প্রেমিকদের সম্বন্ধে অন্য কোন অপরাধের প্রশ্নই উঠে না। শাসকদের নিয়ত সংশয় ও সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টির এমন পরিবেশের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে রাষ্ট্রের প্রতি প্রকৃত দরদ দৃঢ় হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইবে না, ইহা স্বাভাবিক। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সমান অধিকারের মর্যাদাদানের প্রতিশ্রুতি এক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি পরিহাস মাত্র বলিয়াই আমরা মনে করি। পূর্ব পাকিস্থানের ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে কথাটা স্পষ্টভাষাতেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি প্রদানই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সমান অধিকার দেওয়া প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব পাকিস্থানে তাহা করা হইতেছে না; এজন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে একটা অস্বস্তি ও উদ্বেগের ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। লাহিড়ী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকিতে চায় না। তাহারা নিজেদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চায়; কিন্তু ধর্মীয় রাষ্ট্রের মধ্যযুগীয় ধারণার সঙ্গে সর্বজনীন অধিকারের তেমন উদার ভাবনা স্থান পায় কিনা, এ সম্বন্ধে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে; সুতরাং যতদিন পাকিস্থানের মৌলিক রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন না ঘটিবে, সে পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা আমরা দেখিতে পাইতেছি না। এই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, আত্মমর্যাদার তেমন অনুকূল প্রতিবেশ পূর্ববঙ্গে যদি গড়িয়া না উঠে, তবে শুভেচ্ছামূলক মৌখিক আন্তরিকতাহীন আশ্বাসের দ্বারা তথাকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগের গতি রুদ্ধ করা যাইবে না। প্রাণের চেয়ে মানুষের কাছে মানের মূল্য বেশী। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই মানমর্যাদার দিকে তাকানো শুধু মানবতারই প্রশ্ন নয়, এ সম্পর্কে ভারত সরকারের সাক্ষাৎ সম্পর্কে দায়িত্ব এবং কর্তব্যও রহিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদের অবদান স্বীকার করিয়া সে কর্তব্য প্রতিপালনে তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

বিশ্বেষ প্রচারের অভিযান

মৌলানা আক্রাম খাঁ ঢাকায় থাকিয়া এবার ঢাকে কাঠি দিয়াছেন, কবে কাবুলী নৃত্য শুরু হইবে জানি না। গত ১৯শে অক্টোবর হইতে দৈনিক 'আজাদ' ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'আজাদে'র প্রথম সংখ্যাতেই বিপন্ন ইসলামের জিগীর জমাইয়া তুলিবার কৌশল ফুটিয়া উঠিয়াছে। মৌলানা সাহেব মনের দরজা ফাঁক করিয়া হাঁক ছাড়িয়াছেন। পূর্ব পাকিস্থানের অর্থসচিব সেদিন লাহোরে গিয়া সকলকে শুনাইয়াছেন যে, সংবাদপত্রের পক্ষে সহযোগিতার আদান-প্রদান সূত্রে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিবে। 'আজাদ' হইতে তাহার শুভ সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। 'আজাদে'র ঢাকার প্রথম সংখ্যায় যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, এতদিন ভারতীয় রাষ্ট্রে থাকার দরুণ মৌলানা সাহেবের পরিচালনাধীন 'আজাদ' প্রকৃতপক্ষে মনে মুখে এক করিয়া চলে নাই। সোজা কথায় বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে অর্থাৎ মিথ্যাচরণ করিয়াছে। কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদ সম্বন্ধে আজাদের এই মিথ্যাচার, ভণ্ডামীর জন্য মৌলানা সাহেব কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য তাঁহাদের আন্তরিক ছিল না, তথাপি বাহিরের কাজে সে আনুগত্য দেখাইতে হইয়াছে। শুনিতে পাই, মৌলানা সাহেব বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম সাধনাকেই সার করিয়াছেন। ধর্মজীবনের সঙ্গে বিবেকের এমন বিরুদ্ধতা এবং মিথ্যাচার খাপ খায় কিনা শাস্ত্রজ্ঞ মৌলানা সাহেবই সে বিবেচনা করিবেন। তাঁহার অন্তরের সে তত্ত্বকথার জন্য আমরা মাথা ঘামাইতে চাহি না; কিন্তু ঢাকা হইতে 'আজাদে'র মারফতে হায়দরাবাদে মুসলমানদের উপর অত্যাচার, মুসলমান মহিলাদের মর্যাদাহানি, নরহত্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যেসব রোমহর্ষক নিতান্ত ভ্রান্ত মিথ্যার প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। আজাদের এই ধরণের মিথ্যা প্রচারে ভারত সরকারের নীতির কিছু পরিবর্তন ঘটিবে না, ইহা নিশ্চয়। হায়দরাবাদের রেজাকরী নরঘাতক দস্যুদলের উৎসাদন কার্য নির্বিঘ্নেই নিষ্পন্ন হইবে এবং কাশ্মীর হইতে দস্যু হানাদারদের বিতাড়নের বীর রক্ত উদ্‌যাপনও উল্লাসের সঙ্গেই আগাইয়া চলিবে, ইহা আমরা জানি; কিন্তু আমাদের ভয়ের কারণ অন্যত্র। পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয়তাবোধ এখনও জাগ্রত হয় নাই। পাকিস্থানী বলিয়া সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার নিরিখ হয় না। সাম্প্রদায়িকতা এখনও সেখানে রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিক্ষোভ সে অঞ্চলে এই ধরণের বিদ্বেষ প্রচারের ফলে যে কোনদিন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। তেমন অবস্থায় দরিদ্র, অসহায় নরনারীর অশ্রুতেই মাটি ভিজিবে। ইহা কেহই চাহে না। মৌলানা সাহেব ধর্মের দায়ে বৃদ্ধ বয়সে মোহাজের হইয়াছেন। এখন যদি তিনি মোহাজেদের মর্যাদা লাভ করিতে চাহেন, কাশ্মীর রহিয়াছে। কিন্তু বাঙলার আশেপাশে ধর্মান্ধ বর্বরতার এভাবে তিনি আর ছড়াইবেন না। সে তিনি পূর্ব পাকিস্থানের হিতসাধন ক পারিবেন না। পক্ষান্তরে সে পথে চা হইতে অনর্থের বেড়াজালে পাকিস্থ জড়াইয়া পড়িতে হইবে এবং প্রতিক্রিয়ার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। কারণ ম স্বভাবত পশু নয়। ভেদ-বিদ্বেষমূলক প্রচারণার কৃত্রিম প্ররোচনায় মানুষকে বেশ নাচানো চলে না। পশু প্রবৃত্তির অল্পদিনের মধ্যেই ধরা পড়িয়া যায় এবং নিদারুণ দৈন্য ও নিঃস্বতা উন্মুক্ত হয়।

বাঙলার সংস্কৃতির শক্তি

বাঙলার আজ বড়ই দুর্দিন দেখা দি বলা বাহুল্য, এত বড় ঐতিহাসিক বি বাঙলা দেশে আর কোনদিনই আসে নিখিল ভারত প্রাচ্য মহাবিদ্যা সম্মেল দ্বারভাঙ্গার অধিবেশনে ডাক্তার রমে মজুমদার মহাশয় বাঙলার এই বিপদের উল্লেখ করিয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয় ব নিজ গৃহে হিন্দু বাঙালীর স্থান নাই। লক্ষ হিন্দু নরনারী বাস্তুহারা হইয়া স আশ্রয়ের জন্য পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে আজ আমি কি বলিয়া বাঙালীকে সান্ত্বনা তবে মুক্তকণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করিতে যে, ভারতের সর্বত্র প্রবাসী বাঙালীরা যে নিবেশ বা বৃহত্তর বঙ্গ গড়িয়া তুলির সেগুলি বাঙলার সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির ধ ও বাহকরূপে বাঁচিয়া থাকিবে।" মজু মহাশয়ের ন্যায় আমাদেরও ঐ একমাত্র ভর বাঙলার সংস্কৃতির প্রতি আমরা বিশ্বা আমাদের বিশ্বাস এই যে, বর্তমানে বাঙ আকাশ আঁধারে যতই আচ্ছন্ন হোক না মেঘ আবার কাটিয়া যাইবে এবং বাঙ সংস্কৃতি জয়যুক্ত হইবে। প্রাণপূর্ণ ত্যাগে তপস্যায় বাঙলার সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়া অধর্ম, অন্যায়, ভেদ-বিদ্বেষ প্রাণের সে মহিমাকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে মিথ্যার উপর সত্য সর্বদিনই জয়যুক্ত রাষ্ট্রনীতিক বা প্রাদেশিক ভেদবাদ আজ হইয়া দেখা দিয়াছে, এজন্যই বাঙলার সংস্কৃ উদার মহিমাকে সাময়িকভাবে আমরা হইতে দেখিতেছি; কিন্তু অবসন্ন হইলে না। বাঙলার সংস্কৃতির সাধ আমাদিগকে নিশ্চিত থাকিতে হইবে তপস্যা চালাইয়া যাইতে হইবে। আজ বাঙ যাহারা খাটো করিতে চাহিতেছে, বাং সংস্কৃতিকে লঘু করিবার জন্য ধর্মান্ধ স্বার্থান্ধতার পথ ধরিয়া যাহারা চাল তাহাদের কি ত্যাগ বা তপস্যা আছে? মানব জন্য সাধনা তাহাদের কতখানি? বাঙ সংস্কৃতির মূলে যে আত্মোৎসর্গের অ

রহিয়াছে, ইহাদের তেমন গর্ব কোথায়? জগতের ইতিহাস এই সত্যই চিরদিন সাক্ষ্য দিবে যে, যে কর্মসাধনার মূলে আত্যন্তিক ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গের প্রেরণা নাই, তাহা কোনদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এদেশের সাধকরাও বলিয়াছেন, ত্যাগের দ্বারাই সংস্কৃতি বা সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়া থাকে এবং ভৌগোলিক পরিমাপ কোন দেশ বা জাতির শক্তি বাড়ায় না, পরন্তু সংস্কৃতির মূলীভূত ত্যাগ এবং আত্মোৎসর্গের উদার মনোভাবই সৃষ্টিকে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং আকাশে মেঘ দেখিয়া আমরা ভয় পাইব না। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সাধনা যাহাদের সংস্কৃতির মূলে শক্তি যোগাইতেছে, সে সংস্কৃতি জয়যুক্ত হইবেই। সুদৃঢ় এই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আমরা পথের বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইব এবং প্রয়োজন হইলে বুকের রক্তে দেশের মর্যাদা জাতির মান এবং সংস্কৃতির মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিব।

নিষ্ঠুর পরিহাস

মিথ্যা প্রচারেরও একটা মাত্রা আছে; কিন্তু পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতির নিয়ামকদের কাছে সামাজিক এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সাধারণ নীতিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানের অর্থ-সচিব মিঃ হামিদুল হক চৌধুরী লাহোরে গিয়া পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এমন মাত্রাহীন মিথ্যা নির্লজ্জতার চূড়ান্ত হইয়া উঠিয়াছে। চৌধুরী সাহেব সোজা এই কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, পূর্ব-পাকিস্থানের সুখের রাজ্য ছাড়িয়া একজন হিন্দুও পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুত্যাগী হিসাবে আসে নাই। শুধু তাহাই নয়, হিন্দুদের একজনও পূর্ব-পাকিস্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই এবং বাড়ি হারায় নাই। যাহারা পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে যাইতেছে, তাহারা ঘরোয়া ব্যাপার সম্পর্কেই যাইতেছে। এই ধরণের যাওয়া-আসা নাকি বরাবরই চলিয়া থাকে। পূর্ব-পাকিস্থানের গবর্ণমেণ্টের নীতির চাপে পড়িয়া কেহই পশ্চিমবঙ্গে যায় নাই ইত্যাদি। চোখের উপর নিত্যনৈমিত্তিকভাবে যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহাকে অস্বীকার করিয়া কোন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যে এমন বিবৃতি দিতে পারেন, কাগজে ছাপার অক্ষরে পড়িয়াও আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই; কিন্তু অবিশ্বাস্য হইলেও চৌধুরী সাহেব সত্যই এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সমুচিত ভাষাতেই জবাবও তাহার দিয়াছেন। বেশ লক্ষ্য হয়, ডাক্তার রায়ের ভাষা এক্ষেত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে তেজস্বিতায় দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, যশোহর, দিনাজপুর, পাবনা, মেহেরপুর, বরিশাল, পূর্ব-পাকিস্থানের সমগ্র অঞ্চল জুড়িয়া স্বদেশসেবক কর্মীদের উপর যেসব নির্যাতন, লাঞ্ছনা চলিতেছে, সেসব কি মিথ্যা? না, মায়া-মরীচিকা? শ্রীযুত অরুণ গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সতীন সেন, যোগেশ দাস, রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ দাস, কেশবচন্দ্র বাড়ুজ্যে, জিতেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী—পাকিস্থান সরকারের সঙ্গে প্রীতির বাঁধন দৃঢ় করিবার জন্যই ইঁহাদের গৃহে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। রাণাঘাট, শিয়ালদহ প্রভৃতি স্টেশনে প্রত্যহ পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে নরনারীর যে ভিড় জমিতেছে, ইঁহারা কি পাকিস্থানী প্রেমে পুষ্ট হইয়া প্রমোদ ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়াছে? ডাক্তার রায় পূর্ব-পাকিস্থানের নিয়ামকদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, এই ধরণের ধাপ্পাবাজিতে দীর্ঘদিন লোককে ভুলানো চলে না এবং এইভাবে বাস্তব সমস্যারও কোন সমাধান হয় না। কিন্তু আসল কথা হইতেছে যে, পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যাপকভাবে এই দেশত্যাগ আমাদের কাছে যত বড় সমস্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হোক না, পূর্ব পাকিস্থানে শাসন-নীতির পরিচালকদের পক্ষে তাহা নয়। তাঁহারা নির্ধারিত পথেই লইয়াই অগ্রসর হইতেছেন এবং তাহার সার্থকতায় অন্তরাত্মাতে তৃপ্তিই আস্বাদন করিতেছেন, বস্তুতঃ অগণিত নরনারীর দুঃখ-দুর্দশায় তাঁহাদের এমন নিষ্ঠুর পরিহাসের ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থই হয় না। এই এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইহা অবিসম্বাদিতভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্ধ কুসংস্কার যেখানে সামান্য মাত্রও সাড়া দেয়, সেখানে অত্যাচার এবং দৌরাত্ম্য সায়েস্তা করিতে পূর্ব-পাকিস্থানী কর্তাদের শক্তি নাই এবং সেখানে তাঁহাদের দায়িত্ববোধ সুবিধাবাদের মধ্যে সুপ্ত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার সংস্কার মানুষের মনকে সত্য সম্বন্ধে কতটা অন্ধ করিয়া তুলিতে পারে, পাকিস্থানের কল্যাণে বিশ্ব-জগতে সে অধ্যায়ের পাতার পর পাতা ক্রমেই খুলিতেছে। মানবতার জাগরণে কবে মধ্যযুগীয় বর্বরতা এই নির্মম এবং নিষ্ঠুর অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিবে, আমরা জানি না। তবে বুঝিতেছি যে, পরীক্ষার আমাদের আজও অবসান হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে আজ যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় সে সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনা নাই; সমগ্র ভারতকে প্রাণপূর্ণ অবদানের পথে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। ভারত সরকার এ ক্ষেত্রে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় আমাদের পর নহেন। আমরা প্রাণ দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিব। তাহাদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব। ভারতের জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির কাছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, ভেদ-বিভেদ এবং বৈষম্যের অন্তঃসারহীন স্পর্ধাও স্থায়ী হইবে না।

সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষ

লণ্ডনে সাম্রাজ্য প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই সম্মেলনে কি সিদ্ধান্ত হইল এবং ভারত নূতন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহার ভবিষ্য রাষ্ট্র মর্যাদার ক্ষেত্রে সে সিদ্ধান্তের ফল কিরূপ ঘটিবে, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বসম্পন্ন। কারণ রাজনীতি শুধু ভাবপ্রবণতার ব্যাপার নয়, কঠোর বাস্তবের সঙ্গে বিচার করিয়া তাঁহার গতি নিরূপণ করিতে হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বাস্তব রাজনীতির দিক হইতে বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ ভারতের সার্বভৌম রাষ্ট্রমর্যাদা, তাহার সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, ভারতকে সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। সম্মেলনের সিদ্ধান্তে একটা বিষয় খুবই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধতার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র যাহাতে ইঙ্গ-মার্কিনের পক্ষে যোগদান করে, সেজন্য সেখানে যথেষ্ট আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিনের এইভাবে পক্ষ সমর্থনের ফলে সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনিচয়, বিশেষভাবে ভারতের কি সুবিধা হইবে, সিদ্ধান্তে তাহা সুস্পষ্ট নয়। ইংরেজ এবং আমেরিকা নিজেদের স্বার্থ দেখিবে, ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু অতীতের ন্যায় তাহাদের ইঙ্গিত মাত্রে ভারত নিঃস্বার্থভাবে তাহাদের সেবা করিতে অগ্রসর হইবে, এমন উদারতার অসহায়ত্ব এবং দৈন্য হইতে ভারত মুক্তিলাভ করিয়াছে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, ভারত কোনক্রমে তাহার সার্বভৌম রাষ্ট্র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবে না। ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্যে সে রাজী হইবে না এবং সাম্রাজ্যের গোড়া হইতে 'ব্রিটিশ' এই কথাটি বাদ দিলেও সাম্রাজ্যবাদের মূল দোষ কাটিয়া যাইবে, এমন মোহও তাহার নাই। সোজা কথায়, ভারত মানবতার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায় এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিকতার মর্যাদা রাখিতে সে বদ্ধপরিকর। বর্ণবৈষম্য ভারত মানিবে না কিংবা জগতের কোন অংশের জনগণের অভিমতের বিরুদ্ধে তাহাদের উপর প্রবল অপর শক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কূট কৌশলের হিংস্র খেলাকে সে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল এবং পাকিস্থানের ব্যাপারে ভারতের পক্ষে যে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রের নিয়ামক সেগুলির সম্বন্ধে মানবতা এবং গণতান্ত্রিকতার সে মর্যাদা কতটা মানিয়া চলিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নীতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

মেঘ ও পর্বত　　　　শিল্পী: নন্দলাল বসু

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

য়ারের সিদ্ধান্ত

ব্রিটিশ কমনওয়েলথে স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ডের অবস্থিতি দীর্ঘদিন শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞদের মাথাব্যথার । হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা ামের ফলে ১৯২২ সালে স্বায়ত্তশাসন নের পর থেকে ইংল্যাণ্ডের সন্নিকটবর্তী দ্বীপটি যেভাবে নিজের শাসনতন্ত্র গড়ে ছে, সে কথা স্মরণ করলে বিস্মিতই হতে । আয়ার যা পেয়েছিল, তা ছিল মূলত মিনিয়নী স্বাধীনতা। সুতরাং অদৃশ্য বা হলেও বৃটিশ রাজশক্তির প্রতি একটা িকিক আনুগত্যও তার ছিল। স্বাধীন য়ার ঘটা করে আইনগত দিক থেকে এই নুগত্যকে কোনদিন অস্বীকার করে নি। অ কার্যত দেখা গেছে যে, ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে আইরিশরা এই রাজানুগত্যের কোন র্যাদাও রাখে নি। দেশবাসীদের ঐকান্তিক সমর্থনপুষ্ট ডি ভ্যালেরা গভর্নর জেনারেলের পদ বিলোপ করে দিয়েছেন, আয়ারকে গড়ে তুলেছেন রিপাবলিকের ভিত্তিতে। কিন্তু তাই বলে লৌকিক রাজানুগত্যকে আয়ারের পক্ষে একেবারে বর্জন করাও সম্ভব হয় নি। আইরিশ শাসনতন্ত্রে বৈদেশিক সম্পর্ক-পনঘটিত যে আইন বলবৎ আছে, সে আইনানুসারে কার্যত না হলেও নামে বৃটিশ-রাজই আয়র্ল্যাণ্ডের বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ করেন। প্রকৃত নিয়োগ অবশ্য আইরিশ পররাষ্ট্রসচিবই করেন; কিন্তু সে য়োগ লৌকিকভাবে বৃটিশ রাজশক্তির অনুমোদনসাপেক্ষ। একটি সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতদের নামে হলেও রাজানুগত্য স্বীকার করতে হয়—এটা স্পষ্টতঃই পরস্পর-বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। হলে কি হয়—ঘটনাচক্রে পড়ে আয়র্ল্যাণ্ডকে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা মেনে নরেই এতদিন চলে আসতে হয়েছে। এবার আইরিশ গভর্নমেণ্ট স্থির করেছেন যে, এ ব্যবস্থা তাঁরা আর মেনে নেবেন না। তাই তাঁরা পূর্বোল্লিখিত বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন-বিষয়ক আইনটি বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন। বর্তমান আইরিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ জন কস্টেলো এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। আয়ারের জাতীয় আইন সভা ডেইলের আসন্ন অধিবেশনে এই সরকারী প্রস্তাব উপস্থাপিত হবে এবং সে প্রস্তাব যে গৃহীত হবে, সে বিষয়ে সংশয়ও নেই।

আয়ারের এই নতুন সিদ্ধান্তে স্বাভাবিক-ভাবেই খাস বৃটেনে এবং কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ ডোমিনিয়নগুলিতে চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হয়েছে। হবারই কথা। যে অদৃশ্য যোগসূত্র কার্যত না হলেও নামে আয়ারকে এতদিন পর্যন্ত বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছিল, এবার তা ছিন্ন হতে চলেছে। স্বাধীন আয়ার ফিরে পেতে বসেছে তার পরিপূর্ণ মর্যাদা। আয়ার যে বৈপ্লবিক কিছু করতে চলেছে এমন নয়। সে যা করতে চলেছে, তা হলো স্বাধীনতার অতি-স্বাভাবিক পরিণতি। স্বাধীন ব্রহ্মদেশও এই জন্যে রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা করেছে কমনওয়েলথের বাইরে এসে। তবে আয়ারের ব্যাপারে এই চাঞ্চল্যের কারণ কি? চাঞ্চল্যের মূল কারণ হল আয়ারের সঙ্গে বৃটেন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক উভয়তই। আয়ারের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থিতি তো আছেই—তার উপর আছে এক বৃটেনেই ২০ লক্ষ আইরিশ অধিবাসীর সমস্যা। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও বহুসংখ্যক আইরিশ নাগরিক আছে। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বলেই আয়র্ল্যাণ্ড এতকাল অনেক বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এসেছে। আয়ার বিদেশী রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হলে আজ এ সবকিছু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার প্রশ্ন উঠবে। এ বিষয়ে আইরিশ জননেতারাও কম উদগ্রীব নন। আয়ারের রিপাবলিককে কমন-ওয়েলথের একেবারে বাইরে রেখেও তাঁরা কমনওয়েলথের সঙ্গে সর্বপ্রকার যোগাযোগ রক্ষা করতে উৎসুক। আইরিশ নেতারা স্পষ্টতই এ উক্তি করেছেন। তাই নিয়ে চলেছে যত রকম গণ্ডগোল।

আত্মরক্ষার তাগিদে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে যে পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে, অনেক লোভ দেখানো সত্ত্বেও আয়ার সে ইউনিয়নে যোগ দেয় নি। বিভক্ত উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড বা আলস্টারকে আয়ারের মধ্যে টেনে আনার পক্ষে আইরিশ জনমত অত্যন্ত প্রবল। আয়ারের স্বার্থঘটিত এই দুর্বল স্থানে আঘাত করেও বৃটিশ কূট-কৌশল জয়ী হতে পারে নি। কিছুকাল পূর্বে আয়র্ল্যাণ্ডে প্রবাস যাপনের সময় স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মিঃ অ্যাটলী আয়ার ও আলস্টারের মিলন সাধনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে প্রকাশ। বৃটিশ ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, আয়ার যে নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছে, তার ফলে আয়ারে আলস্টারের যোগ-দানের সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত হয়ে গেল। কিন্তু এই ধরণের বিরুদ্ধ সম্ভাবনা সত্ত্বেও আয়ার তার সিদ্ধান্তে অটল। এই জন্যে লণ্ডনে সম্প্রতি যে বৃটিশ কমনওয়েলথ সম্মেলন হয়ে গেল, তার অধিবেশনে যোগদানের জন্যে আইরিশ প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করা হয় নি। আয়ারের নতুন সিদ্ধান্তসঞ্জাত বিভিন্ন অসুবিধা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনার জন্যে কমনওয়েলথ সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ অ্যাটলীর পল্লী-ভবন চেকার্সে আইরিশ গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আর এক দলে গোপন আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল। বৃটেন ছাড়াও ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। আয়ার গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ সীন ম্যাকব্রাইড ও অর্থসচিব মিঃ ম্যাক্‌গিলিগান। আলাপ আলোচনান্তে স্বদেশে ফিরে গিয়ে এঁরা ঘোষণা করেছেন যে, আইরিশ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিতই আছে। আইরিশ রাষ্ট্র পূর্ণ স্বাধীন রিপাবলিকের মর্যাদা নিয়েও বর্তমান সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে এবং কমন-ওয়েলথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারে—এ অভিমতও তাঁরা জ্ঞাপন করেছেন। মিঃ কস্টেলো একটি সুদীর্ঘ বিবৃতিতে বলেছেন যে, আয়ার কমনওয়েলথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলার যে পরিকল্পনা করেছে, তার মূল ভিত্তি হল প্যান-আমেরিকান ইউনিয়নের আদর্শ। কমনওয়েলথের রাষ্ট্রগুলি এই আদর্শ মেনে নিলে অনেক ঝঞ্ঝাট মিটে যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর এ উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইংল্যাণ্ডে যে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন হয়ে গেল, সেই সম্মেলনে ভারত ও পাকিস্থানকে কমনওয়েলথে ধরে রাখার জন্যে নাকি অনেক সলা-পরামর্শ হয়ে গেছে। তার অন্যতম প্রমাণ হল বৃটিশ কমনওয়েলথের নতুন নামকরণ হয়েছে শুধু কমনওয়েলথ। কিন্তু শুধু এই নামগত পরিবর্তনে সকল বাধা-বিপত্তির অবসান হবে বলে মনে হয় না। কমনওয়েলথের অস্তিত্ব যদি রাখতে হয়, যদি তার সাহায্যে বিশ্বের কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধন করতে হয়, তবে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্তিকে পুরোপুরি রাজানুগত্যের সম্পর্কবিবর্জিত করতে হবে। কোন রিপাবলিক কমনওয়েলথের সদস্য হতে পারে কি না আয়ারের দৃষ্টান্ত থেকে আজ এই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে। এ প্রশ্নের একমাত্র সমাধান হল কমনওয়েলথকে সর্বপ্রকারে

রাজানুগত্য-বিবর্জিত করে কমনওয়েলথের সকল দেশকে সমান পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

ইন্দোনেশিয়া

জাভার মাদিয়ুন শহরকে কেন্দ্র করে প্রায় মাসখানেক পূর্বে ইন্দোনেশীয় রিপাবলিকের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টদের যে অভিযান শুরু হয়েছিল, ডাঃ মহম্মদ হাত্তার রিপাবলিকান গভর্নমেণ্ট তা প্রায় দমন করে এনেছেন। জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশীয়দের এই কৃতিত্বের ফলে ইন্দোনেশিয়া সম্ভাব্য অনেক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল বলা চলে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক স্বাধীন দেশেই আজ কম্যুনিস্টরা আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করে শাসনক্ষমতা দখল করার নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু আংশিকভাবে একমাত্র চীনে ছাড়া আর কোথাও তাদের এ কর্মনীতি সামান্য সাফল্যও অর্জন করতে পারেনি। ইন্দোনেশীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকার্নো যোগজাকার্তা বেতার থেকে সানন্দে ঘোষণা করেছেন যে, দক্ষিণ জাভায় কম্যুনিস্টদের শেষ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি পতি এবং পত্জিতানের পতনের ফলে কম্যুনিস্টদের তথাকথিত অভিযানের নাভিশ্বাস উঠেছে। এখনও হয়তো এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু আক্রমণ তারা চালাবে—কিন্তু সে আক্রমণে কোন কাজ হবে না। ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক বিপন্মুক্ত হয়েছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। রিপাবলিকের সঙ্গে আজো সাম্রাজ্যবাদী ডাচদের কোন স্থায়ী আপোষ মীমাংসা হয়নি। বিদেশী শত্রুর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হবার আগেই জাতীয় গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে কম্যুনিস্টরা জাতীয় শক্তিকেই দুর্বল করে তুলেছে। এতে লাভবান হলে হবে সাম্রাজ্যবাদী ডাচরাই। কম্যুনিস্ট অভিযানের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবার ফলে নায়করা কম্যুনিস্ট নেতারা হয় পালিয়েছেন, নয় নিহত হয়েছেন। নায়করা কম্যুনিস্টদের মধ্যে ধরা পড়েছেন একমাত্র আলিমিন। ইনি মস্কোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং মস্কো থেকে মুসো ফিরে এসে পার্টির ভার না নেওয়া পর্যন্ত ইনিই ছিলেন দলের অধিনায়ক। স্বয়ম্ভু কম্যুনিস্ট রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট মুসো ও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আমির শরীফুদ্দীনের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। প্রথমে খবর রটেছিল যে, তাঁরা পালিয়ে গেছেন ব্যাংককে। পরে এ সংবাদ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। মাঝে আর একটি সংবাদ ঘোষিত হয়েছিল যে, শরীফুদ্দীন নিজের সমর্থকদের হাতে নিহত হয়েছেন। পরে এ সংবাদও মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, মুসো ও শরীফুদ্দীন জাভার কোন জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

এই গেল রণনৈতিক পরিস্থিতি। ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও ইতিমধ্যে কোন কোন পরিবর্তন হয়ে গেছে। ডাচ লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর জেনারেল ডাঃ ভ্যান্ মুক অকস্মাৎ পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর স্থলবর্তী হয়ে আসছেন ভূতপূর্ব ডাচ প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বীল্। অনেকের ধারণা যে, ডাঃ বীল কিছুটা উদারনৈতিক কর্মনীতি নিয়ে আসছেন এবং তাঁর উদ্যোগে ডাচ-ইন্দোনেশীয় বিরোধ মীমাংসা হওয়াও বিচিত্র নয়। ডাচ গভর্নমেণ্ট অবশ্য কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের বিজয়ে খুসীই হয়েছেন; কিন্তু আপোষ-মীমাংসা সম্বন্ধে অতিরিক্ত আশা পোষণের কোন হেতু দেখি না। সম্প্রতি হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্ থেকে ইন্দোনেশীয় রিপাবলিককে বাদ দিয়ে অন্তর্বর্তী ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠনের যে প্রস্তাব করা হয়েছে এবং পূর্বে জাভায় নতুন একটি ডাচ তাঁবেদার রাষ্ট্র যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে আমরা কোন নতুন আশার কারণ খুঁজে পাই না। তবে অন্য একটা ব্যাপার থেকে কিছুটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা কমিটির তরফ থেকে ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যদ্বয় যুগ্মভাবে যে আপোষ-প্রস্তাব এনেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী হল্যাণ্ড তা গ্রহণ করে নি। এই-বার মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ কোক্রান্ পুনরায় এই কঠিন কাজে হাত দিয়েছেন। তাঁর নতুন আপোষ-প্রস্তাবকেই বর্তমানে দুপক্ষ বিচার বিবেচনা করে দেখছে। মিঃ কোক্রান ঘোষণা করেছেন যে, পুনরায় উভয়পক্ষের আপোষ-আলোচনায় সম্মিলিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাঁর এ প্রয়াস সার্থক হোক, ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক পূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদা পাক—আমরাও তাই চাই। সাম্রাজ্যবাদী হল্যাণ্ড তা চায় কিনা, পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই তার প্রমাণ মিলবে।

প্যালেস্টাইন

প্যালেস্টাইনের দক্ষিণাঞ্চল নেগেবে পুনরায় মিসরীয় ও ইহুদীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল। একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ অঞ্চলে এই যুদ্ধ বাধলেও প্যালেস্টাইনের সর্বত্র এই সংগ্রামের আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের চাপে পড়ে আরব ও ইহুদীরা সাময়িকভাবে শান্ত হয়ে থাকলেও ভিতরে ভিতরে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে বারুদের স্তূপবিশেষ হয়ে আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শ পেলেই এ স্তূপ ফেটে পড়বে। প্যালেস্টাইনে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের যে সব পরিদর্শক আছেন, তাঁরা চেষ্টা করেও নেগেবে যুদ্ধারম্ভ বন্ধ করতে পারেন নি। তখন তাঁরা বাধ্য হয়েই স্বস্তি পরিষদের কাছে আবেদন জানান। একটি জরুরী অধিবেশনে মিলিত হয়ে স্বস্তি পরিষদের সদস্যরা অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সে মর্মে ইজরাইলী রাষ্ট্র ও মিসরের কাছে আবেদন জানান। উভয়পক্ষই এ আবেদন মেনে নিয়ে আপাতত অস্ত্র সম্বরণ করেছেন। কিন্তু প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে এই ধরণের ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা আর কতদিন চলবে?

বিতর্কমূলক নেগেব অঞ্চল নিয়ে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে প্রচুর বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নিহত কাউণ্ট বার্নাদোতে তাঁর রিপোর্টে প্যালেস্টাইন বিভাগের যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন, সে পরিকল্পনা অনুসারে নেগেব পড়েছে ইহুদীদের ভাগে। এতে স্বাভাবিকভাবেই আরবদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়েছে। নেগেবে ইহুদীদের নতুন অভিযানের কারণ হল মিসরীয় বাহিনীর পশ্চাদবর্তী ইহুদী অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের চেষ্টাসঞ্জাত। মিসরীয় বাহিনী এই চেষ্টায় বাধা দিয়েছিল বলেই এ সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিল। স্বস্তি পরিষদের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে এ সংগ্রাম যে বেশী দূর গড়াতে পারে নি সেটা সুখের কথা। কিন্তু প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান যদি আজও তাদের দুর্বল কর্মনীতির মোহ কাটিয়ে উঠতে না পারে, তবে প্রতিনিয়তই এই ধরণের দুর্দৈবের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে বলে আমরা মনে করি। নিহত কাউণ্ট বার্নাদোতের পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক আর নতুন কোন পরিকল্পনারই উদ্ভব করা হোক সে পরিকল্পনাকে অবিলম্বে এবং কঠোর হস্তে কার্যকরী করে তোলা অত্যাবশ্যক। এই অনিশ্চিত অবস্থা চলতে থাকলে প্যালেস্টাইনে কোন দিনই শান্তি স্থাপিত হবে না। সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের উদ্বাস্তু বিভাগের ডিরেক্টর স্যার রাফেল ক্লিয়েণ্টোর একটি বিবৃতি থেকে দেখা যায় যে, প্যালেস্টাইনে উদ্বাস্তু আশ্রয়প্রার্থীদের দুর্দশার অন্ত নেই। তাঁর গণনানুসারে প্রায় ৭ লক্ষ আরব ও সাত হাজার ইহুদী বর্তমানে প্যালেস্টাইনে আশ্রয়হীন জীবন-যাপন করছে। সম্মুখে শীত। অথচ তাদের না আছে দেহাবরণের বস্ত্র—না আছে মাথা গুঁজবার ঠাঁই। প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান না হলে এই ধরণের দুর্দশা বাড়বে বই কমবে না। প্যালেস্টাইনের এই অবর্ণনীয় দুর্দশার জন্যে সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের দুর্বল ক্লীব ও দীর্ঘসূত্রী কর্মনীতি যে বহুলাংশে দায়ী, সে কথা না বললেও চলে। এই দুর্দশা যাতে আর বাড়তে না পারে তার জন্যে অবিলম্বে প্রয়োজন হল সুদৃঢ় কর্মনীতির। কাউণ্ট বার্নাদোতের হত্যার পরেও কি সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের চৈতন্যোদয় হবে না?

২৪-১০-৪৮

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

ইরে যেয়ে থাকতে থাকতে মনটা আমার খারাপ হয়ে ওঠে। এমন একটা রিক্ত বুকটাকে চেপে থাকে, মনের এমন একটা ম্ব ভার বোধ করা যায়, যাতে করে মনে বাইরের অন্ধকারময়ী শূন্যতা অনন্ত শটাকে আশ্রয় করে বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। শ আর মনকে টানে না, ছুঁড়ে ফেলে দেয় াকাশের গায়ে আর মনের খবর পড়া যায় পাওয়া যায় না।

সমরের মনে পড়ে যায়, কতদিন তাঁবুতে য়ে বুকে হাত দিয়ে রাতের তারা-ভরা আকাশের দিকে অনিমেখে চেয়ে বাড়ির কথা ভাবতো—সেই অসংখ্য তারার চোখে কত সান্ত্বনা ছিল! আশা-আনন্দ পরিপোষক উজ্জ্বল তারারা দীপবর্তিকার মত প্রতিদিন রাত্রে আকাশে উদয় হতো—মনে হতো তার মনের অনেক কথা এই তারারা জানে। শত্রুপক্ষের বিমান নিরীক্ষণ করতে যারা নৈশ আকাশে চোখ রাখে তাদের জন্যে তারা-ভরা আকাশের কি মানে হয় জানি না, কিন্তু সমরের মত যারা ঘর ছেড়ে বাইরে এসে বাড়ির কথা, প্রিয়জনের কথ ভাবতে ভালবাসে, তাদের কাছে নক্ষত্র-খচিত ছায়াপথবিশিষ্ট শূন্য আকাশের অনেক মানে হয়। আকাশে যদি তারা না থাকতো, মানুষের মূক বেদনাহত ভাবনাগুলোর কি হতো? —ক্ষতি কি ভাবতে, আকাশের ঐ তারাগুলো আমাদেরই অসংখ্য ভাবনার এক-একটা উজ্জ্বল রূপ। মাটি থেকে মুখ তুলে কোনদিন আকাশের দিকে চোখ ফেরালে কোন নক্ষত্রের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ে একথা কি মনে হয় না, তোমার-আমার মনে একান্ত গোপনীয় যে ভাবনাগুলো প্রকাশ হতে না পেরে বেদনায় বুকের মধ্যে মাথা কুটে, তারাই ঐ তারার মধ্যে অভিব্যক্ত?—তোমার বেদনার মূর্চ্ছনা ঐ তারার আলোয় সারারাত দপ দপ করে।

কাল সকাল হতে এখনো কত দেরি, কে জানে—রাত্রি আর সমরের ভালো লাগে না। দিনের আলোয় এখন একবার পরিচিতদের দেখে নিলে যেন ভাল হয়—তার আসার খবর পরিচিত পরিবেশ জানুকঃ সমর যুদ্ধ থেকে ফিরেছে, মিত্রপক্ষের জয় হওয়ায় তার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল করে এসেছে—সে-সমর এখন নেই; যুদ্ধে না গিয়ে তোমরা লেখাপড়া শিখে ভুল করেছ—সমরকে দেখে এখন বোঝ, শিক্ষিত লোকের যুদ্ধে যাওয়া উচিত কি না।

কিন্তু ওরা যদি ওদিক দিয়েই না যায়—যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসাটা একেবারে গণনার মধ্যে না ধরে? এমন কিছু একটা বুদ্ধিমানের, যোগ্যতার কাজ বলে মনেই না করে—আর সমরকে দেখে একেবারেই ঈর্ষান্বিত না হয়, তাহলে? ওদের সঙ্গে দিনের আলোয় যেয়ে দেখা করে আসবার তখনো কি দরকার হবে? নিজের ছোট ভাই হয়ে যেকথা অক্লেশে ভাবতে পারলে পাড়ার পাঁচজন চেনাশোনা বন্ধু-বান্ধব সেকথা ভাবলে আর দোষ কি? বৃটিশের প্রভুত্বকে প্রশ্রয় দিতে তারা যুদ্ধে গিয়েছিল? বেশ। কিন্তু সেই প্রভুত্বকে রসাতলে দিতে এরা দেশে থেকে এতদিন কি করলে? —প্রবীরকে প্রশ্নটা করবার জন্যে সমর ছটফট করতে লাগল। কথায় মাতব্বরি করলেই চলবে না—তারা বাড়ি থেকে কার সুবিধে করেছে—কার ভাল হয়েছে?

প্রবীরের কথায় ঘৃণার, অবজ্ঞার ভাব সমর বুঝতে পারে। ভায়ের প্রতি কেমন একটা বৈরী ভাব মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—সমর টের পায়। ছোট ভায়ের ঘৃণার জবাবে কি করা উচিত? আঘাত? বিচ্ছেদ? না, আত্ম-সমর্পণ? সব কিছুর এখনি যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেলে মাথার আগুনটা নিভে যায়। স্নেহ নয়, স্বার্থ নয়, শুধু মতবিরোধ ভায়ে-ভা. এতখানি তফাৎ করে দেয়? কোন ব িবসম্বাদ না করে সমর যদি মনে করে, বেশ করেছি যুদ্ধে গেছি; আর প্রবীর যদি অসাক্ষাতে বলে বেড়ায়—যুদ্ধে গিয়ে তোমরা ৃটিশের প্রভুত্বকে কায়েম করেছো—কি আসে-যাবে? না, তাহলেও সুস্থির হওয়া যায় না, আত্মশ্লাঘার কোন পর্দায় যেন এখনো বেসুরো বাজছে—গলায়-বেঁধা মাছের কাঁটার মত প্রবীরের কথাগুলো মনের মধ্যে খর-খর করছে। একটা মনগড়া বিরোধের জন্যে মনটা যেন প্রস্তুত হচ্ছে।

গলির মধ্যে কোথায় যেন জল পড়ছে—ছরছর করে একটানা শব্দ হচ্ছে। শব্দটা এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কাদের বাড়ির ছাদের ঘোলা জলের ট্যাঙ্কটা ভর্তি হয়ে উপছে পড়ছে—গলি পথটাকে পিচ্ছিল করে রাখছে। কাল সকালে হয়তো ঐ ট্যাঙ্কে একটুও জল থাকবে না—মিছিমিছি অকারণে পথটাকে পিচ্ছিল করে দিচ্ছে। জানালার বাইরে রাত্রির গভীরতায় মাটির স্পর্শ পাওয়া আকাশটা যেন উঁকি-ঝুঁকি মারছে, ট্যাঙ্ক উপছে গঙ্গাজল পড়ে যাওয়ায় শব্দে সচকিত হয়ে উঠেছে—সমরের জানালার বাইরে একটি তারার চাহনি বড় নিষ্প্রভ। এখন ট্যাঙ্কের জলটা শুধু শুধু নষ্ট হচ্ছে, কাল কাজের সময় একফোঁটা জল পাওয়া যাবে না—গৃহস্বামীর কত অসুবিধা হবে। কে জানে, কাজের সময় জল না পাওয়ার রহস্য তিনি আজো অবগত কিনা। শূন্যপথে মাটির বুকে অকারণে অসময়ে জল পড়ার শব্দটা বড় অস্বস্তিকর মনে হয় সমরের—তার নিদ্রাহীনতা বিলম্বিত করে রাখছে কেবল। এখনি সকাল হয় না?

ঠিক সেইভাবে যেন আর সব জিনিস ফিরে পাওয়া যায় না। আত্মপ্রসাদ আত্মগৌরব করতে আপনা থেকে সংকোচ বোধ করে সমর। যুদ্ধের কথা এরা তার চেয়ে ঢের বেশি জানে মনে হয়—যুদ্ধে না গিয়েও যথাযথ বর্ণনা করতে পারে স্বর্গ-মর্ত-পাতালের যুদ্ধকাহিনী। যে-অস্ত্রে যুদ্ধ শেষ হলো, তার জটিল ফরমুলাও এদের অনেকের কণ্ঠস্থঃ The next will be an Atomic War!

সব এদের জানা কথা। অর্থাৎ যুদ্ধে গেলেই যুদ্ধ জানা যায় না। এদের কাছে নিজের সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য আশা করেছিল, তার প্রকাশ বড় একটা সমর দেখতে পেলে না—যুদ্ধে গিয়ে ফিরে এসে বাহাদুরীর বাহবা প্রত্যাশা করা এখন বিড়ম্বনা, ছেলেমানষী মনে হয় সমরের। এর চেয়ে ফিরে না এলেই যেন ছিল ভাল, মৃত সৈনিকের সম্মান যেন অনেক বেশি।

বয়স্থরা দেখা হলে বলেন, এই যে সমর! তারপর কবে ফিরলে? ভাল তো?

এই পর্যন্ত, আর কোন কথা হয় না—কোন কৌতূহল প্রকাশ করেন না। কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়, সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থেকে আবাল্য পরিচিত পরিবেশ সম্বন্ধে বিদেশে বসে যে হিসেব করেছিল, তা যেন ঠিক নয়। একটা অতিপরিচিত ঘটনার মত এই যুদ্ধ, তার প্রস্তুতি, তার মৃত্যুপণ-কুচকাওয়াজ করে বন্দুক ধরে বোমা ফেলে গ্রাম নগর ধ্বংস করে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ বিজয়-অভিযান করবে এ আর বড় কথা কি! বিংশ শতাব্দীর মানুষ ওতে ভয় পায় না, ওতে বিস্ময় প্রকাশ করে না। যুদ্ধাবস্থায় শিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষের মৃত্যুপণের অসারতা সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে পেরেছে। মুষ্টিমেয় মানুষের যুদ্ধ-পরিকল্পনায়

অগণিত লোকের আত্মাহুতির সঙ্কল্প কেরানী-গিরিতে জীবন উৎসর্গ করার মত—কোন বাহাদুরী নেই, কোন কৃতিত্ব নেই।

সমবয়েসী ছোটরাও আশানুরূপ ভিড় করে না। দেখা হ'লে জিগ্যেস করে, কি ছুটি হয়ে গেল, না আবার যেতে হবে? কিন্তু যাই বলুন বেটাদের বুদ্ধি আছে, কিভাবে চাকা ঘুরিয়ে দিলে।

সমর ক্ষুণ্ণ হয়। এই চাকা ঘোরানয় তাদের যেন কোন মূল্য নেই। অনেকটা রাজায় রাজায় যুদ্ধে খ্যাতির বখরা থেকে কাটা-সৈনিকদের বাদ পড়ার মত—মাইনে, মেডেল আর মাসোহারায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অথচ কিভাবে যে তাকে আত্মীয় বন্ধু স্বীকার করবে তাও সমর জানে না, কি বলবে? সমরের মত সাহসী ছেলে হয় না, না বাঙালী জাতের কলঙ্ক মোচন করেছে সমরের মত ছেলেরা? না, তার পদমর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হ'য়ে নিজের ছেলেদের অপদার্থ বলে' ভর্ৎসনা করবে? কি হ'লে সমর আজ যুদ্ধে যাওয়াটা সার্থক বলে' মনে করবে? সে বাঁচতে চেয়েছিল, সে আজ বেঁচেছে—তা যে করেই হোক, কি আসে যায় ওরা যদি স্বীকার না করে—তার যুদ্ধে যাওয়াটা একটা স্মরণীয় ঘটনা বলে মনে না করে?

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে সমর—সমবয়েসী ছেলেরা রাজনীতির আলোচনাটা যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমে করছে। 'আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের বীরত্ব কাহিনী নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মেতে উঠেছে। এমন সব অসম্ভব অচিন্তনীয় ঘটনার কথা বলে সব! একবার ভারতের মাটিতে পা দিলে ইংরেজদের দেশ-ছাড়া করা যেত! কোথায় যে সব কি হয়ে যেত ভাবতে পারা যায় না!...অকারণে সমর প্রবীরকে ভয় করতে আরম্ভ করেছে—পারত পক্ষে ভায়ের সঙ্গে বাক্য-বিনিময় করে না—এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে, অথচ কেন যে ভয় ছোট-ভাইকে বুঝতে পারে না। প্রবীর কি সমরের চেয়ে অনেক বোঝে? ভায়ের চলা ফেরাটা কেমন যেন সন্দেহের—কখন বাড়ী থাকে, কখন বাড়ী থাকে না বোঝবারই জো নেই—এদিকে চাকরি-বাকরিও কিছু করে না। দেখলে মনে হবে, সারাদিনরাত গুরুতর কাজে ব্যস্ত আছে, নাইবার খাবার সময় নেই। কি করে' জিগ্যেস করা যায়, প্রবীরের এত কাজটা কি? বাড়ীর কেউ জানে না, কাউকে জানান দরকার বলেও মনে করে না—এমনভাবে থাকে সংসারে যেন ওকে পায়ে ধরে খোসামোদ করে' ধরে-বেঁধে রাখা হ'য়েছে। মা-বাবা আড়ালে ওর সম্বন্ধে আলোচনা করেন; কিন্তু সামনাসামনি এমনভাব দেখান যেন ছোট ছেলে দুবেলা বাড়ী এসে তাঁদের কৃতার্থ করে দিচ্ছে—এ সংসারে ওর জন্যে একটা নিঃশব্দ শ্রদ্ধার আসন পাতা আছে। সমর বেশ বুঝতে পারে, মুখে এঁরা যাই বলুক ছোটছেলেকে এরা ভয় করে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসেন,—মধ্যবিত্ত সংসারে বেকার ছেলের জন্যে এতখানি আদর এতখানি সম্ভ্রম আশ্চর্য মনে হয়। এ সম্ভ্রমবোধের কারণটা কি? আজ সমর যদি বেকার থাকতো তা হলেও কি এ সংসারে প্রবীরের জন্যে আসনটা ঐভাবে পাতা থাকতো? মা-বাবা কি ক্ষেপে পড়তেন না, অভিযোগ করতেন না? এক এক সময় সমরের মনে হয়, সংসারটার জন্যে সে-ই কেবল বড় বেশী ভেবেছিল—সংসারটার জন্যে সে নিজের ব্যক্তিত্ব অনেকটা খুইয়েছে—এতটা না করলেও চলতো! বড় ফাঁকি পড়ে গেছে সে!

বাবা যখন এসে অভিযোগ করেন—অতো বড় ছেলে কিচ্ছু করবে না, সংসারের সুখদুঃখ বুঝবে না, বললে চুপ করে' থাকবে, ওকে নিয়ে হ'য়েছে এক জ্বালা!—সমর কৌতুক বোধ করে। সত্যিই কি এঁরা প্রবীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত? কৌতুকবোধটা মাঝে মাঝে বিরক্তিতে পর্যবসিত হয়ঃ তাকে শোনা-বার কি দরকার!

মা মাঝে মাঝে বলেন, কোনদিন একটা কিছু করে' না বসলে বাঁচি, কি কাজ সে রাতদিন করে' বেড়ায় তার ঠিক নেই! উনি বলে' বলে' হেরে গেছেন।

মা ছোট ছেলের সম্বন্ধে আশ্বাস চান কি না ঠিক বোঝা যায় না। সমর জিগ্যেস করে, তা আমি কি করবো? আমাকে তো মানে ভারি!

শেষের উক্তিটা কানে বড় বাজে—আড়ালে ছোট ভায়ের সম্বন্ধে একি অভিযোগ করছে সে। মানামানির প্রশ্ন কোনদিন ওঠেনি, প্রত্যক্ষ কোন সংঘর্ষও ঘটেনি—ছি, ছি, একি দুর্বলতা প্রকাশ করছে! কথাটা বলে' ফেলে নিজে থেকে সমর কেমন যেন ছোট হ'য়ে যায়, সহজ হবার চেষ্টা করে মাকে বলে, কি আর করবে—বোধ হয় চাকরিবাকরির খোঁজ করে। ভয় পাবার কি আছে!

একটু যেন হাসেও সমর, মার কিন্তু দুশ্চিন্তা কেটেছে বলে মনে হয় না—বলেন, তুই বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলিস্, বয়েস হচ্ছে সংসারে মতিগতি হওয়া তো এখন দরকার!

মা চলে গেলে সমর ভাবে এও একটা কর্তব্য বোধ হয়, ছোট ভাইকে শুধরে সংসারানুরাগী করা। প্রবীরের ওপর সমরের হিংসে হয়, কত লোক তার জন্যে ভাবছে! তার জন্যে কেউ ভাবে না! সে যদি প্রবীরের মত সংসারে ছোট হয়ে জন্মাত, মাথার ওপর বড় ভাই থাকতো—নিজের ভাগ্য নিজেকে তৈরী করে নেবার জন্যে যুদ্ধে যেতে হ'তো না! কেবল ত্যাগ স্বীকার কর, ভাব, ভা[illegible] কর! আগাগোড়া ব্যাপারটা সমরের বড় বিরক্তিকর লাগে—ধেড়ে ছেলের জন্যে এ উদ্বেগ ন্যাকামির মত মনে হয়। আবার এক এক সময় ভালও লাগে—মনে হয়, সে সংসারের কর্তা বলেই মা-বাবা প্রবীরের সম্বন্ধে তাকে জানাচ্ছে। এখন একটা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমরের হাত। সমরই যখন সকলকে খেতে পরতে দিচ্ছে। কিন্তু কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে সমর কিচ্ছুতে ঠিক করতে পারে না। এমন একটা হুকুম জারি করলে যাতে প্রবীর শান্ত সুবোধ ছেলের মত ঘরমুখো হবে—দাদার কথায় উঠবে-বসবে!

কিন্তু হুকুমটা দেওয়াই বা যায় কি করে—আর কাকে দিয়েই বা জারী করা যায়? একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাণীকে ডেকে সমর জিগ্যেস করলে, তোর ছোড়্দা কোথায় রে! হঠাৎ দাদার ছোড়দার খোঁজে বাণী মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়—ভায়ে ভায়ে একটা মনকষাকষি সে গোড়া থেকে আন্দাজ করে রেখেছে। বুঝেছে, দাদা ছোড়্দাকে পছন্দ করে না—ছোড়্দার কার্যকলাপ তো নয়ই। বাণী বললে, ছোড়্দা তো নেই।

জেরা করার মত সমর জিগ্যেস করে, কোথায় জানিস?

বাণী বলে, তা তো জানি না!

সমর ফের প্রশ্ন করে, কখন ফিরবে?

বাণী যেন এবার একটু সংশয়ে পড়ে—বিস্মিত হয়—বলে, তা বোধ হয় রাত্তির হবে। কেন তোমার কি ছোড়্দাকে দরকার? এসময় তো ছোড়্দা কোনদিন বাড়ী থাকে না!

সমর বলে, না।

দাদাকে বাণী জিগ্যেস করতে পারে না কেন—সমরও প্রবীরকে খোঁজ করার হেতুটা প্রকাশ করে না। আজ অসময়ে প্রবীর বাড়ী না-থেকে যেন একটা গুরুতর দায়িত্ব থেকে তাকে রেহাই দিলে! দেখা হ'লে কি-ই বা জিগ্যেস করতো ভাইকে, কি-ই বা কৈফিয়ৎ চাইতো? ওর খুসী ও চাকরি করবে না, ওর খুসী ও কি করে না-করে কাউকে বলবে না! দুত্তোর মিছিমিছি মাথা-ঘামান কেবল! প্রবীর কি ছোট ছেলে, নাবালক? ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি তার যথেষ্ট হয়েছে। প্রবীরের মত নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হতে পারলে যেন সমর আজ বেঁচে যেত। শ্লাঘার ব্যাপারে এত মাথা ঘামাতে হতো না তা হ'লে!...... (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

চেতনা নাশক

শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন

রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে, রাবণ পুত্র মহাবীর ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের সময় এমন রহস্যাস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন যে তার প্রভাবে বানরবাহিনী এবং রাম ও লক্ষ্মণ পর্যন্ত বিবশ হয়ে গিয়েছিলেন। পবননন্দন হনুমান তখন হিমালয় পর্বত থেকে গন্ধমাদন নামে ওষধি পর্বত উৎপাটিত করে আনেন। পর্বতস্থ ওষধির আঘ্রাণে সমুদয় বানর সৈন্য ও রাম-লক্ষণের জ্ঞান ফিরে আসে। তখন হনুমান গন্ধমাদনকে আবার যথাস্থানে রেখে আসেন। তারপর আবার রামানুজ লক্ষণ যখন রাবণের শক্তিশেলের আঘাতে জ্ঞানলুপ্ত হয়ে' ভূপতিত হলেন তখন হনুমান পুনরায় সেই গন্ধমাদন নামে

জেমস সিম্পসন

ওষধি পর্বত উৎপাটিত করে নিয়ে আসেন। সুষেণ সেই পর্বত থেকে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্য-করণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী এই চার প্রকার ওষধি পেষণ করে লক্ষ্মণকে আঘ্রাণ করালেন। লক্ষ্মণ অচিরে নীরোগ হয়ে' উঠে দাঁড়িয়ে রামকে আলিঙ্গন করলেন।

লক্ষণ যে কোনো-এক অস্ত্রের আঘাতে জ্ঞানলুপ্ত হয়েছিলেন সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়, কিন্তু ইন্দ্রজিতের কোন্ অস্ত্রের প্রভাবে বানরসৈন্য ও রামলক্ষণের ন্যায় মহাবীর পর্যন্ত জ্ঞানলুপ্ত হলেন তা বলা শক্ত। ইন্দ্রজিৎ কি কোনো প্রকার গ্যাস দ্বারা তাদের অজ্ঞান করেছিলেন? না আর কিছু? যাই হোক প্রাচীন ভারতীয়েরা অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার ওষুধ জানতেন।

চরক সুশ্রুতের যুগে এবং এমন কি বৌদ্ধ যুগেও শল্য চিকিৎসার প্রচলন ছিল। তখনকার অস্ত্রচিকিৎসকগণ ঠিক কি ওষুধ দ্বারা এবং কিভাবে রোগীকে বিবশ করতেন জানা নেই। মুসলমানদের সময় থেকে শল্য চিকিৎসা কেন, আয়ুর্বেদ পদ্ধতি চিকিৎসাই কমতে থাকে এবং অনেক প্রাচীন পুঁথি নানা কারণে নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে আয়ুর্বেদের বহু প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। এই ত' গেল প্রাচীন আয়ুর্বেদের কথা।

এইবার ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডে অস্ত্রোপচারের কি অবস্থা ছিল তারই একটু নমুনা দেখা যাক্। পুরাতন ভাঙাচোরা খাবার একটি টেবিলের ওপর একটি মহিলাকে শোয়ানো হয়েছে, তাঁর অন্ত্রে কোনোস্থানে অস্ত্রোপচার করা হ'বে। চিকিৎসক মহাশয় মহিলাটিকে চামড়ার বন্ধনী দিয়ে টেবিলের সঙ্গে বেশ মজবুত করে বেঁধেছেন। অস্ত্রোপচারের সময় শক্ত করে ধরবার জন্য চারজন ষণ্ডা ব্যক্তিও মোতায়েন আছে। কিছু গরমজল, কয়েকটি ছুরি কাঁচি নিয়ে হাত গুটিয়ে ডাক্তারবাবু তৈরী। ডাক্তারবাবু হঠাৎ ছুরি তুলে নিয়ে মহিলাটির তলপেটের একস্থানে বেশ খানিকটা চিরে দিলেন। তীব্র চিৎকারে আকাশ বাতাসও যেন চিরে গেল, কঠিন বন্ধন আর ষণ্ডা ব্যক্তিগুলির নাগপাশ থেকে মহিলাটি যেন নিজেকে ছিঁড়ে নিতে চায়। কিন্তু মহিলাটির করুন ক্রন্দনে কেউ ব্যথিত নয়। ডাক্তারবাবু আবার খানিকটা চিরে দিলেন, মহিলাটি আবার আকাশ বাতাস ফাটিয়ে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

এই রকমই ছিল তখনকার অপারেশনের ব্যবস্থা। না ছিল চেতনানাশকের ব্যবস্থা, না ছিল কোনো রকম প্রতিষেধকের ব্যবস্থা। কিন্তু তবুও মহিলাটি হয়ত বেঁচে উঠল, যে রোগের জন্য অস্ত্রোপচার করা সেই রোগ থেকেও হয়ত ডাক্তারবাবু তাকে মুক্ত করতে পারলেন কিন্তু সেই সঙ্গে তার আরও অন্য এবং নতুন উপসর্গ জুটলো তা থেকে ডাক্তার-বাবু আর তাকে মুক্ত করতে পারলেন না। সজ্ঞানে অস্ত্রোপচারের অসহনীয় ক্লেশভোগের ফলে তার হৃদযন্ত্র বরাবরের মতো খারাপ হয়ে' গেল, অস্বাভাবিক উদ্বেগ আর অজ্ঞান অবস্থায় অক্সিজেনের অভাবে তার মস্তিষ্কের কতকগুলি সূক্ষ্ম স্নায়ু জখম হয়ে যায়, এজন্য সে সব সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, আর তার স্মরণ শক্তিরও হ্রাস হ'ল। অস্ত্রোপচারের এই যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতি এড়াবার জন্য অনেকেই চিরজীবন কষ্টভোগ পছন্দ করে' নিত। যদিও বা কেউ সাহস করে' অস্ত্রোপচার করিয়ে বেঁচে উঠত, পরে তাকে সেজন্য অনুতাপ করতে হ'ত।

এত গেল একশত বৎসর পূর্বের কাহিনী। একটি আধুনিক হাসপাতালে নতুনতম অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা দেখা যাক্। এক্ষেত্রেও একটি মহিলার অন্ত্রে অস্ত্রোপচার করা হ'বে। মহিলাটি হাসপাতালে আসবার পর থেকেই যাতে সে বাড়ীর অভাব অনুভব না করে তাকে সেইরকম পরিবেশের মধ্যেই রাখা হ'ল। হাসপাতালে ভর্তি হবার পর এবং অস্ত্রো-

উইলিয়াম টি, জি, মর্টন

পচারের পূর্বদিন সন্ধ্যায় হাসিমুখে একজন ডাক্তারবাবু তার সঙ্গে কথা বলে গেলেন। তিনি জানিয়ে গেলেন যে তাঁর কায হ'ল যাতে অস্ত্রোপচারের সময় রোগী কোনোরকম ব্যথা না পায় অথবা অসুবিধা ভোগ না করে। যাতে রাত্রে সুনিদ্রা হয় এই রকম ওষুধের ব্যবস্থা করে' তিনি চলে গেলেন। এই ডাক্তারবাবুকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় অ্যানেসথেটিস্ট অথবা বিবশকারী। এই যে একটু আত্মীয়তার সুরে ডাক্তারবাবু কথা বলে' গেলেন এর মূল্য অনেকখানি।

পরদিন অস্ত্রোপচারের কিছু আগে সেই বিবশকারী ডাক্তারবাবু মহিলাটির পিঠে শির-দাঁড়ায় নব আবিষ্কৃত একটি ওষুধ ইঞ্জেকসান

দিলেন, কিছু পরেই তার পেটের সব কিছুই অবশ হয়ে গেল, পেটের অস্তিত্ব আছে বলে মনেই হয় না; এমন কি অস্ত্রোপচার চলবার পাঁচ মিনিট পরে মহিলাটি জানতে পারলেন যে তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে, কিন্তু কিছুই অনুভব করলেন না। ডাক্তারবাবু নিয়মমতো ছুরি চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু রোগীর অবস্থার দিকে কিছুই লক্ষ্য রাখছেন না, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ বিবশকারী ডাক্তারবাবুর। অস্ত্রোপচার চলবার সময় বিবশকারী লক্ষ্য করলেন যে প্রচুর রক্তপাতের ফলে রোগিণির রক্তের চাপ কমে গেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তার শরীরে নতুন রক্ত সঞ্চার করিয়ে দিলেন। তাছাড়া মহিলাটির নিশ্বাসপতনের সংখ্যা ও নিশ্বাসের গভীরতা কমতে লাগল, বিবশকারী ডাক্তারবাবু তখনই তাড়াতাড়ি চার চাকার ওপর বসানো একটি যন্ত্র আনালেন, রোগিণীর মুখের ওপর রবারের একটি মুখোস পরিয়ে দিলেন এবং যন্ত্রটি থেকে অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগ করলেন, রোগিণীর নিশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে' উঠল। এত যে ব্যাপার হয়ে' গেল, রোগিণী যে প্রায় মৃত্যুর দ্বারে যেয়ে পৌঁছেছিল, অস্ত্রোপচারক কিন্তু তার কিছুই টের পান নি।

অস্ত্রোপচারের যে বিপদ তা শত বৎসর আগেও যেমন ছিল আজও তেমনি আছে কিন্তু তখন ছিল না কোনো চেতনানাশক অথবা সার্জনকে সাহায্য করতে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিবশকারী। একজন আধুনিক বিবশকারী জানেন কোন্ রোগীকে কোন্ চেতনানাশক দিয়ে অজ্ঞান করতে হ'বে নাক দিয়ে শুঁকিয়ে, ইঞ্জেকসান দিয়ে অথবা নির্দিষ্ট স্থানটিকে হিমশীতল করে। তিনি কোনো রোগীকে তিন মিনিট অথবা বারো ঘণ্টার জন্য অজ্ঞান করে' রাখতে পারেন। অস্ত্রোপচারের সময় অথবা পরে কি ওষুধ রোগীকে খাওয়াতে হবে তাও তিনি জানেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে বিখ্যাত ইংরাজ রাসায়নিক স্যার হামফ্রে ডেভী, নাইট্রাস অক্সাইড নামে একটি গ্যাস আবিষ্কার করেন। এই গ্যাসটি যদিও "হাসির গ্যাস" নামে পরিচিত তথাপি এর শরীরের অংশ বিশেষ অসাড় করবার ক্ষমতা আছে, এবং স্যার হামফ্রে ডেভীই তা প্রথম প্রমাণ করেন। এই গ্যাসের আঘ্রাণ নিলে মুখমণ্ডলের আকৃতি মানুষের হাসবার সময়ের মতো হয় সেইজন্য এর নাম হাসির গ্যাস অথবা লাফিং গ্যাস। আমরা জনসাধারণ কিন্তু এই গ্যাস অপেক্ষা কাঁদুনে গ্যাসের সঙ্গেই বেশী পরিচিত। যাই হোক নাইট্রাস অক্সাইড আবিষ্কার হওয়ার পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রথম ব্যবহৃত হয়। হোরেস ওয়েলস নামে জনৈক দন্ত চিকিৎসক তাঁর বন্ধুর আক্কেল দাঁত তুলতে প্রথম নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করেন। নাইট্রাস অক্সাইড আজও ব্যবহৃত হয় কারণ

আধুনিক হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের দৃশ্য

এর সুবিধা অনেক। খুব সহজেই এ কোনো অঙ্গকে অবশ করে' দিতে পারে এবং খুব তাড়াতাড়ি অবশ অবস্থা কাটিয়ে ওঠা যায়, কোনোরূপ গন্ধ বা প্রতিক্রিয়া নেই। অসুবিধা হ'ল যে এর দ্বারা দীর্ঘক্ষণ অবশ করা যায় না। নাইট্রাস অক্সাইড দাঁত তোলাতেই বেশী ব্যবহৃত হয়, কারণ দাঁত তুলতে অধিক সময়ের আবশ্যক হয় না। কাচের আধারে তরল অবস্থায় গ্যাসটি বিক্রয় হয়, কিন্তু আধারের মুখ খুলে দিলেই গ্যাস হয়ে নির্গত হয়।

আবিষ্কারের প্রথম যুগে মার্কিণ মুলুকে ভ্রাম্যমান ছোট ছোট সার্কাস পার্টির দল গ্যাসটির সাহায্যে খেলা দেখাতো, যথা কারও হাতে অথবা পায়ে নাইট্রাস অক্সাইড লাগিয়ে দিয়ে তার অজ্ঞাতে তার হাত অথবা পা ছুরি দিয়ে কেটে দিত; আবার "রামগড়ুরের ছানার" মতো যদি কেউ বলত "হাসব না, না" তাকে ঐ গ্যাস শুঁকিয়ে তারা হাসিয়ে ছাড়ত। এই রকম একটি সার্কাস পার্টির খেলা দেখে হোরেস ওয়েলস্ নাইট্রাস অক্সাইডের গুণ জানতে পারেন।

নাইট্রাস অক্সাইডের পর চেতনানাশক হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে থাকে ইথার নামে একটি গ্যাস। ইথার বর্ণহীন তরল, বোতলের বাইরে এলেই বায়বীয় রূপ ধারণ করে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জনৈক মার্কিণ চিকিৎসক উইলিয়ম টি জি মর্টন একটি টিউ[illegible] কাটবার সময় চেতনানাশক হিসাবে ইথার ব্যবহার করেন।

ইথার আগে ইয়োরোপ ও অ্যামেরি[illegible] সৌখিন সমাজে পার্টিতে ব্যবহৃত হ[illegible] উত্তেজক হিসাবে। কোনো সৌখিন ম[illegible] অথবা ভদ্র মহোদয় ছিপি ঈষৎ খুলে ইথা[illegible] ঘ্রাণ নিতেন, তারপর বেশ খানিকটা নিতে[illegible], চনমনে মনে করতেন। চেতনানাশক হিসা[illegible] ইথার আজও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর ব্যবহার অন্যান্য চেতনা নাশক অপেক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইথারকে অনেকে ক্লোরোফর্ম অপেক্ষা নিরাপদ মনে করেন, ক্লোরোফর্ম সাময়িকভাবে হৃদযন্ত্রকে দুর্বল করে রক্তের চাপ কমিয়ে দেয়, পরন্তু ইথার [illegible] যন্ত্রকে উত্তেজিত করে এবং রক্তের চাপ [illegible] করে। ফুসফুসের পক্ষে অবশ্য ইথার কিছু ক্ষতিকারক, কিন্তু সেজন্য বিবশকারী ইথার প্রয়োগ করবার পূর্বে ক্ষেত্র বুঝে অ্যাট্রোপিন ইঞ্জেকসান দিয়ে থাকেন।

ইথারের পর যে চেতনানাশক আবিষ্কৃত হ'ল তা সর্বাপেক্ষা পরিচিত, নাম ক্লোরোফর্ম। ঠিক একশত এক বৎসর আগে ক্লোরোফর্মের চেতনা-নাশক গুণ আবিষ্কৃত হয়, সেই তারিখটি হ'ল ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা

নভেম্বর। গত বৎসর ৪ঠা নভেম্বর স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা সহরে ক্লোরোফর্মের শতবার্ষিকী খুব আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্লোরোফর্ম আবিষ্কার করেন ১৮৩২ সালে স্বনামধন্য জার্মাণ রাসায়নিক লিবিগ, কিন্তু তার চেতনানাশক গুণ আবিষ্কার করেন টমস সিম্পসন, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক। সিম্পসন নিজে ইথার ব্যতীত আর একটি চেতনা নাশকের সন্ধান করছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টা ফলবতী হয়েছিল। ১৮৪৭ এর ৪ঠা নভেম্বর সিম্পসন তাঁর নিজের বাড়ীতে দুজন সহকারী ম্যাথু ডানকান ও জর্জ কিথ্‌কে নিয়ে নানাপ্রকার রসায়ন নিয়ে পরীক্ষা করছেন, কোনো পরীক্ষাতেই কৃতকার্য হচ্ছে না। হঠাৎ একজনের স্মরণ হ'ল তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক একই উদ্দেশ্যে লিবিগ আবিষ্কৃত পারক্লোরাইড অফ ফর্মিল প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু এই রসায়ন চেতনানাশক হিসাবে ঠিক উপযুক্ত হবে না মনে করে পরীক্ষা না করেই পরিত্যাগ করেছেন। অনেক খুঁজে কতকগুলি বাজে কাগজের আবর্জনার মধ্য থেকে রসায়নটিকে খুঁজে আনা হ'ল। তারপর তিনজনে খাবার টেবিলে বসে কাচের পাত্রে খানিকটা করে' পারক্লোরাইড অফ ফর্মিল নিয়ে শুঁকতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনজন তিনজনকে আবছা দেখতে দেখতে এক সময়ে সকলেই অজ্ঞান হয়ে' গেলেন। প্রথম জ্ঞান ফিরে এল সিম্পসনের, তিনি দেখলেন যে ডানকান তাঁর চেয়ারে বসে হাঁ করে' একদৃষ্টে একদিকে চেয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। আর কিথ্? তার অবস্থা চরমে পেঁাছেছে। তিনি টেবিলের নীচে পড়ে চেয়ারে লাথি মারছেন। সিম্পসন অনুভব করলেন ইথার অপেক্ষা শক্তিশালী কোনো চেতনানাশক আবিষ্কৃত হয়েছে।

কয়েক দিন পরেই সিম্পসন নতুন চেতনানাশক প্রয়োগে কয়েকজনকে বিবশ করে বেশ কৃতকার্যতার সঙ্গেই কয়েকটি অস্ত্রোপচার করলেন। চেতনা-নাশকটির নতুন নামকরণ হ'ল ক্লোরোফর্ম। ক্লোরোফর্ম একটি ভালো চেতনানাশক বলে' প্রমাণিত হলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। জন স্নো নামে জনৈক ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সন্তান প্রসবের সময় তাঁর ওপর পর পর দু'বার ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করেন। সেই থেকে ক্লোরোফর্ম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত এতই জনপ্রিয় হয় যে দস্যুরা পর্যন্ত শিকারকে অজ্ঞান করবার জন্য ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করতে সুরু করে।

ইথারের মতো ক্লোরোফর্মও বর্ণহীন, জলের মতো তবে এর একটা বেশ মিষ্টি গন্ধ আছে। নাইট্রাস অক্সাইড ও ইথারের সঙ্গে মিশিয়েও ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা যায়। যেখানে রোগীকে অধিকক্ষণ বিবশ করে' রাখতে হ'বে সেখানে অ্যালকোহল ও ইথারের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। অস্ত্রোপচার ব্যতীত প্রসবের সময়েও ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা হয়। ব্যথা লাঘবের জন্য নানাভাবে ক্লোরোফর্ম ব্যবহৃত হয়। পটাশিয়াম ক্লোরেট যেমন 'কলেরাপটাশ' নামে আমাদের দেশে পরিচিত হয়েছে সেই রকম ক্লোরোফর্মকে অনেকেই 'কলেরাফর্ম' বলে থাকে। ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করা শক্ত, একজন্য বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক আছে।

নিখুঁত চেতনানাশক আজও আবিষ্কৃত হয়নি, অবশ্য এরূপ চেতনানাশক আবিষ্কার করবার জন্য চেষ্টার বিরাম নেই। দক্ষিণ অ্যামেরিকার এক আদিম জাতি তীরের ডগায় কুরেয়ার নামে এক তীব্র বিষ ব্যবহার করে, এই কুরেয়ারের কণামাত্র দ্বারা শরীরের স্থান বিশেষ অসাড় করে দেওয়া যায়। কোকেন দ্বারাও শরীরের স্থান বিবশ করা যায়। চোখ ও গলায় অস্ত্রোপচার করতে অথবা দাঁত তুলতে কোকেন ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আছে নভোকেন, প্যাণ্টোকেন, এভিপ্যান, এবং আরও কত কি। কিন্তু প্রত্যেক চেতনানাশক ওষুধ, তা সে মুখ দিয়ে, নাক দিয়ে, শিরদাঁড়ায় ইঞ্জেকসান রূপে, ফোড়ার ওপর ফোয়ারার মতো ক্ষেপণ করে অথবা আর যে-কোনো উপায়েই প্রয়োগ করা হোক্ না কেন প্রত্যেকের কোনো না কোনো দোষ আছে। কিছুদিন হ'ল অস্ত্রোপচারকগণ সাইক্লোপ্রোপেন নামে একটি নতুন চেতনানাশক নিয়ে খুব মেতে উঠেছেন। অক্সিজেন ও সাইক্লোপ্রোপেন একত্রে মিশিয়ে বিশেষ যন্ত্র থেকে মুখোস দ্বারা রোগীকে প্রয়োগ করে' অজ্ঞান করতে হয়। এই চেতনানাশক দ্বারা রোগীকে অনেকক্ষণ অজ্ঞান করে রাখা যায়, কোনো ক্ষতি হয় না এবং পরে কোনো প্রতিক্রিয়াও হয় না। এই নতুন চেতনানাশক প্রয়োগ করে' অস্ত্রোপচারকগণ খুবই আশান্বিত হয়ে উঠেছেন।

আরও একটি চেতনানাশক চিকিৎসকদের খুবই আশান্বিত করেছে, তার নাম পেণ্টোথাল। প্রসূতিকে এই ওষুধ দিলে সে প্রসব বেদনা অনুভব করে না অথচ সে সজ্ঞানেই থাকে। ভিস্‌নেস্কি নামে একজন বিখ্যাত রুশ অস্ত্রোপচারক "সভকেন" নামে এক অভিনব চেতনানাশক আবিষ্কার করেছেন। সভকেন ইঞ্জেকসান দ্বারা প্রয়োগ করতে হয়। শরীরের যে কোনো স্থান সভকেন দ্বারা অসাড় করে' অস্ত্রোপচার করা যায়। রোগী সজ্ঞানে থাকলেও কিছুই টের পায় না। বেদনানাশ করবার জন্যও সভকেন ব্যবহার করা যায়।

ওষুধ অথবা চেতনানাশক যতই আবিষ্কৃত হোক্ না কেন তাকে প্রয়োগ ও ব্যবহার করবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি চাই। একজন ভাল বিবশকারী, অস্ত্রোপচারকের অর্ধেক কায করে' দেয়। সমস্ত পৃথিবীতেই ভাল বিবশকারীর অভাব। অস্ত্রোপচার ভাল হলে প্রশংসা অস্ত্রোপচারকেরই প্রাপ্য হয়, বিবশকারীর বিষয় কেউ খবরই নেয় না, এই মনস্তাত্ত্বিক কারণের জন্য সম্ভবতঃ সহজে কেউ বিবশকারী হ'তে চায় না।

বক্সা ক্যাম্প • অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমরা একদল ভদ্রলোক তেমনি একদল পুলিশে বেষ্টিত হইয়া হোটেলের দ্বিতলে অফিস-ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। চাকর-বাকর লোকজন মায় হোটেলের কর্তৃপক্ষবাবুরা পর্যন্ত প্রথমটা ঘাবড়াইয়া গেল, কিন্তু মিনিট কয়েকের মধ্যেই সামলাইয়া লইয়া স্বাভাবিক হইল। অতর্কিত আক্রমণের স্বভাবই এই যে, জাঁদরেল জাঁদরেল মনুষ্যদের ইস্তক প্রথমটা কাবু করিয়া ফেলে। সর্ব অবস্থায় প্রস্তুত থাকা, মানে কোন অবস্থাতেই অপ্রতিভ না হওয়া চাট্টিখানি কথা নহে। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর ভালো দখল থাকিলেই তবে যে কোন প্রকার ঘটনার আকস্মিক বা প্রত্যাশিত আবির্ভাবে বেসামাল না হইয়াও থাকা যায়। অতএব, আমাদের এই বিচিত্র বাহিনীর হঠাৎ আগমনে হোটেলের লোকজনেরা যে একটু ঘাবড়াইয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

দারোগাবাবুও হয়তো ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া থাকিবেন। তাই পরিস্থিতির সুযোগ লইতে ছাড়িলেন না।

পুলিশী গলায় প্রশ্ন করিলেন—"এই কয়জনের মত খাবার আপনারা এখনই বন্দোবস্ত করে দিতে পারবেন?"

ম্যানেজার গোছের ভদ্রলোক সংগে সংগেই জবাব দিলেন—"খুব্।"

দারোগাবাবু গলার আওয়াজ পূর্ববৎ রাখিয়াই বলিলেন—"আমরা কিন্তু দেরী করতে পারব না। দার্জিলিং মেইল ধরতে হবে আমাদের।"

ম্যানেজার শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক'জন আপনারা?"

—'নয়জন।'

দারোগাবাবু নিজেকে বাদ দিয়া কেবল আমাদের সংখ্যাটাই জানাইলেন।

আমাদের মধ্যে একজন এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলিলেন—"না, দশজন আমরা।"

দারোগাবাবু সংখ্যা বৃদ্ধির হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া বক্তার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

বক্তা বলিলেন—"আপনি নিজেকে বাদ দিচ্ছেন যে।"

—"না, না, আমাকে দিয়ে কাজ নেই, আমি গাড়িতেই খেয়ে নেবখন।"

ভদ্র হইবার এত বড় সুযোগ আমাদের বন্ধুবর হারাইতে আদৌ রাজী ছিলেন না, তাই দারোগাবাবুর না-কে অগ্রাহ্য করিয়া ম্যানেজারবাবুকে হুকুম দিলেন—"দশজনেরই ব্যবস্থা করতে বলুন। তাড়াতাড়ি করবেন, আমাদের সময় নেই।"

ম্যানেজার শান্ত সুরেই উত্তর দিলেন—"আপনারা হাত মুখ ধুয়ে নিন, সমস্তই রেডি পাবেন।"

একটি চাকরকে কহিলাম—"বাথ রুমটা দেখিয়ে দাও তো।"

"আসুন", বলিয়া লোকটি আহ্বান করিল, আমি তাকে অনুসরণ করিলাম।

বাথরুমের দরজায় দাঁড়াইয়া লোকটিকে কহিলাম—"আমরা কে বুঝতে পেরেছ?"

"স্বদেশীবাবু?"

"হাঁ, ঠিক ধরেছ। দেখ, এই চিঠি ক'খানা ডাক বাক্সে ফেলে দেবে, সাবধান ওরা কেউ যেন দেখতে না পায়।"

—"দিন," বলিয়া লোকটি হাত বাড়াইল।

পকেট হইতে তিনখানা চিঠি বাহির করিয়া লোকটির হাতে দিলাম। চিঠি ক'খানা দরকারী ও গোপনীয় ছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"পারবে তো"

"এখনই যাচ্ছি। মোড়ের উপরই ডাকবাক্স রয়েছে, ফেলে দিয়ে আসছি।"

লোকটা চলিয়া গেল, একজন সিপাই বাথরুমের দরজায় আসিয়া মোতায়েন হইল। এই প্রয়োজনটা বুঝিতে দারোগাবাবু মিনিট কয়েক দেরী করিয়া ফেলিয়াছেন, নইলে আর একটু হইলেই 'কলিশন' অনিবার্য ছিল।

সিপাইর সংগে বন্ধুরাও একে একে বাথরুমের দরজায় আসিয়া গেলেন, অবশ্য একজন সিপাইও তাঁদের পশ্চাদভাগ রক্ষণপূর্বক অগ্রসর হইয়াছিল।

হাত মুখ ধুইয়া বাহির হইবার আগেই বাথরুমের দরজায় বন্ধুদের একজন আমাকে নিম্ন সুরে কি যেন বলিলেন। সিউড়ী ষ্টেশনে সেকেণ্ড ক্লাশ ছাড়া 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' চরমপত্র যিনি দিয়াছিলেন, ইনি তিনিই।

আমার সন্নিকটে ঘেঁষিয়া বলিলেন "একটা ফোন করতে চাই।"

—"ফোন? কাকে?"

—"দাদাকে।"

"—আচ্ছা, চলুন তো, দেখি কি পারি।"

প্রয়োজন বড়ই শিক্ষাপ্রদ বস্তু, লোককে বেশ নরম ও বিনীত করিয়া আনিয়াছে। আমি ভাবিতেছিলাম অন্য কথা, ভদ্রলোক দেখিতেছি আমার কর্মকুশলতায় রীতিমত আস্থা স্থাপন করিয়াই বসিয়াছেন। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব, এমন বিশ্বাসের কারণটা কি হইতে পারে, মনে মনে আওড়াইয়া তার কোন হদিস্ পাইলাম না। যাকগে, বন্ধুবর বিশ্বাস করিয়াছেন যে আমি একটা ব্যবস্থা হয়তো করিতে পারি। মনে মনে ঠিক করিয়া দেখিলাম যে, যে কোন প্রকারেই হউক, ভদ্রলোকের এই প্রয়োজনটুকু উদ্ধার করিয়া দিতে হইবে।

অফিস ঘরে আসিয়া দেখিলাম, দারোগাবাবু চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া সিগারেট টানিতেছেন। ঘটনাস্থল হইতে বাধাটা স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন।

তাই বলিলাম—"যান, হাত মুখ ধুয়ে আসুন। দেরী করবেন না।"

'যাই', বলিয়া দারোগাবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অফিসের দরজায় সিপাই ছিল, ঘরের ভিতরও এক পাশে একটা টুলের উপর সিংহের গম্ভীর মূর্তির মত জমাদার সাহেব অবস্থান করিতেছিলেন।

অতএব নিশ্চিন্ত মনেই তিনি হাত মুখ ধুইবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার আগে টুলের উপর উপবিষ্ট সিংহ মূর্তি জমাদারকে চোখের দৃষ্টির একটা অর্থসূচক খোঁচা দিয়া সতর্ক করিয়া রাখিয়া গেলেন।

জমাদারের দৃষ্টিতে পিঠ দিয়া ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া 'পদমেকং ন গচ্ছামি'-কে কহিলাম—"নম্বরটা লিখে দিন।"

বন্ধুবর এক টুকরা কাগজে ফোন নম্বর ও তাঁহার অগ্রজের নাম লিখিয়া দিলেন।

কাগজের টুকরাটি ম্যানেজারের হাতে দিয়া কহিলাম—"এই নম্বরে একটা রিং করুন তো। যদি না পান, তবে পরে আর একবার করবেন। জানাবেন যে, এই কয় ভদ্রলোক বক্সা বন্দি-নিবাসে বদলী হয়ে যাচ্ছেন।" বলিয়া আমাদের নাম কয়টীও লিখিয়া দিলাম।

ভদ্রলোক অনুরোধ রাখিলেন এবং প্রথমবারের চেষ্টাতেই বন্ধুবরের ভ্রাতাকে ফোনে পাওয়া গেল। বন্ধুবর নিজেই তাঁর দাদার সংগে ফোনে কথা বলিলেন। রিসিভার রাখিয়া

দিয়া তিনি স্বস্থানে ফিরিলেন, এই সময়ে দারোগাবাবু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি অনুমানেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সিপাইদের নিকটও জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু এ লইয়া কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। বোধ হয়, চাপিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া থাকিবেন। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন—'পৃথিবীতে অনেক কিছু দেখিবে, অনেক কিছু শুনিবে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবে না।' দারোগাবাবু বুদ্ধিমানের মত বুদ্ধ-মত অনুসরণ পূর্বক এই ব্যাপারটায় একেবারে মৌনীবাবাই হইয়া গেলেন। ঘুনাক্ষরেও জানিতে দিলেন না যে, তিনি কিছু জানিতে পারিয়াছেন।

খাইতে বসিয়া দারোগাবাবু তাড়াহুড়া করিলেন, আর আমরা বত্রিশ দাঁতে চৌষট্টি কামড় দিয়া তবে এক একটি গ্রামকে উদর পথে নামিয়া যাইতে দিলাম। তবু এক সময়ে আহার শেষ হইল এবং স্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। অদৃষ্টই বলবান প্রমাণ হইল, কারণ আমরা ট্রেন ফেল করিতে পারিলাম না। কাজেই, দার্জিলিং মেইল তার এক কামরার কামরায় আমাদের ভরিয়া লইয়া উত্তরের অভিমুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে রাত্রির অন্ধকারে ছুটিয়া চলিল।

জানালার ধারে বেশ আরাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। ইচ্ছা হইলে তেমনি আরাম করিয়াই নিদ্রা দিতে পারিব, আসনের অর্থাৎ শয্যার তেমনি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু মনে মনে ঠিক করিলাম যে, কিছুতেই ঘুমাইব না, সারা পথটা জানালার ধারেই বসিয়া কাটাইয়া দিব। অন্ততঃ পদ্মা পার না হওয়া পর্যন্ত ঘুমকে যে কোন প্রকারেই হউক ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে। শীতের রাত্রে ... কে দেখিতে কেমন হয়, তাহা দেখিবার সুযোগটা যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন ছাড়া হইবে না। অর্থাৎ একটি লোভকে মনে লইয়া ... য় বসিয়া বাহিরের দিকে চোখ পাতিয়া রহিলাম।

আকাশবেষ্টিত পৃথিবীকে এই অন্ধকারের মধ্যে একেবারে অচেনা ঠেকিল। কি রকম যেন একটা ভয় ভয় ভাব মনে জাগিল। নিজেকে এমন কি এই বৃহৎ পৃথিবীকে পর্যন্ত কত অকিঞ্চিৎকর, কত অসহায় বোধ হইতেছে। আকাশে ঐ তারাগুলি দশ দিক ডোবানো অন্ধকারে কোন মতে ক্ষীণ আলোর নাভিশ্বাস টানিতেছে। অন্ধকারের কালো ঢেউয়ের একটি ঝাপটায় এই ক্ষীণ আলোক বিন্দুগুলি ডুবিয়া মুছিয়া গেলে অবস্থাটা তখন কি দাঁড়াইবে। পৃথিবী তার আহ্নিক আবর্তন-পথে ঠিক মত চলিতে পারিবে কি? না, অন্ধ যেমন সন্তর্পণে পা টিপিয়া হাটে, তেমনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিবে? অথবা, আলোর অভাবে অন্ধ গ্রহ-উপগ্রহগুলি একে অপরের উপর হুমড়ি খাইয়া আসিয়া পড়িবে এবং পরস্পরের সংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অন্ধকারের কালো স্রোতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে? যাকগে, এই অনন্ত আকাশে আমাদের পৃথিবী যে কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর, আছে বসিয়াও বোধ হয় না, দিনের আলোকে ইহা মনের নজরে ধরা পড়ে না। অন্ধকার হইলেই পৃথিবীর অসহায় অবস্থাটা ধরা পড়িয়া যায়।

অন্ধকারে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে, নভেম্বর শেষ হইয়া আসিয়াছে, খোলা জানালার পথে বাইরের বাতাস আসিয়া শরীরে বেশ শীত ধরাইয়া দিল। র‍্যাগটা আরও ভালো করিয়া জড়াইয়া লইলাম।

রাত্রি মধ্য প্রহর পার হইয়া গিয়াছে, তারারা আকাশে জায়গা বদল করিয়াছে—মহাশূন্যে নিঃশব্দে কি বিরাট কাজ, ঘটিয়া চলিয়াছে। কোটি কোটি সৌরজগৎ লইয়া কত নিঃশব্দে ও কত অনায়াসে কী এক ভীষণ শক্তির খেলা চলিয়াছে! যে প্রচণ্ড শক্তি এদের চালাইয়া নেয়, উন্মার্গগামী হইতে দেয় না, কেবল ক্বচিৎ কদাচিৎ দুই একটা আলোকপিণ্ড কক্ষ ছাড়িয়া শূন্যের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং একটা ক্ষনিক আলোর আর্ত চীৎকার তুলিয়া অপঘাতে শেষ হয়—সে অদৃশ্য শক্তির কেন্দ্র কোথায়? কোন আশ্রয়ে থাকিয়া এই অযুত নিযুত লক্ষ কোটি গ্রহ উপগ্রহকে শূন্যে সে চড়াইয়া বেড়াইতেছে?.........

বুদ্ধি দিয়া ইহাকে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা বৃথা, মাথাটাই ঝিমঝিম্ করিয়া উঠে। কল্পনার পাখা ক্লান্ত হইয়া আসে, মনের নিশ্চিন্ত নীড়ে বিশ্রামের জন্য তাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। ডানা গুটাইয়া তখন ক্লান্ত বিহঙ্গম ঝিম মারিয়া পড়িয়া থাকে। শক্তির সীমাহীন দিগ্বলয় ডানার জোরেই পার হইয়া যাইবে, কী অদ্ভুত ও অসম্ভব লোভ ক্ষুদ্র এই জীবন-পাখির। একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া গাড়ির ভিতরের দিকটায় দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিলাম।

সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মায় সিপাইরা পর্যন্ত। দারোগাবাবু দুজন পা টান করিয়া পরিপূর্ণ লম্বা হইবার মত জায়গা পাইয়াছেন। অর্থাৎ উভয়েই এখন প্রথম প্রহরের ঢেঁকি-অবতার। বুকের ওঠা-পড়ার ছন্দ দেখিয়া অনুমান করিলাম যে, সুখেই নিদ্রা যাইতেছেন। বন্দিদের সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন, সে দুর্ভাবনা ও দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলিয়া আছেন। নিদ্রাকে মৃত্যুর সামিলই বলা চলে। জীবনে এই প্রাত্যহিক মৃত্যুর একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রকৃতি মানুষের রীতিমত উপকার সাধন করিয়াছেন, নইলে জীবনের জ্বালা ও তাপে কত মানুষ পাগল হইত, এমন কি আত্মহত্যা করিত, ইহাতে আমার মনে কোন সন্দেহই নাই। এই দৈনন্দিন মৃত্যুর ব্যবস্থার দরুণই জীবনটা মানুষের পক্ষে কথঞ্চিৎ সহনীয় হইয়াছে। নইলে এক টানা বাঁচার মত শক্তি কম মানুষেরই থাকিত। অর্থাৎ সুসুপ্তি মানে মৃত্যুর মধ্যে প্রত্যহ ডুব দিয়া আমরা জীবনের জ্বালা, তাপ ও গ্লানিই শুধু দূর করিতেছি না, প্রাণের ক্ষয় ও পূরণ করিয়া লইয়া আসিয়া থাকি।

একটা জিনিস সেদিন বড় প্রত্যক্ষ হইয়া আমার নজরে পড়িল। ঘুমাইলে মানুষের মুখ যে এত কুশ্রী ও বীভৎস দেখায়, ইহা জানিলে নিশ্চয় কেহ এভাবে প্রকাশ্যে ঘুমাইতে সাহস পাইত না। আমার ডেটিনিউ বন্ধুদের মুখ পর্যন্ত মানুষের শ্রী হারাইয়া বিকট দর্শন হইয়াছে। ব্যাপারটা কি? নিদ্রায় তো এই রকম হইবার কথা নহে। নিদ্রা হইতে প্রাণী মাত্রেই স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, কিন্তু মুখের ভাব দেখিয়া তো বরং মনে হয় যে, ইঁহারা নিদ্রার মধ্যে ভয়ংকর কিছুর সঙ্গে সংগ্রামে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। আবার মনে মনে প্রশ্ন আবৃত্তি করিলাম—"ব্যাপারটা কিরে মশায়?"

ব্যাপারটা যে কি, তাহা আমিও জানি না। ঘুমাইতেই জানি, কিন্তু ঘুমের মধ্যে কি হয়, তার খোঁজ খবরই যদি রাখিব, তবে আর ঘুমানো হয় কৈ! অনুমান অবশ্য যে, একটা কিছু না করিতে পারি, এমন নহে।

একটা চলতি কথা আছে যে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ইহারাও নিদ্রার স্বর্গে গিয়াও তেমনি ধান ভানিতেছে। সারাদিনমান জীবনের ক্ষেত্রে চড়িয়া বেড়াইয়া সুখ দুঃখ গো-গ্রাসে যথেচ্ছ গিলিয়াছে, ঘুমের মধ্যে এখন তারই জাবরকাটা চলিতেছে। অর্থাৎ ঘুমাইয়াও রেহাই পায় নাই। যে যেমন স্বভাবের, সে তেমন ঘুম ঘুমাইতেছে। দিনের বেলাতে চেতনা ও জ্ঞান সজাগ থাকে, কিন্তু ঘুমের মধ্যে তা থাকে না, কাজেই স্বভাবের উপর হইতে আবরণটা খসিয়া গিয়া একেবারে স্বরূপটিই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। সেই স্বরূপেরই কিছুটা ছটা ঘুমন্ত মুখেও ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাই এমন বিকটশ্রী ও বীভৎস ইঁহাদের দেখাইতেছে।

আমার অনুমান যদি সঠিক হয়, অর্থাৎ আন্দাজের ঢিলটি যদি ঠিক মত জায়গায় গিয়া পড়িয়া থাকে, তবে অধুনা এই সিদ্ধান্তে নিদ্রার ক্ষেত্রেও অধিকারী অনধিকারী নিয়মটি বলবৎ রহিয়াছে। সুতরাং কৌশলটি যে জানে, রহিয়াছে। সুতরাং কৌশলটি যে জানে, সেই কেবল কুশলে নিদ্রা যাইতে পারে। বাদবাকী আমাদিগকে ঘুমের মধ্যেও দিবসের সুখ দুঃখের রোমন্থন করিয়া মরিতে হয়, অথবা সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

টাওয়ার হোটেলে যিনি জমাদাররূপে টুলের উপর সিংহের গম্ভীর মূর্তির মত অধ্যাসীন ছিলেন, অধুনা তাঁহার ঘুমন্ত মুখখানির মধ্যে সিংহের কোন চিহ্নই নাই। মুখটা হাঁ করিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেছেন, শ্বাসত্যাগের শব্দ পাইতেছি না, কিন্তু শ্বাস যখন দুই নাসাপথে পাম্প করিয়া ভিতরে লইতেছেন, তখন রীতিমত বিকট আওয়াজই সৃষ্ট হইতেছে। ট্রেণের শব্দের মধ্যেও জমাদারের নাসিকা গর্জন চাপা পড়ে নাই। সিংহটি এখন একটি আস্ত ভঁইষকা মাফিক নিদ্ যাতা হ্যায়। সুতরাং অঙ্কের হিসাবে পাওয়া গেল যে, আমাদের সঙ্গী জমাদারটি ভিতরে ভিতরে আসলে একটি মহিষ বিশেষ।

বন্ধুদের একখানি ঘুমন্ত মুখ লওয়া যাক। সেই "পাদমেকং ন গচ্ছামি'র মুখখানা দেখিয়া আমার মনে হইল যে, ঘুমের মধ্যেও ইনি শিকার সন্ধান করিতেছেন। ছেলেরা যেমন ফড়িং ধরি ধরি করিয়াও শেষটা কিছুতেই ফড়িংটাকে ধরিতে পারে না, মোক্ষম সময়েই ফুড়ুৎ করিয়া ফড়িং উড়িয়া যায়, তেমনি ব্যবহার বোধ হয় এঁর শিকারটি ইঁহার সঙ্গে করিতেছে। এঁর মুখের মধ্যে তেমনি একটি অতৃপ্তি ও জ্বালা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধুবর ঘুমের মধ্যেও কি শিকারে রত আছেন, তাহা অবশ্য অনুমানে বলা সম্ভব নহে। তাহা না জানিলেও তাঁর মুখে যে শিকারীর ধূর্ততা, লোভ ও হিংস্রতার ছাপ পড়িয়াছে, এটুকু আপনারাও দেখিলেই স্বীকার পাইতেন। মোট কথা, ঘুমন্ত "পাদমেকং ন গচ্ছামি" আমার নিকট একটি ধূর্ত খেঁকশিয়ালীর মূর্তিতেই প্রতিভাত হইলেন; গৃহস্থ বাড়ির হাঁস-মুরগী ইত্যাদির সন্ধানে আনাচে কানাচে নিশ্চয় ইনি এখন ঘুমের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে করিয়া ফিরিতেছেন, ক্যাক্ করিয়া কোন অসতর্ক শিকার ধরিয়া ফেলিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু দেখিলাম একটু পাশ ফিরিয়া দুইটি হাতকে পাশ বালিশের মত হাঁটুর মধ্যে চালান করিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

আমার চোখেও ঘুম নামিল। ঘুমের মধ্যেই পদ্মা পার হইয়া আসিলাম এবং ঘুমের মধ্যেই শেষ রাত্রে পার্বতীপুরে গাড়ী বদল করিলাম।

এই শীতে আরামের ঘুম হইতে জাগিতে হইল বলিয়া সন্তোষ গাঙ্গুলী ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন। ভদ্রলোক এম-এস-সি পরীক্ষা দিবার আগটিতে ধরা পড়েন, অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তি। আমার পাশে পাশেই চলিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন—"শালা!"

চমকাইয়া উঠিলাম, এ জাতীয় গালিগালাজ তাঁর মুখে শুনিবার প্রত্যাশা করি নাই। বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হোল?"

যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল, বলিয়া উঠিলেন—"কেন, স্বদেশী করেছি বলে কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি? ঘুমোতে পারব না, এমন তো কোন কথা ছিল না। ব্যাটা অমুককে (দলের বিখ্যাত নেতার নাম করিয়া) পে... একবার ভালো করেই জেনে নিতাম, এ কে... দেশী স্বদেশী? ঘুমোতে পারব না, এক... ব্যাটা আগে বলেনি কেন? জানলে কে... শালা আসত।"

আমাদের হাসির শব্দে শীতের শেষ রাত্রিটাও চমকাইয়া উঠিল। দারোগা দুজনও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। সেই বয়সে ছোট পদে বড় দারোগাবাবু জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলিলেন—"কি বলছেন?"

সন্তোষবাবু বলিলেন—ও আপনারা বুঝবেন না। এমন স্বদেশীতে আমার কাজ নেই, ওর খুরে পেন্নাম" বলিয়া আলোয়ানের নীচেই হাত দুটা যুক্ত করিয়া প্রণামের মুদ্রাটি সম্পন্ন করিলেন।

গাড়ী বদল করিয়া আর এক গাড়ীতে উঠিলাম এবং উঠিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম। দেখিয়া মনে হইতে পারিত যে, কোন হাঙ্গামাই হয় নাই, আমরা শুধু পাশ ফিরিয়া শুইয়াছি যেন।

ভোরে যখন জাগিলাম, তখন জানালার পথে চাহিয়াই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম... দূরে উত্তরে সারি সারি শিখর-শ্রেণী লই... হিমালয় আকাশের গায়ে গা লাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। (ক্রমশঃ)

ফসল

নির্মাল্য বসু

বন্যায় ডুবে গেল মাঠ ঘাট,
ফসল তলায়ে গেল জোয়ারে—
ভেঙে গেল অতীতের ভরা হাট—
সঞ্চয় গেল সব খোয়া রে!

ছোট্ট সীমার মাঝে ছোট ঘর
ছোট আশা নিরাশায় রচিত—
আতুর দিনের ভারে মন্থর
জীবনের চলিষ্ণু গতি তো!

ওপারে কখন বাঁধ ভাঙিল
ভাঁটার স্রোত যে বহে উজানীঃ
জীবনের পূর্বাশা রাঙিল
কখন যে অলক্ষ্যে না জানি।

ব্যর্থ আশার অঞ্জলিতে
যাহা ছিল সব গেছে খোয়া রে!
ভরে ওঠে প্রান্তর পলিতে
নব জীবনের নও-জোয়ারে!!

করুণ আঁখির বারি বিন্দু
নতুন দিনের রোদে তৃপ্তঃ
ঊষর মরুর বুকে সিন্ধু
আজকে বাঁধন-ভাঙা দৃপ্ত।

নতুন পলিতে আজ তাই ভাই
প্রাণের ফসল চাই ফলাতে—
যেটুকু অর্ঘ্য পারি রেখে যাই
মহা জীবনের পূজা-ডালাতে॥

অনুবাদ সাহিত্য

যৌবন-সুরা

·ন্যাথানিয়েল হথর্ন

চিকিৎসক হিসাবে এককালে ডাঃ হাইডেজার বেশ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতিটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের। মাথারও একটু দোষ ছিল বলে শোনা যায়। এজন্য তাঁর সম্পর্কে বহু অলৌকিক গল্প প্রচলিত ছিল। ঐসব গল্পের কতখানি সত্য, তা বলতে পারি না, তবে লোকে সাধারণত তা বিশ্বাস করত।

একদিন ঐ বৃদ্ধ ডাক্তার তাঁর চার বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করলেন স্টাডিতে আসবার জন্যে। বন্ধুদের চারজনের তিনজন পুরুষ আর একজন এক বিধবা মহিলা। ওঁর নাম হচ্ছে উইসারলি আর বন্ধুদের নাম হচ্ছে মিঃ মেডবোর্ন, কর্নেল কিলিগ্রু এবং মিঃ গ্যাসকয়নি। জীবনে তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তাই দুঃখভারাক্রান্ত জীবন বহন করে চলেছেন কোনক্রমে। মৃত্যুকে আহ্বান করেও তাঁরা তার শীতল হস্তের স্পর্শ পান নি; দুর্ভাগ্যের বোঝা তাই বেড়েই চলেছে তাঁদের।

যৌবনে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন মিঃ মেডবোর্ন। কিন্তু ফাটকাবাজী করতে গিয়ে সব হারিয়ে আজ তিনি ভিখিরী। কর্নেল কিলিগ্রু ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। অখেয়ালে তাঁর স্বাস্থ্য, শক্তি এবং অর্থ বিনষ্ট হয়েছে। এখন বাতব্যাধি তাঁর চিরসঙ্গী। ব্যথা-বেদনাকে নিয়েই তাঁর দিন কাটাতে হয়। মিঃ গ্যাসকয়নি রাজনীতি করতে গিয়ে প্রচুর দুর্নাম কিনেছেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁর কথা সবাই ভুলে গেছে, তাই গালাগালির হাত থেকে তিনি রেহাই পেয়েছেন।

মিসেস উইসারলি যৌবনে যে প্রচুর সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন, তা তাঁকে দেখলে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এই সৌন্দর্যই ছিল তাঁর শত্রু। তাঁর নামে শহরে বদনাম রটায় তাঁকে বহুদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। উপরিউক্ত তিন ভদ্রলোকই এককালে উইসারলির প্রেম-ভিখারী ছিলেন, এজন্য তাঁদের নিজেদের মধ্যে মারামারিও কম হয় নি।

বন্ধুরা স্টাডিতে উপস্থিত হলে তাঁদের বসবার অনুরোধ করে ডাঃ হাইডেজার বলতে লাগলেন, "প্রিয় বন্ধুগণ, আমি একটা ঔষধ বের করেছি। তা দিয়ে পরীক্ষা কার্য চালাবার জন্যে আমি তোমাদের সাহায্য চাচ্ছি।"

বন্ধুরা চেয়ারে বসে একবার তাকালেন সেই ঘরটার চারধারে। কেমন যেন একটা রহস্য দিয়ে ঘেরা ঘরটি। প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ওর ভিতরটা, এখানে ওখানে অজস্র মাকড়সার জাল। ধুলোও জমেছে অনেক। দেয়ালে কতকগুলি বুককেস। নানা আকৃতির পুঁথি আর বড় বড় ফাইল দিয়ে ঠাসা। মাঝের বুককেসটায় হিপোক্রেটিসের একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি ছিল। শোনা যায়, বিপদের সময় ডাঃ হাইডেজার নাকি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ঘরের এককোণে একটা লম্বা আলমারী ছিল। আলমারীর খোলা দরজা দিয়ে একটা নরকঙ্কালের ছায়া দেখা যাচ্ছিল। দুটো বুককেসের মাঝখানে ধুলোমাখান একটা আয়না ঝুলেছিল। শোনা যায়, ডাক্তারের সমস্ত মৃত রোগীদের মুখ নাকি ঐ আয়নায় আঁকা আছে। মাঝে মাঝেই নাকি ওরা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরের অপর ধারে একটি তরুণীর ছবি আটকান; ধুলিতে ছবিটা অত্যন্ত ম্লান দেখাচ্ছিল। শোনা যায়, এই তরুণীর সঙ্গেই ডাক্তারের বিয়ে হবার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণে মেয়েটি বিয়ের দিন সন্ধ্যায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

ঘরের সবচেয়ে যা অদ্ভুত তার কথা এখনও বলা হয়নি। সেটা হচ্ছে একটা বিরাট বই। বেশ ভাল চামড়া দিয়ে বাঁধান। কিন্তু বইটার যে কি নাম কেউ জানে না। তবে এটা যে একটা ম্যাজিকের বই তা অনেকে জানত। একদিন হয়েছে কি বাড়ীর ঝি বইটা পরিষ্কার করবার জন্য যেই না তুলেছে অমনি নরকঙ্কালটা মরমর করে উঠেছে, ছবির তরুণী এক পা এগিয়ে এসেছে এবং আয়নার ভিতর দিয়ে অনেকগুলো কুৎসিত মুখ উঁকি মারতে শুরু করেছে, আর ওদিকে হিপোক্রেটিস ভ্রূ কুঁচকে বলে উঠেছে, "থামো!"

এই হচ্ছে ডাঃ হাইডেজারের স্টাডি।

সেদিন এই স্টাডিরই একটা কালো গোল টেবিলের চারপাশে বসেছিল ডাক্তার আর তাঁর চার বন্ধু।

অপরাহ্ন বেলা। জানালার ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে ঘরে।

"তোমরা যদি সাহায্য কর," ডাক্তার বলতে লাগলেন, "তবে আমার একটা অদ্ভুত এক্সপেরিমেণ্ট আমি করতে পারি।" বলেই জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে সেই মোটা কালো বইটা নিয়ে এলেন। তারপর বইটা খুলে ওর ভিতর থেকে বের করলেন অতি জীর্ণ একটি গোলাপ ফুল। ফুল আর ওকে বলা চলে না। ওর পাতা আর পাপড়ি এমন ভাবে শুকিয়ে গেছে যে তা এক্ষুণি গুঁড়ো হয়ে পড়ে যাবে।

"এই গোলাপটি," দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বলতে লাগলেন, "শুকিয়ে যাওয়া এই ফুলটি ফুটেছিল ৫৫ বছর আগে। ঐ যে দেখছ মেয়েটির ছবি, ওই দিয়েছিল আমায় ফুলটি। কথা ছিল বিয়ের দিন ওটা আমি ব্যবহার করব আমার জামায়। সেদিন থেকে আজ অবধি ও রয়েছে এই বইয়ের পাতায় আবদ্ধ। কিন্তু এই ফুলটিকে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী পরে আবার নতুন করে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে তা কি তোমরা বিশ্বেস কর?

'নন্‌সেন্স'! মহিলাটি বললেন, বৃদ্ধার কুঁচকে যাওয়া চামড়া বুঝি তরুণীর মত সতেজ হয়ে উঠতে পারে, না?

"পারে কি না নিজেরাই দেখো!" ডাক্তার জবাব দিলেন।

ওঁরা যেখানে বসেছিলেন তারই অদূরে একটা জলপূর্ণ পাত্র ছিল। ডাক্তার ঐ ফুলটাকে জলের মধ্যে ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। ধীরে ধীরে গোলাপের মধ্যে যেন প্রাণের সঞ্চার হতে লাগল। ওর সেই গোলাপী রঙ ফিরে এল, কচি ডাল ও পাতা সবুজ হয়ে উঠল। সদ্যোস্ফুট গোলাপের মত সতেজ আর সুন্দর হয়ে উঠল গোলাপটি।

"ম্যাজিকটা কিন্তু মন্দ নয়," ডাক্তারের বন্ধুরা মন্তব্য করলেন। "কি করে করলে বল না।"

"যৌবনের ঝরণার কথা শুনেছ তোমরা? ওই যার খোঁজে দুতিন শতাব্দী পূর্বে একজন স্প্যানিস বের হয়েছিল।" ডাক্তার বললেন।

"ও কি সেটা খুঁজে পেয়েছিল," ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন মহিলাটি।

"না, পায়নি। কারণ, সে উপযুক্ত স্থানে খোঁজ করেনি। আমার বিশ্বাস আমি তা খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়েছি। ওই ঝরণারই কিছুটা জল রয়েছে ঐ পাত্রে।

"তাই নাকি।" অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে কর্নেল কিলিগ্রু বললেন। "মানুষের ওপর প্রয়োগ করলে কি ফল হবে বলতে পার?"

"নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখ" ডাক্তার জবাব দিলেন, "নিজেদের যৌবন ফিরে পেতে যতখানি জলের প্রয়োজন, তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পার। আমি অবশ্য ও আর ব্যবহার করছি না। কারণ, এ বৃদ্ধ হতে আমাকে বহু হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে, সুতরাং আর আমি যুবক হতে চাই না। তবে মানুষের দেহে এর ফলাফল আমি এখানে বসে দেখতে চাই।" বলতে বলতে ডাক্তার চারটে গ্লাস পূর্ণ করে ফেললেন। সোডা ওয়াটারের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌ উঠছিল গ্লাশের ওপর, চমৎকার

একটা গন্ধ বেরুচ্ছিল। বন্ধুরা ওটা পান করবার জন্যে উতলা হয়ে উঠলেন, কিন্তু ডাক্তার তাঁদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, "বন্ধুগণ, এই পানীয় গ্রহণ করার পূর্বে একটা কথা আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সে হচ্ছে, যৌবনের দুর্গম পথ দ্বিতীয়বার অতিক্রম করার জন্য তোমাদের কয়েকটি সাধারণ নিয়মকানুন রচনা করা উচিত। কারণ, তোমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তোমরা যদি নতুন জীবনে সবার আদর্শস্থানীয় হতে না পার, তবে তা যেমন দুঃখের তেমনি অন্যায় হবে।"

বন্ধুরা একটু স্মিত হাস্য করলেন, কিন্তু কেউ কিছু বললেন না।

"নাও এবার তোমরা যৌবনের সুরা পান কর।"

কম্পিত হস্তে ও'রা গ্লাশ নিয়ে নিঃশেষ করে ফেলল পানীয়।

ক্ষণপরেই ও'দের দেহে একটা উল্লেখযোগ্য *পরিবর্তন দেখা গেল। মদের নেশার মত একটা নেশাও তাঁদের মনে শিহরণ জাগালো। শবের মত বিশীর্ণ গালে রক্তিমাভা ফুটে উঠল। তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকাল। ত'াদের মনে হচ্ছিল যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাদের শরীর* থেকে কালোর লেখা মুছে ফেলছিল। মহিলাটি তাঁর টুপিটা ঠিক করে পরলেন।

"আরও দেও, আরও দেও আমাদের ঐ যৌবন সুরা।" বলে সবাই চীৎকার করে উঠল।

"সবুর কর ভাই," ডাক্তার বললেন, "বুড়ো হতে তোমাদের অনেকদিন লেগেছে, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই তোমরা যৌবন ফিরে পাবে। সুতরাং অস্থির হয়ো না।" বলে তিনি ও'দের গ্লাশগুলো ভরে দিলেন। মুহূর্তে খালি করে ফেলল ও'রা গ্লাশগুলি। দৃষ্টি ত'াদের হল স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল।

"আঃ কি চমৎকারই না তোমাকে দেখাচ্ছে উইসারলি," কর্নেল কিলিগ্রু বললেন।

কর্নেল কিলিগ্রুর যে অতিশয়োক্তি করার অভ্যাস আছে উইসারলি তা জানতেন, তাই ও'র কথায় কর্ণপাত না করে সত্যি ও'র কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না, তা দেখবার জন্যে ছুটে গেলেন আয়নার দিকে। ওদিকে অন্য তিনজনের প্রাণেও বইল স্ফূর্তির বান। মদের নেশায় যেমন হয় অনেকটা তাই। মিঃ গ্যাসকয়নির মস্তিষ্কে তোলপাড় করতে লাগল রাজনীতির জটিল সমস্যাগুলি। তিনি অনবরত আউড়ে যেতে লাগলেন স্বদেশপ্রেম, জাতীয় কীর্তি আর মানুষের অধিকার সম্পর্কিত প্রবচনগুলি; আবার কখনও থেমে ফিস্‌ফিস্ করে কি সব বলতে লাগলেন; মাঝে মাঝে আবার বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলে যাচ্ছিলেন অনেক কিছু। কর্নেল কিলিগ্রু ওর মধ্যে নেই, তিনি বোতলের ঠুং-ঠাং শব্দ করতে করতে গান করতে লাগলেন, প্রেমের গান, কিন্তু দৃষ্টি তার নিবদ্ধ ছিল উইসারলির প্রতি। মিঃ মেডবোর্ন ব্যবসায়ের দুরূহ সমস্যা নিয়ে ছিলেন ব্যস্ত। কি করে আমদানী রপ্তানি করে আরও দু'পয়সা আয় করা যায়, তারই হিসাব করছিলেন তিনি।

মিসেস উইসারলি একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আয়নার দিকে। আঁখিতে ত'ার সপ্রেম দৃষ্টি। নতুন জীবনের রস-মদিরা ত'াকে পাগল করে তুলছিল। তাই এক সময়ে সে ছুটে এল টেবিলের কাছে, সানুনয়ে ডাক্তারের কাছে চাইল আর এক গ্লাশ যৌবন-সুরা।

"এই যে নাও।" মৃদু হেসে ডাক্তার তুলে দিলেন তাঁর হাতে আর একটি গ্লাশ।

সূর্য তখন অস্তাচলগামী। ঘরের আলো তাই কমে গিয়েছিল অনেক, কিন্তু তারই মাঝে জ্বলজ্বল করছিল পাত্রভরা সেই যৌবন-সুরা। উজ্জ্বল আর উন্মাদনাময়।......

যৌবন তার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে জেগে উঠেছিল ডাক্তারের বন্ধুদের দেহে। বন্যার জলের স্রোত লেগেছিল ত'াদের প্রাণে। মনে মনে অপূর্ব শিহরণ। নতুন জাগা প্রাণী যেন তাঁরা এ পৃথিবীর।

"আমরা তরুণ, আমরা যুবক!" অসহ্য আনন্দে ত'ারা চীৎকার করে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তরুণ মনের অদ্ভুত সব খেয়ালের প্রকাশ। পরিহাস করতে লাগলেন তাঁরা প্রৌঢ়ত্বের অকর্মণ্যতাকে, উপহাস করতে লাগলেন জড়ত্বকে। নিজেদের সেই অতি পুরাতন কালের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে ভয়ানক হাসি পেল তাঁদের। বেতো ঠাকুর্দার মত ভংগী করে একজন হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। আর একজন নাকের ডগায় চশমাটা টেনে দিয়ে সেই মোটা বইটা নিয়ে বসলেন পড়তে, অপর বন্ধুটি ভারিক্কি চালে আরাম কেদারায় রইলেন বসে। তারপর এক সময় সবাই মিলে হৈ হৈ করে ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। উইসারলি নবোদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণীর মত কি একটা দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে গেলেন ডাক্তারের দিকে।

"এসো ডাক্তার, আমার সংগে নাচবে এসো," বললেন তিনি খুশীতে ডগমগ হয়ে। বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণীর নৃত্য, ভাবতেই সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

"আমাকে ক্ষমা করতে হবে," শান্তভাবে ডাক্তার জবাব দিলেন, "আমি একে বৃদ্ধ, তায় বেতো রুগী। নৃত্য করবার মত অবস্থা আর আমার নেই। কিন্তু ও'দের যে-কেউ তোমার মত সুন্দরীর পার্টনার হবে সানন্দে। ওদেরই সঙ্গে নৃত্য কর গিয়ে।"

"আমার সঙ্গে নাচবে এসো ক্লারা," কর্নেল কিলিগ্রু চেঁচিয়ে বললেন।

"না, না, আমি ও'র পার্টনার হব; মিঃ গ্যাসকয়নি বাধা দিয়ে বললেন।

"পঞ্চাশ বছর আগে ও আমায় বিয়ে করবে বলেছিল," মিঃ মেডবোর্ন জবাব দিল।

ও'রা সবাই উইসারলিকে ঘিরে দাঁড়ালে একজন ও'র হাতদুটো ধরলেন, অন্যজন কোমর ধরলেন জড়িয়ে, অপর জন ও'র কেশদামে আঙ্গুল দিলেন চালিয়ে। ... উচ্ছল ভঙ্গিমায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ... করলেন ও'দের বাঁধন থেকে, কিন্তু ওই পর্য... এই মৃদু বন্ধনই যে তিনি আকাং... করেছিলেন অনেকদিন থেকে। তাই সমস্ত ... দিয়ে অনুভব করতে লাগলেন ও'দের ... কিন্তু প্রত্যেকটি পুরুষ চাইছিল একা ... ভোগ করতে ও'কে—চাইছিল নিজের ... নিয়ে আসতে। তাই ও'দের মধ্যে বাধল বিবা... আরম্ভ হয়ে গেল মারামারি। টেবিল ... উল্টে গেল, যৌবন-সুরা ভরা পাত্র মাটিতে ... টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আদিম দিনের ... ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের জলে যৌবন সুরায় ভেসে ... ঘর। কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছিল এ... বুড়ো প্রজাপতি মাটিতে। যৌবন সুরার স্প... তার রূপ গেল বদলে। নতুন দিনে আন... হিল্লোলে সে উড়ে বেড়াল ঘরময়, তারপর ব... গিয়ে ডাক্তারের তুষারশুভ্র মস্তকোপরি।

"একি, একি!" বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল... ডাক্তার, "শীঘ্র বন্ধ কর তোমাদের মারামারি..."

তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন। মনে হল দৈব... বাণী যেন ত'ারা শুনতে পেলেন। শঙ্কি... দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁরা ডাক্তারের দিকে। গোলাপ ফুলটি হাতে নিয়ে ডাক্তার বসেছিল... আরাম কেদারায়। ও'রা থামলে বসতে ইঙ্গি... করলেন তিনি।

"আমার প্রেমিকার দেওয়া গোলাপটি আব... যাচ্ছে শুকিয়ে," সখেদে বললেন ডাক্তার।

সত্যি ধীরে ধীরে গোলাপের সমস্ত মাধু... গেল উবে। শুকনো ঝরঝরে হয়ে গেল ফুলটি। সপ্রেমে ফুলটা চুম্বন করে বললেন ডাক্তা... "শুকিয়ে যাক ও, তবু আমি তাকে ভালবাসি।" ও'র কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতিটা পড়ে গেল মাটিতে।

বন্ধুরা আবার শিউরে উঠলেন। এক... শৈত্য-প্রবাহ যেন কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল ত'াদের সারা দেহ। পরস্পরের দিকে তাকালেন ও'রা। বুঝতে পারলেন যে, প্রতিটি মুহূর্তে তাঁদের দেহে হচ্ছে পরিবর্তন। এ কি তবে ভ্রম? জীবনের দিনগুলি কি এতই সংক্ষিপ্ত ?

"আঃ! এত তাড়াতাড়ি আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম? একান্ত দুঃখে বললেন তাঁরা।

সত্যি, যৌবন তাঁদের গেছে ফুরিয়ে। সুরা পান করে ত'ারা উন্মাদ হয়ে গিয়ে... স্থান-কাল-পাত্র গিয়েছিল ভুলে, ত বে ... ক্ষণস্থায়ী, বড় ভংগুর! তাই তো জরা এ... আবার বিস্তার করল তার প্রভাব। ক্ষণিকের খেলা গেল ফুরিয়ে।......

অনুবাদক—শ্রীনিরুপম ...

তালগাছ

সুশীল রায়

কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবে গেছে। নির্জন প্রান্তরের পরপারে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। আকাশ কালো হয়নি তখনো, সোনালী ম'রে গিয়ে তার রং সবে ধূসর হয়েছে। দিগন্তে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে বন। এই বন ভেদ ক'রে ঝাঁকড়া চুল ঊর্ধ্ব মাথা খাড়া ক'রে যারা দাঁড়িয়ে থাকে, ওরা কারা? এই অস্পষ্ট রং-হীন সন্ধ্যাকে ওরা যেন শতবর্ণে উজ্জ্বল করে তোলে। জনহীন মাঠের মাঝখানে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরেও এদের দু'এক জনকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। অনুর্বর আর বন্ধ্যা ক্ষেত এদের ছোঁয়া পেয়ে সৌন্দর্যে যেন ঝলমল ক'রে ওঠে।

বাইরের চটক আদপেই নেই এদের। আপাদমস্তক এরা উলংগ আর বে-আব্রু। মাথায় পাতাবাহারের সিঁথি নেই, গায়ে ডালপালার সাজ নেই। পৃথিবীর ওপর ভর দিয়ে ওরা কি-যেন জানতে চায়, কি-যেন বুঝতে চায়। প্রতিবেশী গাছেরা যা চোখে দেখতে পায় না, চোখে দেখতে চায়ও না, তা-ই জানবার ও বুঝবার জন্যে ওর উদ্দাম আগ্রহ। তা-ই সব গাছকে ডিঙিয়ে আকাশের মধ্যে মাথা গজিয়ে আকাশের রহস্যটা ও জেনে নিতে চায় ব'লে আমার ধারণা। জানার ও দেখার এই প্রবল উৎসাহই তার এই আপাত-দুর্দশার কারণ। আশেপাশের গাছেরা কেমন সতেজ ও সবুজ, তাদের সাজ আছে, পোষাক আছে। সারা গায়ে তারা পাতার বাতাস দেয়, ডালপালা দিয়ে দুয়ার তৈরি করে নেয় তারা। এক কথায়, শরীরকে আরাম দেবার জন্যে আয়োজন তাদের আছে। কিন্তু তালগাছ এসব বৈষয়িক বুদ্ধি থেকে একেবারেই মুক্ত। এ-সব সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার এই-যে সুদীর্ঘ একটা গা, এই গায়ে বাতাস দেওয়ার জন্যে সে ছোটখাট দু'একটা পাতার ব্যবস্থা করেনি। টানা রোদে যাতে গা পুড়ে না যায়, তার জন্যে দু'একটা ডালও গজিয়ে নেবার কথা তার মনে পড়েনি।

তাল গাছের এই প্রশংসা হয়ত সবার মনঃপূত হবে না। আমারও তাকে প্রশংসা করার তেমন ইচ্ছে ছিল না। তালগাছকে আমি কদাকার কুৎসিত বলেই জানতাম। কেননা, তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখেছি, গা মসৃণ নয়। তার মাথায় হাত বুলাবার চেষ্টা কখনো করিনি। তাই ওর মাথা সম্বন্ধে তেমন কিছু জানিনে। কিন্তু ঘাড় তুলে তাকিয়ে দেখেছি, ওর পাতায় কোন বাহার নেই। অতএব সুশ্রী তাকে বলা চলে না। সামাজিক আচার-ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করলেও তাকে বেয়াড়া বলেই মনে হয়। কারো সংগে তার মিল-মিশ নেই, সবার কাছ থেকে সে আলাদা, একই সমাজে বাস করা সত্ত্বেও সমাজের কেউ যেন সে নয়। গাছেদের একটা নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ অরণ্য-সমাজ আছে। গাছে গাছে সেখানে সদ্ভাব দেখেছি, ডালে ডালে সেখানে কোলাকুলির শেষ নেই। পাতার-ঝরার গান যখন শুরু হয়, তখন গাছেরা দল বেঁধে সেই মর্মর-গানের ঐক্যতান বাজায়। সবুজ সমারোহের দিন যখন আসে, তখন নতুন পাতার সাজ পরে সবাই সেই উৎসবে যোগ দেয়। এই উৎসবে ও সংগীতে যখন সমস্ত উদ্ভিদ-জগতে কলরব আরম্ভ হয়, তখন তাল সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে অনেক ঊর্ধ্বে বসে একা একাই কী যেন ভাবে। নীচের এই আনন্দ-উৎসবে তার কোন টান নেই। —কিন্তু দুর্দিন এলে বিচলিত হয়ে ওঠে তাল। প্রচণ্ড ঝড় এসে বনের মর্মমূলে যখন আঘাত হানতে থাকে, বনে বনে যখন কান্নার সাড়া পড়ে যায়, ডালে ডালে যখন শুরু হয় হাহাকার, তখন স্থির থাকতে পারে না এই তাল গাছ। তার ধ্যান ভেঙে যায় অকস্মাৎ। সে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে এই ঝড়ের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করতে শুরু করে দেয়।

এই জন্যেই তাল গাছ আমার এত ভাল লাগে। সে কারো কেউ নয়, কিন্তু দুর্দিনে সবার সহচর। সবার আগে মাথা বাড়িয়ে দুর্দিনের প্রথম ধাক্কাটা নিজের মাথা পেতে নেবার জন্যে সে ব্যগ্র। তাল গাছকে অবজ্ঞা-ভরে আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি কেন, তার কারণ খুঁজে বার করা তাই আজ দরকার বলে মনে হচ্ছে। সবার মধ্যে থেকেও সে কারো নয় বলেই শুধু না, সবার মধ্যে থেকেও সকলের থেকে সে পৃথক বলেই। দশজনের মধ্যে সে একজন হয়ে থাকতে চায় না, দশের মধ্যে হয় সে প্রথম হতে চায়, তা না হ'লে চায় দশম হতে। তাই হয়ত তার ওপর আমরা—সাধারণরা—এমন খাপ্পা। তাই তার বাহ্যিক রূপটাই আমাদের কাছে বড় হয়ে আছে, তার বাহ্যিক আচরণটাই আমাদের মনকে বিরূপ করে রেখেছে। তার গা পালিশ করা নয়, তার সারা গা উলংগ, তার মাথায় ঝাঁকড়া চুলের বোঝা, কারো সংগে সে মেশে না, কারো সংগে ফিসফিস করে পরামর্শ করে না, কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই—সুতরাং তাকে অবজ্ঞা করার অধিকার আমাদের যেন আছে। নিজেদের এই সীমাবদ্ধ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তার বিচার করতে গিয়ে কত বড় অবিচার যে আমরা করছি, সে-বিচার করে দেখার মতো বুদ্ধিই যে আমাদের নেই, তা আমরা ভেবে দেখিনি।

তাল গাছ কদাকার ও কুৎসিত—একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য, অস্বীকারও আমরা করিনে। নিজে সে কুৎসিত—কিন্তু সৌন্দর্যের সে স্রষ্টা। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে সন্ধ্যা-আকাশে নির্জন প্রান্তরে সে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তার তুলনা পাওয়া দুরূহ। পৃথিবীতে এমন আর একটিও গাছ নেই, যে একা এমন সৌন্দর্য রচনা করতে পারে। শেফালি, বকুল, অশ্বত্থ বট অনেক গাছই আছে। দেখতে শুনতে হয়ত তারা সুন্দর, গন্ধে, গানে হয়ত তারা মন জয় করতে পারে। কিন্তু জনহীন একটা মাঠের মাঝখানে এদের যে কোন একজনকে বসিয়ে দিলেই এদের সৌন্দর্যের পরীক্ষা হয়ে যাবে। কারো কারো ছায়ার মায়ায় হয়ত তাদের গুণ কীর্তন আমরা করবো, কিন্তু সে গুণগান স্বার্থের দ্বারা কলঙ্কিত। তাকে আমরা ভাল না বেসে তার ছায়াকে চাই বলেই তার মন রক্ষা করে কয়েকটা চাটুকথা বলি। কারো-বা ফুলের গন্ধে আমরা আমাদের বিচার-বুদ্ধি ফেলি হারিয়ে। সমস্ত স্বার্থকে বলি দিয়ে বিশুদ্ধ রায় যদি আমরা দিতে পারতাম, তাহলে সে-রায় হতো আলাদা রকমের। তাহলে পৃথিবীর তালেরা আমাদের কাছ থেকে এতটা উপেক্ষা পেত না।

এমন অনেক তাল আমি দেখেছি—তারা যেন সবার কৃপার পাত্র। বড় বড় কথা তারা বলে না, বড় বড় ফুল-ফোটানো হাসি তারা হাসে না, বিলাস-ব্যসন প্রসাধন নিয়ে মশগুলও থাকে না তারা। তারা সবার কাছ থেকে একটু তফাতে বসে সারাদিন কি যেন ভাবে, আর কী যেন করে। সেই ভাবনার তাপে তাপে শরীরও ওঠে তাদের শুকিয়ে, দেহের মসৃণতা যায় ঘুচে, সমস্ত তৈলাক্ত সম্পদ উবে গিয়ে দেখা দেয় নির্ভেজাল রুক্ষতা। তারা নির্জীব আর নিরীহ, তারা নির্লিপ্ত আর উদাসীন। সমস্ত সমাজ মনে করে, তাকে সকলে বয়কট করেছে, সামাজিক ব্যবহার তাই তার সংগে কেউ করতে চায় না। এতে আপত্তি কোথায় তালেদের। এ-ই তো তার কাম্য। সকলের মধ্যে থেকেও সে সকলের কাছ থেকে যে পৃথক, সকলে তো তাই স্বীকার করেই নিচ্ছে। মনে মনে তাই হয়ত খুশিই সে হয়। কিন্তু খুশি হবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না তার চোখে মুখে। নিজের ভাবনা

নিয়ে নিজে এতই অতলে তলিয়ে থাকে সে। আরো বেশি জানবার ও বুঝবার চিন্তাতেই সে আত্মহারা।

তালগাছের সংখ্যা ঘাস আর আগাছার চেয়ে অনেক কম। সাধারণ মানুষের সমাজে এরাও সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। সমস্ত পৃথিবী তো ঘাস ছাওয়া। হয়ত ঘাসেরা মনে করে তারা সারা পৃথিবী জয় করেছে, পৃথিবীটা তাদেরই মুঠির মধ্যে। কিন্তু ঘাসের মর্যাদা কতটা তাতো আমরা প্রত্যহ পদাঘাত দিয়েই ঘোষণা করছি। সুতরাং তাদের কথা আলাদা ভাবে বলার কোন দরকার নেই।

এখন তালগাছের কথাই বলি। আমাদের চারদিকে ছিটেফোঁটাভাবে এদের দু-একটা ছড়ানো ছিটানো আছে বলেই আজও আমরা আছি। আমাদের জীবনের একটানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা একটু-আধটু ছুটি চাই—একটু বিরাম, একটু বিরতি। তাল আমাদের সেই সোনার সঙ্কেত দেয়, আমাদের চোখে টেনে দেয় ঠাণ্ডা কাজলের রেখা। ক্লান্ত গমনে যখন আমরা পাড়ি দিই লম্বা রাস্তা, যে-রাস্তার শেষ নেই, সীমা নেই, ঘাড়ের বোঝায় যখন আমাদের শরীর আর চলতে চায় না, সারা দিনের পর দিগন্তে নেমে আসে সন্ধ্যা, একটু বিশ্রামের জন্যে শরীর ও মন যখন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে দিয়ে একবার চোখ মেলে দূরে তাকালে আমাদের সমস্ত ক্লান্তি যেন নিমেষে ধুয়ে নেমে যায়। ধূসর আকাশের বুকে ওই একটি তালগাছ আঁকা। কোন আড়ম্বর নেই, আয়োজন নেই, কোন জাঁক নেই। সুদীর্ঘ একটি নিরাবরণ ও নিরাভরণ দণ্ডের মাথায় গোল গোল পাতার গুচ্ছ। তার নীচে আরো অনেক গাছ দাঁড়িয়ে, গাছের ফাঁক দিয়ে কুটীরের ওই একটি কোণ, এ-পাশে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে একটা মরা নদীর নির্জীব স্রোত। কিন্তু সকলকে ফেলে চোখ পড়ে আছে ওই তাল গাছের দিকে, ওই সহজ সৌন্দর্যের দিকে।

নিজে ও সুন্দর নয়, আগেই বলেছি। কিন্তু সৌন্দর্য রচনা করার এই যে অপার্থিব ক্ষমতা —এ ক্ষমতা ও পেলো কোথা থেকে? কোনখান থেকে সে পায়নি, এ-ক্ষমতা তাকে অর্জন করতে হয়েছে। তারি জন্যে তার এই কৃচ্ছ্রসাধনা, নিজের ও নিজের পরিপাশ সম্বন্ধে তাই তার এই উদাসীনতা। যেটুকু জেনে সবাই খুশি, সেটুকুতে মন তার ওঠে না। সমস্ত শরীরের ওপর ভর দিয়ে যতদূর সম্ভব মাথা উঁচুতে তুলে সে চারদিকে তাকায়, আর কী যেন খোঁজে। সারাটা জীবন এইভাবে খোঁজার ফলে ও নিজে কী পেলো তা অবশ্য বলা কঠিন। আমার তো মনে হয়, নিজে কিছু পাবে বলে ওর কোন পরোয়া নেই। তা যদি থাকতো, তাহলে ভাবনা-চিন্তা সব বাদ দিয়ে ও নিজের আরও কয়েকটা বাড়তি ডাল-পালা গজিয়ে নেবার জন্যে মিষ্টি-কথার ফুল ফোটাতো, আর মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বিলোবার চেষ্টা করতো। চেষ্টা করলে সফল নিশ্চয়ই হতো সে, কিন্তু তাহলে আর তালগাছ সে থাকতো না, সে এতদিনে শিউলি বকুল কিম্বা হাসনাহানা হয়ে যেতো।

কেউ কেউ বলতে পারেন, তা যদি হতো তাতে ক্ষতি কিছু ছিল না। যাঁরা একথা বলবেন, তাঁদের সংখ্যা অনেক। সুতরাং তাঁদের কথার প্রতিবাদ করতে ভরসা হয় না। এক্ষেত্রে তাল গাছের মতো চুপচাপ থাকাই ভাল। কিন্তু ঝড়ের সঙ্কেত এলে তাকে প্রথম বাধা দেবার জন্যে হাসনাহানারা কতটুকু এগিয়ে আসবে, সেকথা আমাদের সকলের ভাবা চাই। সেই তাণ্ডবের প্রতিবাদ জানাবার জন্যে আর কার কতটুকু মাথাব্যথা হবে, তাও ভেবে দেখতে আমাদের হবে।

আমার তো মনে হয়, গাছের মধ্যে প্রাণ যদি কারো থেকে থাকে, তাহলে তা আছে কেবল তালগাছের। কথাটা বেখাপ্পা শোনাতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি। আসলে তালগাছই যে বেখাপ্পা, সুতরাং তার জীবন বেখাপ্পা হওয়াই স্বাভাবিক। তার প্রাণ আছে বটে, কিন্তু তার স্পন্দন সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। তার আস্ফালন নেই, কোলাহল নেই। নীরব ও নিষ্পন্দ সে। অহমিকাহীন তার এই জীবন-ধারণের রীতি দেখে তার ওপর আমার শ্রদ্ধা জন্মেছে, একথা অকপটে বলে ফেলাই ভাল।

আমাদের আশেপাশে এই রকম কত তাল গাছ আছে, কে তার ঠিকানা জানে। তাদের অবজ্ঞা ও অবহেলা করার অহঙ্কার নিয়ে যারা পথ-ঘাট আলো করে হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সত্যি কথা বলতে কি, তাদের দেখে আমার করুণা হয়। ঘাসের ওপর পা ফেলতে গিয়েও থমকে দাঁড়াই মাঝে মাঝে। তাদের সতেজ ও সবুজ সমারোহে মুগ্ধ হয়ে নয়, তারা কত অসহায় ও অর্বাচীন—এই কথা ভেবে। তাদেরই বুক চিরে উঠে গেছে তাল, বর্ণহীন, গন্ধহীন, সুষমাহীন। চোখ পড়ে গিয়ে তারি ওপর। তার প্রকাণ্ড শরীরটার কদর্য কাঠামো ভেদ করে দৃষ্টি চলে যায় তার মর্মমূলে। সেখানে বসে আছে ধ্যানী, সেখানে বসে আছে প্রাণবন্ত একটি পুরুষসিংহ—স্পষ্ট যেন দেখতে পাই দু চোখে। সরসর শব্দ হলো পাতায়—ওটা বোধ হয় তার অস্পষ্ট মর্মবাণী। কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। হঠাৎ চোখ পড়লো নীচে। গাছের গোড়া হা হয়ে আছে অনেকখানি। শুনলাম, ওটাকে কেটে নামানো হবে। কিছুক্ষণ বাদে ওই পথে ফেরার সময় দেখলাম, গাছের গলায় লম্বা কাছি বেঁধে টানা-দেওয়া গোড়ায় কুড়ুল চলেছে একটানা।

দাঁড়ালাম না। হনহন করে সেখান থেকে ছুটা দিলাম। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মূলে এভাবে কুঠারাঘাত বরদাস্ত করা গেল না। অকেজো গাছটি কেটে ফেঁড়ে নাকি কাজে লাগানো হবে—তক্তা তৈরি হবে। ঘাসেরা সব প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে। আজ তাল তাদেরি মতো ধরাশায়ী হবে—এই তাদের আনন্দ।

দুঃখের ঝড় উঠলে কে প্রতিবাদ জানাবে, এ-চিন্তা তাদের কারো আছে বলে মনে হলো না।

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—**শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়**

[পূর্বানুবৃত্তি]

পাঁচ
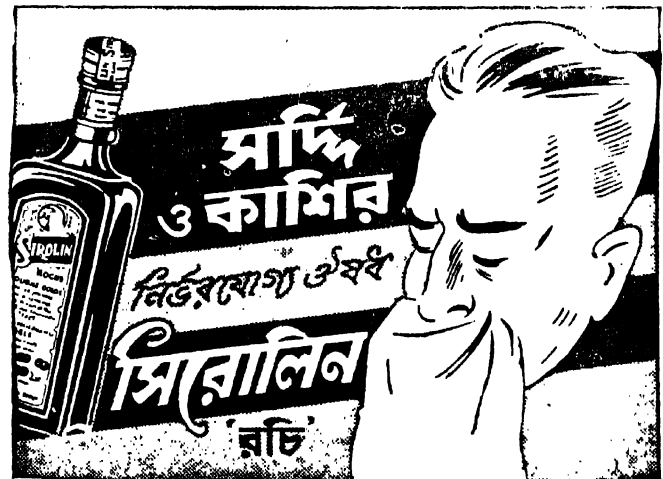
আমি এই সময়ে লন্ডনে ছিলাম। আমরা সেই সময় ইংলন্ডে বসে পরিস্থিতির গুরুত্ব বা তার কণ্টকর পরিণামের কথা কল্পনা করতে পারি নি। ব্যক্তিগত দিক থেকে মোটা টাকা ক্ষতি হওয়ায় আমি নিজে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম—বেশীরভাগই অবশ্য কাগজের হিসাব, অবস্থা একটু থিতোলে দেখা গেল নগদ টাকার হিসাবে অবশ্য ক্ষতিটা অল্প। এলিয়ট মোটা রকমের জুয়োয় মেতেছিল, তাই আমার আশঙ্কা ছিল ওর হয়ত খুবই ক্ষতি হয়ে থাকবে, কিন্তু ক্রীস্‌মাসের সময় রিভিয়েরায় না ফেরা পর্যন্ত আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে নি। দেখা হতে এলিয়ট জানালো হেনরী মাতুরিনের মৃত্যু হয়েছে, আর গ্রে'র সর্বনাশ হয়েছে।

আমার বিষয়বুদ্ধি বা তৎসংক্রান্ত জ্ঞান অল্প, তাই এলিয়ট কথিত ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়ত আমার গোলমাল হ'তে পারে। যতটা বুঝলাম তাতে মনে হল কতকটা হেনরী মাতুরিনের নিজের খেয়ালের জন্য, আর গ্রে'র নির্বুদ্ধিতার ফলেই এই বিপর্যয় ঘটেছে। এই ঘটনা যে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা হেনরী প্রথমটা উপলব্ধি করেন নি, তার মনে হয়েছিল নূ্য ইয়র্কের ব্রোকারদের মফঃস্বলের সহযোগীদের জব্দ করার একটা প্যাঁচ, তাই তিনি বাজার তেজী রাখার জন্য টাকা ছাড়তে লাগলেন। সিকাগোর ব্রোকারদের ওপর তিনি ক্ষেপে উঠলেন, বোকাগুলো এই-ভাবে নূ্য ইয়র্কের শয়তানদের চক্রে জড়িত হয়ে পড়ছে বলে। চিরদিনই উনি এই বলে গর্ব করে এসেছেন যে, অল্প পুঁজির বিধবা বা অবসরপ্রাপ্ত. বাঁধা আয়ের কর্মচারীদের, ও'র উপদেশ মেনে নিয়ে কখনও এক কড়াও নষ্ট হয় নি, এখন তাদের কোনরূপ ক্ষতি যাতে না হয়, সেই কারণে নিজের তহবিল থেকে টাকা দিয়ে তাদের হিসাব বজায় রাখলেন। মাতুরিন বল্লেন—ওদের জন্য আমি সর্বস্বান্ত হতেও রাজী। আবার আমি আমার ভাগ্য গড়ে নিতে পারব, কিন্তু ওদের একটি আধলা নষ্ট হলে আমি মুখ দেখাব কি করে। ওরা যে আমাকে বিশ্বাস করে বসে আছে। ও'র ধারণা ছিল উনি মহানুভব, কিন্তু এ ও'র নির্বুদ্ধিতা। তাঁর অতুল সম্পদ গলে গেল, তারপর এক রাত্রে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ায় গোলযোগ ঘটল। বয়স তখন ষাট, চিরদিনই প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, খেলেছেন খুব, খেয়েছেনও খুব, আর মদ্যপানের প্রচন্ডতাও কম ছিল না, মাত্র কয়েক ঘণ্টা কণ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করে 'করোনারি থ্রম্‌বোসিসে' মাতুরিনের মৃত্যু হ'ল।

এই অবস্থা সামলানোর দায়িত্বভার পড়লো গ্রে'র ওপর, সে একান্তই একা। পিতার অজ্ঞাতে সে প্রচুর পরিমাণে ফাট্‌কাবাজী শুরু করেছিল, সুতরাং নিজেই অত্যন্ত বিপদের ভিতর ছিল। নিজেকে বিপন্মুক্ত করার চেষ্টা তার সফল হ'ল না। কোন ব্যাঙ্ক আর ওকে টাকা ধার দেবে না। এক্সচেঞ্জের যাঁরা অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তি, তাঁরা কারবার গুটোবার পরামর্শ দিলেন। অবশিষ্ট কাহিনীটুকু আমার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়, দেয় টাকাও মেটাতে পারলো না এবং যা বুঝলাম, তার ফলে দেউলিয়া ঘোষিত হ'ল। ইতিমধ্যেই নিজের বাড়িখানি গ্রে বাঁধা দিয়েছিল, সে বাড়ি তাদের হাতেই তুলে দিতে হ'ল। যা কিছু মূল্য পাওয়া গেল, তারই বিনিময়ে লেক সোর ড্রাইভে ওর বাবার বাড়ি ও মারভিনের বাড়িটি বিক্রী হয়ে গেল। ইসাবেল তার অলঙ্কারাদি বিক্রী করল। শুধু বাকী রইল সাউথ ক্যারোলিনার আবাদ, সেটি ইসাবেলের নামেই ছিল,—তার ক্রেতা পাওয়া যায় নি। গ্রে মুছে গেল, ফতুর হয়ে গেল।

প্রশ্ন করলামঃ আর তোমার কি অবস্থা হ'ল, এলিয়ট?"

এলিয়ট বেশ ঢঙ করে বলল—আমি কাউকেই দোষ দিই না ভাই, বলার কিছুই নেই। খেয়ালে যখন যা হাওয়া বয়—

আমি ওকে আর বেশী প্রশ্ন করলাম না, কারণ অর্থনৈতিক ব্যাপারে ত' আর আমার মাথাব্যথা নেই। তবে ভাবলাম পরিমাণ যাই হোক, আমাদের সকলের মত ওরও ক্ষতি হয়েছে।

প্রথমটা রিভেয়ারায় এই বিপর্যয়ের তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। দু'চারজনের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে শুনলাম, অনেকগুলি বাগানবাড়ি শীতে খোলা হল না, আর কতকগুলি বিক্রী করা হবে শুনলাম। হোটেলগুলি মোটেই ভর্তি হল না, মণ্টি কারলোর ক্যাসিনোয় অভিযোগ শোনা গেল যে, এবারকার সীজনটা তেমন জমলো না। বছর দুয়েকের পূর্বে দুঃসময়টা ঠিক বোঝা গেল না। এই সময় একজন জমির দালাল, আমাকে বললেন যে, তুলো থেকে ইতালীয় সীমান্ত পর্যন্ত ছোট বড় প্রায় আটচল্লিশ হাজার সম্পত্তি বিক্রী করা হবে। ক্যাসিনোর শেয়ারের দাম নেমে গেল। বড় বড় হোটেলগুলি আকর্ষণবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৃথাই মূল্য হ্রাস করলো। যারা চিরদরিদ্র এবং আরো দরিদ্র হ'তে পারে না, শুধু সেই সব বিদেশীয়দেরই দেখা গেল, এরা তেমন অর্থব্যয় করতেন না, কারণ ব্যয় করার মত অর্থ তাঁদের নেই,—দোকানদাররা হতাশ হয়ে উঠল। কিন্তু এলিয়ট আরো পাঁচজনের মত কর্মচারীদের সংখ্যা বা বেতন হ্রাস করলো না; রাজন্যবর্গ ও উপাধিমণ্ডিত ব্যক্তিদের যথারীতি মনোরম খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত করতে লাগল। নিজের জন্য এলিয়ট একটা নতুন বড় গাড়ি কিনল,—গাড়িটা আমেরিকা থেকে আনালো, আর তার জন্য প্রচুর কর দিতে হল। কর্মীদের পরিবারবর্গের জন্য বিনামূল্যে আহার বিতরণের উদ্দেশ্যে বিশপরা যে সমস্ত সাহায্য ব্যবস্থার আয়োজন করতেন, তাতে ও মুক্তহস্তে চাঁদা দিত। আসলে সে এমনভাবে দিন কাটাতে লাগল যেন কোন কিছু অঘটনই ঘটে নি—এদিকে অর্ধেক পৃথিবী এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে।

কারণটা ঘটনাচক্রে জানতে পারলাম এক-দিন: কাপড়চোপড় কেনার জন্য এলিয়ট বছরে একবার এক পক্ষকালের জন্য ছাড়া ইংলণ্ডে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তবে তখন ও প্যারীতে ওর ডেরায় শরৎকালে তিন মাসের জন্য মে ও জুন মাসে সব লটবহর পাঠিয়ে দিত; এই সময়টা রিভেয়ারায় এলিটের বন্ধু-বান্ধবরা কেউ বিশেষ থাকতেন না। এখানকার গ্রীষ্মটা এলিয়ট কতকটা আবহাওয়ার খাতিরে ও স্নান করার জন্যই পছন্দ ক'রত, তবে আমার মনে হয়, প্রধানত এই সুযোগে পোষাক-পরিচ্ছদ প্রদর্শনের একটা সুযোগ ও অবসর পাওয়া যেত, ওর পরিচ্ছদবিলাসী মন আত্মতৃপ্তি উপভোগ করত। এই সময় ও লাল, নীল, সবুজ ও হলুদে রঙের ট্রাউজার পরে বেরোত, তার সঙ্গে বিভিন্ন রঙের জামা গায়ে দিত—আর এই পোষাক সম্পর্কিত প্রশংসা সে অতি নম্রতার সঙ্গে গ্রহণ করত, নূতন ভূমিকায় সাফল্যলাভ করার পর অভিনেত্রীরা যে কায়দায়

অভিবাদন গ্রহণ করে প্রতিবেদন জ্ঞাপন করেন, এলিয়টের ভঙ্গীটা অনেকটা সেই রকম।

ক্যাপ্ ফেরাটে ফেরার পথে সেবার বসন্ত-কালে প্যারীতে একটি দিন কাটাবার সুযোগ হয়েছিল, এলিয়টকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলাম। রিজ্ বারে উভয়ে মিলিত হলাম, জায়গাটায় এখন আর আমেরিকান কলেজী ছাত্রের ভিড় নেই, সম্পূর্ণ ফাঁকা, যেন অসফল নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয়ের পরে বন্ধু-পরিত্যক্ত নাট্যকারের মত। আমরা কক্‌টেল খেলাম,—এই ট্রান্স-অতলান্তিক অভ্যাসটি এতদিনে এলিয়টের আয়ত্তে এসেছে। এর পর লাঞ্চের অর্ডার দিলাম। আহারান্তে এলিয়ট প্রস্তাব করল একটা "কিউরিয়ো সপে" (প্রাচীন দ্রব্য-সংগ্রহের দোকান) যাওয়া যাক, ওকে অবশ্য বলেছিলাম, খরচ করার মত বেশী টাকা আমার নেই—তবু ওর সঙ্গ নিলাম। প্লাস্ ভঁদমের ভিতর দিয়ে আমরা হেঁটে চললাম, এলিয়ট আমাকে বলল—ও যদি অল্পক্ষণের জন্য 'চারভেটে' যায়, তাহলে কি আমি কি কিছু মনে করব! ও কতকগুলি জিনিসের অর্ডার দিয়েছে, সেগুলি প্রস্তুত হয়েছে কিনা জানতে চায়। বোঝা গেল ও কিছু সার্ট তৈরী করতে দিয়েছে, আর কিছু 'ড্রয়ার'—সেইগুলির ওপর সুতা দিয়ে ওর নামের আদ্যাক্ষর তোলানো হচ্ছে। সার্টগুলি তখনও আসেনি, ড্রয়ারগুলি তৈরী হয়ে গেছে, দোকান-কর্মচারী জানতে চাইল এলিয়ট সেগুলি দেখবে কি না।

এলিয়ট বল্‌ল—হ্যাঁ দেখব। তারপর লোকটি যখন আনতে গেল তখন আমাকে বলল—"আমার নিজস্ব প্যাটার্নে এগুলো তৈরী করিয়েছি।"

জিনিসগুলো এল, আর দেখ্‌লাম—এক সিল্ক ছাড়া মেঁসীতে আমি যেমনটি প্রায় কিনে থাকি তেমনই; তবে যে জিনিসটি বিশেষ করে নজরে পড়ল, তা E. T. এই অক্ষর দুটির ওপর একটি করে কাউণ্টের ক্রাউন আঁকা। আমি একটিও কথা বললাম না।

এলিয়ট বলে—চমৎকার! চমৎকার! আচ্ছা সার্টগুলো তৈরী হলেই পাঠিয়ে দেবেন।

আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম,—এলিয়ট পথ চলার সময় আমার পানে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসল।

"ক্রাউনটা লক্ষ্য করলে নাকি? সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে যখন 'চারভেটে' যাওয়ার জন্য বলেছিলাম, তখন এ কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। হিজ্ হোলিনেস যে অশেষ করুণা-ভরে আমার খাতিরে আমাদের প্রাচীন পারিবারিক উপাধি পুনর্প্রবর্তন করেছেন।"

আমার ভদ্রতার খোলসের ভিতর থেকে সচকিত হয়ে উঠে বললাম—"তোমার কি বলে?"

এলিয়ট বিরক্তির ভঙ্গীতে ভ্রূ-কুঞ্চিত করল। বল্লে, "তুমি কি জানো না? ফিলিপ দি সেকেণ্ডের সুইটে যে কাউণ্ট দ্য লরিয়া ইংলণ্ডে এসে কুইন মেরীর মেড্ অফ অনারকে বিয়ে করেছিলেন—আমি ত' তাঁরই দৌহিত্র বংশে জন্মেছি।"

"ও আমাদের সেই ব্লাডি মেরী?"

এলিয়ট একটু গম্ভীর হয়ে বলে—"হ্যাঁ, প্রাচীন ইতিহাস ত' তাই বলে থাকে শুনেছি। আমি তোমাকে হয়ত বলি নি ১৯২৯এর সেপ্টেম্বর আমি রোমে কাটিয়েছি—ঐ সময় রোমে যেতে অবশ্য আমার ভারী বিশ্রী লাগছিল—কারণ তখন রোম একেবারে ফাঁকা—তবে সাংসারিক সুখ-সুবিধার চাইতে কর্তব্য-জ্ঞানটাই শ্রেষ্ঠ মনে করে এসেছি চিরদিন। পোপের দপ্তরে আমার যে সব বন্ধুরা ছিলেন তাঁরা আমাকে বল্লেন—ব্যাঙ্কের এই অবস্থা শীঘ্রই ঘটবে, আর তাঁরা আমাকে অতি-শীঘ্র টাকা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন। আমার সমস্ত মার্কিনী আমানত বিক্রী করে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। ক্যাথলিক চার্চের পিছনে রয়েছে সুদীর্ঘ কুড়িটি শতাব্দীর গভীর জ্ঞান, তাই আমি আর এক মুহূর্তেও ইতস্তত করলাম না, হেনরী মার্টুরিনকে কেবল্ করে জানালেন সমস্ত কিছু বিক্রী করে সোনা নিতে আর লুইসাকেও অনুরূপ উপদেশ দিয়ে কেবল্ করলাম। হেনরী জবাবে 'কেবল্' করে জানতে চাইল আমি কি পাগল হয়েছি, আমার পাকা চিঠি না পেলে ও কিছুই করবে না। আমি তৎক্ষণাৎ সোজাসুজি জানিয়ে দিলাম, আমার নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে ও আমাকে তা হয়ে গেলে জানাতে। বেচারী লুইসা আমার উপদেশ নেয় নি—আর তার ফলও ভোগ করেছে।"

"তাহলে যখন বিপর্যয় ঘট্‌ল—তখন তুমি গ্যাঁট হয়ে বসে?"

"কথাটি মার্কিনী—ভায়া হে, এটি ত' তোমাকে কখনও ব্যবহার করতে দেখি নি—তবে এতদ্দ্বারা আমার তখনকার পরিস্থিতিটা বেশ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। আমি কিছুই হারালাম না, বরং যা পেলাম, তা অনেক বলা যেতে পারে, ঝুলি বোঝাই বলতে পারো। কিছু পরেই অতি অল্প টাকায় আমার সেই সব আমানতী কাগজ আবার কিনতে পেরেছি। আর এই ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে বিধাতারই অভিপ্রায়ে ঘটেছে এবং তাঁর কাছেই আমি ঋণী, তাই ভাবলাম বিনিময়ে মঙ্গলময়ের জন্য আমারও কিছু করা উচিত।"

"ওঃ,—তা কি করে কি করলে?"

"এখন, জানো ত' ভুচে পঁর্নাতিন মার্সে অনেক জায়গা বিক্রি করছিলেন—আমাকে অনেকে জানালো যে, ওখানকার বাসিন্দাদের জন্য একটা উপাসনাস্থানের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছেন। সুতরাং সংক্ষেপেই বলে ফেলি—আমি একটি ছোট রোমান চার্চ তৈরী করেছিলাম, প্রোভেন্সে যেমনটি দেখেছিলাম, তারই অবিকল নকল, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিখুঁতভাবে রাখা হয়েছিল, আমার মুখ থেকে শুনলেও বলি—একেবারে যেন রত্ন। উপাসনা মন্দিরটি সেণ্ট মার্টিনের নামে উৎসর্গ করলাম, কারণ সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় একখানি কাঁচখণ্ড পেয়ে গেলাম—তার ওপর সেণ্ট মার্টিন সেই যে নিজের বস্ত্রাংশ ছিন্ন করে একজন নগ্ন ভিক্ষুককে দিয়েছিলেন, সেই দৃশ্যটি আঁকা আছে। প্রতীকটি এতই যথাযোগ্য হয়েছিল যে, আমি সেটি কিনে নিয়ে উঁচু বেদীর ওপর বসিয়ে দিলাম।"

সেণ্ট মার্টিনের সেই বিখ্যাত সদয় কীর্তির সঙ্গে ব্যাঙ্ক-বিভ্রাটের যে কি যোগাযোগ, তা জানবার জন্য আমি বাধা দিলাম না—উপযুক্ত মুহূর্তে ও সিকিউরিটি বেচে দিয়েছে বলেই এক সর্বশক্তিমান অদৃশ্য শক্তিকে দালালের কমিশনের মত এই খয়রাত দিয়েছে কিনা জানতে চাইলাম না। আমি নীরস ব্যক্তি—প্রতীকের ব্যাপার চিরদিনই আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়। এলিয়ট বলে চলে......"আমি যখন 'হোলি ফাদার'কে ভাগ্যক্রমে এই চার্চের ফটোগ্রাফ দেখালাম, তিনি অনুগ্রহ করে বল্লেন—এক-নজরেই তিনি বুঝেছেন যে আমি অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, এই অধঃপতিত যুগে এমন দুর্লভ শিল্পজ্ঞান ও চার্চের প্রতি অনুরাগের সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। সে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা, ভায়া হে, অপূর্ব অভিজ্ঞতা! কিন্তু কিছুকাল পরে যখন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছল যে উনি, কৃপা করে আমাকে একটি উপাধি দান করেছেন, তখন বোধ করি, আমার চাইতে অধিক বিস্মিত আর কেউ হয়নি। আমেরিকান নাগরিক হিসাবে এটি ব্যবহার না করাই আমি শ্রেয় মনে করি, আর আমি আমার যোশেফকে 'মঁসিয়ে লে কোঁত' বলে উল্লেখ করতে নিষেধ করেছি, তুমিও এই কথা গোপন রাখবে আশা করি। আমি এই নিয়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়াতে চাই না। কিন্তু হিজ হোলিনেস্ যে মনে করবেন তাঁর করুণা প্রদত্ত উপাধির আমি কদর করি না, তাও চাই না, তাই এই সব ব্যক্তিগত জামাকাপড়ে 'ক্রাউন'টা আঁকিয়ে নিচ্ছি। একথা তোমাকে আর বলতে কি আমার মার্কিনী ভদ্রলোকের পোষাকের ভিতর আমার পদমর্যাদা প্রচ্ছন্ন রেখেই আমার আনন্দ।"

আমরা বিদায় নিলাম এলিয়ট বলল, জুনের শেষে রিভেয়ারায় আসবে। তা কিন্তু ও এল না। প্যারী থেকে ওর সমস্ত জিনিসপত্তর ও লোকজন সরিয়ে দেওয়ার সবেমাত্র ব্যবস্থা করে ধীরে সুস্থে মোটরে চলে আসবে স্থির করেছিল, এসে দেখবে সব গোছানো রয়েছে,

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ইসাবেলের কেবল্ এল যে তার মার অবস্থা সহসা মন্দের দিকে গিয়েছে। এলিয়ট শুধু যে বোনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল তা নয়, পূর্বেই বলেছি ওর পারিবারিক টান ছিল প্রচণ্ড। শেরবুর্গ থেকে প্রথম জাহাজ নিয়ে ও ন্যু ইয়র্কে পৌঁছল ও সেখান থেকে সিকাগোয় চলে গেল। আমাকে ও লিখেছিল মিসেস্ ব্রাডলী এতই রোগা হয়ে গেছেন যে তা দেখে হৃদয়ে আঘাত লাগে। আর দু'চার সপ্তাহ বা দু' এক মাস মাত্র তিনি বাঁচতে পারেন—যাই হোক শেষ পর্যন্ত ওর কাছে থাকাটাই কর্তব্য বলে মনে করল এলিয়ট। ওখানকার উত্তাপ কিঞ্চিৎ সহনীয়,—আর ওখানকার সমাজ তেমন সুবিধার না হলেও, এই রকম অবস্থায় তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। যেভাবে ওর স্বদেশীয়রা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে কাবু হয়ে রয়েছেন তা দেখে এলিয়ট হতাশ হল। অপর লোকের দুঃখ সহ্য করার চাইতে সহজ কিছুই নেই জানতাম, আর এলিয়টের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় এ নিয়ে কিছু বলার অধিকার নেই। অবশেষে এলিয়ট তার কয়েকটি বন্ধুবান্ধবকে জানানোর জন্য নানা সংবাদ পাঠিয়েছিল আর আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিল সবাইকেই যেন বুঝিয়ে বলি কেন ওর বাড়ি গ্রীষ্মকালের জন্য বন্ধ রইল।

এক মাসের কিছু পরে আর একটি পত্রে ও জানালো যে মিসেস্ ব্রাডলীর দেহাবসান ঘটেছে। চিঠিখানি আন্তরিকতা ও আবেগের সঙ্গে লিখিত। ওর প্রচণ্ড দাম্ভিকতা ও অদ্ভুত উন্নাসিকতা সত্ত্বেও ও যে কতখানি সহৃদয়, করুণাপরবশ ও সৎ ব্যক্তি তা যদি না আমার জানা থাকত, তাহলে এতখানি সংযম ও প্রকৃত অনুভূতি ও সারল্যের সঙ্গে যে এলিয়ট তার মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে, তা আমি কোনোদিনই ভাবতে পারতাম না। এই চিঠির ভিতর ও জানিয়েছিল যে মিসেস ব্রাডলীর বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল। তাঁর বড় ছেলে, তোকিয়োতে এ্যাম্বাসাডারের অনুপস্থিতিতে 'চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার' হয়ে আছেন, তিনি এখন সেখান থেকে আসতে পারবেন না। তাঁর মেজ ছেলে টেম্পলটন, যখন প্রথম ব্রাডলীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তখন ফিলিপাইনে ছিল, এখন তাকে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদপ্তরে বদলী করা হয়েছে।

মার অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি সস্ত্রীক সিকাগোয় এসেছিলেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হবার পরই তাঁকে রাজধানীতে ফিরতে হয়েছে—এই অবস্থায় সমস্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে যতদিন শেষ না হয় ততদিন আমেরিকায় থাকাটাই শ্রেয় মনে করে এলিয়ট। মিসেস্ ব্রাডলী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর তিনটি সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন, তবু বোঝা গেল ঊনত্রিশ খৃষ্টাব্দের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তাঁর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ভাগ্যক্রমে ওদের মার্ভিনস্থ পল্লীভবনের একটা ক্রেতা পাওয়া গেল—এলিয়ট চিঠিতে এই বাড়িটিকে প্রয়াতা লুইসার মফঃস্বলের বাড়ি বলে উল্লেখ করেছিল।

এলিয়ট লিখেছিল, "যখন মানুষকে পৈত্রিক আবাস ছেড়ে যেতে হয় তা বড়ই দুঃখকর হয়, কিন্তু কিছুকালের মধ্যে বহু ইংরাজ বন্ধু-বান্ধবের জীবনে আমি এই নিদারুণ বিপদ ঘটতে দেখেছি, তাই আমার মতে আমার ভাগ্নেরা এবং ইসাবেল যা অবশ্যম্ভাবী তা যথাযোগ্য সাহসিকতার সঙ্গে গ্রহণ করবে।"

মিসেস্ ব্রাডলীর সিকাগোর বাড়িটাও ওরা ভাগ্যক্রমে বিক্রি করতে পেরেছিল। দীর্ঘকাল ধরে একটা পরিকল্পনা ঝুলছিল যে ব্রাডলীদের পাড়ার দীর্ঘ বাড়ির সার ভেঙে ফেলে তার জায়গায় নতুন ধরণের বিরাট বাসাবাড়ি গড়া হবে। মিসেস্ ব্রাডলী তাঁর এতদিনের বাসকরা বাড়িতেই মারা যাবেন এই পণ করে বসে থাকায় এতদিন সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি—কিন্তু যেই তাঁর দেহ থেকে শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়েছে, অমনি উদ্যোক্তারা ছুটে এল বাড়িটা কিনে নেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আর সেই প্রস্তাব তখনই গৃহীত হল। কিন্তু এত করেও ইসাবেলের ভাগ্যে কম সম্পত্তি পড়ল।

বিপত্তির পর গ্রে একটা চাকরির চেষ্টা করতে লাগল, এমনকি, যেসব দালাল কোনোমতে সামলে নিয়েছে তাদের অফিসের কেরাণীগিরি করতেও রাজি ছিল, কিন্তু ব্যবসা মন্দা, তাই কাজ জুটলো না। পুরাতন বন্ধুদের কাছে অতি সামান্য বেতনে এবং যে-কোনো কাজের জন্য আবেদন জানালো, কিন্তু তা নিরর্থক হ'ল। সর্বনাশ সামলে নেওয়ার জন্য তার এই আপ্রাণ চেষ্টা তাকে আকুল করে তুলল। উদ্বেগ ও অপমানের ভয় তাকে অভিভূত করে তুলল, তার ফলে সে স্নায়বিক বিকারে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা মাথার যন্ত্রণায় অচল হয়ে থাকত, আর সে ঘোর কাটলে ভেজা কম্বলের মত নেতিয়ে পড়ত। ইসাবেল ভাবল যে, যতদিন গ্রে স্বাস্থ্য ফিরে না পায়, ততদিন ছেলেদের নিয়ে ক্যারোলিনায় আবাদে চলে যাওয়াই শ্রেয় হবে। এককালে ধানের ফসলে এই জমি থেকে হাজার হাজার ডলার পাওয়া গিয়েছে, এখন শুধু আগাছা আর জঙ্গল, বুনো হাঁস শিকারির কাছেই এর যা-কিছু মূল্য! তাই এর কোনো ক্রেতা পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর থেকে মাঝে মাঝে ওরা এখানে এসে থাকত, এখন স্থির করল যতদিন না অবস্থার পরিবর্তন হয়, গ্রে কোনো কাজ না পায়, ততদিন ওরা এইখানেই থাকবে।

এলিয়ট লিখেছিল—"এ আমি কিছুতেই হতে দেব না, ভায়া হে যেন শুয়োরের মত ওরা থাকবে। ইসাবেলের কোনো দাসী নেই, ছেলেদের গভর্নেস নেই, আর দু'একজন কালো রঙের স্ত্রীলোক যা কিছু দেখাশোনার কাজ করে। আমি তাই আমার প্যারীর বাসাটা ওদের জন্য ছেড়ে দেব বলেছি, যতদিন না এই হতভাগা দেশের অবস্থা ফেরে ততদিন ওরা এখানেই থাকুক। আমি ওদের লোকজন দেব, আসলে আমার রান্নাঘরের দাসীটা খুব ভালো রাঁধুনি, আমি তাকে ওদের জন্য দিয়ে দেব, তার জায়গায় সহজেই যাকে হয় একটা জুটিয়ে নেব। খরচপত্রের ব্যবস্থা আমিই করব, ইসাবেল তাহলে ওর সামান্য পুঁজিতে জামাকাপড় বা সংসারের মনোমত আহার্যের ব্যবস্থা করতে পারবে। তার অর্থ এই দাঁড়াল যে রিভেরারাতেই আমাকে বেশি সময় কাটাতে হবে—আর ভায়া হে, তোমার সঙ্গে একটু বেশি দেখাশোনা হবে, অতীতে যা কোনোদিন হয়নি। লণ্ডন আর প্যারী এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে রিভেরারাতেই আমি থাকব ভালো। এই একমাত্র জায়গা এ জগতে যেখানে লোকজন আমার ভাষাতেই কথা বলে। দু'চার দিনের জন্য মাঝে মাঝে প্যারী যাবো—তখন ঐ 'রিজে' গিয়ে মাথা গুঁজে থাকতে আমার আপত্তি হবে না।

"যাই হোক্ ভাই, গ্রে আর ইসাবেলকে আমার এই প্রস্তাব মানতে রাজি করিয়েছি, আর যথাযোগ্য ব্যবস্থা শেষ হলেই যত শীঘ্র পারি ওদের নিয়ে আসছি। ইতিমধ্যে ফার্নিচার আর ছবি (অতি খেলো ধরণের ভায়া হে, আর অতি সন্দেহজনক তাদের মৌলিকত্ব) সামনের সপ্তাহের পরের সপ্তাহে বিক্রির বন্দোবস্ত হয়েছে। আমি ভেবে দেখলাম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ও-বাড়িতে পড়ে থাকা ওদের পক্ষে বেদনাদায়ক হবে, তাই ওদের নিয়ে এসেছি, আমার সঙ্গে 'ড্রেকে' এখন ওরা আছে। প্যারী গিয়ে ওদের স্থিতু করে দিয়েই রিভেয়ারায় ফিরে আসব। তোমার রাজকীয় প্রতিবেশীদের আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে যেয়ো না।"

প্রচণ্ড উন্নাসিক ও দাম্ভিক হলেও এলিয়ট অতি সহৃদয়, মহানুভব ও কারুণিক, কে তার এই অনুরোধ উপেক্ষা করবে? (ক্রমশ)

কাজের খোঁজে মুসোলিনী-গিন্নী

কিছুদিন আগে জানিয়েছিলাম, মুসোলিনীর পত্নী ডোন্না রাচেলি মুসোলিনী নেপলস্-এর কাছাকাছি ফোরিওতে কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন। সম্প্রতি জানা গেছে তাঁর অভাব দুর্দশা আগের চেয়ে আরও অনেকখানি

পুত্র-কন্যাসহ মুসোলিনী গিন্নী

বেড়েছে—কারণ ইতালীয়ান গভর্নমেণ্ট তাকে প্রতি মাসে দেড়শো টাকার মত যে মাসোহারা দিতেন—সেটুকু দেওয়াও বন্ধ করেছেন। কাজেই মুসোলিনী পত্নী এখন তাঁর ছোট ছেলে রোমানো আর ছোট মেয়ে আন্না ম্যারিয়াকে নিয়ে সেখানে আছেন অত্যন্ত সাধারণ একটা ফ্ল্যাটে, নিতান্ত কষ্ট করেই। কিন্তু অভাব কষ্ট এত বেড়েছে যে, তিনি তাঁর ছেলেমেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা যাওয়ার বাসনা জানিয়েছেন—আমেরিকার সাংবাদিক কুইগ স্ক্রিস্কুয়োলার কাছে। তিনি বলেছেন—"আমেরিকায় যেতে পারলে—সেখানকার একটি চাষবাড়ীতে যে কোনও একটা কাজ যোগাড় করে নিতে খুব অসুবিধা হবে না, কারণ চাষের সব কাজই আমি খুব ভালোই জানি, কারণ আমি তো আসলে চাষারই মেয়ে।" মুসোলিনী-পত্নী আমেরিকায় গেলে আমেরিকানরা তাঁকে নিশ্চয়ই চাষের কাজে লাগানোর চেয়ে অন্য ভালো কাজে লাগাবেন।

অতি সাবধানী রাজনীতিজ্ঞ

আমেরিকার রিপাব্লিকান দলের প্রবীণ নেতা হার্বার্ট হুভার সম্প্রতি তাঁর বন্ধুদের কাছে একটি গোপন তথ্য প্রকাশ করেছেন—সেটি হচ্ছে এই যে তিনি চেকের সাহায্যে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলেন না কোনওদিনই। এর কারণ কি জানতে চাইলে—তিনি জানিয়েছেন যে সারা দেশে নানা জনের অটোগ্রাফের খাতায় তাঁর হাতের সই খুব বেশী ছড়িয়ে আছে বলেই ব্যাঙ্কের কর্তারা তাঁকে বলেছিলেন যে চেকের সাহায্যে যদি তিনি টাকা তোলেন—তাহলে জাল চেক আসার সম্ভাবনাটা খুব বেশী। আমাদের দেশে যাঁরা অটোগ্রাফ চাইলেই চট্ করে সই
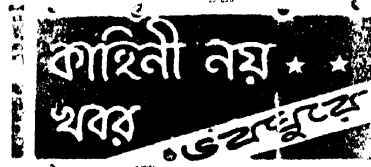
এইবার মুখে আগুন দেবে!

দিয়ে দেন, তাঁরা অতঃপর ভেবেচিন্তে ও কাজটি করবেন।

জীবিকা অর্জনের অভিনব পন্থা

প্যারিস শহরতলী অঞ্চলে ঘুরলে কোনও না কোনও যায়গায় দেখতে পাবেন নাম-না-জানা একটি অদ্ভুত মানুষকে—যে লোকটি তার জীবিকা উপার্জন করে আগুন খাওয়া খেলা দেখিয়ে। প্রথমেই দেখবেন—লোকটি এক বোতল পেট্রল দেখিয়ে চীৎকার করে ক'রে লোক জড়ো করবে। তারপর বেশ কয়েকজন জড়ো হলে—একটা কাঁচের গেলাসে খানিকটা

ফুঁয়ের জোরে আগুন বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে

পেট্রোল ঢেলে নিয়ে ঢোঁচো করে পেট্রোলটা খেয়ে ফেলবে—তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে যেমনি হু-হু শব্দে ফুঁ দিয়ে মুখ থেকে হাওয়া ছাড়বে—অমনি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতেই দপ করে তার মুখ থেকে জ্বলন্ত আগুন বেরিয়ে আসবে। তখন এক-পায়ে হাঁটু গেড়ে বসে ফুঁয়ের জোরে তার মুখের এই আগুনের শিখা দিয়ে ছ' ফুট দূরে রাখা একটা খবরের কাগজকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে—এ-খেলা প্রায়ই সে দেখায়—লোকে তা দেখে তার টিনের কৌটোতে যা দু-চার পয়সা দেয়—তাতেই নাকি তার দিব্যি পেট চলে যায়। অথচ এ লোকটি রাস্তা ছাড়া অন্য কোথাও ও-খেলা দেখাতে চায় না। ভারী অদ্ভুত পেশা—আগুন নিয়ে খেলা।

বিহারিণী

ক্যাপ্টেন মুস্তাফা আনোয়ার

পেশোয়ার হইতে একটি প্রক্টর (Proctor) লইয়া একাকী লাহোরে আসিতেছি। সকাল হইতে মন একটু অস্থির বোধ হইতেছিল, প্রথমে মনে হইল শরীর খারাপ হইতেছে, কিন্তু পরে বুঝিলাম তাহা নহে। পূর্ব হইতে স্থির করিয়া আসিয়াছি, তক্ষশীলার উপর দিয়া যাবতীয় ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যাইব। পেশোয়ার হইতে লাহোরে আসিতে তক্ষশীলা বাঁদিকে পড়ে। ইচ্ছা করিয়া সেই দিকে পথ (কোর্স) ধরিলাম।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সকল স্থানে এরোপ্লেন যাইবার নিয়ম নাই। পাঞ্জাব হইতে পেশোয়ার যাইতে হইলে আটক ব্রীজ পর্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে রেললাইন ধরিয়া যাইতে হয়। আসিবার সময়ও তাহাই করিতে হয়। আটক ব্রীজে আসিয়া সোজা তক্ষশীলা অভিমুখে চলিলাম। পরিষ্কার আকাশে তিন হাজার ফিট উপর দিয়া উড়িতেছিলাম। সিন্ধু নদ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল। উত্তরে প্রায় তিন মাইল দূরে কাবুল নদী সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং সেই পর্যন্ত সিন্ধু নদ প্রশস্ত। অতঃপর আটক ব্রীজের সন্নিকটবর্তী আসিয়া যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কীর্ণ হইয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে।

সাড়ে তিনটায় তক্ষশীলা পৌঁছিলাম। বীর মাউণ্ড, সিরকাপ, জউলীয়ান প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষের উপর উড়িয়া ধর্মরাজিকা স্তূপের উপর নীচু হইয়া যাইবার জন্য ডাইভ করিতেছি, পিছন হইতে তখন কাঁধের উপর হাত রাখিয়া একজন কানে কানে বলিল, ওখানে অত নীচু দিয়ে যেও না।

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম একটি পরমা-সুন্দরী যুবতী পিছনের সীটে বসিয়া রহিয়াছে। ভূত বলিয়া ভয় পাইলাম, কিন্তু দুইটি উজ্জ্বল ডাগর চোখের চাহনি, মুক্তার মত সাদা দাঁত ও নিটোল শরীরের গঠন দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম, শুধু ভুলিলাম না, মুগ্ধ হইলাম। কহিলাম, কে আপনি?

কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে?

সে বলিল, তোমার মত আমিও আকাশে উড়ে বেড়াই, ভয় পেও না, আমি অশরীরী। তুমি যখন পেশোয়ার থেকে ওড়ো তখন থেকেই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। পথে তোমার ইঞ্জিনের দুইটি প্লাগ অচল হয়ে গিয়েছিল। আমি দুটোই বদলে দিয়েছি। নেমে দেখলেই বুঝতে পারবে, তাতে লেখা আছে 'হেলেন'। তোমাকে দেখা দেবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আমাদের এমনি স্বভাব যে, আমরা যাকে ভালবাসি, তাকে দেখা না দিয়ে থাকতে পারি নে। এ যাত্রা হয়ত তোমাকে দেখা দিতাম না, যদি না তুমি অজানিতভাবে এমনি করে নিজের সর্বনাশ করতে উদ্যত হতে।

সে থামিতেই আমি বলিলাম, আমার সর্বনাশ কিসে?

সে অনেক কথা, পরে বলব।

বলিলাম, না—এখন বলুন।

সে হাসিয়া কহিল, বলুন কেন, বল। তোমরা মানুষে যেমন কাউকে সহজে আপন করে নিতে পার না, তেমনি কেউ আপন করে নিতে চাইলেও আপন হতে চাও না। আমরা ওরকম নই, আমরা প্রথম দর্শনেই হয় পরম বন্ধু, নয়ত পরম শত্রু হয়ে পড়ি।

বলিলাম, তোমাদের সবই আশ্চর্য।

সে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে যেন বীণা বাজিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিয়া ইচ্ছা হইল কাছে গিয়া বসি। কিন্তু তাহার কোন উপায় নাই, তাহা হইলে এরোপ্লেন চালানো হয় না। অশরীরী আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া কহিল, এস না, কাছে বসতে চাও ত এস। এরোপ্লেন তোমার ইচ্ছানুযায়ী চলতে থাকবে, কিচ্ছু ধরবার দরকার নেই।

বিশ্বাস হইল না, ভাবিলাম বুঝি রসিকতা করিতেছে। কিন্তু পরীক্ষা করিবার জন্য যখন কণ্ট্রোল হইতে হাত ও পা সরাইয়া লইয়া মনে মনে বাঁদিকে ঘুরিবার আদেশ করিলাম, তখন দেখিলাম এরোপ্লেন সত্যসত্যই বাঁদিকে আপনা আপনি ঘুরিতেছে। ঘোরা থামাইয়া সোজা হইয়া জনডিয়ালের ওপর যাইতে আদেশ করিলাম, দেখিলাম তাহাই হইল। ভয় হইল, এই অশরীরীর পাল্লায় পড়িয়া শেষকালে কি নিজের জীবন খোয়াইব।

সে কহিল, না ভয় নেই, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমরা যাকে ভালবাসি তার কোন ক্ষতি করি না।

ভাবিলাম, এ কি বিড়ম্বনা! নিজের কোন কথাই যে এর অগোচর থাকবে না।

কণ্ট্রোলসমূহ ছাড়িয়া নিকটে আসিয়া বসিলাম। প্রথমে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিতে সাহস হইল না। কথা প্রসঙ্গে তাহার দিকে একবার তাকাইয়া দেখিলাম, ঠিক বাঙালীর মত করুণ শান্ত কোমল মুখশ্রী, তখন আরো কাছে গা ঘেঁসিয়া বসিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু আমাকে তাহা করিতে হইল না অশরীরী নিজেই কাছে সরিয়া আসিয়া আমার একটি হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিল, ভয় পাচ্ছ কেন, বলেইছি ত যে, যাকে আমরা ভালবাসি, তার কোন ক্ষতি করি না।

কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাস কেন?

মানুষকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সব মানুষকে?

না, সবাইকে নয়, তাই কি হয়? এই যেমন তোমার মত দুই একজনকে।

আমার মত মানে?

মানে বললে তোমার গর্ব হবে।

না গর্ব হবে না, বল।

অশরীরী কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া বলিতে লাগিল, যারা আকাশে উড়তে পারে, গান করতে পারে বা কবিতা লিখতে পারে, তাদের আমি খুব পছন্দ করি। এই তিনটেই তুমি পার তাই বিশেষ করে তোমাকে ভালবাসি।

কিন্তু আমার মত আরো ত অনেক পাইলট আছে, যারা এমনি পারে, তাদেরও তাহলে তুমি ভালবাস?

মোটেই না, এ রকম লোক পৃথিবীতে খুব বিরল। থাকলেও তাদের প্রথম আমি যাকে ভালবাসি তাকেই যুগ-যুগান্তর অনাদিকাল ধরে ভালবেসে যাই।

শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, তবে বলিলাম, এসব আমাদের দেশের পুরাতন মনোবৃত্তি। ভালবাসা যে চিরকাল একই পর্দায় ঝঙ্কৃত হতে থাকবে, একই লোককে যে চিরদিন ভালবাসতেই হবে, এ আমরা মনে স্থান দিই না। আমাদের দেশের এক বিখ্যাত কবি বলেছেন, "ভালবাসা হ'ল স্নায়বিক পীড়া"। ঠিকমত ওষুধ পড়লেই ও আরোগ্য হয়ে যায়। ভালবাসার সম্বন্ধ বাস্তবতার সুতো দিয়ে বাঁধা। সেই সুতো ছিঁড়লে ভালবাসার অস্তিত্ব থাকে না। বলুন, একথা সত্যি কিনা?

আবার বলুন? বলিয়া আমার হাতখানা তার কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, বার বার ও রকম বলুন বলুন শুনতে ভাল লাগে না।

বলিলাম, ভুল হয়ে গেছে, আর বলব না। আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি কোথায় এখন?

কাশ্মীর হয়ে মানসসরোবর।

মানসসরোবর! অত পেট্রল ত নেই, তা ছাড়া ভোর হবার আগেই আমাকে লাহোর ফিরতে হবে।

পেট্রলের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না, আর লাহোর তোমাকে আমি ভোর হবার আগেই পৌঁছে দোব।

ভাবিয়া কোন লাভ নাই, চুপ করিয়া রহিলাম।

কোথায় আসিয়াছি, ম্যাপ খুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। অশরীরী তার সুন্দর একটি আঙুল দ্বারা দেখাইয়া দিল আমরা কোথায় আছি।

ধীরে ধীরে সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। মহাশূন্যের যাত্রীর ন্যায় আমরা দুটি প্রাণী উড়িয়া চলিয়াছি। মনে হইতে লাগিল, আমার বুঝি আর পৃথিবীর আলো বাতাসে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই, আমি যেন মহাশূন্যে বিলীন হইবার জন্য বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিয়াছি। এ যাত্রার বুঝি শেষ নাই। কেমন হইয়া গেলাম, চোখে জল আসিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া অশরীরীর সঙ্গে কোন কথা হয় নাই। আমাকে সে তার বুকের মধ্যে টানিয়া লইল; কহিল, পৃথিবীর মায়ার এত দুঃখ কিসের? সেখানে তোমার কে আছে যে, তার জন্যে দুঃখ করবে?

তাহার বক্ষ হইতে মাথা তুলিতে গেলাম, কিন্তু সে বাধা দিয়া বলিল, শুয়ে থাক।

অশান্তি বোধ করিতেছিলাম, অতঃপর বলিলাম, সেখানে আমার সবই ছিল একদিন, তাই আমার এত দুঃখ। আমি অনেক হারিয়েছি সেখানে।

তোমার বিয়ে হয়েছে?

হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন আমার নেই।

সে এখন কার?

জানি না। তবে সে আর যারই হোক, আমার নয়।

এবার উঠিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা কত উঁচু দিয়ে উড়ছি?

তিরিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে, বলিয়া তখন আমরা কোন স্থানের উপর রহিয়াছি, ম্যাপে তাহা দেখাইয়া দিয়া পুনরায় বলিল, আমরা এখন এইখানে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি?

হেলেন।

তুমি কে?

অশরীরী।

সে ত জানি। তোমার পূর্ব পুরুষের পরিচয় কি?

এবার আমাকে বিপদে ফেললে। সে কথা বলতে হলে অনেক কথা বলতে হয়, আর আমার সে সব কথা বলাও উচিত নয়।

আমি যদি অনুরোধ করি?

সেই ত হয়েছে কাল, তোমাকেও এড়াতে পারি না, আবার ওদিকে বললেও সম্রাট রাগ করবেন।

সম্রাট কে?

সম্রাট সেলুকাস, অশরীরী রাজ্যের সম্রাট।

সেলুকাস! দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই একই আত্মা।

আর তুমি তার বিখ্যাত কন্যা হেলেন?

হ্যাঁ।

তোমরা ত দুই হাজার বৎসরের বেশী হ'ল মরেছ, কি আশ্চর্য!

তোমরা শুনেছ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল। সে কথা সত্যি নয়। নাট্যকারেরা অমনি লেখে। ইতিহাসের কথা যদি বল, তাহলে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে আমার নাম জড়িত করার মধ্যে আদৌ সত্যি নেই। আমি মনে প্রাণে জড়িত ছিলাম এ্যাণ্টিগোনাসের অধীন জেনারেল নিকোনরের সঙ্গে।

যখন বলতে আরম্ভ করেছি সবই শোন।

আমার মা ছিলেন ম্যাসিডোনীয়ার মেয়ে। আমার জন্মের পর তিনি মারা যান, সেই থেকে আমি বরাবর বাবার কাছেই থাকি। একদিন বাবা সম্রাট আলেকজাণ্ডারের দরবার থেকে ফিরে এসে বললেন, আমরা একমাস পরে ভারতবর্ষ যাচ্ছি হেলেন। পুলকিত হয়ে বললাম, আনন্দের কথা বাবা, আমার শিক্ষকের কাছে ভারতবর্ষের অনেক গল্প শুনেছি। তিনি বলেন, সে দেশে নাকি সোনা ফলে, গাছে গাছে নাকি ডিমের মত বড় বড় মুক্তা ধরে থাকে, লোকে নাকি শুধু দুধ আর ফল খেয়ে বেঁচে থাকে, আর.....

আচ্ছা আচ্ছা, আর বলতে হবে না, একবার গিয়েই দেখে আসি সেখানে কি আছে।

আমি যাবার জন্য জেদ ধরলাম। অতঃপর বাবা আমাকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন।

পথে অনেক যুদ্ধ হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে পেঁছলাম। তারপরে আর এগুতে পারি না। তুমুল যুদ্ধের পর আমরা জিতলাম। অনেক সৈন্য মরল, অনেক ক্ষতি হল আমাদের। একদিন গুরুতররূপে আহত হয়ে নিকোনর সৈন্য-শিবিরে এল। আহত সৈন্যদের সেবার পরিচর্যা কোন কোন সময় আমি করতাম। নিকোনরের কাতর ক্রন্দনে আমি নিজে তার সেবার ভার নিলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় সে শুধু বলছিল, আমাকে মেরে ফেল, বাঁচাবার চেষ্টা করো না, মেরে ফেল, মেরে ফেল, আমি আর বাঁচতে চাই না। কিন্তু আমি তাকে মরতে দিতে চাই নি। এখন ভাবি তাকে মেরে ফেললেই সব চাইতে ভাল হত, তাহলে তার যুগ যুগান্তর ধরে এই বিরহ যাতনা ভোগ করতে হত না। সে শুধু আমাকে কষ্ট দিতেই এসেছিল। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে সে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল আর আমার দিন কাটতে লাগল শুধু তার পথ চেয়ে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একদিন ফিরে এসে আমার হাতে এক তোড়া আগুনী ফুল দিয়ে নিকোনর বলল, তুমি আমাকে সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছ, এই নাও তার প্রতিদান।

আনন্দে আমার চোখে জল এল, কিছু বলতে পারলাম না। নিকোনর জিজ্ঞাসা করল, কিছু বললে না?

বলব কি, কিছুই তুমি বুঝতে পার না?

পারি, বলে সে আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিল। তার কাছ থেকে পাওয়া সেই আমার প্রথম ও শেষ আদর-সম্ভাষণ।

তাহাকে থামাইয়া বলিলাম, এই যে তুমি বললে আমাকেই নাকি তুমি প্রথম ভালবাসলে, সে কথা ত সত্যি নয়, নিকোনরকেই ত তুমি প্রথম ভালবেসেছিলে।

নিকোনরকে আমি মনুষ্যজীবনে ভালবেসেছিলাম, আর তোমাকে আমি ভালবেসেছি আমার অশরীরী জীবনে। অশরীরী জীবনে আমাদের একজনকে ভালবাসবার অধিকার আছে এবং এ জীবনে আমাদের বিরহ যাতনা ভোগ করতে হয় না। এ জীবনের ভালবাসা চিরন্তন। পার্থিব ভালবাসা অপূর্ণ রয়ে গেলে আত্মা অনন্তকাল ধরে সেই অপূর্ণতার যাতনা ভোগ করে, অস্থির হয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়ায়। আমি কি মনে কর স্থির হয়ে থাকি? মানস সরোবরের ওপর আমাদের রাজধানী, কিন্তু আমি আমার ব্যর্থ কামনা নিয়ে আকাশ পাতাল মর্ত ওলট পালট করে বেড়াই। আমি দিনরাত্রি নিকোনরের আত্মাকে খুঁজে ফিরি। কিন্তু গত দুই হাজার বৎসরের মধ্যেও তার খোঁজ পেলাম না, কোনো দিন পাবও না। শুনেছি সে নাকি আলেকজাণ্ডারের রাজত্ব ভিনাসে বাস করে। সেখানে আমাদের যাবার ক্ষমতা নেই।

বলিলাম, আমাকে ভালবেসে তোমার কি লাভ হল, তোমার আত্মা কি এতে শান্ত হতে পারবে?

সে বলিল, সম্পূর্ণ কোনদিনও হবে না তবে অনেকটা হবে। তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ, তুমি যেন আমাকে কোনদিন ভয় না কর, তাহলে আমার বিরহ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। এত যাতনার উপর তাতে আরো বিড়ম্বনা বাড়বে। যাক, যা বলছিলাম বলি। নিকোনর তারপর আবার যুদ্ধ করতে চলে গেল। একদিন বাবার কাছে খবর পেলাম সে যুদ্ধে মারা গিয়েছে। এই সময় রাজা পুরুর সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছিল। রাজা অম্ভি এর পূর্বে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করেছে। নিকোনরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি অন্তরে যে ব্যথা পেলাম সে ব্যথা আজও আমার সারল না।

দেখিলাম তাহার চোখে জল আসিয়াছে, সে বলিতে লাগিল: কিছুদিনের মধ্যে রাজা পুরু হেরে গেল এবং আমরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করলাম। বীর মাউণ্ড বলে যে জায়গাটা দেখছ ঐখানে আমরা সর্বপ্রথম নগর স্থাপন করি, সিরকাপ পরবর্তীকালে তৈরী হয়েছিল।

বিজেতা হয়ে আমরা বেশীদিন টিকতে পারলাম না, প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেরে গেলাম। কেউ কেউ ম্যাসিডোনীয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হল, কিন্তু অনেকে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে রয়ে গেল এবং তারাই পরবর্তীকালে ভারতে গ্রীক সভ্যতার ছাপ রেখে গেছে। গান্ধার শিল্পকলাতেই তার পরিচয় পেয়েছ।

সিরকাপ শহর যখন গড়ে ওঠে তখন আমি বেঁচে নেই। এই শহর তৈরীর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। কথিত আছে শহরের মাঝখানে যেখানে গ্রীক মন্দির আছে সেই জায়গায় নাকি আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পুরুর সাক্ষাৎ হয়। স্তম্ভের পরিবর্তে আমাদের মধ্যে সেকালে মন্দির গড়বার রীতি ছিল। স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মন্দির তৈরী করা হয়, কালক্রমে এই মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে একটি মস্ত গ্রীক শহর গড়ে ওঠে।

জউলিয়ানে যে মঠ দেখেছ সেটি আমাদের তৈরী নয়, ওটা তৈরী করে বৌদ্ধরা—আমাদের অনেক পরে।

সিরকাপ আমাদের স্থাপত্য শিল্পের এক অতুলনীয় কীর্তি। তোমরা শুধু এ শহরের প্ল্যান দেখেই চমৎকৃত হও, সেকালের পক্ষে আরো যে কত চমকপ্রদ জিনিস ছিল সে সব ত তোমরা কিছু জান না। শহরের প্রত্যেক বাড়িতে পায়খানার ঢাকা নর্দমার এমন ব্যবস্থা ছিল যে, মলমূত্র একজাতীয় তরল পদার্থের সঙ্গে মিশে সম্পূর্ণ তরল আকারে প্রবাহিত হয়ে শহর থেকে তিন মাইল দূরে একস্থানে গিয়ে আপনা আপনি শুকিয়ে যেত। সেগুলি আবার জমীর সারের জন্য ব্যবহার করা হত। জল সরবরাহের জন্যও সুবন্দোবস্ত ছিল। একটি বিরাট ইন্দারা থেকে হাতী দিয়ে জল তুলে বড় বড় জালায় তা ফোটান হত। যে বাষ্প নির্গত হত তা পুনরায় তরল করে তবে সেই নির্মল জল মাটির তৈরী নলের সাহায্যে সবার বাড়িতে সরবরাহ করা হত।

তার কথা শুনিতে শুনিতে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। সে বলিল, ঘুমোতে ইচ্ছে হয় ত তুমি ঘুমোও।

তাহাই করিলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম জানি না। বজ্রের মত কড় কড় শব্দে উঠিয়া পড়িলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। পাশে কেহ নাই, সামনে ঘূর্ণায়মান প্রপেলারের চারিপাশ দিয়া বিদ্যুতের চক্র ঘুরিতেছে, এবং চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। মনে হইল বিদ্যুৎবাণ ছুঁড়িয়া কাহারা যেন আমার এরোপ্লেনটিকে আক্রমণ করিতেছে। ক্ষণকাল পরে একবার এরোপ্লেনখানা প্রবলবেগে কাঁপিয়া উঠিল এবং পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম একটি বিকট মূর্তি জানালার বাহিরে আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। শরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিতে লাগিল। পরক্ষণে দেখিলাম দূর হইতে একটি ছোট গোলাকৃতি আলো ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া আমার দিকে আসিতেছে। কাছে আসিলে দেখিলাম চাঁদের মত আলোকিত গোল একটি জিনিসের মধ্যে উপবিষ্ট হেলেন, এবং তার পাশে রাজকীয় বেশে তারকা সমুজ্জ্বল অলংকার পরিহিত এক বৃদ্ধ। আর তার পশ্চাতে যতদূর দৃষ্টি যায় আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে ও সেই আলোতে একটি শুভ্র ওড়না উড়িতেছে। ভয় তিরোহিত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিতেছি, শুনিতে পাইলাম কে যেন ঘোষণা করিতেছে, ধরিত্রীর অশরীরী রাজ্যের নৃপতি—সম্রাট সন্দ্রর সেলুকাস ও তাঁহার কন্যা হেলেন। এরোপ্লেনের নিকটবর্তী

আসিয়া চাঁদটি স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুৎ আসিল, সব শান্ত হইল। জানলার কাছে যে বিকট মূর্তি এতক্ষণ হাসিতেছিল, তাহার দিকে সম্রাটের দৃষ্টি পড়িতে সে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সম্রাট তাহাকে হস্ত দ্বারা ইশারা করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম দুইজন বিদ্যুৎ সজ্জিত যোদ্ধা তাহাকে লইয়া শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। পরে হেলেনের কাছে শুনিয়াছিলাম যে, সে আমাকে ভয় দেখাইতেছিল বলিয়া সম্রাট তাহাকে পৃথিবীতে নির্বাসন দিয়াছেন।

চন্দ্রাসন হইতে হেলেন নামিয়া পুনরায় এরোপ্লেনে আসিয়া আমার পাশে বসিল এবং পিতাকে অভিবাদন করিতে সেলুকাস হাসিমুখে প্রতিনমস্কার জানাইলেন। ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র চাঁদটি যেমন আসিয়াছিল তেমনি দূরে সরিতে সরিতে একেবারে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। হেলেন কহিল, ভয় পেয়েছিলে?

এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, হেলেনের কথায় সম্বিত পাইয়া কহিলাম, কি ভীষণ দৃশ্য! এবার দয়া করে আমাকে মাটির পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

সে কহিল, বেশ চল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ এসব কি হচ্ছিল?

মানস সরোবরের উপর আমাদের রাজধানীতে মানুষের সঙ্গে প্রবেশ করছিলাম বলে অশরীরীরা আমাকে বাধা দিচ্ছিল। আমি সেই কারণে আমার পিতাকে ডাকতে গিয়েছিলাম।

এতক্ষণে নীচে শহরের আলো দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আমরা শ্রীনগরের ওপর আসিয়াছি। রাত্রি তখন দুই প্রহর হইয়াছে। একে একে রাওয়ালপিণ্ডি, বোলাম প্রভৃতি শহর পার হইয়া লাহোরের নিকট আসিয়াছি। প্রবল ঝড় বৃষ্টির পরে পাখীরা যেমন ধীরে ধীরে আপন নীড়ে ফিরিয়া আসে, নিস্তব্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে আবার যেমন স্বাভাবিক জীবন স্পন্দিত হইতে থাকে, আমারও সেইরূপ মনে হইতেছিল। ভোর হইতে আর দেরী নাই বহু দূরে শহরের নিষ্প্রভ আলো দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কোথা হইতে ভইরোঁ সুরে বীণার ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। মনে হইল সে সুর যেন সুপ্ত পৃথিবীকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

হেলেন আমার হাত ধরিয়া কহিল, এবার তোমাকে পাইলটের জায়গায় গিয়ে বসে চালাতে হবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি যাবে এখন?

আমার ত আর সময় নেই, আর কিছুক্ষণ পরেই আকাশ ফর্সা হয়ে যাবে, তার পূর্বেই আমাকে তোমার সংস্পর্শ থেকে সরে যেতে হবে।

তুমি আর আসবে না কোনো দিন?

তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর কোনো দিন আমার দেখা হবে না।

তবে কেন শুধু এক রাত্রির জন্যে আমার কাছে এলে?

আমার আত্মার মুক্তির জন্য। এখন আমি নিকোনরের ধ্যানে শান্তিতে কালাতিপাত করতে পারব, তার জন্য আমার আর কোন বিরহ ব্যথা ভোগ করতে হবে না।

হেলেনের নির্দেশ অনুযায়ী সামনের সীটে যাইয়া বসিলাম। এবার অনুভব করিলাম, এরোপ্লেন আর নিজের ইচ্ছা মত চলিতেছে না। হেলেন আমার একটি হাত ধরিয়া কহিল, চললাম বন্ধু, বিদায়। বলিয়া সে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

ধরিতে গেলাম, পারিলাম না। আমার হাত পা অসাড় হইয়া গেল। শুধু 'হেলেন' 'হেলেন' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলাম। কোন উত্তর আসিল না। কাহার প্রবল আকর্ষণে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিলাম আমি ফ্লাইং ক্লাবে একটি কোচে শুইয়া আছি এবং আমার এক বন্ধু আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন রৌদ্র উঠিয়াছে, ক্ষণকাল পরে স্মরণ হইল গত রাত্রি ফ্লাইং ক্লাবে কিছুটা বহুল পরিমাণে হুইস্কী টানিবার ফলে ক্লাব গৃহেই একটি কোচে শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তার পরেই এই সমস্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু তবুও বিশ্বাস হইল না। উঠিয়া এরোপ্লেনটি পরিদর্শন করিতে যাইয়া দেখিলাম সত্য সত্যই এঞ্জিনের দুইটি প্লাগে 'হেলেন' লেখা রহিয়াছে। তখন মনে পড়িল গতকল্য 'হেলেন' নামে দুইটি নতুন স্পার্কিং প্লাগ লাগান হইয়াছে।
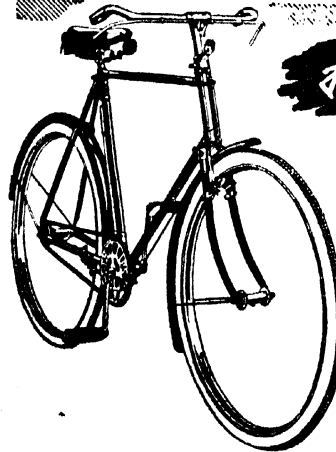
আবুল ফজল

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী পি-এইচ-ডি

আবুল ফজলের নাম যে দুইটি কারণে আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত, তন্মধ্যে একটি হল তাঁর উদার ধর্মমত ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা এবং দ্বিতীয়টি হল তাঁর ইতিহাস রচনায় অসাধারণ নৈপুণ্য—যাহা ঐযুগে উত্তর ভারতে ইহার পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। সে যুগে সাধারণতঃ যে ভাবধারায় ও আদর্শে ইতিহাস লেখা হত তাঁর লিখিত ইতিহাস সে আদর্শ হতে অনেক পৃথক এবং যদিও এই কয় শতাব্দীর ভিতরে ইতিহাস লেখার প্রণালীর বহু পরিবর্তন হয়েছে তা সত্ত্বেও আবুল ফজলের ইতিহাস এই যুগেও ইতিহাস ও সাহিত্যরূপে আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। যে দুটি পুস্তক রচনা করে তিনি ঐতিহাসিকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, সে দুটি হচ্ছে—আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরি। আকবরনামা হচ্ছে আকবরের রাজত্বের ধারাবাহিক ঘটনার বর্ণনা, যথা, দেশ বিজয়, রাজ্যবিস্তার, ও রাজ্যশাসন প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, এবং আইন-ই-আকবরি হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন পরগণা, ফৌজদারি এবং সুবা প্রভৃতির রাজস্বের হিসাব, কোন্ স্থানে কি কি রকমের ফসল হত তার বর্ণনা এবং কোন্ রাজকর্মচারীর কি কর্তব্য প্রভৃতি শাসন সংক্রান্ত অনেক বিষয়ের বিশদ বিবরণ—যাহার সাহায্যে আমরা আকবরের সময়ের মুঘল সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তের নানাপ্রকার তথ্য অতি সুন্দরভাবে জানতে পারি। ভারতে মুসলমান রাজত্বের আমলে, অর্থাৎ পাঠান যুগ হতে শুরু করে আকবরের সময় পর্যন্ত অনেক পুরাতন ইতিহাস আমরা পড়বার সুযোগ পাই, কিন্তু আইন-ই-আকবরির মতন এত বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ এর পূর্বে আমরা দেখতে পাই না। অতীত যুগের অনেক জিনিস কালের জীর্ণ প্রবাহে চিরকালের জন্য মুছে গেছে, কিন্তু যেগুলি বাস্তবিক মহা মূল্যবান তা কালের স্রোত প্রতিরোধ করেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—আইন-ই-আকবরি তাদের মধ্যে অন্যতম।

লেখক হিসাবে যে আবুল ফজলের দোষ ত্রুটি নাই সে কথা বলা যায় না। কোন কোন স্থানে তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতির পরিচয় আমরা পাই এবং কোন কোন স্থানে আকবরের সম্বন্ধে এত অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেখা যায় যা থেকে সত্য ঘটনা বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এই সব সত্ত্বেও তিনি যেসব মহা মূল্যবান তথ্যের পরিচয় পাঠকের কাছে দিয়েছেন তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কাজেই ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি আমাদের নিকটে চিরকালই সমাদৃত হবেন।

তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৫৫১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী। তিনি ছিলেন শেখ মোবারকের দ্বিতীয় পুত্র, তাঁর অগ্রজ শেখ ফৈজি পরে সম্রাটের সভায় রাজকবি হয়েছিলেন। শেখ

আবুল ফজল

মোবারক নিজে মহাপণ্ডিত, জ্ঞানী ও ধর্মভীরু লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি সংকীর্ণমনা ছিলেন না, মনের উদারতার যথেষ্ট পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

মোবারক তাঁর পুত্রদের সময়োপযোগী সর্বপ্রকার শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই দুই পুত্রই ভবিষ্যৎ জীবনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পনেরো বৎসর বয়সের মধ্যেই আবুল ফজল সর্ববিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যখন তাঁর বয়স কুড়ি বৎসরেরও কম তখন উইয়ে কাটা কোন ধর্মসংক্রান্ত মূল্যবান পুস্তক তাঁর হাতে পড়েছিল। উহা এত খারাপভাবে নষ্ট হয়েছিল যে পঙক্তিগুলি পড়া-ত দূরের কথা এমন কি ভাবার্থ বের করাও অসম্ভব ছিল। তিনি এই জীর্ণ-ছিন্ন-গ্রন্থের লুপ্ত স্থানগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হলেন এবং যতটা সময়ের প্রয়োজন তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই লুপ্ত অংশগুলি পূরণ করলেন। কিছুদিন পরে যখন ঐ পুস্তকের অপর একটি নকল পাওয়া গেল তখন উহার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল তাঁর পূরণকরা অংশগুলি প্রায় সবই ঠিক হয়েছে, তিন চার যায়গাতে যা একটু তফাৎ হয়েছে তাতে অর্থের কোনও প্রভেদ হয় না।

তাঁর এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখে সকলে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল এবং এর পরে সৌরভময় পুষ্পের ন্যায় তাঁর জ্ঞানের সুগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি নির্জনে পড়াশুনা করতেই ভালবাসতেন এবং চারিদিকের কোলাহল ও গোলমাল হতে সব সময়ে দূরে দূরে থাকতেন। স্বাধীনভাবে নির্জনে জীবনযাপন করাই ছিল সেই সময়ে তাঁর অন্তরের বাসনা। অর্থ উপার্জনের জন্য চাকুরীর বা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণও ছিল না এবং তার জন্য তিনি কোন চেষ্টাও করতেন না। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর এই মতের অনেক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই।

তেইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বন্ধুদের অনুরোধে তিনি প্রথম আকবরের সঙ্গে দেখা করার জন্য ফতেপুর সিক্রিতে যান; সম্রাট তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তিনি সম্রাটকে স্বরচিত একটি কবিতা উপহার দেন। কিন্তু ঐ সময়ে আকবর বিহার ও বাঙলায় যুদ্ধাভিযানের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় আবুল ফজলের তেমন সুবিধা হল না, কাজেই তিনি সেবারের মত ফিরে এলেন।

সম্রাট বিহার হতে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি আবার তাঁর কাছে গেলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ নানাস্থান হতে আবুল ফজলের প্রশংসা শুনতে পেয়েছিলেন, সুতরাং দ্বিতীয়বার তাঁর রাজদরবারে আগমনে সম্রাট যারপরনাই আনন্দিত হলেন এবং তখন হতে নানাপ্রকার রাজানুগ্রহ তাঁর উপরে বর্ষিত হতে লাগল। এইরূপে তাঁর জীবনের গতি ও কর্মধারারও পরিবর্তন হয়। এখন আর তিনি নির্জনে শুধু পড়াশুনা করেই কাটাতে পারতেন না, পড়াশুনা ছাড়াও তাঁর এখন বহু কাজে মনোযোগ দিতে হত। তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও অসামান্য প্রতিভায় আকবর খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মনুষ্যচরিত্র বুঝবার শক্তি এবং গুণীর প্রতি উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শন আকবরের যেমন ছিল তেমন খুব কম লোকেরই দেখা যায়।

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলকেই সমভাবে দেখতেন এবং তাঁর স্নেহের বন্ধনে যে বহু গুণী ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাই তা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি দুর্লভ। রাজ-দরবারে আবুল ফজলের ক্ষমতা ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং একের পর এক তিনি উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে লাগলেন। কিছু-দিনের মধ্যে তিনি এক সহস্র সৈন্যের সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন, পরে দুই সহস্র এবং এর পরে চার সহস্র সৈন্যের সেনাধ্যক্ষের পদ লাভ করলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজ্যের সকল রাজকর্মচারী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন।

রাজদরবারে নবরত্নের ভিতরে যে কয়জন সম্রাটের বেশী প্রিয়পাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল ও রাজা বীরবল অগ্রগণ্য। যতদূর সম্ভব উভয়কেই আকবর তাঁর কাছে কাছে রাখতেন এবং প্রায় সকল কার্যেই তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। সম্রাটের নির্মিত ফতেপুর সিক্রিতে আবুল ফজল ও রাজা বীরবলের প্রাসাদ দেখলে বেশ বোঝা যায় তিনি উভয়কে কত ভালবাসতেন এবং উভয়কে কাছে রাখার কিরূপ বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই অট্টালিকাগুলি অদ্যাপি ফতেপুর সিক্রিতে বিদ্যমান।

আকবরের মত উদারচেতা ও মহানুভব ব্যক্তি সেকালে আর দেখা যায় না। আবুল ফজল ও রাজা বীরবলও উদারচেতা ও বিভিন্ন ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁরা কোন সংকীর্ণ গণ্ডি বা সীমার মধ্যে থাকা পছন্দ করতেন না এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের প্রতি যাতে প্রীতি ও ভালবাসা বজায় থাকে তার জন্য উভয়ে সম্রাটকে যথাসাধ্য সহায়তা করেছেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ে দীন ইলাহি নামে যে ধর্মের প্রবর্তন আকবর করেছিলেন তাতেও উভয়ে সম্রাটকে প্রাণপণ সাহায্য করেছেন। কেহ কেহ মনে করেন দীনইলাহি (The Religion of God) প্রবর্তনের জন্য তাঁরা উভয়ে দায়ী, কিন্তু যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে বাল্যকাল হতে আকবরের শিক্ষা ও মনের ভাব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করি তা হলে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি ঐ ধর্মমত তাঁর নিজস্ব, অবশ্য তাঁরা উভয়ে এই মহৎ কার্যে তাঁকে সহায়তা করেছেন। সম্রাটের এই মহান প্রচেষ্টা যে কতবড় আদর্শের নিদর্শন তা সেই সময়ের ধর্মকলহরত পাশ্চাত্য দেশের কথা ভাবলে আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়। তাঁর সময়ে ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সুন্দর নব পরিবেশ রচনা হয়েছিল ভারত গগনে এই নব জ্যোতিষ্কেরই আবির্ভাবে, কিন্তু আবার তাঁর অন্তর্ধানে ধীরে ধীরে অন্ধকার ভারতকে আচ্ছাদিত করল, তা না হলে আজ আমরা এখানে দেখতে পেতাম মেঘমুক্ত আকাশ।

সম্রাটের আবুল ফজল ও বীরবলের প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও ভালবাসার ফলে তাঁরা রাজদরবারের অনেকের হিংসা, দ্বেষ ও বিরাগ-ভাজনের কারণ হয়েছিলেন। হিংসা বা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ বা কুৎসা রটনা করতেও দ্বিধাবোধ করত না। অপরের কথা কেন এমন কি, রাজকুমার সেলিম (পরে সম্রাট জাহাংগীর) পর্যন্ত আবুল ফজলের সম্রাটের উপরে এইরূপ আধিপত্য অত্যন্ত বিষ চক্ষে দেখতেন। ইহাই শেষ পর্যন্ত আবুল ফজলের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাজত্বের শেষভাগে সম্রাট দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সংকল্প করেন এবং এই উদ্দেশ্যে রাজকুমার মুরাদকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজকুমার কর্তৃক ঐ কার্য বিশেষ ফলবতী না হওয়ায় সম্রাট আবুল ফজলকে ঐ স্থানে প্রেরণ করলেন এবং এমন কি তিনি নিজেও কিছুকালের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেছিলেন।

মুঘল সেনা দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি স্থান অধিকার করতে সমর্থ হল, কিন্তু এই কার্যের সম্পূর্ণরূপে সমাধা না হবার পূর্বেই আবুল ফজল আকবরের নিকট হতে খবর পেলেন রাজকুমার সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য। আবুল ফজল মনে করলেন এর জন্য রাজকুমারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন এবং তিনি সম্রাটকে জানালেন যে তিনি সেলিমকে সংযত করে রাজদরবারে আসতে বাধ্য করবেন। কয়েকজন পার্শ্বচর সঙ্গে নিয়ে তিনি অনতিবিলম্বে হিন্দুস্থানের অভিমুখে রওনা হলেন।

অপর দিকে যখন রাজকুমার সেলিম শুনতে পেলেন আবুল ফজল তাঁর পিতার সাহায্যের জন্য রওনা হয়েছেন তখন তিনি স্থির করলেন, যে রকম করেই হোক উভয়কে কিছুতেই একত্রিত হতে দেওয়া হবে না। বীরসিংহ বুন্দেলা নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন আবুল ফজলকে পথিমধ্যে হত্যা করার জন্য। এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ তাঁর কানেও পৌঁছেছিল, তবুও তিনি কোন কথায় কর্ণপাত না করে নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করে ঐ বিপদসংকুল পথে অগ্রসর হতে লাগলেন, কিন্তু একদিন হঠাৎ বীরসিংহ দলবলসহ তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করল। (১২ই আগস্ট, ১৬০২ খৃষ্টাব্দ)।

সম্রাটের নিকটে যখন এই মর্মন্তুদ সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন, এমন কি তিনদিন পর্যন্ত তিনি কোন রাজকার্য পরিচালনা করতে সমর্থ হননি। আবুল ফজলকে তিনি নিজের পুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করতেন, কাজেই বৃদ্ধ বয়সে এই নিদারুণ ব্যথা তিনি আর ভুলতে পারেননি এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই দুঃসহ বেদনা হৃদয়ে বহন করেছেন।

* * *

আবুল ফজল ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই সত্য। কিন্তু পরে সম্রাটের আনুকূল্যে তাঁর অর্থ সমাগম হয়েছিল প্রচুর, তা হলেও ঐশ্বর্যের গরিমায় তিনি কখনও নিজের কর্তব্যজ্ঞান হারাননি। তাঁর মন সব সময়ে ছিল উন্নত ও উদার, গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাধ্য মতন সাহায্য করতে তিনি কখনও ভুলেননি। কথিত আছে নববর্ষের দিনে তাঁর পরিধানে পায়জামা ভিন্ন সমস্ত কাপড় ইত্যাদি তিনি দরিদ্রদিগকে দান করতেন।

কারও প্রতি তিনি কখনো খারাপ ব্যবহার করতেন না, এমন কি তাঁর ভৃত্যদের মধ্যে কেউ খারাপ কাজ করলেও তিনি তাকে কর্মচ্যুত করতেন না, কারণ তিনি বলতেন, "যদি আমি ঐরূপ করি তাহলে লোকে মনে করবে আমার বুদ্ধি কম এবং বলবে লোকটি কি রকম তা না জেনে কেন তাকে নিযুক্ত করা হল?"

কথিত আছে, যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে অভিযানে গিয়েছিলেন তখন তিনি এক রকম বাদশাহদের মতন খুব জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সঙ্গে বাস করতেন এবং প্রতিদিন এক সহস্র অধীন রাজকর্মচারীকে ভোজ দিতেন, কিন্তু তাই বলে তিনি গরীবদের ভুলে যাননি; উপরোক্ত সংখ্যক রাজকর্মচারী ও ধনী ব্যক্তি ছাড়াও অনেক গরীব লোকদিগকেও তিনি প্রত্যহ সমস্ত দিন ধরে খিচুড়ী খাওয়াতেন।

তিনি নিজে খুব খেতে পারতেন এবং প্রবাদ আছে তিনি প্রতিদিন প্রায় পনেরো সের ওজন পরিমাণ আহার করতেন। তাঁর পুত্র শেখ আবদুর রহমান তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসতেন। রন্ধনশালার তত্ত্বাবধায়ক দাঁড়িয়ে তাঁদের খাবার তদারক করত। যে খাবারটি আবুল ফজল দুইবার হাত বাড়িয়ে নিতেন সেই রকম খাদ্য পরদিন আবার রান্না করা হত, কারণ ঐরূপ আগ্রহের সহিত তিনি খাবার নিলে বোঝা যেত তাঁর ঐ খাবারটি ভাল লেগেছে। কিন্তু তিনি এত বিনয়ী ও নম্রস্বভাবের ছিলেন যে, কোন খাদ্যের রন্ধন ভাল না হলেও তিনি মুখে অপ্রিয় কথা বলতে পারতেন না। যে খাবারটি তাঁর অপছন্দ হত সেটি তিনি তাঁর পুত্রকে খেতে দিতেন, পুত্র উহা খেয়ে বাবুর্চিদিগকে ভবিষ্যতে ভাল করে রান্না করার জন্য সাবধান করে দিতেন।

পাকিস্থান রাষ্ট্রে ভারত-রাষ্ট্রের হাই-কমিশনার শ্রীশ্রীপ্রকাশ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সচিবসঙ্ঘের অধিকাংশ সচিব এবং কেন্দ্রী সরকারের বাঙালী মন্ত্রিদ্বয় যাহা করেন নাই, তিনি তাহা করিয়াছিলেন—শিয়ালদহ স্টেশনে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পূর্ব-বাঙলা হইতে আগত বাস্তুত্যাগীদের দুর্দশা দেখিয়াছিলেন, তাহাদিগের বিবরণ শুনিয়াছিলেন। একান্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব আসামে তাঁহার অন্যতম ব্যবসা-কেন্দ্র শিলংএ এবং রাজস্ব সচিব রাঁচীতে ছিলেন। অর্থসচিব রোগশয্যায়। শ্রমসচিব বোধ হয় য়ুরোপ যাত্রার আয়োজন করিতে ও সরবরাহ সচিব প্রভৃতি অন্য কারণে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রকাশ অগত্যা পুলিশ বিভাগের সচিবের ও মৎস্য বিভাগের সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি এক সম্বর্ধনা-সম্মেলনে বলিয়াছিলেন, তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাঁহাকে যেন আর তাহা দেখিতে ও শুনিতে না হয়। তাঁহার কয়টি বিবৃতি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, যদিও তিনি সমগ্র পাকিস্থান রাষ্ট্রে ভারতের প্রতিনিধি এবং পূর্ব-পাকিস্থান পাকিস্থানের অংশ মাত্র, তথাপি পূর্ব-পাকিস্থানে হিন্দু-সমস্যার স্বরূপ তিনি পূর্বে অবগত ছিলেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম পর্বে পূর্ববঙ্গ ত্যাগী সমস্যার বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান নাই; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বেও তাঁহার গুরুত্ব সম্যকরূপে জানান নাই। আর কেন্দ্রী সরকারে যে দুইজন বাঙালী মন্ত্রী আছেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিলেও সে সমস্যার প্রকৃত রূপ শিয়ালদহে দেখেন নাই। বাঙলাকে বিভক্ত করিবার জন্য প্রচারকার্য পরিচালন কালে তাঁহাদিগের একজন—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন—পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদিগের জন্য "হোম ল্যাণ্ড" রচনা করিবেন। শিয়ালদহ স্টেশনে যাইলে সেই প্রতিশ্রুতির ব্যর্থতা তাঁহাকে ব্যথিত করিবে বলিয়াই কি তিনি তথায় গমন করেন নাই? প্রতিদিন সহস্রাধিক নরনারী শিয়ালদহে আসিতেছে—তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থা নাই। সেই স্টেশন প্ল্যাটফর্মে শিশু প্রসূত হইতেছে—মরিতেছে, লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়া ব্যাধি-বিষ বিসর্পিত করিতেছে। তাহাদিগের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থাই নাই—আহার ত পরের কথা। শ্রীশ্রীপ্রকাশ তথায় যে সকল স্বেচ্ছাসেবক কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়াছেন—কিন্তু সরকারের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, পাকিস্থানে সরকারের ব্যবস্থার ফলে হিন্দুদিগের পক্ষে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ অনিবার্য। সেই সরকারের ব্যবস্থার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন—যশোহরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট যশোহরের সর্বজনপ্রিয় ডক্টর জীবনরতন ধরকে ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদারকে গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা জারি করিয়াছেন—তাঁহাদিগের গৃহ হইতে অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া বাড়ি দুটি তালাবন্ধ করা হইয়াছে। আর ভূতপূর্ব জিলা ইঞ্জিনীয়ার শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষের, উকীল শ্রীপ্রফুল্লকুমার মজুমদারের ও মহকুমা সরবরাহ কর্মচারী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ অধিকারীর গৃহে খানাতল্লাসী হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি, ইঁহাদিগের কাহারও কাহারও সম্বন্ধে অভিযোগ—ইঁহারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করিয়াছেন! জীবনরতনবাবু, সুরেন্দ্রনাথবাবু ও ক্ষিতিনাথবাবু প্রমুখ ব্যক্তিরা যশোহরে থাকায় যশোহরের হিন্দুদিগের মনে যে কিছু সাহস ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। স্যার উইলিয়াম হার্কোর্ট একবার বিলাতের হাউস অব কমন্সে—মণিপুরের ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, আজ কি পূর্ব-পাকিস্থানে সেই কথাই স্মরণ করিতে হইবে?

"Although in these days they did not cut off the heads of the tall poppies, they took other and more merciful means of removing any person of dangerous political pre-eminence to a harmless condition."

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, মুসলমান রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্থানে বাস হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে:

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র বলিয়াছেন, যদি পূর্ববঙ্গ হইতে আর এক লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আগমন করে, তাহা হইলেই পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইবে। কিন্তু যেরূপ অবিরাম স্রোতে পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা আসিতেছেন, তাহাতে অল্প-দিনেই আরও এক লক্ষ লোক আসিবেন। তাহা নিবারণ করা যাইবে না।

শ্রীসন্তোষকুমার বসু পূর্ব-পাকিস্থানে ভারত-রাষ্ট্রের ডেপুটি হাই-কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে পাকিস্থান সরকারের ও পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাইতে পারিবেন—ইন্দ্রজাল দেখাইতে পারিবেন, এমন মনে হয় না। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি। কিন্তু আমরা আশা করি, তিনি যখনই বুঝিবেন, পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা মুসলমানের সহিত তুল্যাধিকার পাইবেন না—তখনই যেন সে কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া পদত্যাগ করেন। যাঁহারা বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠন করিতে না পারিলে তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন, তিনি যেন তাঁহাদিগের পরবর্তী কার্যের অনুসরণ না করেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগের আগমন অতর্কিত বা অপ্রত্যাশিত নহে। বাঙলা বিভাগের প্রায় এক বৎসর পূর্ব হইতেই তাহা আরম্ভ হইয়াছিল—নোয়াখালিতে ও ত্রিপুরায় হিন্দুর প্রতি দারুণ দুর্ব্যবহার হইতে তাহার আরম্ভ। তখনই আচার্য কৃপালনী বিবৃতি দিয়াছিলেন—মুসলমানেরা "লড়কে ও মারকে" পাকিস্থান লইবার সংকল্প করিয়া যখন আয়োজনে ব্যাপৃত ছিল, তখনও মুসলিম লীগ সরকারের মুসলমান কর্মচারীরা তাহাতে বাধা দেন নাই; কেহ কেহ সক্রিয়ভাবে তাহাদিগের কার্যের সমর্থনও করিয়াছিলেন। তাহার পরে পাকিস্থান সৃষ্ট হইয়াছে। তথায় হিন্দুর অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেন্দ্রী সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন হিন্দু মহাসভার প্রত্যক্ষ নেতা। তিনি স্বয়ং পূর্ববঙ্গে যাইয়া তথায় হিন্দুদিগের দুর্দশা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন এবং হয়ত সেই জন্যই বাঙলা বিভক্ত করিয়া পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের বিপন্ন হিন্দুদিগের "হোম ল্যাণ্ড" রচনার কথা বলিয়াছিলেন। তিনি এই সকল বিপন্ন হিন্দুর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন, এ আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

পূর্ববঙ্গে চাউলের মূল্য বৃদ্ধিতে মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহও যে পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন, তাহা দেখা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পূর্ববঙ্গের লোক। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, পূর্ব-পাকিস্থান সরকারের উক্তিতে আন্তরিকতা নাই।—তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। এই অবস্থায় যে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা বর্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

দেশের কোন পাঠিকা যুক্তপ্রদেশের কোন নগর হইতে লিখিয়াছেন—গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর কেন্দ্রী সরকারের 'গেজেটে' যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, পূর্ব পাঞ্জাবে (অর্থাৎ হিন্দুস্থান পাঞ্জাবে) ও যুক্তপ্রদেশে বাঙালীদিগকে 'তপশীলভুক্ত' বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। ইহার অর্থ কি? যদি ইহার অর্থ এই হয় যে, এই প্রদেশদ্বয়ে

বাঙালীদিগকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সরকারী চাকরী দেওয়া হইবে, তবে তাহাতেও আমাদিগের আপত্তি আছে, কেননা—সরকারী চাকরীতে যোগ্যতাই চাকরীর দাবী বলিয়া বিবেচিত হওয়া সংগত। আর যদি ইহার অর্থ এই হয় যে, বাঙালীরা "অনুন্নত" বলিয়া বিবেচিত হইবে, তবে জিজ্ঞাস্য—পশ্চিমবঙ্গে পাঞ্জাবী, পশ্চিমা প্রভৃতি কি ঐ পর্যায়ভুক্ত হইবে?

আমরা এবিষয়ে কেন্দ্রী সরকারের বিবৃতির অপেক্ষায় রহিলাম। আশা করি, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙালী সদস্যরা এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন ও আমাদিগের সংশয় দূর করিবেন।

শিলংএ যাইয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়াছেন। প্রাদেশিকতা যে জাতীয়তার বিরোধী এবং ভারত-রাষ্ট্রের উন্নতির পথে অন্তরায় তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত কোন প্রদেশের সরকার কি প্রাদেশিকতা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন? আসামে "বঙাল খেদা" আন্দোলন হয়ত তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে না, কিন্তু সেই আন্দোলনের ফলে অসমীয়াদিগের আক্রমণে বাঙালীর মৃত্যুর বিষয় তিনি অবশ্যই অবগত আছেন।

উড়িষ্যায় বাঙালীদিগের প্রতি অনাচারী-দিগের বিরুদ্ধে মামলায় যে সরকারী কর্মচারী দিগকেও (অবশ্য উড়িয়া) সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা দুষ্ট হয়, সে কথা আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছিলাম। সে বিষয়ে উড়িষ্যার গবর্ণরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করায় বহুদিন পরে উড়িষ্যা সরকারের চীফ সেক্রেটারী জানাইয়াছেন, —ঐ জাতীয় মোকদ্দমায় শীঘ্র শীঘ্র বিচার শেষ হওয়া যে বাঞ্ছনীয় তাহা উড়িষ্যা সরকারের কর্মচারীদিগকে সমঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা কর্তব্য সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কি করা হইয়াছে বলা যায় না।

আমরা সম্প্রতি উড়িষ্যায় বাঙালী ফুটবল খেলার দলের প্রতি কুব্যবহারের পরিচয় জ্ঞাপক বিবরণ পাইয়াছি। কলিকাতা হইতে একটি বাঙালী খেলোয়াড় দল পুরীতে বিজ্ঞাপিত দুইটি প্রতিষ্ঠানের খেলায় যোগ দিতে গমন করে। প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মধ্যে যে বিবাদ আছে এবং একটি সরকারী কর্মচারীদিগের অনুগৃহীত, তাহা খেলোয়াড়রা জানিতেন না। প্রথমে যে দলের সহিত তাঁহাদিগের খেলিবার কথা, সে দলের ব্যবহার দোষে বাঙালী খেলোয়াড়রা খেলিতে অসম্মত হইলে, সেই দলের পৃষ্ঠপোষক একব্যক্তি আসিয়া তিনি যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেই পরিচয় দিয়া শাসাইয়া যান, তিনি সেই দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগকে পুরী ত্যাগ করাইবেন—কেননা, তাঁহারা বাঙালী। তাহার পরেই কয়খানি বেনামী পত্রে সেইরূপ ভয় দেখান হয় এবং বাঙালী দলের নেতা বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান। যে ব্যক্তিটি (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) প্রথমে আসিয়াছিলেন, তিনি যে গৃহে খেলোয়াড়রা অতিথি ছিলেন সেই গৃহের মহিলাদিগের সমক্ষেই ঐরূপ দুর্ব্যবহার করেন। বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইলে তিনি—অবস্থা বুঝিয়া—পুলিশকে বাঙালী খেলোয়াড়দিগকে আবশ্যক পাহারা দিবার নির্দেশ দিয়া তাঁহাদিগকেও পুরী ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। বিষয়টি যখন

ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান হইয়াছে এবং পুলিশেও জানাইতে হইয়াছিল, বিশেষ যখন তাহার সহিত একজন উড়িয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (গুণ্ডা নহে) জড়িত, তখন আমরা উড়িষ্যা সরকার কি করেন, তাহা জানিবার পূর্বে কাহারও নাম প্রকাশ করা সংগত মনে করি না। কিন্তু আমরা এ কথা অবশ্যই বলিব যে, প্রাদেশিকতার এইরূপ কদর্য অভিব্যক্তি সরকারের কঠোর দণ্ড ব্যতীত কখনও দূর হইতে পারে না। প্রাদেশিকতা যাহাদিগের উপর উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে—তাহারাও, তাহাদিগের প্রদেশে, তাহার অনুশীলন করিতে পারে এবং কলিকাতায় উড়িয়াদিগের সম্বন্ধে তাহার বিকাশও একবার অবাঞ্ছিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিধানবাবু কি এই বিষয়ে উড়িষ্যার প্রধান সচিবের নিকট সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিবেন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের সচিব শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের মধ্যে যখন ব্যাপকভাবে কলেরা বিস্তারের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা যেন আগমনে বিরত থাকেন। কিন্তু তিনি কি মনে করেন, এই সকল হিন্দু বাধ্য না হইলেও চলিয়া আসিতেছেন? সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—

(১) খুলনায়—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গ্রাম রাড়ুলীতে তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের সম্মুখে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গণে গো-কোর্বানী করা হইয়াছে এবং মুসলমানগণ রক্তাক্ত অস্ত্রগুলি হিন্দুর পুষ্করিণীতে ধৌত করে। ইহার পূর্বে কখন ঐ স্থানে গো-কোর্বানী হয় নাই।

(২) ময়মনসিংহে আটপাড়া থানার সশস্ত্র পুলিশ গ্রামবাসী হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে—হিন্দু গৃহে স্ত্রীলোকদিগকেও অপমান করিতেছে।

(৩) সিরাজগঞ্জে যে ৫৭ জন হিন্দু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়—যে ২ জন উকীল তাঁহাদিগের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে জামিনের আবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সরকার দৃঢ়ভাবে হিন্দুদিগকে অধিকার সম্ভোগ করিতে দিলে কখনই এই সকল সম্ভব হইতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্রসংকট দূর হইল না। প্রকাশ, বস্ত্র বণ্টন নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত করিতে আরও বিলম্ব হইবে। "সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা টেক্সটাইল মার্চেণ্টস এসোসিয়েশন" (১৮ রশ স্ট্রীট) হইতে প্রকাশিত—সরকারের কর্মচারী প্রভৃতিকে লিখিত একখানি পত্রের প্রতিলিপি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বি এল মুরারকা উহার লেখক বলিয়া প্রকাশ। ঐ পত্রে সরকারের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সে-সকলের গুরুত্ব অসাধারণ। পত্রে বলা হইয়াছে—সরকারের অনুগৃহীত চোরাকারবারীরা ২ ভাগে বিভক্ত—(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আমদানীকারী এজেণ্ট, (২) কাপড়ের কলের মালিক। পত্রে বলা হইয়াছে, "ফিনলে ধুতীর" (২০নং) এক্স মিল" দাম ৭, জোড়া; কিন্তু সরকারের কোন এজেণ্ট প্রকাশ্যভাবে ইহা ১৪, টাকা জোড়া দামে বিক্রয় করিতেছেন। কিন্তু অন্য ব্যবসায়ীরা উহা ৮ টাকা ১২ আনা জোড়া দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য এবং বাজারে ১২ টাকা ৮ আনা দরে উহা অনায়াসে পাওয়া যায়। পত্র লেখক এই প্রসঙ্গে আর ২টি কাপড়ের কলের শাড়ীর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া কাপড়ের কলের মালিকদিগের লাভের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—কেশোরাম কলের 'সার্টিং'—'টিউটর' কাপড়ের প্রতি গজের মূল্য গত এপ্রিল মাসে ১৫ আনা এক পাই ছিল, আর নূতন ব্যবস্থায় এক টাকা ৩ আনা হইয়াছে। বাজারে ইহাই ১২ আনা গজ দামে পাওয়া যায়। তিনি তাহার পরে কেশোরাম মিলের 'পপলিনের' ও আমেদাবাদের নিউ স্বদেশী মিলের 'ভেপের' দামের হিসাব দিয়াছেন। এই মিলগুলি বিড়লাদিগের। পশ্চিমবঙ্গে ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোকিওরমেণ্ট অ্যাণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সোসাইটির কথা অনেক শুনা যায়।

এই পত্রে উপস্থাপিত অভিযোগ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুসন্ধান করিয়া উত্তর দিবেন কি?

কলিকাতায় কোন পল্লীতে দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান শেষ উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ফতোয়া দিয়াছেন, খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের সম্বন্ধে এখনও দশ বৎসর পশ্চিমবঙ্গের সংকটকাল। তিনি সরকারী দপ্তরের বহু প্রচারিত কতকগুলি হিসাব নাড়াচাড়া করিয়া দেখাইয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাদির অভাব দূর করা সম্ভব নহে। তবে দশ বৎসর যদি দামোদরের ও ময়ূরাক্ষীর জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়, তবেই দুর্দিনের অবসানে সুদিন আসিবার আশা করা যায়। অবশ্য সেই ব্যবস্থাদ্বয়ের প্রবর্তন পশ্চিমবঙ্গের উপরেই নির্ভর করে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। কাজেই ব্যবস্থা শেষ হইতে দশ বৎসরেরও অধিককাল অতিবাহিত হইতে পারে। এতদিনে খাদ্যাভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্নাভাবের অবস্থা দূর করিবার কোন উপায় কি হইবে না? আমরা জানি যুদ্ধের সময় শিল্পপ্রধান বৃটেন তাহার খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপায় করিয়াছিল। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যতদিন বৃটিশ শাসন রীতিরই অনুসরণ করিবেন, ততদিন সেরূপ ইচ্ছার পরিচয় দেশের লোকের নিকট প্রতিভাত হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গে যে ভূমি অল্প তাহা জানিয়াই যখন কংগ্রেস প্রদেশ বিভাগে র‍্যাডক্লিফের নির্ধারণ মানিয়া লইয়াছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কংগ্রেস সরকারের যে বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি সে বিষয়ে সচেতন হইয়া কেন্দ্রী সরকারকে সেই কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিবেন? প্রফুল্লবাবু বলিয়াছেন:—

পশ্চিমবঙ্গে মটর, কড়াই প্রভৃতি হয় না—মাছ, মাংস ও দুধ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যল্প—লোকপ্রতি মাত্র ৩ আউন্স দুধ পাওয়া যায়; সরিষার তৈলের জন্য যত শস্য প্রয়োজন তাহার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়; পশ্চিমবঙ্গে একটিও চিনির কল নাই।"

আমরা বলিতে বাধ্য তাঁহার হিসাব কোথাও অতিরঞ্জিত, কোথাও ভিত্তিহীন। কারণ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের সরকারী হিসাবে দেখা যায়, এ বৎসর ২৪ পরগণা জিলায় এক হাজার একর, নদীয়া জিলায় ৩১ হাজার ৩ শত একর, মুর্শিদাবাদ জিলায় ৮২ হাজার ৬ শত একর এবং বর্ধমানে ২ হাজার ৩ শত একর, বীরভূম জিলায় ৬ হাজার ৯ শত, বাঁকুড়া জিলায় এক হাজার ৮ শত একর, মেদিনীপুর জিলায় ৩ হাজার ১ শত একর, খাস হুগলী জিলাতেও ৬ শত একর, হাওড়ায় এক শত একর জমিতে ছোলার চাষ হইয়াছিল এবং ঐ সকল জিলায় যথাক্রমে—২৭ হাজার ৭ শত, ৩০ হাজার ২ শত, ৫৫ হাজার ৬ শত, ১২ হাজার ৬ শত, ৫ হাজার, ২০ হাজার ১ শত, ২৫ হাজার ৯ শত, ৪ হাজার ৫ শত, ৫ হাজার ৭ শত এবং জলপাইগুড়িতে ১২ হাজার একর জমিতে দাইল প্রভৃতি খাদ্যশস্যের চাষ হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে চিনির কল আছে। আর তিনি যে সকল খাদ্যদ্রব্যের অভাবের কথা বলিয়াছেন, সে সকলের ফলন বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করিয়াছেন? মৎস, গব্য, সরিষার চাষ—এ সকল কি দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর জল নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বর্ধিত হয় না? পশ্চিমবঙ্গের সচিবরা যদি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দাইল উৎপন্ন হয় না এবং একটিও চিনির কল নাই, তবে তাঁহাদিগের নিকট লোক কি আশা করিতে পারে? দীর্ঘ দশ বৎসরের পূর্বে যদি তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে লোকের অবস্থার উন্নতি সাধন অসম্ভব বিবেচনা করেন, তবে তাঁহারা কিরূপে আপনাদিগের ক্ষমতা পরিচালন সমর্থন করিতে পারেন—তাহা তাঁহাদিগের ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

পশ্চিম বঙ্গের অর্থকথা

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ

মধ্যবঙ্গের জলসম্পদ্

এইবারে মধ্য বঙ্গের জলসম্পদের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে গঙ্গা নদী (পদ্মা) প্রবাহিত হইতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলাকে গঙ্গাই বর্তমান পূর্ব বাঙলা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। পদ্মার দুই তীরে এখনও ভাঙা-গড়ার কাজ চলিতেছে। জেলার অন্যান্য নদী ভাগীরথী, ভৈরব ও জলাঙ্গীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল নদী এককালে অত্যন্ত খরস্রোতা ছিল; কিন্তু বর্তমানে ইহারা নিতান্তই মুমূর্ষু ও প্রাণহীন। জেলার পশ্চিম দিকে সাঁওতাল পরগণা এবং বীরভূম হইতে যে সকল নদী ভাগীরথীতে জলধারা মিশাইতেছে, বর্ষাকাল ভিন্ন তাহারাও সাধারণত নির্জীব। পশ্চিম দিকে বাবলা, ময়ূরাক্ষী এবং ময়ূরাক্ষীর উপনদী দ্বারকা নদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম দিকে আরও কয়েকটি পার্বত্য স্রোত ভাগীরথীতে জলধারা মিশাইতেছে সত্য, কিন্তু খরস্রোতা বলিয়া ইহারাও চলাচলের বিশেষ উপযোগী নহে। তাহা ছাড়া, বর্ষাকালে ইহাদের দুই তীর প্লাবিত হইয়া যায়। এই সকল নানা কারণে মুর্শিদাবাদের নদীবিন্যাসকে জেলার স্বাস্থ্য-সম্পদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলা চলে না। যে সকল নদীতে স্রোত তীব্র নয়, তাহাদের অধিকাংশই শ্যাওলায় পরিপূর্ণ। যে সকল নদী এখনও গভীর রহিয়াছে, ক্রমাগত পলিপ্রবাহের ফলে তাহারাও অগভীর হইয়া পড়িতেছে। জঙ্গীপুর হইতে পলাশী পর্যন্ত বিরাট বাঁধের ফলে এবং সেই সঙ্গে ভাগীরথীর গতিপথে কয়েকটি চড়া পড়িবার ফলে ভাগীরথীর অবনতি সম্প্রতি আরও দ্রুত পরিলক্ষিত হইতেছে। কান্দি মহকুমা এবং বহরমপুর মহকুমারও একাংশের বন্যা এবং প্লাবনের ফলে কখনও কখনও ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। আবার জেলার পশ্চিম অঞ্চলে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে পর্যাপ্ত জলপ্রবাহের ফলে প্রায়ই জলাভাব দেখা যায় এবং কখনও কখনও চাষের অসুবিধা হইয়া থাকে। মতি বিল, তেলকার বিল, ভাণ্ডার ডাহা, চাতরা বিল প্রভৃতি বহুসংখ্যক বিল জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিলক্ষিত হইবে। এই সকল বিল প্রকৃতপক্ষে জলহীন নদীসমূহের তলদেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জেলার পশ্চিম দিকে কাঁদি মহকুমায় হিজল, কারুল, লাঙ্গলহাটা, বাঁকি জোলা প্রভৃতি বিল দেখা যাইবে। এই সকল বিল বর্ষাকালে জলে পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু পার্শ্ববর্তী রেলওয়ে লাইনের উঁচু বাঁধের ফলে জল নির্গমের কোন পথ খুঁজিয়া পায় না। পশ্চিম অঞ্চলে প্রায়ই প্লাবন দেখা যায়, তাহাতে শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। কান্দি মহকুমার নিম্ন জলাভূমিতে একমাত্র বরো ধান ভিন্ন অন্য কিছুই উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। পশ্চিম অঞ্চলে জল সেচনের জন্য জলাশয়ের প্রয়োজনও বেশী; এই কারণেই এই অঞ্চলে অধিক সংখ্যক জলাশয় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ জলাশয়ই বর্তমানে জলহীন; ফলে আমন ধান চাষের কার্যে জল ব্যবহার করিবার পরে রবিশস্য বপনের জন্য মোটেই অবশিষ্ট থাকে না।

নদীয়া জেলার পূর্বে ভাগীরথীই ছিল প্রধান নদী; ক্রমশ ইহা পূর্ব দিকে সরিয়া গিয়াছে। বর্তমানে গতি-পথ জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমা নির্দেশ করিতেছে। অজয়, বাব্লা, কাঁদর এবং সরস্বতী পশ্চিম দিক্ এবং জলাঙ্গী পূর্ব দিক্ হইতে ভাগীরথীতে জলধারা মিশাইতেছে। জেলার অন্যতম প্রধান নদী মাথাভাঙ্গা দুইবার দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে; চূর্ণী এবং ইচ্ছামতী ইহারই অংশ। ইচ্ছামতী নদী গভীর এবং তুলনায় খরস্রোতা। মুর্শিদাবাদের ন্যায় নদীয়া জেলার নদীপ্রবাহও মন্থর এবং নিস্তেজ। জেলার অন্যতম প্রধান নদী মাথাভাঙ্গা কোথাও একেবারেই স্রোতহীন; নদীতে কচুরী পানা সহজেই জন্ম বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। দীর্ঘ নদী জলাঙ্গীও বৎসরের অধিকাংশ সময়ই প্রাণহীন। ভাগীরথী এবং ইচ্ছামতী বর্ষাকালে চলাচলের উপযুক্ত, কিন্তু বৎসরের অন্যান্য সময়ে চলাচল সম্ভব নহে। নদীসমূহের অগভীরতার জন্য বন্যা এবং প্লাবন হইতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাঁধ রচনা করা হইয়াছে। নাকাশিপাড়া, কালিগঞ্জ, শান্তিপুরে, চাপড়া এবং চাকদহ থানায় প্রায়ই প্লাবন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল অঞ্চলের বাঁধ এবং কচুরী পানার ফলে নদীবাহিত পলিমৃত্তিকা যেরূপ কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছাইতে পারে না, সেইরূপ মাছ এবং স্রোতবাহিত মাছের ডিমের পুকুর-বিলে পৌঁছাইবার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর, নদীয়া জেলার নদীপ্রবাহের অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক। প্রধান নদীসমূহের স্রোতকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে জেলার স্বাস্থ্য ও সম্পদ রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। জেলাতে বহু বিল, জলাভূমি ও হ্রদ পরিলক্ষিত হয়; ইহাদের ভিতরে কতকগুলি জলপূর্ণ নিম্ন ভূমি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে সকল জলাভূমির তলদেশ গভীর নহে, সে সকল জলাভূমিতে চাষ করাও সম্ভবপর। জল জমা হইয়া যে সকল স্থানে হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে কেবলমাত্র সেই সকল স্থান ভিন্ন নিম্ন জলাভূমিতেও ধান চাষ করা হইয়া থাকে। যে সকল খাল বিল এবং হ্রদের সহিত নদীপ্রবাহের সংযোগ রক্ষা করিত তাহাদের অধিকাংশই বর্তমানে অগভীর এবং জলহীন; এমন কি বর্ষাকালেও নদীপ্রবাহের সহিত সংযোগ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। প্লাবনের সময়ে বিলে কচুরী পানা প্রবেশ করিলে অনায়াসে বংশ বৃদ্ধি করিয়া চলে। এই সকল নানা কারণে জেলাতে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। রাণাঘাট মহকুমার বিলসমূহের ভিতরে আমলো, কড়কাচুয়া, দোহার, গঙ্গাপ্রসাদ, চম্পা, চাপড়া, চমলী, ধমলাইক প্রভৃতি বিলের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিলের অধিকাংশই জল নিষ্কাশনের পর কৃষির উপযোগী; যে সকল বিল হইতে জল নিষ্কাশন করা সহজ নহে সে সকল স্থানে সহজেই মৎস্য চাষ করা যাইতে পারে।

পশ্চিম অঞ্চলের নদী ব্যবস্থা এবং জলসম্পদের কথা এইবারে আলোচনা করা যাইতে পারে। বীরভূম জেলার সর্বপ্রধান নদী অজয় সাঁওতাল পরগণা হইতে উৎপন্ন হইয়া জেলার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। নদী অত্যন্ত খরস্রোতা, কিন্তু কেবলমাত্র বর্ষাকাল ভিন্ন শীতকাল এবং গ্রীষ্মকাল উভয় সময়ে প্রায়ই জলহীন হইয়া পড়ে। কখনও কখনও নদীতে যে বন্যা দেখা দেয় তাহা পার্শ্ববর্তী শস্যক্ষেতের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে। জেলার মধ্য অংশে ময়ূরাক্ষী নদী অজয় নদীর সমান্তরালে প্রবাহিত; অজয় নদীর ন্যায় ইহারও তলদেশ বালুকাময় এবং গ্রীষ্মকালে ইহাও জলহীন হইয়া পড়ে। অজয় এবং ময়ূরাক্ষীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে হিংলা এবং বক্রেশ্বর নদী প্রবাহিত হইতেছে। বক্রেশ্বর নদী লাভপুরের নিকটে শাল নদীতে সংযুক্ত হইতেছে; ইহার পর কুলা নাম লইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে উত্তর-পূর্বে ভাগীরথীর দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ময়ূরাক্ষীর উত্তরে দ্বারকা নদী অর্ধ বৃত্তাকারে অগ্রসর হইয়া মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমায়

শেষ হইয়াছে। রামপুরহাটের উত্তর ভাগে ব্রাহ্মণী এবং সর্বোত্তরে পাগলা এবং বাঁশলাই নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল নদীর অধিকাংশই সাঁওতাল পরগণা এবং ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে প্রবাহিত হইবার ফলে জল ধারণ করিবার পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী। বর্ষাকালে এই সকল নদী যেরূপ খরস্রোতা, অন্যান্য সময়ে তেমনি জলহীন। চলাচলের পক্ষে এই সকল নদী একেবারেই অনুপযোগী। বর্ষাকালে জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেই এই সকল নদীর প্রধান উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জল ধারণ করিতে অক্ষম বলিয়া উৎস অঞ্চল হইতে জলধারা প্রবলভাবে প্রবাহিত হইলেই এই সকল নদীর দুই তীর প্লাবিত হইয়া যায়। এই কারণে অজয় ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বরে প্রায়ই প্লাবন দেখা যায় এবং শস্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। বীরভূমের ভূমিভাগ উত্তর-পশ্চিম দিক্‌ হইতে দক্ষিণ-পূর্বে তরঙ্গায়িত মৃত্তিকার আর্দ্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। জল সেচনের প্রয়োজনীয়তা বীরভূম জেলার এই কারণে অত্যন্ত বেশী। যে সকল স্থানে জল সেচনের জন্য উপযুক্ত বাঁধ এবং জলাশয় নাই অথচ বৃষ্টিপাত অল্প, সেই সকল স্থানে এই কারণে শস্য উৎপাদনে বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। জেলাতে যে সকল খাল (নালার) প্রবাহিত, তাহাদের ভিতরে কয়েকটিতে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। বাঁশলাই নদীর জলপ্রবাহ কোন গতিপথ না পাইয়া জেলার উত্তরে মুরারী থানায় একটি বৃহৎ বিলকে পরিপুষ্ট করিতেছে।

ভাগীরথী-অজয়-দামোদর বর্ধমান জেলার প্রধান নদী। এই সকল নদীর কথা পূর্বেই মোটামুটিভাবে বলা হইয়াছে। জেলার পূর্ব সীমান্তে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত; অজয় নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মঙ্গলকোট পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া কেতুগ্রামের নিকটে ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। দামোদর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া জামালপুরের নিকটে দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর দুরবস্থার কথা পূর্বেই বহুবার বলা হইয়াছে। বর্ষাকালেই কেবলমাত্র ছোট মালবাহী স্টীমার চলাচল করিতে পারে; ইহা ভিন্নও বৎসরের সকল সময়ই নৌকাযোগে ভাগীরথীতে চলাচল করা সম্ভবপর। বর্ধমান জেলায় ভাগীরথীর দুই তীরস্থ অঞ্চল উর্বর; কিন্তু জনস্বাস্থ্য একেবারেই ভাল নহে। গঙ্গার প্রধান স্রোত যদি ভাগীরথীর প্রবাহ পথ পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভিমুখী না হইত তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য বহু জেলার ন্যায় বর্ধমান জেলার সম্পদ সমৃদ্ধিও যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার নদী অজয়-দামোদরের তলদেশ স্রোতবাহিত মৃত্তিকা এবং বালুকা দ্বারা ভরাট হইয়া যাইতেছে। ফলে, বর্ষাকালে প্রায়ই প্লাবন দেখা যায়; এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষ ক্ষয়-ক্ষতি হইয়া থাকে। দামোদরের উত্তর দিকে প্লাবন রোধ করিবার উদ্দেশ্যে যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে অনেক সময়ে প্লাবন ও বন্যা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। বাঁকা এবং খাড়ি নদী সদর মহকুমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কালনা মহকুমায় পরস্পর মিলিত হইবার পর স্রোতধারা ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। উত্তরে বাঁকা নদী দামোদরের সহিত মিলিত হইয়া প্রচুর জল জমা করিতেছে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে বাঁকা নদী নিজেই জলহীন হইয়া পড়ে। দক্ষিণ মঙ্গলকোট থানার নিকটে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণী খাড়ি নদীর সহিত ভাগীরথীতে মিলিত হইতেছে। অজয়ের উপনদী কুনুর সদর এবং কাটোয়া মহকুমায় প্রবাহিত হইতেছে; বর্ষাকালে বিপুল জলধারায় ইহার দুই তীর প্লাবিত হইয়া যায়। অতএব, দেখা যাইতেছে, বর্ধমান জেলার নদীপ্রবাহও মুমূর্ষু ও প্রাণহীন অথচ প্লাবনের আশঙ্কাও খুব বেশী। সাঁওতাল পরগণার অন্যান্য নদীর ন্যায় জিলার প্রধান নদীসমূহ স্রোত-বাহিত মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট হইয়া যাইতেছে; আবার বর্ষাকালে জলরাশি সামান্য বৃদ্ধি পাইলেই দুই তীর ছাপাইয়া প্লাবন সৃষ্টি হইতেছে। অজয় এবং দামোদরের দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল প্রায়ই জলে প্লাবিত হইয়া যায়। আসানসোল মহকুমা ও কাটোয়া মহকুমায় অজয় নদীর প্লাবন প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়; কুনুর নদীতে প্লাবনের ফলেও গুস্‌করা থানায় শস্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। দামোদর নদের উত্তর দিকে বাঁধের সাহায্যে প্লাবনের আশঙ্কা রোধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার ফলে দক্ষিণ দিকে, বিশেষতঃ রায়না, জামালপুর প্রভৃতি থানা প্রায়ই জলে প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু প্লাবনের এইরূপ সম্ভাবনা সত্ত্বেও জলের অভাব জিলাতে বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। দামোদর খাল, ইডেন খাল, কানাক্ষা খাল, বহুলা খাল, কান্দার খাল প্রভৃতি বহু খাল এই জিলার কৃষিব্যবস্থাকে সাহায্য করিতেছে। দামোদর খাল এবং ইডেন খাল জল সেচন কার্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু অত্যন্ত সামান্য জমিতেই ইহাদের সাহায্যে জল সেচন করা যাইতে পারে। জিলার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে; বিশেষতঃ দামোদরের উত্তর দিক বাঁধ দিবার ফলে স্থানে স্থানে প্রায়ই জল জমা হইয়া থাকে; দক্ষিণ তীরেও নদীবাহিত জল স্থানে স্থানে জমা হইবার পর নদীতে ফিরিয়া যায় না।

বাঁকুড়া জিলায় দ্বারকেশ্বর নদী জিলাকে উত্তর-দক্ষিণে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দ্বারকেশ্বরের তলদেশ অত্যন্ত গভীর; কিন্তু জল এত নিম্নে প্রবাহিত হয় যে, কৃত্রিম বাঁধের সাহায্য ভিন্ন কৃষিকার্যে জল ব্যবহার করা কোন মতেই সম্ভবপর নয়। অন্যান্য স্থানের গতিপথের ন্যায় বাঁকুড়া জিলাতেও দামোদর নদ কেবলমাত্র বর্ষাকালীন প্লাবন ভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে জল দান করে না। শিলাই কিংবা শীলাবতী নদী শিমলাপাল থানায় প্রবাহিত হইয়া মেদিনীপুরে প্রবেশ করিয়াছে। কোশী বা কংসাবতী নদী জিলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত হইতেছে ঃ মেদিনীপুরে প্রবেশ করিবার পর ইহারা অধিক জল বহন করিতেছে। সোনামুখী থানার পরে শালী নদী দামোদরে প্রবাহিত হইতেছে ঃ ইহার জল রবিশস্যের জন্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুর মহকুমার যে সকল স্থানে বোদাই নদী প্রবাহিত, তাহার আশেপাশের জমি উর্বর। জিলার নদীসমূহ প্রাণহীন কিংবা মুমূর্ষু নয় বটে; কিন্তু জিলায় জলাভাব যেরূপ অত্যন্ত বেশী সেইরূপ কৃষিক্ষেত্রে জল সেচন করাও একটি কঠিন সমস্যা। জিলাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সহজেই এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুর মহকুমায় চম্পাখাল এবং "শুভংকরী দাড়া" ভিন্ন উল্লেখযোগ্য কোন খাল জিলাতে পরিলক্ষিত হয় না। জল নিষ্কাশনের নালা (স্থানীয় নাম "জোড়") অবশ্য সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। জলাভাব দূর করিবার জন্য পুষ্করিণী ("বাঁধ") ব্যবস্থা বহুদিন হইতে প্রচলিত রহিয়াছে; কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে এই সকল পুষ্করিণীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ১৯৩৯ সালে পুষ্করিণী উন্নয়ন আইনের ফলে অবস্থার খানিকটা উন্নতি ঘটিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। বাঁকুড়া জেলার জলসেচন ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিতে হইলে "শুভংকরী দাড়া"র কথা উল্লেখ করিতেই হইবে। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শুভংকর রায় এই "দাড়া"র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এক সময়ে ইহার সাহায্যে প্রায় ৭৫ বর্গ মাইল পরিমিত জমিতে জল সরবরাহ করা যাইত, এইরূপ মনে করিবার যুক্তিসংগত কারণ আছে। কিন্তু কয়েকবার খনন করা সত্ত্বেও বর্তমানে ইহার অবস্থা শোচনীয়। এই সকল নানা কারণে বাঁকুড়া জিলায় জল সেচন ব্যবস্থা কঠিন সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে।

মেদিনীপুর জিলার জলসম্পদের কথা আলোচনা করিয়াই পশ্চিম অঞ্চলের জলসম্পদের আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে। মেদিনীপুর জিলার পূর্ব সীমান্তে প্রবাহিত রূপনারায়ণ হুগলী নদীতে জলধারা মিশাইতেছে; দক্ষিণ অঞ্চলে রূপনারায়ণ অধিকতর খরতোয়া। কিন্তু অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া এবং তলদেশে চড়া পড়িবার এবং বালুকা জমা হইবার ফলে চলাচলের বিশেষ উপযোগী নহে। জিলার অন্যতম নদী কোশী

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত হইয়া কেশপুরের নিকটে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা ঘাটাল মহকুমায় প্রবাহিত হইয়া মোহনখালী খাল এবং দুবরাচোটি খাল নামে রূপনারায়ণে মিলিত হইয়াছে। অন্য শাখা কেলেঘাই নদীর সহিত মিলিত হইবার পর হলদী নদী নামে প্রবাহিত হইতেছে। শিলাই কিংবা শীলাবতী নদী গারবেতা-চন্দ্রকোনা-ঘাটাল-দাসপুর থানা হইয়া রূপনারায়ণে মিলিত হইতেছে। গারবেতা থানার নিকটে শিলাই অত্যন্ত গভীর বলিয়া জল ব্যবহার করা সম্ভব নহে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত সুবর্ণরেখার তলদেশ অত্যন্ত প্রশস্ত; কিন্তু জলপ্রবাহ বর্ষাকালেও অত্যন্ত সংকীর্ণ। মেদিনীপুরের পরে সুবর্ণরেখা বালেশ্বর জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। সুবর্ণরেখা স্বর্ণ বহন করে বলিয়া যে বিশ্বাস আজও বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। রাসুলপুর নদী কাঁথি মহকুমায় প্রবাহিত হইবার পর বাগদা-সারপাই-মাধাখালি নদীর প্রবাহে মিলিত হইয়াছে। রাসুলপুর নদী হুগলী নদীতে জলধারা মিশাইতেছে। মেদিনীপুর জিলার নদী প্রবাহে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। রেনল-এর নকসায় যে নদী প্রবাহকে চিহ্নিত করা হইয়াছে, মোটামুটিভাবে আজও তাহাই অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রূপনারায়ণ, কোশী প্রভৃতি নদীতে, বিশেষতঃ রাসুলপুর নদীতে যে পরিমাণ মাটি জমা হইতেছে, তাহাতে জল নিকাশের ব্যবস্থা, বিশেষভাবে কাঁথি মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। জয়কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামে ছোট ছোট খাল জলহীন হইবার ফলে বিশেষভাবে জলাভাব দেখা দিয়াছে। জিলার অর্থনৈতিক জীবনে কোশী নদীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কোশী চলাচলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী না হইলেও মেদিনীপুর উঁচু খালের (High level canal) প্রধান জলধারা কোশী নদীই জোগাইতেছে। কিন্তু নদীর গতিপথ অত্যন্ত বেশী আঁকাবাঁকা বলিয়া কোশী প্রায়ই প্লাবনের সৃষ্টি করিয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্ষতিসাধন করে। রাসুলপুর নদী—নৌযোগে চলাচলের উপযোগী এবং এই পথেই কলিকাতা হইতে হুগলী নদীর সাহায্যে দ্রব্যসম্ভার কাঁথিতে আনয়ন করা হয়। জল নিষ্কাশনের পক্ষেও রাসুলপুর নদী বিশেষ উপযোগী। ঝাড়গ্রাম মহকুমা, সদর মহকুমার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, চন্দ্রকোণা থানা (ঘাটাল), নন্দীগ্রাম থানা প্রভৃতি বহু স্থানে বৃষ্টির যেরূপ অভাব, তেমনি নদী হইতে জল সরবরাহ করাও কঠিন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোশী-কেলেঘাই প্রভৃতি নদীতে প্লাবনের ফলে বহু অঞ্চলের বিশেষতঃ পাঁশকুড়া থানায় যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। শালাই নদীর প্লাবনের ফলে ঘাটাল-দাসপুর প্রভৃতি অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেলেঘাই নদীতেও প্রায়শঃ প্লাবন দেখা যায়। সাধারণতঃ সমুদ্রের লবণাক্ত জল জিলাতে প্রবেশ করে না, কিন্তু ১৯৪২ সালে তমলুক এবং কাঁথি মহকুমায় লবণাক্ত জল প্রবেশ করিবার ফলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। জেলার খালসমূহের ভিতরে মেদিনীপুরে উঁচু খাল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া এই খাল বিস্তৃত ভূমি খণ্ডে জলসেচন করিতেছে; ট্রেন চলাচলের পূর্বে যাতায়াতের জন্যও এই খালের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হইত। খেজুরী থানায় প্রতাপখালী খাল বর্তমানে শুষ্ক বলিলেই চলে। হেজলা খাল জিলার অন্যতম প্রধান খাল; চলাচলের পক্ষে এই খাল বিশেষভাবে উপযোগী। হুগলী এবং রূপনারায়ণের সংগমস্থল হইতে জলপ্রবাহ লইয়া ভাইটনগর পর্যন্ত এই খাল অগ্রসর হইয়াছে। মেদিনীপুর জিলার কোশী-হলদী রাসুলপুর প্রভৃতি নদীতে বহু বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। পর্বতময় উৎসস্থল হইতে জলপ্রবাহ নিম্নভূমিতে প্রায়ই প্লাবনের সৃষ্টি করে বলিয়াই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে নদী-বাহিত পলি মৃত্তিকা যেরূপ জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না, তেমনি এই বাঁধের ফলে নদীসমূহের তলদেশে সহজেই চড়া পড়িতেছে। তাহা ছাড়া, সময়ে সময়ে বাঁধ থাকা সত্ত্বেও জলপ্রবাহ আশে-পাশের অঞ্চলকে প্লাবিত করে।

প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলের জলসম্পদের কথা বিস্তারিতভাবেই বলা হইল। এই সকল নদীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা সকলেই নিজেদের গতিপথে প্রাচীন তটভূমি রচনা করিয়াছে। দামোদরের ন্যায় ইহাদের সকলেরই তলদেশ বর্তমানে অগভীর হইয়া পড়িয়াছে। প্রবল জলস্রোত হইতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। বিবেচনাহীন এই ব্যবস্থার ফলে বন্যা, প্লাবন এবং ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আরও তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। পূর্ব বঙ্গের নদীসমূহ উদ্দাম ও উচ্ছল, সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহাদের আচরণ ও চরিত্র মোটামুটি পরিচিত বলিয়া অধিবাসীদের পক্ষে আকস্মিক সর্বনাশ হইতে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভবপর হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অপ্রশস্ত নদীসমূহ স্বাভাবিক সময়ে শান্ত ও সংযত; কিন্তু দূরদৃষ্টিহীন মানুষের কৃত্রিম বাঁধ ব্যবস্থা যখন আকস্মিকভাবে ভাঙিয়া যায়, তখন সর্বনাশা বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার অবকাশ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র দামোদরের উপরে পাঁচটি বাঁধ দেবার ফলে যে সংকট দেখা দিয়াছে, তাহা উইলককস সাহেব বিশদভাবেই বলিয়াছেন। তাহার মতে ইহার ফলে দামোদরের ডানদিকের প্রায় আড়াই শত পল্লীকে প্রতি বৎসর সর্বনাশা প্লাবনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, আবার বামদিকের প্রায় আট লক্ষ একর জমি শত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জল পাইতেছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; সর্বোপরি ইহা দামোদরের নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

অবিভক্ত বাঙলায় হুগলী-হাওড়া-২৪ পরগণার নদীবিন্যাসকে সাধারণতঃ পশ্চিম অঞ্চলের নদীবিন্যাসেরই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। হুগলী-হাওড়া জিলার নদীসমূহের অধিকাংশই পশ্চিম অঞ্চলের নদীসমূহের বিস্তৃতি; এবং নদী ভিন্ন হইলেও একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিম্বা সমধর্মী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হাওড়া-হুগলী-২৪ পরগণার জলসম্পদে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে এই অঞ্চলের জলসম্পদকে, বিশেষতঃ নূতন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সম্পর্কে আলোচনাকালে, পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করাই অধিকতর সংগত। ২৪ পরগণা জিলার প্রধান নদী হুগলীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হুগলী নদী ভিন্ন জিলার অন্যান্য প্রধান নদীর ভিতরে বিদ্যাধরী, পিয়ালী, যমুনা, মাতলা, ইছামতী, কালিন্দী প্রভৃতি নদীর নাম করা যাইতে পারে। কলিকাতার নিকট হইতে দক্ষিণে সাগরাভিমুখী গতিপথে হুগলী নদী বহু নদীর জলপ্রবাহ বহন করিতেছে। ফলতার নিকটে দামোদর এবং রূপনারায়ণ হুগলী মিলিত হইতেছে। দামোদর রূপনারায়ণ হুগলী নদীতে জলধারা মিশাইতেছে; কিন্তু দক্ষিণে রসুলপুর নদীও হুগলীর সহিত মিলিত হইতেছে। দামোদর রূপনারায়ণের প্রবাহের ফলে হুগলী নদীতে যে বালুচর পড়িয়াছে, তাহাতে জলপথে জাহাজ স্টীমারের যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাধরী নদী ধীরে ধীরে ভরিয়া যাইবার ফলে জলনিকাশের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। যমুনা নদী ২৪ পরগণার উত্তরে প্রবেশ করিয়া ইছামতীতে জলধারা মিশাইতেছে। ইছামতী-কালিন্দী নদী খুলনা ২৪ পরগণার সীমা নির্দেশ করিতেছে। পিয়ালী করতোয়া প্রভৃতি নদী হইতে উৎপন্ন মাতলা প্রমত্তা নদী। পিয়ালী নদী বিদ্যাধরীর জলপ্রবাহ হইতে বাহির হইয়া মাতলায় জলধারা মিশাইতেছে। পিয়ালীর তলদেশ বর্তমানে অত্যন্ত অগভীর হইয়া পড়িয়াছে; ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্রায়ই জলে প্লাবিত হয়। বসিরহাট মহকুমায় হাসনাবাদ-সন্দেশখালি থানা, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় কাকদ্বীপ, মথুরাপুর এবং সাগর এবং সদর মহকুমায় ভাঙগর-ক্যানিং জয়নগর থানায় প্রায়ই জলপ্লাবন দেখা যায়। ১৯৪৪ সালেও এই অঞ্চলে প্লাবনের ফলে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ক্যানিং রাজারহাট প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলে সহজেই সমুদ্রের লবণাক্ত জল প্রবেশ করিতে পারে। ইহা রোধ করিবার জন্য

বাঁধ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল স্বাভাবিক জলপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। দক্ষিণ অঞ্চলে বহু খাল ও ছোট নদী পরিলক্ষিত হয়; আলীপুর সদর মহকুমায় ভাঙগর কাটা খাল উল্লেখযোগ্য খাল, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার খালগুলির ভিতরে বিষ্ণুপুর খাল, সংগ্রামপুর খাল, হোতার খাল, মগরাহাট-জয়নগর খাল, ডায়মণ্ডহারবার খাল প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ব্যারাকপুর মহকুমায় কয়রাপুর খাল, নোয়াই খাল এবং বারাসাত মহকুমায় কৃষ্ণপুর খাল, নোয়াই খাল, কয়বাসুরপুর খাল এবং সাতি খাল উল্লেখযোগ্য। বারাসত মহকুমার খালগুলি জলনিকাশের পক্ষে অত্যন্ত বেশী কার্যকরী। বসিরহাট মহকুমায় বহু খাল পরিলক্ষিত হয়; এই সকল খালের ভিতরে কাটা খাল, আবাসপুর খাল, শিবকালী খাল, চালতাবেড়িয়া খাল প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। জিলা একদিকে যেরূপ খালে পরিপূর্ণ অন্যদিকে বিল এবং নিম্ন জলাভূমিও জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। বালি বিল, কুলগাটি বিল, বয়রা বিল প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জলাভূমি। কিন্তু জলসরবরাহের কোন ব্যবস্থার অভাবে কৃষিকার্যের জন্য এই জল ব্যবহার করা একেবারেই সম্ভবপর হইতেছে না। এই সকল বিল ছাড়াও যমুনা-বিদ্যাধরীর মধ্যবর্তী বানিয়াতী বিল এবং হুগলী-বিদ্যাধরীর মধ্যবর্তী ধাপা হ্রদের নাম করা যাইতে পারে। কৃষিকার্যে জলসরবরাহ করিবার জন্য এবং বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য জিলার বিলগুলিকে সহজেই কাজে লাগান যাইতে পারে।

হুগলী জিলার প্রধান নদীসমূহের ভিতরে হুগলী দামোদর দ্বারকেশ্বর বেহুলা সরস্বতী কানা দামোদর কানা দ্বারকেশ্বর মন্দেশ্বরীর নাম উল্লেখযোগ্য। হুগলী নদী জিলার পূর্ব সীমা নির্দেশ করিতেছে, বর্তমানে নদী অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন। দামোদর জিলার মধ্যস্থলে এক-দিকে আরামবাগ এবং অন্যদিকে সদর এবং শ্রীরামপুর মহকুমা রাখিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পূর্বদিক বাঁধ দেবার ফলে জলপ্রবাহ রোধ করা সম্ভবপর হইয়াছে; কিন্তু পশ্চিমদিকে প্রায়ই প্লাবন দেখা যায়। দ্বারকেশ্বর জিলার উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া শিলাই নদীর সহিত মিলিত হইতেছে এবং শেষপর্যন্ত রূপনারায়ণের সহিত জলধারা মিশাইতেছে। দ্বারকেশ্বর নদীর সাহায্যে আরামবাগ এবং রাণীচকের ভিতরে নৌকাযোগে চলাচল করা সম্ভবপর। হুগলীর শাখা সরস্বতীর তলদেশ বর্তমানে অত্যন্ত অগভীর। দামোদরের শাখা কানা দামোদরে তারকেশ্বরের উপর দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া হাওড়া জিলায় প্রবেশ করিয়াছে। দামোদর এবং দ্বারকেশ্বরের মধ্যে প্রবাহিত মন্দেশ্বরী বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শেষপর্যন্ত রূপনারায়ণের সহিত মিলিত হইতেছে। দ্বারকেশ্বর হইতে বাহির হইয়া কানা দ্বারকেশ্বর আরামবাগ শহরের উপরে প্রবাহিত হইয়া মানেশ্বরের খালের সহিত মিলিত হইবার পরে রূপনারায়ণের সহিত জলপ্রবাহ মিশাইতেছে। জিলার অন্যান্য নদীর ভিতরে দামোদরের প্রাচীন প্রবাহ কানা নদীর নাম করা যাইতে পারে। দ্বারকেশ্বর এবং দামোদরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রায়ই প্লাবন দেখা যায়। জিলার কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ সদর এবং শ্রীরামপুর মহকুমায় কচুরীপানার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। জিলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে জলাভাব দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য খালসমূহের ভিতরে তেরোজুলি খাল, আমোদার খাল এবং ডানকুনি খালের নাম করা যাইতে পারে। শ্রীরামপুর মহকুমায় ডানকুনি এবং কুমীরমারা দুইটি উল্লেখযোগ্য নিম্ন জলাভূমি। জিলার নদীসমূহ বর্তমানে অত্যন্তই দুর্দশাপন্ন; একদিকে প্লাবন অন্যদিকে জলাভাবের ফলে জিলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে।

হাওড়া জিলার পূর্ব সীমান্তে হুগলী নদী উত্তর-পূর্ব দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। হুগলী নদী সারা বৎসরই চলাচলের উপযোগী। সরস্বতী নদী বর্তমানে ক্ষীণতোয়া; জলনিকাশের পক্ষেও বর্তমানে বিশেষ উপযোগী নহে। দামোদর নদ জিলার উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। হাওড়া জিলায় দামোদরের স্রোত অত্যন্ত ক্ষীণ; প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে প্লাবনের সময়ে দামোদরের যে ভয়ংকর মূর্তি দেখা যায়, হাওড়া জিলাতে তাহার কিছুমাত্র আন্দাজ করাও কষ্টসাধ্য। কিন্তু দামোদর অপেক্ষাও দামোদরের প্রাচীন প্রবাহ দামোদরের অবস্থা অধিকতর করুণ ও দুর্দশাপন্ন। দামোদরের এই প্রাচীন প্রবাহ উলুবেড়িয়ার নিকটে হুগলীতে মিলিত হইত। জিলার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত রূপনারায়ণ কোলাঘাটের পর হইতে তুলনায় বেগবান হইয়া হুগলীতে জলধারা মিশাইতেছে। কোলাঘাটের কিছু উত্তরে বকসির নিকট হইতে রূপনারায়ণের তীরে বাঁধ রহিয়াছে। নদী হিসাবে রূপনারায়ণ ক্ষীণতোয়া ও প্রাণহীন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে জিলাতে জলাভাব অপেক্ষা জলপ্লাবনই তীব্রতর সমস্যা। তেজপুর, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে মাঝে মাঝে প্লাবনই দেখা যায়। খালসমূহের ভিতরে কেন্দুয়া খাল ও উলুবেড়িয়া খাল উল্লেখযোগ্য। উলুবেড়িয়া খালের সাহায্যে জলনিকাশ ও চলাচল উভয় কার্যই সম্পন্ন হয়। উলু-বেড়িয়ার নিকটে হুগলী নদী হইতে বাহির হইয়া এই খাল কোলাঘাটের নিকট রূপনারায়ণে মিলিত হইতেছে। উলুবেড়িয়ার নিকটে হুগলী নদী হইতে বাহির হইয়া কেন্দুয়া খাল কেন্দুয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। মাদারী খাল দামোদর হইতে বাহির হইয়া মাদারিয়ার নিকটে দামোদরেই জলধারা মিশাইতেছে। অন্যান্য খালের ভিতরে হাওড়া খাল, রাজাপুর খাল প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। জিলাতে পুষ্করিণীর অভাব নাই, কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও সংস্কারের অভাবে এই সকল পুষ্করিণীর অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়।

প্র-না-বি-র এলবাম

চিত্র-চরিত্র

ভূমিকা

(২)
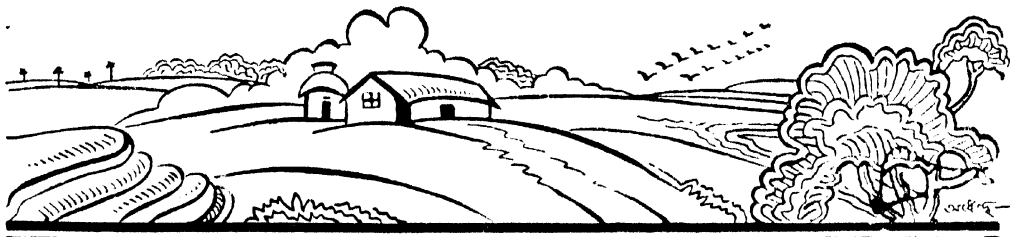
ঊনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষা ইউ-রোপের অষ্টাদশ শতকের জ্ঞান-কৈবল্যের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জ্ঞান-কৈবল্যের বাহ্যরূপ ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা Reason—Reason-এর আরাধকগণ, ভল্টেয়ার ও এনসাইক্লোপিডিস্টগণ মূলত জ্ঞানমার্গীয় সাধক। ইঁহাদেরই সাধনা ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনের পথে, ইংরেজের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই সময়কার বাঙলা দেশে দুইদল ইংরেজ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছিল—একদল কেরি, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারি; অন্যদল হেয়ার, ডিরোজিও প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্। প্রথম যুগের মিশনারিগণ আদৌ উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, অপরপক্ষে হেয়ার ও ডিরোজিও সেকালের শিক্ষিত ও শিক্ষালাভেচ্ছুগণের চিত্তে তুমুল তুফান তুলিয়াছিল। জ্ঞানমার্গের সাহায্যেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। কেরি অবশ্য বাঙলা সাহিত্যের আদি যুগে প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সে তো জ্ঞানমার্গীয় প্রভাব। *মনে রাখিতে হইবে যে, মূলে কেরি এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতেই আসিয়াছিলেন—কিন্তু* কার্যত তিনি বাঙলা গদ্য সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিলেন।

প্রধানত হেয়ার ও ডিরোজিওকে অবলম্বন করিয়াই এদেশে জ্ঞানমার্গীয় নাস্তিক্য প্রসারিত হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রধান প্রধান ছাত্রগণ সকলেই জ্ঞান-কৈবল্যের সাধক—এবং অনেকেই নাস্তিক ছিলেন। অবশ্য ইঁহাদের ছাত্রদের অনেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা ধর্মানুরক্তির ফল নহে। গুরু-ম্বরের শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, হিন্দুধর্মে বিশ্বাস শিথিল হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই শূন্য চিত্তমন্দিরে তাঁহারা, হেয়ার ডিরোজিওর ছাত্রগণ Reason-কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু Reason নিজেও একটা শূন্যতা, তাহাতে বেদীপূরণ হয় না, সেই শূন্যপ্রায় বেদীর উপরে তাঁহারা অনেকে খৃষ্টধর্মকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা আদৌ অত্যাশ্চর্য নয়। ফরাসী বিপ্লবান্তে Reason-এর মন্দির ফরাসী দেশে খৃষ্টধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারই অনুরূপ, ক্ষুদ্রতর একটা কাণ্ড এদেশের তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিতদের চিত্তে ঘটিয়া গিয়াছিল।

হেয়ার-ডিরোজিওর ছাত্রগণ জ্ঞান-কৈবল্যের অতীত কিছু মানিতেন না, তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, জ্ঞান শক্তিস্বরূপ—'নলেজ ইজ পাওয়ার'। নবলব্ধ অস্ত্রখানার মতো সদ্যলব্ধ জ্ঞানকে কেবল আঘাত করিবার কাজেই তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞান-কৈবল্য বা Reason-এর বিপদ এই যে, তাহার পরিণাম উৎকট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা 'ইনডিভিজুয়ালিজম্।' করুণায় ও সমবেদনায় মানুষে মানুষে মিল, বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদ। সেই যুগের এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধাক্কা সমস্ত ঊনবিংশ শতকের মধ্যে দিয়া সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে এবং আজ পর্যন্ত তাহার সুফল ও কুফল দুই-ই আমরা ভোগ করিতেছি। পরবর্তী ঊনবিংশ শতক আর খৃষ্টধর্মকে গ্রহণ করে নাই; নিছক জ্ঞান-কৈবল্যকেও তেমন করিয়া স্বীকার করে নাই—*কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নেশাকে সে এড়াইতে* পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর গৌরবের ও নিষ্ফলতার দুইয়েরই মূলে আছে—প্রচণ্ড ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। বাঙালী একক কাজ করিতে পারে, দল বাঁধিলেই গোলমাল পাকাইয়া ফেলে। যে-কাজ একাকী সম্ভব—বাঙালী তাহাতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সাহিত্য এককের সাধনা—বাঙালী সাহিত্যিক শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু সাহিত্যের এমন অঙ্গ আছে, যাহাতে অনেকের মিলিত হওয়া আবশ্যক সেখানেও বাঙালী মিলিতে পারে নাই। নগেন্দ্রনাথ বসু একাই বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছেন, বঙ্গীয় শব্দকোষ রচয়িতা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন সহকর্মী ছিল না।

জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে কর্মের ক্ষেত্রে আসিয়া এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টতর রূপ ধরিয়াছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একাই বিশ্ববিদ্যালয় গড়িলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এককের কীর্তি। প্রথম আমলের কংগ্রেসে বাঙালীর অবিসম্বাদী প্রাধান্য ছিল—কিন্তু তখনকার কংগ্রেস একটা বার্ষিক সম্মেলন বই কিছু ছিল না। ইহা ছিল কয়েকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে ধার দিবার শানপাথর। কংগ্রেসে যখন সকলকে ডাক দিবার পালা আসিল, তখন আপনিই ব্যক্তিসর্বস্ব বাঙালীর নেতৃত্ব খসিয়া পড়িল। সমাজে ব্যক্তির অস্তিত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়াও গান্ধীজী সমষ্টিসাধনার মন্ত্র লইয়া আবির্ভূত হইলেন। এই আদর্শ ঊনবিংশ শতকের আদর্শ নয়। বরঞ্চ বলা উচিত দীর্ঘ এক শত বৎসর ধরিয়া ইংরাজি শিক্ষিত ভারতবর্ষ যে সাধনা করিতেছিলেন—গান্ধীজীর আদর্শ তাহার বিপরীত। এতদিন ছিল জনগণবর্জিত ভারতবর্ষ—এবার তাহার স্থলে দেখা দিল জনগণের ভারতবর্ষ! ইতিহাসের পেণ্ডুলাম ব্যক্তি সাধনার দিক হইতে সমষ্টি-সাধনার দিকে ফিরিয়া আসিল।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সাধনার অনুষঙ্গরূপে বাঙলা দেশে দ্রুত একটা মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়িয়া উঠিল। ইহা একাধারে ইংরাজ শাসনের কীর্তি ও অপকীর্তি, একাধারে ইহাই তাহার প্রতিষ্ঠা ও বিনাশের কারণ। এই মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী শ্রেণীর সাহায্যেই ইংরাজ এদেশ শাসন করিয়াছে—অবশেষে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ইংরাজ শাসনে বীতরাগ হইয়া তাহার প্রতিষ্ঠার প্রথম ইঁটখানা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া ইংরাজ শাসনের বেদীকে শিথিল করিয়া দিল। বাঙালী সন্ত্রাসবাদীগণের সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মান মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা আর পূর্ববৎ নাই, ব্যাপক যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে তাহাদের প্রভাব প্রতিদিন কমিতে থাকিবে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে লইয়াই বাঙলা দেশের বিশেষ সমস্যা। এ সমস্যা এমন বৃহদাকারে অন্যান্য প্রদেশে নাই। বিহারের সমস্যা, উত্তর বিহারের কৃষক, দক্ষিণ বিহারের শ্রমিক। বাঙালীর বিশিষ্ট সমস্যা কৃষকও নয়, শ্রমিকও নয়, কারণ বাঙলার অধিকাংশ শ্রমিক অবাঙালী, অধিকাংশ কৃষক—হায়, এখন পূর্ব পাকিস্থানভুক্ত। বাঙলার বিশিষ্ট সমস্যা এই লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত, নানাগুণে কৃতী, অধুনা অসহায় ও অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইহারাই একদা ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে, বাঙালীর সংস্কৃতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে এবং ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে! এখন ইহারা ক্লান্ত, জীবিকার্জনে অক্ষমপ্রায়। এখন ইহারা 'De-mobilised' সৈন্যের মতো অসহায়ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছে। কর্তৃপক্ষ ইহাদের ভাবেন অবাঞ্ছিত, সাধারণে ভাবে অতিরিক্ত, আর ইহারা নিজেদের ভাবে অভিশপ্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুষ্ঠু সমাধান না ঘটিলে ইহারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে দিবে না, হয়তো সেই অশান্তির ফলে আবার শাসনবেদীর ইঁট খসিয়া পড়িতে আরম্ভ

করিবে। ইহাদের প্রত্যেকেরই থলিতে সম্ভাবিত লাল নিশান গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে।

আজ এই যে অবস্থায় আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি—ইহা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চরমরূপ, চরম কুফল। ইহার মূল হেয়ারের পাঠশালায় এবং হিন্দু কলেজের পাঠগৃহে। সেকালে ইংরাজি শিখিলেই চাকুরি জুটিত, লাট সাহেব ডাকিয়া ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন, কেহ বলিত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কেহ বলিত বাবার মত জানিয়া জানাইব, আবার কাহাকেও ঢাকায় যাইতে অনুরোধ করিলে বলিত অ-গঙ্গার দেশে মা যাইতে রাজী নহেন। সেকালে চাকুরীদাতাই উমেদার ছিলেন। একালে ইংরাজি জানা দূরের কথা, ইংলিশ চ্যানেল গিলিয়া পান করিলেও চৌকিদারটাও ফিরিয়া তাকায় না। সেকালের সমাধান—একালের সমস্যায় পরিণত। সেকালের জ্ঞান-কৈবল্যের তীক্ষ্ন তরবারী কর্মহীন বাঙালীর হাতে পড়িয়া কেবলি চুল চিরিবার চেষ্টা করিয়া দলে দলে 'অমিত রায়ের' সৃষ্টি করিতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া দেশব্যাপী উচাটনের সম্মুখে একটা পথ দেখাইলেন বটে—কিন্তু অক্ষয় দত্তের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মকে বেদের বেদী হইতে নামাইয়া আত্মপ্রত্যয়ের উপরে প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্রোতকেই সাহায্য করিলেন। ধর্ম আত্মপ্রত্যয় সত্য হইলে কে কাহার কথা মানিবে? কাহার মত সত্য বুঝিব: সকলেই যে স্ব স্ব প্রধান হইয়া দাঁড়ায়? আমি যাহা বুঝি করি, তুমি যাহা বোঝো করো, সে যাহা বোঝে করে কিন্তু এই সব বোঝার সংগতি কোথায়? বেদকে আমিও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বলি না—কিন্তু চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ একটা কিছু থাকা দরকার—নতুবা কাজ চলাই যে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নিজ নিজ আত্মপ্রত্যয় অনুসারে কাজ করিতে থাকিলে কাজ চলে কিনা জানি না—কিন্তু সমাজ অচল হইয়া পড়ে। কিম্বা সমাজের নামে যে বস্তু টিঁকিয়া থাকে তাহা ব্যক্তিসর্বস্ব ব্যক্তিসমূহের একটা সমষ্টি মাত্র। সমষ্টি মাত্রেই সমাজ নহে। পরস্পরের মধ্যে অনিবার্য অপরিহার্য যোগের ফলেই সমাজ গড়িয়া ওঠে। আত্মপ্রত্যয়কে মুখ্য প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ সেই যোগসূত্রকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আমার নিজের ধারণা এই পরিবর্তনে দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে সুখী হন নাই—যুক্তির অমোঘ পরিণামকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মন যেন তেমন করিয়া সায় দেয় নাই। আমার আরও একটি ধারণা এই যে, বেদকে মুখ্য প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া রাখিলে ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজের অন্তর্গত অসংখ্য সম্প্রদায়ের অন্যতম হইয়া বিরাজ করিত।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই স্রোতকেই আরও প্রবল করিয়া তুলিল, কেশব সেন যখন স্বীকার করিলেন যে,—'ব্রাহ্মরা হিন্দু নহে।' এতদিন হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের মাঝে চলাচলের একটা পথ তবু ছিল, এবারে সুগভীর পরিখা খত হইল, আর এই দুস্তর পরিখায় বেষ্টিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতা লাভ করিল, অবশ্য কেশব সেন ভক্তিমার্গের প্রবর্তন করিয়া কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান-কৈবল্যের প্রতিষেধন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কিন্তু ততদিনে ব্যাধি যে চিকিৎসার অতীত হইয়া পড়িয়াছে।

যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সোপানাবলী বাহিয়া আমরা বর্তমান অবস্থায় নামিয়া আসিয়াছি—তাহারই কতকগুলির বর্ণনা করা হইল। আরও একটি প্রধান ধাপ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের চাকুরিজীবিতা। চাকুরীজীবী ব্যক্তি ক্রমে সমাজ নিরপেক্ষ হইয়া পড়ে, কারণ সে মনিবকে খুশী রাখিয়া অনায়াসে আর সকলের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে পারে। সমাজের উপরে নির্ভর করিবার তাহার প্রয়োজনটা কি? পয়সা দিলেই উদ্দিষ্ট বস্তু মেলে, সেই পয়সা মেলে মনিবের কৃপায়। অতএব মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিলেই যথেষ্ট। এই সহজ তত্ত্ব সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রভাবিত করিয়াছে—ফলে প্রত্যেক বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার একান্তভাবে স্বচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিরবচ্ছিন্ন দোষ নয়—কিন্তু তাহা বর্তমান যুগোচিত গুণও নয়। যাহা আমাদের তৎকালে শ্রেষ্ঠ দান করিয়াছে—আজ তাহাই আমাদের জীবনবায়ু হরণ করিতে উদ্যত।

কিন্তু ইহাই ঊনবিংশ শতকের একমাত্র মানসিক স্বরূপ নহে। ইহারই সঙ্গে বা ইহারই প্রতিষেধকরূপে আর একটি মানসিক স্বরূপ ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, সেটি সমন্বয়ের ধারা। বিচিত্র শক্তি এবং বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি—ভারতবর্ষের বিশেষ প্রতিভা। এই প্রতিভাই মনীষিগণের চিত্তে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। যাঁহারা ভারত আবিষ্কারে বাহির হইয়াছিলেন, এই সমন্বয় পন্থা আবিষ্কারও তাঁহাদেরই কীর্তি। কারণ ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বিশেষ প্রতিভা একার্থক। রামমোহন রায় এই আবিষ্কারক দলের অগ্রণী। হেয়ার ডিরোজিও যেমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ধারার উৎস, রামমোহন তেমন সমন্বয়-বাদীদের প্রথম। তাঁহাদের শিষ্যগণ যেমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারার ধারক ও বাহক ছিলেন, তেমনি রামমোহনের ভাবশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন প্রভৃতি ছিলেন সমন্বয়সাধকগণের অন্যতম। এই সমন্বয়ের চূড়ান্ত রূপ পাই রামকৃষ্ণদেবে ও রবীন্দ্রনাথে। যদিচ এই দুই মহা-পুরুষের সাধনায় ও কর্মে দুস্তর প্রভেদ তবু ঐ জায়গাটায় মিল আছে। কেশব সেন ও বিবেকানন্দকে দুটি ধারাই স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহারা দুজনেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমন্বয়বাদের পথের মোড়ে দণ্ডায়মান। কেশব সেনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মুখ্য, সমন্বয়বাদ গৌণ; বিবেকানন্দে ঠিক তাহার বিপরীত। কিম্বা আরও সূক্ষ্মতর বিচারের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে বলিতে হয় যে, একমাত্র রামকৃষ্ণ ব্যতীত সেকালের সকল মনীষীতেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছোঁয়াচ লাগিয়া ছিল। সেকালের সাধারণ হাওয়াটাই ছিল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের—ইঁহারা সকলেই ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, কেহই হাওয়ার স্পর্শ এড়াইতে পারেন নাই, কেবল ইংরাজিজ্ঞানবর্জিত রামকৃষ্ণের কাছে হাওয়াটা ঘেঁষিতে পারে নাই।

তৎকালে প্রাদেশিকতা বলিয়া কোন সত্তা কাহারো পরিজ্ঞাত ছিল না, কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, ভারত ছাড়া তেমনি কথা ছিল না। প্রাদেশিকতা আসিয়াছে অনেক পরে। প্রাদেশিকতা আসিয়াছে কতক পরিমাণে অনভীষ্ট কার্যকারণের ফলে, কতক পরিমাণে অভীষ্ট অভিপ্রায়ের ফলস্বরূপে। বাঙলাদেশেই যেমন ভারতোপলব্ধির সূত্রপাত, বাঙলাদেশেই তেমনি প্রদেশোপলব্ধির আরম্ভ।

স্বদেশী আন্দোলনের পরোক্ষ বা অনভীষ্ট ফল বঙ্গোপলব্ধি অর্থাৎ প্রদেশোপলব্ধির চেতনা। অন্যান্য প্রদেশে এই চৈতন্য আসিয়াছে অনেক পরে, যেমন ভারত-চৈতন্যও সেই সব প্রদেশে আসিয়াছে অনেক পরে। অন্যান্য স্থানে প্রদেশচৈতন্যের প্রথম সজ্ঞান সক্রিয় সূচনা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনতন্ত্রানুমোদিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পর হইতে। এই

চৈতন্যকেই প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে ১৯৪৬-৪৭ সালের মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামজাত আঘাত। উগ্র হিন্দু-চৈতন্যও প্রাদেশিক চৈতন্যের প্রকারভেদ মাত্র। ঊনবিংশ শতকের মনীষীরা আগে নিজেদের ভারতীয় বলিতেন, হিন্দু বলিতেন পরে। এখন আমরা আগে নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই, ভারতীয় না বলিতে পারিলেই যেন বাঁচি। ইংলণ্ডের লোক নিজেদের পরিচয় দিবার সময়ে ইংরাজ বলে, খৃষ্টান বলিবার প্রয়োজন বোধ করে না।

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক চৈতন্য আরও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশের লোক স্ব স্ব প্রদেশের মধ্যে আবদ্ধ এত বেশী যে, নিজের প্রদেশটিই তাহার কাছে ভারতবর্ষ হইয়া উঠিয়াছে—অন্য প্রদেশের স্বার্থ বা দাবী দেখিবার ইচ্ছা বা অবকাশ তাহাদের নাই। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল চলিতে থাকিলে ভারতীয় অখণ্ডতার তিরোধান অবশ্যম্ভাবী। আর এ দেশের দীর্ঘকালের ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে ভারতীয় অখণ্ডতা যখনই ব্যাহত বা শিথিল হইয়াছে—তখনই এ দেশে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীন মহামারী দেখা দিয়াছে। মুসলিম লীগের দাবীতে ভারতবর্ষ আজ দ্বিখণ্ডিত, আর এমন উগ্র প্রাদেশিকতা কিছুকাল চলিলে ভারত-রাষ্ট্র কতকগুলি প্রদেশের সমষ্টিতে মাত্র পরিণত হইবে। ভারতবর্ষ আজ সেই পথেরই যাত্রী। কাজেই এক হিসাবে ঊনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষীদের সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। যাহাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতাবিষ্কার করিয়াছিলেন, আজ তাহারাই প্রাদেশিকতার ধ্বজ-পতাকা বহনে সমুদ্যত।

এখন সমস্ত দেশ দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ স্রোতের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি স্রোত প্রাদেশিকতাবাদের, আর একটি স্রোত সমষ্টিবাদের। ঊনবিংশ শতকের প্রধান ধারা দুইটিও পরস্পরবিরোধী ছিল—ভারতীয়তাবোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এই কারণেই ঊনবিংশ শতকের মনীষা আশানুরূপ সুফল রাখিয়া যাইতে পারে নাই। এ যুগের স্বতোবিরোধী স্রোতদ্বয়ের সংঘর্ষ যে আমাদের কোথায় লইয়া ফেলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পরিণাম শুভসূচী নহে।

এই চিত্র-চরিত্র গ্রন্থে বাংলার সকল মনীষীর নাম দেওয়া যায় নাই—এমন কি ঊনবিংশ শতকের সকলেরও উল্লেখ করিতে পারি নাই। কাহারো প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ এই অনুল্লেখ নহে। গত যুগের প্রধান প্রধান ভাবপ্রবাহের অনুবর্তনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সেই ভাবপ্রবাহের দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনীষিগণের কীর্তি ও জীবনকথা উল্লিখিত হইয়াছে। যুগ-জীবনীর খসড়া রচনায় তাঁহারা উপাদান। তবে একথা বোধ করি সত্য যে, অন্যান্য মনীষীর চিত্র-চরিত্র অংকন করিলেও যুগের স্বরূপের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইত না, কেবল দৃষ্টান্ত বাড়িত এই পর্যন্ত। কিন্তু মানুষের শক্তি অসীম নয় বলিয়া এক জায়গায় সীমা টানিতেই হয়। তাহাতে লেখকের শক্তির অভাব প্রমাণ হয়, শ্রদ্ধার অভাব নয়।

এই গ্রন্থ রচনায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ নামে সুপরিচিত গ্রন্থ হইতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাইয়াছি। বস্তুতঃ এই সুলিখিত গ্রন্থকে চিত্র-চরিত্রের অগ্রজ মনে করিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালা নামে বাংলার সামাজিক ও সাহিত্যিক ইতিহাসের যে ধারাবাহিক খসড়া প্রকাশিত করিতেছেন, তাহার সাহায্য না লইয়া ঊনবিংশ শতক সম্বন্ধে কাজ করা সম্ভব নহে। আমি তো বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ইঁহারাই আমার প্রধান উত্তমর্ণ। ছোটখাটো উত্তমর্ণের নাম করিতে হইলে তালিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে—তাঁহাদের সকলের সাহায্য শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। দেশ পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিলে প্রত্যবায় হইবে—তাঁহারা সহিষ্ণু না হইলে চিত্র-চরিত্র নিশ্চয় প্রকাশের সুযোগ পাইত না।

সর্বশেষে দেশ পত্রিকার পাঠকবর্গের বর্ষব্যাপী সহিষ্ণুতার জন্য সপ্রশংস সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করিয়া কৃতার্থ হইলাম। 'বন্দে ভারতম্'

২৩-১০-৪৮

সমাপ্ত

হেথা নয়

এস এম মোজ্‌হারুল ইস্‌লাম

হেথা নয় সেথা নয়, আর কোনোখানে
আর কোন নীড়ের সন্ধানে
হে আমার আশা-পাখী ছুটে চলো সেথা
শোন না কি আজিকার ঝড়ের বারতা?

এখানে যেটুকু আছে প্রেমের বাঁধন,
এখানে যেটুকু আছে প্রীতির বাঁধন,
হৃদয়ের বাতায়নে যতটুকু ভাষা
সব যেন আচ্ছাদিত দীপ্তিহীন ঊষার আবীরে,
যতটুকু আছে ভালবাসা,
সব যেন শৃংখলিত বিসর্পিল স্বার্থের প্রাচীরে,
জীবনের গতিপথ, নগ্ন উলংগ গতিপথ
রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে সমুন্নত কুটিল পর্বত।

হিংস্র উন্মত্ত মিছিল
এখানে গড়েছে এক সাহারার মরুভূ নিখিল।
একের যজ্ঞের কুণ্ডে অন্যের আহুতি,
এ নিখিলে এনে দেয় প্রশান্ত জৈবিক-অনুভূতি।

জীবনের ক্লান্ত আহাজারি,
মৃত্যুর কুটির প্রান্তে খুঁজে ফেরে মুক্তির দিশারী!

তবু কোথা সাড়া নেই এতোটুকু নাহিক আশ্বাস,
তবু শুধু শুনি সেই একঘেঁয়ে মর্মের উচ্ছ্বাস?

এইখানে আর নয়, আর নয়; হায়,
নীড় বাঁধিবার স্থান নাহি এ ভুবন সীমানায়,
যেতে হবে দূর প্রান্তে নব এক পৃথিবী-সন্ধানে,
হেথা নয় চলো চলো আর কোনোখানে।

প্রজা-সপ্তাহে দেশবন্ধু পার্কের এক সভায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন বলিয়াছেন—"পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে ও বস্ত্রে যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারে, দেবীর কাছে যেন এই প্রার্থনাই করেন"—

খাদ্যে ও বস্ত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রার্থনাটা আমরা বহুদিন হইতে দেবীর

কাছেই করিয়া আসিয়াছি। নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ভাবিয়াছিলাম, এই পুরাতন রীতিটার রদবদল নিশ্চয়ই কিছু হইবে। কিন্তু দেখিতেছি, সরবরাহ বিভাগটি এখনও যথারীতি দেবীর হাতেই রহিয়া গিয়াছে।

* * * * *

প্রজা সপ্তাহের একটি কৌতুকপ্রদ সংবাদে প্রকাশ, একটি গাধার গায়ে আলকাতরা দিয়া "Black marketeer" কথাটা লিখিয়া তাহাকে একটি মিছিলে টানিয়া নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু চোরাকারবারীরা গাধা—এই অপবাদ তাদের অতি বড় শত্রুরাও দিতে পারে না। আমরা নিজেরা গাধা বলিয়াই তাদের বুদ্ধির কারিগরিটা আমাদের কাছে ধরা পড়িল না!

* * * * *

"খেতে ভয় পাচ্ছেন কি"—একটি বিজ্ঞাপনের প্রশ্ন। খুড়ো উত্তর দিলেন—"না, খেতে না পাবার ভয়ে কাবু হয়ে আছি"।

* * * * *

আসামের এক অঞ্চলে নাকি হাজার হাজার ইঁদুর আসিয়া খাদ্যশস্য খাইয়া নানারকম উৎপাত করিতেছে। সংবাদে প্রকাশ, একপ্রকার বাঁশের ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াই নাকি তারা আসে।—"লাঠির বদলে ফুল দিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই এ রকম উৎপাত এসে ঘাড়ে চড়ে"—খুড়ো কথাটা বলিয়া আবার কবিগুরুর রচনাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন—"বংশে যদি বংশী শুধু বাজে, বংশ তবে ধ্বংস হতো লাজে।"

* * * * *

কাথিবাড়ে একদল গুন্ডা নাকি মানুষের নাক কাটিয়া বেড়াইতেছে। নিজের নাক কাটিয়া পরে যাত্রা-ভঙ্গের কথা শুনিয়াছিলাম। ইঁহারা বোধ হয় পরের নাক কাটিয়া নিজের যাত্রা-ভঙ্গের ব্যবস্থা করিতেছেন।

* * * * *

কলিকাতার ট্যাক্সি এসোসিয়েশন ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জীর কাছে অভিযোগ করিয়াছেন, যাত্রীরা নাকি পাঞ্জাবী ট্যাক্সি চালকের বিরুদ্ধে নানারকম প্রচারকার্য চালাইতেছেন—

"যাত্রীদের কোন এসোসিয়েশান নেই বলে তাদের অভিযোগ মিটারে recorded হলো না"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

বাঙালোরে টেলিফোনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। যথাসম্ভব সত্বর নির্ভুল নম্বর পাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য এই কারখানার কোন হাত নাই। সুতরাং............

* * *

বৃটেনের পররাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন—"Key to peace lies in Indian ocean".

এমন স্পষ্ট করিয়া শান্তিকে জলাঞ্জলি দেওয়ার কথা আর কেহ বলেন নাই!

* * * * *

BRITAIN keeping human skin in stores — অন্য একটি সংবাদ।
খুড়ো বলিলেন—"চামড়াটা নিশ্চয়ই চোখের, কেননা ওটার অভাবই ওদের বেশী।"

* * *

শুনিলাম ডন ব্র্যাডম্যান নাকি ক্রিকেট ছাড়িয়া শীঘ্রই রাজনীতিতে যোগদান করিবেন।
পাল্টা জবাব হিসাবে ইংলন্ড হইতে চার্চিল

সাহেব রাজনীতি ছাড়িয়া ক্রিকেটে যোগদান করিবেন কিনা সে সংবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

* * *

বিজয় মার্চেন্ট বলিয়াছেন—"West Indies cricketers will carry the most pleasant memories of their visit".
খুড়ো বলিলেন—"খুব ভালো আশ্বাস—But let them not carry their bats.

* * *

শুনিলাম জব্বলের রাজা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারে এক টাকা মাহিয়ানায় একটি চাকুরি নিয়াছেন। Pay Commission আশা করি এই আদর্শবাদের উপর ভিত্তি করিয়া কেরানীকুলের মাহিয়ানার মান নির্ধারণ করিবেন না।

জেলে ত্রিশ বছর—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস। ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য ৩৲

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী যিনি 'মহারাজ' নামে বাঙলার স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে সুপরিচিত, তিনি ১৯০৮ সাল হইতে ৩০ বৎসর কারাগারেই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে লেখক তাঁহার কর্মজীবন ও কারাগার জীবনের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে বাঙলার নগরে ও পল্লীতে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাঙলার বিপ্লবী দল স্বাধীনতার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া কিভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিভাবে নির্ভীক ও নিঃস্বার্থভাবে বহু যুবক সেই সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাহার জীবন্ত ও জ্বলন্ত কাহিনী লেখক সহজ ও স্বাভাবিক ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। লেখার মধ্যে কোথাও তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নাই—গভীর অনুভূতি দ্বারা নিরাসক্ত মন লইয়াই তিনি এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একদিকে বিপ্লব যুগের সাফল্যের কথাও যেমন তিনি লিখিয়াছেন, তেমনি বিপ্লবীদের কর্মপন্থার দোষ ত্রুটি ও ব্যর্থতার কথাও তিনি ব্যক্ত করিতে কার্পণ্য করেন নাই। জীবনের সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত, সাফল্য-অসাফল্যের মধ্য দিয়া ঘা খাইতে খাইতে একজন একনিষ্ঠ আজীবন-সংগ্রামী বিপ্লবীর মনের পরিবর্তন ও পরিণতির ইতিহাস এই গ্রন্থে অপূর্ব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ত্রিশ বছরের জেল-জীবনের ইতিহাস একটি যুগের ইতিহাস এবং লেখক আশ্চর্য দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সহিত তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙলার একটি জাতীয় সম্পদ এবং উপন্যাসের চেয়েও অধিক চিত্তাকর্ষী এই পুস্তক বাঙলার প্রত্যেক নরনারীর পাঠ করা উচিত। ভূমিকায় লেখক জানাইয়াছেন—"আমার পুস্তক জেলে লেখায় এবং বাহিরে আসিয়া নানা কাজে ব্যস্ত থাকায়, বিপ্লব যুগের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে পারি নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তৃত ইতিহাস লেখার ইচ্ছা রহিল।"

আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য আগ্রহাকুল চিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। বইখানির কাগজ মুদ্রণ ও প্রচ্ছদচিত্র লেখকের রচনার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। এই গ্রন্থে বিপ্লবী যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার দুষ্প্রাপ্য ছবিও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

MAHATMA GANDHI—Pictorial History of a great Life. Collected, compiled, edited and published by JAN BAROS. 1948. Checkoslovak Society, Calcutta, P.O. Batanagar, 24 Parganas. West Bengal. Price Rs. 15|-.

গান্ধীজীর জীবন-চিত্রের এখানি অতুলনীয় আলেখ্য গ্রন্থ। গান্ধীজীর জন্ম ও শৈশব হইতে শুরু করিয়া সমগ্র জীবনের ও তদীয় পার্থিব পরিবেশের মোট ২৩৩খানি ফটোগ্রাফ একত্র আর্ট পেপারে মুদ্রিত করিয়া এই 'আলেখ্য সংগ্রহ' বা 'এলবাম'খানা সাজানো হইয়াছে। গ্রন্থখানার আকার বৃহৎ এবং অধিকাংশ ফটোই পূর্ণ পৃষ্ঠার। গান্ধীজীর মহান্ জীবনের অধ্যায়গুলি এই এলবামের প্রতি পৃষ্ঠায় ছবির পর ছবিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ফটোগুলি এমনি নিপুণভাবে সংগ্রহ করিয়া পর পর সাজানো হইয়াছে যে, কেবল পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া গেলেই এই বিরাট জীবনের পূর্ণালেখ্যখানি চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইবে। ছবিগুলির পরিচয় দিতে গিয়া ইংরাজী ও হিন্দী উভয় ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে; তাহাতে গ্রন্থের গাম্ভীর্য ও উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গান্ধীজীর জন্মস্থান এবং পৈত্রিক ভবনের ফটো এবং তাঁহার শৈশবকালের ও পাঠ্যাবস্থার বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি গ্রন্থের প্রথমাংশে পাওয়া যাইবে। অতঃপর তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী জীবনের আলেখ্য এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃপদ গ্রহণকালের অনেক চিত্তাকর্ষক ছবি দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর চিত্রের পর চিত্রে গান্ধীজীর বিরাট জীবন বর্ণিত হইয়া চলিয়াছে। নোয়াখালি ও বিহার পরিক্রমার ছবিগুলি এবং গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শোকসূচক ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এই বিরাট জীবনের দুইটি বিশিষ্ট অধ্যায় বিশদভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে।

আলোচ্য আলেখ্য গ্রন্থটিকে গান্ধীজীর জীবনের একখানা চলচ্চিত্র বলা যাইতে পারে। সবগুলি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাওয়ার পর স্বতঃই মনে হইবে যেন একখানি বিরাট বিয়োগান্ত মহাকাব্যের পাঠ পরিসমাপ্ত হইল। চিত্রে এইরূপ ধারাবাহিকতা রক্ষা করার মূলে ইহার সংকলয়িতার বিপুল শ্রম ও যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি অভারতীয় প্রতিষ্ঠানের এই প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞতার সহিত বন্দনীয়। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য তাঁহারা এই যে আয়োজন করিলেন তাহা সার্থক হইয়াছে। সংকলয়িতা জানাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থের সমগ্র আয় মহাত্মা গান্ধী জাতীয় স্মৃতি অর্থ ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে। এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

যক্ষ্মাও সারে! পশুপতি ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ৯২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। বিক্রেতা ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

'দেশ' পত্রিকার পাঠকগণের নিকট ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন দেখি না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধগুলি 'দেশে'র পাঠকগণের বিশেষ তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে। আলোচ্য গ্রন্থের কতক কতক প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে লিখিত মোট দশটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলি মোটামুটিভাবে অন্য নিরপেক্ষ হইলেও, লেখক এইগুলিকে পর পর এমনভাবে সাজাইয়াছেন যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ঐক্যবন্ধন সূচিত করে। বস্তুতঃ এগুলি একই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদসদৃশ। যক্ষ্মার ঐতিহাসিক কাহিনী, ক্ষয়-রোগের কারণ, ক্ষয়রোগ ধরবার উপায়, আরোগ্যের উপায়, বিশ্রাম, বাতাস, খাদ্য, থার্মোমিটার দেখা, চিকিৎসার কথা এবং প্রতিরোধের কথা—এই কয়টি শিরোনামায় প্রবন্ধগুলি বিন্যস্ত।

অধুনা যক্ষ্মারোগের প্রসার বিশেষরূপে পাইতেছে। **এই** রোগে আক্রান্ত হইলে লোক তাহার **জীবনের** আশা একরূপ করিয়া বসে। **কারণ** এই রোগটি যমের বলিয়াই **সাধারণতঃ** তাহাদের বিশ্বাস। আলোচ্য **গ্রন্থের লেখক** এই ধারণা দিয়াছেন। এই রোগের প্রতিরোধ ও প্রতি সম্বন্ধে তিনি যেমন অনেক মূল্যবান কথা ছেন তেমনি এই রোগের আধুনিকতম চি সম্বন্ধেও অনেক আশার বাণী শুনাইয়া সাধারণের মধ্যে এই বইটির প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মহাভারতীয় উপাখ্যান—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মহাজাতি প্রকাশক, ১০, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা

শিশুদের উপযোগী ২৩টি নীতিগল্প মহাভারত হইতে সংকলন করিয়া পুস্তকটি রচনা হইয়াছে। মহাভারত গল্পের রত্নাকর বিশেষ উহার যাবতীয় উপাখ্যানই একদিকে যেমন সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে ক্ষমা, ত্যাগ, দাক্ষিণ্য সত্য প্রেম ও ধর্মনীতিতে ভরপুর। এই সকল গল্পের তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। আমাদের ছেলেমেয়েদিগের চরিত্র গঠনে সহায়তা করার জন্য শৈশবেই এই সকল গল্পের সহিত পরিচিত করাইবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতের গৌরব মহিমাপূর্ণ এই সকল উপাখ্যান চরিত্র গঠনে পরম সহায়ক। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ বাঙলার ছেলেমেয়েদের জন্য সহজ ভাষায় সংক্ষেপে এইরূপ কতকগুলি গল্প সংকলন করিয়া শিশুদের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা বইটি শিশুদের অভিভাবক ও শিক্ষকগণের দৃষ্টি করিতেছি। ২৪৯।৪৮

শ্রীউদ্ধবসংবাদঃ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত) শ্রীসারস্বতগৌড়ীয় আসন-মিশন-প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন। মূল্য প্রথম খণ্ড সাত টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড টাকা; দুই খণ্ড একত্রে বারো টাকা।

'শ্রীউদ্ধবসংবাদঃ' গ্রন্থখানা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অন্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে উনত্রিংশৎ অধ্যায় পর্যন্ত শ্লোকসমূহের সংগ্রন্থন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত মূল শ্লোক, শ্রী স্বামীপাদের আনুগত্যে অন্বয়, অনুবাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা এবং টীকার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের টীকার আনুগত্যে সম্পাদক মহাশয়ের সারার্থানুদর্শিনী নামে বঙ্গভাষায় যে টীকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা একাধারে গভীর পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। এই টীকাতে বক্ষ্যমান শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রের তথ্যসমূহ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় তৎসমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বঙ্গানুবাদ সম্ভবতঃ এই প্রথম প্রকাশ করা হইল; ইহা আলোচ্য গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণবের মুকুটমণিস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে উদ্ধব সংবাদ অংশ মধ্যমণি সদৃশ। এই অংশটিকে এইরূপ মূল্যবান টীকা-টিপ্পনীতে সংবদ্ধ ও সুসমৃদ্ধ করিয়া প্রকাশ করায় সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয় ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থপাঠে ভক্তগণ পরিতৃপ্ত এবং পাঠকসাধারণ উপকৃত হইবেন।

[illegible] কয়েক আগে মধ্য কলকাতার নবগঠিত [illegible] একটি চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে [illegible] হানা দেয় এবং ওদের কর্তৃপক্ষের [illegible]কে ধরে নিয়ে যায়। শোনা গেল, তাদের [illegible] হচ্ছে এই যে, তারা ছবি তোলার নাম [illegible] বহু লোকের কাছ থেকে চাঁদা নিয়েছে, [illegible] অংশীদারী সর্তে, কিন্তু তারা স্ত্রীলোক-[illegible] কয়েকটি ব্যাপার পাকিয়ে তোলা ছাড়া [illegible] কাজ কিছুই করে উঠতে পারেনি। বহুকাল ধরেই এই প্রতিষ্ঠানটি একখানি ছবি নির্মীয়মান বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছে। তার ভূমিকালিপিতে কয়েকজন নামকরা শিল্পীর নাম যুক্ত দেখা যায়, তাছাড়া সংশ্লিষ্ট আর সব বিভাগে যেসব নাম দেখা যায়, তারা চলচ্চিত্র-জগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত। পুলিশ এঁদের পিছনে ভাল করে লাগলে এদের আসল উদ্দেশ্য হয়তো জানতে পারা যাবে। কিন্তু এ ধরণের এটা একটা মাত্র উদাহরণ নয়। ১৯৪৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ছবি তোলার নাম করে শ' তিনেরও বেশি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার খবর পাওয়া যায়। এর মধ্যে সত্যিই ছবি তোলায় নিয়োজিত হয়েছে এক-চতুর্থাংশের বেশি নয়, বাকীগুলোর তাহলে ব্যাপার কি? এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলিই যৌথ কারবার। এদের প্রথম কাজ হচ্ছে বেশ ঠাঁটের সঙ্গে কেতা-দুরস্ত একটা অফিস খোলা, প্রস্পেক্টাস্ ছাপানো এবং শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেণ্ট এবং অভিনয় শিল্পীর দরকার জানিয়ে দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া। কেউ কেউ ব্যাপারটাকে আরও চটকদার করে তোলার জন্যে গোড়া থেকেই একখানা যাহোক ছবির নাম এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম দিয়ে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে বসে; আরও ধূর্তরা আরও খানিকটা এগিয়ে একেবারে মহরৎ অনুষ্ঠানটিও সম্পন্ন করে নেয়, যাতে কাগজে কাগজে প্রকাশিত মহরতের সংবাদটি তাদের উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণ করার সার্টিফিকেট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সব প্রস্পেক্টাসেরই কথা প্রায় এক—ছবিতে, স্টুডিওতে আর ছবিঘরে দেশ ভরিয়ে তোলা; আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় প্রস্পেক্টাসেই পৃষ্ঠপোষক বা পরি-চালকমণ্ডলীর মধ্যে সুপরিচিত দু'-একজনের নামও থাকেই। প্রথমে সামান্য কিছু টাকা উদ্যোক্তারা চাঁদা করে তুলে অফিস খুলে বসে, তারপর চলতে থাকে শেয়ার বিক্রী। বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে শেয়ার বিক্রীর জন্যে না হোক, অভিনয় করার ইচ্ছে নিয়ে অনেকেই আসে দেখা করতে। তাদের কাছ থেকে কেউ কেউ ফরম ভর্তির জন্যে টাকা, ফটো তোলার জন্যে টাকা, স্বর পরীক্ষার জন্যে টাকা ইত্যাদি নানা খাতে পাঁচ-দশ টাকা আদায় করে নেয়

—যে-টাকা দিয়ে অফিস খরচ আর সেই সঙ্গে শহরের পানাগারগুলির পৃষ্ঠপোষকতা চলতে থাকে। কেউ কেউ আবার আবেদনকারী-দের একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতম অংক শেয়ার বিক্রীর নির্দেশ দেয়। অনেকে দু-এক হাজার টাকা করে জনকয়েকের কাছে শেয়ার বিক্রী করে ঐভাবে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা সঞ্চয় করে থাকে। চালু খরচা তা থেকেই চলতে থাকে, যেহেতু প্রস্পেক্টাসেরই একটা ধারা অনুযায়ী কাজ হোক না হোক, প্রতি মাসে অফিস খরচ বাবদ একটা টাকার অংশ গ্রহণ করা ম্যানেজিং

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান সংখ্যা হইতে 'দেশ' পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষ শেষ হইল; আগামী সপ্তাহে 'দেশ' ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিবে।

আগামী সপ্তাহের সংখ্যাখানা 'দেশে'র নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যারূপে বর্ধিত কলেবরে বাহির হইবে। এই সংখ্যায় ক্রমশ-প্রকাশ্য রচনাসমূহ ও নিয়মিত বিভাগগুলি থাকিবে এবং তৎসহ নিম্নলিখিত লেখক-গণের রচনা প্রকাশিত হইবে:—

প্রমথ চৌধুরী
ক্ষিতিমোহন সেন
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রমথনাথ বিশী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
শান্তিদেব ঘোষ
হরপ্রসাদ মিত্র
গোবিন্দ চক্রবর্তী, প্রভৃতি

এজেণ্ট বা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অধিকারে থাকেই। প্রথমে হয়তো ওদের সবায়েরই ছবি তোলাই উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু ক্রমশ সেটা রূপান্তরিত হয়ে যায় লোক ভুলিয়ে অফিস-খরচা জোগাড় করতেই এবং শেষে নিজেদের ভিতর গোলমাল ও পাওনাদারদের চাপে এক-দিন সব কোথায় যেন উবে যায়, পড়ে থাকে শুধু বদনাম, যার পুরো বোঝাটা গিয়ে চাপে চলচ্চিত্র শিল্পের ঘাড়ে, যে-শিল্পের সঙ্গে আসলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসবের জন্যে দায়ী তো নয়ই, এমন কি, ঐসব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি-দের কথা জানতেও পারেনি কোনদিন। এখন আবার উদ্বাস্তু আশ্রয়প্রার্থী ধনী ব্যক্তিরাই প্রধানত শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ভট এদের সব হিসেব—কেউ বলে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেই ছবি শেষ করে দেবে, আবার কেউ কষে দেখিয়ে দেয়, মাস ছয়েকের মধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকা লাভ। এদের ফাঁদে পা দেবার মতো লোকেরও অভাব হচ্ছে না কিন্তু। ফলে খানিকটা তোলা ছবির সংখ্যায় গুদাম ভরে উঠেছে, আর না হয়তো ধার-দেনার এমনি বিরাট বোঝা এসে ঘাড়ে চাপছে যে, তা সাফ করে কোন কালেও লাভ করা তো দূরের কথা খরচটাই তুলে আনা দুরাশা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই পাল্লায় পড়ে ভাল ভাল মহাজনও যে কতো ফেঁসে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

চলচ্চিত্র শিল্পের অন্তর্গত কেউ যে এ-কারবার একেবারে করে না তা নয়, বরং বেশ নামকরা কয়েকজনকেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, সোজাসুজি ব্যবসা করার চেয়ে মহাজন বা অংশীদারদের টাকার অংশটা নিজের ব্যাংকে জমা করে নেবার তালেই এরা থাকে। ছবি তুলে নাম করেছে বলে মহাজন জোগাড় করা এদের পক্ষে সহজ এবং মহাজনদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এরা বেশ কারবার চালিয়ে যায় একজনের পর একজনকে ফাঁসিয়ে।

বছর কয়েক ধরে বেশ খোলাখুলিভাবেই নিরীহ লোকের টাকা আত্মসাৎ করবার এই সব কারবার চলেছে এবং এখন মাত্রায় বেড়ে গিয়েছে বেশ। এখন আইন যখন থাবা বাড়িয়েছেন, তখন এই মারাত্মক দুরাচারিতা সমূলে উৎখাত হবার ব্যবস্থা হলেই ভাল হয় নাকি?

* * * *

বছর তিনেক আগে এই বিভাগে আমরা ভারতে বিদেশী ছবির যুদ্ধোত্তর প্রতিযোগিতার রূপ সম্পর্কে কিছু আভাস দিয়ে এদেশের ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছিলাম। ভারতীয় ছবি যেভাবে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে, তাতে ইংরেজি ছবির বাজার বেশিদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে ভারতের ছবির বাজারে নামতে গেলে ভারতীয় ভাষার ছবি নিয়েই নামতে হয় —বিদেশী ব্যবসাদাররা আগেই সেটা বুঝতে পেরেছে এবং ওটাও তারা বুঝতে পেরেছে যে, ওদেশ থেকে টাকা নিয়ে এসে জাগ্রত জাতীয়তাবোধের মুখে ভারতে ছবি তোলার ব্যবসা আরম্ভ করাও তাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধের হবে না। ওরা তখন দমে না গিয়ে ভিন্ন পথ ধরলে এবং ওদের অভিযানের প্রথম অগ্রক্ষেপ হলো সম্প্রতি প্রদর্শিত 'বাগদাদ কা চোর'—হিন্দুস্থানী ভাষায় রূপান্তরিত বিখ্যাত ইংরেজি ছবি 'থিফ অফ বাগদাদ'। ছবিখানির ইংরেজি সংস্করণ ইতিপূর্বে বহু লক্ষ টাকা বিদেশে চালান করে দিয়েছে। তারপর তারই এই হিন্দী সংস্করণ কমপক্ষে আরও আনু-

মানিক বিশ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠাতে সমর্থ হবে। এর পর আরও প্রায় ডজনখানেক ছবি এইভাবে হিন্দীতে রূপান্তরিত হয়ে মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। এসব ছবি তোলার খরচ তো নামমাত্র, ভাষান্তর করতে জনকয়েকের গলার স্বর ধার নেওয়ার জন্যে পারিশ্রমিক বাবদ সামান্য যা খরচ। তাছাড়া প্রত্যেকখানিরই ইংরেজি সংস্করণ বাবদ একতরফা বিপুল পরিমাণ টাকা আগেই তুলে নেওয়া হয়েছে। বৈচিত্র্য এবং উৎকর্ষে ছবিগুলি যে কোন ভারতীয় ছবির চেয়েই উচ্চ শ্রেণীর এবং ভারতীয় দর্শকদের কাছে এসব ছবি যে কতটা জনপ্রিয় হতে পারে, তার এই প্রমাণই যথেষ্ট যে, 'বাগদাদ কা চোর' মুক্তিলাভের প্রথম সপ্তাহে ভারতের তিন-চারটি শহর মিলিয়ে দেড় লক্ষাধিক টাকা তুলতে সমর্থ হয়, যা কোন ভারতীয় ছবির ভাগ্যে ঘটে না। ভারতে বর্তমানে ছবির সংখ্যা যে রকম বেড়েছে, তাতে ভারতীয় ছবির জন্যে চিত্রগৃহে স্থান পাওয়াই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার ওপর বিদেশী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা, অবস্থা কোথায় নিয়ে যাবে সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া আরও ভাববার বিষয় হচ্ছে যে, এক-একখানা বিদেশী ছবি এসে ভারতীয় দর্শকদের পকেট থেকে ঐরকম এক-বার ইংরেজি সংস্করণে কয়েক লক্ষ টাকা, তার-পর তারই হিন্দী সংস্করণ দেখিয়ে বিশ লক্ষ টাকা করে যদি নিয়ে চলে যায় তো ভারতীয় ছবির জন্যে ভারতীয় দর্শকদের পকেটে আর ক' পয়সাই বা থাকছে! —ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের তেজ আর কদিনই বা থাকবে তাহলে। এখনো সময় আছে এই আক্রমণ থেকে বাঁচবার; সেটা হচ্ছে ভারতীয় ছবির সমস্ত চিত্রগৃহে বাধ্যতামূলক প্রদর্শন নীতি প্রণয়ন করা। তা নাহলে বিদেশী ছবির চাপে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের নিঃশেষে মিলিয়ে যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। এ-প্রস্তাবও আমরা কয়েক বছর ধরে করে আসছি, কিন্তু না চিত্র-ব্যবসায়ীরা, আর না সরকারী পক্ষ, কারুরই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। এখন একেবারে শিয়রে শমন দেখে ব্যবসায়ীরা আঁতকে উঠেছে; এতদিনে বোম্বেতে এ নিয়ে জল্পনাও আরম্ভ হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় যে, বিদেশী ছবির যে বর্তমান অভিযান, তার প্রধান জেনারেল হচ্ছেন ভারতীয় চিত্র-শিল্পেরই পাণ্ডাদের কয়েকজন, যেমন ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিমিটেডের কে এম মোদী, যার অধীনে ভারতের প্রধান শহরগুলি মিলিয়ে অনেকগুলি চিত্রগৃহ রয়েছে; যেমন শান্তারামের রাজকমল কলামন্দির, যেখানে ঐসব ছবি হিন্দীতে ভাষান্তরিত হচ্ছে! ছবির বাজার যতদিন যাবে, ততই প্রশস্ততর হবেই—বাঙলা চিত্রশিল্পকে সমৃদ্ধ ও সংরক্ষিত করার জন্যে আঞ্চলিকভাবে সমস্ত চিত্রগৃহে বাঙলা ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন নীতি না করে নিতে পারলে যেমন বোম্বের ছবি বাঙলার বাজারকে দখল করে নেবেই, তেমনি সমগ্র ভারতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি ছবিঘরগুলিতেও ভারতীয় ছবির আনুপাতিক প্রদর্শন নীতি প্রবর্তন করতে না পারলে বিদেশী ছবির পক্ষে ভারতীয় বাজার দখল করে নিতে কতদিনই বা লাগবে?

খুচরা খবর

ভারতীয় ছবির দৈর্ঘ্য যুদ্ধকালের মতো আবার এগারো হাজার ফিটে বেঁধে দেওয়ার কথা সরকারী মহলে প্রায় ঠিকই হয়ে গেছে, যদিও মাদ্রাজ চাইছে ওদের ছবির দৈর্ঘ্য সাড়ে তের হাজার ফিটে বেঁধে দেওয়ার জন্যে। ছবির দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রিত হলে তা থেকে যে পরিমাণ কাঁচা ফিল্ম বাঁচবে, তাতে আরও প্রায় তিরিশ খানি ছবি তোলার মতো মাল পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা যায়—অবশ্য ওদিকে পসেটিভের চাহিদা সেক্ষেত্রে আবার বেড়ে যায়।

* * * *

বিলেতের আর্থার র‍্যাংক আমেরিকায় বিলিতি ছবি চালাবার অভিযানে এতদূর সাফল্য লাভ করছিলো যে, ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্কের প্রায় চার শতাধিক চিত্রগৃহের মধ্যে পনেরো-ষোলটি দখল করেছিলো, কেবলমাত্র বিলিতি ছবি দেখাবার জন্যে; কিন্তু আর এগনো বোধ হয় সম্ভব হবে না, কারণ জানা গেলো যে, নিউ ইয়র্কের "Sons of Liberty" নামক একটি সমিতির সভ্যরা পিকেটিং আর বয়কটের আশ্রয় নিয়ে বিলিতি ছবিকে মাত্র দুটো চিত্রগৃহে ঠেলে দিয়েছে; তাও থাকে কি না সন্দেহ —অথচ গণভোটে প্রকাশ যে, আমেরিকার শতকরা একান্নজন চিত্রামোদীই ব্রিটিশ ছবি পছন্দ করে।

* * * *

কালোবাজারে ফিল্ম বিক্রীর অপরাধে শোনা গেল, দিনকয়েক আগে কলকাতার দুটি বিশিষ্ট স্টুডিওর কর্ণধারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে; তারা নাকি এখানকার বরাদ্দ মাল বোম্বেতে বিক্রী করছিলেন; বিচারের ফল জানবার জন্যে সবায়ের মত আমরাও উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে আইনের ভয়ে কালো-বাজারী আরও গভীরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, যার ফলে আগের মতো খোলাখুলিভাবে ফিল্ম বিক্রী অনেকটা বন্ধ হয়েছে—কালোবাজার থেকে ফিল্ম পেতে একটু অসুবিধে হয়েছে যদিও চেষ্টা করলে পাওয়া যাচ্ছে, তবে দাম বেড়েছে আরও বেশি।

* * * *

আগামী মাসের মাঝামাঝি এস এস প্রডাকসন্সের ছবি 'কায়া ও ছায়া'র কাজ আরম্ভ হবে ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে; ছবি-খানি পরিচালনা করছেন বংশী আশ এবং ব্যবস্থাপনার ভার পেয়েছেন ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ২০শে কার্তিক, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 6th November, 1948. [১ম সংখ্যা

আমাদের নববর্ষ

'দেশ' পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ষ সমাগমে আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষকবর্গকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। দেশের স্বাধীনতা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাধনাই আমাদের লক্ষ্য। গত পঞ্চদশ বর্ষ আমরা যথাশক্তি এই সাধনায় অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছি। পরাধীন অবস্থার প্রতিকূলতার বহু আঘাত এবং অন্তরায়ের ভিতর দিয়া আমাদের পথ করিতে হইয়াছে। দেশবাসীর সাহায্য এবং সহযোগিতা আমাদের সেই সাধনায় সর্বদা শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। অন্য সম্বল আমাদের কিছু ছিল না। আজ দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে; কিন্তু দুর্দৈব এবং দুর্যোগের ঝঞ্ঝা এখনও কাটে নাই। পক্ষান্তরে বাঙলার সভ্যতা, বাঙলার সংস্কৃতি এবং বাঙলার সমুন্নত স্বদেশ প্রেম ও বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের নীতি-নিষ্ঠ আদর্শ নানা দিক হইতে বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। এ বিপদ কাটাইতে হইবে এবং বাঙলার সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে স্বাধীনতার প্রতিবেশের মধ্যে সমুজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এ সাধনা সহজ নয়; অন্তরায় অনেক রহিয়াছে। এগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের এই সাধনার পথে অতীতে আমরা দেশবাসীর নিকট হইতে যেমন অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং অনুকম্পা লাভ করিয়াছি, ভবিষ্যতেও তাহা তেমনভাবেই পাইব। এই আশা অন্তরে লইয়া আমরা নববর্ষের কর্তব্য উদ্যাপনে ব্রতী হইতেছি।

পূর্ববঙ্গ সরকারের কৈফিয়ৎ

পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগের কারণ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গ সরকার সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাঁহারা পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন নাই। সে দিক হইতে সত্যের মর্যাদা কিছু বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বাস্তুত্যাগ যতটা ব্যাপক বলিতেছেন, ততটা নয়। অন্তত এই ক্ষেত্রে তাঁহারা সম্যকভাবে সত্যের অমর্যাদা যে করেন নাই; এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। কিন্তু পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার কৌশলটি এক্ষেত্রেও তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব-পাকিস্থান সরকার বাস্তুত্যাগের জন্য কারণগত যত অপরাধ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারতীয় নেতাদের উপর আরোপ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা একথাও বলিয়াছেন যে, ভারত রাষ্ট্র বিশেষভাবে, পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অথবা মুসলমানদের প্রতি দুর্ব্যবহারের ফলে এবং পূর্ববঙ্গে তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিবার আশঙ্কায় অমুসলমানদের বাস্তুত্যাগ ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের এমন যুক্তির মূলে কূট ছল থাকিতে পারে; কিন্তু সত্য কিম্বা যুক্তির বল নাই। পশ্চিমবঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে মুসলমানদের উপর কোনরূপ দুর্ব্যবহার হইতেছে বা হইয়াছে, একথা লীগের অতি বড় অনুরাগীরাও বুকে হাত দিয়া বলিতে পারিবেন না। পশ্চিমবঙ্গ হইতে কোন মুসলমান ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে গিয়াছে, পূর্ব পাকিস্থানের অর্থসচিব স্বয়ং একথা সেদিন অস্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার এবং উৎপীড়ন ঘটিতেছে তাঁহারা একথা অস্বীকার করিতে পারেন কি? দেশ জুড়িয়া পুলিশ লেলাইয়া দিয়া তথাকার হিন্দু সমাজের নেতাদের উৎপীড়ন, তাহাদের গৃহে খানা-তল্লাস এবং তাঁহাদের গ্রেপ্তার করার আর কোন অর্থ সম্ভব হইতে পারে? সংখ্যার অনুপাতে বন্দুকের পাশ দিবার অযৌক্তিক এবং অভিসন্ধিপূর্ণ অজুহাতে নির্বিচারে হিন্দুদিগকে আত্মরক্ষার সব উপায় হইতে বঞ্চিত করিবার যে নীতি পূর্ববঙ্গ সরকার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শান্তি বা নিরাপত্তার সম্বন্ধে তাঁহাদের আন্তরিকতার কোন অঙ্ক উদ্ঘাটিত হইতেছে? ইহার উপর পাকিস্থান সরকার আর একটা নূতন কথা এবার বলিয়াছেন। পাকিস্থানকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুচক্রীরা নাকি এমন নেহাৎ বদনাম রটাইতেছে এবং তাহার ফলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে অস্বস্তির কারণ ঘটিতেছে। কিন্তু পাকিস্থানের ছোট বড় সকল নেতাই গর্বের সঙ্গেই পাকিস্থান যে ঐসলামিক রাষ্ট্র এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ঐসলামিক রাষ্ট্র এবং ধর্মীয় রাষ্ট্র এই দুইয়ে পার্থক্য কি, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঐসলামিক সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মর্যাদা এবং মহিমা যেখানে রাষ্ট্র বিশেষভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের অর্থ-নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার যত প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রে, বিশেষ প্রভাব-সম্পন্ন সম্প্রদায়বিশেষের অনুকম্পা এবং উদারতায় গিয়াই কার্যত দাঁড়ায়। কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের তেমন উদারতায় বা অনুকম্পার দৈন্যাবস্থার মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ের মনুষ্যত্বের মর্যাদা তুষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে অনর্থক সাম্প্রদায়িক

সংস্কারকেই উত্তেজিত করিয়া তোলে। এই সহজ সত্যটি তাঁহাদের উপলব্ধি করা উচিত। সাধারণ লোক ধর্মের অন্তর্নিহিত সার্বভৌম উদার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। রাষ্ট্রনীতির সংগে সম্প্রদায় বিশেষের আদর্শের উপর এইভাবে জোর দিবার ফলে বাস্তবক্ষেত্রে বৈষম্যবুদ্ধিটুকুই স্থায়ী আকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে জিন্নার নীতির ফলে পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের যে একটা মনোবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সর্বজনীন অধিকারের আদর্শকে দৃঢ় করিবার সাহস বা শক্তি পাকিস্থানের নেতাদের নাই। বস্তুত নীতির মর্যাদা সেদিক হইতে রাখিতে গেলে তাহাদের মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্রিগিরিই ভাঙিয়া পড়ে। চাকুরিয়াদের চাকুরী বিপন্ন হয়। এই দুর্বলতাই পাকিস্থান রাষ্ট্রের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রগতিশীল সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের পক্ষে সেখানকার আবহাওয়া আড়ষ্ট কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানের সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের সদিচ্ছার সুর চড়াইয়া তাঁহাদের বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যে সকল হিন্দু এই প্রদেশের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা দেশ বিভাগের পর ভারতে চলিয়া যাওয়াতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে অসহায়ত্বের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। একথা সত্য আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা পরে পূর্ববঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, পূর্ববঙ্গ সরকারই তাহাতে রাজী হন নাই এবং এখনও রাজী আছেন বলিয়া মনে হয় না। নূতন চাকুরীতে সংখ্যানুপাতিক-ভাবে হিন্দুদিগকে লওয়ার তাঁহারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাও কার্যতঃ ধাপ্পাবাজীতেই পর্যবসিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভেদ ও বৈষম্যের উপর পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং এই বৈষম্য সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সংস্কারবুদ্ধিতে এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহা ছাড়াইতে গেলে পাকিস্থানের তথাকথিত মুরুব্বীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কে বিপদ দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব এবং বৈষম্যই যদি না থাকিল তবে পাকিস্থানের মূল্য কি, যত জিগীর সব বৃথাই গিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন হইতে এই সংস্কার যতদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের শাসক সম্প্রদায় দূর করিতে না পারিবেন এবং উদার রাষ্ট্র ভাবনা সেখানে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ না হইবেন, ততদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শান্তি সেখানে সুনিশ্চিত হইবে না।

সর্দারজীর সম্বর্ধনা

গত ৩১শে অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ৭৪তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ভারতের এই বর্ষীয়ান এবং প্রবীণ জননায়ককে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। এদেশের তত্ত্বদর্শীরা ব্রহ্মবল এবং ক্ষাত্রবলকে পরস্পরার্থে বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র জীবনে ভারতের ব্রহ্মবলের বিচিত্র বিকাশ ঘটে এবং সেই ব্রহ্মবল সর্দারজীর ভিতরে ক্ষাত্রশক্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া কাজ করিয়াছে। সর্দারজী দৃঢ়চেতা এবং যোদ্ধা, কিন্তু তিনি বৃথা অস্ত্র ধারণ করেন নাই। উদার ভাবনা তাঁহার সমস্ত ক্ষাত্রসাধনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সেবা এবং ত্যাগের মহিমা এই বলিষ্ঠ পুরুষের চরিত্রকে

উজ্জ্বল করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্দারজীর অবদান অসামান্য, ইহা সকলেই জানেন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর, সেই স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার কাজে সর্দার বল্লভভাইয়ের কর্মসাধনা সর্বাধিক গৌরবময় ঐতিহ্য রচনা করিয়াছে। তাঁহার খড়্গাঘাতে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বদলের সব প্রচেষ্টা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। তাঁহার রাজনীতিক প্রতিভা বলে প্রচ্ছন্নকারীদের সব শঠতা বিচূর্ণ হইয়াছে। প্রথমে কাশ্মীর ও জুনাগড়, তারপরে হায়দরাবাদকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের এই সব শত্রুরা যে দিক্‌জোড়া চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছিল, সর্দারজীর মত শক্ত মানুষ ভারত সরকারের কেন্দ্রমূলে শক্তি সঞ্চার না করিলে, তাহাদের সে চক্রান্ত অশেষ অনর্থ সৃষ্টি করিত। ইহাদের প্ররোচিত নরঘাতী হিংস্রতায় পৃথিবীর মাটি সিক্ত হইত। যে অবস্থায় মধ্যযুগীয় বর্বরান্ধ দল [illegible]-বাদীদের উস্কানি পাইয়া নিষ্ঠুর এবং [illegible] জিঘাংসার যে সুদীর্ঘ অধ্যায়ের [illegible] করিত, সহজে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিত না। কিন্তু শক্ত মানুষ সর্দারজী বিপুল বীর্যে সে সংকট প্রতিহত করিয়াছেন। তিনি [illegible] আদর্শকে মানবতার মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার পথ নিষ্ঠাবুদ্ধির সঙ্গে উন্মুক্ত করিয়া চলিয়াছেন। তিনি [illegible] ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে অহিংসার নীতিকে নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার মহিমাকে বিশ্বজনীন নীতির ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। এই বাস্তব দৃষ্টি সর্দারজীর রাজনীতিক প্রতিভার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। মনুষ্যত্বকে তিনি জাগাইয়াছেন, জাতিকে তিনি বাঁচাইয়াছেন। ক্ষাত্র এবং দ্বিজত্বকে তিনি পরস্পরার্থে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইদিক হইতে তাঁহার চরিত্রে কোমলতা এবং কঠোরতার অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। বাহিরে দেখিতে গেলে সর্দারজীর আচরণে বজ্রাদপি কঠোর হইলেও অন্তরে তিনি কুসুম হইতেও কোমল। বর্তমান সংকটে এমন মানুষই দরকার। ভারতের সংকট এখনও কাটিয়া যায় নাই; কিন্তু আমাদের আশা আছে, সর্দারজীর দুর্জয় সঙ্কল্পশীলতা এবং সত্যনিষ্ঠার প্রণোদিত সুযোগ্য পরিচালনায় ভারত মানবতার পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর্দারজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা অন্তরে এই আশা পোষণ করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

অসত্যের অভিযান

পূর্ববঙ্গ সরকার সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগ সম্পর্কিত বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান নেতারা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। [illegible] আহম্মদ এতৎসম্পর্কিত একটি বিবৃতিতে বলেন, "বকরিদ এবং দুর্গা পূজার সময় পশ্চিমবঙ্গে গুরুতর আকারে সাম্প্রদায়িক দাংগা দেখা দিবার ফলে সেখান হইতে [illegible] লক্ষ মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীস্বরূপে পূর্ববঙ্গে গিয়াছে, পূর্ববঙ্গ সরকারের এই কথা নির্জলা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়। পাকিস্থানের নিয়ামকেরা যে ধরণের সত্য কথা বলিতে অভ্যস্ত, দৃষ্টান্তস্বরূপে কাশ্মীরে পাকিস্থানের কোন সৈন্য নাই, এই যে সত্য উক্তি তাঁহারা করিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহাদের এই সাম্প্রতিক উক্তিও সেই শ্রেণীর সত্য। ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ হইতে আমরা দৃঢ়তার সংগে তাঁহাদিগকে এই কথা [illegible] দিতেছি যে, মুসলমানদের পক্ষে বাস্তুত্যাগ যদি কোন স্থান হইতে ঘটিয়া থাকে, পূর্ববঙ্গ হইতেই তাহারা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে কেহ যায় নাই।" বলা বাহুল্য,

...য় ও ন্যায়ের দিক হইতে বিবেকের স্বচ্ছতা বজায় রাখিয়া কোন কথা বলিবার বা কোন কাজ করিবার শক্তি পাকিস্থানের কর্তাদের নাই। পাকিস্থানের আদর্শগত মনস্তাত্ত্বিকতা এই দিক হইতে তাহাদের নৈতিক বোধ দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সত্য সত্যই থাকে এবং তাহার বাস্তব মূল্যও ক্ষুন্ন হয় না। পূর্ববঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের উপর দোষ চাপাইয়া সে ঘাটতি পূরণ করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্তা লীলা রায় পশ্চিমবঙ্গে নেতৃত্ব-ক্ষেত্রে কাজ করেন না। তিনি পূর্ববঙ্গে থাকিয়াই কাজ করিতেছিলেন। শ্রীযুক্তা রায় সেদিন একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "গত ১৫ই আগস্টের পর হইতে পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারী নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন, শুধু তাহাই নয়, ১৫ই আগস্টের পর হইতে ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী আরম্ভ হয়। ইহাতে আমাদের সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়া উঠে যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের তথায় অবস্থান করিতে দেওয়ার ইচ্ছা পূর্ববঙ্গ সরকারের মোটেই নাই। কারণ, সংখ্যালঘুদের অভাব অভিযোগের বিষয় প্রচার ও অধিকার রক্ষার দাবী তাঁহরাই তুলিতে সক্ষম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সংখ্যালঘুদের অভাব-অভিযোগের বিষয় প্রচারিত হইতে দেওয়া পূর্ববঙ্গ সরকারের মোটেই কাম্য নহে এবং সংখ্যালঘুদের তথায় বসবাস করিতে হইলে নানারূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে।" শ্রীযুত সতীন সেনও এতদিন পরে অনুরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনিও এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, 'পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বাস্তুত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক অথবা যাহারা বাস্তুত্যাগ করিবে না বা করিতে পারিবে না তাহারা দাসানুদাস হইয়া বসবাস করুক, পূর্ববঙ্গ সরকার কি ইহাই ইচ্ছা?' এই অবস্থাটা যেখানে সত্য, সেখানে শান্তি ও সদিচ্ছার বুলি কপচান শুধু নিরর্থকই নয়, মারাত্মকও বটে। বস্তুতঃ পাকিস্থানী নিয়ামকদের নীতি ভারতের সঙ্গে কোন ক্ষেত্রেই আন্তরিক সহযোগিতার পথে অগ্রসর হইতেছে না। পক্ষান্তরে সর্দারজী সেদিন বলিয়াছেন, পাকিস্থানের নিয়ামকেরা অবিরাম ভারতের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন। সর্দারজী নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া বলিয়াছেন, "আমরা কিছুতেই তাহাদিগকে আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না। শেষ রক্তবিন্দু দান করিয়াও আমরা আমাদের লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিব। এ কাজে যদি ভারতবর্ষ বা পাকিস্থান বা সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া যায়, তাহাতেও আমরা পশ্চাৎপদ হইব না।" সোজা কথা এবং সত্য কথা। পাকিস্থান যদি সত্যই প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দ্যের ভাব ভারতের সঙ্গে বজায় রাখিতে চায়, তবে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিভঙ্গী তাহাকে পরিবর্তন করিয়া সভ্যতাসম্মত নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের পক্ষে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক প্রভাবকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য করিয়া সহস্র সহস্র যোজন দূরে পশ্চিম পাকিস্থানের উপর নির্ভর করিতে গেলে পূর্ব-পাকিস্থানের পক্ষে নানা সঙ্কট দেখা দিবেই। অর্থনীতিক তেমন বিপর্যয়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানকে সুসংহত স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দিক হইতে আমরা তাহা একান্তই অবাস্তব বলিয়া মনে করি। সাম্প্রদায়িকতার ভ্রান্ত প্রচারে বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূলীভূত সত্য সম্বন্ধে লোককে কিছুদিনই বিভ্রান্ত রাখা চলে, কিন্তু দীর্ঘদিন চলে না। প্রকৃতপক্ষে পর পরই থাকিবে।

বাঙলায় বস্ত্র রেশন—

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্র রেশন প্রবর্তিত হইবে। সরবরাহ সচিব মহাশয়ের বিবৃতিতে বোঝা যায়, গভর্নমেণ্ট পূর্বাহ্নে যথেষ্ট সতর্ক হইয়াই এবার বস্ত্র রেশনের আয়োজন করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় বস্ত্র সম্পর্কে বাঙলায় যে সব অভিযোগ আছে, তাহা গভর্নমেণ্টের সুপরিজ্ঞাত। আমরা আশা করি, নূতন রেশনের আমলে সেই সব অভিযোগের কারণ দূর করিবার চেষ্টা হইবে। সংবাদে দেখিতে পাই যে, বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিলগুলিতে বস্ত্র স্তূপীকৃত হইয়া সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু বাঙলার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বরাদ্দ নির্ধারণের বেলায় শুনিতে হয় যে, যথেষ্ট বস্ত্রের অভাব; সুতরাং কম বরাদ্দেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সন্তুষ্ট আমরা আছি; কিন্তু বস্ত্রের সত্যই যদি অভাব না থাকে, তবে শুধু বণ্টনের দোষে আমাদিগকে কেন এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে, ইহা আমরা বুঝি না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যতটা সম্ভব বেশী করিয়া বস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আশার কথা। আর একটা ভরসার কথা এই যে, কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতায় এবার বস্ত্র রেশনের দোকানের সংখ্যা বাড়িবে। কিন্তু এই সঙ্গে অনাচার রোধ এবং চোরাকারবার দমনের ব্যবস্থা দৃঢ় না করিলে শুধু রেশনের দোকানের সংখ্যা বাড়ানোতে সমস্যার কিছুই সমাধান হইবে না। চোরাকারবার দমন এবং বে-আইনীভাবে বাহিরে কাপড় চালান দিবার কাজ বন্ধ করা আগে দরকার। বলা বাহুল্য, কাচা টাকার প্রলোভনের ক্ষেত্রে মানুষের নীতি-বুদ্ধির উপর আমরা আজকাল শ্রদ্ধা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। নিদারুণ দুর্নীতি সমাজের সকল অংশকে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। দণ্ডনীতিই এই অবস্থার প্রতীকার সাধন করিতে পারে এবং সেই নীতি-প্রয়োগে সরকার যদি নিরপেক্ষতা এবং সত্যকার ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন, তবে সমাজের সব স্তরে নৈতিক বুদ্ধিও জাগিয়া উঠিবে। দুর্নীতির প্রতীকারে সাধারণ মানুষেরও মনের উৎসাহ বাড়িয়া যাইবে। শুধু সদুপদেশ না দিয়া এবং নীতি ধর্মের মৌখিক বুলি না আওড়াইয়া শাসকদের পক্ষে দণ্ডনীতির এই মনস্তাত্ত্বিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব

ডাক্তার স্ট্যানলী জোন্স আমেরিকার একজন চিন্তাশীল লেখক। তিনি সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ডাক্তার স্ট্যানলী বলেন, 'বিশ্ব-জগৎ বর্তমানে ভবিষ্যতের ভাবনায় কম্পান্বিত। বিশ্বের ভবিষ্যৎ-নিয়ন্ত্রণে আণবিক বোমা জঙ্গীবাদের শেষ অস্ত্র এবং মহাত্মা গান্ধী ভাগবতী শক্তির প্রতীক। আসুরিক শক্তি এবং ভাগবতী শক্তির এই সংগ্রামে জগতের নিয়তি কোন দিকে চলিবে, গ্রন্থ এই সমস্যার উপর কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করিয়া ভারতের দিকে তাকাইয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ এক শক্তিশালী দানব, সে বামনদের দ্বারা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ছিল। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে স্বাধীন করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ অনৈক্যে অভিভূত ছিল, গান্ধীজী তাহাকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া অথবা ঐক্যের পথে অগ্রসর করিয়া গিয়াছেন এবং নিজের শোণিতের দ্বারা তিনি তাঁহার সাধনাকে শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন। বর্তমান শতাব্দীতে মানবের সমগ্র মহৎ সাধনার শীর্ষস্থানে গান্ধীজীর অবদান উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। নেতারা যেখানে গান্ধীজীর সাধনার অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেইখানেই আলোক জ্বলিয়াছে। ভারতের জন্য আলোক, বিশ্ব-জগতের জন্য আলোক সেইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজীর ভারত ভবিষ্যতের সঙ্গতিপূর্ণ সম্ভাবনায় এবং আশায় উজ্জ্বল। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা-ভাষ্যের সমীচীনতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গান্ধীজীর আদর্শের নিষ্কলুষতা এবং তাহার অন্তর্নিহিত মানবতার সম্বন্ধে গান্ধী-নীতি সম্বন্ধে অতি বড় অবিশ্বাসীর মনেও কোন সন্দেহ জাগিতে পারে না। মহাত্মাজীর আদর্শের অন্তর্নিহিত সত্যনিষ্ঠা এবং মানবতাই ভবিষ্যতে জগতের পথ দেখাইবে।

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

(১)

Ranchi
19. 10. 29

কল্যাণীয়েষু,

...... অপরপক্ষে আমার মনে নানারকম সন্দেহ আছে, সেইজন্য কি আর্ট, কি রিলিজন কি সায়েন্স কোন জিনিসেরই চূড়ান্তবাদীদের কথা নতমস্তকে মেনে নিতে পারি নে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথা শুনতে আমার যেমন ভাল লাগে, তেমনিই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তার কারণ উক্ত ভদ্রলোকের মনে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর 'স্কেপটিক্যাল এসেস্'এর মজাই এই যে, তাঁর সকল স্কেপটিসিজম্-এর মূল হচ্ছে সায়েণ্টিফিক ডগমাটিজম্—তাঁর ধরণধারণ সব মিশনারির তুল্য। তিনিও আমাদের ঘাড় ধরে তাঁর কথা মানাতে চান। মনে রেখো এই ডগমাটিজম্ জিনিসটে মানুষের মানসিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, কোনরূপ reasoning-এর উপর নয়। রাসেল যদি ক্রিশ্চিয়ান হতেন ত তিনি ইনকুইজিশনের পক্ষপাতী হতেন।

সে যাই হোক্, মণ্টু যোগী হয়েছে বলে তুমি এতটা বিচলিত হয়েছ কেন? মণ্টু হোক Lodge হোক আর যে কেউ হোক্, রিলিজন্-এর পাণ্ডা হয়েছে কিনা তার সঙ্গে রিলিজন-এর ভিতর কোন সত্য আছে কিনা, তার ত কোনও যোগাযোগ নেই। এ সমস্যা কোন ব্যক্তিবিশেষের মতামতের উপর নির্ভর করে না। আমার কাছে এ হচ্ছে একমাত্র জ্ঞানের সমস্যা আর তার মীমাংসা লোককে বাদ দিয়ে করতে হবে।

মণ্টু যোগপন্থী হয়েছে বলে আমাদের সকলকে যে যোগ-বিদ্বেষী হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। এ রকম বিষয়ে আমার জাজমেণ্ট চিরকালই সাসপেণ্ডেড হয়ে রয়েছে এবং কোন বন্ধুবান্ধবের মত-পরিবর্তন হলে, সেই সঙ্গে যে আমাদের উল্টোমত বরফের মত জমাট ও ইঁটের মত শক্ত হয়ে যাবে, তার কোনই কারণ নেই। স্কেপটিসিজম্ মানে বিশ্বাসও নয় অবিশ্বাসও নয়, ও দুয়ের ভিতর একটা ইতস্তত মনোভাব, আর আমি হচ্ছি জাত স্কেপটিক, কাজেই রিলিজন-এর কথাও বেদবাক্য বলে কখনো মানতে পারি নি, সায়েণ্টিফিক ফিলসফির কথাও নয়। ধর্মের কথাও যেমন পুরোনো, সায়েণ্টিফিক ফিলসফির কথাও তাদৃশ পুরোনো। দেড় হাজার বৎসরের পূর্বে লেখা সংস্কৃত শাস্ত্র পড়তে পড়তে মনে হয়, যে অনেক জায়গায় সেকালের টিকিওয়ালারা বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অনুবাদ করেছে। শুধু রাসেল humanity, progress প্রভৃতি কতকগুলো বীজমন্ত্রে বিশ্বাস করেন, টিকিওয়ালারা তাও করত না। সুতরাং Scientism-এর সব কথাই সত্য হতে পারে, তবে সে সত্য এত পচা যে তা আমার মনে ধরে না। আমার ইচ্ছে আছে যে ভবিষ্যতে সংস্কৃত দার্শনিকদের মত ও রাসেলের মত পাশাপাশি ছাপাব, তাহলেই দেখতে পাবে যে আমার কথা বাজে নয়।

বিচিত্রায় যে প্রবন্ধ লিখেছি তাতেও দুটি চারটি সংস্কৃত মত তুলে দিয়েছি নমুনাস্বরূপ। আমার শুধু ভয় হয় যে, আমি যদি সংস্কৃত লেখকদের মত একটু লম্বা করে প্রকাশ করি, তাহলে হয়ত তোমাদেরও তা সহ্য হবে না, কারণ সংস্কৃত শাস্ত্রে মর‍্যাল স্কেপটিসিজমও চরম পদে উপনীত হয়েছিল। কোনরূপ নাস্তিকতা শেখবার জন্য আমাদের বিলেত যাবার দরকার নেই। ফরাসীরা ও মতের শ্যাম্পেন্ বানিয়েছে, কিন্তু এদেশে একেবারে পুরো ধেনো। ইংরাজী শিক্ষিত লোকের পেটে তা সহ্য হবে না।......

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

(২)

20, Mayfair, Ballygunge
6. 2. 30

কল্যাণীয়েষু,

......আমি এতটা মুক্ত পুরুষ কোনকালেই ছিলুম না, আজও হইনি যে তোমাকে অথবা আর কাউকে জীবনের সুখদুঃখ উপেক্ষা করতে পরামর্শ দেব। সুখদুঃখের বহির্ভূত জীবন, জীবনই নয়। সুপার-

যৌবনে প্রমথ চৌধুরী

ম্যান বলে যদি কোনও জীব থাকে ত সে অবশ্য ম্যান নয়, সুপার হতে পারে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে, মুক্তির জন্য এত লালায়িত হয়েছিলেন, তার কারণ জীবনটা সত্য সত্যই তাঁদের কাছে ভবযন্ত্রণা মাত্রই ছিল, তাতেই তাঁদের কাছে ও যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের একটা উপায়ই মুক্তি বলে গণ্য হয়েছিল। অবশ্য সে উপায়টা ছিল ষোল আনা মানসিক, ভাষান্তরে কাল্পনিক। এই কল্পনাটাকে তাঁরা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন বলেই জীবন তাঁদের কাছে সহ্য হয়েছিল। আমি সংস্কৃত ভাষায় যখনই মুক্তির কথা শুনি, তখনই আমার মনে হয়, জীবনের বন্ধনটা তাঁদের কাছে কতটা কষ্টকর ছিল। যেমন একালে, সোস্যালিজম্, কম্যুনিজম্ প্রভৃতি বর্তমানের বহু লোকের দুঃখের একটা না একটা কাটান মাত্র। বর্তমান সমাজের প্রতিবাদ হিসাবে সোস্যালিজম্ প্রভৃতির যথেষ্ট মূল্য আছে। ও-সব হচ্ছে একালের মুক্তির পথ। সেকালে লোকে বিশ্বাস করত একমাত্র মনের জোরে

প্রতি ব্যক্তি মুক্তিলাভ করতে পারে; একালে লোকে মনে করে যে, সমাজের তাস নূতন করে ভেঁজে নিলে সমস্ত মানব-সমাজ মুক্তিলাভ করতে পারে। এ দুয়ের ভিতর এই যা তফাৎ। মানুষ চিরকাল কষ্টও পাবে আর যুগে যুগে নতুন নতুন মুক্তির উপায়ও বার করবে। যে জাত না করতে পারবে তার মরণই শ্রেয়ঃ। এই সুখদুঃখের মধ্যে ব্যতিব্যস্ততাই জীবনের রোমান্স। আমার লেখার ভিতর সেণ্টিমেণ্টালিটি মোটেই নেই, কিন্তু রোমান্স থাকতে পারে। কারণ সেণ্টিমেণ্টাল ও রোম্যাণ্টিক এক জিনিস নয়। বুদ্ধদেবের জীবনটা ছিল বিরাট রোম্যাণ্টিক্ অথচ সে জীবনে, সে মনে সেণ্টিমেণ্টালিটির লেশমাত্র ছিল না। যাকে মানুষে রিলিজন বলে সেটা একটা প্রকাণ্ড রোমাণ্টিক মনোভাব। পৃথিবীতে মানুষ থাকবে আর তাদের মনে রোমাণ্টিসিজম্ থাকবে না, এমন সমাজ কল্পনা করতেও আমার ভয় হয়। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

(৩)

20, Mayfair, Ballygunge
15. 10. 32

কল্যাণীয়েষু,

এবার দেখছি আমার চিঠির পিঠপিঠই তোমার চিঠি এসেছে। তোমার এ চিঠি পড়ে মহাখুশী হয়েছি। কেন জানো? তোমার একটা কথা চুরি করে বলছি তোমার এ চিঠিখানি হিউম্যান। এ যুগে ভারতবর্ষে আমরা ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরা, humanist হতে পারি, humane হতে পারি কিন্তু human হওয়া আমাদের পক্ষে অতি কঠিন। কারণ to own up ones emotion, আমাদের পক্ষে তেমন সহজ নয়। এ বাধা শুধু ভয়ই দেয় না, আমাদের পরের কাছে ধার করা আইডিয়া ও আমাদের ইমোশন-এর পথ আগলে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সে সব আইডিয়া আমাদের স্বপ্রকাশের পথে প্রধান বাধা। একটা সামাজিক বিষয়ে মতামতের উদাহরণ দিই। জাতিভেদ যে এ যুগে সামাজিক অভ্যুদয়ের পরিপন্থী, একথা কে অস্বীকার করবে। আমরা যদি জাতি হিসেবে ইউরোপের আর পাঁচটা জাতের মত বড় হতে চাই, আর আমরা সকলেই তা হতে চাই, কারণ বড় হবার অন্য কোনও আদর্শ আমাদের চোখের সুমুখে নেই। এমন কি যাঁরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার বড়াই করেন, তাঁরাও দেখতে পাই নিত্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, যে প্রাচীন ভারতবর্ষ মডার্ন ইউরোপের সঙ্গে আকৃতি প্রকৃতিতে হুবহু মিলে যায়। অর্থাৎ সেকালের গভর্নমেণ্ট ছিল ডেমক্রাটিক, আর লোকের মনোভাব ছিল সব ক্রিশ্চিয়ান।

আমরা জাতিভেদ প্রথা যেমন আছে, ঠিক তেমনিই রাখব অথচ ইংলণ্ড কিম্বা ফ্রান্সের মত স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করব, এ ব্যাপার যে অসম্ভব সে বিষয়ে আমার মনে কস্মিনকালেও কোনও সন্দেহ ছিল না। ফলে কলম ধরে অবধি জাতিভেদের উপর খোঁচা মারতে কখনও কসুর করিনি। আমার এ আক্রমণ যে তেমন লোকের চোখে-আঙ্গুল দিয়ে দেখান আক্রমণ নয়, তার কারণ কোন কিছুর বিরুদ্ধে frontal attack করা আমার ধাতে নেই। এ ত গেল আইডিয়া রাজ্যের কথা। কিন্তু আমার নিজের মনের ভিতর যে জাতীয় অহঙ্কারের লেশ নেই, এমন কথা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। মন্দিরে কে যায় আর না যায়, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন, আর ছেলেবেলা থেকে ছত্রিশ জাতের রান্না খেয়ে আসছি; তবুও আমার কোনও আত্মীয় অসবর্ণ বিবাহ করছে শুনলে মনে খটকা লাগে। আমরা যদি কেবলমাত্র আমাদের আইডিয়া প্রচার না করে, নিজের মনের ভাব প্রকাশ্যে কবুল করি, তাহলে কি সাহিত্যের কি সমাজের বহু উপকার হয়। কিন্তু তা করতে গেলেই নিজের প্রকৃতির ভিতর যে কনট্রাডিকশন আছে, তা স্পষ্ট স্বীকার করতে হবে। আমাদের মনের প্রকৃত অবস্থার কথাই সত্য কথা এবং প্রকৃতি কনট্রাডিকশন-এর বহির্ভূত নয়। এক কথায় আমাদের কারও মন সিম্পল নয়। আর আইডিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে মনকে Simplify করা। যার মন ষোল আনা কোনও আইডিয়ার বশবর্তী সে হয় ফ্যানাটিক আর ফ্যানাটিক মাত্রেই beyond good and evil. ভগবান আমাকে ফ্যানাটিক-এর ছাঁচে ঢালাই করেন নি। এত কথা বললুম এইটে দেখাবার জন্য যে, নিজের ইমোশনকে ব্যক্ত করা তেমন সহজসাধ্য নয়। অবশ্য ইমোশন অর্থে আমি পার্সোনাল ইমোশন-এর কথাই বলছি—ইম্‌পারসোনাল ইমোশন-এর কথা নয়। ইমপার্সোনাল ইমোশন, ইমোশন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, ও-চিজ আইডিয়ার কোঠাতেই পড়ে। আর তা নিয়ে দেদার বক্তৃতা করা যায়। আর তা শুনে শ্রোতারা বাহবাও দেয়। কারণ সে সব কথা, মনের যে তারে ঘা দেয়, তা হৃদয়ের তার নয়, মস্তিষ্কের তার। অথচ যে লেখার ভিতর ইমোশন প্রচ্ছন্ন নয়, সে লেখা সাহিত্য নয়। তা বিজ্ঞান হতে পারে, দর্শন হতে পারে, অর্থাৎ তার ভিতর ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র নেই। আর মানুষে যা যথার্থ ব্যক্ত করে—সে হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব।......ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

(৪)

20, Mayfair, Ballygunge
19. 5. 30

কল্যাণীয়েষু,

...আমি ভেবে দেখছি যে আমার পক্ষে এমন কিছু লেখা কর্তব্য, যা একাধারে গল্প ও প্রবন্ধ হয়। অর্থাৎ যার ভিতর বীরবল ও আমার হাত সমান থাকবে। অবশ্য Wells প্রভৃতি এই ধরণের লেখা লেখেন কিন্তু আসলে গল্পের বেনামীতে তাঁরা প্রবন্ধই লেখেন। Galsworthyর কথা ঠিকই লিখেছ, তিনি বর্ণনা করেন, Bourgeois চরিত্র তার ভিতর beautyর যে খাপ খায় না, এই তাঁর বক্তব্য। কিন্তু তিনি beauty বলতে যে কি বোঝেন তা আমি বুঝতে পারলুম না। এঁদের মুখে beauty কথাটাও libertyর মত, "কি যেন কি" গোছের একটা জিনিষ যা bourgeois জীবনের একটা উৎপাত মাত্র।

Forsyth পরিবারের বিষয় কেউ জানতে চায় না, সুতরাং তার ভিতর কোন ফাঁক দিয়ে beauty ঢুকে যে জীবনকে কি রকম ভেস্তে দিয়েছিল, তাতে অন্তত আমার ত কোনই interest হয় না। সম্প্রতি রঘুবংশ আদ্যোপান্ত পড়লুম। এ কাব্যে কথাবস্তুর বিশেষ কোনও গৌরব নেই একমাত্র রামায়ণের কথা ছাড়া, কিন্তু সমস্ত কাব্যটি ভাষার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে ভরপুর। তাই রঘুবংশ পড়া যায় কিন্তু Forsyth বংশ পড়া যায় না।

আমি এক এক সময়ে ভাবি, যদি আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের সন্ধান না পেতুম তাহলে, একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্য পড়ে আমরা মানুষ হতে পারতুম কি না? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, এক Science বাদ দিয়ে অপর বিষয়ে আমাদের মনের খোরাক যে সংস্কৃত-সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করতে পারতুম, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হয়ত একদিন এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে বসব। আজকের দিনে Shakespeare, Montaigne, Voltaire, Pascal ও Bergson ছাড়া বাদবাকী ইউরোপীয় সাহিত্য লুপ্ত হয়ে গেলেও আমি নিজে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করব না। বেশি পড়লে ভাল লেখা হয় না। আমরা যে বড় লেখক হয়ে উঠতে পারিনি, তার কারণ আমরা বড্ড বেশি পড়েছি। আর আজও পড়ার নেশা থেকে মুক্ত হইনি। তাই নতুন বই অনেক পড়ি আর পড়েই মনে হয় যে, সে বই না পড়লে কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হতুম না। এসব কথা ঠিক্ সুস্থ মনের কথা নয়, কিন্তু এই তালকাটা বিড়িফোঁকার দিনে মনকে কি করে সুস্থ রাখা যায়!... ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
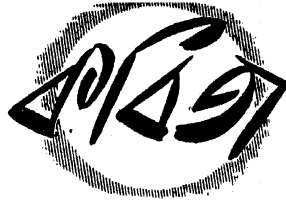
শরৎ

হরপ্রসাদ মিত্র

দীর্ঘ বাঁশির শাণিত ধ্বনির
রেখায় হাওয়ায় যাত্রী দিন,
জলে তরঙ্গভঙ্গ চমৎকার—
প্রথম শরতে হালকা মেঘ—
অলক, শিথিল, সঞ্চারী পাল বাঁধা।

সেখানে হাসির দ্যুতি
রেখা নয়,—
অসীম শাদা।

আরো এক দেশ—
মেরু-তুষারের
দীর্ঘ মেঘের মূর্ছনায়
মানচিত্রের সুদূরে লীন।
স্লেজের কুকুর হিংস্র, বাধ্য ঝড়।

পাঁজির পাতায় শরৎ হারায়,
ঝরে না সূর্যক্ষরিত দিন,
মাটির পৃথিবী সেখানে আবার
—কী বর্বর!

উর্বশি, তুমি আমার মনের
মৃত্তিকা ছুঁয়ে ফুল ফোটাও,—
আবার কখনো এনেছ রাত্রিসঙ্গমে,
কখনো অবোধ হাহাকারে টেনে
পিচ্ছিল গ্লানি পুরস্কার,
কখনো মধুপ-গুঞ্জিত ক্ষণে
মন লোটাও।
শরৎ-আলোর উচ্ছ্বাসে ঘটে
সেই স্মরণের সংক্রামে
হঠাৎ গভীর সুদূর ছবির উদ্‌ঘাটন—
থামে কোন্ দেশে ধাতব যানের
উদ্ধত চারু চক্রমন,—
'টারম্যাকাডাম্' শিউরে জানায় আমন্ত্রণ!
কবিতা ফোটায় ত্বরিত পায়ের চপ্পলে
—মৃদু সঞ্চরণ
রাস্তা যে হয় স্লেটের উপত্যকা—
পদ্মগন্ধে উদগ্র কলকাতা!

নিভৃত, মদির সে কি অস্থির, অন্য প্রাণ?
প্রথম সূর্যমোহে ধরণীর বন্য গান?

শারদীয়া

কানাই সামন্ত

জ্যোতির্ময়ী
আশ্বিনের দিবা অয়ি
জ্যোতিঅর্ঘভার
ঊষাকালে এনেছ তোমার
অরুণথালায়;
শেফালি ও তৃণে তৃণে মুকুতামালায়
দিলে জ্যোতির্ময় আয়ু;
অঞ্চলের বায়ু
চঞ্চলিল ফুল্ল কাশবনে,
হিল্লোল তুলিল ক্ষণে ক্ষণে
শ্যাম শস্যাখেতে,
মিলাইল নীল গগনেতে,
শুভ্র যেথা নন্দনের পাখির পালোক
প'ড়ে আছে; লয়ে ছায়ালোক
একা বসি বেণুকুঞ্জতলে
কপোত কূজিত ক্ষণে, আনন্দচপলে,

ঝঙ্কারিলে অশ্রুত খঞ্জনী;
বিদায়ের পিছু-চাওয়া ব্যথায় রঞ্জনি
শালমহুলের বনে অলিতে-গলিতে
মেলে দিলে ধীরপদে চলিতে চলিতে
অস্তাচল ঘাট-পানে;
স্তব্ধমেঘ-বিদায় সোপানে
অনুরাগ আঁকি
ডুব দিলে কখন একাকী
তিমির সিন্ধুর নীরে
স্বর্ণঘট শিরে;
উঠিলে না আরঃ
ঊর্ধ্বে উৎসৃজিলে নির্মাল্যের ফুলহার—
শুভ্রোৎপলদল-হেন সিতপক্ষশশী,
লক্ষ তারা ওই যারা অতন্দ্রিত তরঙ্গে উলসি
অপার তিমির ভরি
চমকিছে দীর্ঘ বিভাবরী।

বুদ্ধ ও বানর (জাতকের গল্প অবলম্বনে)

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে
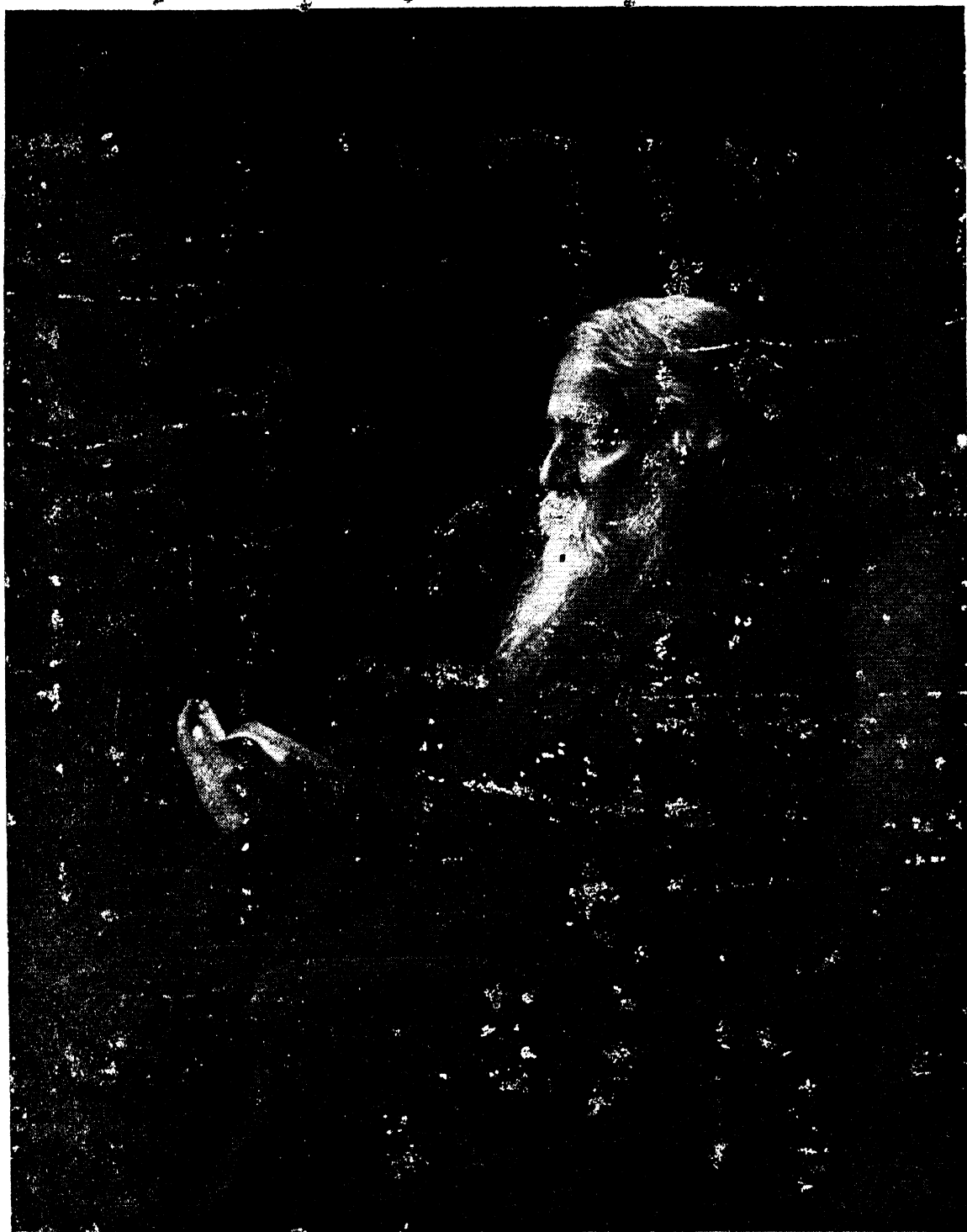
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ধর্মজ্ঞান ভাষাজ্ঞানের ন্যায় মানুষ শিশু-কাল হইতে কখন ও কিভাবে যে আয়ত্ত করে, তাহার ইতিহাস বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যাঁহারা গভীরভাবে অধ্যয়ন ও তাঁহার সংগীত স্তব্ধভাবে শ্রবণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঈশ্বরবিশ্বাস কবির আশৈশবের সংস্কার। তবে তিনি ঈশ্বরকে যেভাবে কল্পনা করিতেন, তাহা যে কেবল লৌকিক হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক তাহা নহে, তাহা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অন্যরূপ, তাঁহার ধর্ম তাঁহার নিজেরই।

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখান হইতে তাঁহার জন্মের পূর্বেই হিন্দুসমাজের শৃঙ্খল খসিয়া গিয়াছিল। এই প্রায়-সংস্কারশূন্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজের সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার অগ্রজদের ন্যায় তাঁহাকে কোনোই সংগ্রাম করিতে হয় নাই। কিন্তু কেবলমাত্র সংস্কার-হীনতা তো নেতিধর্মী, তাহার দ্বারা জীবনের ভাবসম্পদ গড়ে না। বাল্যকাল হইতে মহর্ষির পরিবারে বালকদের পক্ষে 'ব্রাহ্ম ধর্ম' গ্রন্থ আবৃত্তি করা আবশ্যিক ছিল। এই ধর্মবোধকে রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো স্থলে উপনিষদের ধর্ম বলিয়াছেন—প্রয়োগটি ঠিক হইয়াছে কিনা সে বিচারের স্থান আমাদের নাই।

যৌবনে ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের খুব আকর্ষণ না থাকিলেও কর্তব্যবোধে কোনোদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আনুগত্যের অভাব তাঁহার হয় নাই। রবীন্দ্র জীবনীর পাঠকগণ অবগত আছেন যে; বিলাত হইতে দেশে ফিরিবার অব্যবহিত পরে, এমনকি 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনারও পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ব্রহ্ম-সংগীত লেখেন। তাহার পর প্রায় বিশ বৎসর অর্থাৎ কবির চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত—প্রায় প্রতি বৎসরই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনে নানা উৎসবের সময়ে 'ব্রহ্মসংগীত' লিখিয়াছিলেন। অন্যের অনুভূতিকে নিজ অনুভূতির মধ্যে জাগাইয়া ভাষা দান করা হইতেছে দরদী কবির কাজ—আর নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করা হইতেছে সাধক কবির কাজ। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মভাবকে ভাষা ও সুর দান করিয়া তিনি ব্রহ্মসংগীত লেখেন। উহাদিগকে আমরা 'রচিত' গান বলিব, ভক্তহৃদয়ের বেদনাসঞ্জাত ভাব সংগীত বলিতে পারিব না। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীতের পালা শুরু হয় গীতাঞ্জলির পর্বে—তাহার পূর্বের পর্বের গানকে ব্রহ্মসংগীত বলিব।

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সমষ্টির যোগ চেষ্টা হইতেছে নৈবেদ্যের কবিতা-গুচ্ছের নির্গলিত বাণী। এই পর্বটি কবির ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যানের পর্বের সমকালীন। এই সময়ে কবি সর্বপ্রথম ধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। ইতিপূর্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সমর্থনে বহু রচনা লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে ধর্মোপদেশ বা Sermon শ্রেণীর রচনা বলা চলে না। পাঠকের স্মরণ আছে, রবীন্দ্রনাথের বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই মহর্ষি তাঁহাকে জমিদারির বিষয়কর্মের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করেন, তেমনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক করিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায়ও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কবি এই কার্য কেবলমাত্র কর্তব্য হিসাবে পালন করিয়াছিলেন, তদধিক উৎসাহ কখনো দেখান নাই; সেই উৎসাহ হ্রাস পাইতে পাইতে এমনই হইল যে শেষকালে তাঁহারই জীবদ্দশায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের নিত্য কাজ বন্ধ হইল। এখন উক্ত সমাজের অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্তপ্রায়, ব্রহ্ম-মন্দিরের ভগ্নদশা।

নৈবেদ্য রচনার পর্বে মহর্ষির আদেশে কবিকে শান্তিনিকেতনের দশম সাম্বৎসরিক (১৩০৭) উৎসবের ভাষণ লিখিতে হয়; ইহাই তাঁহার ধর্মবিষয়ক প্রথম দেশনা। দ্বিতীয় দেশনা হইতেছে 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম', ঐ বৎসরের মাঘোৎসবের জন্য উহা লিখিত। এই দুইটি রচনাকে কবি তাঁহার 'ধর্ম' নামক গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন নাই।

'ধর্ম গ্রন্থ (১৯০৯) কবির সাত বৎসরের ধর্মোপদেশের' সংগ্রহ—সবগুলিই শান্তি-নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পর রচিত। প্রায় রচনাই পৌষ-উৎসব, মাঘোৎসব, বর্ষশেষ, নববর্ষ প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত—সাধারণের কাছে সাধারণ ধর্মতত্ত্বের কথা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতিমূলক আত্মতত্ত্বের সন্ধানচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। 'দুঃখ' নামক ভাষণে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ব্রহ্মমন্ত্র, ঔপনিষদ ব্রহ্ম ও ধর্মগ্রন্থের অধিকাংশ ভাষণকে আমরা theological বা ধর্মতত্ত্বের আলোচনামূলক রচনা বলিয়া নির্দেশ করিব। কারণ ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ব-ব্যাখ্যানই ছিল রচনার উদ্দেশ্য। মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' নামক যে অপরূপ গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় আছে, তাহা যদি কেহ শান্ত চিত্তে পাঠ করেন তো তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন যে, মহর্ষির আধ্যাত্মিক অনুভূতি স্বকীয় হইলেও, তাহা ভারতীয় ধর্মচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তেমনি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বিষয়ক ভাষণগুলিও পাঠ করিলে আমাদের মনে হয় এ যেন মহর্ষির ব্যাখ্যানই কবির দৃষ্টি ও অনুভূতির অরুণ আলোকে উদ্ভাসিত। 'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশমালাকে কেবলমাত্র ঐ শ্রেণীর তত্ত্বমূলক ভাষণ বলিলে ভুল বিচার হইবে; এগুলি সুদৃঢ় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধ্যান দ্বারা উপলব্ধ, আত্মানুভূত রসের দ্বারা স্নিগ্ধোজ্জ্বল, বহু ব্যাপক অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, দর্শন শাস্ত্রের যুক্তিবাদ, জীবন শিল্পীর কর্মবাদ, বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতার নির্দেশ দিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন জগতের বিচিত্র ব্যবহারিকতাকে বা প্রকৃতির বিচিত্র স্বরূপকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিয়া অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় অবিচ্ছিন্ন শূন্যতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে নাই।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা কবিজীবনের একটি বিশেষ পর্বের সাধনা-উপলব্ধ বাণীর সঞ্চয়, কয়েকটি

মাসের নিবিড় চিন্তা ও ধ্যানের এবং অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ। কবিজীবনের এক একটি ভাবের উৎস এক-এক সময়ে নিবিড়ভাবে দেখা দিয়াছে—কবিতা, নাট্য, গীত, গল্প প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ পর্ব। কতকগুলি কবিতা অথবা গান এবং কয়েকখানি নাট্যও এক-এক সময়ে এক একটি ভাবময় রূপচক্র সৃষ্টি করিয়াছে; এমন কি তাঁহার পত্রধারাও এক একটি ভাবধারার বাহন হইয়াছে। শান্তি-নিকেতনের উপদেশমালাও সেইরূপ একটি বিশেষ পর্বের ধ্যান ও মননলব্ধ বাণীর প্রকাশ।

১৩০৯ হইতে ১৩১৪ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন কর্মের বিচিত্র উত্তেজনা এবং সাহিত্যের বিচিত্র রসসৃষ্টির মধ্যে কাটিলেও নিদারুণ শোকাঘাতে বারেবারেই তাহা খণ্ডিত নিষ্পেষিত হইয়াছে। কবিপ্রিয়া ও মধ্যমাকন্যার মৃত্যুর জন্য কবি বহুকাল হইতে অন্তরকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কারণ উভয়েই দীর্ঘকাল রোগভোগান্তে দেহমুক্ত হন। কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু (১৩১৪ অগ্র ৭) কবির মনকে সত্যই রূঢ়ভাবে আঘাত করিয়াছিল। শমীন্দ্রের মৃত্যুর পর মাঘোৎসবে 'দুঃখ' নামে যে ভাষণটি দেন, তাহার মধ্যে বারে বারে কবির অন্তর্বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৩১৫ সালের পূজাবকাশের পর কবি আশ্রমে ফিরিয়াছেন। গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে শমীন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে. তারও কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ একই দিনে শমীন্দ্র-জননী স্বর্গত হন। তাই এই সময়ে কবির মনে শোকাঘাতজনিত নানা অধ্যাত্ম সমস্যা জাগিতেছে। মনের এই অবস্থায় শান্তিনিকেতনের মন্দিরতোরণে প্রত্যুষান্ধকারে কবি ধ্যানে বসিতেন।

শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা ১৭ খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম আট* খণ্ড যথার্থভাবে আমাদের আলোচনার অন্তর্গত; ১৭ অগ্রহায়ণ (১৩১৫) হইতে ৭ই বৈশাখের (১৩১৬) মধ্যে সেগুলি কথিত ও লিখিত। পরবর্তী খণ্ডগুলির অধিকাংশ হইতেছে বুধবার দিন মন্দিরের উপদেশ বা বিশেষ দিনের ভাষণ অথবা উৎসবের বক্তৃতা। এই প্রথম আট খণ্ডের ভাষণগুলি নিত্য পূজার নৈবেদ্যস্বরূপ। সেইজন্য এই উপদেশমালা হইতে 'ধর্মে'র রচনাগুলির ভাবধারা সুস্পষ্টভাবেই পৃথক। 'ধর্মে'র উপদেশের মধ্যে "ব্রাহ্মধর্ম" ও 'নৈবেদ্য'র প্রভাব যে রহিয়াছে, তাহা অত্যন্তই স্পষ্ট। অধিকাংশই নৈবেদ্যর কবিতার ন্যায় নৈর্ব্যক্তিক, স্পষ্ট ও ওজস্বী। আর শান্তি-নিকেতনের ভাষণগুলির মধ্যে গীতাঞ্জলির ভাবধারা সুপ্ত। সেগুলি আমাদের বুদ্ধির সহিত বোধিকেও উদবুদ্ধ করে।

নৈবেদ্যর নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানমার্গী কাব্য রচনা ও শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন প্রায়-সমকালীন ঘটনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস নৈবেদ্য শ্রেণীর কবিতা লিখিয়া চির-তৃপ্ত রহিতে পারে না। একটি ঘটনায় কবির মনে যে রেখা টানিয়া দেয়—তাহারই অভিঘাতে নূতন কবিতার জন্ম হইল—'খেয়ার নেয়ে' দেখা দিলেন ছন্দের আড়ালে। শুনিয়াছি মহর্ষির কোনো ভক্ত আশ্রম বিদ্যালয় দেখিয়া গিয়া মহর্ষিকে বলেন যে, শান্তিনকেতনের উৎসব-আয়োজনে সকলকেই দেখিয়াছি কেবল দেখি নাই দুলহা (বর)কে। উৎসবের মধ্যে যিনি পরম বরেণ্য, সেই উৎসবরাজেরই দর্শন মেলে নাই। 'খেয়া'র দুলহা-অদর্শনের বেদনা মূর্তি লইয়াছে নূতন ছন্দে, নূতন ভাষায়, নূতন রূপকে।

ইহার পর কবিজীবনে যে পরিবর্তন আসিল, তাহা গভীর শোকাঘাতে উজ্জ্বল—একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য মনের আকুলতা সেই অবস্থায় বাণীময় রূপ লইল "শান্তিনিকেতনে"র উপদেশমালায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি ও সংগীতকার, তিনি কখনো ধর্ম ও দর্শন আলোচনায় আপনাকে নিঃশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না, যাহাকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায়, ধ্যানের দ্বারা মনশ্চক্ষে দেখা যায়, তাহাকে রসের মধ্যে পাইয়া সুরের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতেছে কবির স্বধর্ম। সেটি হইতেছে গীতাঞ্জলির পর্ব।

নৈবেদ্যর দেবতা দূরে থাকিয়া পূজার্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, "খেয়ার নেয়ে" আলো-ছায়ার রহস্যালোকে অস্পষ্টভাবে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়াছেন, আর গীতাঞ্জলির দেবতা ভক্তের সম্মুখে আসীন। শান্তিনিকেতনের ধ্যানলব্ধ সাধনার মধ্যে গীতাঞ্জলির রসানুভূতির প্রতিষ্ঠা। কবির এই রসের ধর্ম গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালিতে স্তরে স্তরে গভীর হইতে গভীরে গিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। গীতালির শেষ কবিতাটি পাঠ করিলে এই কথাটি স্পষ্ট হইবে।

রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক আকুতি যে কেবল গীতধারায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা নহে; তাঁহার সাহিত্য-হৃদয় প্রকাশের বিচিত্র পথে চলিয়া আপনাকে সার্থক করিয়াছে; শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর নাটকচতুষ্টয় এই পর্বেরই রচনা। এইসব নাটকের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের চিত্র কবি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই অবচেতন মনের সংগ্রাম। এইসব Symbolic বা Symbolistic নাটিকাগুলিকে "খেয়া"র রাহস্যিক কবিতার সমসূত্রে বিচার্য।

শান্তিনিকেতনের উপদেশমালার পর্ব হইতে কবির জীবনে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন নানা-ভাবে দেখা দিয়াছে। ধর্মের একত্ব ও সার্ব-ভৌমত্ব সম্বন্ধে কবির যে জ্ঞান এতাবৎকাল উপনিষদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা এখন তাহার সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বিচিত্র ধর্ম ও মতের উদার ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়িয়াছে, ঈশ্বর-যে সম্প্রদায়ের বাহিরে তাহা স্পষ্টতর হইতেছে। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে কবি খৃষ্ট ও চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে স্বয়ং ভাষণ দান করিলেন এবং অনতিকালের মধ্যে ভগবান বুদ্ধ ও হজরত মহম্মদের স্মরণ দিন পালন-রীতি প্রচলিত হইল। এছাড়া কবির ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান এতকাল উপনিষদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাহা বিস্তার লাভ করিল মধ্যযুগীয় সন্তদের জীবনের মধ্যে। এই সন্তদের বাণীর মধ্যে কবি তাঁহার অন্তরের বাণীর সায় পাইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, তিনি ভারতের ধর্মসাধনার ধারা বহন করিয়া আসিতেছেন, তিনি নিঃসঙ্গ নহেন। এই মধ্যযুগীয় সাধকদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটাইলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন।

শান্তিনিকেতন সতেরো খণ্ড উপদেশমালা রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতার লিখিত সঞ্চয়ন। এই কয়েক খণ্ড গ্রন্থ শান্তভাবে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করিলে আমরা কবির একটি সুসংগত ধর্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই ধর্মতত্ত্ব "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থের উপর প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহার সহিত সনাতনী ব্রাহ্মধর্মের সর্বাঙ্গীন মিল নাই। উপনিষদ-কেন্দ্রিত ধর্ম বিশ্বাসকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সংজ্ঞাকে বৃহত্তর পট-ভূমি মধ্যে ব্যাখ্যা করিলেন।

গীতাঞ্জলির গীত ধারায় দেবতা ও প্রকৃতি এবং তাহার সঙ্গে মানব অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে—সৌন্দর্য ও সুন্দর একাঙ্গীভূত অদ্বৈত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কবির যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীতের (Spiritual as opposed to religious) সূত্রপাত এই গীতাঞ্জলির পর্ব হইতে। সুতরাং এগুলিকে ব্রহ্ম সংগীত বলা ভুল হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই নূতন গীতধারা আলোচনা-কালে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, তিনি মুখ্যত স্বভাব কবি, প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্ভোগ তাঁহার আবাল্যের সংস্কার। ঈশ্বরকে অবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া জীবনশিল্পী কবির স্বভাবে হইতে পারে না। তাই গীতাঞ্জলি প্রমুখ কাব্যে ঈশ্বর ও প্রকৃতি এমন আশ্চর্যরূপে ওতপ্রোতভাবে মিলিত; প্রিয়তমের বিরহ বেদনা ছন্দে ও সুরে মুখর। সেইজন্য এখন-কার গানে ঈশ্বর মুখ্য ও প্রকৃতি গৌণ; কিন্তু কবির জীবন যতই গভীরে প্রবেশ করিল, প্রকাশের ভাষা ততই রূপকে, সুরে, ছন্দে,

রহস্যে ভরিয়া উঠিল; ক্রমে ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে মুখ্য-গৌণ ভেদ ঘুচিয়া গিয়া অখণ্ড রসবোধে সমস্ত চিত্ত প্লাবিয়া একাকার হইয়া-ছিল। সাধারণ পাঠকের কাছে মনে হইবে যে, কবির পরযুগের কাব্যে ঈশ্বরের কথা স্পষ্ট নহে, সৌন্দর্যবোধ স্পৃহা যেন সমস্ত দেহ-মনকে আবিষ্ট করিয়াছে। পরবর্তী যুগের কাব্য ও কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে এক শ্রেণীর সমালোচকের অভিযোগ এই যে, কবির রচনার ধারা ক্রমশই অধ্যাত্মলোক হইতে প্রকৃতিলোকে বা অতীন্দ্রিয়লোক হইতে ইন্দ্রিয়লোকে নামিয়া পড়িয়াছিল; এবং তিনি জীবনকে শেষ পর্যন্ত আর্টরূপে সম্ভোগ করিয়াছিলেন,—প্রকৃতিই ক্রমশ গীতে ও কাব্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া-ছিল। অভিযোগকারীদের ধারণা যে, কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি পূর্বের ন্যায় তীব্র ও আন্তরিক ছিল না। আমাদের মতে এই অভি-যোগ একদেশদর্শী; কারণ, রবীন্দ্রনাথ কবি ও তাঁহার কবিধর্মে তিনি প্রকৃতির পূজারী। শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় কবি যাহাকে ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন বাক্যে, গীতাঞ্জলিতে তাহাকে পাইলেন সুরে। জীবনের আরম্ভে কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী, জীবনের অন্তিমে সাধক রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসক। এই দুই অনুভূতি বিভিন্ন গুণ-ধর্মী, একটি অজ্ঞানের পাওয়া, অপরটি রসের উপলব্ধি; আজ যাহাকে সুরে ও ছন্দে পাইতেছেন, তাহা রসের ধর্ম বুদ্ধির ধর্ম নহে। সেইজন্য আমরা কবির শেষ দিককার গান বা কবিতাকে কেবলমাত্র সৌন্দর্য-সম্ভোগী আর্টিস্টের সৃষ্টি বলিয়া বিচার করিতে পারি না—উহারা কবির পরিপূর্ণ দৃষ্টিলব্ধ, অশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনাহীন সৃষ্টি।

এই মতের সমর্থন পাইলাম ক্লাইভ বেলের রচনা হইতে; নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:

Art and Religion are two roads by which men escape from circumstance to ecstasy. Between aesthetic and religious rapture there is a family alliance. Art and Religion are means to similar states of mind. And if we are licensed to lay aside the science of aesthetics and, going behind our emotion and its object, consider what is in the mind of the artist, we may say, loosely enough, that art is a manifestation of the religious sense. If it be an expression of emotion—as I am persuaded that it is—it is an expression of that emotion which is the vital force in every religion, or, at any rate, it expresses an emotion felt for that which is the essence of all. We may say that both art and religion are manifestation of man's religious sense, if by "man's religious sense" we mean his sense of ultimate reality. What we may not say is, that art is the expression of any particular religion; for to do so is to confuse the religious spirit with the channels in which it has been made to flow," (Clive Bell, Art, p. 92-93).

এইখানে আর একটি কথা বলিতে চাই; আমাদের দেশে ধার্মিকতা (religiosity) ও আধ্যাত্মিকতার (spirituality) সাহিত্য সন্ন্যাসের (asceticism) কৃচ্ছ্রতা ও গুহ্য সাধনা (esotericism) এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে, ইহার বাহিরে যে অন্য সাধনপন্থা থাকিতে পারে তাহা সাধারণের ধারণাতীত। রবীন্দ্রনাথ যে সহজ ধর্মসাধনাকে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন তাহাও যে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তি দিতে পারে, তাহা সহজে স্বীকৃত হইতে চাহে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সন্ন্যাস কৃচ্ছ্রতার জয়গানে লোকে মুখর, তাহাকে যদি সত্যই তাহারা ধর্মপন্থা হিসাবে বিশ্বাস করিত, তবে তো সেই পথকেই ব্যক্তিগত জীবনে বরণ করিয়া লইত! কিন্তু জীবনে কেহ তাহা অনুসরণ করে না, কারণ সে জীবনে তাহাদের বিশ্বাস নাই এবং বিশ্বাস যে নাই তাহা স্বীকার করিবার মতো সৎ সাহসের অভাবে অবাস্তবকেই সত্য বলিয়া জানে এবং সত্যজীবনকে তাহার যথাযথ পরিপ্রেক্ষায় দেখিতেও পায় না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যন্ত কবি-ধর্ম ও সাধকধর্মের আনাগোনা চলিয়াছিল, কোনোটিই কাহারও কাছে পরাভব মানিতে চাহে নাই। গীতাঞ্জলি হইতে কবির নূতন গীতধারার সূত্রপাত হইল। গীতাঞ্জলির সকল গান ও কবিতা আমরা যাহাকে আধ্যাত্মিক বলি—সে শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না।

---

*গীতাঞ্জলির ১ হইতে ২০ সংখ্যক গান ইতিপূর্বে শারদোৎসব ও গানে মুদ্রিত হইয়াছিল সুতরাং সেগুলিকে আমরা এই বিশ্লেষণ হইতে বাদ দিলাম।

সংখ্যা	স্থান	পর্ব	রচনার দিন
২১—৩৮=১৮	বোলপুর	১০ ভাদ্র—১৮ ভাদ্র ১৩১৬	৯
৩৯—৪০==২	কলিকাতা	২৭ ভাদ্র—১ আশ্বিন	২
৪১—৪৪==৪	শিলাইদহ	১৯—৩০ আশ্বিন	৪
৪৫=====১	বোলপুর	২০ অগ্রহায়ণ	১
৪৬—৫১==৬	বোলপুর	১২—১৭ পৌষ	৬
৫২—৫৪==৩	—	মাঘ—ফাল্গুন	৩
৫৫—৬১==৭	বোলপুর	২৬ চৈত্র—১ বৈশাখ ১৩১৭	৬
৬২=====১	কলিকাতা	৩ জ্যৈষ্ঠ	১
৬৩—৭৪=১২	তিনধরিয়া	৭—২১ জ্যৈষ্ঠ	৭
৭৫—৭৯==৪	কলিকাতা	২৪—২৮ জ্যৈষ্ঠ	৪
৮০—১১০=৩১	বোলপুর	২৯ জ্যৈষ্ঠ—২১ আষাঢ়	২০
১১১—১২২=১২	শিলাইদহ	২২—২৯ আষাঢ়	৬
১২৬—১৫৫=৩০	বোলপুর	২—২৫ শ্রাবণ	১৮
১৫৬—১৫৭==২	কলিকাতা	২৬—২৯ শ্রাবণ	২

মোট—১৩৭টি মোট—৮৯ দিন

পরিচয় পত্রটা পড়ে ভারী আপ্যায়ন করলেন ঘোষ সাহেব।

—এ আর বেশী কথা কী? নিশ্চয়, নিশ্চয়, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। আপনাদের মতো গুণিজনে দেখে খুসি হলেই—কী বলে ইয়েঃ আমার সার্থকতা। —বলেই তিনি হাঁক ছাড়লেনঃ বেয়ারা!

বেমানান চাপকান পরা একটি গোবেচারী উড়িয়া সামনে এসে দাঁড়ালো।

ঘোষসাহেব বললেন, চা—

আমি বাধা দিলাম ঃ একস্‌কিউজ মি, চা আমি এখন খাবো না।

—আরে তাতে কী! টি ইজ্‌ এ ড্রিংক ফর অল টাইমস—

এবার সবিনয়ে নিবেদন জানালাম বিশুদ্ধ বাঙলায় ঃ আজ্ঞে মাপ করবেন, অসময়ে চা খেলে আমার ইনসমনিয়া ধরে, বড্ড কষ্ট পাই।

—এই বয়সেই? রিডিং টু মাচ অ্যান্ড্ নেগলেক্‌টিং হেল্‌থ—এ? দ্যাট্‌স ব্যাড্‌, ভেরি ব্যাড্‌——সখেদে বললেন ঘোষ সাহেব।

খানিকক্ষণ সসংকোচে নীরব থেকে আমি বললাম, তা হলে মিউজিয়ামটা—

—সে হবে এখন। কিন্তু আমার বাড়িতে এসে শুধু মুখে চলে যাবেন! অন্তত সামান্য কিছু—

হাতজোড় করে বললাম, আমার ডায়েট্‌ অত্যন্ত রেগুলার।

—নো, রিয়্যালি, আমি অত্যন্ত নিরাশ হচ্ছি মাই ইয়ং ফ্রেন্ড্‌। এই তো জীবনকে উপভোগ করবার, মানে ভিগরাস্‌লি এন্‌জয় করবার বয়স। —ঘোষ সাহেবের মুখে চোখে উপদেশ দেবার একটা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ফুটে উঠলঃ কিন্তু আজকালকার ছেলেরা দিনের পর দিন যে বুড়োরও বেহদ্দ হয়ে উঠছে। ডু ইউ নো, এই বয়সেও আমি দেড় সের মাংস খেয়ে হজম করতে পারি?

কথাটা না জানলেও মানি। প্রচুর ঘি-মাংস হজম করবার শক্তি না থাকলে অমন একটি কলেবর যে গড়ে ওঠে না সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই আমার। আর একটা কথা হয়তো সংকোচের জন্যেই আমাকে বলতে পারেননি ঘোষ সাহেব, কিন্তু ওঁর নিশ্বাসে নিশ্বাসে প্রতি মুহূর্তে যে গন্ধ পাচ্ছিলাম তাতে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, যথেষ্ট পরিমাণে ড্রিংক করেও এ বয়সে তিনি একেবারে স্বাভাবিক এবং আত্মস্থ হয়ে থাকতে পারেন।

আজ সন্ধ্যাবেলাতেই আমাকে কটকে ফিরতে হবে, বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম আমি। ঘোষ সাহেব লক্ষ্য করলেন সেটা। সোনার কেস্‌ খুলে একটা আমেরিকান্‌ সিগারেট আল্‌তো-ভাবে ছোঁয়ালেন ঠোঁটের কোণায়, ধরালেন লাইটার দিয়ে, তারপর বললেন আচ্ছা, আসুন।

সত্যি, এত ভালো প্রাইভেট্‌ মিউজিয়াম আমি দেখিনি। মিউজিয়ামটি আয়তনে ছোট, এক্‌জিবিটের সংখ্যাও যে খুব বেশি তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিস সুন্দর আর সুনির্বাচিত। মূর্তি আছে, তাম্রপট্ট আছে, এক টুকরো ফসিল আছে, মুদ্রাও আছে গোটাকতক। প্রায় প্রতিটি জিনিস অত্যন্ত মূল্যবান—ভ্যালুয়েশন করলে এই মিউজিয়ামটুকুর দাম অন্তত পঁচিশ হাজার টাকার কম হবে না।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব আমাকে দেখালেন ঘোষ সাহেব। শুধু তাঁর কালেক্‌শন দেখলাম তাই নয়, সেই সঙ্গে দেখলাম অপরিসীম পাণ্ডিত্য ভদ্রলোকের। প্রচুর পড়াশুনো করেছেন, চিন্তা করেছেন প্রচুরতর পরিমাণে। সারা জীবন বিশ্বস্তভাবে সরকারের সেবা

করবার পরে এই জাতীয় জ্ঞানলিপ্সা খুব সুলভ নয়।

প্রত্যেকটি এক্‌জিবিটের নীচে দিয়েছেন নিখুঁত আর নির্ভুল পরিচয়। এমন কতগুলো জিনিসও চোখে পড়ল যা ভারতবর্ষের আর কোনো মিউজিয়ামে আছে বলে আমার জানা নেই। ক্রমশঃ ঘোষ সাহেবের ওপরে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে উঠতে লাগল। এমন কি তাঁর মুখ থেকে আসা যে মদের গন্ধ এতক্ষণ ধরে আমার স্নায়ুতন্ত্রকে উৎপীড়িত করছিল, তাও সুসহ হতে লাগল ক্রমশ।

খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী করে জোগাড় করলেন এতসব?

—ওঃ, সে সব নানা উপায়ে। —ততক্ষণে মোটামুটি দেখা শেষ করে একটা সোফাতে এসে বসেছি আমরা। সোনার কেস্ থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘোষ সাহেব বললেন ঃ এই আমার নেশা ছিল। লোকে রেস্ খেলে, লোকে —বোধ হয়, 'মদ খায় কথাটা সামলে নিলেন ঘোষ সাহেব ঃ আরো কত কী অপব্যয় করে— আমি যা কিছু অপচয় করেছি এর পেছনে।

—বিস্তর টাকা খরচ হয়েছে বলুন।

—তা হয়েছে। তবে সরকারী চাকরী ছিল, ওইটে এক মস্ত সুবিধে। যখন আর কিছুতেই কাজ হয়নি তখন বলং বলং বাহুবলং, বুঝলেন না।?

—মানে?

—মানে, কিছুটা রাজপ্রতাপ প্রয়োগ করতে হয়েছে—ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা নাচাতে লাগলেন ঘোষ সাহেব ঃ মুর্খের প্রতিষেধক হচ্ছে লাঠি।

এবারেও কিছু বুঝতে না পেরে আমি তাকিয়ে রইলাম।

—বোঝেননি? ওঃ, দেশের লোকের ক্যারাক্টারিস্টিক আপনি জানেন না। ধরুন কোথাও পুকুর, কুয়ো কিংবা ভিত খুঁড়তে গিয়ে, নয়তো কোনো মজা দীঘির নরম জমিতে লাঙল দিতে গিয়ে পেয়ে গেল একটা মূর্তি। হয়তো সেটা বোধিসত্ত্ব, নয়তো কোনো তীর্থঙ্কর—কিন্তু তাতে কী আসে যায় এদের? লিটারেসি দূরে থাক, কমনসেন্সেরও বালাই নেই কিনা। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটাকে একটা বট কিম্বা বেলগাছতলায় প্রতিষ্ঠা করে নিলে, তারপরে প্রাণপণে পুজো শুরু করে দিলে তার। তখন সে মূর্তি আর সেখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। একজোট হয়ে গ্রামের লোকে তাড়া করে আসবে। হাজার যুক্তি দিয়েও বোঝানো যাবে না যে ওরে ব্যাটারা, এটা নিতান্তই অ-হিন্দু পুরুষ দেবতা, মা কালী নয়!

—তা আপনি জোগাড় করতেন কী করে?

—সুবিধে পেলেই গভীর রাত্রে গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দিতাম। পরদিন সকালে ভক্তেরা এসে দেখত দেবতা হাওয়া হয়ে গেছেন। পরম বিশ্বাসে মনে করত, তাদের ভক্তির মধ্যে কোথাও ফাঁকি ছিল, তাই অসন্তুষ্ট দেবতা রাগ করে ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেছেন।

নিজের রসিকতায় হা হা করে হেসে উঠলেন ঘোষ সাহেব।

কিন্তু আমার যেন কেমন বেদনা বোধ হল। কতগুলো মানুষের সরল বিশ্বাসের ওপর এই নিষ্ঠুরতার ব্যাপারটা ঘোষ সাহেবের মতো অমন প্রশান্ত কৌতুকে গ্রহণ করতে পারলাম না আমি। চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম দেবতার শূন্য বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে কতগুলি নিরীহ গ্রাম্য মানুষের চোখ দিয়ে দর দর করে জল নেমে আসছে, যুক্ত করে আর্তকণ্ঠে তারা চাইছে বিমুখ দেবতার মার্জনা ভিক্ষা।

ঘোষ সাহেব বলে চললেন, কোথাও কোথাও রাত্রেও পাহারা দিত। তখন সে ক্ষেত্রে থানা-পুলিস কো-অপারেট করত আমার সঙ্গে। অ্যান্টিকুইরিয়ান্ ইন্টারেস্টের দিক থেকে গভর্নমেণ্ট প্রোপার্টি বলে সীজ করে আনতাম। একটু অপ্রীতির সঞ্চার হত, পুলিসের সঙ্গে একটা খণ্ড যুদ্ধও হয়েছিল একবার। তবে ঘুষ দিয়ে যেখানে কাজ হয়েছে সেখানে আর ওসব হাঙ্গামা হুজ্জুতের মধ্যে আমি যাইনি। ভালো করে দেখুন না, কোনো কোনোটার গায়ে সত্যিই চিহ্ন রয়েছে—হাজার চেষ্টা করেও তাদের পাকা দাগ তুলে ফেলতে পারেননি ঘোষ সাহেব। কিন্তু আমার বিশ্রী লাগতে লাগল। মনশ্চক্ষে ধরা দিলে ঝুরি নামা বটের ছায়ায় লঘু অন্ধকারে সমাসীন দেবতা। অকুণ্ঠ বিশ্বাসে মানুষ সেখানে কামনা জানায়, আশীর্বাদ ভিক্ষা করে, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-বাসনা নিবেদন করে দেয় যৎসামান্য উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে। হোক সে মূর্তি বোধিসত্ত্বের, হোক তা তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের কিন্তু মানুষের সরল বিশ্বাসে সেখানে সত্যি-কারের দেবতা জেগে ওঠেন—অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। আসনের তলায় বাসা বাঁধে কেউটে সাপ, মাথার ওপর পাতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে বৃষ্টির জল, দুঃখের অন্ত নেই; কিন্তু তাই বলে মিউজিয়ামের এই নিরাপদ আশ্রয়ে প্রতি মুহূর্তের সেবাযত্নে কি খুব সুখী আছেন দেবতা? গবেষকের শ্রদ্ধাহীন দৃষ্টির নিষ্ঠুর বিচারে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কি তিনি?

ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওই সিঁদুরের দাগগুলো যেন রক্তচিহ্ন বলে মনে হতে লাগল আমার কাছে। মনে হতে লাগল মুমূর্ষু স্বামীর আয়ুলাভের কামনায় যে সীমন্তিনী ওখানে আকুল যন্ত্রণায় মাথা ঠুকেছে, ও যেন তারি কপালের রক্ত, শেষ সম্বল পশুটিকেও বলি দিয়ে যে বন্ধ্যা সন্তান কামনা করেছে, ও যেন তারি স্বাক্ষর।

ঘোষ সাহেবের সমস্ত কালেক্‌শনের পেছনে একটা নিষ্ঠুরতার ইঙ্গিত পীড়িত করতে লাগল আমাকে। ভাবছিলাম, উঠব—প্রায় দু ঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে। হঠাৎ ঘোষ সাহেব যেন সচেতন হয়ে উঠলেন।

—ভালো কথা, একটা মজার জিনিস আপনাকে দেখানো হয়নি।

—সে আবার কী?

—আসুন দেখাচ্ছি—

একেবারে কোণের একটা টেবিলে কী একটা জিনিস কালো কাপড় দিয়ে মোড়া ছিল। এতক্ষণ সেটা লক্ষ্য করিনি। তার ওপর থেকে এবার আবরণটা সরিয়ে দিলেন ঘোষ সাহেব। সবিস্ময়ে একটা অস্ফুট শব্দ করলাম আমি।

—এ কি—এ আপনি কোথায় পেলেন?

জবাব না দিয়ে মিটি মিটি হাসলেন তিনি।

আমি বললাম, এ যে ব্রাহ্মী।

তিনি বললেন, হুঁ।

পড়তে চেষ্টা করে আরও চমকে উঠলামঃ এ যে মহারাজা বিম্বিসারের নামাঙ্কিত শিলাপট্ট! অতি দুর্মূল্য বস্তু। কোথায় পেলেন আপনি?

—আন্দাজ করুন। তাঁর মুখে সেই রহস্য ঘন হাসির দীপ্তি।

আমি মাথা নাড়লাম।

—এইটেই এখানকার বেস্ট এক্‌জিবিট— কী বলেন?

—নিঃসন্দেহ।

তাহলে এর কাহিনীটা শুনুন। আরো ইন্টারেস্টিং সেটা—ঘোষ সাহেব সিগারেট ধরালেন একটা।

আমি তখন পুরীতে সাব-ডিভিসনাল অফিসার। সব দিক থেকেই আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। আমার প্রতাপে একদিকে বাঘে-গরুতে জল খায়, অন্যদিকে আমার কালেক্‌শনের 'হবির' কথাটাও প্রচারিত হয়ে গেছে লোকের মুখে মুখে। মাঝে মাঝে লোকে আমার কাছে এটা ওটা বেচতেও আসত—ন্যায্য দাম দিয়ে কিনে নিতাম আমি।

এই সময় একটি বাঙালী ছোকরা একদিন এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

হ্যাগার্ড চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, অনেকদিন ভালো করে খেতে পায়নি। ছোকরা গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু কোথাও কোনো প্রভিশন জুটছে না।

আমি বললাম, 'সরি, চাকরীর কোনো ব্যবস্থা আমি করতে পারব না।'

সে বললে, 'না, চাকরী নয়। আমি একটা দুর্মূল্য জিনিস সংগ্রহ করেছি, যদি অনুমতি করেন দেখাতে পারি।'

বললাম, 'বেশ তো, গ্ল্যাডলি। পছন্দ হলে আমি কিনতে পারি।'

পরদিন একটা মুটের মাথায় এইটে চাপিয়ে সে হাজির।

দেখে আমি আপনার মতোই চমকে উঠলাম। বললাম, 'পেলে কোথায়?'

জবাব দিলে, 'সম্বলপুরে ফরেস্টে।'

আমি মশাই সাদাসিধে লোক, ঘোর-প্যাঁচ বুঝি না। তক্ষুনি কিনে ফেললাম। বেশ মোটা দাম চাইলে, জিনিস হিসেবে সেটা আনরিজ্-নেবল নয়। আমি অবশ্য পঞ্চাশ টাকাতেই রফা করলাম শেষ পর্যন্ত। লোকটা বিপদে পড়েছিল, তাই অসন্তুষ্ট হয়েই নিলে টাকাটা। মনে মনে ভাবলাম, খুব জিতে গেছি আমি—আই অ্যাম দি প্রাউড পসেসার অব ওয়ান অব দ্য রেয়ারেস্ট এক্সিবিটস্।

কিন্তু দুনিয়াটা যে এত খারাপ জায়গা এবং মানুষ এমন সাংঘাতিক জীব সে কি আমি জানতাম। সারা জীবন লোককে বিশ্বাস করে করে ঠকেছি ভায়া, এবারেও ঠকলাম।

এরই মাসখানেক পরে একদিন একটা উড়িয়া শিল্পী এসে হাজির।

বললে, 'হুজুর, যদি কোন কাজকর্ম দেন, তো খেয়ে বাঁচি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কাজকর্ম করতে পারো?'

পুরোনো মূর্তি ঠিক করতে পারি, দরকার হলে নতুন তৈরিও করে দিতে পারি। এমন কাজ করে দেব হুজুর যে নতুন-পুরোনোর তফাৎ বুঝতে পারবেন না।'

কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'বটে?'

লোকটা সোৎসাহে বললে, 'হাঁ হুজুর, এই তো সেদিন হরেনবাবুকে'—বলেই আচমকা থেমে গেল সে।

কিন্তু আমি চমকে উঠলাম। হরেন বাবু। সেই লোকটা। বললাম, 'হরেনবাবু কী?'

লোকটা বললে, 'না, না, সে কিছু নয়।'

তখন জবরদস্ত হাকিমের মূর্তি ধরলাম আমি। গর্জন করে বললাম, 'বল ব্যাটা, জেলে দেব নইলে।'

সহজে কী বলে। শেষে একটা হান্টার তুলে নিলাম হাতে। তখন শুড় শুড় করে বেরিয়ে এল সত্য—এ টেরিবল ট্রুথ। উঃ, কী নিমকহারামের জায়গা এই দুনিয়াটা।

কিছুদিন আগে হরেনবাবু এসে ওকে একখানা ছেঁড়া বইয়ের পাতা দেখায় তাকে। বলে এতে যা লেখা আছে, তাই পাথরের গায়ে এঁকে দিতে হবে। এমন করে—যে নতুন-পুরোনোর তফাৎ বোঝা যাবে না। বিনিময়ে দশটা টাকা দেবে তাকে।

দু টাকা বকশিস দিয়ে শিল্পীকে আমি বিদায় দিলাম। তখন আমার মাথার মধ্যে রক্ত নেচে উঠেছে টগবগিয়ে। আমি হাকিম মানুষ, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—আর আমার সঙ্গেই জোচ্চুরি। ওয়েল, ওয়েল! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

হুলিয়া বার করে দিলাম।

যাবে কোথায় বাছাধন। হাকিমের চোখ। ধরা পড়ল ওয়ালটেয়ার স্টেশনে।

কান্নাকাটি করেছিল আমার পা জড়িয়ে। বেশ সেন্টিমেন্টাল আপিল জানিয়েছিল। বলেছিল, 'মরা পাথরের জন্যে এত টাকা আপনি অপব্যয় করেন, না হয় মনে করলেন একটা মানুষকে বাঁচাবার জন্যে এটা আপনি চ্যারিটি করলেন।

'চ্যারিটি! চাইলেই পারতে।' যা হোক কিছু দিতাম। তাই বলে জোচ্চুরি। নো—নো—বিইয়িং এ গার্জেন অব ল', আই কান্ট টলারেট সুইনডলিং।'

'কী করব স্যার, খেতে পাইনি।'

আমি বললাম, 'খেতে অনেকেই পায় না—ইউ কান্ট হেলপ্ ইট। দিলাম ব্যাটাকে পাক্কা একটি বছর ঠুকে।

পরিতৃপ্তি এবং প্রতাপের দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল ঘোষ সাহেবের মুখ।

বললেন, কী অডাসিটি। উপমা দিয়ে বলে মরা পাথরের চাইতে মানুষের প্রাণের দাম বেশি। ইডিয়ট। জ্ঞানের জন্যে হাজার হাজার মানুষ সেলফ-স্যাক্রিফাইস করে—আর এ ব্যাটা উল্টো সারমন শোনাচ্ছে আমাকে। যত সব।

ঘোষ সাহেব আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি আর বসতে পারলাম না। মনে হল, সমস্ত মিউজিয়ামের হাওয়াটা যেন কেমন ভারী হয়ে উঠেছে, চেপে বসতে চাইছে আমার বুকে। ওই নকল শিলাপট্টটা। —মূর্তিগুলোর গায়ে ওই সব সিঁদুরের চিহ্ন কেমন অস্বস্তিতে পীড়িত করতে লাগল আমাকে।

আমি উঠে পড়লাম।

এরই বছর তিনেক পরে আবার আমাকে আসতে হয় ভুবনেশ্বরে। পেটের গোলমালে ভুগছিলাম, ভুবনেশ্বরে জলে স্বাস্থ্য ভালো করে নিয়ে যাব।

দেখা করতে গেলাম ঘোষ সাহেবের সঙ্গে। দেখতে গেলাম তাঁর মিউজিয়াম।

—'সেই নকল শিলাপট্টটা।'

ঘোষ সাহেব হেসে বললেন, নেই।

—গেল কোথায়?

—যুদ্ধের সময় একটা পাগলা আমেরিকান এসেছিল। ইণ্ডিয়ান কিউরিয়ো সম্পর্কে ভাবী ঝোঁক—এদেশের ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ করে চলেছে। সেই ব্যাটাই জেনুয়িন ভেবে দেড় হাজার টাকায় ওটা কিনে নিয়ে গেল। মন্দ হয়নি—কী বলেন?

প্রসন্ন হাসিতে ঘোষ সাহেবের ভারী গালটা চকচক করতে লাগল।

বাংলার বাউলরা একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম এরা পালন করে না। এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নেই। বিধি-নিয়ম আচার অনুষ্ঠান এরা মানে না। শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা এরা নিয়ন্ত্রিত নয়। কৃচ্ছ্রসাধনেও এরা অসম্মত। এই জন্যে বাউলদের সাধনার এক নাম "সহজিয়া" সাধনা। এদের বলে রসিক, কেননা এরা রসোপলব্ধির সাধনা করে, এরা আনন্দরসের অনুরাগী। এরা প্রেমের সাধনা করে যে প্রেমের উদ্দেশ্য কেবল ভালবেসে যাওয়া। এদের ভালবাসা অধরার প্রতি। কিন্তু এই অধরাকে তারা ধরতে চায় রূপের জগতের সাহায্যে। তাই তারা বলে অধরাকে ধরতে হলে ধরার সংগ করা চাই। ধরার জগৎ, রূপের জগতের আনন্দকে আগে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই অধরাকে ধরতে পারবে, তখনই অধরার প্রতি তোমার ভালবাসা সার্থক হয়ে উঠবে। এই অধরাই হলো এদের আর এক ভাষায় "মনের মানুষ"। এই মনের মানুষের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, পূজার ভাব একেবারে নেই। বন্ধু, সখার ভাবের সংগে সম্পূর্ণ মেলে না—যদিও কাছাকাছি যায়। বিরহকাতর প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের সংগে হয়তো এদের প্রেমের তত্ত্ব মেলে কিন্তু মিলনের কোন কথা কোথাও নেই। মিলন হলে কি হবে, কি করবে সে কথা ভাববার তাদের অবসরই মেলেনি। এতখানি প্রেমপাগল এই সম্প্রদায়। এরা বলছে এই মনের মানুষ অধরার স্থান হচ্ছে এই দেহে—এর মধ্যেই তিনি আছেন, আমরা মূর্খের মত ভ্রমে পড়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। অর্থাৎ নানা প্রকার আচার বিচার প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাকে আয়ত্ত করতে চাচ্ছি বাইরের জিনিস ভেবে। অথচ আমার মধ্যেই সেই অধরা, সেই প্রাণের মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইভাবে তাকে অনুভূতির সাহায্যে জানাই হোলো এদের মূল কথা।

এ সাধনা গুরুপরম্পরা সাধনা, তাই এরা মনে করে এদের এই সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে গুরুই হোলো প্রধান অবলম্বন। তিনি ছাড়া এই পথে অগ্রসর হবার পথ আর কেউ বলতে পারে না। তাই এরা গুরুকে এদের সাধনায় বিশেষ স্থান দিয়েছে। কখনো কখনো এমনও বলেছে যে, অধরাকে ধরতে গেলে যে 'ধরা'-র সংগ করতে হবে সে 'ধরা'ই হোলেন গুরু। আর এই গুরুর শ্রীচরণ পূজাতেই অধরার সন্ধান পাওয়া যায়। এই রকম গুরুবাদের বড় কারণ হোলো লেখাপড়া না জানা বাউলদের কাছে গুরুরাই প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রগ্রন্থ। পণ্ডিত, জ্ঞানীরা পুস্তক পাঠে নিজেদের মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারেন, কিন্তু অশিক্ষিতদের পক্ষে এরকম কোন সুবিধাই নেই। এরা লেখাপড়া জানা সম্প্রদায় নয় বলেই গুরুরাও কোনদিনই কিছু লিখে রাখতে পারেনি। তাদের জ্ঞানের কথাকে, গূঢ় তত্ত্বকথাকে, কেবল গানের ভাষায় মুখে মুখে বলে গেছে। তাই বলেছি গুরুরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে লিখিত ধর্ম-পুস্তকের সমান। যে কারণে হিন্দুদের বেদ, খৃষ্টানদের বাইবেল, মুসলমানদের কোরাণ ও শিখদের গ্রন্থসাহেব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ঈশ্বর সমতুল্য পূজ্য গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল আমরা সাধারণত কিভাবে তাদের দেখি। মুখে দাড়ি গোঁফ লম্বা চুল তালুতে উঁচু করে চূড়ো বাঁধা। গায়ে সাধারণত হাতকাটা, লম্বা জোব্বা, হাঁটুর একটু নীচ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ভিক্ষাজীবী। সাধারণ লোকে গান শুনে যা দেয়, তাতেই খুসী। যারা আখড়াধিপতি গুরুস্থানীয় তারা তাঁদের আখড়া থেকে বড় একটা নড়েন না। আবার পূর্ববংগের খ্যাতনামা বাউলদের অনেকেই ছিলেন যাঁরা দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতেন। রবীন্দ্রনাথের গগন হরকরা ছিলেন

বাউল — শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

পিয়ন, লালন ফকিরের ছিল পানের বরোজ, তাঁর গুরু ছিলেন পাল্কীবাহক। বাউলরা সঙ্গে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বসবাস করেছেন, সংসারও করেছেন, অথচ এরা যেন হাঁসের মত। জলের মধ্যে ডুব দিলেও জল এদের গা ভেজাতে পারে না। এরা ঘর যেমন বাঁধে আবার যে কোন মুহূর্তে ঘর ভাঙ্গতেও সেই রকম দক্ষ। একেবারে আত্মভোলা সম্প্রদায় এরা।

পণ্ডিতদের মতে এই ধরণের সাধনার ধারা নাকি ভারতের অতি প্রাচীন প্রথা। বৈদিক যুগেও নাকি এরকম এক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, তারাও আচার বিচার মানত না, আপন ইচ্ছায় চলত। তার পরে নাথ যোগীরাও নাকি ছিল এই ধরণের একটি আত্মভোলা ও ত্যাগী সম্প্রদায়। বৌদ্ধ গান ও দোঁহার সঙ্গেও নাকি ভাবের দিক থেকে বাউলদের গানের সঙ্গে বহু সাদৃশ্য আছে। এই যুগে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার সঙ্গে বাউলদের সহজিয়া সাধনার মিল অনেকে দেখেছেন। এছাড়া সবচেয়ে বড় চিন্তা হোলো এই যে, মুসলমান যুগের সুফীরা এদের চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণালীকে বিশেষভাবে চালিত করেছে। তান্ত্রিক যুগের বৌদ্ধরা মুসলমান সভ্যতার চাপে যদিও মুসলমান হোলো, কিন্তু তারা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বহু প্রকার বিন্যাসকে ছাড়তে পারেনি। সেই সাধনার বহুপ্রকার গুপ্ত প্রক্রিয়াকে নিজেদের এই সাধনার অঙ্গ করে নিয়েছে। পণ্ডিতরা আরো বিশ্বাস করেন যে, পারস্য দেশের সুফীদের মধ্যে সেই অঞ্চলের প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তা না হলে গুরুবাদে বিশ্বাস করা ও ইসলামের নীতি বিরোধী নাচ গানকে সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। যাই হোক ভারতে এই ভাবে সুফী ও বৌদ্ধভাবাপন্ন হিন্দু সাধনার সংমিশ্রণে আমরা বাউল নামে এই বিশেষ সম্প্রদায়কে পেয়েছি।

সব ধর্মমতই যখন মূল আদর্শচ্যুত হয়, তখন তা থেকে নানা প্রকার মতবাদ ও দলের সৃষ্টি হয়। এই বাউলদের মধ্যেও তাই ঘটেছিল। তারই ফলে আউল, নেড়ানেড়ীর দল, কর্তাভজার দল, বৈষ্ণব বাউল বা ফকির ইত্যাদির আবির্ভাব। এই সব দলগত প্রভাব বাউল গানে যথেষ্ট পড়েছে। যার বড় উদাহরণ পশ্চিম বাংলায় পেয়েছি, বাউলদের রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে, গৌর-নিতাই বিষয়ক ভক্তির গানে।

এদের প্রচলিত গুপ্তসাধন প্রণালী আমি দেখিনি ও জানি না। কিন্তু এরা যখন গানের ভাষায় নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে জমায়েৎ হয়, তখনকার সেই আবহাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। দল বেঁধে বসে গেছে গোল হয়ে,—মাঝখানে একটু প্রশস্ত জায়গা। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একতারা, কিন্তু সে একতারা পশ্চিম ভারতের ভজনপন্থী গায়কদের একতারা নয়, পশ্চিমের একতারাকে বলা চলে তানপুরার ছোট সংস্করণ। তানপুরার চার তারের বদলে এতে থাকে এক তার কিংবা দুই তার। বাংলার বাউলদের মধ্যে প্রচলিত একতারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আমার নিজের ব্যক্তিগত মত হোলো পশ্চিম বাংলা অঞ্চলের বাউলদের একতারা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গলারই নিজস্ব একতারা। বাঙ্গলার বাউলদের এই একতারা একমাত্র তাদেরই হাতে ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে দেখা যায় না। (এই একতারার ছবি অনেকেই দেখেছেন, তবুও সাধ্যমত এর বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো।)

সাধারণত পাকা লাউ থেকেই এর সৃষ্টি। বাঁশও বিশেষ প্রয়োজনীয়। গোল ও চেপ্টা লাউ এই প্রকার একতারায় কাজে লাগে না। যে লাউয়ের আকৃতি সরু ও লম্বা, কতকটা মুগুরের মত, তারই নীচের অর্ধেকটা এর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সাধারণত একতারার লাউটি এক বিঘৎ কিংবা আট নয় ইঞ্চি লম্বা থাকে। নীচের অংশে পাতলা চামড়া লাগায়। এস্রাজ বা স্বরোদে আমরা যা দেখি, এই চামড়াও সেই জাতের। লাউয়ের উপর দিকটা থাকে ফাঁকা। একটি এক থেকে দেড় ইঞ্চি ফাঁপা ও প্রায় দুহাত লম্বা বাঁশের একদিকের গাঁঠটিকে না কেটে, অপর দিক থেকে উপরের গাঁঠ পর্যন্ত চার ভাগে চিরে ফেলে। মুখোমুখি দুদিক থেকে দুটি অংশকে কেটে বাদ দিয়ে বাকি দুই অংশ ঐ লাউয়ের দুই পাশে বেঁধে দেয়, লাউয়ের গা ফুটো করে, মোটা সুতো, দড়ি বা পাতলা তারে। উপরে গাঁঠের ঠিক নীচেই থাকে একটি বাঁশের তৈরী কান। সেই কান থেকে তার যায় লাউয়ের ভিতর দিয়ে নীচেকার চামড়ার মাঝখানটি ফুটো করে। চামড়ার বাইরে একটি কাঠের ছোট টুকরোর সাহায্যে তারটি আটকান থাকে। এছাড়া চায়ের টিনের কৌটোকে একতারা করে বাজাতে দেখেছি। অনেকে সখ করে কাঁসার তৈরী একতারাও বানিয়ে নেয়।

এই একতারার বাঁশের দুইটি পাতলা ডান্ডার যে কোন একটিকে একহাতে চেপে ধরে, হাতের দ্বিতীয় আঙ্গুলে গানের ছন্দে ছন্দে আঘাত করে ঝঙ্কার তুলতে হয়। লাউয়ের অংশটিকে কানের কাছে চেপে ধরে বহু সময় তাদের বাজাতে দেখি। তার একটি প্রধান কারণ হোলো লাউয়ের ভিতর দিয়ে একতারার শব্দ ঝংকার যেভাবে কানে বিশেষভাবে ধরা পড়ে, সে রকম আর কোন উপায়ে সম্ভব নয়। তখন মনে হয় জগতটা যেন একটি বিরাট সুরে ডুবে আছে।

কোমরে থাকে ছোট একটি "বাঁয়া"। বাঁ দিকে, সামনে ঈষৎ বেঁকানো। কোমর ও বাঁ কাঁধ থেকে ফিতে দিয়ে ঝুলিয়ে কাপড়ের পাড়ে শক্ত করে বাঁধা। কেবলমাত্র বাঁ হাতে বাঁয়ার উপরে নানা প্রকার শব্দে ছন্দ তুলতে হয় গানের সঙ্গে মিলিয়ে। বাংলা দেশের এই দলের বাউলদের সবচেয়ে বড় গুণ হোলো বাঁ হাতে বাঁয়া-র উপর তাল দিয়ে, ডান হাতে এক আঙ্গুলে একতারায় তালে তালে ঝঙ্কার তুলে, পায়ে বাউলের কাঁসার বাঁকা নূপুরের শব্দে নৃত্য ও একসঙ্গে গান গাওয়া। এইরূপ স্বাবলম্বনের ক্ষমতা এই বাউলদের একটি আশ্চর্য ক্ষমতা। আমার মতে বাউলদের এই বিশেষত্বটিও বাঙ্গলারই একটি নিজস্ব বিশেষ গুণ।

বাউলরা নাচে গায়। কিন্তু এযুগে নাচিয়ে বাউলের সংখ্যা খুব কম। দল বেঁধে সংকীর্তনের মত নাচতে তাদের কখনো দেখিনি। পূর্বে বাংলা দেশের সব বাউলরাই গান গেয়ে নাচতো কিনা বলতে পারি না। শোনা যায় সুফীদের মধ্যে চিশ্তীয়হ্ ও সুহ্রবরদীয়হ্ দরবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে গানে প্রেম প্রকাশের ধারা প্রচলিত, তাকে তারা বলে "সমা" বা গানের বৈঠক। এদের উদ্দেশ্য হলো গানবাজনায় অন্তরকে প্রেমরসে উদ্দীপ্ত করা, ভগবৎ প্রেমে বিভোর হওয়া। এই অবস্থাকে কীর্তনের ভাষায় দশায় পাওয়া বলে। অনেকে ঐ সময় ভাবাবেগে নানা দেহভঙ্গী করে বা নাচতে থাকে। অবশ্য সে নাচ কোন নিয়মের দ্বারা যে পরিচালিত তা নয়। তাকে অশিক্ষিত দেহছন্দে তালে তালে ভাবাবেগে এক রকমের লাফানো বলা চলে।

কবি জয়দেবের বাসস্থান বিখ্যাত কেন্দুলী গ্রাম শান্তিনিকেতনের ২৫ মাইল পশ্চিমে অজয় নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর এই গ্রামে পৌষ-সংক্রান্তি থেকে শুরু করে এক সপ্তাহের মত একটি বিরাট মেলা বসে। এই মেলার প্রধান আকর্ষণ হোলো বাঙলার বিভিন্ন স্থানের বাউল ও তার নানা শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত সম্প্রদায়ের সম্মিলন। এই সপ্তাহটি তাদের কাছে বড় আনন্দের, কারণ এইখানেই তারা বছরে একবার নিজেদের মধ্যে মেলামেশা, ভাবের ও জ্ঞানের আদানপ্রদানের সুযোগ পায়। এই সময় তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে, গানে নাচে রাতের পর রাত আনন্দ করে। বহুবার সেখানে গেছি—কতবার এদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বসে ওদের গান নাচে শীত কাটিয়েছি মশগুল হয়ে। বিগত ২৪ বৎসরের মধ্যে ৬।৭ বার ঐ মেলায় গিয়েছি। তাছাড়া শান্তিনিকেতনেও মাঝে মাঝে এ অঞ্চলের বাউলরা এসেছে। কিন্তু নাচের দিক থেকে সব চেয়ে বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছে আমাকে তিনটি বাউল। প্রথমটির দেখা পাই ১৯৩১ খৃঃ কেন্দুলীর মেলাতেই। যুবক সেই বাউলটি। অজয় নদের তীরে, একটি আখড়ায় সকালে গাছের ছায়ায় তাকে গান গেয়ে নাচতে দেখি। সুস্থ সবল দেহ, গায়ে ছিল আলখাল্লার বদলে একটি বড় চাদর। দুই আঁচল দুদিক থেকে ঘুরিয়ে এনে ঘাড়ের পিছনে দুটি

গানে বিভোর বাঙলার বাউল শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

কোণে বাঁধা। পরণে আর কিছু ছিল না। দাড়ি সামান্য, চুল উপরে চুড়ো করে বাঁধা। একতারা, বাঁয়া ও পায়ে নূপুর সবই ছিল। বহুক্ষণ সে মশগুল হয়ে নেচে গান গায় এবং তার নৃত্যের ভাবভঙ্গী ও বলিষ্ঠতায় সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়। আখড়ার অন্যান্য সঙ্গীরা চারিদিকে তাকে ঘিরে বসেছে। দলের একজন ছিল ভাল, চামড়ার তালবাদ্য 'খঞ্জনী' বাজিয়ে। অপূর্ব তার বাজাবার ভঙ্গী। সে সমস্ত অঙ্গ দিয়ে বাজাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে বসে বসে খঞ্জনী হাতে নাচছে। বাউলের নাচে ও খঞ্জনীর বাজনায় সেই দিনের সকালটিতে যে একটি মধুর সংগীত দোলা জাগিয়েছিল, সে আজো আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে। তারপর দেখেছি 'গোপাল খেপা'কে—ঐ মেলাতেই। সেও বাউলদের মধ্যে সুপরিচিত। নাম শুনে পরে বহুবার শান্তিনিকেতনে এসেছে, গানে নাচে সকলকে আনন্দ দিয়েছে। বার্ধক্যহেতু কিছুকাল থেকে নাচতে চাইত না—এখন আর তাকে দেখি না। বাউলমহলে তার নাচের চেয়ে গানেই ছিল অধিক প্রসিদ্ধি; তবুও মোটামুটি ভাবে সে নাচতে জানতো। কয়েক বছর হোলো 'নবনী গোপাল' নামে এই অঞ্চলবাসী আর একটি বাউলকে প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আনা-গোনা করতে দেখেছি। এখনকার অনেকেই তার নাচ দেখেছেন। এর নৃত্যভঙ্গীর বৈচিত্র্য দেখবার মত ও প্রাণবন্ত।

এখন কথা হচ্ছে এই বাউলরা যা নাচে সে নাচ কি প্রকারের এবং তারা তা পেল কিসের থেকে। এদের নাচে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হোলো, এরা গানের প্রত্যেক কথাকে কখনো নাচের ভঙ্গীতে বা মুদ্রাভিনয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে না। দুই হাতে দুই যন্ত্র থাকার দরুণ হাতের সাহায্যে কোন প্রকার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করবার কোন উপায় এদের নেই। মুখে সাধারণত থাকে আত্মভোলা একটি হাসিখুসি ভাব। দেখে মনে হয় এরা গান শোনায় কেবল কণ্ঠস্বরে নয়, দেহভঙ্গীতেও। গান গেয়ে, নেচে তারা গানের সমগ্র রসটিকে ফুটিয়ে তোলে।

উপরের তিনটি বাউলের মধ্যে প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হোলো তার নাচে পুরুষোচিত বলিষ্ঠ তেজ ও প্রাণবান নৃত্যছন্দ। নাচের মধ্যে নারী-সুলভ কমনীয় ভঙ্গী প্রায় ছিলই না। গানের কোন কোন অংশ যখন খুব জমাটভাবে গাওয়া হচ্ছে তখন খঞ্জনী ও বাঁয়ার ছন্দে আধবসা অবস্থা থেকে এক পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে যখন উঠ্‌ছিলো তখন সেই আখড়ার এমন কেউ ছিল না যে নাচের রসে মুগ্ধ না হয়েছিল। পায়ের বিচিত্র ছন্দের পদক্ষেপে সেখানে মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছিল, ধুলো উড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিন তার বলিষ্ঠ দেহের গতিভঙ্গীতে যে মাধুর্য দেখেছিলাম সে হোলো মনোমুগ্ধকর শক্তির মাধুর্য।

নাচে 'গোপাল ক্ষেপা' অপেক্ষাকৃত কোমল মাধুর্যের পরিপোষক। তার বয়স একটু বেশী তাই গানের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। হালে যাকে দেখেছি, তার নাচে আছে অধিক লালিত্য পূর্বোক্ত নাচিয়েদের তুলনায়। এর নাচে সেই প্রকার পুরুষোচিত বলিষ্ঠ নৃত্যভঙ্গী দেখিনি। কিন্তু আছে বিভিন্ন পদক্ষেপে নাচের গতি-ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য, দেহের নানারূপ দোলন। এর নাচে লালিত্য থাক্‌লেও তা' নারীসুলভ দুর্বল নয়। শক্তির প্রকাশ তাতে আছে।

এদের নাচে সামনের দিকে বিভিন্ন চলনে এগিয়ে চলাই হোলো প্রধান বিশেষত্ব। বৃত্তাকারে এগিয়ে চলা, সামনে এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে না এসে ঘুরে গিয়ে আবার সেইমুখি সামনে চলা, এই হোলো এদের নাচের মূল চাল। পাশের দিকে চলতে দেখি না। কিন্তু এক জায়গায়ও অনেকক্ষণ নানা ভঙ্গীতে নাচে। এরা কখনো কোমর দোলায় না বা গলাকে ডাইনে-বাঁয়ে দ্রুতছন্দে কখনো নাচায় না। গানের তাল সাধারণত তিন ও চার মাত্রা ছন্দের। ছন্দ বৈচিত্র্য আনবার জন্যে গানের মাঝে মাঝে প্রায়ই অন্য ছন্দের নানাপ্রকার অলঙ্কার জুড়তে দেখি।

আমার নিজের ধারণা এ নাচের মূল উৎস হোলো বাঙলা দেশের প্রাচীন পাঁচালি গানের আদর্শের নাচ। পাঁচালীতে আগেকার দিনে লোকে গাইত চলে ফিরে, নেচে নেচে। মূল গায়েন একজন, দোহারের দল সঙ্গে। এও কিন্তু খাঁটি নৃত্যাভিনয় নয়। সে নাচ একমাত্র গানের ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কথার উপরে নয়। গানের সময় সাধারণ অভিনয়ে গানগুলি গেয়ে যায়। কখনো পদচালনা থাকে, বেশি সময়েই থাকে না। গানের মাঝে মাঝে যখন কেবল ঢোলে ছন্দ বাজে তখনই বিশেষ করে সেই ছন্দকে নাচে মূর্ত করা এদের প্রধান রীতি। কোন ধরাবাঁধা বিশেষ নৃত্যধারার

আঙ্গিকে পাঁচালী গানের নাচ কোনদিনই গড়ে ওঠে নি। যখনই পাঁচালী গাইয়ে আপন ক্ষমতা মত গানের ছন্দে মিলিয়ে নাচতে পেরেছে তখনই তাকে পাঁচালী গানের নাচ বলা হ'য়েছে। যে যুগে বাঙালী সমাজে নাচের চর্চা ছিল—সে যুগে পাঁচালী নাচিয়েদের নৃত্যকৌশল উন্নত ছিল। পরবর্তী যুগে নৃত্যের স্থান সমাজে ছিল না বলে পাঁচালী গাইয়েদের নৃত্য-পদ্ধতির অবনতি ঘটে। পাঁচালী গাইয়ের নাচ সাধারণত একলার নাচ।

এখনো কবি গানে, রামায়ণ গানে এই ধরণের পাঁচালী পদ্ধতির চলন আছে। দেখেছি মূল গায়েনকে সাধারণভাবে অভিনয় করতে গান গেয়ে এবং গানের মাঝে মাঝে ঢোলের তালে অঙ্গভঙ্গি ক'রে নাচতে। আজকালকার 'কবি' গাইয়েদের মধ্যে নাচের বৈশিষ্ট্য বিশেষ নেই। বাঙলার খেমটাওয়ালিদের কোমর-দোলানো ও মেয়েলি ধরণের নাচের অঙ্গ-ভঙ্গীতে তারা উৎসাহী। রামায়ণ গানে চামর হাতে মূল গায়েন নাচে, তাকে পাকাপোক্ত নাচ বলা চলে না, তবে নাচের দোলা বা কিছুটা ছন্দ রাখবার চেষ্টা করে পায়ে, দেহে। এক-জাতীয় কীর্তন গানেও চামর হাতে পাঁচালী আদর্শে নাচ দেখেছি। এই ধরণের একলা গান গেয়ে পদচালনার নাচ আরো কয়েকরকম লোক-গীতেও দেখা যায়।

বাউলের নাচ ঐ আদর্শেই গঠিত এক-ধরণের পাঁচালী নাচ। কোন একটি বিশেষ রীতিতে বাঁধাধরা নাচ এ নয়। যখন যে বাউল যেখানে যে নৃত্যছন্দ পেয়েছে তাকেই গ্রহণ করেছে সহজভাবে। যতদূর মনে হয় চেষ্টাকৃত কোন নৃত্যরূপ পছন্দ করে নি। গান গাইবার রীতিতে তারা যত প্রকার ছন্দ পেয়েছে তাকেই নৃত্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা থেকেই তাদের নাচের উদ্ভব, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ। যার নাচতে ভালো লেগেছে সে নেচেছে, যার ইচ্ছা করে নি সে নাচে নি। তাদের গানের আনন্দকে এক সঙ্গে গানে ও নৃত্যে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ নাচের উদ্ভব। এ যে সুফী দরবেশদের 'সমা'-র প্রেমোন্মত্ততা তাদের গান ও নাচ দেখে সে কথা কখনো মনে হয় না। তারা যখন ভক্ত, দরদী বা মরমীদের 'সঙ্গ' করে, তখন তাদের আলাপ আলোচনার ভাষা হোলো গান। তখন গান গাইতে বা গান শুনতে তাদের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই তাদের নাচের মূল প্রেরণা—এ ঠিক প্রেমোন্মাদে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়া নয়।

আমার বিছানাটা অত্যন্ত ছোট। এতে আমার শরীরটা এ'টে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মন কিছুতেই কুলাচ্ছে না।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আস্ত একটি বিছানা কেউ যদি বিছিয়ে দিতো, তাহলে একটু গড়িয়ে বাঁচতাম। আমার বিছানাটায় গড়িয়ে সুখ নেই। একপাশে একটু গড়ালেই চট করে বিছানাটা ফুরিয়ে যায়। তাই অগত্যা গড়াগড়ি করি। যথেচ্ছা গড়াবার সুযোগ নেই দেখে বিছানার ওপর আমি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি। অনেকে আবার একে খাতির করে—তাদের ওপরও আমার অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে। তারা শরীরসর্বস্ব, তাদের সর্বস্বই তাদের শরীর; দেহাতিরিক্ত *কিছুই তারা জানে না,* পরোয়াও করে না। *তাদের মাথা যতটা মোটা, শরীরটাও সেই অনুপাতে স্থূল।* সুতরাং তাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাদের থেকে তাই সর্বদা তফাতে থাকি। লক্ষ্য করে দেখেছি, বিছানার মর্যাদা দিতে তারা আদপেই জানে না। বিছানার গায়ে যাতে চোট না লাগে, সেজন্যে তারা যেন সর্বদা সজাগ। তারা অতি সন্তর্পণে বিছানায় শুয়ে থাকে, কেউ কেউ আবার গা এলিয়ে দেয়। তারা মোটেই গড়ায় না, আদপেই গড়াগড়ি করে না। তাদের কাছে তাই সাত ফুট লম্বা আর ছয় ফুট চওড়া বিছানাই প্রশস্ত, আর প্রকাণ্ড শয্যা বলে মনে হয়।

তাদের গলদ গোড়ায়। নিছক শোবার উদ্দেশ্যেই যে বিছানার সৃষ্টি নয়, এটা তারা জানে না। শোবার জন্যে বিছানার দরকার হবে কেন। যেখানে-সেখানে তো শুয়ে পড়া যেতে পারে। রেল স্টেশনের বেঞ্চিতে শুয়ে কত লোক রাত কাটিয়ে দিচ্ছে। কত লোক ফুট-পাথের ধারে কাৎ হয়ে শুয়ে লম্বা ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছে। এই ধরণের যে বিশ্রাম, তার নাম শোয়া। কিন্তু বিছানা ব্যবহার অন্য ধরণের। বিছানা হচ্ছে গড়াবার তীর্থক্ষেত্র।

আমার বিছানা আমার কাছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়। পা যত-দূর সম্ভব টান করে দিয়ে দেখেছি, বিছানার কিনার অবধি পা পৌঁছয় না। দুই হাত দুপাশে বিছিয়ে দিয়ে দেখেছি, বিছানার দুই সীমান্তের নাগাল পাইনে। তবুও আমার মনে হয়, এ বিছানা ক্ষুদ্র ও নগণ্য।

গড়াতেই যদি না পারলাম, তবে নিছক গড়াগড়ি ক'রে লাভ কি? যত খুসি গড়াবো, তবু শেষ হবে না—এমনি একটা বিশাল বিছানা যদি পেতাম, তাহ'লে মন আমার আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠতো।

দুগ্ধ ফেনানিভ না হয় না হ'লো, লম্বায় আর চওড়ায় চৌকষ হ'তে ক্ষতি কি। পৃথিবীর এক কোণে যৎসামান্য একটু জায়গায় সসঙ্কোচে প'ড়ে আছে যে শয্যা, তাকে বিছানা বলতে আমার বাধে। যে যা নয়, তা'কে সে আখ্যা দিতে আমি রাজি না। সহজে আমার চোখে ধুলো দিতে পারে না আমার বিছানা। আমি চাই এমন একটি ক্ষেত্র—যেখানে আমার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আমার মন ও মেজাজ যত খুসি গড়িয়ে বেড়াতে পারবে। আমার মনকে আমি রুখতে পারিনে, আমার মন গড়াতে গড়াতে আমার মুঠি থেকে পালিয়ে কত দূরে যে চ'লে যায় তার ঠিকানা পাওয়া দুষ্কর। মনের পিঠের নীচে নীচে আমি যদি বিছানা সরবরাহ করতে করতে চলতে পারতেম, তাহ'লে মনকে খুসি করতে পারতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু তা হবার নয়।

তা হবার না ব'লেই আমার মেজাজ এমন রুক্ষ। শুধু শরীরটাকে তোয়াজ ক'রে মনকে অবহেলা করলে সে বিদ্রোহ ক'রে উঠবেই। এই বিদ্রোহ দমন করার একটি মাত্র অস্ত্র আছে। সেটা মোক্ষম অস্ত্র। পৃথিবী জোড়া একটা আস্ত বিছানা।

কষ্টের সংসার ব'লে হাহাকার করতে চাইনে, কিন্তু কাজের সংসার থেকে একটু ছুটি চাই। একটানা লম্বা ছুটি দিতে কারো যদি আপত্তি থাকে, তাহলে জুলুম করবো না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু 'খুচরো' ছুটি পাওয়া যায়, সেই আমার যথেষ্ট। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত ছুটি উপভোগের একটা আসর চাই। সেই জন্যেই একটা বড় রকমের বিছানার জন্য এই দাবী জানাচ্ছি। আমার এ দাবী মঞ্জুর হ'লে কেবল আমার মেজাজই যে ঠাণ্ডা হবে, তা যেন কেউ না ভাবেন। পথে ঘাটে এমন অনাহারী মন অনেক আছে। তারা নির্জীব ও নিরীহ, তারা বোকা ও বেকুব। তাই তারা তাদের দাবীর কথা তুলতে ভরসা পাচ্ছে না।

আমি আমার পক্ষ থেকে যে আবেদন পেশ করছি, তার নীচে তাদের সকলেরও দস্তখৎ আছে—এটা যেন সকলে জেনে রাখেন।

জীবনকে উপভোগ করার জন্যে পৃথিবীতে অনেক রকম আয়োজন আছে শুনেছি। আরামের ও বিশ্রামের জন্যে ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত অনেক রকমের নাকি হ'তে পারে। কিন্তু সে সব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার—ওর মধ্যে বাদশাহী গন্ধ অপর্যাপ্ত। তাই সে সবে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। আমি চাই শহরের কল-কোলাহলের নাগালের বাইরে আমার যে ছোট ঘরটি আছে, সেই ঘরের মধ্যে একটা বিছানা, যে বিছানা সমস্ত পৃথিবীকে জুড়ে থাকবে। কার্যক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র ব'লে পৃথিবীতে যত রকমের ক্ষেত্র আছে, সব ঢেকে দেবে কোনো কাজ থাকবে না, কোনো তাগাদা থাকবে না, কোনো চিন্তা থাকবে না, ভাবনা থাকবে না, বেদনা থাকবে না,—কিছু বলতে কিছু থাকবে না। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে থাকবে এই বিছানা। এমন যদি বিছানা একটা পেতাম, তা হ'লে প্রাণ ভরে একটু গড়িয়ে নেওয়া যেতো। মুহূর্তের সেই বিশ্রাম, আমাকে চিরকালের সম্মিলিত আনন্দ দিতে পারতো তাহ'লে।

অভাব অভিযোগ বলতে আমার কিছুই নেই। আমার কিছুই নেই, কিছুই চাইনে—তাই অভাবের ফাঁদে পড়িনি আজও। কিন্তু মনের মতো একটা বিছানার অভাব আমাকে হাজারো রকম অভাবের যন্ত্রণা দিচ্ছে। এই অভাবের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে আজ মনের কথা খুলে বলতে বাধ্য হ'লাম। এতে কাজ কতটা হবে কিংবা একান্তই কিছু হবে কি না—তা অবশ্য বলতে পারিনে। কাজ যে বিশেষ কিছু হবে না, সেটা অবশ্য বুঝতেই পারছি। কী ক'রে হবে? আমি আমার এই অভাবটি যতটা তীব্রভাবে বোধ করছি, এই অভাবকে ততটা তীব্রভাবে গ্রহণ করবে ক'জন? সুতরাং সহানুভূতি যে খুব বেশি পাব, এমন ভরসা করিনে। যে দাবীর পেছনে সাধারণের সমর্থন নেই, সে দাবী কোনোদিনই মেটে না। না পেলাম তেমন একটা বিছানা, কিন্তু চাইতে ক্ষতি কি?

কবিত্ব করছিনে। কিন্তু আকাশের চাঁদকে দেখে আমার হিংসে হয়। সে পৃথিবীর এক পাশ থেকে আর এক পাশ পর্যন্ত মনের আনন্দে কেমন গড়িয়ে বেড়ায়। আমাদের মেজাজ যে এমন রুক্ষ, চেহারা যে এমন কাটখোট্টা—তার কারণ অবশ্যই আর খুলে বলতে হবে না। শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী দেখেছি অনেক। যামিনী পুলকিত না হবে কেন। সারা পৃথিবী গড়িয়ে গড়িয়ে চাঁদের মেজাজ ঠাণ্ডা হ'য়েই আছে, তার আলো সুতরাং গ্যাসের আলোর মতো ঠাণ্ডা হবেই। কিন্তু আমরা কোনো বিষয় কাউকে একটু আলোক দান করতে গেলেই দৃঢ় মুঠিতে টেবিল চাপড়ে চীৎকার করতে শুরু করি। আমাদের আলো প্রখর ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। আমাদের অনেক রকম আলোক দান করার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু কাউকে কিছু বুঝাতে গেলেই হঠাৎ মেজাজ সপ্তমে চ'ড়ে যায়। তাই বাক বন্ধ করে বসে আছি।

আমার তো মনে হয়, পৃথিবীর সব রকম হাঙ্গামার মূলে আছে এই একটা জিনিস। আমরা আমাদের মনের খোরাক জোগাইনে। মন যখনই যা চেয়েছে, তখনই তাকে আমরা ধমকে দিয়েছি। ইচ্ছাকে এভাবে চাপা দিয়ে রাখতে রাখতে ইচ্ছারা সব তেতে গেছে। তারই তাপে আমাদের মেজাজের উত্তাপও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। যদি আপনারা সবাই শান্তি চান, তবে বৈঠকী আলাপ বন্ধ করে অবিলম্বে বিছানার বন্দোবস্ত করুন তাহলেই একটা কাজের মতো কাজ করা হবে।

আর কারো যদি তেমন কোনো তাগাদা না থাকে, তাদের জন্যে ব্যবস্থা কিছু পরে করলেও হবে। কিন্তু আমার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। আমার মনকে কুলাতে পারি, এমন একটি বিছানা অবিলম্বে আমার দরকার। চেঁচিয়ে বলার মতো কথা এটা নয়, তাই জনান্তিকে আপনাদের সবার কাছে এই আবেদন জানাচ্ছি।

ছোট বিছানাটায় শুয়ে আছি। নড়ছিনে, আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছি। নড়তে ভয় করছে। শরীরকে একটা নাড়া দিলেই মন যদি সজাগ হয়ে ওঠে—এই ভয়। মাথার নীচে দুই হাত দিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি—কি করা যায়। এই ঘর, ওই বারান্দা, রাস্তা, মাঠ, সার সার ওই ঘরবাড়ি, আপিস আদালত সব ঢেকে দিয়ে যদি এখনি একটা বিছানা পাতা হ'য়ে যেতো। তাহলে বেশ আরাম করে গড়িয়ে নেওয়া যেতো একটু। যুগ যুগ ধরে তেমন বিছানায় গড়িয়ে জীবন কাটাবার ইচ্ছে অবশ্য নেই। কিন্তু দিনের সামান্য যে সময়টুকু বিছানার জন্যে বরাদ্দ আছে, সেই সময়ের সদ্ব্যবহার করা তো দরকার। একেবারে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার হ'য়ে সেই সময়টুকু উপভোগ করার আমার বড় ইচ্ছে।

বিছানা ছোট হওয়ায় কত যে অসুবিধে, তার খুঁটিনাটি ফিরিস্তি দেওয়া অসম্ভব। বিছানার পাশেই অনাবৃত যে জায়গা প'ড়ে থাকে, সেই জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আপিস আর আদালত, দোয়াত কলম আর কাগজের দল। আরাম ক'রে অবসর যাপনের সুযোগ তারা দেয় না। তারা পাশে দাঁড়িয়ে কানের মধ্যে ফিসফিস ক'রে কাজের কথা বলতে থাকে ক্রমান্বয়ে

চারিদিকে এই উৎপাত আর উপদ্রবের দল, আর তারি মাঝখানে আমার এই একখণ্ড বিছানা। অন্তহীন নোনাজলের মাঝখানে একটুকরো দ্বীপের মতো। জীবনটা তাই বড় বিস্বাদ ঠেকে। সামান্য একটু সময়ের জন্যে জীবনকে একটু মুখরোচক করার জন্যেই আমার আজকের এই আবেদন। এর পেছনে অন্য কোনো অভিসন্ধি নেই—কোনোরকম চক্রান্তই নেই।

অনেকে ভাবতে পারেন, পৃথিবীকে পদানত করার জন্যে হয়ত এটা একটা কূটনৈতিক কারসাজি। সারা পৃথিবী জুড়ে যার বিছানা পাতা হবে, পৃথিবীটা বুঝি তার একারই হয়ে যাবে। এর জবাবে আমার একটা কথা বলার আছে। পৃথিবীর ঘরে ঘরে যার যত বিছানা পাতা হ'য়েছে, সেই বিছানার নীচের জায়গা-গুলির ওপর তাদের সবারই কি অধিকার জন্মে গেছে? তা যদি জন্মে গিয়ে থাকে, তাহ'লে আমি আমার দাবী প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আর যদি জন্মে না থাকে, তাহ'লে আমার মনের মতো বিছানা পেতে দিতে কারো ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

বিছানার গায়ের কাছে এমন ঝঞ্ঝাট নিয়ে বাস করা কঠিন। কাগজ কলমের ওপাশে দরজা। দরজার কড়ায় মাঝে মাঝেই কটকট ক'রে শব্দ হচ্ছে। বাতাসের উৎপাত মনে করে চুপচাপ আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি। ভাবছি, দরজাটা ঢেকে দিতে পারি, আপাততো এমন একটা মাঝারী রকম বিছানা হ'লেও চলে। হাওয়ায় মাথার কাছে কাগজ খসখস করে উড়তে লাগলো। পায়ের কাছের জানলায় চড়ুই পাখী ফরফর করছে। শুধু দরজা ঢাকলেই তাহ'লে চলবে না, মাথার কাছের কাগজ আর পায়ের কাছের চড়ুই পাখীকেও চাপা দিতে হবে। শরীরকে আড়ষ্ট ক'রে আর মনকে বেঁধে রেখে এভাবে শোবার অর্থ কি, বুঝে পাইনে। না, মাঝারী দাবী আমার নয়। আপাতত ব'লে আর কোনো কথা নেই। আপাদমস্তক-মোড়া বিছানাই আমার দরকার। এর চেয়ে এক চুল কম হ'লেও চলবে না।

কখন তন্দ্রা এসেছিলো বলতে পারিনে। হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটুর জন্যে প'ড়ে যাইনি। পায়ের ওপর পা তোলা ছিল, একটা পা নীচে ঝুলে প'ড়েছে! লাফিয়ে উঠে পড়লাম। না, এটুকু বিছানায় কখনই চলবে না। কটকট ক'রে বেজে উঠলো দরজার কড়া! কে যেন ডাকলো, অমুকবাবু বাড়ি আছেন।

ইচ্ছে হ'লো, তোষকটা তুলে নিয়ে গিয়ে ওই লোকটাকে চাপা দিয়ে দিই।

ভিক্ষুক-কুকুর-সংবাদ

প্র. না. বি.

পাঠক, তুমি হয়তো লক্ষ্য করিয়াছ যে, অনেক সময়েই বড়লোকের বাড়ির দরজায় কুকুর বাঁধা থাকে, কিম্বা হয়তো আরও লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, অনেক কুকুর বেড়াইতে বাহির হইবার সময়ে শিকল বাঁধিয়া একটি সৌখীন লোককে টানিয়া লইয়া চলে।

সৌখীন লোককে টানিয়া লইয়া চলে

পাঠক, তুমি হয়তো এ সমস্তকে ধনী বা ধনীর কুকুরের একটি সখ বলিয়া মনে করিয়াছ, বস্তুত তা নয়। ভিখারী বা পাওনাদার তাড়াইবার উদ্দেশ্যেই ধনীরা কুকুর পুষিয়া থাকে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল, মানুষ চিনিয়া রাখিবার শক্তিও তাহাদের অসাধারণ। কুকুরের সাহায্যে দাগী আসামী ধরিবার কাহিনী নিশ্চয় তুমি শুনিয়াছ। ধনীরা কুকুরের সেই শক্তিকেই কাজে লাগাইয়া বিরক্তিকর পাওনাদার এবং ভিক্ষুকদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করে। বড় বড় কুকুরের আড়তে গিয়া কেবল জানাইলেই হইল যে, তোমার শিক্ষিত কুকুর আবশ্যক। মালিক তোমার আবশ্যকের প্রকৃতি জানিয়া লইয়া নগদ মূল্যে তোমাকে শিক্ষিত কুকুর বিক্রয় করিবে। ভিখারী-তাড়ানো কুকুর, পাওনাদার-ঠেকানো কুকুর, মাইনরিটীকে বাধা দেওয়া কুকুর, বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের লোককে কামড়াইয়া দেওয়া কুকুর, অবাঞ্ছিত শাশুড়ী বা শালা-সম্বন্ধীকে বাড়িতে না ঢুকিতে দেওয়া কুকুর প্রভৃতি হরেক রকমের কুকুর এই সব আড়তে পাওয়া যায়। ধনীরা প্রয়োজন মতো কুকুর কিনিয়া লইয়া যায়। এই সব কুকুরের শিক্ষা এমনি মজবুত যে, কখনো স্বকার্যে তাহারা ব্যর্থ হয় না। আজ এইরূপে একটি কুকুরের ইতিহাস তোমাদের বলিব মনস্থ করিয়াছি।

এক ধনীর দরজায় শিকলে বাঁধা একটি কুকুর বসিয়াছিল—এমন সময়ে সেখানে একটি ভিক্ষুক আসিয়া হাঁকিল—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, বাবা দুটো ভিক্ষা পাই গো।

তাহার কথা শুনিয়া কুকুরটি বলিল—এখানে কিছু হবে না, অন্যত্র যাও।

পাঠক, কুকুরকে কথা বলিতে শুনিয়া নিশ্চয় তুমি বিস্মিত হও নাই, কারণ মানুষের কথার সহিত কুকুরের কথা যুক্ত না হইলে সংসারের গণ্ডগোল কখনই এমন বিচিত্র হইতে পারিত না। বিশেষ কত মানুষ কুকুরের মতো কথা বলে, একটি কুকুর যে মানুষের মতো কথা বলিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

কুকুরের কথা শুনিয়া ভিক্ষুক বলিল, সবাই বলে অন্যত্র যাও, অন্যত্র যাও, বাপু, সেই অন্যত্রটা কোথায় বলিয়া দিতে পারো?

কুকুর

আমার মনিব কুম্ভকর্ণ পার্টির লোক। তুমি বিভীষণ পার্টির কোন লোকের বাড়িতে যাও—তাহারা আমাদের শত্রু।

ভিক্ষুক

কুম্ভকর্ণ পার্টিটা কি শুনিতে পাই?

কুকুর

আমার মনিব ও তৎশ্রেণীর লোকেরা সারাদিন পড়িয়া ঘুমায়, মাঝে মাঝে খাইবার জন্য জাগে—তাঁহাদের আদর্শ কুম্ভকর্ণ বলিয়া পার্টির নাম কুম্ভকর্ণ পার্টি।

ভিক্ষুক

তোমার মনিব কি ধনী? ধনী না হইলে শুধু ঘুমাইয়া ও খাইয়া কি দিন চলে?

কুকুর

ধনী বলিয়া ধনী। দিবাভাগে মোসাহেবদের ধ্বনি ও রাত্রে বাবুর নিজের নাসাধ্বনিতে পাড়া প্রকম্পিত!

শাশুড়ী-তাড়ানো কুকুর

ভিক্ষুক

এত বড় ধনী—আর আমার জন্যে একটা পয়সার বরাদ্দ নাই।

কুকুর

সমুদ্রগামী প্রকাণ্ড জাহাজের তলায় ছোট একটি ছিদ্র থাকিলে জাহাজের উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হইয়া যায় না? একটি পয়সা ভিক্ষার ছিদ্র-পথে কত সাম্রাজ্য রসাতলে গিয়াছে, তাহার হিসাব রাখো?

ভিক্ষুক

ভাই কুকুর, তোমার যুক্তি ও উপমা বড়ই হৃদয়গ্রাহী।

কুকুর

কেন না হবে? পূর্বজন্মে আমি সাহিত্যিক ছিলাম। সাহিত্যিকসুলভ স্বজনবিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার তাড়ায় আমি এ-জন্মে কুকুর-যোনির গুহায় ঢুকতে বাধ্য হয়েছি।

ভিক্ষুক

তুমি দেখি জন্মান্তরবাদের খবর রাখো?

কুকুর

না রেখে উপায় কি? সংসারে ঐ তো একমাত্র সত্য এবং সান্ত্বনা।

ভিক্ষুক

কিন্তু জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে যে আর ভরসা হয় না।

কুকুর

জন্মান্তরের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে কেন? 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর।'

ভিক্ষুক

তুমি দেখি কবিগুরুর গানও জানো।

কুকুর

না জেনে পারি কই? বেতার সংগীতের কৃপায় সব কুকুর যে শিক্ষিত হয়ে উঠল।

ভিক্ষুক

তুমি কি বলতে চাও—এর বিপরীতটাও সত্য? অর্থাৎ সব মানুষ অশিক্ষিত রয়ে গেল।

কুকুর

তুমি কি বলতে চাও যে, কুকুর আর মানুষ পরস্পর বিপরীত?

ভিক্ষুক

আমি না বললেই বা কি আসে-যায়?

কুকুর

ভাই ভিক্ষুক, তোমার যুক্তি ও বিদ্যার খাড়াই দেখে মনে হচ্ছে, আগামী জন্মে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে পারবে।

ভিক্ষুক

আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকই ছিলাম।

কুকুর

'ভিখারির দশা তবে কেন তোর আজি?' ভাই, আমি বাঙালী কুকুর কিনা, তাই উপযুক্ত

কোটেশন না হলে মনোভাব প্রকাশ করতে পারি না। তা তোমার চাকুরিটা গেল কেন?

ভিক্ষুক

দুঃখের কথা আর বলবো কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে কেউ বিদ্যা আশা করে না, এ-খবর বোধ করি তুমি রাখো। একদিন পথে যেতে যেতে একদল লোকে তর্ক করছিল, পাঁচ-সাততে কত হয়! আমি বলে ফেললাম—পঁয়ত্রিশ। তারা আমার বিদ্যা দেখে অবাক হয়ে আমার পেশা শুধালো। আমি বললাম—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তারা

তুমি পাঠশালার পণ্ডিত

তো শুনে হেসেই অস্থির, বলল, মিথ্যা কেন বলছ বাবা? তুমি পাঠশালার পণ্ডিত!

কুকুর

কেন পাঠশালার পণ্ডিত কি অধ্যাপকের চেয়ে বেশি জানে?

ভিক্ষুক

পণ্ডিতে অন্তত নামতাটা জানে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে অধ্যাপকরা সেটাও ভুলে যায়। হিমালয়ের চূড়ায় উঠলে পৃথিবী যেমন সমান আর সমতল মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে গিয়ে উঠলে বিদ্যা-জগতের সব তথ্য খাঁদা নাকের মতো সমান চেপ্টা দেখায়। যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য দূষিত করবার অপরাধে আমার চাকুরিটি গিয়েছে, কিন্তু ভাই, এসব তো অবান্তর কথা। তুমি যে বললে—এই জন্মেই জন্মান্তর লাভ করা যায়, তাতে আমি বড় কৌতূহল বোধ করছি। আর একটু খুলে বলো।

কুকুর

তোমাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, দেহান্তর না ঘটিলে জন্মান্তর ঘটে না। একথা আদৌ সত্য নয়। অবস্থা ও পরিচ্ছদের পরিবর্তন মাত্রেই জন্মান্তর ঘটিয়া যায়—এই সত্য উপলব্ধির পরেই কবি লিখিয়াছিলেন—'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর।' প্রাণীর অবস্থা ও পোষাকটাই আসল; দেহটা

দুইজনে মিলিয়া শিকল পরাইলাম

পোষাক ঝুলাইয়া রাখিবার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। চশমার জন্যই নাক, টুপির জন্যই মাথা, আর সোনার হারের জন্যই গলার প্রয়োজন। এই দেখ না কেন, রূপার চেন ও বকলসের জন্যই আমি কুকুর, আর ছেঁড়া কাপড়, ঝুলি ও লাঠির জন্যই তুমি ভিক্ষুক। আমাদের পোষাকের অদল-বদল করিবামাত্র তুমি কুকুর হইবে, আমি ভিক্ষুক হইব।

ভিক্ষুক

ইহা কি সত্য?

কুকুর

কেন সত্য নয়? আমার পরীক্ষিত ব্যাপার। একদিন আমার মনিবের রাত্রে আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। আমি কোনরূপে শিকলমুক্ত হইয়া মনিবনির শয্যায় উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে কুকুর বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

ভিক্ষুক

এ বড় আশ্চর্য!

কুকুর

মোটেই আশ্চর্য নয়। মনিবনির পুত্রগণকে দেখিও। তাহাদের কুকুর বলিয়া বুঝিতে শিকল ও বকলসেরও প্রয়োজন হয় না।

ভিক্ষুক

আর তোমার মনিবের কি দশা হইল?

কুকুর

মনিব অনেক রাত্রে আমার শিকল লইয়া ঘরে ঢুকিল। মনিবনি বলিয়া উঠিলেন—ওই দেখ, কুকুরটা শিকল খুলে ফেলেছে। তখন তিনি ও আমি দুইজনে মিলিয়া তাহার গলায় শিকল পরাইলাম। শিকল পরিবামাত্র মনিব কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল—আর আমি মহানন্দে তার খাদ্য, পোষাক ইত্যাদি ভোগ করিতে থাকিলাম। অনেকদিন পরে তিনি কোনরূপে শিকলমুক্ত হইলে আমি শিকলগ্রস্ত হইয়া আবার কুকুরজন্ম পরিগ্রহ করিলাম।

ভিক্ষুক

একথা আমার বিশ্বাস হয় না।

জন্মান্তরের কুকুরটিকে তাড়া মারিয়া বলিল—এখানে কিছু হবে না—যাও
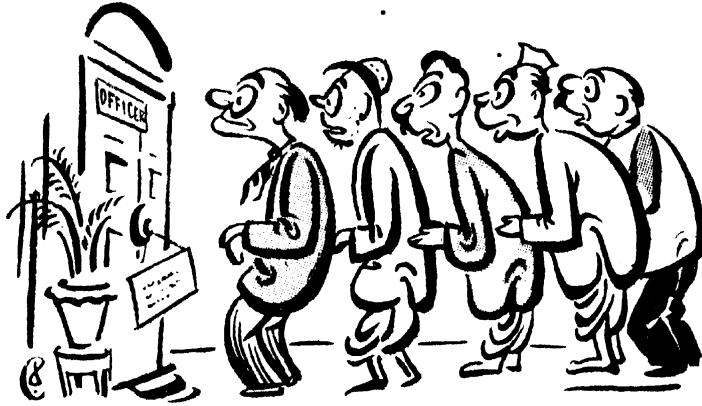
......মন্ত্রীর বাড়িতে, পারমিট অফিসে......স্বচক্ষে দেখিয়াছি

কুকুর

তবে এসো না কেন, দুইজনে পোষাক বিনিময় করি।

তখন কুকুর ও ভিক্ষুক পোষাক বিনিময় করিল। কুকুর ভিক্ষুকের ঝুলি ও লাঠি লইল, আর ভিক্ষুকটি গলায় চেন বকলস বাঁধিয়া বসিল। এমন সময়ে মনিব আসিয়া উপস্থিত। সে শিকলবন্ধ কুকুরটিকে ভিক্ষুক বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া 'টম', 'টম' বলিয়া আদর করিল—পকেট হইতে বিস্কুট বাহির করিয়া খাইতে দিল। আর ঝুলি ও লাঠিধারী ভিক্ষুকটিকে অর্থাৎ জন্মান্তরের কুকুরটিকে তাড়া মারিয়া বলিল—এখানে কিছু হবে না, যাও।

মনিব বাড়িতে প্রবেশ করিলে পূর্বজন্মের কুকুর পূর্বজন্মের ভিক্ষুককে বলিল—এসো, এবারে বেশ বদলানো যাক! কিন্তু নবজন্ম প্রাপ্ত কুকুর বলিল—না, ভাই আর বেশ বদলাইবার ইচ্ছা নাই, বেশ আছি—ভিক্ষুক হইয়া বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইবার চেয়ে ধনীর কুকুর-জন্ম অনেক বেশি আরামের। তখন পূর্বজন্মের কুকুরটি শিকল কাড়িয়া গলায় পরিবার জন্য পূর্বজন্মের ভিক্ষুককে আক্রমণ করিল। প্রাক্তন ভিক্ষুক আর্তস্বরে ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। তাহার স্বর শুনিতে পাইয়া দারোয়ান আসিয়া প্রাক্তন কুকুরকে লাঠি মারিয়া তাড়াইয়া দিল। সে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ হাঁকিতে হাঁকিতে প্রস্থান করিল।

পাঠক, আমার এই গল্প হয়তো তোমরা বিশ্বাস করিলে না; কিন্তু গল্প হইলেও ইহা মিথ্যা নয়। কত মানুষকে কুকুরত্ব লাভের আশায় ধনীর বাড়িতে, মন্ত্রীর বাড়িতে, পারমিট আফিসে ও রাজনীতিক আড্ডায় ঘুরিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার পরেও যদি বিশ্বাস না হয়, তবে গলায় শিকল ও বকলস বাঁধিয়া কুকুর বিক্রয়ের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইও—এমন নগদ মূল্যের অঙ্ক শুনিতে পাইবে মানব-জীবনের মূল্যস্বরূপ যাহা কল্পনা করিবার সাহসও তোমার হয় নাই।

বিপ্রমুখের কথা

ভিন্ন ভিন্ন বছরে নানা রকমের খেয়ালী কথা শোনাবার আয়োজন করা হয় 'দেশে'র আসরে। কখনো ইন্দ্রজিতের খাতা, কখনো প্র-না-বির পাতা। এই খাতার পাতায় অনেক কথাই লেখা হয়েছে, অনেক দৃশ্য আর চরিত্র চিত্রিত হয়েছে এলব্যমে-এ। এবার বিপ্রমুখের ওপর ভার পড়েছে কথা শোনাবার। তাই বিপ্রমুখের কথা।

এমন একদিন ছিল যে, বিপ্রকণ্ঠ-নিঃসৃত বাক্যের মূল্য ছিল সর্বিশেষ। সে বাণী ছিল অমোঘ, অলঙ্ঘ্য। তার সত্যতা এবং দুর্নিবার শক্তিকে অতিক্রম করার সাধ্য ছিল না দেবতারও। আপন সত্যে শক্তিমান্, অনৃত বর্জনকারী ব্রাহ্মণেরই সেই স্বপ্রতিষ্ঠ ন্যায়বাক্য একদিন সমগ্র ভারতীয় সমাজকে অমৃতধারায় পুষ্ট, পীন ও প্রবুদ্ধ করেছিল। আর বিপ্রমুখ থেকে যে সত্য প্রকাশ পেত, সেটা যুগ-যুগান্তেরই উপলব্ধ মর্মবাণী। তাতে শুধু ব্রাহ্মণোচিত আশীর্বাণী, দয়া-দম-তিতিক্ষার উদাত্ত কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হয়নি। তাতে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কশাঘাত, অসত্য অধর্মের প্রতি নিদারুণ ধিক্কার। দিব্য নয়নে ছিল ক্ষমাসুন্দর জ্ঞানের প্রসন্ন দৃষ্টি আবার রুদ্র আঁখির ভস্মকারী কোপবহ্নি। এই বাম-দক্ষিণের অপূর্ব সমন্বয়েই বিপ্রমুখ একদিন সার্থকবাক্ হয়ে উঠেছিল। সমগ্র সমাজের সদ্ধর্মকে রক্ষণ ও ধারণ করে, ত্রুটি-বিচ্যুতিকে হেয় জ্ঞানে বর্জন করে বিপ্রমুখ একদিন শক্তিশালী কূটনীতিকেও আয়ত্ত করেছিল—যেদিন রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠান-মাহাত্ম্য পর্যন্ত খর্ব হয়েছিল তত্ত্বজ্ঞ, সত্য বক্তা ব্রাহ্মণ কণ্ঠের কাছে।

এখন সে দিন নেই। থাকবার কথাও নয়। যুগ-সন্ধিক্ষণে ব্রাহ্মণোপম নিষ্ঠাবান্ দৃষ্টিবান্ পুরুষও নেই। যে দু চারজন মহাত্মা দর্শন ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করে মানবাত্মাকে সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা জীবিত নেই। শুধু তাঁদের কালজয়ী বাণী ছাপা হরফে মুদ্রিত আছে এবং বোধ করি মুদ্রিতই থাকবে। তাঁদের জীবন ও জীবন-সত্যকে ভাঁড়িয়ে কিছুকাল আমরা আত্ম-গরিমায় বিভোর থাকব, প্রতিবিম্বিত আলোয় খানিকক্ষণ গৌরববোধে উদ্ভাসিত হয়ে উঠব, এই পর্যন্ত। কিন্তু পূর্বসূরিগণের উপলব্ধ চরম সত্যগুলিকে হয়তো মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারব না। উত্তেজনা-প্রবণ ক্ষণিকবাদীর দায়িত্ব পালনের মতই আমাদের ভাব-সর্বস্ব প্রতিজ্ঞাগুলি অচিরেই হয়তো স্মৃতি-নৈবেদ্য হয়ে দাঁড়াবে। দুটি শুকনো প্রসাদী ফুল বিবর্ণ পাতার মোড়কে তুলে রাখব। কালে ভদ্রে, বিশেষ করে সংকটকালে তাকে মাথায় ঠেকাব। বাৎসরিক অথবা কোনো উপলক্ষ-বিশেষে তাঁদের বাণীকে সজ্জিত, অলঙ্কৃত করে তুলব। কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের নিত্য নিরুদ্দেশ প্রেরণায় ভুলে যাব, হয়তো খুঁজেই পাব না, আবহমান প্রয়াগ-ধারার অন্তরিত শক্তিস্রোত। ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির যুগে এর চেয়ে বোধ হয় বেশি প্রত্যাশা না করাই ভালো।

তবু ভবিষ্যতের আশা কেউ ছাড়তে চায় না। দুঃখবাদ, নৈরাশ্যবাদ, সন্দেহবাদ,—সকল মতবাদের পিছনেই একটি প্রশ্নাকুল মনোভাব যেন অন্তরাল থেকে কাজ করে যায়। নীরবে অপেক্ষা করে থাকে একটি 'ক্রাইসিসে'র। যুগ-শক্তির অমোঘ আবর্তনে সৃষ্টি হয় নতুন আশার, পৃথিবীর পীড়িত আত্মা কণ্ঠ পায় একটি অথবা বহু মুখে। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ে পুঞ্জীভূত গ্লানির প্রতিক্রিয়া। ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়। কর্মজীবী অথবা বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠ থেকে তখন যে কথা বলিষ্ঠ-

ভাবে প্রকাশ পায়, সেইটেই হল সত্যিকারের বিপ্রমুখের কথা।

বর্তমানে বিপ্রমুখের সে ভরসা নেই। অতখানি শক্তি ব্যবহারের ধৃষ্টতাও নেই। যে দৈবত দৃষ্টির ফলে বিপ্র-বাণীর সৃষ্টি হয়েছিল, সে দৃষ্টি পাব কোথায়? দেবতা নিজেই মুখ লুকিয়ে আছেন। কদাচার আর অনাচার, আণবিক শক্তি অর্জনে মানবাত্মার অপমান, ভেদ-নীতির অপপ্রয়োগে আত্মবলের লালসা, স্থূলে-জীবিকার সুবিধা সন্ধানে উন্মাদনায় এবং কূট-কৌশলে পৃথিবী তো ভরপুর। কণ্ঠে রামধুন, অঙ্গে পোষাকী বল্কল আর কয়েকটি মনোরম আশ্রম এবং অজস্র ভিক্ষার কমণ্ডুল থাকলেই রামরাজ্য আসবে না। কলির শেষ হতে এখনও দেরি। আর একটি খণ্ড যুগ সামনে পড়ে আছে। আর একটি জগৎ জোড়া বিপর্যয়ের চৌকাঠে পা ঠেকিয়ে থমকে সবাই দাঁড়িয়ে আছি। মনে হয়—যা হবার হয়ে যাক্। এ রকম ইতরামি আর সহ্য হয় না। প্রলয় যদি আসেই, আসুক। দলগত স্বার্থ, শ্রেণীর স্বার্থ বড় বড় রাষ্ট্রশক্তির উন্মুক্ত স্বার্থ এত স্বার্থের গোপন এবং প্রকাশ্য সংঘর্ষে মানুষের দৃষ্টি বিভ্রান্ত। বিশ্বসমাজের এই পিউজিলিস্টিক পোজ, দেশে-দেশে মানুষের এই ঘুষি বাগিয়ে মল্লযুদ্ধের ভঙ্গিমা, বীরত্বের অভিনয়ে চরম কাপুরুষতা এবং শান্তি কামনার ব্যাজস্তুতিতে শক্তি সঞ্চয়ের মন্ত্র-গুপ্তি—এতে পরমাত্মা কি কাতর ও পীড়িত নন? সর্বত্র তো সেই একই দৃশ্য, একই কথা। দৃষ্টি অস্বচ্ছ, উপলক্ষ্যটা স্থূল, কিন্তু উপ-লক্ষণগুলি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞানসম্মত তাই মারাত্মক।

* * * *

গঠনমূলক সমালোচনার যুগ এটা নয়। এটা স্বপ্রধান মতবাদের যুগ। এখন এক একটা ইজম্ বা বিশ্বাস খাড়া করে সেইটেকেই গায়ের জোরে, কণ্ঠের জোরে বড় বলে প্রমাণ করতে হয়। 'মঝঝিম পথ' আর নেই। হয় বাঁচো নয় মরো। হয় দলে ভিড়ে পড়ো, নয়তো জাহান্নমে যাও। পড়াশুনো করে পণ্ডিতমূর্খ। চিন্তা করে অলস ভাবুক। সর্ব দর্শন সংগ্রহের সময় এটা নয়। সমন্বয়-দৃষ্টির সাহায্যে অখণ্ড ঐক্যসাধনা রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধু দুরাশা, সমাজনীতির ক্ষেত্রে এক্লেকটিক বুর্জোয়া ধর্ম। চিরন্তন সত্য শাশ্বত মানব ধর্ম বলে একদিন যেগুলো মানুষ আঁকড়ে ধরেছিল, সে-গুলো নব্য সমাজ-বিজ্ঞানে বাতিল। মান-নিরূপণ চিত্র আঁকা হচ্ছে যুগোচিত ধর্মে। লেখনী সাংবাদিক, বিষয়বস্তু সাময়িক, দৃষ্টি-ভঙ্গী সামরিক। জ্ঞান হল একটা বিশুদ্ধ অপ্রত্যক্ষ এবং অবাস্তব ধারণা। বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। জনসাধারণের কল্যাণে নিযুক্ত হবে বলেই নাকি তার সাড়ম্বর আয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের উপকরণটাই বেশি। আদর্শ, বিশ্বাস, মতবাদ,—এ সব জিনিস অবশ্যই পরি-বর্তন-সাপেক্ষ। এক যুগের শক্ত পাথর হয় আর এক যুগের ঘুণ-ধরা ভিত্তি, এক যুগের শক্ত মানুষ হয় আর এক যুগের ফাঁপা মানুষ। এক যুগের রঙীন ইন্দ্রধনু আর এক যুগের কুয়াশা, এক যুগের পরশমণি আর এক যুগের কানা কড়ি। কিন্তু নতুন করে দাম যাচাই করার ফলে মূল্য বোধ কি সত্যিই বেড়েছে, আগেকার কালের 'ভ্যালুজ' কি নিম্নস্তরের? সংস্কৃতির ইতিহাসে অগ্রগামীরা কি শুধুই অগ্রদানী? মানব-ইতিহাসে কিন্তু পূর্ববর্তী যুগেরও স্থান আছে। সেটা অগ্রাহ্য নয়। তখনকার রীতি-নীতির পুনর্বিচার হোক্, বিশ্লেষণ চলুক, কিন্তু যেন তাদের বুঝতে শিখি, অশ্রদ্ধা না করি। আধুনিকতম ঐতিহাসিক বিচারেও তাদের যথার্থ মূল্য অস্বীকার করা হয়নি। কেননা, মানুষের অগ্রগতি ঠিকমত বুঝতে হলে জানতে হবে অতীত দিনের ঘটনা, ধারণা আর সামাজিক পরিবেশ যা মানুষের পরিবর্তনকে বরাবরই নিয়ন্ত্রিত, পরিচ্ছিন্ন করেছে।

বিগত যুগ সুবর্ণ যুগ না হলেও তার একটা বিশিষ্ট সুর ছিল, যে সুরটি স্থান পেয়েছিল চারণকবিদের কণ্ঠে। বিদেশের ক্রনিক্যাল, আমাদের দেশের গাথা। ওদের দেশে ভ্রাম্যমান পথচারী কবি, সাজ্‌ং এবং ক্যারল-সঙ্গীতকার। আমাদের এই শ্রুতি-স্মৃতির দেশে কথকঠাকুর। এঁরাই হলেন সে যুগের চলন্ত বিজ্ঞাপন, সুরেলা ব্যাখ্যানকার। সময়টা মন্দ ছিল না। গদ্যময়, নীরস সাংবাদিক তর্ক-বিতর্কের দিনে কথকঠাকুরকে আর একবার আমদানী করলে বোধ হয় খারাপ লাগত না। আধুনিক যুগের অনেক ছেলেমেয়েরাই না দেখেছে কথক, না দেখেছে কবি, না শুনেছে যাত্রা বা পালা গান। কাশীর মালাইয়ের মতন কথকতাও অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। আসরের যাত্রা তো উঠেই গিয়েছে। প্রবাসে এসে এসে রামলীলা এখনও মধ্যে মধ্যে শুনি বটে। কিন্তু মুকুন্দ দাসের যাত্রা অথবা কুলদা মল্লিকের কথকতা যাঁরা শোনে নি, তাঁরা বুঝতেও পারবে না বাঙলা দেশের নিজস্ব সম্পদ ছিল কতখানি। দেশাত্মবোধ, সমাজ-সচেতনতা, বিদ্রূপাত্মক কাব্য বর্তমানের রেওয়াজ হলেও তাদের পিছনে একশো বছরের রেওয়াজ আছে। তাই প্রাচীনদের লেখা সেকালের স্মৃতি থেকে কিছুটা হারানো সুর ফিরে পাবার চেষ্টা করি। অচিন্ত্যকুমারের কুঞ্জ আর তারাশঙ্করের কবি তারই সাহিত্যিক সংস্করণ, খানিকটা আমাদের মানসিক খোরাক মেটায়।

আমাদের দেশের যাত্রা, কবির গান, ছড়া প্রভৃতি জিনিষগুলো এককালে ছিল লোক-শিক্ষার বাহন। তাদের মধ্যে আদর্শ আর বাস্তব, সহজ দর্শন আর সমাজ-আলোচনার এমন একটা সরল সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল যে, সাধারণ লোকের কাছে সেগুলো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি-লাভের উপকরণ হিসেবেই শুধু এগুলির মূল্য নয়। সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, সাময়িক ঘটনার টীকাটিপ্পনী হিসেবেও এগুলির একটা স্বতন্ত্র সমাজ-তাত্ত্বিক মূল্য আছে, যেমন ছিল প্রাচীনকালে পুরাণের। পুরাণ-আখ্যানে যেমন সমাজ, ধর্ম ও ইতিহাসের রেখাচিত্র, যাত্রায় আর কথকতায় আর কবি-কণ্ঠের ব্যাখ্যানেও তেমনি দেশীয় অথবা আঞ্চলিক সমাজের পরিচয়। এদের মধ্যে কোনও কোনও রচনায় গ্রাম্যতা-দোষ আছে। স্থানীয় চরিত্রে আর ভাষায় ছড়া গানের মাধুর্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্থানীয় প্রচলনই তো সাহিত্য-ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। এদের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে জনসাধারণের সরল প্রাণের ধর্ম আর মর্মকথা। তাই অবনীন্দ্রনাথের খাতার পাতা ওলটাই, ভালো লাগে সেকালের ঘরোয়া ব্রত অনুষ্ঠানের চিত্র। রবীন্দ্রনাথের লোকশিক্ষা-মূলক প্রবন্ধ আবার পড়ি। বুঝি, কবিই প্রথম তাঁর তীক্ষ্ম রসজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে এদের যথার্থ সমাদর করেছিলেন, প্রেরণা দিয়েছিলেন এগুলিকে সংগ্রহ করবার। পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বেও তিনি ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরে বলেছিলেন যে, প্রচলন-সাহিত্যই ইতি-হাসের প্রাথমিক উপাদান। যে সব লিখিত, অলিখিত কাহিনী ও গান, লোকপরম্পরায় শ্রুত কিংবদন্তী, প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান ছড়িয়ে আছে আমাদের দেশে, সেগুলি হল ইতিহাসের রূঢ় মালমসালা। মানব মনের, তার বিশ্বাস ও সংস্কারের ধারাবাহিক কাহিনীটাও খাঁটি ইতিহাস।

সমাজ-বিজ্ঞানেও এই কথা স্বীকার করা হয়। বর্তমান অগ্রগতির যুগে এদের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় ঘটলে পিছন ফিরে তাকানোর অপবাদ কি গায়ে লাগবে?

অখণ্ড ভারতের সাধনা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

এক এক জন মানুষ সারা জন্মই অন্য লোককে জ্বালাইয়া যায়, ছেলেবেলায় এইরকম এক 'গ্রাম-জ্বালানিয়া'র কথা শুনিয়া ছিলাম। মরিবার সময় উপস্থিত হইলে তাহার মনে হইল, 'এখন তো আমি চলিলাম, ইহার পরে গ্রামের লোককে জ্বালাইয়া অতিষ্ঠ করিবে কে? এই ভাবিয়া সেই দুষ্ট মরিবার পূর্বে কোন মতে গ্রামের নিকটবর্তী বনে গেল। তখন বনের বাঘেরা মানুষ খাইতে জানিত না। তাহারা অন্য জীবজন্তু ধরিয়া খাইত। সেই দুর্বৃত্ত গিয়া বাঘেদের বলিল, 'তোমরা আমাকে খাও, বাঘেরা বলিল সে আবার কি কথা? বাঘে আবার মানুষ খায় নাকি।' সেই গ্রাম-জ্বালানিয়া বলিল 'কখনও তো খাও নাই, একবার খাইয়া দেখ।' বিস্মিত বাঘের দল মুমূর্ষু লোকের কথায় তাহাকে খাইয়া দেখিল, অপূর্ব স্বাদ মানুষের মাংসের। তখন তাহারা বলিল, 'চমৎকর মাংস তো, ইহার পরে পাইলে আর মানুষকে ছাড়িব না।'

'গ্রাম-জ্বালানিয়া' অতিশয় আনন্দে প্রাণত্যাগ করিল। মরিবার সময় বলিয়া গেল, "বাঁচা গেল, মরিতে মরিতেও লোককে অতিষ্ঠ করিবার উপায় বলিয়া গেলাম, এখন আর মরিতেও দুঃখ নাই।"

ইংরাজও বিধাতার বিধানে বিদায় নিতে বাধ্য হইল। কিন্তু আগুন জ্বালাইয়া দিয়া সে গেল। স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষের বিষ বাঘের দংশন হইতেও দারুণ। সেই বাঘ সে সৃষ্টি করিয়া গেল। বিদায় লইয়াও সে এখনো সেই সব বাঘের সহায়তা করিতে কসুর করিতেছে না।

সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ধার্মিক, সাধক ইংরাজ ও যুরোপীয়ের বিরুদ্ধে কাহারও কোনও অভিযোগ নাই। অভিযোগ হইল সেইসব সাহেব লোকদের বিরুদ্ধে যাঁহারা রাষ্ট্রশাসন, ব্যবসা, বাণিজ্যের নাম করিয়া ভারতকে চিরদিন শোষণ ও পেষণ করিয়াছেন। তাঁহারাও যখন যুগ বিধাতার ইতিহাস নিয়ন্তার নির্দেশে ভারতবর্ষ ছাড়িতে বাধ্য হইলেন তখন তাঁহারা ভদ্রভাবে বিদায় নিলে উভয়দিকে প্রীতি-মৈত্রী বজায় থাকিত। কিন্তু সেই সদ্বুদ্ধি ইঁহাদের হইল কৈ?

যাইবার সময় তাঁহারা ঐ "গ্রাম-জ্বালানিয়া"র মত নিজের স্বার্থনাশ সত্ত্বেও চারিদিকে সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতা ভেদ বুদ্ধির বিষ নানাভাবে ছড়াইয়া গেলেন। অখণ্ড ভারতকে তাঁহরা শুধু যে ভৌগোলিক ভাবেই খণ্ড খণ্ড করিয়া বিদায় নিলেন তাঁহা নহে, ঘরে বাহিরে চারিদিকের মনের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরাইয়া গেলেন। তাঁহাদের দীক্ষা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যে সব অল্পমতিরা সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা জাতিভেদের নামে নানা অসঙ্গত দাবী করেন তাঁহাদের উপর রাগ করিয়া লাভ কি? বনের বাঘের মত ইঁহাদিগকে মানুষ রক্তের আস্বাদ দিয়া যেসব দুর্বৃত্তেরা বিদায় লইয়াছেন দোষ তাঁহাদেরই।

আমাদের ভারতবর্ষ এক অখণ্ড সাধনাভূমি। এই অখণ্ডিত দেশেই বেদপূর্ব ও পরবর্তী সব সভ্যতার সাধনাই পাশাপাশি বিরাজমান। এই দেশ সিন্ধু বা হিন্দু নদের দ্বারা পরিচিত হিন্দু দেশ বা হিন্দস্থান। এখানকার সকল সংস্কৃতির সম্মেলনেই হইল হিন্দুধর্ম। এই দেশের সব সাধনার দানই রহিয়াছে সেই ধর্মে। এই অখণ্ড দেশের সর্বত্রই বৈদিক সন্ধ্যা গায়ত্রী ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানের মন্ত্র একই। বিষ্ণু শিব ও দেবীর অর্চনাও সর্বত্র। শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র পূজিত। রামায়ণ মহাভারত সর্বত্র সমাদৃত। এই সব সাধনা বেদবাহ্য ইহা ভাগবতদের। তন্ত্রমতে তো ভারতের ৫২ পীঠ একই দেবী জগন্মাতার ৫২টি অঙ্গ। তাহাতে হিমালয়ের জ্বালামুখী হইতে দক্ষিণের কুমারিকা তীর্থ, পশ্চিমের হিংলাজ হইতে আসামের কামরূপ সবই দেবীর আপন জীবন্ত অঙ্গ। সেই দেবীর জীবন্ত দেহকে আমরা যেন খণ্ডিত না করি ইহাই শক্তি সাধনার মর্মগত কথা।

আবার এই দেশই আমাদের বহিস্থিত ভৌতিক দেহ। আমাদের দেহও আবার দেশের চিন্ময় বিগ্রহ। এই মানব দেহেই সর্বতীর্থস্থান অবস্থিত। পুরশ্চর্যার্ণব বলেন স্বদেশের মধ্যে অবস্থিত তৎ তৎ পীঠস্থানে পীঠন্যাস পূর্বক সাধনা করিবে। (পৃঃ ৩৪০)।

আমাদের কাম্য দেবতাকে ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে চারিধামে (৮৪) চৌরাশ তীর্থে দর্শন ও অর্চনা করিলেই এবং সব তীর্থোদকে তাঁহার পূজা করিলেই পূর্ণাভিষেক হয়। নচেৎ তাঁহার সকল অভিষেকই অসম্পূর্ণ। আমাদের যে-কোনো তীর্থই সকল ভারতবর্ষের জীবন্ত বিগ্রহ।

কাশীতে সমস্ত ভারতবর্ষকেই দেখা যায়। কাশীর ঘাটে সর্বপ্রদেশের তীর্থার্থীদেরই স্থান। মণিকর্ণিকায় ভারতীয় সকল প্রদেশবাসীর দেহই ভস্মীভূত। গয়া প্রভৃতি তীর্থগুলি সর্বপ্রদেশের মৃতগণের শ্রাদ্ধ স্থান।

সারা ভারতে একই রকমের জাতিভেদ। সমাজ ব্যবস্থা, দশকর্ম, একই রকমের মাস-বৎসরাদি গণনা। মালাবারেও চৈত্র সংক্রান্তিতে বিষুবপূজা দেখা যায়। সর্বত্রই শারদীয়া ও বাসন্তীদেবীর পূজা, দোল, রথযাত্রা প্রভৃতি। সারা ভারতে সংসারীর আচার সামান্য ইতরবিশেষ হইলেও সর্বত্রই প্রায় একরূপ। ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পরমহংসরাও ভারতে সর্বত্রই সমান মান্য। শঙ্করাচার্যের জন্ম মালাবারে। তাঁহার চারিমঠ ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে। তাঁহার সম্প্রদায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। হিমালয় বদ্রীনাথে তাঁরই শিষ্যের দল তীর্থগুরু। শংকরের দশনামী সম্প্রদায়ের মত রামানুজ নিম্বার্ক মাধ্ব সম্প্রদায়ও সর্বভারতে পূজ্য। মন্বাদি স্মৃতির হুকুম ভারতের সর্বত্র চলে।

মুসলমানেরাও ভারতে সাধনার দ্বারা যে সব তীর্থ করিয়াছেন তাহার মধ্যে লাহোরে হুজবেরীর সাধনা, আজমীরে মৈনুদ্দীন চিশ্তির দরগাহ, পাকপত্তনে ফরিদসকরগঞ্জের তীর্থ ও শ্রীহট্টের সাহজলালের সাধনা।

এক মুসলমান সাধনা সারা ভারতে ছড়াইয়া চিশ্তী, সুরবর্দী, কাদিরী নক্সবন্দী, মদারী প্রভৃতি নানা মতে সারা ভারতেই প্রতিষ্ঠিত।

ভারতবর্ষে প্রাদেশিকতার স্থান কই? বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা কান্যকুব্জ হইতে আগত। দেড় হাজার বছর আগে নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা নাকি বাঙলাদেশ হইতে গিয়াই মালাবারে বাস করেন। মালাবারের নায়ারেরা তাঁহাদেরই সেবক ও ভক্ত। বঙ্গবাসীদের মত ইঁহারাও নিজবাড়ির চতুঃসীমার মধ্যেই পুষ্করিণীতে স্নান করেন। মৃত্যুতে নিজ উদ্যানেই তাঁহাদের দেহ দগ্ধ হয়। মৃত্যুর পরে আমগাছ কাটিয়া দাহ হয়। অশৌচকালে গলায় লোহার চাবি ঝুলাইতে হয়। এই সবই বঙ্গীয়, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের প্রথা। বিবাহে উলুধ্বনি হয়। কাঁসার দর্পণ ও অস্ত্র লইয়া বর বিবাহ যাত্রা করেন। সঙ্গে নিতবর থাকে, বিবাহে বরকন্যা নাটিতে পুকুর কাটিয়া মাছধরার খেলা খেলেন। বরের দেওয়া মাদুলী কন্যার গলায় ঝুলাইতে হয়। ধোপা নাপিত ছাড়া ক্রিয়া হয় না। ধোপা নাপিত বন্ধ হইলে সমাজ বন্ধ। তিন-বিপ্র,

তিন-শূদ্রে একত্র গেলে অযাত্রা। এই সব বাঙলা দেশেও দেখি বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে।

হাজার বারশত বৎসর পূর্বে বিস্তর বাঙালী হিমালয় গাঢ়ওয়াল প্রদেশে গিয়া বাস করেন। তথাকার হিন্দীভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত ইতিহাসে তাহা পাই। সারস্বত ব্রাহ্মণেরা গৌড় দেশ হইতে মহারাষ্ট্রে যান। নাগর ব্রাহ্মণেরা শ্রীহট্ট হইতে গুজরাটে গিয়া বাস করেন। কর্ণাট রাজবংশের লোক বাঙলা দেশে সেনবংশ প্রবর্তন করেন। তাঁহাদেরই বংশের রাজারা পরে হিমালয়ে সুকেত মাণ্ডী প্রভৃতি স্থানে রাজ্য স্থাপনা করেন। দক্ষিণ ভারতের রাজা সাতবাহনের সময়ের কলাপ ব্যাকরণ চলে কাশ্মীরে ও পূর্ববঙ্গে। কল্যব্দের যেরূপ গণনা পূর্ববঙ্গের বল্লালসেনের ইতিহাসে দেখা যায়, সেইরূপেই গণনা চলে কাশ্মীরে।

আমরা বাল্যকালে গল্প শুনিতাম দক্ষিণদেশের কাঞ্চী রাজপুত্রের কথা। আমাদের বণিক ও রাজপুত্রেরা যাইতেন কাঞ্চীতে সিংহলে। বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজার গল্পই ছিল আমাদের ও সারা ভারতের উপজীব্য। পূর্ববঙ্গের গোপীচাঁদের করুণ সন্ন্যাস কাহিনী সারা ভারতকে কাঁদাইয়াছে। কর্ণাটের বিল্বমঙ্গলকে আমরা সকলেই মনে করি নিজ নিজ ঘরেরই লোক। পূর্ববঙ্গের মধুসূদন সরস্বতীর গ্রন্থ সারা ভারতে আদৃত। চৈতন্য মতের লোক ডেরাগাজীখাঁয়ে সিন্ধু লারকানায় ও গুজরাটে দেখিয়াছি।

বড় হইয়া যখন স্নান মন্ত্র দেখিলাম তখন দেখিলাম স্নানকালে সারা ভারতের সকল নদীকেই আবাহন করিতে হয়। সারা ভারতই সেখানে এক।

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
(পুরোহিত দর্পণ সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য পৃঃ ৬)

ঘট স্থাপনে মন্ত্র বলিয়াছি,

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
সর্বতীর্থানি পুন্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিং॥

গঙ্গা প্রভৃতি সকল নদী সর্বতীর্থ এখানে সমবেত হউক। স্নানকালে এই মন্ত্রও উচ্চারণ করিতে হয়—

কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা প্রভাস পুস্করানিচ।
তীর্থান্যেতানি পুন্যানি স্থানকালে ভবন্ত্বিহ॥
(ঐ, পৃঃ ১০১)

কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ আমার স্নানকালে এখানে সমবেত হউক। অর্থাৎ গোটা ভারত একত্র না হইলে আমাদের স্নান করাও চলে না।

মৃত্যুর পরেও এই মন্ত্রেই আমাদের দেহ স্নাত হয়—

গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুন্যাঃশিলোচ্চয়া
কুরুক্ষেত্রং চ গঙ্গাং চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্॥"
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাং চ সর্বপাপ প্রণাসিনীম্
ভদ্রাবকাশং সরযূং পনসং গণ্ডকীং তথা॥
বৈনবং চ বরাহং তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
(ঐ, ৫৫৬)

গয়া প্রভৃতি সব তীর্থ ভারতের পবিত্র সব পর্বত, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা, যমুনা, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, ভদ্রাবকাশা, সরযূ, গণ্ডকী প্রভৃতি সব নদী, পনস, বৈনব, বরাহ, পিণ্ডারক প্রভৃতি সব তীর্থকে আবাহন করি। সকলে সন্নিহিত হইয়া এই বিগতপ্রাণ দেহকে পবিত্র করুন। জনমে, মরনে অখণ্ড ভারতকে আবাহন না করিলে আমাদের চলিত না।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের অখণ্ড দেশকে এমন অখণ্ড করিয়াই ধ্যান করা হইয়াছে। সেই দেশকে এখন যাঁহারা খণ্ডিত করিলেন, তাঁহারা যে কতদূর সর্বনাশ করিলেন তাহা বলা অসম্ভব। আবার আমরাও প্রাদেশিকতা প্রভৃতির দ্বারা তাহারই সমর্থন করিতেছি। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কিসে?

ভারত ছাড়িবার পূর্বে ইংরাজ এই সর্বনাশ আমাদের করিয়া গেল। চিরদিন এই পাপ ভারতকে দগ্ধ করিয়া মারিবে।

১৯২৪ সালে লোকগুরু রবীন্দ্রনাথ চীনদেশের নেতা পরলোকগত লিয়াং-চি-চাওকে বলিয়াছিলেন, "ইংরাজ ও য়ুরোপীয়রা এসিয়া ছাড়িবে তাহার পূর্ব সূচনা দেখিতেছি।" লিয়াং-চি-চাও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বৃথা ছাড়িবে তাহারা? আমরা তো তেমন শক্তিলাভ এখনো করি নাই।" কবি বলিলেন, "এসিয়াতে সর্বত্র লোক জাগিয়া উঠিতেছে। গৃহস্থ যতক্ষণ ঘুমায় ততক্ষণই তস্করদের সুযোগ। গৃহস্থ জাগিলেই তস্করকে পলাইতে হয়। ভাল য়ুরোপীয়দের কথা বলি না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নমস্য। কিন্তু যারা তস্কর, তারা এতকাল আমাদের নানাভাবে ঘুম পাড়াইয়া লুণ্ঠন করিয়াছে, এখন আর সেই পন্থা চলিতেছে না। এখনও কিছুকাল শেষ চেষ্টা করিয়া তাহাদের পলাইতে হইবে।"

"কিন্তু যাইবার আগেও তাহারা নানাভাবে আমাদের জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। জাপান বিজ্ঞানে ও শিল্পে অগ্রসর। কিন্তু জাপানকে ইহারাই দস্যু মন্ত্রে (Imperialism) যে দীক্ষা দিয়া চলিয়াছে তাহাতেই তাহারা সর্বনাশ করিবে। ভারতে তাহারা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা ক্রমশঃই সজোরে চালাইয়াছে। ভারতে জাতিভেদ কালের ধর্মে ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসিত। কিন্তু লোক-গণনাতে (Census) আদালতে হলফ প্রভৃতি নানা উপায়ে সেই জাতিভেদকে ইংরাজেরাই দিন দিন প্রবল করিয়া তুলিতেছে এবং তাহাতেই সে জাতিতে-জাতিতে বিচ্ছেদ আনিবে। আমাদের গোঁড়ারাও সেই নষ্টামি না বুঝিয়া তাহাতেই ঘৃতাহুতি দিবেন। চীনের জন্যও ভয় হয়।"

লিয়াং চি চাও বলিলেন, চীনে জাতিভেদ নাই। আমাদের সর্বত্র একই বর্ণমালা-গত ভাষা। কাজেই প্রাদেশিকতাও নাই। ধর্ম ও সম্প্রদায় লইয়া আমরা কখনও গোলমাল করি না। তবে আমাদের মারিবে কেমন করিয়া?" কবি বলিলেন, "হয়তো তবে রাজনীতির দিক দিয়া চীনদেশে এমন আগুন ইহারা জ্বালাইবে যে, তাহার চোটেই চীনকে চির-দুর্বল হইয়া থাকিতে হইবে। জাপান, ভারত ও চীনকে মারিয়া রাখিতে পারিলে ঐসব দস্যুদের আর কোনও বিপদ নাই।"

আমরাও এখন দেখিতেছি তাহারাই জাপানকে দস্যুমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া চীন ও ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার সর্বনাশ করিল। চীনকে চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া রাখিল। চীনের দুই দলেরই মূলমন্ত্র য়ুরোপেরই আমদানী। ভারত ছাড়িবার সময়েও তাহারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়া ভারতকে ভাঙিয়া গেল। বিভক্ত ভারতেও হিন্দুকে হিন্দু যাহাতে চিরদিন জ্বালাইতে পারে, তাহার জন্য প্রাদেশিকতার আগুন জ্বালাইয়া গেল। প্রদেশের মধ্যেও যেন সোয়াস্তি না থাকে, তাহার জন্য "সিডিউল" "নন-সিডিউল" প্রভৃতি নানাভাবে জাতিভেদের বিষ ছড়াইয়া গেল। তাহার পরেও যদি সর্বনাশ না হয়, তবে য়ুরোপেরই আমদানী নানাবিধ রাজনীতির দীক্ষা ও মন্ত্র ছড়াইয়া গেল। গ্রাম জ্বালানিয়া বিদায় লইল বটে, কিন্তু শত শত বাঘ খাড়া করিয়া গেল। ইহারাই চিরকাল আমাদের চিবাইয়া খাইবে। স্বার্থ ও সংকীর্ণতার দন্ত বাঘের দাঁত হইতেও দারুণ। বিপক্ষের কোন বিশেষ একজনের উপর রাগ করিলে হইবে কি? ঘরে বাহিরে ইহারা যাইবার সময় শতভাবে শত উত্তরাধিকারী রাখিয়া গিয়াছে। কত দিকই বা আমরা সামলাইব। হায়দরাবাদ কাশ্মীর জুনাগড় সর্বত্র সেই একই ব্যাপার। তাহারা কোথাও যদি আগুন নিভিয়া আসিতে দেখে, তবে নানাভাবে ফুঁ দিয়া দুর্বল আগুনকে সবল করিতে তাহাদের আলস্য নাই। গ্রাম জ্বালানিয়া মরিয়া ভূত হইয়াও আবার মরে নাই। ইহারা ভূত হইয়াও মারিতে চায়। কিন্তু দুর্বৃত্তদেরই কি চিরদিন জয় হইবে। ভগবানের শাশ্বত সত্য কি চিরদিনই দুষ্টবৃত্তদের পদদলিত হইবে? অখণ্ডদেশকে কি চিরদিনই ইহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিতে পারিবে? সর্বত্র মানবজাতিকে যিনি এক করিয়া দেখিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এতখানি দুর্বৃত্তপনা ভাবিতেও পারেন নাই।

ভারত বিভাগ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়া যান নাই। কিন্তু বঙ্গ বিভাগ দেখিয়া যে তাঁর কি বেদনা হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। তাই খণ্ডিত বাঙলাকে মিলিত করিবার জন্য তিনি ৩০শে আশ্বিন 'রাখীবন্ধন উৎসব

প্রবর্তিত করিলেন। এই মিলনের রাখী-উৎসব তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল।

তাহার বহু বৎসর পরে ১৯৪১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন, তখন সারা ভারতের পালনীয় মিলন-মহোৎসব রাখী-পূর্ণিমার দিনই তিনি দেহরক্ষা করিলেন। তিনি কি তবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে দারুণতম কোন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা মনে মনে জানিয়া পূর্ব হইতেই মৃত্যুর দ্বারা তাহার যোগসাধনের জন্য রাখী-উৎসবের দীক্ষা দিয়া গেলেন। আজও তাঁহার অমর আত্মা বলিতেছে, "বিচ্ছিন্ন হইও না। স্বার্থ, সংকীর্ণতা ও দ্বেষ ত্যাগ করিয়া সকলে মিলিত হও।" কবিগুরু চিরদিনই মানবের বিচ্ছেদের মধ্যেও যোগেরই সন্ধান করিয়াছেন। দুর্বলের উপর প্রবলের জুলুম তাঁহার দুঃসহ ছিল। সেই জুলুমের বেদনায় তিনি গাহিয়াছেন—

"রইল বলে রাখলে কারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার, টানাটানি টিকবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে॥

ভাবছ, হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে,
হয় না যেটা সেটাও হবে।"

জুলুমবাদ দুর্বৃত্তদের ডাক দিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান,
তুমি কি এমনি শক্তিমান!
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
তোমাদের এমন অভিযান।

আমাদের শক্তি মেরে, তোরাও বাঁচবি নেরে,
বোঝা তোর ভারি হ'লেই ডুববে তরীখানা।"

আবার তিনি জোর করিয়া শুনাইয়াছেন—

"ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে
গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
... ...
ওরা ধর্ম যতই দলবে, ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে॥"

ভগবানের বিধানে তাঁহার অটল ভরসা ছিল বলিয়াই তিনি বলিয়াছেন—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ ক'রেই থাকিস,
সে পণ যে তোর রবেই রবে॥
ওরে মন হবেই হবে॥"

তাই তিনি সকলকে সকল স্বার্থ লোভ, দ্বেষ, বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া প্রেমের মিলনের জন্য হাতে হাতে ধরিতে ডাক দিয়াছেন—

"এখন, আর দেরী নয় ধরগো তোরা
হাতে হাতে ধরগো,
আজ আপন পথে ফিরতে হবে,
সামনে মিলন স্বর্গ।
... ...
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে
মরতে হয়তো মর গো॥"

ভারতবর্ষ হইল সকল ধর্মের সকল মানবজাতির মহামিলন ক্ষেত্র। এখানেও ভেদ-বিভেদ কেন? ভারতের ইতিহাসের ধারাতে তিনি এই সত্যই জাজ্বল্যমান করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই সত্যই তাঁহার গানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে,
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক, হুন দল, পাঠান, মোগল,
এক দেহে হ'ল লীন॥"

য়ুরোপকেও তিনি এই মহামিলনে ডাক দিয়াছেন; কিন্তু দস্যুভাবে নয়। সাধকের মত তারও এখানে নিমন্ত্রণ আছে।

"পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবেনা ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥
এসো হে আর্য এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃষ্ঠান
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত হোক অপনীত
সব অপমান ভার
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥"

মায়ের সেবার সাধনায় উচ্চ-নীচ ভেদ নাই। ধনি-নির্ধন ভেদ নাই। তাই জন-গণ-মন অধিনায়ক গানে তিনি বলেন—

"পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড়
উৎকলবঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে
গাহে তব জয় গাথা"

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত শুনি
তব উদারবাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারশিক
মুসলমান খৃষ্টানী,
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা॥"

বক্সা ক্যাম্প • অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

এই সেই হিমালয়—ভারতবর্ষের হিমালয়!

প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করিতে সাহস হইল না যে, সত্যই আমি হিমালয়কে দেখিতেছি। জন্মার্জিত পুণ্য আমার ছিল, তাই হিমালয়ের দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হইল। আমার বন্দিত্বের সমস্ত ব্যথা ও ক্ষোভ মুছিয়া গেল, ইংরেজের উপর যেন আমার কোন নালিশই আর রহিল না। হিমালয়কে দেখিবার সুযোগ তাঁহারাই আমাকে দিয়াছে। —সমস্ত মনকে সংহত, শান্ত ও কেন্দ্রস্থ করিয়া ভারতবর্ষের হিমালয়কে, দেবাত্মা হিমালয়কে আমি আমার প্রণাম জানাইলাম।

শরৎবাবু যে তাঁর জায়গা ছাড়িয়া আমার কাঁধ ঘেঁষিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তা টের পাই নাই। কানের কাছে তাঁর গলা শুনিয়া তবে সচেতন হইলাম। হিমালয়ের মহান শান্তি আমার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং কয়েকটি ক্ষণের জন্য সেদিন আমিও ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, একথা বলিলে খুব জোর দিয়া যে প্রতিবাদ করিতে পারিব, মনে হয় না। তাই শরৎবাবুর সান্নিধ্য সম্বন্ধে আমি সচেতন হই নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওটা কি?" বলিয়া চোখ ও আঙ্গুলে দিয়া ওটার দিকে নির্দেশ করিলেন।

আমি কিন্তু ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া শুধু অনন্ত শিখরশ্রেণীই দেখিতে পাইলাম, কোন ওটার সাক্ষাৎ পাইলাম না।

কহিলাম—"কোনটা?"

—"ঐ যে চূড়োটা, আয়নার মত যা ঝক্‌ঝক্ করছে।"

নিজের বুদ্ধিমত উত্তর দিলাম—"ও চূড়োটা বরফে ঢাকা ,রৌদ্র পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে।"

এক সিপাই বলিল—"ওই তো কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া।"

—"কাঞ্চনজঙ্ঘা? এখান থেকে দেখা যায়?"

হ্যাঁ, যায়। সিপাইজী এই পথে আরও কয়েকবার নাকি যাতায়াত করিয়াছে, কাজেই সে জানে। পরের স্টেশনে খোঁজ লইয়া জানিলাম যে, সিপাহী ঠিকই বলিয়াছে, আমাদিগকে গ্রাম্য পাইয়া হাইকোর্ট দেখায় নাই।

কিন্তু এর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন? যে-ভাবে জ্বলিতেছে, তাতে সোনার রং তো মোটেই নাই। বরং এর এই রজতকান্তি দেখিয়া এর নামকরণ হওয়া উচিত ছিল—রজতজঙ্ঘা।

আবার ভাবিয়া সংশোধন করিলাম যে, ভোরের প্রথম আলো যখন এর বরফের চূড়া স্পর্শ করে, তখন নিশ্চয় এর সারাদেহ সোনায় ঝলমল করিয়া উঠে। সে সময়ে এর কনক-কান্তি দেখিয়াই বোধ হয় এর নামকরণ হইয়া থাকিবে—কাঞ্চনজঙ্ঘা।

বেশ, তাহাই নয় মানিয়া নিলাম। কিন্তু জঙ্ঘা কেন? এতো জঙ্ঘা নয়, এযে শিখরচূড়ো। যেমন বলা হয় গৌরীশৃঙ্গ, তেমনি হওয়া উচিত ছিল—কাঞ্চনশৃঙ্গ বা কাঞ্চন-শিখর। আজও আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, কি কারণে শিখর-চূড়াকে জঙ্ঘা নাম দেওয়া হইল। এই যদি জঙ্ঘা হয়, তবে বাকী ঊর্ধ্বাংশটি কোথায়? থাকগে, খামোকা মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই। যত ভুল নামকরণই হউক না কেন, নামটা কিন্তু শ্রুতিমধুর এবং একটি কমনীয় কাঠিন্যও ইহাতে রহিয়াছে—কাঞ্চন-জঙ্ঘা।

শরৎবাবু কানের ধারে সারা পথটা শিশুর মত কেবল অনর্গল কথা কহিয়া গিয়াছেন। আমার তরফ হইতে উত্তর না পাইলেও তাঁর কাকলীর স্রোত সমানই অব্যাহত ছিল। আমি মুগ্ধ দুই চোখ পাতিয়া রাখিয়াছিলাম,—বাহিরে ঐ হিমালয় সারি সারি শিখর লইয়া আকাশে গা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ভিতরেও মনের একটা আকাশ আছে, সেখানে অনন্ত গিরিশ্রেণী লইয়া আর এক হিমালয় স্বপ্ন-দেহে দাঁড়াইয়া ছিল। আমার মনের সমস্ত মনোযোগ তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, শরৎবাবুর কথায় কান বা মন কোনটাই আমি দিতে পারি নাই।—

রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে যখন নামিলাম, রৌদ্র তখন রীতিমত তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখান হইতে আমাদিগকে ছোট গাড়ীতে যাইতে হইবে। এ গাড়ী বক্সা হইয়া ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া জয়ন্তিয়া স্টেশনে গিয়া থামিবে। জয়ন্তিয়া বোধ হয় বক্সার পরের স্টেশন, মাঝখানে ঘন অরণ্যে আর কোন স্টেশন আছে বলিয়া আমি শুনি নাই।

হিমালয়ের পাদদেশ ধরিয়া ঘন অরণ্য হিমালয়ের মতই একটানা অবিচ্ছেদে পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তারিত হইয়া আছে। এ অরণ্য যেমন দুর্ভেদ্য, তেমনি ভয়ংকর, প্রস্থে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল, আর দৈর্ঘ্যে হিমালয়েরই প্রায় সমান। এ অরণ্যসম্পদের পরিমাপ করা সত্যই কষ্টকর, অফুরন্ত বলিলেও চলে। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, এ দিককার 'ফরেস্টে'ও ব্যাঘ্র, হস্তী, বরাহ, মৃগ হইতে শুরু করিয়া যাবতীয় শ্রেণীর পশুদেরই বসতি রহিয়াছে এবং পার্শ্ববর্তী মনুষ্য-সমাজ ও বসতির উপর তাহাদের উৎপাতও কিছু কম নহে।

স্টেশনের নামটায় আমাদের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল—রাজাভাতখাওয়া! কোন রাজার ভাত খাওয়ার সঙ্গে ইহার যোগ আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নামের মধ্যেই স্টেশনটির পরিচয় নিহিত আছে। রাজা হীরা-মুক্তো-সোনা-দানা না খাইয়া আমাদের মত সামান্য মনুষ্যেরা যে ভাত খাইয়া থাকে, সেই ভাতই ভক্ষণ করিয়াছেন, এই অসামান্য কীর্তিকেই বোধ হয় এই নামকরণে স্থায়িত্ব দিয়া স্মরণীয় করিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছে। এইটুকু পর্যন্ত চোখ বুজিয়াই অনুমান করিয়া লইলাম।

আমার এ অনুমান কিম্বদন্তী দ্বারাও সমর্থিত হইল। স্থানীয় একজনের নিকট ইতিহাসের তথ্য পাইয়া গেলাম। পুরাকালে—সেকালের সনটা বক্তাও বলিতে পারেন নাই, কুচবিহারের কোন রাজার সঙ্গে ভুটানের রাজার লড়াই লাগিয়াছিল। রাজায় রাজায় লড়াই লাগিয়াই থাকে, মান্ধাতার আমল হইতে রাজা মাত্রেই এ নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং কোচবংশের সহিত ভোট বংশের লড়াই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়াই গ্রহণ করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। কুচবিহারের রাজা ভুটানের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অর্থাৎ আচ্ছা—সে শিক্ষা দিয়া ফিরিবার পথে পাহাড় হইতে নামিয়া সসৈন্যে এখানে ছাউনী ফেলিয়া তবে অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশের মাটীতে পা দিয়া কেবল ভাত খাইয়াই তিনি প্রথম বিজয়োৎসব সম্পন্ন করেন, এ খবর শুনিয়া আমার মন ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইল। এতদিনে একজন খাঁটি বাঙালীর পরিচয় পাইলাম, যিনি ভেতো নামটাকে গর্বের ও বিজয়ের জিনিস মনে করিতে ভয় পান নাই বা দ্বিধা করেন নাই। ভাতকে যিনি এত বড় সম্মান দিতে পারিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত বাঙালী জাতিরই নমস্য, এক কথায় তিনি প্রাতঃস্মরণীয়।

তাঁর আত্মত্যাগও তুচ্ছ করিবার মত নহে। শুধু মোগল-পাঠান আমলেই নহে, এ আমলেও বড় বড় লোকেরা নিজের নামটা গ্রামের বা

নগরের কপালে লটকাইয়া দিয়া থাকেন—যেমন লেনিনগ্রাদ, স্টালিনগ্রাদ ইত্যাদি। এই খাঁটি বাঙালী তাহা না করিয়া বাঙালীর প্রাণধারণের একমাত্র আহার যে ভাত খাওয়া, তার পূর্বে শুধু রাজা শব্দটি যোজনা করিয়াছেন। অশোকের শিলালিপির শিক্ষা ও অনুশাসনই শুধু উত্তরকালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু রাজাভাতখাওয়ার মধ্যে যে কি তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, তাহা বাঙালী আমরা তাকাইয়াও দেখি না। রাজাভাতখাওয়া মানে—বাঙালী যেদিন ভাত খাইতে পাইত, সেদিন সে সত্যই রাজা ছিল। ভাতের অভাবে বাঙালীর কি ছিরি ও দুর্দশা হইয়াছে, তাহা আর কহতব্য নহে।

তত্ত্বদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া যখন খোলা দৃষ্টিতে রাজাভাতখাওয়ার দিকে তাকাইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম যে, স্টেশনটি কাঠের গুদাম হইয়া রহিয়াছে। যতদূর মনে পড়ে, কয়েক স্টেশন আগে আলিপুর-ডুয়ার্সেও সারি সারি কাঠের স্তূপ ছোট ছোট পাহাড়ের মত মজুত রহিয়াছে দেখিয়াছিলাম। এযে চোরাই মাল, ওতে আর সন্দেহ রহিল না। নিকটের ঐ অরণ্য হইতে এ সব সংগৃহীত হইয়াছে। অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ চৌর্যের তেমন কোন প্রতিবাদ করেন নাই বলাই বাহুল্য। সমুদ্র হইতে কয়েক কলস জল লইলেই রত্নাকরের সম্পত্তিতে হাত দেওয়া হয় মনে করিলে ভুল হইবে। বনলক্ষ্মীর ঐশ্বর্যের খুদকুঁড়োও মানুষ এতাবৎ অপহরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বক্সা স্টেশনে যখন অবতীর্ণ হইলাম, তখন বেলা প্রায় গোটা দশেক। মহাসমুদ্রের মাঝখানে ছোট একটুখানি দ্বীপ যেমন, মহা-অরণ্যের মাঝখানে এই স্টেশনটিও তেমনি।

আমরা সিউড়ী জেলের নয়জন ছাড়া আরও পাঁচজন রাজবন্দী ট্রেন হইতে পুলিশের জিম্মায় অবতীর্ণ হইলেন দেখা গেল। ইঁহারা বগুড়া ও রংপুর জেল হইতে চালান হইয়া আসিয়াছেন। সবসাকুল্যে সংখ্যাটা এখন দাঁড়াইল চতুর্দশ।

শরীরের ভাবগতিক ভালো দেখিলাম না। সিউড়ী হইতে কয়েকশত মাইল কলিকাতা, তারপর সেখান হইতে দীর্ঘপথ, অবশ্য গাড়ীতেই চড়িয়া আসিয়াছি, নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া আসিতে হয় নাই—তবু দেখিলাম শরীরটা অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ওয়েটিংরুম বলিতে যে ছোট্ট খোপটা আছে, তাতে আশ্রয় লইতে দল হইতে সরিয়া নিঃশব্দে আগাইয়া গেলাম।

দুয়ারেই বাধা পাইলাম, অভ্যর্থনার আয়োজন দেখিয়া। প্রবেশমুখেই মানুষের অপকর্ম মজুত রহিয়াছে। মূত্র নাই বটে, কিন্তু দাগ স্পষ্ট ফুটিয়া আছে। আর মল মেঝেতে লেপটাইয়া একাকার। ফিরিব ফিরিব মনে করিতেছিলাম, গন্ধে ও দৃশ্যে পেটে মোচড় দিয়া উঠিল, বমির ইচ্ছা জাগিয়াছে বুঝিলাম। আর ফিরিতে পারিলাম না। পেটের মোচড়ে মোহমুদ্গরের কাজ দিল। অর্থাৎ মোহবিদূরিত হইয়া জ্ঞাননেত্রই খুলিয়া গেল। আমার নিজের কোষ্ঠেই মল রহিয়াছে; তাই বলিয়া অপবিত্র ভাবিয়া ঘৃণায় নিজের শরীরটাকে তো ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াই না। এখন বাহিরে ও বস্তু দেখিয়া পিছাইলে চলিবে কেন?

বীরের মত আগাইয়া গেলাম। একটা হাতলভাঙা আরামকেদারা ছিল, সেটাকে কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া জানালার ধারে লইয়া কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। মিথ্যা বলিব না, একটা চেয়ারও ঘরে ছিল, তার পিছনের ঠ্যাং দুটো পিছনে হেলিয়া ছিল। ভাবে মনে হয় যে, সঙ্গীয় আরামকেদারাটার কাৎ হইবার ভঙ্গীটুকু অনুকরণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। একটা চুরুট ধরাইয়া লইলাম। সেকালে লোকেরা বাণ দিয়া বাণ কাটিত, আমি গন্ধ দিয়া গন্ধ ঠেকাইতে লাগিলাম। তবু চুরুটের কড়া গন্ধের পর্দা ফাঁক করিয়া মাঝে মাঝে শত্রুটি অর্থাৎ অবাঞ্ছিত গন্ধটা উঁকি দিতে ছাড়িল না।

বক্সা স্টেশনে নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িয়াছিল যে, একদল ভুটিয়া কুলী মাল নিবার জন্য উপস্থিত রহিয়াছে, ফোর্টের কম্যান্ডান্ট পাঠাইয়াছেন। গাড়ি আসিতেই উহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। অবাক হইয়া আমরা সকলেই দুই চোখে চাহিয়া ছিলাম, মিনিট খানেকের মধ্যে পার্থক্যটা মালুম করিতে পারি নাই, পরে দৃষ্টি অভ্যস্ত হইয়া গেল।

"ব্যাকরণের জ্ঞান যে লোপ করে দিল দেখছি।" আমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে শিক্ষিত সেই সন্তোষ গাঙ্গুলীরই গলা।

জিজ্ঞাসু মুখে চাহিতেই তিনি জবাব দিয়াছিলেন—

—"ভেদ বুঝতে পারেন; কে পুরুষ আর কে মেয়ে মানুষ?"

আমার ঠোঁট একটু ফাঁক হইয়া গেল, না হাসিয়া পারি নাই।

সন্তোষবাবু কহিলেন,—"দেখছেন না, বুক বলে কোন আপদ-বালাই নেই, সব সমান।"

দেখিয়াছিলাম বই কি! দেখিয়াই তো এতক্ষণ হাঁ করিয়াছিলাম। দেখা যখন আরও অভ্যাস হইয়াছিল, তখন আর থ' খাইতাম না। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, পাহাড়ী দেশের মেয়েদের দেহে প্রায় ক্ষেত্রেই এ ত্রুটি থাকে। উত্তমাঙ্গের দিকে যে-কোন কারণেই হউক ইহারা বিধাতার মার খাইয়াছে। কিন্তু অধমাঙ্গের দিকে এ ত্রুটি ভগবান বড় বেশী করিয়াই সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। উরুর যে আভাস পাইলাম, তাতে দমিয়া গেলাম। দুর্যোধনের উরু ভাঙিয়া ভীম বাহাদুর হইয়াছেন। তিনি যে কত বড় বীর এবং তাঁর গদার জোর যে কত, পাইলে একবার এখন পরীক্ষা করা যাইত।

এই সময়ে কেষ্টবাবুর গলা শুনিয়াছিলাম —"জয়মা মহিষমর্দিনী!"

ফিরিয়া দেখিলাম, সত্যই তিনি কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম নিবেদন করিতেছেন। প্রণম্যটিকে দেখিয়া আমারও মন জয়ধ্বনি না করিয়া পারে নাই—মহিষমর্দিনীই বটে! প্রায় আড়াই মণ তিন মণ ওজনের মাল কাঁধে লইয়া মহিষমর্দিনী দাঁড়াইয়াছে এবং ছ-সাত মাইল পাহাড়ী পথ পার হইয়া এ মাল পাহাড়ের মাথায় বক্সা দুর্গে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে ভারমুক্ত হইবে। অধমাঙ্গের শক্তি ও পুষ্টি কি স্তরের হইলে ইহা সম্ভব হয়, তাহা আপনাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। বৃটিশ ললনাদেরও পাদ ও নিতম্বগর্ব এই ভুটিয়া মহিষমর্দিনীরা মর্দিত করিয়া ছাড়িয়াছে; এই জয়ের গর্বে আমরাও গর্বিত বোধ করিলাম। (ক্রমশ)

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভয় না করলেও এইটাই সমর আশা করেছিল। বাবা বিয়ের কথা পাড়লেন। মত চাওয়ার কথা নয়, প্রয়োজনের কথা। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে এও একটা অত্যাবশ্যক অবলম্বন, বাঙালী জীবনে দুটি যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যে এ একটি—প্রথমে চাকরি, তারপর বিয়ে। পারম্পর্য রক্ষা হলে বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান অসম্ভব। যোগানন্দবাবু যে ইতিমধ্যে মেয়ে দেখা আরম্ভ করেছেন, তা বললেন। এখন সমরের পছন্দ হলে কথাবার্তা পাকাপাকি ক'রে ফেলবেন—অনেকগুলি পরিবারের অনেকগুলি বিয়ের উপযুক্ত মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। সমর সুবিধে মত নিজে হোক বন্ধুবান্ধব দিয়ে হোক মেয়ে দেখে আসতে পারে। তারপর—

অলকাকে এঁরা ভুলে গেলেন না কি? না, এখন ছেলের ভাল চাকরি হয়েছে বলে ও সম্বন্ধ বাতিল করে দিয়েছেন? স্বচ্ছল সংসারে অলকার মত অস্বচ্ছল ঘরের মেয়েরা একেবারে বেমানান? কি? হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত করবার ইচ্ছে হয় সমরের—চীৎকার করে জানিয়ে দেয়ঃ আপনারা ভেবেছেন কি—মনে করেন কি? ছেলে-খেলা পেয়েছেন!

স্বার্থত্যাগের একটা সীমা আছে—ভক্তি-শ্রদ্ধারও একটা মান আছে, তা লঙ্ঘন করলে অতি নিরীহ ভালমানুষও স্বাধিকার রক্ষায় ক্ষেপে ওঠে। বাবা কি অলকার সঙ্গে তার সম্পর্কটা উড়িয়ে দিতে চান? একদিন বিনা প্রতিবাদে ছেলের ভালবাসার পাত্রীকে স্বীকার করে নিয়ে আজ বিনা কারণে তাকে অস্বীকার করার কি মানে হয়? অলকাকে সে লুকিয়ে ভালবাসেনি—ভালবেসে বাপ-মায়ের সন্দেহ দোলাটাকে শুধুমাত্র নাড়া দেয় নি, একটা সৃষ্টিছাড়া বিপর্যয় কাণ্ড ভেবে প্রতিবাদ গুঞ্জন তোলবার অবকাশ দেয় নি। মা-বাবা উভয়েই জানতেন ছেলে তাঁদের একদিন অলকাকেই বিয়ে করবে। আজ হঠাৎ এ উল্টো কথার মানে কি? এখন সে যদি মুখের ওপর অবাধ্যতা করে! না, না, এ কিছুতেই সে সহ্য করবে না। একটু ধোঁকায়ও পড়ে সমর; হঠাৎ সব যেন কেমন উল্টেপাল্টে গুলিয়ে গেছে, এই কয়েক বছরে অনেক ঠিক করা জিনিস বেঠিক হয়ে গেছে, অনেক সিদ্ধান্ত বদলে গেছে।

মুখে কিন্তু সমর প্রতিবাদ করতে পারে না। অলকার সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়—বাবা-মা ভাই-বোন তাকে অস্বীকার করলেও তার কি উচিত ছিল না সমরকে জানান, সে অস্বীকারের কারণ! আজ তিন চারদিন বাড়ি এসেও অলকার কোন সাক্ষাৎ মিললো না। কেন অলকা কি নিজে থেকে একবারও আসতে পারতো না? সমর যুদ্ধে যাবার আগে তো কত আসতো, কারণে অকারণে যখন তখন। কিছুই লুকোন ছিল না—তা ছাড়া মা-বাবাও ওকে পছন্দ করতেন। আজ হঠাৎ কি হলো যে, এমনি করে সরে দাঁড়াতে হবে, সঙ্কোচ বোধ করতে হবে? এ পরিবর্তনের যথার্থ কারণ কি!

সমরের কেমন ধারণা হয়, অন্যত্র তার বিয়ের সম্বন্ধের কথা জানতে পেরে অলকা সরে দাঁড়িয়েছে। ভেবেছে, সুবোধ শিশুর মত সমরও বাবা-মা'র বাধ্য হয় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। অভিমান করে অলকা কি সমরকে অপমান করলে না? সে তো জানাতে পারতো, সমরের মনোভাব জানতে চাইলেই বুঝতে পারতো। সমরের চিঠিগুলোর কি কোন মূল্য নেই? হৃদয়ের কোন তাপই কি ওতে অনুভূত হয় না? এত বড় ভুল অলকা করলো কি করে?

যোগানন্দবাবু অপেক্ষা করছিলেন, সমর কি বলে না বলে শোনবার জন্যে। সমর চুপ করেছিল যোগানন্দবাবুর প্রস্তাবের আকস্মিকতায়—কিছুক্ষণের জন্যে তার বোধ-শক্তি যেন লোপ পেলে। কি বলবে সে?

যোগানন্দবাবু ছেলেকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, তা হলে ঐ কথা রইল—বাগ-বাজারের মেয়েটি কাল দেখে আসবে, ভদ্রলোক বড় ধরেচেন!

একবার সমরের মনে হলো জিগ্যেস করে কেন, অলকার কি হলো? কি দোষ করলে তার বাবা? পাত্রী হিসেবে কি অযোগ্য?

কেমন বাধ বাধ ঠেকল—বাপের মুখের ওপর এ ধরণের প্রগলভতা উপস্থিত মানসিক উত্তেজনায় অসম্ভব না হলেও সমর সামলে নিলে। মুখে বললে, এখন থাক।

যোগানন্দবাবু জিগ্যেস করলেন, কেন?

সমর এড়িয়ে যাবার মত বললে, চাকরি-বাকরির তো এখনো কোন স্থিরতা নেই। আর কিছুদিন না গেলে বোঝা যাবে না।

যোগানন্দবাবু সমরের কথায় কোন আমলই দিলেন না—বললেন, হুঃ তোমার চাকরি যাবে! তা হলে তো কারো চাকরি থাকে না! যারা 'ফিল্ড' সার্ভিসে গিয়েছিল তাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স। ক্ষেপেচো, মিথ্যে ভাবনা!

সমরও মনে মনে বিশ্বাস করে সে-কথা। কিন্তু এখন চাকরি থাকা না-থাকা নিয়ে আর তেমন উৎসাহবোধ করে না। চাকরি যদি না থাকে এখনকার চেয়ে ভবিষ্যৎ কত আর অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে? মনে হয় না থাকাই যেন ভাল। বলে, আরো কিছুদিন দেখা যাক্। তাড়াতাড়ি কি দরকার?

যোগানন্দবাবু বিয়ের সঙ্গে বয়সের এবং বয়সের সঙ্গে বিয়ের উপযুক্ততা সম্বন্ধে ছেলেকে অবহিত করবার চেষ্টা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বললেন, সমরের মত বয়েসে তাঁর ছ'সাত বছর বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে। আজ-কালই দেখছেন বয়েস দিয়ে বিয়ের সময় নিরূপণ করা হয় না—চাকরির খবরদারিতে ও-জিনিসের দিনক্ষণ ঠিক হয়! এখন সব দিক থেকে সমরের তো কিছু না ভাববার কথা। বিয়েতে মত করাই উচিত!

যোগানন্দবাবুর কথার যৌক্তিকতা সমরকে স্পর্শ করে কিনা বোঝা যায় না। সব কথা কানেও যায় না বোধ হয়। হঠাৎ একবার মনে হয়, তার যদি চাকরি না থাকতো সে যদি প্রবীরের মত বেকার হ'তো তাহ'লেও কি বাবা আজকের মত বয়েসের যুক্তি দেখিয়ে তাকে বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন? আজকাল কোন মধ্যবিত্ত বাপ কি যে ছেলের চাকরি নেই তার বিয়ের সম্বন্ধ করতে সাহস পান? বিয়ে করার যোগ্যতা কিসে? বয়েস, স্বাস্থ্য, না আর্থিক স্বচ্ছলতা? সামাজিকতা কোন্ সূত্রে গড়ে ওঠে—অর্থ-সামর্থ্যে, না দৈহিক স্বাস্থ্যে? সত্যিকারের হৃদয়ের ঐশ্বর্যের কি মূল্য দিই আমরা?

তবু স্পষ্ট ক'রে সমরকে বলতে হয়ঃ এখন বিয়ের কথাটা থাক্।

যোগানন্দবাবু 'কেন'র কথাটা জিগ্যেস করতে সাহস পান না। হয়তো ভাবেন আর একদিন সুবিধে মত এ প্রসঙ্গ তোলা যাবে। উভয়পক্ষে ভেবে দেখার ঔচিত্য মনে মনে স্বীকার করেন হয়তো। এদিকে সমর কিছুতে অলকাদের কথা তুলতে পারে না। অনেকবার মনে হ'য়েছে, অলকার বাবার কথা জিগ্যেস করেঃ তাঁরা কেমন আছেন? যোগানন্দবাবুর বন্ধু তো অলকার বাবা যতীনবাবু? এ খবর নিতে কেন যে বাধলো সমর কিছুতে বুঝে

উঠতে পারলো না। তা হ'লে কি অলকার কথা এসে যাবে—লজ্জার কিছু ঘটবে? না, কোন কিছু বৈপরীত্যের ভয়ে সমর বাপের সামনে অলকাদের কথা তুললে না? যদি কিছু অপ্রিয় সংবাদ শুনতে হয়? না, বাপের সম্বন্ধে মনে মনে সমর কঠিন হ'য়ে উঠেছে—স্বার্থপরতাটা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে দেখেশুনে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। এখানে কি বলবে, কি জিগ্যেস করবে সে, আর কাকেই বা জিগ্যেস করবে? সংসার কি তার মুখ-চাওয়া, না সে সংসারের মুখ-চাওয়া? আজ কে কার মুখ চাইবে? এই সংসারের প্রয়োজনে একদিন সে চাকরি নিয়েছিল, এই সংসারের প্রয়োজনে একদিন তাকে বিয়ে করতে হবে—তার ভাল লাগুক বা না-ই লাগুক! কে জানতে যাবে সে-কথা, কে-ই বা আগ্রহ করে তা শুনবে—তার হৃদয়বৃত্তির মর্যাদা দেবে?

সমরের কেমন মনে হয়, অলকারা হারিয়ে গেছে—গত ছ' বছরের ঘটনাস্রোতে তাদের নিশ্চিহ্নভাবে ধুয়ে-মুছে দিয়েছে—যোগানন্দ-বাবুদের সংসারে প্রতিদিনের আশা-আনন্দের হর্ষ-বেদনার সংবাদে সে সংবাদ এতটুকু আলোড়ন তুলতে পারে নি! কে অলকা? কি দরকার তাদের খোঁজ নিয়ে? আনুষ্ঠানিকভাবে যারা আপন হয় না, যাদের মন স্বীকার করে না, তাদের ভালমন্দ বর্তমান ভবিষ্যতের জন্যে মানুষ মাথা ঘামাবেই বা কেন? অলকাদের সঙ্গে একদা পরিচয় ছিল, এই নিয়ে যোগানন্দ-বাবুর বসে থাকলে তো আর চলবে না। সেই পরিচয়টা ছেলের মনে কিভাবে ক্রিয়া করেছে তার খবর রাখবার কথা তো যোগানন্দবাবুর নয়। বয়স ধর্মের ভালবাসার মান-অভিমানকে আমল দিলে সংসারধর্ম অচল হয়ে যায়, অনেক ভাল কাজই তো সে করতে পারে না তাহ'লে!

কিন্তু তবুও—কেন এরা আজ এত নীরব? উপযুক্ত রোজগেরে পুত্রের বাক্‌দত্তা সম্বন্ধে এত অন্যমনস্ক, এত উদাসীন? বাক্‌দানের কথা না জানলেও তাদের ভালবাসার কথা তো এঁরা জানতেন? এক সময় অলকার মেলামেশায় চলা-ফেরায় যদি সন্দেহ জেগে না থাকে, তা হ'লে আজ সুখের দিনে মিলনের দিনে সে বাদ পড়ে কি ক'রে? যতীনবাবুর মেয়ে বলে নয়, অলকা পুত্রবধূ হবার অধিকার রাখে বলে যোগানন্দবাবুর তাকে মনে রাখা উচিত ছিল—কি দোষে অলকা সে অধিকার হারাল? বাবা কি ভেবেছেন, কলেজে-পড়া ছেলের ভাবাবেগ আর রোজগারে ছেলের ভাবাবেগ এক নয়? বয়েসকালের ও-সব ছেলেমানুষী থাকবার কথা নয়! মা-ও কি মনে করেন অলকা আর তার সম্পর্কটা ছেলেখেলার—ভুলে যাবার?

গত তিন দিনে দেশ-কালের যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছে সমর তার মূলসূত্র যেন অলকার এই নিরুদ্দেশ—কোন খোঁজ না পাওয়া। অলকা যেন আর সেই অলকা নেই! কিন্তু কোথায় পরিবর্তন, কেন পরিবর্তন সমর বুঝতে পারে না!

কিন্তু খোঁজ-খবর করবার ইচ্ছে থাকলেও উপযাচক হ'য়ে এখন অলকার সামনে উপস্থিত হওয়াও যেন কেমন কাঙালীপনা! অনেকবার সমরের মনে হ'য়েছে একবার নিজে বেরিয়ে অলকার সংবাদ নেয়, আবার অনেকবার সে-ইচ্ছে দমন করেছে এই অভিমানে, চিঠি পেয়ে এত-দিন পরে যে দেখা করতে ছুটে এল না, নিজে থেকে দেখা করলে সে নিশ্চয়ই খুসী হবে না। এক-একবার মনে হয়, অলকা ইচ্ছে করেই সরে গেছে তাই বাড়ীতে তার সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই। বাবার মনোভাবটা যেন ঠিকঃ আর যাই হোক যে মেয়ে প্রেমাস্পদের অদর্শনে বিরহ-তাপ অনুভব করে না, তার ভালবাসার মূল্য দিয়ে তাকে জীবনসঙ্গিনী করা চলে না—উচিতও নয়! জানার পরে তো নয়-ই।

কিন্তু কেন এমন হয়? সমর কি সান্ত্বনা পায়? না, থাক্ কোন সান্ত্বনার দরকার নেই—সামান্য একটা মেয়ের জন্যে এত কাতর হওয়ার কোন মানে হয় না, বিশেষ করে সমরের মত যারা অকাতরে মানুষ মারার নৃশংসতায় মেতে উঠতে পারে। সৈনিকের চরিত্রে হৃদয়াবেগের স্থান কোথায়? না না, এ দুর্বলতা। দ্রুত মানুষ মারার কলা-কৌশল আয়ত্ত করায় প্রত্যক্ষ মানুষমারার কৃতিত্বে সমরের পদোন্নতি হ'য়েছে সেকেণ্ড লেফ্‌টন্যান্ট থেকে কেপ্টেন! আরো উন্নতি করবার আশা রাখে সমর। অলকা যদি সরে যায় এমন কি আর ক্ষতি হবে! অনেক ভালবাসার ধন তো মানুষ নির্মম হাতে গুঁড়িয়ে দিতে শিখিয়েছে—এ যুদ্ধে প্রতিদিন কত 'হিউম্যান ভ্যালুস' তো থেঁৎলে দেওয়া হলো! তবুও—

এখন বাবার প্রস্তাবে রাজি হ'লে কি তাকে ভোলা যাবে? নদীর স্রোতের মত মনটা একই স্রোতে বারবার অবগাহন করবে কি? মনে রাখা সহজ, না ভুলে যাওয়া সহজ—মনের ও-দুটো প্রক্রিয়া কি একই? কে জানে, ভোলবার জন্যে অলকা এমনি দ্বন্দ্বে পড়েছিল কি না—তার ভুলে-থাকাটা সহজ হ'য়েছে কি না! সে ভুলতে পেরেছে কিনা?

বাবা কি অলকাকে শুধু যতীনবাবুর মেয়ে বলে' আমল দিতেন, সহ্য করতেন—সমরের 'ভাবী কেউ' বলে মনে করতেন না? মা বোধ হয় জানতেন বাবার মনোভাব তাই, সমরের এখন যেন মনে পড়ছে—খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ পেত না তাঁর ব্যবহারে! বড়ছেলের ছেলেমানুষী সহ্য করার উদারতা তাঁদের ছিল! আজ অলকার অনুপস্থিতিতে এগুলো যেন স্পষ্ট ক'রে মনে হচ্ছে—ছি ছি, কি লজ্জার! আজ অলকার কথা না তুলে যেন অনেক লজ্জার হাত থেকে সে বেঁচে গেছে—উপযুক্ত ছেলের বেহায়াপনায় বাবা-মা বড় মর্মাহত হ'তেন। এ যেন ভাল হয়েছে, সবার সম্মান বজায় আছে! তা হ'লেও—

আশানুরূপ প্রত্যাশা যদি আজ সফল হ'তো, অলকা দেখা করতে নিজে থেকে ছুটে আসতো, বিদায়ের দিনে যে বাচালতা প্রকাশ ক'রেছিল সেই বাচালতা যদি দেশে পৌঁছে সমর দেখতে পেত, তাহ'লে কত খুসী হতো? সেদিন বিদায় দিতে গিয়ে অলকা যেভাবে ধরা দিয়েছিল আজ স্বাগতম্ করতে না এসে তার চেয়ে বেশি যেন সমরকে ধ'রে ফেলেছে—সমর বড় ধরা পড়ে গেছে! বড় পরীক্ষায় পড়েছে সমর!

তা হ'লেও সে বিয়ে করবে না, বাবার প্রস্তাবে রাজি হবে না। এ অলকার জন্যে আক্ষেপ বা না-পাওয়ায় নিরুৎসাহ নয়—এমনিই সে বিয়ে করবে না। রাগ সে করছে না, দুঃখু সে করছে না, অভিমানও সে দেখাচ্ছে না। এর পর আর কিচ্ছুরই মানে হয় না, কোন কিচ্ছুর দরকার করে না। কিন্তু—

(ক্রমশ)
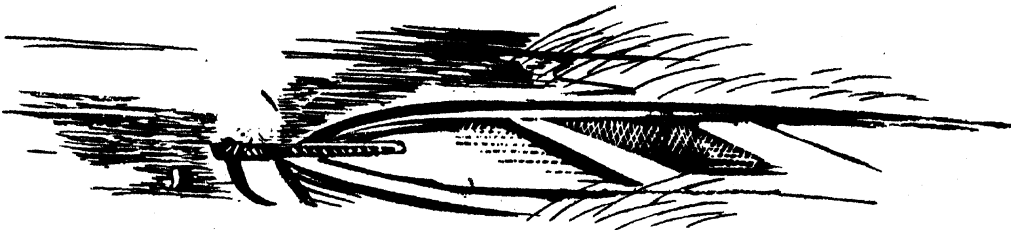
পশ্চিম বঙ্গের অর্থকথা

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ

পশ্চিম বঙ্গের জমি

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট জমির পরিমাণ ১৮,৮৭৫,৯০৯ একরের কম হইবে না। কিন্তু প্রদেশের এই মোট জমির ভিতরে যে সকল জমি ফসল জন্মাইবার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য,—মাত্র ৯,৩৭৪,৩৩২ একর। অর্থাৎ জনসংখ্যার তুলনায় যে স্বল্প পরিমাণ জমি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহারও ৫০% ভাগের কম জমি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। অবশিষ্ট জমি বিভিন্ন কারণে আবাদ করা সম্ভবপর হইতেছে না। প্রথমত, প্রদেশের বনসম্পদ অধিক না হইলেও দার্জিলিং জলপাইগুড়ি—২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে যে অরণ্য অঞ্চল রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ কম পক্ষেও ১,৬৯৭,৫০৪ একর হইবে, স্বভাবতই এই পরিমাণ কৃষির জন্য ব্যবহার করা সহজসাধ্য নহে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩,০৮২,৫৮১ একর জমি রহিয়াছে, যাহা কোনমতেই কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহার করা চলে না। এই সকল জমিতে নদী-খাল-বিল, পথ-ঘাট-বাঁধ, দোকান-বাড়ি-ঘর এবং মন্দির, মসজিদ রহিয়াছে; কাজেই এই সকল জমিকে চাষের পক্ষে একেবারেই অযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তৃতীয়ত, প্রদেশের প্রায় ২,৭৮৭,৪৮৩ একর ভূমি বিভিন্ন কারণে অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত না হইবার প্রধান কারণ কৃষিজনিত জমির অপচয় এবং ভিটা পশুচারণক্ষেত্র জঙ্গল মাঠ প্রভৃতির অবস্থান। এই শ্রেণীর জমির ভিতরে অন্তত ১১,৬৯৯ একর জমি রহিয়াছে, যাহা সহজেই আবাদ করা চলে। চতুর্থত, এই সকল জমি ছাড়াও প্রদেশে যে সকল জমি বর্তমানে "পতিত" অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং যাহা সহজেই আবাদ করা চলে, তাহার পরিমাণও ১,৯৩৪,০০৯ একরের কম হইবে না। ১

জমির ব্যবহারের প্রকারভেদ অনুযায়ী প্রদেশের মোট জমিকে যে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, প্রয়োজনের তুলনায় প্রদেশের জমির পরিমাণ সামান্য হইলেও ইহার অধিকাংশই অধিবাসীদের অজ্ঞতা ও অবহেলার জন্য উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইতেছে না। বলা বাহুল্য, যে সকল জমি কৃষির উপযোগী অথচ কৃষিব্যবস্থার ত্রুটির জন্য যাহার অপচয় ঘটিতেছে, অথবা একেবারেই ব্যবহৃত হইতেছে না, সেই সকল জমিকে কৃষির অন্তর্ভুক্ত করিলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিসম্পদ সহজেই বৃদ্ধি পাইতে পারে।

প্রদেশের কৃষিসম্পদ

পশ্চিমবঙ্গে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৯,৩৭৪,৩৩২ একর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন জমি বৎসরে একাধিকবার ব্যবহৃত হয় বলিয়া বৎসরে মোট চাষের জমির পরিমাণ কিছু বেশী দেখা যাইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসলের জন্য প্রায় ১০,৩০০,৬৮৫ একর জমি ব্যবহৃত হইয়াছে। অবিভক্ত বাঙলায় মোট জমির তুলনায় চাষের জমির অনুপাত অনেক বেশী ছিল। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মোট জমির ৫০% ভাগেরও কম জমি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে, অবিভক্ত বাঙলায় সেখানে প্রায় ৬২½% জমি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইত। বৎসরে একাধিকবার ব্যবহৃত হইতেছে, এইরূপ জমির হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, অবিভক্ত বাঙলার ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমির ভিতরে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ একর বা ৭১% ভাগ জমি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।২

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে যে জমি ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার ভিতরে কোন্ কোন্ ফসলের জন্য কি পরিমাণ জমির প্রয়োজন হইতেছে, তাহারও একটি হিসাব দেওয়া চলে। ১৯৪৩-৪৪ সালে মোট ১ কোটি ৩ লক্ষ একর ব্যবহৃত জমির ভিতরে ৬৪ লক্ষ ৬০ হাজার একরের বেশী জমি আঘানী বা আমন ফসলের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে; ১৪ লক্ষ ৫৩ হাজার একর জমিতে রবিশস্যের চাষ দেওয়া হইয়াছে এবং অবশিষ্ট প্রায় ২৪ লক্ষ একরে ভাদই শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। ১ বিভিন্ন জেলায়, এমন কি একই জেলার বিভিন্ন মহকুমায়, এই সকল শস্য বপন এবং সংগ্রহের সময়ে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় সত্য; কিন্তু এই তারতম্য সাধারণত দুই মাসের বেশী হয় না।

বিভিন্ন শস্য বপন এবং সংগ্রহের সময় অনুসারে মোট ব্যবহৃত জমিকে যেরূপ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা সম্ভবপর; সেইরূপ বিভিন্ন কৃষিদ্রব্যের জন্য কত জমি ব্যবহৃত হইতেছে, তাহারও হিসাব সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রধানত পাঁচ প্রকার: খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, আঁশ ও তন্তুজাতীয় পদার্থ, ঔষধ ও নেশাজাতীয় পদার্থ এবং ফল (ইক্ষুসহ) ও শাকসব্জী। এই সকল বিভিন্ন কৃষিদ্রব্যের জন্য কি পরিমাণ জমি ব্যবহৃত হইতেছে, এইবারে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

খাদ্যশস্য—ধান

১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৯১ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ভিতরে গম উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার একর; ইহা ছাড়া ৬৩ হাজার একর জমিতে বার্লি, ৫ হাজার একর জমিতে জোয়ার, ২½ হাজার একর জমিতে বজরা, ১ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে আটা, ২ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে ডাল উৎপন্ন হইয়াছে। অবশিষ্ট ৮১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে বিভিন্নপ্রকার ধানের চাষ হইয়াছিল। ২

১৯৪৩-৪৪ সালে ৮১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে বিভিন্ন প্রকার ধানের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ১১ লক্ষ মণ। ১৯৪৬-৪৭ সালে সরকারী পূর্বাভাষ অনুসারে প্রদেশে ৯০ লক্ষ একরের বেশী জমিতে ১০ কোটি ৮৫ লক্ষ মণ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের সরকারী পূর্বাভাষ অনুসারে আবাদী জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ উভয়ই কিছু হ্রাস পাইয়াছে।৩ সম্প্রতি বাঙলা সরকারের দপ্তর হইতে ১৯৪৮ সালের উৎপাদন ১০ কোটি ৮১ লক্ষ মণ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ৪ এই হিসাব ১৯৪৪-৪৫ সালে 'প্লট টু প্লট আনুমারেশন'-এর ভিত্তিতে নেওয়া হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট' সম্প্রতি নমুনা সংগ্রহের ভিত্তিতে যে হিসাব প্রকাশ

---

1. Statistical Abstract, West Bengal, P. 35.

2. Land Revenue Commission Report Vol. II P. 88. Famine Enquiry Commission Report (Bengal). Statistical Abstract, West Bengal, 1947, P. 35.

1. Statistical Abstract, West Bengal, 1947.

2. Season and Crop Report of Bengal.

3. Official Forecasts, Govt. of Bengal.

৪। এই হিসাব বাঙলা সরকারের দপ্তর হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

করিয়াছে, তাহাতে বর্তমান বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ৯ কোটি ৭০ লক্ষ মণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহাই হউক, পশ্চিমবঙ্গে গড় উৎপাদন ১০ কোটি মণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, অবিভক্ত বাঙলায় মোট ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল, ৯৭ লক্ষ টন বা প্রায় ২৮ কোটি মণ। পূর্ব বাঙলায় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬২½ লক্ষ টন বা ১৭ কোটি মণের কিছু বেশী; পশ্চিম বাঙলার উৎপাদন ১০।১১ কোটি মণের বেশী হইবে না, পূর্বেই বলা হইয়াছে। আবাদী জমির হিসাব করিলেও দেখা যাইবে, অবিভক্ত বাঙলার ধান্যের জন্য যে জমি চাষ করা হইত, তাহার ⅓ অংশ পশ্চিম বাঙলায় রহিয়াছে। বাকী ⅔ অংশ বা প্রায় ৭০% ভাগ জমি পূর্ব বাঙলায় অবস্থিত।

এইবারে প্রদেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে। বাঙলা দেশের প্রতি একর জমির উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য বিভিন্ন বৎসরে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারত সরকারের একটি হিসাব অনুসারে, ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙলাদেশে প্রতি একর জমির উৎপাদন ছিল মাত্র ৬৫২ পাউন্ড এবং ১৯৪৩-৪৪ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৯৯৪ পাউন্ড। ১ যাহাই হউক, পূর্ব বাঙলার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের জমির উৎপাদিকা শক্তি যে কিছু কম হইবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। বাঙলা সরকারের একটি হিসাব অনুসারে পশ্চিম বাঙলায় একর প্রতি উৎপাদন মোটামুটিভাবে ৯০০ পাউন্ড বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ২

কিন্তু অবিভক্ত বাঙলার ন্যায় পশ্চিম বাঙলার সকল ধানই একপ্রকার নহে। বপন এবং সংগ্রহের সময়ে তারতম্য অনুসারে সাধারণ ফসলের ন্যায় উৎপন্ন ধানকেও তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ধানের প্রকারভেদ অনুযায়ী জমির উৎপাদিকা শক্তিতেও তারতম্য দেখা যায়। প্রথমত, আমন বা শীতকালীন ধান; আঘানী ফসল বলিয়া বর্ষাকালে বীজ বপন করিয়া সাধারণত শীতকালে এই ধান সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয়ত, বরো বা গ্রীষ্মকালীন ধান। রবিশস্য বলিয়া শীতকালে বপন করিয়া শরৎকালে এই ধান সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, আউশ (আশু) বা শরৎকালীন ধান ভাদই ফসল; কাজেই, গ্রীষ্মকালে বীজ বপন করিয়া শরৎকালে এই ধান সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এই তিন শ্রেণীর ধানের ভিতরে আমন ধানই সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। মোট

1. Food Statistics of India, Govt. of India.

2. Plot to Plot Emunration, 1944-45, Govt. of Bengal.

উৎপাদনের ৯।১০ ভাগই আমন ধান; অর্থাৎ ১০ কোটি মণ ধানের ভিতরে প্রায় ৯ কোটি ২০ লক্ষ মণই আমন ধান। মোট আবাদী জমিরও প্রায় ৫/৬ ভাগ জমিতে অর্থাৎ প্রায় ৯০ লক্ষ একরের ভিতরে প্রায় ৭৫ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। আমনের পরেই আউশ ধানের স্থান। কিন্তু মোট উৎপাদনের তুলনায় আউশ উৎপাদনের পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। ১৬ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বৎসর ১ কোটি ৬০ লক্ষ মণ আউশ ধান উৎপন্ন হয়। বরো ধানের পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। মাত্র ৪৯ হাজার একর জমিতে ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার মণ বরো ধান ১৯৪৬-৪৭ সালে পশ্চিম বাঙলায় উৎপন্ন হইয়াছে। এই হিসাব ১৯৪৬-৪৭ সালের হইলেও বিভিন্ন প্রকার ধানের আনুপাতিক গুরুত্ব বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ১৯৪৮ সালের সরকারী পূর্বাভাষ অনুসারে অবশ্য বরো ধানের উৎপাদন অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৭ সালে যেখানে ৪৬ হাজার একরে ৪½ লক্ষ মণের বেশী বরো ধান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে ১৯৪৮ সালে ২৫ হাজার একর জমিতে উৎপন্ন বরো ধানের পরিমাণ ২½ লক্ষ মণের কিছু বেশী হইবে। স্বাভাবিক বৎসরে বরো ধানের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৩৩ হাজার একর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১

বিভিন্ন প্রকার ধানের উৎপাদনের পরিমাণে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, পূর্বেই বলিয়াছি। ১৯২২-২৩ সাল হইতে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত যে সকল পাঁচসালা হিসাব লওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বাঙলাদেশের প্রতি একর জমিতে যে পরিমাণ আমন ধান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে ১২½ মণ হইতে ১৩½ মণ ছাঁটা চাউল পাওয়া যাইতে পারে। ১৯৩৫-৩৬ সালেও উৎপাদনের পরিমাণ, বাঙলা সরকারের হিসাব অনুসারে, একর প্রতি ১৩½ মণ ছিল।২ ১৯৩৩-৩৪ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত উৎপাদনের যে হিসাব লওয়া হইয়াছে, তাহাতেও উৎপাদনের পরিমাণ ১২ মণের কিছু বেশী হইয়াছে।৩ প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন আউশ ধান ১০ মণ ৩০ সের হইতে ১২½ মণ ছাঁটা চাউল পাওয়া যাইতে পারে। বরো ধানের ক্ষেত্রে ইহার পরিমাণ ১৩½ মণ হইতে ১৫ মণ পর্যন্ত হইয়া থাকে। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত উৎপাদনের হিসাব অনুসারে, প্রতি একর জমিতে আউশ ১১ মণ

1. Forecast of Rabi Crops of West Bengal for 1947-48, Calcutta Gazette Aug. 19.

2. Bengal Season and Crop Report. Report of the Land Revenue Commission, Bengal, P. 89.

3. Agricultural Statistics, 1938-39 Vol. I, P. 314.

১০ সের পাওয়া যায়; বরো চাউলের পরিমাণ ১৩ মণের কিছু কম হইবে।৪ যাহাই হউক, মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে আউশ ধান অপেক্ষা আমন ধান উৎপাদনে জমির উৎপাদিকা শক্তি বেশী পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে উৎপন্ন ধানের সরকারী হিসাব এবং বিবরণী হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়। পশ্চিম বাঙলায় প্রতি একর জমিতে উৎপন্ন আউশ চাউলের পরিমাণ ১০ মণ ৩৬ সের, আমন চাউলের পরিমাণ ১২ মণ ১৬ সের এবং বরো চাউলের পরিমাণ ১৩ মণ ২৪ সের বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ৫

পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের ভিতরে মেদিনীপুরের আয়তন যেরূপ সর্ববৃহৎ, সেইরূপ মেদিনীপুরের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী। মোট ৯০ লক্ষ একরের ভিতরে প্রায় ২১ লক্ষ একর কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলাতে চাষ হয়। মোট ১০ কোটি মণ উৎপাদনের ভিতরেও মেদিনীপুরের অংশ ২ কোটি ৬০ লক্ষ মণের কম হইবে না। মেদিনীপুরের পরেই ২৪ পরগণার স্থান। ২৪ পরগণার ১৪ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটি মণ ধান উৎপন্ন হইতেছে। কৃষিজনিত জমির অপচয় সর্বাপেক্ষা বেশী পরিলক্ষিত হয় বাঁকুড়া জেলায়। কৃষিকার্যে ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহৃত হইতেছে না, এইরূপ জমির পরিমাণ (মোট জমির অনুপাতে) বাঁকুড়া জেলায় ১৫·১%, দিনাজপুর জেলায় ১৪·৩% এবং নদীয়া জেলায় ১৪·৬% ভাগ। ১

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, ধান পশ্চিম বাঙলার প্রধান কৃষিদ্রব্য হইলেও পশ্চিম বাঙলার প্রয়োজন অনুপাতে মোটেই যথেষ্ট নহে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, প্রতি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক চাউলের প্রয়োজন ১৬ আউন্সের কম হইবে না। বোম্বাই পরিকল্পনা, ভোর কমিটির সুপারিশ কিংবা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের বিবরণীতেও প্রায় ১৬ আউন্সই নিত্যপ্রয়োজনীয় মূলে খাদ্য হিসাবে ধরা হইয়াছে। ২ এই হিসাব অনুসারে নূতন প্রদেশের প্রয়োজন (পূর্ণবয়স্কদের প্রয়োজন অনুযায়ী) মোটামুটিভাবে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ মণ কিংবা ১১½ কোটি মণের কম হইবে না। প্রদেশের বর্তমান উৎপাদন ১০ কোটি মণ

8. Bengal Season and Crop Report. Report of the Land Revenue Commission, Bengal P. 89 Agricultural Statistics, 1938-v9 Vol. I.

5. Quinquennial Report on the Crop-cutting expriments; Forecast of Rabi Crops.

1. Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. II P. 88.

2. Famine Enquiry Commission, Report Vol. II P. 106 Bhore Committee Report (Vol. I P. 56).

ধরিয়া লইলে ঘাটতির পরিমাণ অন্তত ১½ কোটি মণ হইবে। ১৯৪৬-৪৭ কিংবা ১৯৪৭-৪৮ সালের বর্ধিত উৎপাদনের হিসাব অনুসারেও প্রদেশের ঘাটতির পরিমাণ ৬৫।৭০ লক্ষ মণের কম হইবে না।

ডাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য

পশ্চিম বাঙলার উৎপন্ন খাদ্যশস্যের ভিতরে ধানের পরেই ডালের স্থান; কেবলমাত্র মটর-কলাই জাতীয় ডালই ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিম বাঙলায় ২ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে চাষ করা হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রায় ২ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে ডালের চাষ হইয়াছে। ধানের পরে অন্য কোন খাদ্য-শস্যের জন্য এত অধিক পরিমাণে জমি ব্যবহৃত হয় না। প্রতি একর জমিতে সাধারণত ১ মণ ৩০ সের ডাল উৎপন্ন হয়। এই হিসাব অনুসারে গত বৎসর প্রদেশে ১৫ লক্ষ ৬৮ হাজার মণ এবং বর্তমান বৎসরে ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ ডাল উৎপন্ন হইয়াছে। ডাল চাষ করিবার পক্ষে নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের জমি বিশেষ উপযোগী। পূর্বেকার নদীয়া জিলাতে অবিভক্ত বাঙলার মোট উৎপাদনের প্রায় ২৮% ভাগ উৎপন্ন হইত। বর্তমানে ডাল উৎপাদনে মুর্শিদাবাদের স্থান সর্বপ্রথম; ১৯৪৭-৪৮ সালে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার একর জমিতে ডাল উৎপন্ন হইয়াছে।৩ কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে মটর কিংবা কলাই ছাড়াও মসুর, মুগ, মাস-কলাই, খেসারী, অড়হর প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার ডাল উৎপন্ন হয়। যে সকল জমিতে ডাল উৎপন্ন হয়, তাহা ধরিলে ডালের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ আরও অনেক বেশী হইবে। ১৯৪৩-৪৪ সালেই ৭ লক্ষ একরের বেশী জমিতে ডাল এবং ডাল জাতীয় অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট যে বিবরণী প্রচার করিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, প্রদেশের প্রায় ৯ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে ৬১ লক্ষ ৪৩ হাজার মণ ডাল এবং ডাল জাতীয় খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইনস্টিটিউটের মতে, প্রদেশের বার্ষিক প্রয়োজন কিছুতেই ১½ কোটি মণের কম হইবে না। ৪

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যসমূহের ভিতরে ধান এবং ডালের পরেই ভুট্টার স্থান; ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছে। ভুট্টা উৎপাদনে দার্জিলিং-এর স্থান সর্বপ্রথম; প্রায় ৬৬ হাজার একর জমি কেবলমাত্র ভুট্টার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, জলপাইগুড়ি, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, এমন কি, হাওড়া হুগলী জিলাতেও সামান্য পরিমাণে ভুট্টা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিম বাঙলায় উৎপন্ন অন্যান্য খাদ্যশস্যের ভিতরে গম, বার্লি, জোয়ার এবং বজরা প্রধান। ১৯৪৩-৪৪ সালে ১ লক্ষ ১৩ হাজার একরে গম, ৬৩ হাজার একরে বার্লি, ৫ হাজার একরে জোয়ার এবং ২½ হাজার একর জমিতে বজরা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে সরকারী পূর্বাভাষ অনুসারে, ৪২ হাজার একর জমিতে বার্লি উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতি একর জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ ১০ মণ ৩০ সের ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৩০ হাজার মণ হইবে। ১ বর্তমান বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার একর জমিতে বার্লি এবং জোয়ারের চাষ করা হইয়াছে; উৎপাদনের পরিমাণ ১১ লক্ষ মণের কম হইবে না। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের মতে, প্রদেশের বাৎসরিক প্রয়োজন ৭২ লক্ষ মণ; অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে ৬১ লক্ষ মণ হইবে। ২ ১৯৪৭-৪৮ সালের সরকারী পূর্বাভাষ অনুসারে, প্রদেশে মোট ১৬ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে; গত বৎসর ১ লক্ষ ৮৪ হাজার একর জমিতে গম চাষ করা হইয়াছিল।৩

3. Forecast of Rabi Crops of West Bengal for 1947-48. Season and Crop Report of Bengal.
4. West Bengal Crop Survey, I.S.I., Calcutta.

1. Forecast of Rabi Crops of West Bengal, 1947-48, Calcutta Gazette Aug. 19.
2. West Bengal Crop Survey, I.S.I., Calcutta.
3. Forecast of Wheat Crop of West Bengal. Supplement to Calcutta Gazette, Aug. 5, 1948.

Now that we are free—জনৈক ভারতীয় গ্রামবাসী লিখিত। সরস্বতী সদন, বাঁকীপুর, পাটনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—তিন টাকা।

আলোচ্য ইংরেজী গ্রন্থখানিতে লেখক স্বাধীনতালাভ করিবার পর ভারতের পক্ষে যেসব সমস্যা দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং একমাত্র মানবতার পথেই যে সব সমস্যার সমাধান হইতে পারে, ইহাই প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। গ্রন্থকার পরমহংস রামকৃষ্ণ এবং গান্ধীজীর মতবাদের অনুরাগী। তাঁহার মতে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মর্মবাণী তাঁহাদের জীবনে অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রসংগক্রমে গ্রন্থকার সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, কমিউনিষ্ট মতবাদ, বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই অবতারণা করিয়াছেন এবং প্রধানত সাম্যমূলক সামঞ্জস্য সাধনের পথেই তাঁহার বিচারের গতি প্রসারিত হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঞ্চারিত বিষ আমাদের রাষ্ট্রনীতিক এবং সমাজজীবনের দুর্গতির মূল কারণ বলিয়া গ্রন্থকার নির্দেশ করিয়াছেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে সম্পর্কচ্ছেদনের তিনি পক্ষপাতী। সে সাম্রাজ্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিলে আমাদের স্বাধীনতার কোন অর্থ হইবে না ইহাই তাঁহার অভিমত। গ্রন্থকার গ্রাম সংগঠনের ভিতর দিয়াই রাষ্ট্রজীবনকে বিকসিত করিয়া তুলিবার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। উপসংহারে লর্ড পেথিক লরেন্সের নিকট গ্রন্থকারের লিখিত একখানা পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। সুদীর্ঘ এই পত্র-খানিতে গ্রন্থকারের গভীর স্বদেশপ্রেম এবং রাজনীতিক উদার-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় এবং আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীযুক্ত রমাপতি বিশ্বাস এই গ্রন্থের গ্রন্থকার। ইনি বাঙলা সাহিত্যে নবাগত নহেন। রমাপতিবাবুর পুস্তকখানিতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনের অনেক খোরাক পাইবেন।

অন্তর্লোকযাত্রী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক ৩৩নং হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

লেখক বাঙালী বৌদ্ধসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। 'সম্বোধির পথের' লেখক হিসাবে তিনি বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রেও সুনাম অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সাধনার আলোচনা দ্বারা মৈত্রী, করুণা, উদার এবং সার্বভৌমতত্ত্বের রসরূপের রহস্য উদ্ঘাটন চেষ্টা করিয়াছেন। চিন্তাশীল সমাজে এ পুস্তকের আদর হইবে।

ভজন-কীর্তন—কবি-কিংশুক-কৃত (বিনা মূল্যে বিতরিত)। লীলামৃত কার্যালয়, ৪১সি, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

রচনা সরস মাধুর্যপূর্ণ এবং কীর্তনের পক্ষে উপযোগী।

শ্রীউদ্ধব সংবাদ:—গত সপ্তাহের 'দেশে' যে 'শ্রীউদ্ধব সংবাদ' গ্রন্থের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, উহার প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, ২৯বি, হাজরা রোড, কলিকাতা।

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—**শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়**

[পূর্বানুবৃত্তি]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(এক)

এলিয়ট তার লেফট্ ব্যাংকের প্রশস্ত বাসভবনে মাতুরিণদের প্রতিষ্ঠিত করে বর্ষশেষে রিভেয়ারায় ফিরে এল। এলিয়ট তার বাড়িখানি নিজস্ব মনোমত করে তৈরী করেছিল, সেখানে যে পরিবারের সংখ্যা চারে পৌঁছবে তাদের স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন, তাই ইচ্ছা কর্‌লেও সে ওদের এখানে রাখতে পার্‌ত না, আর আমার মনে হয় তারজন্য ওর অন্তরে কোনো অনুতাপ ছিল না। ও জান্‌ত যে, মানুষ হিসাবে একা অনেকের কাছেই সংগী হিসাবে সে বাঞ্ছিত, কিন্তু ভাগ্নী বা ভাগ্নে জামাই সমেত সে সমাদর অদৃষ্টে জুট্‌বে না। তাছাড়া যে সব ছোটখাটো পার্টির সে মাঝে মাঝে আয়োজন করত, (যার জন্য সে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করত) সেইসব পার্টিতে যদি দুটি বাড়ির অতিথির ব্যবস্থা রাখ্‌তে হয়, তাহ'লে তার বৈশিষ্ট্যই থাকে না।

"ওদের পক্ষে প্যারীতে থিতু হয়ে এখানকার সভ্যজীবনের সংগে পরিচিত ও অভ্যস্ত হওয়াই ভালো হবে। মেয়ে দুটির স্কুলে যাবার বয়স হয়েছে, আর আমার বাসার কাছাকাছি শুনেছি একটা বেশ ভালো দরের স্কুল আছে।"

এর ফলে বসন্তকালের আগে আর ইসাবেলের সংগে আমার দেখা হয়নি, সেই সময় দু'একটা কাজের জন্য কয়েক সপ্তাহ প্যারীতে কাটানোর প্রয়োজন হয়। আমি প্যারী গিয়ে প্লাস্ ভঁদমের অতি নিকটস্থ একটি হোটেলে দুটি কামরা নিয়েছিলাম। আমি এই হোটেলটিতে নিয়মিত যাতায়াত কর্‌তাম, শুধু এর সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য নয়, এর একটা নিজস্ব ধারা ছিল বলে। বেশ বড় প্রাংগণের ওপর নির্মিত প্রকাণ্ড একটি প্রাচীন বাড়ি, প্রায় দু'শ' বছরের ওপর এটি সরাই হিসাবে চালু আছে। বাথরুমগুলি জাঁকজমক-হীন আর জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়—শয়নঘরের শাদা রঙকরা লোহার খাট আর প্রকাণ্ড জানলা দরজার ভিতর কেমন একটা দারিদ্র্যের চিহ্ন বর্তমান; কিন্তু আসবাবপত্র ছিল চমৎকার। সোফা, আরাম কেদারা, প্রভৃতি দ্রব্যগুলি তৃতীয় নেপোলিয়নের সময়ের, আর তেমন আরামদায়ক না হ'লেও তাদের ভিতর একটা মাধুর্য আছে। এই ঘরটিতে আমি ফরাসী ঔপন্যাসিকদের অতীতের একটা আবহাওয়া পেতাম। প্লাস-কেসের ভিতর থেকে আমি যখন এম্পায়ার ক্লকটি দেখ্‌তাম, তখন ভাব্‌তাম হয়ত সুচারু পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত কোনো সুন্দরী রমণী রাস্তিগনাকের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করার সময় এই ঘড়ির কাঁটা লক্ষ করে গেছেন। এই সম্ভ্রান্ত দুঃসাহসী নায়কের কাহিনী ব্যালজাক্ তাঁর সামান্য প্রাথমিক অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থায় লিখিত বিবিধ উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। ডাঃ বিয়াঁকন্ এতই জীবন্ত ছিলেন যে, ব্যালজাক্ মৃত্যুকালে বলেছিলেন, "বিঁয়াকনই আমাকে বাঁচাতে পারেন।" আইনগত পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মফঃস্বলাগত কোনো বিধবা গৃহিনীর সাময়িক ব্যাধি উপলক্ষে হয়ত সেই ডাক্তার বিঁয়াকন এই হোটেলের কোনো কক্ষে এসে রোগিনীর নাড়ি টিপে গেছেন। ঐ টেবলের ওপর হয়ত কোনো প্রেমোন্মাদিনী নারী ক্রিনোলিনের পোষাকে সজ্জিত হয়ে তাঁর বিশ্বাসঘাতক প্রণয়ীকে আবেগভরে চিঠি লিখেছেন বা সবুজ ফ্রককোট পরা কোনো মোটাসোটা ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ হয়ত তার উচ্ছৃংখল পুত্রকে কড়া চিঠি লিখেছেন।

এখানে আসার পরদিন ইসাবেলের বাসায় গিয়ে পাঁচটার সময় এলে এক কাপ চা পাওয়া যাবে কি না জান্‌তে চাইলাম। ওকে দেখার পর দশ বছর কেটে গেছে। আমাকে বাট্‌লার যখন ভিতরে নিয়ে গেল, তখনও একখানি ফরাসী উপন্যাস পড়্‌ছিল,—আমাকে দেখে অত্যন্ত আন্তরিকতাভরে ও করমর্দন করে মনোহর ভংগিমায় হেসে অভ্যর্থনা জানালো। আমি বড় জোর দশ বারো বার দেখেছি, তাও শুধু দু'বার নিরালায়, কিন্তু ওর ব্যবহারে বোঝা গেল আমাকে সে সাময়িকস্বল্পপরিচিত হিসাবে গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করেছে পুরাতন বন্ধু হিসাবে। যে দশ বছর অতীত হয়েছে তার ভিতর একজন তরুণী ও মধ্যবয়সীর ব্যবধান-টুকু কেটে গেছে, আমরা উভয়েই এখন আর বয়সের ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন নই। সাংসারিক স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক সূক্ষ্ম তোষামোদে ও আমার সংগে সমবয়সীর মত ব্যবহার করল, আর পাঁচ মিনিটের ভিতর আমরা এমন অন্তরংগ ও ঘনিষ্ঠভাবে কথা বল্‌তে লাগ্‌লাম—যেন আমরা উভয়ে বাল্য-কালের খেলার সাথী, আমাদের পারস্পরিক দেখাশোনা যেন অব্যাহত গতিতেই হয়ে আস্‌ছে। স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মসংযম ও একটা নির্ভরতা অভ্যাস করেছে ইসাবেল।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে আমার মনে লাগ্‌ল, ওর দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন। ওকে বেশ চমৎকার গোলগাল মেয়ে হিসাবে দেখেছিলাম মনে পড়ে, মোটা হয়ে ওঠারই সম্ভাবনা ছিল ওর। জানি না সেই সম্ভাবনায় সচেতন হয়ে ইসাবেল কৃশাংগী হওয়ার সাধনা করেছে না সন্তানধারণের ফলেই এই আকস্মিক অথচ মনোহর পরিবর্তন ঘটেছে—এখন এমনই তন্বী ওর আকৃতি যে এর অধিক আর কিছু আশা করা যায় না। সাময়িক রীতি আরো সাহায্য করেছে। কালো পোষাক পরেছে ইসাবেল, এক নজরেই লক্ষ্য কর্‌লাম খুব সাধারণ ও খুব সৌখীন না হলেও প্যারীর শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ নির্মাতাদের হাতে তৈরী সেই সিল্কের মূল্যবান পোষাক স্ত্রীজনসুলভ অমনোযোগীর ভংগীতেই সে পরেছে। দশ বছর আগে এলিয়টের উপদেশ সত্বেও ওর ফ্রকগুলি জম্‌কালো হ'ত আর সেগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে সে পরতে পারত না। মেরী লুইসী দ্য ফ্লোরিমন্দ এখন আর বল্‌তে পারে না যে, ইসাবেলের পালিসের অভাব আছে। গোলাপী রঙে রঞ্জিত ওর আঙুলের নখের ডগায় পর্যন্ত ওর পালিস ও জৌলুষ। ওর মুখাকৃতি সুন্দর হয়ে উঠেছে, ওর অমন সুন্দর টিকোলা নাক আর কোনো স্ত্রীলোকের মুখের পর আমিত দেখিনি। কপালের ওপর বা চোখের নীচে এতটুকু কুঞ্চন রেখা নেই, প্রথম যৌবনের আভা গায়ে না থাকলেও গাত্র-চর্ম চমৎকার হয়ে উঠেছে। হয়ত এখন লোশন, ক্রীম ও মাসাজের ফলেই এই মনোহারিত্ব সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এ সব জিনিস ওর দেহে এমন একটা স্বচ্ছ মাধুরী এনেছে যা বিশেষ আকর্ষণীয়। ওর শীর্ণ গালে অতি ক্ষীণ রুজ মাখানো আর মুখখানি বেশ বিবেচনা সহকারে চিত্রিত করা হয়েছে। সাময়িক ফ্যাসন অনুসারে উজ্জ্বল বাদামী রঙের চুল 'বব্' করা হয়েছে। ওর হাতে কোনো আঙটি নেই, মনে পড়্‌ল এলিয়ট বলেছিল ওর সমস্ত অলংকার বিক্রী করতে হয়েছে। ওর হাত দুখানি খুব ছোট

না হলেও সুঠাম। সেই কালে মেয়েরা দিবা-ভাগে খাটো ঝুলের ফ্রক্ পরতো, আমি স্যাস্পেন রঙের মোজায় ঘেরা ওর পা দুটি লক্ষ্য কর্লাম—বেশ লম্বা, পাতলা ও সুগঠিত। বহু সুন্দরী স্ত্রীলোকের পা হয়ত তেমন ভালো হয় না, ইসাবেলের পা, বালিকা বয়সে যা অশোভন ছিল, তা এখন অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, অপূর্ব গায়ের রঙ ও উচ্চাংগের মনোভংগী একদা যে বালিকাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল আজ সে পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। তার এই সৌন্দর্যের পিছনে শিল্প, নিয়মানুবর্তিতা ও ও কৃচ্ছ্র সাধন যে কিছু পরিমাণে প্রচ্ছন্ন আছে সেটা বড়ো কথা নয়। এর প্রতিক্রিয়া অতি সাফল্যজনক হয়ে উঠেছে। তার ভংগিমার মনোহারিত্ব, আচরণের স্বাচ্ছন্দ্য হয়ত চেষ্টাকৃত —কিন্তু তাহলেও তার ভিতর একটা সম্পূর্ণ স্বতঃউৎসারিত স্বচ্ছতা লক্ষিত হ'ত। আমার ধারণা হল, গত চার মাসকাল প্যারীতে অবস্থানের ফলে দীর্ঘদিন ধরে যে শিল্প সামগ্রী তিলে তিলে গড়ে উঠ্ছিল তা অপূর্ব সম্পূর্ণতার শেষ স্পর্শ লাভ করেছে। বিশ্লেষকের তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়েও এলিয়টও তাকে অপছন্দ কর্তে পার্বে না, আর আমি—সহজে সন্তুষ্ট হবার পাত্র নই—আমার কাছেও ওর এই রূপ উদ্ভ্রান্তিকর।

গ্রে মর্ট ফন্তেনে গলফ্ খেলতে গেছে, কিন্তু ইসাবেল আমাকে বল্ল যে, সে এখনই এসে পড়্বে।

"আর আমার মেয়ে দুটিকেও দেখ্তে পাবেন, ওরা "তুইলেরী গার্ডেনে" গেছে, এখনই ফির্বে,—লক্ষ্মী মেয়ে।"

আমরা নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা কর্তে লাগলাম। প্যারীতে এসে ওর ভালো লাগছে আর এলিয়টের বাসায় ওরা বেশ আরামেই আছে। ওদের এখানে ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে যাদের ওরা পছন্দ কর্তে পারে এমন কয়েক-জনের সংগে এলিয়ট আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—ইতিমধ্যেই ওদের পরিচিতের একটা সুন্দর গোষ্ঠী হয়ে উঠেছে। সে ওদের বলে গেছে, ওর মত জাঁকজমকের সংগে এদের আদর আপ্যায়ন কর্তে।

ইসাবেল বলে ঃ "জানেন, এভাবে ধনীর মতো চলতে আমার যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়, অথচ আসলে আমরা একেবারে দেউলিয়া।"

"সত্যই কি তাই।?"

ইসাবেল মুখ টিপে হাসে, দশ বছর পূর্বে যে আনন্দ উজ্জ্বল হাল্কা হাসি ওর মুখে দেখেছিলাম তা এখন আমার মনে পড়ে।

"গ্রে'র একটি পয়সাও নেই, লারী যখন বিবাহের প্রস্তাব করে, তখন তার যে আয় ছিল এখন আমাদের ঠিক ততটুকু আয়, তার ওপর দুটি সন্তান হয়েছে,—ব্যাপারটি কৌতুকাবহ নয় কি?

"এর অন্তর্নিহিত রস যে তুমি ধরতে পেরেছ, তা জেনে আমি খুসী হলুম।"

"লারীর কিছু খবর জানো?"

"আমি? না—তোমরা শেষবার যখন প্যারীতে এসেছিলে তারপর আর তাকে দেখিনি। ওর পরিচিত দু'একজনকে জান্তাম, তাদের কাছে জান্তে চেয়েছি ওর খবর, সেও অনেক দিনের কথা। কেউই কিছু জানে না। ও যেন উবে গেছে।"

"সিকাগোয় যে ব্যাঙ্কে ওর টাকা আছে তার ম্যানেজারকে আমরা জানি, তিনি আমাদের বলেছেন, অদ্ভুত ধরণের জায়গা থেকে টাকার জন্য চিঠি আসে—চীন, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবীটা ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হয়।"

আমার জিভের ডগায় যে প্রশ্ন এসেছিল তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ইতস্ততঃ করলাম না, কিছু জানার থাকলে সোজাসুজি তা বলে ফেলাই ভালো।

"এখন কী তোমার মনে হয় লারীকে বিয়ে করলেই হ'ত?"

ইসাবেল হাসল ঃ গ্রেকে পেয়ে আমি ভারী সুখী হয়েছি। স্বামী হিসাবে ও অপূর্ব! জানেন ত বিভ্রাট ঘটবার সময় পর্যন্ত আমরা উভয়ে চমৎকারভাবে দিন কাটিয়েছি, আমরা একই ধরণের লোকজন পছন্দ করি, একই ধরণের কাজ করি—ভারী মধুর ওর স্বভাব। আর ওর কাছে আদর পেতে চমৎকার লাগে; প্রথম যখন বিবাহ হয়েছিল এখনও তখনকার মতই ও আমাকে ভালবাসে। ওর ধারণা আমি পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব রমণী। ও যে কত সদয় ও বিবেচক ব্যক্তি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। ওর মহানুভবতার তুলনা নেই, ওর ধারণা কিছুই আমার যোগ্য নয়। জানেন, এতদিনের এই বিবাহিত জীবনে ও আমাকে একটিও কটু বা তীক্ষ্ম কথা বলেনি কোনোদিন। আমাদের অসীম সৌভাগ্য!

মনে মনে ভাবলাম, ইসাবেল কি মনে করে এতেই আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে, আমি কথাবার্তার ধারা অন্যদিকে পরিবর্তিত করলাম।

"তোমার মেয়েদের কথা বল।"

এই কথা বলার সংগে দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

"এই ত এসে গেছে, স্বচক্ষে দেখুন।"

এক মুহূর্তের ভিতর ওরা এসে পড়ল, সংগে গভর্নেস—প্রথমে জোন ও পরে প্রিসিলার সংগে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। উভয়েই আমার হাতটি তুলে নিয়ে সামান্য আন্দোলিত করল। একজনের বয়স আট, অপরার ছয়। বয়সের অনুপাতে ওরা বেশী লম্বা। ইসাবেলও বেশ লম্বা, আর গ্রের কথা মনে আছে সে ত বিরাটকায়। তবে সকল শিশুই যেমন সুন্দর হয়—এরাও তেমনই সুন্দর। একটু শীর্ণ দেখায়। বাপের কালো চুল ও মার বাদামী চোখ ওরা পেয়েছে। একজন অপরিচিতের উপস্থিতিতে ওরা কুণ্ঠিত নয়—বেশ উৎসাহ সহকারে বাগানে ওদের কার্যাবলীর বিবরণ মার কাছে বলতে লাগল। ইসাবেলের রাঁধুনী চায়ের সংগে যেসব আহার্য দিয়েছিল, আমরা তার একটিও স্পর্শ করিনি, তারা সেদিকে উৎসুক নয়নে তাকাতে লাগল, একটা কিছু তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়াতে কি যে পছন্দ করে নেবে তাই ভেবে আকুল হয়ে উঠল। মায়ের প্রতি ওদের যে কি মমতা তা দেখে ভারী আনন্দ লাগে, ওরা তিনজনে মিলে একটি অপরূপ ছবি। উভয়ে একটি করে কেক নির্বাচিত করে নেওয়ার পর, ইসাবেল তাদের ভিতরে পাঠিয়ে দিল, তারাও বিনা বাক্য ব্যয়ে ভিতরে চলে গেল। আমার ধারণা হল ইসাবেল তাদের মনোমত করে গড়ে তুলতে, ও যা বলে সেই মতই তারা চলে।

ওরা চলে যাওয়ার পর সাধারণতঃ জননীকে তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে যা বলা হয়ে থাকে সেই সব কথাই বললাম, আর ইসাবেল আমার সেই প্রশস্তি বাক্য প্রত্যক্ষভাবে আনন্দ সহকারে হলেও কিঞ্চিৎ সাধারণ ভাবেই গ্রহণ করল। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, গ্রের প্যারী কি রকম লাগছে।

"ভালোই লাগছে, এলিয়ট মামা আমাদের জন্য একখানি গাড়ী দিয়েছেন, গ্রে প্রায় প্রতি-দিনই গলফ্ খেলতে যেতে পারে, তার ওপর ট্রাভলার্স ক্লাবের সদস্য হয়েছে সেখানে গিয়ে ব্রীজ খেলে। এলিয়ট মামার এই ভাবে ও'র বাসায় রেখে আমাদের সাহায্য করাটা অবশ্য ঈশ্বর প্রেরিত সৌভাগ্য। গ্রের স্নায়ুশিরা বিকল হয়ে উঠেছে, তার ওপর মাঝে মাঝে বিশ্রী রকম মাথা ধরে; যদি কোনো কাজ ও পায়, তা হলেও তা করার শক্তি ওর নেই। আর সেই কারণেই ও উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ও কাজ করতে চায়, ওর ধারণা যে, ওর কাজ করা উচিত, আর তা পারে না বলেই নিজেকে ছোট মনে করে। ওর ধারণা যে পুরুষের কাজ করাই কর্তব্য, আর সে যদি কাজ না করতে পারে, তাহ'লে সে মৃতের সমান। বাজারে নেশাখোরের মত আবিষ্ট হয়ে ঘুরছে এই চিন্তা ওর সহ্য হয় না, আর একটা পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এই আশ্বাস দিয়েই ওকে এখানে আসতে রাজী করিয়েছি। তবে জানি যে যতক্ষণ না প্রকৃতপক্ষে কাজ করতে পারবে ততক্ষণ ও কিছুতেই খুসী হতে পারবে না।"

"আমার মনে হয় এই আড়াই বছরকাল তোমাকে বড় দুঃসময়ের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে।"

"জানেন, যখন বিপর্যয়ের খবর এল, তখন প্রথমটা আমি বিশ্বাস করিনি। আমরা যে

সর্বস্বান্ত হব, এ চিন্তা আমার কাছে অচিন্তনীয়। অপরের সর্বনাশ হতে পারে বুঝি, তবে আমাদের যে সর্বনাশ ঘটবে এ একেবারে অসম্ভব। ভাবতে লাগলাম শেষ মুহূর্তে কিছু একটা ঘটবেই আর আমরা বেঁচে যাব—তারপর যখন চরম আঘাত এসে পড়ল, তখন ভাবলাম বেঁচে আর লাভ নেই। ভবিষ্যতের সামনে যে দাঁড়াতে পারব তা ভাবিনি, অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ। একপক্ষকাল অতি যন্ত্রণায় কাটল। সর্বকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে, সকল আমোদ-প্রমোদ চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেল জেনে আমার মনোমত বস্তু বিরহিত হয়ে থাকা, ভগবান জানেন কি নিদারুণ! পক্ষকাল পরে বললামঃ যা হয় হোকগে আর এ সব কথা চিন্তা করবো না। আপনার কাছে শপথ করে বলছি তা করিওনি আর। আর আমার কোনো খেদ নাই, আক্ষেপ নাই। যখন সুদিন ছিল অনেক আমোদ উপভোগ করেছি—এখন সে সব গেছে, সব শেষ হয়েছে!"

"সেই সর্বনাশটা ফ্যাসনেবল সমাজের এই বিলাসবহুল প্রাসাদের নিখরচায় পাওয়া সুযোগ্য বাটলার ও রাঁধুনীর সহায়তায় তা সহনীয় হয়ে উঠবেই, তার ওপর যখন হাড় ক'খানা চ্যানেলের তৈরী পোষাকে ঢাকা যায় কি বল?"

ইসাবেল হাসল—"দশ বছরেও দেখছি আপনার তেমন পরিবর্তন হয়নি, আপনি হয়ত আমাকে বিশ্বাস করবেন না, কারণ আপনি একটি দুঃখবাদী জীব, তবে এটুকু বলব শুধু গ্রে ও আমার মেয়েদের খাতিরেই এলিয়ট খুড়োর এই প্রস্তাব আমি গ্রহণ করেছি। আমার বার্ষিক আটশ-শো ডলারে আমি চাষবাস করে একরূপ কাটিয়ে দিতে পারতাম। আমরা ধান ও রাই শস্যের চাষ করেছি, শুয়োর পুষেছি। আমি ত ইলিনয়ের খামারেই জন্মেছি ও মানুষ হয়েছি।"

আমি হাসলাম—জানতাম নু-ইয়র্কের এক উঁচু দরের ক্লিনিকেই ওর জন্ম হয়েছে। বললামঃ "তা ত বটেই।"

এই সময় গ্রে এসে পড়ল। বারো বছর পূর্বে ওকে মাত্র দু একবার দেখেছি বটে, তবে স্ত্রীর সংগে একত্রে তোলা একটা ফটো দেখেছিলাম, (এলিয়ট সেটি সুইডেনের রাজা, স্পেনের রাণী, ডিউক দ্য গইস প্রভৃতির ছবির সংগে বহুমূল্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে পিয়ানোর ওপর রেখেছিল) সে ছবির কথা আমার মনে ছিল। আমি বিস্ময়ে অবাক হলাম। ওর চুল রগের ধারে এসেছে, মাথায় ছোট টাক পড়েছে, মুখখানি ফুলো ও লাল,—আর চিবুকটা ডবল হয়ে উঠেছে। ভালোভাবে দীর্ঘকাল থাকার ফলে ও মদ্যপানে ওর ওজন বেড়েছিল আর শুধু ওর দৈর্ঘ্যের জন্যই তেমন মোটা হয়ে ওঠেনি। যা বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম তা ওর চোখের চাউনি। ওর সেই বিশ্বাস ভরা নীল চোখের কথা মনে পড়ল, সেদিন জগৎ ওর সামনে ছিল, কোনো কিছু সম্পর্কেই ওর এতটুকু মাথা ব্যথা ছিল না। এখন তার ভিতর একটা সংশয়াচ্ছন্ন দিশেহারা ভাব লক্ষ্য করলাম। যদি ওদের ঘটনা আমার কিছু না জানা থাকত তা হলেও ওর চোখ দেখেই বুঝতাম নিজের সম্পর্কে ও নিয়মানুগ জীবনধারার প্রতি বিশ্বাস নষ্ট করার মত একটা কিছু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। ওর যে স্নায়ু বিকার ঘটেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমাকে দেখে ও অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে অভিনন্দন জানালো, জানো পুরাতন বন্ধুর দেখা পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছে। কিন্তু আমার কেমন মনে হল ওর এই অন্তরঙ্গতা স্বভাববশতঃই পরিস্ফুট হয়েছে, অন্তরের প্রতিচ্ছবি এর ভিতর নেই।

মদ্য আনা হল, গ্রে ককটেল মিশ্রিত করল। দু-একদান গলফ খেলে আসছে, তার জন্য ও সন্তুষ্ট হয়ে আছে। কি ভাবে গলফের একটা গতের ব্যাপারে গোলমালে পড়েছিল সে বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিতে লাগল, ইসাবেলও যেন গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। আরো কয়েক মিনিট পরে একত্রে ডিনার খাওয়ার ও অভিনয় দেখার একটা দিন স্থির করে আমি উঠে পড়লাম।

(ক্রমশ)

পূর্ববঙ্গ হইতে প্রতিদিন সহস্রাধিক হিন্দু নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন। মনে হয়, তাঁহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিতই হইতেছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রে ভারত সরকারের হাই-কমিশনার শ্রীশ্রীপ্রকাশ কলিকাতায় আসিয়া যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়াছেন। বারাণসীতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—দোষ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের; তাঁহারা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিলে অবশিষ্ট লোকদিগের পক্ষে তথায় বাস অসম্ভব হয়।

লাহোরে যাইয়া পূর্ব-পাকিস্থানের অন্যতম সচিব মিস্টার চৌধুরী হামিদুল হক অনায়াসে বলিয়াছেন—একজনও অ-মুসলমান পূর্ব-পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া যায় নাই। যিনি এমন সত্য প্রচার করিতে পারেন, তাঁহাকে হিসাব দেখাইয়া লজ্জিত করিবার আশা আমরা করিতে পারি না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাঁহার এই অসত্য উক্তিতে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়েরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। তিনি দিল্লীতে বলিয়াছেন—

"একথা অস্বীকার করিয়া কোন ফল নাই যে, লোকে পূর্ববঙ্গে বাস অসম্ভব অনুভব করিয়াই পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে।"

তিনি বলিয়াছেন — পূর্ব-পাকিস্থানে সম্প্রতি হিন্দুদিগের গৃহে খানাতল্লাস হইতেছে; লোককে মামলা-সোপর্দ করা হইতেছে; ব্যবসায়ের অনুমতি প্রদানে এক-দেশদর্শিতার পরিচয় প্রকট হইতেছে; শহরে হিন্দুদিগের গৃহ অধিকার করা হইতেছে; ইউনিয়ন বোর্ডের কর, আয়-কর প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে তারতম্য করা হইতেছে, অর্থাৎ ন্যায় পদদলিত করা হইতেছে; হিন্দুদিগের নিকট হইতে উৎপীড়ন করিয়া জিন্না তহবিল প্রভৃতির জন্য টাকা আদায় করা হইতেছে—ইত্যাদি।

বিধানবাবু বলিয়াছেন, অন্তত পনের লক্ষ লোক পূর্ব-পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। আমাদিগের মনে হয়, পনের লক্ষের অনেক অধিক লোক আসিয়াছেন —এখনও আসিতেছেন।

বিধানবাবুর বিবৃতিতে আর একটি কথা স্বীকার করা হইয়াছে। আমরা ইতঃপূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—

তিনি অবগত হইয়াছেন, নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম হইতে দলে দলে মুসলমান জীবিকার্জনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র প্রদেশ। এই প্রদেশে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগেরই স্থান হইতে পারে না। সেইজন্যই গান্ধীজীর পুত্র ও ভারত-রাষ্ট্রের বড়লাট শ্রীরাজাগোপালাচারীর জামাতা শ্রীদেবদাস গান্ধী সম্পাদিত 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রে লিখিত হইয়াছিল, পূর্ব-পাকিস্থানে সরকার যদি স্বীয় রাষ্ট্রে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হিন্দুদিগকে রক্ষা করিতে অর্থাৎ তাঁহাদিগের ধন, প্রাণ, মান রক্ষা করিতে না পারেন, তবে দুই বঙ্গে অধিবাসী বিনিময়ের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। আজ যখন বিধানবাবু স্বীকার করিয়াছেন—নোয়াখালি, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম হইতে দলে দলে মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে, তখন অন্য রাষ্ট্রের প্রজাদিগকে পশ্চিমবঙ্গে আসিবার সুযোগ প্রদান করা সংগত কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিধানবাবু নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের কথাই বলিয়াছেন, আমরা

তাঁহাকে বলিতে পারি, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জিলা হইতেও বহু মুসলমান নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন। তাঁহারা সকলেই জাতীয়তাবাদী নহেন, পরন্তু পাকিস্থানের সমর্থক ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাদিগের আগমনে কেবল যে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা অযথা বর্ধিত হইতেছে, তাহাই নহে—পরন্তু তাহাতে ভবিষ্যতে ভারত-রাষ্ট্রের বিপদ-সম্ভাবনাও থাকিতে পারে। ইংরেজিতে যাহাকে 'ইনফিলট্রেশন' বলে—ইহা যে তাহাই নহে, তাহা কে বলিতে পারে?

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সর্বস্বান্ত প্রায় সাড়ে সাতশত হিন্দু ধীবর পরিবার সরকার কর্তৃক তাহাদিগের জন্য ঢাকা করোনেশন পার্কে নির্মিত কুটীরে বাস করিতেছিল। পাকিস্থান সরকারের অন্যতম সচিব যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য প্রদান না করা পর্যন্ত তাহারা তথায় বাস করিতে পারিবে। কিন্তু গত বিজয়া দশমীর দিন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির লোক পুলিশ লইয়া যাইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

শ্রীসতীন সেন পূর্ববঙ্গ হইতে লোকের পশ্চিমবঙ্গে গমন বন্ধ করিবার জন্য পাকিস্থান সরকারের সহিত সহযোগ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হইতে বিলম্ব হয় নাই।

পাকিস্থান সরকার যাহাই কেন বলুন না, কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, লোক সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অকারণে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ অনেকাংশে মানুষের সৃষ্টি। যুদ্ধের সুযোগ লইয়া তখন বাঙলায় যে দুর্নীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা আজ আর করিব না। সেই সময় যাঁহারা বাঙলার দুর্দশার—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—কারণ ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম বাঙলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট আজ পরলোকে। কিন্তু সর্দার বলদেব সিংহ তখন কেন্দ্রী সরকারের ও বাঙলার প্রাদেশিক সরকারের যে রূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন, তাহা যে ভয়াবহ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদিগের বক্তব্য, এবার কেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তুত হইবার সুযোগ ছিল। কারণ পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগের গৃহত্যাগ ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের মনে সাহস এবং মুসলমানদিগের মনে সম্প্রীতি সম্প্রসারণের জন্য পূর্ববঙ্গে যাইয়া গান্ধীজীও চারিদিকব্যাপ্ত অন্ধকারে আলোক দেখিতে পান নাই। ঘটনাক্রমে তখন বিহারে হাঙ্গামা ঘটে এবং সেইজন্য তাঁহাকে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে প্ররোচিত করা হয়—আর তাহার পরে, তাঁহাকে দিল্লীতে যাইতে হয়। দেশ বিভক্ত হইবার পূর্বেই পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের যে লাঞ্ছনা আরম্ভ হইয়াছিল, বিভাগের পরে যে তাহা নিবৃত্ত না হইয়া বর্ধিতই হইবে, সে আশঙ্কা অবজ্ঞা করা রাজনীতিকোচিত কাজ হয় নাই।

এখনও পশ্চিমবঙ্গে যে জমি 'পতিত' আছে বলিয়া নিকুঞ্জবিহারী মাইতি মহাশয় হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে কেন চাষ হয় নাই, তাহা কে বলিবে। এই 'পতিত' জমিতে চাষ হইলেই যে অতিরিক্ত কুড়ি লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হইত, এমন আমরা মনে করি না—কিন্তু যদি বহুলোৎপাদিকা কৃষির পদ্ধতি প্রবর্তিত হইত, তবে যে অনেক উপকার হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিকুঞ্জবিহারীবাবু 'পতিত' জমির যে হিসাব দিয়াছেন, তাহা ব্যতীত কত জমি অতিলোভী ফাটকাবাজদিগের অধিকারে আছে, তাহাও দেখিবার বিষয়। তাঁহারা নামমাত্র মূল্যে জমি কিনিয়া লোকের দুর্দশার সুযোগ লইয়া তাহা অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহারা সমাজের অহিতকারী। যদি অবস্থার প্রতিকার না হয়, তবে আবার দুর্ভিক্ষই হইবে। তাহার পরে যদি সুব্যবস্থা হয়, তবে ফাঁসীর পরে বেকসুর খালাস হইবে।

বে-সামরিক সরবরাহ সচিব বলিয়াছেন—দশ বৎসর পরে পশ্চিমবঙ্গের লোক মোড় ফিরিতে পারিবে। রুশিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিল—কাজ কেবল দুইটি নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা নহে। প্রফুল্লবাবু দশ বৎসরের মেয়াদ লইয়াছেন—ততদিনে দুটি নদীর জলধারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। কিন্তু দশ বৎসর লোক কিরূপে জীবিত থাকিবে? আর জীবিত থাকিলেও কি তাহারা জীবন্মৃত হইয়াই থাকিবে না? ইহার মধ্যে খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির কি কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইয়াছে? এক দিকে অন্নাভাব, আর এক দিকে চাষের জমি 'পতিত' রহিয়াছে—এই অবস্থা যে সমর্থনের অযোগ্য, তাহা বলা বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গে বহু পুষ্করিণী ছিল—সে সকলের জল লোক পান করিত, তাহাতে সেচ হইত, তাহাতে মৎস্যের চাষ হইত। সে সকলের অনেকগুলি এখন নানা কারণে অসংস্কৃত। কয় বৎসর পূর্বে মিস্টার টার্ডন এই বিষয়ে এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার তাহা কার্যে পরিণত করেন নাই। যদি প্রয়োজন হয়, গ্রামের অধিবাসিগণের নিকট হইতে কর লইয়া ও সরকারী সাহায্য দিয়া সে সকলের সংস্কার করা কর্তব্য। যে সকল ক্ষেত্রে পুষ্করিণীর অধিকারীরা সংস্কারবিমুখ, সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া তাহা ইউনিয়ন বা জিলা বোর্ডকে দিতে বাধ্য করা যায়। আগামী বৎসরের বাজেটে সেজন্যে ব্যয় বরাদ্দ করা যাইতে পারে। অল্পদিন পূর্বে আমরা কলিকাতার উপকণ্ঠে (বোড়ালে) একটি বিরাট দীঘির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। সেইরূপ জলাশয় অনেক জিলায় পাওয়া যাইতে পারে। সে সকলের সংস্কার-ব্যয় টেনেসী-ভ্যালি অবস্থার অনুকরণে যে দামোদর পরিকল্পনা হইবে—তাহার তুলনায় তুচ্ছই হইবে। স্থানে স্থানে যে সকল নলকূপ বসান হইয়াছে, সে সকল অনেক স্থানে অল্পকাল মধ্যে অব্যবহার্য হয় এবং তাহাতে মাছের চাষ হয় না। কৃষি বিভাগের ও সেচ বিভাগের উভয় বিভাগের সমবেত চেষ্টায় পুষ্করিণী সংস্কার হওয়া প্রয়োজন এবং ছোট ছোট সেচের খালও সংস্কৃত ও খনিত হইতে পারে। আমাদিগের মনে হয়, স্বাস্থ্য বিভাগেরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিদিগকে সরকারের সাহায্যাপেক্ষী না হইয়া লাভজনক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধ যে বিশেষ সময়োপযোগী, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেইরূপ কাজের কয়টি পরিকল্পনাও করিয়াছেন। সেই সকল পরিকল্পনা কি লোককে জানাইয়া দেওয়া হইবে?

আজ অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আদর্শ পল্লীগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিবার সুবিধা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠায় লোককে উৎসাহিত করা যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা কুটীরশিল্প হিসাবে গ্রামে দেশলাই প্রস্তুত করিবার কথা বলিতে পারি। কিছুদিন পূর্বে দেশলাই প্রস্তুত করিবার একটি কল নির্মিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ উদ্ভাবক জগদীশ্বর ঘটক মহাশয়ের পুত্র শ্রীউমাপতি ঘটক চিত্তরঞ্জনের উৎসাহে ও প্ররোচনায় তাহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস, পাতিয়ালা ও কোটা সামন্ত রাজ্যদ্বয়ে তাহা ব্যবহারে সুফলও ফলিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সরকারের শিল্প-বাণিজ্য নীতি হেতু তাহার ব্যবহার বন্ধ হয়। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরীক্ষা করিয়া তাহা ব্যবহারোপযোগী মনে করেন, তবে কতকগুলি কল প্রস্তুত করাইয়া গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতির সাহায্যেও দিতে পারেন। সেচের পাম্পের বিষয় আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। সরকার যে 'পার্শিয়ান হুইল' সেচের জন্য ব্যবহার করিতে বলেন, তাহা ব্যয়সাধ্য—যেরূপ পাম্প দুই তিনজন কৃষক একসঙ্গে কিনিতে পারে, সেইরূপ যন্ত্রের প্রাবল্য

বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট—কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠায় সরকারের সাহায্য পাইলে যেমন গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তেমনই বহু লোক কাজ পায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সকল পরিকল্পনা করিয়াছেন, সে সকল কি কি? তাঁহারা বিশেষজ্ঞদিগের ও লোকের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়াছেন? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে সে সকলের সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নিশ্চয়ই থাকিবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহার সরকারকে ও উড়িষ্যা সরকারকে আশ্রয়প্রার্থীদিগের সমস্যা সমাধানে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সে নির্দেশ কি ভারত সরকারের দান করাই সংগত নহে?

কলিকাতায় টেলিফোনের প্রধান কেন্দ্রে অগ্নিদাহে প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে। যে সকল যন্ত্রাদি নষ্ট হইয়াছে, সে সকল পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে দুই-তিন বৎসর সময় লাগিবে। সেই সময়ের মধ্যে টেলিফোনের অভাবে লোকের ক্ষতি হয়ত কোটি কোটি টাকার হইবে। কিছুদিন পূর্বে টেলিফোনের জন্য পরামর্শদাতৃ সমিতি গঠিত করা হইয়াছিল। যখন দীর্ঘকাল নূতন টেলিফোন দেওয়া সম্ভব হইবে না, তখন কি সেই সমিতি রাখার আর কোন সার্থকতা আছে? আমরা দেখিয়াছি, যে সময় সহস্রাধিক লোক প্রয়োজনে টেলিফোন পাইবার জন্য আবেদন করিয়াও টেলিফোন পান নাই, সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু পরামর্শদাতাদিগের কাহারও কাহারও কর্মস্থলে 'এক্সচেঞ্জ' পর্যন্ত বসান হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব-পাকিস্থান সম্বন্ধে আমরা বহুবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীকিরণশঙ্কর রায় অল্পদিন পূর্বে সীমান্তে কতকগুলি চর পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সীমান্তে পদ্মার কতকগুলি চরে মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ চলিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্থান হইতে লোক —পাকিস্থান পুলিশের ও কোন কোন সরকারী কর্মচারীর সহায়তায় ঐ সকল চর আক্রমণ করিতেছে। চরগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। আক্রমণকারীরা ঐ সকল চর হইতে ফসল ও গবাদি লইয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত জলপথেও যাতায়াত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয়, ঐ সকল চর হইতে পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগকে বিতাড়িত করাই এই সকল আক্রমণের উদ্দেশ্য।

খাস পূর্ব-পাকিস্থান হইতে হিন্দু-বিতাড়নের যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, সে সকল সম্বন্ধে বিধানবাবু যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার পরে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, হায়দরাবাদে রাজাকাররা প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—পূর্ব-পাকিস্থানে তাহাই পরোক্ষভাবে হইতেছে। সুরেশবাবু পূর্ব-পাকিস্থানে হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার কয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

(১) আপত্তিকর অংগভংগী। স্থানীয় মুসলমানদিগের তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আপত্তিকর অংগভংগীর জন্য পূর্ব-পাকিস্থানে গ্রামে ও নগরে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বাড়ির বাহিরে যাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাদিগকে—বিশেষ তরুণীদিগকে পাকিস্থানের বাহিরে নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

(২) আপত্তিকর প্রস্তাব। পুরুষদিগের অনুপস্থিতিকালে মুসলমানেরা হিন্দু-গৃহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট আপত্তিকর প্রস্তাব করে। গৃহে ফিরিবার পরে পুরুষরা সেই ব্যবহারে আপত্তি করিলে তাঁহাদিগকে বলা হয়, মুসলমানাধীন পাকিস্থানে হিন্দুদিগকে সেরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে হইবে।

(৩) মুসলমানেরা ধনী হিন্দুদিগকে ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়া থাকে। একখানি পত্রে যাহা লিখিত ছিল, তাহার মর্মার্থ—'আল্লার নামে বলিতেছি, বসন্তবাবু সতর্ক হউন—একদিন আমরা জনকয়েক আপনার বাড়িতে যাইব। দুই হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত থাকিবেন—নহিলে আপনার ছোট বধূকে বা বড়বধূকে দিতে হইবে।

(৪) হিন্দু নারী বলপূর্বক অপসারিত করিয়া মুসলমান করা ও পরে মুসলমানের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির মত লোকের এই বিবৃতির পর যে বলিবার আর কিছু থাকিতে পারে, এমন মনে হয় না।

(১) গত ১১ই অক্টোবর স্থানীয় ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর কার্যাধ্যক্ষ শ্রীহাসি দত্ত দেশরক্ষা আইনের বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীদুলাল গুহ ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালিত করিতেছিলেন—গত ২০শে অক্টোবর তাঁহাকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

(২) প্রকাশ, কক্সবাজার মুন্সেফী আদালতের উকীল শ্রীবিধুভূষণ সেন স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক রাষ্ট্র-রক্ষা আইনের বলে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ঐ আদালতের উকীল শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদার পূর্বেই গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

(৩) বিজয়া দশমীর দিন রাওজান থানার এলাকায় কাওজানে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। এক দলের কার্যফলে হিন্দু-মুসলমান সম্মেলনের কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে এবং পূর্ণিমায় বৌদ্ধদিগের একটি অনুষ্ঠানেও বাধা দেওয়া হয়।

এই সকল হইতেই বোঝা যায়, মুসলমানাতিরিক্ত কেহই পাকিস্থানে নিরাপদ নহেন। পাকিস্থান সরকার কখনই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য গোপন করেন নাই—পাকিস্থান ইসলাম রাষ্ট্র।

আমরা জানিয়া প্রীত হইলাম, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পরলোকগত জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র মিস্টার পি এন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত সরকারের বিদেশী ভাষার ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্বে ভারত সরকারের বেতার বিভাগে রুশ 'প্রোডাকশান অফিসার' ছিলেন। তাঁহার মত বহুভাষাভিজ্ঞ বিরল।

পণ্ডিত নেহরুর ইউরোপ সফর

লণ্ডনে একটি একাদশ বর্ষীয়া ভারতীয় বালিকা পণ্ডিতজীকে পুষ্পস্তবক উপহার দিলে, পণ্ডিতজী তাহাকে আদর জানাইতেছেন।

প্যারিসে পণ্ডিত নেহরু: ১৫ই অক্টোবর পণ্ডিতজী লণ্ডন হইতে প্যারিস আগমন করেন। উপরের ছবিতে পণ্ডিতজী ও তাঁহার ভগিনী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে দেখা যাইতেছে। প্যারিসের বিমানঘাঁটিতে উক্ত ছবিখানি তোলা হয়।

লণ্ডনের গ্লোব থিয়েটারে পণ্ডিত নেহরু। ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পত্নী লেডী মাউণ্টব্যাটেন তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন।

ভিসিনস্কির ভেটো

বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স রাশিয়ার সংগে আপোষ-আলোচনার পথে বার্লিন সমস্যার সমাধান করতে না পেরে যখন প্যারীতে স্বস্তি পরিষদে বার্লিন প্রসংগ উত্থাপন করেছিল, তখনই আমরা বলেছিলাম যে, এ-পথে বার্লিন সমস্যার প্রকৃত সমাধান হতে পারে না। তার কারণ স্বস্তি পরিষদে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের পিছনে গণতান্ত্রিক ভোটাধিক্য থাকলেও সোভিয়েট রাশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি মঃ আঁদ্রে ভিসিনস্কির হাতে আছে 'ভেটো' নামধেয় মারাত্মক অস্ত্র। যখন কোন মূলগত প্রশ্নে পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ বাধে এবং রাশিয়া যদি বোঝে যে, ভোটে তার পরাজয় সুনিশ্চিত তখন তার প্রতিনিধি এই অস্ত্র প্রয়োগ করে পশ্চিমী প্রচেষ্টা বানচাল করে দেন। বার্লিন এমনই একটা মূলগত প্রশ্ন। দীর্ঘ ৫।৬ মাসের প্রচেষ্টায় যে সমস্যার আপোষ-মীমাংসা হল না, সে সমস্যাকে নিঃশব্দে স্বস্তি পরিষদের হাতে তুলে দিয়ে রাশিয়া নিস্পৃহ হয়ে থাকবে—একথা ভাববার কোন কারণ নেই। বার্লিন সমস্যার সমাধান রাশিয়াও হয়তো চায়, তবে সেটা নিজের সর্তে। বার্লিন সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিম্বা বৃটেনের আরোপিত সর্ত মেনে নিতে সে যেমন সম্মত নয়, তেমনি সে সম্মত নয় এ বিষয়টির উপর স্বস্তি পরিষদের কোন এক্তেয়ার মেনে নিতে। স্বস্তি পরিষদে বার্লিন সমস্যা নিয়ে গিয়ে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জও তার কোন সুষ্ঠু সমাধান প্রত্যাশা করেছিল বলে মনে হয় না। তারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জকে খুব সম্ভব এই কথা বোঝাতে চেয়েছিল যে, রাশিয়ার অন্যায় জেদের জন্যেই বার্লিন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সেদিক থেকে তাদের প্রচেষ্টা কিছুটা সার্থকও বোধ হয় হয়েছে।

প্রথমে স্থির হয়েছিল যে, বার্লিনে অবরোধ সৃষ্টির জন্যে সোভিয়েট রাশিয়াকে দোষী প্রতিপন্ন করে স্বস্তি পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হবে। পরে কেন জানি না এ সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয়। তখন বিবদমান শক্তি-চতুষ্টয়কে বাদ দিয়ে স্বস্তি পরিষদের ছয়টি 'নিরপেক্ষ' রাষ্ট্র—চীন, কানাডা, বেলজিয়াম, আর্জেণ্টাইন, কলম্বিয়া ও সিরিয়া নতুন আপোষের সূত্র নির্ণয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই কয়টি রাষ্ট্রকে প্রকৃত নিরপেক্ষ বলা অবশ্য শক্ত। কেননা, এ পর্যন্ত স্বস্তি পরিষদের সম্মুখে যত বিশ্ব-সমস্যা এসেছে, সে সবের সমাধানের ব্যাপারে দেখা গেছে যে, এই কয়টি রাষ্ট্র ইংল্যান্ড-আমেরিকার পক্ষ টেনেই চলে। তবে এদের সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, বার্লিন সমস্যার ব্যাপারে এরা যথা-

সম্ভব মোহমুক্ত মন নিয়ে কাজে হাত দিয়েছিল এবং বিবদমান শক্তিপুঞ্জের উভয়ের পক্ষে সম্মানজনক একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করেছিল। এদের মীমাংসার সূত্র ছিল তিনটি—(১) সোভিয়েট রাশিয়াকে অবিলম্বে বার্লিন অবরোধের অবসান ঘোষণা করতে হবে; (২) এর দশ দিন পরে সমগ্র বার্লিনে রুশ মার্ককে একমাত্র মুদ্রামানরূপে চালু করার ব্যবস্থা করা হবে এবং (৩) তারপর সমগ্র জার্মান সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক বসবে। এ-প্রস্তাবে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন কটূক্তি ছিল না। এই নিরপেক্ষ প্রস্তাব স্বস্তি পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় প্রথম প্রথম আপোষ সম্বন্ধে বেশ কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা এ-প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ-প্রস্তাব সোভিয়েট প্রতিনিধির মনঃপূত হয়নি। এ-প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গ্রহণের পূর্বে তিনি জানিয়েছিলেন যে, প্রস্তাবটি যদি অন্যভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করা হয়, তবে তাঁর গভর্নমেণ্ট এ-প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন। কিন্তু যে পরিবর্তন তিনি চেয়েছিলেন, সে পরিবর্তন সাধন করা হলে প্রস্তাবটি আবার পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের সমর্থন হারায়। যে কারণে মার্শাল স্ট্যালিনের সংগে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের সরাসরি আপোষ-আলোচনা ব্যর্থ হয়েছিল, স্বস্তি পরিষদের নিরপেক্ষ দেশ কয়টির আপোষ-প্রয়াসও সেই একই কারণে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ অবরোধের অবসান ও রুশ মুদ্রানীতি প্রবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ের প্রশ্ন। সোভিয়েট পক্ষের দাবী এই যে, যুগপৎ একই সংগে এ-দুটি কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। আর ইংগ-মার্কিন পক্ষের বক্তব্য এই যে, অবরোধের খড়্গ মাথার উপর ঝুলে থাকা পর্যন্ত তারা মুদ্রানীতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করবে না। এই পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিকোণের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারায় ২৫শে অক্টোবর তারিখে নিরপেক্ষ প্রস্তাবটিকে অপরিবর্তিত অবস্থায়ই স্বস্তি পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। ভোট গ্রহণের প্রাক্কালে রুশ প্রতিনিধি মঃ ভিসিনস্কি ঘোষণা করেন যে, ভোটাধিক্যে এ-প্রস্তাব গ্রহণের চেষ্টা করা হলে তিনি বাধ্য হয়ে বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের ২৭ ধারার ৩ উপধারা অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভেটো প্রয়োগ করবেন। কার্যত তিনি করেছেনও তাই। সুতরাং স্বস্তি পরিষদের এ-প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে। অতএব মঃ ভিসিনস্কিই আপাততঃ বিজয়ী হয়েছেন।

প্রশ্ন হল—ইংগ-মার্কিন পক্ষ অতঃপর কি করবে? তাদের একমাত্র উপায় হল, বার্লিন সমস্যাকে স্বস্তি পরিষদের হাত থেকে সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনের হাতে তুলে দেওয়া। সেখানে রাশিয়ার ভেটো নেই—ভোটাধিক্যও আছে ইংগ-মার্কিন পক্ষের দিকে। অতএব বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু সে বিজয়ে লাভ হবে কি? ধরে নিলাম সাধারণ অধিবেশনের রায় ইংগ-মার্কিন পক্ষের অনুকূলে হবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়াকে সেই রায় মেনে নিতে বাধ্য করার উপায় কোথায়? তাই দেখা যাচ্ছে যে, বার্লিন সমস্যাকে এখনও স্বস্তি পরিষদের কর্ম-তালিকাতেই রেখে দেওয়া হয়েছে। এখনও যদি কোন আপোষ-রফা হয়—এই হল একমাত্র ভরসা। যা দেখা যাচ্ছে, তাতে বার্লিন সমস্যা আজ বিশ্ব-সমস্যার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের কোন বড় সমস্যা সম্বন্ধেই আজ ইংগ-মার্কিন পক্ষ ও সোভিয়েট পক্ষের দৃষ্টিভংগীর মিল হচ্ছে না। বিশ্বের স্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্যে যে সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে ইংগ-মার্কিন পক্ষের ভোটাধিক্য আছে সত্য—কিন্তু কোন রাষ্ট্রকে গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাবার মত শক্তি নেই এই প্রতিষ্ঠানটির। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিষদরূপে যে স্বস্তি পরিষদ আছে, সেখানেও ইংগ-মার্কিন পক্ষেই আছে ভোটাধিক্য। কিন্তু ভোটের সমর্থন না থাকলেও সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ ভিসিনস্কি সেখানে নিঃসহায় নন। তাঁর হাতে আছে সনদ-প্রদত্ত 'ভেটো' অস্ত্র। প্রয়োজন হলে তিনি এই অস্ত্র প্রয়োগ করে ভোটাধিক্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারেন। অতএব মুক্তির পথ কোথায়? মুক্তির একমাত্র পথ বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিবাদের অবসান ঘটানো—পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারা। তা যদি তারা না পারে, তবে এমনই অচল অবস্থা চলতেই থাকবে এবং এর মধ্য থেকেই একদিন সূত্রপাত হবে নূতন বিশ্বযুদ্ধের।

চার্চিল বনাম স্ট্যালিন

রুশ রাষ্ট্রাধিনায়ক জেনারেলিসিমো স্ট্যালিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মুখ খুলেছেন। স্ট্যালিন সাধারণত অত্যন্ত কম কথা বলেন। তাই বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জের গতি বিচারে তাঁর কথার উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পৃথিবী আজ যে দুটি

পরস্পরবিরোধী ব্লকে বিভক্ত হয়েছে, তার একটির সর্বাধিনায়ক তিনি। সুতরাং তাঁর নীতি এবং তাঁর কার্যাবলীর উপর বিশ্ব-শান্তি যে বহুলাংশে নির্ভরশীল, একথা না বললেও চলে। আমেরিকার তৃতীয় দলের প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী মিঃ হেনরী ওয়ালেসের খোলা চিঠির জবাবে গত মে মাসে স্ট্যালিন তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়েছিলেন। আর এতদিন পরে রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'প্রাভদা'র প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে স্ট্যালিন যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার মূল লক্ষ্য আপাতদৃষ্টিতে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দলের অধিনায়ক মিঃ চার্চিল হলেও তাঁর তীব্র সমালোচনার হাত থেকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির শাসক-শক্তিও বাদ পড়েনি। চার্চিলের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণের মাত্রা তীব্রতর—এই যা প্রভেদ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজ কম্যুনিস্টদের আক্রমণাত্মক কর্মনীতি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। একদিকে এই অবস্থা—অপরদিকে বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট ব্লক বনাম ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের বিরোধ। বার্লিনে, কোরিয়ায়, ঔপনিবেশিক প্রশ্নে, নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে, আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে—সর্বত্র এই বিরোধ সুপ্রকট। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, এ বিরোধ ও অচলাবস্থার জন্যে একমাত্র দায়ী সোভিয়েট একগুঁয়েমি। আর সোভিয়েট পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা ভোটের জোরে দুনিয়াকে পদানত করার স্পৃহা যদি ত্যাগ করে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যদি একমত হবার চেষ্টা করে, তবেই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আসতে পারে। এই অভিযোগ প্রত্যভিযোগের ঝড়ের মধ্যে প্রকৃত সত্য যে কি, তা নির্ধারণ করা এক দুষ্কর ব্যাপার। এক পক্ষের বক্তব্যকে সত্য বলে ধরে নিলে অপর-পক্ষের বক্তব্যকে মিথ্যা বলে ধরা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। মঃ স্ট্যালিনের সাম্প্রতিক বিবৃতি এদিক থেকে কোন নতুন আলোক সম্পাত করতে পারেনি এবং দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন ইঙ্গিতও দিতে পারেনি। এদিক থেকে তাঁর বিবৃতি যতটা প্রচারমূলক, ততটা উদ্দেশ্যবহ বা সার্থক নয়।

স্ট্যালিনের বিবৃতির আশু লক্ষ্য হল টোরি চার্চিল সাহেবের ল্যান ডাডনোর বক্তৃতা। কিছুদিন পূর্বে ওয়েলসের এই স্থানটিতে রক্ষণশীল দলের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে মিঃ চার্চিল সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়াকে হয় পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে শিখতে হবে, নয়তো তাকে উচিত শাস্তি পাবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি চান যে, সোভিয়েট রাশিয়াকে তার আদর্শে বিশ্বাস ত্যাগ করে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম্ প্রচার বন্ধ করে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের সর্ত মেনে নিতে হবে, তা নইলে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের উচিত অ্যাটম বোমা মেরে সোভিয়েট রাশিয়াকে ঠাণ্ডা বানিয়ে দেওয়া। এ ধরণের সাফ কথায় চার্চিলের যুদ্ধকালীন বন্ধু স্ট্যালিনের গাত্রদাহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই চার্চিলের মুখেই আবার আমরা যুদ্ধকালে কমরেড স্ট্যালিনের কি গুণগানই না শুনেছি! যতই গুণগান করুন, চার্চিলের সোভিয়েট বিদ্বেষ মজ্জাগত এবং তা যাবার নয়। যুদ্ধান্তে তাঁর হাত থেকে ইংল্যাণ্ডের শাসন-ক্ষমতা খসে পড়েছে। এই নখদন্তহীন অবস্থাতেও তিনি এমন এক-এক কামড় দেন, যার ফলে মস্কো পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। চার্চিল সাহেবের এই ধরণের যুদ্ধং দেহি মনোভাব যে বিশ্ব-শান্তির পক্ষে বড় বাধা, সে বিষয়ে সংশয় নেই। তাঁর এ উক্তি বিলেতের শ্রমিক গভর্নমেণ্টেরও মনঃপুত নয়। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির মত লোক মন্তব্য করেছেন যে, মিঃ চার্চিল যদি এই ধরণের কথাবার্তা বলেন, তবে সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে প্রচারকার্যের বেশি সুবিধা হয়। সোভিয়েট রাশিয়া বরাবরই বলে আসছে যে, পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ তার ধ্বংস চায়। মিঃ চার্চিলের এই ধরণের বাগাড়ম্বর সোভিয়েটের প্রচারের পিছনে নৈতিক সমর্থন যোগায় মাত্র। কিন্তু মিঃ চার্চিলের এই ধরণের উক্তিকে নিছক বাগাড়ম্বর বলে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, আগামী ১৯৫০ সালে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ডের শাসন-গদীতে বসার দুরাশা রাখেন। মারাত্মক সোভিয়েট বিদ্বেষ-প্রচার তাঁর নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার অন্যতম কৌশলও বটে।

মঃ স্ট্যালিন তাঁর এই বিবৃতিতে মিঃ চার্চিলকে যুদ্ধের উস্কানিদাতা বলে অভিহিত করেছেন। তাতে বোধ হয় কারও কিছু বলবার নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের শাসকমণ্ডলীকেও তিনি রেহাই দেননি। তিনি তাদের উস্কানিদাতা অবশ্য বলেন নি—তবে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণকারী বলেছেন। এ ধরণের উক্তি ইতিপূর্বে স্ট্যালিনের মুখ থেকে শোনা যায় নি। তাই পশ্চিমী রাষ্ট্র-মহলে এ নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেছে। পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধ যে আজ কত তীব্র ও গভীর হয়ে উঠেছে, মঃ স্ট্যালিনের এই স্পষ্টোক্তি তার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু তাঁর এ উক্তি উভয় পক্ষের বিরোধ মীমাংসায় সহায়ক না হয়ে অধিকতর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে মাত্র। এর ফলে উভয় পক্ষের অবিশ্বাস ও সন্দেহ আরও গভীরতর হয়ে উঠবে মাত্র। স্ট্যালিন অবশ্য এইটুকু আশার কথা বলেছেন যে, তাঁর মতে যুদ্ধ অনিবার্য নয়—নতুন যুদ্ধের গতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রনেতাদের এই ধরণের উক্তির সার্থকতা কোথায়? একথা তো প্রায় সকল দেশের সকল রাষ্ট্রনেতাই বলছেন—সঙ্গে সঙ্গে দেখছি যে, পৃথিবীটাও ক্রমশ নতুন যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্ট্যালিন মনে করেন যে, শান্তি ও প্রগতির শক্তিপুঞ্জ এত বলশালী যে প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধকামী শক্তিপুঞ্জ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারবে না। তাঁর বক্তব্যের ধরণ থেকে বোঝা যায় যে, শান্তি ও প্রগতির শক্তি বলতে তিনি কম্যুনিজমকেই বোঝাতে চেয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশে যে কম্যুনিস্ট পার্টি কাজ করছে, তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এ-পথে শান্তি কোথায়? সংখ্যালঘু কম্যুনিস্টরা জোর করে নিজেদের ইচ্ছা সংখ্যাগুরুদের উপর চালাতে গিয়ে চীনে, ব্রহ্মে, ইন্দোনেশিয়ায় যে অশান্তির সৃষ্টি করেছে, তার খবর আমরা সকলেই জানি। এতে তো যুদ্ধ আরও এগিয়ে আসবে বলেই আমরা মনে করি। স্ট্যালিন দেখছেন, সারা দুনিয়ায় কম্যুনিস্ট প্রাধান্য স্থাপন করে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আর পশ্চিমী গণতন্ত্রকামীরা দেখছে সারা দুনিয়ায় তাদের ধরণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের স্বপ্ন। মূল বিরোধ ত এইখানে। বিশ্ব-শান্তির বুলি এখানে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির আবরণ মাত্র। তাই দুই পক্ষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার সম্ভাবনা শুধু সুদূরপরাহতই হয়ে চলেছে।

৩১।১০।৪৮

কলিকাতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অগ্নিকাণ্ড
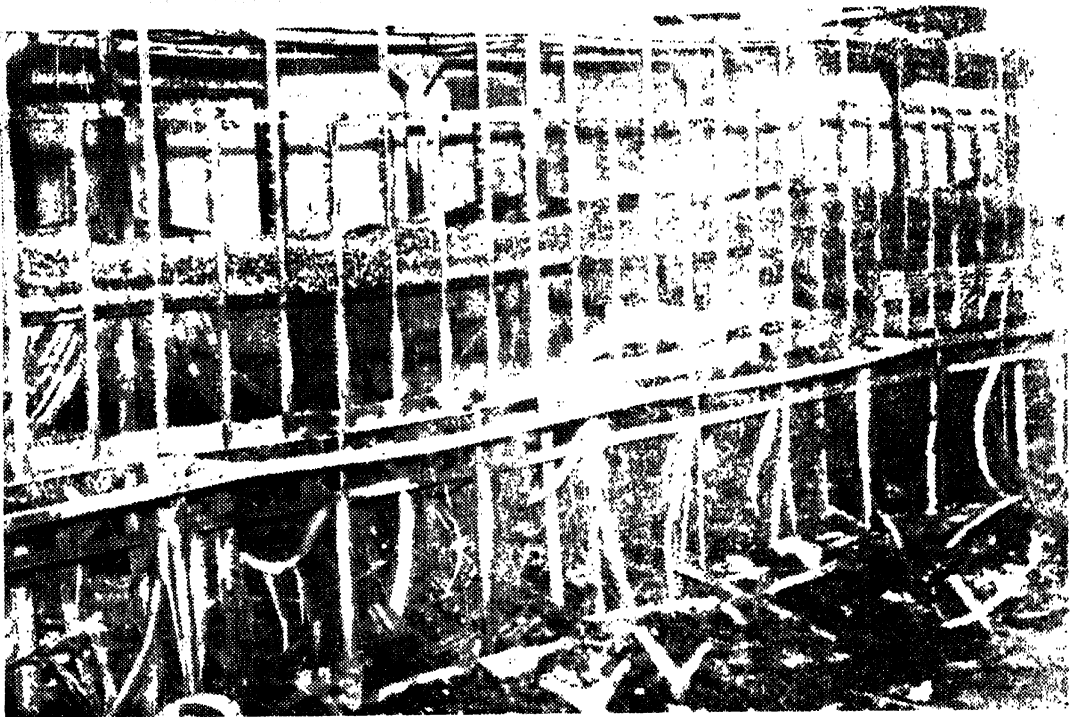
গত ৯ই কার্তিক মঙ্গলবার রাত্রিতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে কলিকাতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অগ্নিদগ্ধ হয়। উপরের ছবিতে—অগ্নিদগ্ধ সুইচ বোর্ডগুলিকে দেখা যাইতেছে।
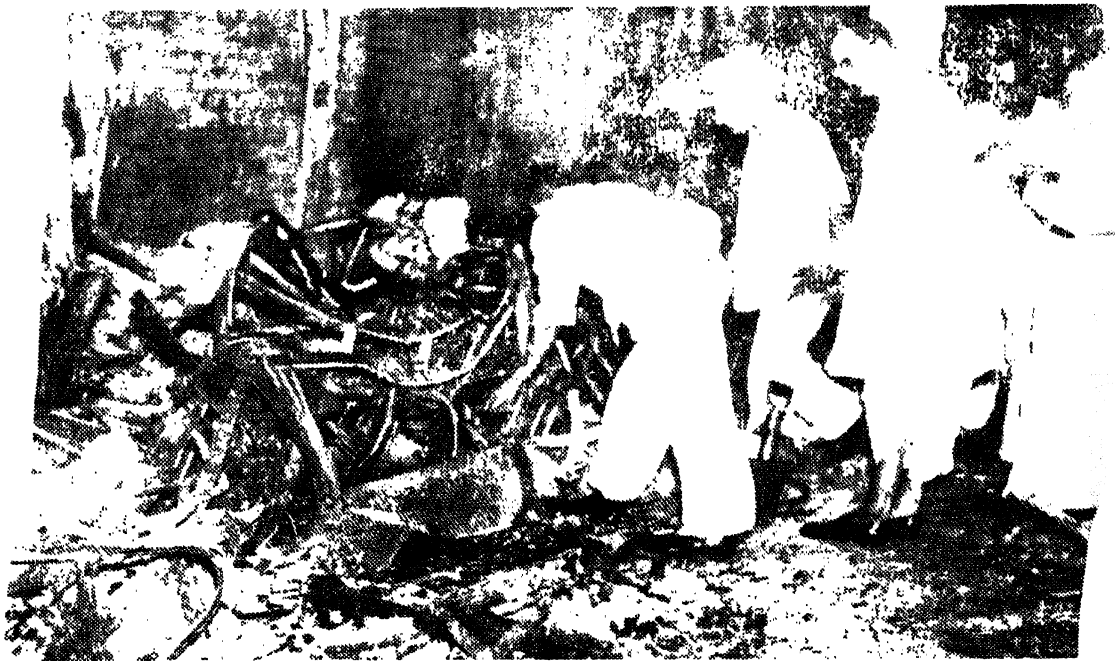
পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় টেলিফোন বিভাগের কর্মচারীবৃন্দসহ হেয়ার স্ট্রীটের প্রধান টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিংয়ের ত্রিতলের অগ্নিকাণ্ড বিধ্বস্ত কক্ষটি দেখিতেছেন। এই স্থানে কলিকাতা ও ইণ্টালী এক্সচেঞ্জের ৮ হাজার লাইনের সুইচ বোর্ড ছিল।

অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্ম পরিচালনার্থে টেলিফোন সংযোগ স্থাপনের জন্য টেলিফোন বিভাগের কর্মচারিগণ সাময়িকভাবে সুইচ বোর্ডসমূহ বসাইতেছেন।
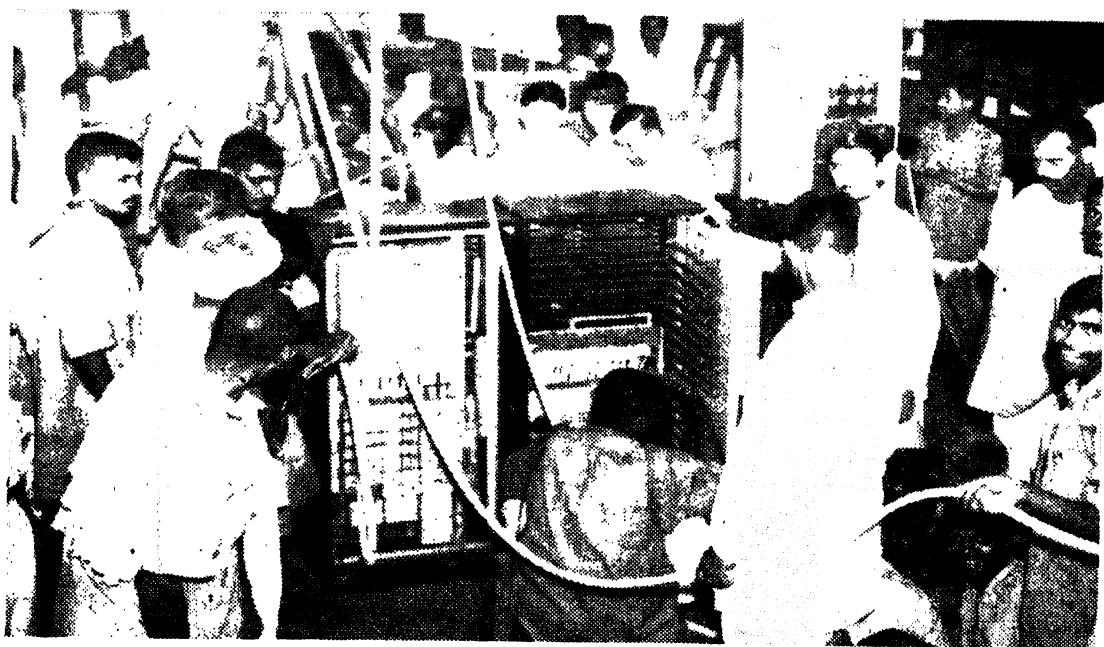
টেলিফোন সার্ভিস পুনঃ সংস্থাপনার্থে একটি নূতন যন্ত্র বসান হইতেছে।

ভারতে নাগরিক বাস্তু-সমস্যার স্বরূপ

শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী এম-এ

বিজাতি-সৃষ্ট আধুনিক ভারতের শহরগুলি যে ইউরোপ ও আমেরিকার পরিকল্পিত (planned) শহরসমূহের ন্যায় 'সুখের স্বর্গ' নহে ভারতের শিক্ষিত নাগরিক মাত্রই ইহা অবগত আছেন। ইংরেজেরা নেহাৎ প্রয়োজনেই সৈন্য ও রসদাদি রক্ষা করার এবং খাজানাদি আদায় করার জন্য শাসনকেন্দ্র হিসাবে ভারতের এক একটি নগরের পত্তন করিয়াছিল; ফলে ভারতের অধিকাংশ শহরই বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে শহরের প্রয়োজনীয় উপকরণ হইতে বঞ্চিত। শহর জীবন অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় নাগরিকের কাছে দুর্বিষহ!

ভারতীয় শহরের গলদ কোথায়?—মিঃ লেঞ্চেস্টার (Mr. Lanchester) তাঁহার 'টাউন প্লানিং ইন মাদ্রাজ' (Town planning in Madras) পুস্তিকায় লিখিয়াছেনঃ

"There is I think a certain amount of parallelism between India in the present day and Mideaval Europe. We had in Mideaval times in Europe, symbolisms which took the same shape in regard to buildings, but also in regard to town-planning."

আমার মনে হয় বর্তমান ভারত এবং মধ্যযুগের ইউরোপের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। মধ্যযুগের ইউরোপে বর্তমান ভারতের অট্টালিকা ও শহরের ন্যায়ই অট্টালিকা এবং শহর পরিকল্পিত ও প্রস্তুত হইয়াছিল। অতীতে আমরা হার মানাইয়াছি, কিন্তু বর্তমানে হার মানিয়াছি। খৃষ্ট-পূর্ব যুগে প্রাগৈতিহাসিক ভারতেও মহেঞ্জোদরো সভ্যতার যুগে এদেশে পরিকল্পিত শহরের অভাব ছিল না। আর এখন? শতাব্দীর পর শতাব্দী দাসত্ব ও পরাধীনতায় আমরা আমাদের সভ্যতার মুকুর শহরগুলিকে এতটুকু উন্নত করিতে পারি নাই; যেগুলি ছিল তাহারা হয় লুণ্ঠিত নয় বিধ্বস্ত স্তূপ। বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শহরগুলির উন্নয়নই হইবে সর্বপ্রথম কাজ। কারণ শহর-পরিকল্পনার মধ্য দিয়াই শিল্প-পরিকল্পনা অগ্রসর হইতে পারে। শহর শিল্পাঞ্চলের (Industrial Region) কেন্দ্র-স্বরূপ। শহরের জীবন্ত দেহ শিল্পাঞ্চলকে দেয় প্রাণ, দেয় সাংস্কৃতিক আলো, সামাজিক চেতনা। বস্তুতঃ কোন দেশের শিল্পোন্নতি ধরা পড়ে তাহার শহরের মুকুরের মধ্যে। মিঃ লেঞ্চেস্টার অন্যত্র দুঃখ করিয়া ভারতীয় শহরগুলির সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"The European city is located by economic needs, but the Indian more by imaginative caprice, and in India, the cities have faded away with the dynasty, which is not the case with the European cities."

ইউরোপের শহরগুলি আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ভারতীয় শহরের অবস্থান কল্পনাপ্রসূত। ফলে ভারতীয় শহরগুলি এক একটি রাজবংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপীয় শহরগুলি লোপ পায় নাই।" নগর-বিজ্ঞানের জনক অধ্যাপক এ গিডিস (Prof. A. Geddes) উহা ব্যাখ্যা করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেনঃ

"The Twentieth century town-planning in rural India, is turned in accordance with the English nineteenth century bye-laws."

বিংশ শতাব্দীর গ্রামে গাঁথা ভারতে শহর পরিকল্পনায় ইংরেজী ঊনবিংশ-শতাব্দীর উপধারার অনুসরণ করা হইয়াছে। তাঁহার বিদ্রূপ যে অতিমাত্রায় খাঁটি তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইংরেজেরা ভারতের সামাজিক গঠন, ভৌগোলিক সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত না হইয়াই ভারতে শহরের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সমস্ত শহরের কোন কোনটি আজ জনসংখ্যা ও বাণিজ্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহরে পরিণত হইয়াছে, অথচ তাহাদের মূলগত সমস্যাসমূহ আরও জটিল হইয়াছে। শহরের অধিবাসীদের বাসগৃহ সমস্যা তাহাদের শীর্ষস্থানে। ফলে মহানগরীসমূহ হইয়াছে নানা ব্যাধি ও মহামারীর উৎসভূমি। বর্তমান নিবন্ধে ভারতের কয়েকটি মহানগরীর বাস্তু-সমস্যার দৃষ্টান্তই প্রদান করা যাইতেছে। ইহাদের কোনটিতেই বসবাসের অঞ্চল (Residential Quarters) শিক্ষা, ব্যবসায়, চিকিৎসা ও প্রমোদ-কেন্দ্রসমূহ আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিন্যস্ত নহে।

বোম্বেঃ—১৯৩১ ইংরেজীর আদমশুমারী মতে বোম্বের শতকরা ৩৬ জন লোক শহরের অধিক জনসংখ্যার চাপে ব্যতিব্যস্ত। শহরের শতকরা ৮১টি বাসা-বাড়ীই একটিমাত্র গৃহ-সম্বলিত এবং উল্লিখিত প্রত্যেকটি ঘরের গড় জনসংখ্যা ৪·০১। শুধু তাহাই নয়, ২৫৬,৩৭৯ জন লোক ৬ হইতে ৯ জন অধিকৃত গৃহে, ৮০,১৩৩ জন দশ হইতে ঊনিশ জন অধিকৃত গৃহে এবং ৫০,৪৯০ জন বিশ অথবা তদধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট গৃহে বাস করে। ইহারা বোম্বে শহরের জনসংখ্যার শতকরা ত্রিশ ভাগ। গড়ে এই মহানগরীর প্রত্যেক নাগরিক বাসের জন্য ৬ বর্গ ফুট স্থানের অধিকারী। সতর বৎসর অতীত হইতে চলিল ১৯৩১ ইংরেজির এই চিত্র বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। জনসংখ্যার চাপ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার স্থান সংকুলানের জন্য ১৯৪০ ইংরেজিতে বোম্বের তদানীন্তন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মিঃ এম ডি ভট (M. D. Bhat) বোম্বের উন্নতির জন্য একটি পঞ্চদশ বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করেন। উহাতে তিনি যে সমস্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে (১) শহরের উন্মুক্ত স্থানসমূহে অধিক সংখ্যক বাসগৃহ নির্মাণ, (২) নূতন বাড়িগুলিকে আধুনিক পরিকল্পনায় উন্নীত করা, উল্লেখযোগ্য। বোম্বের নাগরিক বাস্তু-সমস্যা সম্বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনা সভা (National Planning Committee) তাঁহাদের 'ন্যাশনাল হাউসিং (National Housing) পুস্তিকায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক বোম্বের ২৩ লক্ষ লোক স্বাভাবিক অবস্থায় কমিয়া ২০ লক্ষ হইবে। কিন্তু তথাপি বর্তমান অবস্থায় বিশ লক্ষ লোকের স্থান সংকুলানের জন্যও নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৃহত্তর বোম্বের হাউসিং পেনেলের (Housing Panel of the Greater Bombay Scheme) মতে বর্তমান শহরেই চার লক্ষ লোকের জন্য নূতন বাসগৃহ নির্মাণ করা সম্ভব এবং আট লক্ষ লোকের জন্য শহরতলীতে বাসগৃহের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। শহরে যাহাতে জনসংখ্যার চাপ আর না বাড়ে, সেজন্য পেনেল নূতন নূতন কলকারখানা শহর হইতে দূরে স্থাপন করার পক্ষপাতী। ইহাতে লোক ঐ সমস্ত শিল্পাঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বোম্বাই শহরকে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বিন্যস্ত করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হয় নাই।

কলিকাতা :—কলিকাতার জনবহুলতা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। ১৯৪১ ইংরেজির আদম সুমারী মতে কলিকাতার জনসংখ্যা ছিল কিঞ্চিদধিক একুশ লক্ষ। আর আজ সেই সংখ্যা প্রায় তিনগুণে দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতায় বর্তমানে সর্বসাকুল্যে জায়গা ২২,৪০০,০০০ বর্গ ফুট। ইহাতে মাথাপিছু জায়গা মাত্র ৫·৫ বর্গ ফুট করিয়া পড়ে। অথচ ন্যূনপক্ষে বাসের জন্য মাথাপিছু

১৮ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন। (The Statesman, Calcutta dated 11th December, 1947). এতদ্ভিন্ন **কলিকাতার কর্মকেন্দ্রসমূহ** (Functional zones) বৈজ্ঞানিকভাবে বিন্যস্ত নহে। ব্যবসা-কেন্দ্র, শাসন-কেন্দ্র, শিক্ষা-কেন্দ্র এবং বাসের অঞ্চলসমূহ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত না হইলে শহর-জীবন শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রধান প্রধান শিক্ষায়তন ব্যবসা-কেন্দ্রেই অবস্থিত। শুধু তাহাই নয়, অধিকাংশ স্থলেই শিক্ষায়তনগুলি পাশাপাশি অবস্থিত। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে স্কুল-কলেজগুলি শহরের এক-এক প্রান্তে এমনভাবে অবস্থিত হওয়া উচিত, যাহাতে শহরের যে কোন স্থান হইতে নিকটবর্তী স্কুল-কলেজে পেণছিতে হাঁটিয়া দশ মিনিটের বেশি সময় না লাগে। ইতি বিবেচনায় কলিকাতার স্কুল-কলেজকে নূতন পরিকল্পনায় কলিকাতার উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে স্থানান্তরিত করিলে একদিকে যেমন ব্যবসা-কেন্দ্রগুলির অবস্থান নির্দিষ্ট হইবে, অপর দিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত আব-হাওয়ায় নগরের কোলাহলমুক্ত স্থান শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাজকর্মের অনুকূল হইবে। ইউরোপ বা আমেরিকার আধুনিক শহরগুলি এইভাবেই পরিকল্পিত। কর্মকেন্দ্রগুলি এই-ভাবে বিন্যস্ত হইলে বাস্তু-সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া উঠে; তখন কর্মকেন্দ্রের সম্বন্ধ অনুসারে বাসগৃহ পরিকল্পনা সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার বিভিন্ন বস্তী অঞ্চলগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বস্তী অঞ্চল-গুলি নানা রোগের আকর। বর্তমান অবস্থায় জনবহুল কলিকাতার এই বস্তীগুলির সংস্কার না করিলে এবং প্রয়োজন বিবেচনায় স্থানান্তরিত না করিলে যে কোন মুহূর্তে ঐ সমস্ত অঞ্চলের অপরিষ্কৃত আবহাওয়ায় মহামারীর উদ্ভব হইতে পারে। এই সমস্ত অঞ্চলে, প্রধানত মধ্য মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকের বাস। কলিকাতার নিকটে উপ-নগরের (Satellite Towns) সৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত লোকের বাসের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রধান শহরের অবস্থাই তুল্যরূপ।

নাগরিক বাস্তু পরিকল্পনা-সমস্যা:— জাতীয় পরিকল্পনা সভা (National Planning Committee) নাগরিক বাস-গৃহের গলদ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্ন-লিখিতগুলি প্রধান। (১) অবস্থান (Site): (ক) আঞ্চলিকতার অভাব (Absence of zoning); (খ) পরিকল্পনার অভাব (Lack of planning); (গ) নিয়ন্ত্রণের অভাব (Inadequate Control); (ঘ) অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল (Insanitary Areas); (ঙ) উপ-করণের অপ্রাচুর্য (Want of Amenities); (চ) অতিরিক্ত ভীড় (Congestion)।

(২) গৃহ (House); (ক) নীচু নীচু ঘর (Squatter type of huts); (খ) অস্বাস্থ্যকর ঘর (Insanitary Houses); (গ) অতিরিক্ত ভীড় (Overcrowding) ইত্যাদি।

যদিও জাতীয় পরিকল্পনা সভার অধীন সাব-কমিটি নাগরিক বাস্তুর এই সমস্ত গলদকে আশু দূরীভূত করার সুপারিশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের মতে এইরূপ কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করায় যথেষ্ট অসুবিধাও আছে। ঐ সমস্ত অসুবিধার মধ্যে সাব-কমিটি শহরে নূতন বাস্তু নির্মাণের স্থানাভাব, ব্যয়াধিক্য এবং সামাজিক সমস্যাদির (Sociological Complications) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাব-কমিটির মতে জন-সাধারণের দারিদ্র্য সংস্কার এবং অশিক্ষাও নাগরিক বাস্তু পরিকল্পনার অন্তরায়।[১] নগরে শ্রমিক শ্রেণীর বাসগৃহ-সমস্যা সম্বন্ধে সাব-কমিটি বলেন:

> "If the State does not undertake the housing for the labourers, the private individuals and corporations will keep up the standard which appears to be the minimum in our opinion for labour class housing."

1. National Housing: National Planning Committee Series. Report of the Sub-committee.

সাব-কমিটির মতে গড়ে মাথাপিছু প্রত্যেক নাগরিকেরই ৬০ বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন। তাহাদের মতে ৫ হইতে ৬ জনের পরিবারের জন্য ৩৬০ বর্গফুট এবং ৭ হইতে ৮ জনের জন্য ৪২০ বর্গফুট স্থানের প্রয়োজন।

সমাধানের কয়েকটি পথ: ভারতের বর্তমান প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের শতকরা ১৪ ভাগই শহরবাসী। তাহা ছাড়া, নূতনভাবে ভারতে বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে। ইতি বিবেচনায় বৈজ্ঞানিক-ভাবে পরিকল্পনা এবং নাগরিক বাস্তু সমস্যার সমাধান আশু কর্তব্য। বড় বড় শহরের চতুষ্পার্শ্বে ৫ মাইল দূরে উপনগরের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত নগর ও উপ-নগর পরিপূরকভাবে এক একটি অঞ্চল গড়িয়া তুলিবে। উপর্যুক্ত নাগরিক বাসগৃহের গলদ এবং তাহাদের সমাধানের পথে অন্তরায় সম্বন্ধে সাব-কমিটির মতামত পড়িয়া ইহাই প্রতীত হয় যে, সরকার পরিকল্পিত পথেই উদার সমাধান সম্ভব। বাসগৃহ-সমস্যা সমাধানের সম্বন্ধে মিঃ লুই ওয়ার্থ (Louis Wirth) তাঁহার 'কনটেম্পরারি সোসিয়েল প্রব্লেমস' (Contemporary Social Problems) পুস্তকে নাগরিক বাস্তু পরিকল্পনা সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর পরামর্শ দিয়াছেন। তাহার মধ্যে কয়েকটি বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা যাইতেছে: (ক) বহু বিত্তশালী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসগৃহ সমস্যা ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা এবং মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসগৃহ সমস্যা সরকারী প্রচেষ্টায় সমাধান করিতে হইবে; (খ) বাসগৃহের উপকরণসমূহের গুণ ও মূল্য নির্ধারিত করা কর্তব্য; (গ) পরিকল্পনা সভার নির্দেশানুসারে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে বাসগৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য; (ঘ) আইনতঃ বাসগৃহ নির্মাণকে 'পাব্লিক ইউটিলিটি' (public utility) হিসাবে গণ্য করিতে হইবে; (ঙ) সরকারী ও বে-সরকারী গৃহনির্মাণ প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে কার্যত ঐক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান ভারতীয় পটভূমিতে নূতন দৃষ্টিতে শহর পরিকল্পনা করার সময় আমরা যেন এই কথাগুলি স্মরণ রাখি।
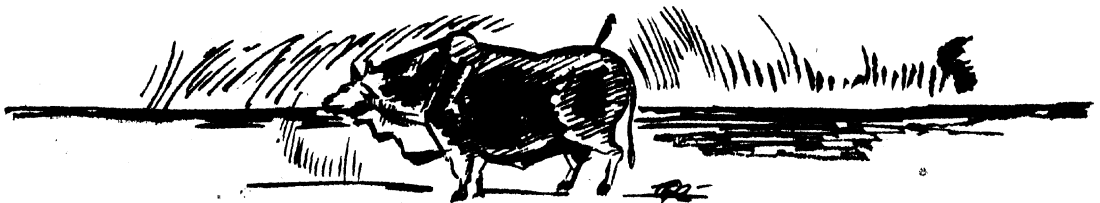
রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে স্বদেশ সংগীত লিখিয়া যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় অন্যতম। তিনিই প্রথম খাঁটি বাঙালী কবি, যিনি প্রবাসে বসিয়া বাঙলার তথা ভারতের জাতীয়তাকে জাগ্রত করিবার সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙলা ভাষায় কবিতা ও সংগীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'কত কাল পরে বল ভারতরে', 'দিন কি এমন হবে', 'নির্মল সলিলে, বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও', 'নিরখি স্মৃতির পট কহরে শুনি', 'জীবন সবসে দেখ কি ভাবি কি হয়', 'উঠরে বাছা সকল ডাকেন ভারত মা দুখিনী' ইত্যাদি স্বদেশ সংগীত বাঙালী চিত্তকে জয় করিয়া নিয়াছিল। তাজমহলের সৌন্দর্য দেখিয়া প্রথম বাঙালী কবি হিসাবে তিনিই তহার উপর কবিতা লিখিয়াছিলেন 'তাজমহল', 'তাজমহলের প্রতি'। তাঁহার রচিত অন্যান্য কবিতা ও সংগীতের মধ্যেও স্বাদেশিকতার পরিপূর্ণ বিষয় এ পর্যন্ত তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি এবং লুপ্তপ্রায় কবিতা ও সংগীতগুলির পুনরুদ্ধারের কোন প্রচেষ্টাই দেখা যায় নাই।

বাঙলা সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের রচনা পড়িয়া আমাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। একজন সমালোচক ও সাহিত্যিক লিখিয়াছিলেন যে, গোবিন্দচন্দ্র 'ভারতবিলাপ' ও 'যমুনালহরী' ভিন্ন আর কোন কবিতা লেখেন নাই,
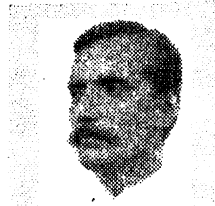
গোবিন্দচন্দ্র রায়

আর একজন লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ইংরেজী জানিতেন না। এই সব নানা ভ্রান্ত বিষয় পড়িয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধানে আমরা সচেষ্ট হই। ফলে তাঁহার অনেকগুলি রচনা আমরা পাইয়াছি। বর্তমানের কাব্যখানি অপ্রকাশিত রহিয়াছিল। কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও যথাসাধ্যভাবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পাদনা করিয়াছেন।

(সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৪৩নং)

আমাদের এই কাজে যাঁহাদের সক্রিয় সহযোগিতা পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পিয়ূরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে। তাঁহার নিকট হইতে নানা উপদেশ, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াই এই সংগ্রহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছি। তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গোবিন্দ রায়ের পরিবারের শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাগুলি দিয়া আমাদের ঋণপাশে বাঁধিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া খাটো করিতে চাই না। এই নাতিদীর্ঘ কাব্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার ভার নিয়া 'দেশ' কর্তৃপক্ষ যে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য 'দেশ' কর্তৃপক্ষকেও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংগ্রাহক—শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্তী

গঙ্গাতরঙ্গ

গোবিন্দচন্দ্র রায়

ভজনের সুর*

খল খল হাসে   কৌতুকি কালে
বহিছ চঞ্চল   অনিশ গঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

বহিছ দারুণ   প্রখর ধারে
কাটি গুহাগিরি   শরীর পাতে
উথলি ফেনার   বন কাঁপাই
ধ্বনিয়া কন্দর   হিমাচলাঙ্গে ॥ ১

পড়িছ নির্ঝরে   তুলিয়া বাষ্প
কোথা রামধনু   রচি আলোকে,
তৃষাপূর্ণ মৃগে   ত্রাসিনী নাদে
পরিহাসি যেন   মেঘ মাতঙ্গে ॥ ২

গিরি শিরে শিরে   চুমিয়া মেঘে
বাড়াই যৌবন   সলিল ভারে
ডুবাই সম্পদ   মানুস বাড়ী
ধাইছ কোথা বা   তুলি আতঙ্কে ॥ ৩

কোথা বা মোহিনী   রূপ তোমারি
খেলিছে ভূধর   পাষাণ ক্রোড়ে
গাইছ মোহিয়া   মধুর তানে
কভু আলো বুকে   কভু ছায়াঙ্কে ॥ ৪

উছলিয়া কোথা   শিখর ছাড়ি
লইয়া সঙ্গিনী   শতেক ধারা
চলেছ মিলিয়া   গলা মিশাই
কাড়ি বধূদের   ঘট তরঙ্গে ॥ ৫

কোথা দেবদারু—   বনের আড়ে
খেলিছে যে সব   গিরীশ বালা
হরি তাহাদের   আনন বিম্ব
লই পলাইছ   মুকুর অঙ্গে ॥ ৬

কোথা কোলাহলে   কোথা বা তজি
কোথা হাসি গাই   কোথা বা ধীরে
বহিছ কোথা বা   মধুরালাপে
ভামিনী (?) যেমন   প্রেম প্রসঙ্গে ॥ ৭

হিমানী ভেদিয়া   নিভর চালে
গিরি গুহা বন   কিছু না মানি
চলেছ সাগরে   সতত ধাই
পরিয়া গৈরিক   তরল অঙ্গে ॥ ৮

বিছি ফলে ফুলে   শ্যামল পারে
চলেছে ধর্ষিয়া   সুখ সমৃদ্ধি
প্রাসাদ মন্দির   মজিদ তীর্থ (?)
থুই থরে থরে   দুতট তুঙ্গে ॥ ৯

বাজিছে তীরেতে   আরতি বাজা
বাজাই বাজনে   গগন বায়ু
চলেছ নাচিয়া   তাল তরঙ্গে
দুই বেলা (?) জল   কল্লোক সঙ্গে ॥ ১০

তুলিছ মানস   পটে জাগাই
কত পুরাতন   নূতন গাঁথা
কত কোটি রসে   দুখের বার্তা
বহিছ দুস্তর   জলধি ভঙ্গে ॥ ১১

উঠি পড়ি সদা   সচল বাতে
রবি শশি তলে   ঢেউর মালা
দেখাইছে অনু—   করিয়া নৃত্যে
নরক পালের   তরল রঙ্গে ॥ ১২

অহ ! কি প্রাচীন   এ তব ধারা !
এলো সুখে ডিঙ্গি   যুগ ও কল্প
ধুই বিলোপিত   অগণ্য (?) জাতি
থুই ঘটা কত   অতীত অঙ্গে ॥ ১৩

ক্ষয়ি কত শত   অচল শৃঙ্গ
করি বিচূরণ   পাদপ স্রাবা
ডুবাই প্রাসাদ   গড়াই দ্বীপে
এলে অজানিত   সময় সঙ্গে ॥ ১৪

ধুই ঋষিদের   বৈদিক বাড়ী
অতি পরাচীন   অস্ফুট কালে
স্বচ্ছ বাতে (?) তার   স্বাধীন ভূমে
এলে খেলি সেই   রৌদ জোৎস্নাঙ্গে ॥ ১৫

এলে ধুই শেষে [১]   সগর বংশ
ব্যাস বাল্মিক   বৌদ্ধ কপীনী
ভাসাইয়া কত   সম্রাট রাজা
কবি ও কোবিদ   নীর তরঙ্গে ॥ ১৬

এলে ধুই যত   সে গত কালে
বন গুহা [২] সহ   পাপ কলঙ্ক
যুগ যুগের সে   না আছে শেখা
গ্রাসিত কালের   করাল ভঙ্গে ॥ ১৭

* রাধাকৃষ্ণ রটাকর্ সাহা, টট্ যায় নোহি তোর পিঞ্জরারে।

১ তুমি—পাণ্ডুলিপিতে পাশে ইহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

২ Some contrast with পাপ-কলঙ্ক would be better.

অহ! সময়ের
আইল নাইল
অসংখ্য সংখ্যায়
হয় রোমাঞ্চন
সে জন রাশী
যে এই নীরে
সে যে প্রবাহ!
স্মরণে অঙ্গে॥১৮

দেশ দেশ হতে
ধরিয়া অন্তরে
সঁপিল প্রাণ এ
ভাসাইয়া তনু
কত যে কোটি
আশার ভেলা
পঙ্কিল আপে
ছোরোত সঙ্গে॥১৯

ভরসা অন্তরে
যাবে সুখে কোন
নাহিক যেখানে
জ্বালাইতে পুনঃ
ধরি এ ধারা
বাঞ্ছিত দেশে
এ ভব জ্বালা
জীবন সাঙ্গে॥২০

অহ! মনে আশা
পায় যথা [illegible]
এ তব তীরের
ডুবাই কায়া এ
পাইবে শান্তি
ঐহিকে লোকে
অনিল ছায়া
শীত তরঙ্গে॥২১

ভরসা নিবে এ
অতল অন্ধ সে
দেখাইবে পথ
সরাই অন্তিম
চঞ্চল বারি
কাল কোরোড়ে
ঢেউর আভা
তিমির সঙ্ঘে॥২২

আহা! লই সবে
গেল সহস্রেতে
কি হলো শেষেতে
রলো কি নিখিল
গেল এ আশা
কোটি ও লাখে
জানকি বারি!
চিতার সঙ্গে॥২৩

না পায় অন্তর
না খোলে যন্ত্রে যে
সে গুহ আঁধারে
এ জল আবিল—
যাতে মনীষা
অর্গল কাঠী
দেখে কিছু কি
শোচন গঙ্গে!॥২৪

না কোন সংবাদ
আশ্বাসে পান্থকে
যায় প্রবাহেতে
অনিশ, অজ্ঞাত
না কোন যাত্রী
সেখানে থাকি
জীব ও জন্তু
সে গুহা অঙ্কে॥২৫

না ভাতে এ রবি
না হাসে বিদ্যুত
আশার খদ্যোত
নিবিছে দীপিছে
না শশী তারা
সে ঘোর দেশে
কেবল তাতে
বিহরি রঙ্গে॥২৬

কি তব যোগ্যতা
সাধ্য কি পেঁাছিতে
সীমায় বেষ্টিত
পয়োধি খাত এ
জানিতে অন্ত
এ জল ধারা
এ তব কেলি
তুষার শৃঙ্গে॥২৭

বহ নদী! বহ
পরিয়া জ্যোতিতে
নাচ সুখে আহা!
কোনও এ তব
হাসি আলোকে
সোণার শোভা
নাই যে জ্বালা
শীতল অঙ্গে॥২৮

খুলি প্রসারিত
বহ আশ্বাসিয়
ডোবে এ জীবন
আশা নাহি ডোবে
বুকের পাটা
ভারত লোকে
দুখে যদিও
সুখের সঙ্গে॥২৯

কহ ডাকি সবে
এ প্রাণ পোতের
মরণ জীবন
আশাই ভাসাই
ঢেউর নাদে
আশাই 'বয়া',
দুখ তুফানে
রাখে তরঙ্গে॥৩০

বাঁধে ঐ যে লোক
এ ভব ঢেউর
উদ্যম সাহস
ভর সবারই সে
সৌধ কি চালা
ফেন শরীরে
যা কিছু চেষ্টা
আশার অঙ্গে॥৩১

বহ নদি! বহ
লয়ে বুকে ছোট
বহে যথা কোন
পর দুখ সুখা—
প্রসারি পাটা
বড়র বিম্ব
হৃদয় ডাঙ্গর
নুভূতি সঙ্গে॥৩২

উঠহ' কল্লোলে
মানব চিত্তের
কাতারে কাতারে
উঠে ঢেউ যথা
উথলি বেগে
আক্ষেপ সাথে
উঠাও ঢেউ
মনের অঙ্গে॥৩৩

কহ শুনি কিছু
কুসুমিলো যাহা
ও ছায়া নীরবে
কালে কভু সুখ—
সে গত গল্প
ও দুই পারে
ও শীত বাতে
দুখ প্রসঙ্গে॥৩৪

পড়ে মনে কি হা!
উজালিলো কভু
বিছাই বৈভব
মঠ পুরী সৌধ
ঐ যে ও তীরে
মগধ ধানী
অতীব ভারী
বিম্বাই অঙ্গে॥৩৫

পড়ে মনে কি সে
গিরীক বালার
বাজিল বাজনা
বিম্বি যাতে তোমা
মিলন প্রেমে
সে মুখ চারু
হিন্দু য়ুনোনী
গ্রীক তুরঙ্গে॥৩৬

এলো স্রোতভরে
মাসিডন সেনা
লই বিবাহের
উজলিয়া ঝাঁক—
ও তট ছাই
প্রণত মাথে
ভেট বিচিত্র
জমক সঙ্গে॥৩৭

বিমল সে গ্রীক
মিশিয়া ভারত—
ফুটিল এ তবে
স্বাধীনা যেদিন
শশীর হারে
কুমুদ পাঁতি
প্রবাহ কাচে
তুমি তরঙ্গে॥৩৮

হাসাতে গ্রাসাই
সে দুই বারির
মিলায়ে এ নীরে
ফুটিত সে দিন
যবে এ ঢেউয়ে
নলিনী রাজি
অহ! কি শোভা
এই তরঙ্গে॥৩৯

আসিত নাইতে
মিলি সে য়ুনানী
এ ঘাটে, সে সুখ—
স্বাধীনা যেদিন
ঝাঁকে ও ঝাঁকে
ভারত বালা
সঙ্গমে আহা!
তুমি তরঙ্গে॥৪০

খেলিত সে কালে
সে হাসি আস্মেয়
উঠিতে উচ্ছাস
উথলি সাগর
এ জলে ভাসি
কৌমুদী মালা;
উঠে যে ভাবে
হেরি শশাঙ্কে॥৪১

দোঁহার সে সুখ—
পরিলে সে যে কি
ছিঁড়িল ফাটক
সেদিন সে সুখ—
মিলন সঙ্গে
গৌরব চূড়া
জাতির ফুলে
প্রেম তরঙ্গে॥৪২

মিশিলো আসিয়া
মিলি ঝুলি তরে
শিখালে শিখিলে
স্বাধীনা যেদিন
জ্ঞানের ধারা
সে স্রোতবেগে
কত যে বার্তা
তুমি তরঙ্গে॥৪৩

রবি তো ঐ তটে
পাটলি পুত্র সে
উজলি গৌরবে
খেলিল সম্পদ
বিশাল ধানী
উৎসব নাটে
হাসি যে কালে
বিহার বঙ্গে॥৪৪

বিপুল সে পুরি
পাঁচশ' সত্তর
পরি কটি তটে
শোভিতো চৌষট্টি
যোজন ব্যাপী
বুরুজ মাথে
পরিখা কাণ্ডী
দুয়ার সঙ্গে॥৪৫

ধ্বনিত সে ধানী
উঠাই গ্রীকের
উড়িতো তাঁবুরে
স্বাধীনা যেদিন
সেনা সামন্তে
মনে আতঙ্ক
খচি পতাকা
তুমি তরঙ্গে॥৪৬

উচু তোমার এ
কখন ভূষিলো
বিছাইয়া পারে
ছড়াই বিক্রম
লহরি শৃঙ্গে
সে রাজধানী
প্রাচী সাম্রাজ্য
বিহার বঙ্গে॥৪৭

এলো তব দূত
ম্যাগিসথানিস
নমিলো সম্ভ্রমে
স্বাধীনা যেদিন
ধরি এ ধারা
গুপ্ত শিবিরে
খুলি কিরীটি
তুমি তরঙ্গে॥৪৮

মিশিল আসিয়া
গুপ্ত সেনাদলে
উড়িল চৌদিশি
স্বাধীনা যেদিন
যবন সেনা
সমর সাজে
বিজয় কেতু
তুমি তরঙ্গে॥৪৯

প্রখর চাণক্য
উখারিলো দশ
বাজালো গ্রীকেরা
স্বাধীনা যেদিন
নীতির কুটে
নন্দের জাতি
সে জয় ভেরি
তুমি তরঙ্গে॥৫০

নিরভয়ে সদা
হাটিত গৌরবে
মিলি বাহু বুকে
স্বাধীনা যেদিন
সাহস দর্পে
সবে এপারে
যবন সঙ্গে
তুমি তরঙ্গে॥৫১

স্বাধীনা যেদিন
মেলি প্রসারিলে
খচিল কেতুতে
ছাই রণতরী
তুমি তরঙ্গে
বুক সমুদ্রে।
তনু আদর্শ
বিহার বঙ্গে॥৫২

ছাইল চৌদিশি
বহি অশোকের
রোমাইয়া পুরি
দূর দূর দেশ
তরণি ব্যাপী
শাসন চিহ্ন
গিরির শৃঙ্গে
কীরতি স্তম্ভে॥৫৩

বহিলে সেদিন রঙ্ বিরঙ্গে
ভরি ভরি নায়ে বুদ্ধের সেনা
প্রতিবিম্বিল ভূ সহ এ বারি
রঙিয়া চৌদিক কষায় রঙ্গে ॥৫৪

রঙিলো দিক্ যত গৌর নিশানে
পথ ঘাট পুরি কৌপিন গেরে
সাজিল স্বারথ তেয়াগি যোগি
রাজা প্রজা সব বিহার বঙ্গে ॥৫৫

রাজা প্রজা কত সে কোন কালে
পর দুখে গলি কাতর মর্ম্মে
ছাড়িয়া পীড়ন, দয়া বিভূতি
পরিল কৌপিনে কষাই অঙ্গে ॥৫৬

রঙ্গি সে রঙ্গে আসীয়া খণ্ড
দ্বীপ উপদ্বীপ যোজক গিরি
ছুটিল ছাইয়া ভুবি সে গেরু
উছলি উৎসাহ প্রাণ তরঙ্গে ॥৫৭

অহ! সে জীবন করম কায়ে
বহিল যা কভু এ ভূমি দেশে
দেখিসে না, নাহি এলো ফিরে সে
কভু কোথা পুনঃ ভারতে, গঙ্গে ॥৫৮

ঘটনা সে যত স্বপন তুল্য
তব বুকের এ জ্যোছনা ছায়া,
মিটি গেল সব খুইয়া গল্প
লোক মনে আর আখর অঙ্গে ॥৫৯

অই সে পাটলি পাটনা রূপী
পরিয়া কর্পর মাঘার বাঁশে
অতীব জর্জ্জর সুদীন দর্শন
লুঠিছে ভুকায়ে ধূলার সঙ্গে ॥৬০

না আছে গর্জন না সে তরঙ্গ
ডাকে রহি রহি কুক্কুর ফেরু
না উড়ে সে গেরু না সে পতাকা
সব সুশায়িত কালের অঙ্কে ॥৬১

এলো তবে ঝড় লইয়া রাতি
বরষি শোণিত লুণ্ঠন হত্যা
হইল যে হতে তাবত সঙ্গে
খুইয়া ভীরুতা কায় উলঙ্গে ॥৬২

নিল উড়াইয়া যা কিছু গায়ে
ছিল বিভূষণ স্বাধীন কালে
হলো বিচুরণ মান কি গৌরব
নিখিল জীবন সাহস সঙ্গে ॥৬৩

গেল খসি প্রাণ খুইয়া খাঁচা
অবসাদে সব ডুবাই শেষে
উড়িল দীঘল সে ঝড় ব্যাপী
অতি বেগ ভরে তম তরঙ্গে ॥৬৪

আইল বিশ্রাম সে তবে অল্প
লইল তারতে নিশ্বাস বায়ু
সরিল আঁধার কিছুটা সে যে
দেখাতে পীড়ন কুদশা অঙ্গে ॥৬৫

দেশ

খেলিত সে কালে — এ জলে ভাসি
সে হাসি আশ্বের কৌমুদীমালা।
উঠিতে উচ্ছ্বসি উঠে যেভাবে
উথলি সাগর হেরি শশাঙ্কে ॥৪১

দোঁহারে সে সুখ — মিলন সঙ্গে
পারিলে সে যে কি গৌরব চূড়া
ছিঁড়িল কণ্টক জাতির [illegible] ফুলে
সেদিন সে সুখ — প্রেম তরঙ্গে ॥৪২

মিশিল আসিয়া জ্ঞানের ধারা
মিলি খুলি তবে সে স্রোত বেগে
শিখালে শিখিলে কত যে বার্ত্তা
স্বাধীনা যেদিন তুমি তরঙ্গে ॥৪৩

রক্ষিতা এ তটে বিশাল ধানী
পাটলিপুত্র সে উৎসব নাটে
উজলি গৌরবে হাসি যে কলে
খেলিল সমসাদে বিহার বঙ্গে ॥৪৪

"গঙ্গা তরঙ্গে"র একটি পৃষ্ঠার আলোক চিত্র

জাগিল অন্তরে বাসনা বেথা
ছিল যা নিদ্রিত দিন না পাই
আহা! সেকি লাগি বিফল সুদূ!
আশায় পঙ্গু কি পাহাড় লঙ্ঘে? ॥৬৬

উঠিল সে তবে পুনঃ বিরামে
আবার ঝঞ্ঝার উদে যাগ আসি
না ঘুচিতে গ্লানি না হইতে দিবা
এতব দুতটে ভীম তরঙ্গে ॥৬৭

উঠিল কঙ্কলে আঘাত পাই
ছিল যাতে কিছু প্রাণের শিরা
সে নিশা শেষেতে সে পুন্ন বাতে
তব এ তীরের ছায়ার অঙ্কে ॥৬৮

অহ! উষার সে সমীর কোলে
উঠিল সে দ্রোহ আগুন জ্বালি
ব্যাপীল চৌদিশ ভীষণ দৃশ্যে
বাড়ব তুল্য এ জল তরঙ্গে ॥৬৯

গ্রাসিল বিপ্লব গোলা ও তোপে
তরাল আগুন বারুদে ছাই
না রাখিয়া ভেদ দিবা কি রাতির
বিকট ভীষণ ভয়ের সঙ্গে ॥৭০

খেলিল কন্দুকে মানুস মুণ্ডে
তরবারি শত আকাশে লাফি

পাদপে পাদপে শবের ঝুলো
ঝুলিল সে কত এতট অঙ্গে ॥৭১

ভুলি গেলো সুত আপন তাতে
ভুলি গেলো প্রিয় স্বামীরে দারা
সে ঝড় প্রলয়ে নিল কত যে
শরণ সমাধি তব তরঙ্গে ॥৭২

হলো নির্বাসিত বাঁচাতে বাড়ী
মরিল রাখিতে জীবন জাতি
কত লাখ লাখ সে দিবা অর্ঘে
মাখি লহ শবে তোমায়, গঙ্গে ॥৭৩

না আছে মন্দির মঠ কি চিতা
স্মরণ সঙ্কেত সে শব পুঞ্জে
না ক্ষয় কাঁদিয়া গান কি গাথা
না বহে আখর নামের অঙ্গে ॥৭৪

কেহ না গণিল শুনিল কানে
সে শব রাশির সে অশ্রু বেথা
উঠিয়া হৃদয়ে হৃদয় গালি
বহি গেল ধারে শোণিত সঙ্গে ॥৭৫

ওপথ ওগলি এ নদী নালা
এঘাট মাঠ এ আবরজনা
সমাধি তাদের এ যতরে নদি!
অচিন উড্ডীন এ রক্ত পঙ্কে ॥৭৬

উঠিতো শব্দ সে
নিভৃতে এতটে
ভাই ভাই রবে
মরম ভেদীয়া
কভু বিলাপে
নিশীথ আধে
নীরব ভাঙ্গি
করুণ কণ্ঠে॥৭৭

শব্দিত জাগিত
বেরতো না ভয়ে
বহিত সে রব
গভীর রাতির
প্রহরী যারা
তলাসে কেহ
এ নানা দিকে
ঘাত তরঙ্গে॥৭৮

কে জানে কাছার
আসিত সে ধ্বনি
ব্যাথিয়া অন্তর
অপ্রতি কারিত
কোথা হইতে
নিশির ঘিরে
তিতাই আঁখি
দুখের সঙ্গে॥৭৯

উঠি কিছুদিন
ডুবিল এ নীল
মিটি গেল তার
করি তিল তিল
ধ্বনি সে ভাবে
আকাশ গায়ে
কথা ও বার্তা
স্মৃতির অঙ্গে॥৮০

গেলো ধুয়ে তবে
ছিল যা মিশ্রিত
থুইল এ জল
রচিতে পাথর
সে ধুলো বালী
শোণিত হাড়ে
স্রোতে বহাই
সাগর পঙ্কে॥৮১

পড়িবে তাহাতে
আকৃতি আচার
বিনাশ কাহানী
আসিবে যারা সে
মাপি সে অস্থি
যুগের সংখ্যা
গুলির চিহ্নে
যুগ যুগান্তে॥৮২

আসিবে সে কোন
পরিবর্তিলে এ
রবে না মানব
পড়িতে প্রাণের
নূতন প্রাণী
সাগর মেরু
রহিবে প্রাণ সে
চিহ্ন ঘরাঙ্কে॥৮৩

পড়িবে সে তবে
সে হাড়ে যেরূপে
লোভ আকাঙ্ক্ষার
রঞ্জিল পঞ্জর
উন্নত জাতি
মানুষ পশু
তর্পণ লাগি
মানুষ অঙ্গে॥৮৪

পড়িবে যেভাবে
প্রবৃত্তি সম্বেগ
জ্বলিয়া আঘাতে
আগ্নেয় প্রায় এ
তুলিলো দ্রোহ
মরম নীচে
আগুনে অস্ত্রে
বসুধা অঙ্কে॥৮৫

পড়িবে যেরূপে
হলো নিপীড়িত
কবে হাড় তবে
অশান্তি উদ্বেগ
প্রবল গ্রাসে
দুর্বল ভীরু
ছিল যে গাঁথা
প্রাণের সঙ্গে॥৮৬

কবে এ প্রাণের
ছিল ছড়ান যে
ডুবিল জীব এ
বহি ব্যথা বিষ
জীবন ভোগে
কণ্টক মালা
ভবে যেভাবে
প্রাণের অঙ্গে॥৮৭

আছে সৌসাদৃশ্য
তাই আশা করি
ঢালিছে এ যত
হই তরঙ্গিত
নরে তোমাতে
সহানুভূতি
মন এ আবেগে
স্বীয় তরঙ্গে॥৮৮

অহ! কি আমোদ
সদা উদাসীনী
যায় আরম্ভেতে
উপস্থিতে বহি
যাও প্রবাহি
ভাবিও ভূতে
মানব জীবন
যেমন রঙ্গে॥৮৯

চায় উছলিয়া
গায় পারণ এ
ধ্বনি সুখে দুখে
বন গুহা গিরি
তোমার সাথে
মনের গাথা
দিন কি যামিনী
সার তরঙ্গে॥৯০

আসে মেঘ বহি
যায় প্রহারিয়া
না থোয় দাগ কি
এ দ্রব কাচের
ধাত কুলীশে
ভাসি দিগন্তে
বেদনা রুধ্র
নির্মল অঙ্গে॥৯১

কিন্তু বিপর্যয়
এ যত লক্ষণ
তার সে প্রাণের
মিটে না মিটিলে
মানব দেহে
স্রোতে তোমারি
ছেদ কি বেথা
সেনা চিতাঙ্গে॥৯২

এ তব ধরার
কম্প প্রসারণ
সবারি বাহিনি!
তব সে প্রাণেশ
বেগ যতেক
কল্লোল গীতি
অবধি সীমা
বারীশ অঙ্কে॥৯৩

কিন্তু এ প্রাণের
বিশাল এ ডুবি
ডিঙ্গিয়া বিশ্বের
ধায় অকূল ঐ
গতি অনন্ত
কারা ইহারে
রাশী উছালি
আকাশ অঙ্গে॥৯৪

হই বিভ্রান্ত সে
না পায় ভাবিয়া
হিমানী প্রাচীরে
বিবৃত যেমন
অনন্ত মাঝে
কিছু সেখানে
তব প্রবাহ
বেগ তরঙ্গে॥৯৫

দৌড়ে কোথায় না
ডোবে কি সেই না
অথির ভ্রান্ত এ
মিটে শেষে ভবে
কিসের লাগি
ধরিয়া কারে
প্রাণের ধারা
ধূলার সঙ্গে॥৯৬

লই অপূরণ
অতৃপ্ত জীবন
হয় কাল বুকে
ফল্গু যথা নদি!
মনের আশা
খেদ অশান্তি
চির আদেখা
সৈকত অঙ্গে॥৯৭

যায় শারি শারি
কোথা কে জানে সে
আসে নব স্রোত
গর্জিয়া কিছু না
ভূতল ছাড়ি
ধারা অনন্ত
ফেনা উঠাই
গনি ভ্রূভঙ্গে॥৯৮

অহ!! কি প্রকাণ্ড
এ যত উৎপ্লবে
নিরখ এ হাসি
বহে যত সুখ
কাণ্ড মদান্ধ
প্রাণ প্রবাহে
কান্নার ক্রীড়া
দুখ প্রসঙ্গে॥৯৯

যায় নিতি বহি
মত্ত প্রমাদে এ
উঠি পড়ি নানা
তব গতি প্রায়
ধাই বিনাশে
জীব তরঙ্গ
দশার শৈলে
কালাব্দি অঙ্কে॥১০০ *

---

* কবি কাব্যটিকে সংশোধন করেন নাই। লিখিবার পর যেখানে প্রয়োজন মনে করিয়াছেন সেখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা অন্য চিহ্ন পাণ্ডুলিপিতে রাখিয়াছিলেন, পরে অবসর সময়ে সংশোধন করিবেন আশায়। এই কাব্যের শেষে এইজন্যে লিখিয়াছিলেন—

"The latter part of this song has not been properly revised—so you can add or substract or modify any portion of it what you think fit or unfit."

তিনি ইহা লিখিয়া পরে নিজেকে মনে করাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-কারণেই হউক তাহা হয় নাই। আমরা কবির রচনা হুবহু তুলিয়া দিলাম।

—সংগ্রাহক

ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়াকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁর কাছে সবিনয়ে একথাও নিবেদন করিতেছি যে—কংগ্রেসের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য

একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের প্রয়োজনই আজ সকলের আগে।

* * * * *

দৈনন্দিন টেলিফোন বিভ্রাটে রাগিয়া আগুন হইলেও আমরা এত বড় অভিশাপ কিন্তু কোনদিন দিই নাই। কার 'ছাপে' এই আগুন জ্বলিল, তার অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

* * * * *

পণ্ডিত জওহরলালজীর বিলাত সফরের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বোম্বাইর Blitz কাগজের সংবাদদাতা জানাইতেছেন—"He has made a big hit." আমাদের বিশু খুড়ো জানাইলেন—জনাব লিয়াকৎ আলীও নাকি Hit করিতেই গিয়াছিলেন, কিন্তু L-B-W হইয়া গেলেন।

* * * * *

লিয়াকৎ আলী খাঁ সাহেব বলিয়াছেন—পাকিস্থানের অবস্থা "Sound" আমরাও তাই শুনিয়াছি, আর বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছি—"এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়?"

* * * * *

পূর্ব-পাকিস্থান হইতে কোন অ-মুসলমান বাস্তু ত্যাগ করিয়া আসেন নাই—এই উক্তি করিয়াছেন হামিদুল হক চৌধুরী সাহেব। পশ্চিম বাঙলা সরকার না-হক্ মাথা ঘামাইতেছেন।

কমনওয়েলথ কনফারেন্সকে রাজা—Brotherhood of Nations বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আমরা Sisterhood of Nations-এর অভাব অনুভব করিতেছি, বিশেষ করিয়া এই ভাইফোঁটার মরসুমে।

* * * *

DOMINION premiers talked about everything—from curried chicken to capital goods"—

—একটি সংবাদ। খুড়ো বলিলেন—"তাঁরা একমত হয়েছেন হয়ত এই Chicken প্রসঙ্গেই।"

* * *

অনেকে বলিতেছেন—ভারতে বসিয়া ফরাসী সরকার যাহা করিতেছেন, তাহা ফার্সেরই সামিল। শুধু একজন বলিতেছেন—"বৃটিশ কুইট করেছে, এখন ফ্রান্স French leave নিলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।"

* * * * *

NATURALISTS claim that fish have no method of communication.—

খুড়ো আমাদিগকে শুনাইলেন—"মাছের টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অনেক আগেই আগুন লেগেছে।"

* * * *

কোন কোন প্রদেশে ছোটদের ধূমপানে বিরত রাখিবার জন্য আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে কিছু ফল পাওয়া যাইবে কি? তার চেয়ে স্বর্গত সুকুমার রায় বর্ণিত—"জ্যাঠা ছেলে বিড়ি খায় কান ধরে টানিও"—নীতিটা অধিকতর কার্যকরী হইবে বলিয়াই মনে হয়।

A Muslim of France intends to claim the world record for underwater swimming.—

—একটি সংবাদ। "কিন্তু ডুব দিয়ে জল খেয়ে একাদশীকে ফাঁকি দেওয়ার রেকর্ড হিন্দুরা অনেক আগেই স্থাপন করেছেন"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * * *

অস্ট্রেলিয়ায় নাকি হাওয়াই জাহাজ হইতে ধান বোনার ব্যবস্থা হইতেছে। ধান ফলার পর তাকে "হাওয়া" করিয়া দেওয়ার কায়দাটা আমরা অনেক আগেই শিখিয়া ফেলিয়াছি।

* * * * *

একটি সংবাদে জানিলাম, কলিকাতায় অনেকগুলি দুধালো গাই আর মোষ আমদানী করা হইয়াছে।

"জলালো গাই আর মোষগুলো রপ্তানি করা হয়েছে কি না, তার খবর রাখ কি?"—জিজ্ঞাসা করেন খুড়ো।

* * * * *

আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক একটি তারকা আবিষ্কার করিয়াছেন—সেটি নাকি সূর্যের চেয়ে দশ হাজার গুণ উজ্জ্বল-

তর।—কিন্তু মাত্র একটি তারকা? —বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই টলিউড দেখেন নাই।

* * * * *

বাঙলার প্রদেশপাল একাদশের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হইতেছে।

অতঃপর কাজে কাজেই কলিকাতায় একটি স্টেডিয়ামের ব্যবস্থা প্রদেশপাল করিয়া যাইবেন, একথা কেহ ভাবিলে বলিব বাঙলার মাটি এবং রাজনীতি এই দুই ব্যাপারেই তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সেপ্টেম্বরের গোড়াতে কলকাতার ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিও তত্রস্থ একুশ জন কর্মীকে বরখাস্ত করে দেবার পর অক্টোবর শেষ হওয়ার সঙ্গে বাকী প্রায় পঞ্চাশ জন কলাকুশলী ও কর্মীকেও বরখাস্ত করে দিয়েছে। সমস্ত লোককেই ছাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য স্টুডিওটি বন্ধ করে দেওয়া নয়, স্টুডিওর পরিচালন কর্তৃত্ব পরিবর্তন করার জন্যেই এই ব্যবস্থা বরখাস্ত নোটিশে জানানো হয়েছে যে, "বাজার মন্দা পড়ায় স্টুডিওর কাজ পড়ে গিয়েছে, কাজেই তোমাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হলো।" ভেতরকার খবর যারা রাখেন, তারা বলছেন যে, এ উক্তি সত্য নয়, আসলে স্টুডিওর মালিকদের নিজেদের মধ্যে পরিচালনা ব্যাপারে কোন মিল না হওয়ায় তারা আগামী পাঁচ বছরের জন্যে স্টুডিওটি এম-পি পিকচার্সের শ্রীমুরলী চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং নতুন পরিচালনা কর্তাদের নির্দেশ মতই প্রত্যেকটি কর্মীকেই বরখাস্ত করা হয়েছে। শোনা যায়, মালিকরা কর্মীদের বহাল রাখার জন্যে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু তাতে এম-পিরা নাকি রাজী হয় নি। অবশ্য তা না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ যে চালাবে সে তার নিজের পেটোয়া লোকের প্রতিই ঝুঁকবে আর তার জন্যে তাকে দোষীও বলা যায় না। কিন্তু দু-বছর আগে থেকে বন-জঙ্গল কেটে এই যে পঞ্চাশাধিক কর্মী ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওকে দাঁড় করালো তাদের এই রকম আকস্মিকভাবে বরখাস্ত করে মালিকদের কোন অনুশোচনা তো দূরের কথা নোটিশে সামান্য একটা সহানুভূতি প্রকাশও যে পেল না এইটেই সবচেয়ে দুঃখের বিষয়; অথচ এই কর্মীদের প্রত্যেককেই কর্মরত অবস্থা থেকেই অপর স্টুডিও থেকে প্রলোভন দেখিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিলো। এবং আমরা জানি যে, এই কর্মীরাই এই কালো-বাজারী যুগেও সততা, কর্মনিষ্ঠা এবং গুণ-পণায় স্টুডিওটিকে অল্পদিনের মধ্যে কলকাতার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলো—স্টুডিওতে যারা ছবি তুলেছেন, সেই সব ভাড়াটে প্রযোজক, পরি-চালক, শিল্পী ও কর্মী—তারাই একথা উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশ করে থাকেন। মালিকরা বাজার মন্দার যে অজুহাত দেখিয়েছেন, সেটা যে আসল কারণ নয়, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না, কারণ সত্যিই যদি তাই হতো তো মুরলী-বাবুর মতো চিত্র-ব্যবসাদার একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি স্টুডিওটি সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই গ্রহণ করতেন না। যাক সে কথা। বরখাস্ত কর্মীরা হয়তো অন্যত্র কাজ জুটিয়ে নিতেও পারবে—দুটি নতুন স্টুডিও খোলা হচ্ছে, তাছাড়া এম-পি দলের হয়ে যারা ন্যাশনালে যোগদান করবে, তাদের পরিত্যক্ত পদগুলিও হয়তো খালি হচ্ছে এবং সেসব পদে কিছু কিছু লোকের নিয়োগ লাভ সম্ভাব্য হবে হয়তো। কিন্তু চলচ্চিত্র কর্মী ও কলাকুশলীদের এই-ভাবে যাযাবর অবস্থা আর কতদিন চলবে? একে তো চলচ্চিত্র-জগতে কলাকুশলীদের কার্যকাল দশ-বারো বছরেই শেষ হয়ে যায়, তার মধ্যেও যদি ওদের অনবরতই কার্যক্ষেত্র বদল করে চলতে হয় তো তাদের অবস্থা কি দাঁড়ায়, ভেবে দেখবার বিষয়—এখন যেমন সব স্টুডিওতেই দেখা যায়, যাদের উন্নতির চেয়ে চাকরীর স্থায়িত্ব নিয়েই কর্মী ও কলা-কুশলীদের মগজ ও মন এমনি ভরে থাকে যে ছবির উৎকর্ষের জন্যে প্রাণ ঢেলে কাজ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সম্প্রতি একই

শার্লি টেম্পল তার তিন মাসের মেয়ে লিণ্ডা সুসানকে নিয়ে গত ২১শে মে হলিউডে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ান। মেয়ের বাবা জন আগর ছেলেবেলায় শার্লির সঙ্গেই অভিনয় করতেন এবং উপস্থিত দুজনেই ছবি তোলার কাজে লিপ্ত আছেন।

দিনে কলকাতার বর্তমান বারোটি স্টুডিওর মধ্যে পাঁচটি পরিভ্রমণ করার সুযোগ হ'য়েছিলো। প্রত্যেকটি স্টুডিওর কর্মী ও কলাকুশলীদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় দেখা গেলো চাকরীর স্থায়িত্ব প্রায় নির্ধারিত দিনে বেতন পাওয়া না-পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজে তাদের কারুরই গাফিলতী নেই, বেশ নিষ্ঠার সংগেই তারা কাজ করছে, কিন্তু একাগ্রভাবে বলা যায় কি? অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাবার পক্ষে মনেপ্রাণে যতটা আবেগ সঞ্চার দরকার, তাদের চিন্তা যতটা নিরঙ্কুশ হওয়া দরকার, তা কি হ'তে পারছে কারুরই ক্ষেত্রে? এখানকার চলচ্চিত্রশিল্পের কর্ণধাররা এসব বিষয়ে দৃক্‌পাত করা প্রয়োজনও মনে করেন ব'লে মনে হয় না, অথচ সত্যিই ভালো ছবি ক'রতে গেলে এদিকটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। তা হ'লে একটা সুব্যবস্থা ক'রবে কে?

নূতন ছবির পরিচয়

মহাকাল (চিত্রবাণী)—

কাহিনী ঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা-তত্ত্বাবধায়ক ঃ নীরেন লাহিড়ী, পরিচালনা ঃ ধীরেশ ঘোষ, আলোকচিত্র ঃ সুহৃদ ঘোষ, শব্দযন্ত্রী ঃ সত্যেন ঘোষ, সুর ঃ গোপেন মল্লিক।

ভূমিকায় ঃ শ্যাম লাহা, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা, অমিতা প্রভৃতি।

ছবিখানি ২২শে অক্টোবর মিনার-বিজলী-ছবিঘরে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

বাঙলা ছবি নিয়ে খুব বেশী রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ হ'য়েছে কিছুকাল ধরে বিভিন্ন ছবির সমালোচনা প্রসংগে আমরা তা ব্যক্ত করেছি; 'মহাকাল' সেই যথেচ্ছাচারিতারই একটি চরম পরিচয়। নিজেদের ক্ষমতাকে খুব বড় ভাবা সিনেমা লাইনের দস্তুর তো আছেই কিন্তু তা যে একেবারে মাত্রাছাড়া 'মহাকাল'-এর নির্মাতাদের বেলা সেই পরিচয়ই পাওয়া যায়। কারণ তারা তাদের ক্ষমতার স্ট্যাণ্ডার্ড এবারে আর এদেশী স্ট্যাণ্ডার্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি, তারা পাল্লা দিতে বেরিয়েছেন একেবারে হলিউডের শ্রেষ্ঠদের সংগে। তা না হ'লে, নির্বাক যুগে এবং সবাক যুগে যে কাহিনীর এক একটি চিত্র সংস্করণ সমগ্র চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাসকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলতে সমর্থ হয়েছে, এখানকার সর্বদিকের ক্ষমতা ও কৃতিত্বের কথা জেনেও তারই বাঙলা সংস্করণ তোলবার মত ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রতে আসতো না এরা। পৃথিবীর সাহিত্যে অমর সৃষ্টি 'হাঞ্চ ব্যাক অফ্ নোতরদাম'এর নির্বাক ও সবাক চিত্র সংস্করণও চিত্রজগতের রত্ন বিশেষ; সেকথা জেনেও সেই কাহিনীরই অনুসরণে রচিত 'মহাকাল' তোলার পিছনে যে বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় প্রকট হ'য়ে ওঠে, ছবিখানির প্রতি ফুটেই সেই মস্তিষ্কের প্রভাবই স্পষ্ট। সত্যিই এই আকাশকুম্বী ধৃষ্টতা দেখাবার সাহস এরা পেলো কি ক'রে! তাছাড়া, তুলনা থেকে যদি বিরতও হওয়া যায়, যদি সাহিত্যসৃষ্টি হিসেবে বা নির্বাক ও সবাক পূর্ববর্তী ইংরাজী শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে 'হ্যাঞ্চব্যাক্ অফ্ নোতরদাম'এর কথা 'মহাকাল'এর বিচার প্রসংগে মন থেকে মুছেও ফেলা যায়, যদি এটাকে একটা মৌলিক কাহিনী অবলম্বনে গঠিত মৌলিক চিত্রাবদান ব'লেও ধ'রে নেওয়া হয় তা হ'লেও একমাত্র বাঙলা ছবির বিচারেও ছবিখানি এক মহা-জঞ্জাল ব'লেই পরিগণিত হয়ে উঠবে। এমন সর্বাংগীন বৈষম্য ও সামঞ্জস্যহীনতা নিয়ে আর কোনও ছবি বাঙলার পর্দাকে কলঙ্কিত ক'রেছে বলে আমাদের মনে পড়ে না।

কাহিনী যেটুকু পাওয়া যায় তা হ'চ্ছে ঃ ছোট মেয়ে কৃষ্ণাকে দেখে বেদে দলের রাণী বুঝতে পারে যে কালে মেয়েটি রাজরাণী হবে, বহু লোক ওর পায়ে লুটিয়ে পড়বে কাজেই অমন একটি মেয়ে ওদের দলে থাকলে ওদের দলের সমৃদ্ধিও অনেক বেড়ে যাবে; তাই কৃষ্ণাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেলো ওরা। বড় হ'য়ে কৃষ্ণা হ'লো বেদেনী মেঘমালা। ওদিকে কৃষ্ণার বদলে তার জায়গায় মানুষের নামে যে মাংসপিণ্ডটাকে বেদেরা রেখে এসেছিলো সে বড় হ'তে লাগলো মহাকাল মন্দিরে পুরোহিতের আশ্রয়ে; জড়বুদ্ধি কদাকার কুব্জ কর্কটের কাজ হ'লো দুবেলা মন্দিরের ঘণ্টা বাজানো; মন্দিরের চূড়োর ঘণ্টা কোঠাতেই তার বাস। মেঘমালা পথে পথে নেচে গেয়ে বেড়ায়। একদিন মহাকালের উৎসব শেষে মেঘমালা মন্দিরে প্রবেশ ক'রে বসে। পুরোহিত নীলকণ্ঠ ওকে দেখে মোহিত হয়ে পড়ে, তার ওপর মেঘমালা তাকে অপমান করায় ওকে পাবার জন্যে পুরোহিত কৃতসংকল্প হয়। মেঘমালা একা ফেরার সময় নীলকণ্ঠের নির্দেশে কর্কট তাকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজপুরুষ অনিরুদ্ধ মেঘমালাকে উদ্ধার করলেও নারী অপহরণের অপরাধে কর্কটকে জনসমক্ষে বেত্রাঘাত করার শাস্তি দেওয়া হয়। বেত্রাঘাতে জর্জরিত কর্কট এক ফোঁটা জলের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাতে সমবেত জনতা যখন বিদ্রূপে মেতে উঠেছিলো তখন মেঘমালাই এগিয়ে এসে তাকে জলপান করালে। কর্কট কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। ওদিকে মেঘমালা নিজের আড্ডায় ফিরে গিয়ে দেখলে যে ওর লোকেরা এক কবিকে ধ'রে ফাঁসি দেবার উপক্রম ক'রেছে, কিন্তু সর্দার জানালে যে কেউ যদি কবিকে বিয়ে করে তাহ'লে ফাঁসি রদ হ'তে পারে। কেউ রাজী নয় দেখে মেঘমালাই কবিকে বিবাহ ক'রলে। মেঘমালার মনেতে গাঁথা কিন্তু অনিরুদ্ধের ছবি। একদিন আকস্মিকভাবে মেঘমালা অনিরুদ্ধের দেখা পেলে; এক রাত্রে বেতসী নদীর ধারে ওরা মিলিত হবে ঠিক হ'লো; নীলকণ্ঠ অলক্ষ্যে তা শুনলে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্জনে মেঘমালা অনিরুদ্ধের সংগে মিলিত হ'লো, কিন্তু সুযোগ পেয়ে নীলকণ্ঠ অনিরুদ্ধকে ছুরিকাঘাত ক'রলে। অনিরুদ্ধকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হ'লো মেঘমালা এবং তার শাস্তি হ'লো মৃত্যু। নীলকণ্ঠ মেঘমালাকে প্রেম নিবেদন করে জানালে যে মেঘমালা যদি তার সংগে পালিয়ে যেতে রাজী হয় তাকে মুক্ত ক'রে দিতে পারবে। মেঘমালা রাজী নয়, সুতরাং তাকে ফাঁসিস্থলে নিয়ে যাওয়া হ'লো। কর্কট তার সেদিনকার জল দেওয়ার উপকারের ঋণ শোধ করার একটা সুযোগ পেলে। মেঘমালাকে সে যেন যাদুবলে ফাঁসীমঞ্চ থেকে তুলে একেবারে তার বাসায় এনে ফেললে। নীলকণ্ঠ এলো মেঘমালাকে গ্রহণ করার জন্য, কিন্তু কর্কট তাকে যেতে দিলে না ঃ দুজনে মারামারি আরম্ভ হ'লো, নীলকণ্ঠ নিহত হ'লো; মেঘমালা উদ্ধার পেলে, কর্কট মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়ে চললো।

একেবারেই ছেলেমানুষী গল্প, তার ওপর তার রূপও দেওয়া হয়েছে একেবারেই আজগুবি ধরণে। যেমনি ভাষা ও ভাবভঙ্গী, তেমনি সাজপোষাক ও দৃশ্যসজ্জা, সব কিছুই কেমন যেন বেখাপ্পা, কেমন যেন ছন্দছাড়া। ছবিখানিকে সব দিক থেকেই উদ্ভট ও আজগুবি ক'রে তোলার জন্যে খরচ হ'য়েছে সাধারণ বাংলা ছবির চেয়ে অনেক বেশী, তা দেখেই বোঝা যায়, তেমনি নিকৃষ্টতায়ও সাধারণ বাঙলা ছবির চেয়ে 'মহাকাল' অনেক নীচের ধাপে গিয়ে পড়ে। কোন কিছুই মনেতে বিরক্তি ছাড়া খুশী জোগাতে পারে না। একজন প্রখ্যাতনামা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে তোলা এমন চৌকষ বাজে ছবি দেখবার সুযোগ কমই ঘটেছে। ছবিখানির যাবতীয় দিকের মধ্যে প্রশংসা করা যায় আলোকচিত্রকে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে তার আর অস্তিত্ব কোথায়? তা' ছাড়া কর্কটের ভূমিকায় শ্যাম লাহার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় অবশ্য যদি দেখবার সময় লন চেনী বা চার্লস লাফটনের কথা মনে না আসে। ছবিখানি দেখে শুধু এইমাত্র বলতে হয় যে, ধৃষ্টতারও সীমা থাকা দরকার।

দেশ

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ২৭শে কার্তিক, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 13th November, 1948. [২য় সংখ্যা

ভারতের বাণী

সাম্রাজ্য প্রধান মন্ত্রিসম্মেলনে যোগদান করিবার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। সাম্রাজ্য মন্ত্রণা-সম্মেলনে তিনি ভারতের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘের সদস্যগণের সাধারণ সভায় পণ্ডিতজীর অভিভাষণ জগতে নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুতঃ পণ্ডিতজী বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া যে সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন, জগতের অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে অদ্যাপি সে সম্মানলাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীরা লণ্ডনে সমবেত হইয়াছিলেন, এবং পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী ঐ সময় প্যারিসে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তিনি আমন্ত্রিত হন নাই। অন্যান্য প্রধান মন্ত্রীরাও আমন্ত্রণ পাইলে বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে অভিভাষণ প্রদান করিবার জন্য প্যারিসে উপস্থিত হইতে পারিতেন, কিন্তু সংঘের সদস্যগণ সে প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই. পণ্ডিত জওহরলালকেই তাঁহারা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেন। ইহার কারণ কি? পণ্ডিত জওহরলালের কাছে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু আশা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতানুগতিক পারস্পরিক বিদ্বেষ-বিরোধের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনিতে চাহেন নাই। হিংসা ও বিদ্বেষের যে আবর্তের মধ্যে বর্তমানে জগৎ পতিত হইয়াছে, তাহা হইতে যাহাতে জগৎ রক্ষা পায়, এমন কিছু জানাইবার ক্ষমতা ভারতেরই আছে, বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘ সদস্যগণ এই বিশ্বাসে এক্ষেত্রে আগ্রহান্বিত হন এবং এজন্যই তাঁহারা ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করেন। রাজনীতি সাধারণভাবে মানুষের মনের সনাতন সুচেতনের সন্ধান রাখে না এবং সমষ্টি চেতনার বেদনাকে সম্যকভাবে স্পর্শ করে না। রাজনৈতিক বিচিকিৎসা সাময়িক এবং অনেক ক্ষেত্রেই একান্ত বাহিরের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকে। সত্য দৃষ্টির অভাবে এজন্য রাজনীতিকের দৃষ্টি অনেক সময়েই পরিচ্ছিন্ন এবং গণ্ডীবদ্ধ স্বার্থেই তাহা সমীহিত হয়। এমন রাজনীতির কোন স্থায়িত্ব নাই এবং এই ধরণের রাজনীতির অনুশীলনে যিনি যত বড় শক্তিরই পরিচয় দিন না কেন, স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাঁহাদের সাধনার সৌধ বালুর ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাঁহাদের কর্মময় জীবনের প্রচণ্ড দীপ্তিও বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ভারত নূতন পথ দেখাইয়াছে। ভারতের রাজনীতিক সাধনা বাহ্য বিদ্বেষ-বিরোধকে অতিক্রম করিয়া মানুষের মনোমূলে আত্মনিহিত এক উদার পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। সে সত্য সনাতন, সর্বজনীন এবং সর্বকালে, সব দেশে তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। মহাত্মা গান্ধী এই সত্যের দ্রষ্টা এবং উদ্গাতা। বাহ্য রাজনীতির পরিবর্তনশীল সাময়িকতার চঞ্চল এবং বিভ্রমকর আবর্তনের মধ্যে আত্মনিষ্ঠিত জীবনের সত্যের সাধনায় দৃষ্টিকে অপরিচ্ছন্ন রাখিয়া ভারতের মহামানব এক পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তিনি সেই সত্যের উপর রাজনীতিক সাধনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া সাময়িক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের এক সনাতন এবং অভ্রান্ত পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সে বাণী জগতের অন্তরকে স্পর্শ করে। কারণ সমষ্টি মনের একান্ত সান্ত্বনা তাহাতে রহিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল মহাত্মাজীর অধ্যাত্ম-সাধনার অন্তর্নিহিত সেই সত্যকে বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে প্রচার করিয়াছেন। তিনি সেই সত্যকে ব্যাপ্তিরূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পণ্ডিতজী নিজেও বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে তাঁহার আমন্ত্রণের কারণস্বরূপে এই কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমই মানব জীবনের পরম প্রয়োজন, মৈত্রীই সংস্কৃতির মূলগত শক্তি, ভারতের তত্ত্বনীতির ইহাই বাণী। বর্তমান রাজনীতির হিংসাত্মক আন্দোলনে মানুষ এই সত্য ভুলিতে বসিয়াছিল। গান্ধীজী আত্ম-সাধনায় ভারতকে প্রাণ দিয়াছেন, জীবন দিয়া ভারতের সংস্কৃতিকে তিনি সঞ্জীবিত করিয়াছেন। জগৎকে যদি বাঁচিতে হয়, ভারতের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতকে ছাড়া জগৎ বাঁচিবে না। বস্তুত আণবিক বোমার আবিষ্কার বর্তমানে জগৎকে এমন অবস্থার মধ্যে লইয়া ফেলিয়াছে যে, ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার পথ যদি সে অনুসরণ না করে, মহামানব গান্ধীজীর জীবন-মহিমাকে রাষ্ট্রে এবং সমাজে উদ্দীপ্ত করিতে না চায়, তবে ধ্বংস তাহার অনিবার্য। সত্য সঙ্কল্পের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয় না। ছটফট বাড়াইয়া কেহ সত্যের বললাভ করিতেও সমর্থ হয় না। বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের সদস্যগণও তাহা পাইবেন না। তাঁহাদের সব কচায়ন অতীতের মত ব্যর্থতারেই পর্যবসিত হইবে। লড়াই তো চলিতেছে, আগুন তো জ্বলিতেছে। তাহাদের কোন্ সিদ্ধান্ত কতটা কাজে আসিতেছে সুতরাং সত্যের পথ তাঁহাদিগকে ধরিতে হইবে। পণ্ডিত জওহরলালকে সম্মান দিয়া সত্যের প্রতিই তাঁহারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। এদেশের অধ্যাত্ম-সাধনার বাণীর গুরুত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা আশার

কথা ভারতের কৌপীন সম্বল মহামানবের আদর্শের প্রতি তাঁহাদের আগ্রহের এই আন্তরিকতা জগতে গৌরবময় নূতন যুগের উদ্বোধনই সূচনা করিতেছে।

বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা

পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের লইয়া জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহার সমাধানের জন্য নানারকম চেষ্টা চলিতেছে। পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা অতীতে হইয়াছে এবং আরও হইবে বলিয়া শুনিতেছি। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু পূর্ব পাকিস্থানের ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকায় গিয়া কার্যভার গ্রহণও করিবেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার পাকাপাকি নিয়োগের এই পর্বটা সম্পন্ন হইতে এত বিলম্ব কেন ঘটিল, ইহাই আমাদের পক্ষে বিস্ময়কর বিষয়। *এই নিয়োগ যদি পূর্বে হইত, তবে পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনের বল অন্ততঃ কিছুটা বাড়িত বলিয়া আমাদের মনে হয়।* প্রধানতঃ অসহায়ত্বের একটা মনোভাবই তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে অনেকে অনেক রকম উপদেশ দিতেছেন। *কেহ কেহ তাঁহাদিগকে স্থানত্যাগ না করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিতেছেন। পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীরা সংস্কৃতির মর্যাদা-সম্পন্ন, স্বদেশ-প্রেম তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়।* সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের উপদেশ অবান্তর বলিয়াই আমরা মনে করি। *প্রকৃতপক্ষে মনে জোর বাঁধ বলিলেই মনের গোড়ায় জোর যোগাড় করিয়া তোলা যায় না।* পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদী-দের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, ইহা সত্য; কিন্তু সে প্রতিবেশ এখন তাঁহারা পাইতেছেন না, ইহা বুঝিতে হইবে এবং বাস্তব পরিস্থিতির বিচার করিতে হইবে। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের স্বাধীনতার অখণ্ড আদর্শ তাহাদের মনকে সে অবস্থায় বল দিত, জাতির সমষ্টি মনের সমর্থন তাঁহাদের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করিত। বলিষ্ঠ আদর্শের সে প্রেরণা হইতে তাঁহারা এখন বঞ্চিত। এক্ষেত্রে নিজেদের রাষ্ট্রগত মর্যাদাই তাঁহাদিগকে শক্ত রাখিতে পারে; কিন্তু সে মর্যাদার সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা কার্যত উপেক্ষিত হইতেছেন। যাঁহারা প্রাণ দিয়া পূর্ববঙ্গের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আজ পূর্ববঙ্গের তাঁহারা কেহ নহেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সেখানে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। পূর্ববঙ্গের শাসক সম্প্রদায় ইহাদিগকে সংযত করিতে সমর্থ নহেন, কিংবা করিতে চাহেন না। সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের যে মর্যাদা তাঁহাদের রাষ্ট্র চেতনার মূলে তাহাতে বাধে। এ অবস্থায় কর্তব্য কি? সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেদিন নাগপুরের জনসভায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের এই সমস্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। সর্দারজীর অভিমত এই যে, পাকিস্থান যদি হিন্দুদের বিতাড়িত করিবার সংকল্পই করিয়া থাকে, তবে বাস্তুহারা হিন্দুদের পুনর্বসতির জন্য তাহাকে যথোপযুক্ত স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে। প্রশ্নটি জটিল। পাকিস্থান অন্য অঞ্চল হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে একরূপ বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে, পূর্ববঙ্গই বলিতে গেলে এখন বাকী আছে। এক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থের দিক হইতেই পাকিস্থানের পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে। এ কথা পাকিস্থানের নিয়ামকরাও মনে প্রাণে না বুঝেন, তাহা নয়; কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করিয়া লাভ নাই, গোজামিলের পথে বেশী দিন আগাইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্থানের নীতির নিয়ন্তাগণ যদি সত্যই পাকিস্থানকে সুসংহত এবং সুব্যবস্থিত করিতে চাহেন, এবং দেশবাসীর দুঃখ-দৈন্যের লাঘব করিয়া যদি গঠনমূলক *কর্মসাধনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হইতে চান, তবে তাঁহাদের মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্থান মুসলমানের নয়, হিন্দুরও নয়, সদিচ্ছামূলক এই ধরণের কথা শুধু মুখে আওড়াইলে চলিবে না।* রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়কে সমান মর্যাদা *দিতে হইবে এবং সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক মনোবৃত্তির উৎখাত সাধনে তাঁহাদিগকে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে হইবে। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ইহার উপরই নির্ভর করিতেছে। সাম্প্রদায়িকতার পথে আধুনিক জগতে রাষ্ট্র-নীতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না,* বিশেষভাবে চারিদিক হইতে অসাম্প্রদায়িক আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রগতিশীল ভারতীয় রাষ্ট্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থার মধ্যে পূর্ববঙ্গের পক্ষে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়। পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃগণ এই সত্যটি যত সত্বর উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল।

বাঙলার প্রতি অবিচার

জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি এই বাঙলা। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক বাঙালী সমাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকার্য চালাইয়া সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের মনে কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিতেছে, সর্দার প্যাটেলের নাগপুরের বক্তৃতাতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। সর্দারজী জাতীয়তাবোধের প্রেরণার উপর জোর দেন এবং প্রাদেশিকতার নিন্দাবাদ করেন। আমরা সর্বতোভাবেই তাঁহার এই মতের সমর্থক এবং বাঙলার সমগ্র সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদের শক্তিকেই বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। বাঙলাদেশ প্রাদেশিকতা কোনদিন বোঝে নাই কিংবা মানে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সর্দারজীর বক্তৃতায় অতঃপর প্রাদেশিকতার অপরাধের চাপটা এই বাঙালীদের উপরই গিয়া পড়িয়াছে। সর্দারজী তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বাঙলায় যান। সেখানে বিহার বনাম বাঙলা এবং বাঙলা বনাম আসাম বিরোধে আবহাওয়া দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। শিখ ট্যাক্সিওয়ালাদের বরদাস্ত করা হয় না। তাহার পরিবর্তে বাঙালীকে ট্যাক্সীর লাইসেন্স দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।" সর্দারজীর এই কথা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, অপরে তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়াছে। তিনি সব কথা জানেন না। যদি জানিতেন তবে তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকে বাঙলায় যাইতে না বলিয়া মানভূমে কিংবা গৌহাটীতে যাইতে বলাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত। কারণ বাঙালীদের বিরুদ্ধে এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক বিদ্বেষ কিরূপ উগ্র আকার ধারণ করিতেছে, ঐ দুইটি স্থানে বেশ পরিচয় মিলিবে। শিখ ট্যাক্সিওয়ালাদের সম্বন্ধে সর্দারজী যাহা শুনিয়াছেন, তাহাও ঠিক নয়। শিখদের সঙ্গে বাঙালী সমাজের ঘনিষ্ঠতা বরং বেশী। লীগ শাসনের আমলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দৃষ্টিতে বাঙালী ও শিখের এই ঐক্য এবং ঘনিষ্ঠতা চক্ষুশূল হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ যদি কোথায়ও থাকে, বাঙলাদেশে এবং বাঙলার রাজনীতিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হইবে। শুধু তাহাই নয়, এমনটি ভারতের অন্য কোথায়ও বড় নাই। আমরা গর্বের সঙ্গেই একথা বলিতে পারি। বাঙলার বাহিরে পা দিলেই বাঙালী প্রাদেশিকতার সাড়া পায় এবং তজ্জনিত আঘাত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় এবং সেজন্য দুঃখ অনুভব করে। বাঙলা ভাষা এবং বাঙলার সীমানা সম্পর্কিত বিতর্কেও এই দিক হইতে বাঙালীর মনে কষ্টের কারণ সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী যদি মুখ ফুটিয়া সে নীতির মর্যাদা রক্ষার দাবী করে, অমনই তাহার বিরুদ্ধে প্রাদেশিকতার অভিযোগ চারিদিক হইতে উত্থাপিত হয়। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ আজ বড়ই বিপন্ন। পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের আশ্রয় দিবার মত স্থান তাহার নাই। কংগ্রেস গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সমগ্র বাঙালী সমাজ আবেদন-নিবেদন জানাইয়াও এ পর্যন্ত সহানুভূতিমূলক সাড়া কিছুই পায় নাই। সুতরাং দোষ কি আজ বাঙালীদের? বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল যে বাঙলাদেশের

অংশ—সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের স্বার্থমূলক অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই যে বাঙলা-দেশ হইতে তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল ইহা কাহারও অবিদিত নয়। পশ্চিম বাঙলার এই ন্যায্য দাবী পূরণ করিলে ভারতীয় রাষ্ট্রের সংহতিই দৃঢ় হইবে এবং সেই রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান সমস্যার সমাধানের পথই সহজ হইয়া আসিবে। বঙ্গ-বিহারের সীমানা সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসা হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশারই নিরসন হইবে। এজন্যই আমরা এই প্রশ্ন মীমাংসাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব প্রদান করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। আমরা এই পথে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি এবং সহযোগিতার ভাব দৃঢ় করিতেই চাই, জাতীয়তাবাদকেই মর্যাদা দিতে আমরা অভিলাষী এবং প্রাদেশিকতাকে নষ্ট করাই আমাদের অভিপ্রায়। কাহারও বিরুদ্ধে কোনরকম বিদ্বেষ ভাব আমরা পোষণ করি না এবং বাঙলার সংস্কৃতি সাধনার প্রতি মর্যাদা-বোধ বজায় রাখিয়া তাহা সম্ভবও নয়।

ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়া

গণপরিষদের বর্তমান অধিবেশনে ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়ার চূড়ান্ত রূপ দানের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কাজটি জটিল এবং দুরূহ। যুক্তরাষ্ট্র এবং কেন্দ্রশক্তিতে একক সার্বভৌম রাষ্ট্রে এই দুই আদর্শের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। মৌলানা হসরত মোহানী একটা অদ্ভুত দাবী তুলিয়াছেন। তাঁহার কথা এই যে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের দ্বারা নূতন এক গণপরিষদ গঠিত করা উচিত। তাঁহারা শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করিবার যোগ্য অধিকারী; সুতরাং সেই অপেক্ষায় এখানকার পরিষদের কাজ স্থগিত রাখা হোক। বলা বাহুল্য, এমন যুক্তির কোন মূল্যই নাই। গণ-পরিষদের প্রতিনিধিদের যোগ্যতা এবং প্রতিনিধিত্ব-মর্যাদার কোন প্রশ্নই উঠে না। বস্তুতঃ ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়, দেশের লোকে ইহাই কামনা করে এবং বৈদেশিক প্রভুত্বের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার জন্যই তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

জাতীয় জীবনে সৌন্দর্য-সাধনা

আমরা সৌন্দর্যবোধ হারাইয়া ফেলিতেছি। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং রাষ্ট্রপাল শ্রীরাজাগোপালাচারী উভয়েই এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই এই সত্যের উপর জোর দিয়াছেন যে, সৌন্দর্যবোধের অনুভূতির উপর জাতীয় জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের উপযুক্ত কর্মসাধনার জাগরণ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের বর্তমান বহু প্রয়োজনের তাড়নার মধ্যে সৌন্দর্যের রসানুভূতি বা অনুষ্ঠানের অবসর কোথায় এবং উদরের চিন্তায় যাহারা অবসন্ন, তাহাদের বাস্তব সমস্যা সমাধানে তাহার সার্থকতাই বা কতখানি, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠে। সৌন্দর্যবোধ বা শিল্প সাধনা সম্বন্ধে যাঁহারা এমন ধারণা পোষণ করেন, তাঁহারা বিষয়টি ঠিক ধরিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিকপক্ষে কর্ম-সাধনার পথেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধান নির্ভর করে। সৌন্দর্যবোধ উদার তেমন কর্মপ্রেরণাই জাতীয় জীবনে সঞ্চার করিয়া থাকে। অন্ন চিন্তা কালিদাসের কবিত্বশক্তিকেও সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল, এ সত্য অবশ্য অস্বীকার করা চলে না; কিন্তু বস্তু বিচারের সেই দৈন্য হইতে মনকে মুক্ত করিয়া তাহাকে সৃষ্টির সামর্থ্যদানের ক্ষমতা সৌন্দর্যবোধের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। জাতির যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা মনীষী, যাঁহারা প্রতিবেশ-প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন তাঁহারা সত্যকে উপলব্ধি করেন এবং জাতির মনোমূলে সত্যের শিবত্ব এবং সুন্দরত্ব উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহারা জাতিকে জীবন্ত করিয়া তোলেন! পরাধীন জীবনের প্রতিকূল-প্রতিবেশের মধ্যেও বাঙলার মনীষামূলে আমরা এখন সৃজন-প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। এ ভুলিলে চলিবে না যে, সেই প্রতিভা বাঙলাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, জাতির নৈতিক বোধকে তাহা প্রতিষ্ঠা দিয়াছে এবং জাতিকে প্রচুর প্রাণধর্মে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। বাঙলার যে অগ্নিময় অবদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্জয় করিয়াছিল, তাহার মূলে বাঙলার মনীষিবৃন্দের সৌন্দর্যানুভূতি এবং সৃজন-প্রতিভাই প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়াছে। বস্তু বিচার বা অর্থনীতি সেক্ষেত্রে একান্ত নগণ্য বলিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের সাধনা নূতন বাঙলা গড়িয়াছে এবং ইঁহাদের সে সাধনা সত্য শিব সুন্দরের অনুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। রসানুভূতির প্রাণপূর্ণ সমৃদ্ধি এবং সঙ্গতির জনাই 'বন্দে মাতরমে'র এত মাহাত্ম্য, ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া বৈপ্লবিক কর্মপ্রেরণাকে জাগাইতে সে মন্ত্রময় সঙ্গীতের এতখানি শক্তি। স্বাধীন ভারতকে যদি সত্যকার মহিমায় প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে ভারতের চিন্তানায়ক এবং মনীষীদের সেজন্য সাধনা করিতে হইবে এবং অখণ্ড সত্যের গভীর অনুধ্যানকে জাতির মনের মূলে জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং শিক্ষাকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। শুধু কতকগুলি বিষয়ের ধারণা দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, বৃহত্ত্বের ভাবনা এবং বৃহৎ কর্মসাধনার প্রেরণা ও বেদনা জাতির মনে জাগাইয়া তোলাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শুধু বস্তু বিচার চিত্তকে ভারাক্রান্তই করে এবং মনে নানা দৈন্য আনিয়া ফেলে। বাঙালী সৌন্দর্যানুভূতির সেই উদ্দীপনা যেন অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে, দুর্বলের অনুকৃতি তাহার শিল্প-সাধনাকে প্রাণহীন করিয়া তুলিতেছে, সমাজ-জীবনে নীতিবোধ জাগিতেছে না। এ দৈন্য আমাদের কাটাইতে হইবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষুদ্র বিচারকে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর ভাবনায় সমষ্টিমনকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বস্তুত মন আমাদের লঘু হইয়া পড়িয়াছে, গভীরভাবে চিন্তা করিবার মত আদর্শ এবং অনুধ্যান সে পাইতেছে না। মন কেবল সাময়িকতার মধ্যে ছাড়া ছাড়া ভাবেই সাড়া দেয়। এই অসহায়ত্ব হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া প্রজ্ঞানময় পথে উদ্দীপ্ত করিতে হইবে। দায়িত্ব জাতির চিন্তানায়ক, শিক্ষাব্রতী এবং সাহিত্যিকদের উপর রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সাধনাই জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা দিবে।

দুর্বলের যুক্তি

পাকিস্থান নিয়ামকদের দৃষ্টি একই কেন্দ্রে ঘোরে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া তাঁহাদের দৃষ্টিতে অন্য কোন আশ্রয় নাই, কিংবা অবলম্বন নাই। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী ইউরোপে গিয়া সাম্প্রদায়িকতার সেই বাণীই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্যারিসের বক্তৃতায় মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে পাকিস্থানী মনোবৃত্তিতে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার যুক্তি কৌশল খেলিয়াছে মিশরের বক্তৃতাতেও সেই চাতুর্য চালাইতে তিনি কসুর করেন নাই। পাকিস্থানের বাণিজ্য সচিব মিঃ ফজলুর রহমান সেদিন করাচীতে বক্তৃতাকালে এই ধর্মের জিগীরই তুলিয়াছেন এবং জগতের মুসলমানদিগকে এক করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। মিশরের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নোকরী পাসার একটি উক্তি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পাকিস্থান এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে সংবর্ধিত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, প্রগতিশীল মহাদেশ লইয়া মিশর রাষ্ট্র সাধনায় অগ্রসর হইতেছে। নিশ্চয়ই এ পথ বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের সংস্কার লইয়া চলিবার পথ নয়। ধর্ম সংস্কারই যদি রাষ্ট্রনীতিক সংহতির মূলে যথেষ্টভাবে কাজ করিত, তবে জগতে বড় বড় যুদ্ধগুলি ঘটিত না। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ধর্ম-সংস্কারকে জড়াইতে গেলে আনুষ্ঠানিক কতকগুলি সংকীর্ণতাই দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং কোন রাষ্ট্রই গঠনমূলক কাজের ব্যাপক পরিপ্রেক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহার ফলে পারস্পরিক সাহচর্য হইতেই সে বঞ্চিত হয়। বিভেদের দৃষ্টি বিভেদকেই বড় করিয়া তোলে এবং আপনাকেও পর করিয়া ফেলে। পাকিস্থানী কর্তারা ধর্ম সংস্কার জাঁকাইয়া তুলিয়া সেই দুর্গতির দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছেন।

তীর্থযাত্রী

টি এস্‌ এলিয়ট্‌-এর The Journey of Magi নামক কবিতার অনুবাদ।

অনুবাদঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা,
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।
ঘাড়ে-ক্ষত পায়ে-ব্যথা মেজাজ-চড়া উটগুলো
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল,
আর শরবতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল।
এদিকে উটওয়ালারা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না।
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা; নগরীতে সন্দেহ;
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুশকিল।
শেষে ঠাওরালেম, চলব সারারাত;
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে,
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে—
এ সমস্তই পাগলামি॥

ভোরের দিকে এলেম যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে,
সেখানে বরফসীমার নিচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছগাছালির গন্ধ।
নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে।
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌঁছলেম শরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধে হল;
সময় পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা।
বলা যেতে পারে, ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক॥

মনে পড়ে এ-সব ঘটেছে অনেক কাল আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো,
এই লিখে রাখো,—এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।
জন্ম একটা হয়েছিল বটে,
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও,—
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোর,
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে
যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধরে।
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

টি এস এলিয়ট

অদ্বৈত মল্ল বর্মণ

মিঃ টি এস এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot) এ বৎসর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। গত ৪ঠা নবেম্বর সুইডিস একাডেমির সাহিত্য শাখার এক অধিবেশনে এই পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সংবাদে পৃথিবীর নানা দেশের কাব্য-রসিকগণ নিশ্চয় আনন্দিত হবেন। কারণ, বড় কবি মাত্রই দেশকাল ভেদে সকল কবিরই স্বগোত্র হলেও, কবি এলিয়টের প্রভাব সমসাময়িক কবিতায় ও কবিদের মধ্যে যত গভীর ভাবে শিকড় গেড়েছে, তেমনটি খুব কমই দেখা যায়। সেদিনের রোমাণ্টিক পৃথিবী থেকে আজকের পৃথিবী অন্য রকম; তার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর কাব্যাদর্শেরও যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হবার ছিল, এলিয়টের ন্যায় শক্তিধর কবি সে কাজ সিদ্ধ করে যুগের দাবী পূরণ করেছেন বলা চলে।

রোমাণ্টিক কবিতা ও এলিয়টের কবিতার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য, তা অল্প কথায় বোঝানো সম্ভবপর নয়। কথা ছন্দ ভাবের ললিত বিলাস ও তার বাহুল্য রোমাণ্টিক কবি ও পাঠক উভয় গোষ্ঠীকেই মশগুল করে রাখে। মানুষকে সেখানে মাটিতে পাওয়া ভার, তারা হাওয়াতে উড়ে বেড়ায়; সেখানে মানুষ সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলাই রসের উৎকর্ষের পরিচায়ক। এই অতিবিরাট, সুতীব্র অনুভূতিপ্রবণ, প্রভাবশালী কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামশীল আজকের এই টি এস এলিয়ট। রোমাণ্টিক কবিতার মূলে আছে ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধ প্রেরণা মাত্র; কিন্তু এলিয়টের কবিতার মূলে আছে সমষ্টির দুঃখবেদনা অভাব নৈরাশ্যকে বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে দেখার এবং এমন কি নির্মম হয়েও, তার অন্তরের হাহাকারকে ভাষা দেবার ক্ষমতা। তাঁর এই অসাধারণ ক্ষমতার ফলেই রোমাণ্টিকের সঙ্গে তাঁর এই বিরোধ তাঁর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নানা দেশের কাব্যজগতে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সর্বত্রই কবিচিত্তে একটা সংগ্রামশীলতা জাগিয়ে তুলেছে। এই একটি মাত্র লোককে কেন্দ্র করে কাব্যের একটা বিরাট জগৎ গড়ে উঠেছে—আকাশে তার পক্ষবিস্তার নয়, মাটিতে তার পদ দৃঢ়সংবদ্ধ। তাঁর প্রতিভা যেমনি মৌলিক তেমনি প্রচণ্ড না হলে, এটা সম্ভবপর হত না।

সম্ভবত এই দিকটি লক্ষ্য করেই, 'ক্ষুরস্য ধার' (Razor's Edge—ঔপনিষদিক পটভূমিকায় রচিত যুগান্তকারী উপন্যাস) লেখক সমরসেট মম এলিয়টকে বলেছেন বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর মৌলিক কবি। কোথায় এই মৌলিকতার উৎস, সে বিচার করতে হলে আমাদের অধিক দূর যেতে হবে না।

ইংরাজী ১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়টা ইংরাজী সাহিত্যে ভাবধারার দিক দিয়ে এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের যুগ। এই সময়ের নূতন এক সাহিত্যিক গোষ্ঠী দৃঢ় পদচারণায় এগিয়ে আসেন সাহিত্যের পাদ-প্রদীপে; একদিকে তরুণ বুদ্ধিজীবী মানসে এবং অন্য দিকে সংস্কৃতিসম্পন্ন পাঠক সাধারণের মধ্যে তাঁরা গভীর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলেন।

১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়েই তাঁদের যুগান্তকারী লেখাগুলো প্রকাশিত হয়। ত্রিশ সালের এই তরুণ বিদ্রোহীদের দলে অগ্রগণ্যরূপে পাই কথাশিল্পীদের মধ্যে জেমস জয়েস, অলডাস হাক্সলি ও ভার্জিনিয়া উলফ্‌কে এবং কাব্যস্রষ্টাদের মুখপাত্ররূপে পাই টি এস এলিয়টকে। যুদ্ধপূর্ব যুগের জনপ্রিয় কথাশিল্পী গলসওয়ার্দী, ওয়েলস, বেনেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে জেমস জয়েস ও ভার্জিনিয়া উলফ্ তো পুস্তিকা লিখে সংগ্রামই ঘোষণা করে দিলেন। এদিকে অলডাস হাক্সলিও ঔপন্যাসিক ধারণায় ঘটালেন বিপ্লব।

এদিকে এঁরা অগ্রযুগের গদ্য-রচয়িতাদের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম চালালেন, এলিয়টও তেমনি পদ্য-রচয়িতাদের বিরুদ্ধে তূন থেকে বার করলেন ব্রহ্মাস্ত্র; নূতন চিন্তা, নূতন টেকনিক, নূতন ভাবধারণার ও নূতন মননের নিদর্শন নিয়ে বেরুল তাঁর কবিতা। এই 'নূতন' আসলে কি? তাঁদের রচনাগুলো বিশ্লেষণ করলে এই নূতনকে আমাদের চিনতে বিলম্ব হবে না। বহুপুরাতনের মণিকোঠা থেকে উৎসারিত হয়ে এসেছে এই নূতন। এই নূতনই হাক্সলি-ঈশারউডকে যোগী বানিয়েছে! এলিয়টের কাব্যের যে রোমাঞ্চকর মৌলিকতা, এরও উৎস কি এইখানেই? সমুদ্র মৌলিক, কিন্তু তাকে মন্থন করে যে সুধা ওঠে, তাকেও কি মৌলিক বলব না? উপনিষদের ক্ষীর-সমুদ্র থেকে মন্থন করেই তোলা হয়েছে এই মৌলিক কাব্য-সুধা আজকের দিনে একথা অসম্ভব মনে নাও হতে পারে! অন্তত এ যুগের যে সকল পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে বিবর্তিত করেছেন তাঁদের অনেকেই যে মনে প্রাণে বৈদান্তিক একথা সুবিদিত। এলিয়টের কাব্য পাঠে মনে হবে বেদান্তের হাওয়া এর গায়েও কিছু লেগেছে। রোমাণ্টিসিজমের সঙ্গে সংগ্রাম এক হিসাবে ভোগ-লালসা ও ক্লেদাক্ত রাজসিকতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারায় সর্বত্র ত্যাগকে ছোট করে ভোগকে বড় করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের আদর্শ তার ঠিক

ডোনাল্ড পি হেস্টিংস কর্তৃক নির্মিত এলিয়টের প্রতিমূর্তি

উল্টো; এখানে মানুষকে মানুষরূপেই দেখা হয়েছে এবং পার্থিব অসারতা ও নশ্বর ভঙ্গুরতাকে ইন্দ্রিয় সুখলালসার থালা সাজিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা হয়নি। এলিয়টের কাব্য-জগৎ যদি এইখানে ভূমিস্পর্শ পেয়ে থাকে তো সেটা অসম্ভব কিছু নয়।

(২)

এলিয়ট নোবেল প্রাইজ পেলেন ষাট বৎসর বয়সে। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে আমেরিকান মাতা-পিতার সন্তান এলিয়ট মিসৌরীর অন্তর্গত সেণ্ট লুইসাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খৃস্টাব্দ থেকে তিনি ইংলণ্ডে বসবাস করছেন।

এলিয়ট পিতার সপ্তম ও কনিষ্ঠ সন্তান। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত করে হারভার্ড গ্রাজুয়েট স্কুলে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯১০-১১ খৃস্টাব্দে প্যারিসের Sorbonne-এ ফরাসী সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরের তিন বৎসর তিনি আবার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এবং সংস্কৃত শিক্ষা করতে থাকেন। ১৯১৩-১৪ খৃস্টাব্দে হারভার্ডে দর্শন বিভাগে সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন, কিন্তু ট্রাভেলিং ফেলোশিপ পেয়ে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বক্ষণে জার্মাণীতে কাটান।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে অক্সফোর্ডের Merton কলেজে গ্রীক দর্শন অধ্যয়ন করতে আসেন। ঐ সময়ে তিনি ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লেখতে থাকেন। লিবনিজ ও ব্র্যাডলির উপর দুটি স্মরণীয় প্রবন্ধও তিনি ঐ সময়েই রচনা করেন। কবিতায় তাঁর প্রথম পরিণত রচনা হচ্ছে Alfred Prufroch-এর প্রেমের কবিতা; বেরোয় ১৯১৫ খৃস্টাব্দে। ঐ সময়েই তাঁর বিবাহ হয় এবং ঐ সময়েই লণ্ডনের নিকটস্থ হাইগেটস স্কুলে ফরাসী, ল্যাটিন, গণিতশাস্ত্র, ড্রইং, সন্তরণ, ইতিহাস, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করতে থাকেন। এর পর লয়েডস ব্যাঙ্কে কিছুদিন চাকরি করেন। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগে চাকরি পেয়েও কিন্তু স্বাস্থ্যের অজুহাতে বঞ্চিত হন।

১৯১৭ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত এলিয়ট 'এগোয়িস্ট' পত্রের সহকারী সম্পাদকতা করেন; এবং 'এথেনিয়ান' পত্রে অনেক প্রবন্ধাদি লেখেন। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে ত্রৈমাসিক পত্র 'ক্রিটেরিয়নের' সম্পাদক পদে বৃত হন। এখন তিনি 'ফেবার অ্যান্ড ফেবার' নামক পুস্তক প্রকাশালয়ের একজন ডিরেক্টর।

তাঁর প্রধান প্রধান রচনা—

কবিতা:

The Waste Land (1922); Ash Wednesday (1930); East Coker (1940); Burnt Norton (1941); Dry Salvages (1941); Poems (1909-25); Later Poems (1925-35);

নাটক:

Murder in the Cathedral (1915); Family Reunion (1939);

প্রবন্ধের বই:

Homage to John Dryden (1928); Selected Essays (1917-32); Elizabethan Essays (1908). Essays in Criticism; An Essay on Poetic Drama; The Sacred Wood.

[৩]

বর্তমান সভ্যতা কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত তার বিশ্লেষণ করে দেখলে, এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার যৌক্তিকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে। এই সভ্যতা যেন নিজে যা নয়, তার চাইতেও বেশি বলে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত। এলিয়ট এর বিরুদ্ধে বজ্র সম, তীব্রতম অভিযোগ এনেছেন; তাঁর Waste Land কবিতা-পুস্তকে তিনি এই সভ্যতার স্বরূপ, এই সভ্য মানুষের খাঁটি রূপ নির্মম-ভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই সভ্যতা যে কতখানি অসার, তাকে নিয়ে গর্বান্ধ মানুষ যে কত অকিঞ্চিৎকর, কবি তা নির্মমভাবে নগ্ন করে দেখিয়েছেন। এই দেখানোর মধ্যে অবশ্য একটা দুঃখবাদের রেশ, নৈরাশ্যের সুর প্রতি-ধ্বনিত হয়েছে যা মানুষকে আনন্দ না দিয়ে দেবে বেদনা। কিন্তু এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য যে, প্রচলিত মেকি অথচ দুর্বার এক সভ্যতা-স্রোতের প্রতিকূলে মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে দাঁড়িয়েছেন তিনি একা। কিন্তু আজ আর তিনি একা নন। তাঁর বজ্রদৃঢ় অভিযোগই প্রধানতঃ এ যুগের সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের বিবর্তনে এলিয়টের দান অসামান্য। ১৯১১ থেকে ১৯২২ খৃস্টাব্দের মধ্যে আধুনিকপন্থী কবিদের রচনা নিয়ে জর্জিয়ান পয়েট্রি নামে কতকগুলি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে এবং ইংরাজি কাব্যে সেগুলি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। এই কবিগোষ্ঠীর অন্যতম রুপার্ট ব্রুক যুদ্ধের কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করেন এবং যুদ্ধেই নিহত হন। এই দলের আরো একজন কবি, উইলফ্রেড ওয়েন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে সিগফ্রিড সেশুন যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন এবং সেখানকার লেখা কিছু কবিতা সঙ্গে করে আসেন। সেগুলি ছাড়া, ঐসময়ের ঐদলের লেখা কবিতা যুগের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধবন্ধ ছিল না। অর্থাৎ তাঁরা যে যুগে বাস করতেন, সে যুগের প্রকৃত জগতের কোন ধারণাই সেগুলিতে পাওয়া যায়নি। এই অধোগতিকে দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের অধোগতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। তখন ফ্যাসিবিরোধী গান ও কবিতা হয়ে পড়েছিল বাংলা কবিতার নিরিখ। যা হোক, তখন চলছিল শ্রেণী-সংগ্রাম আর অতৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদের লড়াই। চিন্তারাজ্যের ভিত্তি তখন বিপ্লবমুখী সমাজ-বিশ্লেষণ, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণী ধারণা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কলরব প্রভৃতির অভিঘাতে প্রায় নড়ে উঠেছিল। জর্জিয়ান কবিরা এইগুলিকেই গেঁথে গেঁথে কবিতা সৃষ্টি করে চললেন। কিন্তু এলিয়ট প্রগতিপন্থী হয়েও এই গড্ডালিকা প্রবাহে পা বাড়াতে অস্বীকার করলেন। এঁদের থেকে তাঁর সাহস যেমন ছিল অধিক, তেমনি সত্যিকার বুদ্ধি ও মননের দিক থেকেও তিনি ছিলেন তাঁদের অনেক ওপরে।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে প্রথম বই Prufrock এবং ১৯২০ খৃস্টাব্দে Poems বের করলেন। এই দুটি বই সেই সময়ের কবিতা লেখার ফ্যাশনকে অগ্রাহ্য করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। সেই কবিতাগুলিতে অভ্রান্ত সিনিসিজম-এর যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, অত্যল্পকালের মধ্যেই তা বুদ্ধিজীবী গণ-মানসে বিশেষ আবেদন জাগিয়ে তুলল। যেন তারা এইরকম সুর শোনবার জন্যেই এত-দিন কান পেতে ছিল।

তার পর বেরোয় তাঁর যুগান্তকারী কাব্য-গ্রন্থ Waste Land, ১৯২২ খৃস্টাব্দে। এ বই বেরুলে তরুণ সমাজ তাঁকে আদর্শ ও প্রেরণার প্রতীকরূপে গ্রহণ করল এবং তাদের মনোরাজ্যে তিনি একক কাব্যস্রষ্টারূপে স্থান পেলেন। এই বইটিতে প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের গতিপ্রকৃতির অসারতা নির্মম লেখায় রূপ পেয়েছে; সভ্যতার চক্র আটকে পড়েছে, তার আর ঘুরবার ক্ষমতা নেই, এই ভাবটি কবি তাঁর কাব্যের লাইনগুলিতে নিবিড়ভাবে রূপদান করেছেন। কিন্তু এই ভঙ্গুর সভ্যতা আর জীবন্মৃত মানুষ চিত্রিত করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে আপনাকে শুধিয়েছেন, 'কবি, একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।' সেই বিশ্বাসের ছবিই তাঁর Ash Wednesday বইখানা।

এলিয়ট ইংলণ্ডের গত বিশ বছরের চিন্তাধারাকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে-ছেন। গত বিশ বছর ধরে যাঁরা কবিতা লিখে আসছেন, তাঁদের মধ্যে সমালোচক হিসাবেও আজ তাঁর আধিপত্য সর্বজন-স্বীকৃত। চিন্তা-শীল মানবমনে তিনি ধর্মবোধ উজ্জীবনার্থে নিজের পড়াশোনা ও প্রতিভাকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

কাব্যশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ। সর্বযুগের কবিতা সম্বন্ধেই তাঁর অগাধ উপপত্তি। তাঁর ছন্দ ও ব্যঞ্জনা স্বভাবসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্তিতে প্রবাহিত; যেন মনের ঐকান্তি-কতা থেকে বিনা চেষ্টায় এগুলি বেরিয়ে আসে। তাঁর রচনা ও জীবন-দর্শন ভাষার দিক বিবেচনায় ইংরাজি ও আমেরিকান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে বিশ্ব-সাহিত্যকে।

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমর লক্ষ্য করেনি কখন অন্ধকার হয়ে গেছে,—ছাদের আলসেয় কনুই-এ ভর দিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে নীচে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হয় পায়ের তলার অবলম্বনটা সরে গেছে, সহস্রচক্ষুজ্বালা শহরটা পাক খাচ্ছে—অদ্ভুত নিরালম্ব হয়ে আছে সব! প্রতিদিন দিবালোকে প্রত্যক্ষ করা রহস্যালেশহীন কর্মব্যস্ত শহরটা হঠাৎ বড় রহস্যাবৃত শান্ত মনে হয়—দূর থেকে ভেসে-আসা গাড়ী ঘোড়ার শব্দটা বড় অদ্ভুত লাগে। এখন এই মুহূর্তের কোলকাতাটা যেন হতচেতন হয়ে অনেক নীচে পড়ে আছে, সমর অনেক ওপরে উঠে গেছেঃ কি অদ্ভুত, কি আশ্চর্য এই পরিবেশ! কে জানে সমরের মানসিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় কি না!

সমরের এমনি মনে পড়েঃ যুদ্ধে যাবার আগে এই ছাদের ওপর ব্যায়াম সেরে অনেকদিন আলসে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে— মনটাও যেন কেমন অকারণে উদাস হয়ে গেছে। দৃষ্টির শূন্যতায় মনের এমন শূন্যতা ক্কচিৎ উপলব্ধি করা যায়। হঠাৎ পাশ থেকে কার গা-ছোঁয়া স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে—অলকা বেচারা হয়তো একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এমন নিঃসাড়ে তার আসা উচিত হয়নি বোধ হয়, কেমন যেন একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভাব তার মুখে-চোখে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। কে জানে, সমর সত্যিই ভয় পেয়েছিল কিনা! আর ভয় দেখাবার সত্যিই কোন উদ্দেশ্য সেদিন অলকার ছিল কি না। কিন্তু কতক্ষণই বা! পাশাপাশি অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দুজনেরই মন এমন একটা অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যার নাম আর যাই হোক ভয় নয়—কথা না-বলা মুহূর্তে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে চেনার এই যেন অবসর। অনেকবার সমরের মনে হয়েছে জিগ্যেস করে—নীচে কেউ অলকাকে দেখেছে কি না। কিন্তু শেষপর্যন্ত জিগ্যেস করা হয়নিঃ অবারিত দ্বার সমরদের গৃহে প্রবেশ করে অলকা যে সেদিন অন্ধকারে ছাদে উঠে না আসতো তা হলে যেন ভাল করতো না। প্রেমিকার দুঃসাহসিকা হওয়া চাই কখনো কখনো।

সমর হঠাৎ চমকে উঠলো। চোখ না ফিরিয়েই মনে হোলো সেই স্পর্শ, হুবহু এক। তবে কি এতদিনে অলকার সময় হলো। চকিতে সমরের মনে হয়, সেইদিন সন্ধ্যা আর আজ—কতদিন? অনেক দিন! সমর দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল—স্পর্শটা আরো গভীর হোক, হৃদয়তাপটা আরো সঞ্চারিত হোক! না-আসার কৈফিয়ৎটা স্পর্শানুভূতির স্থায়িত্বে ঘন হয়ে উঠুক। ভালবাসার গভীরে অবগাহন করুক অলকা! প্রথমে কি প্রশ্ন করবে সমর? আসনি কেন? চিঠি পেয়েছিলে? তারপর?

বাণী ডাকলে, দাদা চা খাবে না? নীচে চল।

সমরের সম্বিত ফিরে আসে। একি মনের ভুল! ইঃ ভাগ্যে অন্ধকারে ভুল করে বসেনি—কাকে কি ভেবেছে। এর চেয়ে আর মানুষ কি করে অপ্রকৃতিস্থ হয়! ছি, ছি। অলকা যদি তার কথা না ভেবে থাকতে পারে সে এখনো এভাবে তার কথা ভাবে কেন? এক পক্ষ যখন সব চুকিয়ে দিয়েছে তখন সে কিসের আশায় এখনও হিসেব করছে!

চোখ তুলে চাইতে মাথার ওপর আকাশ-চন্দ্রাতপটা আরক্ত মনে হয়,—তলা থেকে অনেকগুলো আলোকরেখা অধোগামী অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করেছে, দীপমালায় শহরটা দপ্ দপ্ করছে। দূরে একটা বাড়ির ছাদে বাঁশের আগায় একটা আলো জ্বলু জ্বলু করছে। সমরের মনে পড়ে, এখন কার্তিক মাস—আকাশ প্রদীপের আলো ওটা। পুরোণকালের সংস্কার তা হ'লে বজায় আছে! কে জানে, ঐ আলোর পিতৃপুরুষের স্বর্গের পথ আলোকিত হয় কি না—দিশাহারা অন্ধকারে দিশা মেলে কি না। বাঁশের ডগায় বাঁধা আলো কতদূর পৌঁছয়?

এখন অলকাদের সংবাদ নেওয়া কি খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে? কি আর মনে করবে বাণী? অলকার বাবার কথা জিগ্যেস করলে স্বভাবতই অনেক কথা উঠে পড়বে। দাদার সঙ্গে অলকার কি সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বাণী খেয়াল করে না—আর সে সম্পর্ক বোঝবার মত বয়েস ছিল না নিশ্চয়ই অতটুকু মেয়ের। বাবার বন্ধু হিসেবে পাড়ার ভদ্রলোক প্রতিবেশী হিসেবে যতীনবাবুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা মেলামেশা একটু বেশী ছিল—দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে এমন একটা সহনশীলতা দেখা গিয়েছিল, যাতে অল্পবয়েসীদের মনে বিপরীত কিছু একটা সন্দেহ জাগবার কথা নয়ঃ অলকা তার নিজের ভাই বোনের যেমন দিদি, তেমনি বাণীরও দিদি। সমর-প্রবীর যেমন বাণীর নিজের দাদা, তেমনি অলকার ভাই-বোনেরও দাদা। কর্তারা বয়েস অনুপাতে ছেলেদের কাছে কাকা-জ্যাঠার আসন এবং মর্যাদা পেয়েছেন। যে দুজনকে উপলক্ষ্য করে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক গড়ে উঠবে তাদের কথা বিশেষ করে কে আর জানতো! বাণী তখন কতটুকুই বা। আর বাবা-মা যা জানতেন তার কোন দায় বা দায়িত্ব ছিল না, এখন তো বেশ বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং সমরের অবর্তমানে তাদের সংসারে অলকাকে নিয়ে কি আর আলোচনা হবে যে বাণী মনে করে রাখবে? না, বাণীকেই অলকাদের কথা জিগ্যেস করবে সমর। বাণী বেশ চটপটে আর সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে!

চা খেতে খেতে সমর বললে, তুই তা হলে এ বছরে ম্যাট্রিক দিবি?

বাণী সলজ্জ মাথা নাড়লে। সমর জিগ্যেস করলে, তোর পড়াশোনা দেখিয়ে দেয় কে? মাস্টার আছে?

বাণী বললে, কে আর দেখাবে—আগে ছোড়দা দেখাতো, এখন নিজেই করি—কেন, তোর অলকাদির কাছে দেখিয়ে নিতে পারিস তো! সমর একটু অপ্রস্তুতের মত যেন কথাটা বলে ফেললে—যেন কথাটা কানে অবান্তর শোনাল। হয়তো বাণী এখনি এমন একটা উত্তর দেবে যা না-শোনাই ভাল। কিন্তু তবু উত্তরের প্রত্যাশাটা বড় তীক্ষ্ণ, রুদ্ধশ্বাস।

জবাব না দিয়ে বাণী চুপ করে রইল। বুঝতে পারলে না, দাদা হঠাৎ অলকাদির কাছে পড়া দেখিয়ে নেবার কথা বললে কেন, দাদা কি জানে না, অলকাদিকে পাওয়া আগের মত সহজ নয়! একটু বিস্ময় বোধ করে বাণী। ভাবে, দাদা না জানলে দাদাকে এখন জানান উচিত হবে কি না!

বাণীকে চুপ করে থাকতে দেখে সমর যেন একটু ভয় পেয়ে যায়। বাণী চুপ করে আছে কেন? দুই পরিবারে কি এমন অপ্রিয় ব্যাপার ঘটলো ইতিমধ্যে?

সমর জিগ্যেস করলে, কেন, সময় পায় না বুঝি! কিরে?

বাণী নিঃসন্দেহ হলো, দাদা অলকাদিদের কোন খবরই রাখে না। জানলে এভাবে জিগ্যেস করতো না কখনো। কিন্তু খবরটা শোনাবে

কি? কি বলে আরম্ভ করবে? খবরটার বেদনাদায়কতা মনে কেমন একটা ইতস্ততভাব এবং সঙ্কোচ আনে। যেন সহজে যখন তখন অসঙ্কোচে এতটুকু চিত্তবিক্ষেপ অনুভব না করে এ সংবাদ জানান যায় না। অলকাদিরা এত আপনার ছিল!

বাণী চোখ না তুলেই বুঝতে পারে দাদা আগ্রহভরে উত্তরের অপেক্ষা করছে। মনে হয়, দাদা হয়তো খবরটার আকস্মিকতা সহ্য করতে পারবে না—অলকাদিকে তারা যত সহজে মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছে দাদা হয়তো অতো সহজে মুছে ফেলতে পারবে না। হঠাৎ অলকাদির সঙ্গে দাদার সম্পর্কের রোমাঞ্চকর রমণীয়তার কথা মনে হয় বাণীর—কেমন একটা ঈর্ষার ভাবও জাগে—অলকাদির ব্যবহারে সে যেন খুশী হয়েছে। তার কি হয়েছে, দাদা শুনলেই বা। দাদা কি অলকাদিকে সত্যি সত্যিই ভালবাসতো? মনে মনে 'বেশ হয়েছে' একটা ভাব। এই প্রথম বাণীর মনে হচ্ছে, দাদা কেন অলকাদিকে ভালবাসবে? কি এমন যোগ্য মেয়ে সে?

সমরের আগ্রহটা খুব বেশী প্রকাশ পায় না। প্রকাশ করা উচিত মনে করে না সমর। আবার খুব বেশী নির্লিপ্ততার ভাণও করা যায় না। কে জানে, বাণী কিছু বুঝতে পেরেছে কি না। একটা পরিচিত পরিবারের সংবাদ নেওয়ায় কি আর এমন সন্দেহের! তা ছাড়া অলকা তো তাদেরই একজন ছিল—আসা-যাওয়ায় এক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাণী চুপ করে আছে কেন এখনো। অলকার কি হলো? অলকাদের কি বিপদ ঘটলো?

বাণী বললে, অলকাদিরা এখানে থাকে না। এ পাড়া থেকে তারা মাসখানেক হলো উঠে গেছে।

সমর জিগ্যেস করলে, কেন? হঠাৎ—

প্রশ্নটি যেন ঠিক হয়নি—নিজের কানে কেমন বেসুরো শোনাল; বাণী বলে যাক, সে কেবল শুনে যাক। তারপর যা ভাববার, যা করবার সে করবে। এত উতলা হবার দরকার নেই।

বাণী বললে, অলকাদি এখন সিনেমা করে। খুব নাম করেছে। যতীনকাকা মারা গেছেন আজ দেড় বছর। কাকীমা সন্তু অলকাদির কাছেই থাকে। খুব পয়সা হয়েছে ওদের—যে বাড়িতে উঠে গেছে সে-বাড়িটা নাকি কিনেছে।

সমর আর প্রশ্ন করে না। মনটা কেমন ভোঁতা হয়ে যায়। সিনেমা করে অলকার পয়সা হয়েছে, খুব সুখে আছে—পরিচিত পরিবেশ থেকে তাই সরে গেছে। হঠাৎ নিজেকে এত কাঙ্গাল মনে হয় সমরের, ছি, ছি। গত তিনচার দিন কি মিথ্যে মনোকষ্টই না ভোগ করেছে সে—কার জন্যে? অবিচলিত আকাশ প্রদীপের মত কিসের আশায় প্রেমের দীপ জেলে রেখেছে সে? অভিমান নয় মনে মনে একটা ক্রোধ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। সব তুচ্ছ মনে হয়, প্রেম ভালবাসা! ভালবাসার মত এমন একটা উপহাসের বস্তু যেন এ সংসারে নেই। বাবা যদি মনে করে থাকেন এ ছেলেমানষী ঠিকই মনে করেছেন। কোন মানে হয় না।

কৈফিয়ৎ হিসেবেই যেন বাণী তখনো বলছে, মাঝে অলকাদিদের বড় কষ্ট গেছে—যতীনকাকা ব্লাডপ্রেসারে শয্যাশায়ী হতে সংসার ওদের অচল হয়ে পড়ে—একলা অলকাদির রোজগারে চলবে কি করে? আমাদের বাড়িতে এসে কতদিন মার কাছে দুঃখু করেছেঃ জেঠাইমা, আর পারি না, কোনদিন দেখবেন পালিয়ে যাব সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে। আমার যদি একটা বড় ভাই থাকতো এ সময়!

সমরের মনটা নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে—অলকার দুঃখসুখের কাহিনী যেন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অলকার সুখ হলেই বা কি, দুঃখ পেলেই বা কি! কোন কৈফিয়তের আর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া অলকা নিজে থেকে যখন কোন কৈফিয়ৎ দেয়নি তখন—

থেকে থেকে সমরের কেবল একটা অবজ্ঞা, অবহেলার কথা মনে হচ্ছে—দুঃখে পড়েও নিজের চেষ্টায় সুখের পথ করে নেওয়ায় অলকা যে আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় দিয়েছে তা যেন সমরের পৌরুষকে আঘাত করছে। অলকা তার উপর নির্ভর করলো না কেন? দুর্দিনে তার সাহায্য প্রত্যাশা করলো না কেন? ব্যক্তিগত সুখদুঃখ বোধের সংবাদ ছাড়া তার পরিচয়ের কোন কথাই অলকা সমরকে জানায়নি। কেন? একি প্রতারণা? হঠাৎ অলকার সিনেমা করাটা বড় লজ্জার মনে হয়—অলকার চরিত্রের সঙ্গে ওর কোন মিল নেই—একটা নোঙরামির মধ্যে যেন অলকা পা দিয়েছে, কিছুতে আর তোলা যাবে না। দুঃখের চেয়ে ক্ষোভই বেশী হয়, এর চেয়ে বড় ফাঁকি যেন আর হয় না।

বাণী বললে, এদ্দিন তো এখানেই ছিল কিন্তু আর থাকতে পারলে না। যাবার আগে আমাকে একদিন বলেছে, আর পরের মত এ পাড়ায় থাকা যায় না, বেশ বুঝতে পারছি সবাই আমাদের এড়িয়ে যেতে চায়। বোধ হয় আমাদের বাড়ির কথাও বলতে চেয়েছিল, বাব মা ইদানীং খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না তো!

বাণীর কথা শুনতে শুনতে সমরের কেমন মনে হয়, বাবা-মা'র জন্যেই অলকা আজ পর হয়ে গেছে। যতীনকাকার মেয়ের সঙ্গে ও'রা সদয় ব্যবহার করেন নিঃ অলকা দুঃখে পড়ে এসেছিল কোন সান্ত্বনা পায়নি—আবার সুখের দিনেও কোন সমর্থন পায়নি। একসময় অলকার ব্যবহারের যৌক্তিকতা যেন খুঁজে পাওয়া যায়—যেন নিরুপায় নিঃসহায় হয়েই আজ সে সরে দাঁড়িয়েছে। ও ছাড়া আর তার কোন গতি ছিল না, কোন উপায়ই ছিল না। এরা সবাই মিলে তাকে ঠেলে দিয়েছে—অলকার কোন দোষ নেই। অলকাকে এরা পর করে দিয়েছে!

কিন্তু অভিমানটাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, অলকা তাকে জানায়নি কেন? অলকা কি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি? এত জিনিস থাকতে 'সিনেমা করতে' গেল কেন? শুধু বাঁচবার জনাই কি ঐ জীবিকা গ্রহণ করেছে না, আরো কিছু? চাকরি করার খবর যদি প্রবাসে সমরকে জানাতে পারলে তাহলে 'সিনেমা করার' কথা জানাতে পারলে না কেন? কি ভেবে চেপে গেছে? কি ভেবেছে? কোন লাভ নেই!—কি হবে জানিয়ে! যে অধিকারের কথা ভেবে সমর এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল, মনে মনে অহঙ্কার বোধ করতো আজ যেন সেই অধিকারবোধ তাকে বিদ্রুপ করছে—ভালবেসে সমর যেন ঠকে গেছে।

বাণী বলছে, অলকাদি এর মধ্যে খুব নাম করেছে। সেবার খুব হৈ হৈ হলো। চমৎকার অভিনয় করে—

দাদার মুখের দিকে চেয়ে বাণী হঠাৎ চুপ করে যায়—দাদার মুখটা বড় কঠিন দেখায় তাহলে দাদাকে এসব কথা বলে কি সে ভাল করেনি? বাণী কেমন অপ্রস্তুত বোধ করে। দাদার মুখচোখের কাঠিন্যে অলকাদির প্রসঙ্গের গুরুত্ব সম্বন্ধে বাণী সহসা যেন অবহিত হয়—কে জানে সে অন্যায় করলে কি না। অলকাদির ওপর এখন আর হিংসে হচ্ছে না এটা সে বুঝতে পারে। কোথায় যেন সমবেদনার একটা সুর থেকে যায়। অলকাদিকে একেবারে হারানোর কথা মনে হয়। দাদার ভালবাসার গভীরতাটা যেন উপলব্ধি করতে পারে সে।

সমর সহজ হবার চেষ্টা করেঃ তাই নাকি! খুব নাম হয়েছে! তুই দেখেছিস?

হঠাৎ দাদার আগ্রহটা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে না বাণী—বুঝতে পারে না, দাদা ভাল মনে অলকাদির খবর নিচ্ছে কি না! কেমন যেন সন্দেহ হয়, দাদার ব্যবহারে। বাণী মিইয়ে গিয়ে জবাব দেয়ঃ না, দেখিনি।

সমর জেরা করে, তা হলে জানলি কি করে?

কথার সুরটা বড় চড়া মনে হয় বাণীর——দুর্নামকারীকে ধমকানোর মত। বলে, কাগজে খুব নাম দেখি কি না!

ও—অ, বলে সমর চুপ করে যায়। বাণী লক্ষ্য করে দাদার মুখ-চোখের ভাবটা যেন আবার অন্যরকম হয়ে গেছে। ছ বছর আগে বাণী ভাল করে জানত না অলকাদি তাদের কে হবে, ছ বছর পরে আজ এখনি যেন বুঝতে পারছে অলকাদি তাদের কেউ-না-হবার পথ না রেখে বড় একটা দাগা দিয়েছে। দাদা ফিরে আসার সমস্ত আনন্দ অলকাদি নষ্ট করে দিয়েছে।

মুখ তুলে বোনের মুখের দিকে ভাল করে চাইতে পারে না সমর—সঙ্কোচ বোধ করে,

যেন একটা বড় রকমের অনুচিত দুর্বলতা ছোট বোনের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছে। অলকার খবরের জন্যে এতটা উতলা না হওয়াই যেন উচিত ছিল। বাণীর বয়েস হয়েছে এখন একটু সমঝে চলা উচিত।

ও প্রসঙ্গ উড়িয়ে দেবার জন্যে সমর বলে, তোর পড়াশোনার তা হলে তো খুব অসুবিধে হচ্ছে। বাণী বলে, না, আমি নিজেই পারি—অসুবিধে আর কি!

না, না, ওটা কাজের কথা নয়—পড়াশোনা চালাকির জিনিস নয়। প্রবীরবাবুর যদি সময় না-ই হয় একটা মাস্টার দেখে দিতে পারেন তো!

বাবা-মা পছন্দ করেন না! পছন্দ না করাটা যেন বাণীরই অপরাধ, কথাটা এমনি শোনায়।

তাহলে পড়াশোনা না করলেই পারিস—ওটা করে লাভ কি? দাদা বেশ রেগেছে মনে হয়।

বাণী আবার বলে আমার কোন অসুবিধে হয় না।

কি এমন কাজ করে যে, একটু সময় করে তোর পড়াটা দেখে দিতে পারে না! দেশোদ্ধার করছেন বুঝি আজকাল?

কোথা থেকে কি এল! আবার একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ ওঠে বোধ হয়। বাণী চুপ করে থাকে। দাদার মেজাজের হদিস পায় না কোন।

সমর নিজের মনে বকে যায়ঃ দেশোদ্ধার তো পালিয়ে যাচ্ছে না—ঘরের কাজ একটু আধটু করলেই পারেন। সারা দিন রাত্রে পড়া দেখাবার সময় হয় না? কি করেন শুনি!

বাণী এমনভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে যেন প্রবীরের সব কিছুর জন্যেই সে দায়ী—সব জানে অথচ কবুল করছে না। কি যে মুস্কিলে পড়া গেল!

কি মনে করে সমর আর অগ্রসর হয় না। বলে, আমি যদ্দিন আছি আমার কাছে দেখিয়ে নিস্।

উপস্থিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও, ভবিষ্যতের অস্বস্তির জন্যে মনে মনে বাণী ভয় পায়। তার পড়াশোনা দেখান নিয়ে আবার কিছুর উদ্ভব হবে কি না কে জানে। দাদার যা মেজাজ হয়েছে!

ইতিমধ্যে চা-টা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। সমর অপ্রস্তুতের মত তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা তুলে ধরে চুমুক দিলে। দাদার মুখের দিকে চেয়ে বাণীর একটা অজানা বেদনাবোধ গুমরে ওঠেঃ দাদা বড় কাতর হয়েছে, মুষড়ে পড়েছে। অলকাদিকে ফিরে পাওয়া যায় না?

এক চুমুকে ঠাণ্ডা চা-টা শেষ করে চোখ তুলে চাইতে বোনের মুখের লাবণ্যে ছ' বছর আগে অলকার বিশেষ একটা ভঙ্গি প্রতিফলিত দেখতে পায় যেন। চমকে ওঠে। বাণী ছ' বছর পরে কারো সঙ্গে অলকার মত ব্যবহার করবে না তো? বিশ্বাস কি! দেখতে দেখতে বাণীটা কত বড় হয়ে উঠেছে—অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন!

ঘরটা বেশ গুছানো মনে হয়—কয়েকটা ছবিও ঝোলান হয়েছে, উনিশ শ' উনচল্লিশের মেমসাহেবের মুখওলা ক্যালেন্ডারটা ইতিমধ্যে কখন সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রথম দিন এসে রাত্রে শুয়ে ঘরটাকে যতটা বুকচাপা মনে হয়েছিল এখন অনেক ফাঁকা আর পরিচ্ছন্ন লাগছে। খাটের ছত্রিতে জড়ান মশারীটা বড় পরিস্কার। একটা সযত্ন পরিপাটি ঘরময় লেপে আছে।

বোনের মুখের দিকে চেয়ে সমর হাসলে। বাণীও হাসলে। সমর বললে, খুব গুছানো হয়েছিস তো! বাবার ঘরের ছবিগুলো পর্যন্ত খুলে এনে এখানে টাঙিয়েছিস! বেশ দেখিয়েছে নয়?

বাণী মুখ টিপে উজ্জ্বল হয়ে রইল। মেয়েটা বড় 'ইনটারেস্টিং' হয়ে উঠেছে!

ঘরের এক কোণে সিলিং-এর ওপর সিমেন্টের পটী মারা একটা ফাটল চিহ্ন চুনকামের আড়ালে ঢাকা পড়েনি—বেশ নজরে পড়ছে সমরের। কি দরকার ছিল আজ ঘর সাজাবার—নাই বা কেউ সমরের ঘর গুছিয়ে রাখতো! ফাটা ছাদ দিয়ে ঘরের ভেতর জল পড়লেই বা কি এসে যেত? যুদ্ধে যাবার আগে ঘর গুছোবার অছিলায় অলকা অনেকদিন ওপরে উঠে এসেছে—ধরা পড়েও ধরা দিতে চায়নি। পৈতৃক বাড়িটা তখন বড় জীর্ণ ছিল—ছাদে উঠতেই ভয় করতো তখন। এখন কি সমরদের পয়সা হয়েছে? ঘরদোর বেশ মেরামত করা হয়েছে। শ্রী ফিরেছে বোধ হয়। (ক্রমশঃ)

বিপ্রমুখের কথা

। ব গত যুগের ঐশ্বর্য নিয়ে আক্ষেপ করা যুক্তিসংগত নয়। তাই বলে বর্তমানের অস্তিত্বটাই তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি, এটা মেনে নিতেও বাধে। অতীতের যা কিছু সবই ভালো বলা যেমন অজ্ঞতা, বর্তমানের সব কিছুই খারাপ ভেবে নেওয়া তেমনি অন্ধতা। তাই যেখানে যেটুকু ভালো দেখেছি আর পেয়েছি, সেটা স্বীকার করে নেব, যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যাচাই করে নেব,যেটা মেকি বলে সন্দেহ হয়। এই গ্রহণ-বর্জনের পালা কেউ-বা নেপথ্যে সেরে নেন, কেউ-বা উন্মুক্তভাবেই প্রকাশ করেন। সকল লেখক, কবি, শিল্পীই এই কাজ করে থাকেন। করাটাই ধর্ম, না করাটাই অধর্ম। প্রেরণা না থাকলে যেমন সৃষ্টি হয় না, সাধনা না থাকলে সে সৃষ্টি সার্থক হয় না। সাধনার অর্থই হল জিজ্ঞাসা, সমালোচনা, উপলব্ধি, সমীকরণ। যা দেখেছি, যা উপভোগ করেছি, যা ভালো লাগেনি, বুদ্ধি-বিচার-শক্তিকে পীড়িত করেছে, হৃদয়কে ক্ষুণ্ণ করেছে, সব কথাই অকপটে ব্যক্ত করব। এতক্ষণ করলাম মুখবন্ধ।

অথ কথারম্ভ

হেমন্তের স্বর্ণোজ্জ্বল আলোয় বাগানটি ঝলমল করছে। শিশির শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু ঘাসের ডগাগুলি এখনও ভিজে। লংকা-চারায় ছোট ছোট শাদা ফুলগুলি নোলকের মতন দুলছে। কোণের ওই স্থলপদ্মের গাছে রোদের ঝলকটা তীব্রভাবে পড়েছে, ফুলের পাপড়িতে সবে গোলাপী আভা ধরেছে। রূপান্তরের কামনায় ফুলগুলির নীরব প্রতীক্ষা এতো সহজ সত্য বলেই নতুন দেখার চমক জাগায় মনে। প্রত্যেকটি ফুলের ও ফলের গাছে সেই একই প্রাকৃতিক রহস্য ধীরে ধীরে পলে পলে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। যেন হচ্ছে হবে, এই ভাব। কোন ব্যগ্র উন্মাদনা নেই। বিজ্ঞাপন আছে কিন্তু বাহুল্য নেই। একটি অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার অদৃশ্য প্রাণসূত্রে সব কিছু শ্লথ ও শিথিলভাবে বাঁধা পড়ে আছে। সমষ্টির দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়—সবাই যেন বলছে, 'চোখ মেলে চেয়ে দেখো। হয়তো এমন করে এই প্রথম দেখলে। আর হয়তো এই শেষ দেখা।' এই চোখের খোরাক মেটায় মনের ক্ষুধা। ক্ষুধার তৃপ্তিতে শান্তি। হয়তো বা অতৃপ্তি। আবার নতুন ব্যাকুলতা, নতুন করে দেখার আগ্রহ। এই চলেছে। নিত্য চলিষ্ণু জগতের সংগে তাল রেখে চলেছে অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি আর অন্তরের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা স্বর্ণ-সেতু নির্মাণ করে চলেছে দিনের পর দিন। সেই অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করছে সত্যের। কখনো তিক্ত, কখনো মধুর। কখনো শক্ত, কখনো পলকা। ঐ যে পেয়ারা গাছটি—ছায়ায় আর রৌদ্রে ওটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল। শান্ত সহিষ্ণু গৃহিণীর মতই অকাতরে অর্বাচীন সংসারের দুরন্তপনা সহ্য করে। পুরানো ছাল এক-পুরু করে উঠে গেছে। মাঝে মাঝে ক্ষতের দাগ, দু-একটি ডাল ভাঙা, প্রান্ত শাখাগুলির কয়েকটি দাপাদাপির চোটে নুয়ে পড়েছে। তবু নমনীয় প্রকৃতির নিজস্ব অদম্য শক্তির প্রাণরসে ওটি পূর্ণ। প্রাচুর্য আর অতি-পরিচয়ের অনাদরে ওর অস্তিত্বে দৃক্‌পাত তেমন করি না। কিন্তু আস্থা রাখি বেশি। বাগানের অপর কোণে দেখছি এক জোড়া গোলোক-চাঁপার গাছ। যেন ধনী-গৃহের দুটি যমজ গরবিনী। পাতার নিখুঁৎ সজ্জায়, দীঘল পেলবতায় ওরা মনোহারী। ওদের কৃত্রিম জীবনের একমাত্র উন্মীলিত সত্য যেন চূড়ায় এসে দুটি গুচ্ছে বিকশিত হয়ে উঠেছে। একটিতে শাদা স্তবক, অপরটিতে লাল। পলকা ওদের ডালগুলি। দেখতে যদিও নধর, মোটা-সোটা। সযত্নবর্ধিত স্বল্প মূল গাছ দুটির সংগে মাটির যোগ কম। বাহারটাই বেশি। তবু এ-ও সত্য। প্রচ্ছন্ন তেজে গভীর ও গম্ভীর নয়। শুধু ঢলঢলে সরস সত্য।

আর অদূরে ঐ যে আমলকি গাছটি রয়েছে—কবির ভাষায় বলতে গেলে শীতের প্রথম হাওয়ায় যার ডালে-ডালে নাচন শুরু হয়েছে, ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। ওর সত্য স্বতন্ত্র। বাহ্য রূপে, এমন কি, অন্তরের রসাস্বাদেও ওর মর্মপরিচয় ঠিক মেলে না। নিরুপম আমলক-ফলের সাহিত্যিক তুলনা মেলে মেরেডিথের গদ্যে, এলিয়টের কাব্যে। একাধারে এগোইস্ট আর ওয়েস্ট ল্যান্ড। ঘরোয়া তুলনায় বলা চলে, পাকা ঘরনীর বিচিত্র স্বাদ কষায় মধুর বাণী। অংগে অন্তরংগ শ্যাম, চোখে শ্বেতাভ স্বচ্ছ সজলতা, রসনায় কটু ক্ষার। জলপানযোগে মিষ্ট, ভাইটামিনে ভরপুর, গূঢ় কোষে মাধুর্য, জারক রসে রাঢ় দেশের খাঁটি মোরব্বা। শাস্ত্রে এটি হরিতকীর মতই সাত্ত্বিক ফল, অমৃতবিশেষ। কবিরাজির কথা বাদ দিলাম। গুণপনায় আর প্রয়োজনীয়তায় বিলেত-ফেরৎ ডাক্তারও আমলকীর প্রশংসা করে থাকেন। এ-ও সত্য।

* * *

কোনও অস্তিত্বই অবহেলার বস্তু নয়। সকল প্রকাশের পিছনেই আছে বিশিষ্ট সত্তা, ভালোয় মন্দয়, দোষে-গুণে জড়ানো-মেশানো। পারিপার্শ্বিকের সংগে সমগ্র সম্বন্ধে জড়িত, নিয়ন্ত্রিত। যে চোখ আনুষঙ্গিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তুর প্রকৃত এবং আন্তরিক রূপটি ধরে ফেলে, সেই চোখ সত্য-সন্ধানী। কথাটা অত্যন্ত সহজ, পরিচিত। তবু পুনরাবৃত্তির ওজন সইতে পারবে। • শুধু টিকটিকি, গিরগিটি বা সরীসৃপ জাতীয় জীব এই প্রকৃতির দেওয়া ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করে চলেছে, তাই নয়। সকল প্রাণীই তাই করছে। মানুষও সেই বিদ্যা শিখে নিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। যুদ্ধের সময় 'ক্যামুফ্লাজ'-এর ছড়াছড়ি ছিল। নতুন আংগিকে, নতুন কৌশলে সত্য রূপটিকে গোপন রাখার প্রয়াস চলেছে আজও এবং সর্বত্র—সংসারে, সমাজে, ব্যবসায়ে, কূটনীতির ক্ষেত্রে। এক হিসেবে আমরা এক-একটি বিচিত্রবর্ণ পাইথন অথবা ঢিল-নুড়ি-পাথরে মুখ লুকিয়ে শুয়ে-থাকা ঘোর দর্শন বাস্তু-মাস্টার। কেউ-বা বাঙলা দেশের নধর নিরীহ লাউ-ডগা, কেউ-বা আফ্রিকার লতান্তরিত অদৃশ্য ভীষণ শত্রু—মামবা। কেউটে-গোখরোর অভাবও নেই। তবে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে রকমফের, এই যা। কেউ-বা স্পিটিং কোবরা, কেউ-বা দুধে-কেউটে, কেউ-বা খরিষ, কেউ-বা শঙ্খচূড়। প্রকৃতির সংগে নিজেকে মিশিয়ে, খাপ খাইয়ে, স্বভাবটিকে গোপন করে বেশ আছি। ক্রূরতার সংগে অমায়িকতা, স্বার্থরক্ষার সংগে নির্বিরোধ উদাসীনতার প্রয়োজনীয় ডোজ মিশিয়ে, দল বেঁধে অথবা দল ছেড়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি সব দেশ-বিদেশের ঝোপে-ঝাড়ে। বাইরে যা, ঘরেও তাই। ঠোঁট-চাপা, কোষে-ঢাকা বিষ দাঁত নিয়ে কত বর্ণ ও রেখাবহুল ভাই-প্যার বিচরণ করছে। কেউ-বা কালনাগিনী, কেউ-বা চন্দ্রবোড়া অথবা শাঁখামুঠি।

আত্মরক্ষা আর জৈব প্রয়োজনেই প্রকৃতির বর্ণলীলা, প্রাকৃতিক জীবের ছদ্মবেশ। আমরা সেই ছদ্মবেশের রহস্যটুকু বুঝে নিয়ে নিজের কাজে লাগিয়ে থাকি। একদিন অর্থাৎ সভ্যতার আদিম যুগে এসব উপায়-কৌশলের গুরু প্রয়োজন ঘটেছিল। সভ্যতার বিবর্তনে আজ অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি আমরা। অ-প্রাণীবাচক গুণাগুণ, ধারণা, ভাববস্তু নিয়ে বিশ্বের দরবারে কারবার করে থাকি। কিন্তু বুদ্ধি-বিচারের সংগে যে প্রাথমিক 'ইনস্টিংট' অথবা সহজাত প্রবৃত্তিগুলো অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে, সেগুলো এখনও ঠিক মত কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পারা সম্ভব হয়নি। প্রবৃত্তিগুলোর ওপর চড়া পালিশ লাগিয়ে চোরাবাজারের সান্ধ্য জৌলুস এনেছি মাত্র। নতুন নতুন নাম দিয়েছি—লয়েলটি, সেফটি অব দি স্টেট, ব্যালেন্স অব পাওয়ার কিম্বা গ্রুপ রাইটস। চলছে তো ভালোই এখনও পর্যন্ত। যাঁরা পলিটিক্স করেন, তাঁরা অসংকোচে

ঐতিহ্যের ব্যবহার করেন। দক্ষিণপন্থীরা রাষ্ট্রের কাঠামো বদলাতে নারাজ। অবস্থা বুঝে তাঁদের ব্যবস্থা, হোমিওপ্যাথিক ডোজে পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসির মাহাত্ম্য-বিস্তার। বামপন্থীরা দলগত স্বার্থ উড়িয়ে দিয়ে শ্রেণী-বিরোধ নিঃশেষ করতে চান। ডিনামাইট প্রয়োগে অচলায়তনের পাথর-কেল্লা ভেঙে নতুন মাটির ভিত্তি তাঁরা কামনা করেন। মধ্যপন্থীরা লেবার গভর্নমেণ্টের মতন সুবিধা মাফিক ভোল বদলে ফেলেন। পুরানো কূটনীতিকে নতুন সাজে ঢেলে এক-একটি নীরব বিপ্লব সাধন করেন। সংকট পার হয়ে যায়, পরস্পর গা-শোঁকাশুঁকি চলে। বিস্ময়ে হতবাক্ পশ্চিম ভূখণ্ড এই মানিয়ে নেওয়ার অদ্ভুত কৃতিত্বে মাথা নত করে। আর আমরা জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজনে আর তাগিদে ঘুরে বেড়াই ক্ষেত-খামারে, মাঠে-জঙ্গলে। মাঝে মাঝে কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরের জগতের দিকে তাকাই, দুনিয়ার সংবাদের দু-এক টুকরো ঘরে নিয়ে ফিরি, নতুন প্যাঁচ শিখি, কাজে লাগাই, তারিফ করি আবার সমালোচনাও করি, আবার গড্ডালিকা-প্রবাহে, আসন্ন দুর্দিনের ভয়ে কিছু কিছু পুঁজি সঞ্চয় করে নিয়ে নিরাপদ গর্তের মুখ খুঁজে ফিরি।

মানুষের এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত ন্যায্য এবং স্বাভাবিক। মানুষ যখন অবস্থার ফেরে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে, তার স্বভাব ও ধারণাগুলোও সেই রকম সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চাপে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র রূপ নেবে, এটা সমাজ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র। আমাদের যাবতীয় বিশ্বাস আর সংস্কার, ধর্ম, রাষ্ট্র আর সমাজ-সংক্রান্ত সমস্ত ধ্যান-ধারণাই এই-ভাবে পুষ্টিলাভ করেছে। বাঁচবার জন্যে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন। শক্তি অর্জনের একটি প্রধান উপকরণ হল আত্মসাৎকরণ। যেখানে যেটুকু নেবার ও শেখবার আছে, সেখান থেকে সেটুকু গ্রহণ না করলে চলে না। সাধারণ মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী, সকলেই তাই করে থাকে। প্রয়োগশিল্পে যেটুকু পার্থক্য, সেই-টুকুই ব্যক্তিগত নৈপুণ্য। মানুষ প্রকৃতির কাছে চিরদিনের জন্য এ বিষয়ে ঋণী হয়ে আছে এবং থাকবে। প্রকৃতির অফুরন্ত রহস্য-খনি এখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি। আণবিক যুগেও প্রকৃতির নকলিয়ানাই হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ মুন্সিয়ানা।

এক খিলি মিঠে পান আর ইংগ-ভারতীয়-আমেরিকান মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি একটি টোস্ট তামাকের সিগরেট ধরিয়ে, উদার উদরের পূর্ণ সহযোগিতায় খেয়ালি চিন্তার অম্লমধুর রসে জীর্ণ হচ্ছিলুম। এমন সময়ে মূর্তিমতী সার্থকতার বেশে বহুরূপী এসে উদয় হল। রোজই আসে এই মহাদেও। অশিক্ষিত দেহাতী সে। জরু-গরু মরে গেছে। জমি-জারাৎ বেচে দিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। পুজো আর বড়দিনের মরশুমে কলকাতার বায়ু-পরিবর্তন-কারী বাবুদের মনোরঞ্জন করে নানা সাজে। নকল করে অনেক চরিত্রকে। মানুষটির সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি। ওর মধ্যে যথার্থ অভিনয়-দক্ষতা আছে আর আছে সহজ সুন্দর শিল্পবোধ। কোনও বাড়াবাড়ি নেই, যেখানে যেটুকু দরকার, সেইটুকুই ফোটায় ও দেখায়। একাধারে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীব। আপন মনেই আসে, আবার চলে যায় সাঁওতাল পরগণার অন্য কোনও শহরে। এই ওর পেশা, এই ওর নেশা। কোনও দিন সাজে গুর্খা দরোয়ান, কোনও দিন কাবুলিওয়ালা। কখনো শহুরে উকিল, কখনও খৈনি-খাওয়া সিপাহী। কাল এসেছিল মথুরা-বৃন্দাবনের গোয়ালিনী বেশে। আজ এল ধোপানীর সাজে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আঁচলটা মাথায় টেনে সামান্য মুচকি হাসি হেসে বহুরূপী বললে, "বেনারসের ধোপানী আছি বাবু। কাপড় কাচি ভালো......"

চীনের একটি খবর

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চীন দেশে দশ বার বছর ধরে যুদ্ধ চলছে। তৎপূর্বে পর পর কয়েকবার সেখানে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে। জাপানের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলেছিল ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু শিক্ষায়তন নষ্ট হয়ে যায়। রাজকোষে টাকার অভাব; দেশে খাবার নেই, কাপড় নেই; চুরি ডাকাতি কালোবাজারের অন্ত নেই। এই দুরবস্থার মধ্যে কোন গঠনমূলক সমাজ সংস্কারের কাজ যে কোথাও চলতে পারে কল্পনা করা যায় না। অথচ এই দুর্দিনেও চীনে একটি আশ্চর্য গঠনমূলক কাজ চলেছে তার খবরও আমাদের কাছে পেঁছায় না।

চীনের তুলনায় ভারতবর্ষের অবস্থা স্বর্গতুল্য। আমাদের দেশে তেমন অশান্তি কোথাও নেই, সরকারের ধনকোষে অর্থের তেমন টানাটানি এখনো ঘটেনি, আহার্য বা কাপড় বা অন্যান্য নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী যা আছে তাতে একরকম চলে যাচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতা এতদিন সম্পূর্ণ ছিল না বটে এক বছর হল তাও পাওয়া গেছে। তার অনেক বছর আগে থেকেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান সমস্ত দেশ অধিকার করে ফেলেছিল। কংগ্রেসের আওতায় দেশ সেবার গঠনমূলক কাজের উদ্যোগেরও অভাব ছিল না। কিন্তু পলিটিকস্ বাদ দিয়ে যদি ভাবি তবে কতটুকু সত্যিকার দেশসেবা আমরা এতদিনে করতে পেরেছি, সমাজের প্রকৃত উন্নতিসাধন কতটা করেছি সেই প্রশ্ন বারংবার মনে জাগে। এই সম্পর্কে চীনের দু একটি উদ্যোগের বিষয় ভাবলে সে কথা আরো প্রবলভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমাদের মাথা নত হয়ে যায়।

আমরা এসিয়ার অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে খুব কম খবরই রাখি। বিদেশী বার্তাবণিকরা মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প সত্যমিথ্যা যা খবর সরবরাহ করে থাকে তার থেকেই আমাদের যা কিছু জ্ঞান লাভ করতে হয়। তারা যা খবর দেয় যুদ্ধ-বিগ্রহেরই খবর, দেশের প্রকৃত অবস্থা তার থেকে কিছুই জানবার উপায় নাই। এসিয়ান মহাসভার প্রথম অধিবেশন আমাদের নেতৃবর্গের আহ্বানেই ভারতবর্ষে হয়েছিল। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, কথাবার্তা ও বক্তৃতাতেই সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল, কাজ কিছু হল না। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির খবরাখবর জানবার কোনো ব্যবস্থাও এখনো পর্যন্ত হল না। ভারতবর্ষের বাইরে এসিয়ার কোনো দেশে আমাদের "নিজস্ব সংবাদদাতার" পরিচয় এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অথচ আমাদের চারপাশে এসিয়ার বিভিন্ন দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে আমাদের কি জানার দরকার নেই?

চীনের একটি খবর এখন দেওয়া যাক। চীনে অনবরত যুদ্ধই চলছে, সেখানকার লোকেরা খেতে পরতে পাচ্ছে না—এই খবরই সংবাদদাতারা আমাদের দিয়ে আসছেন। যে খবর দেবার জন্য এই প্রবন্ধ লেখা সাংবাদিকেরা তাকে সম্ভবত তুচ্ছ মনে করে, তাই এই ধরণের খবর আমাদের কাছে সহজে পেঁছায় না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই চীনে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ ১৯২০তে প্রথম শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে চীন সরকারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর উদ্দীপক একটি যুবক, Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, জিমি ইয়েন (Jimmy Yen)। এই যুবকটিই এই আন্দোলনের জন্মদাতা ও তাঁর একার চেষ্টাতেই জনসেবা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানটি দেশজোড়া বৃহৎরূপ ধারণ করেছে। তিনি যখন প্রথম কাজ আরম্ভ করেন আমাদের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে এই যুবকটির আশ্চর্য উদ্যম ও সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের (Adult Education) অভিনব প্রণালী সম্বন্ধে আমরা শুনতে পাই। এই বিষয় আরো বিশদভাবে জানবার জন্য সেই সময় চীন থেকে ইয়েন-এর প্রকাশিত প্রচার পুস্তিকা ও ভাষা শিক্ষার charts শান্তিনিকেতনে আনান হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কোন সংবাদ নেওয়া সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি The new Leader পত্রিকাতে ইয়েন-এর এই কাজ সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশ হয়েছে দেখতে পেলুম। তার থেকে জানতে পারা গেল তিনি Hopei প্রদেশে শিক্ষা প্রচারের যে কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন এই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও তা শুধু যে অক্ষুন্ন আছে তা নয়, আশ্চর্য প্রসারলাভ করেছে। বিবরণটি সংক্ষিপ্ত হলেও তার থেকে বেশ বোঝা যায় চীনের এই জনসেবা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক জগতের একটি প্রধান ঘটনা বলে স্বীকারযোগ্য।

চীন ভাষায় ৪০,০০০ কথা আছে। প্রত্যেক কথার জন্য একটি করে অক্ষর। ইয়েন দেখলেন সকলের পক্ষে ৪০,০০০ অক্ষর শেখার কোন প্রয়োজন নেই এবং শেখাতে গেলে বৃথা সময় নষ্ট হয়। জনশিক্ষার প্রয়োজনমত মাত্র ১০০০ কথা তিনি বাছাই করে নিলেন। সেই এক হাজার কথা ও তার অক্ষর শেখাবার সহজ প্রণালী অবলম্বন করে নানা রকম চার্ট তৈরী করে জনশিক্ষার কাজে নামলেন। প্রথমে তিনি সহরের লোকদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর Tientsin এর একটি ধনী তাঁকে Hopei প্রদেশে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। ইয়েন এইটেই চেয়েছিলেন। তিনি নিরক্ষর গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে কাজ করবার কথাই ভাবছিলেন, এমন সময় এই আহ্বান এল। তিনি তখন Peiping গিয়ে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের কাছে তাঁদের সাহায্য চান। তাঁর অনুরোধে তৎক্ষণাৎ ৬০জন ছাত্র আর অধ্যাপক সানন্দচিত্তে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে Yen এর সঙ্গে গ্রামে গিয়ে তাঁর প্রণালীতে শিক্ষা প্রচারের কাজে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখান, কিন্তু কাজে নেমে দেখলেন যে, জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে গেলে শুধু নিরক্ষরতা দূর করলেই হবে না, তাদের আরো অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া দরকার। তাদের ভাল চাষ করতে শেখাতে হবে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হবে, মহাজনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার উপায় বলে দিতে হবে, সর্বোপরি তাদের সমাজ সংস্কার ও সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। এতে তাঁরা দমে গেলেন না, Hopeiর গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে উৎসাহ সহকারে এই কাজ করতে লেগে গেলেন।

একটি সম্পূর্ণ প্রদেশের লোককে এই ধরণের শিক্ষা দেওয়া যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। তাছাড়া প্রতি পদে নানা অসুবিধা ও বাধা। তাঁদের মূলধন ছিল মাত্র ৩০০০৲ টাকা; কার্যস্থল একটি বৃহৎ প্রদেশ যার প্রতি জেলায় ৪ লক্ষ নিরক্ষর লোক, অথচ লোকবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী। তাঁরা প্রথমে অল্প কয়েকটি কেন্দ্র খুলে ছাত্র সংগ্রহ করলেন। তাদের এমন শিক্ষা দিলেন যাতে তারাই আবার শিক্ষকের কাজ করতে পারে। এইরকম করে একটি শিক্ষক সঙ্ঘ গঠিত হল। সেই শিক্ষকরা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়ে নানা জায়গায় ইস্কুল গড়ে তুলতে লাগল। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের

পর শহর, জেলার পর জেলা কাজ ক্রমশ অগ্রসর হয়ে চলল। যেমন যেমন একটি দলের শিক্ষা শেষ হল তারাই আবার একটি ছাত্র সঙ্ঘের সভ্য হয়ে গ্রামের নেতৃত্বভার গ্রহণ করল। তারা বেতারকেন্দ্র স্থাপন করে তার পরিচালনার ভার নিল, নতুন ধরণের পাঠ্য পুস্তক ছাপাতে লাগল ও সেইগুলি বাঁশের বাঁকে দুদিকে ঝুলিয়ে নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিতরণ করে বেড়াতে লাগল। তাদের মধ্যে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা রুগীদের সেবা করল, গ্রামের মেয়েদের স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম, পরিচ্ছন্নতা ও শিশু পালন সম্বন্ধে শিখিয়ে দিল। যারা ডাক্তার ছিল তারা ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। ডাক্তারের প্রয়োজন বাড়লে ইয়েন মেডিক্যাল ইস্কুলের কর্তৃপক্ষদের স্মরণাপন্ন হলেন, তাঁরা ব্যবস্থা করলেন ছাত্রেরা তাদের internship-এর সময় গ্রামে গিয়ে চিকিৎসার অভ্যাস করবে। তখন ডাক্তারের অভাব ঘুচে গেল। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও কৃষির উন্নতির চেষ্টা সমানে চলতে থাকল।

কাজ করতে গিয়ে ইয়েন দেখলেন সাধারণ প্রচলিত প্রণালীতে একজন সামান্য লেখাপড়া শেখাতে অন্তত তিন বছর লাগে। অনর্থক এত সময় দেওয়া পরিশ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ। ইয়েনের সেই সময় যে অর্থ বা লোকবল তাতে প্রচলিত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে গেলে সাফল্যের সম্ভাবনা নেই আশঙ্কা হল। তিনি তখন প্রাথমিক শিক্ষার নতুন প্রণালী আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন ও আশাতীত সফল হলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল তিন বছর না লেগে নূতন প্রণালীতে ১৮ মাসেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করা যায়। খরচ লাগে মাথাপিছু মাত্র ১৮৲ টাকা। সকলের খুব উৎসাহ বেড়ে গেল। স্থির হল তিন বছরের মধ্যেই Hopei প্রদেশে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিতে হবে।

ইয়েনের জনশিক্ষা প্রণালী অনুকরণীয়। তাঁর স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রত্যহ প্রত্যূষে চাষের কাজ আরম্ভ হবার পূর্বেই গ্রামের কোন চাষীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে সবাইকে ডাক দেন। সকলে সমবেত হলেই ক্লাস আরম্ভ হয়। গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসারে বর্ণমালা সুর করে মুখস্থ করান হয় না। প্রথম দিন শিক্ষক হয়ত একজন প্রবীণ গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করেন:—

"ওয়াং, তুমি চোখে ভাল দেখতে পাও?"

"হাঁ, মশায়, দেখতে পাব না কেন?"

"আচ্ছা, আমার হাতে যে বইটা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ?"

"নিশ্চয়।"

"তবে বল ত এতে কি লিখছে?"

লোকটি এদিক ওদিক তাকায় জবাব দিতে পারে না।

"তোমার চোখ আছে বটে, কিন্তু তবু তুমি অন্ধ। আচ্ছা, বল ত তুমি তোমার নিজের নাম লিখতে পার?"

"আজ্ঞে না, শিখিয়ে দিলে তবে ত নাম লিখব।"

"বেশ, শিখে নাও" বলে বোর্ডে তার নাম বড় বড় হরফে লিখে দিলেন। শিক্ষকের লেখা ওয়াংকে অনুকরণ করতে দেওয়া হল। প্রথম দিনেই খানিকটা চেষ্টার পর ওয়াং নিজের নাম লেখা অভ্যাস করে ফেলল।

এক মাসের মধ্যে খবরের কাগজের হেড লাইনগুলি প্রতিবেশীদের সে পড়ে শোনাতে পারল। ক্লাসের ছাত্রদের যখন পাঁচশোটা অক্ষর পরিচয় হয়ে গেছে তখন শিক্ষক তাদের বুঝিয়ে বলেন, "তোমরা ত পড়তে পার এখন, কিন্তু পাশের গ্রামের তোমাদের ভাইদের এখনো অক্ষর পরিচয় হয় নি, তোমরা কেউ গিয়ে তাদের শিখিয়ে দিয়ে এস না।" তাদের মধ্যে হয় ত পাঁচজন এই কাজ করতে রাজী হল। তখন তাদের কাছাকাছি পাঁচটা গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই করে খুব সহজেই সরকারের বিনা সাহায্যে নগণ্য ব্যয়ে দেশময় ছেলেমেয়ে বৃদ্ধ সকলের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার করতে সক্ষম হলেন ইয়েন।

সাক্ষাংভাবে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না নিলেও ইয়েন পরোক্ষভাবে যে প্রণালীতে সাহায্য নিয়েছেন তার একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে কোন গবর্ণমেণ্ট দেশের জনসাধারণের হিত করতে যদি সত্যই ইচ্ছুক থাকে, তবে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কী ভাবে সহযোগিতা করলে অতি অনায়াসে কতটা উপকার করতে পারে। Bishan জেলা এক সময় তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইয়েনের কর্মীরা দেখলেন তাঁতীরা এখন সুতো না পাওয়ায় তাদের জীবিকা ত্যাগ করে দিন-মজুরগিরি করতে বাধ্য হয়েছে। ইয়েনের পরামর্শে চীন সরকার নিয়ম করল তাঁতীদের যথেষ্ট পরিমাণে সুতো সরবরাহ করা হবে নিম্নলিখিত নিয়মে:

(১) তাঁতীদের সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে।

(২) যে তাঁতীদের ঘরে দুটোর বেশি তাঁত আছে তারাই কেবল সুতো পাবে।

(৩) তাঁতীদের লেখাপড়া শিখতে হবে, যারা নিরক্ষর তারা সুতো পাবে না।

(৪) তারা যে কাপড় বুনবে ৬০ ইঞ্চি বহরের ও ৪০ গজ লম্বার কম হতে পারবে না এবং প্রত্যেক ইঞ্চিতে ৬০ গাছা সুতো থাকবে।

এই নিয়ম করায় তাঁতীদের মধ্যে যারা উদ্যোগী তাদের জীবিকার্জনের উপায় হল, তাদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের সুবিধা হল এবং নির্ধারিত আদর্শ অনুযায়ী (standardized) কাপড় প্রস্তুতের ব্যবস্থাও একাধারে হয়ে গেল। এই নিয়ম প্রবর্তনের ২ মাসের মধ্যে দেখা গেল ৭৮৭ থান কাপড় প্রস্তুত হয়েছে, তাঁতীরা ২৭০০৲ বেতন পেয়েছে ও সমবায় সমিতিগুলি ৩০০০৲ মুনাফা করেছে। এই লাভের টাকা ২০% শিক্ষা প্রচারের কাজে, ১০% স্বাস্থ্য উন্নতির কাজে ও বাকি টাকা তাঁত ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সমিতিগুলি স্বেচ্ছায় বণ্টন করে দিয়েছিল। Bishan জেলার কয়েকটি গ্রামের তাঁতীদের এই উন্নতি দেখে সারা জেলায় আন্দোলন পড়ে গেল, অন্যান্য গ্রামের তাঁতীরা ইয়েনকে অনুরোধ জানাল তাদেরও সাহায্য করতে হবে। ইয়েন বললেন, তিনি নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন যদি তারা তাদের গ্রামে একটি করে পাঠশালা স্থাপনে তাঁকে সাহায্য করে। এই কথা শুনেই জেলার সব গ্রামেই তাঁতীরা গাছ কাটা শুরু করে দিল, ইঁট প্রস্তুত হতে থাকল। সেই দেখে ইয়েনের ভাবনা হল এত সুতো কি করে সংগ্রহ করবেন। তিনি তখুনি Chunkingএ গিয়ে সরকারী ব্যাঙ্কে ৯ লক্ষ টাকা ধার চাইলেন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তাঁর মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। একটিমাত্র জেলার সমবায় সমিতিকে এত টাকা ধার কি করে দেবেন। ইয়েন নাছোড়, উপরওয়ালাদের কাছে দরবার করে দেড় মাসের মধ্যে ৯ লক্ষ টাকা আদায় করে Bishanএ ফিরে এলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই জেলার ঘরে ঘরে তাঁত চলতে লাগল।

তাঁতীদের কাপড় বোনার ব্যবস্থা হয়ে গেলে ইয়েন কাগজ তৈরী করা নিয়ে পড়লেন। ঐ জেলাতে যে কাগজ তৈরী হত সস্তা দামের নিকৃষ্ট কাগজ। তিনি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আনিয়ে ভাল কাগজ করানো শেখালেন, তাঁতীদের যেমন ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে লেখা-পড়া শেখানরও চেষ্টা হয়েছিল, এদের মধ্যেও সে চেষ্টার ব্যতিক্রম হয়নি।

তারপর এল চাষীরা। ইয়েন কয়েকটি ভাল জাতের মুরগী আনিয়ে একজন ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞকে বলে দিলেন চাষীদের দেখাতে তারা যে দেশী মুরগী পালন করে তার চেয়ে এই মুরগী কত বেশী ডিম দেয়। চাষীরা তা দেখেও বিশেষ উৎসাহিত হল না—তারা বলল "আপনারা, মশায়, জ্ঞানীগুণী লোক, মুরগী যাতে বেশি ডিম দেয় আপনারা তার ব্যবস্থা করতে পারেন, আমরা পারব না।" ইয়েন তখন ঐ গ্রামেরই একজন অপেক্ষাকৃত উৎসাহী চাষীকে ভাল জাতের কয়েকটি মুরগী দিয়ে রাজি করালেন তার বাড়িতেই সেগুলিকে সে পালবে। যখন গ্রামবাসীরা দেখল যে তাদেরই একজনের বাড়িতে মুরগীগুলি সত্যিই অনেক ডিম দিচ্ছে তখন সকলেই ঐ মুরগী নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

জনসেবা সংঘের কর্মীরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন চাষীরা সাধারণত রক্ষণশীল হলেও উন্নতির প্রণালী যদি তাদের প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দেওয়া যায় তবে তারা আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করে। চাষের উন্নতি কি করে করতে হবে শেখাবার জন্য প্রথমে ছয়টি ইস্কুল স্থাপিত হয়। এই ইস্কুলগুলির উপকারিতা দেখে জেলার লোকদের মধ্যে এত উৎসাহ জাগল যে তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে আরো ৪৭২টা ইস্কুলের ঘরবাড়ি তৈরী করে দিল। এই কাজের জন্য ইয়েনকে যেখানে ১৲ খরচ করতে হল জনসাধারণ সেখানে ১০০৲ তুলে দিল।

১৯৩৭ পর্যন্ত ইয়েন যত রকমের যতগুলি ইস্কুল স্থাপন করতে পেরেছিলেন তার থেকে ৮০,০০০ লোক পাশ করে বেরিয়েছিল। ইস্কুল ছাড়াও কয়েক শত সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। দেশময় তখন সাড়া পড়ে গেছে, Hupeiর বাইরে থেকেও দাবী আসতে লাগল। চীনের নানান প্রদেশ থেকে গ্রামোন্নতির প্রণালী শেখবার জন্য তাঁর কাছে লোক এল। তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের গ্রামে ইয়েনের অনুকরণে ৮০০টা জনসেবার কেন্দ্র গঠন করে। তার পরেই মহাযুদ্ধ বেধে গিয়ে কাজে বাধা পড়ে গেল। যে দ্রুতগতিতে দেশের চতুর্দিকে সংঘের কাজ ছড়িয়ে যাচ্ছিল বিঘ্ন ঘটল। ইয়েন কিন্তু তাতে দমে গেলেন না। অনিবার্য বাধা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কাজ সংকুচিত করে Szechuan ও তার পার্শ্ববর্তী দুটি বিভাগের মধ্যে আবদ্ধ রাখলেন। চীনের এই অঞ্চল চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, এখানে বাইরের অশান্তি সহজে প্রবেশ করতে পারে না এবং এখানকার অধিকাংশ লোক চাষী ও কুটীরশিল্প ব্যবসায়ী। তাঁর কাজের ক্ষেত্র এখন হল ১২০,০০০,০০০ জনসংখ্যা নিয়ে। তিনটি বিভাগের এই জনসংখ্যার মধ্যে সাধারণ প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ চলতে থাকল, কিন্তু আরো জমাটভাবে কাজ করার সুযোগ পাবার জন্য তিনি Bishan জেলার ৫ লক্ষ মাত্র জনসংখ্যা নিয়ে একটি বিশেষ কেন্দ্র গঠন করলেন। সেখানে একাগ্রভাবে কাজ করার জন্য ২০ জন বিশেষজ্ঞ ও ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রছাত্রীদের লাগিয়ে দিলেন। এ'দের উপর ভার রইল জনসেবা সংঘের কর্মী ও নেতা তৈরী করে দেওয়া।

মহাসমরে ও তারপর গৃহযুদ্ধে চীন যদি আজ এত নিপীড়িত না হয়ে পড়ত তবে এতদিনে ইয়েনের প্রবর্তিত জনসেবা সংঘ সেই মহাদেশের প্রতি জেলায় ছড়িয়ে গিয়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তুলতে পারত। পৃথিবীতে কোথাও এত বিস্তৃতভাবে সমাজ সংস্কারের কাজ এত নিঃশব্দে হয়েছে বলে জানি না। যুদ্ধের মাঝামাঝি ১৯৪৩তে ইয়েন আমেরিকায় পুনরায় যান। সেখানে তখন তাঁর এত খ্যাতি যে, তিনি সহজেই সংঘের জন্য ৫ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। সম্প্রতি UNESCO ইয়েনকে অনুরোধ জানিয়েছে যে, তাঁর কাজ চীন দেশেই আবদ্ধ না রেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রবর্তন করবার জন্য UNESCOকে সাহায্য করতে। ইয়েন চীনের একপ্রান্তে যে আদর্শ দেখিয়েছেন তা সর্বত্র অনুকরণীয় সন্দেহ নেই।

UNESCOর আহবানে ইয়েন যে জবাব দিয়েছিলেন তার থেকে একাংশ উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করি:

"Three quarters of the world population is illeterate, underfed, poorly clothed, badly sheltered, diseased and sorrowful. Millions of them are young people, the energetic and idealistic. Today they are illiterate and oppressed, but they represent the central strategic force destined to shape the future of the world. Given education and opportunity they can become the spearhead for world construction and world peace."

১৯১৯-এর পাঞ্জাব-হাঙ্গামায়

রবীন্দ্রনাথ

অমৃতসর কংগ্রেসে বড়লাটের কাছে কবির চিঠি

অমল হোম

(১)

শারদীয়া "দেশ" পত্রিকায় জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠির বিষয়ে কিছু লিখেছি।

বড়লাট চেমসফোর্ডকে লেখা তাঁর সে চিঠিখানি প্রকাশিত হলে পর বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে কিভাবে তা অভিভূত করেছিলো, তা জানা যায় "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মৃত্যুর পর (২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে প্রবন্ধ লেখেন তা থেকে। সমাজপতি মহাশয় লিখেছিলেন—

"লর্ড হার্ডিঞ্জ যাঁহাকে এসিয়ার রাজকবি বলিয়া সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আমরা যাঁহাকে এসিয়ার গণতন্ত্রের কবি বলিয়া জানি, রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত ভাব-যজ্ঞে তাঁহার সাহচর্য ছিল। স্বদেশী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, ১৩২১ সালে, পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্ধনায় অভিনন্দনে লিখিয়াছিলেন,—সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য-ধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর,—হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি। কে অস্বীকার করিবে, এই সুন্দর অভিনন্দনের প্রত্যেক অক্ষর সত্য। আর তখন কে জানিত, যাঁহার জীবন এমন সুন্দর, তাঁহার মৃত্যুও এমন সুন্দর হইবে,—কোনও মৃত্যু এমন সুন্দর হইতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের একদিন পূর্বে নাইট উপাধি বর্জন করিয়া ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) তাঁহার পদত্যাগ পত্রের অনুবাদ "বসুমতী"র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, আমি উত্থানশক্তি-রহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই। সোমবার প্রভাতে (১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহার মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর আর এ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ কারবার—দেশাত্মবোধের উদ্বোধন। দেশভক্তিই যাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেরণা ছিল,—দেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ মিশিয়া গেল"।*

মৃত্যুশয্যায় শায়িত আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের এই অপূর্ব অনুভূতির সঙ্গে যখন তুলনা করি, আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের উদাসীন মনোভাব, তখন সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের লীলাক্ষেত্র অমৃতসরে, ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে, কংগ্রেসমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের এই "ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা" প্রসঙ্গে একটি কথাও শুনিনি কারুর মুখে! পাঞ্জাবে ওডায়ারী ও ডায়ারী বর্বরতার, ইংরেজের অমানুষিকতার তীব্র প্রতিবাদে সভামণ্ডপ কাঁপিয়ে বক্তৃতার পর বক্তৃতা হোলো সমানে,—কিন্তু যেদিন সমগ্র দেশের আতঙ্ক-বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বাণী দিয়েছিলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ, সেদিনের কথা কেউ একবারও বললে না। তাঁর সে-চিঠির এতটুকু উল্লেখও কেউ করলে না। কংগ্রেস থেকে একটা রেজোল্যুশন পাশ করে যাতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশাত্মবোধের এই স-বীর্য প্রকাশকে, তাঁর স্বদেশবাসীর,—বিশেষভাবে পাঞ্জাবের,—পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়—সে চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিলো। ঘটনাটা যা ঘটেছিলো, তা এখানে বলে রাখা দরকার মনে করি। ইতিপূর্বে তা কোথাও বলবার সুযোগ পাই নি, পরেও আর পাব কি না জানি না।

অমৃতসরে যখন দেখলাম, কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে-সব রেজোল্যুশন সবজেক্টস কমিটির সামনে উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি-ত্যাগের নামগন্ধ কোথাও নেই, তখন আমি আমার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শের পর সেই রকম একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করে প্রেসিডেণ্ট মোতিলালজীর কাছে কথা পাড়তেই তিনি বললেন—

You move it in the Subjects Committee.

আমি সবজেক্টস কমিটির মেম্বার ছিলাম বটে, কিন্তু এ রকম একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করবার মতো শক্তি বা পদমর্যাদা দুয়েরই আমার অভাব অনুভব করে, আমি সকলের আগে ধরলাম বিপিন বাঁড়ুয্যে মশাইকে। তিনি প্রথমে খুব উৎসাহ প্রকাশ করে পরে,—ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই, কেন জানি না,—পিছিয়ে গেলেন। তখন আমি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শরণাপন্ন হলাম। তিনি বল্লেন—"দেখ, আমার মনে হয়, বেঙ্গল ডেলিগেট কেউ এ-রকম প্রস্তাব না এনে, পাঞ্জাবের কাউকে দিয়ে এটা করালে ভাল হয়।" আমি তখন ধরলাম লালা মনোহরলালকে,—ইনি ছিলেন ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির প্রথম মিণ্টো প্রফেসর অফ ইকনমিকস, পরে হন পাঞ্জাবের শিক্ষাসচিব ও রাজস্বসচিব স্যার মনোহরলাল। "ট্রিবিউন" কাগজের একজন ট্রাস্টী বলে, মার্শাল ল'-র সময়ে তাঁর লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। তিনি আমাকে বললেন—"You must have a passionate speaker to sponsor a motion like that. I don't really feel equal to it." অনেক বলেও আমি মনোহরলালকে রাজী করাতে পারলাম না। শেষে, ইন্দুভূষণ সেন (কলকাতার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার অধুনা-পরলোকগত আই-বি-সেন) মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, সৈয়দ হোসেন-সাহেবকে ধরলাম। তিনি অবশ্য পাঞ্জাবী ছিলেন না,—কিন্তু সুবক্তা ছিলেন। সৈয়দ সাহেবকে বলামাত্রই তিনি সম্মত হলেন। বললেন—"It will be an honour"! আর তখনি, আমি রেজোল্যুশনটার যে খসড়া করেছিলাম, তার দুটো একটা কথা বদলিয়ে, নীচে নাম সই করে দিলেন। ঠিক হোলো যে, সৈয়দ হোসেন প্রস্তাবটি পেশ করবার পর রঙ্গ আয়ার মহাশয় সেটি সমর্থন করবেন। বর্তমানে মিশরে স্বাধীন ভারতের রাজদূত তখন মোতিলালজীর "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" কাগজের এডিটর,—আর রঙ্গ আয়ার তাঁর প্রধান সহকারী এলাহাবাদে।

---

* সমাজপতি মহাশয়ের 'রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধটি, "দৈনিক বসুমতীতে" বের হবার পর, তাঁর সম্পাদিত "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকার ১৩২৬ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। [বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' গ্রন্থপর্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "সুরেশচন্দ্র সমাজপতি" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।]

জনসেবা সংঘের কর্মীরা শীঘ্রই ব্ঝতে পারলেন চাষীরা সাধারণত রক্ষণশীল হলেও উন্নতির প্রণালী যদি তাদের প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দেওয়া যায় তবে তারা আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করে। চাষের উন্নতি কি করে করতে হবে শেখাবার জন্য প্রথমে ছয়টি ইস্কুল স্থাপিত হয়। এই ইস্কুলগ্লির উপকারিতা দেখে জেলার লোকদের মধ্যে এত উৎসাহ জাগল যে তারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে আরো ৪৭২টা ইস্কুলের ঘরবাড়ি তৈরী করে দিল। এই কাজের জন্য ইয়েনকে যেখানে ১৲ খরচ করতে হল জনসাধারণ সেখানে ১০০৲ তুলে দিল।

১৯৩৭ পর্যন্ত ইয়েন যত রকমের যতগ্লি ইস্কুল স্থাপন করতে পেরেছিলেন তার থেকে ৮০,০০০ লোক পাশ করে বেরিয়েছিল। ইস্কুল ছাড়াও কয়েক শত সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। দেশময় তখন সাড়া পড়ে গেছে, Hupeiর বাইরে থেকেও দাবী আসতে লাগল। চীনের নানান প্রদেশ থেকে গ্রামোন্নতির প্রণালী শেখবার জন্য তাঁর কাছে লোক এল। তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের গ্রামে ইয়েনের অন্করণে ৮০০টা জনসেবার কেন্দ্র গঠন করে। তার পরেই মহায্দ্ধ বেধে গিয়ে কাজে বাধা পড়ে গেল। যে দ্রুতগতিতে দেশের চতুর্দিকে সংঘের কাজ ছড়িয়ে যাচ্ছিল বিঘ্ন ঘটল। ইয়েন কিন্তু তাতে দমে গেলেন না। অনিবার্য বাধা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কাজ সংকুচিত করে Szechuan ও তার পার্শ্ববর্তী দ্টি বিভাগের মধ্যে আবদ্ধ রাখলেন। চীনের এই অঞ্চল চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, এখানে বাইরের অশান্তি সহজে প্রবেশ করতে পারে না এবং এখানকার অধিকাংশ লোক চাষী ও কুটীরশিল্প ব্যবসায়ী। তাঁর কাজের ক্ষেত্র এখন হল ১২০,০০০,০০০ জনসংখ্যা নিয়ে। তিনটি বিভাগের এই জনসংখ্যার মধ্যে সাধারণ প্রোগ্রাম অন্সারে কাজ চলতে থাকল, কিন্তু আরো জমাটভাবে কাজ করার স্যোগ পাবার জন্য তিনি Bishan জেলার ৫ লক্ষ মাত্র জনসংখ্যা নিয়ে একটি বিশেষ কেন্দ্র গঠন করলেন। সেখানে একাগ্রভাবে কাজ করার জন্য ২০ জন বিশেষজ্ঞ ও ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রছাত্রীদের লাগিয়ে দিলেন। এ'দের উপর ভার রইল জনসেবা সংঘের কর্মী ও নেতা তৈরী করে দেওয়া।

মহাসমরে ও তারপর গ্হয্দ্ধে চীন যদি আজ এত নিপীড়িত না হয়ে পড়ত তবে এতদিনে ইয়েনের প্রবর্তিত জনসেবা সংঘ সেই মহাদেশের প্রতি জেলায় ছড়িয়ে গিয়ে সমাজের আম্ল পরিবর্তন ঘটিয়ে তুলতে পারত। প্থিবীতে কোথাও এত বিস্তৃতভাবে সমাজ সংস্কারের কাজ এত নিঃশব্দে হয়েছে বলে জানি না। য্দ্ধের মাঝামাঝি ১৯৪৩তে ইয়েন আমেরিকায় প্নরায় যান। সেখানে তখন তাঁর এত খ্যাতি যে, তিনি সহজেই সংঘের জন্য ৫ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। সম্প্রতি UNESCO ইয়েনকে অন্রোধ জানিয়েছে যে, তাঁর কাজ চীন দেশেই আবদ্ধ না রেখে প্থিবীর অন্যান্য দেশেও প্রবর্তন করবার জন্য UNESCOকে সাহায্য করতে। ইয়েন চীনের একপ্রান্তে যে আদর্শ দেখিয়েছেন তা সর্বত্র অন্করণীয় সন্দেহ নেই।

UNESCOর আহ্বানে ইয়েন যে জবাব দিয়েছিলেন তার থেকে একাংশ উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করি:

"Three quarters of the world population is illeterate, underfed, poorly clothed, badly sheltered, diseased and sorrowful. Millions of them are young people, the energetic and idealistic. Today they are illiterate and oppressed, but they represent the central strategic force destined to shape the future of the world. Given education and opportunity they can become the spearhead for world construction and world peace."

১৯১৯-এর পাঞ্জাব-হাঙ্গামায় রবীন্দ্রনাথ

অমৃতসর কংগ্রেসে বড়লাটের কাছে কবির চিঠি

অমল হোম

(১)

শারদীয়া "দেশ" পত্রিকায় জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠির বিষয়ে কিছু লিখেছি।

বড়লাট চেমসফোর্ডকে লেখা তাঁর সে চিঠিখানি প্রকাশিত হলে পর বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে কিভাবে তা অভিভূত করেছিলো, তা জানা যায় "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মৃত্যুর পর (২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে প্রবন্ধ লেখেন তা থেকে। সমাজপতি মহাশয় লিখেছিলেন—

"লর্ড হার্ডিঞ্জ যাঁহাকে এসিয়ার রাজকবি বলিয়া সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আমরা যাঁহাকে এসিয়ার গণতন্ত্রের কবি বলিয়া জানি, রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত ভাব-যজ্ঞে তাঁহার সাহচর্য ছিল। স্বদেশী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত রামেন্দ্র-সুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, ১৩২১ সালে, পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্ধনায় অভিনন্দনে লিখিয়াছিলেন,—সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য-ধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর,—হে রামেন্দ্র-সুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি। কে অস্বীকার করিবে, এই সুন্দর অভিনন্দনের প্রত্যেক অক্ষর সত্য। আর তখন কে জানিত, যাঁহার জীবন এমন সুন্দর, তাঁহার মৃত্যুও এমন সুন্দর হইবে,—কোনও মৃত্যু এমন সুন্দর হইতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েকদিন পূর্বে নাইট উপাধি বর্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) তাঁহার পদত্যাগ পত্রের অনুবাদ "বসুমতী"র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, আমি উত্থানশক্তি-রহিত। আপনার পায়ের ধূলো চাই। সোমবার প্রভাতে (১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬) রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্র-বাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহার মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর আর এ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ কারবার—দেশাত্মবোধের উন্বোধন। দেশ-ভক্তিই যাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেরণা ছিল,—দেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ মিশিয়া গেল"।*

মৃত্যুশয্যায় শায়িত আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের এই অপূর্ব অনুভূতির সঙ্গে যখন তুলনা করি, আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্র-নৈতিক নেতাদের উদাসীন মনোভাব, তখন সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের লীলাক্ষেত্র অমৃতসরে, ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে, কংগ্রেসমঞ্চে রবীন্দ্র-নাথের এই "ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা" প্রসঙ্গে একটি কথাও শুনিনি কারুর মুখে! পাঞ্জাবে ওডায়ারী ও ডায়ারী বর্বরতার, ইংরেজের অমানুষিকতার তীব্র প্রতিবাদে সভামণ্ডপ কাঁপিয়ে বক্তৃতার পর বক্তৃতা হোলো সমানে,—কিন্তু যেদিন সমগ্র দেশের আতঙ্ক-বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে বাণী দিয়ে-ছিলেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ, সেদিনের কথা কেউ একবারও বললে না। তাঁর সে-চিঠির এতটুকু উল্লেখও কেউ করলে না। কংগ্রেস থেকে একটা রেজোল্যুশন পাশ করে যাতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশাত্মবোধের এই স-বীর্য প্রকাশকে, তাঁর স্বদেশবাসীর,—বিশেষভাবে পাঞ্জাবের,—পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়—সে চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ হয়েছিলো। ঘটনাটা যা ঘটেছিলো, তা এখানে বলে রাখা দরকার মনে করি। ইতিপূর্বে তা কোথাও বলবার সুযোগ পাই নি, পরেও আর পাব কি না জানি না।

অমৃতসরে যখন দেখলাম, কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে-সব রেজোল্যুশন সবজেক্টস কমিটির সামনে উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি-ত্যাগের নামগন্ধ কোথাও নেই, তখন আমি আমার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শের পর সেই রকম একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরী করে প্রেসিডেণ্ট মোতিলালজীর কাছে কথা পাড়তেই তিনি বললেন—

You move it in the Subjects Committee.

আমি সবজেক্টস কমিটির মেম্বার ছিলাম বটে, কিন্তু এ রকম একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করবার মতো শক্তি বা পদমর্যাদা দুয়েরই আমার অভাব অনুভব করে, আমি সকলের আগে ধরলাম জিতেন বাঁড়ুয্যে মশাইকে। তিনি প্রথমে খুব উৎসাহ প্রকাশ করে পরে,—ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই, কেন জানি না,—পিছিয়ে গেলেন। তখন আমি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শরণাপন্ন হলাম। তিনি বল্লেন—"দেখ, আমার মনে হয়, বেঙ্গল ডেলিগেট কেউ এ রকম প্রস্তাব না এনে, পাঞ্জাবের কাউকে দিয়ে এটা করালে ভাল হয়।" আমি তখন ধরলাম লালা মনোহরলালকে,—যিনি ছিলেন ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির প্রথম মিণ্টো প্রফেসর অফ ইকনমিকস, পরে হন পাঞ্জাবের শিক্ষাসচিব ও রাজস্বসচিব স্যার মনোহরলাল। "ট্রিবিউন" কাগজের একজন ট্রাস্টী বলে, মার্শাল ল'-র সময়ে তাঁর লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। তিনি আমাকে বললেন—'You must have a passionate speaker to sponsor a motion like that. I don't really feel equal to it.' অনেক বলেও আমি মনোহরলালকে রাজী করাতে পারলাম না। শেষে, ইন্দুভূষণ সেন (কলকাতার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার অধুনা-পরলোকগত আই-বি-সেন) মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, সৈয়দ হোসেন-সাহেবকে ধরলাম। তিনি অবশ্য পাঞ্জাবী ছিলেন না,—কিন্তু সুবক্তা ছিলেন। সৈয়দ সাহেবকে বলামাত্রই তিনি সম্মত হলেন। বললেন—"It will be an honour"! আর তখনি, আমি রেজোল্যুশনটার যে খসড়া করেছিলাম, তার দুটো একটা কথা বদলিয়ে, নীচে নাম সই করে দিলেন। ঠিক হোলো যে, সৈয়দ হোসেন প্রস্তাবটি পেশ করবার পর রঙ্গ আয়ার মহাশয় সেটি সমর্থন করবেন। বর্তমানে মিশরে স্বাধীন ভারতের রাজদূত তখন মোতিলালজীর "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" কাগজের এডিটর,—আর রঙ্গ আয়ার তাঁর প্রধান সহকারী এলাহাবাদে।

---

* সমাজপতি মহাশয়ের 'রামেন্দ্রসুন্দর' প্রবন্ধটি, "দৈনিক বসুমতীতে" বের হবার পর, তাঁর সম্পাদিত "সাহিত্য" মাসিক পত্রিকার ১৩২৬ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। [বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' গ্রন্থপর্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "সুরেশচন্দ্র সমাজপতি" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।]

প্রস্তাবের খসড়া যথারীতি মোতিলালজীর সামনে নিয়ে ধরলাম। তখন সবজেক্টস্ কমিটির মিটিং চলছে। তিনি কাগজখানিকে আড়চোখে একবার দেখে, তাঁর চশমার খাপটা চাপা দিয়ে সেটি রেখে দিলেন এক পাশে। ভাবলাম, যথাসময়ে সৈয়দ হোসেনের ডাক পড়বে। কিন্তু ডাক আর পড়লো না—দুদুবার স্মারক 'স্লিপ' পাঠানো সত্ত্বেও! শেষে জবাহরলালের খোঁজ করলাম। ছটফটে মানুষ; চুপটি করে এক জায়গায় বসে থাকবার লোক নন। প্যাণ্ডালের বাইরে পাকড়াও করলাম তাঁকে। তিনি গিয়ে 'পাপা'-র কানে কানে দু-একটা কথা কি বলতেই লক্ষ্য করলাম, পণ্ডিতজীর,—তখন আমরা মোতিলাল নেহরুকেই 'পণ্ডিতজী' বলতাম,—ভুরুটা কুঁচকে উঠলো। ব্যাপার বুঝলাম না কিছুই। অনেক রাত্রিতে সব্জেক্টস কমিটির মিটিং যখন ভাঙলো,—ছুটে গেলাম তখন পণ্ডিতজীর কাছে। তিনি শুধু বললেন—'Wait"। ভাবলাম কাল হয়তো প্রস্তাবটা উপস্থিত করবেন কমিটিতে। কিন্তু সে 'কাল' আর এলো না। কেন এলো না সে রহস্য আমার কাছে উদ্ঘাটন করেছিলেন সৈয়দ হোসেন,—কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবার কদিন পরেই যখন গান্ধীজী তাঁকে বিশেষ জরুরী একটি কথা বলবার জন্য এলাহাবাদ থেকে লাহোরে ডেকে পাঠান। আলি ভাইরা তখন ছিলেন সেখানে গান্ধীজীর কাছে।

সে কথা থাক। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে, পাঞ্জাব ব্যাপারে বড়লাটের কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে কোনো প্রস্তাবই পেশ বা পাশ হোলো না। অমৃতসরে বেঙ্গল ডেলিগেটদের ক্যাম্পে এ নিয়ে কোনো চাঞ্চল্য দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ যে একটা মস্ত কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে—দু'একজন ছাড়া এ-ধারণার কোন পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। বাঙলার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনীকুমার চন্দ, অখিলচন্দ্র দত্ত কাউকেই বলতে বাকী রাখি নি। তাঁদের মধ্যে যে কেউ একজন সব্জেক্টস কমিটিতে একবার উঠে দাঁড়ালেই হয়ে যেত। অন্য প্রদেশের নেতাদের মধ্যেও কাউকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলাম। তিনি কোনো উৎসাহই প্রকাশ করেন নি। মডারেট নেতাদের মধ্যে তিনিই সেবার কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন—আর সকলে বয়কট করেছিলেন। আর অবশ্য ছিলেন মালবীয়াজী। তাঁকে বলাতে তিনি বলেছিলেন—'To be put from the Chair' রেজোল্যুশনগুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন আমার প্রস্তাবটা। কিন্তু সেখানেও শেষ পর্যন্ত তার স্থান হয়নি। পরে মহম্মদ আলি জিন্না সাহেবকে এসব কথা আমি জানানোতে তিনি আমাকে বলেছিলেন—"তুমি আমাকে বললে না কেন"? আমার ভুল হয়েছিলো।

গান্ধীজীকে বলবার সুযোগ পাইনি। তিনি তখন টিলক-মহারাজের সঙ্গে 'কো-অপারেশান' বনাম 'রেসপন্সিভ কো-অপারেশান'-দ্বন্দ্বে ব্যস্ত। তা ছাড়া, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এসব করতে হয়েছিলো আমাকে। আমার কাগজের কাজও ছিল অনেক। ফ্যাসাদেও পড়েছিলাম তা নিয়ে। সবজেক্টস কমিটিতে একটা রেজোল্যুশনের কথা "ট্রিবিউন"-এ আগে থেকেই বেরিয়ে যাওয়াতে মোতিলালজী ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। কংগ্রেসে, অবশ্য কারুর নাম না করে, এ নিয়ে খুব তিরস্কার করেছিলেন সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের। কংগ্রেস থেকে আমাদের বের করে দেবেন বলে শাসিয়েছিলেন। কেন জানি না সন্দেহ করেছিলেন যে আমিই এ-কাজ করেছি! পরদিন যখন পাঞ্জাবের বাইরের কাগজ সব অমৃতসরে এসে পেঁছলো, তখন দেখা গেল যে, সে খবর তাতেও বেরিয়েছে। আসলে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসই ব্যাপারটা ঐভাবে, নিজেদের নাম চেপে, ফাঁস করে দিয়েছিলো। যা হোক, এ নিয়ে একটা দিন আমাকে ভারি ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো। আর, মোতিলালজী এত চটেছিলেন যে, তাঁকে সৈয়দ হোসেনের নামাঙ্কিত রেজোল্যুশন নিয়ে সেদিন বেশি পীড়াপীড়ি করবার সাহস হয়নি আমার। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ও পদশ্রেষ্ঠদের মধ্যেও পাইনি কাউকে সে কাজের জন্য। বড় কম মেজাজী ছিলেন না জবাহরলালজীর পিতাজী। আর অমৃতসরে কংগ্রেসের সময় কোনো পারিবারিক অশান্তিতে তাঁর মেজাজটা খুব বেশি বিগড়ে গিয়েছিলো।

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের এই উপাধি-বর্জন ব্যাপারটা সে-দিনের কংগ্রেস মহলে কি এ-দিনে গান্ধীজীর আসন্ন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও কোনোদিন বিশেষ কোনো সাড়া জাগায়নি। তাই দেখি, মহাত্মাজীর পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে, মৃদুলা সারাভাই, ডি জি তেণ্ডুলকার, চলাপতি রাও ও বিঠলভাই জাভেরী কর্তৃক সম্পাদিত "Gandhiji: His Life and Work" গ্রন্থখানির গান্ধী-জীবন-পঞ্জীতে (Gandhi Chronicle: 1867-1944) ছাপা হয়েছে—

1920 (Age 51)—
On August 1, Gandhi wrote to Viceroy surrendering Kaiser-i-Hind gold medal and Boer War medal. Rabindranath Tagore returned knighthood—Page 435.

অর্থাৎ কিনা গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ একই দিনে তাঁদের সরকারী শিরোপা পরিত্যাগ করেছিলেন—১৯২০র ১লা আগসট!!

ইতিহাসের বিকৃতি এমনি করেই ঘটে।

(২)
"সিয়াপা"

'পাঞ্জাবে একটা লোকাচার আছে (এখনও আছে কি না জানি না) কেউ মারা গেলে, মৃতদেহ সামনে রেখে শোক প্রকাশ করবার জন্য লোক ভাড়া করে আনা হয়। আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনরোলে এই ভাড়াটিয়া শোক-প্রকাশকেরা তারস্বরে যোগ দিয়ে, বুক চাপড়িয়ে, মৃত্যুঘোষণার কাজে লেগে যায়। এরই নাম 'সিয়াপা'। পাঞ্জাবের ছোটলাট-বাহাদুরকে পরিহাস করবার জন্যই লাহোরের অন্তঃপুরিকারা তার অনুকরণে কান্না জুড়ে বুক চাপড়াতে শুরু করলেন—মার্শাল-ল' জারী করবার আগের দিন, দীর্ঘ পাঁচ দিনব্যাপী হরতাল-রুদ্ধদ্বার দোকানপাট খোলাবার চেষ্টায় স্যার মাইকেল ওয়াডার পুরানো শহরের ভিতরে ঢুকতেই। অর্থাৎ বলা হোলো—তাঁর প্রবেশটা রীতিমতো অমঙ্গল, মৃত্যুর আবির্ভাবের মতই শোকাবহ।

(৩)
গান্ধিজী কেন তখন পাঞ্জাবে আসেন নি

সরকারী নিষেধ ও বাধা, বিশেষভাবে 'মার্শাল ল'-এর ভয়াল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, গান্ধীজী কেন তখন পাঞ্জাবে আসেন নি, এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। পাঞ্জাব-হাঙ্গামার কংগ্রেসী-তদন্ত-কমিটির কাজে, ক'মাস বাদে, (অক্টোবর। ১৯১৯) গান্ধীজী লাহোরে আসবার পর, এ বিষয়ে তাঁর নিজের মুখ থেকে কিছু শোনবার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমি তখন তাঁর কথা শুনে এই বুঝেছিলাম যে, তিনি প্রথমে সমস্ত বাধা নিষেধ লঙ্ঘন করে আবার পাঞ্জাবে আসবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মনে হোলো যে, ৬ই এপ্রিলে 'সত্যাগ্রহ' ঘোষণার পর, যখন গুজরাটে ও পাঞ্জাবে হাঙ্গামা বাধলো, তখন তিনি, যথেষ্ট প্রস্তুতি বিনা, সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে আপামর-সাধারণকে আহ্বান করবার ভুল বুঝতে পেরে, তাঁর সে-ভুল স্বীকার করেছেন—যে-ভুলের জন্য জনসাধারণের পক্ষেও একাধিক অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য-ভাবে তাঁর সে ভুল ("Himalayan miscalculation") স্বীকারের পর, আবার পাঞ্জাবে এসে বা আসবার পথে অ্যারেস্ট হওয়া তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিলো। আর, 'মার্শাল ল'-এর সময় পাঞ্জাবে যদি তাঁকে ঢুকতেও দিত, কিছুই করতে পারতেন না তিনি। তিনি এলে তাঁকে আটকেই রেখে দিত। কোনো কাজই হোত না তাতে; হয়তো বা তাঁর অ্যারেস্টের খবরে দেশের অন্যত্র রক্তপাত হোত, যেমন হয়েছিল গুজরাটে পাঞ্জাবে। অ্যাণ্ডরুজ সাহেব এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"Just before that letter (Rabindranath's letter surrendering his knighthood) was written (May 30, 1919), while I was with him in Calcutta, I had been staying with Mahatma Gandhi in Bombay, and I had seen with what agony he also had felt all that was happening, and with what difficulty he

was prevented from going immediately into the Punjab in order to court arrest. Whether I did right or wrong I do not know; but I myself joined in trying to prevent him at that time from going into the Punjab. I felt that the time had not yet come. What I want to point out is this, that I saw, at that critical moment, the same **independence of spirit**, the same fearless courage, the same passionate hatred of tyrannical force, the same **utter disregard of consequences**, the same willingness to sacrifice life itself for duty, the same love and reverence **for the fair name of India** in both of them—no whit less strong in one than **in the other.** ('Gandhi And Tagore', "The Hindu" Madras, April 10, 1924.)

মার্শাল ল' উঠে যায়—অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট তুলে নেন—১১ই জন্ন (১৯১৯)। গান্ধীজী বড়লাট চেমসফোর্ডকে একাধিকবার টেলিগ্রাম করে চিঠি লিখে পাঞ্জাবে আসবার অনন্মতি পান ১৭ই অক্টোবর।

(৪)

পাঞ্জাব-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্রাবলী

লণ্ডন। ১৯২০। ২২শে জন্লাই। তারিখে সি এফ অ্যাণ্ডরন্জকে লিখিত পত্রের বঙ্গানন্বাদ—

"ভারতের প্রতি এ-দেশের শাসক সম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব নিদারন্ণরন্পে প্রতিফলিত হয়েছে,—পার্লামেণ্টের দন্টি কামন্রাতেই (জেনারেল) ডায়ার-সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনা ও বিতর্কমন্লে। এর থেকে যে-কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা এই যে, এ-দেশে যাদের মধ্য থেকে আমাদের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাঁদের আমন্লারা আমাদের উপর যত দানবীয় অত্যাচারই করন্ক না কেন, তাতে তাঁদের মনে কোনোরকম বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না।

"তাঁদের বক্তৃতায় পাশবিকতা যে-রকম নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে এবং তাঁদের খবরের কাগজগন্লোতে তারই প্রতিধ্বনি যেভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, তা অতি ভয়াবহরন্পেই কুৎসিৎ। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দাসত্বাধীনে আমাদের অবস্থায় লজ্জা ও অপমানের অনন্ভূতি, বিগত পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল, প্রতিদিন আমাদের উত্তরোত্তর অভিভূত করে ফেলেছে;—কিন্তু তবন্ও আমাদের একটিমাত্র সান্ত্বনা ছিল, ইংরেজ-জাতির ন্যায়ানন্রাগের উপর আমাদের আস্থা। আমরা ভেবেছি যে, সহজলভ্য যদৃচ্ছ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের শক্তিমত্ততায়, অধীনস্থ দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর মনন্ষ্যত্ব নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে দলিত মথিত করলেও, তার মারাত্মক গরল ইংরেজ-সাধারণের আত্মাকে ক্লেদাক্ত করতে পারেনি।

"কিন্তু বেশ দেখা যাচ্ছে যে, সে-বিষ আমরা যা ভাবিনি তার চেয়ে অনেক বেশি গভীরে প্রবেশ করেছে; ব্রিটিশ জাতির নাড়ীতে ঘন্ণ ধরেছে; তার মজ্জা এই দারন্ণ বিষের প্রতিক্রিয়ায় জর্জরিত হতে চলেছে। আমি অনন্ভব করছি যে, ওদের মহত্বানন্ভূতির উদ্দেশে আমাদের আবেদন প্রতিদিনই ক্রমশঃ ক্ষীণতর সাড়া পাবে। কিন্তু আমার একান্ত আশা এই যে, আমার স্বদেশবাসিগণ এতে নিরাশ বা হতাশ হবেন না, অপিচ দেশের সেবায় তাঁদের সমস্ত উদ্যম ও সামর্থ্য অদম্য সংকল্পে ও সাহসে উৎসর্গ করবেন।

"সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্পষ্টই প্রমাণ করেছে যে, আমাদের সত্যকার মন্ক্তি রয়েছে আমাদের আপন হাতে; কোনো জাতিরই প্রতিষ্ঠা ও মাহাত্ম্য কারও তাচ্ছিল্য-প্রণোদিত বা অবজ্ঞা-সঞ্জাত কার্পণ্যের মন্ষ্টিভিক্ষার উপর গড়ে তোলা চলে না। আমাদের জাতীয় মন্ক্তির পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টিতেই যাদের আত্মস্বার্থ-সংরক্ষণের নির্দেশ, তাদেরই দয়ার উপর নির্ভর করে জাতীয় সাধনার সন্লভ সিদ্ধির সন্ধান, আমাদের চরিত্রবলের ক্ষীণতারই পরিচায়ক হবে মাত্র। শন্ধন্ আত্মত্যাগ ও নিরতিশয় দন্ঃখ-বরণের দ্বারাই আমরা পাব সাফল্যের সন্ধান; —তা ছাড়া আর অন্য পথ নেই। অন্তর্নিহিত অমোঘ অমরাত্মার সক্রিয় শক্তি বিকাশেই সম্ভব হয় মানন্ষের শ্রেষ্ঠ বরলাভ; এবং সেই শক্তির উদ্বোধন হয় কেবলমাত্র বিপদ ও ক্ষতির উপেক্ষানন্লেই।"

[৫]

প্যারী। ১৯২০। ১৩ই আগস্ট। তারিখে সি এফ এ্যাণ্ডরন্জকে লিখিত পত্রাংশের বঙ্গানন্বাদ—

"আমাদের বিলাতে থাকাটা সমস্তই বৃথা হয়েছে। আপনাদের পার্লামেণ্টে পাঞ্জাবের 'ডায়ারিজম' সম্পর্কে আলোচনা-বিতর্কে এবং ভারতের সম্বন্ধে ঘৃণা ও ঔদাসীন্যের বহন্ দৃষ্টান্তের পরিচয়ে আমি মর্মাহত হয়েছি। এই জন্য, ইংল্যাণ্ড ছেড়েই যেন স্বস্তি লাভ করেছি।"

(৬)

প্যারী। ১৯২০। ৭ই সেপ্টেম্বর। তারিখে সি এফ এ্যাণ্ডরন্জকে লিখিত পত্রাংশের বঙ্গানন্বাদ—

"পাঞ্জাবের ঘটনা, আসন্ন, আমরা ভুলে যাই; কিন্তু একথা ভোলা কখনও চলবে না যে, যতদিন না আমরা নিজেদের ঘর ভাল করে বাঁধতে পারবো, ততদিন আমাদের এই নিদারন্ণ লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতেই হবে। সমন্দ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকালে কোনো কাজ হবে না, নিজের নৌকার ছিদ্রগন্লির দিকে মন দেওয়াই দরকার আগে।"

(৭)

১৯২০। ১৩ই এপ্রিল। তারিখে বম্বাই শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রথম সাম্বৎসরিক স্মরণসভায় মহম্মদ আলি জিন্নার নিকট প্রেরিত বাণীর বঙ্গানন্বাদ—

"আইন ও শৃংখলা রক্ষার অজন্হাতে পাঞ্জাবে একটি মহাপাপাচার অনন্ষ্ঠিত হয়েছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো পাপের এই রকম ভীষণ আকস্মিক প্রকাশ তাদের পশ্চাতে রেখে যায়—আদর্শের ভগ্নস্তন্পের ও ভগ্নাবশেষের আবর্জনা। চার বছর ধরে যে দানবীয় সংগ্রাম বিধাতার সৃষ্ট এই জগতকে যে-আগন্নে দগ্ধ ও যে-বিষে কলঙ্কিত করেছে, তারই আসন্রিক ঔরস্য হোলো এই জালিয়ান-ওয়ালাবাগ। যে দন্ঃসহ যন্ত্রণার রক্তলাঞ্ছিত দীর্ঘ পথে মানবতা চলেছে আজ পা টেনে টেনে, তারই বিপন্ল পাপভার, যাদের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা আছে, তাদের মনে জাগিয়েছে অনমনীয় কাঠিন্য আর ঔদাসীন্য। সে-মনে না আছে এতটন্কু দরদের বাধা বা বাইরে থেকে বাধা পাওয়ার একটন্ও ভয়। এই যে ক্ষমতা-বানের কাপন্রন্ষতা, তা এতটন্কু লজ্জা বোধ করেনি অস্ত্রহীন ও অসতর্কিত গ্রামবাসীদের উপর মারণাস্ত্রচালনার ভয়াবহতায়; কিম্বা কুৎসিৎ বিচার-প্রহসনের যবনিকার অন্তরালে, অকথ্য অবমাননা-প্রয়োগে। এক মন্হন্র্তের জন্যও তাদের অনন্ভূতিতে এ-কথা জাগেনি যে, এটা তাদেরি মনন্ষ্যত্বের জঘন্য অপমান। গত যন্দ্ধে মানন্ষ সত্য ও সম্ভ্রমবোধকে যেভাবে পদদলিত করে, আপন স্বভাবের মহত্তর প্রকাশকে যেভাবে নিয়ত লাঞ্ছিত করেছে, তাতেই সম্ভব হয়েছে এই কাপন্রন্ষতা। ভূকম্পের পর ভূকম্প সৃষ্টি করে যাবে সভ্যতা-সৌধের এই সমন্ল উৎপাটন; —মানন্ষকে প্রস্তুত থাকতে হবে আরও দন্ঃখভোগের জন্য। আত্মঘাতী হিংস্র প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি (য়ন্রোপের পীস কনফারেন্সে) শান্তি-আলোচনার আব-হাওয়াকে যে-ভাবে আজ কলন্ষিত করে তুলছে, তাতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ভারসাম্য ফিরে আসতে লাগবে বহন্দিন। জয়মদমত্ত শক্তিপন্ঞ্জের এই ভৈরবী-চক্রে আমাদের কোনো স্থান নেই। তারা তাদের অভিপ্রায় মতো দন্নিয়াটাকে টন্করো টন্করো করে ফেলছে। আমাদের

যে-কথাটা জানা প্রয়োজন, সে হচ্ছে এই যে, যারা নিঃসহায়দের অপমান-লাঞ্ছনা করে, নৈতিক অধঃপতন শুধু তাদেরই ঘটে না; যাদের উপর বর্ষিত হয় সে-অপমান, তাদেরও ঘটে সেই অধঃপতন। নিষ্ঠুর অবিচার যখন নিঃসন্দেহে জানে যে, সে পাবে নিশ্চিত অব্যাহতি, তখন তার কাপুরুষতা সত্যই কুৎসিৎ ও নীচ। কিন্তু এ-অবস্থায়, দুর্বলের মনে যে ভয় ও নিবীর্য ক্রোধের সঞ্চার-সম্ভাবনা রয়েছে, তা সেই কাপুরুষতার চেয়ে কম হেয় নয়।

"ভ্রাতৃগণ, পশু-শক্তি যখন নিজের দম্ভ-বিশ্বাসে, মানুষের আত্মাকে নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা করে, তখনই মানুষের সময় আসে, তার আত্মা যে অজেয়, সে-কথা জোর গলায় জাহির করবার। আমাদের অন্তরে প্রতিহিংসা-গ্রহণের কুশ্রী স্বপ্ন পোষণ করে, আমরা কিছুতেই স্বীকার করবো না নৈতিক পরাজয়। সময় এসেছে, যখন যারা বিজিত, ন্যায়ের ক্ষেত্রে, তারাই হবে বিজয়ী।

"ভাই যখন মাটিতে ভাইয়ের রক্ত ঝরিয়ে, তার সে পাপকে মস্ত একটা নাম দিয়ে, উল্লাস প্রকাশ করে; মাটির বুকে সেই রক্তের দাগকে যখন সে চায় তাজা রাখতে, তার ক্রোধের স্মরণস্তম্ভরূপে,—তখন বিধাতা লজ্জায় ঢেকে দেন সে কলুষ-চিহ্ন, তাঁর শ্যামল শষ্পের আস্তরণ বিছিয়ে, তাঁর পুষ্পের অকলঙ্ক [illegible] শুভ্রতায়। আমরা যারা আমাদেরি দেশে নিরপরাধ মানুষের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড দেখেছি,—আমরা যেন গ্রহণ করতে পারি ঈশ্বরের সেই আপন কাজ;—যেন ঢেকে দিতে পারি পাপের রক্তচিহ্ন আমাদের এই প্রার্থনা দিয়ে—

"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি
নিত্যম্!"

—'হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাদের প্রতিনিয়ত রক্ষা করো।'

"কেন না, সত্যকার যে প্রসন্ন করুণা তা আসে রুদ্রের কাছে থেকেই। তিনিই পারেন, দুঃখভয় ও মৃত্যুভয়ের বিভীষিকা থেকে আমাদের বাঁচাতে; তিনিই পারেন, সমস্ত ক্ষতিকে তুচ্ছ করে, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি থেকে আমাদের বাঁচাতে। আসুন, বেদনা ও অপমানের মর্ম-জ্বালার তীব্র অনুভূতির মধ্যেই, তাঁর হাত থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করি যে,—সমস্ত ক্ষুদ্রতা, নিষ্ঠুরতা এবং অসত্য যখন বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন রইবে শুধু চিরন্তন হ'য়ে—যা মহৎ, যা সত্য। যারা তাই চায়, তারা তাদের ক্রোধের নিকষকৃষ্ণ স্মৃতির পাষাণশিলায় ভারাক্রান্ত করে তুলুক ভবিষ্যৎ কালের অন্তর; কিন্তু আমরা যেন, যারা অনাগত যুগে আসবে,—আমাদের সেই ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য রেখে যেতে পারি শুধু সেই স্মৃতিস্তম্ভ, যাতে আমরা পারবো দিতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য;—আমরা যেন পারি আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রতে, যাঁরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন ভগবান বুদ্ধের প্রতিমূর্তি,—যিনি জয় করেছিলেন অহংকে, যিনি প্রচার করেছিলেন ক্ষমাধর্ম, যিনি দিগ্‌দিগন্তে, দেশে-কালে বিতরণ করেছিলেন তাঁর মৈত্রী, তাঁর প্রেম!"

উত্তর মেঘ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

তুমি লিখেছো কি ভাবছি?
তোমার বাংলোর জানলা দিয়ে
যে-পাহাড়টার চূড়া দেখা যায়
আষাঢ় মেঘের কালো ছায়া সেখানে কি মায়া বিস্তার করে
তাই ভবছি।

ভোর থেকে দিগন্তে মেঘ জমে।
মেঘের সীমানা আর বনের সীমানা এক হ'য়ে যায়।
ছোট খাটো পাহাড়ের টিলা-ছড়ানো মাঠে
বর্গির ঘোড় সোয়ারের মতো মেঘের ছায়া হঠাৎ এসে পড়ে;
মাঝখানের উপত্যকায়
বালুশয্যা সঞ্চারিণী
প্রোষিতভর্তৃকা নদী
পূব হাওয়াকে মনে করে দূরে বিদেশের হরকরা,
পিঠে তার মেঘের পুঁটুলি,
ঝর্ণার ঝঙ্কারে শোনে তার বল্লমের ঘুণ্টির আওয়াজ।

মেঘ আরও জমে,
ছায়ার উপরে পড়ে ছায়া,
নদীর জলের তলা অবধি অন্ধকার হয়,
যমুনার বন্যার মতো ছায়ার সীমানা এগিয়ে আসে,
পড়ে ওই পাহারটার চূড়ায়;
গম্ভীরের কণ্ঠে বিলম্বিত ছায়া
ধূর্জটির কণ্ঠে কালনাগিনীর উপমা।
মেঘের ছায়া আরও গড়ায়,
এসে পৌঁছায় তোমার আঙিনার উপান্তে।
আমি সেই কথাই ভাবছি।

আর ভাবছি
সেই কালো ছায়ার প্রত্যুত্তরে
তোমার কালো চোখের কূলে কূলে না জানি কি সম্ভাবনার আভা জাগে!
খসে-পড়া অঙ্গুরীর মতো তোমার মন তলিয়ে যায় কোন্ অতলে,
জেগে ওঠে কত অপূর্ব স্মৃতি,
কত বিচিত্র আহ্বান,
কত বিস্মৃত বেদনা,
কত প্রণয়,
পরিণাম,
কত জন্মান্তর সৌহার্দ্যের সুখোদ্বেগের কথা!
কালো চোখের কালো বিদ্যুতে
আর কালো মেঘের বিদ্যুৎমালায়
তখন চলে মাল্যবিনিময়ের প্রতিযোগিতা!
দুই-ই অফুরাণ!

গুরু গুরু ডাকে মেঘ,
দুরু দুরু তার উত্তর—তোমার বুকে,
থম থম করে ছায়া,
ছল ছল করে জল, তোমার চোখে
মেঘ রচনা করে অলকা,
তোমার আঙিনায় আজ উজ্জয়িনী,
মেঘের ভূর্জপত্রে বিদ্যুতের বাঁকা অক্ষরে কার বিরহলিপি!
সুন্দরী, তুমি চিরযুগের যক্ষিণী!

আজ আমি ভাবছি সেই কথা,
আজ আমি দেখছি সেই ছবি!
সত্যি কথাই বলছি
আজকার আগে এমন ক'রে মেঘোদয় দেখিনি।
তোমার প্রশ্নের উত্তর পেলে কি?

শরৎ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শহরের এই কারা প্রাঙ্গণে সোনার নৌকা এলো,
উড়ায়ে সোনার পাল,
ঘুচিল মেঘের ভ্রূকুটি-শাসন আকাশ মুক্তি পেলো,
কে পাতিল মায়াজাল?
আলো এসে পড়ে হেসে কুটি কুটি জানালায় জানালায়,
সৌধ প্রাসাদ শিরে,
বন্যার মত শত তরঙ্গে কূলে কূলে উছলায়
'প্লাবি' এই ধরণীরে।
হৃদয় আমার সাগর-শঙ্খ, রৌদ্র সাগরে ডুবি'
শোনে তার কল্লোল,
যুগযুগান্ত আকাশে যে বাণী ধ্বনিতেছে চুপি চুপি,
বুকে লাগে তার দোল।

নীলচক্ষু, শ্বেতচর্ম এয়ার কমোডর বললেন, 'সেনগুপ্ত, জীবনে তিনটি নির্বাচন সম্বন্ধে তোমার সতর্ক থাকা দরকার —নারী, সুরা এবং বাই-সাইকল।'

যুদ্ধের মারণ-উল্লাসই যাদের সুরা, তাদের কাছে আবার সুরা নির্বাচনের পরামর্শ দেওয়াটা হাস্যকর তো বটেই, বোধ হয় অর্থহীনও। আর নারী? —নির্বাচন করে যা মেলে, সে হলো নারীর কল্যাণময় সান্নিধ্য, শান্তির প্রতিশ্রুতি, শুভবুদ্ধির প্রশস্ত রাস্তা। 'স্নাইপার'এর জন্য জীবন কোন প্রশস্ত রাস্তার উপহার তুলে রাখেনি। মেদিনীপুর জেলার ছেলে অরবিন্দ সেনগুপ্ত এসেছে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উপত্যকায় বোমা ফেলতে —সে কোন প্রশস্ত রাস্তার অভিযান নয়। কিন্তু বাইসাইকলের ব্যাপারটা? আফ্রিদির দেশে সাত ফুট লম্বা মানুষের হিংস্রতার কবল থেকে আত্মরক্ষার সদা-সতর্ক চেষ্টায় ব্যস্ত থেকে অরবিন্দ সেনগুপ্ত সে কথাটা এই ক ঘণ্টার মধ্যে তো প্রায় ভুলে গেছে। এখানকার জীবন নিয়ন্ত্রিত—সৈন্যদের পক্ষেই অবশ্য কথাটা প্রযোজ্য। সেনানিবাসের বাইরে এখানে পৃথিবী রুক্ষ, অসমতল এবং বিপদসঙ্কুল। প্রাতঃকালীন বন্ধুরতার দৃশ্য থেকে সন্ধ্যাকালীন বন্ধুরতার দৃশ্য পর্যন্ত সারাদিনের অভিজ্ঞতায় বৈচিত্র্য যা ঘটে, তার অবলম্বন নারীও নয়, সুরাও নয়। কেবল এরোপ্লেনের গুঞ্জন আর বিউগল-এর প্রহরমাত্রিক আস্ফালন। তারপর সূর্যাস্তের পরেই এখানকার প্রকৃত উত্তেজনা আরম্ভ হয়। অন্ধকারের সে আদিম, বর্বরমূর্তি, সে অবসাদহীন উত্তেজনা অরবিন্দের ভালোই লাগে। আফ্রিদিরা অবিশ্যি প্রতি রাত্রেই আসে না।

কিন্তু বৃটিশ সেনানিবাসটি ওদের জন্য প্রতি রাত্রেই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা করে। সে প্রতীক্ষায় বাইসাইক্‌লের দরকার হয় না। বাইসাইক্‌লের মন্থরতার সংগে, ইস্পাতের সেই ক্ষীণ অবয়ব আর শরু টায়ারের ভদ্র বিচরণের সংগে এখানকার নৈশ উত্তেজনার কোন মিল নেই। অবিশ্যি ইস্পাতের হাতিয়ার নিয়েই ওরা অপেক্ষা করে, তবে বাইসাইক্‌ল নয়, রাইফ্‌ল। রাইফ্‌লগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে রাখার হুকুম নেই—সংগীন উঁচিয়ে সারারাত্রি প্রহরী মোতায়েন থাকে। হঠাৎ এরোপ্লেন উড়ে যায় অন্ধকার মহাশূন্যে। বেতারে খবর চালাচালি হয় সারারাত। সে খবর সাধারণের অগোচর—শুধু সংখ্যার লিপি। বন্ধুর পৃথিবীর এক-কোণে বিদ্যুতের আলোয় প্লাবিত, নানা যন্ত্রশোভিত একটি ছোটো ঘরে বসে মেদিনী-পুর জেলার ছেলে অরবিন্দ সেনগুপ্ত সেই প্রতীক লিপির পাঠোদ্ধার করে। এই সতর্ক শাসনের মধ্যেও আফ্রিদি দস্যুরা হানা দেয়। বাইসাইক্‌লের কথাটাও অরবিন্দের মনে অকারণেই হানা দিতে পারে। আর সে রকম ঘটলে অনধিকার প্রবেশের দায়ে দস্যুরা যে শাস্তি পায়, বাইসাইক্‌লের প্রসংগটাও তেমনি-ভাবে বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারে অরবিন্দ, কিন্তু সত্যিই সেকথা ওর মনে পড়ে না। সেসব ভাববার সময়ই নেই এ-রাজ্যে। প্রতীক লিপির অর্থোদ্ধার করতে করতে প্রহরীর একটানা ভারি বুটের আওয়াজ শুনতে শুনতে যদি-বা মন কখনো একটু সরে দাঁড়াতে চায়—তাহলে মনে পড়ে দেশের কথা, গাঁয়ের কথা—হুগলী, হাওড়া ছাড়িয়ে মেদিনীপুর জিলার সেই রাঙা মাটি, কালো মাটির ঢেউ তোলা বিস্তার, রাঢ়ের টান ছোঁয়া বাংলা বুলিতে যেখানে উড়িয়ার ছোঁয়াচ লেগেছে আর বেংগল নাগপুর রেলপথ পড়ে আছে অতিকায় একটা মাছের কাঁটার মতো।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। প্রহরী বাইরের উঠানে ঝোলানো কাঁসরে দু'বার হাতুড়ি ঠুকলো। অরবিন্দ সরকারী নথিপত্তর সরিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরালো। চকিতে মনে পড়লো এয়ার কমোডরের সকাল বেলার কথাটা। হ্যাঁ অরবিন্দের অপরাধের তুলনায় অফিসারের উক্তিটা নিতান্ত হাল্‌কাই বলতে হবে। অন্য কেউ হলে একটা তুমুল হৈ চৈ করে বস্‌তো নিশ্চয়ই। পাঞ্জাবি অফিসার হলে তো আর রক্ষে ছিলো না। কিন্তু ইংরেজ জাতটা সত্যিই ভারি উদার। সিগারেটের ধোঁয়ার সংগে ওর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবোধের উচ্ছ্বাস মিশে গিয়ে জংগী দপ্তরের নিশীথ স্তব্ধতা হঠাৎ যেন কী রকম রমণীয় হয়ে উঠলো। মনে হলো, অফিসারের 'বাইসাইক্‌ল'টা ওভাবে না ব্যবহার করলেই ভালো হতো। কিন্তু চার পেগ হুইস্কির পরে ভালোমন্দের বিচারটাই অন্য রাস্তায় চলতে থাকে। সেজন্য অবিশ্যি অরবিন্দ আত্মশোচনায় ডুবতে রাজি হবে না।' দেশ, সমাজ, সংসার ছেড়ে, এই পার্বত্য, বন্য আফ্রিদি অঞ্চলে যার জীবন উটের মতো হাঁটতে আরম্ভ করেছে, হুইস্কির জোরেই তাকে চলতে হয়। সেই রকম ঝোঁকে পড়েই সকালের দু'ঘণ্টা ছুটির মেয়াদে অরবিন্দ বাইসাইক্‌ল নিয়ে কেল্লার চারপাশে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ যেন আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়েছে কয়েকটা লোক, হাতে নিশি বন্দুক, কোমরে ছোরা। একটিও কথা না বলে গোটা দশেক লাথি কষিয়ে ওকে একটা পাথরের ওপর ফেলে রেখে তারা 'বাইসাইক্‌ল-খানা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। আর পকেট হাতড়ে পয়সাকড়িও যা পেয়েছে, নিয়ে গেছে। অরবিন্দের ভাগ্যি ভালো যে সংগে 'রিভল-ভার' ছিলো না। থাকলে আত্মরক্ষার কাজে তো লাগতোই না, উপরন্তু সেটিও সাইকলের সহচর হ'তো।

প্রহারের ওষুধেই অরবিন্দের নেশা ছুটে গিয়েছিল। তবুও টলতে টলতে পায়ে হেঁটেই কেল্লায় ফিরেছে। আর ফেরবার পথে দরজার ঠিক সামনেই এয়ার-কমোডরের সংগে দেখা। অতো বড়ো 'অফিসারের' সংগে ওর যদিও কোনো সম্পর্ক থাকবার কথা নয়, তবু রীতিমত সেলাম ঠুকে সদাকৃত অপরাধের কথা তাঁর কাছে যথোচিত বিনয়ের সংগে ও স্বীকার করলো। 'অফিসার' সব শুনে শুধু একটু হাসলেন, আর রুপোর সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট নিজে ধরিয়ে আর একটি দিলেন অরবিন্দকে। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন, 'যাও একটা লেমনেড ধ্বংস করো।' কৃতজ্ঞতায় সেলাম ঠুকে অরবিন্দ যখন সত্যিই লেমনেড খাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, তখন আবার কি মনে করে ওকে ডেকে বল্লেন, 'দেখো সেনগুপ্ত, জীবনে তিনটি নির্বাচন সম্বন্ধে তোমার সতর্ক থাকা দরকার—নারী, সুরা এবং বাইসাইক্‌ল।'

কথাটা যদিও রসিকতার সুরেই 'এয়ার কমোডর' বলে ফেলেছিলেন, তবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যরাত্রে এই কথাটারই ছোঁয়া লেগে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো অরবিন্দের বাল্য স্মৃতির কুণ্ডলী হঠাৎ নড়তে আরম্ভ করলো। মনের পটে ভেসে উঠলো বারো বছর আগের একটি শীতের রাত। গড়বেতার ইংরেজি ইস্কুলে ও তখন মাঝামাঝি কোনো এক শ্রেণীতে পড়ে। শালবনি ইস্টিশান থেকে মাইল দুয়েক দূরে রেলের ধারে একটা জংগলের মধ্যে ওর মামার সংগে একটা মাটির ঘরে থেকে পড়াশোনা করতে হতো। মামা কাঠের ব্যবসায়ী ছিলেন। নিমতলায় তাঁর গোলা ছিল আর শালবনিতে জংগল। শাল কাঠের সংগে শিশুর গুঁড়ি চালান দিতেন মালগাড়ি ভরে। দুনলা বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে মামা যেতেন বন কাটাতে আর ও যেতো বইখাতা নিয়ে গড়বেতার ইংরেজি ইস্কুলে। ইস্কুলটায় কোনো বিশেষ আকর্ষণ ছিলো না। দেহাতি লোকের ছেলেরাই পড়তো সেখানে। দু একটা তশীলদার আর জমিদারের অপোগণ্ডও আসা যাওয়া করতো। কিন্তু তাদের কারও সংগেই ওর ভাব জমেনি। ভাব হয়েছিল যে ছেলেটির সংগে সে নারায়ণ মাইতি। তার কাকার ছিল খাবারের দোকান। টিফিনের ছুটিতে প্রায় প্রতিদিনই নারায়ণ তাকে ডেকে নিয়ে যেতো দোকানে। আমলা-গোড়ার প্রসিদ্ধ ক্ষীরমোহন খাইয়েই অরবিন্দকে সে কিনে ফেলেছিল। তাই টিফিনের পরের ঘণ্টায় তারা ইস্কুল পর্যন্ত প্রায়ই আর গিয়ে পৌঁছতে পারতো না। বাঁড়ুয্যে বাড়ীর সামনের মাঠটা পেরিয়ে তেঁতুলতলায় ছায়ায় বসে দুজনে আড্ডা দিয়েছে দিনের পর দিন। তারপরে সাড়ে চারটার গাড়ীর ঘণ্টা পড়লে ছুটতে ছুটতে ইস্টিশানে পৌঁছে অরবিন্দকে শালবনির গাড়ী ধরতে হ'তো। অরবিন্দের জীবনে কোনো দুঃখের বালাই ছিল না। দুঃখের মধ্যে কেবল এই যে দুপুরে একপেট ক্ষীর-মোহন খাবার পরে রাত্রে মামার সংগে খরগোসের ঝোল গেলবার তাগিদ থাকতো না কোনো দিনই। মামা তাই নিয়ে চিন্তিত হতেন, ভাগ্নের যকৃৎ এবং প্লীহার জন্য রীতিমত উদ্বেগ বোধ করতেন এবং মাঝে মাঝে বলতেন, 'তুই কলকাতায় থেকেই লেখাপড়া কর গিয়ে, এখানে তোর শরীর ভালো যাচ্ছে না।' কলকাতায় যাওয়া মানে বড় মামার খপ্পরে পড়া, সকালে বাজার দোকান করা, দুপুরে তাঁর পা হাত টেপা আর সন্ধ্যায় ভাত খেয়ে রাত দুপুর পর্যন্ত বড়মামার বন্ধুদের জন্য তামাক সাজা। সে তুলনায় ক্ষীরমোহন আর খরগোসের ঝোল, নারায়ণ মাইতি আর রেলগাড়ীতে রোজ ধাওয়া আসা করার সৌভাগ্য সে তো স্বর্গসুখ। অরবিন্দ শুধু ক্ষীরমোহন কিছু কম খেলেই ভাবী দুঃখের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারতো। কিন্তু নারায়ণের দুঃখ পরিমাণে এবং গভীরতায় ছিল সমুদ্রের মতোই অশেষ। অথচ সে দুঃখের চারিদিকে সমুদ্রের মুক্তি ছিলো না। একটা কঠিন অবরোধের মধ্যে সেই অশান্তি ক্রমশ আগ্নেয়গিরির শক্তি সঞ্চয় করছিল। নারায়ণের চেহারা আজও ভাসছে চোখের সামনে। গায়ের রঙ কালো, আর চামড়া ছিল মসৃণ; দাঁতগুলি সব সময়ে ঝক্‌মক করতো আর দুই চোখের দৃষ্টিতে কি রকম একটি গ্রাম্য শান্তির ছায়া নিত্য এলিয়ে থাকতো। শুধু তেঁতুল তলার ছায়ায় দুই বন্ধুর বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে মাঝে মাঝে

সেই ছায়া যখন সরে যেতো তখন ওর দাঁতের মতোই ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠতো দুই চোখের মণি। সে চোখ বোধ হয় হিংস্র। আর সে হিংস্রতা বাঘের নয়, সাপের। ক্ষীরমোহন ছাড়া নারায়ণের সঙ্গে অরবিন্দের বন্ধুত্ব জমে ওঠার আরও একটা কারণ ছিল। দুজনেই ছিল বাপ-মা-মরা ছেলে। অরবিন্দের ভাইবোন ছিল না, কিন্তু নারাণের একটি দিদি ছিল—ওর চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। ওদের বিশ্রম্ভালাপের প্রধান বিষয় ছিল সে-ই।

প্রথম যেদিন কথাটা আরম্ভ হয় সেদিন একটা কাঁচা তেঁতুল মটকে ভেঙে ফেলে নারাণ জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই রকম করে কার ঘাড় মট্‌কাবো জানিস?'

—হেড পণ্ডিতের?

—দূর! তশীলদার শালার!

আর সেই মটকানো তেঁতুলের উপর জোর লাথি কষিয়ে ও আবার জিগেস করেছিল 'আর, এই রকম করে কার পিণ্ডি চটকাবো বল দিকিনি?

অরবিন্দ এবার আর কোনো জবাব দেয়নি। উত্তরটা নারাণের মুখেই শুনেছে।

—কাকী হতভাগীর।

* * * *

আলোচনাটা অবশ্য একদিনে শেষ হয়নি। একে একে সব কথাই নারাণ ওকে বলেছিল। তশীলদারের তিনটে বৌ, দুটো মেয়েমানুষ।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অরবিন্দের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সেই কৈশোরে বৌ-এ আর মেয়েমানুষে যে কি পার্থক্য তা অরবিন্দ তখনো শেখেনি। নারাণই সবিস্তারে সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে এমন সব কথা বলেছিল, যার ফলে ওর কর্ণমূল লাল হয়ে উঠেছে, বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করেছে, একটি অপরিসীম ভয়ে উত্তেজনায় মোহে সমস্ত মনে যেন নেশা লেগে গিয়েছিল। কিন্তু নারাণের কথায়, সে রকম কোনো উত্তেজনা ছিল না। স্ত্রী-পুরুষের রহস্য তখন নারাণের কাছে সিদ্ধজ্ঞান আর ওর কাছে আবিষ্কারের সামগ্রী। নারাণের নির্লিপ্তি দেখে ও বরং কিছু মুগ্ধ হয়েছিল। বয়োজ্যেষ্ঠের যে সম্মান ও শ্রদ্ধা ও বয়সে সমসাময়িক বালকদের দিতে কুণ্ঠা হয়ে থাকে, সে শ্রদ্ধাবোধ নারাণ অত্যন্ত সহজে ওর কাছে আদায় করে নিয়েছিল। কিন্তু নারাণের এই নির্লিপ্তি শুধু যে অতিপরিচিতের প্রতি স্বাভাবিক ঔদাস্যপ্রসূত ছিলো, তা নয়। আসল কথা নারাণের মনে ছিল দুঃখ।

ব্যাপারটা এইঃ তশীলদার রায় চৌধুরীর বয়স তিপ্পান্ন বছর, মদের নেশা আর মেয়ে মানুষের লোভ দুটোর কোনোটাই তার মনকে তখনো নিষ্কৃতি দেয়নি। নারাণের দিদিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব জানিয়ে সে ওর কাকার কাছে খবর পাঠিয়েছে। কাকা যদি বা প্রথমটায় একটু গররাজি হয়েছিল, কিন্তু কাকীর তা সহ্য হয়নি। তার প্ররোচনায় পড়ে কাকা একেবারে দেনাপাওনার কথা পর্যন্ত নেমেছে। ওদের বাপ-মা নেই তাই, থাকলে কখনো বুড়ো মাতালের বৌ হতে হতো না দিদিকে। কিন্তু বাপ না থাক, সন্ধ্যারাণীর ভাই তো মরেনি। সেই কথাটাই নারাণ বুঝিয়ে দেবে।

কিন্তু বোঝাবার রাস্তাটা নারাণকে অনেক ভেবে চিন্তে বার করতে হয়েছিল। একদিন ইস্কুলে দেখা হতেই একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে অরবিন্দকে ও জিগেস করলো, 'আচ্ছা, রাক্ষুসীটাকে গরম রসের কড়ায় ফেললে কি রকম হয়?'

আর একদিন ফস্‌ করে বলে বসলো 'আচ্ছা অরবিন্দ তুই ওকে বিয়ে করে ফেল না, তাহলে ভূতপেত্নীর কবল থেকে দিদিটা সত্যিই বেঁচে যায়। অবিশ্যি বয়সের গোলমালটা থেকে যায়। কিন্তু তাতে কি? একটা মেয়ের প্রাণটা তো বাঁচে। আর জাতের তফাৎ তো তুই মানিসই না।

হয়তো বয়োধর্মের উচ্ছ্বাসেই অরবিন্দ সে প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিল। কোনো-রকম ইতস্ততঃ না করে সরাসরি বলে ফেলেছিল, আমি রাজি আছি, নারাণ, কিন্তু এখানে থাকা চলবে না তা হলে। গোটা পঞ্চাশ টাকা যদি পাই, মেদিনীপুরে ছোট একটা দোকান করা যাবে, আর তোতে আমাতে মিলে সেই দোকান চালিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দেবো।

তেঁতুলতলার সভা সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাঙেনি। ট্রেণ বেরিয়ে যাবার অনেক পরে নারাণ কোথা থেকে একখানা ঝরঝরে বাই-সাইকেল নিয়ে এসেছিল। সেই দ্বিচক্রযানের সওয়ার হয়ে ওরা দুজনে যখন শালবনির জঙ্গলের ডেরায় পেঁৗছেচে, তখন মামা রীতিমত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'এতো দেরি হলো কেন?

অবলীলাক্রমে নারাণ জবাব দিয়েছিল, হেড পণ্ডিতের শেষ ঘণ্টায় কেলাস ছিল। ছুটি পেতে দেরি হয়েছে, তাই ট্রেণ বেরিয়ে গেছে।

মামা বিশ্বাস করলেন। নারাণকে তিনি কোনো মতেই অতো রাত্রে বাইসাইকেলে ফিরতে দিলেন না। সঙ্গে লোক দিয়ে শালবনির ইস্টিশানে পাঠিয়ে দিলেন রাত ন'টার প্যাসেঞ্জার ধরে গড়বেতায় ফেরবার জন্যে। বাইসাইকেলটা অবশ্য সঙ্গে নিয়ে গেল নারাণ।

পরদিন ক্ষীরমোহনের সঙ্গে নারাণের কৃতজ্ঞতা পরিবেশিত হলো অকৃপণ ঔদার্যে। তারপর ইস্কুল ফিরতি পথে সে বললে, 'দিদিকে তোর কথা সব বলেছি।'

বেশ মাতব্বরের মতোই অরবিন্দ জিগেস করলে কি বললে বল দিকিন।

উত্তরটাও মাতব্বরোচিত হলোঃ 'মেয়ে-ছেলের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।' সন্ধ্যারাণীর মুখ যে একেবারেই ফোটেনি, তা নয়। তবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। হয়তো দায়ে পড়েই রাজি হয়েছে, একটা বুড়ো মাতালের বিছানার তুলনায় একটা অপরিণাম-দর্শী ছোকরার সান্নিধ্য নিশ্চয়ই ভালো। আত্মরক্ষার ব্যাপারে মেয়েদের অনেক কম বয়স থেকেই দিব্যি একটি সংস্কার জন্মে যায়।

সন্ধ্যারাণীর তারুণ্যে সম্ভবতঃ তখন বয়ঃসন্ধির জোয়ার এসেছিল। এই বয়সের সহজ প্রতীক্ষা আর উপাসনায় নৈবেদ্য সাজিয়ে সে অরবিন্দর জন্যেই চুপি চুপি বসে রইলো।

কিন্তু নাটকের চূড়ান্ত প্যাঁচটা বিধাতা যে এতো কাছে এনে ফেলেছিলেন, সে কথা সন্ধ্যারাণী, অরবিন্দ, নারাণ তিনজনের মধ্যে কারও অনুমানেই ধরা পড়েনি।

শনিবার দুটোয় ইস্কুলের ছুটি হতো। ছুটির পরে নারাণ বললে, বেজায় শীত পড়েছে রে, একটু রোদে চল, কথা আছে।'

মাঘের নীল আকাশের চাঁদোয়া দিগন্ত থেকে দিগন্ত অবধি টান করে বাঁধা রয়েছে মনে হয়। নীচে মাটিতে মটরশুটির লতায় ফুল ধরেছে, খেজুর গাছে হলুদবর্ণ ফলের কাঁদি ঝুলছে। রঙচটা আলোয়ানটা খুব টান করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে নারাণ বল্লে, 'শালারা প্রায় সব ঠিক করে ফেলেছে। কাল রাত্তিরে মটকা মেরে বিছানায় পড়ে পড়ে ওদের সব কথাই শুনেছি। আজ সতেরই মাঘ, সামনের সাতাশে বোধ হয় বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে।'

অরবিন্দের গলার নলীটা হঠাৎ যেন বুজে আসছে, মনে হলো,—কিন্তু দুঃখে বা কান্নায় নয়, পূর্বরাগের উচ্ছ্বাসেও নয়, ভয়ে। রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে ভূত দেখলে যেমন হয়, তেমনি অপ্রত্যাশিত বিপদের অভিজ্ঞতায় ওর পাত পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

'তুই রাজি আছিস তো?—ওর ঠাণ্ডা হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে নারাণ জিজ্ঞেস করলে।

—'নিশ্চয়।'

—একদিন আগে খবর দিলেই তৈরী হতে পারবি তো?'

—'নিশ্চয়।'

নারাণ সেদিন আর ইষ্টিশান পর্যন্ত এলো না। অরবিন্দ জঙ্গলের ডেরায় ফিরে, বইপত্তর কেরাসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলটায় ফেলে রেখে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে কম্বল জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। মাথার মধ্যে কিলবিল করতে লাগলো কেবল রাঙা মাটির হাজার হাজার রাস্তা। মনে হলো হঠাৎ যেন বয়স বেড়ে গেছে—নারাণের কালো হাতের এক ঝাঁকুনিতে বেশ

পরিণত একটি কর্তব্যবোধের স্রোতে চলাচল সুরু হয়েছে শরীরের শিরা উপশিরায়।

না, ভয় করে এড়িয়ে গেলে চলবে না। জীবনের এই প্রথম ঘূর্ণীপাকেই ও ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। রাস্তার টানেই ও নিজেকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দেবে। শুধু ডুবে যাবার দুঃস্বপ্নে চমকালেই তো চলে না। ভাসতে ভাসতে ওর বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে রাখতে হবে কালো কোমল দুটি হাতের মণিবন্ধ। জেগে জেগেই যেন অরবিন্দ সেদিন স্বপ্ন দেখেছে। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ঘোমটায় ঢাকা একটি কিশোর, কালোমুখ। কিন্তু নারাণ কালো বলেই যে তার বোনের রং কালো হবে, তার কোনো মানে নেই। সন্ধ্যারাণীকে কোনোদিন দেখেনি বটে, কিন্তু তার মুখের আদল ভেবে নেওয়া বিশেষ দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। তবু কল্পনায় সেই কোমল মুখের ঘোমটাটি ও কোনমতেই খুলতে পারেনি।

ঝক্‌ঝক্‌ করে রাত ন'টার গাড়ী বেরিয়ে গেছে ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে। মামা ওর শরীর খারাপ শুনে যথারীতি উদ্বিগ্ন হয়েছেন। তারপর হিসেবপত্তর, ফর্দ, ফিতে, কালি, কলম নিয়ে হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় মাথা ঝুঁকিয়ে কাজে বসেছেন। শীতরাত্রির বনস্থলী মাঘের জোৎস্নায় ধোয়ায় আলোয়ান মুড়ি দিয়ে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল নিস্পন্দ নীরবতায়।

তারপর কখন যে ঘোমটায় ছবি দেখতে দেখতে জাগ্রত চেতনা ডুব দিয়েছে ক্লান্তির মসৃণ অন্ধকারে, কখন আলোটা কমিয়ে মামা শুয়ে পড়েছেন তাঁর 'নেয়ার-বাঁধা খাটিয়ায়, রামকিষাণ আর শান্তিরাম ছুতোর গাঁজা টানতে টানতে, কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে পাশের ছোট কুঠরীর খাটিয়ায়, সে সব কিছুই অরবিন্দ জানতে পারেনি।

ঘুম ভাঙলো একটা শতকণ্ঠী হাহারবে। সেই সঙ্গে রেল গাড়ির ইঞ্জিনের ভোঁসভোঁসানি কাণে এলো। রামকিষাণ, শান্তিরাম, ছোট-মামা, অরবিন্দ সবাই যেন একসঙ্গে নিজের নিজের বিছানায় উঠে বসলো। মামাকে ডাকতে চেষ্টা করে অরবিন্দ দেখলো গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। মামাই প্রথম কথা বললেন, 'অরবিন্দ উঠেছিস,' ভয় নেই, ডাক গাড়ি থেমে গেছে মনে হচ্ছে।

রামকিষাণ লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেল। শান্তিরাম আগেই গিয়েছিল। সে ফিরে এলো ছুটতে ছুটতে 'জল জল' চীৎকার করে। ঘটনাটা অসাধারণ নয়। কে একজন কাটা পড়েছে। দৃশ্যটা নিশ্চয় মনোরম নয়। তবু ভীতিপ্রদ বর্বরতার প্রতি মানুষের যে সহজ কৌতূহল আছে, সেই আদিম চাবুকের চকিত তাড়নায় ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে পড়লো এক নিশ্বাসে। মামা গেলেন আলোয়ান জড়িয়ে, অরবিন্দ গেল বিছানা থেকে কম্বলটা টেনে নিয়ে। খালিপায়ে রেলের পাথরগুলো বরফের ফলকের মতো বিঁধতে লাগলো। গাড়ীটা দাঁড়িয়েছে খুব কাছে নয়। প্রায় ইষ্টিশানের কাছাকাছি, জেলাবোর্ডের বড় রাস্তার ফটক ঘেঁষে। মামা ছুটতে ছুটতেই অরবিন্দকে সাবধান করে দিলেন 'সাপখোপ দেখে আসিস। "শীতকালে সাপ থাকে না, কর্তা" শান্তিরাম ছুটতে ছুটতেই সংশোধন করে দিলো। ট্রেনের শেষ কামরার নাগাল পাবার আগেই গাড়ীটা ছেড়ে দিলো। সকলেই ভারি মনঃক্ষুণ্ন হ'লো। এমন একটা সমবেত দৌড় নিছক মাঠে মারা যাবে, একথা কেই বা ভেবেছিল।

যাই হোক দৌড়টা একেবারে বিনা পুরস্কারে শেষ হলনা। বড় রাস্তার ফটকে ওরা যখন পেঁাছল, তখন নীল কুর্তি পরা ফটক ওয়ালার সঙ্গে রেল পুলিশের একটি সেপাই-এর' উত্তেজিত আলোচনা চলেছে। তাদের পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা টিনের সুটকেস, তার দুটো পাশ স্বাভাবিক চেহারার, কিন্তু মাঝখানটা গাড়ির চাকায় চেপ্টে গিয়ে রেল লাইনের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। আরও একটা জিনিস পড়েছিল, আধখানা চ্যাপ্টা মূর্তি বাইসাইকেল। বাকি আধখানা প্রায় দুটো টেলিগ্রাফের খুঁটি ছাড়িয়ে অনেক দূরে চাঁদের আলোয় চিক চিক করছিল।

বিপদ বোঝবার যে অস্পষ্ট শক্তি মানুষের বুকে কোনো কোনো সময়ে চেতিয়ে ওঠে, সেই রকম একটা পরম রহস্যময় সাজ্জার ধূসরতার মধ্যে অরবিন্দের টনক নড়লো। সেপাইকে জিজ্ঞেস করলে, 'কে কাটা পড়েছে ?'

বাঙালি সেপাই তখুনি জবাব দিলে, 'কেউ পড়েনি।'

—তবে সাইকেলের সওয়ারী কোথায়?

--'সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।'

—'কোথায় গেল সে,' প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে অরবিন্দ প্রশ্ন করে। সেপাই গলার স্বর শুনে একটু যেন চমকে উঠলো। বল্লে,

—খোকাবাবু, চেনেন নাকি?

তাড়াতাড়ি মামা জবাব দিলেন, 'ও চিনবে কি করে? ও তো বিছানা থেকে এইমাত্র দৌড়ে এলো।'

সেপাই-এর কাছ থেকে বিস্তারিত খবরটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল যা হোক। কালো রঙের বছর চোদ্দ বয়সের একটি ছেলে সাইকেলে চেপে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে মেদিনিপুরের দিকে যাচ্ছিল। রেলের ফটকটা ডাকগাড়ীর জন্য বন্ধ ছিল। কিন্তু বড় ফটকের পাশে মানুষ চলাচলের জন্য যে ছোট ফটক থাকে, সেই ফাঁক দিয়ে সাইকেল গলিয়ে নিয়ে সে যখন পার হবার চেষ্টা করে, তখন ফটকওয়ালার সঙ্গে তার বেশ খানিকটা বচসা হতে থাকে। ইতিমধ্যে গাড়ী এসে পড়ে। গাড়ীর সার্চ-লাইট জ্বালা ছিলো না বটে, কিন্তু গাড়ির শব্দ তো কিছু কম হয়নি। ছেলেটি বোধ হয় কোনো কারণে অত্যন্ত রেগেছিল। কোনোদিকেই তার মন ছিলো না শুধু ফটক পেরিয়ে তাকে সাইকেল হাঁকাতে হবে, এই ছিলো তার লক্ষ্য। গাড়ীটা কাছে আসতেই ফটকওয়ালা এক হেঁচকা মেরে ছেলেটিকে টেনে আনে, কিন্তু সাইকেলখানা ছুটে' টিনের সুটকেস সমেত একেবারে লাইনের মাঝে ঠিকরে পড়ে। ছেলেটার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি, কিন্তু ফটকওয়ালার হাতে বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ডাক গাড়ীর ড্রাইভার চাঁদের আলোয় দুর্ঘটনাটা দেখেছিল, তাই সে গাড়ি রোখে। নইলে সাইকেল তো দূরের কথা, হাতী চাপা পড়লেও অমন ভারি ইঞ্জিনে হোঁচট লাগেনা। সে যা হোক, ছেলেটাকে অচেতন অবস্থায় গাড়ীতে তুলে দেওয়া হয়েছে, খড়গপুরের রেল হাসপাতালে পেঁাছে দেবে।

রেল পুলিসের বাঙালী সেপাই বললে, 'আমাদের চাকরির এই পেহাড়ি বাবু, গাড়ী থেকে নামতে হলো দুটুকরো সাইকেল পাহারা দেবার জন্যে, এখন এই রাত বারটা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এখানে। তারপর মাস তিনেক ঘুরতে হবে আদালত আর ইস্টিশান আর আদালত। এমন লক্ষ্মীছাড়া ছেলেও তো দেখিনি, রাত বারোটায় ভোঁ ভোঁ রাস্তায় সাইকেল হাঁকাতে বেরিয়েছিল।'

অরবিন্দের আর কিছু শোনবার স্পৃহাও ছিল না, শক্তিও ছিল না। বাড়িতে ফিরে সেই যে জ্বর হলো, তারপর মালিশ, সেঁক, ওষুধ, ডাক্তার, কলকাতায় ফিরে যাওয়া—নানা পর্যায়-ক্রমে অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তিহীন একটা অবসাদ ও ব্যাধির ঘোরে ওর চেতনা বহু ঘোরপাক খেলো।

নারাণের কথাটা যে একেবারে তলিয়ে গেল, তা নয়। কলকাতায় বুকে পিঠে ব্যথা সারাবার ওষুধ বেঁধে শোওয়া অবস্থায় কানে এলো, আমলাগোড়ার হরিচরণ মাইতির ভাইপো নারাণের জেল হয়েছে সেই ডাকগাড়ি থামার ব্যাপারে। কেন জেল, কি অপরাধ, কিছুই সঠিক জানা গেল না। আর সন্ধ্যারাণীর কথা কে-ই বা তুলবে? মামা তো তাকে চেনেন না।

সন্ধ্যারাণী তখনো সেই শালবনীর রাজ-পুরটির জন্য প্রতীক্ষা আর উপাসনার নৈবেদ্য সাজিয়ে বসেছিল কি না, কে বলবে? কিন্তু অরবিন্দের প্রতীক্ষা ফুরোয় কি?

প্রায় মাস ছয়েক পরে রাত ন'টার প্যাসেঞ্জার থেকে নেমে ও আবার সেই পুরানো ইস্টিশানে পা দিলো।

শীত গেছে, গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষার জলে জঙ্গল তখন সতেজ, অন্ধকার। অনেক দিন

পরে প্রকৃতির স্তব্ধতা কেমন যেন অচেনা ঠেকলো। সেই সঙ্গে কলকাতার বিজলী আলোর অভ্যাসের পরে কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে টেবিলের উপর হারিকেন লণ্ঠনের ম্লান আলো কেমন যেন অসহায় মৃত্যুশয্যার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, মনে হলো।

কোনো মতে রাত কাবার করে বেলা আটটার মধ্যে দুটো ভাত মুখে দিয়ে ট্রেনে চেপে অরবিন্দ গড়বেতায় পেঁছিলো। ইস্টিশানটাও কেমন যেন নতুন নতুন লাগলো। কৃষ্ণচূড়ার মস্ত গাছটা যেখানে অতিকায় ছায়া করে দাঁড়িয়ে থাকতো, সেখানটা একেবারে ফাঁকা। হয়তো বাজ পড়ে গাছটা নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো নতুন কোনো রেল আপিসের ঘর তৈরি হবে বলে গাছটা কেটে ফেলা হয়েছে।

অরবিন্দ কিন্তু সোজা ইস্কুলে গেল না। গেল সেই আমলাগোড়ার ক্ষীরমোহনের দোকানে।

আগে চোখ টিপে ধরলো নারাণ। সেই আগে দেখতে পেয়েছিল। বললে, 'ক্ষীরমোহন খা, আজকাল আমি তৈরি করছি।'

—তোর নাকি জেল হয়েছিল?

—দূর!

—তবে তোর কি হলো?

—কিচ্ছু নয়, বকে ছেড়ে দিল।

—কোথায় যাচ্ছিলি রে অতো রাত্তিরে?

—মেদিনীপুরে।

—কেন?

—পরে বলছি। কিছু খাবি না?

অরবিন্দ টানতে টানতে ওকে দোকান থেকে বার করে নিয়ে এলো। চুপিচুপি জিগ্যেস করলে, 'তোর দিদি কোথায়?'

—শ্বশুর বাড়ি।

—কোথায়?

—তশীলদার রায় চৌধুরী......

অরবিন্দের পায়ের নীচে সহসা বসুমতী বাসুকির মাথায় যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। তবু কৌতূহলের পূর্ণ-সন্তুষ্টিতে ও বাধা দেবে কেন? নারাণ অবিশ্যি সংক্ষেপে জানালো, —যতদূর সম্ভব কম কথায়।

শনিবার ইস্কুল থেকে ফেরবার পরে সে জানতে পারে যে, বরপক্ষের অনুরোধে সেই রাতেই বিয়ের ঠিক হয়েছিল। ক্ষমতাশালী তশীলদারকে তখন বাধা দেবার কোনো উপায় নেই। অরবিন্দই বা কি করবে? আমলাগোড়ার ফাঁড়িতে খবর দেওয়া মিথ্যে, পুলিশ তো ঘুষের বশ। তাই দিদিকে বাঁচাবার জন্যে ও মেদিনীপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শরণাপন্ন হবে ঠিক করে। বিয়ের লগ্ন ছিল শেষ রাতে। কোনো মতে রাত দুটোর মধ্যে পেঁছুতে পারলেই হলো। তারপর পুলিস নিয়ে মোটর চেপে আমলাগোড়ায় ফিরে এসে যাহ'ক একটা কিছু করা যেতো। কিন্তু 'বাইসাইকল' ব্যাটাই সব ভেস্তে দিলো।

তশীলদারের জিদ বজায় রইলো বটে, কিন্তু নারাণ তো চেষ্টা করেছিল। আর সেই সততার জন্যই দিদিটা কষ্ট পাচ্ছে না ওখানে। কিন্তু জীবনে বাইসাইকল ও আর ছোঁবে না, এই হলো নারাণের প্রতিজ্ঞা।

সাইফার অফিসার সেনগুপ্তের তর্জনীতে হঠাৎ আগুনের ছেঁকা লাগলো। চমকে উঠে অরবিন্দ সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলো, পুড়ে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। প্রহরী কাঁসরে একবার হাতুড়ি ঠুকলো। দেয়ালে ঘড়িতে বেজেছে রাত আড়াইটে।
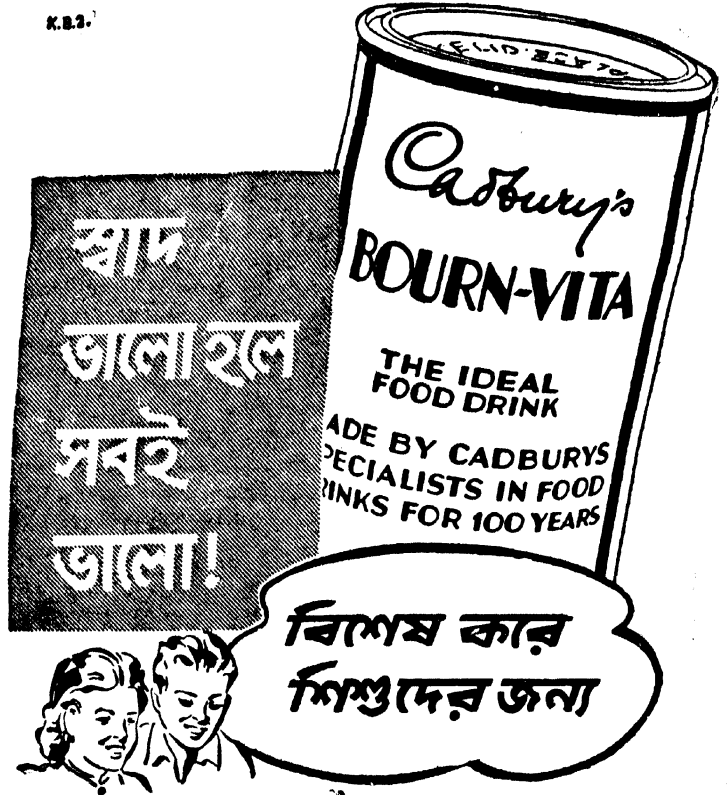
অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

গন্ধর্বপুরীতে মানে সেই ওয়েটিং রুমে খোলা দরজার পথে চোখ মেলিয়া দিয়া বসিয়াছিলাম। চোখ খোলা থাকিলে না দেখিয়া উপায় নাই, তাই অনেক কিছুই দেখিতে হইল। দেখিবার যে বিশেষ অনিচ্ছা ছিল, তাও নয়। রক্তমাংসের মানুষের দোষগুণ যা থাকিবার কথা, তা আমারও ছিল। সর্বোপরি ছিল গভীর বনের পটভূমিকা, ঐ আবেষ্টনে মনে ধীরে ধীরে মোহ বিছাইয়া দিতেছিল। ফলে, মনের মার্জিত সংযত সভ্য দিকটা ঝিমাইয়া পড়িল, অথবা মনের গাত্র হইতে এতদিনের জানাশোনার আচ্ছাদনটা স্খলিত হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া আসিল বনের আদিমতম অধিবাসীর বন্য নগ্ন রূপটি। বহু মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে অরণ্যজীবন পার হইয়া আসিয়াছি, সেই অতীত কোথা হইতে উত্থিত হইয়া আমার বর্তমানকে গ্রাস করিয়া লইল, আমি মনে মনে এই গভীর অরণ্যানীরই অংশীভূত হইয়া গেলাম।

সম্মুখে ছোট্ট প্লাটফর্মে মালপত্র নামানো ও কর্মব্যস্ততা চলিয়াছে। ভূটিয়া ললনারা কাজ করিতেছে, কথা বলিতেছে, হাসিতেছে—প্রাণচাঞ্চল্যের কোন অভাবই দেখিলাম না, বরং যেন একটু বেশিই দেখিলাম। লজ্জা-সংকোচ বলিয়া ব্যাপারটা যে এদের তেমন জানা আছে বলিয়া তো মনে হইল না। কিংবা জানা থাকিলেও অপ্রয়োজনীয় বোধে বহু আগেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সিপাইরা পুরুষ মানুষ, তায় ক্ষত্রিয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, এদের উপর তাদেরই স্বাভাবিক অধিকার থাকার কথা। ক্ষত্রিয়রা শুধু ত্রাণই করিয়াছে তা নয়, সসাগরা বসুন্ধরা ভোগও তারাই করিয়াছে। কাজেই পৌরুষ তাদের চঞ্চল হইয়া উঠিতে ন্যায়তঃ ও স্বভাবতঃ বাধ্য এবং হইয়াও যে উঠিয়াছে, টের পাইলাম। সিপাইদের মধ্যে কারো কারো ভাবভঙ্গী ঠিক রুচিসংগত হইতেছিল বলা চলে না। ভূটিয়া মেয়েরাও হাবভাবে এই পৌরুষে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করিতেছিলনা। এ-খেলার ছলা-কলা কৌশল সবকয়টি ইহারাও বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে দেখিলাম।

আরও খানিকটা দেখিলাম। এই দেখাটির জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না।

স্টেশন হইতে হাত ত্রিশেক দূরে স্টেশন মাস্টারের ঘর। মোটা খুঁটির উপর হাত দশেক উঁচু মঞ্চ, তদুপরি ঘরখানা দাঁড়াইয়া আছে, অতিশয় দৃঢ় ও সুরক্ষিত। বাঘ, ভাল্লুক, হাতী আসিয়া বড় জোর তর্জন-গর্জন করিয়া যাইতে পারে, গা দিয়া শুঁড় দিয়া ঠেলিয়া খুঁটির জোর পরীক্ষা করিতে পারে, কিন্তু গৃহের বা গৃহবাসীর কোন ক্ষতিই করিতে সক্ষম হইবে না—এমন করিয়াই এই ঘন-জঙ্গলের মধ্যে গৃহটি তৈরী করা হইয়াছে।

মাটি ও ঘরের মঞ্চের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান, একটা আস্ত হাতী গিয়াও দাঁড়াইতে পারে। দরজার দিক হইতে দৃষ্টিটাকে ফিরাইয়া জানালার পথে উক্ত গৃহটির অভিমুখে প্রেরণ করিলাম। দৃষ্টি সেখানে পৌঁছিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। একজোড়া ভূটিয়া ছেলে ও মেয়ে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া প্রেমিকযুগল নিশ্চয় বহুক্ষণ পূর্বেই স্টেশনে ফিরিয়াছে। চোখ বুজিয়া হাতলভাঙ্গা ডেকচেয়ারটায় পড়িয়াছিলাম। কতক্ষণ পার হইয়াছে, খেয়াল ছিল না। এই অবস্থায় মনে একটি ব্যাপার ঘটিয়া গেল, যার জন্য মোটেই প্রস্তুত ত ছিলাম না বটেই, কিন্তু এমন যে ঘটিতে পারে তাহাই আমার স্বপ্নেরও অভিজ্ঞতায় ছিল না। কয়েকটা সেকেণ্ড, বড় জোর একটি মিনিট সময় লাগিয়াছিল এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে।

চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ সচেতন হইলাম যে, আমার মনে আসন্ন কিছুর ছায়া পড়িয়াছে। মন ধীরে ধীরে কোথায় গভীরে যেন নামিয়া যাইতেছে, এও টের পাইলাম। পরক্ষণেই টের পাইলাম যে, পরিচিত জগতের সঙ্গে আমার এতদিনের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল। ঠিক ছিন্ন হওয়া নয়, পরিচিত জগৎ যেন কোথায় অদৃশ্য হইল। অথচ, বুদ্ধি আমার তখনও পূর্ণ জাগ্রত।

আমার সম্মুখে যাহা আসিল, তাহা হঠাৎ আসিল বলিয়াই আমার চেতনায় ধাক্কা লাগিয়াছিল। আমি জানিতে পারিলাম যে, আমি এমন একটি লোকে আসিয়াছি, যে-লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই এতাবৎ আমার কোন ধারণা ছিল না।

এই লোকটি আমাদের জগতের মধ্যেই অবস্থিত, অথচ জগৎ তাকে এমন আড়াল করিয়া রাখিয়াছে যে, এর অস্তিত্বের খবরই আমরা জানি না। হঠাৎ কি কারণে মন এই লোকে পা দিয়া বসিল, আমি জানি না। হয়তো দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন একটি ক্ষণের জন্য অপসারিত হইয়া থাকিবে। ঐ একটি ক্ষণের বিদ্যুতালোকেই এই অজ্ঞাত লোকটি আমার চোখে উদ্ভাসিত হইল। ইহাকে কি নামে বুঝাইব, বুঝিতেছি না। কে জানে, হয়তো ইহাই—কামলোক।

একটি ক্ষণ, কিন্তু তাতেই আমার দেখা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। আমাদের জগতের দেশ-কালের কোন সীমা সেখানে নাই। প্রাণের অন্তরালে অন্তহীন কাম-জগৎ অবস্থিত, যেখান হইতে সামান্য বুদ্বুদের মত কিছু উপরে ভাসিয়া উঠিলেই আমাদের প্রাণ-জগতে সমস্ত কামকেন্দ্রগুলিতে অল্পবিস্তর চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হইতে থাকে। এখানকার সামান্য নিঃশ্বাসেই আমাদের এই উপরের জগতে প্রবৃত্তির ঝড় দেখা দেয়। এ-লোকের বর্ণনা চলে না, শুধু দেখা চলে। কিন্তু মনের সে-চোখ হঠাৎ না খুলিলে দেখার পথ কেহই বলিয়া দিতে পারিবে না।

তেমনি হঠাৎ চোখ আবার ক্ষণপরেই বন্ধ হইয়া গেল, নিজের পরিচিত জগতে মন ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিতে লাগিল। যাহা দেখিলাম, তাহার স্মৃতিতে মন আমার তখনও আচ্ছন্ন-আবিষ্ট হইয়া আছে। চোখ খুলিলাম, কিন্তু চোখে তখনও মায়া লাগিয়াছিল, সমস্ত বনভূমি আমার নিকট কাম-ভূমি বলিয়া প্রতিভাসিত হইল।

চোখ খুলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছিল না, চোখ বুজিয়াই পড়িয়া রহিলাম। ছবির পর ছবি আসিতে ও যাইতে লাগিল। ইচ্ছা করিয়া কল্পনা করিয়া দেখিতেছিলাম, তাহা নয়। আবার জোর করিয়া তাড়াইতেও ছিলাম না। আমাকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিয়া ছবির পর ছবি দেখানো চলিতেছিল—শুধু এই জ্ঞানটুকু আমার ছিল যে, যেখান হইতে মন ফিরিয়া আসিয়াছে, তারই প্রতিক্রিয়া চলিতেছে এইভাবে।

ছবিগুলি যা সেদিন দেখিয়াছিলাম, তা একই গোত্রের।

গভীর বনে যেখানে কোনদিন সূর্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেখানে অন্ধকার গর্ত হইতে দলে দলে সাপ-সাপিনী বাহির হইয়া আসিল। একে অপরকে জড়াইয়া লইয়া মদাতুর হইয়াছে, ছোবলে ছোবলে

পরস্পরের মুখ হইতে বিষের ফেনা উদ্গারিত হইতেছে এবং ঘন নিঃশ্বাসে উগ্র পিপাসায় সে ফেনপুঞ্জই আবার তাহারা পান করিয়া চলিয়াছে। দূর বনে বাঘিনী বাঘকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, নখর-দন্ত-ঘর্ষণে ও লেহনে আশে-পাশের গাছপালা ও মাটিতে পর্যন্ত রতি-রোমাঞ্চ জাগিয়াছে, বাঘের কাম-অগ্নি নিঃশ্বাসের ফুৎকারে জ্বালাইয়া লইয়া বাঘিনী অগ্নিস্নানে প্রবেশ করিয়াছে। প্রকান্ড মোটা গাছে গা ঠেকাইয়া হস্তিনীরা ঊর্ধ্বে শুড় তুলিয়া চীৎকার করিতেছে, দলে দলে দৈত্যের মত হাতীরা ছুটিয়া আসিল, তারপর মদস্রাবে সমস্ত বনটাই যেন ভিজিয়া সিক্ত হইল, পদতলে পৃথিবী এ দুর্দান্ত কামক্রীড়ার অসহ্য ভারে ক্লান্ত হইয়া আসিতেছিল, কক্ষ পথ হইতে সরিয়া ছিটকাইয়া পড়িবার ভয়ে তার সর্বাঙ্গে থরথর কম্পন উঠিয়াছে। উপরে গাছের ডালে ডালে পাখীর বাসায় মদকূজন জাগিয়াছে, বিহগীদের ডানার আড়ালে ঢাকিয়া লইয়া পাখীরা তীক্ষ্ম চঞ্চুঘায়ে কামক্ষত রচনা করিতেছিল, গাছগুলি উপরে একপায়ে দাঁড়াইয়া মাটির অন্ধকার অভ্যন্তরে শিকড়ে শিকড়ে জড়াইয়া রস-উদ্গার ও লেহন করিতেছিল। বনের যেদিকে তাকাই, সেই দিকেই এই ছবি, সমস্ত বনভূমি আজ কামভূমি হইয়াছে।

কোন বিরাট শক্তিমানের এ কামরূপ দেখিয়াছিলাম, আজও তা আমি বুঝিতে পারি নাই।

প্লাটফর্ম হইতে মোটা গলার ডাক আসিল—"অমলবাবু, ও অমলবাবু! কান্ড দেখ, ঘুমিয়ে পড়েছে—"

ঘুমাইয়া পড়ি নাই, জাগিয়াই ছিলাম, কারণ চোখ বুজিয়াও জাগা চলে। চোখ মেলিলাম।

শরৎবাবু ওয়েটিংরুমের দুয়ারের সামনে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভিতরে ঢুকিতে গিয়া থেপিয়া গেলেন। উদ্যত পা পিছনে টানিয়া লইয়া কহিলেন—"হুঃ, কিসের মধ্যে বসে আছেন? বাইরে আসুন!"

বলিয়া থুঃ শব্দে খানিকটা নিষ্ঠীবন মুখ ঘুরাইয়া অন্য দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং নাসিকায় হাতের পাতা চাপা দিয়া দুর্গন্ধটাকে ঠেকাইয়া রাখিলেন।

বাহিরে যাইতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। মনের উপর হইতে মোহের আবেগ তখনও সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই।

কহিলাম—"ভেতরে আসুন, চেয়ার আছে।"

—"থাক, চেয়ারের দরকার নেই। আপনি বাইরে আসুন।"

উঠিবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়াই প্রশ্ন করিলাম—"কেন?"

"কথা আছে। গতিক বড় খারাপ।"

তবু উঠিলাম না। গতিক আর কি এমন খারাপ হইবে। টিকিয়া আছি, এই যথেষ্ট। তাছাড়া স্টেশনে আসিলেই একটা নটঘট নির্ঘাৎ বাধিবে, এমন যাত্রাই তো করিয়া বাহির হইয়াছি। অর্থাৎ আমার চোখেমুখে বোধ হয় এইরূপ একটা দার্শনিক ঔদাসীন্য ফুটিয়া থাকিবে। তাই শরৎবাবুকে বাধ্য হইয়াই ভিতরে আসিতে হইল। কারণ, কথা আছে এবং গতিক নাকি বড়ই খারাপ।

প্রবেশ পথে বাধা ছিল। তাই বিপজ্জনক স্থানটুকু এক লম্ফে ডিঙ্গাইয়া শরৎবাবু তার মোটা শরীরটাকে ধপাস শব্দে আমার কাছাকাছি এপারে আনিয়া ফেলিলেন। একটা হেঁচকা টানে চেয়ারটাকে কাছে আগাইয়া লইলেন, মেঝেতে ঘর্ষণে ও আকর্ষণে নিরীহ চেয়ারটা আর্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। শরৎবাবু সেটার উপর চাপিয়া বসিলেন, নড়াদাঁতের মত বেসামাল হইয়া চেয়ারটা কোন মতে খাড়া রহিল।

কিন্তু কতক্ষণ এই বোঝা কাঁধে লইয়া এ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে, নড়বড়ে পদচতুষ্টয়ের দিকে তাকাইয়া তাহা অনুমানের চেষ্টা করিলাম। যাহা মনে মনে চাহিতেছি, বরাত জোরে ঠিক তাহাই যদি ঘটে, অর্থাৎ পায়া যদি কাৎ হয়, তখনও কি যাহা চাহিব, ঠিক তাহাই ঘটিবে? অর্থাৎ, ঘটোৎকচের মত আমার উপর চাপিয়া না পড়িয়া তিনি কি দয়া করিয়া পিছনের ঐ বিপজ্জনক স্থানেই গিয়া ভূমিশয্যা লইবেন? না, এতটা সৌভাগ্য আমার হইবে বলিয়া আমি আশা করিতে পারি না।

শরৎবাবু ঠিক হইয়া বসিলে পর প্রশ্ন করিলাম—"গতিক খারাপের কথা কি বলছিলেন?"

উত্তরের ধারকাছ দিয়াও তিনি গেলেন না, উল্টা আমাকেই প্রশ্ন করিলেন—"জিজ্ঞেস করি, আজ রাতটা স্টেশনে থাকবেন, না যাবেন?"

—"মানে?"

—"মানে সোজা, এই ছ'সাত মাইল চড়াই-উৎরাই করে ফোর্টে যেতে পারেন যদি তবে চলুন। নইলে স্টেশনেই থাকবার বন্দোবস্ত করুন।"

ভয় পাইয়া গেলাম, উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"হেঁটে যেতে হবে?"

উত্তর হইল—"কিসে যেতে চান, আমার কাঁধে চড়ে?"

অবশ্য তাঁর কাঁধে চড়িয়া যাওয়ার কথা উঠে না, শরৎবাবু নিজে রাজী হইলেও তাঁর কাঁধে চড়িয়া যাইতে রাজী হওয়া বা না হওয়া আমার ইচ্ছা। যে মেজাজের লোক, কাঁধ হইতে পাঁচশত মাইল গভীর খাদের মধ্যে নামাইয়া দিয়া তিনি ভারমুক্ত হইবেন এমন সুযোগ তাঁকে দেই আর কি? বলিলেই হইল।

তাই কাঁধে চড়ার প্রস্তাবটায় কান না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হেঁটে যেতে হবে কেন? শুনেছিলাম যে, ঘোড়া ডাণ্ডী এসবের বন্দোবস্ত থাকে?"

"তা থাকে," বলিয়া শরৎবাবু তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

শরৎবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ এইভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। ঘোড়া আসিয়াছে মাত্র ছয়টি, ডাণ্ডী আসে নাই একখানাও, এদিকে লোক আনিয়া নামানো হইয়াছে চৌদ্দ জন। আমরা সিউড়ীর নবরত্ন, আর বগুড়া ও রংপুর হইতে পাঁচজন—সংখ্যাটা চৌদ্দই হয়।

শাস্ত্রে আছে, বুদ্ধি যার বল তার। আর বুদ্ধিটা যার যার নিজ মাথার মধ্যেই রহিয়াছে। বুদ্ধির শরণ নিলাম এবং পরামর্শও পাইয়া গেলাম।

কহিলাম—"এতে এত ভাববার কি আছে?"

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এতেও আপনি ভাবতে নিষেধ করছেন? বেশ, কখন আপনি ভাবতে বলেন?"

হাসি চাপিয়া কহিলাম—"সময় হলেই বুঝতে পারবেন, ভাবতে বলার পরামর্শের দরকার হবে না।"

"কথা কাটাকাটি করার ইচ্ছে আমার নেই, বেশ, আপনার কথাই মেনে নিলাম। এখন আপনি কি করতে বলেন শুনি?"

শুনিতে যখন চাহিতেছেন, শুনাইয়া দিলাম। বলিলাম—"ছয়টা ঘোড়া আছে, ছ'জন চলে যাক। তারা গিয়ে বাকী আটজনের মত ঘোড়া ডাণ্ডী পাঠিয়ে দিতে বলুক।"

—"এইতো? না, আরও কিছু পরামর্শ আছে?"

ঘাবড়াইয়া গেলাম, কহিলাম—"না, আপাততঃ এর বেশি অন্য কোন পরামর্শ আমার নেই।"

"বেশ, তবে শুনুন এবার। দুজন যেতেও পারে, গিয়ে ওকথা বলতেও পারে। কিন্তু ঘোড়া ডাণ্ডী আজ আর আসবে না। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।"

এত সহজে মানিয়া লইতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কহিলাম—"কেন কাটাতে হবে? ঘোড়া ডাণ্ডী আসবার বাধাটা কি?"

শরৎবাবুও হটিবার পাত্র ছিলেন না, মুখের উপর জবাব দিলেন—"কেন আসবে শুনি? জীবনের মায়া নেই?"

জবাব নয়, যেন চপেটাঘাত। একেবারে বোবা হইয়া গেলাম। জীবনের মায়া আছে, কি নাই, এ কি একটা জিজ্ঞাসা করার মত প্রশ্ন হইল! আমাদের জীবনে থাকার মধ্যে তো একমাত্র জীবনের মায়াটাই আছে। এ কে না জানে! নম্র হইয়া পড়িলাম। তখন শরৎবাবুর

কাছে আরও খানিকটা তথ্য পাইয়া গেলাম।

ফোর্টে গিয়া এই দল যখন পেণীছিবে, তখন আর ঘোড়া বা ডান্ডী পাঠাইবার সময় থাকিবে না। শীতকাল, একটু আগেই দিন শেষ হয়, সূর্যাস্তের বহু পূর্বেই এ প্রদেশে অন্ধকার নামে। দিনের আলো থাকিতে থাকিতেই এই বনের ও পাহাড়ের পথে লোক-জনের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। জানোয়ারের হাতে প্রাণ হারাইতে যাদের আপত্তি নাই, তারা তখন এ পথে চলিলেও চলিতে পারে। সে রকম লোক খুব বেশি আছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। থাকিলেও ঘোড়ার সহিস বা ডান্ডীবাহকদের মধ্যে সে নাই, তা না দেখিয়াই ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

তাছাড়া, ধরিয়াই নয় নিলাম যে, ঘোড়া ও ডান্ডী সন্ধ্যার কাছাকাছি স্টেশনে কোনরকমে সত্যই আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু তখন যাইবে কে? আমরা? কেন, বিপ্লবী স্বদেশী হইয়াছি বলিয়া কি এমনই অপরাধ করিয়াছি যে, আমাদের জীবনের মায়া থাকিতে নাই?

(ক্রমশঃ)

পূর্ব-পাকিস্থান হইতে পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দু নরনারীর আগমনের যেমন নিবৃত্তি নাই, সে সম্বন্ধে পূর্ব-পাকিস্থানের সচিবসমূহের বিবৃতিরও তেমনই বিরাম নাই। এই সকল বিবৃতি পাকিস্থান সরকারের অনুসৃত নীতির সমর্থক প্রচারকার্য ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং সেগুলিতে কোথাও অসত্য ব্যতীত সত্য নাই, কোথাও-বা সত্যাসত্যের মিশ্রণে অসত্যের ভাগই অধিক। কোন কোন বিবৃতিতে হিন্দু-দিগের পূর্ব-পাকিস্থান ত্যাগ অস্বীকৃত হইয়াছে, কোন কোনটিতে তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। ইংরেজিতে একটি চলিত উক্তি আছে—যদি মোকদ্দমায় মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিবার কিছু না থাকে, তবে অপর পক্ষের উকিলকে গালি দিয়া জিতিবার চেষ্টা করিতে হয়। সেই নিয়মানুসারে পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-পরিচালিত সংবাদপত্র-সমূহকে আক্রমণ করা হইয়াছে। আমরা সে সকলের বিশ্লেষণ করা অনাবশ্যক মনে করি। কারণ আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাই যথেষ্ট।

গত ২৪শে অক্টোবর শ্রীকামিনীকুমার দত্ত, শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক, শ্রীপরেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতির উপস্থিতিতে ঢাকায় পাকিস্থান গণ-সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে লোকের পূর্ব-পাকিস্থান ত্যাগের কারণগুলি নিম্নলিখিতরূপে প্রদান করা হইয়াছে—

(১) মুসলমান নেতারা কেবলই বলিতেছেন, পাকিস্থান মুসলমান রাষ্ট্র এবং তাহা মুসলমানের আইনানুসারেই শাসিত হইবে।

(২) রাষ্ট্রের শাসন-ব্যাপারে হিন্দুদিগের মত প্রতিষ্ঠার কোন উপায় নাই।

(৩) রাষ্ট্রের সশস্ত্র বা সাধারণ পুলিশে হিন্দু নাই।

(৪) বহু হিন্দুকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইয়াছে—বিশেষ সম্প্রতি প্রায় সকল জিলায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু গৃহস্থের আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

(৫) গৃহচ্যুত হিন্দুদিগের বাসের কোন ব্যবস্থা না করিয়াই সরকারের ও বে-সরকারী লোকের (মুসলমান) জন্য অতি অল্প সময় পূর্বে জানাইয়া হিন্দুদিগের গৃহ অধিকার করা হইতেছে।

(৬) অন্য স্থান হইতে আগত মুসলমানরাও বলপূর্বক হিন্দুদিগের গৃহ অধিকার করিতেছে এবং সরকার তাহাতে বাধা দিতেছেন না এবং অধিকারকারীদিগকে দূর করিয়াও দিতেছেন না।

(৭) ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দু-মুসলমানে ব্যবহার-বৈষম্য করা হইতেছে।

(৮) যে অঞ্চল অর্থনীতিক হিসাবে অখণ্ড ছিল, তাহাতে উভয় সরকারের মাল আমদানী-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসা প্রায় অচল হইয়াছে এবং সেই কারণে বহু লোকের জীবিকার্জনের উপায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(৯) পূর্ব-পাকিস্থান সরকার শিক্ষা সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা মুসলমানাতিরিক্তদিগের সংস্কৃতির বিরোধী।

(১০) আর্থিক—বিশেষ খাদ্য সম্পর্কিত অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

(১১) উভয় রাষ্ট্রে কোন কোন লোকের উক্তি দায়িত্বজ্ঞানের অভাব দ্যোতনা করিতেছে।

(১২) এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

(১৩) পূর্ব-পাকিস্থান সরকার সম্প্রতি যেন ভীতিবিকল হইয়া ব্যাপক খানাতল্লাস, গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে লোককে আটক রাখা আরম্ভ করিয়াছেন।

(১৪) সম্ভ্রান্ত ও ধনী হিন্দুরা পূর্ব-পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

(১৫) কোন কোন অঞ্চলে সমাজদ্রোহী কাজ হইতেছে এবং সরকার অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না।

(১৬) ব্যবসায়ীরা এবং শিল্পী প্রভৃতি বৃত্তিহীন হইয়াছেন।

অত্যন্ত সংযতভাবে যে ষোল দফা কারণ প্রদান করা হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে দুই দফার ব্যাখ্যা প্রয়োজন—

(১) দ্বাদশ দফায় বলা হইয়াছে, এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। গণ-সমিতি যে পাকিস্থানে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' পত্রদ্বয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবসম্পন্ন পত্রে ঐরূপ বিবরণ প্রকাশিত হয় না। পূর্ববঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়াই 'আজাদ' যেরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেছেন, তাহার পরিচয় আমরা পূর্বে দিয়াছি। গত ২০শে অক্টোবর খুলনায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' নষ্ট করার পরের দিন তথায় কেবল 'স্টেটস-ম্যান' ও 'আজাদ' বিক্রীত হইয়াছে। তাহার পরে কলিকাতার আরও দুইখানি পত্রের পূর্ব-পাকিস্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে—(১) 'নয়া দুনিয়া'; (২) 'দৈনিক বসুমতী।'

(২) সমাজদ্রোহী কার্যের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—হিন্দু নারীহরণ ও তাহাদিগকে বলপূর্বক মুসল-মানের সহিত বিবাহ প্রদান। এই কাজই যে আরও উগ্রভাবে নোয়াখালিতে ও ত্রিপুরায় ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অনুশীলন করা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কুমারী মুরিয়েল লিস্টারের বিবৃতিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহাই যে হিন্দু-দিগের পূর্ববঙ্গ ত্যাগের যথেষ্ট কারণ, তাহা বলা বাহুল্য।

গণ-সমিতি যে ১৬ দফা অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশেরই যে প্রতিকার সরকার—ইচ্ছা থাকিলে—করিতে পারেন, তাহাও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা প্রতিকার না করার কারণ, তাঁহাদিগের মত—পাকিস্থান মুসলমান রাষ্ট্র এবং মুসলমানের বিধানানুসারেই শাসিত হইবে।

কেন্দ্রী সরকারের মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল শাকসেনা বলিয়াছেন—অধিবাসী-বিনিময় সম্ভব

নহে। যদি তাহা অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হয়, তবে যে ভারত সরকারের পরিচালকগণ ভারতবর্ষ বিভাগে সম্মতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা কি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের সম্বন্ধে ভারত-রাষ্ট্রের দায়িত্ব অস্বীকার করিবেন! তাঁহারা যে সেই দায়িত্বের গুরুত্ব স্বীকার করেন, তাহার প্রমাণ যে আজও পাওয়া যাইতেছে না, তাহাই বিশেষ দুঃখের বিষয়। সম্প্রতি দিল্লীতে যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে যে এই সমস্যার সমাধান-পথ সুগম হইয়াছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কেন্দ্রী সরকারের অজ্ঞাত নাই। এই ক্ষুদ্র প্রদেশে অতিরিক্ত কত লোকের স্থান হইতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া তাঁহারা বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশত্রয়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া কাহাকে কত লোকের আশ্রয়-ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের অবস্থা শ্রীশ্রীপ্রকাশ ও শ্রীমোহনলাল শাকসেনা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারিবেন যে, তাহাদিগের সমস্যার সমাধানে আর বিলম্ব করা যায় না? ভারত রাষ্ট্রের দায়িত্ব রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রদেশকে ভাগ করিয়া দেওয়াই আমরা সংগত বলিয়া মনে করি। পশ্চিম পাঞ্জাবের বাস্তুত্যাগীদিগকে বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশেও দেওয়া হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের লোকদিগের সম্বন্ধে তাহা কেন করা হইতে পারে না? যদি বিহার বা উড়িষ্যা সে দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তবে এ প্রস্তাব অনায়াসেই করা যাইতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায় যে বহু বিহারী ও উড়িয়া শ্রমিক কাজ করিতেছে, তাহাদিগের স্থানে শতকরা নির্দিষ্ট সংখ্যক বাঙালী লইতেই হইবে, এমন ব্যবস্থা করা হইতে পারে। ভারত সরকার হয়ত অবগত আছেন, জামসেদপুরে টাটার কারখানায় বাঙালীর সংখ্যাধিক্যে ঈর্ষ্যান্বিত বিহার তথায় অধিক সংখ্যক বিহারী নিয়োগের নির্দেশ দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানসচিব, তাঁহার অর্থসচিবের অসুস্থতাহেতু, স্বয়ং দিল্লীতে গিয়াছিলেন, তিনি বিহারকে, উড়িষ্যাকে ও আসামকে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক লইতেই হইবে এমন বলিয়াছিলেন কি? উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সহিত তাঁহার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। তথায় যে বহু লোকের বাসের ও চাষের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। পুরীতে সমুদ্রকূলে যে বহু গৃহ—বৎসরের অধিকাংশ সময় শূন্য থাকে, সে সকল কি অস্থায়ী আশ্রয়ে পরিণত করিয়া লোককে স্থান দান করা সম্ভব নহে? উড়িষ্যার প্রধানসচিব শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব এ বিষয়ে কি বলেন?

একথা কি সত্য যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কন্ধে ন্যস্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন স্বীকার করিতেছেন, এখনও তথায় "পতিত" ভূমি রহিয়াছে, তখন সে ভূমি উঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা কিরূপে কেন্দ্রী সরকারকে অন্যত্র ভূমির ব্যবস্থা করিতে বলিতে পারেন? এ বিষয়ে আমরা বহুবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যাহা বলিয়াছি, আবার তাহাই বলিব—বহু গ্রামে যে বাস্তু উদ্বাস্তু হইয়াছে, প্রথমেই সেই সকলে লোকের বাসব্যবস্থা করিয়া তবে চাষের জমীতে হস্তক্ষেপ করা সংগত। যে জমী "পতিত" আছে, সে সকল যে অনেক স্থানে ধনী ও অতিলোভী ফাটকাবাজরা ফেলিয়া রাখিয়া "দাও" মারিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, সে কথা আমরা বলিয়াছি। তাহার প্রতিকার প্রয়োজন। কৃষির উন্নতি সাধন করিলে যে ফসলের পরিমাণ বর্ধিত করা যায়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সে দিকে যে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হইতেছে, তাহাও বলা যায় না। কলিকাতা হইতে আবর্জনা বহন করিয়া যে জল যায়, তাহাতে জমীর উর্বরতা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মে হইতে পারে। গ্লাসগো সহরে মিউনিসিপ্যালিটি আবর্জনা সারে পরিণত করিয়া বিক্রয় করেন। পশ্চিমবঙ্গে কি তাহা হয় না?

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিব বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছিলেন, লোকাভাবে তাহা ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য পুষ্করিণী সংস্কার সরবরাহ বিভাগের বিষয় নহে। কিন্তু সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ সরবরাহ সচিবের কথা যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তবে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, যে সকল স্থানে গ্রামের লোক সংঘবদ্ধ হইয়া পুষ্করিণী সংস্কারের ভার গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল সে সকল স্থানে তাঁহাদিগকে সে কাজের ভার দেওয়া হইবে কি? কয় সপ্তাহ পূর্বে আমরা ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামের বিরাট সেন দীঘির কথায় যাহা বলিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সরকার মামুলী ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে অসম্মত বা অক্ষম।

যে সকল স্থানে কংগ্রেস সমিতি আছে, সে সকল স্থানেও যে অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা আমরা ঐ বোড়াল গ্রাম হইতে প্রাপ্ত অভিযোগেই দেখিতে পাইতেছি। গত ২৮শে জুলাই ২৪ পরগণা জিলা কণ্ট্রোলার অব সিভিল সাপ্লাইজ স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীহারাণচন্দ্র নাড়ুকে লিখেন—তিনি হাওড়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ কটন মিল হইতে ৫ গাঁইট কাপড় পাইবেন। উহা আনিয়া তাঁহাকে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির তত্ত্বাবধানে বণ্টন করিতে হইবে। ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি উক্ত ব্যবসায়ীকে ১৮ই আগষ্ট পত্র লিখিয়া—কাপড় আসিয়াছে কি না, জানিতে চাহেন। যাহাতে পূজার সময় লোক কাপড় পায় সেই অভিপ্রায়ে কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক জিলা কণ্ট্রোলারকে ২রা অক্টোবর জানান, ব্যবসায়ী চেষ্টা করিয়াও ঐ কাপড় পায় নাই; তিনি যেন এবিষয়ে অবহিত হ'ন। তাহার পরে ২০শে সেপ্টেম্বর সহসা জিলা কণ্ট্রোলার কংগ্রেস কমিটিকে অবজ্ঞা করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানাইয়াছেন, গ্রামে হারাণচন্দ্র নাড়ু, মীর নকড়ি ও শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই ৩ জনকে মোট ৪ গাঁইট কাপড় বিক্রয় করিতে দেওয়া হইল। প্রথম পত্রে ও শেষ পত্রে সামঞ্জস্য নাই; বিশেষ কি কারণে কংগ্রেস কমিটিকে পদদলিত করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতিকে আদর করা হইল, তাহা কে বলিতে পারে?

পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদিগকে আশ্রয়দান প্রসঙ্গে আমরা বিহারের ও উড়িষ্যার কথা বলিয়াছি, আসামের কথা বলি নাই। তাহার কারণ, আসামে বাঙালীর সংখ্যা অল্প না হইলেও এবং আসামে অসমীয়ারা স্বতন্ত্র ভাবে সংখ্যায় অধিক না হইলেও রাজনীতিক ক্ষমতা-লাভ করিয়া বাঙালীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা নূতন বলিয়াই অধিক প্রবল। সেই অত্যাচারে বাঙালীর সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালীর অধিকার রক্ষা করিবার জন্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতিতে স্বতন্ত্র পূর্বাচল প্রদেশ গঠনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত প্রদেশ সম্বন্ধে আমরা আজ দীর্ঘ আলোচনা করিব না। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত অঞ্চল লইয়া পূর্বাচল প্রদেশ গঠিত হইতে পারে:—

	বর্গমাইল	লোক সংখ্যা
কাছাড়	৪৭১৯	১০,২৭,০৬৪
লুসাই পাহাড়	৮১৪২	১,৫২,৭৮৬
মণিপুর রাজ্য	৮৩২০	৫,১২,০৬৯
ত্রিপুরা রাজ্য	৪০৪৯	৩,৪৭,৭৫২
মোট	২৫,৫৩০	২২,০৪,৯২৯

এইরূপে গঠিত হইলে প্রদেশে—

হিন্দুর সংখ্যা	১৬,১৬,৮০৫
মুসলমানের সংখ্যা	৫,৮,১২৪

হইবে।

বিস্তার হিসাবে অন্য কয়টি প্রদেশ এইরূপ—

হিমাচল	১১,২৫৪	বর্গমাইল
আজমীর-মারোয়ার	২,৪০০	"
কুর্গ	১,৫৯৩	"
দিল্লী	৫৭৪	"
মৎস্য	৭,৫৩৬	"
বিন্ধ্য	২৪,৬১০	"
কচ্ছ	৪,৪৬১	"

পূর্বাচল ৩ ভাবে গঠিত হইতে পারে। সে আলোচনা আমরা করিব না।

অসমীয়া ভাষা বহুদিনের নহে এবং তাহার সাহিত্য উল্লেখযোগ্য নহে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বা ঐরূপ সময়ে আসামের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট গুণাভিরাম বড়ুয়া কলিকাতায় আসিয়া বহু-লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া এই ভাষাকে ভাবপ্রকাশক্ষম করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার এক পুত্র বাঙালী পরিবারে এবং তাঁহার বিধবা কন্যা বাঙালী অধ্যাপক ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্তমানে আসামে অসমীয়া ভাষা অধিক চলিত নহে। তথায় বাঙলা ব্যতীত অন্যান্য ভাষাও ব্যবহৃত হয়। কাজেই বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলে অসমীয়া ভাষা প্রচলিত করিবার কোন অধিকার অসমীয়াদিগের নাই। তাহা—"using the arm of political injustice" ব্যতীত আর কিছুই হইবে না।

অল্পদিনের মধ্যে বার বার আসামে বাঙালীরা আক্রান্ত, আহত ও নিহত হইয়াছেন। বাঙালীর দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে—যে সকল সাইন বোর্ডে বাঙলা অক্ষর ছিল, সে সকল নষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে এমন কি দুর্গা প্রতিমায় দেবীকে 'মেখলা' পরাইবার জন্য জিদ করাও হইয়াছে—ইত্যাদি।

কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন নীতিই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আমরা অবশ্যই বলিব যে, কংগ্রেসের স্বীকৃত নীতির মূল্য কংগ্রেসের যে-কোন নেতার মতের মূল্যের তুলনায় অত্যন্ত অধিক। সম্প্রতি শ্রী বি জি খের বলিয়াছেন, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনে আর বিলম্ব করা সংগত নহে।

পশ্চিমবঙ্গে তাল গাছের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু তালের রস কেবল তাড়ী করিবার জনাই ব্যবহৃত হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্বে লোককে মাদক দ্রব্য বর্জন করাইবার আগ্রহে কোন কোন স্থানে তাল গাছ কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। তাহাতে যে কাষ্ঠের অভাব হয় এবং অন্য ক্ষতিও হয়, তাহা অনেকে বিবেচনা করেন নাই। তাল কাঠে ঘরের কড়ি হয়—কচি তালের 'শাঁস' বাহির করিয়া লইয়া তাহার উপরের অংশ পশুখাদ্য-রূপে ব্যবহৃত হয়, 'শাঁস' বিক্রীত হয়। সে যাহাই হউক, তালের রস হইতে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত বন্ধ করিয়া তাহা হইতে গুড় উৎপাদনের চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন করিতেছেন না? মাদকদ্রব্য ব্যবহারে লোককে বিরত করিবার ও সঙ্গে সঙ্গে লোকের খাদ্য বৃদ্ধির এই উপায়ে আমরা সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে নারিকেল গাছের চাষের কথা শুনা গিয়াছিল। কিন্তু সে বিষয়ে সরকার যে মনোযোগ দিতেছেন, এমন মনে হয় না। অথচ পশ্চিমবঙ্গকে নারিকেল তেলের জন্য সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রদেশের ও দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়—নারিকেলের দড়িও আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাহির হইতে আনাইয়া ব্যবহার করি। সে দড়ির ব্যবহারও অল্প নহে। আজকাল ভারতবর্ষ (মাদ্রাজ) হইতে নারিকেল দড়ির সতরঞ্চ আমেরিকায় রপ্তানি হইতেছে। মাদ্রাজের কোন কোন স্থানে ইহা প্রস্তুত করিবার বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও তাহা হইতে পারে। কিন্তু সে দিকে যে কৃষি ও শিল্প বিভাগদ্বয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, এমন কোন প্রমাণ দেশের লোক পাইতেছে না।

মানভূম জিলা বঙ্গভাষাভাষী। কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি অনুসারে তাহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন করার 'অপরাধে' আনরার শ্রীনীরদবরণ রায়ের দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা আছে এই অছিলায় বিহার সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে—কেন তিনি শান্তিপূর্ণভাবে থাকিবার জন্য মুচলেকা দিতে বাধ্য হইবেন না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৭ ধারা বলে তাঁহাকে মামলা সোপর্দ করেন। নীরদবাবু তাঁহার জবাবে বলেন, তিনি মনে করেন যে, মানভূম জিলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত এবং সে বিষয়ে আলোচনা করা আইন-বিরুদ্ধ নহে। আদালতে মামলার শুনানীর পরে মামলা বাতিল হইয়াছে। বিহার সরকার বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার জন্য আন্দোলনকারীদিগের প্রতি খরদৃষ্টি রাখিবার জন্য যে 'গোপনীয়' নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহা যে অসংগত আদালতে সে কথা বলিবার সাহসও তাঁহাদিগের হয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে বিনা অপরাধে মামলা সোপর্দ করিয়া নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে, সেজন্য কি বিহার সরকারকে ক্ষতি-পূরণ করিতে বাধ্য করা যায় না?

বিহার সরকারের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত—

(১) বাংলা বনাম হিন্দী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় রঘুনাথপুরের কয়জন ছাত্রকে পুলিশ গত ১৯শে অক্টোবর গ্রেপ্তার করে—মহকুমা হাকিম পরদিন তাহাদিগকে জামিনে মুক্তিদানের নির্দেশ দিলেও ২৩শে অক্টোবরের পূর্বে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন নাই। ইহার জন্য কে দায়ী?

(২) ডেপুটি কমিশনারের বিনানুমতিতে ছাত্রদিগের শিক্ষাশিবির উদ্বোধন করায় শ্রীজওহরলাল বসু, শ্রীপবনচন্দ্র দাস, শ্রীমিহির কুমার চট্টরাজ ও শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য মামলা সোপর্দ হইয়াছেন। আর ৪ জন বাঙালীকে বিনানুমতিতে সভা করার 'অপরাধে' মামলা সোপর্দ করা হইয়াছে।

অবশ্য যাঁহারা লাঞ্ছিত, তাঁহাদিগের বিশেষ অপরাধ—তাঁহারা বাঙালী।

মৌলানা হোসেন আমেদ মাদানী নিখিল ভারত জমিয়ৎ-উল-উলেমার সভাপতি। তিনি সম্প্রতি আসামে গিয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া পূর্ব পাকিস্থানে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগের প্রতি সরকারের দুর্ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। তিনি আসাম-পূর্ববঙ্গ সীমান্তে করিমগঞ্জ প্রভৃতি নানাস্থানে সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যাহাতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ নদী পার হইয়া সে সকল সভায় যাইতে না পারেন, সেজন্য সতর্ক পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, জাতীয়তাবাদী—এই "অপরাধে" পূর্ব পাকিস্থানে মুসলমানরা লাঞ্ছিত, প্রহৃত ও কারারুদ্ধ হইতেছেন। মৌলবী বসির আমেদকে কারাগারে এমন প্রহার করা হইয়াছিল যে, প্রহার ফলে ৪।৫ দিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীহট্টে মুজ্জামিল মিঞা ও মৌলবী আব্দুল করিমকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; আরও গ্রেপ্তার চলিতেছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করাও হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, পাকিস্থানে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকে সরকার যেরূপে লাঞ্ছিত করিতেছেন, তাহাও হিন্দুদিগের পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগের অন্যতম কারণ। হিন্দুরা স্বভাবতঃই মনে করিতেছেন, যখন মুসলমানরাও জাতীয়তাবাদী বলিয়া সরকার কর্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছেন, তখন হিন্দুদিগকে কিরূপ ব্যবহার ভোগ করিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই পূর্বাহ্নে সতর্ক হইয়া পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করা তাঁহারা সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হিন্দুদিগের এইরূপ মনোভাব একান্ত স্বাভাবিক।

দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বস্ত্র বণ্টন লইয়া কোন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা আবার এক নূতন নির্দেশ প্রচার করিয়াছেন। তবে তাহাতে পুনরুক্তি করিয়াছেন, ১লা ডিসেম্বর হইতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হইবেই। তাহার মধ্যে কি তাঁহাদিগের পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোকিওরমেণ্ট অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন সোসাইটি" কল হইতে কাপড় আনিবার আবশ্যক আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন? এই সোসাইটির অংশীদার কাহারা এবং তাঁহাদিগের এই কাজে অভিজ্ঞতা কিরূপ?

কলিকাতার কেন্দ্রী টেলিফোন অফিসে অগ্নিকাণ্ডের পরেই যে সকল টেলিফোন অফিসে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, অগ্নিকাণ্ড কেনরূপ ষড়যন্ত্রের ফল—এইরূপ সন্দেহ সরকারের ছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, বজবজ পর্যন্ত টেলিফোনের যে তার (মৃত্তিকার নিম্নে) গিয়াছে, তাহারও কতকাংশ নষ্ট করা হইয়াছে। ইহা যে কোন অনিষ্টকারীর কাজ তাহতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

অদৃষ্টের কাহিনী বলতে সুরু করবে। আহার ও শয্যার জন্য অর্থ ভিক্ষা চাইবে। লোকটি পাৎলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল, তার কালো চোখে আমোদের দৃষ্টি। শুভ্র দাঁতগুলি বার করে বলে ঃ "আমাকে মনে নেই, ভুলে গেছ?"

"আমি ত বাপু জীবনে তোমাকে দেখিনি।"

আমি ত কুড়ি ফ্রাঁ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমাকে ও চেনে বলে ধাপ্পা দিয়ে যাবে তা হতে দেব না।

লোকটি বলল ঃ "আমি লারী।"

"গুড্ গড্, হা ভগবান! বস, বস।"

সে মুখ টিপে হেসে, তারপর আর এক পা এগিয়ে এসে আমার টেবলের ধারে এক শূন্য চেয়ারে বসল।

আমি ওয়েটারকে ইঙ্গিতে ডেকে ওকে প্রশ্ন করলাম—"একটু মদ্য পান করা যাক।" তারপর বললাম, "ওই দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের ভিতর থেকে কি করে তোমাকে চিনে ফেলব আশা কর?"

ওয়েটার আসতে লারী একটা 'অরেঞ্জেড' অর্ডার দিল। এখন ওর মুখের পানে তাকিয়ে চোখের সেই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম, ঘন কৃষ্ণ ভ্রূর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, চোখের তারার চাইতেও কালো, সেই দিকে তাকিয়ে তার গভীরতা ও স্বচ্ছতা উপলব্ধি করলাম।

প্রশ্ন করলাম—"প্যারীতে কতদিন এসেছ?"

"প্রায় এক মাস।"

"থাকবে নাকি এখন?"

"কিছুদিন অন্তত থাকবো।"

এই সব প্রশ্ন করার সময় আমার মন কিন্তু ব্যস্ত ছিল।

লক্ষ্য করলাম, ওর ট্রাউজারের পায়ের দিকটা ছিঁড়ে গেছে. কোটের কনুইয়ে গর্ত দেখা যাচ্ছে, পূর্বাঞ্চলের বন্দরে যেসব হতভাগাদের দেখা যায়, তার চাইতেও বেন খারাপ। তৎকালে বাজারের অবস্থা বিস্মৃত হওয়া কঠিন ছিল, তাই ভাবলাম হয়ত ঊনত্রিশ খৃষ্টাব্দের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ও ফতুর হয়ে গেছে। এই চিন্তাটা আমার ভালো লাগল না, তাই লুকোছাপা না করে সোজা-সুজি প্রশ্ন করলাম—

"তুমি দেউলিয়া হয়ে গেছ নাকি?"

"না, আমি ত ঠিকই আছি, একথা আপনার মনে হল কেন?"

"তোমাকে দেখে মনে হয়, কোন রকমে একবেলা আহারেই তোমার চলে যায়, আর পোষাক-পরিচ্ছদ ত আবর্জনা-স্তূপে ফেলে দেবার মত হয়েছে।"

"তাই নাকি। এতই খারাপ হয়ে উঠেছে? আমি এসব কোনদিন কিন্তু ভাবিনি। সত্যি কথা বলতে কি, দু-একটা জিনিসপত্রের দরকার বোধ করছি—কিন্তু সংগ্রহ করে উঠতে পারছি না।"

মনে মনে ভাবলাম, ও লাজুক এবং দাম্ভিক, এ ধরণের নির্বুদ্ধিতা আমি কেন সহ্য করব বললাম ঃ

"লারী - নির্বোধের মত কথা বোলো না, আমি লাখপতি না হলেও দরিদ্র নই, তোমার যদি টাকার অভাব থাকে, তাহলে আমি তোমাকে দু-চার হাজার ফ্রাঁ ধার দিতে পারি, তাতে আমি ফতুর হয়ে যাবো না।"

লারী হেসে উঠল।

"অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু আমার টাকার অভাব নেই, আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আছে।"

"অর্থনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও।"

"ও, তাতে আমার কিছুই হয়নি, আমার যা কিছু সবই গভর্নমেণ্ট-বণ্ড কেনা ছিল, তার দাম কমেছিল কিনা, জানি না, অনুসন্ধানও করি নি, তবে জানতাম, আমাদের 'শ্যাম চাচা' ভদ্রলোকের মতই টাকা দিয়ে গেছেন। আসলে কি জানেন, গত কয়েক বছর ধরে আমি এতই কম খরচ করেছি যে, নিশ্চয়ই বেশ কিছু টাকা আমার জমেছে।"

"তাহলে এখন কোথা থেকে আসছ?"

"ভারতবর্ষ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে, ঐখানে গেছ, ইসাবেল আমাকে বলেছিল। সে তোমার শিকাগোর ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারকে নাকি জানে।"

"ইসাবেল? তার সঙ্গে কবে আপনার দেখা হল?"

"গত কাল।"

"সে কি প্যারীতে আছে নাকি?"

"হ্যাঁ, প্যারীতেই আছে, এলিয়ট টেম্পলটনের বাসায় আছে।"

"বা চমৎকার! ওর সঙ্গে দেখা হলে বেশ হবে।"

যদিও অতি তীক্ষ্ণভাবে ওর চোখের পানে তাকিয়েছিলাম, এই মন্তব্য শোনার সময়ে, তবু আমি ওর চোখে স্বাভাবিক বিস্ময় ও কৌতূহলের অধিক অন্য কিছু লক্ষ্য করলাম না।

"গ্রে-ও আছে, জানো ত ওদের বিবাহ হয়েছে।"

"হ্যাঁ বব খুড়ো, ডাঃ নেলসন, আমার যিনি অভিভাবক ছিলেন, তিনিই চিঠিতে জানিয়েছিলেন—তিনিও কয়েক বছর আগে মারা গেছেন।"

আমার মনে হল, ডাঃ নেলসনের মৃত্যুর সঙ্গেই শিকাগো এবং সেখানকার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে লারীর শেষ যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সে আর সেখানকার সংবাদ কিছুই রাখে না। আমি তাকে ইসাবেলের দুটি কন্যার জন্মকথা, হেনরী মাতুরিন ও লুইসা ব্রাডলির মৃত্যু-কথা, গ্রের সর্বস্বান্ত হওয়ার বিবরণ ও এলিয়টের মহানুভবতার কথা বলে গেলাম।

"এলিয়টও কি এখানে আছে নাকি?"

"না।"

গত চল্লিশ বছরের ভিতর এই সর্বপ্রথম এলিয়ট প্যারীতে বসন্ত যাপন করল না। অপেক্ষাকৃত তরুণ দেখালেও তার বয়স এখন সত্তর, আর এই বয়সের লোকের মতই মাঝে মাঝে সে ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এক শুধু বেড়ানোর ব্যায়াম ছাড়া সব সে ছেড়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কেও একটু নার্ভাস, তাই সপ্তাহে দুবার ডাক্তার এসে পরীক্ষা করেন, আর একটির পর আরেকটি নিতম্বে তৎকালীন ফ্যাশনের একটি ওষুধ ইঞ্জেকশন করে যান। প্রতি আহারের শেষে সে পকেট থেকে একটি সোনার ছোট বাক্স বার করে তার ভিতর থেকে একটি বড়ি নিয়ে গিলে ফেলত, কার্যটি এমন নিষ্ঠার সঙ্গে করত যেন কোন ধর্মাচরণ পালন করছে। ইতালীর উত্তরাঞ্চলে জলময় প্রদেশ 'মণ্টি-চার্টিনি'তে যেতে ওর ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়ে ছিলেন, এর পর ভেনিসে গিয়ে ওর সেই রোমান গির্জার উপযোগী একটা প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনার সন্ধান করবে। প্যারীতে পদার্পণ না করার জন্য ওর তেমন অনিচ্ছা এবার ছিল না, কারণ ওর মনে হত, প্যারী ক্রমশ সামাজিক দিক থেকে অসার্থক হয়ে উঠছে। বৃদ্ধদের ও মোটেই পছন্দ করত না, আর কোথাও শুধু সমবয়সীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হলে ও তাতে আপত্তি জানাতো। তরুণদের কেমন জলো মনে হত। যে-চার্চটি ও তৈরি করেছে, তাকে অলঙ্কৃত করাই এখন ওর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে—শিল্প-দ্রব্য কেনার যে দুর্দমনীয় কামনা ওর ছিল, তা এখন দেব-সেবার জন্য করছে এই আশ্বাস ওর আছে। রোমে প্রাচীনকালের এক মধু-রঙের পাথরের বেদী সংগ্রহ করেছে—আর তার ওপর রাখার জন্য ছ' মাস ফ্লোরেন্সে বসে সীয়েনস পদ্ধতির একটি ত্রি-ভাগা ছবির জন্য চেষ্টা করেছে।

অতঃপর লারী জানতে চাইল গ্রের প্যারী কেমন লাগছে।

"আমার ত মনে হয়, এখানে ওর তেমন মন লাগছে না।"

গ্রেকে কেমন লেগেছে, সেকথা বলার চেষ্টা করছিলাম, ও আমার মুখের পানে চোখ রেখে বেশ ভাবাকুল নয়নে তাকিয়েছিল—তার সেই নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার কেমন মনে হল, ও কান দিয়ে শুনছে না—কোন একটা অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় যা অধিকতর সক্রিয়, তার সাহায্যেই শুনছে। কেমন অদ্ভুত অথচ তেমন সুবিধার নয়।

আমি বললাম—"তবে তুমি স্বচক্ষেই দেখবে।"

"হ্যাঁ, ওদের দেখবার ভারি বাসনা আমার, টেলিফোনের বইয়ে বোধ হয় ওদের ঠিকানা পাওয়া যাবে।"

"তবে যদি ওদের অবাক্ করতে, আর ছোটদের ভয় দেখাতে না চাও, তাহলে চুল ছেঁটে ও দাড়ি কামিয়ে যেও।"

লারী হাসল।

"আমিও সেকথা ভাবছিলাম। নিজেকে চিহ্নিত করে তোলার আমার বাসনা নেই।"

"তাহলে এসব যদি করো, তবে সেই সংগে পোষাকটাও নতুন করে নিও।"

"আমার মনে হয়, আমি একটু নোংরা হয়ে পড়েছি। যখন ভারতবর্ষ ছাড়ি, তখন দেখি, যা পরে আছি, তাছাড়া আর পোষাক নেই।"

আমার স্যুটের দিকে তাকিয়ে লারী জানতে চাইল, কে আমার দর্জী। তাকে সেকথা জানালাম, তবে একথাও বললাম যে, তারা লণ্ডনের লোক, বিশেষ কাজে আসবে না।

আমরা এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করলাম, ও পুনরায় গ্রে ও ইসাবেলের কথা বলতে লাগল।

আমি বললাম—"আমি ওদের দেখাশোনা করি, উভয়ে খুব সুখী হয়েছে, গ্রে'র সংগে অবশ্য একা কথা কইবার সুযোগ হয়নি, তবু ভাবে মনে হয়—সে ইসাবেলের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। ওর মুখ কিঞ্চিৎ স্ফীত, চোখ দুটি ক্লান্ত, কিন্তু যখন ইসাবেলের পানে তাকায়, তখন সে-চোখে একটা সৌম্য ও করুণ ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ-দৃশ্য অন্তর স্পর্শ করে। আমার ধারণা, এই বিপদের সময় ইসাবেল পাহাড়ের মত অটল হয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই ওর ঋণ গ্রে ভুলতে পারে না। দেখবে ইসাবেলের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।"

ওকে বললাম না যে, ইসাবেল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী হয়ে উঠেছে। আমার ধারণা যে, অতীতের কিশোরী কুমারী কি আশ্চর্য-ভাবে নারীত্বের অপূর্ব মর্যাদায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে, তা লক্ষ্য করার শক্তি হয়ত ওর আছে। এমন অনেক লোক আছে, যারা রমণী-দেহের সৌন্দর্যবর্ধক নানাবিধ প্রসাধন-দ্রব্যে ধাঁধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আমি বললাম—ইসাবেল গ্রে'র প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য সে অসীম চেষ্টা করছে।

দেরি হয়ে যাচ্ছিল—আমি লারীকে বললাম বুলভার্দে এসে আমার সংগে একত্রে ডিনার খাবে কিনা।

সে জবাবে বলল, "না, আমার তেমন দরকার নেই, আমাকে এখন যেতে হয়।"

সে উঠে পড়ল, বন্ধুভাবে মাথা নাড়ল—তারপর পথে নেমে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

অর্ঘ্য

গ্যাব্রিয়েল দ্য আনুৎসিও

সেন্ট গণ্‌সেল্‌ভোর বার্ষিক মহোৎসব। ইতালীর মাস্‌কালিকো জনপদের প্রতি নরনারী এই উৎসবে যোগ দেয়। সমারোহ ব্যাপার। আনন্দের বন্যা ব'য়ে যায় নগরে। পতাকায় আর ফুলের মালায় প্রতি তোরণ-দ্বার সজ্জিত হয়। প্রতি গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট আর সজ্জা।

এই নগরের অধিষ্ঠাতা দেবতা সেন্ট গণ্‌সেল্‌ভো। প্রবাদ আছে যে, পুরাকালে এই দেবতার কৃপায় এক প্রবল শত্রুর নৃশংস আক্রমণ থেকে আশ্চর্যরূপে এই নগরী রক্ষা পেয়েছে। আজকের দিনে তারই বিজয়োৎসব।

গির্জার আছে সেন্ট গণ্‌সেল্‌ভোর বিরাট পাথরের মূর্তি। সেই মূর্তিকে আজ বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে নগরের মাঝখানে বিশেষভাবে তৈরী-করা পূজামণ্ডপে। সেখানে সারাদিন পূজো-অর্চনা আর আনন্দমেলার উৎসব চলবে।

বিশাল মহীরূহের মতো বিপুলভার সেই মূর্তিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। নগরের আটজন শ্রেষ্ঠ বলশালী বীরের উপর অর্পিত হয়েছে সেই গুরুদায়িত্ব।

* * *

গির্জার সামনে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা অপেক্ষা করছে। বাজনা বাজছে। কোলাহল আর উত্তেজনার অন্ত নেই।

"সর, সর, রাস্তা দাও। বাহকেরা আসছে।"

উত্তেজিত জনতা স'রে দাঁড়ালো। তাদের মাঝখান দিয়ে আটজন বাহক ধীরপদক্ষেপে গির্জার দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের সুগঠিত বলিষ্ঠ শরীরের দিকে প্রশংসমান নরনারীর দৃষ্টি। খর তাদের চোখের দৃষ্টি, মুখে সৌম্য হাসি, সারা অবয়বে শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

প্রধান পুরোহিত হাঁক দিলেন—"সব প্রস্তুত, এগিয়ে এসো তোমরা।"

শান্ত পদক্ষেপে বাহক আটজন মর্মর-মূর্তির সামনে এগিয়ে গেল। পুরোহিত তাদের মাথায় শান্তিজল ক্ষেপণ করলেন।

বাজনা বেজে উঠ্‌লো জোরে।

"জয়, সেন্ট গন্‌সেল্‌ভোর জয়।"

নগর-দেবতার জয়ধ্বনিতে আকাশ প্রকম্পিত হ'ল।

বাহকদের মধ্যে একজনের নাম উমালিদো। সে-ই এদের নায়ক। সামনের দিকে দক্ষিণ ধারে তার স্থান।

"ওঠাও।" আদেশ দিলেন পুরোহিত।

"ওঠাও।" হাঁক দিলে উমালিদো।

অস্ফুট শব্দ ক'রে বাহক আটজন মূর্তির তলদেশে-বাঁধা-কাঠের-তক্তার আটদিক ধ'রে মূর্তিকে কাঁধের উপর তোলবার চেষ্টায় নিয়োজিত হ'ল।

পাহাড়ের ভার নিয়ে দেবমূর্তি যেন স্তব্ধ হ'য়ে আছে। উমালিদো আবার হাঁক পাড়লে—"আরও জোরে, ভাই সব। জয় সেন্ট গণ্‌সেল্‌ভো।"

"উঠেছে, উঠেছে।" গুঞ্জন উঠ্‌লো চারিদিকে। "দেবতা উঠেছে।"

অকস্মাৎ কী যেন হ'ল। কারুর পা বুঝি টল্‌লো।

"সামাল, সামাল।"

"গেল, গেল, গেল।"

"সর্বনাশ, সর, সর।"

মূর্তি হেলে পড়েছে। সাবধান! গেল বুঝি উমালিদোর ঠিক পিছন দিকে যে-দুজন বাহক ছিল, তারা ভার সামলাতে না পেরে কিছুটা কাৎ হয়ে পড়েছে। তাই এই বিপর্যয়।

উমালিদো প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—"সামাল।"

কিন্তু ততক্ষণে মূর্তি হেলে পড়েছে উমালিদোর দিকে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে উমালিদো মূর্তিকে ধ'রে রাখলে।

বিহ্বল স্তব্ধতায় কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে মূর্তিকে বেদীর উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল।

উমালিদোর জীবন-তুচ্ছ-করা চেষ্টায় মূর্তি পড়ে গেল না বটে, কিন্তু দেবতাকে যখন পতন থেকে রক্ষা করে বেদীর উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল তখন দেখা গেল, উমালিদোর ডান হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত মূর্তির নীচে চাপা পড়ে গেছে।

আশে-পাশের জনতা হায় হায় ক'রে উঠ্‌লো। কী হল, কী হল। রব উঠ্‌লো চারিদিকে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে উমালিদো। তার ডান হাতখানা যেখানে চাপা ড়েছে, সেখানে চাপ চাপ রক্ত জমাট বাঁধছে। বন্ধ পর্যন্ত হাতখানা পিষে, গুঁড়িয়ে ব্বারে চ্যাপ্টা কাগজ হ'য়ে গেছে।

জনতা সখেদে চীৎকার করছে। উমালিদো স্থির অচঞ্চল। শুধু তার দুই চোখে কাতর বেদনার অস্ফুট আভাস।

উমালিদোকে মুক্ত করবার জন্যে তার সঙ্গীরা আবার সমবেত চেষ্টায় মূর্তিকে তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করল। দেবতা উঠ্‌লো ধীরে ধীরে। উমালিদো তার রক্তাক্ত নিষ্পেষিত হাতখানা সরিয়ে নিলে। সে-দৃশ্য দেখে মেয়েরা আর্তনাদ ক'রে চোখ বুজলো।

"বাড়ি যাও, উমালিদো।"

"ডাক্তারের কাছে চল।"

সান্ত্বনা দিল অনেকে। অনেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। একটি মহিলা তাঁর ওড়না খুলে দিলেন হাত বাঁধবার জন্যে।

এদিকে উমালিদোর স্থানে কে বাহক হবে তারই জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

"এবার আমার পালা।"

"না, ওর পরেই ছিল আমার পালা।"

"না, না, আমি বহন করব দেবতাকে।"

তিন চারজনের মধ্যে রীতিমত বচসা সুরু হোয়ে গেছে।

* * *

বাঁ-হাত দিয়ে জনতাকে সরিয়ে উমালিদো এগিয়ে গেল। বিক্ষত মনিবন্ধটা ঝুলে পড়েছে। রক্ত জমে জমে সমস্ত ক্ষতস্থানটা কালো হোয়ে গেছে।

নিষ্কম্প কণ্ঠে উমালিদো বললে—"কারুর পালা নয়। আমার পালা আমিই সাঙ্গ করব।"

হতবাক সকলে। পাগল হল নাকি উমালিদো? এই অবস্থায় মূর্তি বহন করবে সে?

ঘাড় নেড়ে উমালিদো জানালো, হ্যাঁ, সে-ই বহন করবে এবং কথা শেষ করে সে পুনরায় নিজের স্থানে গিয়ে অন্য বাহকদের সঙ্গে কাঁধ দিলে।

* * *

বিরাট শোভাযাত্রার আগে আগে মূর্তি কাঁধে নিয়ে বাহকেরা চলেছে সতর্ক পদ-বিক্ষেপে। বাজনার ছন্দে তাদের পা পড়ছে। বুকের মাংসপেশী তারই তালে তালে ওঠা-নামা করছে।

"উমালিদো, কেমন বোধ করছ?"

পিছন থেকে সঙ্গী প্রশ্ন করল। উত্তর দিলে না উমালিদো। শুধু ঘাড় নাড়লো। তার দুই চোখে ধীরে ধীরে যেন অন্ধকার নেমে আসছে। পারবে নাকি সে তার যাত্রা সাঙ্গ করতে, পূজামণ্ডপে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে?

পথের বাঁকে মোড় ঘুরতে গিয়ে উমালিদোর পা টলে গেল। নাঃ! আর তো পারা যায় না! শেষে কি অন্য সঙ্গীদেরও বিপদ ঘটাবে সে? তার সংকেতে বাহকেরা থামলো। সে আর পারছে না, অন্য কেউ আসুক, জানালো উমালিদো।

বলা মাত্র ছুটে এলো অন্যজন। উমালিদো সাবধানে সরে দাঁড়ালো। নবাগত বাহক তার স্থান গ্রহণ করল। শোভাযাত্রা আবার অগ্রসর হল।

উমালিদো আর দাঁড়াতে পারলে না। ধীরে ধীরে রাস্তার ধারে বসে পড়ল। কাঁধ থেকে গুরুভার সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষে উবে গেছে। দুই চোখে অতল অন্ধকার।

* * *

অদূরে পূজামণ্ডপে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। দেবতা বোধ হয় সিংহাসনে বসলেন। বাজনা বাজছে। পূজার বাজনা।

"আহা, উমালিদো, তুমি এখনো এখানে বসে আছ? বাড়ি যাও। ডাক্তার দেখাও। আহা, হাতখানা একেবারে গেছে।"

সমবেদনা জানিয়ে সবাই চলে গেল। পূজার লগ্ন বয়ে যায়। উৎসব সুরু হয়েছে। সকলে পূজামণ্ডপের দিকে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। উমালিদোর দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই কারো।

হাতখানা সত্যিই একেবারে গেছে। এই ডান হাত দিয়ে সে এতদিন জীবিকা অর্জন করেছে। সুদক্ষ কারিগর সে। ডান হাতেই তার যা-কিছু কাজ। সেই ডান হাত আর নেই। আঘাতের বেদনার চেয়ে উমালিদোর বুকে ঘনিয়ে উঠলো অবসাদ আর হতাশা। সে পঙ্গু হয়ে গেল। ব্যর্থ তার ভবিষ্যৎ।

কোমরে গোঁজা ছিল তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। বাঁ-হাতে সেই ছুরি বার করে নিয়ে উমালিদো উঠে দাঁড়ালো। তার পা টলছে। মাথা ঘুরছে। দাঁড়াতে পারছে না সে। কিন্তু তবুও তাকে যেতে হবে পূজামণ্ডপে। প্রতি নাগরিক আজ অর্ঘ দেবে দেবতাকে। শুধু সে-ই কি দেবে না কিছুই?

পূজার অঙ্গন ধূসর হোয়ে উঠেছে ধূপের ধোঁয়ায়। পুরোহিত পূজায় বসেছেন। প্রকাণ্ড বেদীর সামনে নানাবিধ অর্ঘ্য, উপহার আর উপচার।

ধীরে ধীরে উমালিদো বেদীর সামনে এগিয়ে গেল। জনতার দৃষ্টি পড়ল তার উপর।

"উমালিদো এসেছে। উমালিদো।"

কিন্তু এ কী করছে সে? ছুরি কেন বাঁ-হাতে? এ কি! এ কি! ছুরি দিয়ে সে তার ডান হাতখানা কেটে ফেলছে! চারিদিকে তুমুল গুঞ্জনধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

ডান হাতখানা বেদীর উপর স্থাপন করে বাঁ-হাতে ক্ষুরধার ছুরিকা ধরে উমালিদো তার ডান হাতের কনুই-এর নীচে সেই ছুরির ফলা বসিয়ে দিলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো! নির্বিকার উমালিদো। পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে ডান হাতখানাকে সে দ্বিখণ্ডিত করলে, তারপর বাঁ-হাতে সেই খণ্ডিত হাতের অংশটিকে বেদীর উপর স্থাপন করে আর্তকণ্ঠে উমালিদো বললে —"দেবতা! এই আমার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ তোমাকে দিলাম।"

—অনুবাদক, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের কথা

হিরোশিমা

শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন

হিরোশিমার একটি শহরতলী, কয়ই।
৬ই অগাস্ট, ১৯৪৫ সাল।

কুমারি তোশিকো শাশাকি সকাল তিনটেয় (জাপানী সময়) ঘুম থেকে উঠেছে, অফিস যাবার আগে অনেক গৃহস্থালী কাজ করতে হবে। ইস্ট এশিয়া টিন ওয়ার্কসে সে কেরানির কাজ করে, কর্মচারীদের ছুটি ও বদলীর হিসেব রাখে। তার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। তার এক বছরের ছোট্ট ভাই আকিও গেছে হাসপাতালে, তার খুব অসুখ। হাসপাতালে সংগে তার মাও আছে। এদের দুজনেরই পথ্য ও খাবার তৈরী করে পাঠাতে হবে। আজকাল যুদ্ধের বাজার, হাসপাতালে ঠিক মতো খাবার পথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। বাড়িতে আরও একটি ভাই, বোন ও বাবা আছে, তাদের সকালের খাবার তৈরী করে দিতে হবে। বাবা এক কারখানায় কাজ করেন, তাঁর সংগে নিয়ে যাবার জন্য আলাদা খাবার তৈরী করে সংগে গুছিয়ে দিতে হবে। এই সব কাজকর্ম সেরে তোশিকো শাশাকি অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হল। তখন সকাল সাতটা।

কয়ই থেকে হিরোশিমার যেখানে তার অফিস, সেখানে পেঁাছতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। এই অঞ্চলের নাম ক্যানন-ম্যাচি। কুমারি তোশিকো অফিসে এসে খবর পেল যে, গতদিন তাদের একজন ভূতপূর্ব কর্মী, বর্তমানে নৌ-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, চলন্ত ট্রেনের সম্মুখে নিজের দেহ নিক্ষেপ করে হারাকিরি করেছে। তার এই গৌরবময় মৃত্যুর জন্য বেলা দশটায় একটি স্মৃতিসভা হবে। তোশিকো তার কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে একটি বড় হল ঘরে সভার আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখল। তারপর সে

আইনস্টাইন ও বৈজ্ঞানিক ই, ফিলিপস্ ওপেনহাইমার, অনেকে বলেন ইনিই অ্যাটম বোমা প্রস্তুত করেছেন।
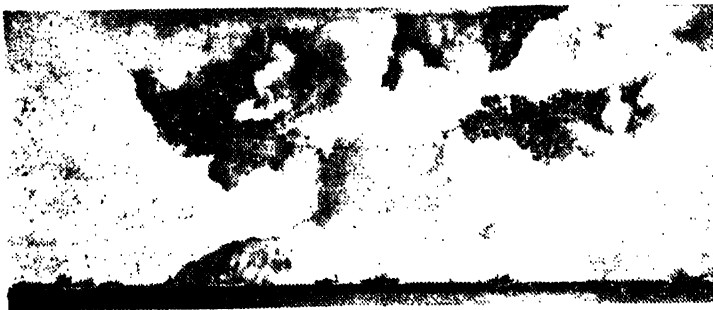
অ্যাটম বোমা ফাটার পরের দৃশ্য

তার নিজের আসনে কাজ করবার জন্য ফিরে গেল। তার আসন জানালা থেকে কিছু দূরে। অল্প কিছু কাজ করে তার দক্ষিণে জানালার বিপরীত দিকে তার সহকর্মীর সংগে কিছু কথা বলতে যেই উদ্যত হয়েছে অমনি সমস্ত ঘরটা হঠাৎ যেন এক মহাদ্যুতিতে আলোকিত হয়ে উঠল। সেই আলোর তীব্রতায় তোশিকো কয়েক মুহূর্ত ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে স্থানুর মতো চেয়ারে বসে রইল। ঠিক তারপর কি হল তার সঠিক মনে নেই। তার এইটুকু মনে আছে যে, তাদের অফিস বাড়ির ওপরের কাঠের ছাদ যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

সে ছিটকে একদিকে যেয়ে পড়ল। কোথা থেকে একটা বই ভরা আলমারী যেন উড়ে এসে তার বাঁ পাটাকে মচ্‌চড়ে ভেঙে দিয়ে তার পায়ের ওপর পড়ল। নিজ্ঞান অবস্থায় তার মনে হল যেন শত টাইফুন একত্র হয়ে হিরোশিমা আক্রমণ করেছে। বিমান আক্রমণের সতর্ক বাঁশী ত বাজেনি?

পরদিন ৭ই অগস্ট জাপানী বেতারে ঘোষণা করা হল, "কয়েকটি বি—২৯ বিমানের আক্রমণে হিরোশিমার প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়েছে। সম্ভবতঃ কোনো নতুন ধরণের বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে।"

রেডিওর এই খবর যারা শুনেছিল তারা সেইদিন শর্ট ওয়েভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির বিশেষ বেতার ঘোষণা শুনেছিল কিনা কে জানে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাক্রমশালী সভাপতি ট্রুম্যান বেতারে বলেছিলেন, "এই নতুন বোমার ক্ষমতা বিশ হাজার টি-এন-টি বোমা অপেক্ষা বেশী এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বোমা বৃটিশ গ্র্যান্ড স্ল্যাম অপেক্ষা দুহাজার গুণেরও বেশী শক্তিশালী।"

কিন্তু বিশ হাজার টি-এন-টি কিংবা দু-হাজার বৃটিশ গ্র্যান্ড স্ল্যাম কিংবা পাঁচ হাজার আর-ডি-এক্স অপেক্ষা কত বেশী ক্ষতি যে মাত্র একটি বোমা করেছে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে হিরোশিমার অভিশপ্ত অধিবাসীরা, আজ এখনও পর্যন্ত। মহাপরাক্রমশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলদর্পী সভাপতি ট্রুম্যান সাহেব অতুলনীয় নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেতেন যদি সেই সময় হিরোশিমায় থাকবার মতো তাঁর কণামাত্রও সাহস থাকত।

তারপর ১৫ই অগস্ট। হিরোশিমার রেল স্টেশনে মৃতপ্রায় একদল জাপানী কেউ বসে কেউ শুয়ে কেউ দাঁড়িয়ে বেতারের লাউড স্পিকার মারফৎ শুনতে পেলে তাদের দেবতা প্রতিম সম্রাটের কণ্ঠস্বর, জীবনে সেই প্রথম। তাদের "তেনো" বলছেন ঃ "পৃথিবীর বর্তমান সংকটময় অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে এবং আমাদের সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিপদের বিষয় সম্যক উপলব্ধি করে আমরা চূড়ান্ত এক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার......।" জাপান আত্মসমর্পণ করল।

অ্যাটম বোমা ফাটার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কি এইরূপ যমজের জন্ম হবে?

১৯৪৫ সালের এই ৬ই অগস্ট তারিখে মানব জাতির ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম ধ্বংসের মধ্যে শুরু হল নতুন এক যুগ, কলিযুগের অবসান করে সত্যযুগের শুরু নয়। শুরু হল সন্দেহজনক এক পরমাণবিক যুগ।

নতুন যে যুগ শুরু হয়েছে, গত তিন বৎসর থেকে তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে চলছে নানা কল্পনা, জল্পনা ও গবেষণা; জাগিয়ে তুলেছে মানবের মনে আশা, নিরাশা, আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা।

কিন্তু হিরোশিমার পর নাগাসাকি, তারপর বিকিনি এই তিন স্থানে অ্যাটম বোমার যে প্রত্যক্ষ ফল বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন তাতে কিন্তু একদল বৈজ্ঞানিক মোটেই আশান্বিত হতে পারেননি, যদিও আর একদল ভবিষ্যৎ পরমাণবিক যুগের এক সুন্দর কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

অ্যাটম বোমা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। অ্যাটম বোমা ফাটলে তিনটি মহাশক্তিশালী ও হানিকর অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়। যদিও এক কথায় এদের বলা হয় রেডিও-অ্যাক্টিভ রশ্মি কিন্তু তিনটি রশ্মির পৃথক নাম ল্যাটিন বর্ণমালা অনুযায়ী অ্যালফা, বিটা ও গ্যামা। বিদীর্ণ অ্যাটম বোমার আর কিছু থেকে অব্যাহতি পেলেও এই তিনটি রশ্মি থেকে অব্যাহতি নেই। এদের মধ্যে আবার ভীষণ হল গ্যামা রশ্মি।

বিকিনির প্রবাল বলয়ে অ্যাটম বোমার যে পরীক্ষা হয় তা থেকে জানা যায় যে সেখানে একটি মাত্র বোমা থেকে হাজার টন রেডিয়ামের সমতুল্য রেডিওঅ্যাক্টিভ রশ্মি

তেজস্ক্রিয় রশ্মি সারে প্রয়োগ করলে গাছের তেজ বাড়ে।
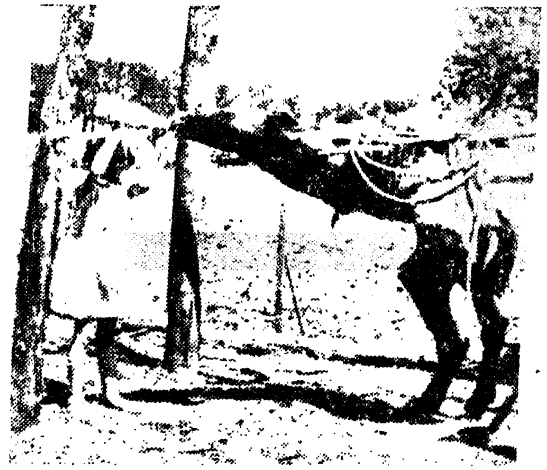
অ্যাটম বোমা ফাটবার পর এই রকম সামনের পা-হীন প্রাণীও জন্মাতে পারে।

নির্গত হয়েছে। এক বৎসর অতিক্রম হবার পরও দেখা গেছে যে তখনও পর্যন্ত বাট পঁয়ষট্টিটি জাহাজ রেডিওঅ্যাক্টিভ রশ্মিময় হয়ে রয়েছে, এবং এ সমস্ত জাহাজে যাওয়া বিপজ্জনক। এই জাহাজগুলিকে কোনো উপায়েই রেডিওঅ্যাক্টিভ রশ্মি থেকে মুক্ত করা যায়নি। এদের মধ্যে কয়েকটি জাহাজকে নদীর ও সমুদ্রের জল এবং রসায়ন দিয়ে ভাল করে ধোওয়া হয়েছে, রং একদম চেঁচে তুলে ফেলে সীসে মিশ্রিত রং দিয়ে পুনরায় রং করা হয়েছে, কারণ সীসে রেডিওঅ্যাক্টিভ প্রতিরোধ করতে পারে। তথাপি জাহাজগুলিকে রেডিওঅ্যাক্টিভ রশ্মি থেকে মুক্ত করা বিফল হয়েছে। আরও কতকগুলি জাহাজে বিশেষ ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ পরে' এবং প্রতিবেধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেও এক ঘণ্টার অধিক কায করা যায় না।

মেয়েটি সারাজীবন অ্যাটম বোমার ক্ষত চিহ্ন বহন করবে

বিকিনির প্রবাল বলয়ে কতকগুলি কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে যেখান থেকে রেডিওঅ্যাক্টিভ রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জলের ক্ষুদ্র প্রাণি, জীবাণু ও জলজ উদ্ভিদ রেডিওঅ্যাক্টিভ রশ্মি শোষণ করেছে, তাদের আবার বড় মাছ আহার করে তারাও নিজেদের দেহাভ্যন্তরে ঐ রশ্মি গ্রহণ করেছে। এই সব জলজ উদ্ভিদ প্রাণি ও মাছগুলির এখন বিনা ক্যামেরাতে কেবলমাত্র ফোটোগ্রাফিক প্লেটের সাহায্যে অন্ধকারে ছবি তোলা যায়, তারা এতই স্বতঃদীপ্ত হয়ে' উঠেছে। তা ছাড়া কতকগুলি গাছের আকৃতি ও রংএর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

বিকিনির প্রবাল বলয়ে পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত জাহাজ জড়ো করা হয়েছিল সেগুলিতে যদি লোক ভর্তি থাকত তাহলে ঐ একটি বোমার দ্বারা অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ হাজার লোক মারা যেত। এত হ'ল বিকিনির

মেয়েটির মাথা কেশ শূন্য হয়ে গেছে

পরীক্ষার কথা, যেখানে সব রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে' তবে অ্যাটম বোমা ফেলা হয়েছিল। কিন্তু হিরোশিমা ও নাগাসাকির পরবর্তী অবস্থা দেখে অনেকেই বলছেন,—তাঁদের মধ্যে মার্কিন বৈজ্ঞানিকরাও আছেন,—যে অ্যাটম বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাওয়া ভাল। নচেৎ তারপর যে কি হ'তে পারে, আর কি হ'তে পারে না তা কল্পনা করাই শক্ত।

অ্যাটম বোমা ফাটার ফলে অগ্নিকাণ্ডেও যারা মরল না, শরীরের কোনো কোনো স্থান হয়ত দগ্ধ হ'ল মাত্র, তাদের সেই দগ্ধ স্থান হয়ত সেরে গেল কিন্তু সেই স্থানে ফুলে যাওয়ার মতো অতিরিক্ত মাংসে কুশ্রী সব চিহ্ন জন্মাতে লাগল। এই ফোলা স্থানগুলি স্পর্শ করলে কুষ্ঠরোগীর মতো কেউ কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু কারও আবার হাত দিলে যন্ত্রণা হয়। এইরূপ ফোলার নাম দেওয়া হয়েছে "কেলয়েড"। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সন্তানের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা

কেলয়েডের আর একটি নমুনা

বিলুপ্ত হয়েছে আবার যার ক্ষমতা ছিল না অথবা যে সকল নারীর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সন্তানোৎপাদন করতে পেরেছে বলে' জানা গেছে।

কতজনের মাথার চুল সম্পূর্ণ উঠে গেছে, শরীরের রক্তের সমস্ত শ্বেত কণিকা ধ্বংস হয়ে গেছে, গায়ের রং গেছে বদলে। সামান্য ক্ষত থেকে শরীরের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে গেছে। সে রক্তপাত কিছুতেই থামানো যায়নি, ফলে হয়েছে মৃত্যু।

হিরোশিমা এবং নাগাসাকির যে স্থানটিতে বোমা ফেটে ছিল, সেখান থেকে তিন হাজার ফিট দূরত্বের মধ্যে যত সন্তানবতী নারী ছিল, প্রত্যেকেরই গর্ভপাত হয়েছে; এমন কি সাড়ে ছয় হাজার ফিট দূরত্বের মধ্যেও যারা ছিল তাদেরও প্রায় সকলেরই গর্ভ নষ্ট হয়ে

'কেলয়েড' গ্রস্থ ব্যক্তি

গিয়েছিল। এই দূরত্বের বাইরে, কিন্তু দশ হাজার ফিটের মধ্যে যত সন্তানবতী নারী ছিল তাদের মধ্যে মাত্র এক তৃতীয়াংশের যথাসময়ে সন্তান প্রসব হয়েছিল। যে সমস্ত পুরুষ এক মাইলের মধ্যে ছিল তারা তিন মাস পর্যন্ত প্রজনন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ছিল। দুই মাইল দূরে কোনো পরিবারের একটি মুরগী যার ডিম দেওয়া বন্ধ ছিল, ছয় মাস পর থেকে সে পুনরায় ডিম দিতে আরম্ভ করে।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দেখা গেছে যে, রেডিওঅ্যাক্টিভ রশ্মি দ্বারা নারী অপেক্ষা পুরুষের যৌন কোষ অধিক সংখ্যায় নষ্ট হয়ে যায়। শরীরের ত্বক, স্ত্রী ও পুরুষজ্ঞাপক চিহ্ন পাকস্থলীর অংশ বিশেষ এবং রক্ত প্রস্তুতকারক কোষগুচ্ছে এই অদৃশ্য রশ্মিগুলির দ্বারা প্রথমে নষ্ট হয়, তারপর আর কিছু।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মুলার একজন কৃতবিদ্য অধ্যাপক। মাছির ওপর ক্রমাগত এক্স-রে প্রয়োগ করলে তাদের বংশধররা বিকৃত হয়ে যায় এই তথ্য প্রমাণ করে' ১৯৪৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। অ্যাটম বোমার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি যা বলেন তা অতি ভীষণ। তিনি বলেন মানুষের জীবকোষে যে ক্রোমোজোম আছে এবং 'জেনি' অর্থাৎ বংশকণা যেগুলি দ্বারা এই ক্রোমোজোম গঠিত; বিদীর্ণ অ্যাটম বোমা থেকে নির্গত অদৃশ্য গ্যামা রশ্মি দ্বারা এই ক্রোমোজোম এবং জেনির ওপর তাদের এমন ক্রিয়া হয় যে, হঠাৎ একটা অভাবনীয় পরিবর্তন আনতে পারে। ফলে অদ্ভুত মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে, হয়ত কারও পা থাকবেনা, কিংবা হয়ত কেউ ভীষণ লম্বা অথবা খর্ব হবে, কিংবা হয়ত আভ্যন্তরীণ কোনো অংগ থাকবে না। এইরূপ অংগবিকৃতি চলবে বংশপরম্পরা ধরে', এবং সত্যসত্যই যদি পৃথিবীতে পরমাণবিক যুদ্ধ চলে এবং তার পরও যদি মানুষ কিছুকাল বেঁচে থাকে তাহলে এইরূপ বিকৃত মানব মানবী ও জীবজন্তুতে পৃথিবী ভরে' উঠবে। এইরূপ যে হবে তার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা পেয়েছেন।

ভবিষ্যতে হয়ত এমন দিনও আসতে পারে যেদিন এক জাতি যুদ্ধ ঘোষণা না করেও এক জাতি তার শত্রু জাতির গোপনে ধ্বংসসাধন করতে পারে কেবলমাত্র অদৃশ্য রেডিওঅ্যাক্টিভ রশ্মি প্রয়োগ করে'। একদিন হয়ত দেখা যাবে যে সে জাতির জনসাধারণের মধ্যে ক্যান্সার রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, তাদের রক্ত পতলা হয়ে' যাচ্ছে, সব সময় তারা দুর্বলতা বোধ করছে, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে' যাচ্ছে, ক্ষেতের শস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বেঁচে থাকবার স্পৃহাও তাদের আর নেই। ভবিষ্যৎ এইরূপ এক দিনের ভীষণতা ভেবে আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিক শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

কুমারি তোশিকো আট মাস হাসপাতালে পড়ে ছিল, তার বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই মারা গেছে। তোশিকো খোঁড়া হয়ে গেছে ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে কোনো রকমে সে চলা-ফেরা করে মাথার সব চুল উঠে গেছে, দেহ হয়েছে কংকালসার, বর্ণ হয়েছে মলিন, কোনো কাযে ইচ্ছে নেই বাঁচবারও নয়, তবুও পরের দয়ায় নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়।

হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা ফাটবার সংগে সংগে যারা গেছে তারা গেছে, কিন্তু যারা রইল তাদের ঐ একটি মাত্র বোমা যেন রস্‌কস্‌ নিংড়ে নিয়ে ছোবড়ার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

রেল শ্রমিক (মাসিক পত্র) সম্পাদক—কালিদাস চক্রবর্তী। কার্যালয় ই আই আর এম্‌প্লইজ এসোসিয়েশন, ২৩।২৪ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। মূল্য প্রতি সংখ্যা দুই আনা।

"রেল শ্রমিক" ই আই আর এম্‌প্লইজ এসোসিয়েশনের মুখপত্র। আমরা এই পত্রখানার পর পর তিনখানা সংখ্যা সমালোচনার্থ পাইয়া প্রীত হইয়াছি এবং পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। রেল শ্রমিকদের ন্যায় এমন বিপুল সংখ্যক কর্মিসংঘের একখানা মুখপত্র থাকা নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। রেল শ্রমিক সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পত্রখানাতে রেল শ্রমিকের দাবীদাওয়া অভাব-অভিযোগ এবং সুখ দুঃখের কাহিনী রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক কথায় রেল শ্রমিকের প্রাণের বাণীই এই পত্রখানার মারফতে ভাষা পরিগ্রহ করিয়া থাকে। আশা করি প্রত্যেক রেল কর্মীই পত্রখানাকে নিজের বাণী বাহকরূপে গ্রহণ করিবেন। আমরা পত্রখানার বহুল প্রচার কামনা করি। ২৪৮।৪৮

জাগৃহি (শারদীয়া সংখ্যা) সম্পাদক—শ্রীইন্দু গুপ্ত ও শ্রীশিশির বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যালয়—১২, পদ্মনাথ লেন, কলিকাতা—৪। মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

শারদীয়া সংখ্যা "জাগৃহি" কয়েকটি উৎকৃষ্ট গদ্য পদ্য রচনার সংকলন। রচনাগুলি সুলিখিত এবং পত্রখানা সুসম্পাদিত। আমরা "জাগৃহি"র দীর্ঘজীবন কামনা করি। ২৩৭।৪৮

চিত্রবাণী—সম্পাদক, শ্রীগৌর চট্টোপাধ্যায়। কার্যালয়, ৫, হাজরা লেন, কলিকাতা—২৯। মূল্য দুই টাকা।

আমরা "চিত্রবাণী"র শারদীয়া সংখ্যা সমালোচনার জন্য পাইয়া প্রীত হইলাম। চলচ্চিত্র বিষয়ক বহুসংখ্যক রচনা ও চিত্রাবলীতে সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। আলোচ্য সংখ্যাটির সম্পাদনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে চলচ্চিত্রশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের লিখিত রচনাবলীই সংগ্রহ করা হইয়াছে। যেমন, বাঙলার শতকরা অভিনয় শিল্পিগণ অভিনয় সম্বন্ধে এবং শিল্পের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে টেকনিশিয়ানগণ লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, নাটক, বেতার চিত্রসমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ক রচনাও আছে। সংখ্যাটি আগাগোড়া পাঠ করিলে প্রচুর আমোদ যেমন পাওয়া যাইবে, তেমনি সিনেমাশিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে। ২৫৭।৪৮

নব দর্শনের গতিপথে—শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ভাগলপুর, ইউনাইটেড প্রেস লিমিটেডে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ নাই। মূল্য আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে "পাশ্চাত্য নব দর্শনের ইতিহাসিক ধারা" আলোচিত হইয়াছে। বইটি দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ইউরোপের কেবল যুক্তিবাদী দার্শনিকদের, যথা দেকার্ডে, স্পিনোজা, লিবনিজের চিন্তাধারার আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বেকন, লক, বার্কলে, হিউম প্রভৃতির দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতির মোটামুটি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বইটি আগাগোড়া পাঠ করিলে ইউরোপের নব্য দর্শনের গতিধারা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিবে। ২৫০।৪৮
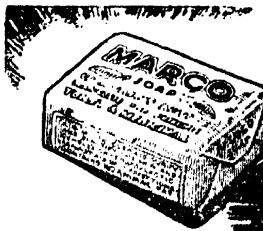
প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বিজয়

গত ২রা নবেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ভোটাধিক্যে রিপাবলিকান পার্টির পদপ্রার্থী গবর্নর টমাস ই ডিউইকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এ নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো স্তম্ভিত হয়েছেই—সমগ্র বিশ্বও বিস্মিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ডিউই-ই এ বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হবেন—এই মর্মে আমেরিকা থেকে দীর্ঘকাল প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল। এমন কি, নির্বাচনের মুখেও বিশেষজ্ঞগণ হিসাবনিকাশ করে প্রচার করেছিলেন যে, ডিউই-ই বিজয়ী হবেন। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত আঘাতে সকল

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান

দলের সর্বপ্রকার জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে ট্রুম্যান সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নির্বাচনে বিস্মিত হয়নি, এরূপ লোক যদি কেউ থেকে থাকে, তবে তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নিজে। ডেমোক্রেটিক পার্টির যেসব সমর্থক শেষ পর্যন্ত তাঁকে সমর্থন করেছেন, তাঁরাও তাঁর বিজয় সম্বন্ধে ছিলেন সন্দিহান। ট্রুম্যানের এই বিজয়ের ফলে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় ডেমোক্রেটিক শাসন কায়েম হল। ১৯৩৩ সালে লোকান্তরিত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ক্ষমতা লাভের পর থেকে যে ডেমোক্রাটিক শাসনের আরম্ভ হয়েছিল, আজ পর্যন্ত তা অব্যাহতগতিতে চলেছে এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চলবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এত দীর্ঘ দিন কখনও একদলীয় শাসন চলেনি কিংবা

রিপাবলিকান দলও এত দীর্ঘকাল ক্ষমতাচ্যুত হয়ে থাকেনি। যারা প্রত্যাশা করেছিল যে, ডিউইর বিজয়ে এই দীর্ঘস্থায়ী একদলীয় শাসনের অবসান ঘটবে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বিজয় তাদের হতাশ করে দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের এই বিজয় আরও কৃতিত্বহ এই জন্যে যে, তিনি সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় এই নির্বাচনী-বৈতরণী পার হয়েছেন বলা চলে। নিজের দলের পরিপূর্ণ সমর্থন তিনি প্রথম থেকেই পান নাই। নিগ্রোদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দানের নীতি নিয়ে ডেমোক্রেটিক দলে ভাঙন ধরেছিল এবং দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোপ্রধান স্টেটগুলির ডেমোক্রেট প্রতিনিধিরা ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গবর্নর থারমণ্ডকে তাঁদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নির্বাচিত করেছিলেন। গবর্নর থারমণ্ড অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নগণ্য ছিলেন, কিন্তু ট্রুম্যানের কিছু সংখ্যক ভোট যে তিনি ছিনিয়ে নিয়েছেন, সে বিষয়ে সংশয় নেই। তৃতীয় দলের প্রতিনিধিরূপে ছিলেন মিঃ হেনরী ওয়ালেস্। তাঁর মূল কর্মনীতি ছিল সোভিয়েট তোষণমূলক। নির্বাচনের পূর্বে তাঁর সমর্থকরা ঘোষণা করেছিলেন যে, ওয়ালেস্ অন্ততঃ এক কোটি ভোট পাবেন। সেক্ষেত্রে তিনি পেয়েছেন মাত্র দশ লক্ষ ভোট—মার্কিন ভোটদাতাদের শতকরা দুইভাগ ভোট মাত্র। মার্কিন জনমত যে সোভিয়েট তোষণ চায় না, এর দ্বারা একথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল। আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও রিপাবলিকান দলের গবর্ণর ডিউই-র মধ্যে। ট্রুম্যান পেয়েছেন প্রায় সোয়া দুই কোটি ভোট, আর ডিউই পেয়েছেন দুই কোটি ভোটের কিছু বেশী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে খুব তীব্র হয়েছে সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আরও কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি এ নির্বাচনে মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ এবং সেনেট উভয়েই ডেমোক্রাটিক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পেয়েছেন। ১৯৪৬ সাল থেকে এই দুটি আইন পরিষদেই রিপাবলিকান দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল এবং তার ফলে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে শাসনকার্য পরিচালনায় অনেক ব্যাঘাতের সম্মুখীন হতে হত। এবার আর সে অসুবিধা রইল না।

ট্রুম্যান-ডিউইর এ সংঘাতে বিশ্বরাজনীতি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল না। বর্তমানে বিশ্বরাজনীতির ব্যাপারে ডেমোক্রাটিক ও রিপাবলিকান দল প্রায় একমত। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এ নির্বাচনের সমধিক গুরুত্ব বর্তমান। রিপাবলিকান দলের তুলনায় ডেমোক্রাটিক দলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ অনেক বেশী প্রগতিশীল। সাধারণ শ্রমিক-মজদুরদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ডেমোক্রাটিক দল ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রয়াসী। অপরপক্ষে রিপাবলিকান দল কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষক। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্বাচন সংবাদে মার্কিন শেয়ার মার্কেটে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কেন—এর থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। রিপাবলিকান দল

টমাস ই ডিউই

হোয়াইট হাউসে প্রবেশ লাভের আশায় এবার নির্বাচনী প্রচারকার্যে দুই থেকে আড়াই কোটি ডলার ব্যয় করেছে বলে প্রকাশ। অপরপক্ষে ডেমোক্রাটিক দল পার্টি-ফাণ্ডের অভাবে যথোচিতভাবে প্রচারকার্য চালাতে পারেনি—একথাও আমরা শুনেছি। রিপাবলিকান দলের এই টাকা কোথা থেকে এসেছে, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

ডেমোক্রাটিক দলের নেতা হিসাবে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের শক্তি বিচারে সাধারণ মার্কিনবাসীদের থেকে আরম্ভ করে ডেমোক্রাটিক দলের সদস্যরাও যে ভুল করেছে—ট্রুম্যানের এ বিজয়ই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অবশ্য এ বিচারে ভুল হওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়। পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মত বহু বিচিত্র জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তাঁর নেই। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির মুখে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হন। এজন্যে তাঁকে নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়নি।

তদবধি এই তিন বৎসরকালের শাসনে তিনি বড় ধরণের কোন বিশেষ কৃতিত্বেরও পরিচয় দিতে পারেননি। অবশ্য এ অসামর্থের দরুণ নিছক তাঁকে দায়ী করে লাভ নেই। এর পিছনে যুক্তিসঙ্গত কয়েকটি কারণও ছিল। এবার নির্বাচনী সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে ট্রুম্যান প্রমাণ করে দিলেন যে, প্রেসিডেণ্ট পদের সম্পূর্ণ যোগ্যই শুধু তিনি নন—তিনি মার্কিন জনমতের নির্বাচিত প্রতিনিধি।

প্রায় দুমাস পূর্বে নির্বাচনী সফরে বের হবার মুখে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলেছিলেন : "আমার নির্বাচনী সফর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করবে।" একাধিক দিক থেকে তা রেকর্ড সৃষ্টি করেছেও বটে। স্বল্পবাক ডিউইর তুলনায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন অনেক বেশী—যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫টি স্টেটে তিনি বক্তৃতা করেছেন, লক্ষ লক্ষ সাধারণ নরনারীর সঙ্গে মিশেছেন এবং তাদের হৃদয়ে সাড়া জাগানোর চেষ্টা করেছেন। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়ে সাধারণের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্যে তিনি কি করতে চান, সে কথা স্পষ্ট সহজ ভাষায় নির্ভীকভাবে তিনি জনসমাজে উপস্থাপিত করেছেন। আর ডিউই মূলত আউড়েছেন ফাঁকা আদর্শবাদের বুলি—স্পষ্ট করে কোন বিষয়ে তিনি নিজের দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করতে পারেননি। এ অস্পষ্টতার একমাত্র কারণ তাঁর দ্বৈত নীতি। তিনি একসঙ্গে মার্কিন শিল্পপতি ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। নির্বাচনী সফরের মুখে ট্রুম্যান আরও ঘোষণা করেছিলেন যে, অন্ততপক্ষে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ মার্কিন ভোটদাতা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তিনি সেই চেষ্টাই করেছেন। তাঁর এ চেষ্টাও বহুলাংশে সফল হয়েছে। ৫ কোটির উপর ভোটদাতা যে এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ইতিহাসে এত ভোটদাতা নাকি কখনও অংশ গ্রহণ করে না। সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা সাড়ে নয় কোটি। তার মধ্যে ভোটদাতার অধিকার যারা অর্জন করেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ছয় কোটি ৭০ লক্ষ। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ট্রুম্যানের এ বিজয় যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। হতাশার সমুদ্র থেকে তিনি ডেমোক্রাটিক দলকে তীরে টেনে তুলেছেন। সেনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রাটিক দল অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। ডেমোক্রাটিক দলের মনোনীত প্রার্থী সেনেটের অ্যালবেন বার্কলি ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বোপরি ট্রুম্যান আজ কারও উপর নির্ভরশীল নন—তিনি নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। এই অবস্থায় তাঁর আগামী চার বৎসরের শাসনকালে তিনি কি কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তার দ্বারাই ইতিহাস তাঁর বিচার করবে।

চিয়াং গভর্নমেণ্টের বিপর্যয়

কম্যুনিষ্ট বাহিনীর হাতে দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকার পরে মাঞ্চুরিয়ার বৃহত্তম সহর মুকডেনের পতন ঘটেছে। ফলে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া কম্যুনিষ্টদের হস্তগত হয়েছে এবং ইয়াংসি নদীর উত্তর তীরবর্তী সমস্ত চীনের বিপদ ঘনিয়ে এসেছে বলা চলে। মাঞ্চুরিয়া বিজয়ের পরে মাও সে তুং-এর কম্যুনিষ্ট বাহিনী যেভাবে দক্ষিণ মুখে অভিযান চালিয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে চিয়াং গভর্নমেণ্টের বর্তমান রাজধানী নানকিং-এর পতন যদি ঘটে এবং চিয়াং কাইশেকের কুওমিনটাঙ্ গভর্নমেণ্টের অধীনে যদি একমাত্র ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল থাকে তবু বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সম্মুখ সংগ্রামে যেভাবে কম্যুনিষ্টরা সাফল্য অর্জন করছে, তাতে আজ আর বিস্ময়ের কিছুই নেই। চিয়াং গভর্নমেণ্টের ব্যর্থতাই যে এই কম্যুনিষ্ট সাফল্যের মূল কারণ, সে কথা না বললেও চলে। কম্যুনিষ্টরা এতদিন যুদ্ধে গেরিলা কৌশলই বরাবর চালিয়ে এসেছে। বর্তমানে তারা সরাসরি দুর্গপ্রাকার পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত নগর আক্রমণ করেও সাফল্য অর্জন করছে। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, চীনের গৃহযুদ্ধ আজ নতুন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মাঞ্চুরিয়ার মুকডেন, চ্যাংচুন্, চিংচাউ এবং শানটুং প্রদেশের সিনিয়ান ও চেফু শহরের কম্যুনিষ্ট বিজয় এই কথাই প্রমাণিত করে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কম্যুনিষ্টদের স্থলশক্তি সরকারী সেনাবাহিনীর তুলনায় বেশী নয়, তাদের অস্ত্রশস্ত্রও উন্নততর ধরণের হতে পারে না। আর বিমান-শক্তি বলতে তো তাদের কিছুই নেই। আর চিয়াং গভর্নমেণ্টের হাতে যথেষ্ট বিমানশক্তি ও সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কম্যুনিষ্টদের এঁটে উঠতে পারছেন না। এটা নিছক সামরিক বিপর্যয়ের ফল, এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে। এর পিছনে আছে সরকারী কর্মনীতির চরম ব্যর্থতা। মুষ্টিমেয় স্বার্থবাদীদের দ্বারা শাসিত চিয়াং গভর্নমেণ্ট আজ ঘুষ, দুর্নীতি প্রভৃতি সমাজবিরোধী দুষ্কার্যের আকর হয়ে উঠেছে। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের মনে এই গভর্নমেণ্ট কোন নতুন আদর্শের সঞ্চার করতে পারেনি—দেশের ব্যাপক দুঃখ দুর্দশারও কোন প্রতিকার করতে পারেনি। চিয়াং গভর্নমেণ্ট চীনের জনমতকে নিজেদের পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে পারেননি। মুকডেনের মত দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে কুওমিনটাঙ গভর্নমেণ্ট নিয়মিত খাদ্যবস্ত্র সরবরাহ করতে পারেননি। ফলে এই শহরের সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী সেনাদলের মনোবলও গিয়েছিল ভেঙে। কোন গভর্নমেণ্টের পক্ষেই এটা প্রশংসার কথা নয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইয়াংসি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কম্যুনিষ্টরা আজ একটা বহুবিস্তীর্ণ ভূভাগের শাসক এবং এই অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় ২০ কোটি। এই দৃঢ়-সংবদ্ধ কম্যুনিষ্ট শক্তিকে চিয়াং কাইশেক যে সহজে হটাতে পারবেন—এরূপ মনে করা আজ দুরূহ হয়ে উঠেছে। আর বিপরীতটা যদি সত্য হয় অর্থাৎ কম্যুনিষ্টরাই যদি সমগ্র চীনের শাসনকর্তৃত্ব পায়, তবে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট অভিযানের দ্বার মুক্ত হয়ে যাবে।

মার্শাল চিয়াং

উত্তর চীন চিয়াং গভর্নমেণ্টের হাতছাড়া হতে চলেছে বলেই যে চীনে গৃহযুদ্ধের অবসান হয়ে গেল, এরূপ মনে করার হেতু নেই। এক সময় জাপানীরাও এ অঞ্চল প্রায় পুরোপুরি দখল করে নিয়েছিল। প্রশ্ন হল, চীনের সেনাবাহিনীর মনোবল। সে মনোবল ভেঙে পড়েছে বলে মনে হয়। তা নইলে মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াং গভর্নমেণ্টকে আজ এভাবে একটির পর একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে কেন? মুকডেনের বিপর্যয়ের ফলে আজ প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইশেকের মন্ত্রিমণ্ডলও পদত্যাগ করেছেন। নতুন কোন মন্ত্রিমণ্ডল এ পর্যন্ত গঠিত হয়নি। অনেকের ধারণা যে, আপোষের জন্য চিয়াং কাইশেক পুনরায় কম্যুনিষ্টদের দ্বারস্থ হবেন। কম্যুনিষ্টরা চীনের প্রায় অর্ধাংশের কর্তা হলেও তারা এ পর্যন্ত কোন স্বতন্ত্র গভর্নমেণ্ট গড়ে তোলেনি। মুকডেনের পতনের ফলে আজ সত্যই চিয়াং গভর্নমেণ্টের স্থির সিদ্ধান্তের দিন এসেছে। হয় তাঁদের নিজের ঘরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে মার্কিন সাহায্য নিয়ে অধিকতর দৃঢ়সংবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে, নয়তো কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। চিয়াং কাইশেক যদি জাতীয় শক্তিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করতে না পারেন, তবে নিছক মার্কিন সাহায্যে কোন লাভ হবে না। ৭।১১।৪৮

আমাদের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডাঃ সীতারামাইয়া মাদ্রাজে এক সম্বর্ধনার উত্তরে বলিয়াছেন—

"I hope, I will prove a good son-in-law to you just as I have been a good son-in-law to my father-in-law."

নিঃসন্দেহে খুব রসালো উক্তি, কিন্তু বাঙলাদেশ এই রস গ্রহণ করতে পারবেন তো?—এখানে যে প্রবাদ—যম, জামাই,

ভাগ্না, এ তিন নয় আপনা"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

রাষ্ট্রপতি আরো বলিয়াছেন—

"Ministers should be either bachelors or widowers."

—প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী সেদিন মেয়েদিগকে চোরাকারবারী বর গ্রহণ করিতে মানা করিয়াছেন, নূতন রাষ্ট্রপতির নীতিতে মন্ত্রীজায়া হওয়ার পথেও বিঘ্ন সমুপস্থিত। নাঃ, মেয়েদের অবস্থা সত্যই করুণ হইয়া উঠিল।

খুড়ো বলিলেন—"শুধু মেয়েরাই নয়, মন্ত্রিপদপ্রার্থী এবং সেই সঙ্গে মহিলা-পাণিপ্রার্থী পুরুষদের অবস্থাও তথৈবচ"?

* * *

বিলাতে নাকি একটি অদ্ভুত মাছিমারা কাচ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খুড়ো আমাদিগকে হুকোমুখো হ্যাংলার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন—

যদি দেখি কোন পাজি বসে ঠিক মাঝামাঝি
কি যে করি ভেবে নাহি পাইরে
ভেবে দেখি একি দায় কোন ল্যাজে মারি তায়
দুটি বই ল্যাজ মোর নাইরে"

হায়, শেষ পর্যন্ত শুধু মাছি মারা ফন্দী আর ল্যাজ নাড়া?

হুইরোপের রাষ্ট্র নায়কদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের দরকার—এই মন্তব্য করিয়াছেন, পণ্ডিত জওহরলাল।

"Short sight এবং চালশে এ দু উপসর্গ থেকেই যে তারা ভুগছেন, তা আমরা অনেক আগেই অনুমান করেছিলাম"—বলিলেন খুড়ো?

* * *

মিঃ হার্বার্ট মরিসন বলিয়াছেন—

"Mr. Churchill is incapable of moving forward as the years go on".

মানে তাঁকে এখন রেসে না ছুটিয়ে গাড়ীতে জোতার সময় হয়েছে—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

আমেরিকার জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বাদশাহ ফারুক নাকি বলিয়াছেন—"আবার বিশ্ব যুদ্ধ বাধিলে মাত্র পাঁচজন রাজা বাঁচিবেন—ইংলণ্ডের রাজা, ইস্কাপনের রাজা, হরতনের রাজা, রুইতনের রাজা আর চিড়িতনের রাজা।"

প্রশ্ন থাকিয়া যায়—টেকাগুলি কার হাতে থাকিবে?

* * *

"THE talk between Mr. Liaqat Ali and Mr. Mershall is understood to have ranged over the world picture."—

একটি সংবাদ। এই পৃথিবীর চিত্রে ভূ-স্বর্গ

কাশ্মীর তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু খাঁ সাহেব চিত্রটি এক বর্ণে না ত্রিবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন সেই কথাই ভাবিতেছি।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ—আদম এবং ঈভের গল্প নিয়া জার্মানীতে নাকি একটি ছবি তোলা হইতেছে এবং অনুরূপ একটি ছবি তোলার পরিকল্পনা নাকি আমেরিকারও আছে।

ছবিটিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য অভিনেতা, অভিনেত্রী এই দেশ হইতে নেওয়া হইবে কি না তা জানা যায় নাই।

শুনিলাম শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী অমলা নাকি মস্কোতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। সেখান হইতে তাঁরা

আমেরিকা যাইবেন।

দুইটি দেশকেই তাণ্ডব নৃত্য শিখাইবার জন্য এই আমন্ত্রণ কি না তা কিন্তু আমাদের কাছে স্পষ্ট হইল না।

* * * * *

"FEWER deaths in France—because of less food

একটি অদ্ভুত সংবাদ।

সত্যি হলে আমাদের কোলকাতায় বাড়ির সমস্যাটা চিরজীবী হয়েই থাকবে"—সখেদে বলেন খুড়ো।

* * * * *

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটারদের কলিকাতা আগমনের প্রাক্কালে এখানে একটি ষ্টেডিয়াম কমিটি গঠন করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ শুনিলাম।

জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে—"দাদা, এই নিয়ে ক'বার হলো?"

* * * *

বিলাত হইতে আসিবার পথে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যোন্নতির উল্লেখ করিয়া দলের ম্যানেজার বলিয়াছেন—"They have not missed a meal"—"আমাদের দেশে কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও meal miss করতে হয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যানেজার তা নিশ্চয়ই জানেন না"—বলেন খুড়ো।

লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে 'অ্যাস্‌প্রো' বত রকমের ছোটোখাটো অসুখবিসুখ সর্দি, কাশির হাত থেকে রেহাই পাবার শ্রেষ্ঠ উপায়। 'অ্যাস্‌প্রো'র উপর নির্ভর করুন, 'অ্যাস্‌প্রো' আপনাকে সুস্থ করবে, রোগভোগ থেকে রক্ষা করবে। কাছাকাছি যে কোনো ওষুধের দোকানে গেলেই 'অ্যাস্‌প্রো' বড়ি কিনতে পাবেন। সর্দি হলে শোবার সময় একটু জল দিয়ে দুটো বড়ি খেয়ে ফেলবেন, দিব্যি শান্তিতে ঘুমিয়ে রাত কাটবে, বেশির ভাগ সময়ে সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর বেশ ঝরঝরে বোধ হবে। 'অ্যাস্‌প্রো' জ্বরের তাপ কমায়, শরীরের ম্যাজম্যাজে বা শীতশীত ভাব কাটায়। পৃথিবীতে প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় চিকিৎসক, তারই কাজ সহজ করে দেয় 'অ্যাস্‌প্রো'। সুতরাং অযথা যন্ত্রণা ভোগ করবেন না।

মাত্রা ১ থেকে ৩টি বড়ি

পরিবেশক: জে. এল. মরিসন, সন অ্যাণ্ড জোনস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
পোস্ট বক্স ৩০৭, কলিকাতা; ফোন ক্যাল ৭০০
ও অন্যান্য শাখা

'অ্যাস্‌প্রো' নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োজ্যঃ

স্নায়বিক অবসাদ, মাথাধরা, পিঠ ব্যথা, গাঁট ব্যথা ও খিল ধরা, দাঁতের ব্যথা, নিদ্রাহীনতা, খিটখিটে মেজাজ, সর্দি ও গলা ব্যথা

নিরাপদ এবং আশু ফলপ্রদ

ছবির বাজার পড়ে গিয়েছে ব'লে আবার ধ্য়ো উঠেছে। কেন যে মাঝে মাঝে এরকম আতঙ্কের সৃষ্টি হয় বুঝতে পারা যায় না। এ নিয়ে বহুবার আলোচনা করা হ'য়েছে এবং দেখা গিয়েছে যে, চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ বা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও আশঙ্কান্বিত হ'য়ে ওঠার মতো কোন কারণেরই উদ্ভব হয়নি আজও। যুদ্ধের সময় ব্যবসা যে রকম ফুলে উঠেছিলো আর এখন যে রকম ব্যবসা চলছে তার মধ্যে পার্থক্য চার আনার চেয়েও কম এবং এক্ষেত্রে একথাটাও প্রণিধানযোগ্য যে, ছবির বাজারের সমষ্টিগতভাবে আয়ের পরিমাণ ধ'রলে তখনকার চেয়ে এখন লোকের কাছ থেকে ছবির দরুণ বরং অনেক বেশী টাকাই আদায় হ'চ্ছে; তার সহজ কারণ এই—তখন যত লোক যতগুলি ছবি দেখতে পেতো এখন তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশী লোক প্রায় তিনগুণ বেশী ছবি দেখছে। তার ওপর লক্ষ্য ক'রে দেখা গিয়েছে যে, এ বছরে এ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত প্রায় চৌত্রিশখানি ছবির মধ্যে উৎকর্ষের দিক থেকে কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য কোন ছবিই যুদ্ধকালের স্ফীত বাজারের চেয়ে বিশেষ কম আয় ক'রতে পেরেছে বলে দেখা যায় না। এটা ঠিক যে, এখন লোকের হাতে আগের মতো পয়সা উপছে পড়ছে না ব'লে তারা ছবি দেখা বিষয়ে বাছবিচারের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ছবি ভালো হ'লে তার যথাযথ সমাদর জানাতে এতটুকুও তারা কার্পণ্য ক'রছে এমন প্রমাণ একটিও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বর্তমানের কষ্টোপার্জিত টাকা তারা আর যথেচ্ছভাবে খরচ ক'রতে রাজী নয়। তাই দেখা যায়, এ পর্যন্ত প্রদর্শিত চৌত্রিশখানি ছবির মধ্যে যে চারখানি মাত্র ছবি পয়সার দিক থেকে সাফল্যলাভ ক'রেছে, উৎকর্ষের বিচারে ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য অবদান হ'তে পেরেছে বলেই তা হওয়া সম্ভব হয়েছে, আর বাকী প্রায় ত্রিশখানি ছবি লোকসানের পর্যায়ে না পড়লেও তেমন যে লাভ এনে দিতে পারেনি তার কারণই হ'চ্ছে যে, ওর প্রায় বাইশখানি ছবিই এতো নিকৃষ্ট শ্রেণীর যে, সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পেরই তার জন্যে লজ্জার অন্ত নেই; আর বাকী আটখানি উৎকর্ষে মাঝামাঝি শ্রেণীর এবং তাদের আয়ও হ'য়েছে ঠিক মাঝামাঝি রকমেরই। এখানে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। ব্যবসায় সাফল্যমণ্ডিত ছবি চারখানিরই পরিচালক এখনকার হিসেবে প্রথম শ্রেণীর আসনে অধিষ্ঠিত; মাঝামাঝি শ্রেণীর আটখানি ছবির পরিচালকদের মধ্যে সকলেই অভিজ্ঞ পরিচালক এবং তার মধ্যে একজন মাত্র প্রথম পর্যায়ের আর সবাই দ্বিতীয় স্তরের। নিকৃষ্ট বাইশখানির পরিচালকদের মধ্যে অনেকদিন থেকেই ছবি তুলছেন অথবা কোনকালে ভালো পরিচালক-

রূপে যশ অর্জন ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলেন এমন ব্যক্তি সংখ্যায় মাত্র তিনজন, দশজন একেবারে নতুন লোক মানে প্রথম ব্রতী, আর বাকী ন'জন তা না হ'লেও তাদের হাত থেকে ইতিপূর্বে যেসব ছবি বেরিয়েছে সেগুলিও চিত্রশিল্পের কলঙ্ক ব'লেই কুখ্যাত হ'য়েছে। সুতরাং এথেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হ'চ্ছে যে, বেশীর ভাগ ছবি যে অসফল হ'য়েছে তার কারণ সেসব ছবির পরিচালক নির্বাচনই হ'য়েছে ভুল। বাস্তবিকই আজকাল ছবির পরিচালনা ব্যাপারটা একেবারেই গুরুত্ব হারিয়েছে। ছবির পরিচালক হ'চ্ছে গ্রন্থ রচয়িতারই সামিল, ছবির ভালোমন্দ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তারই ওপরে অথচ সে কাজের ভারটা একেবারে যার তার ওপরে ছেড়ে দেওয়া হ'চ্ছে আজকাল। ভাল গুণী লোক নিতে গেলে পয়সাও ভালরকম দিতে হয় অথচ আজকালকার উট্‌কো প্রযোজকরা এই খরচটাই একেবারে ফালতু ব'লে ধ'রে নিয়েছে এবং শুদ্ধমাত্র পরিচয়-লিপিতে একজনের নামটা বসিয়ে দেবার জন্যেই যেন যাকে তাকে নামমাত্র টাকায় নিযুক্ত ক'রে রাখছে। কাজেই ফলও দাঁড়াচ্ছে ঐ রকমই। সকলেরই একথাটা জানা দরকার যে, শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর মধ্যে এমন একটিও উদাহরণ পাওয়া যায় না, যেক্ষেত্রে পরিচালক গুণী না হ'লেও ছবি ভালো হ'তে পেরেছে, কারণ তা হ'তে পারে না। কিন্তু আমাদের এখানে সেই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলার জন্যে লোকে উঠে পড়ে লেগেছে, আর তারপর তাদের বাজে ছবি লাভ ক'রতে অপারগ হ'লে বাজার মন্দা ব'লে নিজেদের খাক্‌তি ঢাকবার চেষ্টা ক'রছে। ওপরের চৌত্রিশখানি ছবির হিসেব থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বাজে লোককে পরিচালক সাজিয়ে খাড়া ক'রে রাখার চেয়ে অভিজ্ঞ বা গুণী লোকের হাতে পরিচালনার ভার তুলে দেওয়ায় ছবির সাফল্য বিষয়ে ঝুঁকি কতো কম।

* * *

মফঃস্বলে চিত্রগৃহ বাড়তে দেওয়া উচিত হবে কি-না, এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার সদস্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি আলোচনার অবতারণা ক'রেছেন। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা পরিষদ সদস্যদের মধ্যে এই-ই বোধ হয় প্রথম। তবে, চিত্রগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে ব'লে আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে, অথবা, পৃথিবীর সমস্ত [illegible] রাষ্ট্রের চেয়ে আনুপাতিক হিসেবে [illegible] সংখ্যা অতি নগণ্য ব'লে তা [illegible] মনে ক'রে এই আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে কি-না জানা যায়নি। আধুনিক জীবনে চলচ্চিত্র অপরিহার্য। সহজে ও সস্তায় সাধারণ্যে প্রমোদ বিতরণের যে সুযোগ চলচ্চিত্রের দ্বারা এনে দেওয়া সম্ভব আর কোন মাধ্যমের দ্বারা তা হয় না। শুধু তাই নয়, সমগ্র দেশের মধ্যে চিন্তা, রুচি ও কৃষ্টির সমতা বজায় রাখার এবং একই ধারা প্রবাহিত করার উপায় চলচ্চিত্রই ক'রে দিতে পারে। শিক্ষার প্রসার, প্রচার ও বিজ্ঞপ্তি, নানা বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ, পৃথিবীর আধুনিকতম ধারার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি বহু সুযোগই চলচ্চিত্র এনে দিয়েছে। তা ছাড়া, আমাদের দেশকে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির পাশে দাঁড় করাতে চলচ্চিত্রের সহায়তাই হবে সবচেয়ে কার্যকরী। যেদিক থেকেই ভেবে দেখা যাক না কেন, চিত্রগৃহের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা উচিত হবে না। পশ্চিমবঙ্গে এখন চিত্রগৃহের মোট সংখ্যা ২২৫-এর বেশী নয় যার মধ্যে কলকাতা ও সহরতলীতেই অর্ধেক অবস্থিত। এই তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সিনেমার সংখ্যা হ'চ্ছেঃ রাশিয়া (ভ্রাম্যমান ইউনিট সমেত) ৩২০০০, এছাড়া স্কুল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষায়তন ও কারখানার প্রায় সর্বত্রই স্বতন্ত্রভাবে চলচ্চিত্রাগার আছে; যুক্তরাষ্ট্র ১৮৭৬৫ (ভ্রাম্যমান ইউনিট ও স্বতন্ত্র চিত্রাগার ছাড়া), বৃটেন ৪৮৫০, ফ্রান্স ৪৬৫০, জার্মানী ৬৪৫০, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা ৬৩৩১, জাপান্ ৩২০০, দূর প্রাচ্য ২৭৭৯, মধ্য প্রাচ্য ১৮৪৪, কানাডা ১৫৭০, আফ্রিকা ১২০৭, ইতালী ৪০০০, সুইডেন ২০০০, চেকোশ্লোভাকিয়া ১৫০০, বেলজিয়াম ১০৫০, ফিনল্যান্ড ৩০০, রুমানিয়া ৩৫৪, গ্রীস ২১০, অস্ট্রেলিয়া ১৫৭০, নিউ জিল্যান্ড ৫৫১, আয়ার ২৪০। এই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের চিত্রগৃহ সংখ্যায় কি খুবই বেশী, না আরও হওয়া দরকার? আবশ্যকতা ও লোকসংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গের মফস্বলে অন্তত এক হাজারটি চিত্রগৃহ গড়তে দেওয়ায় উদ্যোগী হওয়াই দরকার, অবশ্য বসতবাড়ির মালমসলার অভাব পূরণ ক'রে।

খুচরো খবর

ঝাউতলায় রূপশ্রী লিমিটেড এবং টালিগঞ্জে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওকে নিয়ে কলকাতায় স্টুডিও সংখ্যা ১৪টিতে দাঁড়াচ্ছে। বছর শেষ হবার আগেই এই দুটি স্টুডিওতেই চিত্রগ্রহণ কাজ আরম্ভ হবে।

* * * * *

গত শুক্রবার কলকাতার পাঁচটি চিত্রগৃহে ফিল্মিস্তানের নবতম অবদান 'শহীদ' মুক্তিলাভ

ক'রেছে। আগস্ট বিপ্লবের পটে একটি ছেলের কাহিনী ছবিখানিতে রূপায়িত করা হয়েছে এবং বম্বে ও দিল্লীর সরকারী ও বে-সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ছবিখানি দেখে প্রশংসা ক'রেছেন। এমন কি বড়লাটও নিজের প্রাসাদে ছবিখানি আনিয়ে দেখে সুখ্যাতি ক'রেছেন।

* * * *

প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ক'রে বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন এবং নবোদ্যমে ছবি তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করা স্থির ক'রেছেন।

* * * *

গত মাস শেষ হওয়ার সঙ্গেই কালী ফিল্মস তার অধিকাংশ কলাকুশলীকে বরখাস্ত ক'রে দিয়েছেন, কয়েকজন অবশ্য স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন। গত কালীপুজোর রাত্রে বাজীর আগুনে এদের সবচেয়ে বড় শব্দমঞ্চটি ভস্মীভূত হ'য়েছে।

* * *

এ বছর শেষ হবার আগেই দক্ষিণ কলিকাতায় একটি এবং মধ্য কলিকাতায় তিনটি নতুন চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন সম্ভাবনা আছে।

এ ছাড়া পুরণো এলিটও প্রায় বছর দুই বন্ধ থাকার পর নতুন রূপ নিয়ে আগামী সপ্তাহ থেকেই আবার চলতে আরম্ভ ক'রবে।

* * *

সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ফিল্ম আমদানী হওয়ায় এদিককার অভাব বর্তমানে মিটে যাচ্ছে ব'লে নতুন ছবি তোলার দিকে আবার ঝোঁক বেড়ে ওঠার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনমত কাঁচা ফিল্ম পাবার আর কোন অসুবিধে থাকবে না।

* * *

কিছুদিন পূর্বে উদয়শঙ্কর ভারত সরকারকে যে একটি পরিকল্পনা পেশ ক'রেছিলেন তদনুযায়ী শীঘ্রই কলকাতায় ভারতীয় নৃত্য ও অভিনয়ের প্রধান শিক্ষালয়ের স্থাপনা হবে ব'লে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

ক্রিকেট

ভারত ভ্রমণকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের এই পর্যন্ত পূর্ণ শক্তি পরীক্ষা হয় নাই। দ্বিতীয় প্রথম টেস্ট ম্যাচের ফলাফলই ইহার পরিচয় দিবে। ভারতীয় দল শক্তিশালী করিয়াই গঠন করা হইয়াছে। অভিজ্ঞ ও কৃতী খেলোয়াড়গণকেই দলভুক্ত করা হইয়াছে। একমাত্র নূতন খেলোয়াড় হিসাবে উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় উমরিগার দলে স্থান পাইয়াছেন। বোম্বাইর প্রথম খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ ব্যাটিং ও বোলিংয়ের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী ইহাকে নির্বাচন করিয়াছেন। প্রথম টেস্ট খেলায় ইনি যদি ঐ খেলার পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন তাহা হইলেই পরবর্তী টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলে স্থান পাইতে পারিবেন। আমরা এই তরুণ খেলোয়াড়ের সাফল্য কামনা করি।

ভারতীয় প্রথম টেস্ট দল

ভারতীয় প্রথম টেস্ট দলে খেলিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করা হইয়াছে:—অমরনাথ (অধিনায়ক), পি সেন (উইকেট রক্ষক), বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, এইচ আর অধিকারী, কে কে তারাপোর, উমরিগার, সি টি সারভাতে, কে সি ইব্রাহিম, আর এস মোদী, সি আর রঙ্গাচারী, ডি জি ফাদকার। অতিরিক্ত—এম কে মন্ত্রী ও বি বি নিম্বলকার।

অমরনাথের কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং

ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক অমরনাথ কিরূপ খেলিবেন এই বিষয় অনেকেই অনেক প্রকার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পাতিয়ালায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে অমরনাথ ২২৩ রান করিয়া নট আউট থাকিয়া সকল আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই খেলায় তিনি ব্যাটিংয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দল যখন নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে তখন খেলা আরম্ভ করিয়া দৃঢ়তার সহিত রান তুলিতে আরম্ভ করেন। শতাধিক রান করিলেও কেহই আশা করেন নাই, তিনি দ্বিশতাধিক রান করিবেন ও শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকিবেন, খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইবে। অমরনাথ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে যেরূপ খেলিয়াছেন টেস্ট খেলায় ঠিক সেইরূপ খেলিবেন আশা করা যায় না। তবে এটা ঠিক তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলারদের ভীতির কারণ হইবেন। ভারতীয় দলকে পরাজিত করা সহজ হইবে না, ইহা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়গণ ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রথম টেস্ট খেলায় অমরনাথ ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করুন—ইহা সকলেরই কাম্য।

উত্তরাঞ্চল বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল

উত্তরাঞ্চল বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চারি দিনব্যাপী খেলা পাতিয়ালায় অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। উত্তরাঞ্চল দল প্রথম ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। মাত্র ২১৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। তরুণ খেলোয়াড় যশবন্ত সিংহ ৭০ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অমরনাথ মাত্র ১৩ রান করেন। এই দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল শেষ সময় খেলা আরম্ভ করিয়া কোন উইকেট না হারাইয়া ৯ রান করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ট্রিম ও গোমেজের বোলিং কার্যকরী হয়। দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সমস্ত দিন খেলিয়া ৫ উইকেটে ৩৮০ রান করে। দলের প্রথম খেলোয়াড় রেই শতাধিক রান করে। উইকস ৫৭ রান ও ক্রিশ্চিয়ানী ৫৩ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৭ উইকেটে ৫৯১ রান করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ডিক্লেয়ার্ড করে। উইকস ১৭২ রান করিয়া নট আউট থাকেন।

উত্তরাঞ্চল দল ৩৭৩ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১৬২ রান করে। অমরনাথ ৭৬ রান করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে খেলা আরম্ভ হইলে সকলেই কল্পনা করিতে থাকেন উত্তরাঞ্চল ইনিংসে পরাজিত হইবেন। কিন্তু খেলা আরম্ভ হইলে দেখা যায় অমরনাথ অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া রান তুলিতেছেন। একের পর এক খেলোয়াড় বিদায় লইতেছেন; কিন্তু অমরনাথের খেলায় কোন শৈথিল্য দেখা যাইতেছে না। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় অমরনাথ ১২৫ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তিনি ১৬১ মিনিটে শত রান পূর্ণ করেন ও উক্ত রানের মধ্যে ১০টি বাউণ্ডারী হয়। ১৬৫ রান করিয়া অমরনাথ একবার আউট করিবার সুযোগ দেন। ৩০০ মিনিটে উত্তরাঞ্চলের ৩০০ রান হয়। চা-পানের সময় উত্তরাঞ্চলের ৭ উইকেটে ৩৫৩ রান হয়। অমরনাথ ৩১২ মিনিট খেলিয়া দ্বিশতাধিক রান পূর্ণ করেন। উক্ত রানের মধ্যে ২১টি বাউণ্ডারী হয়। চা-পানের পর রান খুব ধীরে উঠিতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত উত্তরাঞ্চল দলের ৭ উইকেটে ৩৭৮ রান হয়। অমরনাথ ২২৩ রান করিয়া নট আউট থাকেন। রাজেন্দ্রনাথ ৯০ মিনিট খেলিয়া মাত্র ৪ রান করিয়া নট আউট থাকেন। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

খেলার ফলাফল:—

উত্তর অঞ্চল, প্রথম ইনিংস—২১৯ রান (যশোবন্ত সিং ৭০; গোমেজ ৪৪ রানে ৪টি ও ট্রিম ৫৬ রানে ৩টি উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ:—প্রথম ইনিংস—(৭ উইঃ ডিক্লেয়ার) ৫৯১ রান (রে ১১০, ওয়ালকট ৭৫, ক্রিশ্চিয়ানী ৮৫, উইকস নট আউট ১৭২; বলবীরচাঁদ ১৭২ রানে ৫টি উইকেট)।

উত্তর অঞ্চল, দ্বিতীয় ইনিংস:—(৭ উইঃ) ৩৭৮ রান (অমরনাথ নট আউট ২২৩, পৃথ্বিরাজ ৩৭, রাজেন্দ্রনাথ নট আউট ৪, বলবীরচাঁদ ৩০)।

পৃথিবীর অপরাজিত হেভী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান জো লুইকে আমেরিকার ন্যাশনাল বক্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ এ জে গ্রীন বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতেছেন।

ক'রেছে। আগস্ট বিপ্লবের পটে একটি প্রেমের কাহিনী ছবিখানিতে রূপায়িত করা হ'য়েছে এবং বম্বে ও দিল্লীর সরকারী ও বে-সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা ছবিখানি দেখে প্রশংসা ক'রেছেন। এমন কি বড়লাটও নিজের প্রাসাদে ছবিখানি আনিয়ে দেখে সুখ্যাতি ক'রেছেন।

* * * *

প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ক'রে বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন এবং নবোদ্যমে ছবি তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করা স্থির ক'রেছেন।

* * * *

গত মাস শেষ হওয়ার সংগেই কালী ফিল্মস তার অধিকাংশ কলাকুশলীকে বরখাস্ত ক'রে দিয়েছেন, কয়েকজন অবশ্য স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন। গত কালীপুজোর রাত্রে বাজীর আগুনে এদের সবচেয়ে বড় শব্দমণ্ডপটি ভস্মীভূত হ'য়েছে।

* * *

এ বছর শেষ হবার আগেই দক্ষিণ কলিকাতায় একটি এবং মধ্য কলিকাতায় তিনটি নতুন চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন সম্ভাবনা আছে।

এ ছাড়া পুরণো এলিটও প্রায় বছর দুই বন্ধ থাকার পর নতুন রূপ নিয়ে আগামী সপ্তাহ থেকেই আবার চলতে আরম্ভ ক'রবে।

* * *

সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ফিল্ম আমদানী হওয়ায় এদিককার অভাব বর্তমানে মিটে যাচ্ছে ব'লে নতুন ছবি তোলার দিকে আবার ঝোঁক বেড়ে ওঠার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনমত কাঁচা ফিল্ম পাবার আর কোন অসুবিধে থাকবে না।

* * *

কিছুদিন পূর্বে উদয়শঙ্কর ভারত সরকারকে যে একটি পরিকল্পনা পেশ ক'রেছিলেন তদনুযায়ী শীঘ্রই কলকাতায় ভারতীয় নৃত্য ও অভিনয়ের প্রধান শিক্ষালয়ের স্থাপনা হবে ব'লে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

ক্রিকেট

ভারত ভ্রমণকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের এই পর্যন্ত পূর্ণ শক্তি পরীক্ষা হয় নাই। দিল্লীর প্রথম টেস্ট ম্যাচের ফলাফলই ইহার পরিচয় দিবে। ভারতীয় দল শক্তিশালী করিয়াই গঠন করা হইয়াছে। অভিজ্ঞ ও কৃতী খেলোয়াড়গণকেই দলভুক্ত করা হইয়াছে। একমাত্র নূতন খেলোয়াড় হিসাবে উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় উমরিগার দলে স্থান পাইয়াছেন। বোম্বাইর প্রথম খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ ব্যাটিং ও বোলিংয়ের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী ইহাকে নির্বাচন করিয়াছেন। প্রথম টেস্ট খেলায় ইনি যদি ঐ খেলার পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন তাহা হইলেই পরবর্তী টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলে স্থান পাইতে পারিবেন। আমরা এই তরুণ খেলোয়াড়ের সাফল্য কামনা করি।

ভারতীয় প্রথম টেস্ট দল

ভারতীয় প্রথম টেস্ট দলে খেলিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করা হইয়াছে:—অমরনাথ (অধিনায়ক), পি সেন (উইকেট রক্ষক), বিজয় হাজারে, বিনু মানকড়, এইচ আর অধিকারী, কে কে তারাপোর, উমরিগার, সি টি সারভাতে, কে সি ইব্রাহিম, আর এস মোদী, সি আর রঙ্গাচারী, ডি জি ফাদকার। অতিরিক্ত—এম কে মন্ত্রী ও বি বি নিম্বলকার।

অমরনাথের কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং

ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক অমরনাথ কিরূপ খেলিবেন এই বিষয় অনেকেই অনেক প্রকার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পাতিয়ালায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে অমরনাথ ২২৩ রান করিয়া নট আউট থাকিয়া সকল আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই খেলায় তিনি ব্যাটিংয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দল যখন নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে তখন খেলা আরম্ভ করিয়া দৃঢ়তার সহিত রান তুলিতে আরম্ভ করেন। শতাধিক রান করিলেও কেহই আশা করেন নাই, তিনি দ্বিশতাধিক রান করিবেন ও শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকিবেন, খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইবে। অমরনাথ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে যেরূপ খেলিয়াছেন টেস্ট খেলায় ঠিক সেইরূপ খেলিবেন আশা করা যায় না। তবে এটা ঠিক তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলারদের ভীতির কারণ হইবেন। ভারতীয় দলকে পরাজিত করা সহজ হইবে না, ইহা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়গণ ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রথম টেস্ট খেলায় অমরনাথ ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করুন—ইহা সকলেরই কাম্য।

উত্তরাঞ্চল বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল

উত্তরাঞ্চল বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চারি দিনব্যাপী খেলা পাতিয়ালায় অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। উত্তরাঞ্চল দল প্রথম ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। মাত্র ২১৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। তরুণ খেলোয়াড় যশবন্ত সিংহ ৭০ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অমরনাথ মাত্র ১৩ রান করেন। এই দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল শেষ সময় খেলা আরম্ভ করিয়া কোন উইকেট না হারাইয়া ৯ রান করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ট্রিম ও গোমেজের বোলিং কার্যকরী হয়। দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সমস্ত দিন খেলিয়া ৫ উইকেটে ৩৮০ রান করে। দলের প্রথম খেলোয়াড় রেই শতাধিক রান করে। উইবাস ৫৭ রান ও ক্রিশ্চিয়ানী ৫৩ রান

করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৭ উইকেটে ৫৯১ রান করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ডিক্লেয়ার্ড করে। উইকস ১৭২ রান করিয়া নট আউট থাকেন।

উত্তরাঞ্চল দল ৩৭৩ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১৬২ রান করে। অমরনাথ ৭৬ রান করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে খেলা আরম্ভ হইলে সকলেই কল্পনা করিতে থাকেন উত্তরাঞ্চল ইনিংসে পরাজিত হইবেন। কিন্তু খেলা আরম্ভ হইলে দেখা যায় অমরনাথ অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া রান তুলিতেছেন। একের পর এক খেলোয়াড় বিদায় লইতেছেন; কিন্তু অমরনাথের খেলায় কোন শৈথিল্য দেখা যাইতেছে না। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় অমরনাথ ১২৫ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তিনি ১৬১ মিনিটে শত রান পূর্ণ করেন ও উক্ত রানের মধ্যে ১০টি বাউণ্ডারী হয়। ১৬৫ রান করিয়া অমরনাথ একবার আউট করিবার সুযোগ দেন। ৩০০ মিনিটে উত্তরাঞ্চলের ৩০০ রান হয়। চা-পানের সময় উত্তরাঞ্চলের ৫ উইকেটে ৩৫৩ রান হয়। অমরনাথ ৩১২ মিনিট খেলিয়া দ্বিশতাধিক রান পূর্ণ করেন। উক্ত রানের মধ্যে ২১টি বাউণ্ডারী হয়। চা-পানের পর রান খুব ধীরে উঠিতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত উত্তরাঞ্চল দলের ৭ উইকেটে ৩৭৮ রান হয়। অমরনাথ ২২৩ রান করিয়া নট আউট থাকেন। রাজেন্দ্রনাথ ৯০ মিনিট খেলিয়া মাত্র ৪ রান করিয়া নট আউট থাকেন। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

খেলার ফলাফল:—

উত্তর অঞ্চল, প্রথম ইনিংস—২১৯ রান (যশোবন্ত সিং ৭০; গোমেজ ৪৪ রানে ৪টি ও ট্রিম ৫৬ রানে ৩টি উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ:—প্রথম ইনিংস—(৭ উইঃ ডিক্লেয়ার) ৫৯১ রান (রে ১১৩, ওয়ালকট ৭৫, ক্রিশ্চিয়ানী ৮৫, উইকস নট আউট ১৭২; বলবীরচাঁদ ১৭২ রানে ৫টি উইকেট)।

উত্তর অঞ্চল, দ্বিতীয় ইনিংস:—(৭ উইঃ) ৩৭৮ রান (অমরনাথ নট আউট ২২৩, পৃথ্বিরাজ ৩৭, রাজেন্দ্রনাথ নট আউট ৪, বলবীরচাঁদ ৩০)।

পৃথিবীর অপরাজিত হেভী ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান জো লুইকে আমেরিকার ন্যাশনাল বক্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ও জে গ্রীন বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতেছেন।

দেশী সংবাদ

১লা নভেম্বর—কলিকাতায় প্রাপ্ত ময়মনসিংহের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০শে অক্টোবর ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস কমিটির সহঃ সভাপতি শ্রীমতিলাল পুরকায়স্থকে স্থানীয় পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ২৯শে অক্টোবর কাশ্মীর রণাঙ্গনে প্রায় তিন শত হানাদার হাল্কা মেসিনগানে সজ্জিত হইয়া চম্বের দক্ষিণে ভারতীয় সৈন্যদের অবস্থানের উপর আক্রমণ চালায়। এই সময় পাকিস্থান এলাকা হইতেও গোলাবর্ষণ করা হয়। ভারতীয় বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত হয়।

২রা নভেম্বর—সেকেন্দরাবাদের ১৫ মাইল দূরবর্তী বালাপুর গ্রামের কয়েকটি হিন্দু গৃহ আক্রমণকালে ২ জন নিহত ও ৪ জন আহত হইয়াছে। আক্রমণকারীরা রাজাকার বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে

বহরমপুরের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী মুর্শিদাবাদ গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

৩রা নভেম্বর—নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারতের অস্থায়ী সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন যে, আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও নবলব্ধ স্বাধীনতাকে সংহত করিয়া ভারতবর্ষ যদি উপযুক্ত স্থান গ্রহণ করে, তবে সে এশিয়ার নেতৃত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুত এস এন মজুমদার কলিকাতায় সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে বলেন যে, দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন জলাধার নির্মাণের জন্য ফার্মসমূহে আগামী বৎসরের প্রারম্ভে অর্ডার দিতে পারা যাইবে বলিয়া কর্পোরেশন আশা করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, আনুমানিক ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ বৎসরকালের মধ্যেই পরিকল্পনার কার্য সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান পদে শ্রীযুত এ বি চ্যাটার্জি আই সি এস্-এর বদলে ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত বি কে আচার্য আই সি এস্ নিযুক্ত হইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্থানে যাহারা মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত গঠনমূলক কার্যে ব্রতী আছেন, আগামী ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর বরিশাল জেলার পিরোজপুর থানার অন্তর্গত পারেরহাটে তাঁহাদের এক সম্মেলন হইবে।

৪ঠা নভেম্বর—ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্রকে চূড়ান্ত রূপদান ও উহা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আজ নয়াদিল্লীতে ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের আইনসচিব ডাঃ আম্বেদকর ভারতীয় গণপরিষদে খসড়া প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক রচিত ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্র উত্থাপন করেন।

কলিকাতা ও বজবজের টেলিফোন সংযোগ গতকল্য মধ্যরাত্রি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ যে চারটি "কেবল্" (তার সমষ্টি)যোগে কলিকাতা বজবজের সহিত সংযুক্ত ছিল, তাহার খানিকটা অপসারণের ফলেই এই বিপর্যয় ঘটিয়াছে। ইহা সমাজবিরোধীদের ধ্বংসাত্মক কার্য বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অদ্য নাগপুরে মধ্য প্রাদেশিক দেশীয় রাজ্য উপদেষ্টা বোর্ডের উদ্বোধন করেন।

৫ই নভেম্বর—নাগপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন যে, পাকিস্থান প্রস্তুত থাকিলে আমরা পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বিরাট হিন্দু সমাজের বসবাসের ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন করিতে পারি। অন্যথায় উহা দুইটি ডোমিনিয়নের মধ্যে অশান্তির কারণ হইয়া উঠিবে। সর্দার প্যাটেল এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, পাকিস্থান হিন্দুগণকে পূর্ববঙ্গ হইতে বিতাড়নের সঙ্কল্পই যদি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের পুনর্বসতির উপযোগী যথেষ্ট ভূমিও আমাদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে। সে যাহা হউক, এ ব্যাপারে যে-কোন জরুরী অবস্থার জন্য আমরা প্রস্তুত রহিয়াছি।

কটকের সংবাদে প্রকাশ, উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ২৫,০০০ আশ্রয়প্রার্থী গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

৬ই নবেম্বর— নয়াদিল্লীতে ভারতীয় গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হয়। অদ্যকার আলোচনায় কয়েকজন সদস্য এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হউক।

কাছাড়, মণিপুর, ত্রিপুরা ও লুসাই পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের লইয়া গঠিত একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাতের জন্য আগামী সপ্তাহে দিল্লী যাত্রা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত অঞ্চলগুলি লইয়া যাহাতে একটি পৃথক কংগ্রেস প্রদেশ গঠন করা হয়, তজ্জন্য তাহারা কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইবেন।

অনুমান এক মাসকাল ইউরোপ সফরান্তে অদ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীযুত রাজা গোপালাচারী অদ্য নয়াদিল্লীতে বড়লাট প্রাসাদে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

৭ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণ-পরিষদের কংগ্রেস দলের বিশেষ সভায় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার ইউরোপ সফর সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কমনওয়েলথ সম্মেলনে অথবা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর সহিত ব্যক্তিগত আলোচনায় কোন সমস্যা সম্পর্কে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তিনি কংগ্রেস দলকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে, গণপরিষদে ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ সংক্রান্ত যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, তাহা অপরিবর্তনীয় থাকিবে এবং ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষিত হইবে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সচিব শ্রীযুত এন ভি গ্যাডগিল [illegible] সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ভারতে যে কয়টি সেতু নির্মিত হইবে তাহার মধ্যে এই সেতু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে দৈনিক 'তেজ' পত্রিকার জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুত রাজা গোপালাচারী, পণ্ডিত নেহরু ও মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ উক্ত পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর লালা দেশবন্ধু গুপ্তের বাসভবনে উপস্থিত হন। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জনসাধারণের মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য সংবাদপত্রের বিরাট দায়িত্ব আছে।

ভারত সরকার ৮ই নবেম্বর ময়ুরভঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১লা নভেম্বর—চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনী সম্পূর্ণভাবে মুকডেন অধিকার করিয়াছে। মুকডেন অধিকারের ফলে চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনীর মাঞ্চুরিয়া অধিকারের ত্রিবর্ষব্যাপী সংগ্রাম শেষ হইল।

বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ, মধ্য জাভার কম্যুনিস্ট সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মুসো সরকারী বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে নিহত হইয়াছেন।

২রা নভেম্বর—মধ্য চীনের প্রধান সরকারী ঘাঁটি ও চীনের রাজধানী নানকিং-এর প্রবেশপথে অবস্থিত সুচো অভিমুখে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে কম্যুনিস্টরা জেনারেল চেন ই লিওনো চেং-এর অধীনে প্রায় ৬ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

৩রা নভেম্বর—মিঃ হ্যারী এস্ ট্রুম্যান অদ্য চারি বৎসরের জন্য পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী গভর্ণর টমাস্ ডিউই মিঃ ট্রুম্যানের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ডেমোক্র্যাট দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কংগ্রেসের উভয় পরিষদেই অধিক সংখ্যক আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

অদ্য চীনের প্রধান মন্ত্রী ও ওয়েন-হান্-এর নেতৃত্বে চীনা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছে।

৪ঠা নভেম্বর—প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ অদ্য রাশিয়ার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছে।

বিশিষ্ট বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক পি এস্ ব্ল্যাকেটকে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইংরেজ কবি মিঃ টি এস্ এলিয়টকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য কায়রোতে সাংবাদিকগণকে বলেন যে, অদূরভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। রাজা ফারুক প্রকাশ্য দরবারে পণ্ডিতজীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

৬ই নবেম্বর—প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়া ইসরাইল বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান সরবরাহ করিতেছে।

৭ই নবেম্বর—ভিয়েনাসিনের এক সংবাদে প্রকাশ, চীনের নেতৃবৃন্দ কম্যুনিস্টদের সহিত শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় রত আছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন **সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ**

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 20th November, 1948. [৩য় সংখ্যা

পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল ১৪ই নবেম্বর ষষ্টিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, এই উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সুযোগ্য সেনানী। বীর্য তাঁহার অপ্রতিহত এবং অধৃষ্য; সত্যে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং কর্মে তিনি অকুতোভয়। বস্তুত মানবতার সমগ্র গুণরাজি পণ্ডিত জওহরলালে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পরাধীন ভারতের আকাশে ভারতের এই বরেণ্য সন্তান ভাস্বর জ্যোতিষ্কের মত দুর্যোগের অন্ধকার আলো করিয়া জাতিকে পথ দেখাইয়াছেন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তাঁহার কর্মোদ্যম প্রখরতর প্রভায় পথের অন্ধকার দূর করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তিনি সতত অনলস, সাধনায় তিনি অতন্দ্রিত। বয়োধর্মকে অতিক্রম করিয়া যৌবনের শক্তি তাঁহার দেহ-মনে সর্বদা দৃপ্ত এবং নবীন। সঙ্কল্পে তিনি স্থির, বিচারে তিনি ধীর। দৃষ্টি তাঁহার দুর্যোগের আবর্তের মধ্যেও অপরিচ্ছিন্ন। বস্তুত ভারতের মহামানব গান্ধীজী অধ্যাত্মের ধ্যানময় অনুভূতি এবং প্রাণময় প্রেরণা পণ্ডিত জওহরলালের কর্মনিষ্ঠায় সমভাবে মূর্ত হইয়াছে। জওহরলাল হৃদয়বান পুরুষ। হৃদয়বত্তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি তাঁহার চরিত্রকে উগ্র-মধুরে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে। বৃহৎ আদর্শের ভাবময় আবেগ পণ্ডিত জওহরলালের রাজনীতিক প্রতিভার সংমিশ্রণে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব বিস্তারে বলিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। চরিত্রের ঔদার্য তাঁহার প্রাণবলকে প্রাচুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। ভাবাদর্শের প্রেরণায় এবং সে আদর্শকে বাস্তব রূপ দিবার তীক্ষ্ণ মনস্বিতায় জওহরলালের জীবন সত্যই বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে এবং তাহা সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জওহরলালের স্বদেশপ্রেম অতুলনীয়; কিন্তু তাঁহার এই স্বদেশপ্রেম ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে সঙ্কীর্ণতা লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে ব্যাপ্ত মহিমায় দীপ্ত হইয়া তাহা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। জওহরলালের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত রাজনীতির মূলে প্রেরণা তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। উপনিষদের উদারছন্দে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং বেদান্তের সমদর্শন তাঁহার রাজনীতিক বাস্তব সাধনাকে শক্তি সঞ্চার তাঁহার জীবনকে কাব্যময় করিয়া তুলিয়াছে। জওহরলালের রাজনীতিক সাধনা ভারতকে মহীয়ান্ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে এসিয়ার রাজনীতিক জাগরণেও তাহা নবশক্তির উন্মেষ সাধন করিয়াছে। এই দিক হইতে জওহরলাল শুধু ভারতেরই গৌরব নহেন, বিরাট এবং বিশাল প্রাচ্য ভূখণ্ডের সর্বত্র তিনি আশা ও উদ্দীপনার প্রতীকস্বরূপ। এসিয়ার প্রগতিশীল তরুণ সমাজ জওহরলালের অনুরক্ত এবং তাঁহার আদর্শে উদ্দীপ্ত। সঙ্কীর্ণ ভেদ-বিভেদের অন্ধতা এবং মোহ এমন উদার এবং বলিষ্ঠ চরিত্রের প্রভাবের কাছে তিষ্ঠিতে পারে না, সমাজবিরোধী বর্বরতা এমন জীবনের সুসংস্কৃত মহিমার কাছে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং পশুত্ব ইহার নিকট অবনত হইয়া পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরবর্তীকালের ইতিহাস এই সত্য প্রতিপন্ন করিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল বীর্যবলে বর্বরতাকে রুদ্ধ করিয়াছেন, নরঘাতক হিংস্রতাকে তিনি প্রতিহত করিয়া মানবতার উদার মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু সাধনা তাঁহার এখনও সমাপ্ত হয় নাই। মধ্যযুগীয় বর্বর মনোবৃত্তি এখনও ইতস্তত অনর্থ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জওহরলাল দেবতার দীপহস্তে আসিয়াছেন, আমরা জানি, তাহার পথে কেহ অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিবে না। বিদেশীর বন্ধন-শৃঙ্খলকে তিনি বিচূর্ণ করিয়াছেন, মানবতার বিরোধীদের সব উদ্যমকে ব্যর্থ করিতেও তাঁহার পক্ষে বিলম্ব ঘটিবে না। সত্য জয়যুক্ত হইবেই। জওহরলালের সমগ্র সাধনা মানবতার সুমহান্ সত্যে দীপ্ত। তাঁহার জীবন-বীণায় ভারতের নবজাগরণের ঝঙ্কার উঠিয়াছে। তাঁহার সাধনায় প্রাচ্য-জগতে অভ্যুত্থানের মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার উদার আন্তর্জাতিক অনুভূতিতে বিশ্বজগতে নূতন আশা জাগিয়াছে। ভারত এবং জগতের এই নব জাগরণ-যুগের প্রভাত-সূর্য বীর্যময় জওহরলালকে আমরা বন্দনা করিতেছি।

মীমাংসার পথ

পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগের গতি রুদ্ধ হয় নাই। সর্দার প্যাটেল কিছুদিন পূর্বে নাগপুরের বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, পূর্ববঙ্গ হইতে এমন ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ যদি নিবারিত না হয়, অথবা পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্ট ইহা নিবারণ না করেন, তবে সেক্ষেত্রে এই বৃহৎসংখ্যক বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতি অর্থাৎ বসবাসের জন্য পাকিস্থানকে উপযুক্ত ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইবে। কথাটা সোজা এবং সরল। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন সর্দারজীর এই উক্তিতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ময়মনসিংহের বক্তৃতায় বীররসে অভিনয় করিয়া বলিয়াছেন—যুদ্ধ চাও? আমরা তাহাতে পশ্চাৎপদ নহি, প্রস্তুত। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর এই শ্রেণীর বীরত্বকে আমরা কোন গুরুত্ব দিতে চাই না; কারণ বাস্তব অবস্থা আমাদের জানা আছে।

নব্য ভারতের সিংহাসনে জওহরলালের দাবী অবিসংবাদিত। তিনি অত্যুন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সংকল্প তাঁর অনমনীয়, সাহস তাঁর অদম্য। অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা-উজ্জ্বল চরিত্র—এ দুটি তাঁকে বহু ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। রাজনৈতিক সংঘাত—যেখানে প্রতারণা আর আত্মবঞ্চনা বার বার সংবদ্ধতাকে বিনাশ করেছে, জওহরলাল তারই মধ্যে পবিত্রতার মান উচ্চ করে দিয়েছেন। সত্য যেখানে বিঘ্নে কণ্টকিত সেখানেও তিনি সত্যকেই অবলম্বন করেন; আর মিথ্যা যেখানে সহজ সুন্দর, সেখানেও তিনি মিথ্যার সঙ্গে মিতালি করেন না। কূটনীতির পথ যতখানি নীচু, সে পথে সাফল্য ততখানি সহজ—জওহরলালের বুদ্ধি-উজ্জ্বল মন স্পষ্ট ভাষায় বিরক্তি জানিয়ে সে পথ থেকে চলে আসেন। উদ্দেশ্যের এই পবিত্রতা, সত্যাশ্রয়ের এই অবিচলতা স্বাধীনতা সংগ্রামে জওহরলালের সবচেয়ে বড় দান।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ মার্চ, ১৯৩৮

জনতা ও জননেতা

এই রচনাটি পণ্ডিতজীর নিজের লেখা। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে একটি সাময়িকপত্রে "রাষ্ট্রপতি" শিরোনামায় "চাণক্য" এই ছদ্ম নামে পণ্ডিতজী এইআত্ম-আলেখ্য চিত্রিত করেন। রচনাটিতে তিনি দেশ-বাসীর নিকট আবেদন করেন যে, তাঁকে যেন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি করা না হয়। পর পর দুইবার রাষ্ট্রপতি থাকার পরও তৃতীয়বারের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত হইলে তিনি এই আবেদন প্রচারের প্রয়োজন বোধ করেন। প্রবন্ধটিতে তাঁর আত্মবিশ্লেষণী প্রকৃতি, এবং সুনিপুণ বিচারশক্তি ও শালীনতাবোধ নিজের ক্ষেত্রেও অতুলনীয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি জওহরলাল কি জয়! জনতার স্রোত ঠেলে যেতে যেতে রাষ্ট্রপতি একবার মুখ তুলে চাইলেন; তাঁর হাত দুটি উপরে উঠে এল, একটা বিনম্র নমস্কারে হল তারা সম্মিলিত। তাঁর রুক্ষ ম্লান মুখমণ্ডল স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। প্রাণময়, ব্যক্তিবৈশিষ্টময় সে হাসি। জনতার মধ্যে যারা সে হাসি দেখল, সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল; বিনিময়ে তারাও হাসল এবং উল্লাস জানাল।

হাসি মিলিয়ে গেল; আবার সে মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও কঠিন হয়ে উঠল; জনতার মধ্যে উদ্দীপনা জাগিয়ে সে মুখ যেমনটি ছিল আবার তাই হয়ে পড়ল। মনে হল, সে হাসি, সে ব্যঞ্জনার পশ্চাতে কোনো সত্য নেই, যে জনতা তাঁকে এতো ভালবাসে, তারই শুভেচ্ছা-টুকু আদায় করার কৌশলমাত্র সেই হাসি। তাই কি সত্যি?

আবার তাঁর দিকে ভালো করে তাকানো যাক। মানুষের বিরাট মিছিল। সহস্র সহস্র লোক তাঁর গাড়িখানা ঘিরে ফেলেছে, বিদায়ের অশ্রু-উল্লাসের মধ্যে দিয়ে জানাচ্ছে তাঁকে পুলক-বেদনা। তিনি তখন গাড়িতে তাঁর আসনের উপর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে সুদীর্ঘ ও দেবতার মতো শান্ত দেখাচ্ছে —উচ্ছ্বসিত জনতার মাঝে তিনি সম্পূর্ণ অবিচলিত।

সহসা মুখে আবার সেই হাসি খেলে গেল। স্মিত হাসির মাঝে দেখা ছিল সশব্দ উচ্চহাসি। আবহাওয়ার পট-পরিবর্তন হল। জনতাও সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল, কিন্তু জানল না কি দেখে তারা হাসছে। এবার তাঁকে আর দেবতার মতো দেখাচ্ছে না; মানুষের মাঝে তাঁকে মানুষেরই মতো দেখাচ্ছে—হাজার মানুষ যারা তাঁর গাড়িখানা ঘিরে রেখেছে তারা যেন তাঁরই আত্মার আত্মীয়, সখ্যসূত্রে আবদ্ধ। জনতা সহর্ষে সপ্রেমে তাঁকে মনের মাঝখানটিতে টেনে নিয়েছে। কিন্তু সে হাসি মিলিয়ে গেল, আবার সেই কঠিন বিষাদমগ্ন মুখ।

এসব কি সত্যি স্বাভাবিক, না নেতৃজন-সুলভ ভেবেচিন্তে তৈরী কর বিচক্ষণ ছলনা মাত্র। সম্ভবত দুই-ই; দীর্ঘকালের অভ্যাস এখন দ্বিতীয় স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। তাকেই বলব সবচেয়ে কার্যকরী 'পোজ' যার মধ্যে পোজ-এর ভঙ্গী মোটেই প্রকাশ পাবে না, আর অভিনেতার পেন্ট ও পাউডার ছাড়াই অভিনয় করে যেতে জওহরলাল তো একেবারে

পাকা। এক আপাতপ্রতীয়মান অনবধানতা দেখিয়ে তিনি জনসাধারণের রঙ্গমঞ্চে চূড়ান্ত কৌশলের সঙ্গে অভিনয় করে থাকেন। এ তাঁকে কোথায় চালিয়ে নেবে, দেশকেই বা কোথায় চালিয়ে নেবে? তাঁর এই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য-হীনতার লক্ষ্যস্থল কোথায়? তাঁর এই মুখোসের অন্তরালে কোন্ বস্তু নিহিত রয়েছে? কোন অভীপ্সা? কোন্ শক্তিসাধ, কোন্ অতৃপ্ত বাসনা?

এসব প্রশ্ন যে-কোনো ব্যাপারেই কৌতূহলের উদ্রেক করে থাকে। আর জওহরলালের ব্যক্তিত্ব যে বস্তু তাতে তাঁর প্রতি কৌতূহল ও মনোযোগ আসতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের নিকট এ সকল প্রশ্নের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, কেননা, ভারতবর্ষের বর্তমানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্ববন্ধন অচ্ছেদ্য, সম্ভবত ভারতের ভবিষ্যৎও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আর তাঁর মধ্যে যে ক্ষমতা রয়েছে তার দ্বারা ভারতের অশেষ মঙ্গল যেমন হতে পারে তেমনি হতে পারে মহা অনিষ্ট। কাজেই এ সকল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ আমাদের করতেই হবে।

প্রায় দু বৎসর তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাতে কোনো কোনো লোকের অনুমান যে, তিনি ওয়ার্কিং কমিটির প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছেন—তিনি অন্যের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে আছেন। তা সত্ত্বেও গণ-সমাজে এবং নানা দল ও তার অনুবর্তী লোকের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও প্রভাব সুনিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তিনি সকলের কাছেই গিয়ে থাকেন; চাষী ও মজুর, জমিদার ও পুঁজিপতি, বণিক ও ফেরিওয়ালা, ব্রাহ্মণ ও অচ্ছুৎ, মুসলমান ও শিখ, পার্শি খৃস্টান ও ইহুদী—এদের সবারই কাছে তাঁর গতায়াত; ভারতীয় জীবনের বিরাট বৈচিত্র্যকে এরা রূপায়িত করে এসেছে। এদের সকলের কাছেই তিনি ঈষৎ ভিন্নরূপ ভাষাতে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন—তাদেরকে স্বপক্ষে টেনে আনার উদ্দেশ্যকে তিনি সর্বদাই কার্যে পরিণত করার প্রয়াসী। তাঁর মতো বয়সের লোকের যতখানি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখলে লোকে আশ্চর্য হয়ে যায় তেমনি উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি এই বিশাল ভারতভূমির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলেছেন, সর্বদাই তিনি অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অভ্যর্থিত হয়েছেন। সুদূর আর্যাবর্ত থেকে কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্যন্ত কোনো বিজয়ী সিজারের মতোই তিনি ছুটে চলেছেন, পশ্চাতে রেখে চলেছেন গৌরব ও যশোগাথা। একি তাঁর কেবল নিজের খেয়ালে কোনো কল্পনার বশবর্তী হয়ে অবিরাম ছুটে চলা? না, এর কোনো গভীর উদ্দেশ্য আছে? নাকি এ এমন

কোনো শক্তির খেলা যা তাঁর নিজের কাছেও অজ্ঞাত? একি তাঁর কোনো শক্তির এষণা, যার কথা তিনি আত্মচরিতে বলেছেন—যে-শক্তি তাঁকে জনতা থেকে জনতায় চালনা করে চলেছে; যে শক্তির বশে তিনি আপন মনে বলে উঠেছেন, "মানুষের এই যে স্রোতোধারা, এর রাশ আমিই হাতে করে টেনে চলেছি এবং আমারই ইচ্ছা তারকার অক্ষরে আকাশের গায়ে লিখে দিয়েছি।"

এই কল্পনার মোড় যদি ঘুরে যায়, তা হলে কি হবে? জওহরলালের ন্যায় মানুষ, যাদের মহৎ ও কল্যাণকর কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে, গণতন্ত্রের পক্ষে তারা নিরাপদ নয়। আপনাকে তিনি গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী বলে থাকেন এবং সর্বান্তঃকরণেই যে বলে থাকেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক মাত্রেই জানেন, মনকে পরিণামে অন্তরের নিকট আত্মবিক্রয় করতেই হয়; এই নীতিশাস্ত্রকে মানুষের অদম্য ইচ্ছা ও বাসনার সঙ্গে সর্বদা খাপ খাওয়ানো যেতে পারে। মোড়টা আর একটু অন্য পথে ঘুরলেই শম্বুকগতি ডেমোক্রেসির সাজসজ্জা ঝেড়ে ফেলে জওহরলাল হয়ত ডিক্টেটর হয়ে যেতে পারতেন। তখনো তিনি হয়ত ডেমোক্রেসি ও সোস্যালিজমের ভাষা ও ধ্বনি ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু ফ্যাসিজম কিভাবে সেই ভাষাকে শৃঙ্খলিত করে তাকে খড়কুটোর মতো ছুড়ে ফেলেছে তা আমাদের অজ্ঞাত নয়।

প্রত্যয় বা স্বভাব কোনোদিক দিয়েই জওহরলাল যে ফ্যাসিস্ট নন, একথা সুনিশ্চিত।

তিনি এত অধিক অভিজাত যে, ফ্যাসিজমের নোংরামি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। তাঁর মুখমণ্ডল এবং কণ্ঠস্বরই আমাদের বলে দেয় যে

"Private faces in public places are better and nicer than public faces in private places."

ফ্যাসিস্টের মুখ হচ্ছে ঐ 'পাবলিক' মুখ যা পাবলিক বা প্রাইভেট কোনো ক্ষেত্রেই সুখকর নয়। জওহরলালের মুখ এবং কণ্ঠস্বর উভয়ই যে ব্যক্তিগত, একথা সুনিশ্চিত। এমন কি জনতার মধ্যেও এর ভুল হওয়ার কথা নয়। আর, তাঁর স্বর হচ্ছে জনসভাসমূহের সুপরিচিত স্বর; এই স্বর প্রতিটি ব্যক্তির কাছে সহজ সত্যের প্রকাশরূপে ফুটে ওঠে। যে-কেউ এই স্বর শোনে কিংবা ঐ স্পর্শপ্রবণ মুখখানা দেখে, সেই আশ্চর্য হয়ে ভাবে এই স্বর এই মুখের অন্তরালে কি নিহিত রয়েছে—কি ভাবনা ও কামনা, কোন দুর্জ্ঞেয় মনোবিক্ষেপ ও চাপা বক্ষোবেদনা; বাধাপ্রাপ্ত কোন্ চিত্তসম্বেগ শক্তিতে রূপান্তরিত; কোন্ বাসনা-রাশি বা তিনি নিজের কাছেও স্বীকার করে নিতে সাহস পান না? জনসভায় যখন বক্তৃতা দেন, চিন্তার ধারাস্রোত তাঁকে অভিভূত করে রাখে। কিন্তু অন্য সময়ে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে অন্তস্তল ধরা পড়ে; কারণ, তাঁর মন নূতন ক্ষেত্রে ও নূতন কল্পনায় উধাও হয়ে ছুটে যায়। মুহূর্তের জন্যে পারিপার্শ্বিক ভুলে যান। স্বীয় মস্তিষ্কের অদৃশ্য প্রাণীদের সঙ্গে অশ্রুতভাষায় আলাপ শুরু করে দেন। জীবনের যাত্রাপথ তাঁর কঠোর এবং ঝটিকা-সঙ্কুল; এ পথে চলতে গিয়ে যে মানবীয় সংস্পর্শ হারিয়েছেন, তার কথা কি তিনি ভেবে থাকেন? এই সংস্পর্শ কি তিনি কামনা করেন? কিংবা জীবনের ভাবী রূপায়নের স্বপ্ন—যে সংঘাত ও বিজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেবে, তারই স্বপ্ন তিনি দেখেন কি? একথা তিনি অবশ্যই ভালভাবে জানেন যে, যে পথ তিনি বেছে নিয়েছেন, লক্ষ্যস্থলে না পেঁৗছানো পর্যন্ত তার মধ্যপথে তিনি বিশ্রাম নিতে পারেন না। সে পথে যে বিজয় লব্ধ হবে, তারও বোঝা হবে বিষম ভারী। যেমন লরেন্স বলেছিলেন আরবদের লক্ষ্য করে, "বিদ্রোহের মাঝপথে বিশ্রামের কোনো কুটির নেইকো,—জয়েরও নেই কোনো বাঁটোয়ারা।"

আনন্দ তিনি পাবেন না জানি; কিন্তু ভাগ্য ও অদৃষ্ট যদি সুপ্রসন্ন হয়, আনন্দের চাইতেও বড়ো কিছু তিনি পেতে পারেন—সে হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি।

জওহরলাল ফ্যাসিস্ট হতে পারেন না। তবু তাঁর মধ্যে সর্বাধিনায়কের সব কিছু উপাদান রয়েছে—বিপুল জনপ্রিয়তা, সুদৃঢ় ইচ্ছা, উৎসাহ, গৌরব, পরিচালন-ক্ষমতা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং জনতার প্রতি তাঁর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং দুর্বল ও অকর্মণ্যের প্রতি একপ্রকার অনুদারতা।

তাঁর মেজাজের খবর সকলেরই জানা আছে। মেজাজ যখন প্রতিকূল থাকে, তখন জোর করে তা দমন করে রাখলেও ওষ্ঠের কুঞ্চনে সেটি বেরিয়ে পড়ে। কার্য সিদ্ধির জন্য—যা তিনি পছন্দ করেন না, তাকে ঢেলে সাজবার জন্য তাঁর আগ্রহের যে আতিশয্য, সেটা ডেমোক্রেসির শম্বুক গতির সঙ্গে খাপ খায় না। কাজের তিনি কাটছাঁট করতে চান না বটে, কিন্তু দেখতে চান যে, তা ঠিক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অবনমিত হবে। শান্তির সময়ে তিনি একজন কার্য-নির্বাহক হিসাবে যোগ্যতা ও কৃতকার্যতা অবশ্যই দেখাতে পারতেন। কিন্তু এই বিপ্লবের যুগে সিজারিজম্ অনাহূতরূপেই এসে পড়ে; তাহলে জওহরলালও নিজেকে একজন সিজার-রূপে কল্পনা করে নিতে পারতেন, এ কি অসম্ভব?

এখানেই জওহরলালের তথা ভারতবর্ষের বিপদ নিহিত আছে। কারণ, ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করবে, সেটা সিজারিজমের সাহায্যে নয়। কোনো সুযোগ্য হিতপ্রয়াসী একনায়কত্বের অধীনে ভারতবর্ষ হয়ত কিছুটা সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, কিন্তু তাতে সে বাধাগ্রস্ত এবং জনগণের মুক্তির পথ দীর্ঘায়ত হয়ে পড়বে।

জওহরলাল ক্রমাগত দু'বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে আসছেন। কোনো কোনো দিক দিয়ে তিনি নিজেকে এমনি অপরিহার্য করে তুলেছেন যে, অনেকে বলছে তাঁকে তৃতীয়বারও সভাপতি করা হোক। কিন্তু তাতে ভারতের প্রতি এবং জওহরলালের নিজের প্রতি এমন অনিষ্ট করা হবে, যা আর কিছুতে সম্ভব নয়। তাঁকে তৃতীয়বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত করলে কংগ্রেসকে ফেলে আমরা একটিমাত্র লোককেই বড় করে তুলব। তাতে সিজারিজমের পদ্ধতিতেই লোককে ভাবতে শেখানো হবে। জওহরলালের মধ্যে তা হলে ভ্রান্ত ভাবধর্মেরই প্ররোচনা দেওয়া হবে এবং গর্ব ও অহং ভাবকে বৃদ্ধি করা হবে। তাঁর মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে, এই ভার বহনের কিংবা ভারতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। অফিস পরিচালনার প্রতি তাঁর মনোযোগের যে সুস্পষ্ট অভাব রয়েছে, তা সত্ত্বেও গত সতেরো বৎসর ধরে তিনি কংগ্রেসের নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনা করে আসছেন, একথা মনে রাখতে হবে। তিনি যে অপরিহার্য, একথা তাঁকে ভেবে চলতেই হবে; অপর লোককে কিন্তু এভাবে ভাবতে দেওয়া চলবে না। পর পর তিনবারের জন্য ভারত তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পেতে পারে না।

এর একটা ব্যক্তিগত যুক্তিও রয়েছে। তাঁর বীরোচিত কথাবার্তা সত্ত্বেও জওহরলাল যে ক্লান্ত এবং স্তিমিত, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ক্রমাগত সভাপতি হতে থাকলে তাঁর জীবনের অগ্রগতিতে ভাঁটা পড়ে আসবে। তাঁর বিশ্রাম নেওয়া চলতেই পারে না, কেননা, যে-ব্যক্তি শার্দূলের পিঠে সোয়ার হয়েছে তাঁর পক্ষে নেমে আসা অসম্ভব। তবে আমরা অন্ততঃ তাঁকে ভুল পথে যাওয়া থেকে নিরস্ত করতে পারি, আর গুরু কর্মভার ও দায়িত্বের বোঝার চাপে তাঁর মানসিক বৈক্লব্য ঘটলে তার থেকে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারি। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে ভাল কাজ আশা করার আমাদের অধিকার রয়েছে যে। বহুল মান ও প্রশংসার চাপে আমরা যেন তাঁকে বা তাঁর কাজকে নষ্ট হতে না দিই। তাঁর মধ্যে আত্ম-গৌরব যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা ইতি-মধ্যেই প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। একে প্রতিরোধ করতেই হবে। আমরা আর সিজার চাই না।

• অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

সন্ধ্যাই শেষে দেখা দিল। শরীর ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম। এখন এই লম্বা পথটা নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া চড়াই-উৎরাই করিয়া পাহাড়ের মাথায় ফোর্টে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে, ছবিটা একটুও আরামপ্রদ বোধ হইল না। কাঁদিলে যদি উপায় থাকিত, তবে কাঁদিতেও রাজী ছিলাম। এমনই মনের অবস্থা!

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আর সকলে কি বলেন?"

"কিছু বলেন না, শুধু ভাবছেন। একমাত্র সেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঘোড়া বা ডান্ডী না হলে পায়ে হেঁটে যাবেন না।"

সেই তিনি মানে যিনি সিউড়ী স্টেশনে 'সেকন্ড কেলাশ ছাড়া পাদমেকং ন গচ্ছামি' ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ভীষ্মের জন্য ভাবিত হইলাম না, কারণ দরকার হইলেই তিনি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে প্রস্তুত হইবেন। তাঁর সংস্কারযুক্ত মনের উপর আমার ভরসা ছিল। তবু মনে মনে চটিয়া গেলাম। মুখের কথা বলিয়াই ইঁহারা মুক্ত হন, কথাটার যে কোন দাম থাকিতে পারে, এ তাঁরা যেন গ্রাহ্যই করিতে চান না।

শরৎবাবুকেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বলে তো এলেন যে, যাবেন না। করবেন কি শুনি?"

শরৎবাবু নির্বিকার উত্তর দিলেন,—"না গেলে এখানেই থাকতে হবে।"

"এখানে? এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় থাকবেন শুনি?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শরৎবাবু খোলা দরজার পথে দৃষ্টিটাকে প্রেরণ করিয়া থাকিবার মত জায়গা খুঁজিতে লাগিলেন।

কহিলাম,—"স্টেশন মাস্টারটাও বোধ হয় ফিরতি ট্রেনে আলিপুর ডুয়ার্সে গিয়ে রাত কাটায়। এখানে রাত্রে জনমানব থাকে আপনি মনে করেন?"

শরৎবাবু মাথা নাড়িলেন, অর্থাৎ তিনি তাহা মনে করেন না। শরৎবাবু কি মনে করেন, তাহা মনে করিবার ভার তাঁহার উপরই ছাড়িয়া দিলাম। নিজে কি মনে করি, এই প্রশ্নটা এতক্ষণে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

মন সজাগ হইয়া উঠিল। না, এখানে থাকা চলিতেই পারে না। যে-ভাবেই হউক, ফোর্টে গিয়া পোঁছিতেই হইবে। শরীর ক্লান্ত বোধ করিতেছি, তা সত্য। কিন্তু প্রাণ যে তার চেয়েও বেশী সত্য। ঘোড়া ডান্ডী না জোটে পায়ে হাঁটিয়াই এ পথটা মারিয়া দিতে হইবে—মনের হুকুম ও সম্মতি দুই-ই পাইয়া গেলাম।

আঠারো বছর আগের ব্যাপার, রক্তে তখনও বেগ ছিল, মনে তখনও স্থবিরত্ব আসে নাই। যাইতে হইবে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ামাত্র মন নোঙ্গর তুলিয়া ফেলিল। শরীরে সায় পাইলাম, পথের জন্য পায়ের পেশী প্রস্তুত হইল এবং রক্তের পালে উৎসাহের বায়ু জোর ফুঁ দিল। চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

কহিলাম,—"বাইরে চলুন।"

শরৎবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বাহির হইবার জন্য চেয়ারটাকে পিছনে ঠেলিয়া দিলেন, চেয়ারটা আর্ত চীৎকার তুলিল, যেন বলিতে চায় যে, এ কেমন ব্যবহার, এতক্ষণ উপবেশনের পরে এই কি বিদায়?

তিনি বিপজ্জনক স্থানটুকু পূর্ববৎ লম্ফ প্রদানে পার হইয়া গেলেন। আমিও মহাজনেরই যেন গত স পন্থায় বাহির হইয়া আসিলাম।

শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হেঁটে যেতে পারবেন তো?"

শরৎবাবু শুধু হাস্য করিলেন। ভাবখানা এই যে, এমন অপমানজনক প্রশ্নের তিনি উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন। শরৎবাবু পালোয়ান লোক, বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বয়স তখনও পঁচিশের অনেক নীচে, সবই আমি জানিতাম। কিন্তু শরীরের ওজনও তো কম নহে। সম্বলের মধ্যে তো ঐ আমারই মত দুইখানা ঠ্যাং, চতুষ্পদ হইলে নয় কোন কথা ছিল না। তা ছাড়া, আমি শুনিয়াছিলাম যে, যত উপরে উঠা যায়, ততই নাকি শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। তাই শরৎবাবুকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন কিনা। তাঁর হাস্যে নিশ্চিন্ত হইয়া অগ্রসর হইলাম।

প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইতেই দারোগার মুখোমুখী পড়িয়া গেলাম, তিনি আমাদের খোঁজেই আসিতেছিলেন। তিনি কি যেন বলিতে চাহিতেছিলেন, বাধা দিয়া কহিলাম,—"এদিকে আসুন", বলিয়া আর একটু দূরে সরিয়া লইলাম।

দূরে সরিবার কারণ ভুটিয়া কুলীরা। ভুটিয়ারাও মানুষ এবং আমাদের মতই মানুষ, এ-কথা অবশ্যই আমি স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। কিন্তু তাই বলিয়া তাদের জামা ও গায়ের গন্ধও নাক ভরিয়া শোষণ করিতে আমি বাধ্য থাকিব, ইহা কোন কাজের কথা নহে।

শুনিতে পাই পাহাড়েও জল পাওয়া যায়। শোনা-কথার প্রয়োজন কি, আমাদের দেশে সমতল ভূমিতে যে-গুলি নদী, তাহারাই তো এদের এখানে প্রথমে ঝরণা হইয়া নামে। মরুভূমির দেশের লোক নয়, তবু ইহারা স্নান করে না কেন? বরফ-গলা জলে শরীরে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়? বেশ, জামাগুলির তো প্রাণ নাই, ও-গুলিকে মাঝে মাঝে ময়লা ও গন্ধমুক্ত করিতে দোষ কি? প্রত্যেকেই যেন এক একটি ছোটখাটো চলন্ত গন্ধমাদন অথবা গন্ধর্ববিশেষ।

বন্ধুরাও কাছে আসিয়া জমায়েৎ হইলেন। বেশী কথা বা বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে না যাইয়া আমি সোজা জানাইয়া দিলাম যে, ঘোড়া-ডান্ডীর অপেক্ষায় এখানে পড়িয়া থাকা চলিবে না, পায়ে হাঁটিয়াই যাইব। আমাদের মধ্যে নৃপেন মৈত্র নামক বহরমপুরের বছর আঠারোর একটি ছেলে ছিল, পথে তার একটু জ্বরভাব হয়। নৃপেনের জন্য একটি ঘোড়া রাখিয়া বাকীগুলি যেন ভাগাভাগি করিয়া লওয়া হয়, এই অনুরোধ জানাইলাম।

তারপর দারোগাবাবুকে কহিলাম,—"আমরা যাচ্ছি। কয়েকজন কুলী এগিয়ে গেছে, পথ ঠিক চিনতে পারব, আপনারা সব ঠিকঠাক করে পিছনে আসুন।"

বলিয়া স্টেশনের বাহিরে আসিলাম, সঙ্গে সকলেই আসিলেন। আসিয়া দেখি, পাঁচটি ঘোড়া আছে, ছ' নম্বরটিকে দেখা যাইতেছে না। খবর লইয়া জানা গেল যে, রংপুর না বগুড়া হইতে আগন্তুক এক ভদ্রলোক তাহাতে চাপিয়া আগাইয়া গেছেন।

লোকটির বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না, গতিক তেমন সুবিধা নয় দেখিয়া অবস্থা বুঝিয়া নিজের ব্যবস্থা করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। এমন নিঃসঙ্কোচ মূর্তিমান স্বার্থটিকে দেখিবার একটা অদম্য ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইল। ঘোড়ার যদি তার সত্যিকার প্রয়োজনই থাকিত, তবে অন্যান্য বন্ধুদের উপর অনায়াসে তিনি নির্ভর করিতে পারিতেন, কেহই তাঁকে ঘোড়া হইতে বঞ্চিত করিত না। ভয় ও স্বার্থ তাঁকে সেটুকু ধৈর্য বা অপেক্ষা করিবার শক্তি দেয় নাই। লোকটির উপর একটা বিজাতীয় ঘৃণাই জন্মিয়া গেল। পরে জানিয়াছিলাম যে, তিনি কটিবাত ও হার্ট-বাতের রোগী ছিলেন, ঘোড়া দেখিয়াই তিনি খোঁড়া হন নাই।

কাপড়ের কোঁচা দুই পায়ের মধ্য দিয়া গলাইয়া মল্লকচ্ছ মারিয়া মল্ল সাজিলাম, কাঁধের র‍্যাপারটাকে নামাইয়া কষিয়া কোমরবন্ধ

করিলাম এবং পাঞ্জাবীর আস্তিনটা গুটাইয়া কনুই অবধি মুক্ত রাখিলাম। এখন 'হর-হর, বম্-বম্' বলিয়া পা চালাইলেই হয়।

শরৎবাবু ও আমি দুই পদাতিক পথে নামিয়া পড়িলাম। আগে এক ঘোড়সোয়ার গিয়াছেন, তাকে অর্থাৎ ছ নম্বরের অশ্বারোহীকে গিয়া ধরা চাই। গভীর বনের মধ্যেই ছিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে গভীরতর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

বনের ও পাহাড়ের পথে দুইজনে পাশাপাশি চলিয়াছি। দুই পাশে গভীর অরণ্য, ঝিঁঝিঁ ও পতঙ্গের একটানা শব্দে বনভূমির নিস্তব্ধতাকে গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। জনমানবের চিহ্ন নাই, বন্যশ্বাপদেরা দূরে বনে ও গুহায় রাত্রির অপেক্ষা করিয়া দিনমান আলস্য-বিশ্রামে কাটাইতেছে—পথ চলিতে চলিতে আমার এতদিনের পরিচিত মন বদলাইয়া গেল।

প্রাণের এক বলিষ্ঠ রূপ দেখিলাম নিজের মধ্যে। একদিন এই অরণ্য-জগতে বনস্পতি হইয়া একপায়ে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া আকাশের আলোর তপস্যা করিয়াছি, শাখা-পল্লবের করপুট ভরিয়া রৌদ্ররস পান করিয়াছি, আর মাটির গভীরে শত শিকড়ের মুখে ধরণীর রসস্তন্য প্রবল পিপাসায় পূর্ণবলে আকর্ষণ করিয়াছি। এই অরণ্য-জগতের আমিও একদিন একটি অধিবাসী ছিলাম, আজ তাহা পার হইয়া প্রাণ-প্রবাহের পথে মানুষের ঘাটে আসিয়া আমি থামিয়াছি। বহু বহু যুগের অতীত একই সময়ে আমার চেতনায় রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। আমি যেন না জানিয়াও নিশ্চিত জানিতে পারিলাম যে, আমি আজিকার নয়, খণ্ডকালেরও নয়—আমি সৃষ্টির আদিতে ছিলাম, বর্তমানে আছি এবং এই প্রাণের ধারা-পথে ভবিষ্যতের শেষ সীমা পার হইয়াও আমার শেষ হইবে না।

আমার প্রাণের এই রূপেই আমি সেদিন দেখিতে পাইয়াছিলাম। বক্সা স্টেশন হইতে পাহাড়ের মাথায় বক্সা দুর্গ পর্যন্ত হাঁটাপথের এই অরণ্যযাত্রাটি আমার জীবনের অভিজ্ঞতার ঘরে একটি পরম সম্পদ। এই দিনের অনুভূতিটি বক্সা দুর্গে পেঁছিয়া অবসর মত আমি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। আঠারো বছর পূর্বের সে-লেখার যেটুকু আছে, তাহারই খানিকটা আমি উদ্ধৃত করিতেছি।

সেদিন নিজেকে যাহা জানিয়াছিলাম, অথবা যে অনুভূতিটি নিজের সম্বন্ধে আমার হইয়াছিল, তাহার অবশ্য আজ আর অপরের কাছে কোন দাম বা মূল্য নাই। তবু একজন বিপ্লবীর মনোভাবের খানিকটা আভাস হয়তো ইহাতে পাওয়া যাইতে পারে।

সেদিন যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা এই—

"মিনিট পনেরো হয় বক্সা স্টেশনে বন্ধুদের পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। নির্জন গভীর বন চারিদিকে, পাশে শরৎবাবু।

হঠাৎ প্রশ্ন জাগিল—কে আমি? কোথায় চলিয়াছি? কোথায় আমার ঘরবাড়ি, বাপ-মা-ভাই-বোন-স্ত্রী-কন্যা, আর আমি কিসের জন্য এই বনের মধ্যে ক্লান্ত দেহে পথ চলিতেছি? এই দুর্ভোগ আমার কিসের জন্য? কে আমি?

পথ চলিতে চলিতে নিজের ভিতরটায় দৃষ্টি দিলাম। দেখিলাম, বুকের মধ্যে এক বিদ্রোহী মৌন হইয়া আছে—তার চোয়াল কঠিন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়নিবদ্ধ, চোখে তার ক্ষমাশূন্য দৃষ্টি, সে-দৃষ্টি পাগলের চোখের মত অর্থহীন ও যোগীর চোখের ন্যায় পলকহীন। পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য যাদেরই পায়ে শিকল পরানো হইয়াছে, আমার পায়ে আজ সেই সকলের শিকল-বন্ধনের শব্দ শুনিতেছি। আমি জগতের সমস্ত বিদ্রোহী মানবাত্মার প্রতিনিধি।

বনের মধ্যে তাই আমি সিংহের মত আজ একাকী গহনচারী। আমি যেদিন দিনের আলোকে লোকালয়ে বাহির হইব, সেদিন মানব-সমাজের মুক্তির দিন। ভিতরের বিদ্রোহীর মৌন-ভঙ্গের দিন সেটি।"

আঠারো বছর পরে আজ দেখিতেছি যে, সে-বিদ্রোহীর মৌন-ভঙ্গ তো দূরের কথা, সে-বিদ্রোহীই বুকের কোন প্রত্যন্ত দেশে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। আমাকে দিয়া এ মহা-বিদ্রোহীর স্বপ্ন সার্থক হয় নাই এবং হইবে না, ইহা আমি জানি। আর ইহাও জানি যে, এই বিদ্রোহী একদিন সত্যিকার বীরের তনুতে তনু গ্রহণ করিবেন। সেদিন প্রলয়ংকর শঙ্কর ও দক্ষিণমুখ শিব সেই বীরের মধ্যে একাধারে শিব-শঙ্করের মূর্তিতে দেখা দিবেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্য ইতিহাসের তিনিই চালক ও নেতা, ধারক ও বাহক। নব মহাভারতের তিনিই নব মহাবীর।

এই অরণ্যপথ-যাত্রার আর একটি ছবিও দেখিতেছি সেদিনের ডায়েরীতে লেখা আছে। এটুকুও উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ নাই বা করিলাম।—

"বনের মধ্যে কিছুদূর আসিয়া একটি গাছ দেখিয়াছিলাম। গাছটি আমার কাছে শক্তির একটি প্রতীক হইয়া আছে। প্রকাণ্ড গাছ, আশেপাশের কোন গাছই এরকম মোটা বা দীর্ঘ নয়। গাছটার মাথাটা নাই। মনে হয়, মাথাটা ডালাপালা সমেত কেহ মোচড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছে। এখনও কাণ্ডটি যে-দৈর্ঘ্য লইয়া খাড়া আছে, তাহাও কম নহে। হয়তো ঝড়ের সঙ্গে সমস্ত বনের পক্ষ হইয়া এ লড়াই করিয়াছিল। এ-কে ভূমিশায়ী করিবার জন্য ঝড় যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তবু উন্মূল করিয়া ভূমিশয্যা লওয়াইতে পারে নাই—এক পায়ে এক স্থানে দাঁড়াইয়াই বনের বীর বনস্পতি ঝটিকার সঙ্গে সংগ্রাম চালাইয়াছে।

অবশেষে আকাশের কালো মেঘ হইতে বজ্র বাহির হইয়া আসিয়াছে। অটল স্থিরতায় এ সমুন্নত মস্তকে আকাশের বজ্রকে অবরোধ করিয়াছে, তাই এর মস্তক আজ দেহচ্যুত হইয়াছে—কিন্তু হার সে মানে নাই।

শক্তিমান যোদ্ধার এর চেয়ে বলিষ্ঠতর মূর্তি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। সত্যিকার যোদ্ধার বোধ হয় এই রকম পরিণামই হইয়া থাকে। মানুষের সমাজেও কত বীরের মাথা খণ্ডিত হইয়া ধূলায় পড়িয়াছে। ইহাদের স্মরণেও শক্তি পাওয়া যায়, সম্মান করিতে পারিলে নিজেদের পৌরুষেও তেজ সংক্রামিত হয়। অনায়াসে মাথা দিয়া দেয়, তবু সম্মান দেয় না—মানুষের মহিমা ও বীর্যের কি সীমা আছে!"

এই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের অভিজ্ঞতা একটু যোগ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

বহুদিন যাবত দীনতাকে শাস্ত্রে ও কোন কোন সাধক সমাজে আদর্শ অচরণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং তৃণকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া সুন্দরভাবে নীচু হইবার কৌশলটি আয়ত্ত করিতে বলা হইয়াছে এবং বিরাট বনস্পতি-বটকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখা হইয়াছে। শক্তির দীন রূপটাই অর্থাৎ তামসিক দিকটাই গ্রহণযোগ্য হইল, আর শক্তির বলিষ্ঠ রাজসিক মূর্তিটি অনায়াসে পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু কেন? এ কি শুধু রুচিরই তারতম্য, না শক্তিকে গ্রহণ করার স্বাভাবিক অধিকারের তারতম্য?

তৃণ কেন আদর্শ আচরণের দৃষ্টান্ত হইল? ঝড়ে সে উন্মূলিত হয় না, নত হইয়া ঝড়ের গতিপথকে জায়গা ছাড়িয়া দেয়। অর্থাৎ তৃণ টিকিয়া থাকার কৌশল জানে, এই তো? আর বিরাট বট, সে ঝড়ের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়, তাই উন্মূলিত হয়। অর্থাৎ টিকিয়া থাকার কৌশল তার স্বভাবে সহজাত নয়।

কিন্তু কথাটি কি ঠিক? তৃণ গবাদি পশু কর্তৃক ভক্ষিত হয়, কিন্তু বটকে গ্রাস করিবার খাণ্ডব ক্ষুধা বা শক্তি কোন জীবেরই নাই। তৃণ পদতলে নিত্য মর্দিত হয়, বটকে পদতলে মর্দন করিতে পারে ভূতলে তেমন ভূচর কোথায়? তৃণ কোনদিন ছায়া দেয় না, পাখীকে আশ্রয় দেয় না এবং পথিককে সুখ বিশ্রামের সুযোগ দেয় না। বিরাট বনস্পতিই ধরণীকে কঠিন বন্ধ্যাত্ব হইতে মুক্তি দেয় বলিয়াই ধরণীর ধূলায় তৃণস্তর বিস্তারিত হইবার সুযোগ ও অধিকার পায়। সর্বশেষে, আকাশের ঝড়কে জাগ্রত ও আহ্বান করিবার শক্তি তৃণের নাই। বৃহৎ শক্তিই প্রকৃতির বৃহত্তম শক্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করিয়া তুলিয়া থাকে।

আর টিকিয়া থাকা? কতটুকু বন্ধন মাটির সংগে তৃণের রহিয়াছে? ক্ষুদ্র বালিকার কচি অংগুলীর আকর্ষণেই তাহা উৎপাটিত হইয়া আসে। আর বট? সমস্ত আকাশের ঝটিকার সহস্র বাহুতে তাকে আকর্ষণ করিয়াও সহজে উৎপাটন করা সম্ভব হয় না। অস্তিত্বের সাগরে তৃণ ক্ষণায়ু ক্ষণভংগুর বুদ্বুদ, আর সেই সমুদ্রে বিরাট বনস্পতি অতলোত্থিত মগ্ন গিরি, সমুদ্রের শত তরংগের আঘাত তার গায়ে মায়ের ঘুমপাড়ানী ছন্দের সুকোমল স্নেহস্পর্শ।

তৃণের দীনতা বা নীচুতা মানুষের আদর্শ আচরণ হইতে পারে না এবং হওয়া উচিত নহে। বিরাট বনস্পতির শক্তিমান বলিষ্ঠতাই মানুষের চরিত্রে আদর্শ আচরণ বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার রাজসী শক্তিই ক্রিয়াশীল। মানুষকেও চরিত্রে ও স্বভাবে তার আপন স্রষ্টারই প্রতিরূপ হইতে হইবে। কিন্তু তার পথ তো শক্তিহীন তৃণের তামসিকতা নয়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অর্থাৎ ঐ রাজসী শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলে আমরাও ঈশ্বরসদৃশই হইয়া উঠিতে পারি। সে-পথের সন্ধান শক্তিমান যিনি, শুধু তিনি দিতে পারেন। (ক্রমশ)

জীবাণু ও বসন্তের টিকে

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

জীবাণুর সংগে রোগের সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হবার বহু পূর্ব হতেই রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকে দেবার প্রথা প্রচলিত হয়েছিলো। প্রথম টিকে দেবার প্রথা প্রচলিত হয় বসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য।

বসন্ত একটি বহু প্রাচীন রোগ। প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বেও যে প্রাচ্য দেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় মিশর দেশের মামি হতে। মিশরে পিরামিডের ভিতরে রক্ষিত প্রায় তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন মামির মুখে বসন্ত রোগের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে। প্রাচ্যদেশ হতে ক্রমশ এ রোগ ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। দশম শতাব্দীতে বসন্ত রোগ প্রথম ইউরোপে আসে। পরবর্তী পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপে এমন একটি স্থান ছিলো না যেস্থানে এ রোগ দৃষ্ট না হতো। এশিয়া ও ইউরোপ হতে বিচ্ছিন্ন থাকায় বহুকাল পর্যন্ত আমেরিকাবাসীরা এ রোগের কথা জানতে পারেনি। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন হতে আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে লোক প্রবেশের সংগে সংগে বসন্ত রোগ আমেরিকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে বসন্ত রোগের আক্রমণে আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের প্রায় অর্ধাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রাচ্যদেশে বসন্ত রোগের যেমন প্রথম আবির্ভাব হয়েছিলো তেমনি প্রাচ্যদেশ হতেই এ রোগ প্রতিরোধের জন্যও টিকে দেবার প্রথা ইউরোপে প্রথম আনিত হয়। ইউরোপের লোক প্রথম টিকের কথা জানতে পারে তুরস্ক দেশবাসীদের কাছ হতে। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মণ্টেগু তুরস্কে আসেন রাজদূত (ambassador) হয়ে। লেডী মণ্টেগু ছিলেন খুব মিশুক প্রকৃতির রমণী। তিনি তুরস্কের প্রায় সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে যাতায়াত করে সে দেশের রীতিনীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টায় নিযুক্ত হন। এ সময়ে তুরস্ক হতে ইংলণ্ডে তিনি তার এক বন্ধুকে যে চিঠি লেখেন তার থেকেই ইংলণ্ডের লোক বসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকে দেবার প্রথার কথা প্রথম জানতে পারে। তার চিঠি হতে জানতে পারা যায় প্রতি বৎসর শরত কালের প্রথম ভাগে এক শ্রেণীর বয়স্কা স্ত্রীলোক বসন্ত রোগের প্রতিরোধের জন্য তুরস্কবাসীদের টিকে দিয়ে বেড়ায়। সেই টিকে দেওয়া হতো খাঁটি বসন্ত রোগের বীজ হতে। টিকে দেবার পূর্বে এক এক স্থানে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির নিকট সমবেত হতো। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির হাতে থাকতো একটি মোটা তীক্ষ্ম সূচ ও একটি পাত্রে খানিকটা খাঁটি বসন্তের বীজ। সকলে সমবেত হলে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি একে একে সকলের হাতে বা অন্য যে কোন স্থানে সূচ দিয়ে চামড়া ফুঁড়ে বা আঁচর কেটে সেই সূচেরই মুখে করে কণা পরিমাণ বসন্তের বীজ আঁচরকাটা স্থানে লাগিয়ে দিতো। ছয় সাত দিন পর্যন্ত তাদের শারীরিক অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটতে দেখা যেতো না। অষ্টম দিবসে তাদের মুখে কয়েকটি গোটা দেখা দিত—বিশ ত্রিশটির বেশি নয়। গায়েও হতো প্রবল জ্বর। কিন্তু সে মাত্র তিন চারদিনের জন্য। তারপর জ্বরও সেরে যেতো, মুখের গোটাও মিলিয়ে যেতো। তাদের শরীরে তখন আর রোগের কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া যেতো না। চিঠির শেষাংশে তিনি লেখেন—"টিকে দেবার পর কোন লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এরূপ ঘটনা আমার জানা নেই। আমি এ বিষয়ে নিঃসংশয় যে টিকে লওয়ার মধ্যে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নেই। কারণ আমি নিজেই স্থির করেছি আমার নিজের ছেলের দেহে এর পরীক্ষা করব। আর আমার নিজের দেশের প্রতি ভালবাসা হতে আমি কৃতসংকল্প আমি যখন দেশে ফিরে যাব তখন এদেশের এই আবিষ্কারটি আমার দেশবাসীদের মধ্যে প্রচার করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো।"

দেশে ফিরে লেডী মণ্টেগু তার দেশবাসীদের মধ্যে টিকে দেবার প্রথা প্রচারের চেষ্টায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু বাধা আসলো চারদিক থেকে। মানুষ সাধারণত কোনরকম নতুন আবিষ্কার বা নূতন প্রথা সহজে গ্রহণ করতে চায় না। সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে পরীক্ষার জন্য নিজের দেহে রোগ ডেকে আনা, তাও যে সে রোগ নয় একেবারে বসন্ত, যেমন তেমন সাহসের কাজ ছিল না। তাছাড়া পাদ্রীমহল থেকেও আসলো প্রবল বাধা। এ যে ভগবানের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা—রোগও দেন তিনি, আরোগ্যও করেন তিনি। রোগ প্রতিরোধের এ চেষ্টা তো ভগবানের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়।

চারিদিকের এরূপ প্রবল বাধা সত্ত্বেও লেডী মণ্টেগু কিন্তু নিরস্ত হলেন না। তিনি তাঁর কার্যসিদ্ধির জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সাত জন কয়েদীর জন্য রাজদ্বারে শরণাপন্ন হলেন। এই সাতজন কয়েদীকে বলা হলো তারা যদি স্বেচ্ছায় টিকে নিতে রাজি হয় তাহলে তাদের জেলখানা হতে মুক্তি দেওয়া হবে। জেল কর্তৃপক্ষ লেডী মণ্টেগুর প্রস্তাবে রাজি হলে তিনি একদিন সে সময়কার তিনজন বিখ্যাত ডাক্তারকে সংগে নিয়ে জেলখানায় প্রবেশ করলেন। যথাসময়ে কয়েদীদের দেহে বিষ প্রয়োগ করা হলো। দেশময় পড়ে গেল সাড়া সকলে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো কী হয় দেখবার জন্য। যথাসময়ে কয়েদীদের গায় বসন্তের গোটা বের হলো, কিন্তু তা অতি সামান্যই, জ্বরও হলো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কয়েদীগণ বসন্তের এই সামান্য আক্রমণ হতে নীরোগ হয়ে সুস্থ ও সবল দেহে জেল হতে মুক্তি লাভ করলো। লেডী মণ্টেগু জয়ী হলেন।

কয়েদীদের উপর পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ায় গোটা ইংলণ্ডময় সাড়া পড়ে গেলো। ইংলণ্ডে বসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকে

ইংলণ্ড হতে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও টিকের কথা প্রচার হতে লাগলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই গোটা ইউরোপময় টিকে নেওয়ার প্রথা ফ্যাসনস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু রুশ দেশে টিকে দেবার প্রথা সহজে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। সেখানে বাধা শুধু জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো না—টিকে দেবার রীতি প্রতিষ্ঠিত হবার বিরুদ্ধে সে দেশে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেছিলো ধর্মযাজক সম্প্রদায়। তখন রুশ দেশে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনের রাজত্ব। নিজের দেশ থেকে এই দারুণ ব্যাধি দূর করবার জন্য তিনি স্থির করলেন তিনি নিজে ও তাঁর পুত্র গ্র্যান্ড ডিউক (Grand Duke) টিকে নেবেন। ইংলণ্ড হতে তিনি আহবান করলেন ডাক্তার ডিমস্‌ডেলকে (Dimsdale)। ডাক্তার ডিমস্‌ডেলের তখন ইউরোপময় টিকের প্রক্রিয়ায় অতিশয় পসার ও প্রতিপত্তি। ইংলণ্ড হতে ডাক্তার ডিমস্‌ডেল আসলেন রুশ দেশে সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনকে টিকে দিতে। টিকে দেবার পূর্বে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তারের কানে কানে নিম্নস্বরে স্মরণ করিয়ে দিলেন সম্রাজ্ঞী ও তাঁর পুত্রের জীবন ও মরণ তারি হাতে নির্ভর করছে। মন্ত্রী মহাশয়ের এ ইঙ্গিতের গুপ্ত অর্থ বুঝতে ডাক্তারের দেরী হলো না। তিনি বুঝতে পারলেন টিকে দেবার পর সম্রাজ্ঞীর জীবনের যদি সংশয় ঘটে তাহলে জীবিত অবস্থায় তিনিও ইংলণ্ডে ফিরতে পারবেন না। ডাক্তারের বিপদের কথা সম্রাজ্ঞী নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সঙ্কটকালে ডাক্তার যাতে গোপনে রুশ সাম্রাজ্য হতে বিদেশে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে পারেন সেইজন্য তিনি গোপনে রাজধানী হতে রুশ দেশের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন।

যথাসময়ে সম্রাজ্ঞী ও গ্র্যান্ড ডিউকের দেহে টিকের বীজ প্রয়োগ করা হলো। ডাক্তারের নিজের উপর যেমন বিশ্বাস ছিলো তেমনি বিশ্বাস ছিলো সম্রাজ্ঞীরও ডাক্তারের উপর। টিকে দেবার পর রোগের আক্রমণের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেলে লোকের মন হতে সংশয় দূর হয়ে গেলো। রাজসভার মাননীয় ব্যক্তিগণও তখন একে একে ডাক্তারের কাছে এসে টিকে নিতে আরম্ভ করলেন। তখন হতে রুশ দেশেও টিকে দেবার প্রথা প্রচলন হয়ে গেলো।

এ হলো ষোড়শ শতাব্দীর কথা। এইরূপ বাঙলা টিকে বা খাঁটি বসন্ত রোগের বীজ হতে টিকে দেবার প্রথায় বিপদও ছিলো অনেক। তাতে রোগ প্রতিরোধ না হয়ে রোগের আক্রমণে লোকের জীবনও বিপন্ন হতো। সেইসব টিকের বীজের সঙ্গে থাকতো অন্যান্য নানা-জাতীয় সংক্রামক রোগেরও বীজ যেমন সীফিলিস (Syphilis), টি বি প্রভৃতির। তা ছাড়া টিকে হতে জাত রোগের সামান্য আক্রমণ হতেও সে রোগ ছড়িয়ে যেত অন্যান্য লোকের দেহে। এসব বিপদ দূর হলো যেদিন থেকে গো-বসন্তের বীজ হতে টিকে দেবার প্রথা প্রচলিত হলো। প্রথম গো-বসন্ত বীজের টিকা প্রচলন করেন এডওয়ার্ড জেনের (Edward Jenner) নামক একজন ইংরেজ ডাক্তার।

ডাক্তার হিসেবে জেনের সাহেবের যে সে সময়ে বিশেষ প্রসার বা প্রতিপত্তি ছিলো তা নয়, বস্তুত ভ্যাসিন বা গো-টিকের বীজ (ল্যাটিন কথা Vacea মানে গাভী) আবিষ্কার না করলে তাঁর নাম তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যেতো। শৈশব বা যৌবনে কোন বিষয়েই তার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নি। পাঠ্যাবস্থায় তিনি নিতান্ত চলনসই কবিতা লিখতেন, বাঁশি ও বেহালা বাজাতেন। উজ্জ্বল বর্ণের পাখি ধরার দিকেও ছিলো তার বিশেষ ঝোঁক। ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সে সময়কার জনসাধারণের মধ্যে একটি প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি তাঁর মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। সে সময়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিলো যারা একবার গো-বসন্তে আক্রান্ত হয় তারা বসন্ত রোগে বড় একটা আক্রান্ত হয় না। দ্বিতীয় চার্লসের উপপত্নী ডাচেস্ অব ক্লেভলেণ্ডকে (Duchess of Cleveland) তার এক পূর্ব প্রণয়ী এই বলে একবার অভিশাপ দেন যে বসন্ত হয়ে তার মুখের সৌন্দর্য সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। সম্রাটও তখন তাকে ত্যাগ করবেন। তাতে ডাচেস উত্তর দেন "তোমার অভিশাপে আমার কিছুই হবে না, কারণ একবার আমার গো-বসন্ত হয়ে গেছে।"

পূর্বোক্ত প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে কোনরূপ সত্য নিহিত আছে কিনা জানবার জন্য জেনের সাহেব এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি দেখতে পান যেসব মেয়েরা গোপরিচর্যা বা গোদোহন করে তারা কখনো কখনো গো-বসন্তে আক্রান্ত হলেও সে রোগ তেমন মারাত্মক হয় না। ইহাও তিনি লক্ষ্য করেন যারা একবার গো-বসন্তে আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে কদাচিৎ বসন্ত রোগ হতে দেখা যায়। গো-বসন্ত ও মানুষের গায়ের বসন্ত একই রোগ। প্রভেদ এই গো-বসন্ত মানুষের গায়ের বসন্তের ন্যায় তেমন মারাত্মক নয়। বহুদিন পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার ফলে অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন গো-বসন্তের আক্রমণজনিত প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবদেহে এমন শক্তির উদ্ভব হয় যার ফলে মানুষ বসন্তের আক্রমণকে প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়।

এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবার জন্য তিনি তাঁর গুরু ডাঃ হাণ্টার সাহেবকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা লিখে জানান। হাণ্টার সাহেব উত্তরে লিখলেন—"শুধু ভেবেই নিরস্ত থেকো না, পরীক্ষা কর, ধৈর্যশীল হও ও নির্ভুল হতে চেষ্টা করো।"

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জেনের সাহেব তার উদ্ভাবিত টিকের প্রথম পরীক্ষা করলেন জেমস ফিপস্ (James Phips) নামক একটি অল্প বয়স্ক বালকের উপর। কিছুদিন পূর্বে ফিপসের এক ভাই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছিলো। কিন্তু ফিপস্ ছিলো নির্ভীক। সারা নেলমেস (Sarah nelmes) নামক একজন গোয়ালিনীর গায়ের গো-বসন্তের বীজ নিয়ে জেনের সাহেব ফিপসের গায়ে প্রয়োগ করলেন। তিন চার দিনের মধ্যেই ফিপসের গায় বসন্তের লক্ষণ দেখা দিল—সামান্য কয়েকটি গোটা ও সামান্য জ্বর হয়েই তা সেরে গেলো।

জেনের সাহেবের কৃতিত্ব ফিপসের গায় গো-বসন্তের টিকে প্রয়োগে নয়, তাঁর প্রধান কৃতিত্ব গো-বসন্তের বীজ প্রয়োগ করে মানব দেহকে খাঁটি বসন্তের আক্রমণ হতে রক্ষা করা। এক মাস পর জেনের সাহেব ফিপসের গায়েই খাঁটি বসন্তের বীজ প্রয়োগ করলেন। তার সিদ্ধান্তকে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই তার প্রথম পরীক্ষা। সারা দেশময় লোকে ভয়ে আতঙ্কে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো কী হয় দেখবার জন্য। ডাক্তারের বিরুদ্ধে রুদ্ধ কানাকানিও চলতে লাগলো। সকলেই আশঙ্কা করতে লাগলো টিকের ফলে ফিপসের মৃত্যু ঘটলে ক্রুদ্ধ জনতার হাতে ডাক্তারের লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না, এমন কি প্রাণ যাওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু জেনের সাহেবের মনে কিছুমাত্র ভয় ছিলো না। তিনি জানতেন তার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

দিনের পর দিন কেটে গেল। মাসাধিক-কালের মধ্যেও যখন ফিপসের গায়ে বসন্তের কোন লক্ষণই দেখা গেল না তখন লোকের মন হতে সব সংশয় ও বিরুদ্ধভাব দূর হয়ে গেল। সকলেই বুঝতে পারলো জেনের সাহেবের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত নির্ভুল। সেদিন থেকে প্রতিরোধ চিকিৎসার (Science of Immunity) বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। জেনের সাহেব হলেন তার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। বসন্তের ন্যায় এমন একটি দারুণ ব্যাধির জীবাণুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার উপায় মানুষ প্রথম শিখলো জেনের সাহেবের কাছ হতে। জেনের সাহেব এক রোগকে নির্মূল করবার জন্য অন্য এক রোগ নিয়োগ করেছিলেন। বস্তুত তিনি এক শ্রেণীর জীবাণু দিয়ে অন্য এক শ্রেণীর জীবাণু ধ্বংসেরই উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন যদিও তখন তিনি সে কথা জানতেন না। কারণ জীবাণুর আক্রমণ যে নানাবিধ রোগের কারণ সেকথা তখন লোকের জানা ছিলো না। সেকথা প্রথম আবিষ্কার করেন ফরাসী বিজ্ঞানী মনীষী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur)।

পশ্চিম বঙ্গের অর্থকথা

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে যে-সকল বিভিন্ন কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার ভিতরে খাদ্যশস্যের পরেই আঁশ ও তন্তুজাতীয় পদার্থের স্থান। প্রদেশের মোট ১ কোটি ৩ লক্ষ একর আবাদী জমির ভিতরে ১৯৪৩-৪৪ সালে ২ লক্ষ ৮৫ হাজার একর জমিতে এই সকল আঁশ ও তন্তুজাতীয় পদার্থের চাষ করা হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে এই ২ লক্ষ ৮৫ হাজার একর জমির ভিতরে ৮০০ একর জমিতে তুলার, ২ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জমিতে পাটের এবং ৪ হাজার ৮ শত একর জমিতে তন্তুজাতীয় অন্যান্য পদার্থের চাষ হইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালের পর প্রদেশের কৃষি-ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে আঁশ ও তন্তুজাতীয় পদার্থের জন্য আবাদী জমির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে কেবলমাত্র পাটের জন্যই ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমি চাষ করা হইয়াছে; এমন কি তুলা উৎপাদনের জন্যও ৩৬ হাজার ৩ শত একর জমি ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই বর্তমানে প্রদেশের আঁশ ও তন্তুজাতীয় পদার্থের জন্য ২ লক্ষ ৮৫ হাজার একরের অনেক বেশী জমি যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। (১)

পাট

পাট প্রধানত পূর্ববঙ্গের কৃষিদ্রব্য হইলেও পশ্চিমবঙ্গের তন্তুজাতীয় পদার্থের ভিতরে পাটের স্থানই সর্বপ্রথম। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন সমভূমি এবং সেখানকার জলবায়ু পাট চাষের বিশেষ উপযোগী বলিয়াই পূর্ববঙ্গ পাট সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। সরকারী পূর্বাভাষ অনুসারে পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ সালে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে ৬৮ লক্ষ গাইট (১ গাইট=৪০০ পাউণ্ড) পাট উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ ২৮ হাজার একর জমিতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার গাইটের কম পাট উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ অবিভক্ত বাঙলার পাটের জন্য আবাদী জমির এবং উৎপাদনের সামান্য অংশই পশ্চিম বাঙলা দাবী করিতে পারে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার একরে পাট চাষ করা হইয়াছে; ইহা ছাড়া পাটচাষ নিয়ন্ত্রণমূলক সংশোধিত আইন অনুসারে আরও ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, গত বৎসর যেখানে ২ লক্ষ ২৮ হাজার একর জমিতে পাটচাষ করা হইয়াছে, বর্তমান বৎসরে সেখানে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার একর জমি পাটচাষের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, এইরূপ অনুমান করা চলে।

সরকারী পূর্বাভাস অনুসারে, বর্তমান বৎসরে পূর্ব বাঙলায় ১৮ লক্ষ ৭৭ হাজার একরে ৫৪ লক্ষ ৭৯ হাজার গাইট পাট উৎপন্ন হইবে। (১) পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গের জমির উৎপাদন শক্তি যে বেশী, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অবিভক্ত বাঙলায় একর প্রতি পাট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৫-৩৬ সালের হিসাব অনুসারে, ১৭ ৪/৫ মণ বলিয়া ধরা হইয়াছে। (২) ১৯২২ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত যে সকল পাঁচসালা হিসাব লওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গে একর প্রতি ৩·৭ গাইট, উত্তরবঙ্গে ৩·৫ গাইট এবং পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৩·২ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে। (৩) কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের একর প্রতি উৎপাদন ৩·২ গাইটের কম হইবে, এইরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কাহারও কাহারও মতে প্রদেশের উৎপাদন শক্তির পরিমাণ একর প্রতি ২২ গাইট ধরিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানের অর্থাৎ বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রদেশের মোট উৎপাদনের সহিত তুলনা করিলেও পশ্চিম-বঙ্গের উৎপাদন খুব বেশী বলিয়া মনে হইবে না। বর্তমান বৎসরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার একর জমিতে ২০ লক্ষ ২৫ হাজার গাইট পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। অথচ বর্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার একরের বেশী জমিতে পাটচাষ করা হয় নাই। কাজেই, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পাটের জন্য আবাদী মোট জমির ½ অংশের কিছু বেশী জমি পশ্চিমবঙ্গে চাষ করা হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ১৬ লক্ষ ৯৫ হাজার গাইট এবং মোট আবাদী জমির পরিমাণ যেখানে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার একর, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অংশ যথাক্রমে ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার গাইট এবং ২ লক্ষ ২৯ হাজার একরের বেশী হইবে না। অর্থাৎ, ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের ⅓ অংশের সামান্য বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের হিসাবেও মোটামুটিভাবে একই অবস্থা পরিস্ফুট হইবে। ১৯৪৬ সালের হিসাব অনুসারে বর্তমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ও আবাদী জমির পরিমাণ অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপাদনের ১৯·২% ভাগ এবং আবাদী জমির ২৩·৬% ভাগ ছিল। সেই বৎসর পশ্চিম-বঙ্গের উৎপাদন ও আবাদী জমির পরিমাণ অবিভক্ত ভারতের ৬·২% এবং ৬·০% ভাগ ছিল। অথচ বিহারে সেই বৎসরে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতবর্ষের মোট আবাদী জমির ৭·৭% ভাগে পাটচাষ করা হইয়াছে। কাজেই, দেখা যাইতেছে, ১৯৪৬ সালে বিহারে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বেশী জমিতে পাটচাষ করা হইয়াছিল। উৎপাদনের দিক হইতে বিচার করিলে অবশ্য দেখা যাইবে যে, যদিও বিহারে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশী জমিতে পাটচাষ করা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা কম হইয়াছে। বিহারের উৎপাদন সেই বৎসর ২ লক্ষ ৫১ হাজার গাইট অর্থাৎ সমগ্র ভারতের ৪·৬% ভাগ ছিল। বর্তমান বৎসরে বিহারে পাটের জন্য আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৬৩ হাজার একরে দাঁড়াইলেও পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণ তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালে আসামে আবাদী জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন উভয়ই পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশী ছিল। সেই বৎসর সমগ্র ভারতের আবাদী জমির ৮·৬% ভাগ জমিতে আসাম প্রদেশে (শ্রীহট্ট ছাড়া) মোট উৎপাদনের ৭·৪% ভাগ পাট উৎপন্ন করিয়াছে। বর্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধিত উৎপাদনের ফলে এই অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। (১)

---

1. Statistical Abstract. West Bengal, 1947. Forecast of Jute Crops, West Bengal. Press Note Govt. of West Bengal, Oct. 28, 1948.

1. Official Forecast, Govt. of Pakistan.
2. Report of the Land Revenue Commission Bengal, Vol. II P. 92.
3. Compiled from season and crop Report, Bengal, Statistical Abstract, West Bengal.

1. Forecast of Jute Crop of West Bengal, Bihar and Assam, Calcutta Gazette, July 22, 1948.

অবিভক্ত বাঙলার সব কয়টি পাটের কলই পশ্চিম বাঙলায় অবস্থিত। এই সকল কলকে পূর্বের ন্যায় চালু রাখিতে হইলে যে পরিমাণ কাঁচা পাটের দরকার, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহার পরিমাণ ৬০ লক্ষ গাঁইটের কম হইবে না। কাজেই, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধিত উৎপাদনের হিসাব অনুসারেও পশ্চিমবঙ্গ এই সকল কলের জন্য মোট প্রয়োজনের ৯% ভাগ মাত্র উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু এই হিসাব যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ১৯৪৬ সালে কিংবা ১৯৪৭ সালেও বাঙলাদেশে যে পরিমাণ পাট-চাষ হইয়াছে, তাহা বাঙলাদেশের পাট উৎপাদনের শক্তির সঠিক হিসাব নহে। ১৯৪০ সালের পরে প্রদেশের পাটচাষের পরিমাণকে হ্রাস করিবার জন্য যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয়, তাহাতে উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অবিভক্ত বাঙলাদেশের ১৯৪৭-৪৮ সালের উৎপাদন ১৯৪০ সালের অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করিবার পূর্বেকার উৎপাদনের ৫০% ভাগ মাত্র। ১৯৪০ সালে কেবলমাত্র পশ্চিম বাঙলাতেই ৩ লক্ষ ৯১ হাজার একর জমিতে পাটচাষ করা হইয়াছে; উৎপাদনের পরিমাণও তখন প্রায় ৯ লক্ষ ৪০ হাজার গাঁইট ছিল। ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বাঙলায় পাটচাষের পরিমাণ যেরূপ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকিলে প্রদেশের পাটচাষের পরিমাণ সহজেই বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথা মনে রাখিলে দেখা যাইবে যে, বিহার এবং আসাম উভয় প্রদেশ অপেক্ষাই পশ্চিমবঙ্গের আবাদী জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন বেশী হইবে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধিত চাষ ও উৎপাদন হইতেই ইহা অনুমান করা চলে।

তাহা ছাড়া, প্রদেশের মোট চাহিদা হিসাব করিবার সময়ে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। বর্তমানে পাটকলগুলিকে চালু রাখিতে হইলে যে ৬০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাটের দরকার, তাহা হইতে উৎপন্ন সকল পাটদ্রব্যই প্রদেশের পক্ষে অপরিহার্য নহে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল পাটদ্রব্যের একান্ত দরকার, তাহা ৩০ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট হইতে উৎপন্ন হইতে পরে। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন অবশ্যই আরও অনেক কম হইবে। কাজেই, দেখা যাইতেছে, পাটশিল্প সম্পর্কে পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থা সাধারণত যতটা আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে হইয়া থাকে, প্রকৃত অবস্থা ততটা আশঙ্কাজনক নহে।

পাট উৎপাদন এবং পাটশিল্প সম্পর্কে এই সকল কথা মনে রাখিলেও স্বীকার করিতেই হইবে, প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম। তাহা ছাড়া, এই প্রয়োজন কেবলমাত্র প্রদেশের কিংবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পাটজাত দ্রব্যের প্রয়োজন দ্বারা বিচার করিলেও চলিবে না। পাটজাত দ্রব্যসমূহের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ভিন্নও পশ্চিম বাঙলার পাটশিল্প এবং পাটকলগুলি প্রদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য। প্রদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সংস্থান এবং রপ্তানি বাণিজ্যের দিক্ হইতে পাটশিল্পের গুরুত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। বর্তমান খাদ্যসংকটের দিনে প্রদেশের মোট আবাদী জমিকে ধান এবং পাটচাষের জন্য কিভাবে বণ্টন করা সংগত, তাহা অবশ্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু, ইহা নিঃসংকোচেই বলা চলে যে, প্রদেশের পাটকল-গুলি পূর্ণ-ক্ষমতায় চালু রাখিতে না পারিলে পাটশিল্পে নিযুক্ত বহু লোকের সংস্থান যেরূপ লোপ পাইবে, বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনয়নের জন্য মূল্য দিবার একটি প্রধান সম্পদকেও হারাইতে হইবে।

প্রদেশের পাট উৎপাদনে বিভিন্ন জিলার স্থান সম্পর্কে আলোচনা করিয়াই পাটের কথা শেষ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের জিলা-সমূহের ভিতরে মুর্শিদাবাদে সর্বাপেক্ষা বেশী পাটচাষ হয়। বর্তমান বৎসরে মুর্শিদাবাদ জিলার ৬০ হাজার একরের বেশী জমিতে পাটচাষ হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের পরেই ২৪ পরগণার স্থান; বর্তমান বৎসরে ২৪ পরগণা জিলার ৫৯ হাজার একরের বেশী জমি পাটচাষের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া হুগলী (৪২ হাজার একর), নদীয়া (৩৭ হাজার একর), জলপাই-গুড়ি (২৬ হাজার একর), মালদহ (২০ হাজার একর) এবং পশ্চিম দিনাজপুর (১৯ হাজার একর) জিলাতেও যথেষ্ট পরিমাণে পাটচাষ করা হয়। পাটচাষে বীরভূম-বাঁকুড়া জিলার অংশ সর্বাপেক্ষা অল্প। বীরভূমে ৩৫০ একর জমিতে এবং বাঁকুড়ায় মাত্র ৩০৫ একর জমিতে পাটচাষ করা হইয়াছে। (১)

তুলা ও রেশম

পশ্চিমবঙ্গের তন্তুজাতীয় পদার্থের ভিতরে তুলার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রদেশের মৃত্তিকা তুলা উৎপাদনের পক্ষে একেবারেই উপযোগী নহে। অবিভক্ত বাঙলাদেশেও তুলা উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য ছিল। সমগ্র ভারতে ১৯৪০-৪১ সালে ৪৫ লক্ষ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বৎসর বাঙলাদেশের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ২০ হাজার গাঁইট। কিন্তু অবিভক্ত বাঙলার সামান্য উৎপাদনেরও স্বল্প অংশই পশ্চিম বাঙলায় উৎপন্ন হয়। ১৯৪০-৪১ সালে সমগ্র বাঙলাদেশে তুলার জন্য ৮১,০০০ একর জমি চাষ করা হইয়াছে; অথচ পশ্চিম বাঙলায় ১৯৩৯-৪০ সালে মাত্র ১,৬০০ একর জমি তুলা উৎপন্ন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিম বাঙলায় তুলার চাষ আরও হ্রাস পাইয়াছে; সেই বৎসর কেবল-মাত্র ৮০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিম বাঙলায় তুলার চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী হিসাব অনুসারে, ১৯৪৭ সালে ২৫,৭০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬,৩৫০ একরে দাঁড়াইয়াছে। প্রদেশের মৃত্তিকা ও জলবায়ু তুলা চাষের পক্ষে অনুকূল না হইলেও চেষ্টা করিলে যে তুলার চাষ কিছুটা বাড়ান যাইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু, প্রধান সমস্যা এই যে, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাঙলার তুলাই হ্রস্ব আঁশবিশিষ্ট হইবার ফলে কাপড়ের কল-গুলিতে এই তুলা একেবারেই ব্যবহার করা চলে না। কাজেই, বাহির হইতে আমদানীর উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। (২)

ভারতবর্ষের মোট রেশম উৎপাদনের প্রায় ২০% অবিভক্ত বাঙলাদেশে উৎপন্ন হইত; ইহার পরিমাণ ৩ লক্ষ পাউণ্ডের কম হইবে না। ইহার ভিতরে পশ্চিমবঙ্গের অংশ অন্তত ৯০ হাজার পাউণ্ড হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার রেশমের গুণানুসারে কোন শ্রেণী বিভাগ করা হয় নাই। তাহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন চরকা রেশমের প্রধান দোষ এই যে, তন্তু হিসাবে ইহা নিরবচ্ছিন্ন নহে; কাজেই দ্রুতগতিসম্পন্ন কলে এই রেশম দ্বারা বয়নকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। এই কারণেই, রেশম বয়নের কলসমূহের জন্য এ পর্যন্ত চীন-জাপান-আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রয়োজনীয় রেশম আমদানী করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের জিলাসমূহের ভিতরে মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম ও মালদহ রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। রেশমশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে মুর্শিদাবাদের খ্যাতি বহুদিনের। রেশম সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া প্রদেশের তুঁতফল উৎপাদনের কথা উল্লেখ করা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯৪৬-৪৭ সালে সমগ্র বাঙলাদেশে প্রায় ৯,৫০০ একরে তুঁত-ফলের চাষ হইয়াছিল; ইহার ভিতরে পশ্চিম-বঙ্গের অংশ ২৫০০ একরের কম হইবে না। পশ্চিমবঙ্গে তুঁতফলের চাষবৃদ্ধি করিবার এবং উন্নত ধরণের রেশম উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

---

1. Forecast of the Jute Crop, West Bengal, Supplement to the Calcutta Gazette, July 22, '48.

2. Statistical Abstract, West Bengal, 1947 Press Note, Govt. of West Bengal, Oct. 28, 1948.

তৈলবীজ : তিল-তিসি-সরিষা

পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন কৃষি দ্রব্যাদির ভিতরে খাদ্যশস্য এবং তন্তুজাতীয় পদার্থের পরেই তৈলবীজের স্থান। ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রদেশের ২ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজের চাষ হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে চাষের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইলেও বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজের জন্য মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১ লক্ষ ৯৯ হাজার একরের বেশী ছিল। ইহার ভিতরে ৪৮ হাজার একরে কেবলমাত্র তিসির চাষ হইয়াছে; উৎপন্ন তিসির মোট পরিমাণ ছিল, ৮ হাজার ৩ শত টন। ১৯৪৮ সালে প্রদেশে তিসির চাষ সামান্য হ্রাস পাইয়াছে। সরকারী পূর্বাভাস অনুসারে, ১৯৪৮ সালে ৪১ হাজার একরে ৭ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের সরকারী পূর্বাভাস অনুসারে দেখা যায়, সমগ্র বাঙলাদেশে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার একর জমিতে মোট ৩০ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ এই হিসাব অনুসারে অবিভক্ত বাঙলায় তিসির জন্য আবাদী জমির ⅓ ভাগ এবং উৎপাদনের ¼ ভাগের কিছু বেশী পশ্চিমবঙ্গের অংশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রদেশের তিসি উৎপাদন সহজেই বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ১৯৪৩-৪৪ সালের সরকারী শস্য বিবরণীতে দেখা যাইতেছে, প্রদেশে তিসির জন্য আবাদী জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮১ হাজার একর। কাজেই সম্প্রতি প্রদেশে তিসির চাষ যে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে, তাহা বিশদ্ করিয়া না বলিলেও চলে। পশ্চিমবঙ্গে তিসির জন্য ব্যবহৃত জমির স্বাভাবিক পরিমাণ ৮৭ হাজার একর বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিসি উৎপাদনে প্রদেশের স্বাভাবিক উৎপাদন শক্তি একর প্রতি ৬·৫ মণ বলিয়া বর্তমান বৎসরে হিসাব করা হইয়াছে। ১৯২২-২৩ সাল হইতে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত যে সকল পাঁচসালা হিসাব লওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, একর প্রতি ৫·৭৫ মণ হইতে ৭·৩৮ মণ পর্যন্ত তিসি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার ১৯৩৫-৩৬ সালে দশ বৎসরের যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, একর প্রতি উৎপাদন ৪·৫৪ মণের বেশী হইবে না। সেই বৎসর বাঙলা সরকারের বিবরণীতে স্বাভাবিক উৎপাদনের পরিমাণ ৭¼ মণ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।(১) যাহাই হউক, প্রদেশের একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ৬½ মণ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই সঙ্গত। প্রদেশের জিলাসমূহের ভিতরে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ জিলায় সর্বাপেক্ষা বেশী তিসি উৎপন্ন হয়। ১৯৪৮ সালে মুর্শিদাবাদ জিলায় ৩৮ হাজার একরে এবং নদীয়া জিলায় ৩০ হাজার একরে তিসির চাষ হইয়াছে। জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং জিলাতে তিসির চাষ হয় না বলিলেই চলে। হুগলী জিলায় মাত্র ১০০ একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে।(২)

পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন তৈলবীজসমূহের ভিতরে সরিষা এবং রাই'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৪৮ সালে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে রাই এবং সরিষার চাষ করা হইয়াছে; উৎপাদনের পরিমাণ ২৬ হাজার টনের কম হইবে না। ১৯৪৭ সালে ১ লক্ষ ৫২ হাজার একর জমিতে ২৮ হাজার টন রাই ও সরিষা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বৎসর পূর্ব বাঙলায় প্রায় ৪ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জমির ৩ গুণ জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে একর প্রতি জমির উৎপাদন শক্তি ৬·৬ মণ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর হিসাব অনুসারে বর্তমান বৎসরে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার একরে ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার মণ সরিষা উৎপন্ন হইয়াছে। ইনস্টিটিউটের মতে প্রদেশের বাৎসরিক প্রয়োজনের পরিমাণ ২৪ লক্ষ মণের কম হইবে না।(৩) জলপাইগুড়িতে তিসির চাষ প্রায় হয় না বলিলেই চলে কিন্তু রাই ও সরিষার চাষ জলপাইগুড়িতেই সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। ১৯৪৮ সালে জলপাইগুড়িতে ৪৫ হাজার একরে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে। পশ্চিম দিনাজপুরে ২৪ হাজার একর জমি এবং মুর্শিদাবাদে ২২ হাজার একর জমিতে এই শস্যের চাষ হইতেছে। হাওড়াতে ইহার উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অল্প। বর্তমান বৎসরে হাওড়া জিলাতে মাত্র ৪০০ একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে।

তিসি, রাই ও সরিষা (এবং তিল) ভিন্ন আরও বহু প্রকার তৈলবীজ পশ্চিম বাঙলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্তমান বৎসরে ২২ হাজর একর জমিতে প্রায় ২৮ হাজার টন এই সকল তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ২১ হাজার একরে প্রায় ২৭ হাজার টন এই সকল তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে। পশ্চিম বাঙলার প্রতি একর জমিতে এই সকল তৈলবীজ স্বাভাবিক অবস্থায় ৪½ মণ উৎপন্ন হয়, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সকল তৈল বীজের ভিতরে চীনা বাদাম, রেড়ির বীজ এবং নারিকেলই প্রধান। ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিম বাঙলায় প্রায় ৩ হাজার একর জমিতে চীনা বাদামের চাষ হইয়াছে। এই সকল তৈল বীজ মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। ১৯৪৮ সালে বাঁকুড়া জিলায় ৯ হাজার একর জমিতে এবং মেদিনীপুর জিলায় প্রায় ৬ হাজার একর জমিতে এই সকল তৈল বীজের চাষ হইয়াছে।(১)

এইবারে তিল সম্পর্কে আলোচনা করিয়াই প্রদেশের তৈলবীজ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে। ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিম বংগের প্রায় ২০ হাজার একরে তিলের চাষ হইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ সালে তিল চাষের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে; সেই বৎসর কেবলমাত্র ১০ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়ছে। ১৯৪৭-৪৮ পূর্ববংগে ৮৪ হাজার একরেরও বেশী জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে। ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের দশ বৎসরের হিসাব অনুসারে একর প্রতি উৎপাদন ৫ মণ ৪ সের ধরা হইয়াছে; সেই বৎসরে বাঙলা সরকারের একটি হিসাব অনুসারে স্বাভাবিক অবস্থায় একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ৭ ২/৫ মণ বলিয়া ধরা হইয়াছে।(২) প্রদেশের জিলা সমূহের ভিতরে বাঁকুড়া-মুর্শিদাবাদ জিলায় সর্বাপেক্ষা বেশী তিলের চাষ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, মালদহ জিলাতেও তিলের চাষ মোটামুটি ভালই হইয়া থাকে। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় উৎপন্ন সকল প্রকার তৈলবীজের হিসাব করিলে দেখা যায়, পশ্চিম বাঙলায় যে পরিমাণ জমি তৈলবীজের জন্য চাষ করা হইতেছে, তাহা পূর্ব বাঙলার ৬০% ভাগের বেশী হইবে না। তাহা ছাড়া, বাঙলা দেশের তৈলবীজসমূহে তৈলাংশ অল্প থাকায় এই সকল তৈলবীজকে প্রথম শ্রেণীর তৈলবীজ বলিয়া গণ্য করা চলে না। ছোট ছোট তৈল-কলসহ পশ্চিম বাঙলায় তৈল কলের সংখ্যা প্রায় ত্রিশত হইবে। ইহাদের ভিতরে অন্তত ১৫।২০টি কল বৃহদায়তন সংগঠিত শিল্পের মর্যাদা দবী করিতে পারে। পশ্চিম বাঙলার এই তৈলকলগুলির চালু রাখিতে হইলে উন্নত ধরণের বীজ বপন করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিমিত জমি কিংবা ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক।

---

1. Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. II p. 96.

2. Forecast of Spring Oilseed Crops of West Bengal, 1947-48 Supplement to the Calcutta Gazette, Aug. 26, '48.
3. West Bengal Crop Survey, I.S.I., Calcutta.

1. Forecast of Spring Oil seed crops of West Bengal.
2. Report of the Land Revenue Commission, Bengal. Vol. II, P. 97.

উপরে: সৌদী আরবের আমীর ফয়সল সহ পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীমতী বিজয়-লক্ষ্মী।

ডানদিকে: নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ডক্টর অব ল' উপাধিদান।

নীচে: কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি ডাঃ সীতারামিয়া ও রাষ্ট্রপাল রাজা-গোপালাচারী।

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

প্র-না-বি.....

সূচনা

গত বছরের দেশ পত্রিকায় উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষীদের চিত্র চরিত্র লিখিয়াছি। তাঁহারা ছিলেন রক্ত মাংসের মানুষ। জীবলোক হইতে অপসারণের পরে স্মৃতিরূপে মাত্র তাঁহারা বিরাজিত। সেই স্মৃতিকে পুনরায় রক্তমাংসের সংস্কারে ভূষিত করাই ছিল চিত্র-চরিত্র লেখকের উদ্দেশ্য। এবারে অন্য একপ্রকার চিত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছি। ইহারা বাঙলার মনীষী নয়, বাঙলার মনীষীদের সৃষ্টি। সাধারণ অর্থে ইহারা রক্তমাংসের জীব না হইয়াও রক্তমাংসের জীবের চেয়েও অধিকতর সত্য, যেসব মনীষীর ইহারা সৃষ্টি, তাহাদের চেয়েও ইহাদের আয়ু দীর্ঘতর, ইহাদের অনেকেই অমর, মৃত্যুশীল মানুষের অমরতার আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। মানুষ মরিতে চায় না, কিন্তু তাহার চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা কেবল সন্তান ধারার মধ্যেই রূপান্তরে সার্থক হইতে পারে। আর হইতে পারে মানুষের সার্থক শিল্প সৃষ্টির কল্যাণে। শিল্প অমরতার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ অমর হইলে শিল্প সৃষ্টি করিত না। দেবতারা শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করে না।

এবারে বাঙলা সাহিত্যের নরনারীর চিত্র লিখিতে যাইতেছি। বাঙালীর শিল্প সৃষ্টির আয়তন সামান্য নয়। হাজার বছরের পুরাতন বৌদ্ধ গান ও দোঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও বাঙলা সাহিত্যের বিস্তৃতি বড় অল্প দিনের নহে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বাঙালী লেখকগণ যেসব নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা অগণিত। চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হইতে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী পর্যন্ত কত বিচিত্র চরিত্রেরই না সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও পথের পাঁচালীতে প্রভেদ যতই দুস্তর হোক না কেন অপুর্ব ও দুর্গা এবং রাধা ও তাহার সখীগণ একই বাঙলা দেশের মানুষ। আবার কবিকঙ্কণ চন্ডীর ভাঁড়ুদত্ত এবং আলালের ঘরের দুলালের ঠক চাচা, উভয়ের মধ্যে ভেদ কেবল সাময়িক, দুজনেই বাঙলার মাটিতে গড়া। বস্তুত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সৃষ্ট হইলে এক প্রকার বাহ্য প্রভেদ দেখা দিবেই কিন্তু অন্তর্লোকে মিল থাকিয়া যায়। বংশ ধারার ইতিহাসে ঐ অমিলের মধ্যে মিল খুঁজিয়া বাহির করা বৈজ্ঞানিকের কাজ, সাহিত্যের ইতিহাসে সেই কাজ সমালোচকের। বাঙালী লেখকের সৃষ্ট কতকগুলি বিশিষ্ট (সবগুলি সম্ভব নয়) নরনারীর ইতিহাস রচনাই বর্তমান পর্যায়ের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যের নরনারীকে রক্তমাংসের জীব বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়া কাজে নামিতে হইবে। কিন্তু 'কল্পনা' শব্দটাতে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। বস্তুতঃই ইহারা রক্তমাংসের জীব। রক্তমাংসের জীব বলিতে যদি জীবন্ত বোঝায়, আপাদমস্তক প্রাণ প্রবাহে স্পন্দিত বোঝায়, তবে ইহারা বাস্তব নরনারীর চেয়েও অনেক বেশী জীবিত, সৃষ্টিকর্তাদের চেয়েও অনেক বেশী জীবিত! ইহারা এতই বেশি জীবিত যে, ইহাদের মৃত্যু নাই, এমন কি ইহাদের জন্মই হয় নাই, ইহারা স্বয়ম্ভু! বাল্মীকির চেয়ে রাম অনেক বেশি সজীব, ব্যাসের চেয়ে অনেক বেশি সজীব যুধিষ্ঠির। সত্য কথা বলিতে কি এখন বাল্মীকি ও ব্যাস রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের সুবাদেই পরিচিত। রামের জন্মের আগে রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল প্রবাদের চেয়ে অনেক বেশি সত্য রামচন্দ্র বাল্মীকিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি অর্থে যদি জ্ঞান-গোচরতা বোঝায় তবে রামের কৃপাতেই কি বাল্মীকির চৈতন্য আমাদের হয় নাই? রামায়ণ না থাকিলে আজ বাল্মীকিকে কেহ জানিত কি?

সমাজের হিসাব রক্ষকেরা বলিতেছেন যে, বাঙলার লোকসংখ্যা এত দ্রুত বাড়িতেছে যে, খাদ্যের ঘাটতি বাড়িয়াই চলিবে। এসব কথা কতদূর সত্য, আর কতদূর রাজনীতি জানি না। কিন্তু জানি যে বাঙলা সাহিত্যের নরনারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে, আরও জানি যে, তাহারা কখনো খাদ্যে ঘাটতি ঘটাইবে না। ইহারাই বাঙালীর ভাবলোকের অধিবাসী, ইহাদের বাসস্থানই বাঙলার ভাবলোক। শিল্প সৃষ্টির আদি যুগ হইতে প্রত্যেক দেশে এইরূপ এক একটি ভাবলোক গড়িয়া উঠিতেছে। শিল্প সৃষ্টির সক্ষম যুগের আগে হইতেই এইরূপ ভাবলোক গড়িবার আকাঙ্খা মানুষের মনে ছিল। আকাশে গ্রহ তারা ফোটে, কিন্তু সেগুলিকে বৃহস্পতি, শুক্র বা সপ্তর্ষি কল্পনা করিবার কারণ কি? যেসব মনীষী এক সময়ে ধরাতলে বিচরণ করিত, মৃত্যুর পরে তাহারা তারায় রূপান্তরিত হইয়াছেন,

"They will suffer a star change into something rich and strange."

মানুষের স্বর্গলোকের অধিবাসীর সংখ্যাও এই একই ভাবে, এই একই আকাঙ্ক্ষা হইতে দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে—এখনো বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বর্গের দেবতার সংখ্যা প্রাচীনকালে নিশ্চয় তেত্রিশ কোটি ছিল না, দূর ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, কি গ্রহ নক্ষত্র লোকে, কি স্বর্গলোকে নিরন্তর একটি Sublimation বা ঊর্ধ্বায়ন প্রক্রিয়া চলিতেছে। সেই প্রক্রিয়ার ফলেই প্রকৃতি শিল্পে পরিণত হইতেছে—অর্থাৎ প্রাকৃত অপ্রাকৃত হইয়া উঠিতেছে। এই প্রক্রিয়া হইতেই সাহিত্য সৃষ্টি সাহিত্যের নরনারীর সৃষ্টি।

এক হিসাবে বর্তমান পর্যায় চিত্র চরিত্র হইতে ভিন্নপন্থী রচনা। চিত্র চরিত্রে ছিল রক্তমাংসের জীবকে ভাবলোকে ঊর্ধ্বায়ন, আর এখন করিতে চাই ভাবলোকের জীবকে রক্তমাংসের সংসারে নিম্নায়ন। এ অনেকটা স্বর্গ হইতে বিদায়ের অনুরূপ। ভাব স্বর্গের জীবকে বাস্তব সংসারে নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে চাই কি প্রতিক্রিয়া ঘটে। বর্তমান পর্যায়ের ভাব হইতে রূপে আসা, আর পূর্বতন পর্যায়ের রূপ হইতে ভাবে যাওয়া মিলিয়া 'ভাব হতে রূপে' যাতায়াতের চক্রাবর্ত সম্পূর্ণ হইবে। এইরূপে বাঙলার মনীষার বাস্তব রূপ ও ভাব রূপ দুইকেই হয়তো জানিতে পারা যাইবে। বাঙালীর ভাবলোকের এই অধিবাসিগণ বাঙলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হয়তো এমন সংবাদ দিতে পারিবে রাজনীতির শুষ্ক দলিলে যাহার আভাসটুকুও মর্মায়িত হয় না।

বাঙলা দেশে নিজেকে ব-দ্বীপ মালায় উদ্ঘাটিত করিয়া আত্মবিস্তার করিতেছে, সমুদ্রগর্ভের রহস্য দিবালোকের বাস্তব হইয়া উঠিতেছে। বাঙালী শিল্পের অন্তরের রহস্য-লোক হইতে তেমনি নিত্য নব নরনারী বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাদের লইয়াই সত্যকার বাঙালী সমাজ, কারণ ইহারা চিরন্তন। বাস্তব নরনারী বিশেষ কাল অধিকার করিয়া বিরাজ করে, কিন্তু যাহারা ভাবৈকরূপ, বিশেষকালের দ্বারা তাহাদের আয়ু পরিমিত নহে বলিয়াই তাহাদের কাছে চিরন্তনের সংবাদ পাইবার আশা। সঠিক সংবাদের জন্য লোকে স্বর্গ মর্ত্য খুঁজিয়া দেখে, বাঙলার স্বরূপ জানিবার আশায় আমরা এই চিরায়ু নরনারীর দ্বারস্থ না হই কেন? ইহাদের ছাড়িলে বাঙলা দেশ অসম্পূর্ণ, বাঙালী সমাজ খণ্ডিত। বাস্তব বাঙালী ও ভাবময় বাঙালী মিলিয়াই বাঙালীর স্বরূপ। স্বরূপ মানে সমগ্র রূপ। বাঙলা দেশের সত্যকার ইতিহাস যিনি লিখিতে চাহিবেন, তাঁহাকে ইহাদের জীবনচরিত লিখিতে হইবে। বাস্তব নরনারী সংবাদ মাত্র দিতে পারে, সত্যের সোনার কাঠি এই ভাবৈকরূপ নরনারীর আয়ত্তে।

এইটুকু নব পর্যায়ের সূচনা। এবারে আমার আসল কৈফিয়ৎ দেশের পাঠকদের কাছে। চিত্র-চরিত্র পর্যায়ের এক ভাবে সূচনা হইয়া আর একভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিল। এবারের পরিণাম সম্বন্ধেও নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারি না। প্র-না-বি-র হাতের কলম যে শেষ পর্যন্ত প্রমথনাথ বিশী কাড়িয়া লইবে না বর্তমান লেখক সে কথা জোর করিয়া বলিতে পারে না। তবে দেশের পাঠকগণের যেমন প্রশংসনীয় সহিষ্ণুতা তাহাতে যাহার কলমই লিখুক না কেন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিবে না। পাঠকের ধৈর্যের মর্মর ফলকখানাই তো সাহিত্যের আসল পাদপীঠ, যতক্ষণ সেখানা অটুট আছে ততক্ষণ মাভৈঃ॥

ভাঁড়ু দত্ত

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রথম বাঙালী ঔপন্যাসিক। যদিচ তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে কোনক্রমেই উপন্যাস বলা চলে না, তবু বর্তমানে উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝি, তাহার ধর্ম অনেক পরিমাণে কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বিদ্যমান। উপন্যাস ধারাবাহিক বস্তুনিষ্ঠ গল্প, বর্তমানে গদ্যে লিখিত, কিন্তু পদ্যে লেখা যে আদৌ অসম্ভব এমন নয়। উপন্যাসের বিবর্তন লক্ষ্য করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে যে বস্তুনিষ্ঠা গুণটি ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে তাহাতে প্রবেশ করিতেছে। উপন্যাসের আদিযুগে বাস্তব সংসার ও উপন্যাস সমান্তর রেখায় চলিত। কিন্তু ক্রমে দুই রেখা দূরত্ব ঘুচাইয়া কাছে ঘেঁষিতে লাগিল—ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে তাহারা এত কাছে আসিয়া পড়ে যে একটি আর একটির ছায়া হইয়া উঠিল। ইহাই 'রিয়ালিজম'। এই প্রক্রিয়া এখনো সক্রিয়। বাস্তব নিষ্ঠার উপরে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের এতই ঝোঁক যে, উপন্যাস প্রায় ফটোগ্রাফের সামিল হইয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর, বাস্তব নিষ্ঠাই বর্তমানে উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ। এখন এই বাস্তব নিষ্ঠার সঞ্চারীভাব নির্মমতা। আধুনিক ঔপন্যাসিক নিজের নাক বরাবর চলিতে কৃতসংকল্প, তার ফলে তাহাকে যেখানে লইয়াই ফেলুক না কেন, তাহার দুঃখ নাই—ইহাকেই বলি নির্মমতা। মমত্ব বুদ্ধি, রুচি, অভিপ্রায়কে সংযত করিয়া লেখক বাস্তব সংসারকে অনুসরণ করিতেছে, সংসারের বাস্তব ধর্মকে ধরিবে এই তাহার পণ।

এখন ইহাই যদি উপন্যাসের এবং আধুনিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে মুকুন্দরাম কেবল ঔপন্যাসিক নয়, অত্যন্ত আধুনিক ঔপন্যাসিক। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাস্তব নিষ্ঠা ও নির্মমতা প্রচুর পরিমাণে বিরাজমান। পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় প্রদর্শন—প্রাচীন কাব্যের লক্ষণ। ইহা বাস্তবপন্থীও নয়, নির্মমও নয়, কারণ কবি কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছিবেন আগে হইতেই তাহা স্থিরীকৃত। মহাভারত ও রামায়ণের কবি আদর্শনিষ্ঠ। তাঁহাদের আদর্শ কাব্যের প্রথম শ্লোক রচনার আগে হইতেই নির্দিষ্ট, এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, রামের জন্মের পূর্বেই অর্থাৎ বস্তুগত ঘটনা ঘটিবার আগেই রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। আবার তাঁহারা দুইজনেই নিষ্ঠুর, পঞ্চপাণ্ডব ও রামদম্পতিকে অশেষ দুঃখকষ্ট তাঁহারা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের নির্মম বলা চলে না। পাণ্ডব ও রামচন্দ্রকে তাঁহারা দুঃখে কষ্টে ফেলিয়াছেন, কিন্তু সে তো ব্যক্তিগত আদর্শকে প্রস্ফুট করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই, বাস্তবের হাতে কল্পনার রশ্মি তাঁহারা কখনো তুলিয়া দেন নাই। প্রাচীন কবিরা কাব্যপ্রবাহের ভগীরথ, কাব্য তাঁহাদের শঙ্খনিস্বন অনুসরণ করিয়া গিয়াছে। আর আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা মানচিত্র অঙ্কনকারী, ঘটনাপ্রবাহকে অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের কলম চলে, একটু এদিক ওদিক হইলে শিল্প স্বধর্মচ্যুত হয়।

আগেই বলিয়াছি কবিকঙ্কণ চণ্ডীকে উপন্যাস না বলা গেলেও উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ দুটি তাহাতে আছে, বস্তুনিষ্ঠা ও নির্মমতা। মোটের উপরে চণ্ডী কাব্যেও পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় অঙ্কিত, কবির লক্ষ্য আগে হইতেই সুনির্দিষ্ট। কিন্তু কোন কোন চরিত্র-চিত্রণে কবি বস্তুনিষ্ঠা ও নির্মমতার চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন। এমন একটি বোধকরি, একমাত্র চরিত্র ভাঁড়ু দত্ত, অন্ততঃ একমাত্র মনুষ্য চরিত্র। কারণ কবিকঙ্কণ পশু সমাজের যে চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও বস্তুনিষ্ঠ।

ভাঁড়ু দত্ত লোকটা শয়তান। কিন্তু শয়তান আছে বলিয়াই তো সংসার সুখে দুঃখে জমিয়া উঠিয়াছে। শয়তান না থাকিলে আদি দম্পতি আদম ও ইউ এখনও নন্দনবনে বসিয়া পরিপূর্ণ নৈষ্কর্ম্য উপভোগ করিত। এখানেও দেখি শয়তান ভাঁড়ু দত্তের চক্রান্তে কালকেতু উপাখ্যানের ঘটনাস্রোত উত্তাল হইয়া উঠিয়া পরিণামের মুখে ছুটিয়াছে।

কালকেতু বন-জঙ্গল কাটিয়া গুজরাটের রাজা হইয়া বসিলে অনেক লোক সেখানে সুখে বসবাস করিবার আশায় আসিল। তাহাদের অগ্রণী আমলা হাঁড়ার দত্ত শ্রীমান্ ভাঁড়ু। সঙ্গে তাহার চিড়া, দধি, কলা প্রভৃতি ভেট, কানে গোঁজা তাহার খরশান কলম। সে আসিয়াই কালকেতুর সঙ্গে খুড়া-ভাইপো সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিল। ভাঁড়ু জানাইল যে গঙ্গার দুই কুলের কায়স্থ সমাজ তাহার ঘরে আহারাদি করে, ঘোষ ও বসু কন্যাদ্বয়কে সে বিবাহ করিয়াছে, আর 'মিত্রে কৈল কন্যা বিতরণ।' এহেন পাত্রকে রাজ্যের প্রধান পাত্র করা কর্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি! কালকেতু লোকটা 'up start', হঠাৎ বড়লোক, ধন তার হইয়াছে, কিন্তু কুলের গৌরব নাই, কাজেই সে কুলীনশ্রেষ্ঠ ভাঁড়ুকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। ভাঁড়ু রাজ্যের প্রধান পাত্র হইয়া পূর্বতন প্রধান বুলান মণ্ডলকে ম্লান করিয়া দিল। শেষে রাজ্যের এমন অবস্থা করিয়া তুলিল যে, কালকেতুও ভাঁড়ুর ছায়ায় পড়িয়া গেল।

ভাঁড়ুর অত্যাচারে হাটুরে লোকের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম। কবিকঙ্কণ বলিতেছেন,—

'এমন সময় ভাঁড়ুদত্ত হাট মধ্যে আসে
পশারী পশরা ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে।
পশরা লুটিয়া ভাঁড়ু পূরয়ে চুবড়ি
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি।
লণ্ডেভণ্ডে দেই গালি বলে শালা মালা
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।
হাটুয়া টানয়ে ভাঁড়ুদত্ত নাহি ছাড়ে
কেশে ধরি করে কিল লাথি মারে ঘাড়ে।'

তখন হাটুরে লোকে গিয়া কালকেতুকে নালিশ করিল। কালকেতু তখনো বনেদী ধনী হইয়া ওঠে নাই, দুঃখের স্মৃতি তখনো মনে আছে, তাই ভাঁড়ুকে ডাকিয়া অপমান করিল। ভাঁড়ু অপমান হজম করিবার লোক নয়, যদি তাহার প্রতিকার থাকে। এক প্রতিকার ছিল। সে কলিঙ্গরাজের নিকটে গিয়া কালকেতুর নামে সত্য-মিথ্যা অনেক বলিয়া কহিয়া দুই রাজ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দিল। যুদ্ধে কালকেতুকে পারিয়া ওঠা সহজ নয়, সে মহাবীর। তখন ভাঁড়ুর চক্রান্তে ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কালকেতু বন্দী হইয়া কলিঙ্গ রাজ্যে চলিল। অবশেষে কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর মধ্যে বন্ধুত্ব হইল এবং কালকেতু পুনরায় সগৌরবে গুজরাট রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভাঁড়ু দেখিল মহাবিপদ। গুজরাটেই তাহার বিষয় সম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্রাদি। এখন কি উপায়? তখন সে আবার—

ভেট লৈয়া কাচকলা শাক কচু আলু মুলা
ভাঁড়ুদত্ত করয়ে জোহার
নোয়াইয়া বীরে মাথা কহে প্রবঞ্চন কথা
খুড়া দেখি খণ্ডিল আঁধার!

ভাঁড়ু কালকেতুকে জানাইল যে, তাহার বিরহে ও বিপদে ভাঁড়ুর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কিন্তু কালকেতু ভুলিল না। সে ভাঁড়ুকে অপমান করিয়া নাপিতের ভোঁতা ক্ষুর দিয়া মাথা মুড়াইয়া রাজ্যের বাহির করিয়া দিল। শহরের ছেলেমেয়েরা ভাঁড়ুকে টিটকারি দিতে লাগিল, কোটাল তাহার মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিল। কেহ কেহ তাহার পিছে পিছে ঢোল বাজাইতে লাগিল। ভাঁড়ুর বিপদ দেখিয়া কালকেতুর মনে কষ্ট হইল। সে তাহাকে 'পুনর্বার দিল ঘরবাড়ি।'

এই তো ভাঁড়ুর জীবনচরিত। তাহার চিত্রটি বস্তুনিষ্ঠ কলমে ও নির্মমভাবে অঙ্কিত। কেবল শেষের দিকে কবির নির্মমতা শিথিল। ভাঁড়ুদত্তের দণ্ডে পাপের পরাজয় চিত্রিত। কিন্তু ভাঁড়ুর মতো বুদ্ধিমান পাপী এত সহজে পরাজয় মানিবে কেন? সে গুজরাট রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার হাটুরে লোকের জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিবে। অনেক ভাঁড়ু আজকার দিনে দিব্য চোরাবাজারের কারবারী, ধরা পড়িয়াও নামান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। আর কালকেতু যদি তাহাকে দণ্ডই দিল, আবার তাহাকে ফিরিয়া ডাকা কেন? কালকেতুর মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য কি? এখানেও কবির নির্মমতা শিথিল। এই দুটি খুঁৎ বাদ দিলে ভাঁড়ুর চরিত্র যে-কোন আধুনিক উপন্যাসের সামগ্রী হইতে পারে। ভাঁড়ু অত্যন্ত 'মডার্ন', তাহার মাসতুতো ভাই আলালের ঘরের দুলালের 'ঠক চাচা।'

বলা বাহুল্য, ভাঁড়ু দত্ত লোকটা অতিশয় দুর্জন। কিন্তু তবু তাহাকে অসহ্য লাগে না, কারণ মুকুন্দরাম তাহার চরিত্রে এক বিন্দু কমিক রস দিয়াছেন। ঐ বিন্দুটি তাহাকে তাজা করিয়া রাখিয়াছে, ঐ রসের গুণেই দর্শক তাহাকে ছাড়িতে চায় না। মুকুন্দরাম তাহাকে লইয়া নিশ্চয় খুব সংকটে পড়িয়াছিলেন। শ্রোতাদের চিত্ত এমনভাবেই সে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল যে, কালকেতু ও ফুল্লরার প্রতি আর কোন ঔৎসুক্য তাহাদের ছিল না। শ্রোতাদের ভাব গল্পটা থাকুক, তার চেয়ে ভাঁড়ুর ভাঁড়ামি চলুক। তখন বাধ্য হইয়া নিরুপায় কবি তাহাকে যেন তেন প্রকারেণ বিদায় করিয়া দিয়া গল্পের পরিণামটাকে রক্ষা করিলেন। ভাঁড়ু কেবল বাস্তব কালকেতুর সর্বনাশ করে নাই, কালকেতুর শিল্পরূপকেও মারিতে বসিয়াছিল। সেক্সপীয়র ফলস্টাফকে লইয়া এমনি বিপদে পড়িয়াছিলেন। শেষরক্ষা করিতে না পারিলে কমিক চরিত্রের ট্রাজিক হইয়া উঠিবার আশঙ্কা।

ভাঁড়ু দত্তর চেহারা কেমন ছিল? রঙটি কালো, মেদের প্রাচুর্যে তাহাতে চিকনাই লাগিয়াছে; স্থূলাকার, ভুঁড়িটি অগ্রগামী, 'ভুঁড়ির তাল সামলাইতে গিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতে অভ্যস্ত; শরীরের তুলনায় পা দুখানি খাটো, প্রয়োজনমাত্রেই হাসি ও অশ্রু টানিয়া আনিতে পারে; মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে; দুইকানে গুচ্ছ গুচ্ছ লোম; নাকের ডগায় কয়েকটা লোম খাড়া হইয়া আছে; মাথা ও হাত নাড়িয়া কথা বলা তাহার অভ্যাস। আর বসন সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—'ছিড়া ধুতি কোঁচা লম্ব।' ভাঁড়ুর এ রূপ আমার মন গড়া নয়। যে কোন জমিদারের কাছারীতে গেলেই ভাঁড়ুর দেখা মিলিবে। বাঙলাদেশে ভাঁড়ু অত্যন্ত সাধারণ জীব। মুকুন্দরাম সাধারণকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই শিল্পের অসাধ্যসাধন।*

* মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, কালকেতু উপাখ্যান।

রামায়ণ ও বাল্মীকিপ্রতিভা

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যে যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠস্থান-লাভের অধিকারী, তাহা যুগযুগান্তর মানব-সমাজের ও মনীষিগণের সবিশেষ আদরণীয় ও পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া রহিয়াছে। কালচক্রের পরিবর্তনশীল আবর্তনে সমাজের ও পণ্ডিতগণের রুচিভেদ ও চিন্তাধারার পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী হইলেও, এই সকল সাহিত্যের অণুমাত্র স্বস্থান-চ্যুতি ঘটে নাই। ইহাতে সমাজের শিক্ষণীয় বিবিধ হিতকর বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; এই হেতু ইহা চিরন্তন মহাসাহিত্য। আর্যজাতির সাহিত্যের গণনায় বৈদিক সাহিত্য প্রাচীন, সংস্কৃত সাহিত্য অর্বাচীন। ইহা যেমন জাতীয় মহাসাহিত্য, তেমনই ইহার নানা জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার বিপুল ও অক্ষয়। পণ্ডিত লেখকগণ ইহা হইতে নানা রত্ন চয়ন ও দিব্য মাল্য রচনা করিয়া সমস্ত সুধীগণের সুখভোগ্য করিয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক জাতীয় মহাসাহিত্যের বিষয়ে এই প্রকার মন্তব্যে মতদ্বৈধ নাই, মনে হয়।

বাল্মীকি কবিগুরু; তাঁহার বিরচিত রামায়ণ মহাকাব্য মহাসাহিত্য মহাজ্ঞানরত্ন-ভাণ্ডার। কি ঐতিহাসিক বিষয়, কি সাহিত্য-সম্ভার, কি ধর্মতত্ত্ব—সকল প্রকারেরই গণনায়, শ্রুতির পরেই রামায়ণের ক্রমনির্দেশ অসংগত নহে, মনে হয়। প্রতিভাবান্ কবি নাট্যকার ও মনীষী লেখকগণ—কেহ মৌলিকভাবে, কেহ মৌলিকের সহিত কল্পনার যোগে, কেহ বা ভাষার ভঙ্গ্যন্তরে লেখনপ্রকারে—ইহার বিষয় বা বিষয়বিশেষ অবলম্বন করিয়া কাব্যে নাট্যে গীতিনাট্যে ও প্রবন্ধে এই বিপুল সাহিত্য বিপুলতর করিয়া রাখিয়াছেন।

রামায়ণের বিষয় অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য "বাল্মীকি প্রতিভা" প্রণয়ন করিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণের 'ব্যাধকৃত ক্রৌঞ্চবধ', 'বাল্মীকির মুখনিঃসৃত শ্লোক' এবং কৃত্তিবাস-বর্ণিত দস্যু রত্নাকরের দস্যুবৃত্তি—এই তিনটি বিষয় গীতিনাট্যে গৃহীত হইয়াছে। "সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে"—বাল্মীকিকে ব্রহ্মার এই বরদানের কথা কৃত্তিবাসের বর্ণনা; ইহা হইতে সরস্বতীর বিষয় সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কবি, সরস্বতীর বালিকামূর্তি, জ্যোতির্ময় প্রকাশ, মূর্ত আবির্ভাব—এই রূপত্রয়ের কল্পনা করিয়াছেন, মনে হয়। এতদ্ভিন্ন 'দস্যুদল', 'দস্যুদলপতি' ইত্যাদি নাট্যবস্তু কবির কল্পনাপ্রসূত*।

রামায়ণের বর্ণনায় বাল্মীকি ঋষি, দস্যু বা দস্যুপতি নহেন; রত্নাকর দস্যু বলিয়াই বর্ণিত, দস্যুপতি ছিলেন না; কিন্তু কবিবর বাল্মীকিকেই 'দস্যুপতি' সাজাইয়া পরে তাঁহাকেই 'কবি' বাল্মীকিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়—রত্নাকর ও বাল্মীকি বস্তুত একই, একেরই নামান্তরমাত্র, ভেদ কেবল চরিতকথায়—দস্যুবৃত্তিতে আর কবিকৃতিতে। একেরই এই কেবল চরিতগত ভেদরেখা অপনীত করিয়া রত্নাকরের পূর্বজীবনের ও পরিবর্তিত কবিজীবনের বৈসাদৃশ্যের চিত্র পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়েই কবি দস্যুপতি বাল্মীকির ও কবি বাল্মীকির কল্পনা করিয়াছেন, রত্নাকরের নামোল্লেখ করেন নাই।

কবির কথায় বাল্মীকি-প্রতিভা "গানের সুরে নাট্যের মালা", অর্থাৎ গানের সুরের প্রাধান্যে মালার মত পর-পর গ্রথিত নাট্যবস্তু। এই নাট্যবস্তু ছয়টি দৃশ্যে বিভক্ত; কল্পনার বিষয় বা কল্পিত নাট্যবস্তু এই সকল দৃশ্যে উদ্দেশ্যানুসারে ক্রমান্বয়ে সুসম্বন্ধভাবে অগ্রসর হইয়া বাল্মীকির কবিত্বলাভে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। মুখ্য ও গৌণ ভেদে এই নাট্যবস্তু দ্বিধা বিভক্ত; গৌণ মুখ্যের পরিপোষকভাবে উদ্দেশ্যের পরিপূরক। পরবর্তী নাট্যবস্তুর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণে ইহা পরিস্ফুট হইবে, আশা করি।

প্রথম দৃশ্য। উদ্দেশ্য—কালীপূজার্থ বলি। কল্পিত নাট্যবস্তু—অমানিশা; কালীপূজা; বলির নিমিত্ত দস্যুগণের প্রতি দস্যুপতির আদেশ; বলির অন্বেষণে বহির্গত দস্যুগণ কর্তৃক বালিকার বন্ধন। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। উদ্দেশ্য—দস্যুপতির পাষাণ হৃদয়ে করুণা। কল্পিত নাট্যবস্তু—অরণ্য; কালীপ্রতিমা; আসীন বাল্মীকির স্তবগান; বন্ধ বালিকার সহিত দস্যুগণের প্রবেশ; বলিচ্ছেদনার্থ কৃপাণ আনিতে দস্যুপতির আদেশ; আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে প্রাণরক্ষার্থ বালিকার করুণ প্রার্থনায় আকস্মিক চিত্তবৃত্তির পরিবর্তনে দস্যুপতির একান্ত বিস্ময়; বালিকার মায়ায় বাল্মীকির পাষাণ হৃদয় বিগলিত; বলিচ্ছেদন নিবর্তিত; বাল্মীকির আদেশে বালিকার বন্ধন ছেদন ও মোচন; অন্য বলির নিমিত্ত দস্যুরাজের আদেশ। (সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য। উদ্দেশ্য—বাল্মীকির হৃদয়ে করুণার স্থায়িভাব। কল্পিত নাট্যবস্তু—অরণ্য; বাল্মীকি একাকী; শূন্য মনে বনে বনে ভ্রমণ; শ্রবণ কাতর; খেদোক্তি—"কে জুড়াবে হিয়া সুধা বরিসনে।" (প্রস্থান)

দস্যুগণ কর্তৃক বালিকার পুনর্বন্ধন ও আনয়ন; পূজার উপচার আনয়ন; উচ্ছৃঙ্খল দস্যুদিগের প্রতিমা বেষ্টনপূর্বক উদ্দণ্ড নৃত্য; বাল্মীকির প্রবেশ; দস্যুগণের উচ্ছৃঙ্খলতায় ও আস্পর্ধায় বাল্মীকির সরোষ তিরস্কার; বিরক্তিতে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ; দস্যুদল পরিহার। (দস্যুগণের প্রস্থান)

সস্নেহ বচনে অভয়দানপূর্বক ভয়ার্ত বালিকার সহিত বাল্মীকির প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য। উদ্দেশ্য—করুণার স্থায়িত্বের দ্বিতীয় পরীক্ষা। কল্পিত নাট্যবস্তু—বাল্মীকির প্রবেশ; চির-আচরিত দস্যুবৃত্তির সংস্কার হেতু শিকার চিত্তশান্তির উপায় নির্ধারণ; দস্যুদিগের প্রতি বাল্মীকির শিকার-সন্ধানের আদেশ; শিকারে সকলের প্রস্থান; হরিণশিশুর বধার্থে পশ্চাৎ ধাবিত দস্যুগণের প্রতি বাল্মীকির শরক্ষেপে সনির্বন্ধ নিষেধ; (প্রস্থান)। দস্যুগণের প্রবেশ; নিষেধে সকলের বিশেষ বিরক্তি ও বাল্মীকির সংগত্যাগে সকলের উদ্যোগ; বাল্মীকির প্রবেশ; "তোর দশা রাজা ভালো তো নয়" ইত্যাদি অভিযোগ-বাক্যে সকলের রাজার সংগত্যাগ। (দস্যুগণের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য। উদ্দেশ্য—করুণার শেষ পরীক্ষা। কল্পিত নাট্যবস্তু—সহচরহীন বাল্মীকি একাকী; জীবনের ব্যর্থতায় বাল্মীকির বিষম বিষাদ; নৈরাশ্যের অন্ধকারে বনে বনে ভ্রমণে অধীরতা শূন্য হৃদয়ের ভার বহনে অক্ষমতা; মনে নানা বাসনার উদয়; কর্তব্য নির্ধারণে চিত্তের অব্যবস্থিত ভাব;—"কী করি জানি না গো, কী করি কী করি বলি, হাহা করি ভ্রমি গো।"

ব্যাধগণের প্রবেশ, ব্যাধ কর্তৃক শরাঘাতে কামার্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চবধ; এই অধর্মাচরণের তীব্র বেদনায় বাল্মীকির মুখ হইতে "মা নিষাদ" ইত্যাদি শ্লোক নিঃসরণ,

---

*কবির মন্তব্য—বেদনার ভিতর দিয়ে ভাব-প্রকাশের প্রয়াসে সে (লেখনীর সেই নূতন বহির্মুখী প্রবৃত্তি) শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকি-প্রতিভায়।

শ্লোকোচ্চারণে বাল্মীকির একান্ত বিস্ময়ঃ—"কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণী রে! কিছুই না জানি কেমনে রে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা! এমন কথা কেমনে শিখিনুরে!" মন পুলকে পূরিতঃ হৃদয়ে সরস্বতীর জ্যোতির্ময় প্রকাশ—'এ কী! হৃদয়ে এ কী দেখি! ঘোর অন্ধকারে এ কী জ্যোতিভাব! অবাক! এ করুণা কার! সম্মুখে মূর্তিমতী সরস্বতীর আবির্ভাবে বাল্মীকি,—এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা! বিমল কিরণে সব দিক উজলা! কী প্রতিমা দেখি এ জোছনা মাখিয়ে, কে রেখেছে আঁকিয়ে, আহা মরি করুণ পুতলা! (ব্যাধগণের প্রস্থান)।

বনদেবীগণের প্রবেশ; বনদেবীর গানে ভারতীর পরিচয়-লাভে বাল্মীকি,—"পূর্ণ কর বাসনা, দেবী কমলাসনা, ধন্য হল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ! তব করুণা পতিমনে, রাখ হৃদি ভরিয়ে, চিরদিন করিব তব চরণসুধা পান!" (বনদেবীগণের প্রস্থান)

কালী প্রতিমার নিকট বাল্মীকির বিদায় গান;—"শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা! পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা! মায়ের মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা!"

ষষ্ঠ দৃশ্য। উদ্দেশ্য—সরস্বতীর বর—কবিত্ব লাভ। কল্পিত নাট্যবস্তু—সরস্বতীর অন্তর্ধানে বাল্মীকির করুণ খেদোক্তি—কোথা লুকাইলে! সব আশা নিবিল, দশদিশি অন্ধকার, সব গেছে চলে তেজিয়ে আমারে তুমিও কি তেয়াগিলে!

লক্ষ্মীর আবির্ভাব; বাল্মীকির প্রতি লক্ষ্মীর রত্ন-রাশিদানের প্রলোভনঃ ভারতীর বিদ্যালোকে মোহিত বাল্মীকির লক্ষ্মীর দান প্রত্যাখ্যান,—"কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা! তুমি তো নহ সে দেবী, কমলাসনা,—করো না আমায় ছলনা! কী এনেছ ধনমান! দেবী গো চাহি না,...মণিময় ধূলিরাশি চাহি না!...যাহ লক্ষ্মী অলকায়, যাহ লক্ষ্মী অমরায়, এ বনে এসো না, এসো না, এসো না এ দীনের কুটীরে।" (প্রত্যাখ্যাতা লক্ষ্মীর অন্তর্ধান; বাল্মীকির প্রস্থান)।

বনদেবীগণের প্রবেশঃ বাল্মীকিকে দর্শন-দানে বনদেবীগণের ভারতীর প্রতি প্রার্থনা,—"বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী! অন্ধজনে নয়ন দিলে, অন্ধকারে ফেলিলে, দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি!...তোমারে চাহি ফিরিছে হেরো কাননে কাননে অই!" (বনদেবীগণের প্রস্থান)।

বাল্মীকির প্রবেশ ঃ সরস্বতীর আবির্ভাবে বিশ্ব-ছন্দোময়; পুলকিত বাল্মীকির স্তব,—

"এই যে হেরি গো দেবী আমারি!
সব কবিতাময় জগত চরাচর
সব শোভাময় নেহারি!
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে!
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে!
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল,
বনে বনে এ কী গীতি গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ-রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি! তুমিই কি দেবী ভারতী,
কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে;
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে!
তুমি ধন্য গো,
রব চিরদিন চরণ ধরি তোমারি!"

সুপ্রসন্না ভারতীর বরে বাল্মীকির কবিত্ব লাভে বরদানের দিব্য বাণীঃ—

"দীনহীন বালিকার সাজে
এসেছিনু ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন;—
শোন বৎস, শোন তাহা শোন!
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ!
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোর কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ!
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারিদিকে দিক্-বধূ আকুল নয়ন-জলে!
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা!
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়!
যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথা তোর নাম রবে,
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্যস্রোত ব'বে!
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া,
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া!
মোর পদ্মাসন-তলে রহিবে আসন তোর!
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর!
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত!
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার!" *

(নাট্য সমাপ্ত)

এক্ষণে বাল্মীকি-প্রতিভায় বর্ণিত নাট্য-বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের স্বল্প সমালোচনা অপ্রীতিকর হইবে না, মনে হয়।

(১) বাল্মীকি দস্যুপতি; তাই দস্যুবৃত্তির কথাসূত্র ধরিয়াই কবি কল্পনার সুকৌশলে দস্যুপতির পাষাণহৃদয় করুণ রসে বিগলিত হওয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। এই রসের আলম্বন—বালক-বালিকার প্রাণ রক্ষার্থ করুণ প্রার্থনা। পরবর্তী দৃশ্যের পটভূমিকায় বর্ণিত হরিণশিশুর বধার্থ শরক্ষেপণে দস্যুগণের প্রতি বাল্মীকির সনির্বন্ধ নিষেধ ও ব্যাধকৃত ক্রৌঞ্চবধ হেতু ব্যথিতহৃদয় বাল্মীকির মুখে শ্লোক নিঃসরণ—এই দুইটি সেই করুণ রসের ধারাবাহিকতার পরিচায়ক। ছদ্মমূর্তি বালিকার রূপে দস্যুপতির প্রতি সরস্বতীর প্রসাদ গূঢ় রাখিয়া, দস্যুবৃত্তির অবসানে বাল্মীকির করুণার্দ্র হৃদয়ে বিদ্যালোকময় সরস্বতীর প্রকাশ ও নাট্যশেষে মূর্তিমতী সরস্বতীর আবির্ভাব বর্ণনা করিয়া, কবি দেবীর প্রসন্নতার ধারা প্রবহমান ও পরিস্ফুট করিয়াই অঙ্কিত করিয়াছেন। কৃপালু ভারতীর সেই প্রসাদ-হেতুক বরেই বরপুত্র বাল্মীকি কবিত্বলাভে 'কবি' বাল্মীকি নামে প্রথিত ও করুণরসাত্মক রামায়ণ মহাকাব্যের মহাকবির পদে অধিষ্ঠিত। তাই তিনি ভারতের কবিকুলশিরোমণি কবিগুরু বাল্মীকি।

(২) বনদেবীগণের ও দস্যুদলের ভূমিকা নাট্যে গৌণবস্তু। লক্ষ্মীর বিষয়ও গুণীভূত নাট্য। রত্নরাশি—মণিময় ধূলিরাশি; বিদ্যারত্ন মহাধন, রত্নরাশি অপেক্ষা মহত্তর—কবির এই অন্তর্গূঢ় বিচারণা লক্ষ্মীর ভূমিকায় সুষ্ঠু সপ্রমাণ হইয়াছে। বিদ্যালোকে আলোকিত সকরুণ হৃদয় নিদারুণ দস্যুবৃত্তির অধিকার নাই; তাই কালী প্রতিমার বিসর্জন কল্পিত হইয়াছে।

---

* বাল্মীকিকে ভারতীর বরদান উপলক্ষ্য করিয়া কবি যে কয়েকটি পঙক্তিতে কবি কর্মের বিশ্বব্যাপিনী শক্তি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত কবি প্রতিভার ইঙ্গিত অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; বস্তুত সরস্বতীর বরবাণী রবীন্দ্রনাথের কবি কৃতিত্বে বর্ণে বর্ণে নিঃসংশয় সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহা সুধীগণের বিবেচ্য।

"ক্ষুরস্য ধারা"—
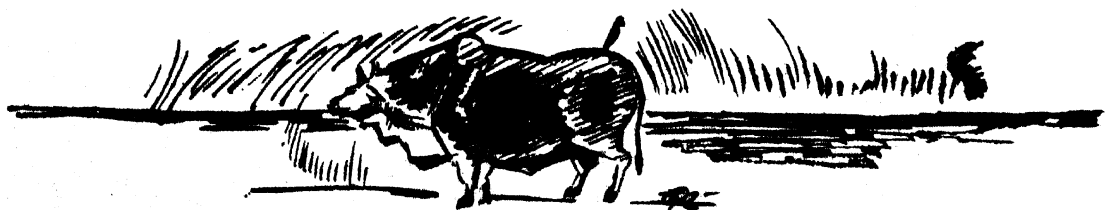
সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

(চার)

পরদিন গ্রে ও ইসাবেলের সঙ্গে দেখা করে জানালাম লারীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। ওরাও আমার মতই বিস্মিত হয়ে গেল।

ইসাবেল বলে ওঠে—"ওর সঙ্গে দেখা হ'লে ভারী মজা হবে, এখনই ওর সঙ্গে দেখা করা যাক্।"

তখন আমার মনে হ'ল লারী যে কোথায় আছে সে ঠিকানাটা ত' নেওয়া হয়নি। ইসাবেল আমাকে যা নয় তাই বলল্।

আমি হেসে প্রতিবাদ হিসাবে বল্‌লাম—"জানতে চাইলেও ও কি আর আমাকে বলত? হয়ত আমার অবচেতন মন এর জন্য কিছু দায়ী। তোমার মনে নেই, ও কোথায় থাকে কখনোই কাউকে বলতো না—এতো ওর অন্যতম খেয়ালের মধ্যে—যে কোনও মুহূর্তেই হয়ত ও এসে পড়বে।"

গ্রে বল্‌ল—"ঠিক ওর উপযুক্তই হবে, সেই অতীতকালে মনে আছে ত' যেখানে ওকে পাওয়ার আশা থাকত সেখানে কখনও পাওয়া যেত না—আজ এখানে কাল সেখানে, এমনই চিরদিন। কোনও ঘরে ওকে দেখে সবে হয়ত মনে করছ এবার গিয়ে 'হ্যালো' বলা যাক্, তারপর যেতে না যেতেই দেখা যাবে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে।"

ইসাবেল বলে "ও অবশ্য বরাবরই উত্যক্ত-কর মানুষ,—সেকথা অস্বীকার করা যায় না, আমার ত' মনে হয় যতক্ষণ ওর মর্জি হবে ততকাল আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।"

সেদিন আর লারী এল না, তার পরদিন, তারও পরের দিন নয়। ইসাবেল আমাকে আক্রমণ করে বলে তাকে রাগাবার উদ্দেশ্যে এই কাহিনীটি বানানো হয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌লাম তা করিনি, কেন ও আস্‌ছে না তার হেতু জানাবার চেষ্টা করি। কিন্তু সেসব কথায় কাজ হয় না—আমি স্বয়ং মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লাম যে সমগ্র ব্যাপারটি ভেবে নিয়ে হয়ত গ্রে আর ইসাবেলের সঙ্গে দেখা না করাই শ্রেয় স্থির করেছে—আর হয়ত প্যারী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। আমার একটা ধারণা ছিল ও কোথাও শিকড় বসাতে চায় না, আর সর্বদাই অল্প সময়ের মধ্যে খেয়াল মত এক জায়গা থেকে অন্যত্র নড়ে যেতে পারে।

অবশেষে একদিন ও এসে পৌঁছল। সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল গ্রে "মরতেফঁতেনে" যায় নি। আমরা তিনজনেই একত্রে ছিলাম,—ইসাবেল আর আমি চা পান কর্‌ছিলাম। গ্রে হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছিল এমন সময় বাটলার দরজা খুলে দিল—লারী ঘরে এসে দাঁড়াল। ইসাবেল এক রকম চীৎকার করে ওঠে দাঁড়াল তারপর তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু গালে চুমো খেলো। গ্রের লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠেছে,—সে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে লারীর করমর্দন করল।

আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে—"তোমাকে দেখে ভারী আনন্দ হচ্ছে লারী।" ইসাবেল নিজের ঠোঁটটি দাঁত দিয়ে চেপে আছে, বুঝলাম কান্না চাপার চেষ্টা করছে। গ্রে অস্থিরভাবে বল্‌ল—"এসো ভায়া এক পাত্র টানা যাক্।"

এই পরিব্রাজকটিকে পেয়ে ওদের এই আনন্দ দেখে অভিভূত হলাম। ওর পক্ষেও হয়ত খুবই মনোরম লাগ্‌ছে এই ভেবে যে ওদের কাছে কি ওর মূল্য। সে আনন্দভরে হাসতে লাগ্‌ল,—আমার কাছে এটুকু স্পষ্ট হল যে ও সম্পূর্ণ আত্ম-সমাহিত। চায়ের জিনিসগুলি ওর চোখে পড়ল।

সে বল্‌ল—"আমি এক কাপ চা খাব।"

গ্রে চেঁচিয়ে বলে—হা ভাগ্যবান! চা খাবে কি? এস এক বোতল স্যাম্পেন খাওয়া যাক্।

লারী হেসে বলে—"না, আমার চা হ'লেই চল্‌বে।"

তার এই গাম্ভীর্যে অপরের প্রতি অভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া ঘটলো। সবাই শান্ত হয়ে গেল, তবু তার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি অবশ্য একথা বল্‌তে চাই না যে তাদের এই স্বাভাবিক আতিশয্যের উচ্ছ্বাসে ও অশোভন শীতলতা এনে দিল, তার ভঙ্গী আশানুরূপ আন্তরিক ও মনোহর। কিন্তু ওর এই ভঙ্গীতে আমি কেমন একটা দূরত্বের ছায়া লক্ষ্য করলাম, ভাবতে লাগ্‌লাম—এর অর্থ কি।

ইসাবেল চেঁচিয়ে বলে—মূর্তিমান ধূম-কেতু! তখনই সোজা চলে এলে না কেন?—একটা অবজ্ঞার ভান তার কথায়।—তারপর বলে—"গত পাঁচ দিন ধরে জানলা দিয়ে কেবলই ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌ছি আসছো কিনা, দরজায় ঘণ্টা বাজলে প্রাণ আমার মুখের গোড়ায় এসেছে—আর আমাকে যা [illegible] হয়েছে।"

লারী মুখ টিপে হাস্‌ল।

বল্‌ল : "মিস্টার এম—বললেন আমাকে এমনই বেয়াড়া দেখাচ্ছে যে তোমার লোকজন হয়ত আমাকে ঢুকতেই দেবে না। তাই লণ্ডনে উড়ে গিয়ে কিছু পোষাক কিনিয়ে নিয়ে এলাম।"

আমি হেসে বল্‌লাম—"এত শত করার প্রয়োজন ছিল না, বেল জার্ডিনেয়র—বা প্রিনটেমসে গিয়ে তৈরী জামা পেতে পারতে।"

"ভাবলাম, যদি করতেই হয়, ভাল করে স্টাইল মতই করা যাক—গত দশ বছরের ভিতর য়ুরোপে পোষাক করাই নি। আপনার দর্জির কাছে গিয়ে বল্‌লাম তিন দিনের ভিতর স্যুট চাই। সে বল্‌ল—একপক্ষ লাগবে, অবশেষে চারদিনে রফা করলাম, এই এক ঘণ্টা হ'ল লণ্ডন থেকে ফিরেছি।"

লারী নীল সার্জের জামা পরেছিল, চমৎকার মানিয়েছে, শাদা সার্ট—নরম কলার, নীল সিল্কের টাই, আর বাদামি রংএর জুতা। মাথার চুল ছোট করে ছেঁটেছে আর দাড়ি কামিয়েছে। শুধু যে সুন্দর দেখাচ্ছে তা নয়, বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। এ এক পরিবর্তন। লারী অতি রোগা, তার চোয়াল অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাথার রগ দুটি আরও ফাঁকা হয়েছে আর গভীর অক্ষিকোটরের ভিতর চোখ দুটি আরও বড় হয়ে উঠেছে, এত বড় চোখ দেখেছি কিনা মনে নেই। কিন্তু এত সত্ত্বেও ওকে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। ওর সেই সূর্য-দগ্ধ অকুণ্ঠিত মুখে ওকে অদ্ভুত কম বয়েসী মনে হয়। গ্রে'র চাইতে সে এক বছরের ছোট। দুজনেই ত্রিশের গোড়ার দিকে, কিন্তু গ্রেকে বয়সের অনুপাতে দশ বছরের বড় বলে মনে হয়, লারী যেন দশ বছরের ছোট শারীরিক স্থূলত্বের জন্য গ্রে'র চালচলন বেশ গম্ভীর ও নিশ্চিত; কিন্তু লারীর হাল্কা ও সহজ ভঙ্গী। তার ভঙ্গিমা বালকোচিত, উজ্জ্বল ও মার্জিত। কিন্তু সব জড়িয়ে এমন একটা অদ্ভুত প্রশান্তি লক্ষ্য করলাম যা আমি আগের দিনের পরিচিত বালক লারীর মধ্যে লক্ষ্য করিনি। পুরাতন বন্ধুদের পক্ষে যা স্বাভাবিক সেইভাবেই বিনা বাধায় আলাপ আলোচনা চল্‌তে লাগল, উভয়েরই স্মৃতির সূত্র এক, আর গ্রে বা ইসাবেল চিকাগোর টুক্‌রো-টাক্‌রা সংবাদ বলে, তুচ্ছ ঘটনা ও সংবাদ, এক থেকে আরেক দিকে আলোচনার গতি প্রবাহিত হয়,—এই সবের ভিতর থেকেও আমার মনে হল যদিচ লারী ইসাবেলের বকবকানিতে আমোদ অনুভব করছে ও সরলভাবে যোগ দিচ্ছে, তবু তার ভিতর কোথায় যেন একটা অনাসক্ত ভাব রয়েছে। সে যে অভিনয় করছে তা আমার মনে হয় নি, সে অতিশয় স্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ আর তার সারল্য সন্দেহাতীত। আমি অনুভব করলাম যে তার ভিতর কি যেন রয়েছে—কিন্তু যে শক্তি ওর মধ্যে এই বিস্ময়কর

নিস্পৃহতা এনেছে তার নাম কি সচেতনত্ব, সংবেদনশীলতা, না অধ্যাত্ম শক্তি?

মেয়েদের আনা হল, লারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, তারাও নম্রভাবে নতি জানালো। লারী ওদের প্রতি অতি কোমল চোখে আগ্রহভরে তাকিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল তারাও গম্ভীর মুখে তা গ্রহণ করল। ইসাবেল আনন্দভরে বলল ওরা বেশ পড়াশোনা করছে তারপর ওদের দুজনকে এক একটি মিঠে চাপাটি হাতে দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিল।

বলল—তোমরা বিছানায় শুলে আমি গিয়ে দশ মিনিট পড়ব।"

সেই মুহূর্তে লারীকে দেখার আনন্দ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। ছোট মেয়ে দুটি তাদের বাপকে 'গুড নাইট' জানাতে গেল। সেই বিরাট প্রাণীর লাল মুখখানিতে যে স্নেহের ভাব ফুটে উঠলো তা লক্ষ্যণীয়, ওদের বুকে জড়িয়ে নিয়ে গ্রে চুমো খেল। সে যে গর্বভরে তাদের আদর করছে এ ভাব কারো চোখ এড়ালো না। ওরা চলে যাবার পর লারীর দিকে ফিরে ঠোঁটে হাসি টেনে সে বলে :

"তেমন দুষ্টু নয়, কি বল?"

ইসাবেল তার দিকে প্রেম ভরে তাকালো।

"আমি যদি গ্রে'র হাতে ছেড়ে দিই তাহলে ওদের একেবারে নষ্ট করে দেবে। ওই লোকটি ওদের পোলাও-কালিয়া খাওয়ানোর জন্য হয়ত আমাকে অনাহারেই মেরে ফেলবে।

গ্রে তার মুখের পানে হাসি ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—"তুমি একটি মিথ্যাবাদী—তুমি ত' জানো যে পথ দিয়ে যাও সে পথও আমার প্রণম্য।"

ইসাবেলের চোখে সমর্থনের হাসি ফুটে উঠে। একথা তার অজানা নেই, ওরা সুখী দম্পতি।

ইসাবেল ডিনার পর্যন্ত থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল—ওরা এখন নিজেদের মধ্যে থাকতেই হয়ত চায় এই ভেবে আমি নানা প্রকার অছিলা জানিয়ে আপত্তি করলাম—কিন্তু ইসাবেল শুনলো না।

"মেরীকে বলে দিই স্যুপে আর একটা গাজর ছেড়ে দিতে—তাহলেই চারজনের মত হয়ে যাবে—একটা চিকেন আছে—গ্রে আর আপনি ঠ্যাঙের দিকটা পাবেন, লারী আর আমি ডানার অংশ পাব, আর আমাদের সবায়ের পক্ষে যথেষ্ট করে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে সে তৈরী করতে পারে।"

গ্রে প্রশ্ন করল—"বেশ মজা তো! বাঘ-আমি তাই ওদের যা অভিরুচি সেই মত চলতেই রাজী হলাম।

আমরা যখন অপেক্ষা করছিলাম তখন সংক্ষেপে যা ইতিপূর্বে আমি লারীকে বলেছিলাম তারই বিস্তারিত কাহিনী ইসাবেল লারীকে শোনাতে লাগল। যদিচ এই করুণ কাহিনী যথাসম্ভব সহজ ও লঘু করে সে বর্ণনা করছিল গ্রের মুখখানি বিষাদে ভরে উঠল। ইসাবেল তাকে প্রফুল্ল করার চেষ্টা করে, বলে :

"যাই হোক্ এখন ত' সব চুকে বুকে গেছে, এখন আমরা পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে। অবস্থার একটু উন্নতি হলেই গ্রে একটা ভাল কাজ জুটিয়ে নিয়ে আবার লাখ্ লাখ্ টাকা রোজগার করবে।"

কক্‌টেল এল,—দুপাত্র পান করার পর যেন বেচারার মনটা একটু ফিরল্। দেখলাম লারী যদিও একপাত্র নিয়ে ছিল—তা প্রায় স্পর্শই করেনি, গ্রে সেদিকে লক্ষ্য না করেই যখন আরেক পাত্রের জন্য অনুরোধ করল তখন সে তা প্রত্যাখ্যান করল। আমরা হাত ধুয়ে ডিনারে বস্‌লাম। গ্রে স্যামপেন আনতে হুকুম দিয়েছিল—বাট্‌লার যখন লারীর গ্লাসে ঢালতে গেল তখন সে জানালো তার প্রয়োজন নেই।

ইসাবেল বলে ওঠে—"না, না একটু নিতেই হবে, এ হ'ল এলিয়ট মামার সেরা জিনিস, শুধু বিশিষ্ট অতিথিদেরই দেওয়া হয়।"

"সত্যি কথা বলতে কি, আমার জলই ভাল লাগে, এতদিন প্রাচ্য দেশে কাটিয়ে জেনেছি জলপানই শ্রেয় ও নিরাপদ।"

"আজ একটা বিশেষ দিন।"

"বেশ, আমি এক গ্লাস নিচ্ছি।"

চমৎকার ডিনার। কিন্তু ইসাবেলও আমার মত লক্ষ্য করল লারী খুব কমই আহার করল।

মনে হল, সহসা ইসাবেলের মনে পড়ল যে কথাবার্তা যা কিছু সে-ই বলে চলেছে আর লারী কথা শোনা ছাড়া আর কিছু করার সুযোগ পাচ্ছে না—তাই সে এখন ওর গত দশ বছরের কার্যকলাপের বিষয় প্রশ্ন করতে লাগল—এর ভিতর আর ওদের সাক্ষাৎকার ঘটেনি। লারী অবশ্য তার স্বাভাবিক সারল্যের সঙ্গে জবাব দিতে লাগল, কিন্তু তা অতি ভাসা ভাসা, যেন আমাদের বেশি কিছু বলতে চায় না।

"এই চারদিকে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ালাম। এক বছর জার্মাণীতে কাটল, কিছু দিন স্পেন আর ইতালীতে—তারপর একটু প্রাচ্য দেশে কাটিয়ে এলাম।"

"এখন কোথা থেকে আসছ?"

"ভারতবর্ষ।"

"সেখানে কত দিন ছিলে?"

"পাঁচ বছর।"

গ্রে প্রশ্ন করল—"বেশ মজা তো! বাঘ-টাঘ মারলে নাকি"?

লারী হেসে বলে—"না।"

ইসাবেল বলে : "তাহলে পাঁচ বছর ধরে ভারতবর্ষে কি করছিলে?"

ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে লারী বলে—"খেলে বেড়াচ্ছিলাম।"

গ্রে বলল—"আচ্ছা 'দড়ির ম্যাজিকের' ব্যাপারটা কি? দেখেছ?"

"না, তা দেখিনি।"

"কি সব দেখলে সেখানে?"

"অ নে ক কি ছু।"

আমি এবার ওকে একটা প্রশ্ন করলাম :

"আচ্ছা, যোগীরা কি এমন শক্তি লাভ করতে পারে যা আমাদের কাছে অ-প্রাকৃত মনে হতে পারে?"

"আমি ঠিক জানিনা। তবে এইটুকু বলতে পারি, ভারতবর্ষে সাধারণত সকলেরই এই বিশ্বাস। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এই শক্তি সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব দেন না; তাঁদের ধারণা এর দ্বারা অধ্যাত্ম সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। মনে পড়ে একজন যোগীর কথা শুনেছিলাম—নদীর কিনারে এসে দেখলেন পার হওয়ার পয়সা নেই, আর মাঝি তাঁকে বিনামূল্যে অপর পারে নিয়ে যেতে রাজী হল না। তিনি তখন জলের ওপর দিয়ে হেঁটেই অপর পারে চলে গেলেন। যে যোগী আমাকে এই কাহিনীটি বলেছিলেন তিনি উপেক্ষাভরে কাঁধ নেড়ে বল্লেন : এই জাতীয় কৌশলের মূল্য পার হতে যে পয়সা লাগত তার চাইতে বেশি নয়।"

গ্রে প্রশ্ন করল,—"কিন্তু তোমার কি ধারণা সত্যই হেঁটে সেই যোগী নদী পার হয়েছিলেন?"

"যে যোগী আমাকে বলেছিলেন, তাঁর অবশ্য অখণ্ড বিশ্বাস।"

লারীর কথা শুনতে বড় ভালো লাগে, ওর গলার আওয়াজ বড়ই সুরেলা—বেশ হালকা, গভীর না হলেও দামী, আর কণ্ঠস্বরে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। আমাদের ডিনার শেষ হল, বৈঠকখানায় গিয়ে 'কফি'র জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি কখনও ভারতবর্ষে যাইনি, তাই সেখানকার আরও কথা জানার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত ছিলাম।

আমি প্রশ্ন করলাম,—কোনো লেখক বা চিন্তানায়কের সংস্পর্শে এসেছিলে না কি?"

আমাকে ক্ষেপাবার উদ্দেশ্যে ইসাবেল বলে : "আপনি যে দুটির ভেতর একটা পার্থক্য রাখছেন দেখছি।"

লারী জবাব দেয়—"এই কাজই ত ছিল আমার।"

"কি ভাবে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে? ইংরাজীতে?"

"ও'রা যদি কিছু বলতেন তাতে মজাই হত, বলতে ভালো পারতেন না, আর বোঝেন কম। আমি হিন্দুস্থানী শিখেছিলাম। আর দক্ষিণ দিকে গিয়ে কাজ চালাবার মত বেশ তামিল শিখে নিয়েছিলাম।"

"লারী—তুমি কতগুলি ভাষা শিখেছ?"

"ঠিক জানিনা, ছ'সাত রকমের হবে।"

ইসাবেল বলল : "যোগীদের কথা আরো শুনতে ইচ্ছা করে, ঘনিষ্ঠ ভাবে কারো সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।"

লারী হেসে বলে, "যাঁরা অনন্তের সন্ধানে দিন কাটান, তাঁদের যতটুকু ঘনিষ্ঠভাবে জানা সম্ভব তা জেনেছি, একজন যোগীর আশ্রমেও দু'বছর ছিলাম।"

"দু ব ছ র? আশ্রম আবার কি?"

"আশ্রম মানে সাধুজনের আস্তানা বলা যায়, সাধুরা নির্জনে ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় কোনো মন্দিরে, অরণ্যে বা হিমালয়ের পাদদেশে সাধনা করেন। আর এক শ্রেণীর সাধু আছেন তাঁরা শিষ্যদের নিয়ে থাকেন। দানশীল ব্যক্তিরা তাঁদের শ্রদ্ধেয় যোগীদের জন্য ছোট বা বড় ধরণের বাড়ি ঘর তৈরী করে দেন, আর তাঁর শিষ্যবৃন্দ গুরুর সঙ্গেই থাকেন বা বারান্দায় —বা রান্না ঘরের অভাবে গাছের তলায় পর্যন্ত দিন কাটিয়ে দেন। আমি উঠানে একটা ছোট্ট কুঁড়ে পেয়েছিলাম, কোনো রকমে আমার খাটিয়া, একটি চেয়ার ও টেবল আর বুক-সেলফটা ধরত। "

আমি প্রশ্ন করলাম,—"এ জায়গাটা কোথায়?"

"ত্রিবাঙ্কুর। চমৎকার জায়গা—সবুজ পাহাড় আর শান্ত নদী ঘেরা উপত্যকা। পাহাড়ের ওপর বাঘ, চিতা, হাতী ও বাইসন আছে—কিন্তু আশ্রমটি সাগর সংলগ্ন খালের উপর, চার পাশে নারিকেল গাছ আর এরেকা-পামের ঝাড়। নিকটস্থ শহর থেকে জায়গাটি তিন চার মাইল দূরে, কিন্তু পায়ে হেঁটে বা বয়েল গাড়ি চড়ে কাছের ও দূরের বহুলোক যোগীর মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য আসে —যদি তিনি কিছু না বলতেন, তাহলেও তাঁর পায়ের তলায় বসে তাঁর উপস্থিতিতে যে মঙ্গলের পরশ পাওয়া যায় তাই তারা শান্তিতে উপভোগ করে, সাধু লোকের শুভাশীষের সৌরভে বাতাস সুরভিত হয়ে ওঠে।"

গ্রে অস্বস্তিভরে চেয়ারে নড়ে বসে। অনুমান করলাম আলোচনা এমন খাতে চলেছে যা তার কাছে তেমন মনোহর লাগছে না।

গ্রে আমাকে বলল: "নিন, কিছু পান করুন।"

"না, ধন্যবাদ।"

"আমি একটু নেব, ইসাবেল তুমিও নেবে না কি?"

সেই বিশাল বপু নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে সে যে টেবলে হুইস্কি আর গ্লাস ছিল সেখানে গেল।

"ওখানে আরও শাদা লোক আছেন নাকি?

"না, আমিই একা ছিলাম।"

ইসাবেল বলে ওঠে—"কি করে দুবছর এ সব সইলো তোমার?"

"যেন একটি মুহূর্তের মত কেটে গেছে। এমন দিনও কাটিয়েছি যা অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ মনে হয়েছে।"

"এই সময়টা তুমি কিভাবে কাটালে?"

"পড়তুম, অনেক দীর্ঘ পথ হাঁটতাম্— খালের ভিতর নৌকায় বেড়াতাম। ধ্যান করতাম। এই ধ্যান করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। দু'তিন ঘণ্টার পর এতই ক্লান্ত মনে হয় যেন তুমি পাঁচশো মাইল মোটর ড্রাইভ করে এসেছ। তখন শুধু প্রয়োজন বিশ্রামের।"

ইসাবেল ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করল। সে ধাঁধায় পড়েছে একটু ভয়ও হয়ত পেয়েছে। আমার মনে হয় তার ধারণা হতে লাগল যে, লারী কয়েক ঘণ্টা পূর্বে এই ঘরে এসে ঢুকেছে। সে আকৃতিতে সেই অতীতের লারি এবং সেই রকমই বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও তার সেই সহজ ও আনন্দ চঞ্চল রূপ কই, কোথায় সেই অতীতের লারি যে ওর সকল কথার সমর্থক ছিল, সে লারির সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ। আগেই ওকে সে হারিয়েছে—পুনরায় তাকে দেখে, পুরাতন দিনের লারি হিসাবে গ্রহণ করে ও ভেবেছিল পরিস্থিতি যতই পরিবর্তিত হোক, লারি তারই একান্ত আপন জন হয়েই আছে; আর এখন যেন হাত দিয়ে রবিরশ্মি ধরতে গিয়ে তা আঙুলের ফাঁকে বেরিয়ে পড়েছে, ইসাবেল তাই ঈষৎ বিহ্বল হয়ে পড়েছে। সেইদিন সন্ধ্যায় ওকে আমি খুবই লক্ষ্য করেছিলাম, এ কাজটি সর্বদাই মনোরম। ওর চোখের সপ্রেম দৃষ্টি ওর মাথার ওপর ঘুরতে দেখেছিলাম, সেই দৃষ্টি আবার চোয়ালের শূন্যতা লক্ষ্য করে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তার দীর্ঘ সরু হাতগুলি কৃশ হলেও বেশ শক্ত ও দৃঢ় সেদিকেও ইসাবেল তাকালো। তারপর তার দৃষ্টি পড়ল ওর মুখে, সুগঠিত সুন্দর মুখ, সুন্দর ভ্রূযুগ আর সুঠাম নাকে সে মুখ মনোহর। ওর নতুন পোষাক পরার ভিতর এলিয়টের থিয়েটারের যন্ত্রসঙ্গীতের দলের ঢঙ নেই এবং একটা অমনোযোগের ভাব যেন সে সারা বছরই এভাবে পোষাক পরে আসছে, অনুভব করলাম ইসাবেলের মনে ও একটা মাতৃত্বের আবেগ এনেছে, নিজের সন্তান সম্পর্কে তার এই জাতীয় জননীসুলভ মমতা কোনোদিন লক্ষ্য করিনি। সে এক অভিজ্ঞ রমণী, আর লারিকে এখনও বালকের মত দেখায়। উপযুক্ত সন্তান সম্পর্কে জননীর মনে যে গর্ব ফুটে ওঠে আমার মনে হ'ল ওর মনেও সেই ভাব জেগেছে, কেননা লারি বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলছে আর সবাই তা শুনছে, অর্থাৎ সে যা বলছে তা অর্থপূর্ণ। আমার কিন্তু মনে হয় না যে, লারি যা বলছিল তার অন্তর্নিহিত অর্থ সে সম্যক উপলব্ধি করতে পারছিল না।

আমার কিন্তু প্রশ্ন করা শেষ হয়নি।

বললাম: "তোমার যোগীটি কি রকম দেখতে?"

"অর্থাৎ, আকৃতিটা কেমন জানতে চাইছেন? উনি তেমন লম্বা ন'ন—তেমন মোটা বা রোগা ন'ন। রঙটা ম্লান বাদামী রঙের, পরিচ্ছন্নভাবে দাড়ি কামান, চুল ছোট করে ছাঁটা। ছোট্ট টুকরো কাপড় ভিন্ন কিছুই পরেন না, অথচ তাঁকে ব্রুকস্ ব্রাদার্সের বিজ্ঞাপনের মত সুশ্রী, সুসজ্জিত তরুণের মতো পরিচ্ছন্ন দেখায়।"

"কি এমন তাঁর ভিতর ছিল যা তোমাকে আকৃষ্ট করল?"

প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে লারি আমার পানে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইল। সেই গভীর অক্ষি-কোটরের ভিতর থেকে ওর চোখ এমনভাবে বেরিয়ে আসছে যেন আমার আত্মার গভীরে তা ভেদ করে যাবে।

"সিদ্ধ মহাপুরুষ।"

ওর এই জবাবে আমি কিঞ্চিৎ আশাহত হয়ে পড়লাম। চারিদিকের দেয়ালে বহুমূল্যে চিত্রাবলী শোভিত সেই চমৎকার আসবাবে পরিপূর্ণ ঘরের ছাত থেকে যেন এক বিন্দু জল চুঁইয়ে পড়ল উচ্ছ্বসিত স্নানঘর থেকে।

"আমরা সকলেই সাধু সন্তদের কথা পড়েছি, সেন্ট ফ্রান্সিস্, সেন্ট জন অফ্ দি ক্রস প্রভৃতি। কিন্তু সে সব শত শত বছর আগেকার কথা। আমি কোনোদিন ভাবিনি, এমন একজনর সাক্ষাৎ মিলবে যিনি আজো জীবিত। প্রথম যেদিন তাঁকে দেখি সেদিনই মনে হয়েছিল ইনি সিদ্ধ মহাপুরুষ। মহাত্মা নয় বলে কোনোদিনই মনে সন্দেহ জাগেনি সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।"

"এতে তোমার কি লাভ হ'ল?"

হাল্কা হেসে সে শুধু বলল: "শান্তি।" তারপর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—"না আমাকে এখন যেতেই হবে।"

ইসাবেল বলে ওঠে—"না লারি, এখনই কি! এখনত' সবে সন্ধ্যে।"

তবু সে হেসে বলে, "গুড নাইট।" তার সেই অনুযোগ লারি যেন লক্ষ্যই করে না। তারপর তার গালে চুমা দিয়ে বলে: "দু'এক দিনের ভিতর আবার দেখা করব।"

"কোথায় আছো? আমিই যাবো তোমার ওখানে।"

"না, না, তা করতে যেয়োনা—পারীতে একটা কল পাওয়া কি কঠিন জানো ত' তা ছাড়া আমাদের ফোনটা আবার অচল হয়েই আছে।"

লারী কি সুচারুভাবে ঠিকানা দেওয়ার অনুরোধ এড়িয়ে গেল তা বুঝে আমি মনে মনে হাসলাম। নিজের বাসার ঠিকানা গোপন করে রাখা ওর একটা অদ্ভুত খেয়াল। আমি প্রস্তাব করলাম, আগামী পরশু দিন সকলেই আমার সঙ্গে একত্রে "বই দ্য বুলোনে" ডিনার খাবে। সেই চমৎকার বসন্তকালে ঘরের বাইরে গাছের তলায় বসে খেতে ভালো লাগবে। আর গ্রে তার গাড়িতে আমাদের নিয়ে যাবে। লারির সঙ্গেই আমি বেরিয়ে পড়লাম—স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে কিছুদূর হেঁটে যেতে পারতাম, কিন্তু পথে নামতেই ও আমার করমর্দন করে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল।

আমি একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম।

(ক্রমশ)

দেশলাই

সুশীল রায়

সহায় বা সম্বল বলে কাউকে মানিও না, কাউকে জানিও না। সুতরাং দেশলাইকে সহায় বলতে আমি নারাজ। একে সংগী ব'লেও কোনোদিন স্বীকার আমি করিনি। কিন্তু ঘটনাটা অজানিতে কিভাবে যেন নিয়মিত ঘ'টে যাচ্ছে এক এক সময় আমারি আশ্চর্য লাগে।

যখন যেখানে যে-ভাবেই আমি থাকি না কেন, আমার সংগে দেশলাই একটা থাকবেই। অন্যমনস্ক হয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে অনেক দিন চমকে উঠেছি—পকেটে আওয়াজ করে উঠেছে দেশলাই। আমার চমকেই ও বেজে ওঠে, অথবা ওর বেজে ওঠাতেই আমি চমকে যাই—সেটা এখনো ঠিক করতে পারিনি। সংগে দেশলাই রাখার এই বদভ্যাস সত্ত্বেও তার সংগ এখনো আমি রপ্ত করতে পারিনি। আমার তো মনে হয়, আমি ওকে চাইনে, ও-ই আমাকে চায়। এমন কঠিন কামড় দিয়ে তাই আমাকে ও ধ'রে রেখেছে। আমি হাত দিয়ে ওকে পকেটে কুড়িয়ে নিইনে, ওই আমার হাতের মারফৎ পকেটে ঢুকে পড়ে। হাতের সংগে ওর ষড়যন্ত্র নির্ঘাৎ আছে।

কিন্তু হাতেরই বা দোষ দিই কেন। কাছে একটা দেশলাই টেনে না নিলে মনটাই কেমন খাঁ খাঁ করতে থাকে। অতএব বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, আমার মনের ওপর ও মোক্ষম প্রভাব বিস্তার করেছে। অকপটে স্বীকারই করে ফেলি তাহলে—একটা দেশলাই না হ'লে আমার কিছুতে চলে না। আমাকে ও-যে বশ ক'রে নিয়েছে, এটা তার প্রমাণ ছাড়া অবশ্য কিছু না। আকৃতিতে ও চৌকো, এইটুকুই জানতেম। প্রকৃতিতেও যে ও চৌকশ, আগে তা টের পাইনি। অনেকে বলতে পারেন, দেশলাই-এর ওপর আমার প্রীতিটা নিছক ভন্ডামী, ধোঁয়ার ওপর টান থাকার দরুণ ওকে আমি খোসামোদ করছি। মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা নাড়া-চাড়া করেন, তাঁরা একটা ঘটনার বিস্তর বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু আমার মনের সংগে আমার পরিচয় তাঁদের থেকে নিশ্চয় ঘনিষ্ঠতরো, এ-বিষয় দ্বিমত থাকার কথা নয়। সুতরাং আমার মন সম্বন্ধে বাইরের কারো মন্তব্য অনধিকার চর্চারই সামিল ব'লে ধ'রে নিতে হবে। দেশলাই-এর ধামা-ধরার ইচ্ছে যদি আমার থাকতো, তাহলে প্রকাশ্যেই আমি তা ধরতাম। আরো কথা কি জানেন, তোষামোদে ভুলে যাবার পাত্র নয় দেশলাই। এর সংগে যার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, সে-ই এ-কথা জানে। একে নিয়ে একটু-আধটু ঘষাঘষি করলেই ফস ক'রে ও প্রতিবাদ জানিয়ে রীতিমতো জ্ব'লে ওঠে। সুতরাং তোষামোদ দূরের কথা, আমি ওর কাছে বড় একটা ঘেঁষতে চাইনে। নিরিবিলি আমার সংগে ও থাকে, সেইটুকুই ওর সংগে আমার সম্পর্ক, এর বেশি কিছু নয়।

এক সময় এর নাম নাকি ছিল দীপশলাকা। তখন এর চেহারা কেমন ছিল, সে-খবর জানা যায়নি। কিন্তু এখন এ একটা বাক্সের আকার ধারণ করেছে। দু'পাশে বারুদের প্রাচীর খাড়া করে একটা ছোট-খাট দুর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর গহ্বরে যে-সব কাঠি ঠাসাঠাসি করে বাস করে, তারা অবশ্য সকলেই তালপাতার সেপাই। তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই দেশলাই-এর। সে তার দুর্গত্বের গরিমায় সেপাইদের দুর্গতি চাপা দিয়ে রাখে।

দেশলাই-এর এই পরিচ্ছন্ন নীরব অহংকারটিই আমার ভাল লাগে বেশি। তাই ওকে সংগছাড়া করতে আমি চাইনে। আমার সংগ যদি ওর ভালই লাগে লাগুক। তাকে নিঃসংগ করে দিয়ে লাভ আর হবে কি। আমার সংগে ওকে থাকতে দিয়ে ওর মস্ত উপকার আমি করছি, এমন কথা অবশ্য আমি ভাবিনে। ও আমার সংগে থাকায় আমার উপকার যেটুকু হয়, সেই কথাই মনে পড়ে বারবার। নেহাৎ একা পড়ে যাই যখন, তখন দেশলাই বেজায় দরকারী জিনিস ব'লে ঠেকে। তাকে তোষামোদ না ক'রে তার প্রাচীরের গায়ে একটা তালপাতার সেপাইকে লেলিয়ে দিই। সংঘর্ষ বাধা মাত্র জ্বলে ওঠে আগুন, সেই আগুনে জ্বালিয়ে নিই মুখের চুরটটা। এক মনে ব'সে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মন-মেজাজ চাংগা হ'য়ে ওঠে। তখন পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে পা দোলাই, আর সেই তালে তালে আঙুল দিয়ে বাজাতে থাকি দেশলাইকে।

যার সংগ চাইনে ব'লে আগে ঘোষণা করে এসেছি, তাকে নিয়ে এতটা মৌতাতের ব্যবস্থা যে করিয়ে নেওয়া যেতে পারে—কে তা আগে ভাবতে পেরেছিল। পা দোলাতে দোলাতে পা ব্যথা হয়ে যায়, কিন্তু তবু যেন মৌতাত কমে না। মুখ দিয়ে অনবরত ধোঁয়া বার হতে থাকে। একটু দম নিয়ে নেবার জন্যে মুখের চুরটটা নামিয়ে রাখি দেশলাই-এর ওপর। কোনোরকম আপত্তি সে জানায় না। বুক পেতে যেন রোলার নিতেও সে রাজি। আমার সুখের জন্যে সব কিছু করার জন্যেই সে যেন আমার সংগ ধ'রেছে ব'লে মনে হয়। তার বুকের ওপর আমার মুখের চুরটটা রেখে তাকিয়ে দেখি, আর মনে হয় সত্যিই যেন চুরটটা একটা লোহার রোলারের মতো তার বুকের ওপর গড়াচ্ছে। মায়া হয়। চুরটটা আবার মুখে তুলে নিই।

লোককে এভাবে শাসন আর শোষণ করাটাই বুঝি ফ্যাশান। তাই দেশলাইয়ের সংগে আমরা শাসনের ভংগীতে কথা বলি, আর শোষণের ভংগীতে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করি। ওরা ওদের কেতাদুরস্তি নিয়েই মত্ত, তাই নেপথ্যে কে তার রেস্ত হাতিয়ে নিয়ে নিজের কাজ হাঁসিল করছে, সে হিসেবই মোটে করে না। একটা দেশলাই না হলে, শুধু আমার কেন, কারোরই চলে না। এর প্রধান কারণ, কাঁঠাল ভাঙার জন্যে আর কেউ এমন নিরাপত্তিতে মাথা এগিয়ে দেয় না। প্রতিবাদ জানাবার কিংবা আপত্তি জাহির করবার জন্যে একবার যদি সে রুখে দাঁড়ায়, তাহ'লে কারো-যে রেহাই নেই—এই সামান্য কথাটাও আমরা কোনদিন ভেবে দেখিনি। ওর বুকের মধ্যে জমা আছে শুকনো আগুনের স্তূপ। যে কাঠিদের আমরা তালপাতার সেপাই বলে অবজ্ঞা করে থাকি, সেই এক একটা সেপাই এক একটা গাঁ জ্বালিয়ে দিতে পারে। অবশ্য তেমন ক্ষেপে যদি যায় তারা। সুতরাং দেশলাই সম্বন্ধে আমাদের অবিলম্বে সাবধান হতে হবে। তার সংগে আমাদের ব্যবহার আরও মোলায়েম করতে হবে। তা না হলে দুর্বিপাক এড়ানো যাবে না, একথা এখন থেকে সমঝে রাখাই ভাল।

শুভ কাজে যাতে ওর মন যায়, সেইভাবে ওকে চালিত করতে হবে। বে-কায়দায় ব্যবহার করলে ও যেমন আগুন লাগিয়ে চারদিক পুড়িয়ে ঝলসিয়ে ছারখার করে দিতে পারে, কায়দামাফিক ব্যবহার করলে ওকে দিয়ে তেমনি আমরা আমাদের চারদিকে আলোর উৎসব রচনা করতে পারি। সুতরাং একটু সাবধানে চলাই ভাল। ওকে যেমন-খুসি তেমন ব্যবহার করে ওর চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাতে যদি আমরা চাই, হয়ত তাতে প্রথম প্রথম কোনো আপত্তি সে করবে না। কিন্তু কতদিন সে তা সহ্য করবে, সেইটেই ভাববার কথা।

দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে এই কথাই ভাবছিলাম। ভাবতে

ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে কখন যে হাতের দেশলাই বাজাতে শুরু করেছি, তা খেয়ালই করিনি। হঠাৎ থেমে গেলাম। হাত থেকে দেশলাই ছুঁড়ে টেবিলের ওপর রাখলাম। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে দেশলাইটা সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকাতে লাগলো। মনে হলো, আমি যেন ঘাবড়ে গেলাম। উঠে গিয়ে তার কাছে বসলাম। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম, কিছু বলছে কিনা। উঁহু, সে নীরব। ক্ষেপে গিয়ে এতটা নীরব থাকা তো ভাল লক্ষণ নয়। তাকে তুলে পকেটে পুরতেও ভয় হলো। অনেকক্ষণ সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। কোনোরকম বাধা সে দিলো না। আবার একটা কাঠি বার করে সিগারেট জ্বালার চেষ্টা করলাম। কাঠির মাথা থেকে খসে গেল বারুদ। বুঝলাম, এটা ওর নীরব হুঁসিয়ারী। ওকে যেন সাবধানে ব্যবহার করি, এটা তার একটা সংকেত। একটু আগেই ঝমাঝম বৃষ্টি হয়ে গেছে। জানলার কাছ থেকে তখন ওকে সরিয়ে রাখার কথা আদপে আমার মনেই হয়নি। জলের ছাট লেগেছে ওর গায়ে। কারো তোয়াজ ও চায় না বটে, কিন্তু এই সামান্য আরাম থেকে তাকে বঞ্চিত করা কেন হলো, ও তার জবাব চাইলো বলে আমার কেবলই মনে হতে লগলো। রোদে পোড়ালে ওর বিশেষ কিছু যায় আসে না, কিন্তু জলে ভেজালে ও যে নির্জীব হয়ে পড়ে—একথা জানা সত্ত্বেও আমাদের এই বেপরোয়া উদাসীনতা কেন, তার দিকে চেয়ে আমারও সেজন্যে আক্ষেপ হলো বটে; কিন্তু সে আক্ষেপ তার জন্যে ততটা নয়, যতটা আমার নিজের জন্যে। উপরোউপরি তিনটে কাঠির বারুদ খসে যাওয়ায় আমার যে অসুবিধা হলো, হয়ত মনে মনে তারই জন্যে খেদ করছিলাম, আর ভাবছিলাম—এইটেই আমার আক্ষেপ।

যার কাছ থেকে নানারকমের কাজ পাওয়া যায়, তাকে এইভাবে অবহেলা করাই অবশ্য নিয়ম। এ সত্যটি জানা সত্ত্বেও দেশলাই-এর প্রতি আমার এই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে সংকোচ বোধ করলাম কেন যেন। এ রকম সংকোচ বোধ করা যে নিয়ম নয়, তা অবশ্য জানি। কিন্তু তবুও মুখের ভাপ দিয়ে দিয়ে দেশলাইকে তাতিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। মনে হতে লাগলো, আমি যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। লক্ষণটা ভাল। এইভাবে চারদিকে যদি প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর দেশলাইরা অবশ্যই খুসি হবে। তাহলে অবহেলা করার অদম্য আগ্রহে কিছুটা ভাঁটা পড়বে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সে আগ্রহের কমতি দেখছিনে কোথাও। দেশলাইরা একটানা কাজ করে চলেছে, আমরাও একটানা উদাসীন পদক্ষেপে পকেটের দেশলাই বাজাতে বাজাতে পথ হেঁটে চলেছি। তার কাঠি দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে যখন স্বর্গসুখ উপভোগ করি, তখনও তার প্রতি মমতা আমাদের এতটুকু বাড়ে না। যাকে দিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি গড়িয়ে নিচ্ছি, তাকে উপযুক্ত মজুরী তো দিচ্ছিইনে, তাকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করতেও আমরা কেন-যেন নারাজ। এতে আমাদের ইজ্জতের কোথায় যে আটকায়, আজ পর্যন্ত তা বুঝে উঠতে পারলাম না। একদিন যদি সমস্ত পৃথিবী থেকে দেশলাইরা অন্তর্ধান করে, কিছুদিনের জন্যেও যদি তারা গা ঢাকা দেয়, তাহ'লে আমাদের দুর্গতি কি হবে—আমরা তা ভেবেই দেখিনে।

আমার তাই মনে হয় যে, আমরা আমাদের আগামী দিনের কথা বিন্দুবিসর্গ না ভেবে মনের আনন্দে গা ভাসিয়ে চলাতে মত্ত আছি বলেই, চারদিকে এই অশান্তি ও হাহাকার। আমরা যদি এতটুকু হুঁসিয়ার হয়ে চলি, আমরা যদি অবহেলা ও অসম্মানের নেশাকে বেমালুম বর্জন করতে পারি—তাহ'লে আমাদের চার-দিকের চেহারাই বদলে যায়। স্বর্গ চাক্ষুষ দেখিনি, সুতরাং বলতে পারিনে—পৃথিবী তাহলে স্বর্গের মতো হয়ে যাবে কিনা।

দেশলাইরা তাহলে আবার দীপশলাকা হয়ে উঠবে। তারা আগুন না জ্বালিয়ে আলো জেলে দেবে আমাদের চারদিকে। তার এই সৌখীন দুর্গন্ধ ত্যাগ করে সে তাহলে আমাদের হাতে হাতে শোভা পাবে। আমাদের মনের গলি ঘুঁজিতে আজ যে অন্ধকার আলকাৎরার মতো গড়াচ্ছে, সে অন্ধকার দুগ্ধ ফেননিভ হয়ে উঠবে। এ কথার মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেইঃ এর মধ্যে অতিরঞ্জনের আওয়াজও নেই।

অজানা আর অচেনা ভবিষ্যতের এই ছবিটা দেখে বড় আরাম পাচ্ছিলাম। চোখ বুজে এক মনে ভেবে চলেছি এই ভাবনা। কেমন যেন রোমাঞ্চ হচ্ছিলো। একমাত্র দেশলাই-এর ওপর আমাদের আচরণ বদলে দিলেই যদি পৃথিবীর চেহারা বদলে যায়, তাহলে সেই সহজ পরিবর্তনটা আমরা চাইনে কেন, একথাও মনে হচ্ছিল বার বার। পথটা সহজ বলেই অথবা পরিবর্তনটা সুলভ বলে? কিন্তু সুলভ বা সহজ এরা নয়। নিজেই তা টের পেলাম।

দেশলাই খুঁজছিলাম। টেবিল, টেবিলের তলা, বালিশের তলা, জানলার ওপর, বইয়ের ভাঁজ—কোথাও খুঁজে পেলাম না। ওটা কি তবে পালালো? হরদম দেশলাই কেন যে হারিয়ে যায়, তার মানে বোঝা কঠিন। একটু আগেই মুখের ভাপ দিয়ে তাকে তাতালাম—স্পষ্ট মনে পড়ছে। ওকে একদম গ্রাহ্যই করিনে, এটা তারই প্রমাণ। দিনের মধ্যে দশবার ওটা হারিয়ে যাবেই। নিজেরই ওপর রাগ হচ্ছিলো ভয়ানক। সারা ঘর তছনছ করতে লাগলাম—এর মধ্যে একবারও ওটা বেজে উঠলো না। জরুরী দরকার এখন ওকে। ওর কথা ভাবতে ভাবতেই তো একটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হয়েছে, এখন ওর এভাবে গা-ঢাকা দেবার দরকার কী ছিল। এমন রসিকতার কোনো মানে হয় না।

টেবিল-ঢাকার কোণ উলটে ছিল। আমাদের ক্ষুদে দুর্গতিকে পাওয়া গেল তার নীচে। উত্তেজিত হয়ে সিগারেটটা টেবিলের ওপর ঠুকতে লাগলাম। তারপর দেশলাই হাতে নিয়ে রাগে একটা ঝাঁকি দিলাম তাকে। বাজলো না। খুলে দেখি, কাঠি নেই একটাও। খোলসটা ফেলে রেখে সব সরে পড়েছে। এক টোকা দিয়ে ওকে ঘরের বার করে দিলাম।

পশ্চিম বঙ্গের সচিবরা যাহাই কেন বলুন না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, লোকমতের প্রভাবে ও শ্রী শ্রীপ্রকাশ শিয়ালদহ স্টেশনে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যাইবার পরে কেন্দ্রী সরকার পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীদিগের সম্বন্ধে ভারত রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে অধিক সচেতন হইয়াছেন। নাগপুরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছেন (৪ঠা নভেম্বর)—ভারত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পাকিস্থানকে অকুণ্ঠভাবে বলিতে হইবে, যদি আলোচনার দ্বারা পূর্ব পাকিস্থান হইতে হিন্দুদিগের পশ্চিম বঙ্গে আগমন সমস্যার সমাধান না হয়, তবে তাহাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের কারণ থাকিবে। ভারত রাষ্ট্র সর্ববিধ অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছে। পাকিস্থান যদি হিন্দুদিগকে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে তাহাদিগের পুনর্বসতির জন্য ভারত রাষ্ট্রকে অধিক ভূমি দিতেই হইবে।

সর্দার বল্লভভাই যে হায়দরাবাদ আক্রমণ করিয়া জয়ী হওয়ায় এক সম্প্রদায়ের বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার এই স্পষ্ট উক্তি তাঁহাদিগের ভাল লাগে নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, সর্দারজী অসময়ে অসঙ্গত কথা বলিয়া থাকেন—ইত্যাদি।

কিন্তু সর্দারজীর উক্তি যে অত্যন্ত সঙ্গত তাহা বলা বাহুল্য। আমরা বহুবার বলিয়াছি—যদি পূর্ব পাকিস্থানে মুসলমানদিগের দুর্ব্যবহারে হিন্দুর বাস করা অসম্ভব হয় এবং পশ্চিম বঙ্গেও ভূমির অভাব ঘটে, তবে শেষে অধিবাসী বিনিময় ব্যতীত আর কোন উপায় থাকিতে পারে না। র‍্যাডক্লিফের নির্ধারণ যে পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা অবশ্যস্বীকার্য। পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর পশ্চিমবঙ্গে আগমনে সেই অসঙ্গতি আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সচিবও স্বীকার করিয়াছেন, হিন্দুদিগের পক্ষে পূর্ববঙ্গে বাস অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আর পশ্চিম বঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি স্বয়ং পূর্ববঙ্গের লোক—তথায় হিন্দুদিগের প্রতি অনাচারের ও অত্যাচারের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন।

সর্দারজী পাকিস্থানকে বলিয়াছেন—হিন্দুদিগের পাকিস্থান ত্যাগই যদি পাকিস্থান সরকারের অভিপ্রেত হয়, তবে আমাদিগকে গৃহত্যাগীদিগের বসবাসের ও চাষের জন্য আবশ্যক ভূমি দিতে হইবে। কিন্তু পাকিস্থান তাহাতে সম্মত হইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিভাগের পরে একবার জনরব রটিয়াছিল—যশোহর ও খুলনা জিলা দুইটি পশ্চিম বঙ্গকে অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রকে দিবার কথা হইতেছে। কিন্তু কার্যকালে তাহা হয় নাই এবং যশোহর ও খুলনার সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর ব্যাপারে ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পৈত্রিক গৃহের প্রাঙ্গণে গোহত্যা হইতেই বুঝা গিয়াছে। সেই জিলা দুইটিতে হিন্দুর বাস অসম্ভব করাই পাকিস্থানের অভিপ্রেত।

ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যদি সমস্যায় অভিভূত না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গেও বাসের ও চাষের ব্যবস্থা বর্ধিত করিবার আয়োজন করিতেন, তবে আমরা তাঁহার চেষ্টার আন্তরিকতায় প্রীত হইতাম। আমরা জানি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গে যে জমি "পতিত" আছে, তাহা অব্যবহার্য রাখিয়া কেন্দ্রী সরকারকে বাস্তুত্যাগীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে বলা হইতেছে কেন? এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, "পতিত" জমির "উঠিত" না হওয়ার দায়িত্ব পশ্চিম বঙ্গ সরকারের যে নাই এমন নহে। কারণ, আইনের ত্রুটিতে অনেক জমি অর্থগৃধ্নু ধনীর হস্তগত হইয়াছে ও হইতেছে। গত ৯ই নবেম্বর 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রে প্রকাশিত একখানি পত্রে ইহার উল্লেখ আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, কৃষির জমি ব্যতীত অন্য জমি সম্বন্ধীয় আইনে বহু প্রজার স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজস্ব অনাদায়ী নিলামে বিক্রীত জমি হইতে প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার যে সুযোগ ক্রেতার আছে, তাহা সমানই রহিয়া গিয়াছে। এই আইন বার বৎসরের পুরাতন এবং নূতন অবস্থার সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। ইহার মর্ম এই যে, প্রজার স্বত্ব যদি বাঙলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে থাকা প্রমাণিত না হয়, তবে প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইবে। সে প্রমাণ উপস্থাপিত করা প্রজার পক্ষে কত দুষ্কর, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সুযোগ লইয়া বহু ফাটকাবাজ রাজস্ব অনাদায়ের নিলামে জমি কিনিয়া প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে তৎপর। সচিবদিগের মধ্যে কেহ কেহও হয়ত সেই কাজ করিতেছেন। বিধানবাবু আপাতত ২৪ পরগণার উচ্ছেদের নালিশ-তালিকা বিশ্লেষণ করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। যে স্থলে ধনী প্রভাবশালী তথায় প্রমাণ লোপও সম্ভব হইতে পারে। আর্থার ইয়ং ফ্রান্সের নানা স্থানে কৃষির অবনত অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে স্থানে জমিতে প্রজার স্বত্ব থাকে, তথায় সে কৃষি কার্যে বিশেষ শ্রম করে—
—"property in land is, of all others, the most active instigator to severe and incessant labour."

সামান্য চেষ্টা করিলেই জানিতে পারা যাইবে, আজকাল স্থানে স্থানে প্রজাকে কেবল ৯ মাসের কবুলতীতে জমি বিলি করা হইতেছে—পাছে জমিতে তাহার স্বত্ব হয়। ইহাতে যে কৃষির উন্নতি অসম্ভব তাহা বলা-বাহুল্য। যে সকল জমিদার এইরূপ কাজ করেন, তাঁহাদিগকে দণ্ডার্হ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবারও কৃষককে সারের জন্য আবশ্যক খৈল বা "এমন ফস" দিতে পারিতেছেন না। যে "এমন" দেওয়া হইতেছে, তাহা মহীশূর হইতে আমদানী করা হইয়াছে এবং তাহার বিশ্লেষণ সরকারও জানেন না। আমরা বার বার পশ্চিম বঙ্গে বহুলোৎপাদিকা কৃষি প্রবর্তনের এবং সেচের জন্য পাম্প ব্যবহারের সুবিধা করার কথা বলিয়াছি। কিন্তু সে সকল ত পরের কথা—কৃষি বিভাগ আবশ্যক উৎকৃষ্ট বীজ ও সার দিতে পারিতেছেন না।

একদিকে ধনীর প্রজাকে পিষ্ট করিয়া অর্থলাভের হীন চেষ্টা আর একদিকে কৃষি বিভাগের এই অবস্থা যে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের পথ বিঘ্নবহুল করিতেছে, তাহাও যদি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, তবে সর্বনাশ ঘটিবেই। পূর্ববর্তী ব্যবস্থা পরিষদে দুইজন সদস্য বাকি খাজনায় জমি বিক্রয়ের নিয়ম পরিবর্তিত করিবার জন্য আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার কিছু হয় নাই। যদি সত্য সত্যই রক্ষকও ভক্ষক হইয়া দাঁড়ান, তবে এ বিষয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। পশ্চিমবঙ্গের সচিবসঙ্ঘে জমিদারের অভাব নাই। তাঁহারা যদি স্বার্থত্যাগ করিতে না পারেন, তবে যে তাঁহারা সচিব থাকিবার উপযুক্ত নহেন—ইহাও কি কংগ্রেসের পরিচালকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে? আজ আমরা এই শ্রেণীর জমিদার ও ধনীদিগের নাম প্রকাশে বিরত রহিলাম। কিন্তু তাঁহাদিগের নামের তালিকা আলিপুরে কালেক্টরী হইতে অতি সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে বক্তৃতার আলোচনা আমরা করিয়াছি, তাহাতে বাঙলা সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। তিনি বলিয়াছেন,—বাঙলায় যাও—দেখিবে কেবলই বিহারী বনাম বাঙালী ও বাঙালী বনাম

আসামী বিতর্ক চলিতেছে। শিখ ট্যাক্সি চালককে সহ্য করা হয় না—তাহার স্থানে বাঙালী নিয়োগের চেষ্টা চলিতেছে। এই সকল বিপদের কুফলের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

আমরা সর্দারজীর সহিত এ বিষয়ে একমত হইলেও বলিতে বাধ্য—তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পাঠকগণ মনে করিতে পারেন, বাঙালীই বিহারী, আসামী, শিখ সহ্য করিতে পারে না—সে-ই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে প্রভাবিত। পশ্চিমবঙ্গ বিহারী বা আসামী বা শিখ বিতাড়নের কথা কল্পনাও করে নাই এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেই পশ্চিমবঙ্গে বিহারী, শিখ, পশ্চিমা, মারবাড়ী প্রভৃতির সংখ্যা জানিতে পারিবেন। বাঙালীর কল-কারখানায় যেমন গৃহেও তেমনই বিহারী ও উড়িয়া ভৃত্যের অভাব নাই। কিন্তু বিহার সরকার তথায় বাঙালীদিগের প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার নির্লজ্জ ভাবে করিয়া আসিতেছেন, বিহার সরকার কি গোপন আদেশ জারি করিয়াছেন—এ সকল সর্দারজীর অবিদিত থাকিবার কথা নহে। উড়িষ্যায় যে বাঙালী বনাম উড়িয়া মামলায় সরকারী কর্মচারীরাও সাক্ষ্য দিতে আসিতে অসম্মত হন, তাহার উল্লেখ আমরা করিয়াছি এবং সে বিষয় উড়িষ্যার গভর্নরকে জানানও হইয়াছিল। ২৭শে জুলাই সেই পত্র লিখিত হয় ২রা আগস্ট উত্তর লিখিত হয়—পত্র উড়িষ্যা সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে পাঠান হইয়াছে। ২৮শে আগস্ট তাঁহাকে স্মারকলিপি প্রদানের পরে ১৭ই সেপ্টেম্বর পত্র পাওয়া যায়—

"It has been impressed on local officers that these cases should be disposed of with the greatest possible expedition."

তাহার পরেও উড়িষ্যায় বাঙালী ফুটবল খেলোয়াড়দিগের প্রতি একটি উড়িয়া ক্লাবের ব্যবহারের বিবরণ 'দেশে' প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কুব্যবহারের যিনি নায়ক ছিলেন, তিনি একজন উড়িয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তিনি যে গৃহে বাঙালী খেলোয়াড়রা অতিথি ছিলেন, তথায় মহিলাদিগের উপস্থিতিতেই অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন, বলাও হইয়াছিল। একবার উড়িষ্যায় পুরীর সমুদ্রোপকূলে বাঙালী মহিলাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতায় কয়জন উড়িয়া আক্রান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরে কলিকাতায় উড়িয়া বর্জনের কোন চেষ্টা হয় নাই। বাঙলায় আসামীরা কোথাও প্রহৃত বা বিহারীরা আক্রান্ত হয় নাই। শিখ বর্জনের যে সংবাদ সর্দারজী পাইয়াছেন, তাহার ভিত্তি কোথায়? অথচ পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর আগমনে পশ্চিমবঙ্গে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে যদি পশ্চিমবঙ্গে—স্থানাভাব ও অন্নাভাবহেতু—কাজে বাঙালীদিগকে প্রথমে নিয়োগ করা হয়, তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে অসংগত হইবে কিনা, তাহা বিবেচ্য। বাঙালী প্রাদেশিকতা যথাসম্ভব বর্জনই করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ যে বাঙালীর সম্বন্ধে সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছে বা করিতেছে, তাহা বলা যায় না। আমরা আশা করি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিহার, উড়িষ্যা, আসাম—এই সকল প্রদেশকে সে বিষয়ে সদুপদেশ দিতে কুণ্ঠানুভব করিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনে একজন সিভিল সার্ভিসের চাকরীয়াকে সর্বাধ্যক্ষ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া ঐ চাকরী হইতে আর একজনকে (মিস্টার এ ডি খাঁন) কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্পোরেশনকে তাঁহাদিগের কবলমুক্ত করিয়াছিলেন, কর্পোরেশন আবার তাঁহাদিগের দ্বারাই কবলিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা—

"of differentiating the spheres of action appropriate for Government and for local bodies respectively".

পশ্চিমবঙ্গ সরকারে যদি সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়ার সংখ্যা অতিরিক্ত অধিক হইয়া থাকে, তবে সে সংখ্যা হ্রাস করাই প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরা আমাদিগের মত বহুবার ব্যক্ত করিয়াছি। আমরা এ চাকরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সকলের সম্বন্ধে কোনরূপ অনুযোগ উপস্থাপিত করিতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, তাঁহারা বৃটিশ আমলাতন্ত্রের শিক্ষায় শিক্ষিত। দেশের লোকের জন্মগত অধিকার লাভের আগ্রহ 'অপরাধ' বলিয়া বিবেচনা করিতেও তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের স্বভাব যাহাই কেন হউক না, অভ্যাসও অল্প প্রবল হইতে পারে না। তাঁহারা যে শাসন কর্তৃত্ব ইংরেজের হস্ত হইতে বাঙালীর হস্তে আসিবার সংগে সংগে তাঁহাদিগের অভ্যাস পরিবর্তিত করিবেন, এমন মনে করাও সংগত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"ডিপুটি পোস্ট মাস্টার বাবু পান পনের টাকা, পিয়ন পায় সাত টাকা। সুতরাং পিয়ন মনে করে, সাত আনায় আর পনের আনায় যে তফাৎ, বাবুর সংগে আমার তাহার অধিক তফাৎ নহে।" বড়লাটের প্রসংগে ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, তাঁহার বেতনাদি অধিক বটে, কিন্তু তাহার কারণ—তিনি বড়লাট, তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয়। সেই হিসাবে যদি এই সকল চাকরীয়া সচিবদিগের মত বেতনের সহিত তাঁহাদিগের বেতন তুলনা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তাহাও অসংগত না হইতে পারে। শেষ কথা—তাঁহারা সরকারের চাকরীয়া, কলিকাতা কর্পোরেশন সরকারের অধীনরূপে কল্পিত নহে।

সিভিলিয়ানী শাসনে কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্যে কি পরিবর্তন বা উন্নতি হইয়াছে? রাস্তার অবস্থা যেমন শোচনীয়, অপরিষ্কৃত জল সরবরাহও তেমনই। রাস্তায় আবর্জনা পূর্ববৎ থাকে। শহরের মধ্যে গবাদির খাটাল তেমনই রহিয়াছে। বে-আইনী ভাবে নির্মিত একখানি গৃহও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই। কর্পোরেশনের বাজারগুলির আয় বৃদ্ধির কোন সুচিন্তিত ব্যবস্থা হয় নাই। আবার শহরে প্রবল জনরব—গত ৬ই সেপ্টেম্বর ও ৫ই অক্টোবরের মধ্যে কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হইতে ৩ দফায় দেড় হাজার টাকার পেনিসিলিন কিনিয়া লইয়াছেন এবং তাহার জমা বা খরচ কর্পোরেশনের হিসাবের খাতায় পাওয়া যাইতেছে না। তাহা যে ভারত-রাষ্ট্রে চোরা-বাজারে গিয়াছে বা পাকিস্থানে চালান হইয়াছে—এমন কথা আমরা বলিতেছি না বটে, কিন্তু যখন কথাটা রটিয়াছে, তখন সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কি কলিকাতার করদাতারা দাবী করিতে পারেন না? সিভিলিয়ানী আমলের পূর্বে তাঁহারা সে দাবী করিতে পারিতেন—বিদেশী সরকারের সময়েও পারিতেন। দুষ্ট লোক বলে, কলিকাতায় 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' সময় সহসা যে 'পাকিস্তান এম্বুলেন্স কোরের' আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাকে কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী পিপা পিপা ব্লিচিং পাউডার ও ফিনাইল দিয়াছিলেন—তাহার হিসাবও নাকি পাওয়া যায় না এবং তাহা নোয়াখালী ও ত্রিপুরার প্রভৃতির জন্য গিয়াছিল কিনা, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। সেই বিষয় স্মরণ করিয়া আমরা পেনিসিলিন রহস্য ভেদ করিবার কথা বলিতেছি। ব্যয় প্রয়োজন—কিন্তু অপব্যয় করিবার অবস্থা পশ্চিমবঙ্গেরও নাই, কলিকাতা কর্পোরেশনেরও নাই।

ব্যয় ও অপব্যয় উভয়ের মধ্যে যে সীমা আছে, তাহা নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যানবাহন বিভাগেও লঙ্ঘন করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থেরও প্রাচুর্য নাই; যানবাহন বিভাগের গুরুত্বও অধিক নহে। সে অবস্থায় সেই বিভাগের কর্মচারী-নিয়োগে যে অমিতব্যয়িতার কথা শুনা যাইতেছে, যে সরকার পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্য বন্ধ করিবেন বলিয়া বার বার ঘোষণা করিয়া কেবল লোকমতের প্রতিবাদে তাহা করিতে পারিতেছেন না, সে সরকারের পক্ষে এইরূপ ব্যয়-বাহুল্য করা কি নিদারুণ ও নির্মম অপব্যয় ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে চাকরীয়াদিগের বাবদে অমিতব্যয়িতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা দেখা গিয়াছে। যে স্থানে অবিভক্ত বাঙলার কাজ একজন সেক্রেটারী করিতে পারিতেন, সে স্থানে যে ২ জন সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন, সে কি কেবল পদের তুলনায় সিভিলিয়ান চাকরীয়ার সংখ্যা অধিক বলিয়া?

একদিকে এই অবস্থা, আর একদিকে পূর্ববঙ্গাগত সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "শিরে সংক্রান্তি"। সেদিন সর্দার প্যাটেল যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব পাকিস্থানের প্রধান সচিব হিন্দুদিগকে শাসাইয়াছেন, প্রেরণার জন্য প্রদেশের সীমার বাহিরে চাহিবার অভ্যাস ত্যাগ কর—সাবধান! কারণ যাহারা যে রাষ্ট্রে বাস করে, তাহারা রাষ্ট্রের বাহির হইতে প্রেরণা পাইবার চেষ্টা করিলে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হয়। সরকার তাহাদিগের সম্বন্ধে সতর্ক হইবেন। হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তানে বাস করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা যেন স্বপ্নেও পূর্ববঙ্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মিলনের কথা মনে না করেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যেন ভারত রাষ্ট্রের হিন্দু নেতাদিগকে তাঁহাদিগের নেতা বলিয়া মনে না করেন। আবার—লর্ড মিন্টো যেমন "স্বদেশীকে" সাধু ও অসাধু দুই পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তিনি তেমনই পাকিস্তানে হিন্দুদিগকে পাকিস্তানানুরক্ত, সুতরাং "সাধু" হইতে সদুপদেশ দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিব সে সকল ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল যদি ভিত্তিহীন হইত, তাহা হইলে কি পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতেন? কলিকাতায় তাঁহারা কিরূপ দুর্দশা ভোগ করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। 'স্টেটস্ম্যান' পাকিস্থানবিরোধী নহেন। সেই পত্রের বর্ণনা—শিয়ালদহে আশ্রয়প্রার্থীদিগের মধ্যে কলেরা দেখা দিয়াছে; মাত্র ৪ বর্গফিট স্থানে এক একটি পরিবার পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা থাকিতে বাধ্য হইতেছে—লজ্জারও অবসর নাই।

শ্রীশ্রীপ্রকাশ শিয়ালদহ স্টেশনে স্বেচ্ছা-সেবকদিগের কার্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সেই সকল তরুণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আবশ্যক উপকরণ দিয়া উৎসাহিত করাও যে হইতেছে না, তাহা পরিতাপের বিষয়। সে বিষয়ে সরকারের ও বেসরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সরকারের সক্রিয় আগ্রহ ব্যতীত যে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এ বিষয়ে কেন্দ্রী সরকারের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বও অল্প নহে। উভয় সরকারের পক্ষেই বাস্তুত্যাগীদিগের দুর্দশা কলঙ্কের বিষয়। ভারত রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই সকল বাস্তুত্যাগীকে বসবাস করাইবার যে কথা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কার্যে পরিণত করিতে কি অকারণ বিলম্ব হইতেছে না? যতদিন বিলম্ব হইবে, ততদিনে যে বহু লোকের মৃত্যু হইবে, অনেক লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু তাহারা জীবিত থাকিলেও জীবন্মৃত হইবে, বহুলোকের দুর্ভোগ হইবে, তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। উড়িষ্যায় কতক বাস্তুত্যাগীর বসবাসের ব্যবস্থা করিতে নাকি উড়িষ্যা সরকার সম্মত হইয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে উড়িষ্যার কোন অংশে পশ্চিম-বঙ্গ হইতে কতদূরে—কিভাবে গ্রাম বা নগর রচনা করা হইবে, তাহাও স্থির করিয়া ফেলা প্রয়োজন।

হাত দেখা আমার ব্যবসাও নয়, বিলাসও নয়।

তবু একবার গণৎকার হতে হয়েছিল। ইচ্ছা করে যে তা ঠিক নয়। উপরোধে লোকে ঢেঁকি পর্যন্ত গেলে আর একটুখানি হাত ধরতে পারবো না? তবে চুরি বিদ্যার মতই আমার সে বিদ্যা ধরবার আগেই যে অক্ষুণ্ণ সম্মানে সরে পড়তে পেরেছিলাম এই যা রক্ষা। যখন প্রায় ধরা পড়ে এসেছি তখন আমি ধরা পড়ার বদলে ধরা পড়ে গেল এক যাযাবর জীবনের অলিখিত ইতিহাস। হস্তলিপি নাকি বিধিলিপিকে রেখার অক্ষরে ধারণ করে রাখে। সত্য মিথ্যা এখনো জানি না। তবে যদি বিধিকে পেতাম তাকে দিয়ে বুড়ির হাতের লেখাগুলি বদলিয়ে নিবার একটা চেষ্টা নিশ্চয়ই করতাম।

সেই বুড়ির রুধিরাক্ত হৃদয়ে সত্য অথচ গোপন একটি কাহিনীই আমায় লিখতে হচ্ছে নিজের হাতে—যে হাতে খেলার ছলে তার হাতের তালু পরীক্ষা করে শুক্রের ক্ষেত্র, চন্দ্রের ক্ষেত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে কত মিথ্যাই না রচনা করেছিলাম। হায় মিথ্যার বেসাতি করতে করতে কেন হৃদয়ের সত্যকে ঘাটাতে গেলাম?

আমি তখন হেব্রিডিস দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট দ্বীপে। আপনারা কেউ সেখানে যান নি নিশ্চয়ই। কোন ভারতীয় সেখানে যায় না। কিন্তু আমার ভবঘুরে ভাগ্য বা নেশা সেখানেই আমায় নিয়ে যায় যেখানে চেনা কোন লোক যায় না। পরিচিত লোকের অনুগ্রহ মেশানো হাসির চেয়ে অপরিচিত বালকদের করতালি, পরিচয়ের কলকাকলীর চেয়ে অপরিচয়ের কৌতূহল আমার ঔৎসুক্য বেশী জাগায়।

কিন্তু ভবঘুরেমি করলেও ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়া যে এড়ানো যায় না সেটা এখন আমি বুঝতে পেরেছি।

দেশে থাকতে ওয়ার্ডস্বার্থের একটা ইংরেজী কবিতা পড়েছিলাম—হাইল্যান্ডসে একটি বালিকা একাকিনী ধান কাটতে কাটতে এমন একটা গান গাইছিল যাতে কবির মনে পড়ে গেল হেব্রিডিস দ্বীপপুঞ্জের কথা, তার অকথিত বাণী, অগীত গান ও অনন্দভবনীয় রিক্ততার কথা। হাইল্যান্ডসের নির্জন অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অতলান্ত মহাসাগরের কল্লোল ছাপিয়ে সেই অশ্রুত গানের আহ্বান সহসা আমারও কানে এসে পেঁছোল। একটা বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পরিচিত পৃথিবী ত্যাগ করে সাগরে পাড়ি দিলাম ওই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সব চেয়ে নির্জন ও ভীষণ স্কাই দ্বীপে বেড়িয়ে আসবার জন্য।

মেঘ ও কুয়াসার ভিতর দিয়ে পথ হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে বন্দরে পেঁছিয়ে মনে হল যে আরব্য উপন্যাসের কোন এক রহস্যময়ী যাদুকরী মায়াকাঠির স্পর্শে একটি সুন্দর নির্জন উপবন তৈরী করে বাঁশীর ডাকে বিদেশীকে টেনে এনে. সব অধিবাসীকে নিয়ে, বোধ হয়, আত্মগোপন করেছে।

ভবঘুরে জীবনই বটে। সারাদিনে কুড়ি মাইলের উপর হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যে কুটিরটিতে আশ্রয় নিলাম তাতে তিনটি মাত্র ঘর। পায়ে হেঁটে পাহাড় টপকিয়ে বেড়িয়ে যারা দেশ

দেখতে চায় যাযাবর সমিতির সভ্য হয়ে কেবল তাদেরই এখানে স্থান। একটা ঘরে পুরুষরা ও অন্য একটা ঘরে মেয়েরা ঘাসের গাদার বিছানায় কম্বল পেতে ঘুমিয়ে রাত কাটাবে। ভোর বেলা বিছানা ও কম্বল ঝেড়ে ঝুরে রেখে খেয়ে বেরিয়ে যেতে হবে যাযাবরী বৃত্তিতে। হিন্দু-শাস্ত্র বোধ হয় ওরা কোন কোন ব্যাপারে মানে। না হলে এইসব জায়গায় ত্রিরাত্রি একসঙ্গে বাস নিষিদ্ধ হবে কেন? বাকী ঘরটাতে রান্না-ঘর ও বৈঠকখানা দুয়েরই কাজ মহাসমারোহে চলতে থাকে।

খাওয়ার পালা অবশ্যই সংক্ষিপ্ত; বৈঠকটাই আসল কাজ। আমি এখন সেই বৈঠক জাঁকিয়ে বসেছি।

খাওয়ার পালা সবারই সারা হয়ে গিয়েছে। আর কিই বা খাওয়া? গোটা তিন আলু সিদ্ধ, একটা ডিম সিদ্ধ পিঠে ঝোলান ঝুলিতে সযত্নে রাখা একটা মাখনের টিন থেকে খানিকটা মাখন নিয়ে নুন মাখিয়ে খেয়ে নেওয়া। সারা দিন জঙ্গল পাহাড়ে ঘুরে অবশ্য ঠিক একাহারী থাকা যায় না; তবে একাদশীর কাছাকাছি প্রায় পৌঁছিয়ে গিয়েছি। তবু ভালই লাগে। বছরে বারো মাস ত কাঁটা চামচে সুরুয়া থেকে শুরু করে পুডিং পর্যন্ত চালাই। মাস দুই না হয় একটু আদিম জীবনই যাপন করলাম। অভাব ত অনুভব করছি না কিছুরই।

কেবল একটা জিনিস বাদে। এক ছিলিম তামাক একটা হুঁকোর মাথায় বসিয়ে চোখ বুজে পা ছড়িয়ে আরামে টানতে পারা যায় না একটু? অথবা গড়গড়া? অবশ্য আমার চার-দিকেই মাটিতে খড়ের গাদায় বসে আছে 'ইয়ুথ হোস্টেল' সমিতির যাযাবর তরুণ তরুণীরা। তারাও এই সুদুর্গম দেশ দেখতে বেরিয়েছে; কিন্তু সেখানে যে ভারতীয় কাউকে দেখবে তা বোধ হয় তারা ভাবতেও পারে নি। কেই বা পারবে? আজ যখন গ্রামের ভিতর দিয়ে হাঁটছিলাম স্কুলটা ত ভেঙেগই গেল আমায় দেখে—সব ছেলের দল ক্লাস ফেলে পিছু নিল আমার, মাস্টাররাও তাদের যেন ডেকে ফেরাতেই আসছে এমন ভাবেই আমার পিছু নিল। শেষপর্যন্ত তাদের সঙ্গে গল্প করতে হল খানিকক্ষণ। চা খাইয়ে তবে তারা ছাড়ল আমায়। আমি ওদের দেশ দেখতে এসেছিলাম আর ওরা কিনা আমাকেই না দেখে ছাড়ছে না।

কিন্তু তামাক খাওয়ার না কেউ এক ছিলিম এখন? ভাবতে ভাবতে গোটা তিনেক সিগারেটের কাগজ থুথু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে মোটা একটা সিগারেট বানিয়ে দুই আঙুলের মধ্যে রেখে এমনভাবে মুঠি করলাম যাতে হুঁকোর খোলটা সাপটিয়ে ধরে তামাক খাবার মত দেখায়। হুঁকো টানছি মনে করতে করতে সত্যই হুঁকোর আস্বাদ যেন পেতে লাগলাম আর আরামে মাথাটা ডাইনে থেকে বাঁয়ে ও বাঁ থেকে ডাইনে দুলতে লাগল।

না, ভাববেন না, আমার মাথায় টিকি ছিল না যে ঘড়ির পেন্ডুলামের মত দুলছে দেখে খাস বৃটিশ তরুণ তরুণীরা আমার চারদিকে ঘিরে এসে বসে আমার তুরীয়ানন্দে বিভোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। যে ধূম্রলোকে মনে মনে উঠে গিয়েছিলাম তা থেকে একটু নেমে এসেই চোখ খুলে দেখি গুটি দশ বার তরুণ তরুণী বিশেষ কৌতূহল ও মনোযোগ দিয়ে আমায় দেখছে। চোখ মেলে আমায় হঠাৎ চাইতে দেখে তারা একটু বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে পড়ল।

ছেলেবেলা থেকে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে যাত্রা পার্টির অভিনয় দেখে এসেছি; যেমন করে এমন অবস্থায় চোখ ধীরে ধীরে মেললে, চোখের একটা ভুরু একটুখানি ওঠালে দর্শকরা 'হে গুরু, তোমায় প্রণাম করি,' এমন একটা ভাবে অভিভূত হবে তা জানা আছে। ঠিক তেমনি একটা ভঙ্গী করলাম আর ডান হাতটা বরাভয় দেবার জন্যই যেন একটু হালকা ভাবে সামনে এগিয়ে দিলাম। তারপর কতখানি এফেক্ট হল তা বুঝবার জন্য আর একটা ভুরু একটু উপরের দিকে টেনে তুলে আমার দুটি চোখেই একটা প্রশান্ত ভাব ফুটিয়ে তুললাম। মনে মনে টের পেলাম খুব দারুণ একটি অভিনয় হল; এখনি সবাই ভক্তিভরে জয় বাবা ভোলানাথ বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বসবে।

তার পরিবর্তে একান্ত ভয় বা শ্রদ্ধাহীন-ভাবে মুচকি হেসে একটি মেয়ে তার হাতখানি এগিয়ে দিয়ে বলল 'ক্ষমা করুন, যদি কিছু মনে না করেন, একবার আমার হাতটা দেখে দিন না।'

একটু নির্দোষ 'পোজ' করতে চেয়েছিলাম মাত্র, কিন্তু গণৎকার সাজবার কোন মতলব বা বিদ্যা আমার ছিল না; এখনো নেই। গোটা-কয়েক চটি বই হাতদেখা সম্বন্ধে যা সবাই পড়ে থাকে শুধু তাই সম্বল। এবং তাও শুধু লোকসমাজে কথাবার্তা চালাবার জন্য, ভবিষ্যৎ দেখবার জন্য নয়। কাজেই সবিনয়ে মাপ চাইলাম।

আবার অনুরুদ্ধ হয়ে বললাম—বিশ্বাস করুন, আমি হাত দেখতে কিছুই জানি না।

তরুণী অভিমানে গাল ফুলিয়ে বলল, —না জানেন না। আমরা বুঝি আর জানি না যে, ইণ্ডিয়ানরা দৈব বিদ্যায় ওস্তাদ। হাত দেখতে আর সাপ খেলতে প্রত্যেক ইণ্ডিয়ানই জানে।

রাগের সঙ্গে হাসি মিশ খেয়ে গেল। বললাম, সেটা আপনাদের কল্পনা। আমাদের দেশে সাপুড়ে ও গণৎকার দুই-ই আছে বটে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, আর আমি ও দুটোর মধ্যে কোন দলেরই নই। আমি আপনাদেরই মত সাধারণ ভদ্রলোক; পকেটের পয়সা খরচ করে দেশে দেশে বেড়াই। তবে আমেরিকান টুরিস্ট নই আর এইরকম অজানা জায়গাতে বেড়াতেই বেশী ভালবাসি—এই, এই আপনাদেরই মত।

আমার নিবেদন মঞ্জুর হল না। সবাই তরুণীর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমায় ঠেসে ধরল, বলল যে আমি নিশ্চয়ই হাত দেখতে জানি। একটি নীলনয়না কনককেশিনী বিস্কুটি খড়ের 'কিল্ট' অর্থাৎ গামছাপরনী তরুণী ঠোঁট উল্টিয়ে আহ্বানের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা এনে ডেকে বসলেন—'জর্জ'। ওদেশে ওরা অপরিচিত ভারতীয়ের সঙ্গে সৌহার্দ দেখাতে হলে জর্জ বলে ডাকে।

কুমারী বিস্কুটি ঠোঁট উল্টিয়ে কণ্ঠস্বরে ঘনিষ্ঠতা এনে বললেন,—জর্জ এত গোঁয়ার হবেন না, বাইরে শোঁ শোঁ ঝড়ো বাতাস বইছে, পাশের হ্রদের ঢেউগুলির জলপরীরা এতক্ষণে নাচানাচি শুরু করেছে, আর রূপকথার জীব-জন্তুরাও সব ডাকাডাকি করছে। রাত নিশুতি হয়ে এল। ঘুমতে যাবার সময় হয়ে এল। দুয়েকটা ভাল খবর দিয়ে দিন না, জর্জ, ঘুমাতে যাবার আগে। একটু স্পোর্টসম্যান হোন্।

নাঃ, আমায় স্পোর্টসম্যান হতেই হবে। এত অনুরোধ, বিশেষ করে মিষ্ট অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। ওদের অবশ্য উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছি। মনের মত কয়েকটা ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সুখসুপ্তি ও সুখস্বপ্ন যদি কারো হয় হোক্ না। মিথ্যাকথনের যেটুকু পাপ হবে তা আমারি হোক্; ওরা ত একটু খুশী হবে।

ঘরেরই মধ্যে ঝুলবারান্দার মত একটুখানি জায়গা ছিল একটু উঁচুতে আর রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেখানে গিয়ে উঠে বসলাম খুব ভনিতা ও অঙ্গভঙ্গি করে। একটু চেঁচিয়েই 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' প্রভৃতি দুয়েকটা ভুলে যাওয়া সংস্কৃত শ্লোক চোখ বুজে আউড়ে নিলাম। তারপর একটুখানি চোখ বুজে থেকে ওঁ ওঁ হ্রীং ক্লীং প্রভৃতি উচ্চারণ করে মুখটা একটুখানি চেপে ধরে চোখ বুজে রইলাম।

তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুলে বললাম,—মেরী বলে যে মেয়েটি এই ভীড়ের মধ্যে আছ এগিয়ে এস।

প্রত্যেকের মুখে বিস্ময় ও প্রশংসাসূচক আওয়াজ হল। কি আশ্চর্য, সত্যিই ত জর্জ যে যাদুবিদ্যা জানে সে ত স্বতঃসিদ্ধ; না হলে মেরী বলে যে একটি মেয়ে আছে তা সে কি করে জানতে পারল? আর সে ঠিক আজই সন্ধ্যাবেলা এই হোস্টেলে এসেছে। কাজেই তার নাম ত কারো জানতে পারবার নয়।

মেরী ত এগিয়ে এল আনন্দ ও আশঙ্কায় দুরু দুরু বুকে। তার মুখের দিকে খুব

তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে বললাম,—প্রশ্ন কর, মোটে তিনটি প্রশ্ন।

মেরী নিজেকে খুব বুদ্ধিমতী মনে করে। সে বলল—আমি কি প্রশ্ন করতে চাই তাই বলুন প্রথমে।

একটু চোখ বুজে রইলাম, তার দেহের গঠনের দিকে ভালভাবে তাকালাম, তার স্বর ও উচ্চারণ মনে মনে যাচাই করে নিলাম; তার আঙ্গুলগুলিও দেখে নিলাম। তারপর তার হাত তুলে ধরেই বললাম,—আপনি ভাবছেন আপনি সুখী হবেন কিনা।

বেচারী মেরী। সে কিছু ভাবতে সময় পেল না; চট করে বলে বসল—ঠিক কথা। কিন্তু বলুন, যাকে নিয়ে আমি সুখী হব তার নাম কি?

উত্তরটা হয়ত মেরীর পক্ষে মর্মান্তিক হতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে ঘর্মাত্মক নিশ্চয়ই। আবার চোখবোজার স্মরণ নিতে হল, সে অবসরে তার হাতব্যাগটির দিকেও একবার ভাল করে উঁকি মেরে নিলাম, কিছুই নজরে পড়ল না। মরিয়া হয়ে বলে দিলাম—বব, জর্জ, জন এই তিনজনের মধ্যে একজন।

আনন্দে প্রায় আত্মহারা হয়ে গেল মেরী। বলল—ওঃ আপনি একেবারে যাদুকর; রবার্ট, এস, জনের নামডাক বহুলোকে জানে কিন্তু আমার মাও জানে না এখনো। আচ্ছা, আচ্ছা, শেষ প্রশ্নের উত্তর দিন—সে কি আমায় এখনো ভালবাসতে আরম্ভ করেনি?

রবার্ট, এস, জন—নামটা মনে মনে যাচাই করে নিলাম। চালিয়াৎ ছোকরা; না হলে আর এমনভাবে নামটা সাজিয়েছে? বলতে একটুও দ্বিধা হল না যে—তোমাকে 'করুনী' বলে সে এখনো একটু দ্বিধা করছে; কিন্তু তা কেটে যাবে বিশেষ করে যখন দেখবে তোমার শিক্ষিত হবার চেষ্টা সফল হয়ে আসছে।

হাত তালি দিয়ে নাচতে নাচতে নেমে গেল মেরী। খুশীর একটা উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হতে লাগল তার পায়ের আন্দোলনে। আমিও খুশী হয়ে উঠলাম তাকে খুশী করতে পেরেছি দেখে।

ভেবে দেখতে গেলে এমন শক্ত কাজ কিছু নয়। সেখানে যতজন পুরুষ ও নারী ছিল সবাই হাত দেখানে উৎসুক, কিন্তু বয়স প্রায় সকলেরই অল্প কাজেই প্রশ্নের পরিধিও অল্প। ঘুরে ফিরে মেয়েরা সেই একই প্রশ্ন করে—ভালবাসা পাব কিনা? সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য হবে কিনা? আর আশ্চর্যের বিষয় পুরুষদের চেয়ে বিদেশী মেয়েরাই বেশী জিজ্ঞাসা করে সুখী হবার কথা।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করল—আমি খুব সুখী হয়েছি। কিন্তু কি করে হলাম?

তার নরম সুন্দর হাতের তালু তুলে ধরেই বলে দিলাম—স্বর্গ থেকে স্বামী নামে একটি মানুষ তোমার ঘরে নেমে এসেছে—সে তোমায় খাটতেও দেয় না এবং নিজেই খেটে মরে এত ভাল স্বামী। ঘরকন্নার কাজও সে অনেক করে।

কি করে বললাম তাও ফাঁস করে দিচ্ছি এখানে কারণ সে মেয়েরা কেউ এ গল্পটা পড়বে না জানি। ওই রকম নরম হাতের তেলো ও আঙ্গুল শুধু তাদেরই হতে পারে যারা ঘরকন্নার কাজ বিলেতের মত দেশেও করে না। আর সে যে আমায় ঠকাবার জন্য তার বিয়ের আংটিটি খুলে রেখেছিল সে ত হাত ধরেই বুঝতে পেরেছিলাম।

ছেলেরা প্রশ্ন করল জীবিকার কথা। প্রায় সবাইকেই বললাম বিদেশে গেলেই বেশী উন্নতি হবে। ঔপনিবেশিক জাতের ছেলেদের সে কথা বলা খুবই সহজ। কেহ প্রশ্ন করল—তার প্রেমে কেহ পড়েছে কিনা। উত্তর খুবই সহজ—তুমি জান আর না জান তোমার প্রেমে একাধিক মেয়ে পড়েছে। নিশ্চয় করে জানতাম যে, উত্তরটা ঠিক না হলেও কোন আত্মাভিমানী যুবক এমন একটা আনন্দদায়ক কথা লোকসমক্ষে অস্বীকার করতে পারবে না।

মোট কথা এইভাবেই আমার হাত দেখার বিদ্যা ওই অন্ধকার রাতে বড় বিদ্যার মতই চালাচ্ছিলাম কিন্তু কে জানত যে, আমার যশঃসৌরভ এত দ্রুত বাইরে ছড়িয়ে পড়ে বাইরের লোককেই ডেকে আনবে। আমার হাতদেখার খেলা সাফল্যের সঙ্গে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই একটি অদ্ভুত দেখতে লোক ঘরের মধ্যে উদ্ধতভাবে ঢুকে এল। কে একজন ফিসফিস করে বলে উঠল—ও সেই রোমানিটা; ওর ক্যারাভ্যান আজই এ গ্রামে ঢুকেছে। জ্বালাবে দেখছি।

রোমানি (বেদে) দৃঢ় পাদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে এল। বেশ গাট্টাগোট্টা লোক; ইংরেজদের মত ফর্সা নয়; ইয়া পাকানো গোঁফ; উড়ন্ত প্রজাপতির ভঙ্গিতে ঠোঁটের উপর থেকে সামনে পাখা মেলে এগিয়ে আসছে, কানে ছেদা করে বসান আংটি আর মাথায় লক্কা পায়রা ধরণের ফেট্টি বাঁধা। গলায় টাইয়ের বদলে রেশমী রুমাল আর শার্টের উপর ভেলভেটের ওয়েস্টকোট। চিনতে একটুও ভুল হয়না যে, এ হচ্ছে একটি ইউরোপীয় জাত বেদে। নানা বিদ্যায় ওস্তাদ, আমাদের দেশের মূর্খ অসভ্য বেদে নয়।

একটু ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। বাঙালী জানে আর কত সইবে? রাত্রও প্রায় দশটা হয়ে এল। সবারই ঘুম পেয়েছে; আমার অবস্থা আরো খারাপ। কেবল দেশের নাম রাখবার জন্যই এই দুঃসাহসী রণে ভঙ্গ না দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি এখনো।

সে এসে বলল—স্যার, গ্রামে আপনার অলৌকিক বিদ্যা সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। সবাই বলছে যে, ফিঙ্গালের পর এমন জ্যোতিষী আর য়্যাটল্যান্টিক সাগরের এপারে কখনো আসেনি। আপনি যদি দয়া করে আমার হাতটা একবার দেখেন।

সহজে ভুলবার ছেলে আমি নই। হস্তরেখার বিদ্যায় বেদেরা ওস্তাদ হয় সাধারণত; যে সুনাম এতক্ষণ ধরে তৈরী করেছি ও বজায় রেখেছি তা আমি ধূলিসাৎ হতে দিবার পাত্র নই।

বললাম—মানুষের কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে। আমার চোখ আর মন দুই-ই ক্লান্ত; এবারকার মত ক্ষমা দাও।

মনে মনে অবশ্য জানি যে, কাল ভোরবেলা সামনের পাহাড়ে সূর্যের ও আমার উদয় একসঙ্গেই হবে। পাখী ডাকার আগেই পথ আমায় ডাক দেবে। কোথায় থাকবে এই বেদে আর আমার বিদ্যা পরীক্ষা।

সেও ছাড়বার পাত্র নয়। সে দৃঢ়স্বরে অথচ অনুনয় করে বলল—দয়া করে দেখুন একবার। মাত্র একটি প্রশ্ন। মাত্র একটি।

ঘুমভরা চোখে সবাই তার অনুনয়ে যোগ দিল। জর্জ, মাত্র একটি প্রশ্ন; ও বেচারা যখন এসেছে এতদূরে আর তোমার মত লোক কোথায় আছে; "বি এ স্পোর্ট।"

কি করি। অদৃষ্ট পাঠের খেলায় শেষ পর্যন্ত আমার অদৃষ্টে কি আছে কে জানে। অগত্যা খেলোয়াড় হতেই হল।

রোমানি ধীর গম্ভীর ও গর্জনময় স্বরে প্রশ্ন করল—আমার বিয়ে হল না কেন? বলে এমনভাবে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল যেন ঠিক উত্তর দিতে না পারলে সে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল ক্যাঁচ করে আমার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে নাড়ীভুঁড়ি সব ছিঁড়ে বের করে আনবে।

অগত্যা 'কিয়েরো'র ভুলে যাওয়া বইগুলির শরণ নিতে হল। তাও দেখি যে, ও বিদ্যায় কুলায় না। সবচেয়ে মুস্কিল হল যে, এই ভেবে এরা বোধ হয় ভাবতে আরম্ভ করেছে যে, বেদে আর ভারতীয়ের দুইয়েরই এ বিদ্যা আছে; অতএব জর্জকে নিশ্চয়ই রোমানি ঠকাতে পারবে না।

এতগুলি কৌতূহলী চোখের সামনে হাতের রেখা ঠিকমত পড়তে পারাও শক্ত। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি যে, চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে ভাগ্যের ক্ষেত্রে যাবার রেখাটা কেটে গেছে এবং তার উপর মঙ্গলের ক্ষেত্র থেকে একটা রেখা এসে সেটার সঙ্গে কাটাকাটি করেছে। কিন্তু কি থেকে কি ধরতে হবে তার ঠিক নেই।

হায় গুরুদেব কিয়েরো! জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে রোমানির হাতের রেখাগুলি ভাল করে ফুটিয়ে দাও যাতে ঠিকমত যা হোক কিছু একটা বলতে পারি।

হঠাৎ বলে উঠলাম—তোমার বিয়ে হলে রক্তপাত হত তাই হল না।

হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হল। সূক্ষ্ম স্নায়ুবিশিষ্ট বিলেতী মেয়েদের প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম হল—ওঃ মাই; ওঃ গুডনেস প্রভৃতি ভয়ভরা উক্তি ও উদ্বেগ তাঁদের ক্ষীণ অধরপ্রান্ত থেকে বের হয়ে আসতে লাগল আর দ্রুত নিঃশ্বাসে পীন বক্ষগুলি অনিশ্চিতভাবে দুলে উঠল। একটি ছিপছিপে চেকনাইমার্কা তরুণ বলে উঠল—মাই হ্যাট!

রোমানী কিন্তু আমার হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল; ঠোঁট চেপে সে নিজের উত্তেজনা সংবরণ করে বলল—তুমি কি করে জানলে, জর্জ?

বুঝলাম যে, একটা দারুণ ওস্তাদের মার মেরেছি। খুসী মনে প্রায় শীষ দিয়ে উঠলাম; কোন মতে সেটা থামিয়ে বললাম—তোমার মোটে একটি প্রশ্ন করবার কথা।

সবাই সায় দিল এবং শুভরাত্রির পালাও আরম্ভ হয়ে গেল। অনেকে তাড়াতাড়ি আমায় প্রচুর ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে শোবার ঘরে সরে পড়ল। মেরী যাবার সময় কানে ফিসফিস করে বলে গেল যে, শীঘ্রই আমায় তাদের যুগলের ছবি পাঠাবে এবং তাদের বিয়েতে যেন নিশ্চয়ই যোগ দিই।

রোমানি কিন্তু অত সহজে নিষ্কৃতি দিল না। সে বলল, জর্জ, দয়া কর; আমায় দশটা মিনিট দাও। তার চোখে দেখলাম অনন্ত বিষাদ ও করুণতার ছায়া; বিশাল বপু তার এত ভঙ্গুর ও অসহায় মনে হচ্ছে। বড় মায়া হল। এই ক্ষুদ্র জনতার মধ্যে এই একটি লোক যাকে ঠকাতে ইচ্ছা হয়নি; এই একটি লোক যার রুক্ষ বহিরাবরণের ভিতরে কোথায় একটা দুঃখী অন্তর আছে। তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে আমাদের দুজনেরই মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এল। হ্রদের জলে চাঁদের হাসি লুটোপুটি খেয়ে ঢেউয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গড়িয়ে যাচ্ছে। চারদিক নীরব। দিনের নির্জনতার সঙ্গে রাত্রির নীরবতা মিশে আকাশে জলে মাটিতে একটা মায়ার প্রলেপ দিয়েছে। আমরা দুজনে দুটো পাথরের উপর বসলাম।

সে বলল—জর্জ, তুমি ঠিকই বলেছ আমাদের বিয়ে হলে রক্তপাত হ'ত। কিন্তু কেন হ'ত তা তোমায় আর জিজ্ঞেস করতে চাই না।

ওই বিশাল ও রুক্ষ মানুষটার কণ্ঠস্বরে আর্দ্রতার আভাস। খুব মৃদুস্বরে বললাম—আমি শুনতে চাই না তোমার ব্যথার কাহিনী।

ব্যথার কাহিনী? কি করে জানলে যে তা ব্যথায় ভরা? তুমি ছেলেমানুষ, তুমি ব্যথার কি জান? অবসন্ন প্রশ্নহীন সুরে সে প্রশ্ন করল।

আঃ। আমি স্রোতের ফুলের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যেতে চাই; ব্যথার কিছু যদি না জানতে হয়, তারচেয়ে সুখের আর কি আছে?

স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল—তা ত হবে না; তুমিও একদিন দুঃখ পাবে। দুঃখ পেতেই আমাদের জন্ম। বিশেষ করে বিদেশে এসেছ—যদি কোন বিদেশিনীকে ভালবাস?

হেসে বললাম—আর যদি নিজের দেশের কাউকে ভালবাসি?

তবুও দুঃখ পাবে। ভালবাসলেই দুঃখ পাবে। কারণ স্বদেশিনীও ভালবাসার মায়া-কাঠির সঙ্গে বিদেশিনী হয়ে ওঠে; হাতের কাছের বা মুঠোর মধ্যের নারী সে আর থাকে না।

ভালবাসার অত কিছু বুঝি না আমি। প্রশ্ন করলাম—যাকে ভালবাসব, তাকে ত ভালবাসার মধ্যে দিয়েই কাছে পাব।

সে। না, তা পাবে না, ভালবাসা কাছের মানুষকে দূরের করে দেয়, অথবা বলতে পার যে, যাকে সুদূরে মনে কর তাকেই তুমি ভালবাস।

আ। তোমার কথাগুলি খুব 'সফিসটিকেটেড' দর্শনতত্ত্বের মত শোনাচ্ছে।

সে। তুমি বোধ হয় ভাবছ যে, একটা বেদে কি করে এসব কথা ভাবে। আমরা স্ত্রী-পুরুষে বিয়ের পর খুব বিশ্বস্ত দাম্পত্য জীবন যাপন করি; একসঙ্গে এক মন নিয়ে সংসারে চলি; আমার মাথায় এসব তথ্য আসার কথা নয়। কিন্তু জান, আমিও ইংরেজি বই পড়েছি অনেক; অবশ্য না পড়লেই ভাল হ'ত।

আ। কেন? তোমরা ত এমনিতেই খুব উত্তপ্ত-হৃদয় লোক বলে জানি। ইংরেজি তোমাদের আর নতুন কি শেখাবে প্রেম সম্বন্ধে?

সে। ওটা তোমাদের ভুল। তুমিও বোধ হয় লেডি ইলিয়ানর স্মিথের বই পড়ে ধরে নিয়েছ যে, চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় তপ্তরক্ত রোমানি রমণী রোম্যান্স করে বেড়ায় জর্জিয়োদের সঙ্গে। বরং তার ঠিক উল্টো। যাক্ না কোন জর্জিয়ো (সভ্যজগতের লোক) কোন রোমানির সঙ্গে ফ্লার্টেশন করতে; একটা কাশের অর্থাৎ চেলাকাঠের ঘায়ে রোমান্সের [illegible]কাঠা হয়ে যাবে।

আ। তবে? তবে তোমার ত দুঃখের কোন কারণ থাকার কথা নয়।

সে। সেখানেই ত হল মুশকিল। আমরা রোমানিরা বিয়ে করি, তোমাদের মত ভালবাসি না। আমি গিয়েছিলাম ভালবাসতে।

আ। তারপর বুঝি দেখলে যে, ভালবেসে তাকে সুদূর করে দিয়েছ?

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বলল—না, তা নয়, ভালবেসেছিলাম সে সুদূর বলে। সে ছিল এক জর্জিয়ো মেয়ে। বিদেশিনী।

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

একটু পরে সে বলল—সে ছিল তোমাদের সভ্যজাতের মেয়ে। দিনে-রাত্রিতে নিমেষে নিমেষে সে নূতন; নিত্য তাকে পাবার সাধনা করতে হবে। একটি চুমিদাভে (বেদের বিয়ের মন্ত্রপূতঃ চুম্বনে) তাকে বাঁধা যায় না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তাই তাকে পেলাম না।

ওই বিশালকায় রুক্ষদর্শন, সরলপ্রকৃতির লোকটির এই আত্মপ্রকাশের কাহিনী শুনতে কষ্ট হচ্ছিল। অথচ শুনতেও কৌতূহল ছিল অসীম। কিন্তু সে নীরব হয়ে রইল। স্মৃতি-সরোবরে ধ্যানমগ্ন তাকে জাগান হয়ত সহজ হবে না। আর সে যদি নিজে থেকে আর না বলতে চায়, খুঁচিয়ে কথা বের করতেও বড় সঙ্কোচ হতে লাগল।

অবশেষে প্রশ্ন করলাম—তুমি যে বলেছিলে যে বিয়ে হলে রক্তপাত হত সে কথাটা ত বোঝালে না আমাকে?

যেন ঘুম থেকে উঠে এল সে। ধীরে ধীরে আরম্ভ হল তার কাহিনী।

আমাদের বিয়ে হল দিনেরবেলা। প্রথমে গণ্ডি দিয়ে দাঁড়ায় বাচ্চারা। তাদের পিছনে ছেলেমেয়ের দল। বয়স্করা সবার শেষের সারিতে। গণ্ডির মাঝখানে বর-কনে তাদের পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। বরের বাঁ-হাতের আর কনের ডান হাতের চাটুতে ফুটো করে রক্ত বের করে দেওয়া হয়। দুজনের হাতে হাত রাখলে সেই রক্ত পরস্পরের দেহে মিশে যায়, আর সাতটি কুমারী রেশমী সুতো দিয়ে শক্ত করে হাত দুটি বেঁধে দেয়। তারপর বর-কনে পরস্পরকে চুম্বন করে, যার অর্থ হচ্ছে তুমি চিরকালের জন্য আমার, আর আমি চিরকালের জন্য তোমার।

বাঃ কি রোম্যাণ্টিক বিয়ের পদ্ধতি—প্রশংসমান সুরে বললাম আমি।

ক্ষুব্ধ হয়ে বলল সে—জান এই রক্তময় পদ্ধতিটার জন্যই আমার বিয়ে হল না; রক্তাক্ত হৃদয়ে আমার ঘর ছাড়া হয়ে চলে যেতে হল। না হল আমার বোমেরিন (বিয়ে), না পেলাম আমি রোভেল (বধূ)।

চুপ করে রইলাম আমি। সে আকাশকে বোধ হয় উদ্দেশ করে অন্য মনে বলল—অথচ কি রকম রিক্লোন (সুন্দর) বোরো ডিব্বাস (উৎসবের দিবস) হতে পারত সেটি যদি আমার ভার্ডোতে (ক্যারাভানে) আসতে পারত?

খুব মৃদু ভাবে—যেন নিজেকেই প্রশ্ন করে আমি বললাম—কেন পারল না সে? সে কি ভালবাসত না তোমায়?

সে। হ্যাঁ, ভালবাসত, খুবই ভালবাসত। এত ভালবাসত যে সে তার বিদ্যুতের আলো. আর গ্যাসের উনুন ছেড়ে কেরোসিনের কুপীর আলোয় চেলা কাঠের আগুনে রান্না করবার জন্য আমার ভার্ডোতে উঠে আসতে রাজী ছিল।

আ। তবে?

সে। সেখানেই ত মুশকিল। তাকে যখন প্রথম দেখলাম জঙ্গলে রাসপবেরী পাড়তে পাড়তে। সেও এসেছিল একই কাজে—জ্যাম তৈরী করবে বলে। আমি তাকে নূতন এক রকম জ্যাম তৈরী করবার কায়দা শিখিয়ে দেব বলাতে সে আমার আস্তানায় এল। আমিও আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে তাকে জ্যাম করা শেখাতে এত ভাল লাগে। নতুন নতুন পাক-প্রণালী ভবিষ্যতে শিখিয়ে দিব এ আশ্বাস তখনি দিয়ে দিলাম। কিন্তু কেন দিলাম?

নিজের মনেই যেন সে স্বগতোক্তি করল—কিন্তু কেন দিলাম?

আ। বিদেশিনী বলে?

সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠে সে বলল—না, তা নয়। সব জর্জিয়ো মেয়েই ত আমাদের চোখে বিদেশিনী। নতুন একটা গ্রামের গলিপথ দিয়ে যখন আমাদের ঘোড়া টানা ঘর-বাড়ির গাড়ি চলতে আরম্ভ করে তার চাকাগুলি যেন সভ্য ছোকরাদের প্রাণে দাগা হানতে হানতে যায়। কিশোরী যুবতীর দল আমাদের গড়ানে সংসারগুলি ছেঁকে ধরে। কেমন করে আমরা রাঁধি, জীবনযাপন করি, সে সব দেখবার অজুহাতে সময়ে অসময়ে আমাদের চারদিকে ঘুর ঘুর করে। কিন্তু কারো দিকেও আমরা ফিরে তাকাই না।

আ। তোমাদের অজানা জীবনের দিকে তাদের যে আকর্ষণ সে ত স্বাভাবিক।

সে। হ্যাঁ, অজানার জন্য, অদেখার জন্য ব্যাকুলতা স্বাভাবিক, কারণ তোমরা সভ্য, তোমাদের দৃষ্টি তোমাদের গতি সবই সভ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আ। আর তোমাদের?

সে। আমাদেরও তাই। তবে পৃথিবীময় আমরা ঘুরে বেড়াই, বাসা বাঁধি না। তাই মন বসে না কোথাও। তোমাদের রোম্যান্সের জন্য ব্যাকুল মেয়েদের জন্যও না। যদিও আমাদের আস্তানায় এসে অন্তত এক কাপ চা খাবার জন্য তাদের আগ্রহের সীমা থাকে না।

রাত্রি অনেক হয়ে যাচ্ছিল। বললাম—কিন্তু তোমার কি হল তাই বল।

সে। আমার আর কি হবে। বেটিকে মনে হল শুধু মেয়ে নয়, মহিলা; নারী নয় রাণী।

আ। বুঝলাম—তারপর যা হবার তাই হল।

একটু অসহিষ্ণুভাবে সে বলল—না কিছুই বোঝ নি। আমরা যতদিন অবিবাহিত থাকি এ সব রঙীন খেলায় কোন আপত্তি দেখি না। এখনও দেখতাম না। বেটিকে যদি শুধু একটি মেয়ে বলে মনে হত তা হলে বেঁচে যেতাম, অতি কাছের, অতি জানা, সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে দু দিন খেলা করে তৃতীয় দিন সরে পড়তাম আস্তানা তুলে নিয়ে।

আ। অর্থাৎ তাকে ভালবাস বলে যখন আবিষ্কার করলে, তখন দেখলে যে সে সুদূর ও রহস্যময়ী হয়ে গেছে? ভালবাসা তোমাদের মধ্যে সেতু বাঁধল না, পরিচয়ের স্রোতের মধ্যে বাঁধ বেঁধে দিল?

সে। ঠিক তাই। তখন থেকেই মনে হল তাকে যেন চিনি না, তার আদিও নেই, অন্তও নেই। তার উগ্র রকমের শুভ্র বর্ণের অন্তরালে কোথায় যে অন্তর লুকানো আছে তার সন্ধান দুই হাতে আঁতিপাতি করে অন্বেষণ করেও পাই না। তার নীল নয়ন দুটি নীল মহাসিন্ধুর আহ্বান জানিয়ে যায়। তার ঢেউ খেলান কোঁকড়া সোনালী চুলের উপর পর্যন্ত চুমু দিতে সংকোচ বোধ হয়। হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে এসে স্বপ্নের মাঝখানে সে ঠাঁই নিল।

চাঁদ তখন হ্রদের ওপারে পাহাড়ের আড়ালে প্রায় লুকিয়ে পড়েছে। দু একটা গ্রাউজ পক্ষীর ডাক হঠাৎ শোনা যাচ্ছে। আর পৃথিবীতে কিছু নেই।

সে বলে চলল। ক্রমে আমাদের আস্তানা গুটোবার সময় হয়ে এল। আমাদের সর্দার ৪৮ ঘণ্টার নোটিশ দিল। আমি তখন ফাঁসির নোটিশ পেলাম মনে হল। সর্দার অবশ্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা কি। আমায় খোলাখুলি বলল যে এসব চলবে না। রোমানি স্বামী তোমাদের অতি লক্ষ্মী সুসভ্য স্বামীদের মত ভোরবেলার শীতে গরম এক কাপ চা হাতে নিয়ে এসে স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গাবে না; আমাদের জীবন একটি সুদীর্ঘ অলস চুম্বন নয়। আমাদের মেয়েরা বিয়ে করে স্বামীর সহকর্মিনী হবার জন্য, পথে বিপথে, তাকে অজস্র সন্তান দিবার জন্য, ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজের মধ্যে ডুবে থাকার জন্য। তারা হচ্ছে তোমাদের দেশের কুমড়ো গাছের লতা, বিলেতের 'মর্নিং গ্লোরি' নয়। মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে সর্দার ঘোষণা করল যে 'বেটি' হচ্ছে উদ্যান লতা, প্রেম করতে পারে, সংসার করতে পারবে না। সে যখন বিয়ে করবে মাথায় সাজাতে হবে তুষার-শুভ্র জর্জেটের অবগুণ্ঠনের উপর কমলা ফুলের স্তবক; তার হাতের তালুর রক্তপাত করতে গেলে সে মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

এই পর্যন্ত বলে সে আবার স্মৃতির সাগরে অবগাহন করল। নিস্তরঙ্গ সে সাগর নিস্তব্ধ, নিঃশ্বাসহীন মনে হতে লাগল।

খানিক পরে সে নিজেই আবার আরম্ভ করল। সে কথা বোধ হয় ঠিক। 'বেটি' ছিল রোম্যান্টিক মেয়ে, যে রকম শুধু ইংরেজ মেয়েরাই হতে পারে। ভেবে দেখ কতখানি মনে রঙ থাকলে ওরা সাহস করে বিদেশীদের সঙ্গে ভালবাসায় পড়ে, এ কথা জেনেও সে বেশীর ভাগ সময় তারা ঠকবে। মনে করে দেখ, দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ সবের ব্যবধান এড়িয়ে একটি মেয়ে যখন বিদেশীকে বিয়ে করে কতখানি ত্যাগ ও কতখানি সাহস তার পিছনে থাকে।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—সে ত শুধু ঘর পাবে বলে। নিছক বাস্তব সংসারের হিসাবের কথা এটা।

এ কথা সে পছন্দ করল না। প্রতিবাদ করে বলল—জর্জ, তুমি হয়ত কখনও প্রেমে পড় নি তাই এ কথা বলছ। তুমি কি করে জানবে বিদেশিনীর প্রেমের বিশালতার কথা।

কথা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে দেখে বললাম—আচ্ছা তা না হয় মানছি; এখন বল বেটির কথা।

বাকীটা বলে আর কি হবে? একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার ঠেলাগাড়ির সংসারে তাকে চা ঢেলে দিতে দিতে বিদায়ের কথা ও সর্দারের আদেশের কথা বললাম। বাপ-মা আমার নাম দিয়েছিল রুডি; রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনোর মৃত্যু সংবাদে শুনেছি বহু মেয়ে ঘরে বসে কেঁদেছিল; মৃত্যুদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত রুডির বিদায় সংবাদে বেটির চোখের জল টপ টপ করে চায়ের কাপে পড়তে লাগল।

আমি নিরুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, আর তুমি কি করলে?

আমি কি করলাম? যদি তার সঙ্গে কথা কইতাম, তাকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম বা তর্ক করতাম হয়ত একটা কিছু সমাধান হত। হয়ত সে আমায় ডাকত তাদের জগতে চলে আসতে; হয়ত হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতাম সর্দারের কাছে; তার অনুমতি নিয়ে বেটিকে 'চুমিদাভ' দিবার জন্য। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলাম না। তার চোখের জল দেখে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলাম; অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমার ঘোড়াটার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে লক্ষ্যও করতে পারলাম না কখন সে চলে গেছে।

পরের দিন সকালে কেন তাকে আবার ডেকে আনলে না?

পরের দিন আমার আর ভোর হল না সে গ্রামে; সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমাদের ক্যারাভ্যান চলতে আরম্ভ করেছে শেষ রাত্রি থেকেই—আমার ঠেলাগাড়ির ঘর লাইনের ঠিক মাঝে; সর্দারের গাড়ী ঠিক আমার পিছনে; একদৃষ্টে সর্দার চেয়ে আছে আমার ঘরের দিকে। সে ঘর গড়াই হল না, তাকে আর ঘর বলে লাভ কি?

তার পর?

তার পর আর কি? আমার ভাঙ্গা ঘরে রাঙা অতিথির স্থান হল না। তাকে ভাল করে কোন দিন শুধানো পর্যন্ত হয় নি সে এ ঘরে তার চরণ দুটি পাততে রাজী আছে কি না।

কেন? তার সময় ও সুবিধা নিশ্চয়ই তুমি অনেকবারই পেয়েছিলে?

হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। কিন্তু কেন তুমি বুঝতে পারছ না যে সে বেটিকে ডেকে এনেছিলাম খেলাঘরে খেলার জন্য তাকে সে কথা শুধানো যেত; কিন্তু সে বেটিকে ভালবেসে ফেললাম তাকে তরীখানি আমার চোরা বালুচরের ঘাটে ভিড়াতে বলি কি করে? যে বাধা সর্দার সাংসারিক কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিল, তা সে আমার মনে বহুদিন থেকেই লুকানো ছিল। চোখ বুজেছিলাম প্রথম পরিচয়ের সময় কিন্তু চোখ যখন খুলল দেখলাম যে বেটি কতদূরে দাঁড়িয়ে আছে। সংসারে যত কাছে সে এগিয়ে এসেছে সন্ধান তার ততই সরে সরে গিয়েছে। কাছে এসে তাই সে দূরে হয়ে গেল।

এ যে বড় জটিল দর্শনবাদের কথা হয়ে উঠল। একজন বেদের কাছে এরকম তত্ত্ব কথা প্রত্যাশা করি নি। প্রলোভন হল একটু আঘাত করতে—যদি আরও কোন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুদূরে হ্রদের ওপারে যেন দৃষ্টি মেলে বলে উঠলাম—মনে হচ্ছে যেন এখানেই এ কাহিনীর শেষ নয়। সে দূর হয়ে গেল তার জন্য এত ব্যথা ত হবার কথা নয়।

বুড়িকে আঘাত অনুভব করান গেল না। সে বলল—কথা নয়; তবু ব্যথা পাই। তোমরা সভ্যতার আবরণে ভালবাসা ভুলে যাও, নতুন করে প্রেমে পড়ে তার দার্শনিক ব্যাখ্যা তৈরী কর। আমাদের দর্শনতত্ত্ব নেই, আছে দুঃখের তথ্য। আমরা বিয়ে করি সংসার করবার জন্য। সন্যাসের মধ্যে আমাদের সংসার—যাযাবরতার মধ্যে স্থাবরতা; সবচেয়ে বড় সেই সম্পদ—তাই আমার হল না এ জীবনে।

সান্ত্বনা মাখান সুরে বললাম—তাতে ত তোমার দুঃখ হওয়া উচিত নয়; মনে কর না কেন যে একটি মেয়েকে ভালবেসে দুঃখের মধ্যে টেনে আন নি, তাকে ত্যাগ করবার দুঃসাহস করবার সারা জীবনের মত যাযাবর হয়ে যাবার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছ। সে থাকুক না তার নিজের জগতে, নিজের পরিচিত প্রথায় ও পরিবেশে।

কণ্ঠস্বরের কোন রঙ নেই। তবুও ওই চন্দ্রালোকিত হ্রদের জলে প্রতিফলিত আলোকে উদ্ভাসিত তার মুখের ভিতর থেকে যে স্বর বেরিয়ে এল তাকে ম্লান বলব আমি। সেই ম্লান কণ্ঠে যেন বহু সুদূর থেকে ভেসে আসল তার কথা—সে সুযোগই ত তাকে দিলাম আমি বিনা তর্কে, বিনা প্রতিবাদে। কিন্তু আজ নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি সে জন্য। কেন জান?

হঠাৎ তার স্বরে পরিবর্তন লক্ষ্য করে চমকিয়ে উঠলাম। যে রূঢ় রুক্ষ ভাষায় সে কুটীরের মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল, সেই স্বর তার ফিরে এসেছে। হঠাৎ নূতন ভাবের কোন আলোচনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম।

রুক্ষ ভাবে সে বলল—কি লাভ হয়েছে আমার তাকে সে সুযোগ দিয়ে? বেটি কি সুখী হয়েছে তার পরিচিত সংসারযাত্রায়? তার কি লাভ হয়েছে রোম্যান্সের লোভ সংবরণ করে? আজ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তাকে দেখলাম আমাদের ঠেলাগাড়ির ক্যারাভানের কাছে। তার ঠেলাগাড়িতে দুটো বাচ্চা দেখলেই বোঝা যায় যে খেতে পায় না, অ্যাপ্রনের কোণা ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে আরো একটা; বুভুক্ষা ও অতৃপ্তি তাদের মুখে মাখানো। বিনা পয়সার মজা দেখাতে এনেছে তাদের বেটি, সেই মহিলা, আধ ময়লা, আধ ছেঁড়া কাপড়ে, আধভাঙ্গা চেহারা একটা মেয়ে।

চুপ করে রইলাম। বুড়িও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর সে নিজেই আবার শুরু করল। জানো, তাতেও আমি তত দুঃখিত হইনি। ভেবেছিলাম তার ভাগ্যে যদি এই থেকে থাকে হয়ত সে ভাবছে যে বেদেনী হয়ে গেলেও বাদ সাধত ভাগ্য এমনি করে। কিন্তু কষ্ট হল যখন দেখলাম তার মধ্যের মহিলার মৃত্যু হয়েছে। সে আবার অনেক কাছের, হাতের মুঠোর মধ্যের মেয়ে হয়ে নেমে এসেছে।

প্রতিবাদ করে বললাম—তা কি কখনো হয়। আমি ত ভেবেছিলাম সে চিরকালের জন্য তোমার কাছে মহীয়সী হয়েই শোভা পাবে।

মৃদু স্বরে সে বলল—সেখানেই ত হয়েছে তার মৃত্যু। বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল—সে বলল, জান, তার হাতের ছেলেটার মুঠোর মধ্যে আমি একটা সোনার গিনি পুরে দিয়েছিলাম। কোন কথা বলিনি। চিনতে পেয়েছি এ লজ্জা যেন সে না পায়। কিন্তু সে কি করল তা জান? সে একটু দূরে যখন সরে গেল ছেলেটার হাত থেকে নিয়ে দেখল আমি কি দিয়েছি। তারপর মিষ্টিভাবে হাসবার চেষ্টা করে আমায় একটা চুমু ছুঁড়ে মারল। চড়ের মত সে চুমু আমায় এসে লাগল। আমি দৌড়ে পালিয়ে গেলাম আমার কামরার ভিতরে। যে ঘরে বসিয়ে তাকে সিংহাসনে বসাতাম মনে মনে। চুমু দিয়ে যার মহৎ ভাবকে কখনো অপবিত্র করতে ইচ্ছা হত না সেই ঘরে।

ভাবতে লাগলাম। যে ঘর কোন দিন গড়াই হল না, সে ভাঙ্গা ঘরের অতিথির এ পরিণামের জন্য এত দুঃখ কেন? যে আসেইনি, তার চলে যাওয়ায় যায় আসে কি? এত সূক্ষ্ম অনুভব, এত সুকুমার বিশ্লেষণ কেন করছে বুড়ি? কোথায় শিখল সে এত মর্মান্তিক মনস্তত্ত্ব, কোন মানবতার বিশ্ববিদ্যালয়ে?

কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না। মুখ তুলে দেখি অটুট স্বাস্থ্যবান সুগঠিত দেহ রোমানি বুড়ি মাথা নীচু করে দূরে সরে যাচ্ছে। জংলী লতাপাতা গুল্মের ঝোপ দু হাতে সরিয়ে সরিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে—যেন কত দুর্বল, কত অসহায় সে। ভেঙ্গে পড়ছে তার মেরুদণ্ড: পদক্ষেপে ঝোপের মধ্যে মর্মরিত হচ্ছে পরাজয়ের বেদনা।

কোন প্রশ্নই করতে পারলাম না। আলো আঁধারের অন্তরালে মিলিয়ে গেল সে—যেমন করে তার ভাঙ্গা ঘরে রাঙা অতিথির আগমন-স্বপ্ন মিলিয়ে গিয়েছে।

বিঙ্কমুখের কথা

কৌতুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করলুমঃ "কি রকম? কত করে শ' কাচো?"

বহুরূপী অমায়িক কণ্ঠে জবাব দিলে ঃ "দাম লাগেনা বাবু। এমনি মুফতে কাপড় ধোলাই করি। সাফা কাপড় ময়লা করি, ময়লা কাপড় পীলা করি। আস্ত কাপড় ফালা করি, ভাসুরের পিঠে কাপড় ঠেঙাই। বেনারসের ধোপানী আছি, কাপড় কাচি ভালো......"

আজ বহুরূপীর শেষ অভিনয়। গত এক-পক্ষকাল প্রত্যহ বিভিন্ন সাজে সেজে তার ছড়া কেটে রংগরস করেছে। আগামী দেওয়ালীতে ওকে হাজির হতে হবে মুঙেরে। সেখানে কিছু মুনাফার আশা আছে। কিছু বকশিস দিয়ে ওকে বিদায় দিলাম। শাদাশিদে, গোটা মানুষ এই মহাবীর। সহজ ওর শিল্পকলা, অতি সহজ ওর জীবনযাত্রা। যেটা ভালো লাগে, সেইটে নকল করে, সেজে দেখায়। যেখানে খুশি, সেখানে থাকে আবার চলে যায়। খাঁটি যাযাবর মানুষ। পথের সংগে আর মাটির সংগে ওর নাড়ীর যোগ। বর্তমান জীবনের মধ্যে দিয়ে ও চলেছে এবং আনুষঙ্গিক গ্লানিও ভোগ করে থাকে। কিন্তু কি এক স্বাভাবিক আশ্চর্য উপায়ে, জটিলতার ধার ধারে না। ওর সহজ গাম্ভীর্য আর রসবোধের কাছে যত সব ছোট কথা যেন হার মেনেছে......

সচেতন অথবা অচেতন ভাবে আমরা অনেকেই বহুরূপী। হরেক রকমের রূপ-সাধনা করে থাকি। তার পিছনে আছে সজ্ঞান চিন্তা অথবা মনন শক্তি। কিন্তু বহুরূপীর মেজাজ আছে কি? দৃষ্টির প্রসন্নতা? ইচ্ছামত, অনায়াসে, প্রাকৃতিক অবলীলায় পাতার সবুজ, মাটির গেরুয়া, পাথরের ধূসর কিংবা রোদের সোনালি মেখে কি আমরা মনকে অচেতন-অবচেতনের অভিষেকে স্নাত ও স্নিগ্ধ করতে পারি? কিংবা ঐ মানুষ-বহুরূপীর মতন সহজ প্রতীক-বেশে উপলব্ধির সাহায্যে চিত্র-চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারি? আমাদের আছে বুদ্ধি-জাগর সচেতন মন, আছে দার্শনিকতার অভিমান, নেই অসংকোচ দৃষ্টির অপ্রতিহত প্রসাদ। এক কথায় পোজ্ আছে, নেই সত্যি-কারের এ্যাটিচুড। কেন নেই, তার জবাব দেওয়া কঠিন নয়। আর সে জবাব দেবেন সমাজ-দর্শনের বিশেলষক পণ্ডিত। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে বহুমুখী সত্তা আছে, যার বিকাশ হয়ে থাকে একই মানুষের নানাবিধ প্রচেষ্টায় এবং আচরণে—সেই বহুমুখী সত্তা বা ব্যক্তিত্বের এক একটি ধারাকে পৃথক করে, অবচ্ছিন্ন করে দেখতে অথবা ফুটিয়ে তুলতে আমরা জানি না। কাজটিও কঠিন। পার্সোন্যালিটির এই ডিসো-সিয়েশ্যন যার আয়ত্ত, এক হিসেবে তার আত্ম-দর্শন হয়েছে। আমাদের দেশের ফকির-বাউল, উদাসী-বৈরাগীর মধ্যে খানিকটা এই সহজ বিশেলষণ-শক্তি এবং সেই সংগে একান্বয়-বোধ ছিল।

* * * *

বহু দূর থেকে একটা বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। রেল লাইন পেরিয়ে ঘুমটির পাশ দিয়ে কাঁচা সড়কটা যে মাঠের মধ্যে গিয়ে মিশেছে, সেইখানেই বোধহয় উৎসব শুরু হল। গত কয়দিন ধরে একটা কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করছি। শীত-রিক্ত মাঠে হেমন্তের সন্ধ্যায় যেমন করে সূর্যের আর্দ্র তিমির ঝরে পড়ে, অরণ্যের প্রত্যাশী পাথুরের রাস্তায় যেমন করে ঝর্ণা ধারায় পৌঁছুবার আগেই একটা ভিজে হাওয়া আর গন্ধের আমেজ পাওয়া যায়, আমার মনের শূন্য বালিয়াড়ি যেন সেই রকম একটা স্নিগ্ধ ক্ষীণ কল্লোলের আভাস পাচ্ছে ঐ শব্দ-তরংগের মাধ্যমে। কিসের যেন একটা প্রত্যাশায় মন উদগ্র হয়ে উঠছে আবার কিসের একটা অভাবে বঞ্চনার সূক্ষ্ম বেদনা সঞ্চিত হয়ে উঠছে।

ঐ দেহাতী উৎসবের বাজনার আওয়াজে বাঙলা দেশের নিজস্ব উৎসবের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করি। মনে হয়, এ বেশ আছি। প্রবাসে অন্ততঃ (জগা-খিচুড়ি) উৎসবের বিড়ম্বনা নেই। শারদীয় বাদ্যের রোলে, আকাশের নির্মেঘ চোখ-ঝলসানো নীলাভায়, শস্যহরিৎ প্রান্তরের শ্যামলতায়, কাশগুচ্ছের শুভ্র আন্দোলনে একটা প্রত্যাশা জাগে মনে। বহুদিনের ঐতিহ্য, সংস্কার আর ভাবানুষংগ যেন একসংগে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হয়তো এটা অভ্যাস মাত্র। বিশেষ একটি উপলক্ষে শব্দ আর চিত্রের সহ-যোগিতায় প্রাক্তন সংস্কারেরই অনুবেদন। তার বেশি কিছু নয়। তবু সেই প্রত্যাশা অন্ততঃ আংশিক পূর্ণতা না পেলে মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা দেশের রাজধানীতে এখন যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা কি করছেন সেই কথাটা ভাবতে চেষ্টা করি। এখানে-ওখানে ঘুরছেন, সপরিবারে কুমারটুলী-বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জ-কালীঘাট ঘুরে প্রতিমা দেখে বেড়াচ্ছেন আর অকারণে জনসংকুল যানবাহনের ভিড় বাড়িয়ে তুলছেন। কিসের জন্য আর কি প্রত্যাশায়? উৎসবের প্রাণবস্তুর সন্ধান কি তাঁরা পেলেন? দেখছেন, সাজ-সজ্জা আর রঙ আর শুনছেন আওয়াজ......

এক এক পাড়াতেই ছ'সাতখানা মণ্ডপ। অর্থাৎ বারোজনকে নিয়ে এক একটি বারোয়ারী এবং তারই আনুসংগিক দলাদলি। চাঁদা সংগ্রহ, প্যাণ্ডাল বাঁধা আর আয়োজনের বাহুল্য। প্রতিমা গৌণ, মণ্ডপ মুখ্য। পূজা গৌণ, জন-সমাবেশ মুখ্য। প্রতিমা সব নূতন ধাঁচের। বাহনগুলি খুঁজে নিয়ে দেখলে হয়তো বোঝা যাবে কে কোন্ দেবতা। কান্তিবিদ্যার আধুনিক প্রয়োগে চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। সারাদিন অসংখ্য লোক আসছে যাচ্ছে, অঞ্জলি দেবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। নীরব কোনও এক মুহূর্তে হঠাৎ বাজনা বেজে ওঠে। বুঝতে পারা যায় সন্ধিপূজার লগ্ন। কিন্তু পূজা-মণ্ডপে ভদ্র ও সংযত স্তব্ধতা কোথায়? শারদীয়া পূজার শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয় উপকরণ হল লাউড-স্পীকার। দিন-রাত তারই সাহায্যে গ্রামোফোন রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি চলেছে। মণ্ডপ মধ্যরাত্রে জনশূন্য। সিংহবাহনা দেবী নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে শুনছেন "পৃথিবী আমারে চায়...প্রিয়া খুলে দাও বাহু ডোর!" অসহায় ভাবে ভাবছেন আর মনে মনে আধুনিক গীত-কাব্যের অদ্বিতীয় নায়িকার নাছোড়বান্দা বাহুপাশের নাগপাশ কৃতিত্বে বিস্মিত হচ্ছেন। কোনো শিশু-জলসায় বা বালক-বালিকার সাহিত্য বৈঠকে পরমসহিষ্ণু বাল্মীকির মতই দেবী তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকেন সারা-দিন। সন্ধ্যার ঝোঁকে আরতির ঘণ্টায় আর সুগন্ধ অর্চনায় মনটা ক্ষণেকের জন্য স্বাভাবিক প্রশান্তি খুঁজে পায়। তারপর দর্শকের দল ভিড় করতে থাকে। বাঁশ দিয়ে ঘেরা লাল শালু মোড়া নেতাজী-জওহরলাল-মূর্তি শোভিত মণ্ডপের প্রবেশ পথেই কেউ কেউ প্রণাম সেরে ফিরে যায়, কেউবা এগিয়ে এসে সমালোচকের দৃষ্টিতে গঠন-কৌশলের তুলনা-প্রতিতুলনা করে, মহিলারা সংলগ্ন স্টল-এ স্বদেশী তাঁত শিল্প, আচার-মোরব্বা শিল্পের নমুনা সংগ্রহ করেন, বালক-বালিকার দল কলরব করে, কেউবা হারিয়ে যায়। কিন্তু নিঃশব্দে নয়। লাউড স্পীকারে দেবীমূর্তির পিছনেই ভৈরব কণ্ঠ জেগে ওঠে, "হ্যালো, হ্যালো, সাতাশের তিন জগন্নাথ দাসের লেন থেকে ঝণ্টি নামে একটি ন' বছরের ছেলের বাবা বিশ্বম্ভরবাবু ছ নম্বর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঝণ্টিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোনো স্বেচ্ছাসেবক ঐ নামের কোনো ছেলেকে......" ইত্যাদি।

হয়তো এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। যুগোচিত বিবর্তন। পূজা উৎসবে পূজা যে নেই, উৎসব যে পার্টি হয়ে উঠেছে, মণ্ডপের জনতা মিটিং-এ এসেছে বলে মনে হয়, তাতে স্বয়ং দেবীও হয়তো আর বিস্মিত হন না। তবু মেনে নিতে সময় লাগে।

প্রবাসে বসে তাই মনে হচ্ছে, বেঁচে গেছি।

শহরে থাকলেই বেরুতে হ'ত। এখানে ওসব হাঙ্গামা নেই। যেটুকু আছে, সেটুকু নির্ভেজাল। বাংলা দেশের মতন বিহার বা যুক্তপ্রদেশের জনসাধারণ বোধ হয় এখনও অতটা 'সোফিস্টিকেটেড' হয়ে ওঠেনি। এখনও দশেরা, রামলীলায় খাঁটি উৎসবের গন্ধটা পাওয়া যায়। দশাননের মূর্তি পোড়ে, ডুগি বেজে ওঠে। এখনও পুতুল নাচের প্রচলন উঠে যায়নি। কথকতা হয়। ছেঁড়া পাল টাঙিয়ে সামান্য আয়োজনেই আসর বসে। গায়ক গলায় ফুলের মালা পরে মধ্যস্থলে বসে অশিক্ষিত-পটু-কণ্ঠে ব্যাখ্যা করে চলে আর গান করে। আনন্দে আর উত্তেজনায় আর মধ্যে মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর তান-মাহাত্ম্যে শ্রোতার দল তৃপ্ত হয়। খোলা মাঠে সারারাতই হয়তো গান-বাজনা চলবে আজ। সন্ধ্যার কিছু আগেই দোকান বন্ধ করে কয়েকটি লোক ঐ পথে গিয়েছে দেখেছিলুম......

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

কমিশন পাবার আগে একটা মজার টেস্টের কথা সমরের হঠাৎ এমনি মনে পড়ছে। ঘরে ঢুকতেই বেঁটে টেকো সাহেবটা ঘাউ ঘাউ করে উঠলো। সমর এক বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলে না, কি যে বললে সাহেব! শিকার ধরার আগে বেড়ালের চোখ দুটো যেমন শানিয়ে ওঠে সাহেবের কটা চোখ দুটো তেমনি সমরের বিমূঢ় মুখের ওপর ঝলসে উঠলো। সাহেব আবার ঘাউ ঘাউ করলে—বাঁধান দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগল। অনেক কষ্টে সমর বুঝলে, সাহেব নাম জিগ্যেস করছে। নাম বলতেই সাহেব তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে সমরের চেয়ারের হাতলের ওপর বসল। জিগ্যেস করলে, what do you like most, poetry or paintin?

প্রশ্নটা শুনে সমর অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগল, সাহেব ইয়ার্কি করছে কিনা, যুদ্ধে যে যাবে তার এর দরকার কি? কি উত্তর দেবে এখন—কি বলবে ভাল লাগে না ও দুটো কিছুই—সাহেব বোধ হয় সন্তুষ্ট হ'বে! ধাঁধাঁর মত গোলমেলে লাগছে প্রশ্নটা।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সাহেব আবার জিগ্যেস করলে, Have you ever kissed a girl?

শুধু আরক্ত নয় সমর একেবারে ঘেবড়ে গেল, সত্যি সত্যি সাহেব ইয়ার্কি করছে না তো! মনে হ'লো সাহেবটার চোখ দুটোয় কৌতুক উপছে উঠেছে। 'না' বলতে গিয়ে সমর ঢোক গিলে ফেললে—কে জানে সাহেব যদি 'ফেল' করিয়ে দেয়! যদি ধরতে পারে সমর মিথ্যে বলছে! সমরের কেমন ধারণা হ'য়ে গেল, সাহেবটা মনের কথা বুঝতে পারে। ঝাণু! অস্ফুটে জবাব দিলে yes! বলেই চেষ্টা করে একটু সপ্রতিভ হলো।

উত্তর শুনে পিঠে ব্যথা ধরিয়ে দেবার মত সাহেবটা থাপড় মেরেছিল। সেদিন ভালবেসে চুমু খাওয়াটা বাহাদুরীর, সমর বুঝতে পেরেছিল। 'না' বললে নিশ্চয়ই সে 'ফেল' করতো। ভালবাসার জন্যেই যেন সেদিন চাকরীটা হ'য়েছিল। সত্যিকারের চুমু খাওয়ার চেয়ে চুম্বনের স্বীকারোক্তিতে যেন শিহরণ পুলক বেশী। সেদিন সারাদিন এমনভাবে দিন কেটেছে কিছুই খেয়াল হয়নি! পরে অলকা শুনে বিশ্বাস করেনি—বলেছে, সমরের মত সব বানান গল্প কথা। কোন সামরিক পরীক্ষক ঐ রকম একটা আজগুবি প্রশ্ন কখনো করতে পারে? অলকার মত মেয়ের মন কিছুতে ভাবতে পারে না, যারা যুদ্ধে যাবে তাদের ভালবাসার দরকার কি? সুস্থ মানুষের পক্ষে কোনটা অনিবার্য প্রেম না, যুদ্ধ? সমরের কথা যদি সত্যিও হয় তাহ'লে সাহেবটা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেছে: ভাল যদি বাসবে তবে যুদ্ধে যাবে কেন? সমরের কথা বিশ্বাস করেনি।

বিশ্বাস না করলেও আরক্ত হ'য়ে অলকার গল্পটা ভাল লেগেছিল। সমর বুঝতে পেরেছিল। একদিনের একটা মাত্র শঙ্কিত সন্ত্রস্ত চুমু সহস্র চঞ্চল চুম্বন চিন্তায় নিঃশব্দ গুঞ্জনে উভয়ের মাঝখানে ফিরেছিল সেদিন। অনেক্ষণ দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে পারেনি।

মনে করবার ইচ্ছে না থাকলেও হঠাৎ ঐ কথাগুলোই এখন মনে পড়ছে। নিষ্ঠুর পরিহাসের মত মনে হচ্ছে—সাহেবকে সেদিন মিথ্যে কথা বলাই যেন উচিত ছিল, তাহলে আজকের দিনটা সত্যি হ'তো! সমর নিজেকে প্রশ্ন করে, এর পরও সে অলকাকে ভালবাসে কি? হাঁ—না স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্তই সমর করতে পারে না। একেবারে 'না' বলার মতও মনের জোর যেন পাওয়া যাচ্ছে না। চুম্বনের ইতিহাসটা কি মর্মান্তিক রকমে মিথ্যে আজ! অলকা, তুমি শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না? কি মনে করে নিজের ভালমন্দ নিজে ঠিক করলে? কি ভেবেছিলে তুমি?

সমর যা ভাবছে হয়তো তা নয়। অলকা হয়তো আজো তার অপেক্ষা করে আছে। জীবিকা হিসাবে যে পথ গ্রহণ ক'রেছে সে-পথে সকলেই হয়তো বিপথে যায় না। অলকার চারিত্রিক দৃঢ়তায় সমর এরি মধ্যে সন্দেহ না করলেই পারে—দেখুক, শুনুক বুঝুক, তারপর—

কিন্তু খুব নাম হ'য়েছে মানে কি? আর এ নামের অর্থই বা কি? পর্দার ছবির মত অলকা অলীক। মানসলোকে প্রতিফলিত অলকা বাস্তবে মিথ্যা। অলকা নেই, অলকাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না! কি হ'বে দুঃখু করে—বৃথা আক্ষেপ! অলকা, তুমি একবারও সমরের কথা ভাবলে না? বিশ্বাস করবার মত পুরুষ কি সমর নয়? ভালবাসায় উপেক্ষা পৌরুষেরই অপমান।

ঠিকানা জিগ্যেস করবার ইচ্ছে কখন মনে প্রবল হয়, কিন্তু মুখ ফুটে বাণীকে সমর জিগ্যেস করতে পারে না। বাণীও নিজে থেকে কিছু বলে না। কে জানে এখন কোন লাভ আছে কিনা। সব মিথ্যে, সব ভুল—

পরিবর্তনের অদ্ভুত একটা ধারণা সমরের মাথায় আসে—অত্যাশ্চর্য আকস্মিকতা! আপাতত মনে মনে স্বীকার না করলেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষানুভূতিতে মেনে নিতেই হয়: অতো-টুকু বাণী আজ হঠাৎ কতবড় হয়ে গেছে। আর অলকা? সে তো বোঝাই যাচ্ছে। পরিবর্তন উপলব্ধির—পরিবর্তন দেখার, অনিবার্য। কিন্তু এই মানসিকতা?

হঠাৎ বাণীর সামনে ধরা পড়ার ভয় হয়। বাণী বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে। কাউকে ভালবাসে না ও? কোন যুবক ওর চিন্তায় লৌকিক বুদ্ধি হারায়নি? সমরের নিশ্চয় ধারণা হয়, বাণী কাউকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। মেয়েটার চোখ-মুখের দিকে এখন আর সহজ ভাবে তাকান যায় না—গুরুজন হয়েও এমন একটা মানসিক সঙ্কোচ বোধ করে সমর, ঠিক কি—কেন, নিজেই বুঝতে পারে না।

সমর বললে, চল একটা সিনেমা দেখে আসি। ভাল কি বই হচ্ছে এখানে?

বাণীর উৎসাহিত হবার কথা, কিন্তু কেমন যেন আগ্রহ বোধ করে না। দাদার সঙ্গে সিনেমা যাওয়া! বললে, কই ভাল বই আর হচ্ছে কোথায়! যত সব বাজে বই।

তাই একটা চল, অনেকদিন দেখিনি। সমর বড় পীড়াপীড়ি করে।

বাণীর একবার ইচ্ছে হয়, দাদাকে কিছু না বলে অলকাদির অভিনয় করা কোন বই দেখিয়ে আনে—দেখা যাক্ না দাদা কি করে। কত আর কষ্ট হবে? দাদা কত ভালবাসে বোঝা যাবে। পরক্ষণেই আবার যেন মায়া হয়—একটা সমবেদনা বোধ করে। এ অলকাদির ভারি অন্যায়। এতদিন পরে আজ হঠাৎ অলকাদির বর্তমান অবস্থাটা প্রতারণার মত মনে হয়। অলকাদি তাদের পরিবারবর্গকে ঠকিয়ে গেছে। কে জানে অলকাদি দাদাকে কত ভালবাসতো? সহসা ওদের ভালবাসার গভীরতাটা যেন বাণী উপলব্ধি করতে পারে।

দাদাকে অলকাদি সম্বন্ধে এত কথা না জানালেই হতো। না জেনে বড় ভুল করে বসেছে বাণী। এখন উপায়?

এবার আগ্রহটা দেখায় বাণীঃ যদি যাও তো চলো আর সময় নেই—

সমরের কি মনে হয় কে জানে। বলে, তবে আজ থাক, আর একদিন যাওয়া যাবে।

সমর আজ সিনেমা দেখতে গেলে অলকার অভিনীত কোন বই দেখে ফেলতো কি না বলা যায় না। হয়তো সেই ভয়েই সিনেমা যাওয়া স্থগিত রাখলে। কিন্তু ভয় কিসের? তবে কি রাগ?

ব্যাপারটা যেন বাণী বুঝতে পারে। এক কথায় দাদার সঙ্গে সিনেমা যাবার প্রস্তাবে রাজী হলে ভাল হতো। দাদাকে প্রফুল্ল রাখা এখন তার কর্তব্য। বাণী বুঝতে পারে না, কি ভাবে সমবেদনা জানাবে। চুপ করে থাকতে বড় অস্বস্তি লাগে।

জীবনের যেন আর সে স্বাদ নেই। বড় বিবর্ণ, নিষ্প্রভ মনে হয়। জীবনযাত্রার সে অনাবিলতা বিপর্যস্ত—খোয়া-ওঠা দাঁত-দাড়া বার করা রাস্তাঘাটের মত শহরের জীবন এখন, ক্ষত-বিক্ষত অন্তর্মুখী। কে জানে, দুর্ভোগের ঘা খেয়ে মানুষ জাগছে কি না। কিন্তু যা চোখে পড়ে তা বড় মর্মান্তিক। বড় স্বার্থপর হয়ে উঠেছে মানুষজন। হঠাৎ 'বিজনেজ' কথাটা অনেকের মুখে ফিরছে—ব্যবসা করে পাড়ায় অনেকে ইতিমধ্যে পয়সা করে ফেলেছে, সমর শুনেছে। বাঙালী বড় 'বিজনেজ' বোঝে আজকাল। সমাজের মানদণ্ড বদলে গেছে। পরিচিত মানুষগুলো যেন কেমন হয়ে গেছেঃ অনেক ছোট বড় হয়েছে, অনেক বড় ছোট হয়েছে। পাড়ায় সবাই মাতব্বর, সবাই কর্তা। আত্মগরিমায় মশগুল—আপন কৃতিত্ব প্রকাশের এমন নির্লজ্জ বেহায়াপনা সকলে সহ্যও করছে, আশ্চর্য। বয়সের সম্মান করা, সমীহ করা উঠে গেছে। সমর সেদিন স্পষ্ট দেখলে, পাড়ার দুটো ছোঁড়া পাড়ার বৃদ্ধ রজনীবাবুর সামনে দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে গেল—ভ্রূক্ষেপ নেই। ছোঁড়া দুটোর মুখ ভাল করে সমর স্মরণ করতে পারেনি, কিন্তু রজনী জেঠার মুখটা বড় করুণ অসহায় মনে হয়েছিল। কে জানে ছোঁড়াদের বেয়াদপিতে রজনীবাবু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন কি না—মুখটা করুণ হওয়ার কারণ তাঁর সম্মানহানি কি না। আরো আশ্চর্য কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই, সমঝে দেবার জন্যে একটু সমালোচনা। তবে কি বুড়োরা এটা গায়ে মাখে না, অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছে? সমর ভাবে, তাঁদের সময় কিন্তু ব্যবস্থা অন্যরকম ছিল বুড়োদের আড্ডায় তুমুল সমালোচনা পড়ে যেত। ঘরে-বাইরে ছোটদের এতটুকু অশিষ্ট আচরণ সহ্য করা হতো না। সমরের মনে পড়ে, একবার ঐ রকম কার যেন লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া নিয়ে কদিন ধরে কি কাণ্ডটাই না হয়েছিল। বুড়োদের ঘোঁটের ঠেলায় সত্যি সত্যিই সেদিন সমর এবং সমরের বয়েসী কজন তিক্তবিরক্ত হয়ে মনে মনে বুড়োগুলোর মৃত্যু কামনা করেছিল। আজ কিন্তু সমর ভাবছে, বুড়োদের ব্যবস্থাই যেন ভাল ছিল—বুড়োরা তাদের ভালর জন্যেই খিট্ খিট্ করতো। অল্প বয়েসের উচ্ছৃংখলতা আদৌ সহ্য করা, প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। নীতি-জ্ঞান, সহবৎ সম্বন্ধে সমর বড় সচেতন হয়ে ওঠে। আজকালকার হালচাল আজকালকার ছেলে হয়েও তার বড় চোখে লাগে, বিসদৃশ ঠেকে। আর মেয়েদের সম্বন্ধে যা দেখছে, শুনছে কহতব্য নয়—বড় বাড়াবাড়ি। স্বাধীন জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতায় পাড়ার অনেকগুলি মেয়ে স্বাধিকার-প্রমত্তা—কেবল সেজেগুজে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোনো মেয়েদের স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না আজকাল। তার প্রকাশ যেন নানাভাবে দৃষ্টি-কটু রকমে প্রকট। কথা প্রসঙ্গে দু'একবার সমর বাড়িতে এ সম্বন্ধে আলোচনা তুলেছিল। বাবা-মা সায় দিয়ে অসহায়ের মত কেবল বলেছিলেন, আর বলো কেন, দিন দিন যা হচ্ছে। যেমনি ছেলেগুলো, তেমনি মেয়েগুলো—কাকে কি বলবে।

আক্ষেপটা বড় করুণ, নিরুপায়ের স্বীকারোক্তি। বাবা-মার কথার সুরে একজনের কথা সমরের মনে পড়ে যায় পাড়ার বিখ্যাত পাজী টকাই। সামনাসামনি কেউই তার সমালোচনা করতে সাহস করতো না—আড়ালে আবডালে যেটুকু বলে নেওয়া যায়, গায়ের জ্বালা মেটে। সমরদের বড় কৌতুক বোধ হতো—টকাই-এর কাছে আচ্ছা জব্দ। আজকে বাবা-মা আর আর বয়স্কদের বোধ হয় সেই অবস্থা রাস্তাঘাটে টকাইরা অভিযান আরম্ভ করেছে। সমর লক্ষ্য করেছে, বাণী কিন্তু কোন কথা বলেনি বরং কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

সমরের জেদ চেপে যায়। কঠোর সমালোচনা করেঃ ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে চাকরি করছেন বলে সাপের পাঁচ পা দেখেছেন সব, যত সব বেয়াড়া চাল।

যেন খুব একটা পুরণো প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন হয়েছে। একতরফা সমালোচনা তেমন জমে না। বাবা শুধু মন্তব্য করেন, কালের গতি, আরো কত কি হ'বে কালে কালে।

দাদাকে বাণীর বড় বুড়োটে মনে হয়। যুদ্ধে গেলে মানুষগুলো এমনি হয় না কি। দাদার আর কথা নেই? যুদ্ধফেরৎ দাদাকে যতটা 'ইণ্টারেসিটং' মনে হয়েছিল এখন আর তা মনে হয় না। দাদা যেন দোষ ধরবার জন্যে দেশে ফিরে এসেছে। সময় সময় বড় খারাপ লাগে।

'ডিসিপ্লিন' সম্বন্ধে সমর প্রায়ই ছোট-খাটো বক্তৃতা দেয়। এ যুগে শৃংখলাই মানুষকে নতুন পথ দেখাতে পারে। বাঙালীর এত বদনাম কেন? জাতটা আদৌ শৃংখলা মানে না। আজ যা হয়েছে সব ডিসিপ্লিন না মানার জন্যে। চাবকে বেয়াদপদের ঢিট করে দিতে হয়। যা ইচ্ছে করলেই হলো। লঘু গুরু জ্ঞান নেই।

মুশকিল হয়েছে বাণীর—দাদার বক্তৃতার সব ঝাঁঝটুকু তাকেই সহ্য করতে হয়। অথচ এ বিষয়ের গুরুত্ব সে একেবারে উপলব্ধি করে না। দাদা যেভাবে পরিবর্তন লক্ষ্য করছে, সে সেভাবে দেখে না—কিসের অন্যায়? কি অন্যায়? মেয়েরা চাকরি করছে বলে কি দাদার যত গায়ের জ্বালা। পাড়ার বুড়ো জেঠা-কাকাদের মত দাদাকে কেবল ছিদ্রান্বেষী মনে হয় বাণীর। এমন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নিয়ে দাদা যে কেন মাথা গরম করে আছে কে জানে। যুদ্ধে গিয়ে কার মাথা কিনে রেখেছে। ছোড়দার কথাই ঠিক।......

পাড়ার একমাত্র মুদিখানা দোকান দশকর্মা ভাণ্ডারের এখন নতুন নামকরণ হয়েছে—'পদরেণু।' চেনাই যায় না এই সেই। পাশাপাশি আরো দুখানা ঘর নিয়ে দোকানটা বড় হয়েছে, আত্মসাৎ করা ঘর দুখানার আগে একখানায় ছিল উড়েনী লক্ষ্মীর মুড়ি-মুড়কী আর তেলে-ভাজার দোকান আর একটায় ছিল কালীঘাটের বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী হাফিজের বিড়ির কারখানা এবং আড়ৎ—রাস্তা থেকে গুটিকয়েক বিড়ি শ্রমিকের অষ্টপ্রহর মাথা নাড়া, দেহ চালনা দেখা যেত; মাকড়সার জালের অভ্যন্তরের মত গুটিকয়েক ছায়া সগুঞ্জরনে থর থর করে কাঁপতো—পথচারীর চোখে ঝিম ধরতো। দোকানে রেডিও বাজছে, ভেতরে আড্ডাও

চলছে, কিন্তু আশেপাশে কোন মালপত্তর বড় একটা চোখে পড়ে না। দ্রষ্টব্যের মধ্যে দু-চারটে মুশুর ডাল, কিছু শুকনো লঙ্কা-হলুদ, দু-চারখানা চুণের ঢেলার মত সাবান, সুতোয় গাঁথা গুটিকয়েক চায়ের প্যাকেটের মালা, কিছু তেজপাতা আর পোকায়-খাওয়া ছোলা-মটর।

এতেই নাকি দোকানের মালিক শ্রীগোপীজনবল্লভ বাগের রমরমারম্। শোনা যায়, তিনি অনেক পয়সা করেছেন—টালিগঞ্জে সাত কাঠা জায়গা কিনেছেন, দেশে পুকুর কাটিয়েছেন, ওয়ার ফণ্ডে মোটা টাকা দিয়েছেন, পাড়ার লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। আর কি চাই? যারা একসময় দোকানটার হীন অবস্থা দেখে ঠাট্টা করতোঃ বাগ মহাশয়, ও-ঠাঁট বজায় রেখে লাভ কি, তুলে দিন! —তারাই আজ রেডিওর গান শুনে, দুষ্প্রাপ্য বস্তু দুর্মূল্যে পেয়ে খুশি হয়ে চলে যায়, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ। জানতুম, মিথ্যে ঘোরাঘুরি বাগ মহাশয়ের কাছেই পাব।

শুনে বাগ মশায় হাসেন না, ভবিষ্যতে ক্রেতাকে আসবার জন্যে অনুরোধও করেন না—অম্লানবদনে অগ্নিমূল্যটা হাত পেতে নেন। ওদিকে রেডিওর গানের গণ্ডগোলে ক্রেতা আর কি কি বস্তুর দুষ্প্রাপ্যতা জানায়, শোনা যায় না—বাগ মশায়ের ঘাড় নাড়াটা কেবল দেখা যায়, যার অর্থ হাঁ-ও হয় আবার না-ও হয়।

আশ্চর্য নির্লিপ্ত পুরুষ হয়েছেন এই বাগ মশায়! যে লোক একদিন পাড়ার ঘরে ঘরে মাল পেঁছে দেবার জন্যে মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন ছোটাছুটি করেছেন, বাড়ির চাকর থেকে আরম্ভ করে কর্তার পর্যন্ত পায়ে ধরতে বাকি রেখেছেন, সেই লোক এখন একেবারে দোকানের নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে ওঠেন না। 'হিজ মাস্টারস ভয়েসের' কুকুরের মত সর্বক্ষণ রেডিও মুখে দিয়ে বসে আছেন। 'আজিকার ভাবধারা থেকে বাজার-দর পর্যন্ত বাগ মশায় দোকানে স্বশরীরে বর্তমান থাকেন। পাশের আড্ডাটায় তিনি ইচ্ছেমত কখনো কর্ণপাত করেন, কখনো করেন না। মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে মুখখানাকে গোলআলুর মত করেন—হাসিটা আত্মিক, না আত্মতৃপ্তির বোঝা যায় না।

আজকাল কেউ আর বাগ মশায়কে দোকান তুলে দিয়ে হরিনাম করবার কথা বলে না, বরং দুবেলা দোকানটার পাশ দিয়ে হাঁটবার সময় মাথা নেড়ে আত্মীয়তা এবং পরিচয়ের সূত্রটা পাক দিয়ে মনে মনে বাপান্ত করেঃ ছোট-লোকের পয়সা হয়েছে—বেটাকে ধরিয়ে দেওয়া যায় না!

দোকানে চাহিদামত জিনিসপত্র চোখের ওপর না-থাকার দরুণ অভিযোগ বা আক্ষেপ করলে বাগ মশায় বিশেষ একটি স্বরগ্রামে ক্ষোভ প্রকাশ করেনঃ আনবো কি, শালারা চারগুণ দাম চায়! নেবেন আপনারা? ওসব অধর্ম আমার দ্বারা হবে না, প্রাণ থাকতে নয়।

তবুও লোকে সময়ে-অসময়ে বাগ মশায়েরই শরণাপন্ন হয়—বাগ মশায় প্রাণপাত করে ধর্মাচরণ করেন। কি করবেন, লোকের যদি উপকার হয়। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত 'পদরেণু' (রীতিমত দোকান) পাড়ার অভাব-অভিযোগ মেটায়—শুকনো লঙ্কা, মুশুর ডাল, তেজপাতা রৌদ্রদগ্ধ বালির মত লোকের চোখের ওপর পড়ে থাকে, চায়ের প্যাকেটের মালাটা প্রতিদিন সূর্যোদয় আলিঙ্গন করে বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

দোকানে যারা আড্ডা জমায়, তারা 'কণ্ট্রোলের' শ্রাদ্ধ করে। সর্ববাদিসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, যত দুঃখ-কষ্টের মূল হচ্ছে ঐ শালার কণ্ট্রোল। স্বাধীন ব্যবসা করতে না দিলে কখনো খাওয়া-পরার দুঃখু ঘোচে। তাওতো কণ্ট্রোলের ছিরি ঐ—চাল আছে তো আটা নেই, চিনি আছে তো তেল নেই! বেলেল্লাকারী যা করছে।

গভর্নমেণ্ট কণ্ট্রোলের অকিঞ্চিৎকরতা নিয়ে বিদ্রূপের হাসিটা এত মুখে ঝলসিয়ে ওঠে যে, 'রেডিও সেট'টার গান থেমে যাবার উপক্রম হয়। বাইরে থেকে শতাধিক বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল শূন্যগর্ভ দোকানটা দন্তহীন প্রেতের হাসির মত দেখায়। বাগ মশায় এখন পাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি—কাজে-কর্মে, দায়-দফায় তাঁর নাম নিতে হয়। দুর্দিনের পরোপকারী বন্ধু তাঁর মত পাড়ায় আর কেউ নেই। খালাভাবে কারো রক্তাল্পতা দেখা দিলে বাগ মশায় বাঘের মুখে গিয়ে দুধ আনতে ভয় পান না। অবশ্য মূল্যটা উপযুক্ত হওয়া চাই।

সমর ক'দিন লক্ষ্য করছে, পাড়ার ছেলে-বুড়োর আড্ডাটা আজকাল বাগ মশায়ের দোকানেই বসছে। বাগ মশায়কে ঘিরে একটা ছোটখাটো সভা সকাল-সন্ধ্যা জমে ওঠে। সমর ভাবতে পারে না, এই ক'বছরে বাগ মশায় এত মধু সঞ্চয়ন করলেন কি করে। যে-দোকানে কোন মালপত্তর নেই, সেই দোকানের দোকানী কি করে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে? ওরা কিসের লোভে বা লাভে বাগ মশায়কে ঘিরে থাকে? এক কথায় যার নাম মনোরঞ্জন, তবে কি তাই! এতটুকু মর্যাদা জ্ঞান নেই কারো।

বাগ মশায় দু'একদিন সহাস্যবদনে সমরকে অভ্যর্থনা করলেন। প্রথম দিন তো সমর দেখতে না পাওয়ার ভাণ করে চলে গেল। কিন্তু বাগ মশায় অমায়িকতায় নাছোড়বান্দা—দ্বিতীয় দিনেও ডাকলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমরকে আসতে হলো; কিন্তু দোকানে ঢুকলে না—বাইরে দাঁড়িয়ে আলগোছা কথা হলো।

রেডিওর ব্যাকগ্রাউণ্ডে বাগ মশায় জিগ্যেস করলেন, তারপর ফিরলে বুঝি?

হঠাৎ 'তুমি' সম্বোধনে সমরের কান গরম হয়ে উঠলো—আস্পর্ধা তো কম নয়! বেটা মুদী! মুখ রাঙা করে সমর জবাব দিলে, হুম্?

এখন বাড়ি আছ তো? একদিন শুনবো ভাল করে যুদ্ধের খবর! বাগ মশায়ের আগ্রহটা রসিয়ে ফোকলা দাঁতে হাসি ফোটালে।

রাগে সমরের গা রিরি করতে লাগল। যুদ্ধের খবর শুনে কৃতার্থ করবেন। শালাকে ঠাস করে এক চড় মারতে হয় যেন কাকাখুড়ো কথা বলছেন! কিন্তু মুখে রাগ প্রকাশ করতে পারলে না। 'আচ্ছা'! বলে পিছন ফিরলে।

পিছন থেকে বাগ মশায় চেঁচিয়ে বললেন, একদিন আসচো তো? নিরিবিলি শোনা যাবে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বিবরণ—"

ছুটে এসে ঘুষি মেরে মুখ ভেঙে দিলেও সমরের রাগ যায় না; ওর চাকর আমি—তুমি! হোক বয়েসে, বড় তবু তো মুদী—সেদিনও সমীহ করতো, আজ সমীহ করবে না কেন? পয়সার গরম? অহঙ্কারায় লোকটা মাথায় উঠেছে একেবারে। রাগ হয় পাড়ার ছেলে-বুড়োর ওপর, কেন ওকে এত প্রশ্রয় দিয়েছে! ইচ্ছে করে, লাথি মেরে রেডিও সেটটা ভেঙে দিয়ে ওখানে যে কজন বসে আছে গালে চার চড় লাগিয়ে দেয়। একটা সামান্য মুদীর এতদূর আস্পর্ধা! বাগ মশায়ের শুদ্ধ কথা প্রয়োগে রাগটা যেন আরো বেশী হয় সমরের।

দুবেলা দোকানটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসবার সময় সমর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। অদ্ভুত একটা মানসিক ক্রিয়া বোধ করে একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশ বুকের মধ্যে আছাড় খেয়ে সমস্ত অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয়—কেন ওর অতো পয়সা হবে? প্রভাব-প্রতিপত্তি হবে? কি দরের লোক ও? আর বাগকে দেখলেই রজনী জোঠার কথা মনে হ'বেই—সম্মান পাওয়া কার উচিত? তুলনাটা বড় করুণ মনে হয়। মর্মান্তিক পরিবর্তন!

যুদ্ধে যাবার আগে বাগ মশায়ের সঙ্গে পাড়ার লোকের মনোমালিন্যের কথা মনে পড়ছে। লোকটার একটা স্বভাব ছিল, বেছে বেছে যত রাজ্যের পচা জিনিস এনে দোকানে রাখতো। গাল মন্দকে গ্রাহ্যই করতো না, বরং এমন অম্লান বদনে হাত কচলাতো যে গালাগাল দিতে এসে শেষ পর্যন্ত তারাই লজ্জা পেত—পুরোনো পচা জিনিসের বিকিকিনির কোনই উন্নতি হতো না, পাড়ার লোক বসে বলে অধঃক, বাগ মশায় শুনে শুনে যেতো, ও'রা আর কত বলবেন? গালাগাল অসহ্য হ'লেও বাগ মশায় কাউকে কোনদিন কিন্তু বলেননি, পছন্দ না হয় অন্য জায়গা থেকে নিন। বরং মূক ভাষায় বলতে চেয়েছেন, গালই দেন আর মন্দই বলেন, গরীবটাকে পায়ে রাখবেন।

সমরের মনে পড়ে একবার বাণীর বোধ হয় কি অসুখ করেছিল। পারতপক্ষে প্রয়োজনীয়

কোন জিনিসই বাগ মশায়ের দোকান থেকে সে নেয় না। সেদিন কি মনে করে বাজারে না গিয়ে বাগ মশায়ের দোকান থেকে এক বাক্স শটি নিয়ে গেল। ঘণ্টা তিনচার পরে ফিরে এসে বাগ মশায়ের মুখের ওপর শটির খোলা বাক্সটা তুলে ধরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে, এটা কি? দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ।

জ্বলজ্বল করে চেয়ে বাগ মহাশয় স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলেন, পোকা হয়েছে?

সমর খিঁচিয়ে বললে, তবে দিয়েছিলে কেন? রেখেচো কেন? পোকা হয়েচে! লজ্জা করছে না?

বাগ মশায় উত্তর দেননি আর। শটির বাক্সটা নিয়ে তাকে তুলতে গেলেন কেবল। সমর ধ্যাঁ করে বাক্সটা কেড়ে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলে—সংগে সংগে ছুটে গিয়ে তাকের ওপর যত বাক্স ছিল টান মেরে বাইরে ফুটপাতে ছড়িয়ে দিলে। মুহূর্তে কি যেন একটা হ'য়ে গেল—কাজটা করে ফেলে সমর একটু যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছে! এতটা না করলে হ'তো!

বাইরে ফুটপাথের ওপর ছড়ান জিনিসগুলোর দিকে কেমন এক রকম করে চেয়ে থাকতে থাকতে বাগ মশায় কৈফিয়তের সুরে বলতে লাগলেন জিনিসগুলো ভালই ছিল, আপনারা নেননি কি না তাই—

সেই জন্যে পচা জিনিস থাকবে! হয়তো এক চড়ই মেরে বসতো সমর। বাইরে ভিড় থেকে নানারকম মন্তব্য শোনা গেল। কেউ সমরের কাজকে সমর্থন করলে, কেউ বা আবার এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়নি বলে বাগ মশায়ের ক্ষতির প্রতি সমবেদনা জানালে। না নিলেই ফুরিয়ে যেত—নষ্ট করবার কি অধিকার আছে সমরের? দেনা-পাওনার ব্যাপারে কথাটা হয়তো সত্যি, কিন্তু মানব ধর্মে একেবারে অচল, সুবিধাবাদ!

বাগ মশায় নীচু সুরে অপরাধীর কণ্ঠে একটানা বলে যেতে লাগলেন, আপনারা নেন না—অনেকদিনের জিনিস তাই!

সমর কেমন লজ্জা পেয়ে গেল। বাগমশায় জনতার সমবেদনা আদায় করে' ফেলেছেন। লঘু পাপে লোকটাকে গুরু দণ্ড দেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়! অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এসে জনমতের চাপে ইতিপূর্বে সমর কোনদিন এত লজ্জা পায়নি। সেদিন পালিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছিল।

পরে একটু যেন অনুশোচনাও হয়েছিল। গরীব মানুষ সামান্য ব্যবসা! ক্ষতি না করে ধমকে দিলে হ'তো। চুপি চুপি ক্ষতিপূরণ করতে এসে সমর লজ্জার একশেষ হ'য়ে গেল। অমন নিরীহ একটা লোক যে ওভাবে শোধ নেবে সমরের কল্পনাতীত ছিল—সকাল বেলা অতো অপমান হবার পরও। টাকা ফেরৎ দিয়ে অতি বিনীতভাবে বাগমশায় জিভ কেটে বললেন, ইস, একি করছেন! না, না।

সমরের মুখ দিয়ে কথা সরেনি—প্রসারিত হাতটা কাঁপছিল যেন।

বাগমশায় যেন নিজেকে ধমকালেন, বেশ করেছেন, ঠিক করেছেন, খারাপ জিনিস ফেলে দিয়েছেন, তার আবার ক্ষতিপূরণ কি! পাড়ার মধ্যে দোকান করেছি আপনাদের আশীর্বাদে—খারাপ দেখলে বলবেন বৈ কি, একশবার বলবেন! না না, অধম্মের জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হ'বে বৈকি! অন্যায় দেখলে ভবিষ্যতেও বলবেন, আপনারা জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তি! জ্ঞানী বুদ্ধিমান কথাটা খোঁচার মত শোনাল। বাগমশায় কিছুতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেননি সেদিন। প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে নিজেকে সমরের এত ছোট মনে হয়েছিল যে, বলবার নয়। একটা নৈতিক অপরাধ বোধে বিনা প্রতিবাদে সমরকে কিছুদিন বাগমশায়ের দোকান থেকে দরকার মত জিনিসপত্তর নিতে হয়েছিল।

দশ বার বছর আগের ঘটনা, তবুও সমরের আজ ঘুরতে ফিরতে মনে পড়ছে। কে জানে, লোকটা এখনো সে ঘটনা মনে রেখেছে কি না! সেদিন রজনীবাবুতে আর গোপীজনবল্লভ বাগে বয়েসের বিশেষ পার্থক্য ছিল না, কিন্তু সম্ভ্রম এবং প্রতিপত্তিতে দুজনে আসমান জমীন ফেরাক ছিলেন, আর আজ? পায়ের তলায় মাটি আকাশকে ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে। বাগ মশায়ের দোকানে সেদিনের অনেক জ্যোতিষ্ক ধরা পড়েছে। কিছুতে এ পরিবর্তন সমর বরদাস্ত ক'রতে পারে না। বাগমশায়ের দোকানে আড্ডাটা দেখলে গা জ্বালা করে।

বালেশ্বর জিলার শ্রীমতী লক্ষ্মীর তেলেভাজা মুড়ির দোকানটাই বা কোথায়? 'হাফিজ ব্র্যাণ্ড' বিড়ির কারিগররাই বা কোথায় গেল? লক্ষ্মীর মুড়ি, কিন্তু সব সময় বেশ গরম মুচমুচে পাওয়া যেত—দোকানের একধারে উনুনের ওপর তেলে ভাজার কড়াটায় তেল কি কাল না ছিল, তরল আলকাতরা তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের একদিনও কড়ার গর্ভটা তৈলহীন দেখা যায়নি। কষ্টিপাথরে কোদাই মূর্তির মত লক্ষ্মীর গড়ন—দেহের অনাবৃত জায়গাগুলো 'উল্কি'র ছাপে কণ্টকিত। বিড়ি কারখানায় একজন কারিগরের সঙ্গে লক্ষ্মীর কি যেন একটা সম্বন্ধ ছিল। ভর্তৃহীন লক্ষ্মী। (ক্রমশ)

ভিনদেশী মেয়ে

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

ঝুন্ ঝুন্ ঝুনে পায়ে বাজে নূপুর,
রোদে পোড়া গ্রীষ্মকালের দুপুর।
কোন্ দেশেতে থাকো মেয়ে, কোন দেশেতে ঘর?
পায়ে পায়ে কাঁপিয়ে এলে কোন্ সে তেপান্তর?
কত দেশে ঝড় তুলেছে তোমার পায়ের নূপুর,
মেঘের ডাকে কেঁপে ওঠে কত দেশের দুপুর?
সাত সাগরের ঢেউ উঠেছে তোমার দু'টি পায়ে,
কাল বোশেখীর ঝড় নেমেছে তোমার সারা গায়ে;
হাওয়ায় ওড়ে গাছের পাখী, হাওয়ায় খসে লতাঃ
ভিন্ দেশী মেয়ে গো, তোমার কী যে মনের কথা!
ঝুন্ ঝুন্ ঝুনে পায়ে বাজে নূপুর,
রোদে পোড়া গ্রীষ্মকালের দুপুর।
কোন মন্ত্রে ঝড় উঠালে তোমার নাচের বোলে,
করতালে হাওয়া ছুটলো, মেঘ ডাকলো খোলে,
চোখের চাওয়ায় বজ্র জ্বলে, মাতন জাগে গাছে,
ভিন্ দেশী মেয়ে গো, তোমার কী যে মনে আছে!

ঝুন্ ঝুন্ ঝুন পায়ে বাজে নূপুর,
নাচের তালে ক্ষেপে ওঠে দুপুর।
আমার গাঁয়ের মাটি হলো তোমার নাচের আসর,
গাঁয়ের হাওয়ায় লেখা রইল তোমার দেহের ঝড়,
আমার গাঁয়ের আকাশ ফুঁড়ে তোমার দেহের প্রলয়ঃ
নূপুর নাচের ঝড়ো মায়ায় দেশ করেছ জয়।
শুধোবো না মেয়ে, তোমার কোন্ দেশেতে ঘর,
শুধোবোনা পেরিয়ে এলে কোন্ সে তেপান্তর।
মরাগাঙে বান ডাকালো তোমার দু'টি চরণঃ
ভিন্ দেশী মেয়েগো, তোমায় দিলাম আমার মন।

জেনারেল দ্য গলের পুনরাবির্ভাব

সম্প্রতি ফ্রান্সে ঊর্ধ্বতন আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। এই নির্বাচনের যে ফলাফল এ পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের যুদ্ধকালীন মুক্তি-আন্দোলনের নেতা জেনারেল দ্য গলের অনুগামীরা একক দল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অন্য দলনিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা অবশ্য পায়নি। তবু এই নির্বাচনে যে কৃতিত্ব তারা দেখিয়েছে তা রীতিমত বিস্ময়কর। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের বিজয় যেমন বিস্ময়কর, দ্য গল পন্থীদের এই বিজয়ও তেমনি কম বিস্ময়কর নয়। অবশ্য ট্রুম্যানের বিজয়ের মত বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া জেনারেল দ্য গলের এই বিজয়ের হয়তো নেই—কিন্তু ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব বড় কম নয়। যুদ্ধোত্তর যুগের বামপন্থী ফ্রান্স যে অতি দ্রুত দক্ষিণপন্থীর দিকে ঝুঁকে পড়ছে—এ বিজয় তারই পরিসূচক। যাঁরা ভেবেছিলেন যে, মুক্তিপ্রাপ্ত ফ্রান্সে চার্চিল-দোসর দ্য গলের রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটেছে—এই ঘটনায় তাঁদেরও বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না।

দ্য গল অবশ্য এখনও স্বতন্ত্র কোন দল গড়ে তোলেন নি। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জাতীয় বিপদের মুখে সমগ্র ফরাসী জাতিকে একত্রীভূত করার উদ্দেশ্যে "র‍্যালি অব দি ফ্রেঞ্চ পিপল" বা ফরাসী জাতির একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনটি এখনও পুরোপুরি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়নি। এই সম্মেলনের তরফ থেকেই দ্য গলপন্থীরা এই সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেন এবং প্রথমবারেই যে কৃতিত্ব তাঁরা অর্জন করেছেন, সেটা রাজনৈতিক দলকোঁদলে ফ্রান্সে কৃতিত্বের বিষয় বৈকি! ফ্রান্সের ঊর্ধ্বতন পরিষদের আসন-সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ৩২০টি। তার মধ্যে ২৬৯টি আসনের জন্যে সম্প্রতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বাকি ৫১টি আসনের জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে পরে। এই ৫১টি আসন ফ্রান্সের শাসিত মরক্কো, ইন্দোচীন, মাদাগাস্কার প্রভৃতি রাজ্যগুলির জন্যে সংরক্ষিত। এ পর্যন্ত প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় যে, দ্য গলের অনুগামীরা পেয়েছেন ১১৯টি আসন, সোস্যালিস্টরা পেয়েছে ৪৭টি, র‍্যাডিক্যাল দল ৪৬টি, স্বতন্ত্র ১৯টি, কমিউনিস্ট ১৬টি, পপুলার রিপাবলিকান ১৪, পি আর এল ৩টি ও অন্যান্য ৭টি। নির্বাচনে সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছে কম্যুনিস্টরা। ইতিপূর্বে এই পরিষদে কম্যুনিস্টদের সংখ্যা-শক্তি ছিল ৯১টি। সুতরাং ঊর্ধ্বতন পরিষদের

নির্বাচনের এই ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, ফ্রান্সের জনমত এখন চরম বামপন্থা থেকে চরম দক্ষিণপন্থার দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তার ফলে বিপদগ্রস্ত হতে চলেছে মধ্যপন্থী মঃ কোয়েলির বর্তমান সোস্যালিস্ট গভর্নমেণ্ট। ফ্রান্সের এই ঊর্ধ্বতন পরিষদটি ইংল্যাণ্ডের হাউস অব লর্ডসের মত ততটা শক্তিহীন নয়। সুতরাং নিম্নতন পরিষদের উপর এ নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য এবং এর পরোক্ষ ফলস্বরূপে যদি কোয়েলি গভর্নমেণ্টকে পদত্যাগ করতে হয়, তবু বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। দ্য গলপন্থীদের পক্ষে দক্ষিণ-পন্থী একাধিক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঊর্ধ্বতন আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা আদৌ কষ্টসাধ্য হবে না। আর কয়েক-দিনের মধ্যেই ঊর্ধ্বতন আইন পরিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হবে। সে নির্বাচনে জেনারেল দ্য গল স্বয়ং যদি প্রেসিডেণ্টের পদে বসতে পারেন, তবে তো কথাই নাই। তাঁর মত সুকৌশলী নেতা সহজেই একটা স্থায়ী সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং এইভাবে নিম্নতম পরিষদের কাজে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন। ফরাসী শাসনতন্ত্রের বর্তমান আইনানুসারে ঊর্ধ্বতন পরিষদ যে কোন আইনের সম্বন্ধে সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারে এবং সে প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হলে নিম্নতন আইন পরিষদে মূল প্রস্তাবকে পুনরায় অন্য দল-নিরপেক্ষ ভোটাধিক্য গ্রহণ করাতে হয়। একাধিক দলের সংমিশ্রণে গঠিত মঃ কোয়েলির বর্তমান গভর্নমেণ্ট সর্বদা এরূপ ভোটাধিক্য পাবেন—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

দ্য গল হারানো শক্তি ফিরে পাবার জন্যে অর্থাৎ পুনরায় ফ্রান্সে নিজের শাসন প্রবর্তনের জন্যে গত বৎসরাধিক কাল চেষ্টা করে আসছেন। নিম্নতন পরিষদ ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্বাচন হোক—এই তাঁর প্রধান কাম্য। নানা কৌশলে চেষ্টা করেও এ পর্যন্ত তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন নি। এবার তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেও হতে পারে। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে গভর্নমেণ্ট রদবদল একটা রোগবিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার কোয়েলি গভর্নমেণ্টের পতন ঘটলে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে গভর্নমেণ্ট গঠন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও দ্য গলের এই রাজনৈতিক পুনরাবির্ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করছে। মধ্য-পন্থী সরকারের সোস্যালিস্ট শিল্প পরিকল্পনা এ পর্যন্ত আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি বলে ফরাসী জাতির একাংশ এ গভর্নমেণ্টের উপর বিরূপ হয়ে উঠেছে। গভর্নমেণ্ট আশানুরূপভাবে জীবনধারণের ব্যয় কমাতে পারছেন না, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ব্যাপক কয়লা ধর্মঘটের ব্যাপারেও গভর্নমেণ্ট যথেষ্ট কড়া কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারেন নি। এই সব কারণেও ফরাসী জনমত বিরূপ হয়ে উঠেছে এবং দ্য গল তার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে তাদের অধিকৃত জার্মানীতে জার্মানদের হাতে কয়লা, লৌহ প্রভৃতি মূল-গত শিল্পের কর্তৃত্ব-ভার তুলে দেবার যে প্রস্তাব করা হয়েছে—সেটাও পরোক্ষভাবে দ্য গলকে সাহায্য করবে। দ্য গলের জার্মানবিদ্বেষ সুপরিচিত এবং ফ্রান্সের জনগণের মনেও তীব্র জার্মানবিদ্বেষ বর্তমান। ইঙ্গ-মার্কিনদের ঘোষিত কর্মনীতির পটভূমিকায় ফরাসী জাতির এই জার্মানবিদ্বেষের পূর্ণ সুযোগ তিনি নেবেন। একদিকে সরকারী দুর্বলতা, অপর-দিকে কম্যুনিস্টদের আপোষবিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতা—এই দুটির সংঘাতের ফলে দ্য গল যদি অদূরভবিষ্যতে পুনরায় ফ্রান্সের শাসন-গদীতে বসেন, তবু বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

ম্যালান গভর্নমেণ্টের স্বরূপ

দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যালান গভর্নমেণ্টের ফ্যাসিস্ট নীতি নিয়ে পুনরায় সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে টানা-হেঁচড়া আরম্ভ হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ম্যাণ্ডেটশাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা নিয়েই এ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এ আলোচনায় সরাসরি ভারতীয়দের ভাগ্য অবশ্য বিজড়িত নেই। যাদের ভাগ্য বিজড়িত আছে, তারা হল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হেরে রোস প্রভৃতি আদিম জাতি। সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের অছি পরিষদে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। প্রবাসী ভারতীয়দের ব্যাপারে ম্যালান গভর্নমেণ্ট যে কি ধরণের ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্যবহারের পরিচয় দিচ্ছেন তার সংবাদ আমরা সকলেই রাখি। প্রবাসী ভারতীয়দের মুখপাত্র ডাঃ দাদু ও ডাঃ নাইকারের ছাড়পত্র নিয়ে ম্যালান গভর্নমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী ডাঃ ডোঙ্গেসের অপকীর্তির কথা আজ বিশ্ব-বিদিত। সম্প্রতি আবার রেভারেণ্ড মাইকেল স্কটের ছাড়পত্র নিয়ে একই ব্যাপার ঘটেছে। এই উদারচেতা শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজক দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বর্ণবৈষম্যের অবসান চান এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন

চালিয়ে আসছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অশ্বেত অধিবাসীদের দাবী সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের দরবারে উপস্থাপিত করার জন্যে তিনি প্যারী যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকেও যাবার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

একমাত্র ভারতীয়দের নির্যাতন করেই কিন্তু ম্যালান গভর্নমেণ্ট নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় সরাসরি তাঁদের শাসনাধীনে যেসব ভারতীয় ও আফ্রিকাবাসী আছে, তাদের তো তারা পারিয়ার মত করে রেখেছেনই—এবার তাঁরা নজর দিয়েছেন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার দিকে। ১৯১৮ সালের পূর্বে এই রাজ্যটি ছিল জার্মানী শাসিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের ফলে এই রাজ্যটি তাঁর হস্তচ্যুত হয় এবং জেনেভার জাতিসংঘ প্রবর্তিত ম্যাণ্ডেট-শাসনের বলে এই রাজ্যটিকে শাসন করার ভার পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্টের উপরে। তদবধি দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেণ্টই এই শাসন পরিচালনা করে আসছেন। কিন্তু প্রায় তিরিশ বৎসর কালের শাসনে তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য বিষয়ক উন্নতি-বিধানে কোন কৃতিত্বই দেখাতে পারেন নি। বরং জাতিবিদ্বেষপ্রণোদিত সরকারী কর্ম-নীতির ফলে এই রাজ্যটির অশ্বেত আফ্রিকা-বাসীরা ক্রমিক অবনতির পথে এগিয়ে চলেছে। উন্নতি যা কিছু হচ্ছে সেটা হচ্ছে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গদের। শ্বেতাঙ্গরা মোট অধিবাসী-সংখ্যার মাত্র দশভাগের একভাগ হলেও সব কিছু সুখ-সুবিধার অধিকারী তারা। দেশের শতকরা ৫৮ ভাগ জমির মালিক তারা। আর আফ্রিকাবাসী হেরে রোসদের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। তাদের শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত করার কোন চেষ্টা হয়নি—দেশের শাসন-ব্যবস্থা পরি-চালনায় তাদের কোন হাত নেই—এমন কি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে ভোট দেবার সামান্য অধিকারও নেই তাদের। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধীন ম্যাণ্ডেট শাসিত অঞ্চল-গুলির ভার গ্রহণের জন্যেই বর্তমান সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের অছিগিরি প্রথার উদ্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক অছিগিরির অধীনে যেসব রাজ্যকে আনা হবে, তার প্রথমেই নাম করতে হয় এই সব ম্যাণ্ডেট শাসিত অঞ্চলের। অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ম্যালান গভর্ন-মেণ্ট দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে কিছুতেই আন্তর্জাতিক অছির হাতে তুলে দিতে সম্মত নন। এই নিয়েই মূল বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে।

বৎসরাধিককাল পূর্বে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সর্বপ্রথম অছিগিরি পরিষদের সম্মুখে

আসে এবং তখন অছিগিরি পরিষদের পক্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিক অছির শাসনাধীনে ছেড়ে দিতে হবে এবং এই রাজ্যটির বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় কোন রদবদল করার অধিকার দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্টের থাকবে না। সেই সঙ্গে আরও জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এই রাজ্যটির শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ন-মেণ্টকে অছি পরিষদের কাছে নিয়মিত বার্ষিক বিবরণ দাখিল করতে হবে। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার শাসন-কর্তৃত্ব ছিল স্মাটস গভর্নমেণ্টের হাতে। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই এ-প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তবু ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, ১৯৪৭ সালের ২৩শে জুলাই তারিখের লিখিত পত্রে স্মাটস গভর্নমেণ্ট সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা এই রাজ্যটিকে সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে কোন চেষ্টা করবেন না, ম্যাণ্ডেটের শাসন-নীতি অনুসারেই আপাতত শাসন-কার্য চালিয়ে যাবেন এবং সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের দরবারে বার্ষিক বিবরণ দাখিল করবেন। ১৯৪৭ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনেও অছি পরিষদের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিক অছির শাসনাধীনে আনতে হবে। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতির চাকা দ্রুত আবর্তিত হয়ে গেছে। তীব্র জাতি-বিদ্বেষের ভিত্তিতে ম্যালান গভর্নমেণ্ট নির্বাচন-বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা লাভ করেছেন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়েছেন। সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ম্যালান গভর্নমেণ্ট সরাসরি এই রাজ্যটিকে গ্রাস করার পরিকল্পনা করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিনিধি গ্রহণের যে প্রস্তাব সম্প্রতি ম্যালান গভর্নমেণ্ট করেছেন, তা হল এই দুটি রাজ্যকে সম্মিলিত করারই পূর্বাভাস। এই পররাজ্য গ্রাসের ফ্যাসিস্ট প্রয়াসের বিরুদ্ধেই শ্রীমতী বিজয়-লক্ষ্মী অছি পরিষদের সম্মুখে একটি নতুন প্রস্তাব এনেছেন। এই প্রস্তাবে দাবী করা হয়েছে যে, অবিলম্বে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় আন্তর্জাতিক অছির শাসন প্রবর্তিত করতে হবে এবং যতদিন সে শাসন প্রবর্তন সম্ভব না হয়, ততদিন দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্তমান শাসন-ব্যবস্থায় কোন রদবদল না করার নির্দেশ দিতে হবে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব যদি গৃহীত না হয়, তবে বুঝতে হবে যে, সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান আজ সত্যই একটি নির্বীর্য ও নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

১৪-১১-৪৮
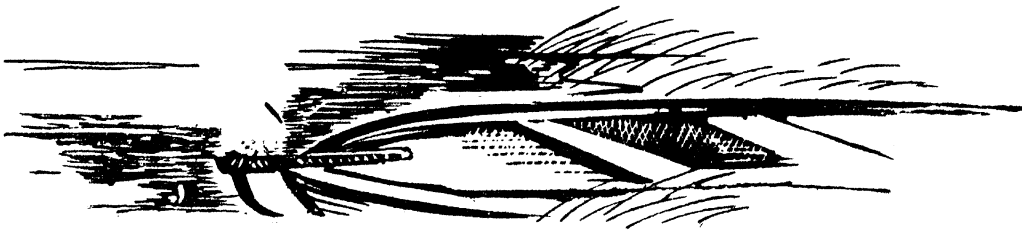
লক্ষ্মী বাণিজ্যে বাস করেন বলিয়া একটা কথা আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাঁরও বাণিজ্যবাস হইতে উদ্বাস্তু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে,—শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ নির্দেশ দিয়াছেন কংগ্রেসের নাম ভাঙাইয়া নাকি ব্যবসা করা চলিবে না।

* * * *

বোম্বাই সরকার নির্দেশ দিয়াছেন—প্রাথমিক শিক্ষকদের নাকি গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে।

"গুরু দক্ষিণার হার সম্বন্ধে অবশ্য তারা এখনো কোন নির্দেশ দেননি"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

গণ-পরিষদে আসামের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রোহিনী চৌধুরী নারীদের জন্য পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় নারীদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। নারীদের মধ্যে যাঁরা ট্রামে-বাসে ভ্রমণ করেন তারা নিশ্চয়ই শ্রীযুক্তা রায়ের সঙ্গে একমত নহেন।

* * * *

আমেরিকার খবর—ছয়টি শ্বেতাঙ্গ নিগ্রোদের সঙ্গে টেনিস খেলিয়াছেন এই অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন। জয় ডিমোক্রেসির জয়!!

* * * *

নির্বাচন প্রতিযোগিতায় ট্রুম্যানের জয়লাভের প্রতিক্রিয়া কলিকাতায় কিরূপ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় খুড়ো বলিলেন—"এখানে ট্রামের সীট এবং বাজারের মাছ অচিরেই সুলভ হবে এই আশায় সকলেই ধেই নৃত্য করছেন"।

American Poojah"—সহযোগী অমৃতবাজারের একটি সংবাদের শিরোনামা। সংবাদে বলা হইয়াছে স্টালিনের একটি মোমের মূর্তি একটি গহ্বরে স্থাপন করিয়া তার গায়ে পিন বিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে নাকি স্টালিন রাশ্যায় বসিয়া ছোরার আঘাতের বেদনা অনুভব করিবেন। খুড়ো মন্তব্য করিলেন—"আমেরিকা হয়ত অচিরেই এটাকে সার্বজনীন পূজোয় পরিণত করবেন। কিন্তু সত্যিকারের স্টালিনকে কি শুধু Pin prick করে ঘায়েল করা যাবে?

* * * *

আফগান সুদখোরদের ভারত ত্যাগ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়াছেন যে, কোন প্রাদেশিক সরকার এই সমস্ত সুদখোরদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে সন্দিহান হইলে তাঁরা যেন তৎক্ষণাৎ তা কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরীভূত করেন।

কিন্তু কোন প্রাদেশিক সরকার এদের কাছে টাকা ধারেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

* * * *

কায়রোতে আরব ও মুসলিম নেতাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে লিয়াকৎ আলি খাঁ সাহেব বলিয়াছেন—"আমরা আবহাওয়া

সম্বন্ধে আলোচনা করি নাই"। খুড়ো বলিলেন—"আবহাওয়ার হালচাল সম্বন্ধে যে খাঁ সাহেব ওয়াকেবহাল ন'ন এ কথা আমরা জানি"।

* * * *

এক সংবাদে প্রকাশ ডাউনিং স্ট্রীটে একটি ডিনার পার্টিতে পণ্ডিত জওহরলাল এবং মিঃ চার্চিল একসঙ্গে আহারাদি করেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন বাক্যালাপ হয় নাই। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন,—"Mr. Churchill spent most of the evening talking about his war reminiscences"—অনুমান করিতেছি চার্চিল সাহেবের আলোচনা তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত—"Second World War" সম্বন্ধেই হইয়াছে। পণ্ডিতজী উত্তরে

"Discovery of India" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে সংবাদদাতা নীরব।

* * * *

Tories Churchill's attack on India"—এই সংবাদ-শিরোনামাটি খুড়োকে পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"Thou too Brutus"!

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ কাস্পিয়ান সাগরের কোন এক স্থানে নাকি রাশ্যা আণবিক বোমা নিক্ষেপের পরীক্ষা করিয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন বোমাটি নাকি নির্ধারিত সময়ের আগেই ফাটিয়া গিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"এর পরেও আছে, সংবাদদাতা সে খবর সংগ্রহ করতে পারেননি অর্থাৎ সেটা—আণবিক বোমা নয়, দেওয়ালিতে ছুঁড়বার একটা পটকা মাত্র"।

* * * *

আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল জাপানকে যুদ্ধ-অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যারা military preparednessএর জন্য তোড়জোড় করিতেছেন তারা এই সংবাদে খুব খুশী হইয়াছেন।

* * * *

এ সপ্তাহেও আমরা আর একটি তারকা আবিষ্কারের সংবাদ পাইয়াছি। আবিষ্কার করিয়াছেন অস্ট্রেলিয়া। এই তারকাটির নাকি কোন আলো নাই, শুধু বিদ্যুৎতরঙ্গ বিকিরণ করে।

আমাদের পরিচিত তারকা—আলো নেই, শুধু—"Shock"!

বর্তমানের সবচেয়ে লম্বা মানুষ

ইউরোপের মধ্যে এখন সবচেয়ে লম্বা মানুষ বলে অনুমান করা হচ্ছে যাঁকে, তাঁর নাম অ্যাট্‌লাস ফারনাণ্ড ব্যাচেলার্ড। বাড়ি তাঁর বেলজিয়ামে—বয়স মাত্র ২৫ বছর। লম্বায় তিনি ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং তাঁর হাতের চেটো লম্বায় মাপ হচ্ছে ১১ ইঞ্চি, ওজন ৫ মণ

ছবির বাঁ দিকে মিঃ ব্যাচেলার্ড

২৪ সের। তিনি এখন স্ক্যানডিনেভিয়াতে বেড়াতে এসেছেন। বর্তমানে তাঁকেই পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ বলে গণ্য করা হচ্ছে। আমাদের দেশের ২৫ বছরের যুবকরা তাঁর চেহারাটা ছবিতে একবার মন দিয়ে দেখলে খুশি হবো।

চোরের লাগিয়া ধর্মবাণী!

নিউইয়র্কের ওয়েল্যাণ্ড-গীর্জার ময়দানের ঘাস কাটবার যন্ত্রটি সম্প্রতি চুরি গেছে। যন্ত্রটি চুরি যাওয়ার পর ঐ গীর্জার পুরোহিত—রেভারেন্ড এডেলবার্ট স্নিডারকে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করতে বলায় তিনি বলেছেন—"আমি মনে করি, যে চোরটি এই কার্য করেছে, সে বিবেকের দংশনে বিব্রত হয়ে ঐ ঘাস-কাটা কলটি ফেরৎ দেবে, আর তার যদি বিবেক বলে কিছু না থাকে, তাহলে আমি আশা করি সে তার আঙুলগুলি সব কেটে বসবে।" শেষ পর্যন্ত চোরটি কি করেছে, সে খবরটা পাইনি; পেলেই আপনাদের জানাবো।

দাঁত দিয়ে রাস্তা তৈরী!

অস্ট্রেলিয়ার এক খবরে জানা গেছে যে, সিডনীর এক নকল দাঁত ব্যবসায়ী মিঃ কেনেথ্ কেম্প তাঁর বাড়ির বাগানের গাড়ি চলার পথটি তৈরী করেছেন লক্ষ লক্ষ নকল দাঁত ফেলে। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, পাথর বা খোয়া দিয়ে ঐ রাস্তাটি তৈরী করতে হলে তাঁর অত্যন্ত বেশী খরচ হতো—তাই তিনি শেষ অবধি তাঁর নিজের বাড়িতে জমানো লক্ষ লক্ষ অব্যবহার্য নকল দাঁতগুলিকেই ঐ কাজে লাগিয়েছেন। লোকে তাঁর কাছে দাঁত বাঁধাতে আসেন—আর তিনি দাঁত দিয়ে পথ বাঁধান! একেই বলে সত্যিকার কেরামতী!

নরমাংস সের দরে বিকায়!

আপনারা সবাই খবরের কাগজে পড়েছেন—সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চ্যাঙচুন্ শহরটি চীনা কমিউনিস্টদের কবলায়িত হয়েছে। কিন্তু এই চ্যাঙচুন শহরটিকে কমিউনিস্টরা অবরুদ্ধ করে এমন অবস্থায় এনেছিল যে, প্রতিদিন সেখানে পাঁচশো করে নাগরিক না খেতে পেয়ে মরেছে। খাবারের অভাব সেখানে এমন হয়েছিল যে, কিছু না পেয়ে তারা ঐসব মরা মানুষ কেটে তার মাংস রেঁধে খেয়েছে। এমন কি জানা গেছে, শেষ পর্যন্ত সেখানে সওয়া ডলার অর্থাৎ প্রায় তিন টাকায় আধ সের মানুষের মাংস বিকিয়েছে। এ অবস্থায় মানুষকে এনে কমিউনিস্টরা তবে জয় করেছে মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী। সত্যিই কমিউনিস্টরাই মানবতার পূজারী!

—ভবঘুরে—

সাহিত্য-সংবাদ

নিখিল বঙ্গ প্রবন্ধ, জীবনী, গল্প ও চিত্র প্রতিযোগিতা

আগামী জানুয়ারী মাসে প্রবন্ধ, জীবনী, গল্প ও চিত্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিযোগিবৃন্দকে আগামী ১৫।১২।৪৮ তারিখ বুধবারের মধ্যে প্রতি বিষয়ের জন্য ছয় পয়সার ডাক টিকিট সহ স্কুল বা কলেজের প্রধানের স্বাক্ষর ও প্রতিষ্ঠানের শিলমোহরসহ বিষয়গুলি পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বিষয়

প্রবন্ধ :—(সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফুলস্কেপ ছয় পাতার মধ্যে) বাঙলার বর্তমান পরিস্থিতি ও যুব সমাজ।

জীবনী :—(প্রবেশিকা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে) অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গল্প :—(নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, ফুলস্কেপ চার পাতার মধ্যে) যে কোন বিষয়ে।

চিত্র :—(সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, ১২×১০ ইঞ্চি কাগজে পেন্সিলে আঁকিতে হইবে) বাঙলার কোন মহাপুরুষের আবক্ষ আলেখ্য ও জবাকুল (লাল)।

—প্রচার সম্পাদক, তরুণ সংঘ
(ঝোড়হাট),
পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া।

শহীদ যুগল—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বি সিংহ ব্রাদার্স, ৩৮নং কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

গ্রন্থটি প্রধানত প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু এই শহীদ যুগলের জীবন কাহিনী হইলেও সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ইতিহাস যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে গ্রন্থটিতে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙলার এই শহীদ যুগলের সম্বন্ধে সত্য তথ্য প্রকাশ করিবার জন্য লেখক অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার ব্যাপক অনুসন্ধিৎসাও বিশেষ প্রশংসনীয়। লেখক গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ না করিয়া স্বয়ং যত্নপূর্বক দুষ্প্রাপ্য পত্রিকাদি ঘাঁটিয়া ও অন্যান্য নানা সূত্রে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বইটিতে সংকলিত করিয়াছেন। এজন্য বইটি যে সমধিক মূল্যবান হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। বইটি অনেক দুষ্প্রাপ্য চিত্রাদিতে সমৃদ্ধ। ২১।১।৪৮

THE REFUGEE PROBLEM OF BENGAL AND INDICATION OF ITS SOLUTION.—By Monoranjan Chaudhury, The Servants of Bengal Society, 48, Amherst Street, Calcutta. Price Rs. 2/- only.

বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা গুরু সমস্যা হইতেছে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা। দেশের চিন্তানায়কদিগকে আজ এই সমস্যাই সর্বাধিক ভাবাইয়া তুলিয়াছে এবং সকলেই ইহার সমাধানের জন্য বিব্রত ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে এই সমস্যার নানা দিক অতি যত্নপূর্বক পর্যালোচনা করা হইয়াছে এবং সমস্যা সম্পর্কে ভাবণীয় ও করণীয় অনেক মূল্যবান বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। তথ্যের দিক হইতেও বইটি বিশেষ মূল্যবান। ২১।৯।৪৮

বীরাঙ্গনা—একালের ও সেকালের। শতদল বিশ্বাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা।

এই গ্রন্থে একালের কস্তুরাবাঈ গান্ধী, কমলা নেহরু, সরোজিনী নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, অরুণা আসফ আলী এবং সেকালের সুলতানা রাজিয়া, রাণী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এই কয়জনার জীবনরেখা চিত্রিত করা হইয়াছে। অল্প কথায় ইঁহাদিগকে বুঝিবার পক্ষে বইটি উপযোগী হইয়াছে। ২৭।১।৪৮

সপ্তর্ষির কথা—শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

"সপ্তর্ষির কথা"য় মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সদার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী এবং কায়েদ আজম মহম্মদ আলী জিন্না এই সাতজনের জীবনী আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনা নিছক বর্ণনাত্মক না হইয়া কতকটা বিশ্লেষণাত্মক হওয়ায় বইটি পাঠকদের নিকট চিত্তাকর্ষক বোধ হইবে। ২৬।৯।৪৮

রক্তকমল—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী প্রণীত। ঘাগড়া (মুর্শিদাবাদ), বিমলা পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা। বাইবেল নিউ টেস্টামেণ্টের অন্তর্গত যীশুখৃষ্টের ও তদীয় শিষ্যবৃন্দের নানা ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত ...টি গাথা-কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

কবিতাগুলির ছন্দ সুললিত, ভাষা মাধুর্যপূর্ণ এবং ভাব শান্ত প্রসাদগুণসম্পন্ন। বইটি সৎ চিন্তার দ্যোতক। কাজেই উহা পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ২৬।১।৪৮

রহস্যমালা—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থজগৎ, ৫২।১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

পাঠক মহলে ডিটেকটিভ গল্পসমূহ পরিবেশনের উদ্দেশ্য লইয়া 'রহস্য মালা' প্রকাশ করা হইতেছে। উহা সাপ্তাহিক পত্ররূপে বাহির হইতে থাকিবে। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পত্রখানার প্রতি গোয়েন্দা সাহিত্য-পাঠানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ২৫।৯।৪৮

শ্রীশ্রীকালীকুল কুণ্ডলিনী—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ভুলুয়া বাবা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীহরিদাস ঘোষ, ৩।এ, ভৈরব বিশ্বাস লেন, বিডন স্ট্রীট, পোঃ কলিকাতা। প্রতি খণ্ড মূল্য তিন টাকা। দুই খণ্ড একত্রে পাঁচ টাকা।

ভুলুয়া বাবা ভক্ত সাধক এবং তত্ত্বদর্শী। সাধনার প্রভাবে যাঁহারা সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানি ১৩১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন পরে ভুলুয়া বাবার শ্রীশ্রীকালী কুণ্ডলিনী পুনঃ প্রকাশিত আকারে পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং পরম উপকৃত হইয়াছি। দুই খণ্ডে গ্রন্থখানি ৫২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। সাধক গ্রন্থকার ধর্মতত্ত্বের সার কথা সবই শুনাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির আলোকে সার্বভৌম উদার সত্য উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আলোচনায় কোথায়ও সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নাই।। সাধকদের পক্ষে তাহা থাকেও না। গ্রন্থকার নিজে মাতৃভাবের উপাসক; কিন্তু অখণ্ড সত্যের উপলব্ধিতে ভাবভেদ তাঁহার কাছে বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং এক সচ্চিদানন্দময় পরম তত্ত্বই তাঁহার দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। একই দর্শন, একই বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধি, মানব মহত্ত্ব উদ্বোধনে একই পরম প্রেরণা তিনি অন্তরে লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভুলুয়া বাবার গ্রন্থ পাঠে তিনি শাক্ত কি বৈষ্ণব, শৈব কি সৌর, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তন্ত্রের মাতৃ মাহাত্ম্যে তিনি যেমন মজিয়া গিয়াছেন, তেমনই ভাগবত এবং চৈতন্য চরিতামৃতের ব্যাখ্যা মুখে মাধুর্যরসে বিভোর হইয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সহজ সরল এবং সুমধুর, বিষয় বিশ্লেষণ এবং বিন্যাসের ভঙ্গী সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ। অযান্তর তার্কিকতা বা অস্পষ্টতার আড়ষ্টভাব এই ধরণের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া ভুলুয়া বাবা অধ্যাত্ম জ্ঞানের ভাণ্ডার সহজ পয়ারের ছন্দে সকলের কাছে উন্মুক্ত করিয়াছেন। সাধু এবং মহাজনগণের আচরণকে দৃষ্টান্তস্বরূপে উপস্থিত করিয়া তিনি বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিয়াছেন। মহাপুরুষদের জীবনের সাধারণ ঘটনার বিবৃতির ভিতর দিয়া সত্যকে সুস্পষ্ট করিয়াছেন। বাঙলা দেশের মহাপুরুষদের মাহাত্ম্যের কীর্তনে এইভাবে গ্রন্থকারের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন গ্রন্থ পাঠে চিত্ত উন্নত হয়। ধর্মসম্পর্কিত সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এবং অনুদারতা দূর করিয়া ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের নৈতিক মর্যাদা উদ্বোধন করিতে ভুলুয়া বাবার শ্রীশ্রীকালী কুণ্ডলিনী বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। এই দিক হইতে বর্তমানে এই শ্রেণীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনার বহুল প্রচারের প্রয়োজন রহিয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের প্রচার কামনা করি। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ সবই সুন্দর। বিষয়োপযোগী কয়েকখানি চিত্রে গ্রন্থখানা সমৃদ্ধ করা হইয়াছে।

কাথিয়াওয়াড়ী সেলাই ও কাঁচের কাজ—শ্রীউমা রায়; প্রকাশক শ্রীক্ষিতীশ রায়, শান্তিনিকেতন; প্রাপ্তিস্থান শিল্পভবন, পোঃ শ্রীনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, মূল্য ২৲ টাকা।

বইখানি পড়ে আনন্দিত হলাম। লেখিকা সুনিপুণা সীবনশিল্পী। তিনি যে "রুচির হাওয়া বদলেছে" বলেছেন একথা খুবই সত্য। বিলাতী ঢঙের বেশভূষা ও বিদেশী ধাঁচে অলংকরণের ধরন নকল করবার মোহ কেটেছে। বাঙলার কাঁথায়, কাশ্মীরের শালে, কাথিয়াওয়াড়ের ঘাগরায় ছুঁচের কাজের কি কি ফোঁড় পাওয়া যায় এখন তারই সন্ধান চলেছে। কাথিয়াওয়াড়ের সেলাইতে যে কয়েকটি ফোঁড় দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে কটি বিশেষ প্রচলিত এ বইখানিতে নক্সার সাহায্যে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। শিল্প শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় শিক্ষকের অভাবই হল তার মধ্যে প্রধান। উৎকৃষ্ট শিল্প গ্রন্থ শিক্ষকের এই অভাব বহুলাংশে পূরণ করে। যে সেলাইয়ের কৌশল এই বইটিতে দেওয়া হয়েছে তার সন্ধান যাঁরা করবেন তাঁদের আর শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হবে না।

আজকের দিনে দেশে নানা শিল্পের নানা গ্রন্থ রচনা, প্রকাশ ও ব্যবহারের প্রয়োজন হয়েছে। শিল্প আজ শিক্ষার মাধ্যম হতে চলেছে। মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সূচী শিল্পের বিশেষ স্থান হওয়া উচিত। একথাটি যেদিন মেনে নেওয়া হবে সেদিন বিদ্যালয়ে এ বইখানির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাবে। সূচীশিল্প সৃষ্টিতে যাঁরা আনন্দ পান তাঁরাও পুস্তিকাখানির সুযোগ গ্রহণ করবেন আশা করা যায়।

মিলের কাগজের পরিবর্তে হাতে তৈরী কাগজে বইখানি ছেপে লেখিকা সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন, হাতের কাজের বই হাতে তৈরী কাগজেই ছাপা হওয়া ভাল।

টালিগঞ্জ পাড়ায় সেদিন স্তম্ভিত হবার মতো একটা গল্প শুনলাম। গল্পটা হচ্ছে ছবির গল্প নিয়েই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন পরিচালক চিত্রনাট্য-বিশারদ নামকরা কোন সাহিত্যিককে তাঁর ছবির কাহিনী রচনার জন্য সম্প্রতি ফরমাস দেন এবং যথারীতি দাদনও পেশ করেন। ছবির একটা নাম ঠিক হয়, সেই নামে বিজ্ঞাপন আরম্ভ হয় এবং একদিন শুভ-মহরৎ কার্যটিও সুসম্পন্ন হয়ে যায়। কাহিনী তখনও লেখা হয়নি, কাহিনীকার একদিন কার্যব্যপদেশে ষ্টুডিওতে হাজির হন এবং বিস্মিত হন শুনে যে, যে কাহিনীটির এতটুকু অংশও তিনি তখনও পরিচালকের হাতে সমর্পণ করেননি তারই চিত্রগ্রহণ শুধু আরম্ভই নয়, মাঝের কদিনে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই ছবির অনেকখানি তোলাও হয়ে গিয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে কাহিনীকার ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে জানতে চাইলে পরিচালক সবটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন যে, এমন মারাত্মক তিনি কিছুই করেননি, তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে বলে তিনি তার সহকারীকে দিয়েই কাহিনী লিখিয়ে ছবি তোলা আরম্ভ করে দিয়েছেন। এরপর, বলা বাহুল্য, কাহিনীকার হতবাক্ হয়েই স্থানত্যাগ করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাহিনীর বাকী অংশ তাকে দিয়েই লিখিয়ে ছবিতে তার নাম বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে কি না, অথবা তিনি সংস্রব ত্যাগ করেছেন কি না, অথবা তাকে বাদই দেওয়া হয়েছে কি না জানা যায় নি।

নামকরা সাহিত্যিকের নামটুকু শুধু ছবিতে যুক্ত করে দেবার জন্যে তাদের কাহিনীর ওপরে কিরকম যথেচ্ছাচার চলে তার আর একটি প্রমাণ 'মহাকাল'। এর কাহিনীকারের জায়গায় ছবিতে নাম প্রচারিত হয়েছে সুসাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এ সম্পর্কে তিনিই আমাদের লিখে পাঠিয়েছেনঃ

সবিনয় নিবেদন,

২০শে কার্তিক দেশে 'মহাকাল' চিত্রের সমালোচনা দেখিলাম। গল্পের যে চুম্বক দিয়াছেন তাহা পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। এ গল্প আমার লেখা নয়, চরিত্রের নামগুলি আমার প্রদত্ত বটে। Hunchback of Notre Damকে ভিত্তি করিয়া একটি চিত্রনাট্য রচনা করিবার অনুরোধ পাইয়া একটি মূলবনুগ চিত্রনাট্য রচনা করি। এখন দেখিতেছি কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উহার খোল নলচে বদল করিয়াছেন।

আমার নিজের গল্পের দায়ীত্ব লইতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত কিন্তু দোহাই আপনাদের, এই গল্পের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাইবেন না। ইহাকে বহন করিতে পারি আমার ঘাড় এতো শক্ত নয়।

প্রয়োজন হইলে, যে চিত্রনাট্য আমি লিখিয়াছি তাহার অনুলিপি পাঠাইয়া আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।

নিবেদন ইতি

৮।১১।১৯৪৮ শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

'মহাকাল' দেখার সময় শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম থাকা সত্ত্বেও কাহিনীটি কোন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক তো দূরের কথা, সাহিত্য বা চিত্রকাহিনী সম্পর্কে এতটুকুও জ্ঞান আছে এমনও কোন ব্যক্তির রচনা বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। উদ্ধৃত চিঠিখানির পর আমাদের ধারণাটাই সত্যি প্রতিপন্ন হলো। আমাদের দেশে অমর সাহিত্য-সৃষ্টির যেরকম বিকৃতিসাধন হয়ে থাকে তার বোধহয় তুলনা পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে চিত্রনির্মাতা বা পরিচালকদের কৈফিয়ৎ হচ্ছে যে, ছবির টেক্‌নিককে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কাহিনী পরিবর্তন করা দরকার হয়ে পড়ে। একথাটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই পরিবর্তনের যোগ্যতাও তো বিচার সাপেক্ষ! আমাদের দেশের সমগ্র চলচ্চিত্র ইতিহাসে এমন কোন চিত্রপরিচালনা-প্রতিভার সন্ধান কি কোনকালে পাওয়া গিয়েছে যা পাল্লায় কোন মামুলী সাহিত্যিক-প্রতিভাকে ঝুঁকিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা দেখাতে পেরেছে! ধরে নেওয়া গেলো যে সাহিত্যিকরা চিত্রনাট্যের টেক্‌নিক না জানায় তাদের লেখা বাধ্য হয়ে বদল করতে হয়; কিন্তু শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক হিসেবে ছাড়াও সমগ্র ভারতে একজন অভিজ্ঞ চিত্রনাট্য রচয়িতা বলেও সুখ্যাত, তার লেখা চিত্রনাট্যেরও একেবারে খোল নলচে বদল করার কি কৈফিয়ৎ থাকতে পারে? আসলে সাহিত্য ও রসসৃষ্টি বিষয়ে আমাদের পরিচালকদের জ্ঞান ও ধারণা এতো বিকৃত ও অপক্ক যে তাদের আর ভালোমন্দ বিচারশক্তি বলতে কিছু থাকে না; নিজেদের খামখেয়ালীমীই হচ্ছে ওদের বিচারের মাত্রা নির্ধারক। কিন্তু দেশের দর্শকশ্রেণী তা বরদাস্ত করবেই না কেন, আর, চিত্রশিল্পেরও দ্বার তাদের জন্যে আর কতকালই বা খোলা থাকবে? পরিবর্তন সাধন আর বিকৃত করা এককথা নয়। মূল রচনার চিত্ররূপান্তরে পরিবর্তন এনেও সাহিত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে দেওয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও যথেষ্টই আছে, কিন্তু সে পরিবর্তন কাহিনীকার কল্পিত ও সৃষ্ট ঘটনা, পরিবেশ, চরিত্র এবং ভাবের অনুকরণেই ও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েই সম্পাদিত হয়েছে আর তাই সেসব ছবি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনবদ্য অবদান বলে স্বীকৃত হবার গৌরব অর্জন করেছে, যেমন 'অঞ্জনগড়'; আর যে সব ক্ষেত্রে, পরিচালক চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে কাহিনীতে পরিবর্তনের দরকার বলে কাহিনীকারের গণ্ডীকে উপেক্ষা করে বাইরে থেকে অসামঞ্জস কিছু আমদানী করে জুড়ে দিতে চেয়েছে সেসব ছবি পরগাছা হয়েই দাঁড়িয়েছে, যেমন 'চন্দ্রশেখর'। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি অবলম্বনে অসংখ্য বিদেশী ছবি তৈরী হয়েছে কিন্তু কাহিনীকারের গণ্ডীর বাইরে গিয়েও ছবি সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলা গিয়েছে এমন উদাহরণ অসাধারণ প্রতিভাবান পরিচালকদের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়নি। আমাদের পরিচালকরা কি তাদেরও টপ্‌কে যেতে চান?

খুচরো খবর—

কিছুদিন আগে কালিকা থিয়েটার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী মঞ্চে উপহার দেবার আয়োজন করেছিলো কিন্তু রামকৃষ্ণ ভক্তদের আপত্তিতে তা বন্ধ করতে হয়। তার কয়েকদিন পরই, পরিচালক অমর মল্লিক স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে যে একখানি ছবি তুলছিলেন তাও বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয়। এই বন্ধ করিয়ে দেবার বিপক্ষে আমাদের কিছু বলবার নেই, কিন্তু 'বিবেকানন্দ' ছবিখানি তোলা হচ্ছিল বৎসরাধিককাল ধরেই এবং গোপনেও নয়, কিন্তু গোড়াতেই তা বন্ধ না করিয়ে, এতদিন চুপ করে থেকে বহু অর্থব্যয় হয়ে ছবিখানি এগিয়ে যাবার পর কেন এক বছর লাগলো আপত্তির কারণ খুঁজতে?

* * * *

কংগ্রেসীমহলে প্রভাব আছে বম্বের এমন একজন প্রযোজক তার একখানি ছবি দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিতজীকে দেখাতে সক্ষম হন। ছবিখানির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তোলা মহাত্মাজীর সংবাদ চিত্রের অংশ সন্নিবেশিত করা ছিল। উল্লসিত প্রযোজক বম্বেতে ফিরে এসে ছবিখানি সেন্সর করার জন্য প্রদর্শন করান, কিন্তু সেন্সর বোর্ড তাকে ছাড়পত্র না দিয়ে জানিয়ে দেন যে, একেবারে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তার ছবিখানি প্রদর্শনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে।

* * * *

টোকিওতে 'ক্ষুরস্য ধারা'-র চিত্ররূপটি মুক্তিলাভ উপলক্ষে ওখানকার প্রধান প্রধান নাগরিকদের মধ্যে হাজার হাজার ক্ষুর বিলনো হয় এমন কি মন্ত্রিমণ্ডলী ও অন্যান্য নেতাদের কাছেও পাঠানো হয়। তার পরই ওখানকার অধিকাংশ অধিবাসী একখানি করে এই মর্মে চিঠি পায় যে, অমুক চিত্রগৃহে যাবেন নইলে আপনাকে 'জুজুতে ধরবে' আসলে ছবিরই নাম হচ্ছে 'Devil will catch you.'

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীর কাউন্সিল হাউসে আন্তর্জাতিক আবহ প্রতিষ্ঠানের এশিয়া আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন করিতেছেন। ১০ই নবেম্বর উক্ত সম্মেলন আরম্ভ হয়।

৯ই নবেম্বর নয়াদিল্লীতে বড়লাট প্রাসাদে রাষ্ট্রপাল শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী কর্তৃক ক্রিকেট খেলায় যোগদানকারী উভয় দলের খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা। চিত্রে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার দক্ষিণে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ক্যাপ্টেনকে দেখা যাইতেছে

দেশী সংবাদ

৮ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে বিচারপতি শ্রীআত্মাচরণের বিশেষ আদালতে গান্ধী হত্যা মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে প্রধান আসামী নাথুরাম গড়সে ৯৩ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে, গত ৩০শে জানুয়ারী তিনি গান্ধীজীকে গুলী করিয়াছিলেন। গান্ধী হত্যার সকল দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া তিনি এই উদ্দেশ্যে অন্যের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেন।

কলিকাতায় সরকারী দপ্তরখানায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেন যে, কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে প্রায় দুই লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে ৮ই নবেম্বর হইতে সাহায্য দানের ব্যবস্থা বন্ধ করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, আরও এক মাসের জন্য তাহা বহাল রাখা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি চাউলের যে বরাদ্দ হ্রাস করা হইয়াছিল, আগামী ১৫ই নবেম্বর হইতে তাহা আংশিকভাবে পুনরায় প্রবর্তন করা হইবে।

৯ই নবেম্বর—ভারত সরকারের অর্থ দপ্তর হইতে প্রচারিত এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বিলাস সামগ্রীর উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন। কতিপয় দ্রব্যের আমদানী শুল্কে অবিলম্বে বৃদ্ধি করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

আজ গণপরিষদে ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্রের সাধারণ আলোচনা শেষ হইল। পাঁচদিন ধরিয়া আলোচনার পর আজ ডাঃ আম্বেদকরের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে খসড়া কমিটির নির্ধারিত খসড়া শাসনতন্ত্র বিবেচনা করিতে বলা হইয়াছে।

করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিন বলেন যে, কলিকাতায় পাকিস্থানের ডেপুটি হাই কমিশনারের সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গেলেই পূর্ববঙ্গে ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্তন করা হইবে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের চীফ কমিশনার শ্রীযুত রেগে ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিক-ভাবে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১০ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া প্রতিষ্ঠানের এশিয়া আঞ্চলিক সম্মেলনের ৭ দিবসব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। চীন, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি এশিয়ার ১৪টি দেশ ও বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। ডাঃ এস কে ব্যানার্জি সর্বসম্মতিক্রমে এশিয়া আঞ্চলিক কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

ডায়মণ্ডহারবারে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার উক্ত মহকুমার অন্তর্গত কাকদ্বীপ গ্রামে একদল দাঙ্গাহাঙ্গামাকারী জনতা ও পুলিশ দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তিনজন মহিলা সহ ৮ ব্যক্তি নিহত এবং আনুমানিক ১২ জন লোক আহত হইয়াছে।

১১ই নবেম্বর—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে ধূমকেতুটি দেখা গিয়াছে, অদ্য সকাল প্রায় পাঁচটার সময় কলিকাতা হইতে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ রেভাঃ গোরো সেই ধূমকেতুটি দেখিয়াছেন। ১৯১০ সালে হ্যালীর ধূমকেতুর পর এরূপ উজ্জ্বলতর ধূমকেতু দেখা যায় নাই।

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যে সকল ভারতীয় সাময়িকভাবে পাকিস্থান ভ্রমণে যাইবেন তাঁহারা ভারতের অধিবাসী এবং সাময়িকভাবে পাকিস্থানে যাইতেছেন বলিয়া যদি স্ব স্ব জেলার কালেক্টর অথবা ডেপুটি কমিশনারের নিকট সার্টিফিকেট না লন, তবে তাঁহারা ভ্রমণের শেষে স্থায়ীভাবে ভারত প্রত্যাবর্তনের সময় ছাড়পত্র সংগ্রহের অসুবিধায় পড়িতে পারেন।

১২ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ইউরোপে যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সভায় তৎসম্পর্কে এক বিবরণ দেন। ফরাসী ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, সভায় সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

১৩ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ এবং তাঁহাদের সাহায্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। কাছাড় ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলি লইয়া পূর্বাচল প্রদেশ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রশ্নও আলোচনা হয়।

পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদের ব্যাপক বাস্তুত্যাগের ফলে যে সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে, কার্যকরীভাবে তাহার আশু সমাধানের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ জানাইয়া গণপরিষদের পশ্চিম-বঙ্গের সদস্যগণ কংগ্রেস সভাপতির নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আজ কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজের নিকট মহরম শোভাযাত্রা উপলক্ষে এক অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়। পুলিশ উপদ্রুত অঞ্চলের অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং গুলী চালায়। পুলিশ কমিশনার উপদ্রুত অঞ্চলে সান্ধ্য আইন জারী করেন। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, উক্ত হাঙ্গামায় ৮৩ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহা ছাড়া ৫ জন নিহত হয় এবং ৪৫ জন সামান্য আহত হয়।

পাকিস্থানবাসীর ভারতে আগমন ও ভারতে তাঁহাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভারতের রাষ্ট্রপাল অদ্য ১৯৪৮ সালের পাকিস্থানী লোকাগমন (নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীতে ভারতীয় গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্রের সাধারণ আলোচনাকালে গণপরিষদের সদস্য শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রে শক্তিশালী গভর্নমেণ্ট গঠনের দাবী জানান।

১৪ই নবেম্বর—আজ ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ষষ্ঠিতম জন্ম দিবস বিভিন্ন স্থানে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত পালন করা হয়।

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতে পাকিস্থানবাসীদের আগমন ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স পূর্ববঙ্গ-বাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

বিদেশী সংবাদ

৮ই নবেম্বর—নানকিং-এ কুওমিণ্টাং দলের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক ঘোষণা করেন যে, চীন হইতে কম্যুনিস্টদিগকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদকল্পে চীনা সরকার দীর্ঘকালীন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তিনি বলেন যে, সম্ভবতঃ আট বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম চলিতে পারে। তিনি শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা করিতে অসম্মত হন।

৯ই নবেম্বর—কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রিতে মিশরের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ও ওয়াফদ দলের নেতা মুস্তাফা নাহাস পাশার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই ৬ষ্ঠবার নাহাস পাশার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হইল।

নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, নানকিং-এর ২০০ মাইল দূরে সুদৃঢ় ঘাঁটি সিনচেং কম্যুনিস্ট বাহিনীর আক্রমণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

১০ই নবেম্বর—প্যারিসে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের অছি কমিটিতে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই দাবী জানান যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীরা অছির অধীনে না থাকিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত যুক্ত থাকিতে চায় বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সরকার যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে তদন্তের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন প্রেরণ করা হউক।

১২ই নবেম্বর—টোকিওতে আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুন্যাল জাপানের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজো প্রমুখ সাতজন জাপ নেতার প্রতি ফাঁসীর হুকুম দিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক পার্লহারবার আক্রান্ত হওয়ার দুই মাস পূর্বে জেনারেল হিদেকি তোজো জাপানের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ট্রাইব্যুনাল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপর জাপানের আক্রমণের জন্য জেনারেল তোজোকে প্রধান অপরাধী সাব্যস্ত করেন। মোট ২৫ জন আসামীর মধ্যে দুইজন ব্যতীত অন্যান্য সকলেই আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন। কিনগোরো হাশিমোতো প্রমুখ ১৬ জন জাপ নেতা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং তোজো মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র সচিব শিগেনোরি তোগো এবং মামরো শিগেমিৎসু যথাক্রমে ২০ বৎসর ও ৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ট্রাইব্যুনালের ১১ জন বিচারপতির মধ্যে ভারতের বিচারপতি ডাঃ রাধাবিনোদ পাল ও অপর দুইজন বিচারপতি ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১৩ই নবেম্বর—চীনা সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, নানকিং প্রবেশের সিংহদ্বার স্বরূপ সুচাউ-এর পূর্বদিকে জানচুয়ান অঞ্চলে কম্যুনিস্ট আক্রমণ সমগ্রভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছে। উক্ত সংগ্রামে প্রায় ৫০ হাজার কম্যুনিস্ট সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ
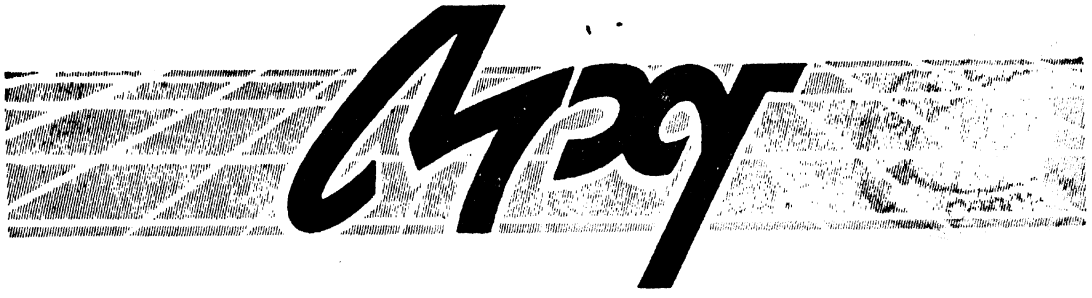
সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ সাল। Saturday, 27th November, 1948. [৪র্থ সংখ্যা

উপদেশ ও অভিসন্ধি

কলিকাতার মহরমের দাঙ্গার সংবাদ ঢাকায় প্রচারিত হইলে জনতা উত্তেজিত হইয়া সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় তর্জন-গর্জন করে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি অবশ্য "আজাদ" ও "জিন্দেগী" এই দুইখানা সংবাদপত্রের কল্যাণে এইরূপ বিক্ষোভ সৃষ্টির উপযোগী উগ্র মিথ্যায় অতিরঞ্জিত হইয়াই পরিবেশিত হইয়াছিল। এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতান্ধ অজ্ঞ অথবা অসংস্কৃত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ধর্মোন্মাদদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নূরুল আমিন সাহেব স্বয়ং মহরমের এই শোভাযাত্রা সম্পর্কিত ঘটনাটিকে দৈবপ্রদত্ত সুযোগস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেণ্টকে খোঁচা দিতে কসুর করেন নাই এবং সেই সঙ্গে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থার গর্বেও তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন। জনাব নূরুল আমিন মুরুব্বীর ভঙ্গীতে বলিয়াছেন —"পাকিস্থানে আমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধান, তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহকে রক্ষা করা এবং তাহাদের সহিত কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গতই নহে, উদার আচরণ করার ভার গ্রহণ করিয়াছি। আমরা উক্ত পবিত্র প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিব। মুসলমানদিগকে সর্বাধিক সংযম দেখাইবার নিমিত্ত আমি আবেদন জানাইতেছি। প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির যে অবিচ্ছিন্ন ইতিবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে অব্যাহত রাখিতে হইবে।" পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর এই সংকল্প এবং তাঁহার এই গর্ব যদি সার্থক হইত ,তবে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইতাম; কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের ব্যাপক বাস্তুত্যাগ হইতে সে সত্য সমর্থিত হয় না। এই অবস্থা দেখিয়াই ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে কিছুদিন পূর্বেও আক্ষেপের সঙ্গে বলিতে হইয়াছে যে, পাকিস্থানের কথা ও কাজে মিল নাই। পূর্ব পাকিস্থানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির যদি সত্যই অবিচ্ছিন্ন ইতিবৃত্ত থাকে, তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ নরনারী নিঃস্ব অবস্থায় সেখান হইতে ভিটামাটি ছাড়িয়া আসিতেছে কেন? পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অনর্থক এই অসহায়ত্ব অবস্থা বরণ করিয়া লইবার দুর্বুদ্ধি কেন দেখা দিয়াছে; পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রগতিশীল। সাধারণ মানুষের কাণ্ডজ্ঞানটুকু পর্যন্ত তাঁহাদের নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন ধারণা করিলে নিশ্চয়ই অবিচার করা হইবে। সুতরাং তাঁহাদের বাস্তুত্যাগের মূলে গভীর কারণ কিছু আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। সে কারণগুলি কি, আমরা সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি। প্রধান কারণ এই যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম-সম্পর্কিত সংস্কার বোধের বৈষম্য এবং তজ্জনিত একটা প্রভুত্ব-স্পৃহা প্রবল রহিয়াছে এবং উন্নত এবং উদার রাষ্ট্রীয় মর্যাদাবুদ্ধি তাহাদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। এ সম্পর্কে পরলোকগত মৌলানা মহম্মদ আলীর একটি উক্তি আমাদের স্মরণ হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

The sentiment of the Mohamedans is stronger in respect of religion than in Nationality.

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বোধের চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মবোধের আবেগই বেশি প্রবল। লীগ রাজনীতি এই ধর্মবোধের সংকীর্ণতা এবং বৈষম্যের দিকটাই বিশেষভাবে জাগাইয়া তুলে এবং উদার নৈতিক মর্যাদাকে শিথিল করিয়া দেয়। বাস্তবিকপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই বৈষম্যবোধ পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা ব্যাপক আকারে দেখা দেয় নাই, ইহা সত্য; কিন্তু তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, সেখানে অশান্তির কোন কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রবল চাপে সেখানকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আত্মসম্বিৎ পর্যন্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছে। শাসকদের উপদেশ এবং সদিচ্ছা তথাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনকে একান্তভাবে স্পর্শ করিতেছে না; কারণ লীগনীতির সঙ্গে সেগুলির আন্তরিকতাসম্পন্ন সামঞ্জস্যের অভাব স্পষ্টভাবেই তাহাদের চোখে পড়িতেছে। তাহারা সেগুলির গুরুত্বহীনত্ব উপলব্ধি করিয়া সেগুলি এড়াইয়া সাম্প্রদায়িক বৈষম্য এবং তজ্জনিত প্রভুত্বের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় মর্যাদার মূল্যকে জাঁকাইয়া তুলিতেছে। পাকিস্থানের নেতারা ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের জিগীর তুলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সেই মনোবৃত্তিকে কার্যত প্রশ্রয় দিতেছেন। এইভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তাহাদের সব সদিচ্ছা শুধু এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সিদ্ধির অভিসন্ধিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে এবং ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের মন রাষ্ট্রে এবং সমাজে একান্তভাবে কোন সংস্থিতি পাইতেছে না। এমন নির্মমতাময় প্রতিবেশ মানুষকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে, ইহা স্বাভাবিক।

ব্যাধির কারণ নির্ণয়

পূর্ববঙ্গের প্রাণশক্তি সাম্প্রদায়িক প্রতিবেশের বেষ্টনীর মধ্যে আজ পিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু বিগত মহরমের অবাঞ্ছিত অনাকাঙ্ক্ষনীয় ব্যাপার হইতেও এই সত্যই প্রতিপন্ন হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রাণশক্তি এখনও সুস্থ আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি খুবই সুস্পষ্ট। আমরা আশা করি, পারস্পরিক দোষারোপের আবর্ত অতিক্রম করিয়া পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের যুক্তির সারবত্তাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার রায় পাকিস্থানের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ পূর্ববঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে ডাক্তার রায়কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, পাকিস্থান ঐস্লামিক রাষ্ট্র বলিয়া বারংবার পুনরুক্তি স্বভাবতঃই মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত ও সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। যদিও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ন্যায় আচরণ করিতে চাহেন এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও উদার ব্যবহার করিবার নিমিত্ত তাঁহারা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমান জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ হিন্দুদের মনে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে যে হিন্দুরা পাকিস্থানে বাঞ্ছিত নহে, এবং এই কারণেই তাহারা চলিয়া যাইতেছে। আমি আরও বলি যে, সিরাজগঞ্জে সকল মান্যগণ্য লোকের ও যশোহরের নেতৃস্থানীয় নাগরিকবৃন্দের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে এবং স্থানীয় কর্মচারিবর্গ কিভাবে জনমতের নিকট অবনত হন, তাহা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।" আমরা আশা করি, জনাব নূরুল আমীন সাহেব, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই অবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিবেন। পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে যেভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের কোথায়ও তাহার নজীর মিলে কি? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাবোধ পশ্চিমবঙ্গের কোথায়ও শাসকদের সন্দেহ বা সংশয়ের দ্বারা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পক্ষান্তরে বিগত মহরমের ব্যাপারে এই সত্যই দৃঢ় হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার ভাব বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নয় এবং যাঁহারা এই ধরণের উপদ্রব সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাদিগকে কেমন করিয়া সায়েস্তা করিতে হয়, তাহারা তাহাও জানে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে স্মৃতীশ বাড়ুয্যে এবং শচীন মিত্রের ন্যায় তরুণদের আত্মদানে সেদিনও যে ভূমি পবিত্র হইয়াছে সেখানে কাপুরুষোচিত সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা পাকিস্থানের ন্যায় বীরত্বের গৌরব পাইবে, এ উপায় নাই। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী যদি সত্যই পূর্ব পাকিস্থানকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে সেখানেও সামাজিক এমন প্রতিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। তিনি যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য কেবল দৃঢ় থাকিলেই চলিবে না, পরন্তু সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিবর্গ যাহাতে দমিত হয়, সেজন্য তাহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। বস্তুতঃ গভর্নমেণ্ট যদি সক্রিয় হয়, এবং জনমত যদি জাগ্রত থাকে, তবে সমাজ-বিরোধী শক্তি কোন রাষ্ট্রেই স্থায়ী হইতে পারে না।

নীতি ও শাসন

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পূর্ববঙ্গে সফর সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে বিশেষ আশ্বস্তির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মিঃ লিয়াকত আলী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা এবং তাহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনেক আশ্বাস দিয়াছেন, ইহা সত্য; কিন্তু ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। পাকিস্থানের নিয়ামকগণ এমন ফাঁকা আশ্বাস ইহার পূর্বেও অনেকবার দিয়াছেন; কিন্তু কার্যতঃ অবস্থার কোন পরিবর্তনই ঘটে নাই। সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের একটা মোহ পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে দৃঢ় হইয়া গিয়াছে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দৈনন্দিন জীবনে এজন্য আঘাত পাইতে হইতেছে। বলা বাহুল্য শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের হাতে এ অবস্থার প্রতীকার অনেকখানি নির্ভর করে। মিঃ লিয়াকত আলী এ সত্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানের শাসন-বিভাগে প্রথমটা অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কর্মচারীর অভাব ছিল। আমরা বলিব, সে অভাব এখনও রহিয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাই বড় কথা নয়, ন্যায়নিষ্ঠা এবং নিরপেক্ষতাই এখানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্থানের শাসন-বিভাগে এই দিক হইতে যোগ্যতার নৈরাশ্যজনক নিদারুণ অভাব পরিলক্ষিত হইবে। ন্যায় এবং নিরপেক্ষতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত শক্ত মানুষ সেখানকার শাসনবিভাগে সত্যই বিরল। ইহার কারণ মিঃ লিয়াকত আলী সাহেব উপলব্ধি না করিয়াছেন, ইহাও বলিব না। কারণ, তিনি সে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই সম্ভবতঃ শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদিগকে রাজনীতির প্রভাব হইতে ঊর্ধ্বে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। যে রাজনীতিক দল শাসন বিভাগে কর্তৃত্ব লাভ করুক না কেন, তাহার দিকে না তাকাইয়া নিরপেক্ষভাবে ন্যায়নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া কর্মচারীরা চলিবেন, ইহাই তাঁহার নির্দেশ। বলা বাহুল্য, এমন উপদেশের কার্যকারিতা খুব কমই আছে; কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অভিমত অনুসারে প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল প্রভাবিত হইয়া থাকে এবং রাজকর্মচারীদিগকে মন্ত্রিমণ্ডলের নীতি অনুসারেই চলিতে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যেখানে সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বকেই বড় বলিয়া বুঝে, সেখানে মন্ত্রিমণ্ডলকে সেই নীতিই অবলম্বন করিতে হয়, নহিলে তাঁহাদের মন্ত্রিত্বই লোপ পায়। এরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রিমণ্ডলের রাজনীতিক মতকে গ্রাহ্য না করিয়া রাজকর্মচারীদের পক্ষে নিরপেক্ষতার উদার আদর্শ অনুসরণ করা সহজ নয়। সে পথ অবলম্বন করিতে গেলে তাহাদিগকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অপ্রিয় হইয়া পড়িতে হয়, তেমনই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি বিধানে তৎপর মন্ত্রিমণ্ডলেরও তাঁহারা বিরাগভাজন হইয়া উঠেন; সুতরাং তাঁহাদের রুজি মারা যাইবার ঝুঁকি তাঁহাদিগকে লইতে হয়। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, রাজকর্মচারীদের পক্ষে এই দিক হইতে যে অন্তরায় আছে, তিনি তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে পাকিস্থানের শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক আছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও ভবিষ্যতের আশ্বস্তির আর এক পর্ব, তাহা কতদিনে কার্যে পরিণত হইবে কে জানে? বাস্তবিক পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার উপর অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভুত্বের উপর রাষ্ট্রনীতি যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ন্যায় এবং নিরপেক্ষতার পথে এই সব অন্তরায় দেখা দিবেই। ফলতঃ মধ্যযুগীয় আদর্শের যুগ অতীত হইয়াছে, পাকিস্থানকে সমুন্নত রাষ্ট্রের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে ধর্ম বিশেষের মৌলিক উদার আদর্শের দোহাই না দেওয়াই ভাল। আদর্শ প্রতিষ্ঠাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে শুধু নাম লইয়া এই বিভ্রম সৃষ্টি করা হয় কেন? কোন ধর্মই মানুষকে হিংসা বা দ্বেষ করিতে বলে না, অথচ ধর্মের নামে জগতে যত বেশী হিংসা এবং বিদ্বেষমূলক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, অন্য কোনভাবেই তাহা হয় নাই। বর্তমান ক্ষেত্রেও রাজনীতির সংগে বিশেষ ধর্মমতের সংস্কার জড়িত রাখিবার বিড়ম্বনা হইতে পাকিস্থান যদি মুক্ত হইতে না পারে, তবে তাহার দুর্গতি যে বাড়িবে ছাড়া কমিবে না, ইহা নিশ্চিত।

বাস্তুত্যাগ বন্ধের উপায়

পূর্ববঙ্গ কংগ্রেস পরিষদ দলের প্রধান হুইপ শ্রীযুত গোবিন্দলাল বাড়ুয্যে সেদিনও একটি বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এরূপ বাস্তব অবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতে হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার মতে শহর ও গ্রামাঞ্চলে গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের অবিরাম অত্যাচারের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে; এই আশঙ্কাই বাস্তুত্যাগের জন্য প্রধানত দায়ী। ইহা ছাড়া বাড়ি দখল, সাধারণ প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিচালনা, শিক্ষায়তনে শৃঙ্খলা রক্ষা, অন্যের জমিতে গো-মহিষাদির বে-আইনী প্রবেশ, গো-হত্যা, গবাদি পশু অপহরণ, বলপূর্বক কন্যাহরণ, ব্যক্তিগত পুকুরে, সাধারণ নারীদের ব্যবহৃত নদীর ঘাটে অশোভনভাবে স্নান, বেতার শ্রবণ, সংবাদপত্র পাঠ এবং আরও বহুবিধ ব্যাপারে সব সময়ই জনতার উপদ্রবের আশঙ্কা বর্তমান। কখন এবং কোথায় এই ধরণের বিপদ লাভ হইবে, তাহা কেহই জানে না; সুতরাং জনসাধারণ অহরহ উৎকণ্ঠার মধ্যে কালযাপন করিতেছে। সাধারণ জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নিজেদের অত্যাচারিত মনে করিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্যত্র আশ্রয় সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব-পাকিস্থানের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। তিনি সত্যকার অবস্থাই ব্যক্ত করিয়াছেন। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলী সেদিন ঢাকার বক্তৃতায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালে ঢাকা আসিয়া যে দৃশ্য দেখেন, তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু নিভিয়াছে দীপ। ঢাকার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তিনি বেদনা বোধ করিয়াছেন। কেন এই বেদনা? পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর মতে পাকিস্থানে সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা এখনও মানুষের দুর্দশার সুযোগ লইতেছে। মজুতদার এবং চোরাকারবারীরা খাদ্যাবস্থাকে গুরুতর করিয়া তুলিতেছে। তিনি বলেন, এই সকল ব্যক্তিকে নির্মমভাবে শাস্তি দিতে হইবে। তাঁহার মতে পাকিস্থানে এমন সব লোকের স্থান হওয়া অনুচিত। নবাব লিয়াকৎ আলী যদি বাস্তব সত্যকে স্বীকার করিয়া দৃষ্টি একটু সম্প্রসারিত করিতে সমর্থ হইতেন, তবে সমাজ-বিরোধীদের তৎপরতা অন্যত্রও লক্ষ্য করিতেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমাজ-বিরোধী এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা যেভাবে উপদ্রুত হইতে হইতেছে এবং ধর্মান্ধ গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকেরা অসহায়ত্বের সুযোগে তাহাদের উপর নির্যাতন চালাইয়া নিজেদের জঘন্য মনোবৃত্তি যেভাবে চরিতার্থ করিতেছে, তাহাও তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিত এবং তিনি ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের মহিমায় মশগুল হইবার আগে এই সব দৌরাত্ম্য এবং অনাচারের জন্য বেদনা বোধ করিতেন। সেক্ষেত্রে এই শ্রেণীর ধর্মান্ধ বর্বরদিগকে নির্মমভাবে শাস্তি দিবার জন্য সুদৃঢ় ন্যায়নিষ্ঠ সংকল্পশীলতা ও তাঁহার উক্তিতে প্রকাশ পাইত। কিন্তু পাকিস্থানের অন্যান্য অতি বুদ্ধিসম্পন্ন নিয়ামকদের মত তিনিও অনেকটা জ্ঞানতঃই এই সত্যকে এড়াইয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রের সংকীর্ণ স্বার্থ প্রয়োজন সম্পর্কিত সংস্কারই এক্ষেত্রে তাহার মনেও কাজ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টিই পাকিস্থান রাষ্ট্রের গোড়ায় রহিয়াছে, একথা সকলেই জানেন; কিন্তু পাকিস্থান এখন যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন সেই দৃষ্টি পরিত্যাগ করাই উচিত এবং রাষ্ট্রকে সর্বজনীন মর্যাদার উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিবার আদর্শ উদ্দীপ্ত করিবার দিকেই তাঁহাদের নীতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্তব্য।

প্রদেশের পুনর্গঠন

নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কংগ্রেস গৃহীত নীতির আগাগোড়াই সমর্থক। তিনি সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে তাঁহার সেই অভিমতকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল মতাবলম্বী নহেন, তবে তিনি কিছু সময়ের জন্য এই নীতি কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উপযুক্ত মনে করেন না। তাঁহার মতে এখন এই বিষয়ে হাত দিতে গেলে অযথা প্রাদেশিকতার ভাব বৃদ্ধি পাইবে। ভারতীয় গণপরিষদে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের খসড়ার দফাওয়ারী আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়। ডাক্তার আম্বেদকর খসড়া প্রণয়ন কমিটির সভাপতি। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইলে প্রাদেশিক সীমা রেখার পরিবর্তন সাধনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, সেদিন ডাক্তার আম্বেদকরের এতৎসম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গণপরিষদে গৃহীত হইয়াছে। বিদেশীর কূট চক্রে বাঙলা দেশের কতকগুলি অংশ বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়; পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চল ফিরিয়া পাইবার জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের জন্য কংগ্রেস-গৃহীত নীতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের এই দাবী প্রতিপালিত হইবে, সেই আশা করিতেছিল। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদ সোজাসুজি ভারত গভর্নমেন্টের উপর এই বিষয়ের ভার ন্যস্ত করা উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ডাক্তার আম্বেদকরের প্রস্তাবে এই অভিমত গৃহীত হয় নাই। তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোন সদস্যও নূতন প্রদেশ গঠন, সীমানা পরিবর্তন এবং আয়তন হ্রাস বৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহা করিবার পূর্বে তাঁহাকে এই প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেও তদনুযায়ী অভিমত দিতে পারিবেন না। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের সঙ্গে যে প্রদেশ সংশ্লিষ্ট সেই প্রদেশের আইন সভা এ বিষয়ে সম্মত কি না, তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে আইন সভার সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের অধিকাংশের সম্মতি থাকিলেও চলিবে না, সমগ্র আইন সভার মতামত নির্ধারণ করা প্রয়োজন হইবে। পশ্চিমবঙ্গের দাবী সম্পর্কে এই ধারা অনুসারে প্রদেশের সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে হইলে রাষ্ট্রপতিকে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের অভিমত আগে লইতে হইবে। বলা বাহুল্য সেই অভিমত সহজে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের অনুকূল হইবে না, এবং মত যদি প্রতিকূল হয়, তথাপি রাষ্ট্রপতি যে প্রদেশ বিশেষের দাবী পূরণে সহায়তা করিবেন অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য বিশেষকে প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি দিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা বৃথা। সুতরাং বিহার ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের সুনিশ্চিত প্রতিকূলতায় এবং তজ্জনিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমর্থনের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গত দাবী পূরণের সব সম্ভাবনাই বিলুপ্ত হইবে। ফলতঃ এমন ব্যবস্থায় প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থমূলক অভিসন্ধিপূর্ণ কূটনীতির অবিচার পশ্চিমবঙ্গকে স্থায়ীভাবে বহন করিতে হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্রের সংহতি এবং সমুন্নতির পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই সহায়ক হইবে না বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বাঙলার সংস্কৃতির শক্তি

শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু পূর্ব পাকিস্থানের ডেপুটি হাই কমিশনারের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার একটি সম্বর্ধনা-সভায় শ্রীযুত বসু বলেন, পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগের গতি রুদ্ধ করিবার উপযোগী ব্যবস্থা সৃষ্টি করিবার কার্যে তিনি সহযোগিতা করিবেন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঙলার এই দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হইলেও বাঙলার এই দুই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনীতিক জীবন পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে বিজড়িত যে, বাঙলার এই অংশকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন এবং তাহা করিতে গেলে অবাস্তব অনর্থই সৃষ্টি হইবে। ভাষা এবং সংস্কৃতির মধ্যেই স্বজাত্যবোধ নিহিত থাকে। বাঙলার হিন্দু এবং মুসলমানকে শুধু ধর্ম সংস্কারের আনুষ্ঠানিকতার দিক হইতে পৃথক করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

'সে কোন বনের হরিণ'—

শিল্পীঃ শ্রীনন্দলাল বসু

[প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

অরণ্য মরাল

গোবিন্দ চক্রবর্তী

বহু মৃত্যু পার হ'য়ে,
কোনো এক স্বচ্ছ নীলিমায়—
একঝাঁক অরণ্যমরাল
আজো বুঝি উড়ে যায়
শরতের লঘুপক্ষ মেঘের মতন।
তাদের ডানার শব্দ আজো যেন শুনি—
শোনে সারা মন,
মন হয় পলকে মাতাল।

একঝাঁক অরণ্যমরাল।
যাযাবর।
চির বেদে।
কোথাও কুলায় বেঁধে
কোনোদিন থুব বেশী থাকেনা সে যারা।
মানেনাক' কোনো ত্রুটী, ভ্রুকুটী, ইশারা
কোনো সে কিছুর;
কোনো সে কিছুই
পারেনা পরাতে যারে কোনো বন্ধন।
মাঝে মাঝে মন
আজো বুঝি ছোঁয় তার অপার গগন।
মাঝে মাঝে—কখনো কখন।

কখনো কখন
কি জানি সে কি যে মনে হয়—
হঠাৎ দ্বিগুণ লাগে প্রাণের স্পন্দন:
তুচ্ছ ক'রে সব বাধা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়—
উদ্বেলিত উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
অকস্মাৎ আপনারে করে নির্বাসন
কোন এক দুর্নিরীক্ষ অকূলে তারায়ঃ
সব মৃত্যু-অন্ধকারো অবশেষে যেথা
দিশাহারা,
ফিরে আসে প্রতিহত বিস্মিত ব্যথায়।

বহু মৃত্যু।
আমাদের ঢের মৃত্যু ভাই।

মিথ্যা মোহ, মিথ্যা লোভ, মিথ্যা ক্ষোভ—
হিংসা, ঘৃণা, শাঠ্য-শঠতার
বহু ছল;
বহু বিষ
পলে পলে নিঃশব্দ হত্যার।
জ'মে জ'মে তীব্র তার
সবটুকু পাপ;
আমাদের এ আকাশে আজ তার এত বেশী চাপ
হ'য়েছে দুর্বার।
দুর্বার দুর্বহ বুঝি
আর তাই এত অন্ধকার।
অন্ধকারে পলে পলে পথ হাতড়াই।
পথ খুঁজি—পথ বুঝি—
পথ নাই, তবু বুঝি কোনো পথ নাই।

ছিলো যেন, ছিলো যেন—
মনে পড়ে, মনে পড়ে
তবু একদিনঃ
এ হৃদয় আশ্চর্য রঙীন;
শাদা কাশে, কাঁচা ঘাসে, বুনো রোদ্দুরে
কোন সে তেপান্তর মাঠে মাঠে ঘুরে—
তারপরে গেছি উড়ে
কখন হাউই হ'য়ে হঠাৎ কোথায়।
মনে পড়ে, আজো মনে পড়েঃ
স্মরণের সেই ছিন্ন ঝিলিমিলি জাল—
আর সেই অরণ্যমরাল
বহুকাল
যারা ছিলো পাশাপাশি
চোখে চোখে সমান্তরাল।

দুরন্ত লুয়ের মত
তারপরে ব'য়ে গেল কত-না বছরঃ
এলোমেলো এলোমেলো কত কালো ঝড়।

কত ঝড়,
মন্বন্তর,
মারী ও বিপ্লবঃ
সাত-রঙা জীবন-উৎসব
সে আগুনে পুড়ে হ'লো ছাই।
প্রাণ হ'লো কঠিন পাথর;
তারপরে পোড়া-হাতে যা-কিছু বানাইঃ
সবই হয় পাথরের চাঁই।

সে পাথর দেখি আর,
দেখে সে কঙ্কর—
সে কুবির এই রূপান্তর,
রূপান্তর ঘাতকে ভয়াল।
সেই সব অরণ্যমরাল
সেই থেকে আর হেথা নাই।

হেথা নাই।
তবু কোনো স্বচ্ছ নীলিমায়
বহু মৃত্যু পার হ'য়ে আজো তারা ওড়ে—
আজ নয়—এইভাবে যুগে-যুগান্তরে,
ঘোরে তারা চিরকাল সূর্যের প্রান্তরে।
ঠোঁটে নিয়ে কণা-কণা জ্যোতির্ময় বীজ—
বেদুইন, চির কিরঘিজ
আমাদের কালো রক্তে কিছুতেই
বাঁধেনাক বাসা।
কিছুতে মেটে না তার আকাশ-পিপাসা।

মাঝে মাঝে, শুধু মাঝে মাঝে
কোনোদিন, হঠাৎ কখন—
আজো বুঝি তার ছোঁয়া কিছু পায় মন।
কিছু পায়
আর হয় পলকে মাতাল।

থামে না, থামে না তবু অরণ্যমরাল।
শুধু উড়ে যায়—
দূর হতে দূরান্তরে, অনন্তে মিলায়।

পণ্ডিত জওহরলালজীর জন্মদিনে আমরা তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি। বিপুল জনগণমনের ট্রামে-বাসে তাঁর আসন চিরকাল অপ্রতিহত থাকুক এই প্রার্থনাই আমাদের আজ সব চেয়ে বড় প্রার্থনা।

* * * *

সংবাদদাতা জানাইতেছেন পণ্ডিতজী তাঁর জন্মদিনে ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়াছেন। আশা করি ছেলেরা তাঁকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং যুগে যুগেই হইবে—DISCOVERY of Jawharlal.

* * *

রাজাজী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—

"We apply one yard stick to measure ourselves and we apply another yard stick when we wish to appraise other people".

"রাজাজীর মাপের জামাকাপড় অন্য সকলের গায়ে ফিট্ করলে বস্ত্র সমস্যা আপনা থেকেই সহজ হয়ে আসত"- মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

শুনিলাম শ্রীযুক্ত রবিশঙ্কর শুক্লের নির্দেশে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ডি পি মিশ্র নাকি "জনগণমন" আর "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের সারাংশ লইয়া একটি নূতন জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।—"জাতীয়
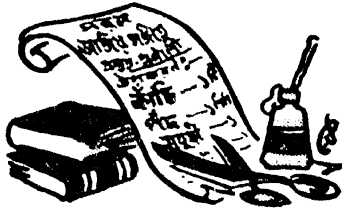
সঙ্গীত Made Easy হতে পারে এ ধারণা আমাদের ছিল না"—বলা বাহুল্য এ মন্তব্যও খুড়োর।

খুড়ো বলিলেন—সকালবেলা গিন্নিকে খবরের কাগজের সংবাদ পড়ে শোনাচ্ছিলাম—মাছের অবস্থার উন্নতি। হাতের কাজ ফেলে গিন্নি নাচতে নাচতে এলেন এবং হয়ত মুখের খানিকটা নাল সামলাতে সামলাতেই বললেন—"সত্যি? কই দেখি"। সংবাদটা দেখালাম। গিন্নি পড়লেন—মাছের অবস্থার উন্নতি। তারপর ভ্রূকুঞ্চন করে বললেন—"চশমাটা" পালটাও, কোথায় 'মাহের' আর কোথায় "মাছের"—হুঃ"!

* * * *

"Rationing of grass in Ahmedabad" একটি সংবাদ। আটা-চাউল

ছাড়িলেও রেশনের কবল হইতে মুক্তি নাই।

* * * * *

একটি সংবাদে শুনিলাম হিটলারের "স্পিরিট" নাকি ধরা হইয়াছিল। হিটলারের স্পিরিট ছাড়া হইয়াছিল কবে সে সংবাদ কিন্তু সত্যই আমরা পাই নাই।

* * * *

"Plan to create artificial moon" একটি সংবাদ। আমাদের বিশু খুড়ো বলিলেন—"ভেজালের ব্যবসাটা দেখছি চন্দ্রলোক পর্যন্ত ধাওয়া করছে"!

* * * *

একটি সংবাদে শুনিলাম বৃটেনে নাকি বধিরের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের উপর। এই ব্যাপক বধিরতার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই খুড়ো আমাদের বুঝাইয়া বলিলেন যে প্রায় দুই শত বৎসর ভারতীয়দের আবেদন-নিবেদন না-শুনিবার ভাণ করিতে করিতে এরা সত্যি সত্যি বধির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই উপসর্গ অবশ্য এখন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে দূর হইয়া যাইবে।

* * * *

ভারতীয়দের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলা দেখিয়া রাজাজী বলিয়াছিলেন—Cricket is one of the good things left by the British in India"—খুড়ো বলিলেন—তা সত্যি, তবে কথা এই যে, ক্রিকেট না শিখলেও আমরা Body line Boundary কথাগুলো বেশ ভালো করেই শিখেছি এবং মাঠ ছেড়ে রাষ্ট্রেও তাই ব্যবহার করছি!

* * * *

বৃস্টলের এক অনুরক্ত ভক্ত চার্চিল সাহেবকে নাকি একটি ষোল ইঞ্চি লম্বা চুরুট উপহার দিয়াছেন।—

সংবাদ-মূল্য হিসাবে গাঁজার কল্কের পাঠক জুটিত ঢের-বেশী——আর তা ছাড়া চার্চিল সাহেব স্বয়ং হয়ত খুবই খুশী হইতেন, চুরুটে যেন আর শানাইতেছে না!

* * * * *

পাকিস্থানের জনৈক মহকুমা হাকিম নাকি আইনজীবীদের কাছারিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হাজির হইতে হুকুম দিয়াছেন।

"আইনের অনুকল্প হিসেবে নিশ্চয়ই"—বলিলেন খুড়ো।

[পূর্বানুবৃত্তি]

কিছুদূর যাইতেই পথের ধারে একটি ভুটিয়া ছেলের সাক্ষাৎ পাইলাম। এখানে মানুষ দেখিলে সত্যই চমকাইতে হয়। মানুষের মাথাটা কাঁধের উপর না থাকিয়া যদি মানুষের হাতে থাকিত, তবে যে রকম ঠেকিত, লোকালয়ে সমাজের মধ্য হইতে মানুষকে এখানে প্রক্ষিপ্ত দেখিলে তেমনি লাগে। অর্থাৎ মানুষকে এখানে মোটেই মানায় না, ছন্দপতন মনে হয়।

ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রে, এখানে বসে আছিস যে?"

উত্তর দিল না, কেবল শ্রীমানের ভেক-লাঞ্ছিত 'নাসিকা-অতুল'এর দুই পাশের খুদে চোখ দুইটি মিটমিট করিয়া উঠিল।

ধমক দিয়া উঠিলাম—"কি, বাক্য বুঝি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করল না? যাবি কোথায়? এখানে বসে আছ কোন বুদ্ধিতে? বাঘের পেটে যাবার মতলব করেছ বুঝি?"

আমার এতগুলি প্রশ্ন উপর্যুপরি নিক্ষিপ্ত হইল এবং সামান্য কিছু কাজ হইল, তাহার প্রমাণও পাইলাম। নোংরা ছাতাপড়া দন্তপংক্তির ঈষৎ বিকাশ দেখা গেল এবং সেই ঈষৎ অবকাশের পথে একটি শব্দ নির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমানের বাঁ হাতটা সমুখে প্রসারিত হইল, অর্থাৎ ছেলেটা হাত পাতিল।

—"কি বলছ ধন, কিছুই যে বুঝতে পারছিনে। সভ্য ভাষায় বল, অন্ততঃ ইংরেজী, না হয় হিন্দিতেই বল না বাবা।"

শরৎবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

কহিলাম—"হাত বাড়িয়েছ কেন, চাঁদ? মতলবখানা কি?"

বয়স অল্প হইলে কি হয়, বুদ্ধিটি দেখিলাম অল্প নয়। ভাষায় যখন কুলাইল না, তখন ছবির সাহায্য নিল। বাঁ হাতেই একটা কাল্পনিক চুরুট ধরিয়া ধূম্রপানের ও উদ্গীরণের প্রক্রিয়াটা রিহার্সেল দিয়া দেখাইল। আমার মুখের চুরুটটাই শ্রীমানের লোভটাকে চেতাইয়া তুলিয়াছে।

—"হুঁ, সখ আছে দেখছি। উঠে আয় হারামজাদা।"

পকেটে হাত দিতে গিয়া দেখি, র‍্যাপারের কটিবন্ধে পকেট চাপা পড়িয়াছে। র‍্যাপারটা ঢিলা করিয়া লইয়া বাক্স বাহির করিলাম। একটি সিগারেট বাহির করিয়া বাক্সটা পুনরায় পকেটে রাখিলাম। সিগারেট দেখিয়া ছেলেটার চোখেমুখে আহ্লাদ ভাসিয়া উঠিল।

কহিলাম—"উঠে আয়, পাজি কোথাকার। এই বয়সেই চরিত্রের মাথাটি চর্বণ করে বসেছ?"

শ্রীমান উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বিনা বাক্যব্যয়ে হাত বাড়াইয়া দিল।

—"নে বাবা নে, একটু দূরেই থাক না বাপু! একেবারে গন্ধমূষিক হয়ে আছ, নাকে যায় না?"

বলিয়া সিগারেটটি তার প্রসারিত হস্তে ছাড়িয়া দিলাম।

কহিলাম—"নে, ধরা। আস্ত একটা সিগারেট তোর জন্য খরচ হোল, দেয় ভোঁতা মুখ থেতলে! আমার দয়ার কথা স্মরণ রাখিস," বলিয়া পকেট হইতে ম্যাচ বাহির করিলাম।

সিগারেট মুখে লইয়া ভুটিয়ানন্দন মুখাগ্নির জন্য প্রস্তুত হইল। আগুনে ধরিতেই এক মুখ ধোঁয়া নাকমুখ দিয়া বমন করিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়াই শ্রীমান হাসিয়া ফেলিল, অপূর্ব দন্তপংক্তি প্রকটিত করিয়া পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিল।

"খুশী হয়েছিস, বুঝতে পেরেছি। নে, এখন দাঁত বন্ধ কর, ও-দৃশ্যে যে আর দেখা যায় না বাবা।"

আমাদের আর কিছু বলিবার অথবা দেখিবার অবকাশ না দিয়া শ্রীমান ঊর্ধ্বশ্বাসে সিগারেট মুখে ছুটে দিল—দুই পায়ে ধুলা ও শুষ্ক পাতা মাড়াইয়া সামনের পথটা ধরিয়া তীরের মত বেগে ধাবমান হইল।

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি, পালাল যে?"

—"বলবেন না, একেবারে কাপুরুষ, রাজ্য ছেড়ে পলায়ন। এই উল্লুক। আস্তে যা আলখাল্লায় পা বেধে আছাড় খেয়ে মরবি যে—"

এই উপদেশেও গতি শ্লথ করিবার মত আশ্বাস ছেলেটা প্রাপ্ত হইল না। শুধু ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিয়া লইল যে, আমাদের ও তার মধ্যে ব্যবধানটা যথেষ্ট দীর্ঘ ও নিরাপদ কর হইয়াছে কিনা।

ছেলেমানুষীতে পাইয়া বসিল, কেমন যেন একটা অনাবিল আমোদ পাইতেছিলাম।

চেঁচাইয়া আবার আশ্বাস প্রেরণ করিলাম—"এই, সিগারেট ফেরৎ দিতে হবে না, ওটা তোকেই দিয়ে দিয়েছি—এখন একটু আস্তে যা বাবা—"

অভ্যাস ছিল না, তাই শেষের শব্দটায় দুই কাজই পাইয়া গেলাম, অর্থাৎ 'বাবা' বলিয়া দম ছাড়িয়া দম লইলাম।

শরৎবাবুর হো হো হাসি অট্ট হইতে অট্টতর হইল। চাক্ষুষ অবশ্য দেখিতে পাই নাই, তবু ঠিক জানি এ হাসিতে পাখীরা আচমকা গাছ ছাড়িয়া উড়িয়া ডাল বদলাইয়া বসিয়াছে, গর্তে নিদ্রিত সাপের কুণ্ডলী ক্ষণেকের জন্য শিথিল হইয়া আবার স্তিমিত হইয়াছে এবং গুহাভ্যন্তরে বিশ্রাম-সুখে লম্বমান শার্দুল থাবার উপাধান হইতে ঘাড়টা তুলিয়া আবার যথাস্থানে রক্ষা করিয়াছে। বাবা, মানুষের হাসি এই রকম হয়, শুনিয়াও বিশ্বাস হয় না।

কহিলাম—"আসুন, হারামজাদাকে দৌড়ে গিয়ে ধরি।"

শরৎবাবু অতটা রাজী ছিলেন না, তাই আর রেসের দৌড় দেখিতে ও দেখাইতে পারিলাম না।

পথটা কিছুক্ষণ হয় চেহারা বদলাইয়াছে, কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু হইয়া আবার ঢালু হইতেছে।, ঢেউ-খেলানো পথ দেখিয়া অনুমান করিলাম যে, পাহাড়ের প্রায় পায়ের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি।

একটা বাঁক ফিরিতেই দেখা পাইয়া গেলাম। ছেলেটা রাস্তার পাশে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়ারই গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সিগারেটটা তখনও শেষ হয় নাই, ধূমপান মহা আরামেই চলিতেছে।

দুনম্বর ঘোড়ার সোয়ার ভদ্রলোক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অদূরে পথিপার্শ্বে অধুনা বিশ্রাম করিতেছিলেন। এক দৃষ্টি-পাতেই ভদ্রলোকের ফটোটি চোখে তুলিয়া আনিলাম। একটা মাফলারকে মাথায় পাগড়ী করিয়া বন্ধন করা হইয়াছে, আলোয়ানটা মিলিটারী ব্যাজের মত বুকে ও পিঠে পৈতা হইয়া শেষের অংশটুকু কটিবন্ধের কাজে লাগিয়াছে, আর তিনি নিজে খর্বকায় হৃষ্টপুষ্ট একটি গোস্বামী হইয়া উপবিষ্ট আছেন। আড়চোখে ও সোজা চোখে দুইভাবেই গোস্বামীজীকে আবার দেখিয়া লইলাম।

বুঝিলাম যে, বিশ্রামপর্ব চলিতেছে। অশ্বারোহণে এই পথটুকু আসিতে গোস্বামীর শরীরটা বোধ হয় নাড়া খাওয়া দধি হইতে তক্রে মানে ঘোলে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দেখিলাম, একটু ঘায়েলই হইয়াছেন। কিন্তু মাথার ও কোমরের ও-দুটো ব্যাণ্ডেজ খুলিলে একটু ঢিলা হইতে কি বাধা ছিল? কিন্তু তখনও জানি নাই যে, তিনি বাতের রোগী, গরমটা গোস্বামীর অসহ্য হইলেও স্বাস্থ্যকর।

ছেলেটাকে কহিলাম—"আচ্ছা ঘোড়া পেয়েছিস তো, হেঁটে এসে ধরতে পেলি। চলে তো, না ঠেলে নিতে হয়?"

গোঁসাইয়ের মুখেও হাসি খেলিয়া গেল। গোঁসাইকে পূর্বে না দেখিয়াই মূর্তিমান স্বার্থ বলিয়া জানিয়াছিলাম, এখন দেখিয়া জানিলাম যে, তিনি রসিকও বটে। ঘোড়াটার কান নড়িয়া উঠিল, হয়তো আমার অসম্মানজনক উক্তিটিকে কানের বাতাস দিয়া কর্ণপ্রবেশ পথ হইতে দূরে উড়াইয়া দিল। ঘাড় বাঁকাইয়া বক্তাকে মানে আমাকে একবার দেখিয়াও লইল। হাসিয়া উঠিবে না তো? না, ঘোড়াটা শরৎবাবুর অট্টহাসি বা গোঁসাইয়ের মৃদু হাসি কোনটাই দিল না। বাঁচা গেল।

ঘোড়ার কান নাড়া দেখিয়া ইচ্ছা হইল যে, ছেলেটার কানটাও টানিয়া একটু নাড়াইয়া দেই, কিন্তু সামলাইয়া গেলাম। গন্ধের ভয়ে পিছাইয়া আসিলাম- কে জানে, গন্ধটা যদি হাতে অমর হইয়া লাগিয়া থাকে। পাকা রং থাকিতে পারে, আর পাকা গন্ধ থাকিতে পারিবে না, এ কোন কাজের কথা নয়।

শরৎবাবুকে কহিলাম—"চলে আসুন, আবার সিগারেট চেয়ে বসবে। দেখছেন না, আস্ত শয়তান, কি রকম মিটমিট তাকাচ্ছে।"

ছেলেটাকে কহিলাম—"যা, আজ বেঁচে গেলি সিগারেটের জন্য যে কান ধরে তোকে ওঠ-বস করাইনি, এ তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য জানবি। মনে রাখিস, ব্যাটা অকৃতজ্ঞ।"

বলিয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম গোস্বামীর মোটা মুখে মৃদু হাস্য ঝিলিক দিতেছে। ব্যাটা, বকধার্মিক, চুপ করিয়া নির্বিকারভাবে বসিয়া আছেন, মুখের কাছে পাইলে দেখিতেছি কিছুই ছাড়েন না।

"চলুন" বলিয়া চলিতে লাগিলাম।

কিছু একটা ঘটিয়া গেল বুঝিতে পারিয়া পিছনে ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখি, শরৎবাবু ছোঁ মারিয়া ছেলেটার হাত হইতে গাছের ডালের লাঠিটা ছিনাইয়া লইয়া হস্তগত করিয়াছেন। ছেলেটা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। ভাবখানা এই যে—"চল, ওটা আপনাকে দিয়ে দিলাম। চাইলেই হোত।"

কহিলাম—"সিগারেটের দাম এটা, বুঝলি? ঋণ থেকে মুক্ত হলি, নইলে নরকে যেতিস, কেউ ঠেকাতে পারত না। অমনিতেও যাবি, কেউ ঠেকাতে পারবে না।"

পাহাড়ে পা দিয়া মনের ছেলেমানুষী সরিয়া গেল।

কিন্তু আর এক রকমের চাঞ্চল্য মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। এখন আমি কোনদিক বাদ দিয়া কোনদিকে তাকাই। যে দিকেই তাকাই দৃষ্টি আটকা পড়িয়া যাইতে চাহে। এত বড় পাথর, চোখ দিয়া বেষ্টন করিতেই যেন ক্লান্তি আসে। গভীর খাদ, তাকাইয়া দেখিতে মাথা ঝিমঝিম করে, মনে হয় নিম্ন হইতে অদৃশ্য কে যেন প্রবল আকর্ষণ করিতেছে। পাথর কাটিয়া সিঁড়ির মত পথ করা হইয়াছে, একধারে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ, উপরে উঠিতে লাগিলাম।

উপরে যতই উঠিতে লাগিলাম, পরিশ্রম ততই বাড়িতে লাগিল। শরৎবাবুর তো দেখিলাম রীতিমত শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়াছে। পাহাড়ী বাতাস জোরে জোরে টানিয়াও বুক ভরিতে চায় না, বাতাস হাল্কা হইয়া আসিতেছে। ঘন বাতাস টানিয়া এতদিন বাঁচার অভ্যাস করিয়া আসিয়াছি, পাহাড়ী বাতাসে তাই পর্যাপ্ত প্রাণ পাইতেছিলাম না।

শরৎবাবুর কষ্ট দেখিয়া পাষণ্ডেরও পাষাণ হৃদয় দ্রব হইত। একেই তো ঊর্ধ্বে উঠা চিরকালই একটু শক্ত ব্যাপার, মাধ্যাকর্ষণ নিরন্তর নীচে টানিয়া রাখিতে চাহে; তদুপরি শরৎবাবু পালোয়ান হইলেও একটু স্থূলকায় ব্যক্তি। ভয় হইল, হার্টফেল হইয়া রাস্তায় শুইয়া পড়িবেন না তো! তখন এ লাশ লইয়া আমি কি করিব?

ভাবনাটা বাধা পাইল। শরৎবাবু আমার কাঁধে হাত রাখিয়া তাঁর দেহের গুরুভার যতটা পারিলেন আমার উপর চালান করিয়া দিলেন। আমি মানুষ, ভারবাহী প্রাণী নহি এবং ভুটিয়া কুলীও নহি। সুতরাং থামিয়া পড়িতে আমি অবশ্যই বাধ্য।

কাঁধ হইতে হাতটা সরাইয়া দিলাম, অর্থাৎ সরিয়া আসিতেই শরৎবাবুর হস্ত আমার স্কন্ধ-চ্যুত হইল।

কহিলাম—"করেন কি? আত্মনির্ভরশীল হন দেখি।"

কিন্তু আত্মনির্ভরশীল হইবার কোন ইচ্ছা অথবা শক্তি হইতে পারে, শরৎবাবুর ছিল না। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমারও তো তাঁর মত দুখানা ঠ্যাংই মাত্র সম্বল, আর দুখানা বেশী হইলে নয় কথা ছিল না। বন্ধুর বোঝা বইতে তখন ন্যায়তঃ আমি বাধ্য থাকিতাম।

শরৎবাবুর গায়ে মাংস বেশী, আমার গায়ে মাংস নাই বলিলেই চলে! বেশ, স্বীকার পাইলাম। কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে মাধ্যাকর্ষণের ট্যাক্স তো কম দিতে হয় না, তাঁর সমানই দিতে হইতেছে। মাধ্যাকর্ষণের বেলায় লঘু-গুরু ভেদ নাই, এটা শরৎবাবুর জানা উচিৎ ছিল।

কহিলাম—"লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠুন।"

—"বাবা! প্রাণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত যেতে পারলে হয়!" বলিয়া প্রাণধারণের যে-কষ্ট হইতেছে, তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসের নমুনায় দেখাইয়া দিলেন।

পায়ের শব্দে সম্মুখে উপরের দিকে চাহিলাম। উপরের বাঁকটায় সাদা কালো এক জোড়া আদমীর আবির্ভাব হইল, ভীষণ বেগে নীচে নামিয়া আসিতেছে।

পোষাকে ও কোমরের পিস্তলে পরিচয় জানাইয়া দিল যে, পুলিশ কর্মচারী, সার্জেন্ট ও হাবিলদার। অনুমানে জানিলাম, ফোর্টে বন্দী পৌঁছাইয়া দিয়া স্টেশনে চলিয়াছে, ফিরতি গাড়িতে রাজধানীর লোক রাজধানীতে যাইবে।

সাহেবটি মাংসপিণ্ডে-গড়া একটি বর্তুল মূর্তিবিশেষ। মুখটা হাঁড়ির মত প্রকাণ্ড এবং একেবারে একটি নিখুঁত বর্তুল। দেশীটি লম্বায় ছ' ফুটের উপরেও কম করিয়া আরও ইঞ্চি চারেক, দেহের প্রস্থেও বড় কম যায় নাই। দু'জনেই মাতালের মত টলিতে টলিতে নামিতেছিল, কিন্তু গতিটা দ্রুত। বুঝিলাম, মাধ্যাকর্ষণের স্রোতে নিজেদের ছাড়িয়া দিয়া কোনমতে দেহের হাল ঠিক রাখিয়া যাইতেছে—তাই গতি ঝড়ের মুখে পাল-তোলা নৌকার মত।

এই দুই দানব গায়ের উপর আসিয়া পড়িলে আমাদের আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

নিজে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম—"সরে দাঁড়ান, ধাক্কা লাগলে অবস্থাটা ভালো হবে না। এ-পাশে আসুন, ও-পাশে খাদ দেখতে পাচ্ছেন না।"

শরৎবাবু এ-পাশে সরিয়া আসিলেন, কহিলেন—"মদ খেয়েছে নাকি? ও-রকম করে টলতে টলতে দৌড়ে আসছে কেন?"

মদ্যপান করিয়াছে কি না, আন্দাজে বলা শক্ত। তাই যাহা বলা যায়, তাহাই বলিলাম—"পতনের পথ কত সহজ দেখছেন, হাত পা ছেড়ে দিলেই হল। আর এদিকে আমাদের এক পা উঠতে একপো প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।"

যুগল মূর্তি প্রায় কাছে আসিয়া পড়িল। ওদের নামার সুবিধাটায় কিছুক্ষণ আগে ঈর্ষা বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু কাছে আসিতে ভুল ভাঙিল। মাধ্যাকর্ষণে প্রায় কাহিল করিয়া আনিয়াছে, ধাক্কা সামলাইতে হাল ঠিক রাখিতে দু'জনেরই প্রায় হইয়া আসিয়াছে। সাদাটি তো প্রায় ব্যাদিত বদনে মানে হাঁ-করা মুখে নামিয়া আসিতেছে, শ্বাস নেওয়া ও ফেলা ছাড়া ও-মুখে এখন আর অন্য কোন কাজের অবস্থা নাই—সমতল ভূমিতে গেলে যদি বাক্য বাহির হয়। কালাটির অবস্থাও খারাপ, কিন্তু সঙ্গীটির মত অত নহে।

হাত কয়েক উপরে থাকিতেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কালা আদমী বলিল,—"বহুৎ আচ্ছা খানাপিনা, জায়গাভি আচ্ছা হ্যায়, আরাম সে রহগে।"

থামিবার যো ছিল না, বলিতে বলিতে প্রায় হাত দশেক নীচে নামিয়া গিয়াছিল।

শরৎবাবু বলিলেন—"শালার কথা শোন! আমার যাচ্ছে প্রাণ বেরিয়ে, আর উনি এলেন খানাপিনার ব্যাখ্যান করতে। দেয় ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে।"

সত্যি, একখানা ভারী পাথর এখান হইতে গড়াইয়া ছাড়িয়া দিলেই হয়, তারপর ব্যস্, ঐ পাঁচ ছ'শো হাত গভীর খাদে জন্মের মত ঠাণ্ডা হইয়া থাকিবে। —এ পথে মৃত্যু এতই সুলভ।

খানিকক্ষণ যাবৎ কি রকম একটা শব্দ কানে আসিতেছিল, কোথায় যেন কে ভয়ানক গর্জন করিতেছে।

একটা পুলের কাছে আসিয়া গেলাম, নিম্ন দিয়া একটা ঝরণা চলিয়াছে। যেমন বেগ, তেমনি গর্জন, আশেপাশের সমস্ত পাহাড় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিসের সঙ্গে এই দুর্দান্ত পর্বতদুহিতার তুলনা করিব, ঠিক পাইতেছিলাম না। তুলনার চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম,—একটা লোভ ক্ষণিকের জন্য মনের আকাশে ঝিলিক দিয়া মিলাইয়া গেল।

আচ্ছা, এ রকম কোন মেয়ে পাওয়া যায় না, যার মধ্যে এই পার্বত্য স্রোতস্বতীর মানবী প্রতিমূর্তি দেখা যাইবে—এমনই প্রাণবেগ, এমনই পাথরটলানো দুর্দমনীয় গতি, এমনই অফুরন্ত উদ্বেল প্রাণপ্রাচুর্য! কিন্তু পাহাড়ের মত মানুষ কোথায়, তেমন মেয়ে পাওয়ার যার অধিকার আছে? স্থির অচঞ্চল থাকিয়া এ প্রাণ-প্রবাহকে যে বুকে ধরিতে পারে, জানি, নাই। তবু তো মানুষ লোভ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। লোভ করিবার শক্তি আছে, অথচ পাইবার অধিকার নাই, একটি অদ্ভুত অসহনীয় নিয়ম!

শরৎবাবু বাঁচিয়া গেলেন। ঝরণার জলে পা ডুবাইয়া, মুখ ধুইয়া, ঘাড়ে ও মাথার পিছনটায় জল দিয়া তিনি চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন। এমন কি তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"আঃ, শরীর জুড়িয়ে গেল। আর কোন ক্লান্তি নেই——"

জলে হাত দিয়া আমারও ঐ রকম একটা আরামের নিঃশ্বাস বাহির হইল, এত ঠাণ্ডা! বরফ-গলা জল, পাথর কাটিয়া আসিতেছে, নদী হইয়া পথের দুধারে অকৃপণ হাতে প্রাণের পানীয় পরিবেশন করিয়া যাইবে—একখানি কল্যাণময়ী বধূমূর্তি চোখের সম্মুখে দেখা দিল। অথচ এ সাগরের অভিসারে বাহির হইয়াছে। এ এক অদ্ভুত অভিসারিকা—যে-প্রেম একে আকর্ষণ করিয়া পিত্রালয় হইতে একাকী পথে বাহির করিল, তাহাতে সকলের জন্য কল্যাণ কেমন করিয়া স্থান পাইল?

মানুষের প্রেম-অভিসার এ রকম কল্যাণবাহী হয় না কেন? সে-প্রেম গোপন, একাকী পথচারী, দুইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায় কি কারণে? মানুষের প্রেম বড় জোর গৃহের শান্ত প্রদীপশিখা হয়, নয় মশাল হইয়া জ্বলিয়া গৃহে আগুন ধরায়।

আমার সামনের এই অভিসারিকা পর্বতকন্যার এত প্রাণ, এত চাঞ্চল্য এবং এত প্রচণ্ড গতিবেগ—অথচ গায়ে হাত দিয়া দেখি এর সমস্ত শরীর কত শীতল, কোন তাপ-জ্বালা এর দেহে নাই। মানুষের দেহ-মনের গতিও যত, তাপ-জ্বালাও ততই—প্রচণ্ড গতির সঙ্গে তেমনি প্রগাঢ় শান্ত শীতলতাকে এর মত বহন করিতে তো মানুষে পায় নাই।

ঝরণার হাত হইতে শরৎবাবুকে এক রকম ছিনাইয়া লইয়া অবশেষে আবার পথ ধরিলাম।

ফোর্ট কতদূর ধারণা ছিল না, তবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, পথ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। আর মিনিট কুড়ি পথ গেলেই বক্সার পোস্ট অফিসঘর। সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই সামান্য একটু ঘটনা ঘটিয়া গেল, তার উল্লেখ থাকা দরকার। কারণ, পুলিশ কর্মচারীও মানুষ, শত হউক তারাও এ-দেশেরই লোক, এই কথার প্রমাণ এই ঘটনাতে পাওয়া যাইবে।

পিছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাইলাম। না দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম, ছ' নম্বর ঘোড়ার সওয়ার গোস্বামী প্রভু আসিতেছেন। কিন্তু গোস্বামীর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ তো এ-রকম হওয়ার কথা নহে। রীতিমত আশঙ্কিত হইয়াই উঠিলাম। চাক্ষুষ দেখিবার জন্য ঘাড় ফিরাইলাম। যাক্, গোস্বামী নয়, দারোগা সাহেব ঘোড়ায় চাপিয়া আসিতেছেন।

গোস্বামীর জন্য দুশ্চিন্তাটা দূর হইল বটে, কিন্তু দারোগার উপর রাগ জন্মিয়া গেল। যাঁদের জন্য ঘোড়া, তাঁরা পায়ে হাঁটিয়া পাহাড়ের পথ ভাঙ্গিতেছেন, আর উনি নবাবের মত—

চিন্তাটা শেষ করিতে পারিলাম না, অর্থাৎ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া তাহা শরৎবাবুকে শুনাইবার ফুরসৎ পাইলাম না, দারোগাবাবু পাশে আসিয়া ঘোড়া হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাগ হইলেও মনে মনে এর অশ্বচালনা ও অশ্ব হইতে অবতরণ ভঙ্গীটির প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না।

নামিয়াই কহিলেন,—"ওরা কেউ আর ঘোড়ায় চড়তে চান না, আপনার জন্য নিয়ে এলাম। নিন, উঠুন—"

"আর কাউকে দিয়ে দিন, আমার ঘোড়ার দরকার নেই।"

বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাই বুঝিয়া নিলেন যে, আমি রাগ করিয়াছি। বলিলেন,—"বিশ্বাস করুন, কাউকে বঞ্চিত করে আনিনি। ওঁরা পায়ে হেঁটে দল বেঁধে আসছেন, ঘোড়ার চেয়ে তাতেই নাকি আরাম। কাজেই এটা চেপে এসেছি—আপনাকে ধরবার জন্য ছুটিয়ে এনেছি, ব্যাটার ঘাম বেরিয়ে গেছে," বলিয়া ঘর্মাক্ত বাহনটির উপর চক্ষু বুলাইয়া লইলেন।

সুর আমার কি কারণে এত আন্তরিক ও নরম হইল, জানি না। বলিলাম,—"আমার জন্য এত কষ্ট করেছেন, সত্যই আমি খুসী হয়েছি। আমরা হেঁটেই যাব, তাতেই আরাম বেশী।"

পরে আসল কারণটি ব্যক্ত করিলাম—"আর দেখছেন তো?" বলিয়া ওদিকের ছ'সাতশত হাত গভীর খাদটার দিকে ইঙ্গিত করিলাম।

দারোগাবাবু এবার হাসিয়া ফেলিলেন, ভাবখানা এই যে, ছোঃ, এরা আবার বিপ্লবী, ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়াশুদ্ধ খাদে পড়িতে ভয় পায়।

কহিলাম,—"কেউ আর এখন ঘোড়ায় যাবে না, আপনিই এটা বাকীটুকু ব্যবহার করুন।"

"যাবেন না? আচ্ছা। এটাকে খালি পিঠে যেতে দিয়ে লাভ নেই," বলিয়া লাফ দিয়া ঘোড়ায় চাপিলেন এবং ঘোড়া হাঁকাইয়া আগাইয়া গেলেন।

শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ব্যাপার কি?"

"কিসের?"

"পায়ে হেঁটে আসছেন, তবু ঘোড়া ছুঁলেন না যে ওঁরা?"

শরৎবাবু কহিলেন—"কে জানে?"

বুঝিলাম, শরৎবাবুর আবার শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়াছে।

কহিলাম,—"আমি জানি।"

এ রকম উত্তর বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই, তাই ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে তাকাইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জানেন?"

গম্ভীর হইয়া কহিলাম,—"বাল্য শিক্ষা পড়েননি?"

—"পড়িনি? কি যে বলেন। পিসিমার কাছে শুনেছি যে, এক বছরে তেরখানা বাল্য-শিক্ষা ছিঁড়েছি।"

হাসিয়া ফেলিলাম, "বলেন কি, এতই?

—"তবে না তো কি—" বলিয়া কৈশোর পাণ্ডিত্যে গর্বিত বোধ করিলেন।

তারপর প্রশ্ন করিলেন—"বাল্য-শিক্ষার কথা কি বলছিলেন?"

—"পড়েননি, 'ঘোড়ায় চড়িল আছাড় খাইল,' কিন্তু ইহারা আবার চড়িল না।"

শরৎবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "বোধ হয় দৃশ্যটা কল্পনায় দেখিয়া অতীব মজা ও হাসির ব্যাপার বলিয়া তাঁর প্রতীতি হইয়া থাকিবে।

আমি বাল্যশিক্ষায় যাহা জানিয়াছিলাম এবং শরৎবাবু কল্পনায় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃই ঘটিয়াছিল। তবে আমাদের ক্ষেত্রে নয়, আগের দিনে যে দল গিয়াছে, তাদের একজনের অভিজ্ঞতা এবম্প্রকারই হইয়াছিল। ক্যাম্পে পৌঁছিয়া শুনিয়াছিলাম।

ভদ্রলোকের নাম বীরেন দাশগুপ্ত। দৈর্ঘ্যে কম, প্রস্থে অধিক, তদুপরি জেলের খাওয়া খাইয়া আরও মেদপুষ্ট হইয়াছিলেন। বক্সা স্টেশনে থামিয়াই তিনি একটা ঘোড়া দখল করেন।

বন্ধুদের বলিলেন,—"এটা আমার ঘোড়া, কেউ যেন আবার নিয়ে সরে না পড়ে। এই চিহ্ন দিয়ে রাখলাম। যে নেবে তার দিব্যি—" বলিয়া জামার বুক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘোড়াটার ঘাড়ে লাগামের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন।

কে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

—"আসছি," বলিয়া প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে একটু দূরে গেলেন। পরে ভারমুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ঘোড়া ঠিক আছে, বে-দখল হয় নাই।

বলিলেন,—"না, তোমরা দেখছি সবাই ভদ্রলোক, সুযোগ পেয়েও পরস্বে হাত দেও না। হাসছ যে?"

—"আপনি ঘোড়ায় চড়বেন?"

—চটিয়া বীরেনবাবু উত্তর দিলেন,—"এতে হাসির কি হল?" আমি ঘোড়ায় না চেপে ঘোড়াটা আমার উপর চাপবে ভেবেছিলে না কি?"

"আমরা তো সেই আশাতেই আছি।"

বীরেনবাবু কহিলেন,—"বৃথা আশা তোমাদের। জান, আমার ঠাকুর্দা ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখতে যেতেন? আমি তাঁরই পৌত্র।"

অশ্বারোহণের উপযুক্ত সজ্জা করিয়া তিনি প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু একা নিজের চেষ্টায় তিনি ঘোড়াটার পিঠে উঠিয়া বসিতে পারিতেছিলেন না।

বলিলেন,—"দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছ কেন? একটু সাহায্য কর না।"

বন্ধুরা ঠেলিয়া-ঠুলিয়া এই আড়াইমণি মাল ঘোড়ার পিঠে উঠাইয়া দিলেন। ঘোড়া আগাইয়া চলিল। পিছন হইতে বন্ধুদের হাসির শব্দ শুনিয়া অশ্বারোহী ঘাড় ফিরাইলেন, কিন্তু হাসির কারণটা অনুধাবন করিতে পারিলেন না।

পরে ঘাড় ফিরাইয়া সম্মুখে চাহিয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বসিয়া আছেন, আর সামনে থাকিয়া দড়ি ধরিয়া একটা ছোঁড়া ছেলে জীবটিকে আগাইয়া লইয়া যাইতেছিল—এই দৃশ্যটাই বন্ধুদের হাসির হেতু।

বীরেনবাবু চটিয়া ছেলেটাকে একটা ধমক দিলেন—"এই উল্লুক, দড়ি ছেড়ে দে বলছি। আমাকে পেয়েছিস কি শুনি?"

ছেলেটা ভয়ে দড়িটা খুলিয়া লইল।

বীরেনবাবু দুই হাতে লাগাম ধরিয়া দুই হাঁটুতে ঘোড়াটার কুক্ষিদেশে কষিয়া দুই গুঁতা দিলেন, অর্থাৎ ঘোড়াকে ঘোড়ার মত চলিবার নির্দেশ দিলেন। ঘোড়া এ আদেশ পালন করিল।

পিছন হইতে বন্ধুরা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে চীৎকার করিলেন,—"বীরেনদা, নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।"

বীরেনবাবু নামিলেন না, কারণ তাঁর নামিবার মত অবস্থা নয়।

তিনিও উত্তর দিলেন—"খামাকা কেন পরিশ্রম করতে যাই, ভালো বুঝলে ওই থামিয়ে দেবে।"

তাহাই হইল। ঘোড়াটা ভালোই বুঝিল, ফলে বীরেনবাবু ধাবমান অশ্ব হইতে পথের উপর ছিটকাইয়া গিয়া পড়িলেন।

তখনও পাহাড়ী পথ শুরু হয় নাই, বনের পথের ধুলো সর্বাঙ্গে মাখিয়া বীরেনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জামা-কাপড় ঝাড়িবার চেষ্টাও করিলেন না। বন্ধুরা দৌড়াইয়া আসিলেন এবং একসঙ্গে অনেকের হাত লাগিয়া গেল ধুলো মার্জনা করিয়া বীরেনবাবুকে চলনসই করিতে।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—"লাগেনি তো?"

বীরেনবাবু উত্তর দিলেন,—"লাগবে? কেমন কায়দায় উপর নাবলাম দেখলেন না।"

আমার বিস্মিত প্রশ্ন হইল,—"নাবলেন কোথায়? আপনি তো ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লেন।"

বীরেনবাবু প্রতিবাদ করিলেন—

—"না পড়িনি, ঘোড়াই ফুরিয়ে গেল।"

উত্তর শুনিয়া বন্ধুরা হাসিয়া উঠিলেন।

ঘটনাস্থল বনের পথ বলিয়া তাঁহারা হাসিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দারোগাবাবু যেখানে আমাকে ঘোড়ার পিঠে অর্থাৎ হাতে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেখানে এ সব হাসিই শোকের কান্না হইয়া যাইত। ধাবন্ত ঘোড়ার পিঠে আসন টলিতে টলিতে অবশেষে পুচ্ছের উপর দিয়া পিছলাইয়া আরোহীর পতন ঘটিলে, সে-পতন পথের উপরই শেষ হইত না, আরও খানিকটা, এই পাঁচ ছ'শত হাত, গড়াইয়া নীচে ঐ খাদে গিয়া তবে সে পতন থামিতে পারিত।

ভাবিতেও গায়ে কণ্টক দেয়। যাক্ বুদ্ধির জোরে বাঁচিয়া গিয়াছি, বুদ্ধি করিয়াই তো ঘোড়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ও তো ঘোড়া প্রত্যাখ্যান নহে, আসলে মৃত্যুকেই ফিরাইয়া দিয়াছি। অতবড় বুদ্ধিমান চাণক্য ব্রাহ্মণ, তিনি কি আর না জানিয়াই বলিয়াছিলেন যে, শত হস্তেন বাজিনা। বাজিনার স্থলে অনেকে পাজিনা বলিয়া থাকেন, তাতেও অর্থের অসঙ্গতি হয় না। বরং চাণক্যের তালিকাটি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হইবার সুযোগ পায়।

এত বুদ্ধি সত্ত্বেও কিন্তু একটা ক্ষোভ মনে তখন জাগিয়াছিল যে, যদি ঘোড়ায় চড়িতে জানিতাম। ঘোড়ায় চড়িতে পারি না, এটাকে আমি অক্ষমতা বলিয়াই মনে করি। এমন কি পৌরুষ যেন এই ত্রুটিতে একটু ম্লানই হয়। অশ্বারোহী ছবিটির মধ্যে মানুষের পৌরুষ ও তেজ যত প্রকাশিত, তা তার কম মূর্তিতেই দেখা যায়।

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশে পোস্ট অফিস দেখা গেল। সামনে একটা শুকনো ঝরণার পাথর-নুড়ি বিছানো পথ, তার উপর একটা পুল। পুলের ডাহিনে পাহাড়টার উপরই ফোর্ট, তার পশ্চিম দিকটা গাছপালার ফাঁকে এখান হইতেই বেশ দেখা যাইতেছে।

ঐ বক্সা দুর্গ। শেষটা তবে আসাই গেল।

কোমরের ব্যাপারটা খুলিয়া লইলাম, মালকচ্ছ মুক্ত করিয়া দোদুল্যমান কোঁচাতে পরিবর্তন করিলাম এবং পাঞ্জাবীর গুটানো আস্তিনকে ঢিলা করিয়া দিলাম।

শরৎবাবুকে কহিলাম,—"নিন, কাপড়-জামা ঠিক করে ভদ্রলোক সেজে নিন।"

"আপনি নিন। ভদ্রলোক আবার সেজে ভদ্রলোক হয় কেমনে? আমি ঠিক আছি।"

না, শরৎবাবুকে যত সরল মনে করিয়াছিলাম, তা নয়। ভিতরে প্যাঁচ যথেষ্টই আছে। যাক্, একজন কাপড়-জামা ঠিক করিয়া ভদ্রলোক সাজিলাম এবং আর একজন কাপড়-জামা ঠিক না করিয়াই ভদ্রলোক রহিয়া গেলেন। তারপর আমরা এই দুই মূর্তি অপরাহ্ণের শেষের দিকে দুর্গের তোরণদ্বারে আসিয়া থামিলাম।

ঢুকিবার মুখে একবার শুধু ভাবিলাম যে, এ যদি অভিমন্যুর চক্রব্যূহ না হয়, তবে বাঁচিয়া থাকিলে নির্গমন পথে বাহির হইতে একদিন পারিবই।

মনের কানে কানে মন্ত্র শুনাইলাম,—মাভৈঃ, ভয় নাই। (ক্রমশঃ)

লিন-য়্যু-টাঙ

শ্রীশুভময় ঘোষ

আমার এক বন্ধু আমায় একবার লিন্-য়্যু-টাঙের একটি ছবি পাঠিয়ে তার নীচে লিখেছিলেন, "The greatest rogue" আমি তাতে প্রচুর আপত্তি করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, "লিন্-য়্যু-টাঙ হচ্ছেন loafer, rogue নন।" Rogue যে-কেউ হতে পারে, খাঁটি loafer হওয়া সত্যিই সাধনার ব্যাপার।

লিন্-য়্যু-টাঙকে আমি দেখিনি। তবুও লিন্-য়্যু-টাঙ বলতেই আমি কল্পনায় দেখি এমন একজন লোককে—যাঁর গায়ে লম্বা আলখাল্লা আর ঢিলে পায়জামা, মুখে সরু চুরুটের মত পাইপ, হাত দুটো তার পেছন দিকে জোড়া করে ধরে রেখেছেন, একটা আধখোলা বই—এই অবস্থায় ভদ্রলোক ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাগানের মধ্যে, চোখ দুটো তার খুশিতে জ্বলজ্বল করছে। মুখে তার যদি "এই ত ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়" গানটা লেগে থাকত ত মোটেই বেমানান হত না। পৃথিবীতে যে অল্প কয়জন সত্যিকারের প্রকৃতিস্থ লোক আছেন, তাঁদের মধ্যে লিন্-য়্যু-টাঙ একজন। অন্যেরা ওঁকে বলবে cynic কারণ পৃথিবীব্যাপী এই বিরাট cynic গোষ্ঠীর মধ্যে ইনি সত্যিই sane। আমরা সবাই cynic, তাই বুঝি না যে আমরা যাঁদের cynic বলি তাঁরাই আসলে খাঁটি লোক। আমাদের মতে যেটা cynicism, সেটাকে লিন্ বলেন "refreshing wind, কেউ কেউ বলেন লিন্ জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চান। কারণ লিন চান এ রকম একটি জীবন, মহাকবি Li Po' যার বর্ণনায় বলেছেনঃ—

"এক পাত্র মদ নিয়ে ফুলেদের মাঝে
একা আমি পান করি সঙ্গী নেই কেউ।
চাঁদকে নিমন্ত্রণ পাঠাই,
আমার এই পানের আসরে
আর আসে ছায়া, এই তিন সঙ্গী মোরা।"

যান্ত্রিক যুগে রাজনীতি আর ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিতে আচ্ছন্ন যে জীবন, সেটা হল জীবনের বিকৃতি। জীবন থেকে সরে গিয়ে আমরা এই বিকৃতিতেই মজে গেছি। লিন্-য়্যু-টাঙ পালাতে চান এই বিকৃত জীবন থেকে। তিনি যে জীবনে ফিরে যেতে চান, সেটাই হল সুস্থ। "গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা"ই হল বেশী সত্য "শেয়ার মার্কেট" আর ডাউনিং স্ট্রীটের চেয়ে। "Importance of Living"এ সেটাই তিনি আমাদের বোঝাতে চান।

লিনে'র বাবা ছিলেন পুরোহিত। তবে যৌবনে তাঁকে অনেক দুঃখ-দারিদ্র্যের সামনে আসতে হয়। তিনি প্রথমে ছিলেন একজন ফেরিওয়ালা; বাড়ি বাড়ি মিষ্টি বিক্রী করাই ছিল তাঁর কাজ। তাঁর মনটা ছিল খুব দরাজ আর ছিল "as warm a feeling for mankind as any son can be proud of in his father." বাবার এই দুটো গুণই লিন্ পেয়েছেন। মানুষই হল লিনের কাছে সবচেয়ে উঁচুতে। ভগবানের কথা তিনি ভাবেন না। তাঁর মতে মানুষই হল সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই অসাধারণ মানবপ্রীতি লিন্ তাঁর বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। আর একটি জিনিস লিন্ তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন, সেটি হল তাঁর বাবার ভবঘুরে মনটি। লিন্-এর মনটা তাঁর প্রভাবেই খাঁটি loafer হয়ে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবীকে লিন্ ভালবাসেন। স্বর্গের জন্য তাঁর লোভ নেই, নরকের ভয়ে তিনি একটুও চিন্তিত নন। যা কোনদিন পাব না, যাকে কোনদিন জানতে পারব না, তাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া এই পৃথিবীর প্রতি অমনোযোগী হওয়া বোকামী। লিন্ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে চান আনন্দের সঙ্গে। বাঁচতে হবে, ভাল ভাবে বাঁচতে হবে, জীবনটাকে উপভোগ করতে হবে—এইটেই হল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় কথা। দর্শনের কাজ হল জীবনকে সহজ আর সুন্দর করে তোলা। আমরা জীবনটাকে দেখি যত জটিলতার মধ্যে দিয়ে। জীবনের কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলে লিন্ বিশ্বাস করেন না। তাঁর কাছে জীবনটাই প্রধান, জীবনের উদ্দেশ্যটা নয়—

"I think we assume too much design and purpose altogether... Had there been a purpose or design in life, it should not have been so puzzling,

প্যারিসে পণ্ডিত নেহরুর সহিত লিন্-য়্যু-টাঙের সাক্ষাৎকার

vague and difficult to find out." জীবনকে নিতে হবে সহজ ভাবে, হালকা ভাবে। ছোট ছেলেদের সরল মনটাকে ফিরিয়ে আনা চাই, নইলে পৃথিবীর এই গণ্ডগোল থামবে না। লিনের জীবনে বুদ্ধির ওপরে থাকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আর অনুভূতি। তাঁর দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল—প্রথম, শিল্পের ভেতর দিয়ে জীবনের সম্পূর্ণ রূপটা দেখা; দ্বিতীয়, দর্শনের ভেতর দিয়ে সহজ সরলতায় ফিরে যাওয়া; তৃতীয়, রোমাঞ্চকর ব্যাপারে নিখুঁত বোঝাপড়া। এর শেষ ফলটা হল, "a worship of the poet, the peasant, and the vagabond."

তবে সম্পূর্ণ বাঁধনছাড়া জীবন, জীবনের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে বলে লিন্ বেছে নিয়েছেন একটা মাঝামাঝি রাস্তা, সেখানে কনফুসিয়াস-এর নীতি Tesseর প্রচারিত 'স্বর্গমান' হল তাঁর আদর্শ। সেখানে কাজ হবে খেলা, আর খেলা হবে কাজ।

লিন্ জন্মেছেন খৃষ্টানের ঘরে, লেখাপড়া করেছেন খৃষ্টান স্কুলে, কিন্তু তিনি মোটেই খৃষ্টান নন। নিজেকে তিনি সব সময়েই Pagan বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। লিন্-য়ু-টাঙকে কোন একটা বিশেষ ধর্মের খাঁচায় পুরে দেওয়া যায় না। ধর্মটা তাঁর কাছে হল অত্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিনি যে ধর্মের লোক, সেটা তাঁর নিজের তৈরী। খৃষ্টান ধর্মের মানুষকে ভগবান করে তোলার চেষ্টায় তাঁর প্রচুর আপত্তি। সেদিক দিয়ে প্রাচীন গ্রীকধর্ম তাঁর পছন্দ। গ্রীকরা মানুষকে ভগবান করতে চাননি, তাঁরা বরঞ্চ ভগবানকেই মানুষ করে তুলেছেন। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "এ যুগের খৃষ্টধর্মের মূল ধারাই হল পাপের উপদেশ। কাউকে খৃষ্টান করতে হলে প্রথমেই তাকে বোঝাতে হবে যে সে পাপী। প্রচলিত সব ধর্মমতের বিরুদ্ধেই তাঁর প্রধান অভিযোগ হল এই যে, সব ধর্মেই স্ফূর্তির সঙ্গে বেঁচে থাকাটাকে পাপ বলে প্রচার করা হয়। ধর্মের নামে কষ্ট পাওয়াটাই হল পুণ্য। এ ছাড়া, সব ধর্মেই বলা হয় যে, বাইরে কোনও মহাশক্তির সাহায্য ছাড়া মানুষ নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। মানুষের প্রতি লিন্-এর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। মানুষ নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারে, সে কথা তিনি মানেন।

লিন্-য়ু-টাঙ-এর লেখা পড়ে অনেকেই বলেন যে, ওঁর মতের কোন ঠিক নেই, লিন্ কোন বিষয়েরই গুরুত্ব দেন না। আমরা যেটাকে গুরুত্ব বলি, সেটা আসলে হচ্ছে গোঁড়ামি। লিন্ কখনও গোঁড়া হতে পারেন না, কারণ তাঁর বুদ্ধিটা সহজ আর স্বাভাবিক।

"Seriousness, after all, is only a sign of effort, and effort is a sign of imperfect mastery....He is serious, because he has not come to feel at home with his ideal."

কোন রকম নক্সাকাটা বাঁধাধরা নিয়ম তাঁর কাছে অসহ্য। মনের চাঞ্চল্যই হল মনের সুস্থতার পরিচয়। মানুষের ওপর লিন্ এখনও আস্থা হারাননি, তার কারণ হল মানুষের মনের চাঞ্চল্য এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। মনের এই অস্থিরতাই মানুষকে আবার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে বলে লিন্-য়ু-টাঙ-এর বিশ্বাস।

লিন্-য়ু-টাঙ হলেন খাঁটি চীনে পণ্ডিত। তাঁর দার্শনিক মতামতগুলো চীন দেশেরই বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমের জ্ঞানের রাজ্যেও তাঁর অবাধ গতি। পশ্চিমের বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে তাঁর বাউণ্ডুলে হৃদয়ের সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ তিনি অনেক লিখেছেন। এ ছাড়াও পুরোনো চীনে পণ্ডিতদের লেখা অনেক বই ইংরিজীতে অনুবাদ করেছেন। চীন দেশের সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, দর্শনকে তিনি তুলে ধরেছেন বিদেশীদের সামনে। চীন দেশের বিরাট সভ্যতার একটা দরজা তিনি খুলে দিয়েছেন বিদেশীদের জন্য। শুধু চীন নয়, ভারতবর্ষের জ্ঞানগরিমা সভ্যতার কথাও তিনি প্রচার করেছেন বিদেশীদের কাছে—তাঁর Wisdom of China & India নামে বিরাট বইটি একটি অত্যাশ্চর্য রচনা। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে যে কয়জন মনীষী চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে লিন্-য়ু-টাঙ একজন। গত চীন-জাপান যুদ্ধের সময় লিন্-য়ু-টাঙের জীবনের আর একটা দিক দেখা যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে তিনি যুদ্ধের আসল চেহারাটা দেখে এসে লিখলেন,—Vigil of a Nation আর A leaf in the storm বই দুটি। সমস্ত চীন যখন হতাশার অন্ধকারে কালো হয়ে গেছে, তখন তিনি লিখলেন,—A personal story of the Sino-Japanese war", (এই লেখাটি my Country and my people বইয়ের ১৯৩৯ সালের সংস্করণে যোগ করে দেওয়া হয়েছে।) এই লেখায় চীনের জীবনীশক্তি আর যুবশক্তির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আর অটল বিশ্বাস, সবার মনে এনেছিল আশার আলো। শুনেছি লিন্-য়ু-টাঙ চীনে হরফের টাইপ রাইটারও নাকি আবিষ্কার করেছেন। পুরনো-কালের অনেক চীনে পণ্ডিতকেই একসঙ্গে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, আর পাণ্ডিত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত।

লিন্-য়ু-টাঙের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। তাই তাঁর লেখার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। লিন্-এর লেখা পড়ে প্রথমেই যেটা সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে, সেটা হচ্ছে তাঁর সহজ কথা খুব সহজ ভাবে বলবার অসাধারণ শক্তি। তিনি যা বলেন সেটাও খুব সহজ, যেভাবে বলেন সেটা আরও সহজ। এই জন্যই তাঁর লেখা এত সুন্দর। এর ওপর আছে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ। wit আর Humourএ তাঁর লেখা ঝলমল করতে থাকে। লিন্-য়ু-টাঙ লেখার স্টাইল আর টেকনিক নিয়ে মাথা ঘামান না। "কি ভাবে বলব" সেটা তাঁর কাছে বড় কথা নয়, "কি বলব" সেইটেই বড় কথা। তাঁর মতে,

"The technique of writing is to literature as dogmas are to the church—the occupation with trivial things by trivial minds."

শিল্পীর ব্যক্তিত্ব (artistic personality)'ই হল প্রধান। লিন্-য়ু-টাঙের লেখায় অনাবশ্যক সাজগোজ একেবারেই নেই, খুব পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষায় তিনি লেখেন। লেখায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলোই প্রকাশ করেন। নিজের ভাবনা, আর অনুভূতির কথা, নিজের সত্যিকারের ভালবাসা আর ঘৃণার কথা, নিজের ভয় আর খেয়ালের কথা তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে। তিনি যা বলেন, তা নির্ভয়েই বলেন। লোকের ঠাট্টার ভয় তিনি করেন না; তাঁর মত প্রাচীন আর আধুনিক মনীষীদের মতের বিরুদ্ধে গেল কিনা সেদিকেও তাঁর নজর নেই। লেখার মধ্যে 'আমি' না বলতে করতে যে ভয় পায়, তাকে লিন-য়ু-টাঙ বড় লেখক বলে মনে করেন না। লেখা হল তাঁর কাছে গল্প করার মত। সাহিত্যের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম থাকতে পারে না। প্রাণ আর গতি নিয়েই সৌন্দর্যের সৃষ্টি। পাহাড়ের মধ্যে একটা খাপছাড়া ভাব আছে বলেই, পাহাড় সুন্দর। সাহিত্য কখনও নিয়মমাফিক চলতে পারে না, একটু 'নিয়মহারা হিসাবহীন' না হলে সমস্ত সৌন্দর্য মারা পড়বে।

শেষ করার আগে আবার এ কথা বলব যে, লিন-য়ু-টাঙ হচ্ছেন মধ্যপন্থী। তিনি নিষ্কর্মা, অথচ খুবই কাজের লোক। "Fairly careful, but not altogether carefull."

এই জীবনই হ'ল লিন-য়ু-টাঙের জীবন।

বাংলার শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনা

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের ধর্ম ও সাহিত্যে যে দুইটি প্রধান ধারা বহু শতাব্দী ধরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের কাব্য অভিব্যক্তিতে একটি বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। মঙ্গল কাব্যগুলিতে শক্তি পূজার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা অনেকটা বহিরঙ্গমূলক; তাহাতে আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের বাহুল্য ও ভক্তের পূজা করিবার যে আগ্রহ তাহা অপেক্ষা দেবতার পূজা পাইবার লোভ প্রবলতর। পূজার উদ্দেশ্যও সাংসারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রলোভনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে সাধনার যে গভীর, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অন্তরঙ্গ আত্মনিবেদনের মাধুর্য আছে, মঙ্গল কাব্যের শক্তি পূজায় ভক্তি তাহার তুলনায় অনেকটা নিম্নস্তরের—সাহিত্যিক গুণেও উভয়ের মধ্যে অনেকটা তারতম্য। আখ্যান কবিতায় বাস্তব প্রতিবেশ চিত্র ও ঘটনা বিবৃতিই বিশুদ্ধ ভাবাবেগ অপেক্ষা প্রধান। কিন্তু ক্রমশঃ বৈষ্ণব সাধনার অন্তরঙ্গ সুর ও বিগলিত ভাবাবেশ মাধুর্য শাক্ত কাব্যেও সংক্রামিত হইল—দেবীর স্তব স্তুতির মধ্যে ভক্তের আত্মসমর্পণ ও একান্ত নির্ভরের ভাবটি বৈষ্ণব কবিতার প্রভাবের ফলস্বরূপে ফুটিয়া উঠিল। তারপর সপ্তদশ শতক হইতে বৈষ্ণব কবিতা ক্রমশঃ নিজ প্রাণশক্তি হারাইয়া গতানুগতিক ভাষা ও ভাবের কৃত্রিম বন্ধনে বাঁধা পড়িল। ইহার অলঙ্কার ভক্ত হৃদয়ের অনুভূতিকে ছাপাইয়া উঠিল। যে অনুপাতে বৈষ্ণব কবিতায় ভাঁটা পড়িল, ঠিক সেই অনুপাতেই শাক্ত কবিতা জোয়ারের পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। শীর্ণ ধমনী হইতে রক্তধারা পুষ্ট শিরা উপশিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। পূর্ণিমা প্রভাতে যেমন ম্লানায়মান চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে উদয়োন্মুখ সূর্যের রক্তিম আভা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ বাঙলার সাহিত্যাকাশে বৈষ্ণব কবিতার পূর্ণচন্দ্র অস্তাচলে হেলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত সাধনার সৌরকরজাল প্রখর হইয়া উঠিল। বাঙলা সাহিত্যে শক্তিকেন্দ্র ও প্রাণশক্তির আধার স্থানান্তরিত হইল। এই পরিবর্তনের ক্রমস্ফুরিত ইঙ্গিত ও বিক্ষিপ্ত ধারাগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে রামপ্রসাদের সাধনায় ও গানে।

মনে হয় যে, এই পরিবর্তনের পিছনে বাঙলার সমাজ ও পরিবার জীবনও সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। বৈষ্ণব পদালীর অলৌকিক রস, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার নিগূঢ় সাধনা, ভগবানকে কান্তরূপে উপলব্ধি করিবার অসামান্য অনুভূতি ক্রমশঃ সমাজ জীবনের বাস্তব সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল। বাঙলার সমাজ ব্যবস্থা যতই দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিল, ইহার স্বাধীন প্রেম চর্চার, ইহার অসামাজিক হৃদয় বৃত্তির অনুশীলনের অবসর ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল ইহার মধ্যে অভাবনীয়ের আবির্ভাবের রন্ধ্র পথগুলিও সেই পরিমাণে রুদ্ধ হইল। শুধু স্মৃতি, অধ্যাত্ম সাধনা ও সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবির ভিতর দিয়া পরকীয়া প্রেমের নিগূঢ়, মর্মদাহী আনন্দ ও তীব্র ভাবোচ্ছ্বাস বেশী দিন আস্বাদ করা যায় না—পুঁথির সঙ্গে বাস্তব জীবনের সংযোগ সূত্রটি ছিন্ন হইলে জীবন প্রবাহিত রসধারা পুঁথির কল্পনা বিলাসের মধ্যে নূতন সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতে পারে না। চণ্ডীদাস ও রামীর মধ্যে পাগল করা প্রেমের সম্পর্কের কিংবদন্তী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না, তবে ইহার সাঙ্কেতিক তাৎপর্যটির যাথার্থ্য অস্বীকার করা অসম্ভব। এই প্রেম কাহিনী চণ্ডীদাসের অনুপম প্রেম কবিতাগুলির অপরিহার্য ভূমিকা—জীবনের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে তাঁহার পদাবলীর আকুল, আন্তরিকতার হৃদয় গলানো অন্য উৎসমুখ আবিষ্কার করা দুরূহ। এই কিংবদন্তীতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ করে যে, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিতা শুধু অনাবিল ভক্তি ও ঐতিহ্যের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছাড়াও কবির জীবন উৎসারিত গভীর উপলব্ধির অপেক্ষা রাখে। এই উপলব্ধি অতি মাত্রায় সংযত ও শৃঙ্খলিত সমাজ জীবনে ক্রমশঃ অধিকতর দুর্লভ ও অনধিগম্য হইয়া উঠিতে লাগিল। রঘুনন্দনের কঠোর অনুশাসনের উদ্যত দণ্ড ব্রজবাঁশরীর অনেকগুলি সুরকেই স্তব্ধ করিয়া দিল, বাঙালী জীবনের বাস্তব প্রতিবেশে চিরকিশোর-কিশোরীর অপরূপ প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি ক্রমেই সুদূর ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বাঙালী কবির সৃষ্টিদৃষ্ট ও হৃদয়ানুভূতি হইতে আদর্শ প্রেমিকের ছবি ম্লান হইা তাহার পার্শ্বে মহিমময়ী মাতৃমূর্তি উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিল। পারিবারিক কেন্দ্র প্রণয়িনী হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জননীতে সংলগ্ন হইল। সমাজের প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার তরুণ জীবনের অসম্ভব, অবাস্তব কল্পনা, তাহার প্রণয়ের মোহাবেশ, তাহার হৃদয়াবেগের সীমালঙ্ঘী প্রসার, তাহার অভিসার যাত্রার অসীম আকুতি সঙ্কুচিত হইয়া বাস্তব জীবনের সহজ সম্ভাব্যতার পরিধির মধ্যে সুস্থির হইল। মা ও সন্তানের সম্পর্কের স্বভাব মাধুর্য, প্রতিদিনকার সংসার-নাট্যে অভিনীত মান অভিমান, আদর আব্দার, সোহাগের পরিমাণ লইয়া কপট অনুযোগের পালা, তাড়নার মধ্যে মাতৃস্নেহের পরিচয় লাভ ও একান্ত আত্মসমর্পণ এই সমস্ত অতি পরিচিত ভাব ও ঘাত-প্রতিঘাতগুলি এক নূতন অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্র রচনা করিল, শক্তি পূজার মধ্যে এক উষ্ণ জীবনী স্রোত ও ভাবগভীরতার সঞ্চার করিল। তন্ত্র সাধনার ফলে বাঙালীর মনে মাতৃপূজার প্রেরণা নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইল। বঁধুর বাধানিষেধ কণ্টকিত, অন্তরের গহন তলে নিরুদ্ধ প্রেমের পরিবর্তে উচ্চকণ্ঠে উদ্ঘোষিত মাতৃনাম দিঙমণ্ডল মুখরিত করিল। সুনিয়ন্ত্রিত বাঙালী পরিবারের মত, বাঙলা ধর্ম জীবনেও প্রণয়িনী অন্তরালবর্তিনী হইয়া মাতার জগদ্ধাত্রী মূর্তির তাঁহার সস্নেহ অভিভাবকত্বের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল। বাঙালীর চিত্ত উদ্ভ্রান্ত ব্যাকুলতার সহিত বৃন্দাবন-পরিক্রমা ত্যাগ করিয়া প্রেম সায়রে লীলা বিহারে ক্ষান্ত হইয়া কালী মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে ভবরত্নাকরের অগাধ জলে নিঃসংশয় নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সহিত ডুব দিল।

ভক্তির এই আধার পরিবর্তনের পিছনে পরিবার কেন্দ্র বিচলন ছাড়াও রুচি ও রসবোধের প্রেরণা ছিল। বহুদিন ধরিয়া অবিমিশ্র মধুর রসের আস্বাদন জনসাধারণের মনে তীক্ষ্ণতর রসের উপভোগের দ্বারা স্বাদ বৈচিত্র্যের স্পৃহা জাগাইয়াছিল। তা ছাড়া চৈতন্য দেবের তিরোভাবের দুই শতাব্দী পরে বৈষ্ণব ধর্মের সামাজিক প্রতিষ্ঠারও কতকটা হ্রাস হইয়াছিল। সহজিয়া সম্প্রদায়ের হাতে ইহার বিকৃতি ও অপপ্রয়োগ যে কিয়দংশে ইহার জন্য দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। মনে হয় যেন এই সময় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীগণ কতকটা সমাজ প্রতিকূলতার জন্য ও কতকটা নির্জন সাধনার সুবিধার জন্য সমাজের কেন্দ্রস্থল পরিত্যাগ করিয়া ইহার সীমান্ত দেশে স্থান গ্রহণ করিতেছিলেন। "বেদ বিধি ছাড়া ত যা বৈরাগী পাড়া" এই বহু প্রচলিত ছড়ার মধ্যে উচ্চ বর্ণের অবজ্ঞা ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেন্দ্রচ্যুতির ইঙ্গিতটি নিহিত আছে। এতদ্ব্যতীত শক্তি পূজার ক্রম-বর্ধমান আড়ম্বর ও উৎসব সমারোহ সাধারণ লোকের চিত্তকে অনিবার্যভাবে ইহার দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল। সমাজের অভিজাত সম্প্রদায় ও

ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারীবর্গ বৈষ্ণব ধর্মের নিরীহ শান্তিপ্রবণতার মধ্যে নিজ উচ্চাভিলাষ ও অধিকার স্পৃহার যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাইতেছিলেন না বলিয়াই শাক্ত আরাধনার দিকেই ঝুঁকিতেছিলেন। বিশেষতঃ উপচার বহুল মহামায়ার অর্চনার মাধ্যমেই তাঁহারা তাঁহাদের নবার্জিত ঐশ্বর্য ও নেতৃত্ব শক্তির আড়ম্বর প্রচারের অধিক সুবিধা পাইলেন। যেমন শারদীয়া পূজার আড়ম্বর ও আতিথেয়তা ও লোকরঞ্জনের আয়োজন-প্রাচুর্য দোল-রাস-ঝুলন প্রভৃতি বৈষ্ণব উৎসবসমূহের পরিমিত ও সাত্ত্বিক ভাব প্রধান অনুষ্ঠানের আকর্ষণ মন্দীভূত করিয়া দিল, সেইরূপ কয়েকটি নিষ্ঠাবান পরিবার ব্যতীত অন্য সর্বত্রই শাক্ত ধর্মের জনপ্রিয়তা বৈষ্ণব ধর্মের মানকে অতিক্রম করিয়া গেল। ভোগ ও প্রসাদের উপকরণ বৈচিত্র্যও এই জনপ্রিয়তা বর্ধনে কম সহায়তা করে নাই—রসনার তৃপ্তি ও ভক্তির আবেশকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। বৈষ্ণবের সাত্ত্বিক, নিরামিষ আহার অপেক্ষা শাক্তের মদ্য মাংসের উপচার সাধারণ লোকের ভোগ স্পৃহাকে প্রবলভাবে উদ্রিক্ত করিয়া অনেক হরি ভক্তকেও শক্তি পূজার উৎসাহী সমর্থকে পরিবর্তিত করিয়াছিল। এইভাবে সর্বত্রই মাতৃ পূজার একটা বিপুল প্রেরণা অনুভূত হইতেছিল। পরিবার জীবনে যে মাতার কল্যাণময় প্রভাব জীবনের নিয়ন্ত্রণে ও সংসার-শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তাহাই অধ্যাত্ম জীবনে, দুর্গা-কালী অন্নপূর্ণা প্রভৃতির লোক-পালিকা মূর্তিতে চণ্ডীর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের অধিষ্ঠাত্রী নিখিল কেন্দ্র শক্তিরূপে, ভক্ত হৃদয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমার সিংহাসন পাতিয়া বসিল। গৃহাঙ্গনের তুলসী মঞ্চে প্রজ্বলিত মিটমিটে স্নিগ্ধ দীপটির ন্যায়ই হরির নৈর্ব্যক্তিক প্রভাব আমাদের প্রাত্যহিক ঘর-কন্নার কাজে জড়িয়া রহিল; কিন্তু উৎসবের উত্তেজনা ও রণ সমারোহে প্রখরতর ব্যক্তিত্বসম্পন্না মাতৃশক্তি আমাদের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দুঃসাহসিকতার অভিযান পথে মেঘরন্ধ্রচ্যুত জ্বলদর্চি রেখার ন্যায় চোখ ধাঁধানো, অগ্নিময় সংকেত নির্দেশ করিয়া চলিল।

এই প্রবহমান পরিবর্তন স্রোতের সূর্য-করোদ্ভাসিত তরঙ্গ শীর্ষ হইতেছেন সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ। তাঁহার সাধনায় ও গানে এই আন্দোলনের সমস্ত পরিবেশ, সমস্ত মহনীয় সম্ভাবনা, সমস্ত আত্মবিশুদ্ধি ও অধ্যাত্ম-মুক্তি—প্রেরণার চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি মূর্ত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যে শক্তিপূজার যে বিকৃত ঔদ্ধত্য, যে অশোভন আত্মপ্রচার প্রবণতা দেখা যায়, রামপ্রসাদে তাহার বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম ভাব-রূপটি পরিস্ফুট। তিনি অভ্রান্ত অনুভূতিবলে ইহার বিধি ও উপকরণের বস্তুবাহুল্য হইতে ইহার খাঁটি ভক্তিরস নির্যাসটি বিবিক্ত করিয়া লইয়াছেন। যেমন বসন্তে নবপল্লব সমারোহের মধ্যে একটিমাত্র কোকিলের কণ্ঠস্বর ইহার মর্মবাণীর অভিব্যক্তি, যেমন দিগন্তপুঞ্জিত জলভরা মেঘের ভিতর একটি বিদ্যুৎচমক বর্ষার স্বরূপের পরিচয়, তেমনি দুরূহ তন্ত্রসাধনার বিবিধ বিধিনিষেধ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির জটিল জালে বন্দী অধ্যাত্মরসসারটিকে রামপ্রসাদ তাঁহার হৃদয়-গলানো, প্রাণমাতানো মা মা ধ্বনির মধ্য দিয়া মুক্তি দিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন গোষ্ঠ-বিষয়ক পদ সমূহের মধ্যে যশোদার হৃদয়মন্থিত বাৎসল্যরস ক্ষরিত হইয়াছে, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে ঠিক তাহারই উলটা দিক—মাতৃস্নেহপিয়াসী সন্তানের ব্যাকুল আর্তি ও অনুযোগ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই দুই রকম গানে মা ও ছেলের স্নেহ সম্পর্কটির দুই বিপরীত দিক মর্মস্পর্শী আন্তরিকতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদে মায়ের জবানী, শাক্ত পদে ছেলের প্রত্যুত্তর। যশোদা জগদীশ্বরকে নিতান্ত অসহায় শিশুরূপে কল্পনা করিয়া নিজের স্নেহাঞ্চলের আবরণে তাঁহাকে সমস্ত অসুবিধা—বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। রামপ্রসাদ জগদীশ্বরীকে অসীম শক্তিশালিনী জানিয়া সাধনা ও ভক্তির দাবীতে তাঁহার এই শক্তিরহস্যের চাবিটি হস্তগত করার প্রার্থী। বৈষ্ণব কবি ভগবৎ মহিমা সম্বন্ধে অন্ধত্বের ভান করিয়াছেন; তাঁহার পদে বাৎসল্যরসের ছদ্মবেশের মধ্যে অপৌরুষেয় শক্তির অনুভবের ব্যঞ্জনা নাই। শাক্ত কবি এই মহিমা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিয়াও ভালবাসার অসমসাহসিকতায় তাঁহার সঙ্গে সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবী করিয়াছেন। একজন চোখের জল ফেলিয়াছেন, অহেতুক আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়াছেন, নানা অমঙ্গল কল্পনা করিয়া উদ্বেগের কশাঘাতে স্নেহের বক্ষস্পন্দন দ্রুততর করিয়াছেন। আর একজন চোখ রাঙ্গাইয়া, ধমক দিয়া, অনুযোগ—অভিমান করিয়া সর্বৈশ্বর্যময়ী মায়ের ঐশ্বর্যের অংশ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছেন। একের ব্যাকুল অনুনয় ও অপরের স্পর্ধিত অধিকার প্রয়োগ—এই দুই এর মধ্যে একই রহস্যের লীলা, একই ভাবের দুই মুখো বিকাশ। ইহাদের মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণব সাধনারীতির আপাত বৈপরীত্যের মধ্যে আসল সাম্যটি চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। এই উভয় সম্প্রদায়ের ছদ্ম কলহের মধ্যে শ্যাম-শ্যামার অভিন্নত্ব উভয়ের নিকটই প্রতিভাসিত—রামপ্রসাদ বৈষ্ণব কবির ভাবভাণ্ডার হইতে দেব ও মানবের মধ্যে এই অন্তরঙ্গতার স্পর্শটুকু আহরণ করিয়া তাহারই স্নিগ্ধ চন্দনপ্রলেপে তাঁহার ভয়ঙ্করী, শ্মশান-চারিণী মাতার অঙ্গরাগ সাধন করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ গান গাহিয়াছেন, কবিতা রচনা করেন নাই। তাঁহার অন্তরের নিবিড়, পরিপূর্ণ অনুভূতি স্বতঃউৎসারিত হইয়া গানের ক্ষুদ্র পাত্রে উপচাইয়া পড়িয়াছে; পাত্রের কারুকার্য বা শিল্পকলাকৌশল সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহার এই গানগুলি সংখ্যায় স্বল্প, আভরণে রিক্ত; কিন্তু অন্তরের সম্পদ যদি কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হয়, তবে রামপ্রসাদের অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠতর কবিতা রচনা করেন নাই। মনে হয় যেন তাঁহার অধ্যাত্ম উপলব্ধি কাব্যকলার হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়া নিজের ভাবে নিজেই বিভোর হইয়া শিশুর কল কাকলীর ন্যায় এক নূতন স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীতে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। তাঁহার ভাষা ভাবের একান্ত
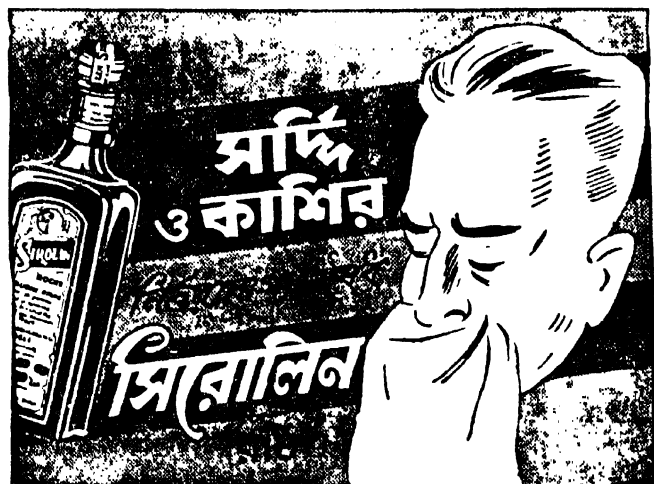
অধীন; তাঁহার শব্দচয়ন অর্থগৌরবের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ ভৃত্য। প্রভুর আদেশ পালন করা ছাড়া তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা উচ্চাভিলাষ নাই। এ যেন রামের পাদুকা শিরোধার্য করিয়া ভরতের রাজ্যশাসন। তাঁহার গানে উপমার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু সে উপমা অভিজাত-বংশীয় নহে, অতি সাধারণ জীবনযাত্রার উপাদান মাত্র। সংসার-চক্রের আবর্তন পথে তিনি যে সমস্ত বস্তু বা কাজ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারাই তাঁহার অধ্যাত্ম-ভাব-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া তাঁহার অন্তর অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। চাষের কাজ, বেড়া বাঁধা, কলুর বলদের চোখে ঠুলি দিয়া ঘানিকাঠের চারিদিকে ঘোরা, জেলের মাছ ধরা, বাজীকরের খেলা, ঘুড়ি ওড়ান, জমিদার প্রজার সম্বন্ধ ইত্যাদি বাঙলার পল্লীজীবনের অতি পরিচিত দৃশ্য ও ভাবগুলি তাঁহার গানে রূপক-গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার সাধকজীবনের ভাব-তন্ময়তার মায়াসৌধের আশ্রয়স্তম্ভ রচনা করিয়াছে। বাঙলার প্রতিদিনকার কাজ ও খেলা, শ্রম ও বিরাম, তাহার জীবনযাত্রার তুচ্ছ, ক্ষুদ্র উপকরণগুলি এক গহন, রহস্যময় সাধনার অঙ্গীভূত হইয়া অভিনব অর্থদ্যোতনায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের বহু পূর্বে সীমার মাঝে অসীম আপনার সুর প্রকটিত করিয়াছে।

সাধারণতঃ যে সমস্ত কবি তর্কবুদ্ধির অতীত মর্মরহস্যের কথা আলোচনা করেন, তাঁহাদের সঙ্গে রামপ্রসাদের একটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ফুটাইতে চর্যাপদের কবিগোষ্ঠী হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই একরকমের না একরকমের সন্ধ্যাভাষা প্রয়োগে একটি ভাবমণ্ডল রচনা করেন; এবং ইহারই সূক্ষ্ম প্রতিধ্বনিময় প্রতিবেশে আভাস-ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনার অর্ধস্ফুট অস্পষ্টতায় অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান। রামপ্রসাদের মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতার লেশমাত্র নাই। তাঁহার নিকট রহস্যের অবগুণ্ঠন ছিন্ন হইয়া পরম সত্যের জ্যোতির্ময় সত্তা স্বচ্ছ সুস্পষ্টতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। চোখে দেখা প্রত্যক্ষ, ব্যবহারিক ঘটনা সম্বন্ধেও যেরূপ অকুণ্ঠিত আত্ম প্রত্যয়ের সহিত বলা কঠিন, রামপ্রসাদ তাহাই নিঃশঙ্ক-চিত্তে ভাবরাজ্যের গহন অনুভূতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অন্ধের ভীরু হস্তসঞ্চালন নাই। সংশয়-কুণ্ঠিত চিত্তের সাবধান পদক্ষেপ নাই, দার্শনিক গোলকধাঁধায় পথভ্রান্ত অনুসন্ধানীর শব্দজাল কুহেলিকায় অর্ধোপলব্ধ সত্যাবিকৃতির কোন চেষ্টা নাই। ইহার কারণ যে এই সত্য কল্পনার প্রদোষালোকে নহে, নিঃসংশয় উপলব্ধির উজ্জ্বল সূর্য কিরণে কবির চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছে। এই নির্ভীক, অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি ধর্মসাধনার কাব্যরূপায়ণের ইতিহাসে খুব বিরল ব্যতিক্রম এবং ইহা রামপ্রসাদের সাধনার অনন্যসাধারণ উৎকর্ষই সূচিত করে।

সাধারণ গান ও সুরের যে সম্বন্ধ রামপ্রসাদী গান ও রামপ্রসাদী সুরের মধ্যে তাহা আরও ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য। এই সুরের মধ্যে বৈরাগ্যের উদাস-করা ব্যঞ্জনা মাখানো আছে। যেমন পালকের সাহায্যে তীর অভ্রান্ত সরল রেখায় লক্ষ্যের দিকে চালিত হয়, তেমনি এই বৈরাগ্যরসাপ্লুত সুরের সাহায্যে রামপ্রসাদের অনুভূত সত্য শ্রোতার মর্মমূল ভেদ করে। এই সুর এই গানের অপরিহার্য বহির্বেশ ও ভাব-রূপায়ণ। রামপ্রসাদ একদিকে যেমন কাব্যোচিত উপমা-অলংকরণের বহিরাভরণ বর্জন করিয়াছেন, তেমনি অভিজাত সুরের সূক্ষ্ম, জটিল কলাকৌশলও পরিহার করিয়াছেন। এ সুর আয়ত্ত করিতে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন হয় না। রাগরাগিনীর ব্যূহভেদের উপযোগী শিক্ষিত পটুত্ব অর্জন করিতে হয় না। ভক্তি মাত্র সম্বল করিয়া, চক্ষে অশ্রুজল, ও কণ্ঠে কিঞ্চিৎ আবেগ-কম্পনের স্পর্শ লইয়াই এ গান গাওয়া যায়। তাই আজও বাঙলার পল্লী অঞ্চলে সর্বস্তরের লোকের কণ্ঠেই এই সরল, মর্মস্পর্শী সুর ধ্বনিত হইতে শোনা যায়। কর্মের ফাঁকে ফাঁকে, বিরল বিশ্রামের অবসরে এই গান গীত হইয়া বাঙলার পল্লীপ্রকৃতির আকাশ-বাতাসকে এক অপরূপ ভাব-ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। বাঙলার সাধারণ লোকের চিত্তবৃত্তি যে রামপ্রসাদী সঙ্গীতের দ্বারা বহুলাংশে গঠিত হইয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। আর কোনও দেশে কবিতার প্রভাব এরূপ বদ্ধমূল ও সুদূরপ্রসারী হইয়াছে কি-না সন্দেহ।

কেহ কেহ রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব বিদ্বেষী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অভিযোগের খণ্ডন তাঁহার গানের মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি কালীকীর্তন ও কৃষ্ণ কীর্তন এই উভয়বিধ গানই রচনা করিয়াছেন। 'কালী হলি মা রাস-বিহারী, সেই শ্যাম সেই শ্যামা' ইত্যাদি সঙ্গীতগুলিতে রামপ্রসাদের সমন্বয়মূলক মনোভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে। যিনি সাধনার গভীরতম স্তরে অবতরণ করিয়াছিলেন, পরম অধ্যাত্ম সত্য যাঁহার স্ফটিকস্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে অনবগুণ্ঠিত হইয়াছে, যিনি ঐশী শক্তির সহিত একেবারে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আরোপ যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈষ্ণব সাধনার মন্ত্র-রহস্য আয়ত্ত করিয়া তিনি ইহা শক্তিপূজায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহাতেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগসূত্রের রাখীবন্ধন বাঁধিয়াছেন। আজ রামপ্রসাদের অন্তর্মুখী সাধনা হইতে আমরা বহু দূরে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি। যে বিষয়-বাসনা সাধকের নিকট বিষবৎ পরিত্যাজ্য তাহাই আজ আমাদের সর্বগ্রাসী লোলুপতার ইন্ধন যোগাইতেছে। আজ উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল বাসনার তাড়নায় আমরা ক্লিষ্ট, জর্জরিত, আমাদের কল্যাণবুদ্ধি, আমাদের শ্রেয়ের সাধনা আজ বিপর্যস্ত, মূর্চ্ছাগ্রস্ত। আজ পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির আকর্ষণে আমরা উদ্ভ্রান্ত; পরের নিকট ঋণ করা সম্পদ আমাদের সুখ শান্তি দিতে অক্ষম, পরন্তু আমাদের প্রাণশক্তিকে পিষিয়া মারিতেছে। আজ ভারতের মহাসভায় বিপুল আড়ম্বরে যে শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে তাহার ভিতর কোথাও তাহার শাশ্বত আত্মার এক ঝলক দীপ্তিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের পূজা আন্তরিকতাহীন; নিতান্ত গতানুগতিকভাবে যখন ভগবানকে ডাকি, তখনও কোন আত্মপ্রত্যয়ের শক্তি স্ফুরিত হয় না। স্বাধীনতা লাভ করিয়াও নিজ উত্তরাধিকার উদ্ধারে আমরা অসমর্থ। এই আদর্শভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত বাঙালী কি আর রামপ্রসাদের সাধনা ও আত্মনিবেদনের হারাণো সুরটি ফিরিয়া পাইবে? তপঃক্লিষ্ট সাধকের মনে মাঝে মধ্যে দৈবী মায়ার প্রভাবে যে গভীর নৈরাশ্যবাদ মোহবিভ্রম জাগায় তাহাই কি আজ রামপ্রসাদের সঙ্গে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র? কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আজ এই কথাই বলিতে ইচ্ছা করেঃ—

রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো

এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে,

ঘরে নিয়ে চলো।

জননীর স্নেহক্রোড়ে প্রত্যাবর্তনের সৌভাগ্য কি আমাদের হইবে?

ভারতে প্রতি বছর চুয়ান্ন কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে সরকারের বার্ষিক আয় হয় গড়ে তেরো কোটি টাকা। এই চা-শিল্পের আয় থেকে দেশ উন্নয়নের নানারকম পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্য করা সহজেই সম্ভব হতে পারে। প্রমাণ স্বরূপ দামোদর বাঁধের কথাই ধরা যাক। এই বাঁধের পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করতে দশ বছর সময় লাগবে এবং তাতে ব্যয় হবে পঞ্চান্ন কোটি টাকা। হিসেব করে দেখা যায় এই সময়ের মধ্যে দামোদর বাঁধের মোট খরচের দ্বিগুণেরও বেশি টাকা আদায় হয় এক চা-শিল্পের রাজস্ব থেকেই। তাই চা আয়েশ-আরামের পানীয়ই শুধু নয়, দেশের সমৃদ্ধিতেও তার দান অনেকখানি।

চা-শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি মোটামুটি তথ্য

- ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ এই তিন বছরের রপ্তানি চা থেকে ১২০ কোটি টাকা মূল্যের সমান বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে।
- চা শিল্প থেকে দেশের প্রায় দশ লক্ষ নরনারী জীবিকা অর্জন করে।
- দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদা মেটানোতে যে পরিমাণ চায়ের প্রয়োজন তার উপর গভর্নমেণ্ট প্রতি পাউণ্ডে তিন আনা করে শুল্ক আদায় করেন এবং রপ্তানির উপর আদায় করেন প্রতি পাউণ্ডে চার আনা। এই দুটি শুল্ক থেকে বছরে প্রায় তেরো কোটি টাকা রাজকোষে জমা হয়ে থাকে।
- এ ছাড়া গভর্নমেণ্ট চা-কোম্পানিদের থেকে আয়কর হিসেবেও বেশ একটা মোটা অঙ্ক পেয়ে থাকেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

রহস্যময়ী

অস্কার ওয়াইল্ড

একদিন দুপুরে কাফেতে বসে কফি খাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম চলমান জনস্রোতকে। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ডাকল। আমি ফিরে তাকালাম। দেখি আমার বহু পুরাতন বন্ধু লর্ড মার্চিসন আমায় ডাকছে। প্রায় দশ বছর ওতে আমাতে ছাড়াছাড়ি। সেই কলেজ ছাড়ার পর আর ওর সংগে দেখা হয়নি। তাই অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় ভারী খুশি হল মনটা। হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য ঢেলে ওর সংগে করলাম করমর্দন।

অক্সফোর্ডে যখন পড়তাম দুজনে, ভারী খাতির ছিল আমাদের। যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল। ওর ঔজ্জ্বল্য, ওর নির্ভীকতা আর সরসতা আমার খুব ভাল লাগত। যদিও ওর কিছু কিছু ত্রুটি ছিল তবু ওর সরলতার জন্যে সবাই ওকে প্রশংসা করত। যাক, ওর চাওনি আর চলাফেরা দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। ডেকে এনে কাছে বসালাম। নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম ওর বিয়ের কথা।

"মেয়েদের আমি বুঝতেই পারি না, বিয়ে করব কি ছাই!" ও জবাব দিল।

"ভুল করেছ, ভুল করেছ ভায়া; মেয়েরা ভালবাসার জিনিস, ওদের বুঝতে যাওয়া বৃথা।" আমি বললাম।

"যাকে বিশ্বাস করি না, তাকে কি করে বিয়ে করি বলত?" বলল ও।

"একটু যেন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি, ভায়া, কি ব্যাপার বলত।"

"চল, একটু বেড়িয়ে আসি," বন্ধুটি বলল, "এখানে বহু লোক। কোন কথা হবে না এখানে বসে।"

আমি একটা হলদে রঙের গাড়ি ডাকলাম, কিন্তু ও বাধা দিয়ে বলল, "উ হুহু, হলদে রঙের গাড়ি নয়। অন্য যে-কোন রঙের গাড়ি নেও তাতে আমার আপত্তি নেই।"

রহস্য যেন আরও একটু ঘন হল। কিছু না বলে সবুজ রঙের গাড়িতে চেপে বসলাম। গাড়ি ছুটে চলল ম্যার্দোলিনের দিকে।

"কোথায় যাবো আমরা?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"চল যেখানে খুশি," ও জবাব দিল, "চল না ভাল একটা রেস্তোরাঁয় যাই।"

"বেশ তো চল। ওখানেই শোনা যাবে তোমার সব গল্প।"

"বেশ।"

ক্ষণপরে আমরা একটা নামকরা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম।

আমি আবার ওকে ওর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেই ও পকেট থেকে রুপো-বাঁধানো ছোট্ট একটা বাক্স বের করে আমার হাতে দিল। আমি বাক্সের ঢাকনিটা খুলে ফেললাম। বাক্সের ভিতর ছিল একটি মহিলার ফটো। মেয়েটি দেখতে একটু লম্বা এবং কৃশ। খোলা চুলে ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"ওর মুখ দেখে কি মনে হয় বলত," বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করল, "চোখ দুটি কি বিশ্বাসঘাতিনীর পরিচয়?"

আমি আবার ফটোটা ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। মেয়েটির চোখ, ওর তাকাবার ভংগী, ওর চুল—সব মিলিয়ে মনে হল যে ও সাধারণ নয়। ওর কি যেন আছে গোপনীয়। কিন্তু তা ভাল কি মন্দ, সে কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়। আমার মনে হচ্ছিল, বহু রহস্য নিংড়ে যেন তৈরী হয়েছে ওর সৌন্দর্য, আর ওর ঠোঁটের স্মিত হাসির আড়ালে রয়েছে কোন এক গোপনীয় রাজ্যের ইংগিত।

এত সময় লাগাতে বন্ধু অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখলে বল না?"

"রহস্যময়ীই মনে হচ্ছে" আমি বললাম, "যাক, বল দেখি ওর সম্বন্ধে সব।"

"এখন থাক," ও বলল, "ডিনারের পর সব বলব।" বলে ও অন্য কথা পাড়ল।

বয় ডিনার দিল। বেশ আরামে দু'বন্ধুতে মিলে খেলাম। খাওয়ার পর সিগারেট ধরাতেই মার্চিসনকে ওর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দু'তিনবার ঘরে পায়চারী করল। তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলতে লাগল:

"একদিন বিকেল পাঁচটায়, বণ্ড স্ট্রীট ধরে হাঁটছিলাম," ও বলল, "একটা অ্যাকসিডেন্ট হওয়ায় রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি কোন রকমে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা হলদে রঙের গাড়ির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি ভাল করে তাকাতেই, যে মেয়েটির ছবি তোমাকে দেখালাম ওর সংগে আমার হল দৃষ্টি বিনিময়। ক্ষণিকের দেখা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না ও মুখ। দিনে রাতে—সব সময়ই চোখের সামনে ভেসে বেড়াত ওই হঠাৎ দেখা নারীর মুখ। আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম। সারা শহরে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম ওই হলদে ব্রুহাম গাড়ি আর তার আরোহিণীকে। কিন্তু পেলাম না। শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, এ আমার দিবাস্বপন। তাই আশা ছেড়ে দিলাম ওর দেখা পাওয়ার। সপ্তাহ খানেক পর একদিন মাদাম দা রাস্তেলের সংগে বসে ডিনার খাওয়ার কথা। আটটায় আমাদের খাওয়ার কথা, কিন্তু সাড়ে আটটা অবধি বসে থাকতে হল ড্রয়িং-রুমে। এর মধ্যে হঠাৎ এক সময় বাড়ির ভৃত্য এসে জানিয়ে দিয়ে গেল, লেডী এলরয়ের আগমনবার্তা। মহিলা ধীরে ধীরে কক্ষে ঢুকলেন। দেখেই আমি চমকে উঠলাম—এই তো আমার সেই স্বপ্নে-দেখা-নারী। আমি পুলকিত হলাম—বিশেষ করে যখন ওর সংগেই আমাকে ডাকল ডিনারে যোগ দিতে। ওর পাশেই বসে পড়লাম খেতে। তারপর এক সময় অতি সাধারণভাবে বললাম, 'কিছুদিন আগে বণ্ড স্ট্রীটে আপনাকে একদিন দেখেছিলাম, লেডী এলরয়।' আমার কথা শুনেই ও পাণ্ডুর হয়ে উঠল। অত্যন্ত নীচু কণ্ঠে বলল, 'এতো জোরে বলবেন না, অন্যে শুনে ফেলবে।' নিজের এই ত্রুটির জন্যে ভারী খারাপ লাগল। যাক, আমি বিষয়ান্তরে চলে গেলাম এবং ফরাসী নাটক নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলাম। ও বিশেষ কিছু বলছিল না—দু'একবার অতি মিষ্টিস্বরে হ্যাঁ কিম্বা না করছিল। ওর সব কথা অন্যে শুনে ফেলবে, এমনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছিল সে। আমি মারাত্মকভাবে ওর প্রেমে পড়ে গেলাম। ওর চারিধারে ঘিরে ছিল যে অব্যক্ত রহস্যময় আবহাওয়া, তা আমার কৌতুহলকে আরও উদ্দীপ্ত করল। ডিনার শেষে ও চলে যেতে উদ্যত হতেই, আবার কবে আমাদের দেখা হবে, তা জানতে চাইলাম। ও এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, অতি সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাল তারপর অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, কাল সপ্টা চটায় দেখা হবে। ও চলে যেতেই মাদাম দা রাস্তেলকে ওর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু মাদাম বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। শুধু জানালেন, মহিলাটি বিধবা এবং পার্ক লেনে ওর একটা চমৎকার বাড়ি আছে।

"পরের দিন ঠিক সময় পার্ক লেনে গিয়ে উপস্থিত হলাম, কিন্তু বাটলার জানালো যে, এইমাত্র লেডী এলরয় বেরিয়ে গেলেন। দুঃখ হল,হতবুদ্ধিও হয়ে পড়লাম কতকটা। তাই

অনেক বিবেচনা করে ওকে একটা চিঠি দিলাম দেখা করার অনুমতি চেয়ে। বেশ ক'দিন কেটে গেল, কিন্তু কোন জবাব এলো না। তারপর হঠাৎ একদিন একখানা চিরকুট পেলাম। তাতে আমাকে জানিয়েছে যে, রোববার দিন চারটার সময় ও বাড়ি থাকবে। সংগে আরও লিখেছে যে, 'আমাকে এ-ঠিকানায় আর চিঠি দেবেন না। দেখা হলে কারণ বলব।' রোববার দিন যথা-নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম ওর বাড়ি। আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করল আমাকে। বলল, ভবিষ্যতে ওকে চিঠি দিতে হলে 'মিসেস নক্স, কেয়ার অফ হুইটকার লাইব্রেরী, গ্রীন স্ট্রীট—এই ঠিকানায় যেন ওকে চিঠি দিই।' বিশেষ কারণে বাড়ির ঠিকানায় চিঠিপত্র আমি পেতে চাই না, ও আমাকে জানাল।

"এর পর বহুদিন আমাদের দেখাশোনা হয়েছে, কিন্তু তার চারধারে কুহেলীর আবরণ কিছুতেই সরাতে পারিনি। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, বোধ হয় কোন শক্তিশালী পুরুষের হাতের মুঠোয় আছে ও—তাই এই রহস্য-আবরণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বিশ্বাস হয়নি। বহু যাদুঘরে এক ধরণের স্ফটিক দেখা যায়—যা কোন সময় থাকে স্বচ্ছ, আবার কোন সময় হয়ে ওঠে কুয়াশাচ্ছন্ন। ও যেন সেই স্ফটিক। তাই ওকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যাক, সব স্বপ্নের অবসান করব বলে স্থির করলাম; ওকে বিয়ে করতে চাই বলে সিদ্ধান্ত করলাম। পরের সোমবার লাইব্রেরীতে ছটায় আমার সংগে দেখা করতে পারবে কিনা, জানবার জন্যে পত্র দিলাম। ওর সম্মতিসূচক পত্র পেয়ে আনন্দ আমার উথলে উঠল। ওর চারিধারে যত রহস্যই থাক, যত গোপনীয় কিছু থাক—তবু ওকে আমি ভালবাসি।"

"হুম," আমি বললাম, "তারপর।"

"সোমবার দিন আমার কাকার সংগে লাঞ্চ খেতে গেলাম। লাঞ্চ খেয়ে রওনা হলাম পিকাডেলের দিকে। হঠাৎ সামনে দেখি লেডী এলরয় চলেছে সারা দেহ আবৃত করে। সেই রাস্তারই শেষ বাড়িটাতে ঢুকে একটা ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। 'হুম, এই বাড়িটাতেই যত রহস্য', আমি নিজের মনে বললাম এবং ভাল করে বাড়িটা পরীক্ষা করলাম। বাড়িটাকে মেসজাতীয় কিছু বলে মনে হল। দোর গোড়ায় ও ওর রুমালটা ফেলে গিয়েছিল, আমি তুলে পকেটে রাখলাম। পরে কি করব, তাই ভাবতে লাগলাম। ওর পেছনে গুপ্তচর বৃত্তি করা উচিত হবে না ভেবে ক্লাবে চলে গেলাম। ছটায় ওর সংগে দেখা করার জন্যে রওনা হলাম। ও একটা সোফায় শুয়েছিল। রুপোর জরির পার দেওয়া চকোলেট রঙের গাউন পরায় ওকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। আমি যেতেই ও বলে উঠল, 'তোমাকে পেয়ে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। তোমার জন্যে সারাদিন আমি বাড়ির বার হইনি।' আমি অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম এবং পকেট থেকে রুমালটা বের করে ওকে দিলাম। 'কামনর স্ট্রীটে এটা তুমি ফেলে এসেছিলে, লেডী এলরয়,' আমি শান্তকণ্ঠে বললাম। ও ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু রুমালটা নিতে চেষ্টা করল না। 'ওখানে কেন গিয়েছিলে,' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'আমাকে ওসব জিজ্ঞাসা করার কোন অধিকার তোমার নেই,' ও জবাব দিল। 'আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে বিয়ে করতে চাই। এই অধিকারেই আমি তা জানতে চেয়েছি', আমি জবাব দিলাম। সে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল এবং ওর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে অশ্রুরাশি বেরিয়ে আসতে লাগল। 'আমাকে সব তোমার বলতেই হবে,' আমি আবার বললাম। ও উঠে দাঁড়াল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে বলার মত কিছু নেই।' 'তুমি সেখানে অভিসারে গিয়েছিলে না?' আমি চীৎকার করে উঠলাম। এই হচ্ছে তোমার রহস্য। ওর মুখ মৃতের মত শাদা হয়ে গেল। বলল, 'না, না, আমি কারু সংগে দেখা করতে যাইনি।' 'সত্য বলার মত সাহস তোমার নেই,' আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম। 'সত্য কথাই আমি বলেছি,' ও জবাব দিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস হল না। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। বোধ হয় অনেক শক্ত কথাই ওকে বলেছি। তারপর ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। পরের দিন ও আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল, কিন্তু আমি তা না খুলেই ফেরৎ পাঠিয়েছি। তারপর এ্যালান কলভিলকে নিয়ে নরওয়ের দিকে যাত্রা করেছি। এক মাস পর ফিরে এসে 'মর্ণিং পোস্টে' দেখলাম, লেডী এলরয়ের মৃত্যু সংবাদ। ফুসফুসের ক্ষত হয়ে ও মারা গেছে। খবর শুনে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। বহুদিন সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী কাটিয়েছি।"

"ওই বাড়িটার খোঁজ নিয়েছিলে তুমি," আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ," ও বলল। "একদিন কামনর স্ট্রীটে গিয়েছিলাম। ওই ঘরটার দরজায় ধাক্কা দিতেই একজন ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। কোন ঘর ভাড়া দেবার আছে কিনা, আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। 'দেখুন,' ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, 'ড্রয়িং রুমটা বোধ হয় ভাড়া দিতে পারব। কারণ যে মেয়েটি ওটা ভাড়া নিয়েছিলেন, তিনি তিন মাস হয় আর আসেন না। ভাড়া বাকী পড়ে গেছে, সুতরাং—' আমি লেডী এলরয়ের ফটো দেখিয়ে বললাম, 'দেখুন তো এই মেয়েটিই ওটা ভাড়া নিয়েছিলেন কিনা।' 'হ্যাঁ, ওই তো ভাড়া নিয়েছিলেন। ও আবার কবে ফিরে আসবে বলতে পারেন?' 'মহিলাটি মারা গেছেন?' আমি বললাম ও'কে। 'সত্যি! ভারি দুঃখের কথা।' ভদ্রমহিলা বললেন, 'ভারী ভালো ভাড়াটে ছিলেন। মাঝে মাঝে আমার ড্রয়িং রুমে এসে বসতেন, এ জন্যেই তিন গিনি করে তিনি সপ্তাহে ভাড়া দিতেন। চমৎকার মেয়ে।' 'কারু সংগে বোধ হয় দেখাশুনা করতে আসতেন এখানে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা তা অস্বীকার করে বললেন যে, ও একাই আসত। ওর সংগে কাউকে এখানে আলাপ করতে দেখেনি। 'তবে এখানে বসে কি করত ও,' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'শুধু শুধু ড্রয়িং রুমে বসে থাকত। কখনও বই পড়ত, কখনও চা খেত।' ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। কি করব ঠিক করতে না পেরে ভদ্রমহিলাকে কিছু পুরস্কার দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বলতে পার এর এত কি? ভদ্রমহিলা মিথ্যা কথা বলেছেন বলে তোমার মনে হয়?'

"না।"

"তবে লেডী এলরয় কেন ওখানে যেত?"

"দেখ বন্ধু, লেডী এলরয়ের ওটা ছিল রোগ। নিজের চারপাশে একটা রহস্যের যবনিকা সৃষ্টি করার রোগ থাকে অনেক মেয়ের; ওরও তাই ছিল। কিন্তু ওর জীবনে ছিল না কোন রহস্য।"

"তোমার কি তাই মনে হয়?"

"নিশ্চয়।" আমি জবাব দিলাম।

বন্ধুটি মরক্কো কেসটি তুলে এর ভেতরের ফটোটি দেখতে লাগল। "আশ্চর্য!" হঠাৎ এক সময় সে বলল।

অনুবাদক: শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

"ক্ষুরস্য ধারা"

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

(পাঁচ)

স্থির হয়েছিল যে, আমরা বাসায় এসে মিলব, তারপর খাওয়ার আগে এক-পাত্র করে ককটেল পান করা যাবে। আমি লারীর পূর্বেই এসে পেঁছেছিলাম। আমি ওদের একটা সৌখীন রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব স্থির করেছিলাম, আশা করেছিলাম, ইসাবেল আয়োজনোপযোগী সাজসজ্জা করবে; সর্বশ্রেষ্ঠ সাজগোছ করে এলেও কেউ যে ওকে ছাপিয়ে যাবে, তা সে হতে দেবে না। এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু দেখলাম, সে সাদাসিধে উলের ফ্রক পরে আছে।

সে বলল: গ্রে'র আবার সেই রকম মাথা ধরেছে, সে কষ্ট পাচ্ছে, ওকে ছেড়ে যেতে পারবো না, এদিকে রাঁধুনিকেও বলেছি মেয়েদের খাইয়ে চলে যেতে, তাই ওর জন্যে নিজেকেই কিছু তৈরি করে খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে—আপনি আর লারী বরং একাই যান।

"গ্রে কি বিছানায় শুয়েছে?"

"না—মাথা ধরলে ও কিছুতেই বিছানায় যাবে না, অথচ তাই যাওয়া উচিত—লাইব্রেরী ঘরে বসে আছে।"

বাদামি ও সোনালি রঙের কাঠের প্যানেল-করা ঘর, এইগুলি এলিয়ট কোন স্যাটো থেকে সংগ্রহ করেছে। বইগুলি পঠনেচ্ছু ব্যক্তির হাত থেকে সযত্নে গিলেটের ঝাঁপ দিয়ে ও তালা লাগানো অবস্থায় সংরক্ষিত। তবে এগুলি বেশির ভাগ অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রিত অশ্লীল গ্রন্থাবলী বলেও হয়ত এই সাবধানতা। মরক্কো বাঁধাই করা অবস্থায় সেগুলি অবশ্য চমৎকার দেখাচ্ছে। ইসাবেল আমাকে নিয়ে চলল। গ্রে একটা চামড়া দেওয়া প্রকাণ্ড চেয়ারে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ছিল, আশেপাশে ছবির কাগজগুলি ছড়ানো রয়েছে। চোখ দুটি বোঁজানো, আর স্বাভাবিক লাল মুখখানি পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। বোঝা গেল, তার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। সে উঠতে চেষ্টা করল, আমি নিষেধ করলাম। ইসাবেলকে প্রশ্ন করলাম, "ওকে এ্যাসপিরিন দিয়েছ?"

"তাতে কোনদিন তেমন উপকার হয় না, আমার একটা আমেরিকান প্রেসক্রিপশন আছে, তাতেও তেমন উপকার হয় না।"

গ্রে বললে, "কিছু ভেবো না ডার্লিং, কালই আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠব।" গ্রে হাসবার চেষ্টা করে, বলে—"ক্রমেই নিজেকে একটা জঞ্জাল করে তুলছি"—তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বলে, "আপনারা সবাই 'বয়'তে জান না।

ইসাবেল বলে ওঠে—"ওকথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, তুমি কি বলতে চাও, তুমি এমন কষ্ট পাচ্ছ জেনেও আমি স্ফূর্তি করতে যাব?"

গ্রে চোখ বুঁজে বলে—"আহা বেচারা, আমাকে ভালোবাসে জানি।"

এর পর ওর মুখখানি সহসা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, সেই মুখে তীব্র বেদনার ছাপ, বোঝা গেল, যন্ত্রণায় ওর মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। আস্তে আস্তে দোরটি খুলে গেল, লারী এসে প্রবেশ করল, ইসাবেল তাকে কি যে হয়েছে তা জানালো।

লারি গ্রে'র মুখের পানে তাকাল, তারপর বলল—"আহা! কোনো রকমে ওকে একটু আরাম দেওয়া যায় না?"

গ্রে বল্‌ল—"কিছুই করা যায় না," তার চোখ তখনও মুদিত, "তবে তুমি বা তোমরা শুধু আমাকে একটু একা থাকতে দিলেই হবে; তোমরা যাও, সময়টা মজায় কাটিয়ে এস।"

আমি ভাবলাম সেইটাই বিবেচনার কাজ হবে, তবে ইসাবেল কি বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করে যেতে পারবে?

লারি বলে ওঠে, "আমাকে একটু দেখতে দেবে, দেখি না কিছু করতে পারি কিনা?"

গ্রে একটু কড়াভাবেই বলে—"কেউই কিছু করতে পারবে না, আমি মরে যাচ্ছি, মাঝে ভাবি ভগবান যেন তাই করেন।"

"আমি হয়ত কিছু করতে পারি কথাটা বলা ভুল হয়েছে, বলা উচিত ছিল তোমাকে দিয়েই কি করাতে পারি দেখি।"

গ্রে ধীরে ধীরে চোখ খুলে লারির মুখের পানে তাকাল।

বল্‌ল: "কি করে কি করবে?"

লারি রৌপ্যমুদ্রা জাতীয় কি একটা বস্তু পকেট থেকে বার করে গ্রে'র হাতে রাখল।

বল্‌লে "হাতটা শক্ত করে মুঠো করে ধর, আর হাতের চেটোটা নীচের দিকে মুখ করে রাখো। আমার বিরুদ্ধে যেয়ো না, কোন চেষ্টাও কোরো না, শুধু এই মুদ্রাটা হাতে জোর করে করে ধরে রাখ, আমি কুড়ি গোণার পূর্বেই তোমার হাত খুলে যাবে আর মুদ্রাটি মাটিতে পড়ে যাবে।"

গ্রে নির্দেশমত কাজ করল। লারি লেখার টেবিলে বসে এক দুই গুণতে শুরু করল। আমি আর ইসাবেল দাঁড়িয়ে রইলাম। এক, দুই, তিন চার—পনের বলা পর্যন্ত গ্রে'র হাত নড়ে নি, তারপর হাত কাঁপতে লাগলে, আর আমার মনে হ'ল, আঙুলগুলি ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। আঙুলগুলি মুঠির ভিতর থেকে খুলে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম আঙুলগুলি কাঁপছে। লারি উনিশ গোণার সঙ্গেই মুদ্রাটি গ্রে'র হাত থেকে পড়ে আমার কাছে গড়িয়ে এল। আমি তুলে নিয়ে দেখতে লাগ্‌লাম—ভারী ও অসমান, আর তার একধারে মোটা করে একটা তরুণের মুখ আঁকা, দেখ্‌লাম আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের মুখ। গ্রে ধাঁধাগ্রস্ত হয়ে নিজের হাতের পানে তাকিয়ে আছে।

সে বল্‌ল: "ওটা আমি ফেলিনি। নিজেই হাত থেকে পড়ে গেল।"

সেই চামড়া বাঁধানো চেয়ারের একটি হাতলে ও ডান হাতখানি রেখেছিল।

লারি প্রশ্ন করল—"ঐ চেয়ারে তুমি কি বেশ স্বস্তি বোধ করছ?"

"বেশ স্বস্তি পাচ্ছিলাম, তারপর মাথার যন্ত্রণা শুরু হ'ল।"

"এখন বেশ ঢিলে হয়ে বস, সহজভাবে জিনিসটা নাও, কিছু কোরো না, বাধা দিও না, আমি কুড়ি গোণার আগেই তোমার ডান হাত চেয়ারের হাতল থেকে তোমার মাথা পর্যন্ত উঠবে—এক, দুই, তিন, চার।"

সেই সুন্দর সুরেলা গলায় লারি সংখ্যাগুলি উচ্চারণ করে যায়, যখন নয় বলা হল, তখন দেখা গেল গ্রে'র হাত চামড়া থেকে সামান্য উঠছে, তারপর ইঞ্চিখানেক ওপরে ওঠার পর পষ্ট বোঝা গেল, এক সেকেণ্ড থেমে রইল।

"দশ, এগারো, বারো—"

সামান্য নড়ল প্রথমে, তারপর সহসা সমস্ত হাতটা ওপর দিকে উঠল—আর সেটি চেয়ারের হাতলে রাখা নেই, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, কোনো স্বেচ্ছাকৃত আন্দোলনের ফল তা নয়। আমি কখনো ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষকে চল্‌তে দেখিনি—কিন্তু এখন অনুমান করতে পারি গ্রে'র এই হাত-তোলার মতই তাদের অবস্থা হয়। মনে হল না যে, ইচ্ছাশক্তিই এখানে প্রবল। আমার ত মনে হ'ল এত ধীরে ও এমন সমতালে সচেতন অবস্থায় হাত তোলা খুব কঠিন। সিলিণ্ডারের ভিতর পিসটন

যেমন ধীরগতিতে এদিক ওদিক করে, এও যেন সেইরূপ।

"পনের ,ষোলো, সতের—"

অতি ধীরে ধীরে কথাগুলি বেরোতে লাগল, যেন কোন পাত্র থেকে জল টপ টপ করে পড়ছে। গ্রে'র হাতে ধীরে ধীরে ওর মাথার ওপর উঠল, তারপর লারী যে সংখ্যা পর্যন্ত বলতে বলেছিল, তা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গেই হাতটি নিজের ভারেই সেই চেয়ারের হাতলে পড়ে গেল।

গ্রে বলল: "আমি নিজে হাত তুলিনি, হাতটা ওভাবে না উঠিয়ে যেন পারলাম না, আর হাতটি যেন স্বেচ্ছায় এমন করেছে।"

লারী মৃদু হাসল।

"তাতে কিছু এসে যায় না, আমি ভাবলাম এতে হয়ত আমার ওপর তোমার বিশ্বাস বাড়বে, সেই গ্রীক মুদ্রাটি কই?"

আমি সেটি দিলাম।

"নাও এটি হাতে করে রাখ।" গ্রে সেটি নিয়ে নিলো। লারি তার ঘড়ির পানে তাকিয়ে বলল: এখন আটটা বেজে তের মিনিট। ষাট সেকেণ্ডের ভিতর তোমার চোখের পাতা ভারী হয়ে যাবে, আর তোমাকে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। তুমি ঠিক ছ'মিনিট ঘুমাবে। আটটা কুড়িতে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে, আর একটুও বেদনা থাকবে না।"

ইসাবেল বা আমি কেউ কোনো কথা বললাম না। আমাদের চোখ রইল লারির দিকে। সে আর কিছুই বলল না, তার দৃষ্টি গ্রের দিকেই আবদ্ধ রাখল, কিন্তু যেন তার দিকে তাকিয়ে নেই, বরং মনে হল সে যেন সব ভেদ করে সুদূরে তাকিয়ে আছে। আর একটা যেন ভৌতিক স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল; রাতে ফুলবাগানে যেমন একটা নীরবতা থাকে, এ যেন তেমনই। সহসা অনুভব করলাম ইসাবেলের হাত শক্ত হয়ে এল। আমি গ্রে'র পানে তাকালাম—তার চোখ বন্ধ। সে বেশ সহজভাবে নিয়মিত নিশ্বাস ফেলছে, আর নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আমরা যেন অন্তহীন কাল ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার সিগারেট ধরাবার তীব্র বাসনা হচ্ছিল, কিন্তু ধরালাম না। লারি নিশ্চল, নিস্পন্দ; তার চোখ কোন সুদূরে চলে গেছে জানি না। চোখ দুটি খোলা না থাকলে মনে হত তার ভাব সমাধি হয়েছে। সহসা মনে হল যে, যেন একটু হাত-পা ছড়াল, তার চোখের ভঙ্গী বেশ স্বাভাবিক হয়ে এল; তারপর সে ঘড়ির দিকে তাকাল। এই রকম করামাত্র গ্রে তার চোখ খুলল।

সে বলল: "গস্—মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।" তারপর সে নড়ে বসল, আমি লক্ষ্য করলাম তার মুখ থেকে সেই তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন লোপ পেয়েছে। সে বলল, "আমার মাথা ধরা আর নেই।"

লারি বলল, "ভালো কথা, একটা সিগারেট ধরাও, তারপর আমরা সবাই ডিনারে যাব।"

"এ এক ইন্দ্রজাল। কি করে করলে? আমি বেশ সুস্থ হয়ে গেছি।"

"আমি কিছুই করিনি, তুমি নিজেই করেছ।"

ইসাবেল পোষাক পরিবর্তন করতে গেল, ইতিমধ্যে আমি ও গ্রে এক পাত্র কক্-টেল পান করলাম। যদিও স্পষ্ট বোঝা গেল, লারি তেমন পছন্দ করছে না, তবু গ্রে ঐ বিষয়েই কথা বলতে লাগল। কি করে যে কি হল, সে বুঝে পায় না।

সে বলল: "জানো, তুমি যে কিছু করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না, শুধু তর্ক করতে ভালো লাগছিল না বলেই আমি রাজী হয়েছিলাম।"

মাথার যন্ত্রণার কথা, তার জন্য কি বেদনানুভব করতে হয়েছে, আর বেদনাবসানের পরও কি রকম অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সেইসব কথা গ্রে বর্ণনা করতে লাগল। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, কি করে ওর আবার পুরাতন সামর্থ্য ফিরে এল। ইসাবেল ফিরে এল। সে এমন একটা পোষাক পরেছে, যা আমি আগে দেখিনি; প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, বোধ করি শাদা মারকোন কাপড়ের তৈরী, ভিতরে একটু কালো ছাপ আছে—সে যে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না।

স্যাটো দ্য মাদ্রিদে খুব হুল্লোড় চলছিল। আর আমরাও খুব ফুর্তিতে ছিলাম।

লারী ভারী মজার মজার কথা বলছিল ও ফাজলামো করছিল, সেভাবে ওকে আগে কখনও কথা কইতে শুনিনি—আমাদের ভারী হাসাচ্ছিল। আমার কেমন মনে হল ওর ঐ অপ্রত্যাশিত শক্তি বিষয়ে আমাদের মনকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই ওর এই প্রচেষ্টা। ইসাবেল কিন্তু দৃঢ়চিত্ত স্ত্রীলোক। সুবিধামত খেলা সে করতে পারে, কিন্তু নিজের কৌতূহল মেটাবার খেয়ালটুকু কিছুতেই ভোলে না। ডিনার শেষ করে আমরা কফি ও সুরা-পান করছিলাম। ইসাবেল লারির মুখের ওপর তার উজ্জ্বল চোখ মেলে বলে:

"এবার বলো কি করে গ্রে'র মাথার যন্ত্রণা সারালে।"

সে হেসে বল্লে: "তোমরা ত স্বচক্ষে দেখলে।

"তুমি কি ভারতবর্ষে এসব করতে শিখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"ওর নানারকমের আতঙ্ক, তুমি ওকে চিরদিনের মত সারিয়ে তুলতে পারো?"

"জানি না, তবে হয়ত পারব।"

"তাহলে ওর সমস্ত জীবনের ধারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, আটচল্লিশ ঘণ্টা অসুস্থ থাকলেও ত কিছুতেই একটা ভালো কাজ পেতে পারে না। আর কাজ করতে না পারলে ও কিছুতেই খুশি হবে না।"

"আমি ত আর অলৌকিক কিছু করতে পারব না, জানো ত—"

"কিন্তু যা করলে তা ত অলৌকিক, আমরা স্বচক্ষে দেখলাম।"

"না, তা নয়, আমি গ্রের মাথায় একটা ধারণা প্রবেশ করিয়ে দিলাম, বাকীটা ও নিজেই করে নিয়েছে।" তারপর গ্রে'র দিকে ফিরে বলে—"কাল কি করবে?"

"গল্ফ খেলব।"

"আমি ছটায় আসব, গল্প করা যাবে।" তারপর ইসাবেলের পানে বিজয়ীর ভঙ্গীতে হেসে বলে: "প্রায় দশ বছর তোমার সঙ্গে নাচিনি, ইসাবেল, নাচতে ভুলে গেছি না এখনও পারি—একবার দেখবে?"

এর পর আমরা লারির খুব দেখা পেতাম। এর পরের সপ্তাহে সে প্রতিদিন বাসায় এসে আধ ঘণ্টা গ্রে'র সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে বসে থাকত। জানা গেল সে গ্রেকে বোঝাবার চেষ্টা করত, (এই কথাই সে হেসে বলেছিল) কিভাবে সেই দুঃসাধ্য আধ-কপালের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, আর তার ওপর গ্রের একটা শিশু-সুলভ বিশ্বাস এসে গিয়েছিলো। গ্রে যেটুকু অল্প কথা বলেছিল, তা থেকে বোঝা গেল যে, তাকে সুস্থ করা ছাড়া লারি তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। দশদিন পরে গ্রে'র আবার একদিন মাথা ধরল, সন্ধ্যা পর্যন্ত সেদিন গ্রে এল না। খুব খারাপ না হলেও লারির শক্তি সম্পর্কে গ্রে'র এমন ধারণা হয়েছিল যে, লারিকে পেলে এ বেদনার কয়েক মিনিটেই অবসান ঘটবে। কিন্তু আমি (ইসাবেল আমাকে ফোনে ডেকেছিল) বা ওরা কেউই তার ঠিকানা জানতাম না। অবশেষে লারি এসে যখন গ্রে'র এই বেদনার উপশম করল, তখন গ্রে তার ঠিকানা জানতে চাইল, যাতে প্রয়োজনের সময় তাকে অবিলম্বে খবর দিতে পারে। লারি হাসল:

"আমেরিকান এক্সপ্রেস ডেকে একটা খবর দেওয়ার জন্য বলবে, আমি প্রতি সকালে তাদের কাছে যাই।"

ইসাবেল পরে আমাকে বলেছিল, লারি কেন তার ঠিকানা গোপন করে রাখে। পূর্বেও সে এমন করত, পরে দেখা গিয়েছিলো এর ভিতর কোন রহস্য নেই, লাটিন কোয়ার্টারে এক তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে থাকত।

আমি জবাবে বলেছিলাম "আমারও কোনো ধারণা নেই, আমি কল্পনা করে কিছু বলতে পারি, কিন্তু সম্ভবতঃ এর ভিতর কিছুই নেই।

আমার মনে হয় এমনও হতে পারে হয়ত ওর কোনো সহজাত প্রকৃতির প্রভাবে ও বাসাবাড়ি সম্পর্কে একটা আত্মিক গোপনীয়তা মেনে চলে।"

ঈষৎ তিক্ত হয়ে ইসাবেল বলে "ঈশ্বরের দোহাই এতদ্বারা কি বলতে চান আপনি—?"

"তোমার কি মনে হয়নি ও যখন আমাদের কাছে থাকে তখন বেশ সহজ ও সামাজিক প্রাণী, বন্ধুতারও অভাব থাকে না কিন্তু ওর মধ্যে একটা নিস্পৃহ ভাব থাকে, যেন সে তার সবটুকু আমাদের দিচ্ছে না, ওর আত্মার কিছু অংশ গোপন করে রাখছে। আমি জানি না সেটা কি—মানসিক উত্তেজনা, নিগূঢ় রহস্য, অভীপ্সা না কোনো তত্ত্বজ্ঞান কি যে ওকে এভাবে বিচ্ছিন্ন রাখে বুঝি না।"

সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে—"আমি সারা জীবন ধরে লারিকে চিনি।"

"মাঝে মাঝে মনে হয় ও একজন দক্ষ অভিনেতা, চটকদার নাটকের ভূমিকা অভিনয় করছে, যেমন La Locandieraয় এলিয়নোরা দুজের অভিনয়।"

ইসাবেল কথাটি এক মুহূর্ত ভেবে নেয়—

"বুঝেছি আপনি কি বলতে চান,—একজন মজা করছে, সে ভাবছে সেও আমাদেরই একজন আর সকলকার মত স্বাভাবিক প্রাণী, তারপর সহসা মনে হবে সে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত তোমার হাতের ফাঁকে কখন পালিয়েছে। কেন ও এত অদ্ভুত হয়ে ওঠে আপনি মনে করেন?"

"হয়ত ব্যাপারটা এমন সাধারণ যে কেউ লক্ষ্য করবে না।"

"যথা—?"

"যেমন ভালোমানুষী, উদাহরণ হিসাবে বলছি।"

ইসাবেল ভ্রূ কুঞ্চিত করল—

"ও রকম ধরণের কথা বলবেন না, ওতে আমার পেটের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়।"

"তাই কি—না তোমার হৃদয়ের গভীরে বেদনা জাগে?"

ইসাবেল দীর্ঘক্ষণ আমার পানে তাকিয়ে রইল, যেন সে আমার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে। পাশের টেবল থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরিয়ে সে আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠতে লাগল—ইসাবেল সেই দিকে দেখতে লাগল।

আমি বললাম: "আমি চলে যাব?"

"না—"

আমি কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম, ওর সুগঠিত নাক আর সুন্দর চোয়াল দেখে আনন্দানুভব করতে লাগলাম। বললাম "তুমি কি লারিকে খুব ভালোবাস?"

"কি বলেন, ওকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে ভালোবাসিনি!"

"তাহলে গ্রেকে বিয়ে করলে কেন?"

"কাউকে ত বিয়ে করতেই হবে, ও আমার জন্য পাগল ছিল আর মা চেয়েছিলেন আমি ওকে বিবাহ করি তাই। সবাই বলল, লারির হাত থেকে ত্রাণ পাবার এই শ্রেষ্ঠ পথ। আমি গ্রেকে ভারী স্নেহ করতাম; আজো তাকে স্নেহ করি, আপনি জানেন না ও কত ভালো, পৃথিবীতে কেউই ওর মত সদয় ও বিবেচক হতে পারে না—ওকে দেখে মনে হয় বুঝি ভীষণ বদমেজাজ, কেমন হয় না? আমার কাছে কিন্তু ও চিরদিনই দেবতুল্য—যখন আমাদের অর্থ ছিল তখন ও চাইত আমি নানাবিধ জিনিসপত্র চাই যাতে ও আমাকে কিনে দেওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। একবার পরিহাস করে বলেছিলাম, আমাকে একটি নৌকা দেবে সেইটেয় চড়ে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে আসব, বিপর্যয় না ঘটলে সে নিশ্চয়ই তা কিনে দিত।"

আমি গুঞ্জন করে বললাম—"শুনে মনে হয় ও অবিশ্বাস্য রকমের ভালো।"

"আমরা চমৎকারভাবে দিন কাটিয়েছি, আমি চিরদিন ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব—ও আমাকে খুবই সুখী করেছে।"

আমি ওর মুখের পানে তাকালাম, কিন্তু কোনো কথা বললাম না।

"হয়ত আমি প্রকৃত ভালোবাসতাম না, কিন্তু বিনা ভালোবাসাতেও একজন কাটিয়ে দিতে পারে—হৃদয়ের গভীরে আকাঙ্ক্ষা ছিল লারির জন্য। কিন্তু যতদিন ওকে দেখিনি ততদিন কিছুই আমাকে পীড়া দেয়নি। আপনার মনে আছে বলেছিলেন—তিন হাজার মাইলের সমুদ্রের ব্যবধান থাকলে প্রেমের জ্বালা কমে যায়? তখন আমার মনে হয়েছিল অত্যন্ত নোঙরা দুঃখবাদী মন্তব্য—কিন্তু কথাটা সত্য।"

"লারিকে দেখলে যদি কষ্ট হয় তাহলে কি তাকে না দেখাটাই বুদ্ধির কাজ নয়?"

"এ বেদনা আনন্দময়, তা ছাড়া আপনি জানেন ও কি—যে-কোনোদিন সূর্যাস্তের পর ছায়ার মত ও হয়ত কোথায় মিলিয়ে যাবে— আর আমরা দীর্ঘকালের ভিতর ওকে দেখতে পাবো না।"

"তুমি কখনো গ্রে'র সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা ভেবেছ?"

"ওকে ডিভোর্স করার কোনো হেতুই আমার নেই।"

"হেতু না থাকলেও মনের মিল না হলে তোমার স্বদেশবাসিনীদের কি স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোনো বাধা থাকে?"

ইসাবেল হাসল।

"কেন তারা এমন করে বলুন ত?"

"কেন জানো না? এর কারণ মার্কিনীর মেয়েরা স্বামীর মধ্যে সেই সম্পূর্ণতা খোঁজে, যা ইংরেজ মহিলারা তাদের বাটলারের মধ্যে পায়।"

ইসাবেল এমনভাবে মাথা নাড়ল যে, আমার মনে হল ওর ঘাড়ে মচকা না লাগে।

"গ্রে তেমন গ্রন্থিল প্রাণী নয় বলে আপনি ভাবেন তার ভিতর কিছুই নেই।"

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠি— "তুমি ভুল করছ, ওর মধ্যে একটা প্রাণস্পর্শী-ভাব আছে। ভালোবাসার অসীম ক্ষমতা আছে ওর। যখন ও তোমার পানে তাকায় তখন শুধু মুখের পানে তাকালেই বোঝা যায় কি গভীর ওর ভালোবাসা, তোমার ওপর ওর অসীম অনুরক্তি। মেয়েদের ও তোমার চাইতে বেশী ভালোবাসে।"

"বোধ হয় এবার বলবেন আমি ভালো মা নই।"

"বরং আমার ধারণা জননী হিসাবে তুমি চমৎকার—ওরা যাতে ভালো থাকে ও আনন্দে থাকে তা তুমি লক্ষ্য রাখো, ওদের খাদ্য সম্পর্কে সতর্ক থাক, দেখ পেটটা পরিষ্কার থাকে কি না—ওদের দিয়ে প্রার্থনাবাণী বলাও, অসুখে পড়লে তখনই ডাক্তার ডাকো, নিজেই সযত্নে শুশ্রূষা করো, কিন্তু গ্রের মত তুমি তাদের নিয়ে লেপটে নেই।"

"সে রকম করার প্রয়োজন নেই, সবাইকে কি তাই করতে হবে? আমি মানুষ, তাদেরও মানুষের মত দেখি। মা ছেলেমেয়েদের ক্ষতিই করেন যদি তাদেরই শুধু জীবনের একমাত্র ব্যাপার মনে করে তাই নিয়ে বিব্রত থাকেন।"

"আমার মনে হয়, তোমার কথাই ঠিক।"

"আর একটা কথা, ওরা আমাকে ভক্তি করে।"

"তা লক্ষ্য করেছি, যা কিছু সুন্দর, শোভন ও আশ্চর্য তুমি তারই আদর্শ ওদের কাছে। কিন্তু তারা তোমার কাছে সহজ ও স্বচ্ছন্দ নয় যেমন হয়ে ওঠে গ্রের কাছে। তারা তোমাকে ভক্তি করে, সত্য কথা, কিন্তু গ্রেকে ভালোবাসে।"

"ও যে ভালোবাসারই পাত্র।"

ওর মুখে এই কথাটি আমার ভালো লাগল, ইসাবেল চরিত্রের সবচেয়ে মধুর বৈশিষ্ট্য এই যে, সে কখনই নগ্ন সত্য উচ্চারণে কুণ্ঠিত হয় না।

(ক্রমশ)

বস্ত্র সমাচার

১৯৪৮ সালের আরম্ভ হইতেই ভারতীয় মিলে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের হার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। দৈনিক উৎপাদনের হিসাব নীচে দেওয়া হইল:—
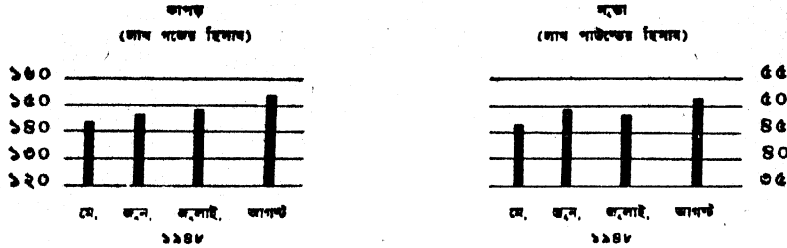
আগামী বৎসর ভারতীয় কলে ৪৫,০০০ লাখ গজ কাপড় ও ৩,৯৮০ লাখ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাড়তি সূতা হইতে ৮০০ লাখ পাউণ্ড সূতা গেঞ্জির কল, দড়ির কাজ ও জাল তৈয়ারী ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হইবে; ৪০০ লাখ পাউণ্ড পাকিস্তানের তুলার বিনিময়ে দিতে হইবে। বাকী সূতা হইতে তাঁতে ও মিলে ১২,৫০০ লাখ গজ কাপড় উৎপন্ন হইবে। ৫৭,৫০০ লাখ গজ মোট উৎপন্ন কাপড় হইতে তুলার বিনিময়ে পাকিস্তানকে দিতে হইবে ৪,৫০০ লাখ গজ; দেশরক্ষাব্যবস্থা এবং বিদেশ হইতে খাদ্য ও কলকব্জার আমদানীর জন্য ৪,০০০ লাখ গজ রাখিতে হইবে।

বেসামরিক জনসাধারণ মাথাপিছু ১৪ গজ কাপড় পাইতে পারে। এই ১৪ গজের ভিতর ১০॥ গজ মিলের কাপড় ও ৩॥ গজ তাঁতের কাপড়। শুধু মিলের কাপড়ই নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।

যুদ্ধের আগে ৪ বৎসরে গড়ে মাথাপিছু ১৪·১ গজ কাপড় (মিল ও তাঁত) পাওয়া যাইত। সুতরাং উৎপাদনের হার লোকবৃদ্ধির অনুপাতে সমান তালেই চলিয়াছে। আমাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় আরও ১০০টী মিলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে ১০০ হইতে ১৩০ লাখ বেশী মাকু চলিবে এবং ৫৭,৫০০ লাখ হইতে ৭৫,০০০ লাখ গজ কাপড় বেশী উৎপন্ন হইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ৬,০০০ লাখ গজ সূতা আমদানী হইত। সেখানে বর্ত্তমানে আমদানী হয় মাত্র ৫০০ লাখ গজ। ইহার কারণ আমাদের প্রধান সরবরাহকারক ইংল্যাণ্ড ও জাপানে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

এখন যে কাপড় পাওয়া যায় তাহা যুদ্ধের আগের তুলনায় মাথাপিছু দেড় গজ কম। আমাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে অত্যাবশ্যক চাহিদার উপযুক্ত কাপড় যথেষ্টই মজুত আছে।

আপনি যদি সকলকে অংশ নিতে দেন
তাহা হইলে সকলের পক্ষেই যথেষ্ট হইবে।

নিজের ন্যায্য অংশের অতিরিক্ত বস্ত্র কিনিবেন না।

ASP

শিল্প দপ্তর হইতে প্রচারিত।

গরাদ

সুশীল রায়

দু'হাতে দু'টো লোহার সিক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, আমি বুঝি বন্দী। এর ওপাশে আমাকে যেতে হলে এদের ভেদ করে যাওয়া অসম্ভব। চারদিকে এত কলরব, এত আনন্দ কল্লোল, তবু আমার জানালার আজও এতগুলো সিক আমাকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছে কেন,—কিছুতেই যেন বুঝতে পারছিনে। বাইরের ওই উল্লাসের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে ছুটে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমার ওই সহজ পথে পাহারাওয়ালার মতো টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একপাল গরাদ। দুটো গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথা গলাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। আমার মাথা ওর চেয়ে মোটা।

দরজায় দরজায় তো এমন লোহার বেড়া বাঁধা থাকে না, জানালায় জানালায় তবে এমন সেপাই খাড়া করে রাখার কারণ কি। জানলা দিয়ে আমাকে ঠেকিয়ে রেখে দরজা দিয়ে পালাবার এমন সুযোগ দেওয়া হলো কেন?

আসলে ওরা কিন্তু আমাকে বেঁধে রাখতে পারে না, ওরা বাঁধে আমার মনকে। দরজা খুলে সোজাসুজি খোলামেলাভাবে দাঁড়িয়ে দেখেছি, আমি অবারিত আর অবধারিত হয়ে গেছি। কিন্তু গরাদের আড়ালে দাঁড়াবামাত্র আমি যেন আড়ালে পড়ে যাই সকলের। আমাকে সকলেই স্পষ্ট দেখতে পায় আমিও সকলকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই—অথচ তারি মাঝে কোথায় যেন থাকে একটু লুকোচুরি, একটু আড়াল আবডাল। ওই সরু লোহার সিক দিয়ে মনকে রুখবার এমন অদ্ভুত কৌশল কে আবিষ্কার করলো, আজ সিক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছি। তাই বুঝি জানলা থেকে সিক উপড়ে ফেললে জানলার জানলাত্ব ঘুচে যায়, সে অবারিত দরজা হয়ে পড়ে। দরজায় আর জানলায় পার্থক্যের মূলে আছে গরাদ। সুতরাং গরাদের ওপর খাপ্পা হওয়া হয়ত ঠিক হবে না—মাথা ঠাণ্ডা করে এ কথা ভাবার চেষ্টা করেছি। বাইরের যে আনন্দ-কলরোলে যোগ দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম, সে কলরোল মন দিয়ে উপভোগ করার জন্যে গরাদের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। আমার ডান পাশের দরজাটা ছিল খোলা। সেটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে আরও যেন জমাট হয়ে গেলাম আমি।

শক্ত করে ধরেছিলাম গরাদ, এখন হাত অজানিতেই শিথিল হয়ে গেছে। গরাদের ওপর অতর্কিতে মায়া আর মমতা দেখা দিল কেন যেন। মনে হলো, আমাকে ও বেঁধে রাখেনি, আমি নিজেকে যাতে বেঁধে রাখি, সেই সঙ্কেত ও আমাকে জানাচ্ছে শুধু। পৃথিবীময় সার সার দরজাই যদি কেবল থাকতো, তাহলে পৃথিবীর মান-ইজ্জত হয়ত থাকতো না আদপে। পৃথিবীর মর্যাদা রক্ষা করার জন্যেই হয়ত তাহলে এই গরাদের আবির্ভাব।

এরা শাসন করে না, এরা সাবধান করে দেয় মাত্র। এরা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়—নিজেকে বিলিয়ে দেবার আগে, নিজেকে বাঁধবার চেষ্টা একটু করা উচিত। অভিভাবকত্বের আঁচ বড় একটা নেই এদের মধ্যে, যা আছে তা হয়ত বা বাৎসল্যের। মেজাজ না দেখিয়ে মন জয় করার এই নীরব কৌশল আয়ত্ত করে ওরা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে বেশ আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাই দেখা যায়, আমাদের ঘরে দরজার চেয়ে জানলার সংখ্যা বেশি। সবার ঘরের কথা অবশ্য পুরোপুরি জানিনে। কিন্তু এখন আমি যে ঘরটিতে বসে আছি, তার দরজা দুটো, কিন্তু জানলা পাঁচটি। জানলা কটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রত্যেকটায় ছ'টা সাতটা করে সিক। এইটুকু একটা ঘরে এতগুলো প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের দাপট নেই আদপে। তাই ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, শব্দহীন বাৎসল্য ওরা শিখলো কোথা থেকে!

শাসন শোষণ আর আস্ফালনে ভরা এই কদর্য আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ বড় মোলায়েম ঠেকে এই লোহার গরাদদের। এদের বাইরেটা শক্ত ধাতুর, কিন্তু নিভৃতে অবশ্যই একটা কোমল মন লুকানো আছে। এরা লোহা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের চারধারে, আমাদের মান আর ইজ্জৎ রক্ষা করে এরা অস্পষ্ট আড়াল সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে হয়ত আমরা ভুল বুঝি এদের। পথ ছেড়ে বিপথ দিয়ে বাইরে পা বাড়াবার সময় যখন ওরা বাধা দেয়, তখন হয়ত মেজাজও তেতে ওঠে হঠাৎ। কিন্তু আমাদের এই আকস্মিক রূঢ়তায় ওরা এতটুকু মনঃক্ষুণ্ণ হয় না। জানলায় জানলায় সোজা দাঁড়িয়ে থেকে হয়ত আমাদের রকম দেখে হাসে। হাসিটা অবশ্য স্পষ্ট দেখতে পাইনি, কিন্তু মেজাজ ঠাণ্ডা হবার পর ওদের দিকে তাকিয়ে সেই রকমই মনে হয়েছে।

বাহির ও ভিতর নামে যে দুটি পৃথিবী আছে, ওরা সেই দুই পৃথিবীর মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করে। দরজা বন্ধ করা মাত্র বাইরের সঙ্গে ভিতরের কোনো সম্পর্ক থাকে না, [illegible] জানালার ফাঁক দিয়ে দুই পৃথিবীর মধ্যে কোলাকুলি চলতে থাকে একটানা। বাহিরকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না, ভিতরকেও বে-আব্রু করে বাইরে বার করে দেয় না। এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান যতদূর সম্ভব বজায় রেখে এরা এদের আত্মীয়তাটা জীইয়ে রাখে।

আমার তো মনে হয়, গরাদ জাতীয় জীবেরা যদি পৃথিবীতে না থাকতো, তাহলে এতদিনে পৃথিবী বেইজ্জত হয়ে যেতো। কতজনের আঘাত আর অভিসম্পাত, রূঢ়তা ও কঠোরতা সহ্য করে এরা নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই দল বেঁধে একদিন যদি এদের মূলে করাত চালাতে শুরু করে, তাহলেও এরা প্রতিবাদ করবে না। করাতের দাঁতে দাঁতে এরা ধীরে ধীরে কাটা পড়ে যাবে, তবুও লোহাত্ব ত্যাগ করবে না, তবুও এরা সোজা ও সহজই থাকবে। লাভের মধ্যে আমাদের এই হবে যে, আমাদের জানলাগুলো সব দরজা হয়ে যাবে, আমাদের ভিতরগুলো সব বাহির হয়ে যাবে, সদর রাস্তা থেকে বাহিরগুলো হুহু করে ঢুকবে আমাদের অন্দরে।

একটু নিরালা ও নিভৃতি না হ'লে মানুষ বাঁচতে পারে বলে আমার ধারণা নেই। আমরা দিনে বারো ঘণ্টা বারোজনের জন্যে কাজ করতে পারি, কিন্তু বারোমাসের জন্যে বারো-য়ারী হ'য়ে যেতে হয়ত চাইনে। মনকে আমরা ছড়িয়ে দিই নানা কাজে, তারপর এক সময় ছড়ানো মনকে গুটিয়ে নিয়ে মনে মনে কথা বলতে পারি ব'লেই আমরা আজও টিকে আছি। তা না হ'লে এতদিনে আমরা নিশ্চয় ক্ষেপে যেতাম। পৃথিবীটা তবে একটা প্রকাণ্ড পাগলা-গারদ হ'য়ে যেতো ব'লেই আমার ধারণা। সেই চরম আর বীভৎস পরিণতির হাত থেকে যারা আমাদের বাঁচায়, তাদের ভাল নাম জানিনে। তাদের চলতি নাম হ'চ্ছে গরাদ।

অভিভাবকত্বের আঁচ এদের মধ্যে নেই বলছিলাম। আঁচ নেই বটে, কিন্তু উত্তাপ যেন একটু আছে। বাৎসল্যের তাপের মাঝে মাঝে অভিভাবকত্বের একটু উত্তাপ যেন পাই। ব্যক্তি-গত জীবনের কথাই শুধু বলছিনে, জাতিগত জীবনেও এরা যেন আমাদের সহায়তা না করলে এতদিনে বিপথে গিয়ে বিপদে পড়তেও হয়ত আমরা কসুর করতাম না, আবার পতন ও পদস্খলনের লজ্জার হাত থেকেও রেহাই হয়ত পেতাম না। অনেকে এদের ফালতু মনে করতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁদের দলে নই। এদের বাধায় মাঝে মাঝে বিরক্ত আমিও হই বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে বিরক্তি কেটে যায়। ঘর ডিঙিয়ে বাইরে যাবার জন্যে নির্দিষ্ট পথ থাকাই দরকার। একটু ফাঁক পাওয়া মাত্র সেই ফাঁক দিয়ে ফাঁকা মাঠে পড়ার জন্যে আমাদের উৎকট আগ্রহ একটা আছে বটে, কিন্তু সেই উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আমাদের

ঠেকিয়ে রাখার জন্যে এরা নীরব নিষেধ হ'য়ে জানলায় জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরের আলোবাতাস ভিতরে আসুক, ভিতরের শ্বাস বাইরে বেরিয়ে যাক, কিন্তু ঘর-বার যেন একাকার হয়ে না যায়, তারি নিঃশব্দ হুঁশিয়ারী হ'য়ে এরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি এদের শ্রদ্ধা করি,—এমন গাল-ভরা কথা না-হয় না বললাম, কিন্তু একথা বলতে বাধ্য যে, আমি এদের স্বীকার করি।

অস্বীকার করার উপায় আমার নেই, কেন না—অন্দরমহল ব'লে যেমন একটা মহল আছে, অন্তরমহল নামক তেমনি আরেকটা মহলের ওপর আমার বড় টান। বর্বর যুগ পার হয়ে আমরা নাকি সভ্যযুগে এসে পৌঁছে গেছি। নগ্নতা ডিঙিয়ে আমরা আবরণের যুগে নাকি এসে ঠেকেছি। এ-কথা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে গরাদকে অস্বীকার করি কী ক'রে? সদর রাস্তারা আমার ঘরের মধ্যে না ঢুকে, ঘরের কোল দিয়ে সসম্ভ্রমে যে সোজা চলে যায়, তার কারণ কি? তাদের ঘরে ঢুকতে মানা তো কেউ করেনি। তারা হালচাল দেখে বুঝেছে, অন্দরে না ঢোকাটাই নিয়ম। আইন-কানুন দিয়ে এ-নিয়ম তৈরী করতে হয়নি। আচারে ও আচরণে আপনা আপনি এই নিয়ম গ'ড়ে উঠেছে। আমার তো মনে হয়, গরাদেরা না থাকলে এসব নিয়মের ধার কেউ ধারতো না—সব অনিয়ম হয়ে যেতো। ভিতরেরা সব পালিয়ে যেতো বাইরে, বাইরেরা এসে হামলা করতো ভিতরে। অন্তর ব'লে যে মহলের কথা একটু আগে ব'লছি, তারা তবে এতদিনে অন্তর্হিত হয়ে যেতো। আমরা তবে কি জাতের মানুষ হ'য়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতাম, সে-কথা হয়ত খুলে না বললেও চলবে।

যে-জাতের জীব আমরা হ'য়ে যেতাম, তা হ'তে আমার ব্যক্তিগত আপত্তি আছে। তাই গরাদের আমি ভক্ত। আমি জানি, আমার সব বিচার ও সব বিবেচনা অভ্রান্ত হবে—এমন কোন কথা নেই। তাই এই বিচার-বিবেচনার পথে একটু ইশারা ও ইঙ্গিতের ভরসা আমি চাই ব'লেই আমি জানলায় জানলায় গরাদ রাখার পক্ষপাতী। এতে আমার দৃষ্টিতে কোনো বাধা পড়ে না। কিন্তু দর্শনের একটু সুবিধে যেন হয়। আমার চিন্তার আসর হিসেবে তাই আমি জানলাকেই বাছাই ক'রে নিয়েছি। কোনো ভাবনায় পড়লেই তাই আমি জানলার কোন ঘেঁষে বসি। আমাকে দেখলেই বোঝা যায়—ওই গরাদের কাছ থেকে আমি যেন পরামর্শ চাচ্ছি। আঙুল উঁচিয়ে গরাদেরা আমাকে যেন আমার চিন্তার পথ-নির্দেশ করতে থাকে। এখানে ব'সে আমি বুঝতে পারি, আমি নিভৃতে ব'সে আছি,—কিন্তু বাইরের সঙ্গে আমার মুখোমুখি আলাপ-আলোচনা চ'লেছে। হঠাৎ যদি হাওয়ায় দরজাটা খুলে যায়, অমনি সমস্ত ঘর যেন হা-হা ক'রে ওঠে। তার আকস্মিক বেআব্রু হয়ে পড়ার জন্যেই যেন এই হাহাকার। কিন্তু গরাদের ফাঁক দিয়ে যে আলো আর বাতাস সচ্ছন্দগতিতে এসে ভেতরে ঢুকছে, তাতে তার ইজ্জৎ হানি হ'চ্ছে না এতটুকু। তাতে সে যেন আরামই পাচ্ছে। দরজার সুড়ঙ্গ দিয়ে পথেরা যখন ঘরে এসে হানা দেয়, তখন তাদের আক্রমণের প্রথম আঘাত এসে পড়ে যেন আমারি ওপর। সেই আঘাতে আমি যে সহজেই কাবু হয়ে যাই, একথা গোপন না করাই ভাল। আমার এই পরাভবের সুযোগ নিয়ে চিন্তারা সব দল বেঁধে পথে নেমে পড়ে। আমার আঁতের কথা ব'লে কোনো কথা আর থাকে না আমার সঙ্গে, আমাকে একেবারে নিঃসম্বল ক'রে দিয়ে ওরা কোথায় যেন চ'লে যায়।

মনঃক্ষুণ্ন হয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে এসে গুম হয়ে বসে থাকি কিছুক্ষণ। কিছু করার থাকে না আর। গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে মনে হয়, আমি বুঝি বন্দী। ইচ্ছে হয়, সব গরাদ টেনে উপড়ে ছত্রখান ক'রে সব একাকার করে' দিই। নিজেকে সংযত করার ক্ষমতাই হয়ত হারিয়ে যায়। তখন চেয়ে দেখি, ওই গরাদেরা লোহার আঙুল উঁচু করে আমাকে কি যেন বোঝাচ্ছে। ওদের ভাষা বোঝা শক্ত। তাই কান পেতে থাকি কিছুক্ষণ। ভাষা কিছু বুঝিনে, তবে ইশারাটা একটু একটু যেন বুঝতে পারি। আবার বসি ওদের পাশে। ভাবনারা সব ঘরে ফিরে আসে। আমার কানের মধ্যে তাদের আক্ষেপের কান্না বাজতে থাকে একটানা। সে কান্নায় যোগ অবশ্য দিইনে, কিন্তু কেন-যেন মন উচাটন হ'য়ে ওঠে। অনিবার্য আক্রোশে লোহার গরাদ আক্রমণ করি। দু'হাতে ধরে নাড়া দিবার চেষ্টা করি। তবু তারা অটল ও অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা এই অর্বাচীনতা যেন উপেক্ষা করছে। এটা তাদের বাৎসল্যের রস অথবা অভিভাবকত্বের উত্তাপ, বুঝতে না পেরে জানালার কবাট বন্ধ করে দিই। —পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই আমার থাকে না। এখন আমার যে অবস্থা হয় সেটা আসল বন্দিত্ব ছাড়া কিছু না। ঘর ভর্তি বাতাস থাকা সত্ত্বেও দম আটকে আসে। মনে হয়, আমার অগোচরে পৃথিবী অজস্র পথ এগিয়ে চ'লে গেছে। আমি একেবারে পিছে প'ড়ে গেছি। পিছন থেকে নিজেকে ঠেলে এগিয়ে দেব, সে সামর্থ্যই হারিয়ে যায় একেবারে। অসহায় ও অপদার্থ ঠেকে নিজেকে। দরজা ফাঁক ক'রে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করি। মনে হয়, আস্ত পৃথিবী যেন ওখানে ওঁৎ পেতে ব'সে আছে, আর একটু ফাঁক পেলেই সশরীরে ঢুকে পড়বে ভেতরে। জানালার কবাট বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সুখ তো গেছেই, এখন স্বস্তি যাবার আতঙ্কে দরজা চেপে দিয়ে এসে জানালা ফাঁক করি। একটা গরাদ চোখে পড়ে। ওই একটিই যথেষ্ট, ওর অঙ্গুলি নির্দেশই আমাকে যেন ভরসার ইশারা জানায়। কবাটটা পুরো টেনে খুলে দিই। গরাদেরা কিছু বলে না।

বাইরের উপদ্রবের হাত থেকে ওরা আমাকে যে-ভাবে রক্ষা করে, আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যেও ওদের তেমনি সমান নজর। ওদের সেপাই বা প্রহরী বললে মানহানি করা হবে। অভিভাবকও ওদের বলতে ইচ্ছে করে না। আমাদের শক্তি ও সাহস ব'লে ওদের পরিচয় হয়ত-বা দেওয়া চলে।

আমাদের মন ও মানের ওরা প্রহরী, আমাদের ঐতিহ্য ও ইজ্জতের ওরা পাহারাদার। ছোট ছোট জানলায় শরু শরু লোহা হ'য়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে ব'লে আমরা ওদের চট্‌ ক'রে চিনতে পারিনে। তাই একটু বিরক্ত হ'লেই ওদের ধরে ঝাঁকি দেবার চেষ্টা করি। গরাদেরা যদি একদিন মাঝরাতে আমাদের জানলাটি ছেড়ে দল বেঁধে উধাও হ'য়ে যায়, তাহলে কী দুর্দশা আমাদের হবে, এই আতঙ্কে আজ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতেই আঁৎকে উঠলাম। চেয়ে দেখি, তিনটি গরাদ নেই। আলো জেবলে দেখলাম, ঘর ফাঁকা। যথাসর্বস্ব হাওয়া হ'য়ে গেছে। আমি হয়ত নেহাৎই অপদার্থ, তাই চোর আমাকে আর টেনে নিয়ে যায়নি।

গান্ধীজীর স্বপ্ন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

স্বপ্ন বললে আমরা এমন কিছু বুঝি যেটা বাস্তব বা সত্য নয়, যার বাস্তব জগতে কোন অস্তিত্ব নেই, যা মানুষ কল্পনা করে তাকেই আমরা স্বপ্ন বলি।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো জগৎটাকে চমকে দিয়েছিলেন একটা খুব নতুন মত প্রকাশ করে। তিনি বলেছিলেন, এই যে জগৎ এবং জাগতিক বস্তুসমূহ এ সব সত্য বটে, কিন্তু এ সবের পিছনে একটা মনোময় জগৎ আছে যা এই প্রকাশমান জগতের উৎপত্তিস্থল। আমরা কোন একটা বস্তু দেখি এবং মনে তার একটা ছবি তুলে নিই এবং বস্তুটাকেই সত্য বা সত্তাবান বলি আর মনের ছবিটাকে সত্তাহীন প্রতিবিম্ব মনে করি। কিন্তু প্লেটো বলেন যে, সমস্ত জগৎটাই মনোময় অস্তিত্বে সত্তাবান। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতায় আছে—রামের জন্মস্থান অযোধ্যায় নয়, জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বাল্মীকির মনে। ঋষি নারদ কবিগুরু বাল্মীকিকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "তোমার মনে রামের যে ছবি উঠেছে সেইটি প্রকৃত সত্য, ঐতিহাসিক রামের চেয়ে বেশী সত্য, যা ঘটে সব সত্য নয়।" প্লেটো বলেছেন, আমরা মনে যেসব ছবি আঁকি তার বাস্তবতা বাইরের জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী। সৌন্দর্যের যে ছবি আমাদের চিত্তপটে ফুটে ওঠে তা জগতের সমস্ত সুন্দর জিনিসের সমষ্টিকে নিষ্প্রভ করে দেয়।

"The idea of beauty is more beautiful than all the beautiful things in the world put together."

জগতে অনেক রকম জিনিস আছে; সেগুলিকে তাদের মিল এবং অমিলের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; এই ভাবে সমস্ত জিনিসই আমাদের মনে সাজানো-গোছানো হয়ে গেছে। কোনো কিছু দেখার সংগে সংগেই আমরা তাকে কোনো একটা বিশেষ পর্যায়ে বা শ্রেণীতে ফেলি এবং যেমন আমাদের মনে ব্যক্তিবিশেষের একটা ছবি ওঠে তেমনি একটা শ্রেণীরও ছবি ওঠে। এই যে শ্রেণী বা জাতির ছবি, তার অস্তিত্ব মনোময় মাত্র ব'লে তাচ্ছিল্য করে থাকি। এর মধ্যে একটি দুর্জয় অফুরন্ত শক্তি নিহিত আছে। এই শক্তির প্রভাবে যুগ-যুগান্তর ধ'রে অসংখ্য বিশিষ্ট বস্তুসমূহের উৎপত্তি হচ্ছে। আমরা জগতে অসংখ্য নরনারী দেখে থাকি। এদের কালে উৎপত্তি হচ্ছে এবং লয় হচ্ছে। এই যে ব্যক্তিসমূহ যা জল-বুদবুদের মত উঠে লয়-প্রাপ্ত হয়, তাদের পশ্চাতে আছে একটি মনোময় নর এবং মনোময় নারী; এদের আদর্শ নর এবং আদর্শ নারী বলা যেতে পারে। এই যে আদর্শ নর এবং নারী তাদের পূর্ণ বাস্তবতা আছে আর যে সকল নরনারী আমরা দেখি তাদের বাস্তবতা অপূর্ণ এবং আংশিক মাত্র। রাম এবং শ্যামের মধ্যে বাস্তবতার প্রভেদ আছে; যদি রামের মধ্যে আদর্শ নরের ধর্ম বেশী প্রকাশ পায়, তাহলে রামের বাস্তবতাই বেশী বলতে হবে। মনুষ্য জাতির মূলে যে আদর্শ নরনারী অলক্ষ্যে সক্রিয় রয়েছে এবং নিজেদের বাস্তব জগতে বিশিষ্ট রূপ দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে তারাই সেই আদি জগৎশক্তি যার প্রভাবে এবং যাকে প্রকাশ করার জন্যে অনন্ত-কাল ধরে অগণিত নরনারীর সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে। আমাদের বাস্তবতা সেই পরিমাণে যে পরিমাণে সেই আদি শক্তির প্রকাশ আমাদের মধ্যে হয়। সৃষ্টির মূলে একটি প্রেরণা আছে, সে প্রেরণা আদর্শের প্রেরণা। সে আদর্শকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের করা যায় না অথচ তারই তাগিদে আমরা মনে কত ছবি আঁকছি এবং সেই ছবির জগৎকে জীবনে সত্য করার চেষ্টা করছি। মানুষের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে আদর্শের প্রভাব যে কতো বেশী, মানুষ জাতির অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যায়। যেসব বড় বড় বিপ্লব মনুষ্য সমাজে ঘটেছে তার মূলে আছে আদর্শ। এই আদর্শকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই যে আদর্শ একে চোখে দেখা যায় না এবং ইন্দ্রিয়-পথে উপলব্ধি করা যায় না; এর শক্তি কত অপরিসীম তা আমাদের বোধগম্য হয় না। জগতে আমরা চারিদিকে পরিবর্তন দেখতে পাই। সর্বদাই অসংখ্য পরিবর্তন জগতে ঘটছে, জগতের রূপ প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস বলেছিলেন,

"You can not bathe twice in the same stream."

(তুমি একই স্রোতে দুবার স্নান করতে পারো না) তিনি জগতে পরিবর্তনশীলতার কথা মানুষকে এই ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। জগৎটা নদীর মত সর্বদা নিজের গতিবেগ নিয়েই ছুটে চলেছে। এই মুহূর্তে যে জগৎ আছে পর মুহূর্তে আর তার অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু এই গতিশীলতার এই যে পরিণাম এর অর্থ কি? কিসের জন্যে এ জগৎ এরূপ প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে, এ কি পেতে চায়? এ পেতে চায় কোনো একটা নতুন অবস্থা, যে অবস্থাটা জগতের পিছনে আদর্শভাবে একটি মনোময় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে এবং জগতে পরিবর্তনের বন্যার সৃষ্টি করছে। 'ক' যখন নিজের রূপ বদলে 'খ' হয়, কার ইংগিতে কার প্রেরণায় এই পরিবর্তনটি ঘটে? 'ক'-এর 'খ'-রূপী ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব 'ক'-এর অন্তরে আদর্শভাবে বাস করে এবং নিজের প্রেরণা শক্তিতে 'ক'-কে 'খ'-এ পরিণত করে। আমরা ভাবি, বর্তমান অনাগত ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করে; কিন্তু অনাগত ভবিষ্যৎ যাকে আমরা সত্তাহীন এবং নিষ্ক্রিয় মনে করি সে যে বর্তমানের মধ্যে তার অপরিসীম প্রভাব নিয়ে লুকিয়ে থাকে এবং আদর্শের প্রেরণার দ্বারা বর্তমানকে নতুন করে গড়ে তোলে তা আমরা ভাবতে পারি না। জগতের সমস্ত পরিবর্তনের মূলে আছে অনাগত ভবিষ্যতের প্রেরণার চাপ। এ কথাটা অস্বীকার করলে জড়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।
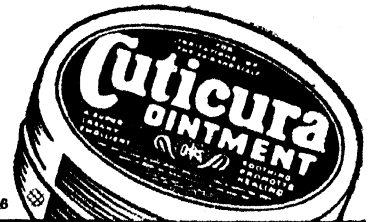
এই যে আদর্শ, এ মানুষের চিত্তপটে অনেক রকম ছবি আঁকে। মানুষের মনে আদর্শ ফুটে ওঠে কারণ যে জগৎ মানুষকে সৃষ্টি করেছে, সে জগতের মূলে একটা বিরাট আদর্শের প্রেরণা আছে। এই প্রেরণা কখনও দেশপ্রেম-রূপে দেখা দেয়, কখনও মানুষকে ভগবৎপ্রেমে ডুবিয়ে দেয়, কখনও বা সমগ্র মানবজাতির ওপর প্রেমের আকার ধারণ করে। মহাত্মাজীর স্বপ্ন শুধু দেশহিতৈষীর স্বপ্ন নয়, তিনি প্রধানতঃ চেয়েছিলেন মানুষকে দেবতা করতে। তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন প্রত্যেক মানুষই অন্তরের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করুক। তিনি সমস্ত জগৎটাকে একটি বিরাট ঐশী শক্তির প্রকাশ বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন সমস্ত দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি যেন জগতটাকে শ্রীভগবানের প্রকাশ বলে গ্রহণ করে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি যে অহিংসা এবং প্রেমের ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচার করেছিলেন তাঁর সে বাণী শুধু ভারতবর্ষের জন্যে নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যে। তিনি নিজে ভারত-বাসী এবং এই জন্যে ভারতবর্ষকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র করেছিলেন। কিন্তু অনেক দিন পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকাই তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল; সেখানেই তিনি প্রথমে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ অহিংস নীতি প্রয়োগ করে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি অহিংস মন্ত্রের অসীম ক্ষমতা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। সত্যাগ্রহকে তিনি বৈজ্ঞানিকের চোখে দেখতেন এবং অব্যর্থ অস্ত্র বলে মনে করতেন। শত্রু যত বলশালী হোক, যদি তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুদ্ধচিত্তে নির্ভুল-ভাবে প্রয়োগ করা হয়, তার পরাজয় নিশ্চিত। তাঁর নিষ্কলুষ চিত্তে সত্যাগ্রহ তার সমগ্র রূপটি নিয়ে এমনভাবে ফুটে উঠেছিল যে, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন সেই দেবতার পূজায় সমর্পণ করেছিলেন। তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছিলেন যে, মনুষ্য সমাজে কোনো দুর্নীতি, কোনো মিথ্যাচার থাকবে না, সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী হবে এবং সত্যাগ্রহী হবে। তাঁর এই স্বপ্ন তাঁকে যে কর্মশক্তি এবং কর্ম-প্রেরণা দিয়েছিল, তাতে সমস্ত জগৎ বিস্মিত হয়েছিল। তিনি সকল মানুষকেই সমান চোখে দেখতেন। মানুষের প্রধান পাপ হচ্ছে অপর মানুষকে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করা। এই শোষণকে মনুষ্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে না পারলে মনুষ্য সমাজের শ্রেয় হবে না।

"Treat humanity, whether in your own person or in that of another as an end and never as a means."

এতে দুটি পাপের ইঙ্গিত আছে, একটি হচ্ছে অপরকে নিজের উপায় বা যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করা এবং অপরটি হচ্ছে নিজেকে অপরের উপায় বা যন্ত্ররূপে পরিণত করা। এই যে নীতি এর সঙ্গে আর একটি নীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে এই—এমন ভাবে কাজ করবে যেন তোমার কর্মের নীতি অপর সকলে গ্রহণ করতে পারবে।

"Act in such a way that the principle according to which you act may be adopted as a rule of action by all men."

মহাত্মার স্বপ্নরাজ্য পূর্বোক্ত নীতি দুটির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল।
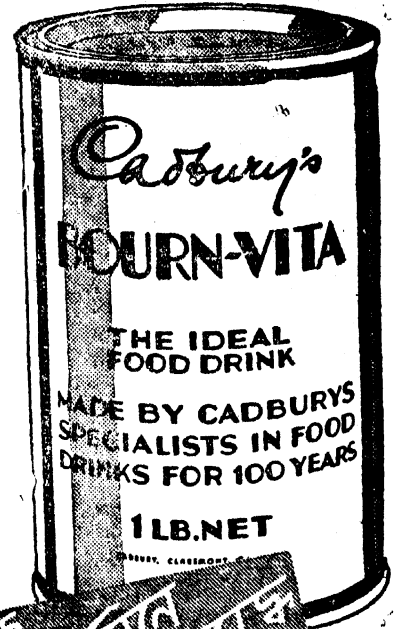
অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

বেশ শীত পড়েছে আজ। কম্বল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। জানালার বাইরে আকাশটা এখনো ঘোলাটে—গলির মুখে আলোটা এখনো নেভান হয়নি, মরা তারার মত নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। ঘুম ভেঙে মেজাজটা বড় খারাপ হয়ে যায়, একটা অদ্ভুত স্বপ্নের স্মৃতি স্পষ্ট যেন মনে করতে পারা যায়। অলকাকে অত্যন্ত দীনবেশে একটা নিমন্ত্রণ বাড়িতে সমর দেখেছে—অতিথি অভ্যাগতদের খাবারের আয়োজন করছে, কাপ-ডিস-প্লেট মুছে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখছে। পাশ থেকে কে যেন বললে, মিস্টার দত্ত কি দেখছেন অমন করে? মেয়েটি কে? সমর চিনেছিল, অলকা! কিন্তু স্বপ্নে মেয়েটির কি পরিচয় পেয়েছিল, এখন একেবারে মনে পড়ছে না, আর একবার যেন অলকাকে দেখা গিয়েছিল—খুব সেজেগুজে একদল মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিল, সমর থমকে দাঁড়িয়ে গেল—বুকটা কেমন হু হু করছিল, জায়গাটা মনে পড়ছে না—কিন্তু পরিবেশের স্মৃতিটা এখনো ঝলমল করছে চোখে। এখন মনে পড়ছে, সমরের ঔৎসুক্যটা বড় কাঙালের মত প্রকাশ পেয়েছিল। অতো কাছে সরে এসে মুখ বাড়িয়ে দিতেও অলকা চিনতে পারেনি, চেনা দেয়নি। ঘুমে-জাগরণে স্মৃতিতে-বিস্মৃতিতে কি করেছিল সমরের এখন মনে পড়ছে না। একটা ক্ষুব্ধ আহত মর্যাদা বুকের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে আছে যেন। সমর কি কেঁদেছিল। অলকার সঙ্গের মেয়েগুলোও অপরূপ সুন্দরী—বেশ-বাসের রমণীয়তা অদৃশ্যপূর্ব।

স্বপ্নটার জন্যেই যেন মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে। চরমতম উপেক্ষায়ও মনটা একেবারে মরে যায় না। চুকেবুকে যাওয়া যেন সহজ নয়। মনের সঙ্গে জোর করে যুক্তি দিয়ে স্মৃতিকে মুছে ফেলা যায় না। আহত মনটা ঘুরে-ফিরে যে আঘাত করে, তারই অভিমুখে ধায়। হার-মানা অপমানিত মনটা বড় কাঙাল-পনা করে। কেন? কেন? 'কেনর' উত্তর পাওয়া যায় না বলেই যেন মনের এই সক্রিয়তা। কাকে বোঝাবে তুমি?

সমর কম্বল ছেড়ে উঠতে পারে না—কেমন অবসাদে দেহটা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। কি হবে উঠে? মনে মনে ভেবে দেখে, কোন কাজ নেই হাতে—জীবন বয়ে যাবার কোন তাড়া নেই। ঘটনাহীন দিনের গণনায় জীবনের কোন মানে হয় না। সাময়িক পরিবেশ থেকে দেহটা যেমন ছুটি পেয়েছে, মনটাকেও যদি তেমন ছুটি দেওয়া যেত আজ! দিনের বয়েস যদি এর চেয়ে না বাড়েঃ এই ঘোলাটে ধোঁয়াটে কম্বল-চাপা গা শির শির করা মুহূর্তের শেষ না হয়। কি ক্ষতি?

জানালার বাইরে মাকড়সার জালের মত গত রাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে, ফিকে দেখাচ্ছে, হঠাৎ ঐক্যতান গানের সুর শুনতে পাওয়া যায়—একটা চাপা হৈ হৈ শব্দ থেকে থেকে হয়। এত সকালে সমবেত কণ্ঠস্বরে কারা প্রভাতী গান গায়? হঠাৎ শুনলে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়—সেদিন আজকের দিনের চেয়ে কত সুন্দর ছিল। তুলনাটা বড় বেশী বেদনাদায়ক মনে হয়। উঠি উঠি করেও উঠতে ইচ্ছে করছে না। এত সকালে কারা গান গাইছে? কি গান গাইছে?

চৌকাঠ থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে বাণী ঘরে ঢুকলোঃ দাদা, চা তৈরী। উঠে পড়।

এগিয়ে এসে বাণী খাটের মশারীটা তুলতে থাকে। শুয়ে শুয়ে সমর বোনের মশারী তোলা দেখতে লাগল—প্রাতঃকালটা যত অবসন্ন মনে হয়েছিল, এখন যেন ততটা মনে হচ্ছে না। বোনের সেবাপরায়ণতার আগ্রহটা হাত-পা নাড়ায় প্রকাশ পাচ্ছে—বাণীটা বড় যত্ন করে আজকাল। সঙ্গে সঙ্গে অলকার কথা মনে পড়ে কি? সমর বোনকে ডেকে কাছে বসায়। বাণী একটু অবাক হয়, লজ্জাও পায়, ভয়ও যেন পায় একটু। দুজনেই চুপ করে বসে থাকে খানিকক্ষণ। বাণী বুঝতে পারে না, দাদা হঠাৎ কাছে বসালে কেন। সমরও ঠিক বুঝতে পারে না, বাণীকে কি বলবার আছে।

বাণী বললে, এখন চা খাবে, না, আরো ঘুমবে?

জবাব না দিয়ে সমর বোনের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলে। দাদার ব্যবহারটা বাণীর দুর্বোধ্য লাগছে। আবার জিগ্যেস করলে, কি বল না?

হেসে সমর বললে, নিশ্চয়ই, আবার বলতে! At this hour of the day—ডাকলে, শোন?

তা হলে উঠে পড়, বাণী পিছন ফিরলে।

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়েছে। সমর ডাকলে, শোন?

ডাক শুনে বাণী যেন নতুন করে ভয় পেয়ে যায়। অথচ কি যে ভয় বুঝতে পারে না। একটু দূরে দাঁড়িয়েই বলে, বল।

সমর বললে, শোন্। শুনতে পাচ্ছিস? দূরাগত গানের সুরটা লক্ষ্য।

বাণী খুব বেশী মুগ্ধ হয়েছে বলে মনে হলো না। হরিনামের কথা বলচো? ও তো আজ মাসখানেক ধরে হচ্ছে অষ্টপ্রহর।

সমর জিগ্যেস করলে, কোথায়? এত সকালে হরিনাম!

বেণীবাবুর বাড়ি। অষ্টপ্রহর গান, চব্বিশ ঘণ্টাই হয়। বাণী চলে যাবার উপক্রম করে।

সমর বলে, বেণীবাবু কে? অষ্টপ্রহর গান হয় কেন?

আমাদের পাড়ায় এসেছেন আজ দু'বছর—ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তি কিনেছেন—সে যে ঘোষেরা, তাদের সব বিক্রী হয়ে গেছে কি না? যুদ্ধে বেণীবাবু শুনতে পাই অনেক পয়সা করেছেন। বাণী চলে গেল।

হরিনাম কেন হয় বাণী বললে না। হয়তো জানে না বলেই বলেনি। সমর যেন বুঝতে পারছে বেণীবাবুর বাড়ি অষ্টপ্রহর হরি-সংকীর্তন হওয়ার মানে কি। যুদ্ধের বাজারে অনেক পয়সা করার সঙ্গে যেন হরিনাম করার একটা যোগাযোগ আছে—পাপের পয়সা পুণ্য সঞ্চয়ে খরচ করার একটা নৈতিক বোধ। জমা-খরচের হিসেবের বোধ হয় সুবিধে হয়। পয়সার ধর্মজ্ঞান নাই থাক, পয়সাওয়ালা লোকের ধর্মজ্ঞান খুবই প্রবল। যুদ্ধের বাজারে পয়সা করেছেন বলে যে ধর্মজ্ঞান বিসর্জন দিয়েছেন, একথা যেন লোকে না বলে। হরিনামের মধু দাতব্য করছেন।

প্রথমে না বুঝে গানটা যত ভাল লেগেছিল এখন 'নাম-মাহাত্ম্য' শুনে আর ভাল লাগছে না—ঐ গানটা ভাড়া করা গলায় পুরোন দিনের স্মৃতিকে যেন গালাগাল দিচ্ছে, কলঙ্কিত করছে মানুষের ভাল-লাগার বোধকে। উদ্দেশ্যে গানের মাধুর্যও নষ্ট হয়।

চা এনে বাণী বেণীবাবুর খবর শোনালে। ভদ্রলোকে উড়ে এসে এ পাড়ায় জুড়ে বসেছেন—অনেক পয়সা করার কৃতিত্বে পাড়ার অনেক আত্মাকে বিমুগ্ধ করে দিয়েছেন। এত ভক্তি-বৎসল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নাকি ইতিপূর্বে দুটি দেখা যায়নি। পয়সার আদি-অন্ত নেই, তবু বিনয়ে ভক্তিতে লুটিয়ে পড়ছেন।

দু' একবার বোনের মুখের ভাব লক্ষ্য করে সমর না হেসে পারলে না। কেমন কৌতুকবোধ করতে লাগল। বাণীর কথা বলায় কেমন রহস্য আছে যেন। আর সকলের মত বাণী কি বেণী-বাবুর ঐশ্বর্যে ভক্তিতে বিমুগ্ধ নয়? ভদ্রলোকের ঐশ্বর্যের সঙ্গে ভক্তির অন্য ব্যাখ্যা করে নাকি। এতটুকু মেয়ের এত বুদ্ধি হয়েছে?

ঠিক তাই। বাণী বললে, এক নম্বর 'ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার'! ওয়ার ফণ্ডে মোটা টাকা দিয়ে পুলিসের মুখ বন্ধ রেখেছে—এখন পাড়ার লোকের মুখবন্ধ করতে চায়।

বাণীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ওঠে।

সমর অবাক হয় এই সেদিনের ফ্রক-পরা বোনের বুদ্ধির প্রখরতা দেখে। ওকি নিজে নিজে এই সিদ্ধান্ত করেছে, না ওর মাথায় এ কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে? গৃহস্থঘরের অনূঢ়া মেয়েদের অসমর্থ বাপ-ভাইকে সমবেদনা দেখাতে ধনীর প্রতি কপট অসূয়া নয় তো? বাণীর মন্তব্যটা পাকামীর মত মনে হয় সমরের।

সমর জিগেস করেঃ তোরা যাস্ না গান শুনতে? হরিনাম কি আর শুধু বিলোয়?

বাণী যেন ফোঁস করে ওঠেঃ ঘেন্না! ছোড়দা তাহলে কি আর আস্ত রাখবে! মা একবার যেতে চেয়েছিল—ছোড়দা বলে গেল যদি শুনি যে, তুমি ওখানে গেচ, তাহলে আমি বাড়ি ঢুকবো না, বাড়ির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ভয়টা তা হলে তোদের ছোড়দাকে? সমর যেন ইচ্ছে করেই স্বরটা একটু বক্র করে।

বাণী বুঝতে পারে—বলে, ভয় কেন হবে; ছোড়দা ঠিক কথাই বলে। হরিনাম দিয়ে নিজের পাপ ঢাকতে চায়। ওতে ওরা প্রশ্রয় পায়।

প্রবীরের কথা উঠতে সবটা বাড়াবাড়ি মনে হয়। বেণীবাবুর পয়সার ওপর হিংসে ছাড়া কি! ওসব নীতি-ফীতির কথা বাজে। প্রবীর-বাবুর শিক্ষায় বোনটিও সেই রকম তৈরী হয়েছে—বড় বড় কথা শিখেছে কেবল। বাগ-মশায়ের আর্থিক উন্নতিতে সমর যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ হয়েছে বেণীবাবু নামক অপরিচিত ব্যক্তির অপর্যাপ্ত অর্থাগমের সংবাদে ঠিক সেই পরিমাণ ক্ষুব্ধ হতে পারছে না। বরং বেণীবাবুর সঙ্গে মনে মনে একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে তুলতে চাইছে। কে জানে, এ প্রবীরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল কি না। হঠাৎ বেণীবাবুর পক্ষ সমর্থনের ইচ্ছেটাও প্রবল হয়ে ওঠে। বোনকে ধমকানর মত বলে, পয়সা করলে অমনি কেউ চোর হয় না—যারা পয়সা করতে পারে না, তারা পয়সাওলাদের চোর ভাবে।

বাণী বলে, কিন্তু ও'র পয়সা যে চুরি করে এ তো সবাই জানে।

সবাইএর মধ্যে কারা, তুমি আর তোমার ছোড়দা তো? জানলে কি করে? সমর যেন ওদের হেয় প্রতিপন্ন করছে, এমনি শোনায় কথাটা।

ও'র অতীত আর বর্তমান, দুটোর মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য নেই—অসদুপায় ছাড়া এ সম্ভব হয় কি করে? বাণী বলে।

সমরের নিশ্চিত ধারণা হয় বাণী শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে। সকালবেলা মিছে তর্ক করে। হেসে বলে—But ill-got money well spent—এটা মানিস তো?

বাণী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলে, না।

একটা তর্ক উঠে পড়ে। সমর বলে, না কেন?

পাপের পয়সায় পাপ খণ্ডান যায় না। দুর্ভিক্ষের সময় খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করে' ঐ রকম অনেকে দোষ কাটিয়েছে। লোকে বাহবা দিয়েছে, চাল চুরির জন্যে কেবল গভর্নমেণ্টকেই দোষারোপ করেছে। এও তো well spent!

বাণীকে সমর ছেলেমানুষ ভাববার অবসর দেয়ঃ চুরি না করলে দান করবে কোত্থেকে?—আমার মত লোক তো আর দান করতে পারে না।

সমরের মুখে হাসি লক্ষ্য করে বাণী আর তর্ক করে নাঃ দাদা নিশ্চয়ই রহস্য করছে। আর ভেবে দেখলে দাদার কথার তাৎপর্যও পাওয়া যায়—চুরি না করে কে কবে দান করেছে যেন হঠাৎ মনে করা যায় না। দান-খয়রাতের বাহবাটা চুরির ছি ছি'র নামান্তর। বাণী চট করে একটাও দানবীরের কথা স্মরণ করতে পারে না—দাদা ধাঁধাঁয় ফেলে দিয়েছে। দান করার মত অর্থ মানুষ পায় কোথা থেকে? দান করে কেন?

সমর বলে, তোমরা যা ভাব, বেণীবাবু লোকটা হয়তো তা নয়—উনি ধর্মপথে থেকে উপার্জন করেছেন। যারা পয়সা করতে পারে না, তারা ধনীদের নামে অমন বদনাম দেয়—মজা, সেই ধনী না হলে আবার চলেও না।

দাদার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। বাণীর মনে হয় দাদা ছেলেমানুষের মত তর্ক করছে। এত সহজ জিনিস তারা বুঝতে পারে, আর দাদা বুঝতে পারছে না? যুদ্ধে গিয়ে দাদার কি হলো? —তুলনায় ছোড়দার চেয়ে দাদাকে অনেক ছেলেমানুষ মনে হয়।

এবার সমর জিগ্যেস করলে, প্রমাণ আছে কিছু?

বাণী এবার সত্যিই রেগে যায়। একটা কঠিন জবাব দিতে গিয়ে মুখে আটকে যায়। কম্পিত কণ্ঠে বলে, যেখানে চালের অভাবে লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরেছে, সেখানে
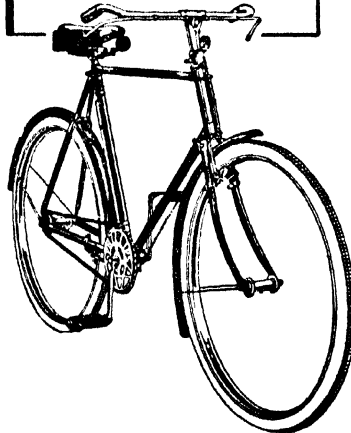
দান করবার জন্যে মণ মণ বস্তা বস্তা চাল আসে কোত্থেকে? আরো প্রমাণ, দুর্ভিক্ষে একটা দলই মরল কেবল!

দূর—বাজে—বাজে তর্ক—সমর চুপ করে যায়। বোনের জন্যে বোধ হয় মনে মনে একটু গর্ব বোধ করে। বেশ তৈরী হয়েছে বোনটা। কিন্তু প্রবীর কেন সে কৃতিত্ব নেবে? সে-ও তো ইচ্ছেমত বোনকে এখন তৈরী করতে পারে। সব কথায় ছোড়্দার মত কেন? সমরকে বাণী ভক্তি করে নাকি?

অলকার কথা মনে হয়। দেখা হলে সেও কি বাণীর মত তর্ক করতো? হঠাৎ পয়সাওলা লোকদের সাধুতা নিয়ে অমন দীপ্তকণ্ঠে বাদ-প্রতিবাদের অবতারণা করতো? মুখচোরা লাজুক মেয়েটা বাচনিকতায় মানসিক পরিবর্তন বুঝিয়ে দিতো? সমর বুঝতে পারে, ছ'বছর আগের কোলকাতা আর আজকের কোলকাতা এক নয়—মানুষের মন আর সেই নেই—পরিবর্তন একটা হয়েছে। কিন্তু কি সে, কেন সে ধরতে পারে না। আর ধরতে পারে না বলেই বোধ হয় যা দেখে যা শোনে সবই বড় বাড়াবাড়ি মনে হয়—বিরক্ত হয়, সম্মানহানির আশঙ্কা জাগে। বোধ হয় যা দেখে, যা শোনে সবই মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়—নিজেকে এত অসহায় আর পরিত্যক্ত লাগে—সে কাউকে বোঝে না কেউ তাকে বোঝে না—তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় সংসারে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

হঠাৎ দাদাকে অন্যমনস্ক দেখে বাণীর মনটা কেমন করে ওঠে। যেন দাদা বাজে তর্ক করলেই ভাল—গম্ভীর হলে দাদাকে একেবারেই মানায় না।

দাদাকে প্রফুল্ল করতে বাণী বলে, আজকের প্রোগ্রামের কথা মনে আছে তো? দুপুরে চিড়িয়াখানা।

সমর বলে, কে কে যাবে? তুই আর আমি?

প্রশ্নটা কেমন বেখাপ্পা শোনায়। আর কার অপেক্ষা করে আছে সমর মনে মনে?

মনে করিয়ে দেবার মত সপ্রতিভ কণ্ঠে বাণী বলে, কেন, মনে নেই? আমার এক বন্ধু আর তার ছোট ভাই আমাদের সঙ্গে যাবে।

সমর 'ও' বলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ছুটিতে দেশে ফিরবার আগে মনে মনে যে প্রোগ্রাম করেছিল, তার কথা মনে পড়ে হয়তো। খুব একটা উৎসাহ বোধ করে না। বাণীর বন্ধুকে জানবার আগ্রহও করে না। যেন কারো কিছুর কোন কিছুর মানে হয় না।

বাণী উজ্জ্বল হবার চেষ্টা করেঃ আমার বন্ধুটি কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে পাগল। যুদ্ধের এত খবর রাখে—দেখবে কি ইন্টারেস্টিং মেয়ে!

হঠাৎ সমরের খেয়াল হয় বোন দূতীয়ালি করছে—বয়েসের সম্বন্ধের কোন বাধাই মানছে না। দাদা এখনো অলকাদি'র কথা ভাবে, বাণী কি মনে মনে টের পেয়েছে?

সমর মুখে বলে, তাই নাকি? বেশ তো! তুমি এবার ওঠ—বেশ সকাল হয়ে গেছে। আমি নীচ থেকে আসচি, দেখি খবরের কাগজ দিলে কিনা! বাণী চলে গেল।

বাণী চলে যেতেও সমর উঠলো না—কম্বলটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কি হবে এত সকালে উঠে? ছুটি, ছুটি, ছুটি, মাথা চাপা কম্বলের তলায় অনেক মনস্তাপ, অনেক নিরুৎসাহ যেন ভিড় করে আসে—অলকার প্রতিদিনের আলাপে প্রতারণার রেশটাই যে স্পষ্ট ছিল—হ্যাঁ, অলকা নীরবে অবজ্ঞাই করতো। এত নির্বোধ ছিল তখন সমর—ছি, ছি। একটা ক্রুর প্রতিহিংসা কম্বলটার তলায় আশ্রয় করেছে, পাশ ফিরলে যেন স্পর্শ পাওয়া যাবে—সমর দেহটাকে সঙ্কুচিত করে রাখে। বারে 'বারে ঢোক গিলে গলায় বেঁধা কাঁটা পরখ করার মত মনটা কেবলি অলকার কথা ভাবে—ব্যথাটা কোথায়?

বাণী হাঁফাতে হাঁফাতে নীচ থেকে ওপরে উঠে আসে। সমরের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়ঃ দাদা, শীগ্গীর এসো—পুলিস।

সমর গায়ের কম্বলটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসেঃ পুলিস? মানে?

বাণী ঘরের মধ্যে ঢুকে জানালার কাছে সরে এসে বলে, দেখে যাও।

আতঙ্ক উত্তেজনায় বাণী তখনো হাঁফায়। সমর দেখে, অনেকগুলো লাল পাগড়ী গলির মোড় থেকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে—বাড়ির দোরগোড়ায় জন দুই দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে এসে উল্টোদিকের জানালার কাছে দাঁড়াতে দেখলে, নীচে সরু পাঁচিলের গা ঘেঁষে জন দুই দাঁড়িয়ে আছে—একজন হাতের বেঁটে লাঠিটা দিয়ে ডুমুর গাছটার ডালপালা ছিঁড়ে দিচ্ছে। পরাশ্রয়ী অকুতোভয় ডুমুর গাছটা ওর কি ক্ষতি করেছে কে জানে।

সমর ভাবছে, সকালবেলায় এত পুলিস কেন? প্রবীর কি—বাণী বারে বারে দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখে—দাদা এর কারণ কিছু জানে নাকি? মিলিটারী দাদার বাড়ি ফেরার সঙ্গে পুলিসের বাড়ি ঘেরাও করার সম্বন্ধ আছে? দাদা অমনভাবে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে কেন?

নীচ থেকে বাবার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ বাণী তোর দাদাকে ডেকে নিয়ে আয়। জ্বালাতন।

সমর ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিগ্যেস করলে, তোর ছোড়্দা কোথায়? তাকে ডেকে দে না—

ছোড়্দার অনুপস্থিতি জন্যে যেন বাণীই দায়ী। জবাবটি কৈফিয়তের মত শোনায়ঃ ছোড়্দা তো আজ দুদিন বাড়ি নেই।

সমর ফেটে পড়েঃ কেন? কোথায় রাজ-কর্ম কোরতে গেছেন?

নীচ থেকে যোগানন্দবাবু ডাকের পর ডাক দিতে লাগলেনঃ কই রে, তোরা নামবি না? আচ্ছা মুশ্কিলে পড়া গেল।

দোষারোপের মত সমর বলে, দুদিন বাড়ি নেই—কই সে খবর তো আমাকে জানান হয়নি। এখন আমাকে যেতে হবে, কেন? কোথায় কি করে আসে তার কৈফিয়ৎ চাইতে পার না। যা হয় হোক গে, আমার কি।

বাণী অনুরোধের সুরে বলে, রাগ পরে কোরো, এখন চল—ছোড়্দার জন্যে পুলিস না-ও আসতে পারে।

তবে কি আমার জন্যে এসেছে? সমর বেশ ক্রুদ্ধ হয়।

অন্য কারণও হতে পারে—দেখবেই চল না। বাণী অনুরোধ করে, বাপের ডাকে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

না, আমি যাব না। যা হয় হোক গে যাক্, I am nobody here. সমর খাটের ওপর জেঁকে বসে।

বাণী আর দাঁড়ায় না। দাদার রাগের কারণটিও বুঝতে পারে না। ঘর ছেড়ে নীচে নেমে যায়। কি ভেবে সমর উঠে পড়ে—গায়ে জামা গলিয়ে বাণীর পিছু পিছু নীচে নেমে আসে।

সিঁড়িতে মার সঙ্গে দেখা হতে মা একেবারে ভেঙে পড়লেনঃ বলেছিলুম, ছোঁড়া সক্কলকে মজাবে। কোথায় কি করে এসেছে—কে জানে।

পুলিস অফিসার সার্চ ওয়ারেণ্ট দেখালেন। বাড়ি সার্চ করবেন। যোগানন্দবাবু টেবিলের একধারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, পুলিস অফিসারের আশেপাশে দু'একজন কনস্টেবল বোড়ের চালের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের ওপর রাখা 'সার্চ ওয়ারেণ্ট' কাগজখানা নিঃশব্দ সঙ্কেতে ঘরের সমস্ত বিস্ময় সমস্ত প্রশ্ন কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে—যত জোড়া চোখ ছিল, সব ঐ দিকেই ফিরে আছে। কাগজখানা তুলে নিয়ে সমর নেড়েচেড়ে দেখলে—পুলিস অফিসারের হাতে ফেরৎ দিতে দিতে বললে, ভুল ইনফরমেশন পেয়েছেন। আমি যুদ্ধে গেছলুম।

পুলিস অফিসার ভুলটা ঠিক মানলেন বলে মনে হলো না। হেসে বললেন, ও। নিজের যুদ্ধে যাবার সংবাদটা যেন বেফাঁস বলে ফেলেছে। পুলিস অফিসারের নির্লিপ্ত নিরুৎসুক জবাবে সমর বড় অপ্রস্তুত বোধ করে। বলবার উদ্দেশ্যটা যেন বিকৃত হয়ে গেছে।

(ক্রমশ)

দিল্লীস্থিত কাশ্মীরিগণ কর্তৃক পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সর্দার প্যাটেল, শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার প্রভৃতির সহিত পণ্ডিত নেহরুকে দেখা যাইতেছে

পণ্ডিত নেহরু তাঁহার জন্মদিবসে তাঁহার তরুণ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে ক্রীড়ায় যোগদান করিতে যাইতেছেন

বিজ্ঞমুখের কথা

আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রাচীন প্রথা বা সংস্কার ছিল, সেগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা চলে না, এই কথাটাই এতক্ষণ বলতে চেয়েছি। যেগুলো নিতান্ত বাহ্য, অর্থাৎ যার প্রাণবস্তু নেই, অনুষ্ঠানই যাদের সর্বস্ব—সেগুলোকে অবশ্যই ছাঁটাই করে নেওয়া দরকার। নইলে জীর্ণ অতীতকে আঁকড়ে থাকতে হয়। ভবিষ্যৎ না ভেবে, অগ্রগতির সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যুগধর্মের দাবীকে অস্বীকার করতে হয়। যেমন অনেকটা এখন আমরা করছি বাঙলা দেশে। ১৯০৬ সালের মোহ আজও দূর হল না আমাদের জীবন আর সাহিত্য থেকে। তারই পুনরাবৃত্তির জের টেনে চলেছি ভারবাহী জীবের মতন। ১৯৪২ সালের পটভূমিতে যে রঙ লাগল, সেটাও অস্তরাগের। তিন যুগেরও আগে যে সূর্য উঠেছিল, তারই অন্তিম রক্তিমা। পৃথিবী জোড়া কালান্তরের সঙ্গে কিছুটা তাল রেখে চলতেই হবে, এ সহজ সত্যটা আমরা মেনে নিতে চাই না। কেননা তাতে বিপদ আছে, স্বার্থহানির আশংকা আছে।

কিন্তু তাই বলে সব কিছু ছেড়ে দিতে, উড়িয়ে দিতে পারি না। এটা সেণ্টিমেণ্ট নয়। হয়তো অবচেতন মনে একটা মায়া, একটা মমত্ববোধ কাজ করে। তা করুক। কিন্তু যা নিয়ে মাটি আর মানুষ তৈরি হয়েছে, হাজার হাজার বছরের ইতিহাস রচিত হয়েছে, কত শত আদর্শ আর ধারণার অজস্র পরিবর্তনের পরও যে গভীর সংযোগ আজও ছিন্ন হয়নি, তাকে ত্যাগ করা সমীচীন নয় এবং সম্ভবও নয়। সাময়িক উত্তেজনায়, যুগসংকটের চলতি ধুয়ায় সে কাজটা লোভনীয় এবং সহজ মনে হলেও মূল উৎপাটন করা চলে না। কলমের চারা বাঁধবার সময়ে ডালপালা ছেঁটে নিতে হয়। কিন্তু অঙ্গচ্ছেদ প্রয়োজনীয় হলেও, শিকড় উপড়ে ফেলা হয় না। কোনো দেশেরই সমাজ-গুরু আর রাষ্ট্র-নায়কের দল একথা বলেন নি। এমন কি সোভিয়েটেও নয়। বিশ্ব-শ্রমিক-রাষ্ট্র-কল্পনায় তারা নিজস্ব সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়নি। সেখানেও ক্লাসিক্স্ চর্চা হয়। ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা আছে যথেষ্ট। কিন্তু ঐতিহ্যের শ্রদ্ধেয় অংশের প্রতি অনাদর নেই। বিদেশের নজির দিতে বাধ্য হলুম এই কারণে, যে বিদেশ এখনও আমাদের চিন্তাগুরু।

বর্তমান যুগে দুটো জিনিস লক্ষ্য করছি —যে দুটো পরস্পরবিরোধী। একটা হল ইতিহাস না পড়ে ও বুঝে ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করা। আরেকটি হল বিদেশী শাসনাবসানে উৎকট স্বদেশিয়ানা। অর্থাৎ ঐতিহ্যের মৌখিক প্রেম। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ বনাম সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ।

আমার যুবক বন্ধুদের একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়। আমাদের বর্তমান ইতিহাস যা নিয়ে গড়ে উঠেছে, তার পিছনে বহুযুগব্যাপী যে সাধনা আছে, তার কথা কি তাঁরা জানেন? ইতিহাসের সঙ্গে মৌখিক পরিচয় সকলেরই আছে অল্প-বিস্তর, তা জানি। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকের ইতিহাস জ্ঞানের কথা বলছি না। আমাদের ইতিহাসের যেগুলি প্রাথমিক উপকরণ সেগুলি তাঁরা পড়েছেন অথবা পড়বার চেষ্টা করেছেন কি? আমার মনে হয় তাঁদের সে ইচ্ছা নেই অথবা সময় নেই। সংবাদ-পত্র, রাজনীতি আর চিত্রগৃহের দুর্নিবার আকর্ষণ কাটিয়ে যেটুকু শক্তি বা সময় থাকে, সেটুকু 'পাশের পড়া' অর্থাৎ অধ্যাপক প্রদত্ত স্যাজেশ্যন-সংগ্রহেই চলে যায়। তাঁরা বেদ-পুরাণ মহাভারতের নাম শুনেছেন, দু চারটে গল্পও জানেন। কিন্তু অনুবাদ মারফৎ। মৌলিক গ্রন্থ পড়া দূরে থাকুক, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দরের বিশিষ্ট প্রবন্ধাবলী পড়ে আপনাদের ঐতিহ্য-সম্পর্কে জ্ঞানবান হতে তাঁরা পারেন নি। এটা দুঃখের কথা। ইতিহাস সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কৌতূহল এবং দৃষ্টি না থাকলে আমাদের ঐতিহ্যের গুণাগুণ বুঝব কি করে? পরের মুখে ঝাল খেয়ে স্মার্ট হওয়া যায়, চমৎকার বুকুনি কাটা যায়, পাশ করা যায় এবং মুরুব্বি থাকলে চাকরিও জোগাড় হয়। কিন্তু মানুষ হওয়া যায় কি? মানুষ নিয়েই ইতিহাস তৈরি হয়। আমাদের ভবিষ্য ইতিহাস কি হবে অমানুষিক? শূন্যগর্ভ কলসীর আওয়াজ মাত্র?

*   *   *   *

কি জানি চারদিকে যা দেখছি, তাতে মনে হয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের অত্যাবশ্যক এবং আন্তরিক বন্ধন শিথিল হয়েছে। এটা শুধু যুগ-সন্ধিক্ষণে সভ্যতারই সংকট নয়, সেইসঙ্গে আমাদের স্বদেশী সংস্কৃতিরও সংকট। দ্বিধাখণ্ডিত দেশে, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় সংকীর্ণতায় দুষ্ট মনোভাব নিয়ে, দুর্নীতি দমনের অছিলায় ব্যাপকতর স্বার্থ-প্রণোদনে এটা আমাদের জাতীয় জীবনেরও সংকট। যেখানে স্থিরবুদ্ধি বিচার-শক্তির অভাব, সেখানে শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অভাব বলে বসে থাকলে এ সংকট জাতিরও সংস্কৃতির সংকট বলেই গণ্য হবে। বাঙলাদেশের সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনে যে মান-বিভ্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার একাধিক এবং অর্থনৈতিক কারণ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু চেষ্টিত আর চরিত্র, নিরীক্ষা আর প্রচেষ্টা— এ ছাড়া সেই মানোন্নতি সম্ভব হয় কি করে?

এদিকে গত আট দশ বছরে কাগজে-কলমে কত চেষ্টাই না চলেছে। কনফারেন্স, কমিটি, সাব-কমিটির বেড়াজালে শিক্ষা বিভাগের সংস্কার আজও আবদ্ধ আছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয় হিসেবে বাঙলাকে যথাযোগ্য সমাদরও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উৎকট স্বদেশিয়ানার নমুনা দেখতে পাচ্ছি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনাদরে। পলিটিকস্‌এ বর্জন নীতি চলে। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে নীতি গ্রাহ্য কি না এবং গ্রাহ্য হলে কতটুকু, সেটা ভেবে দেখতে হবে। বিদেশী ভাষা বলেই সেটা উপেক্ষার বস্তু নয় আর শিক্ষণীয় অথচ অপ্রয়োজনীয় জিনিস বলে যদি সেটাকে গ্রহণ করি, তাহলে অশুদ্ধির প্রয়োগ বেড়েই চলবে। একদিকে ইংরেজি জ্ঞান যেমন কমছে এবং শিক্ষার ত্রুটিগুলো যেমন গর্হিত বা নিন্দনীয় বলে আর বিবেচিত হচ্ছে না, উপরন্তু পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা বেড়েই চলেছে, অপর দিকে দেখি মাতৃভাষার জ্ঞানও কিছু পরিমাণে বাড়ছে না। ইংরেজির প্রতি নিষ্ঠার অভাবে যদি বাঙলার প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা বাড়ত, তাহলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে, স্বজাতীয় সংস্কৃতির উপযুক্ত বাহক হিসেবে সে ভাষার প্রতি মর্যাদা-বোধ আরও পরিস্ফুট হত। 'ক্যারেকটার' বা জীনিয়স্' লিখতে যে বানান বিভ্রাট সৃষ্টি হয়, 'সন্ন্যাসী'র বর্ণশুদ্ধি সমস্যাও সেই পরিমাণে তীব্র হয়। 'উচিত' লিখতে গিয়ে সাংঘাতিক 'অনুচিৎ' কাজ করে বসি। 'ঊর্ধ্বে'র তো কথাই নেই, অধঃপতিত হয়ে যাই। এ অবস্থায় স্বাদেশিকতার অর্থ কি? ভাষারই বা স্বাস্থ্য-রক্ষা হয় কিসে যদি সে 'সাস্থ' বিকৃত হয় লেখনীর অগ্রভাগে?

মনে হয় সংস্কৃতের প্রতি ক্রমশ যে বীত-রাগ ভাবটা আসছে, সেটাও একটা কারণ। সংস্কৃত যে মৃতভাষা এটা সকলেই জানে। কিন্তু যে সংস্কৃত সংস্কৃতির বাহন, যে ভাষা থেকে ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার জন্ম, তার সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিন্ন হলে দেশের ধর্ম, সমাজ, শাস্ত্র, ইতিহাস জানব কি করে? শুধু তর্জমা-সাহিত্য দিয়ে কোনও দেশ লাফিয়ে বড় হয়েছে, এমন কথা শোনা যায়নি। আমাদের বেশির ভাগ ছাত্রের কাছে, সংস্কৃত

মানে পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত মশাই মানে ব্যাকরণ আর খিটুনি। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিকতম সার্থক সাহিত্যিক—কেউই সংস্কৃতের প্রতি অনাস্থা দেখাননি। সংস্কৃত-চর্চা বন্ধ করার অর্থ হল ঐ শিকড় উপড়ে শুকনো ডালে জল দেওয়া।

* * * *

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। অতএব শিক্ষা সংযমের প্রয়োজন নেই। কতকগুলি ধরতাই বুলির সস্তা মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি আমরা। উৎকট স্বাদেশিকতার নমুনা দেখছি সর্বত্র। সর্ববিধ জাতীয় প্রচেষ্টায় স্বাজাত্য-বোধ দেখাতে গিয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এটা যদি ক্রমশ শ্যাভিনিজম-এ দাঁড়ায়, তা'হলে বিস্মিত হব না। গান্ধীজী-কল্পিত সত্য রামরাজ্য শুধু মহাকাব্যের যুগানুযায়ী কয়েকটি নামকরণে যেন শেষ না হয় আর আভিজাত্যহীন স্বাজাত্যবোধ সম্পর্কে কবি-গুরুর যে বিভীষিকা ছিল, সেটা যেন বাস্তব হয়ে না ওঠে, এই বিপ্রমুখের প্রার্থনা।

যে সময় পশ্চিমবঙ্গে শান্তির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সেই সময় যে নানা স্থানে—কলিকাতায়ও অশান্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা "কালধর্ম" বলিয়া উপেক্ষা করিলে সংগত হইবে না। মহরমের প্রাক্কালে হাংগামা নিবারণ জন্য ২৪ পরগণার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে রাত্রি ১১টা হইতে বেলা ৫টা পর্যন্ত "কারফিউ" জারি করিয়াছিলেনঃ—

বনগ্রাম থানায়—আশাবন, সিন্দরাণী, রাণাঘাট, বাগদা, বয়রা, বনগ্রাম, কোলিয়াড়া, সুন্দরপুর, ঘাটবোর ও মোজিগঞ্জ ইউনিয়ন;

গাইঘাটা থানায়—ঝাউডাংগা ও রামনগর ইউনিয়ন;

স্বরূপনগর থানায়—গোবিন্দপুর, বিথারী বইরঘাটা ও বাঁকড়া ইউনিয়ন;

বাদুড়িয়া থানায়—সায়েস্তানগর;

বসিরহাট থানায়—ইটিণ্ডা ও শাঁকচূড়া ইউনিয়ন;

বসিরহাট থানায়—ইটিণ্ডা ও শাঁকচূড়া গঞ্জ, দুলদুলী, যোগেশগঞ্জ ইউনিয়ন ও টাকী মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা।

এতগুলি ইউনিয়ন প্রভৃতিতে সহসা ঐ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ কিন্তু সরকারের বিজ্ঞাপনে বিবৃত করা হয় নাই; সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন সংবাদও প্রকাশিত হয় নাই।

তাহার পরে কলিকাতায় মহরমের তাজিয়া শোভাযাত্রাকালে যে হাংগামা হইয়াছিল, তাহার জের মিটিতে কয়দিন অতিবাহিত হয়। এই হাংগামার কারণ, এখনও সরকার প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

মহরম সিয়া সম্প্রদায়ের শোকানুষ্ঠান। যাহারা সেই শোকের কারণ সেই সুন্নীরা কি কারণে এই শোকানুষ্ঠানে যোগ দিয়া ইহা উৎসবে পরিণত করেন? বেগম সাকিনা একবার মহরমে সুন্নীদিগের কার্য সিয়াদিগের পক্ষে বেদনাদায়ক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ও বাঙলায় সিয়া মুসলমানের সংখ্যা অতি অল্প—সেবার রাজাবাজারে যাহারা হাংগামা করিয়াছিল, তাহারা সুন্নী। সিয়া-সুন্নীর মধ্যে লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানে যেসব হাংগামা হয়, সে সকলও এই প্রসংগে মনে রাখিতে হয়।

আর এক দিক—কলিকাতায় পূর্ববংগ হইতে উপদ্রুত বহু হিন্দু আসিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপ অত্যাচার ভোগ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আচার্য কৃপালনীর ও কুমারী মুরিয়েল লেস্টার প্রভৃতি ব্যক্তির বিবৃতিতে সপ্রকাশ। তাঁহারা এবং "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" সময় কলিকাতায় উৎপীড়িত হিন্দুরা যে সেই উৎপীড়নের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন—অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, এমন নাও হইতে পারে।

এই উভয় দিক বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, সহজেই মনে হয়, যেস্থলে শান্তিভংগের সম্ভাবনা ছিল, তথায় সরকারের সতর্কতায় শৈথিল্য ঘটিয়াছিল।

পূর্ববংগ হইতে দলে দলে—লক্ষ লক্ষ—হিন্দুর পশ্চিমবংগে আগমন উপলক্ষ্য করিয়া সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা লইয়াও যে পূর্ব পাকিস্তানের সচিবরা উগ্র হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। বৃটেন হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—সর্দারজীকে তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা করিবার ও অবকাশ না দিয়া শ্রীশ্রীপ্রকাশকে তার করিয়া জানাইয়াছেন,—সর্দারজীর উক্তিতে ভীতিপ্রদর্শন নাই—সামরিক শক্তির প্রয়োগের ভয় দেখান তো পরের কথা। তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন—ভারত-রষ্ট্রের মত পূর্ব পাকিস্তানের সরকার ও হিন্দুদিগের পূর্ববংগ ত্যাগ চাহেন না। তিনি কিন্তু সংগে সংগে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়।

"পূর্ববংগের হিন্দুরা যে অত্যাচার ভোগ করিতেছেন তাহার জন্য যেমন, ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত অর্থনীতিক অবস্থার জন্যও তেমনই হিন্দুরা পূর্ববংগ ত্যাগ করিতেছেন। .... আমাদিগের কোন কোন প্রধান কর্মীও পূর্ব-বংগে উত্যক্ত হইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় মহাত্মা গান্ধীর খাস মুন্সী শ্রীপ্যারীলালের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হইয়াছে—অভিযোগের কারণ অদ্ভুত। এই সকলের জন্য পূর্ববংগে আমাদিগের অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ করা হইতেছে।"

তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন—

"পরিতাপের বিষয় এই যে, পাকিস্তান সরকার যাহা বলিতেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে অনুসৃত নীতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই।"

যদি তাহাই হয়, তবে পণ্ডিত জওহরলাল কিরূপে বলিতে পারেন—পাকিস্তান সরকারও হিন্দুদিগের পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ চাহেন না?

তিনি কিন্তু সর্দার প্যাটেলের মত অধিক ভূমি দাবীও করেন নাই, অধিবাসী-বিনিময়ের কথাও বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—ভারত-বর্ষে ও পাকিস্তানে একযোগে প্রচেষ্টাই এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়।

পাকিস্তান সরকার সে প্রচেষ্টা করিবেন, পণ্ডিত জওহরলালের সে বিশ্বাস কি এখনও অবিচলিত আছে?

খণ্ডিত ভারতবর্ষের যে অংশ আজ ভারত-রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত তাহা হিন্দুস্থান বলিতে কংগ্রেসের আপত্তি নাই বটে, কিন্তু তাহা হিন্দু-প্রধান হইলেও কোন বিশেষ ধর্মমত তাহার সরকার কর্তৃক সমর্থিত নহে। সেইজন্য হিন্দুর মত মুসলমান প্রভৃতি তথায় তুল্য রাজনীতিক ও ধর্মাচরণের অধিকার সম্ভোগ করে। পাকিস্তান তাহা নহে। পাকিস্তানের পরিচালকগণ অকুণ্ঠ কণ্ঠেই ঘোষণা করেন, পাকিস্তান মুসলমান রাষ্ট্র। তাঁহারা তথায় এখনও ইংরেজের আমলের আইনানুসারে কাজ করিতেছেন বটে, কিন্তু বলিয়া থাকেন, তথায় মুসলমানের আইন প্রবর্তিত হইবে। কার্যতঃ তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান ভেদে ব্যবহার ভেদও করিয়া আসিতেছেন। সেই জন্যই হিন্দুর পক্ষে পূর্ববংগে মান-সম্ভ্রম লইয়া বাস অসম্ভব হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালও বলিয়াছেন,—সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকার যে কথা বলিতেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী কর্মচারীদিগের ব্যবহার তাহার সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন নহে। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি কিরূপে আশা করিতে পারেন, পূর্ববংগে

হিন্দুরা আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়া বাস করিতে পারিবেন? ভারত সরকার যে পাকিস্তান হইতে লোকের আগমন পথ সঙ্কুচিত করিলেও পূর্ব-বঙ্গ হইতে আগতদিগের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন নাই, তাহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বড়লাট হইয়া চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী প্রথম সিমলায় গমন উপলক্ষে সিমলা মিউনিসিপ্যালিটি তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদানোৎসব করেন, তাহাতে তিনি পাঞ্জাবের লোককে তাঁহাদিগের ত্যাগের জন্য প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"আমি পাঞ্জাব ও বাঙলার কথাও বলিতে পারি—ভারতের স্বাধীনতার জন্য দেশের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অধিক কষ্টভোগ করিয়াছে।"

তিনিই সর্বাগ্রে এই প্রদেশদ্বয়কে ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের স্বাধীনতা লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শেষে সেই প্রদেশদ্বয়কে খণ্ডিত করিয়া তাহাদিগের ত্যাগের ও বেদনার উপর দিয়া ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন-রথ অগ্রসর হইয়াছে। আজ তিনি সেই রথে বসিয়া এই সকল কথা বলিতেছেন। তিনি স্বীকার করিবেন কিনা, জানি না, বাঙলার গোমুখী-মুখ হইতেই জাতীয়তার পাবনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালীর ত্যাগ অসাধারণ। মুষ্টিমেয় মুসলমান—আবদুর রশুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, মুন্সী দেদার-বক্স প্রভৃতি—বাদ দিলে স্বাধনীতা-আন্দোলনে হিন্দুরাই সকল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। সে সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমবেত শক্তিতে যুদ্ধ করিয়াছিল। আর আজ তাহাদিগের অর্ধাংশ—পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম রাষ্ট্রে রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তথায় কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্থান দিবার আগ্রহও যে ভারত-রাষ্ট্র দেখাইতেছেন, এমন বলা যায় না। পাঞ্জাবেরও অবস্থা বাঙলার মত। পাঞ্জাবও দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে—পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু-নিধন হইয়াছে এবং তথা হইতে হিন্দুরা পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারত-রাষ্ট্রের প্রথম ভারতীয় বড়লাট পাঞ্জাবীদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন—

"তোমরা যে দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছ, তাহা কে না জানে? ...... ইতিহাস তোমাদিগের ত্যাগের ও সহ্যগুণের বিষয় যেভাবে লিপিবদ্ধ করিবে, তাহাতে তোমাদিগের পরপুরুষরা গর্বানুভব করিবে।"

যাঁহারা ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য হন নাই—তাঁহাদিগের এই সান্ত্বনা ও প্রশংসা পাঞ্জাবের ও বাঙলার হিন্দুদিগের কতদূর কি করিতে পারিবে?

আগামী ৬ই ডিসেম্বর দিল্লীতে ভারত-রাষ্ট্রের প্রধানদিগের সহিত পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রধানদিগের যে আলোচনা হইবে, তাহার প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—

পাকিস্থান এখন হিংসাদ্যোতক নীতি ত্যাগ করিয়া হিন্দু বিতাড়ন জন্য নূতন নীতি অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্থানে—(১) ব্যবসা হিন্দুদিগের হস্ত হইতে মুসলমান-দিগের হস্তগত হইয়াছে; (২) সরকারী চাকুরীতে হিন্দুদিগের স্থান নাই; (৩) হিন্দুরা ব্যবসা করিবার ছাড়ও পান না; (৪) হিন্দুদিগের গ্রাম্য শিল্প নষ্ট করা হইয়াছে; (৫) হিন্দুদিগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ করা হইয়াছে, নহে ত সম্পূর্ণরূপে মুসলমানী করা হইয়াছে; (৬) যে সকল হিন্দু প্রতিবাদ করিতে সাহস করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই রাষ্ট্রের শত্রু বলিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে; (৭) হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়া বলা হইতেছে, তাহারা স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতেছে; (৮) মধ্যে মধ্যে লুণ্ঠন, হত্যা ও নারীহরণ চলিতেছে।

এইরূপে সিন্ধু ও পূর্ব পাকিস্থান হিন্দু-শূন্য করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

দিল্লীর আলোচনায় কি এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে?

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যে নীতিতে কংগ্রেস শাসন-ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত অবিচলিত ছিলেন, ক্ষমতা পাইয়াই সে নীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ও বিলম্ব অবলম্বন করিতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, প্রদেশ গঠন ব্যাপারে ভাষা ব্যতীত আরও অনেক বিষয় বিবেচ্য। কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের সূচ্যগ্র ভূমি পশ্চিমবঙ্গকে দিতে অসম্মত। বিহার সরকার যে সকল উপায়ে বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী জিলা কয়টি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিবার আন্দোলন দলিত করিতেছেন—সে সকল বিদেশীর শাসনকালে কংগ্রেসই নিন্দনীয় বলিয়া আসিয়াছেন। কংগ্রেসের গৃহীত নীতি যেভাবে অবজ্ঞাত হইতেছে, তাহাতে কেহ কেহ প্রাদেশিকতার প্রাবল্য আশঙ্কা করিয়া কথাটা স্থগিত রাখিতেও বলিয়াছেন। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়া কিন্তু বলিয়াছেন—

"ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী সঙ্গত এবং সে দাবী পূর্ণ করা কর্তব্য।"

তিনি বলিয়াছেন, এদেশে বৃটিশ শাসকরা আপনাদিগের স্বার্থরক্ষার্থ বলপূর্বক প্রদেশের যে সকল কৃত্রিম সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন—সে সকল অপসারিত করিতে হইবে। য়ুরোপে যদি ২৮টি রাষ্ট্র থাকিতে পারে, তবে ভারতবর্ষে কেন ১৪টি প্রদেশ থাকিতে পারে না?

দিল্লীর অন্ধ্রবাসীরা তাঁহাকে যে সভায় সম্বর্ধিত করেন, তাহাতেই তিনি এই মত প্রকাশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলেন—

"ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন সাধনে আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে।"

ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়া এই কার্যে কতদূর সফলকাম হইতে পারেন, তাহা দেখিবার বিষয়।

বিহারের অন্যতম সচিব মিস্টার আবদুল কায়েম আন্সারী ও পূর্ব (হিন্দু) পাঞ্জাবের অন্যতম সচিব জ্ঞানী কর্তার সিংহ একই সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল সম্বন্ধে দুইজন দ্বিবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মিস্টার আন্সারী বলিয়াছেন, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের আন্দোলন সম্বন্ধে এখন অসময়। এখন আন্দোলন করা অসঙ্গত—এখন কেবল ভারতের ঐক্য ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য কাজ করিতে হইবে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের কথা এখন বন্ধ রাখিতে হইবে। অবশ্য বিহার সরকার এই সময়ের মধ্যে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বিহারের অধিকার দৃঢ় করিবার হীন চেষ্টায় বাঙালী-দিগকে ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার চেষ্টায় বিরত থাকিবেন কি না, তাহা তিনি বলেন নাই। আর পূর্ব পাঞ্জাবের সচিব, অন্য প্রদেশের যে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিম-বঙ্গের পার্শ্ববর্তী—সে অঞ্চল দাবী করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একান্ত সঙ্গত—সে অঞ্চলে বাঙালীদিগের অধিকার জন্মগত। বিহারের সচিব বলিয়াছেন, এ সময় ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের চেষ্টায় ভারতের ঐক্য নষ্ট হইবে। তাঁহার ঐক্যের ধারণা যে সমর্থনযোগ্য এমন বলা যায় না। পরন্তু দেখা যাইতেছে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনে বিলম্বই ভারতের ঐক্যের অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। এমন কি, সেরাইকেল্লা সম্পর্কে উড়িষ্যায় যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছিল, উড়িষ্যা ভারত-রাষ্ট্র ত্যাগ করিতে পারে।

ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়ার মত সুস্পষ্ট। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হইলেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ কি তাঁহার মত—সুচিন্তিত হইলেও —তাহা গ্রহণ করিবেন?

.৫
রের

রুদ্রসপ্তমী

অমর সান্যাল

হাতীশালা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখের মাঝামাঝি বন্যার জল প্রবেশ করে। গ্রাম থেকে যমুনা নদী প্রায় দুক্রোশ দূরে, তবুও বসন্তের অবকাশে গ্রামের পথঘাট সফেন কর্দমাক্ত জলে পূর্ণ হয়ে যায়। মাঠের বুকে জেগে থাকে শুধু পাটের কাঁচ পাতা আর আউশ ধানের শীষ, খালবিলের কচুরিপানা জলের তোড়ে গৃহস্থের বাড়ীর গোড়ায় আশ্রয় পায়। প্রায় পাঁচ মাস গ্রামের সঙ্গে বহির্জগতের সকল সম্বন্ধ হয় বিচ্ছিন্ন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে মাত্র একটি দিনের জন্য হাতীশালা গ্রাম চঞ্চল কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা নীরব ঔৎসুক্যে প্রতীক্ষা করে সেই দিনটির জন্য।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হাতীশালার বাজারে একটি মেলা বসে। পাট ক্ষেতের উপর দিয়ে কচুরিপানার বনরাজি মথিত করে নৌকার পর নৌকা এসে ভিড় করে বাজারের কিনারায়। ভিন্ গাঁয়ের মেয়েরা আসে হাসি ভরা মুখ নিয়ে। স্বাস্থ্যের লাবণ্যে উদ্ভাসিত দেহবল্লরী, রঙীন কাপড়ে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। ছেলেরা নৌকায় দাঁড় বায়, বৃদ্ধেরা হাল ধরে।

জন্মাষ্টমীর প্রায় একমাস আগে বীজগাঁর কালিদাসী বায়না ধরল লোচনের কাছে,—হাতীশালার মেলায় যাবে। বীজগাঁ থেকে হাতীশালা মোটে চার ক্রোশ দূরে, শুকনো দিনে কালিদাসী নিজেই যতবার যাতায়াত করেছে পায়েচলা সরু পথ দিয়ে। জন্মাষ্টমীর মেলাতেই গেছে সাতবার। বিয়ের পরে কি একটা বন্ধনে সে আবদ্ধ হয়ে গেল! সংসারের আবেষ্টনী ভেদ করে ছুটে যেতে চায় তার কিশোর মনের চাঞ্চল্য, কিন্তু সঙ্গে লোচন না থাকলেও যেন সবই নীরস মনে হয়। লোচনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার মাত্র দুবছর, রঘুরাম সর্দার অনেক অনুসন্ধানের পর একমাত্র মেয়ের জন্য এই ছেলে সংগ্রহ করে এনেছে হাতীশালা থেকে।

জীবনের এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনে মন্ত্রমুগ্ধতায় লোচন আজিও বিহ্বল। হাতীশালায় ৷ একান্ত ছন্নছাড়া জীবন রঙীন পরদার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। বিবাহের পূর্বে তার পথ ছিল কর্কশ, কণ্টকাকীর্ণ; পরে জীবনের গতিধারায় দেখা দিল নতুন দিনের আলো। রঘুরাম সর্দারের মেয়ে কালিদাসীর রূপ ও গুণের কাহিনী শুধু হাতীশালা নয়, চারপাঁচখানা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। যুবকদের রক্তের মধ্যে বেজে উঠত কাড়ানা-কাড়া, যখন তাদের মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হত নিকষ কালো লীলায়িতভঙ্গী এক তরুণীর চরণধ্বনি।

লোচনের বিবাহের ইতিহাসে একটু বৈচিত্র্য আছে। রঘুরাম সর্দার প্রতিবার মেলায় আসে কালিদাসীকে নিয়ে। পুরুষদের কাছে মেলার মাঠে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ গোবরার দোকান। বাইরে সাজান থাকে পান, বিড়ি, সস্তার সিগারেট। দোকানের রহস্যময় অন্দরের সংবাদ জানে শুধু গ্রামের চৌকীদার আর নেতৃস্থানীয় পুরুষের দল।

কালীদাসীর হাত ধরে রঘুরাম প্রথমেই দাঁড়ায় গোবরার দোকানের সামনে। গোবরা আপ্যায়িত করে,—হে' হে', আস সর্দার আস, ঝিটি তো হাতীর মত বেড়ে উঠল।

এইখানে কালিদাসীকে বিদায় দেয় রঘুরাম। পুরাতন বন্ধু গোবরার হাত ধরে সে

প্রবেশ করে অন্দরে। সেখানে বসে থাকে সাত গ্রামের মোড়লের দল। তাদের চারিদিকে বিগতযৌবনা দেহবেসাতিনীর দল। মদ, তামাক ও ক্লিন্ন মনুষ্যদেহের গন্ধে সমাকুল ঘরের হাওয়া। হাসি ও হল্লোড়ে টিনের ছাদ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। সূর্য্যাস্তের একটু আগে রঘুরাম বিদায় নেয় সহচরদের কাছে। কালিদাসী অপেক্ষা করে নৌকায়, তার আঁচলে বাঁধা একরাশ খৈমুড়কী, নৌকার উপর সাজান সদ্যক্রীত মাটির পুতুল।

অঘটন ঘটল, কালিদাসী যখন তেরোয় পা দিল। রঘুরাম লক্ষ্য করেনি মেয়ে কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছে। মাতৃহারা কালিদাসীও নিজ দেহের পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেনি। তাই সেবার জন্মাষ্টমীর মেলায় কালিদাসী চলল বাপের সংগে পূর্বেকার মত কোমরে কাপড় জড়িয়ে, আলগা গায়ে।

গোবরার দোকানে পেঁছতে গৌবরা বলল,—কাপড়টা গায়ে জড়া কালি, খালি গায়ে আর মানায় না।

রঘুরাম খেঁকিয়ে উঠল,—কেনে, কেনে, কাপড় জড়াবে কেনে। ওর বয়েসটা কত শুনি!

ইতিমধ্যে কালিদাসী সরে পড়েছে মেলার ভিড়ে। জনতার মধ্যে আজ প্রথম সে বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। যুবকের দল তাকে অনুসরণ করে চলেছে একনিষ্ঠ ভক্তের মত। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দৃষ্টি নিবদ্ধ তার দিকে। মেয়েরা অংগুলি সঙ্কেত করছে তার দিকে। নিজকে বড় অসহায় মনে করল কালিদাসী। পুতুলওয়ালা কি একটা রসিকতা করবার চেষ্টা করল তার সংগে, পুতুল কেনা আর তার হল না। খাবারওয়ালার ব্যবহারও খুব সরল মনে হল না, কালিদাসী শূন্য আঁচলে ফিরে চলল।

তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বাপের উপর। নিজের জীবনে বাপের অনুপস্থিতি এই প্রথম অনুভব করল সে। এই ধরণের ঠাট্টা-বিদ্রূপ তার কাছে এই প্রথম,—প্রতিশোধের নেশায় সে বিহ্বল হয়ে উঠল। নিজের অজ্ঞাতসারে সে পা বাড়াল গোবরার দোকানের দিকে।

দোকানের অন্দরমহল বেশ জমে উঠেছে। সবে দুপুর, সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত এই অবাধ আনন্দোচ্ছ্বাসে একটুও ভাটা পড়বে না। অকৃপণ-হস্তে তাড়ির ভাঁড় সরবরাহ করে যাচ্ছে গোবরা। রঘুরাম ও বদন চৌকীদার ডুয়েট নাচবার চেষ্টা করছে, বিগত যৌবনার দল হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠল রঘুরাম।· মুক্তদ্বারপথে কালিদাসী দাঁড়িয়ে আছে,—ডুরে শাড়ীখানা কোমরে জড়ান, বিস্ময় ও কৌতূহলে চোখের তারা বিস্ফারিত। সারা ঘরখানা যেন রঘুরামের দৃষ্টি অনুসরণ করল। লুব্ধনেত্রে বদন প্রমুখ পুরুষেরা তাকিয়ে রইল অনাবৃতদেহ কিশোরীর দিকে, প্রৌঢ়ারা অকারণে হেসে উঠল খিলিখিল করে। বদন কি একটা রসিকতা করবার উপক্রম করতেই রঘুনাথ সম্বিৎ ফিরে পেল। সে নিঃশব্দে তুলে নিল ঘরের কোণে হেলান দেওয়া তার মোটা লাঠি গাছটা, তারপর ততোধিক নিঃশব্দে মেয়ের হাত ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রঘুরাম চিরদিনই অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, কিন্তু সেদিনকার ব্যাপারে তার মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। পরদিন সকালে চাটাই বুনতে বুনতে মেলার এই অপমানের কথাই সে চিন্তা করছিল, এমন সময় উঠানে কার ছায়া পড়ল। বিরক্তির সংগে মুখ তুলে চাইল রঘুরাম,—পাঁচু মোড়ল নিশ্চয়ই, হাতী-শালার ঘটনা শুনে রাতে বোধ হয় ঘুম হয়নি। কিন্তু তার অনুমান সত্য হল না, সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার বন্ধুপুত্র, হাতীশালার লোচন সর্দার!

মাটিতে বসে পড়ে লোচন বলল,—একটা বিধেন হোক্ সর্দার; মেয়েছেলের অপমান হয়ে গেল আমাদের গাঁয়ে, বলত চৌকীদারের মাথাটা কেটে আনি।

হঠাৎ যেন তেড়ে উঠল রঘুরাম,—আমার মেয়ের ব্যাপারে তুমাদের মাথা ব্যথা কেন? আরও কি একটা বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু কালিদাসীর আকস্মিক আবির্ভাবে থেমে গেল।

বিগত দিনের সাজসজ্জা তখনও কালিদাসীর অংগে। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু কাপড়ের আঁচলখানা গায়ে জড়ান। ঈষৎ আনত মুখে রাতারাতি দেখা দিয়েছে কিশোরীর সংকোচ, প্রথম যৌবনের ইংগিত।

আজ এই সর্বপ্রথম মেয়েকে নিরীক্ষণ করল রঘুরাম। এতদিন ভুলই করে এসেছে সে, নগ্নগাত্রে মেয়েকে মেলায় নিয়ে যাওয়া তার জীবনের সবচেয়ে বড় বোকামি। লোচনের দিকে চোখ ফেরাল সে,—হ্যাঁ, মরদ বটে! প্রতি অংগে শান্ত সুসংবদ্ধ একটা শক্তি বিকশিত হয়ে উঠেছে। কালিদাসীর চেয়ে বয়স কিছু বেশী, কিন্তু রক্ষাকারী পুরুষ বটে!

রঘুরাম বলল,—ঘর যাও হে আজ, কাল সাঁজের বেলা যাব তুমাদের গাঁয়ে।

কালিদাসী ও লোচনের বিয়ের পর তিনটি বৎসর কেটে গেল, কিন্তু এর মধ্যে হাতীশালার মেলায় যাওয়া একবারও ঘটে উঠল না। রঘুরাম যায় প্রতি বৎসরই, আকণ্ঠ তাড়ি খেয়ে মশ্‌গুল হয়ে ফেরে সন্ধ্যাবেলা। রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত কালিদাসী হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে বাপের কাছে, তৃষিত চাতকের মত হাঁ করে শোনে মেলার গল্প।

কয়েকটা প্রশ্ন সে নিজে থেকেই করে। পুতুলওয়ালা পঞ্চানন তার কথা জিজ্ঞাসা করে কি না, খাবারওয়ালা কানাইএর দোকান সেই বট গাছের নীচেই বসছে ত? আর একটা কথা বাপকে প্রশ্ন করতে গিয়ে সে থেমে যায়। কথাটা কি সে নিজেই ভাল জানে না, কিন্তু তার মনে হয় এইটাই সবচেয়ে বড় জানবার কথা। কালিদাসী স্বপ্ন দেখে আজও,—কোমরে আঁচল জড়ান এক কিশোরী মূর্তি, প্রথম যৌবনের অনুরাগে প্রদীপ্ত; চারিদিকে বিচিত্র এক জগতের মুখর কলরব!

চতুর্থ বৎসরে কালিদাসী রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল। তাগাদার পর তাগাদায় লোচনের ধৈর্য সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। মেলার দশদিন আগে অনুযোগকারী পত্নীকে সে আশ্বাসদানে শান্ত করল।

খবর শুনে রঘুরামও খুশী হল।—তা নেবা বৈকি, বৌকে নিয়ে তো সবাই যায়! এই ধরনা, তুমার শ্বাশুড়ী বেঁচে থাকতে একটি মেলাও বাদ পড়েনি মোদের। নৌকোয় যাবা তো? ওই ডিঙিখানায় যেও দুজনায়। আমি না হয় গয়নায় যাব।

মেলায় যাওয়ার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রঘুরামের শেষের কথাকটি লোচনের মন্দ লাগল না। দুজনের একসংগে কোথাও যাওয়া তো দূরের কথা, একসংগে থাকাই এ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। ডিঙি নৌকোয় ডুরে শাড়ীখানা পরে ঘোমটা-মাথায় কালিদাসী বসে থাকবে জড়সড় হয়ে, আর সে নৌকা বেয়ে চলবে ঘন পাটক্ষেতের ভিতর দিয়ে। লোচন পুলকিত হয়ে উঠল।

আর কালিদাসী! সেও শুনতে পেল তার বাপের সুব্যবস্থার কাহিনী। ছোট্ট ডিঙি আরোহী শুধু সে আর লোচন, খাল বিলের জল কেটে তরতর করে পাড়ি দেবে মেলার পথে। কতটুকুই বা পথ, উজান গেলেও ঘণ্টা দেড়েকের বেশী লাগবে না। অস্থির আনন্দে কালিদাসী আত্মহারা হয়ে উঠল।

মেলায় যাত্রার দুদিন আগে থেকেই আহার-নিদ্রা একরকম ত্যাগ করল কালিদাসী। রঙীন টিনের বাক্সটা খুলে জামাকাপড় বাছাই করতেই তার কেটে গেল পুরো একটি বেলা। লোচন ও রঘুরামের ভাগ্যে সেদিন ভাত জুটলো অবেলায়। রাত্রে শুতে গিয়েও লোচনের নিস্তার নেই। অন্যান্য দিন তার চোখে ঘুম নেমে আসে দেবতরা ক্ষণিক প্রসাদের মত, কালিদাসী এসে কত সাধ্যসাধনা করে তার ঘুম ভাঙ্গায়; আজ কিন্তু তার আগে এসে বিছানা অধিকার করেছে কালিদাসী,—বালিশে মুখ গুঁজে চুপটি করে শুয়ে। একখানা ডুরে শাড়ী কোমরে জড়ান, খোলা পিঠে প্রদীপের আলো চকচক করছে।

লোচনের গৃহপ্রবেশের সংগে সংগে উঠে বসলো কালিদাসী। চুপি চুপি বলল আবদারের সুরে,—হ্যাগা! কেমন দেখাচ্ছে বলত?

সুগভীর আবেগে লোচন সহসা মূক হয়ে গেল, তার উত্তেজিত বলিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে কালিদাসী শুধু থরথর করে কাঁপতে লাগল।

সে রাত্রি উভয়েরই অতিবাহিত হল নিদ্রাহীন গুঞ্জনে।

বীজগাঁ থেকে হাতীশালা যাওয়ার পথে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। মাঠের পর মাঠ, ধানক্ষেতের পর পাটক্ষেত। লম্বা গাছ দু-একটা চোখে পড়ে, তার মধ্যে খেজুর ও বাবলার প্রাধান্যই অধিক। বন্যার জল পৃথিবী থেকে স্থলের অস্তিত্ব যেন লোপ করে দিয়েছে।

জন্মাষ্টমীর মেলার দিন জলভরা মাঠে চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে। নিস্পন্দ জলরাশি মথিত করে নৌকার পর নৌকা ছুটে চলেছে হাতীশালা গ্রামের দিকে।

লোচনদের ডিঙিখানা চলছিল সবার অলক্ষ্যে,—পাটক্ষেতের অন্তরালে। এ ব্যবস্থা কালিদাসীর পরিকল্পনা অনুযায়ী। আগের দিন রাত্রিশেষে কালিদাসী আবদারের সুরে বলেছিল,—আমরা দুজনে যাব, কিন্তু আলাদা, সবার সুমুখে তোমার সঙ্গে যেতে ভারী লজ্জা লাগবে আমার। ধর, বাবা যাবে, তারপর ও-বাড়ীর পিসে, পিসীর ছেলেরা!

কালিদাসীর চিবুক ধরে আদরের সুরে লোচন উত্তর করেছিল,—বানের জল ঠেলে এমন পথে নৌকো নিয়ে যাব, তোমার বাপও টের পাবে না।

হুহু করে জল কেটে চলেছে লোচনের ডিঙা। অভ্যাসমত ঘোমটা টেনে বসে আছে কালিদাসী। লগি ঠেলতে ঠেলতে লোচন বলল, —এ কাপড়টা কাল রাতেও তুমার গায়ে ছিল।

খুশীর হাসিতে বিকশিত হয়ে কালিদাসী উত্তর দিল,—এ আমার বিয়ের আগের কাপড়। কতবার—

কি যেন একটা বলতে গিয়ে কালিদাসী হঠাৎ থেমে গেল। একটা রহস্য সে যেন প্রাণপণে চাপা দেবার চেষ্টা করছিল।

লোচন অতশত লক্ষ্য করেনি। লগিতে জড়ান ঘাসের শিকড় ছাড়াতে ছাড়াতে সে বলল,—এখন আবার অত ঢাকাঢাকি কেন? ঘোমটা খুলেই বস না একটু! আমরা দুজন ছাড়া এদিগরে আর জনমনিষ্যি নেই।

সত্যই তাদের ডিঙা চলছিল বিজন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। চারিদিকে ঈষৎ পঙ্কিল জলরাশি, হাওয়ার দোলায় পাটগাছের ডগা লুটিয়ে পড়ছে নৌকার ছইএর উপর, আকাশে শঙ্খচিল ও মাছরাঙা পাখীর কূজন রচনা করেছে বিচিত্র এক ঐক্যতান।

লোচনের অনুরোধ রক্ষায় কালিদাসী উৎসাহ প্রকাশ করল না, আরও জড়সড় হয়ে সে বসল নৌকার মধ্যে।

ঠাট্টার সুরে লোচন বলল,—বাস্‌রে, কি ভয় তোমার! আমি সঙ্গে রইচি, কার সাদ্যি তোমার গায়ে হাত দেয়!

কালিদাসী আনমনাভাবে উত্তর দিল,—হুঁ!

মেলার ঘাটে পৌঁছুতে তাদের বেশ খানিকটা দেরী হয়ে গেল। গয়নার নৌকো পৌঁছে গেছে কখন, ডাঙার উপর উদ্বিগ্নমুখে প্রতীক্ষা করছে রঘুরাম। মেয়ে জামাইকে দেখে বলল,—এতক্ষণে হুঁস হল বুঝি তুমাদের! যাক্, ঘুরে ফিরে দেখ, আমি চল্লাম হুই উদিকে, সাঁজের বেলা একসঙ্গেই ফেরা যাবে।

ঈষৎ হেসে লোচন বলল,—তোমার বাপের মেলায় আসা মানে গোবরার তাড়িখানায় নেশা জমান,—কি বল গো!

কালিদাসী পূর্বেকার মত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল,—হুঁ।

লোচন সবিস্ময়ে তাকাল স্ত্রীর দিকে। তার চোখমুখে শুরু হয়েছে ভাবের লুকোচুরি খেলা,—ক্ষণিক আনন্দ ক্ষণিক বিষাদে মেশা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করছে রঘুরামের গতিপথ তৃষিত চাতকের মত।

কালিদাসীর ভাবান্তরে লোচন বিস্মিত ও বিরক্ত হল। আনন্দের যে সুমধুর কল্পনা তার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে একটা কালো রেখা কে যেন টেনে দিয়ে গেল।

বেলা তখন বোধ করি দুপুর হবে। আকাশের কোণে কোণে দেখা দিয়েছে জলভরা মেঘ, অন্তরীক্ষে বাদলা হাওয়ার মৃদুমন্দ গুঞ্জন। সূর্য তখনও মেঘে ঢাকা পড়েনি, বিষাদঘন প্রকৃতি ধরা দিল কালিদাসীর আকৃতিতে।

দুজনে মেলার ভিড়ে মিশে গেল। কালিদাসীর উৎসাহ অকস্মাৎ ফিরে এসেছে। সে চলেছে অগ্রগামী, লোচন সানন্দে তাকে অনুসরণ করছে। খাবারওয়ালা, পুতুলওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়াল তারা। কালিদাসী খাবার কিনল, পুতুল কিনল অনেক দরদাম করে, দোকানীর সঙ্গে বাক্যবিনিময়ও হল খানিকক্ষণ, শেষে দাম দিয়ে বিদায় নিল। আশ্চর্য কেউ তাকে চিনতে পারল না, বধূবেশিনী কালিদাসী মুছে গেছে সবার মন থেকে!

ভিড়ের মধ্যে পথ-চলতি লোচনের এক সময় খেয়াল হল তার সম্মুখে কালিদাসী অদৃশ্য হয়ে গেছে। দুহাতে ভিড় ঠেলে সে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল, কিন্তু কালিদাসী নিখোঁজ। বেলা পড়ে এসেছে, সম্ভবতঃ সে নৌকায় বসে অপেক্ষা করছে। এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ক্ষুধাতৃষ্ণা পাওয়াও স্বাভাবিক, সদ্যক্রীত খাবারও তার কাছে। লোচন ছুটতে ছুটতে নৌকার কাছে এল।

নৌকা আরোহীশূন্য, শুধু ছইএর উপর একটা জামা বিছানো,—কালিদাসীর ব্লাউজ, এই সেদিন লোচন কিনে এনেছে শহর থেকে। তবে কি—লোচন সন্দেহে ভীত হয়ে উঠল। কালিদাসী নিশ্চয়ই জলে ডুবে মরেছে, তার উপর অভিমান করে, তাই ব্লাউজ দিয়ে গেছে ফিরিয়ে। ওঃ, এতক্ষণে লোচন কালিদাসীর আজিকার আচরণের রহস্য ভেদ করতে পারল। সে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলল গোবরার দোকানের দিকে। বেচারা রঘুরাম! বৃদ্ধ কি এই শোক সহ্য করতে পারবে?

উন্মত্তের মত লোচন প্রবেশ করল গোবরার তাড়িখানায়। রঘুরামকে সম্বোধন করতে গিয়ে ভূত দেখার মত সে চমকে উঠল। ঘরের এক কোণে ডুরে শাড়ীখানা কোমরে জড়িয়ে মুক্তবক্ষে দাঁড়িয়ে আছে কালিদাসী, আর রঘুরাম হাতের লাঠিখানা বাগিয়ে মত্ত হস্তীর মত দাপাদাপি করছে, বদন, গোবরা প্রভৃতি অনেক কষ্টে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে।
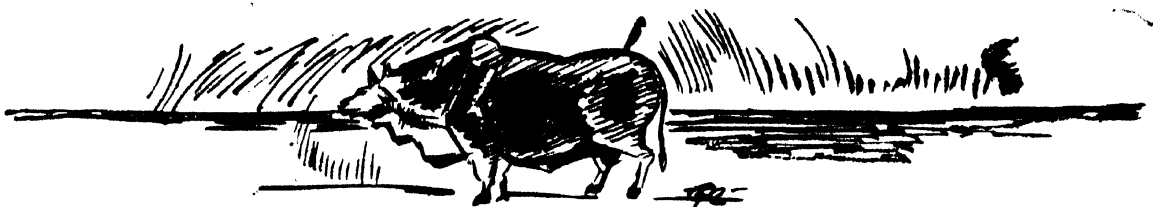
এভাট-লাই-এর আবেদন

গত ১৩ই নবেম্বর অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ও বর্তমানে সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ এইচ ডি এভাট এবং সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সাধারণ সম্পাদক এম্ ট্রিগভি লাই বৃহৎ চতুঃশক্তির কাছে আপোষ মীমাংসার জন্যে একটি মিলিত আবেদন করেছেন। এই আবেদনে বৃহৎ চতুঃশক্তিকে আপোষে সমস্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। আবেদনের ক্ষেত্র বিস্তৃত হলেও মূল আবেদনের লক্ষ্য হল বার্লিন সমস্যার সমাধান। বিশ্বের অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের মনে আজ ধারণা জন্মেছে যে, বৃহৎ চতুঃশক্তির মধ্যে আদর্শগত অনেক ব্যবধান থাকলেও বার্লিন সমস্যাই আজ তাদের মিলনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বার্লিন সমস্যার দ্রুত সমাধান তাঁরা প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করেন। ডাঃ এভাট্ ও এম লাইও স্পষ্টত তাই মনে করেন এবং সেই জন্যেই তাঁদের এ আবেদন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যন্ত বার্লিন সমস্যার সমাধান নিয়ে স্বস্তি পরিষদের বাইরে এবং স্বস্তি পরিষদের ভিতরে বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের মধ্যে যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে তা যদি আমরা মনে রাখি তবে এ আবেদনটিকে আরও গভীর অর্থজ্ঞাপক বলে মনে হবে। ডাঃ এভাট ও এম্ লাই তাঁদের আবেদন পাঠিয়েছেন সরাসরি চারটি রাষ্ট্রের অধিনায়কদের কাছে। এম্ স্টালিন্, মিঃ অ্যাটলী, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ কোয়েলিকে অনুরোধ করা হয়েছে যে, বিশ্বশান্তির খাতিরে বার্লিনের অচল অবস্থার সমাধানকল্পে তাঁরা যেন ব্যক্তি-গতভাবে চেষ্টা করেন। এ'দের আবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী হলেও এ সম্বন্ধে একদিকে সোভিয়েট রাশিয়া ও অপর দিকে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স যেরূপ পরস্পর-বিরোধী কঠিন মনোভাব অবলম্বন করেছে তাতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু ডাঃ এভাট্ ও এম্ লাই যে পথ দেখিয়েছেন এ ছাড়া আর কোন পথ আছে বলেও মনে হয় না। ইতিপূর্বে সব রকম উপায়েই বার্লিন সমস্যা সমাধানের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। সুদীর্ঘ মস্কো আলোচনার কথা আমরা ভুলিনি। বিগত ৩০শে আগস্ট তারিখে উভয় পক্ষের একটা খসড়া চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও বার্লিনের মিলিটারী গভর্নরদের মতদ্বৈধের ফলে সে চুক্তি কার্যকরী হয়নি। তারপরে বার্লিন সমস্যা এসেছিল স্বস্তি পরিষদে। সেখানে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে বার্লিন সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে পাশ করিয়ে নেবার ক্ষমতা

বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের থাকলেও রুশ 'ভেটো'র জন্যে তারা সুবিধে করে উঠতে পারেনি। স্বস্তি পরিষদের অস্থায়ী সভাপতি আর্জেণ্টিনার প্রতিনিধি দলের নেতা ডাঃ ব্রামগুলিয়া বিপাকে পড়ে ব্যক্তিগতভাবে এখনও আপোষ-প্রয়াস করছেন।

বৃহৎ চতুঃশক্তির কাছ থেকে এই মিলিত আবেদনের সরকারী জবাব ইতিমধ্যেই চলে গেছে বলে প্রকাশ। কিন্তু তাতে সুবিধা হয় নি কিছুই। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কার্যক্রমের সমর্থনই শুধু করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, রাশিয়াকে একই সঙ্গে বার্লিনে মুদ্রানীতি সংস্কারের অধিকার না দিলে সে বার্লিন অবরোধের অবসান ঘটতে দেবে না। ফরাসী-ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষও জানিয়ে দিয়েছে যে, বার্লিনের অবরোধ চলতে থাকলে তারা নতুন কোন আপোষ আলোচনার পথে এগুবে না। সুতরাং বার্লিন সমস্যা যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আবেদনে ডাঃ এভাট্ ও এম্ লাই ব্যক্তিগত সংযোগ ও বোঝাপড়ার সাহায্যে সন্তোষজনক সমাধানের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন সে বিষয়ে সোভিয়েট প্রত্যুত্তরে যথেষ্ট উৎসাহ দেখানো হয়েছে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন উৎসাহই দেখানো হয় নি। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ অ্যাটলী কয়েকদিন পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার দ্বারা বিশ্ব সমস্যার সমাধানে বিশ্বাস করেন না—যা কিছু করবার সবই করতে হবে সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের মারফৎ। মার্কিন প্রধান বিচারক ভিন্‌সন্‌কে ব্যক্তিগত দূতরূপে মস্কোতে পাঠানোর প্রস্তাব দেখে যাঁরা ভেবেছিলেন যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্ পুনর্নির্বাচিত হয়ে মার্শাল স্টালিনের সঙ্গে নিজেই দেখা করতে যাবেন, প্রেসিডেণ্ট তাঁদেরও হতাশ করে দিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, মস্কোতে স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মত কোন ইচ্ছা তাঁর নেই। তবে স্টালিনের ওয়াশিংটনে আসার নিমন্ত্রণ রয়ে গেছে—তিনি এলে প্রেসিডেণ্ট খুসীই হবেন। কিন্তু এ আশাও সুদূরপরাহত। অতএব অদূর ভবিষ্যতে বার্লিন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের কোন পথই দেখা যাচ্ছে না।

এভাট্-লাই-এর আকস্মিক আবেদনে ইঙ্গ-মার্কিন মহলে কিছুটা বিস্ময় ও কিছুটা ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন মহলের স্থির ধারণা এই যে, তারা বার্লিন সমস্যার আপোষমীমাংসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখেছেন। যদি কেউ সে প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে থাকে তবে সে হল সোভিয়েট রাশিয়া। সুতরাং এখন একমাত্র কাজ হল সোভিয়েট রাশিয়ার মত পরিবর্তনের। তাদের মতে বার্লিন সমস্যার জন্যে আসল দায়ী যদি কেউ থেকে থাকে তো সে হল সোভিয়েট রাশিয়া। সুতরাং যা-কিছু আবেদন নিবেদন সব কিছুই করা উচিত সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্দেশ্যে। সেক্ষেত্রে আলোচ্য আবেদনে বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সকে জড়িয়ে ফেলে এই শেষোক্ত রাষ্ট্র তিনটিকে অপমানিত করা হচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। এই আবেদনের ফলে মনে হয় যে, বার্লিনের অচল অবস্থার জন্যে আংশিকভাবে দায়িত্ব এসে পড়েছে উল্লিখিত রাষ্ট্রত্রয়ের উপর। এ নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন রাজনৈতিক মহল বেশ কিছুটা মনঃক্ষুন্ন হয়েছে বলে প্রকাশ। তাদের মতে এভাবে চারটি রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা নেই। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধিতার জন্যেই যেখানে বার্লিন সমস্যার সমাধান হতে পারছে না—সেখানে এভাবে চতুঃশক্তির কাছে আবেদন জানালে সোভিয়েট রাশিয়ার কার্যক্রমকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়। বৃহৎ চতুঃশক্তির উত্তর পাবার পর ডাঃ এভাট্ ও এম্ লাই কি করবেন তাই এখন দেখার বিষয়। বার্লিন সমস্যা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সেটা অনেকটা পরস্পরবিরোধী মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মর্যাদাবোধকে নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করে সোভিয়েট রাশিয়াই হোক আর ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হোক—দু' পক্ষের এক পক্ষকে কিছুটা নেমে আসতে হবে। তা যদি তারা না পারে তবে বার্লিন সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব। আর বার্লিনে যদি তাদের এই মূলগত বিরোধ লেগে থাকে তবে বিশ্বের অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে তারা একমত হবে কিভাবে?

রুঢ়ের শিল্পকলা

রুঢ়ের শিল্পাঞ্চলকে নিঃসন্দেহে জার্মানীর প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। এই শিল্পাঞ্চলের জোরেই বার বার জার্মানী রণপিপাসু, পররাজ্যলিপ্সু ও ইউরোপ বিজয়ের দুরাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। তাই বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে মিত্রপক্ষ যে বিষয়টি নিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী চিন্তিত হয়ে উঠেছিল সেটা হল রুঢ়ের কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। এই শিল্পাঞ্চলটিকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে জার্মানীর পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠার সমূহ

সম্ভাবনা। আর সে সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশী মারাত্মক হল ফ্রান্সের পক্ষে। কেন না প্রতিবারই জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করার পর দেখা যায় যে, জার্মান আক্রমণের প্রথম ধাক্কা যায় ফ্রান্সের উপর দিয়েই। এই জন্যেই রূঢ়ের শিল্পাঞ্চলকে আগামী বেশ কিছুকালের জন্যে—সম্ভব হলে চিরদিনের মত—নিষ্ক্রিয় ও নির্বীর্য করে তোলার জন্যে ফ্রান্সই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহান্বিত। তাই ফ্রান্স যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকেই দাবী জানিয়ে আসছিল যে, রূঢ় ও রাইনল্যান্ডকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে প্রথম বিজয়ী বৃটেনের মতবাদও কম তীব্র ও চরমপন্থী ছিল না। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ বেভিন্ কড়া ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, একটা যুদ্ধপ্রিয় জাতিকে রূঢ়ের মত শিল্পপ্রধান অঞ্চলের অবাধ কর্তৃত্ব দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী নন। সেই সময় তিনি একটি উপমা দিয়ে বলেছিলেন যে, একটি লোক যদি তাঁকে লক্ষ্য করে তিন তিনবার গুলি করে থাকে তবে তিনি তাকে চতুর্থবার চেষ্টা করার জন্যে তার হাতে পিস্তল তুলে কেন দেবেন—তা বুঝতে তিনি অসমর্থ। কিন্তু তারপর বিশ্বরাজনীতির চাকা দ্রুত আবর্তিত হয়েছে—পরাজিত জার্মানীর সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিন নীতিরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বার্লিন নিয়ে রুশ-মার্কিন বিরোধ যত তীব্র হয়ে উঠছে, জার্মানীর পশ্চিমাঞ্চলে জার্মানদেরও ততই সুবিধা হচ্ছে। আজ ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, মার্শাল পরিকল্পনায় ইউরোপের পুনর্গঠনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে স্বয়ংনির্ভর জার্মানী ব্যতীত সে ব্যবস্থা কার্যকরী হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। তাই জার্মানীর শিল্প বাণিজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা আজ হাত দিয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের অধিকৃত পশ্চিম জার্মানীর বৃহৎ যন্ত্রশিল্পগুলি ভেঙ্গে ফেলার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখা হবে। এইবার তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন অধিকৃত জার্মানীতে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সকল দায়িত্ব জার্মানদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এ শিল্পগুলি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে থাকবে, না রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে যাবে—জার্মানরাই তা নির্ধারিত করবে। তবে ব্যক্তিবিশেষ যাতে শিল্পের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে না পারে কিংবা ভূতপূর্ব নাৎসীরা যাতে জার্মান শিল্পের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে না পারে—সেদিকে মিলিটারি গভর্নররা কড়া নজর রাখবেন।

ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের এই আকস্মিক ঘোষণায় ফরাসী রাজনৈতিক মহলে রীতিমত বিক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। ঘোষণাটি করা হয়েছে এমন সময় যখন লণ্ডনে রূঢ়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেল্জিয়াম্, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেম্বুর্গের অধিবেশন বসেছে। গত জুন মাসে রূঢ়ের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এই ছয়টি দেশের সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তারই বাস্তব ও কার্যকরী রূপ নির্ধারণের জন্যেই এ বৈঠক। বহু প্ররোচনায় ফ্রান্সকে রূঢ় ও রাইনল্যান্ড বিচ্ছিন্ন করার দাবী ত্যাগ করে এই আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মেনে নিতে সম্মত করানো হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে যে, পণ্যোৎপাদনের উপর কোন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, নিয়ন্ত্রণ থাকবে শুধু পণ্য বণ্টনের উপর। ফ্রান্স এই প্রস্তাবে সম্মত হবে কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের রাষ্ট্রনেতারা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, ফ্রান্সের রূঢ় সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি অর্থহীন। তারা এ সম্বন্ধে পশ্চিম ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তির কথা ও জার্মানীতে সামরিক শাসনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তারা বলছে যে, অদূর ভবিষ্যতে যখন জার্মানী থেকে মিত্রপক্ষের দখলকারী সৈন্য অপসারণের সম্ভাবনা নেই তখন রূঢ় নিয়ে এতটা ভয় পাবারও কিছু নেই। কিন্তু এ নিয়ে নিশ্চিন্ত হবারও কিছু নেই। পশ্চিম জার্মানীর জার্মানরা ইতিমধ্যেই পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে যে তাদের যদি অবিলম্বে নিজস্ব একটি সৈন্যদল গড়ে তুলতে না দেওয়া হয়, তবে মিত্রশক্তির সেনাদল কোন দিন জার্মানী ত্যাগ করলে পূর্ব-জার্মানীর কম্যুনিস্টরা সমগ্র জার্মানীকে দখল করবে। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের জার্মান নীতি যেমন ক্রমশ সম্পূর্ণ বিপরীত উপায়ে বদলে যাচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত লাল জুজুর ভয়ে তারা পশ্চিম জার্মানীর সামরিক সংগঠনের দাবীও যে মেনে নেবে না—সে বিষয়ে নিশ্চয়তার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না।

২১-১১-৪৮

তোমার কাব্য

সমীর ঘোষ

কোনারকের ঘোড়ার পায়ে যে বিজয়ী বেঁচে আছে,
তেমন বাঁচার সম্ভাবনা আমার কাব্যে নাই;
তবু বন্ধু দাবী তোমার ছন্দভরা সাজাও কথা ঃ
তোমার কথার মৃদু সুরেই থাকতে বেঁচে চাই।
বিদগ্ধ জন তর্ক করে বুদ্ধিজীবীর অস্ত্র নিয়ে
সূক্ষ্ম ন্যায়ে শাণিত ঘায়ে এ মাথা হয় নীচু;
এ দুর্দিনের অন্ধকারে সজাগ শিক্ষা হাতড়ে মরে,
বিদ্রোহী মন মন-ভুলানো চায়না ছড়া কিছু।
তবু লিখি, কাব্য লিখি মাত্র কটি কথা নিয়ে।
বন্ধদ্বারে বুদ্ধিজীবীর দিকে পেছন ফিরে;

তোমার মনের পরম শান্তি জানি ভ্রান্তি ঘটায় বহু,
তবু আমি সেই মোহজাল কাটিয়ে চলিনি রে।
নিজের মনেই ভেবে দেখি অনেক দূরের তারা দেখে
যখন মনে পড়ে তোমার দীপ্ত চোখের হাসি,
তখন আমার রুক্ষ জীবন, কর্মণিকের বিষম গ্লানি ঃ
বৃষ্টি-ভেজা গাছের পাতা ঝরিয়ে ধুলোর রাশি।
তখন দেখি মনের তারে কোথায় যেন সুর মিলেছে,
মিড় উঠেছে মেজাজ নিয়ে ছন্দভরা কথার,
তখন বন্ধু তোমার দাবী কোনারকের ঘোড়ার গতি,—
কেউ জানে না বেতার হোয়ে কাঁপিয়ে গেছে ইথার!

পশ্চিম বঙ্গের অর্থকথা

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ

ঔষধ ও নেশাজাতীয় পদার্থ

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিদ্রব্যের ভিতরে ঔষধ ও নেশাজাতীয় পদার্থের গুরুত্ব কম নহে। খাদ্যশস্য, আঁশ ও তন্তুজাতীয় পদার্থ এবং তৈল বীজের পরেই ইহার স্থান। ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিম বাঙলায় মোট দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একরের বেশি জমিতে এই জাতীয় পদার্থের চাষ হইয়াছে। নেশাজাতীয় পদার্থের ভিতরে চা-ই সর্বপ্রধান; ইহার পরে যথাক্রমে তামাক, সিংকোনা, গাঁজার স্থান। ১৯৪৩-৪৪ সালের সরকারী হিসাবে দেখা যাইতেছে, পশ্চিম বাঙলায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে চা আবাদ করা হইতেছে; সমগ্র পশ্চিম বাঙলায় ৩১ হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ হইতেছে। গাঁজা উৎপাদনের জন্য প্রায় তিন হাজার একর জমি ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ছাড়া প্রায় পাঁচশত একর পরিমাণ জমি পশ্চিম বাঙলায় ঔষধ ও নেশাজাতীয় অন্যান্য পদার্থের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।১

পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন বিভিন্ন নেশাজাতীয় পদার্থের ভিতর চা সর্বপ্রধান, পূর্বেই বলিয়াছি। ভারতবর্ষে যত চা উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় ২০% ভাগ বাঙলা দেশে উৎপন্ন হইত; ভারতবর্ষে মোট যত জমিতে চা চাষ হয়, তাহার প্রায় ২৬% ভাগ অবিভক্ত বাঙলা দেশে ছিল। বাঙলার উৎপাদনের সঙ্গে আসামের উৎপাদন যোগ করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০% ভাগই এই দুই প্রদেশে উৎপন্ন হয়। অবিভক্ত বাঙলা দেশ প্রতি বৎসর যে পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানি করিত, তাহার পরিমাণও কুড়ি কোটি টাকার কম হইবে না। শ্রীহট্ট পূর্ব-বাঙলার সহিত যুক্ত হইবার পূর্বে পূর্ব-বাঙলার তুলনায় পশ্চিম-বঙ্গের চা উৎপাদন অনেক বেশি ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালের সরকারী পূর্বাভাষ অনুযায়ী পশ্চিম বাঙলায় প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার একর জমিতে চা আবাদ করা হইয়াছে; সেই বৎসর শ্রীহট্ট সহ পূর্ববাঙলায় প্রায় ৭৫ হাজার একর জমিতে চাষ করা হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করিলে অবশ্য পূর্ব-বাঙলার অংশ সামান্য কম (পশ্চিম বাঙলার উৎপাদনের ৩৮% ভাগ) দেখা যাইবে। ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিম বাঙলায় যেখানে ১১ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে পূর্ব-বাঙলার উৎপাদন প্রায় চার কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড হইবে। কিন্তু শ্রীহট্ট ভিন্ন পূর্ব-বাঙলার উৎপাদন পশ্চিম বাঙলার উৎপাদনের ৩% কিম্বা ৪% ভাগের বেশি হইবে না। ১৯৪৭-৪৮ সালের হিসাব অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার এবং সমগ্র ভারতে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে চা আবাদ করা হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৪ কোটি ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড এবং ৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। কাজেই দেখা যাইতেছে, পশ্চিম বাঙলায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের প্রায় ১/৫ ভাগ চা উৎপন্ন হয়। বর্তমান বৎসরে সরকারী পূর্বাভাষ অনুসারে এক লক্ষ কুড়ি হাজার একরে চা আবাদ করা হইয়াছে।২

পশ্চিম বাঙলার জিলাসমূহের ভিতরে চা উৎপাদনে জলপাইগুড়ির স্থান সর্বপ্রথম; জলপাইগুড়ির পরেই দার্জিলিংএর স্থান। পূর্বেই বলিয়াছি, ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিম বাঙলায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে চা উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার ভিতরে কেবলমাত্র জলপাইগুড়িতেই ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমি চাষ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৬৩ হাজার একর জমি দার্জিলিং জিলাতে চাষ করা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গে চা, প্রধানত জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জিলাতেই হইয়া থাকে। অন্যান্য কোন জিলায় 'চা'এর চাষ নাই বলিলেই চলে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির 'চা' পূর্ববঙ্গের চা অপেক্ষা গুণে অনেক উৎকৃষ্ট। জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জিলাতে আবাদী জমির পরিমাণ সাধারণত যথাক্রমে ৫৪ হাজার এবং ৩০ হাজার একর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অবিভক্ত বাঙলায় যথেষ্ট পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইত। সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ জমিতে তামাক উৎপন্ন হয়, কেবলমাত্র অবিভক্ত বাঙলা দেশেই তাহার ১/৫ ভাগ উৎপন্ন হইত। উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করিলে বাঙলা দেশের প্রাধান্য আরও বেশি পরিলক্ষিত হইবে। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় ½ ভাগ কেবলমাত্র বাঙলা দেশেই উৎপন্ন হইত। বাঙলা দেশের উত্তর অঞ্চলেই অর্থাৎ রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার রাজ্যেই প্রধানত তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙলা বিভক্ত হইবার পরে পশ্চিম বাঙলার তামাক উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালের হিসাব অনুসারে পূর্ব-বাঙলায় যেখানে ১ লক্ষ ১২ হাজার একরের বেশি জমিতে তামাকের চাষ হইয়াছে, সেখানে পশ্চিম বাঙলার পরিমাণ কেবলমাত্র ৫৫ হাজার একর অর্থাৎ মাত্র অর্ধেক হইবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন পূর্ব-বাঙলার উৎপাদনের ৫০% ভাগের কম হইবে; ১৯৪৬-৪৭ সালে পূর্ব-বাঙলার উৎপাদন যেখানে ৪৩ হাজার ৫ শত টন দেখা যাইতেছে, সেখানে পশ্চিম বাঙলার উৎপাদন ২১ হাজার টনের বেশি হইবে না। ১৯৪৮ সালের সরকারী পূর্বাভাষ অনুসারে ২৬ হাজার একর জমিতে ৯ হাজার ৪ শত টন তামাক উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ৩০ হাজার একর জমিতে প্রায় ১১ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হইয়াছে।১

পশ্চিম বাঙলার জিলাসমূহের ভিতরে জলপাইগুড়িতেই সর্বাপেক্ষা বেশি তামাক উৎপন্ন হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালের হিসাব অনুসারে সমগ্র পশ্চিম বাঙলার মোট ৩১ হাজার পাঁচশত একর জমিতে তামাকের চাষ হইয়াছে। ইহার ভিতরে কেবলমাত্র জলপাইগুড়িতেই ১৬ হাজার একরের বেশি জমিতে তামাকের চাষ হইয়াছে। তামাক উৎপাদনে জলপাইগুড়ির পরেই মালদহের স্থান। সেই বৎসর মালদহ জিলাতে চার হাজার একরের বেশি জমিতে তামাকের চাষ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর জিলাতেও কিছু কিছু চাষ হইয়াছে। বর্ধমান, বীরভুম, বাঁকুড়া, হুগলী জিলাতে সামান্যই তামাক উৎপন্ন হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে এই চারিটি জিলার প্রত্যেকটিতেই মাত্র একশত একর পরিমিত জমিতে তামাকের চাষ হইয়াছে।২ সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গে ৩৩ হাজার ৮ শত একরে তামাকের চাষ হয়; ইহার ভিতরে জলপাইগুড়ির অংশ ১৫ হাজার এবং মালদহের অংশ চার হাজার একর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন নেশাজাতীয় অন্যান্য পদার্থের ভিতরে সিংকোনা এবং গাঁজাই প্রধান। ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে তিন হাজার দুইশত একর জমিতে সিংকোনা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবেই দার্জিলিং

1 Statistical Abstract, West Bengal, 1947.

2 Official Forecast, Calcutta Gazette Aug. 19.

1 Forecast of Rabi Crops, 1948.
2 Compiled From Season and Crop Report of Bengal.

জিলাতেই অবস্থিত। ১৮৪৩-৪৪ সালে সিংকোনার চাষ অনেক বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সরকারী হিসাবে দেখা যায়। কালিম্পং মহকুমার মংপু, বাংগু এবং মনসুং-এ অবস্থিত সরকারী কৃষিক্ষেত্রসমূহে মোট ৭২ হাজার একরের বেশি জমিতে ১৯৪৪-৪৫ সালে সিংকোনার চাষ হইয়াছে।৩ ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের ৫৪৫ একর জমিতে গাঁজা এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় পদার্থের চাষ হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে ১৭ শত একরে গাঁজা এবং আরও ১৭ শত একরে অন্যান্য নেশা-জাতীয় পদার্থের চাষ হইয়াছে।৪

ফল ও শাকসব্জী

অবিভক্ত বাঙলা দেশে নানাপ্রকার ফল ও শাকসব্জী প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ১৯৪৩-৪৪ সালের সরকারী হিসাবে দেখা যায়, অবিভক্ত বাঙলায় প্রায় ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার একর জমিতে নানাপ্রকার ফলমূল এবং শাক-সব্জীর চাষ হইত। বাঙলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত একটি হিসাবে দেখা যায়, অবিভক্ত বাঙলার ১ লক্ষ ৩৭ হাজার একর জমিতে ১৯ কোটি ২০ লক্ষ মণের বেশি আম উৎপন্ন হয়; এক লক্ষ দশ হাজার একর জমিতে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ মণ কলা উৎপন্ন হইতেছে; ২ হাজার একর জমিতে চার লক্ষ দশ হাজার মণ কমলা-লেবু উৎপন্ন হইতেছে; ৫০০ একর জমিতে প্রায় ২২২ হাজার মণ পেয়ারা উৎপন্ন হইতেছে; চার হাজার ছয়শত একর জমিতে প্রায় ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মণ আনারস উৎপন্ন হইতেছে; প্রায় ২৫ হাজার একর জমিতে ৩১২৫ মণ কুল উৎপন্ন হইতেছে। ইহা ছাড়াও প্রায় ৪৭৫ একর জমিতে ৪৭২ হাজার মণ অন্যান্য টক জাতীয় ফল উৎপন্ন হইতেছে।৪ অবিভক্ত বাঙলায় এই সকল ফলমূল এবং শাকসব্জী চাষের জন্য ব্যবহৃত জমির প্রায় ৬০% ভাগই পূর্ববঙ্গে অবস্থিত; বাকী ৪০% পশ্চিম বাঙলায় চাষ হইতেছে। পশ্চিম বাঙলার মালদহ জিলায় বিখ্যাত 'মালদহ' আম কিছু উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের উৎপাদন অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জিলায় প্রভূত পরিমাণে উৎকৃষ্ট কমলালেবু উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্ট পূর্ব-বাঙলার সহিত যুক্ত হইবার পূর্বে পূর্ব-বাঙলায় কমলালেবু সামান্যই উৎপন্ন হইত। সমগ্র বাঙলায় যে পরিমাণ আলুর চাষ হইত, তাহার প্রায় ৬০% ভাগই পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। 'প্লট টু প্লট এ্যানুমারেশন'-এর ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে হিসাব প্রস্তুত করিয়া-ছেন, তাহাতে দেখা যায়, ১৯৪৭-৪৮ সালে ৭১ হাজার একর জমিতে ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছে।১ সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট পশ্চিম বাঙলার রবি-শস্য সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়, ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বাঙলায় ৭১ হাজার একর জমিতে ৬৭ লক্ষ ৫৬ হাজার মণ আলু উৎপন্ন হইয়াছে।২

বাঙলা সরকারের হিসাব অনুসারে ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিম বাঙলায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার একর পরিমিত জমিতে নানাপ্রকার ফল ও শাকসব্জীর চাষ হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে মুর্শিদাবাদে চাষের পরিমাণ সর্বাধিক; মুর্শিদাবাদ জিলার প্রায় ৩৪ হাজার একশত একর জমিতে সেই বৎসর বিভিন্ন ফলমূল এবং শাকসব্জীর চাষ হইয়াছে। ২৪ পরগণা জিলাতেও প্রায় ১৯ হাজার একর জমিতে এই সকল কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জিলাতে ১৭ হাজার একরের বেশি জমিতে এই সকল ফলমূলাদির চাষ হইয়াছে। ইহা ছাড়া নবদ্বীপ, হাওড়া, বীরভূম, বর্ধমান জিলাতেও এই সকল দ্রব্যের চাষ হইয়া থাকে। হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া জিলারও বহু জমিতে প্রতি বৎসর এই সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে ফল উৎপাদনের প্রধান ত্রুটি এই যে, অধিকাংশ ফলই সদ্যোভোগ্য বলিয়া সংরক্ষণের উপযোগী নহে। কৃত্রিম উপায়ে ফল সংরক্ষণের শিল্প গড়িয়া তুলিবার যথেষ্ট সুবিধা পশ্চিম বাঙলায় থাকা সত্ত্বেও প্রদেশে এই শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। প্রদেশের ফল-সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি যে অত্যাবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

অবিভক্ত বাঙলা দেশে ইক্ষুর চাষ সামান্য জমিতেই পরিলক্ষিত হইত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বাঙলা দেশকে নিজস্ব প্রয়োজনের প্রায় ৮০% ভাগই বাহির হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের একটি সরকারী হিসাব অনুসারে সমগ্র বাঙলায় মাত্র ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার ভিতরে কেবলমাত্র রাজসাহী জিলাতেই ১০% ভাগ জমি চাষ করা হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের সরকারী পূর্বাভাবে সমগ্র বাঙলায় ইক্ষুর জন্য মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৮০ হাজার একর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের পরে প্রদেশে ইক্ষু চাষের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৯৪৭-৪৮ সালের হিসাব অনুসারে পূর্ব বাঙলায় মোট আবাদী জমির প্রায় ৮০% এবং ২০% ভাগ পশ্চিম বাঙলায় চাষ হইয়াছে। পশ্চিম বাঙলা সরকারের একটি হিসাব অনুসারে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৬৩ হাজার একর জমিতে ২৭ হাজার ১ শত টন ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রদেশের জিলা সমূহের ভিতরে ইক্ষু উৎপাদনে পশ্চিম দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদের অংশ সর্বাপেক্ষা বেশী। ১৯৪৩-৪৪ সালে বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর জিলায় ১৭ হাজার একর জমিতে এবং মুর্শিদাবাদ জিলায় ১০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন নবদ্বীপ এবং বর্ধমান জিলারও বহু জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। দার্জিলিং জিলাতে ইক্ষুর চাষ সাধারণত সামান্য জমিতেই হইয়া থাকে। হাওড়া জিলাও ইক্ষু উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে।

পশ্চিম বাঙলায় চিনি শিল্পের প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ইহার প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতে-ছেন। বর্তমানে প্রদেশে যে পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রদেশের প্রয়োজনের ১৪% কিংবা ১৫% ভাগের বেশী মিটাইতে পারে না। একটি হিসাব অনুসারে, প্রদেশের প্রয়োজন যেখানে ৬৪ হাজার টন, সেখানে বর্তমান উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৪ হাজার টন। ইক্ষু ভিন্ন অন্যান্য যে সকল ইক্ষু জাতীয় পদার্থ দ্বারা চিনি উৎপন্ন করা যাইতে পারে, পশ্চিম বাঙলায় ১৯৪৩-৪৪ সালে ৫ হাজার ৭ শত একরের বেশী জমিতে সেই সকল শস্যের চাষ হইয়াছে। নদীয়া জিলাতে এই সকল শস্যের চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী। ২৪ পরগণা জিলাতেও এই সকল শস্যের চাষ করিবার জন্য কিছু জমি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অন্যান্য কৃষিদ্রব্য

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষিদ্রব্যসমূহের কথা বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করা হইল। কিন্তু খাদ্যশস্য, আঁশ ও তন্তুজাতীয় পদার্থ, তৈলবীজ, ফলমূল ও শাকসব্জী—এই পাঁচ প্রকার প্রধান কৃষিদ্রব্য ছাড়াও পশ্চিম বাঙলায় আরও কয়েকটি কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হয় যাহা উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ১৯৪৪-৪৫ সালে ১ লক্ষ ২৬ হাজার একরের বেশী জমি পশ্চিম বাঙলার পাঁচটি প্রধান কৃষি-দ্রব্য ভিন্ন অন্যান্য কৃষি পদার্থ উৎপন্ন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কৃষিদ্রব্যকেও অশ্ব-গবাদির খাদ্য, মসলা ও মসলা জাতীয় পদার্থ, তুঁত ফল এবং বিবিধ এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

এই সকল কৃষিদ্রব্যের ভিতরে অশ্ব-গবাদির খাদাই প্রধান। ১৯৪৩-৪৪ সালের সরকারী হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ২৮

---

3 Plot to Plot Emuneration, 1944-45.
4 Forecast of Rabi Crops, West Bengal.
4 Bengal Industrial Survey Committee Report, 1948.

(১) এই হিসাব পশ্চিম বাঙলা সরকারের দপ্তর হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।
2 West Bengal Crop Survey, I.S.I., Calcutta.
১৯৪৮ সালে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার একর জমিতে রবিশস্যের অন্তর্ভুক্ত ফলমূল ও শাক-সব্জী উৎপন্ন হইয়াছে।

হাজার একরের বেশী জমিতে এই সকল কৃষি-দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ভিতরে কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জিলাতেই ১৬ হাজার একরের বেশী জমি ইহার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। নদীয়া জিলারও ৮ হাজার একরের বেশী জমিতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এই সকল দ্রব্য একেবারেই উৎপন্ন হয় না বলিলেই চলে। ১৯৪৮ সালে রবিশস্যের ভিতরে এই জাতীয় পদার্থ প্রায় ১৮ হাজার একরে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় অশ্ব-গবাদির খাদ্য কি পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কোন সঠিক হিসাব দেওয়া সহজসাধ্য নহে। তাহার কারণ এই যে, কেবলমাত্র অশ্ব-গবাদির খাদ্য উৎপন্ন করিবার জন্য যে পরিমাণ জমি ব্যবহৃত হইতেছে, উপরে কেবলমাত্র তাহারই হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন খড়ের কি পরিমাণ অশ্ব-গবাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে এবং কি পরিমাণ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার সঠিক হিসাব সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন প্রকার ডালের মোট পরিমাণের কত অংশ গো-মহিষাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহারও সঠিক হিসাব সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। কিন্তু গো-মহিষাদির খাদ্যের জন্য প্রদেশের মোট প্রয়োজনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হয়। ডাঃ বার্নস-এর হিসাব অনুসারে গো-মহিষাদির শ্রেণীর প্রতি সমর্থ পশুর জন্যেই ১ একরের, অন্ততপক্ষে ¾ একরের উৎপাদন প্রয়োজন।[1]

বর্তমানে প্রদেশে যে সংখ্যক গো-মহিষাদি রহিয়াছে, তাহাতেই ৫৭ লক্ষ ৬৩ হাজার একরের বেশী জমির উৎপাদন প্রয়োজন। তাহা ছাড়া প্রদেশের প্রয়োজন অনুযায়ী যদি গো-মহিষাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে গো-মহিষাদির সংখ্যা ৮৭ লক্ষ ৪৪ হাজারের বেশী হইবে। ইহাদের খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইতে প্রায় ৫৮ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমির উৎপাদন প্রয়োজন হইবে।

১৯৪৩-৪৪ সালে প্রদেশের প্রায় ১৮ হাজার ৫ শত একর জমিতে মসলা এবং মসলা জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে প্রায় ১৮ হাজার একর জমিতে এবং ১৯৪৭ সালে ১৯ হাজার একর জমিতে এই সকল পদার্থের (রবিশস্য) চাষ হইয়াছে। সাধারণত ইহার চাষ আরও অধিক পরিমাণ জমিতে—প্রায় ২৪ হাজার একর জমিতে হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদ জিলার প্রায় ৮ হাজার একর জমিতে বর্তমান বৎসর এই সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। নদীয়া এবং ২৪ পরগণা জিলাতেও এই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বীরভূম এবং পশ্চিম দিনাজপুর জিলাতে এই সকল পদার্থ সর্বাপেক্ষা কম উৎপন্ন হয়। বর্তমান বৎসরে বীরভূম জিলাতে মাত্র ৪০ একর জমিতে এবং পশ্চিম দিনাজপুর জিলার কেবলমাত্র ১ শত একর জমিতে এই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে উৎপন্ন তুঁত ফলের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে পশ্চিম বাঙলায় ১৫ হাজার একরের বেশী জমিতে তুঁত ফল উৎপন্ন হইয়াছে। তুঁত ফল মালদহ জিলায় সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। ১৯৪৩-৪৪ সালে মালদহ জিলার প্রায় ১২½ হাজার একর জমিতে তুঁত ফল উৎপন্ন হইয়াছে। নদীয়া জিলাতেও ২ হাজার একরের বেশী জমিতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জিলাতে তুঁত ফল সামান্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য জিলাতে তুঁত ফল উৎপন্ন হয় না বলিলেই চলে।

উপরে যে সকল কৃষিদ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর যে বিবিধ কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সর্বশেষে তাহার সামান্য আলোচনা করিয়াই প্রদেশের কৃষি-কথা শেষ করা যাইতে পারে। এই সকল কৃষিদ্রব্যের ভিতরে কোন কোন দ্রব্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, বাকী দ্রব্যসমূহ খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী নহে। হুগলী-মালদহ জিলাতেই এই সকল দ্রব্য সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জিলাতেও এই সকল শস্য কিছু কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি এবং হাওড়া জিলাতে এই সকল শস্য একেবারে উৎপন্ন হয় না বলিলেই চলে। খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী নহে এইরূপ বিবিধ খাদ্যশস্য পশ্চিম বাঙলার ১৯৪৩-৪৪ সালে ২৮ হাজার একরের বেশী জমিতে উৎপন্ন হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ-মালদহ-দার্জিলিং জিলায় এইরূপ শস্যের চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। পশ্চিম দিনাজপুরে এই প্রকার শস্যের চাষ সর্বাপেক্ষা অল্প।[1]

---

1 Report on the Technological Possibilities of Agricultural Development in India.

1 Statistical Abstract, West Bengal, 1947.

সাহিত্য-সংবাদ

প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ের যে-কোনও একটি বিষয় নিয়া ১০ পৃষ্ঠার অনধিক, সরল সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে (১) সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালী বিষয়ে বর্তমান পথ কি? (২) ধর্মশাস্ত্রে নারীর স্থান। প্রথম পুরস্কার ৩০৲, দ্বিতীয় পুরস্কার ২০৲ টাকা। প্রবন্ধ ২০।১২।৪৮ তারিখের মধ্যে কাশী শাখা সম্পাদক শ্রীসিদ্ধেশ্বর পণ্ডতীর্থ, ১৩৩, সোনারপুর, বেনারস, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

চন্দননগর শক্তি সঙ্ঘ
৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিযোগিতা সমূহ

প্রবন্ধ—১। (ক) "আদর্শ নাগরিক" (সর্ব-সাধারণের জন্য); (খ) "জাতি গঠনে নারীর দায়িত্ব" (মহিলাদের জন্য); (গ) "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা" (স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য)। লেখা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৯ই জানুয়ারী, ১৯৪৯। সম্পাদক, শক্তি সঙ্ঘ, হাটখোলা, পোঃ চন্দননগর।

কাহিনী নয় খবর

পশম-কাঠিতে বোনা কার্পেট

আমাদের পাঠিকাদের মধ্যে অনেকেই হাড়ের কাঠি ও পশমের সাহায্যে গেঞ্জী, সোয়েটার, মোজা ইত্যাদি বুনে থাকেন, কিন্তু ঐভাবে কাঠি এবং পশমের সাহায্যে যে কার্পেট বোনাও সম্ভব, সেই কথাটি প্রমাণ করেছেন,

পা দিয়ে মাড়াবে হাতে বোনা কার্পেট!

ইংলণ্ডের কিংসটন-সারের মিস্ পেগী স্ক্যাড্রেট। তিনি তাদের বাড়ীর সিঁড়িতে পাতবার জন্য সস্তা দামে একটা কার্পেট কিনতে যান—কিন্তু বর্তমানে ঐ কার্পেটের অত্যন্ত বেশী দাম দেখে মনে মনে ঠিক করেন যে তিনি লম্বা কাঠির সাহায্যে নিজে হাতে একটা সিঁড়ির কার্পেট বুনে নেবেন। যেমন সংকল্প, তেমনই তাঁর উৎসাহ—সঙ্গে সঙ্গে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ২টি বারো ইঞ্চি মাপের পশম বোনা কাঠি সংগ্রহ করে কাজে হাত লাগালেন। একমাসে মোট ৮০ ঘণ্টা সময় এই কার্পেট বোনার কাজে লাগিয়ে তিনি সত্যি সত্যিই তাঁদের বাড়ীর সিঁড়ির উপযোগী একটি কার্পেট তৈরী করে ফেলেছেন। এই কার্পেট লম্বা হয়েছে ৯ গজ, চওড়ায় ২০ ইঞ্চি। তাঁর অসীম অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যে—মাত্র একটি মেয়ের পরিশ্রমে—একটি পশমের কার্পেট তৈরী হয়েছে জেনে—সেখানকার সকল মেয়েই অবাক হয়ে গেছে। এই কার্পেটটি তৈরী করতে পশম লেগেছে ১১ পাউণ্ড। মিস্ স্ক্যাড্রেট খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের কাছে বলেছেন—"কাজটা খুবই পরিশ্রম সাপেক্ষ, তাহলেও আমি যে শেষ করতে পেরেছি এটাই আনন্দের কথা। দেখুনতো কত কম দামে এটি পেলাম আমি—এটি কিনতে গেলে কম করে প্রায় ১৪ পাউণ্ড দাম লাগতো, সে যায়গায় খরচ হয়েছে আমার মাত্র ৫ পাউণ্ড ৬ শিলিং।" এই মেয়েটির বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ের তারিফ সবাই করছেন আশা করি আপনরাও করবেন।

চাঁদের দেশে যাওয়ার তোড়জোড়

চাঁদের দেশে যাওয়ার কল্পনা অনেকেই করেছেন কাব্য এবং সাহিত্যে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তোলবার জন্য একটি দল খুব উঠে পড়ে লেগেছেন। জানা গেছে চাঁদের দেশের এই অভিযাত্রী দলে আছেন একাধিক অভিজ্ঞ বৈমানিক, রকেট ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক। এঁরা সকলেই বৃটিশ ইণ্টারপ্ল্যানেটারী সোসাইটি বা "বৃটিশ আন্তর্নাক্ষত্রিক সভার সদস্য। এঁদের উদ্যমের অভাব নেই অভাব শুধু অর্থের—তবে এঁরা বলছেন যে সে অর্থও সংগ্রহ করে তাঁরা চাঁদের দেশে যাওয়ার তোড়জোড় সম্পূর্ণ করতে পারবেন ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের আগেই। এই কটি বছর লাগবে তাদের পরিকল্পিত রকেটযান ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির নির্মাণ ও গবেষণার কাজে। উপরোক্ত চাঁদের অভিযাত্রীদের প্রতিষ্ঠানটিতে এখনই প্রায় ৫০০ জন সদস্য নাম লিখিয়েছেন। সদস্যদের মধ্যে বার্ণার্ড শ, ডক্টর উইলিয়াম ও বিখ্যাত মোটর দৌড়বাজ

চাঁদের দেশ থেকে ঐ দেখা যায় পৃথিবী!

প্রিন্স যাঁরাও আছেন বলে জানা গেছে। চাঁদের দেশে এ'রা যে রকেটটিতে চড়ে পে'ৗছুতে পারবেন বলে মনে করছেন সেটির পরিকল্পনা ও নক্সা তৈরী করেছেন কেনেথ গ্যাটম্যান্ড বলে এক বিমান বৈজ্ঞানিক—এতো গেল ইংলণ্ডের কথা। আমেরিকাতেও শুনেছি একদল বৈজ্ঞানিক চাঁদের দেশে অভিযান করবার তোড়জোড় করছেন। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর স্ট্যাপলডন সম্প্রতি এক বক্তৃতায় এই কথা ঘোষণা করেছেন যে, হয়তো খুব শিগ্গির শুনতে পাবেন যে আমেরিকার পতাকা চাঁদের দেশে উড়ানো হয়েছে। এ সমস্ত কথা শুনে হয়তো মনে হতে পারে যে এই চাঁদের দেশে যাওয়ার অভিযাত্রী দল হয় পাগল নয় মাথা খারাপ। কিন্তু তা নাও হতে পারেন, কারণ বিজ্ঞানের জগতে সবই সম্ভব। তা নাহলে বিমানপোত, বেতার, টেলিভিশন যা একদিন মানুষের কাছে অসম্ভব ও পাগলামী বলে মনে হতো তাওতো সম্ভব হয়েছে। যাকগে ব্যাপারটাকে একেবারে নাইবা হেসে উড়িয়ে দিলেন; আর মাত্র সাতাশটা বছরতো! নিশ্চয়ই বাঁচবো ততদিন। চাইকি তার আগেও হতে পারে। চাঁদের দেশ থেকে পৃথিবীটা কেমন দেখাবে তাই ভাবছেন। বেশতো তার ছবিটাও তৈরী করে ফেলেছেন এই অভিযাত্রী দল—সেটাও ছেপে দিলাম। কল্পনার ডানায় উড়ে চলে যান চাঁদের দেশে।

গত শনিবার ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি তাদের প্রথম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন করে। ফিল্ম সোসাইটি চলচ্চিত্র শিল্পকে সুষ্ঠুভাবে এবং প্রগতির পথে চলার যে কতখানি সহায়তা ক'রতে পারে বিলেতের ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট সম্পর্কে যারা খবর রাখেন তাঁরা তা অনুধাবন করতে পারবেন। বস্তুতঃ যাবতীয় চারুকলা ও সাহিত্য সম্পর্কিত প্রগতিমূলক ও দেশাত্মবোধক চিন্তাধারাকে চলচ্চিত্রের মধ্যে সংযুক্ত করার কাজে পৃথিবীর বহু দেশের ফিল্ম ইনস্টিটিউট বা সোসাইটিগুলিই আজ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'য়েছে। কলকাতার এই সোসাইটিও ভারতীয় ছবির মানকে উ'চু করে তোলার উদ্দেশ্যে বিলিতী ইনস্টিটিউটগুলির আদর্শে গত বছর স্থাপিত হয়েছে। প্রথমে মাত্র ঊনিশজন সভ্য নিয়ে এটি আরম্ভ হয় কিন্তু তা হলেও অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমাগম হয়। এদের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ (ক) জনসাধারণের মধ্যে চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞান বিস্তার ও ছবি সম্পর্কে জনমত গঠন; (খ) চলচ্চিত্র শিল্পান্তর্গত ব্যক্তিদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সোসাইটির তরফ থেকে ডকুমেণ্টারি ছবি তোলা। এদের কার্যতালিকার মধ্যে রয়েছেঃ (ক) দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ বড় ছবি ও ডকুমেণ্টারি দেখানো; (ঘ) চিত্রকর্মী ও কলাকুশলীদের দ্বারা চলচ্চিত্র বিষয়ে আলোচনা; (গ) ভারত ও ভারতের বাইরের ফিল্ম সোসাইটিসমূহের সংগে যোগাযোগ স্থাপন ও মতের আদান-প্রদান; (ঘ) পত্রিকা প্রকাশ, এবং (ঙ) এই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়। প্রথম বছরে বেশী কিছু করে উঠতে না পারলেও যতটুকু কাজের বিবরণ আমরা পেয়েছি তাতে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে সোসাইটি সত্যই চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ বিধানের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

নূতন ছবির পরিচয়

নারীর রূপ (ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ফিল্মস্)—কাহিনী—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; পরিচালনা—সতীশ দাশগুপ্ত; আলোকচিত্র—জি কে মেহতা; শব্দ গ্রহণ—গৌর দাস; সুর—সুবল দাশগুপ্ত; ভূমিকায়ঃ রবীন মজুমদার, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, উৎপল সেন, শ্যাম লাহা, রমলা, রেণুকা প্রভৃতি।

ছবিখানি ৫ই নবেম্বর থেকে মিনার-বিজলী-ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে। বাঙলা ছবির সমালোচকদের যে শাস্তি কতো, সাধারণ লোকে তা বোধহয় অনুমান ক'রতে পারবেন না। ছবি যত জঘন্যই হোক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ওঠবার উপায় নেই। আর এ শাস্তিটা আজকাল আবার ভয়ানকরকম বেড়ে গিয়েছে। সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পের ওপরই বিতৃষ্ণা এনে দেয়, যেন একটা বিরাট ষড়যন্ত্র করে শুধু সেইরকম ছবিই পরিবেশিত হয়ে যাচ্ছে একের পর একটা এবং 'নারীর-রূপ'ও সেই মিছিলেরই অন্তর্ভুক্ত একজন।

'নারীর রূপ' চিত্রে রমলা

আজকাল অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন করে নামমাত্র খরচায় ছবি তোলার যে হিড়িক উঠেছে 'নারীর-রূপ' তাদের দলে পড়ে না, বেশ-পরিবেশ, দৃশ্যসজ্জা, শিল্পিসমন্বয় ইত্যাদি থেকেই তা অনুমান করা যায়, অর্থাৎ খরচের দিক থেকে কোন কার্পণ্য হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থ এবং সর্বোপরি অতি দুষ্প্রাপ্য ফিল্ম নষ্ট করে দু'ঘণ্টার যে মাথাধরাটি সৃষ্টি হলো তার জন্যে দায়ী কে?

বাঙলা ছবির কাহিনীতে অধিকাংশক্ষেত্রেই সামান্য হলেও সাহিত্যরস সিঞ্চিত থাকে বলে অন্যান্য সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও বাঙলা ছবির ভারতে একটা শ্রদ্ধার আসন আছে। তা থেকে বাঙলা ছবির কাহিনীকে নামিয়ে সাহিত্য ও শিল্পসৌষ্ঠব বিবর্জিত এবং অযৌক্তিকতা ও নৈতিক দুরাচারিতায় পুষ্ট বোম্বাই ছবির সাফল্যে মোহগ্রস্ত হয়ে সেই অনুকরণে ছবি তোলায় অন্ততঃ বাঙলা দেশে থেকে কোন প্রযোজক বা পরিচালক অনুপ্রাণিত হতে পারে 'নারীর-রূপ' দেখবার আগে তা আমাদের বিশ্বাসের বাইরেই ছিলো। অনুকরণ মানে, একেবারে 'দিল দিয়া দিল লিয়া' আর I love you darling পর্যন্ত সুর ভাষা সবই নকল করে এমনকি বোম্বের অনুকরণে খুব চে'চিয়ে চলা, বলা, চাওয়া, কিছুই বাদ যায়নি।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনতুম সাহিত্যিক হিসাবে। ত'ার লেখা অবলম্বনে ইতিপূর্বে 'স্বয়ংসিদ্ধা' সাফল্য লাভ করে কিন্তু সে সাফল্যের জন্যে ত'ার রচনা কৃতিত্ব খুব যে বড় অংশীদার ছিলো দর্শক বা সমালোচকের কাছ থেকে তা শোনা যায়নি। কিন্তু সেই সার্টিফিকেটটাই ত'ার কাজে লাগছে আর তাই 'নারীর-রূপে'র মতো অপরূপ একটি কাহিনী উপহার দেবার ধৃষ্টতা তিনি দেখাতে সাহস পেয়েছেন। চরিত্র, ঘটনা সব দিকেই এমনি একটা কৃত্রিমতা এবং বিলিতী ছাঁচ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে যে কাহিনীটি কোন বিদেশী রচনা থেকে অবলম্বন করা হয়েছে বলে ভ্রম হয়। সংলাপ মানে ইংরিজী প্রবাদ আর বাছা বাছা বুলির ঝুড়ি, যা শুনে শুনে এতো সেকেলে হয়ে গিয়েছে যে এখন স্কুলের টেস্ট বই পড়ার চেয়ে বেশী আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না বরং অপপ্রয়োগের মাত্রাধিক্য হাসিরই উদ্রেক করে।

কাহিনীতে অভিনবত্ব অবশ্য আছে, সেটা হচ্ছে একদল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা দেশীয় ক্রীশ্চান নরনারী সমাবেশ যাদের এমনি রূপায়িত করা হয়েছে যে, ওরা যদি ওদের সমগ্র সম্প্রদায়কেই হেয় করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে তো তা অস্বীকার করা শক্ত হবে। রূপে রসে পরিবেশে একেবারেই সেকেলে কাহিনীটিতে 'জুলাই ধর্মঘট' ও '২৬শে জানুয়ারী'র আভাস দিয়ে তাকে একেলে করার চেষ্টা হয়েছে।

পরিচালনা যে একটা আর্ট এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগই ছবির প্রাণ সৃষ্টি করে এক যুগেরও বেশী আমলের পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত তাঁর কোন পরিচয়ই দিতে সক্ষম হননি। প্রগতিমূলক কোন চিন্তার বালাই তো নেই-ই এমনকি বিন্যাসের উন্নত কোন প্রয়োগকৌশলও তাঁর মনের আওতায় আছে বলে জানতে পারা যায় না। সবাক-যুগের গোড়ার দিকে তাঁর তোলা 'বাসবদত্তা' আর এই 'নারীর-রূপ'—তফাৎ শুধু এই যে প্রথম ছবিখানি পর্দায় প্রতিফলিত হবার পর চোখ ফাটিয়ে কান খাড়া করে দেখতে ও শুনতে চেষ্টা করেও তেমন সফল হওয়া যায়নি, দ্বিতীয় ছবিখানি অন্ততঃ সেইদিক থেকে রেহাই দিয়েছে অর্থাৎ ছবি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় আর কথাগুলোও শুনতে পাওয়া যায় স্পষ্টই, তা নয়তো পরিচালনা কৃতিত্বের দিক থেকে এ দু'খানির মধ্যে কোনটি বেশী উজ্জ্বল বিচার করা শক্ত।

সংক্ষেপে কাহিনী হচ্ছেঃ অবসরপ্রাপ্ত জজ ভবতোষ চাকলাদার সুন্দরী ও এম-এ পাশ বলে বর্ণিত তার অত্যন্ত স্থূলদেহা কন্যা আশাকে নিয়ে কলকাতায় এলেন, আশার ইচ্ছে-মত একটা অনাথ আশ্রম খোলবার উদ্যোগ এবং তদোপরি তার বন্ধু এটর্নী অতীনের ছেলে অলকের সংগে আশার বিবাহের চেষ্টায়। পেঁছবার দিন কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘট ফলে ওদের নিয়ে যাবার জন্যে অতীন ও অলকের গাড়ী রাস্তায় আটক পড়ে যায়। স্টেশনে ওদের নিরুপায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে প্রিন্স নন্দলাল ঃ ধর্মঘটীরা কি জানি কেন তাঁর গাড়ী চলতে দেওয়ায় ওরা সেই গাড়ীতে বাড়ি পেঁছতে সমর্থ হয়; সেই থেকে আশার মনে প্রিন্স বাসা বাঁধলো আর প্রিন্সের মনেও আশা। কলকাতায় আসার পর থেকে অতীনের তালিমে আশার কাছে অলকের প্রণয় নিবেদনের পালা আরম্ভ হলো। অগাধ সম্পত্তির অধিকারী রহস্যময় প্রিন্সের খেয়াল হচ্ছে ছবি আঁকা, তার নিযুক্ত কর্মচারী স্যামুয়েল ভিকি আর মায়ার তাকে নতুন নতুন মডেল জুগিয়ে যায়। প্রিন্স তাদের ছবি আঁকে আর প্রচুর অর্থ দান করে। নবতম মডেল মিসেস মেরী ডিকি প্রিন্সের প্রেমে পড়ে গেলো, প্রিন্স তাকে কাটাবার চেষ্টা করলে। প্রিন্স অনুচর ভিকি মারফৎ মেরীকে দশ হাজার টাকার চেক্ পাঠিয়ে দিলে; ভিকি তা থেকে অর্ধেক ভাগ চাওয়ায় মেরীর সংগে তার ঝগড়া বাঁধলো যার ফলে প্রিন্সের কাছে ভিকীর চাকরী চলে গেলো। প্রিন্স মেরীকে স্বামী ডিকিকে নিয়ে সুখী হওয়ার নির্দেশ দিলে এবং জানালে যে, নববর্ষের রাতে মেরীকে সে তাদের পরিচয়ের নিদর্শন স্বরূপ একটা উপহার দেবে। ওদিকে ভিকি প্রতিশোধ নেবার জন্যে ডিকির কাছে মেরীর অবৈধ প্রেমের কথা প্রকাশ করে দেয়। ডিকি অতীনের সহায়তায় এবং প্রিন্সের কাছে মেরীর লেখা প্রেমপত্রের সাহায্যে প্রিন্সের নামে মানহানির মামলা করতে উদ্যত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের সহযোগিতার অভাবে নিবৃত্ত হয়; মেরী প্রতিশ্রুত হয় যে, সে আর প্রিন্সের কাছে যাবে না, তবে নববর্ষের রাত্রিটা ছাড়া; ডিকি অবশ্য তাও নিষেধ করে দেয়। মাঝে একদিন প্রণয় অভিসারের পর অলক ও আশা গাড়ী করে আসবার সময় একটা লোক চাপা পড়ে। অলক পালিয়ে যেতে চায় কিন্তু আশা তাকে ঘটনাস্থলে ফিরে আসতে বাধ্য করে। এসে দেখে যে, প্রিন্স আহতকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়েছে (এখানে অবশ্য 'সেফটি ফার্স্ট' নির্দেশমূলক বক্তৃতা আছে)। ফিরে গিয়ে প্রিন্স আশার জন্যে পাগল হয়ে উঠলে, আশাকে তার চাই; মায়ারকে পাঠালে খবর নেবার জন্যে এবং নিজে আশার প্রতিমূর্তি আঁকতে বসলো। আশার খবর পেয়ে প্রিন্স তার কাছে তার অনাথ আশ্রমের সাহায্যকল্পে এক-খানা চেক পাঠিয়ে দিলে। চেকখানা পড়লো অলকের হাতে। অলক সংগের চিঠিখানা চেপে গিয়ে আশার প্রতি প্রিন্সের অনুরাগ সাব্যস্ত করিয়ে আশাকে অভিযুক্ত করলে। এই নিয়ে আশার সংগে তার মনোমালিন্য বাঁধলো ফলে অলককে অপমানিত হয়ে আশার গৃহত্যাগ করতে হলো। অতীন ও অলক প্রিন্সকে জব্দ করার চেষ্টায় রইলো। ভবতোষ আশাকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে যাবার পর নববর্ষের রাত্রে ডিকির নিষেধ অমান্য করে মেরী প্রিন্সের সংগে দেখা করতে যায়। প্রিন্স মেরীকে লুকিয়ে রেখেছে বলে ডিকি একেবারে কমিশনারের কাছে নালিশ করতে গেলো। কমিশনার ডিকিকে নিজে গিয়ে দেখে আসার জন্যে বলেন। সেইমত ডিকি প্রিন্সের বাড়িতে এলো কিন্তু মেরীর কথামতো প্রিন্স তাকে লুকিয়ে রাখলো। মাতাল ডিকি মেরীকে খুঁজে না পেয়ে চলে গেলো আর সংগে সংগে কমিশনারও প্রিন্সের কাছে হাজির হলো। কমিশনার প্রিন্স ও মেরির কাছ থেকে ওদের বিষয়ে আসল ব্যাপার শুনলে আর সেই সংগে আশার কাছে প্রিন্সের চেক পাঠানোর রহস্যও পরিষ্কার হলো। কমিশনার খুসী হলো; প্রিন্স তার কি এক আরব্ধ কাজের ভার কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করলে এবং কমিশনারের নির্দেশে কিছুকাল বিশ্রাম নেবার জন্যে কলকাতা ছেড়ে গেলো এবং যেখানে গিয়ে পেঁছলো সেটা দেখা গেলো প্রিন্সেরই জমিদারী। ভবতোষ ও আশাও আবার সেইখানেই তখন বাস করছে। প্রিন্স ফিরে গিয়েই জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক'রলে এবং জমি প্রজাদের দিতে চাইলে। ভবতোষ ও আশা এই খবর পড়ে পুলকিত হ'য়ে প্রিন্সের সংগে দেখা ক'রলে। প্রিন্স ও আশার মধ্যে প্রণয় জমতে দেরি হ'লো না, 'আপনি'টা 'তুমি'-তে পরিবর্তিত হ'তে ওদের বিবাহও ঠিক হ'য়ে গেলো। ওদিকে কলকাতায় মেরীর অদর্শনে ক্রুদ্ধ হ'য়ে ডিকি আত্মহত্যা করে, কিন্তু অতীন, অলক আর ভিকী মিলে প্রিন্সকে হত্যাকারী প্রতিপন্ন ক'রতে উদ্যত হয়। মেরী আসে প্রিন্সকে সেকথা জানাতে। আশা সে সময় প্রিন্সের কাছে আসে এবং সংগে মেরীকে দেখে প্রিন্স সম্পর্কে সব ধারণা পাল্টে ফেলে। ব্যর্থ-প্রেম প্রিন্স অনন্যোপায় হ'য়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা ক'রলে। ইতিমধ্যে ভবতোষের বন্ধু কমিশনার রায়বাহাদুর লাহিড়ী ট্রাঙ্ক ফোনে আশাকে প্রিন্সের নির্দোষিতার কথা জানিয়ে দিলে। আশা ভুল বুঝে গাড়িতে ট্রেনের সংগে পাল্লা দিয়ে প্রিন্সকে ধরে নিয়ে এল।

কাহিনীটি আগেই বলা হ'য়েছে, একেবারে বোম্বে প্যাটার্নের ছবির মত আর তাকে সাজানও হ'য়েছে ঐ রকম ক'রেই। কোন রসিক ব্যক্তির পক্ষে পুরো ছবিটা দেখা ধৈর্যের পরীক্ষা ব'লে পরিগণিত হবে। মেরীর ভূমিকায় একমাত্র রমলার অভিনয়ই যা সামান্য বরদাস্ত করা যায় নয়তো ছবিখানিতে উল্লেখ করবার মত কোন দিক তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও পাওয়া যায় না। ক্যামেরার কাজ মোটামুটি ভালই, কিন্তু মোটরে চলার সময় পিছনের দৃশ্য অপসারণ ব্যাপারটা (Back Projection) অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক, তেমনি হ'য়েছে অবিরাম দাঁড় টেনে গেলেও নৌকোর 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি' দৃশ্যটা। শব্দ স্পষ্ট হ'লেও একটা অস্বাভাবিক কর্কশতা 'উপভোগ্য ক'রবেন,' 'নেকলেশ যার গলায় দেবেন তিনি ভাগ্যবান' ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাকরণ ভুল ঢাকতে পারেনি।

ক্রিকেট

দিল্লীতে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ এই খেলায় প্রমাণিত করিয়াছেন যে, টেস্ট খেলিবার মত মনের দৃঢ়তার অভাব তাঁহাদের নাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৬৩১ রাণের বিরুদ্ধে খেলিয়া ভারতীয় খেলোয়াড়গণ কোন সময়েই হতাশার পরিচয় দেন নাই। সেইজন্য প্রথম ইনিংসে ৪৫৪ রাণ তোলা সম্ভব হয়। শেষ দুইজন খেলোয়াড় অল্প ধৈর্য সহকারে সাহায্য করিলে শেষ পর্যন্ত হয়তো বা ভারতীয় দলকে "ফলো অন" করিতে হইত না। তবে খুবই সুখের বিষয় "ফলো অন" করিয়া শেষ পর্যন্ত দলের সুনাম রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। অমরনাথ দলের অধিনায়ক হিসাবেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

তবে ভারতীয় দলের এই সৌভাগ্যের জন্য অধিকারীর অপূর্ব ব্যাটিংয়ের সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ইনিংসেই শেষ পর্যন্ত নট আউট ছিলেন। এমন কি, প্রথম ইনিংসে শতাধিক রাণও সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার পরেই কে সি ইব্রাহিমের নাম করিতে হয়। ইনি উভয় ইনিংসেই প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। আর এস মোদী প্রায় এক বৎসর খেলা হইতে দূরে ছিলেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি দুই ইনিংসেই পূর্ব অর্জিত গৌরবের কিছু পরিচয় দিয়াছেন। অমরনাথ উভয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও খ্যাতি অনুযায়ী খেলিতে পারেন নাই। দলের গুরুদায়িত্ব তাঁহাকে যে বিচলিত করিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। তাহা হইলেও ইহা বলা চলে অধিনায়কত্বে তিনি গডার্ড অপেক্ষা কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। বোলিংয়ে একমাত্র রঙ্গচারী ব্যতীত কেহই সুবিধা করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় টেস্ট দল নির্বাচনের সময় বিশেষভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণকে এই দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের কৃতিত্ব

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চারিজন খেলোয়াড় একই ইনিংসে শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে গত বৎসর ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে এইরূপভাবে এক ইনিংসে যে চারিজন খেলোয়াড় শতাধিক রান করিয়া টেস্টে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেন, ভারতীয় দলের সহিত খেলিয়া তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ভারতীয় দলের বোলিংয়ের শক্তিহীনতা যদি হ্রাস পায় ভবিষ্যতে অপর সকল টেস্ট খেলায় আশা করা যায় এইরূপভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়গণ পর পর চারিজনে শতাধিক রান করিতে পারিবেন না। তাহা হইলেও ইহাদের ব্যাটিংয়ের দৃঢ়তা ও সময় মত বেপরোয়া ব্যাটিং অনুকরণীয় সন্দেহ নাই।

খেলার বিবরণ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল প্রথম খেলা আরম্ভ করিয়া মোটেই সুবিধা করিতে পারে না। পর পর তিনটি উইকেট ২৭ রানের মধ্যে পড়িয়া যায়। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ খুবই উৎসাহিত হন। কিন্তু ইহার পরে ওয়ালকট ও গোমেজ খেলিতে নামিয়া খেলার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শকগণ দেখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৩ উইকেটে ২৯৪ রান হয়। ওয়ালকট ১৫২ রান ও গোমেজ ৯৯ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ইহারা একত্রে চতুর্থ উইকেটে ২৬৭ রান সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয় দিনে খেলা আরম্ভ করিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে ওয়ালকট ১৫২ রানে ও গোমেজ ১০১ রানে আউট হন। ইহাতে পুনরায় মনে হয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ইনিংস দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই শেষ হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। উইকস ও ক্রিস্টিয়ানী ভীষণ পিটাইয়া খেলিয়া রান তুলিতে আরম্ভ করেন। দিনের শেষে দেখা যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৮ উইকেটে ৬২৩ রান হইয়াছে। উইকস ও ক্রিস্টিয়ানী উভয়ে শতাধিক রান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতের টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক ইনিংসে চারিজন শতাধিক রান করিয়া নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

তৃতীয় দিনে ২০ মিনিট খেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৬৩১ রানে ইনিংস শেষ করে।

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। মাত্র ৮ রানে মানকড় আউট হন। ইব্রাহিম ও মোদী একত্রে খেলিয়া রান তুলিতে আরম্ভ করেন। ইহারা ১২৯ মিনিট একত্রে খেলিয়া ১২১ রান সংগ্রহ করেন। ১৮১ রানে ৩টি উইকেটের পতন হয়। অমরনাথ ও হাজারে একত্রে খেলিয়া দিনের শেষে ৩ উইকেটে ২২৩ রান করিতে সক্ষম হন। অমরনাথ ৫০ রান করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে সূচনায় অমরনাথ ও হাজারে আউট হন। ভারতীয় দলের ইনিংস পরাজয় অনিবার্য বলিয়া আশংকা হয়। কিন্তু ফাদকার ও অধিকারীর অপূর্ব ব্যাটিং খেলায় পুনরায় নূতন প্রাণ সঞ্চার করে। ভারতীয় দল চতুর্থ দিনের শেষে ৪৫৪ রানে ইনিংস শেষ করে। অধিকারী ১১৪ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় দল কোন টেস্ট খেলায় ৪৫৪ রান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ইহা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের নূতন রেকর্ড।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইনিংস পরাজয়ের লোভে ভারতীয় দলকে ফলো অন করিতে বাধ্য করে। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটিংয়ের অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। পঞ্চম দিনের শেষে ৬ উইকেটে ২২০ রান করে। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। পুনরায় অধিকারী এই ইনিংসেও ২৯ রান করিয়া শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন।

খেলার ফলাফল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস:—৬৩১ রান
(ওয়ালকট ১৫২, উইকস ১২৮, গোমেজ ১০১, ক্রিস্টিয়ানী ১০৭ রান, রঙ্গচারী ১০৭ রানে ৫টি, মানকড় ১৭৬ রানে ২টি উইকেট পান।)

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংস:—৪৫৪ রান
(অধিকারী নট আউট ১১৪ রান, কে সি ইব্রাহিম ৮৫, আর এস মোদী ৬৩, অমরনাথ ৬২, ফাদকার ৪১, সারভাতে ৩৭, পি সেন ২২, জোন্স ৯০ রানে ৩টি, গোমেজ ৭৬ রানে ২টি, ক্যামেরন ৭৪ রানে ২টি ও স্টোলমেয়ার ৮০ রানে ২টি উইকেট পান)।

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস:—৬ উইঃ ২২০ রান
(কে সি ইব্রাহিম ৪৪, আর এস মোদী ৩৬, অমরনাথ ৩৬, অধিকারী নট আউট ২৯, সারভাতে নট আউট ৩৫, ক্রিস্টিয়ানী ৫৩ রানে ৩টি উইকেট পান)।

সিন্ধু বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পাকিস্থানের একটিমাত্র খেলায় সিন্ধু দলের সহিত করাচীতে খেলিয়া অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়াছে। খেলাটি তিনদিনব্যাপী হয়। প্রথমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জয় করিয়াও সিন্ধু দলকে ব্যাট করিবার সুযোগ দান করে। সিন্ধু দল খেলিয়া মাত্র ১৭২ রানে ইনিংস শেষ করে। পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল খেলিয়া দ্বিতীয় দিনের চা-পানের মধ্যে ৭ উইকেটে ২৮৩ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। কেহ শত রান পূর্ণ করেন। সকলেরই ধারণা হয় সিন্ধু দল ইনিংসে পরাজিত হইবে। দ্বিতীয় দিনের শেষে খুব অল্প রানই উঠে। কিন্তু তৃতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হইলে সিন্ধু দলকে দ্রুত রান তুলিতে দেখা যায়। চা-পানের মধ্যে ৮ উইকেটে ২৮৪ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। মাত্র এক ঘণ্টা ১৭৫ রান করিলে বিজয়ী হইবে এইরূপ অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল খেলা আরম্ভ করিয়া ২ উইকেটে ৬১ রান করে। ফলে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। সিন্ধু দলের খেলোয়াড়গণ সত্যই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

দেশী সংবাদ

১৫ই নবেম্বর—অদ্য প্রাতে আসাম রেলওয়ের লামডিং-তিনসুকিয়া শাখার ফারকাটিং ও কামোর-বান্ধানী স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে ৭নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণের সম্মুখের ৫খানি বগী লাইনচ্যুত হয়। ইহার ফলে ১২ জন নিহত ও ২৬ জন আহত হইয়াছে। —

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, সুসংহত পঞ্চম বাহিনী ভারত ভূমিতে তৎপর রহিয়াছে। পাকিস্থানী, পলাতক রাজাকার ও বেতনভুক বিদেশীরাই এই পঞ্চম বাহিনীতে রহিয়াছে। ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ পঞ্চমবাহিনীর কার্যকলাপের বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন।

১৬ই নভেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এবং মণিপুর, ত্রিপুরা ও লুসাই পার্বত্য অঞ্চল আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। ৮ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্বতন্ত্র পূর্বাচল প্রদেশ গঠনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহা বাতিল করা হইয়াছে।

শ্রীনগরের সংবাদে প্রকাশ, জোজিলা গিরি-বর্ত্মের তুষারাবৃত অঞ্চল হইতে ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত শত্রুকবলিত দ্রাস গতকল্য ভারতীয় সেনাদল কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ভারতীয় বাহিনী যে এই রণাঙ্গনে শীতকালীন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, এতদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে।

১৭ই নভেম্বর—"ইণ্ডিয়া" নাম পরিবর্তন করিয়া ভারতবর্ষ, ভারত অথবা হিন্দুস্থান করিবার জন্য ভারতীয় গণপরিষদে যে সকল সংশোধন প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে, উহার আলোচনা স্থগিত রাখার জন্য পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থের প্রস্তাব আজ গণপরিষদ গ্রহণ করেন।

বৃটিশ নৌবহরের ৯,৮৫০ টন ক্রুজার "নরফোক" আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কর্ণওয়ালিশ বন্দর হইতে আজ কলিকাতায় প্রিন্সেপস ঘাটে আসিয়া পৌঁছায়। জাহাজটি এখানে এক সপ্তাহ-কাল থাকিবে।

১৮ই নভেম্বর—পাটনার সংবাদে প্রকাশ, অদ্য প্রাতে এক স্টীমার ডুবির ফলে অনুমান ৮ শত লোক গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ১২ শত যাত্রী ও গৃহপালিত জন্তু প্রভৃতিতে পূর্ণরূপে বোঝাই হইয়া "নারায়ণী" নামক স্টীমার খানি শোণপুর মেলা হইতে রওনা হইয়াছিল। স্টীমারটি পাটনা ইঞ্জিনীয়ার কলেজের নিকট রাণীঘাটের অনতিদূরে অকস্মাৎ ডুবিয়া যায়। নিহত ব্যক্তিদের অধিকাংশই সরল পল্লীবাসী। উহাদের মধ্যে বহু স্ত্রীলোক ও শিশু আছে।

ভারতীয় নৌ-বহরের ক্রুজার "দিল্লী" অদ্য ভিজাগাপত্তম হইতে কলিকাতায় প্রিন্সেপস ঘাটে পৌঁছায়; উহার সঙ্গে "সাটলেজ" ও কৃষ্ণা নামে দুইখানি শলুপও আসিয়াছে। ৭০৩০ টন পরি-মাপের এই ক্রুজারটি ভারতের প্রথম ক্রুজার; ইহার অধিনায়ক জে টি এস হল।

ভারতীয় গণপরিষদের বৈঠকে খসড়া শাসন-তন্ত্রের আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইলে ডাঃ আম্বেদকর এই মর্মে এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোন অঞ্চলের সীমা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভারতীয় পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইবার পূর্বে প্রেসিডেণ্টকে এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক আইন সভার

পণ্ডিত নেহরু সকাশে ভারতস্থ ব্রাজিল রাষ্ট্রদূত সিনর জোস দ্য এলেনকার

মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রেসিডেণ্টকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অভিমত গ্রহণ করিতে হইবে। সংশোধন প্রস্তাবটি পরিষদে গৃহীত হয়।

১৯শে নভেম্বর—আয়কর তদন্ত কমিশন যেসব সুপারিশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটি জরুরী বিষয় কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে অদ্য ভারতের রাষ্ট্রপাল ১৯৪৭ সালের আয়কর সংক্রান্ত আইন সংশোধনকল্পে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনে খসড়া শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা আরম্ভ হয়।। উক্ত অধ্যায়ে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি নির্দেশনামার মূল সূত্রসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত নীতিসমূহ বিচারযোগ্য রাখার উদ্দেশ্যে দুইজন সদস্য কর্তৃক দুইটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

অদ্য ভারতের ভাষা সমস্যা সম্পর্কে আলো-চনার পর নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

২০শে নভেম্বর—ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, অধুনালুপ্ত "নবযুগ" পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা মৌলানা আহম্মদ আলীকে গত ১৬ই নভেম্বর তাঁহার নিজ জেলা খুলনায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেল নয়াদিল্লীর আরুইন য়্যাম্পিথিয়েটারে একটি সুইস টিপিয়া বেতার ব্যবস্থায় ভিজাগাপত্তমে সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর নির্মিত "জলপ্রভা" (৮ হাজার টন) নামক জাহাজখানি জলে ভাসাইয়া দেন।

২১শে নভেম্বর—পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খান ঢাকায় এক বিরাট জন-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে অমুসলমানরা পাকিস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাউক, পাকিস্থান গভর্নমেণ্টের ইহা কাম্য নহে। সংখ্যা-লঘুরা যদি চলিয়া যায়, তবে পাকিস্থানের অর্থ-নীতির উপর এক গুরুতর আঘাত আসিবে। তিনি তাঁহাদিগকে এই আশ্বাস দেন যে, পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও উদার ব্যবহার করা হইবে।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই নভেম্বর—সাংহাই-এর এক সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে নানকিং-এর প্রবেশপথে অবস্থিত সুচাও-এর পতন হইয়াছে।

১৮ই নভেম্বর—বৃটেন অদ্য সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক কমিটিতে এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে যে, প্যালেস্টাইনের আরব অধিকৃত অঞ্চল ট্রান্সজর্ডনের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। তদুপরি কাউণ্ট বার্ণাদোতের পরিকল্পনা অনুসারে নেগেভ আরবদিগের ও দক্ষিণ-পশ্চিম গ্যালিলী ইহুদীদিগের থাকিবে। জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে হইবে।

১৯শে নভেম্বর—নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, দশদিন ব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের পর চীনা সরকারী বাহিনী নানকিং-এর ২০০ মাইল উত্তরে মধ্যচীনের সুচাউ রণক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, সুচাউ-এর যুদ্ধে দুই লক্ষাধিক কম্যুনিস্ট সৈন্য খোয়া গিয়াছে এবং কম্যুনিস্টদের নানকিং ও সাংহাই অভিমুখী অভিযানের প্রচেষ্টা বিপর্যস্ত হইয়াছে।

২০শে নভেম্বর—গত রাত্রে প্যারিসে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের অছি কমিটির অধিবেশনে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা কার্যতঃ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউ-নিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এইরূপ কোনও ব্যবস্থা অনুসরণ না করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া ভারতবর্ষ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, তাহা ২২-২১ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

প্যারিসে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব বহু ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। সোভিয়েট পক্ষ হইতে প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়।

মিশরের রাজা ফারুক ও রাণী ফরি[illegible] বিবাহ বিচ্ছেদ সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে [illegible] ফারুকের ভগিণী রাণী ফৌজিয়ার সহিত প[illegible] সাহের বিবাহ বিচ্ছেদের সংবাদও সরকারী[illegible] ঘোষিত হইয়াছে।

২১শে নভেম্বর—নানকিং-এর সংবাদে প্রক[illegible] চীনা সরকারী বাহিনী উত্তর চীনের খনি অঞ্চলে[illegible] সহিত সংযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অদ্য পিকিং তিয়েনসিনের মধ্যবর্তী অঞ্চলের কম্যুনিস্ট সেন[illegible] বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, চীন হইতে সদ্য প্রত্যাগত প্রতিনিধি দল সেনেটের এপ্রোপ্রিয়েশান কমিটিতে যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছে উহাতে বলা হইয়াছে, "চীনের প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইসেক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি অবিলম্বে সরাসরি আমাদিগকে মুক্তহস্তে সামরিক সাহায্য প্রদান না করে এবং চীনের মুদ্রার স্থায়িত্ব বিধানের জন্য অতিরিক্ত ঋণ না দেয়, তবে চীন কমিউনিস্টদের হস্তগত হইবে।"

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ]   শনিবার, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ সাল।   Saturday, 4th December, 1948.   [৫ম সংখ্যা

কলিকাতায় ভারতের রাষ্ট্রপাল

ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী তিনদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রপালস্বরূপে পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার আগমন এই প্রথম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজাজীকে ডি-এল, উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজাজীর এই আগমন পুরোপুরি সরকারী ভাবে নয়, তথাপি রাষ্ট্রপালের পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনে এই আগমনে ভারতীয় গণরাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আগামী ৬ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে। সম্মেলনের এই অধিবেশন নানাদিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। প্রকাশ যে, পূর্ব পাকিস্থানে বাস্তুত্যাগীদের সমস্যা সম্বন্ধে এই বৈঠকে বিশেষভাবে আলোচনা উত্থাপিত হইবে। প্রত্যক্ষভাবে না হোক্ পরোক্ষভাবে হায়দরাবাদ এবং কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিও যে আলোচনাকে প্রভাবিত করিবে, এরূপ মনে করিবারও বিশেষ কারণ রহিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রপাল কলিকাতায় আসিয়া বাস্তুত্যাগীদের এই সমস্যার যথাযথ অবস্থা উপলব্ধি করিতে সুযোগ লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী সূক্ষ্মদর্শী রাজনৈতিক মনীষাসম্পন্ন পুরুষ। হায়দরাবাদকে কেন্দ্র করিয়া সমস্যা যেরূপ জটিল হইয়া উঠিতেছিল, ভারতীয় সেনাদলের সময়োচিত হস্তক্ষেপে যদি তাহার সমাধান না ঘটিত, তবে সমগ্র ভারতের ঐক্য এবং সংহতির অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করিত। হায়দরাবাদস্থ ভারতের ভূতপূর্ব প্রতিনিধি শ্রীযুত মুন্সী সেদিন সে কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীযুত মুন্সীর জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি কয়েকজন ছাড়া, তাঁহার অপরাপর সঙ্গী এবং সতীর্থ

কর্মচারীদিগকে ভারতে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হায়দরাবাদের সমস্যার যথোচিত সমাধানে সাক্ষাৎ সম্পর্কে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও রাষ্ট্রপাল হিসাবে রাজাজীর কৃতিত্বও যে অনেকখানি রহিয়াছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপক বাস্তুত্যাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে আজ যে বিপুল সমস্যা দেখা দিয়াছে, রাজাজীর তীক্ষ্ন ধী-শক্তি তাহার সমাধানেও সার্থকতা লাভ করিবে এবং এতৎসম্পর্কিত সব উদ্বেগ অবিলম্বে কাটিয়া যাইবে, গৃহহারার দল পুনরায় শান্তির নীড়ে আশ্রয় লাভ করিবে, আমরা ইহাই আশা করিতেছি।

সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ

"অদ্য এখানে আমি যে পতাকা উত্তোলন করিতেছি, তাহা একটি মিত্র রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা। এই পতাকা শান্তি ও প্রগতির প্রতীক। এই পতাকা প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্থানের নিকট সাম্যের বাণী লইয়া যাইতেছে। পূর্ব পাকিস্থানে এই পতাকা ন্যায় এবং সাম্যের বাণী বহন করিবে"—পূর্ব পাকিস্থানের ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার স্বরূপে শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু গত ২৮শে নবেম্বর ঢাকায় তাঁহার অফিসে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে গিয়া এই কথা বলেন। বস্তুতঃ শ্রীযুত বসুর এই উক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন কিছুই নাই। কংগ্রেস মানবতার অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শের জন্য সুদীর্ঘকাল স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়াছে। মনুষ্যত্বের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সে কোনদিন কাহাকেও আঘাত করে নাই। কংগ্রেসকর্মীদের প্রতিবিন্দু রক্ত মানবতার মহনীয় আদর্শেই ক্ষরিত হইয়াছে, বিদেশীর স্বৈরাচারকে বিচূর্ণ করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে। প্রতিবেশীর রক্তপাতে কংগ্রেস পৃথিবীকে কলঙ্কিত করে নাই। সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা সে আদর্শে কোনদিন বীরত্বের গর্ব লাভ করে নাই। গান্ধীজী জীবন দিয়া মানবতার এই মহনীয় আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং বিশ্বের জনসমাজে আজ সে আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক জগৎ নানা উপদ্রবে আতঙ্কিত; বিশ্ববাসী এই উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভারতের দিকেই তাকাইয়া আছে। এসিয়া আজ ভারতের নেতৃত্বকে বরণ করিয়া লইবার জন্য আগ্রহান্বিত, ইউরোপও ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান জগতে ভারতের এই গুরুত্বকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং স্বার্থসন্ধীদের ভারতের বিরুদ্ধে সহস্র প্রকার মিথ্যা প্রচারকার্য সত্ত্বেও ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের অন্তর্নিহিত মানবতার সে পরম মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। ভারত বৃহৎ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে এবং বৃহৎ আদর্শের জন্যই তাহার সন্তানেরা প্রাণ দিয়াছে। ভবিষ্যতেও মানবসেবার সেই বৃহৎ আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করিতে ভারতের সমগ্র কর্মসাধনা প্রযুক্ত হইবে। কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা বৃহতের জন্য সাধনার প্রেরণারই প্রতীক। ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বের দুর্গত মানবসমাজকে প্রাণধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্যাণ ব্রতেরই উদ্বোধন করিতেছে। হায়দরাবাদে ভারতের এই সাধনা জয়যুক্ত হইয়াছে, কাশ্মীরেও সে সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

ছাত্র সমাজের আদর্শ

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলীর পূর্ববংগে সফর সম্পন্ন হইয়াছে। বলা বাহুল্য তাঁহার এই সফর পূর্বে পাকিস্থানের জনসমাজে, এমনকি সেখানকার প্রগতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিশেষ কোন উৎসাহ বা উদ্যম জাগাইতে সমর্থ হয় নাই। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতামূলক প্রতিবেশের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তরুণদের কতকাংশের মধ্যে আধুনিক সংস্কৃতির একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি এবং উপদেশ তাহাদিগকে কোন উদার ভাবে অনুপ্রাণিত করে নাই। পক্ষান্তরে কার্যত তাহারা সর্বতোভাবে নিরুৎসাহিতই হইয়াছে। মিঃ লিয়াকত আলী পূর্ব পাকিস্থানে প্রাদেশিকতার সন্ধান পাইয়াছেন। ছাত্রসমাজের অভিনন্দনের উত্তরে এজন্য তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। ছাত্রদের অপরাধ এই যে, তাহারা পাকিস্থানের জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকুরী সংরক্ষণের দাবী করিয়াছিল। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে পূর্ববংগের এই দাবী মিঃ লিয়াকত আলী উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি কতকগুলি বাঁধা বুলি আওড়াইয়া গণতান্ত্রিকতাসম্মত এই নীতিকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত হন নাই। সুতরাং বড় বড় পদগুলিতে পশ্চিম পাকিস্থানের প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার কৌশলই সমানভাবেই চালানো হইবে। এই পথে পূর্ববংগের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে পিষ্ট করিয়াই পাকিস্থানের কর্ণধারগণ পাকিস্থানের অখণ্ডতাকে দৃঢ় করিতে চাহেন। এই নীতি তাঁহারা পূর্বেই অবলম্বন করিয়াছেন। এখন সেই নীতিই ক্রমশ সম্প্রসারিত করা হইতেছে। এইভাবে পাঞ্জাবী মুসলমানদের প্রভাবাধীনে পূর্ব পাকিস্থানের অধিবাসীদিগকে কার্যত ক্রীতদাসে পরিণত করিবার পালাই পত্তন করা হইয়াছে এবং সেক্ষেত্রে প্রাদেশিকতার ধুয়া তোলা ধাপ্পাবাজী ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাঙলা ভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বরূপে গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ববংগের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ছাত্রসমাজ যে দাবী করিয়াছিল, মিঃ লিয়াকত আলী তাহাতেও অস্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার মতে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা যে উর্দু হইবে ইহা আগেই স্থির হইয়া গিয়াছে। তবে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রসমাজকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ববংগের সমস্ত কর্মচারীকে বাঙলা শিক্ষা করিতে হইবে, সেইভাবে পশ্চিম পাকিস্থানে সরকারী অফিসে যেসব কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে, তাহারাও উর্দুজবানে ওস্তাদ হওয়া চাই। পরে, দুই প্রদেশের মধ্যে কর্মচারী বিনিময় করা হইবে, এইভাবে কর্মচারীরা ক্রমশঃ উর্দু ও বাঙলা ভাষা শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা পূর্ববঙ্গবাসীদের মাতৃভাষার মর্যাদা সম্যক্‌ভাবে রক্ষিত হইল না। সোজাসুজি বাঙলা ভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম ভাষা স্বরূপে স্বীকার করিলে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে ভাষার পারস্পরিক সংযোগসূত্র স্বাভাবিকভাবেই দৃঢ় হইয়া উঠিত এবং তাহাতে মিঃ লিয়াকত আলী যাহা চাহেন, তাহাই সমধিক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইত বলিয়াই আমরা মনে করি; কিন্তু পূর্ববংগের ভাষা এবং সংস্কৃতিকে এইভাবে পাকিস্থানের সমগ্র রাষ্ট্রনীতিতে প্রভাবিত হইতে দিলে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিটা পাছে শিথিল হয়, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী এই ভয় করিয়াছেন। ধর্মগত সংস্কারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আধুনিক কোন উন্নত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব হয় না, মিঃ লিয়াকত আলী কার্যত কোনক্ষেত্রেই তাহা স্বীকার করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি পুনঃপুনঃ সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মগত সংস্কারকেই প্ররোচনা প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে পাকিস্থানের বিভিন্ন অংশ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্যবুদ্ধিই বৃদ্ধি পাইবে এবং সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাবোধগত ঐক্য শিথিল হইয়াই পড়িবে। এই নীতি অবলম্বনের কুফল ইহার মধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি সিন্ধু গভর্নমেণ্ট পাকিস্থানেরই পাঁচখানা উগ্র সাম্প্রদায়িক মতবাদী পত্রিকার সিন্ধুদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে বাধ্য হন। বাস্তবিকপক্ষে সাম্প্রদায়িকতা এবং রাষ্ট্রীয় এ দুইটি পরস্পর বিরোধী বস্তু। বিশ্ববাসীকে সাম্য এবং মৈত্রীর পথ-প্রদর্শনে পাকিস্থানের বড় বড় আদর্শের কথা পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর মুখে আমরা কয়েকদিন অনেক শুনিতে পাইয়াছি; সেগুলির সংগে পাকিস্থানী কর্তাদের অবলম্বিত নীতির সত্যকার অসামঞ্জস্য সকলেরই চোখে পড়িবে। এই সব দিক হইতে মিঃ লিয়াকত আলীর পূর্ববংগ পরিদর্শন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

সত্যানুসন্ধান

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ অধিবেশনে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা নানাদিক হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্দারজী স্পষ্টবাদী পুরুষ, কঠোর বাস্তব সত্যকে অভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করিবার মত মনস্বিতা এবং নিরপেক্ষভাবে তাহা ব্যক্ত করিবার নির্ভীকতা তাঁহার আছে। এই বাস্তব বিচারের দিক হইতেই সর্দারজী এদেশের কংগ্রেসকর্মীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি কতকটা অপ্রিয় শুনাইতে পারে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, সত্যের খাতিরেই তাঁহাকে কখনও কখনও কঠোর ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু সত্যেরই সমাদর স্থায়িত্ব লাভ করে। পক্ষান্তরে মিথ্যা যতই আপাতমধুর হোক্, তাহা চিরদিনই মারাত্মক। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আমাদের সম্মুখে যে সব সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের কাহারো কাহারো পক্ষে অপ্রিয় হইলেও সত্যের আলোকেই সেগুলি সমাধানের জন্য আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। সর্দারজী এই প্রসংগে চরিত্র-নিষ্ঠার উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন, চরিত্রের দৃঢ়তাতেই শিক্ষার সার্থকতা। গান্ধীজী আমাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিখাইয়াছেন। অথচ বর্তমানে আমরা অনেকে গান্ধীজীর আদর্শের বিরোধী কাজই করিতেছি। মন্ত্রিত্ব ও ক্ষমতালাভের মোহ আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতেছে। আমরা গভর্নমেণ্ট বা কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের জন্য অশোভন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছি। আমরা যদি স্বাধীনতার প্রারম্ভেই এইরূপ আত্মদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হই, তবে আমরা আমাদের স্বাধীনতার মূল্য কিছুই যে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, ইহা সর্বাংশে সত্য। বক্তৃতার উপসংহারে সর্দার প্যাটেল দুঃখ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, অথচ ভারতবাসীদের ব্যবহারে সে সত্য প্রকাশ পাইতেছে না। স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে জনমানসে যে উৎসাহ, উদ্যম ও সংকল্প জাগ্রত হইবার কথা তাহা পরিদৃষ্ট হয় না এবং স্বাধীন ভারতকে বিশ্বসভায় গৌরবোজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন ও সংকল্প দেশবাসীর চোখেমুখে বিন্দুমাত্রও উদ্ভাসিত নহে। বস্তুত সর্দারজীর উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে বিচার বা গবেষণার কোন প্রয়োজন হয় না। আমাদের চারিদিকে দৃষ্টি করিলেই সে সত্য আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীনতালাভ করিবার পর সমষ্টিজীবনের বলিষ্ঠ আদর্শ আমাদের মধ্যে যেন মলিন হইয়া পড়িয়াছে এবং ব্যক্তি স্বার্থ এবং তৎসম্পর্কিত বিচার ও বিবেচনাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। সর্দারজী এই সত্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। দীর্ঘ সংগ্রামের অবসানে এমন একটা মানসিক দুর্বলতা অন্যান্য জাতির ইতিহাসেও দেখা গিয়াছে, সুতরাং অস্বাভাবিক কিছু নয়; কিন্তু বৈপ্লবিক কর্মপ্রেরণা সেক্ষেত্রে তরুণ চিত্তকে আবর্তিত করিয়া এমন একটা উচ্ছ্বাস জাগায় যে, প্রবীণের দলের সব ক্লান্তি, শ্রান্তি এবং দুর্বলতার সব গ্লানি তাহাতে ভাসিয়া যায়। সমাজে নূতন মানুষ দেখা দেয়। তাহারা জাতিকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। সর্দারজীও সেই কথাই বলিয়াছেন এবং তিনি তরুণের দলকে দেশের গঠনকার্যে বিপুল বীর্যে আগাইয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সর্দারজী বলেন, 'আমরা বৃদ্ধের দল জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে উপনীত

হইয়াছি। যে কয়দিন আমরা আছি, তোমাদের ও দেশের সেবায় নিজেদের শক্তি যথাসাধ্য নিয়োগ করিব। যদি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ও অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ থাকো, তবে মঙ্গল, নতুবা সম্মুখে দুর্দিন ও বিপদ অপেক্ষা করিতেছে, ইহা মনে রাখিও।' ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুণ্য পীঠভূমি এই বাঙলা। বীরের রক্তে এ ভূমির ধূলিকণা এখনও সিক্ত রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, আজ এখানকার দিক্‌চক্রবালও আমরা অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতেছি, সর্বত্রই যেন একটা অবসাদের ভাব, পরাজয়ের মনোবৃত্তি বাঙলার সমাজ-জীবনও যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কোথায় বাঙলার সে বুকের বল, কোথায় সে বীর্য! জীবন দিয়া যাহারা জাতিকে গড়িবে, দেশকে স্বাধীন জাতির গৌরব-গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহারা কোথায়? কোথায় তাহারা যাহারা দরিদ্রের দুঃখ দূর করিবে, পীড়িতের অশ্রু মুছাইবে? কোথায় তাহারা যাহারা দুর্নীতিকে দলন করিবে এবং দেশের দুর্দশা লইয়া যাহারা স্বার্থসিদ্ধির পাপ-ব্যবসা চালাইতেছে, তাহাদের ভণ্ডামি ভাঙিয়া দিবে? জাগো বীরের দল, কর্মীর দল, সাধকের দল, তোমরা আসিয়া আপন স্থান গ্রহণ কর, সর্দারের কণ্ঠে বর্তমান ভারত তোমাদিগকেই আজ আহ্বান করিতেছে।

দরিদ্রনারায়ণের সেবা

গত ২৭শে নবেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীতে দিল্লী প্রাদেশিক সমাজ-সেবী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সমবেত সদস্যাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই সভায় নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলি উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার পট্টভি জিজ্ঞাসা করেন, সভায় যে সব পুরুষ এবং মহিলা গ্র্যাজুয়েট উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন দরিদ্রের দুঃখ ও কষ্ট দূর করিবার জন্য তাহাদের সুখে দুঃখের সঙ্গী হইতে প্রস্তুত আছেন? শত শত নরনারী আজ গৃহহারা, ইহাদের মধ্যে অনেকে নিঃস্ব এবং আশ্রয়-প্রার্থী, আপনাদের যাঁহারা প্রাসাদোপম ভবনে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন নিজেদের বাসভবনের অন্ততঃ কতকটা অংশ এই সব হতভাগ্য ভ্রাতাভগিনীদের জন্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত! সভ্যগণ ডাক্তার পট্টভির এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছিলেন, আমরা জানি না, তবে সেবাধর্মের আত্যন্তিকতা যে আমাদের সমাজ-জীবনে অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার অভিভাষণেও আমাদের ব্যক্তি-জীবনের বর্তমান এইরূপ মনস্তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করেন। পণ্ডিতজী বলেন, নিজেদের শ্রেষ্ঠতর মানুষ জ্ঞান করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সৌভাগ্য-বানদের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাদৃষ্টি লইয়া সমাজসেবা করিতে যাওয়া অনুচিত। প্রকৃত-পক্ষে তেমনভাবে সেবা করিতে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াই ভালো। মানুষকে যাহারা আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছেন শুধু তাঁহারাই মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তেমন সেবাব্রতীদের সাধনাই সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। ইঁহাদের সাধনাতেই শক্তিশালী সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। বলা বাহুল্য, পণ্ডিতজী সেবাধর্মের এই যে আদর্শ সেদিন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, বাঙলা দেশের সাধক এবং মনীষিগণ তাঁহাদের সমগ্র সাধনায় মানবতার সেই বেদনাই সমাজ-জীবনে সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুত সেবা করিয়া অপরকে কৃতার্থ করা সেবার উদ্দেশ্য নয়, নিজেকে কৃতার্থ করাতেই সেবাধর্মের সার্থকতা এবং সেই পথেই সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রাণবলের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়া থাকে। বাঙলার আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, বাঙলা দেশ একদিন এই দুর্জয় প্রাণ-বলের অধিকারী হইয়াছিল। জীবনকে তুচ্ছ করিয়া ত্যাগের পরম মহিমায় সে অমৃতকে আস্বাদন করিয়াছিল। অমৃতত্বের সেই শক্তি বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে আজও সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষে একদিন এখানে যে বীরবাণী উদ্গীত হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্রের জীবনে তাহারই জ্যোতির্ময় বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাঙলা দেশকে যদি আজ স্বাধীন ভারতে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয়, তবে এই সেবাধর্মকেই উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে এবং সেজন্য বাঙলার সভ্যতার মর্মমূলে যাওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে বিদেশীর ধার করা মতবাদের জিগীরে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, গভীরভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য আমরা যেন ক্রমেই হারাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের চিত্তের এই দৈন্য অতিক্রম করিতে না পারিলে শুধু বড় বড় মতবাদ বা আদর্শ আমাদিগকে বর্তমান দ্বন্দ্বময় জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সাময়িক উত্তেজনা জাতির গোড়ায় শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না, সেজন্য সাধনার প্রয়োজন এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগময় জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবই আদর্শকে বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে।

অসারের তর্জন-গর্জন

কাশ্মীরে হানাদারদল এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষকবর্গের পৃষ্ঠপ্রদর্শনের পর্ব পূর্ণাঙ্গ হইতে চলিয়াছে। পার্বত্য দুরধিগম্য অঞ্চলে যেসব ঘাঁটি বাঁধিয়া তাহারা কাশ্মীরের অংশ-বিশেষের উপর আধিপত্য রক্ষার যে আশা করিতেছিল, দ্রাস এবং পুঞ্চ এলাকায় ভারতীয় বাহিনীর কৃতিত্বের ফলে তাহা আজ নির্মূল হইতে চলিয়াছে। পরবর্তী ধাক্কা ইহাদিগকে গিলগিট পার করিয়া ছাড়িবে। হানাদার বাহিনীর পশ্চাতে যাঁহারা মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতেছেন ভারতীয় বাহিনীর এই সাফল্য স্বভাবতই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিয়াছে। তাই দেখা যাইতেছে, পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জাফরুল্লা খাঁ বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে হাজির হইয়া ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। জাতিবৃন্দ অবিলম্বে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি রোধের ব্যবস্থা না করিলে পাকিস্থানের সৈন্যদল সমগ্র শক্তি লইয়া রণাঙ্গনে আবির্ভূত হইবে বলিয়াও তিনি শাসাইয়াছেন। ভারতের দেশরক্ষাসচিব সর্দার বলদেও সিং সেদিন এমন হুমকির জবাব দিয়াছেন। তিনি শুনাইয়া দিয়াছেন যে, পঞ্চাশ হাজার পাঠান সৈন্য কাশ্মীর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত এই ধরণের কথা শুনিয়া ভারত ভয় পাইবে না। পূর্ব পাঞ্জাবের তিনটি জেলাতেই ঐরূপ আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত যথেষ্ট লোক আছে, এমনকি, সমগ্র পাকিস্থানের লোকদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি এক পূর্ব পাঞ্জাবেই রহিয়াছে। সর্দারজী আরও বলেন যে, পাকিস্থান সম্পর্কে আমাদের কোন খারাপ অভিসন্ধি নাই; কিন্তু পাকিস্থান ভারত সম্পর্কে দুরভিসন্ধি পোষণ করিয়া চলিয়াছে। যদি তাহার এই মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটে, তবে পাকিস্থান নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন করিয়া তুলিবে। বলা বাহুল্য, পাকিস্থানের পররাষ্ট্রসচিবের ফাঁকা হুমকিতে প্রচুর পরিহাসেরই উদ্রেক করে। পাকিস্থান পররাষ্ট্র গ্রাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পাকিস্থানী সেনাদলের কাশ্মীর প্রবেশ এবং হানাদার দস্যুদের পরিচালনার কাজ কাশ্মীর কমিশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক নীতির দিক হইতে স্পষ্টই নিন্দিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কাশ্মীর ভারতীয় রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক নীতির দিক হইতে কাশ্মীরের নিরাপত্তা রক্ষার ভার ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত আছে। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর হইতে হানাদারদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সেখানে নিযুক্ত হইয়াছে এবং যতদিন পর্যন্ত সে কাজ সম্পন্ন না হইবে, ততদিন তাহাদের অভিযানও প্রতিরুদ্ধ হইবে না; অধিকন্তু সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ভারত যথোচিত শক্তিই সর্বতোভাবে প্রয়োগ করিবে এবং পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিবের চোখরাঙানীতে ভারত সে কর্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবে না। অত্যাচারিত এবং উৎপীড়িতকে রক্ষা করিবার জন্য, নিজের রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত ভারতের সেই প্রচেষ্টায় পাকিস্থান যদি সমধিক শক্তি প্রয়োগ করিতে স্পর্ধিত হয় এবং সেজন্য রক্তস্রোত বহে, পাকিস্থানই তাহার জন্য দায়ী হইবে।

নদীর ধারে [বাণী মুখার্জির সৌজন্যে] শিল্পী ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

শিল্পী ঃ নন্দলাল বসু

[সুধময় মিত্রর সৌজন্যে]

দুর্ভিক্ষ

শিবদাস চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধে নয়, ভূমিকম্পে নয়, নয় কালবৈশাখীর ঝড়ে
শুধু অর্ধাহারে, অনাহারে আর কুটিল অত্যাচারে
লাখে লাখে
পৃথিবী-বক্ষ হ'তে শুষ্ক পাতার মত
নিঃশব্দে যারা ঝ'রে গেল
তারা আমারই দেশের লোক।

আমি এক নির্বাসিত কবি।
অর্থহীন আমার অক্ষম বিলাপ।
এদেশে উজ্জ্বল লোকের ভিড়
শান্তির সূর্যলোকে। পালক-শয্যার আরাম।
দূর হতে দেখি
কঙ্কাল যাত্রীর মিছিল—মৃত্যুপারে হয়তো শহীদ হবে।

এর চেয়ে—
আমার দেশের সোনার ক্ষেতে
যদি হতে পারতাম একটি শস্যকণাও,
তাই খেয়ে হয়তো কোনো ক্ষুধার্ত শিশু
দুর্বল দুটি ছোট ছোট হাতে তার
আরো কিছুদিন দূরে ঠেলে রাখতে পারতো
অপরিচিত নিষ্ঠুর ঠাণ্ডা মৃত্যুকে।
আমার দেশের সুফলা বাগানে
যদি ফল হয়েও জন্ম নিতাম
হয়তো কোনো উপোসী মেয়ে আমায় খেয়ে
বাঁচাতে পারতো তার পুষ্পিত যৌবনের জীবন।

আমার দেশের উদার আকাশে
যদি হতাম উড়ন্ত এক পাখী
হয়তো কোনো বুভুক্ষু ভাই
আমার মাংসে
তার দেহকে রক্ষা করতে পারতো
অকাল কবরের অন্ধকার হতে।
এই দুর্ভিক্ষ,
এই মৃত্যু,
এই পাপ
মানুষসাপের সৃষ্টি।
নরকের গলিত অন্ধকার হ'তে
বুক ঘ'ষে ঘ'ষে
অতিলোভব্যাধিগ্রস্ত অতিকায় অজগর
এলো পুঁজিপতি—
লম্পটের কপট হাসি হেসে
নির্মল আকাশে বিষ বমি করলো
নীল আকাশ পোড়া কাগজের মত কুঁকড়ে কালো হ'য়ে গেল।
মাঠের ধান গেল ম'রে
গোলাপ শুকিয়ে গেল
সুজলা সুফলা দেশে
আমার দেশের লোক না খেয়ে মরলো।

মিলিয়ে গেল
স্থির জলে লক্ষ পাখীর নিরুদ্দেশ ছায়া।*

---

* খলিল জিব্রানের 'Dead are my people' কবিতা অবলম্বনে।

"THERE is a dearth of highly qualified Pakistanis in every development of the Government"—
বলিয়াছেন খাজা নাজিমুদ্দিন।

"গভর্নর জেনারেল এবং উজীরের পদ
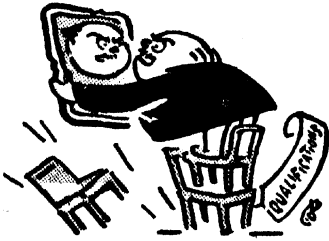
সম্বন্ধেও খাজা সাহেবের এই মত কি না তা স্পষ্ট হলো না"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * * *

জনাব লিয়াকৎ আলি তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—

"I am unable to distinguish between non-Muslim and Muslim capitalists".—

"এ দুয়ের পার্থক্য বোঝা সত্যিই একটু শক্ত, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না;—খাঁ সাহেব গরীব মুসলমান আর অমুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যটা ভালো করে বুঝে নিয়েছেন, তো, তা হলেই দেশ শাসনের কাজ চলে যাবে"—এই মন্তব্যও অবশ্যই খুড়োর।

* * * *

জনাব জাফরুল্লা খাঁ নাকি আবার রাষ্ট্র-সংঘে হায়দরাবাদ প্রসঙ্গ উত্থাপনের তোড়জোড় করিতেছেন। কিন্তু আমরা

শুনিয়াছি হাতে কাজ না থাকিলে খৈ ভাজিলেও নাকি সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয়। খাঁ সাহেব হায়দরাবাদ ছাড়িয়া খৈ ভাজার কাজে মন দিলেও তো পারেন।

* * *

ভারতীয় বিমানবহরের একজন পদস্থ কর্মচারী বলিয়াছেন—

"War in Kashmir is not an Inter-Dominion football match"—

কিন্তু লীগপন্থীরা তাঁর সঙ্গে একমত নহেন বলিয়াই হয়ত রেফরী এবং লাইনস্‌ম্যানের খোঁজে ব্যস্ত আছেন।

* * * *

আমাদের বাঙলার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিধান রায় বলিয়াছেন—

"We West Bengal Ministers are a happy family".—

আমরা তা জানি। আমাদের ভাবনা শুধু পাড়া প্রতিবেশীর পরিবার সম্বন্ধে। রায়-পরিবার তাহাদের সুখসাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়া দিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

* * * *

রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন—জনসাধারণ—ইচ্ছা করিলেই ভোটের সাহায্যে গুণ্ডা নির্বাচন করিয়া গুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। গুণ্ডারা বলিতেছে তারা নাকি নিরপেক্ষ নির্বাচনের সুযোগ পাইতেছে না!

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম দিল্লীতে নাকি চুরির সংখ্যা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে—"ভাবের ঘরে চুরি না হলে দিল্লী তথা দেশবাসীর আতঙ্কের কোন কারণ নেই"—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

* * * * *

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, গুরু নানকের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া পণ্ডিত জওহরলালজীর এক জোড়া নূতন জুতা চুরি হইয়া গিয়াছে, চোর সেই স্থানে এক জোড়া পুরাতন জুতা রাখিয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতজীর জুতা পরিয়া অপরাধী নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছে জুতাটা কোথায় "Pinch" করিতেছে!

* * * *

নোবেল পুরস্কার কমিটি ঘোষণা করিয়াছেন—এ বৎসরে শান্তির জন্য কোন পুরস্কার বিতরণ করা হইবে না। খুড়ো বলিলেন—"সেটা তৃতীয় মহাযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুলতুবী রাখাই ভালো।"

* * * *

বৃটিশ মুষ্টিযোদ্ধা ফ্রে ডি মিল্‌সকে নাকি আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত এম সি সি'র এক খেলায়—ক্রিকেট প্যাভিলিয়নে

ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। বৃটিশ সিংহ অপেক্ষা আফ্রিকার সিংহ নিশ্চয়ই অধিকতর পরাক্রমশালী।

* * * *

চিকিৎসকগণের অভিমত—বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বত্রই নাকি নানারকম পেটের অসুখের প্রাবল্য দেখা দিয়াছে।—

"কাঁকর এবং তেঁতুল বীচি রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারত বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছেন এ অনুমান করা শক্ত নয়"—বলা বাহুল্য এ উক্তি খুড়োর।

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, সব চেয়ে ভালো আলুর চাষ কি করিয়া করা যায় তা নিয়া নাকি স্কটল্যাণ্ডে গবেষণা চলিতেছে।—অর্থাৎ আলুও বিশুদ্ধ "Scotch" মার্কা না হইলে চলিবে না। আমরা এখানে অবশ্য "বিশুদ্ধ" আলুরই পক্ষপাতী!!

* * * *

পণ্ডিত জওহরলালজীর জন্মদিনে মার্শাল স্টালিন তাঁর স্বকীয় ভাষায় যে অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া নাকি আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের অনেকেই কমিউনিজমটা ষোল আনা হজম করা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছেন। এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন বিশুখুড়ো সুতরাং বিশ্বাস করুন চাই না করুন!

বক্সা ক্যাম্প • অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

বক্সাতে আসিয়া একেবারে বোকা বনিয়া গেলাম, যেন কুয়ার ব্যাঙকে সমুদ্রে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থান, কাল পাত্র—সবগুলি মিলাইয়া এমনই একটা অবস্থা আমার সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইল যে, এর সামান্যতম অংশকে চেতনা দিয়া বেষ্টন বা আয়ত্ত করিতেই মন হাঁপাইয়া উঠিল, সেই যাকে বলে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলাম, ভদ্র ভাষায়—হতভম্ব অথবা হতবুদ্ধি হওয়া।

এতদিন ছিলাম জেলে, বড়জোর দশবারো জনে মিলিয়া বাসস্থানকে নরক বানাইয়া গুলজার করিবার চেষ্টাই শুধু করিয়াছি। যেন ছোট্ট একটি পরিবারের সীমাবদ্ধ ছোট্ট ডোবায় সাঁতার কাটিয়াছি, ঐটুকু জলেই হাবুডুবু পর্যন্ত খাইতে অসুবিধা বোধ করি নাই, এমনই ছিলাম।

কিন্তু এতো তা নয়। এখানে দেখি ইতিমধ্যেই শ'দেড়েক লোক হাজির রহিয়াছে এবং এখনও লোক আনিয়া সংখ্যা বাড়ানোই চলিতেছে। স্কুলে থাকিতে অঙ্ক কষিতে হইত —চৌবাচ্চার একটা পাইপ দিয়া জল আসে এবং আর একটা পাইপ দিয়া জল নিঃসরণ হয়। কিন্তু এখানে ভিতরে ঢুকিবার পাইপটাই আছে, বাহির হইবার পাইপটার কোন পাত্তাই পাইতেছি না। এরকম অঙ্ক যে জীবনে কষিতে হইবে, কই, তাতো স্কুলে বা কলেজে কোন শিক্ষকই শাসাইয়া দেয় নাই! পুরা জ্ঞান বোধ হয় কোন শিক্ষকই দেন না, কিছুটা হাতে রাখিয়া দেওয়াই তাঁহাদের অভ্যাস, অর্থাৎ ঠেকিয়া শিখিবার জন্যই আমাদের তাঁহারা অর্ধশিক্ষিত করিয়া পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়া থাকেন।

বাঙলাদেশের এমন জেলা নাই যেখান হইতে এই বকসা দুর্গে লোককে টানিয়া আনা না হইয়াছে। বিমূঢ় হইয়াই গেলাম, দেশে এত বিপ্লবীও ছিল! গোপনে গোপনে বিপ্লবের শাখা-প্রশাখা কী ভয়ানকভাবেই না প্রদেশের জেলায় জেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, একেবারে সর্বনাশের জালটাই ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল! আমরা যে এতখানি আগাইয়া গিয়াছিলাম, দেখিতেছি সে খবরটা আমরা নিজেরাই জানিতাম না। ঠাট্টা নয়, সত্যিই নিজেদের উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। নিজের চেহারা নিজের চোখে দেখিতে হইলে আয়নার আবশ্যক করে, সেই আয়নাটা এতদিনে পাইয়া গেলাম। আমাদের সম্বন্ধে ইংরেজের বিভীষিকাই সেই আয়না, তাতে আমাদের যে প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত দেখিলাম, তাহা প্রকৃতই আমাদের আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মশ্লাঘা বর্ধিত করিয়া দিল এবং তাহা আমার কাছে একটুও অযথা বা অযৌক্তিক বোধ হইল না। নিজের মূল্য নির্ধারণের বহু উপায়ই হয়তো আছে। কিন্তু অপরের ভয়-ভীতিও একটি প্রামাণ্য নিকষ-পাথর, যাতে আমরা আসল কি মেকি তাহা বেশ কষিয়া লওয়া চলে—ইহাই আমার বিশ্বাস।

১৯০৫ সালে একদিন বাঙলার মাটিতে ফাটল দেখা দিয়াছিল, সে ভাঙ্গা ফাটল অবশ্য জোড়া লাগিয়া আবার সেই আস্ত বাঙলাই হইল। কিন্তু মাঝখান হইতে একটা "কিন্তু" জন্ম লইল, সেই ফাটলের পথে বাঙলার মাটির গভীর গহ্বর হইতে একটা সাপ বাহির হইয়া আসিল দাঁতে বিষ ও ছোবল লইয়া। সে সাপ কোন লাঠিতেই মরিল না, —অবশ্য লাঠিও তখন পর্যন্ত ভাঙ্গে নাই, কিংবা গর্তে ফিরিয়া গিয়া কুণ্ডলীশয্যায় আবার ঘুমাইয়াও পড়িল না। সেই নাগিনীর ফনার ছত্রছায়ায় যে ইতিমধ্যে এতগুলি বিষাক্ত শিশু সাপ পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে ইহা কে ভাবিতে পারিয়াছিল! সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতাম, কি বিষ-স্তন্যে কোন্ নাগমাতা এদের পালন করিয়াছে তা কি এরা জানে! অধিকাংশ বন্দীই একে অপরের অপরিচিত, কিন্তু গোত্রে এদের মিল আছে, একই বিষবন্ধনে ইহারা গ্রথিত। তাই বন্ধনরজ্জুর একস্থানে টান পড়িলে সর্বত্রই আকর্ষণ সঞ্চারিত হয়। তাই একই বেড়াজালে জড়াইয়া ইহাদিগকে বন্দি-নিবাসের ডাঙ্গায় টানিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। গোপন অন্ধকারে যাহাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে আভাসে ইঙ্গিতে সজাগ হইয়াছি, আজ প্রকাশ্যে তাহারা একত্রিত হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যাটা যে এত বৃহৎ, ইহা এমনভাবে জানিবার বা অনুসন্ধান করিবার তেমন সুযোগ আমরা পূর্বে পাই নাই।

আমাদের এই সংখ্যাটা শেষ পর্যন্ত চার হাজার অবধি উঠিয়াছিল। আর যদি সর্বসাকুল্যে ধরা যায়, অর্থাৎ যাহাদের জেলে না আনিয়া লাল, সবুজ ইত্যাদি কার্ড দিয়া মার্কা মারিয়া বাহিরে চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যাটা যোগ করিলে আমরা প্রায় লাখ খানেকের কাছে গিয়া পৌঁছিতাম। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বকসা গিয়া দেখিলাম বিপ্লবীদের প্রায় পনর আনাই বাঙাল। বাঙলার বৃহত্তর ক্ষেত্রেও এই সংখ্যানুপাতই লক্ষিত হইবে। বাঙলার বিপ্লবীদের প্রায় পনর-আনা অংশই কেন পূর্ব বাঙলা হইতে আসিল, ইহার কারণ বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকের হাতে ছাড়িয়া দিলাম। আমি কেবল একটা তথ্যেরই ইঙ্গিত প্রসঙ্গতঃ করিয়া গেলাম।

স্থান, কাল, পাত্র লইয়াই নাকি ইতিহাস। অতএব স্থান সম্বন্ধে কিছু বলা অবশ্যই উচিত। স্থানশূন্য ঘটনা আর বৃন্তহীন পুষ্প প্রায় একই গোছের ব্যাপার। স্থানটিই বোঁটার মত ঘটনা ও ইতিহাসকে ধারণ করিয়া থাকে। আর সময় ও স্থান যে হরগৌরীর ন্যায় নিত্য-সম্বন্ধে যুক্ত, একথা শুধু দার্শনিকেই নয় বৈজ্ঞানিকেরাও বলিয়া থাকেন।

প্রথমেই কালের একটু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। গান্ধীজীর আইন অমান্যের কাল সেটা। অর্থাৎ ভারতবর্ষের তামাম আকাশ সেদিন আইন-অমান্যের ঘন মেঘে আবৃত। আর সে-আকাশের পূর্বদিগন্তে মাঝে মাঝে বিপ্লবী বিদ্যুতের খাড়ার ঝিলিক। এক কথায় বাঙলার আকাশে সেদিন মেঘ-বিদ্যুৎ-ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর প্রকাশ। এই দিনেই আমাদিগকে বক্সা দুর্গে আনিয়া মজুত করা হইয়াছিল।

অতঃপর স্থানের ক্ষেত্রে আসা যাইতেছে। তিনদিকে তিনটি পাহাড়, মাঝখানে এই বক্সা দুর্গ—পাথরে তৈরী। পূবে ও পশ্চিমে তিনটি ঝরণা। বাঙলা ও ভুটানের সীমান্তে ঘাঁটি রক্ষার জন্য স্থান-নির্বাচন ভালোই হইয়াছে। কিন্তু মন একটু সঙ্কুচিত হইয়া গেল। দূর হইতে যে হিমালয় দেখিয়াছিলাম, সে হিমালয় কোথায়? শিখরের পর শিখরশ্রেণী লইয়া যে হিমালয় চোখের সামনে ধরা দিয়াছিল, সে হিমালয় আড়াল হইয়া গেল। উত্তর-পশ্চিম-পূব তিনদিকের তিনটি পাহাড় দৃষ্টির পথ রোধ করিয়া দুর্লঙ্ঘ্য নিষেধের তর্জনীর মত খাড়া হইয়া রহিল।

এক খোলা ছিল দক্ষিণের দিকটা। এদিকে চোখের দৃষ্টি আকাশের শেষ সীমান্ত অবধি বাধাহীন মুক্তি পাইত। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইতাম—অসীম আকাশের তলে আমাদের বাঙলাদেশ। ভালোই হইয়াছে, তিনদিকে দৃষ্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় দেশের দিকে দৃষ্টি খোলা পাওয়া গেল। এতদিন ম্যাপে বাঙলাদেশ দেখিয়াছি, কিন্তু আজ বাঙলার শিয়রে দাঁড়াইয়া সমগ্র বাঙলাকে দেখিবার

সুযোগ পাইলাম। দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া সবটা একই সময়ে দেখা যায় না বটে, কিন্তু দিগ্বলয়ে যেখানে আকাশ ও মাটি মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে বাকী বাঙলা নেপথ্যেই অপেক্ষা করিতেছে, এ বোধ চেতনায় সব সময়েই থাকিত।

দক্ষিণের বিস্তীর্ণ প্রান্তর নানা রংয়ের ছবির পর ছবি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিত। এত রকম রংয়ের খেলা সেখানে দেখিতাম যে, চোখ ক্লান্তবোধ করিবার অবসরই পাইত না। মাঝে মাঝে সেখানে একটা নীলের প্রগাঢ় ছায়া এমনভাবে পড়িত যে, প্রান্তর বলিয়া চেনা যাইত না। অনেক সময় অনেকের ভুলও হইত। ভুলের একটা ঘটনা বলিতেছি।

ভোর হইয়াছে, কিন্তু কাক ডাকিতেছে না। কারণ বক্সাতে কোনদিন কাক দেখি নাই, অতএব তার ডাকও শুনি নাই। কাক ছিলনা, কিন্তু তাই বলিয়া পাখীর অভাব ছিল না, আকাশের আলোর অভ্যর্থনা তারাই তারস্বরে করিতেছিল। ঘড়ির কাঁটার হিসাবে দিন বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু আমাদের আকাশে সূর্য দেখা যাইতেছিল না, পূবের পাহাড়টা ভোরের সূর্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওটা ডিঙ্গাইয়া আসিতে প্রায় আটটা বাজাইয়া ফেলিবে।

নীচে বাথরুমে তখন বেশ ভিড়। যিনি একবার প্রবেশ করেন, সহজে বাহির হইতে চান না; দাঁতন, মুখ প্রক্ষালন ইত্যাদির ফাঁকে সঙ্গীত-চর্চাও অনেকেই করিতেছিলেন। বরাবর দেখিয়াছি বাথরুমেই আমাদের গানের গলা বেশ খুলিয়া যায়। বিশেষ করিয়া শীতকালে। ভুটিয়া কুলীরা পিঠে দুধের টিন, মাছ, আলুর বস্তা ইত্যাদি লইয়া দুর্গের পশ্চিম খিড়কীর দরজার পথে বাথরুমের গা ঘেঁষিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে, রান্নাঘরের সামনে মাল নামাইয়া রাখিতেছে, বাবুরাও দাঁতন হাতে টাওয়েল কাঁধে আশেপাশে ঘুরিতেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যে যাঁদের রুচি ও আকর্ষণ তাঁরা রান্নাঘরকে বাঁয়ে ও বাথরুমকে ডাইনে রক্ষা করিয়া আরও একটু দক্ষিণে নামিয়া গিয়া এবং দু'নম্বর ব্যারাককে আরও নীচে সম্মুখভাগে রক্ষা করিয়া দৃষ্টির লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান আছেন—সম্মুখে বাঙলার সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তর। কিন্তু প্রান্তর বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। দীর্ঘ বন ও তার কিনারা হইতে সুরু হওয়া বিস্তৃত ভূভাগ কি এক রকম রংয়ে একাকার হইয়া গিয়াছে। এমনকি দূরের চা-বাগানের বাড়িগুলি পর্যন্ত ঐ রংয়ে ডুব মারিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সমস্তটা ছবির উপর প্রগাঢ় একটা নীলের ছোপ লাগিয়াছে।

বীরেনদা (চাটার্জি) কিছুক্ষণ ভুটিয়াদের সঙ্গে তাঁর স্বরচিত ভুটিয়া ভাষায় অনর্গল আলাপে ভুটিয়া বাহিনীকে অবাক ও বাবু-বাহিনীকে হাস্যমুখর করিয়া সবেমাত্র সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল চট্টগ্রামের অল্পবয়স্ক একটি ছেলে নাম শশাঙ্ক। গত কালই তারা ক্যাম্পে আসিয়াছে। এই তাদের বক্সাতে প্রথম ভোর।

বীরেনদা শশাঙ্কের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"বে অফ বেঙ্গল।"

ছেলেটি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল্লেন?"

—"বঙ্গোপসাগর দেখা যাচ্ছে।"

—"বঙ্গোপসাগর? এখান থেকে?"

—"কম উঁচুতে তো উঠিনি। দূরবীণ হলে আরও পরিষ্কার বোঝা যেত, ঢেউ পর্যন্ত দেখতে পারতে।"

অবাক হইয়া কহিল—"বে-অব-বেঙ্গলের কোন সাইড এটা? চাটিগা, না মেদিনীপুর?"

বীরেনদা কহিলেন, "না, চাটিগার দিক নয়, এটা ডায়মণ্ডহারবারের সাইড।।"

শশাঙ্ক দৌড়াইয়া উপরে উঠিয়া গেল, বন্ধুদের ডাকিয়া আনিল সাগর দেখাইবার জন্য। শশাঙ্ক চলিয়া যাইতেই আশেপাশের যাঁরা কোনমতে এতক্ষণ হাসি চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁরা চাপা হাসিকে বাঁধমুক্ত করিয়া দিলেন।

ক্ষিতীশ বানার্জী মোটা ভুঁড়ি ও মোটা গোঁফ লইয়া আগাইয়া আসিলেন, মহারাজকে (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী) কহিলেন—"শুনলেন কথা? জিওগ্রাফি শেখাচ্ছেন।"

মহারাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"পট্টিপাট্টা কমিটির প্রেসিডেন্ট যে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পট্টিপাট্টা কমিটির সেক্রেটারী নৃপেন মজুমদার ও তাঁর সহযোগী-দের মুখে মুখে প্রচারিত বুলেটিনে সংবাদটা ব্যারাকে ব্যারাকে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। শশাঙ্ক দক্ষিণের প্রান্তরে নীল রং দেখিয়া বয়স্ক ও শ্রদ্ধেয় বীরেনদাকে বিশ্বাস করিয়াছিল, এজন্য বেচারা কয়েকদিন লজ্জিত হইয়াই ছিল।

প্রান্তরে যে শুধু নীল রংয়েরই খেলা হইত, তা নয়। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যত রং আছে, একে একে সবগুলিই সে সারাদিনের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঐ ভূভাগের উপর বুলাইয়া দিত। সবচেয়ে ভালো লাগিত, যখন সারি সারি ঢেউয়ের মত মেঘ স্তরে স্তরে উপরে উঠিয়া আসিত নানারংয়ের পোষাক পরিয়া। সে মেঘকে দেশে থাকিতে উপরের দিকে মাথা তুলিয়া বহু ঊর্ধ্বে আকাশে দেখিতে হইত, সেই মেঘেরাই আমাদের গা ঠেলিয়া চলিয়াছে, প্রথমটা তো রোমাঞ্চই লাগিয়া গিয়াছিল।

স্থান সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বকসাতে বৃষ্টির কেমন ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল না, যখন খুশী তখনই নামিয়া আসিত। বর্ষাকালে তো বর্ষণের আর বিশ্রামই ছিল না, সমস্ত পাহাড় ও তার বনভূমি দিনরাত্র ধারাস্নানে ভিজিয়া সিক্ত হইত। ঝরণার চীৎকার ও গর্জন ব্যারাক হইতেই তখন স্পষ্ট শোনা যাইত। এখানে এত মেঘ, এত বর্ষণ—কতবার ভাবিয়াছি যে, এত অপব্যয় ও অপচয় এখানে, অথচ মরুভূমি পিপাসায় দগ্ধ হইয়া মরিলেও এক ফোঁটা জল পায় না। বিশ্ব-প্রকৃতি যে স্বভাবে বেহিসেবী, এ সম্বন্ধে আর আমাদের মনে কোন সন্দেহই ছিল না।

অধুনা পাত্রের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া যাইতেছে। প্রথমেই বকসা ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্টের বিষয় উল্লেখ করা কর্তব্য। যদিও মিঃ ফিনী দুর্গের কমাণ্ডাণ্ট, জাতে কিন্তু তিনি মিলিটারী নন। বাঙলা পুলিশের পদস্থ কর্মচারী, ইঁহার গুণবত্তা ও দক্ষতায় বাঙলা সরকার আস্থা রাখিতেন, বক্সা ক্যাম্প খোলার ভার দিয়া তাঁকে পাঠানো হয় এবং প্রথম বছর দেড়েক মিঃ ফিনীই ক্যাম্পের কমাণ্ড্যাণ্টও ছিলেন। শুনিয়া বিস্মিত হউন যে, পুলিশ কর্মচারী ফিনী সাহেবের অধীনে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন একজন সাহেব আই সি এস দুর্গের সহকারী কমাণ্ডাণ্টরূপে। ইহা হইতেই ফিনী সাহেবের দক্ষতা অনুমান আপনারা করিয়া লইতে পারিবেন। বয়সও তেমন বেশী নহে, সাতাশ-আটাশ হইবে। এক কথায় ফিনী সাহেব ছিলেন আস্ত একটি ঘুঘু এবং তেমনি মাথা-ঠাণ্ডা মানুষ।

গেটেই অর্থাৎ ক্যাম্পের অফিসেই সাহেবের একটু পরিচয় পাইয়া গেলাম। তখনও ক্যাম্পের ভিতর আমরা ঢুকিতে পারি নাই, কুলীরা মালপত্র নামাইয়া রাখিয়াছে, আমরা অফিসের ব্যারাকের বারান্দায় একে একে চৌদ্দজনই আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছি, উত্তর দিকের গেট দিয়া দুইটি বৃহদাকার বাদামী রংয়ের কুকুর আসিয়া ক্যাম্পের আস্তানার মধ্যে প্রবেশ করিল। সিপাই শান্ত্রী ও অফিসের বাবুদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। বুঝিলাম যে, কুকুরের প্রভু পশ্চাতে আসিতেছেন এবং তিনি ইহাদেরও প্রভু। ছড়ি হাতে, পাইপ মুখে, টুপি মাথায় ফিনী সাহেব প্রবেশ করিলেন, পিছনে ফাইল বগলে সাহেবের গুর্খা বেয়ারা। সাহেব গট্‌গট করিয়া বারান্দা ধরিয়া আগাইয়া গেলেন, যাইবার পথে একবার অপাঙ্গের তির্যক দৃষ্টিতে আমাদিগকে ছুঁইয়া গেলেন। একেবারে শেষ প্রান্তে পূবের কামরায় গিয়া তিনি প্রবেশ করিলেন এবং অদৃশ্য হইলেন। লোকজনের হাবভাব এবং প্রভুর গাম্ভীর্য দর্শনে আমরাও বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম। ঐ যাকে বলে ঘাবড়াইয়া যাওয়া, তাই।

শরৎবাবু ফেউয়ের মত অথবা জোঁকের মত আমার সঙ্গে লাগিয়াই থাকিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাটাটা কে?"

তখন শুনিয়া পুলকিত হইলাম। কহিলাম, "আস্তে, কেউ শুনে ফেলবে?"

এমন সময়ে বেঁটে খাটো এক ভদ্রলোক এক গাল সাদাকালো দাঁড়ি লইয়া পাশের একটা ঘর হইতে নির্গত হইয়া আসিলেন এবং আমাদের সম্মুখ দিয়া সাহেবের কামরার অভিমুখে হেলিতে দুলিতে আগাইয়া চলিলেন।

ডাকিয়া কহিলাম—"মশায়, সাহেবটি কে?"

মহাশয় থামিয়া দাঁড়াইলেন এবং উত্তর দিলেন—"থাকলেই চিনতে পারবেন।" বলিয়া চোখটাকে কুৎ-কুৎ করিয়া নাচাইয়া লইলেন।

যেটুকু ঘাই দিলেন, তাতেই বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি গভীর জলের মৎস। এ অনুমান পরে নানাভাবেই সমর্থিত হইয়াছিল।

রসিকতাকে আমল না দিয়াই বলিলাম—"কমান্ডাণ্ট বুঝি?"

—"চিনতে পেরেছেন দেখছি। হাঁ, কমান্ডাণ্ট মিঃ ফিনী।"

—"কর্নেল?"

চোখের দৃষ্টিটাকে স্থির রাখিয়া ভদ্রলোক তাঁর ভাঙ্গা গলায় বলিলেন,—"কর্নেল কি বলছেন, চৌদ্দ পুরুষে কেউ মিলিটারীতে যায়নি। পাদ্রীর পুত্র।" বলিয়া তিনি আগাইয়া গেলেন।

শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কেমন বুঝছেন?"

শরৎবাবু দার্শনিক ঔদাসীন্যে জবাব দিলেন—"শালগ্রামের আবার শোয়াবসা।" অর্থাৎ, আমাদের আবার ব্যাপার অব্যাপার কি, সর্বাবস্থাই সমান।

—"যিনি গেলেন তাঁকে কেমন মনে হোল?"

—"কাকে?"

—"ঐ দাড়িকে।"

শরৎবাবু ভাবিতে সময় না লইয়াই সুচিন্তিত অভিমত দিলেন—"আস্ত একটি শয়তান।"

আমি সংশোধন করিয়া বলিলাম—"না, মহর্ষি ব্যক্তি।"

পরে কিন্তু ক্যাম্পে ইনি এই নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। জাতে ব্রাহ্ম, তদুপরি একগাল দাড়ি, তাই আমরা বলিতাম—মহর্ষি জগদীশচন্দ্র (কর)। স্বভাবটিও প্রায় ঋষিতুল্য ছিল। পূর্বে শিয়ালদহ পুলিশের ডেপুটি সুপার ছিলেন, বক্সাতে সাহেবের অন্যতম এসিস্ট্যান্ট ও দক্ষিণ হস্তরূপে তিনি আগমন করেন। ক্যাম্পে ঢুকিলে তিনি আকণ্ঠ আহার না করিয়া কোনদিন বাহির হইতেন না। খাদ্যে তাঁর আসক্তিটা নির্বিকারই ছিল, কোনদিনই তা বিকারপ্রাপ্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। আর বৃদ্ধির কথা তো উঠেই না, কারণ আসক্তিটা তিনি তুঙ্গেই উঠাইয়া লইয়াছিলেন, উন্নতির আর অবকাশ ছিল না। ভালো মাছ, ফল, তরিতরকারী আসিলে মহর্ষি তাঁর বালক পুত্রদের পাঠাইতেন, তাহারা আমাদের ম্যানেজারের হাতে কখনও একটুকুরা চিঠি দিত, অথবা কানে কানে বক্তব্য পেশ করিত। যাইবার সময় মাছের মুড়া, পাঁঠার ঠ্যাং, ফলমূল তরিতরকারী লইয়া হৃষ্টচিত্তে কোয়ার্টারে প্রত্যাবর্তন করিত। শুধু কি কেবল খাদ্যদ্রব্য? তেল, সাবান, জামা, কাপড় অর্থাৎ সংসারী মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কোন বস্তুতেই মহর্ষির অনাসক্তি ছিল না। ঐ একই পদ্ধতিতে তাহা তিনি সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন।

বারান্দায় অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল। চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম যে, মহর্ষি, আমাদের গার্ডিয়ান নিস্পেক্টর কয়টি, বেয়ারা ইত্যাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া পাদ্রীর তনয় বক্সা ফোর্টের কমান্ডাণ্ট আমাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন।

পাইপটা মুখ হইতে সরাইয়া তিনি হাতে লইলেন এবং মহর্ষির দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"জগদীশবাবু, এদের ভিতরে পাঠিয়ে দিন। মালপত্র পরে সার্চ করা যাবে।"

মহর্ষি কহিলেন—"এ'রা তো চোদ্দজন, কোন নম্বরে পাঠাব?"

সাহেব জবাব দিলেন—"পাঁচ নম্বরেই পাঠিয়ে দিন।"

জেলে কোন নূতন আগন্তুক আসিলে অথবা আমরা এক জেল হইতে অন্য জেলে বদলী হইলে জেল কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া দায়মুক্ত হইতেন। জেলের বন্ধুরাই কে কোথায় থাকিবে তার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ফলে কাহাকেও ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত অসুবিধায় ছটফট করিতে হইত না, আপন আপন বন্ধুদের বা চেনা লোকের পাশে থাকিবার সুযোগ সকলেই পাইত। কিন্তু এখানে দেখিতেছি বিপরীত ব্যবস্থা।

সুতরাং সবিনয় নিবেদন করিলাম, "আমাদের ভিতরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন, কে কোন নম্বরে থাকবেন, আমরাই ঠিক করে নেব।"

সাহেব বলিলেন—"নো, তা হবে না। কে কোন সীটে থাকবে, আমিই ঠিক করে দেই।"

বেশ, তাই সই,—হুজুরের যেমন আজ্ঞা। একবার ভিতরে যাইতো, তারপর আমরাও আছি, আর হুজুরের ঠিক করাও আছে। বলা বাহুল্য কিছুদিনের মধ্যে সাহেবের সমস্ত ঠিক করা ওলট পালট করিয়া আমরা আমাদের সুবিধা ও ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলাম।

ফিনী সাহেব এর পূর্বে রাজনৈতিক বন্দীদের লইয়া কারবার করেন নাই, এ বিষয়ে তাঁর কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, এ গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বক্সা ফোর্টের কমান্ডাণ্টরূপে নিজেকে আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলিয়াই প্রথমটা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই আমাদের প্রথম অনুরোধের উত্তরে তিনি সাফ জবাব দিয়া বসিলেন,—"নো, তা হইবে না।"

এই নো-কে ইয়েস করিতে আমাদেরও কিছু তেলনুন খরচ করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ, ফিনী সাহেবকেও ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছিল এবং তাকে আমরা ঠিক করিয়াই আনিয়াছিলাম।

ফিনী সাহেবের ঠেকিয়া শিক্ষার অভিজ্ঞতা বলিতে গেলে প্রায় ক্যাম্প খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়। আরম্ভটা এইরূপ—

দিন পনর আগে বন্দীদের প্রথম দল প্রেসিডেন্সী জেল হইতে এখানে চালান হইয়া আসেন। শ্রান্ত দেহে ও ঘর্মাক্ত কলেবরে এই দল ফোর্টে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুপুরের রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। 'আসুন' বলিয়া অভ্যর্থনার কথা থাক, কিন্তু কি করিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে ইত্যাদি সমস্যা হইতে মুক্ত করিবার জন্যও কেহ আগাইয়া আসিল না। পাহাড় ভাঙিয়া সাত মাইল পথ আসিতে সকলেরই অবস্থা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। বাবুরা অস্থির হইয়া উঠিলেন।

কেরানী গোছের এক ভদ্রলোক বাহির হইতে আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন এবং ভিতরের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেছিলেন। একজন তাঁকে ডাকিয়া থামাইলেন—"শুনুন তো।"

ভদ্রলোক ফিরিয়া তাকাইলেন, বলিলেন—"বলুন।"

—"আপনি অফিসের লোক?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। বক্তা পুনরায় বলিলেন, "আমাদের কি করবেন, সত্বর করে ফেলতে বলুন। আমরা আর দাঁড়াতে পারছিনে।"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—"আপনারা সাহেবের কাছে যান।"

"কোন্ সাহেব?"

উত্তর হইল, "ফোর্টের কমান্ডাণ্ট।"

কমান্ডাণ্ট শব্দটা প্রায় কামানের আওয়াজের মত শুনাইল। ফোর্ট কমান্ডাণ্ট, সিপাই-শান্ত্রী সব মিলিয়া অবস্থাটা ঘোরালো হইয়া উঠিল। দুপুরের রৌদ্রে দাঁড়াইয়া সকলেই পলকের জন্য একবার বিভীষিকা দেখিয়া লইল।

ভূপতিদা (পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী) সিগারেট মুখে এতক্ষণ এই প্রশ্নোত্তর নীরবে শুনিয়া যাইতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাপুরুষটি আছেন কোন ঘরে?'

বচনের ভঙ্গী ও উচ্চারণে ভদ্রলোক ঘাড় ফিরাইলেন। অর্থাৎ "কে বট হে"—স্টাইলে বেঁটেখাটো বক্তাটিকে একবার আপাদমস্তক চাক্ষুষ সার্ভে করিয়া লইলেন। পরে চোখের ইঙ্গিতে ব্যারাকের শেষপ্রান্তের ঘরটি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ যে আর্দালী বসে আছে, ঐ ঘর।"

"এসহে, সাহেবের সঙ্গ করে আসা যাক," বলিয়া ভূপতিদা আগাইয়া চলিলেন, জনতিনেক তাঁর সঙ্গ লইলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই দেখা গেল লালমুখো এক সাহেব মুখে পাইপ এবং হাতে একটা লালনীল পেন্সিল লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া কাজ করিতেছেন। পায়ের শব্দে তিনি ঘাড় তুলিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ভূপতিদা বলিলেন, "গুড্ আফটারনুন।"

সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে অস্ফুট 'টানুন' কোন-মতে সাহেবের কণ্ঠনালী হইতে নাসাপথে নির্গত হইল, ভালো করিয়া শোনাও গেল না। মনে হইল, চিড়বিড় করিয়া বোধ হয় একটা অশ্রাব্য গালিই উচ্চারণ করিলেন।

কোন ভদ্রতা নাই, বসিবার জন্য অনুরোধ নাই, এক কথায় সাহেবটি নির্জ্জলা একটি চাষা। তিনখানা চেয়ার ছিল, ভূপতিদা সঙ্গীদের বলিলেন, "বসে পড়।" তিনজন তিনখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, সাহেব চুপ করিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন।

দেখা তাঁর আরও একটু বাকী ছিল। ভূপতিদা তখনও দাঁড়াইয়া আছেন, তবু আর্দালী ডাকিয়া আর একখানি 'কুরসী' আনিবার কথা পর্যন্ত তিনি বলিলেন না। তখন ভূপতি মজুমদার সাহেবের টেবিলের উপর চাড়িয়া বসিলেন এবং বাম পায়ের উপর দক্ষিণ পদ তুলিয়া হাফ-পদ্মাসন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মিনিটখানেকের মধ্যে এইটুকু ঘটিয়া গেল। সাহেব এতটার জন্য নিশ্চয় প্রস্তুত ছিলেন না। লালমুখ আরও লাল হইল, চোখ হইতে রোষাগ্নি নির্গত হইল, নাসারন্ধ্র বুলডগের মত স্ফীত হইল এবং মুখ হইতে পাইপটা ডান হাতে স্থান লাভ করিল।

অতঃপর সাহেব আওয়াজ ছাড়িলেন, "টেবিলে বসলে যে ?"

পদ্মাসনে আসীন ব্যক্তি উত্তর দিলেন, "কারণ ঘরে বসবার মত আর চেয়ার নেই।"

—"তাই বলে তুমি টেবিলে উঠে বসবে। ?"

উত্তর হইল, "তবে কি তোমাকে খুশী করবার জন্য ঘোড়ার মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাকব ?"

সাহেবের ধৈর্য এতক্ষণে চ্যুত হইল। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিয়া চাপাকণ্ঠে গর্জন করিলেন, —"জান, আমি ফোর্টের কমান্ডাণ্ট ?"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর হইল—"Oh, you are the little Czar of this Buxa Fort ?" যেন সংবাদ শুনিয়া ভূপতিদা আহ্লাদে আটখানা হইয়া গিয়াছেন, এমনি গদগদ কণ্ঠ।

উত্তর শুনিয়া সাহেব প্রায় ক্যাবলার মত হইয়া গেলেন। তাঁকে সামলাইয়া লইবার সুযোগ না দিয়াই ভূপতিদা কহিলেন— "লুক হিয়ার, শোন, তোমার সঙ্গে সময় নষ্ট করবার মত মেজাজ বা অবস্থা কোনটাই আপাততঃ আমাদের নেই। আমাদের এখন ভেতরে পাঠিয়ে দেও। আমরা অতিশয় শ্রান্ত, আমাদের বিশ্রাম দরকার। তোমার আইনকানুনের হাঙ্গামাগুলো তুমি পরে কর, ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে পরে বোঝপড়াও তুমি করতে পার। কিন্তু এখন ভালো মানুষের মত আমাদের ভিতরে পাঠাবার কষ্টটুকু তুমি স্বীকার কর।"

একটির পর একটি এই রকমের এবং আরও অন্যান্য রকমের অনেকগুলি ঢেউয়ের ধাক্কায় বকসা ফোর্টের কমান্ডাণ্ট সাহেবের মেজাজ ঔদ্ধত্য ও বজ্জাতির রুক্ষ কাঠিন্যটুকু মসৃণ করিয়া লওয়ার পর তবে ক্যাম্পের বন্দি-দের সঙ্গে কমান্ডাণ্টের একটা সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েকজনের সঙ্গে তো তাঁর বন্ধুত্ব পর্যন্ত হইয়া গিয়াছিল ?

(ক্রমশঃ)

চোখ

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

ঘুমাতে পারি না, শত শত চোখ জ্বলে,
দেয়ালে দেয়ালে হাজার হাজার চোখ।
জলে ও পাথরে চকমকি চোখে আগুন
আঁধারে জ্বলে।
মুখ নেই শুধু চোখ,
দুয়ে-দুয়ে মিলে থরোথরো, স্থির, উধাও।
কি চাও, তোমরা কি চাও?

কখনো জল, কখনো আগুন, কখনো পাথর
মণি কাঁপে থরোথর।
নারী ও নরের, আশা ও ভয়ের চোখ,
চোখের উপর আগুনের অক্ষর,
বিদ্যুতে যেন ভাস্বর মেঘলোক।

মনে হয় যেন আমি তোমাদের চিনি।
চেতনার বড় আয়নার কাছে এসে
কান্নার চোখে যেদিন নিজেকে চিনলে,
যে-দিন বেরোলে রাজপথে, ময়দানে,
গুহার উনুন, অফিসের খোপ ছেড়ে,
সেদিন প্রথম চিনলাম।

মিছিলের পরে ঝাঁক ঝাঁক যবে বুলেট,
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী, সেদিন রক্ত-ঝরা,
মুদিত চোখের আলোক নেভেনি যেন,
বিধবার চোখে কালবৈশাখ যেদিন,
সেদিন যে-চোখ দেখলাম।

কী চাও, তোমরা কী চাও!
থরোথরো, স্থির, বিদ্যুৎ, মাঝে-উধাও,
চোখের মিছিল আকাশ-তারার মত,
বিদ্যুতে যেন ভাস্বর মেঘলোক।
তোমাদের ঐ বোবা মিছিলের কথা
শুনতে দাও।

স্কুল মিস্ট্রেস

শেকভ

সাড়ে আটটার সময় ওরা গাড়িতে যাত্রা করল শহরের দিকে। শুকনো বাঁধান রাস্তা। এপ্রিলের মনোরম সূর্য স্নিগ্ধ কিরণ ছড়াচ্ছে। বনে ও ডোবায় তখনও বরফ জমে রয়েছে। এখনও দীর্ঘ, শোভাহীন, বিশ্রী শীত শেষ হয় নি। সহসা এর মাঝে বসন্ত এসে দেখা দিল। তবু ম্যারিয়া ভ্যাসিলিয়েভনার কাছে এই কোমল উষ্ণতা, বসন্তের স্পর্শে শিহরিত ঝিমিয়ে পড়া স্বচ্ছ বন, হ্রদের মত বিরাট জলাশয়ের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখীর দল, অপূর্ব, অন্তহীন আকাশ, যার গভীরে সানন্দে প্রবেশ করতে সাধ হয় সকলের—এ সব কিছুই নতুনের সন্ধান দিল না বা তার মনে খুশী জাগিয়েও তুলল না। সে গাড়ির মধ্যে বসেছিল। তের বছর ধরে সে স্কুল-মাস্টারী করছে। এই তের বছরের মধ্যে সে কতবার এই পথ দিয়ে শহরে গেছে মাইনে আনতে কে তার হিসেব রাখে। আর যতবার সে এই পথে গেছে—তা সে বসন্তেই হোক অথবা শরতের বৃষ্টিমুখরিত সন্ধ্যায়ই হোক অথবা শীতে—সবই তার কাছে সমান। পথে যেতে যেতে এই কামনাই শুধু সে করত, তার যাত্রাপথ যত তাড়াতাড়ি হয় শেষ হোক।

তার মনে হ'ল সে যেন যুগ যুগ ধরে সেই অঞ্চলে বাস করছে। শহর থেকে স্কুলে যাবার এই পথটির প্রতিটি পাথর, প্রতিটি গাছ তার যেন চেনা। তার অতীত কেটেছে এখানে, বর্তমান এখানেই কাটছে। সে কল্পনায় দেখত স্কুল ছাড়া তার আর অন্য কোন ভবিষ্যৎ নেই। সেই শহরে যাবার রাস্তা; সেখান থেকে ফিরে আসা, আবার স্কুল, আবার রাস্তা............।

স্কুলে পড়াতে আসার আগে—তার অতীত জীবনের কথা প্রায় ভুলেই গেছে সে; ভাবনায়ও আনতে পারে না এখন। কোন একদিন তার বাবা ছিল, মাও ছিল। তারা সবাই মস্কোর রেড গেটে একটা বড় ফ্লাটে থাকত। সেই বিগত জীবনের দিনগুলো তার স্মৃতির সাথে অস্পষ্ট, তরলভাবে জড়িয়ে রয়েছে স্বপ্নের মত। যখন তার বয়েস দশ বছর, তার বাবা মারা গেল। কিছুদিন পর তার মা-ও। তার একটি ভাই ছিল বড় চাকুরে। প্রথমে তারা পরস্পরকে চিঠিপত্র লিখত। ক্রমে তার ভাই উত্তর দেওয়া বন্ধ করল। তার পুরনো সামগ্রীর মধ্যে ছিল তার মায়ের একখানা ফোটো। স্কুলঘরের স্যাঁৎ-স্যাঁতে আবহাওয়ায় সেখানা ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে। এখন তার চুল আর কালো ভুরু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

দু'মাইল এগিয়ে যাবার পর গাড়ির চালক সেমিয়ন ঘুরে বললে,

"ওরা শহরে একজন সরকারী কর্মচারীকে ধরেছে। তাকে ওরা নিয়ে গেছে। সবাই বলছে, সে নাকি কতকগুলো জার্মানের সহায়তায় মেয়র আলেক্সিয়েভকে হত্যা করেছে।"

"কে বললে তোমায়?"

"ওরা সবাই আইভান আইনভের সরাই-খানায় বসে কাগজে পড়ছিল।"

আবার দুজনে অনেকক্ষণ নীরব রইল। ম্যারিয়া ভ্যাসিলিয়েভনা আবার স্কুলের কথা ভাবতে লাগল—এগিয়ে আসা পরীক্ষার কথা, যে মেয়ে ও চারটি ছেলেকে পরীক্ষা দিতে পাঠাবে তাদের কথা। যখন সে পরীক্ষার কথা ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে তার প্রতিবেশী জমিদার হ্যানভের চার-ঘোড়ার গাড়ি এসে তার গাড়িকে ধরে ফেল্ল। এই ভদ্রলোকটিই গেল বছরে তার স্কুলের পরীক্ষক ছিল। দুখানা গাড়ি পাশাপাশি এসে পড়তেই ম্যারিয়া তাকে চিনতে পেরে অভিবাদন করল।

"সুপ্রভাত," হ্যানভ প্রত্যভিবাদন করে বলল, "তুমি বোধ করি বাসায় ফিরছ।"

হ্যানভের বয়েস চল্লিশ। সাম্যভাব। মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। বার্ধক্য সবে নেমে আসতে শুরু করেছে তার দেহে। তবু এখনও তাকে সুন্দর দেখায়; মেয়েরা তার প্রশংসা করে। সে তার প্রকাণ্ড বাড়িতে একা থাকে। কোন চাকরী-বাকরী করে না। সবাই বলে, বাড়িতে তার কোন কাজ নেই। শুধু শিষ দিয়ে এধার ওধার পায়চারী করে অথবা চাকরের সঙ্গে বসে দাবা খেলে। আরও শোনা যায়, সে ভীষণ মদ খায়। গত বছরে পরীক্ষার সময় সে যে প্রশ্নপত্রগুলো এনেছিল, তা থেকে পর্যন্ত মদ আর আতরের গন্ধ। পরীক্ষার সময় সে আগাগোড়া নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে এসেছিল। ম্যারিয়ার তাকে বড় সুন্দর মনে হয়েছিল আর যতক্ষণ তার পাশে সে বসেছিল, লজ্জায় ও সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হয়ে ছিল। কড়া অথচ বিবেচক পরীক্ষক সে অনেক দেখেছে। অথচ এই লোকটি যার বাইবেলের একটা লাইনও মনে নেই, কি প্রশ্ন করবে নিজেই জানে না। কিন্তু অতি ভদ্র ও কোমলহৃদয়—এরকম পরীক্ষক ত সে কোনদিন দেখে নি। এ শুধু জানে বেশী বেশী নম্বর দিতে।

"আমি বার্কভিস্টের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি," সে ম্যারিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, "কিন্তু শুনছি সে নাকি বাড়ি নেই।"

তারা বড় রাস্তা ছেড়ে গ্রামের দিকে একটা ছোট কাঁচা রাস্তায় গিয়ে পড়ল। হ্যানভ আগে আগে যাচ্ছিল, সেমিয়ন পেছনে। হ্যানভের গাড়ির চারটি ঘোড়া মন্থরগতিতে চলেছে কাদার মধ্য দিয়ে সেই ভারী গাড়িখানা কষ্টে টেনে নিয়ে। সেমিয়ন খালি এধার-ওধার করছিল। কখনও তার গাড়ি একেবারে রাস্তার কিনারা ঘেঁসে চলছিল, কখনও বরফস্তূপের মধ্য দিয়ে আবার কখনও বা জলপূর্ণ খাদের ভেতর দিয়ে। তাকে মাঝে মাঝেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে হচ্ছিল ঘোড়াগুলোকে সাহায্য করবার জন্য। ম্যারিয়া তখনও স্কুলের কথা ভাবছে,—অঙ্কের প্রশ্নটা সোজা হবে না কঠিন। সে জেমস্‌ভো বোর্ডের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। আগের দিন সেখানে গিয়ে কাউকে পায় নি। এ কি রকম অব্যবস্থা! আজ দু'বছর ধরে দরোয়ানটাকে বরখাস্ত করার জন্য এখানে বলেছে। লোকটা কিছুই করে না, তার সাথে অভদ্র ব্যবহার করে, ছেলেগুলোকে ধরে ঠেঙায়। কিন্তু কারো এদিকে নজর নেই। প্রেসিডেণ্টকে ত অফিসে পাওয়াই যায় না। যদি-বা দেখা হল, তিনি ব্যাকুল মিনতি করে বলবেন, তাঁর এক-মুহূর্তও সময় নেই। ইন্সপেক্টর সাহেব তিন বছরে একবার স্কুল পরিদর্শন করেন। স্কুলের কাজ সম্বন্ধে তিনি একটি নিরেট। আর জানবেনই বা কোথা থেকে। তিনি কাজ করতেন আবগারী শুল্ক বিভাগে, আর ইন্সপেক্টরের পদ পেয়েছিলেন তদবিরের জোরে। স্কুল কাউন্সিলের মিটিং হ'ত কালেভদ্রে, কিন্তু কোথায় যে হ'ত, তা কেউ জানত না। স্কুলের কর্তা একটি প্রায় নিরক্ষর চাষা। এক চামড়ার কারখানার তিনি প্রধান। একটা অসভ্য বর্বর। তিনিই আবার দরোয়ানটির প্রাণের বন্ধু। সে ত ভেবেই পায় না, এমন হলে কার কাছে সে তার অভিযোগ জানাবে, আর কার কাছেই বা উপদেশ চাইবে।

হ্যানভের দিকে চেয়ে সে ভাবল, "সত্যিই সুন্দর!"

তারা ক্রমশ আরো খারাপ রাস্তায় এসে পড়ল.........। বনের মধ্য দিয়ে তারা চলেছে।

রাস্তা এত অপরিসর যে, গাড়ি ঘোরান অসম্ভব। চাকাগুলো কাদার মধ্যে গেড়ে বসছে। ছপ্ ছপ্ করে জল ছিটকে উঠে সবাইকে ভিজিয়ে দিল। গাছের ছোট ছোট সতেজ শাখাগুলোর আঘাত এসে লাগতে লাগল মুখে চোখে।

"কি বিশ্রী রাস্তা!" বলে হ্যানভ একটু হাসল।

স্কুল-মিস্ট্রেস তার দিকে ফিরে তাকাল। সে ভেবে পায় না, কেন এই অদ্ভুত লোকটি এখানে বাস করে। তার অর্থ, তার সুন্দর চেহারা, তার পরিচ্ছন্ন চালচলন এ সব নিয়ে সে এই কাদার মধ্যে, এই নির্জন, নিরানন্দ, পান্ডববর্জিত জায়গায় কি করে? জীবনের কাছে তার বিশেষ কোন দাবী নেই। এখানে সেই সেমিয়নের মতই বীভৎস রাস্তায় তারই মত শত অসুবিধা সহ্য করে গাড়ি চালাচ্ছে মন্দ গতিতে। ঠোক্কর খাচ্ছে প্রতি পদে। পিটার্সবার্গ অথবা বাইরে আরও কোন ভাল জায়গায় ইচ্ছে করলেই যে থাকতে পারে সে এখানে থাকে কেন? অনেকেই ভাবতে পারে তার মত বড়লোক ইচ্ছে করলে এই বিশ্রী রাস্তার পরিবর্তে একটা ভাল রাস্তা তৈরী করিয়ে দিতে পারে। তা হলে আর রাস্তার এই দুঃখভোগ করতে হয় না আর তার গাড়োয়ান ও সেমিয়নের মুখে এতখানি নিঃসহায়তার চিহ্নও ফুটে ওঠে না। কিন্তু এ সব কথা তার মনেও আসে না। সে শুধু হাসতে লাগল যেন কিছুই হয়নি। এর চাইতে ভাল জীবন যেন সে চায় না। যেমন পরীক্ষা নিতে গেলেও বাইবেলের একটা লাইনও তার মনে ছিল না, তেমনি সাধারণ জীবন সম্বন্ধে এই হৃদয়বান, কোমলস্বভাব, সপ্রতিভ লোকটির কোন ধারণা নেই। স্কুলের জন্য সে এক পয়সা চাঁদা দেয় না, গ্লোব কিনতে টাকা দেয়। আন্তরিকভাবেই সে নিজেকে জনশিক্ষার উন্নতিসাধনের একজন মস্তবড় কর্মী বলে মনে করে। জনশিক্ষা বিস্তারে এই গ্লোব কি কাজে আসবে!

"সাবধান, ভ্যাসিলিয়েভনা, সাবধান!" সেমিয়ন চীৎকার করে উঠল।

গাড়িখানা ভীষণ ধাক্কা খেয়ে উল্টে যাবার যোগাড় হোল। একটা কি যেন ভারী বস্তু ভ্যাসিলিয়েভনার পায়ের কাছে গাড়িয়ে পড়ল—তার সদ্য কেনা জিনিসগুলোর প্যাকেটটাই ত। এর পরই শুরু হবে কর্দমাক্ত খাড়া রাস্তা ছোট পাহাড়ের ওপরে। ছোট নদীগুলোর জল এসে পড়ছে আঁকাবাঁকা খানার মধ্যে কলকল্ শব্দে। রাস্তাটা যেন জলে ক্ষয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ পথে কি করে মানুষ চলে। ঘোড়াগুলো দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। হ্যানভ তার লম্বা ওভারকোটটি গায় দিয়ে হাঁটতে লাগল গাড়ি থেকে নেমে। শীত লাগার ভয় নেই তার।

"কি বিশ্রী রাস্তা!" বলে আবার সে হাসল। এখুনি গাড়িগুলো শুদ্ধ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে!"

"কেউ তোমাকে এই জল-কাদার মধ্যে গাড়ি নিয়ে বেরুতে বলেনি।" তীক্ষ্ম কণ্ঠে সেমিয়ন বললে। "তোমার বাড়িতে বসে থাকাই উচিত ছিল।"

"বাড়িতে বসে থাকতে আমার মোটে ভাল লাগে না, বুঝলে, বুড়ো। বড্ড বিশ্রী লাগে।"

সেমিয়নের পাশে তাকে বেশ সবল সুপুরুষ বলে মনে হচ্ছিল বটে, কিন্তু একটু বিশেষ লক্ষ্য করে দেখলে তার চলবার ভঙ্গীতে এমন কিছু ধরা পড়ে যার থেকে বোঝা যায় তাকেও ক্ষয় স্পর্শ করেছে, দুর্বল করেছে এবং ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে বনের ভেতর যেন কার হতশ্বাস। আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ এই লোকটি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী লোকটির জন্য ভয় ও করুণায় ভরে উঠল ম্যারিয়ার মন। সে ভাবল, যদি আমি তার স্ত্রী অথবা বোন হতাম, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে একে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। হ্যাঁ, তার স্ত্রী। শৃঙ্খলা দিয়ে বাঁধা জীবন। এই লোকটি তার প্রকান্ড বাড়িতে একা একা থাকে; আর ম্যারিয়া এই নিরানন্দ পাড়াগাঁয়ে জীবনযাপন করে। তবু কেন যেন এই দুজনের মিলন, এদের সমান বলে ভাবা, শুধুমাত্র এর চিন্তাও অসম্ভব অবাস্তব বলে মনে হয়। বস্তুতঃ, জীবন এমনই সুসংবদ্ধ এবং মানুষের সম্বন্ধ এত জটিল ও অবোধ্য যে এ সম্বন্ধে চিন্তা করলে মন শিউরে ওঠে, হৃদয় হতাশায় ভেঙে পড়ে।

"কেন, কেন এত রূপ, এত সৌন্দর্য, অমন সুন্দর ম্লান চোখ ভগবান হতভাগা অপদার্থ লোকগুলোকে দেয়। কেন তারা এত সুন্দর—আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।" ম্যারিয়া ভেবেই চলেছে।

এবার আমাদের ডানদিকে ঘুরতে হবে, হ্যানভ গাড়িতে চেপে বলল। "নমস্কার।" সে তার শুভকামনা করে বিদায় নিল।

আবার ম্যারিয়া ভাবতে লাগল তার ছাত্র-ছাত্রীদের কথা, পরীক্ষার কথা, দরওয়ান ও স্কুল কাউন্সিলের কথা। পিছনে ফেলে আসা হ্যানভের গাড়ির শব্দে তার সমস্ত চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেল। সে ভাবতে চায় সুন্দর চোখের কথা, প্রেমের কথা, যে সুখ তার জীবনে কোনদিন আসবে না তার কথা।

তার স্ত্রী। সকালে বড় ঠান্ডা পড়েছিল। আগুনটা জেবলে দেবারও কেউ ছিল না। দরোয়ানটা কোথায় পালিয়েছে। প্রভাতের আলো ফুটে উঠতেই ছেলেমেয়েরা এসে জুটল হৈ চৈ করে, সাথে করে নিয়ে এল কাদা আর বরফ। এত অসুবিধে। আরাম বলতে কিছু নেই। বাসস্থান বলতে তার আছে ছোট একখানা কামরা আর তার কাছেই একখানা রান্নাঘর; রোজ কাজের শেষে তার মাথা ধরে, রাত্রে খাওয়ার পর বুক জ্বালা করে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কাঠের দাম ও দরোয়ানের মাইনে তাকে আদায় করতে হয়। আর তারপর ঐ নধর উদ্ধত স্কুলের কর্তা ঐ চাষাটার কাছে মিনতি করে বলতে হয় কিছু কাঠ পাঠাবার জন্য। পরীক্ষার, চাষাদের আর বরফ স্তূপ ভেঙে পড়ার স্বপ্ন দেখে রাতে। এমনি ধারা জীবনের চাপে পড়ে অকালে বুড়ো হয়ে পড়েছে সে, হারিয়ে ফেলেছে তার সজীবতা। কুৎসিত, বক্র এবং অদ্ভুত করে তুলেছে তাকে এই জীবন। সে যেন সীসের তৈরী। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। জেমসভোর কোন সভ্য বা স্কুলের কর্তা এলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। যতক্ষণ তারা থাকে তার বসতে সাহস হয় না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে প্রাণহীন অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায়। তাকে দেখে কেউ কোন আকর্ষণ বোধ করে না। এমনি নিরানন্দ, স্নেহহীন, সহানুভূতিহীন, নির্বান্ধব জীবনযাপন করছে সে। তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু পর্যন্ত নেই। তার মত অবস্থায় যদি কেউ কারো প্রেমে পড়ে তা হলে তা কি অদ্ভুতই মনে হবে।

"ভ্যাসিলিয়েভনা, সামলে।"

আবার খাড়াই......।

তাকে বাধ্য হয়ে স্কুল মিস্ট্রেস হতে হয়েছে। এই কাজে তার কোন আকর্ষণ ছিল বলে নয়। সে কোনদিন শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হবার কথা চিন্তা করেনি এবং জ্ঞানালোক বিতরণ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করার কথাও ভাবেনি। তার শিক্ষয়িত্রী জীবনে ছেলেরা অথবা জ্ঞানবিতরণ করা বড় ছিল না। তার মনে হয়, পরীক্ষাটাই সব কিছু। তা ছাড়া, জ্ঞান বিতরণ, কোন বৃত্তি অবলম্বন এ সব কথা চিন্তা করবার সময়ই বা কোথায় ছিল তার।

শিক্ষক, গরীব ডাক্তার ও তাদের সহকারী এদের কি কঠোর পরিশ্রমই না করতে হয়। তারা কোন আদর্শের সেবা করছে, জনসাধারণের দুঃখ দূর করছে, এ সব কথা ভেবে যে একটু সান্ত্বনা পাবে তারই বা অবসর কোথায়? প্রতিদিনের আহারের চিন্তা, আগুন জ্বালবার কাঠের চিন্তা, খারাপ রাস্তার চিন্তা আর অসুখ-বিসুখের চিন্তা এ সব ভাবনাই সমস্ত মাথা জুড়ে রয়েছে। এই কঠিন পরিশ্রম, এই নিরানন্দ জীবন ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার মত সহিষ্ণু ম্যারিয়াই নীরবে সহ্য করতে পারে দিনের পর দিন। যারা সজীব, যারা শক্তিমান, যাদের হৃদয় আছে, জীবনে বৃত্তির কথা বলে আদর্শের কথা বলে তারা দুদিনেই ক্লান্ত হয়ে এ কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

সেমিয়ন শুকনো ও সোজা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করছে। প্রথমে মাঠের মধ্য দিয়ে তারপর গ্রাম্য কুটীরগুলোর পেছন

দিয়ে চলল। এক জায়গায় চাষারা তাদের আটকে দিল, আর এক জায়গায় পাদ্রীর জমির ওপর দিয়ে তাদের যেতে দিল না। শেষ পর্যন্ত জমিদারের কাছ থেকে কেনা আইভান আইওনভের একখণ্ড জমির চারপাশে পালার কাছে এসে তাদের আবার ফিরতে হল।

তারা নির্জনি গোরোভিচে এসে পৌঁছল। সরাইখানাটার কাছে সেই অপরিষ্কার জায়গাটায় তখনও বরফ জমে রয়েছে। সেখানে কয়েকটা গাড়ি তখনও দাঁড়িয়েছিল। এই গাড়িগুলোতে করে অপরিশুদ্ধ সালফিউরিক এসিড আনা হয়েছে। অনেক লোক সরাইতে জমা হয়েছে। তারা সবাই গাড়ি চালায়। ভড্‌কা তামাক আর ভেড়ার চামড়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে সেখান থেকে। কথাবার্তার শব্দ কানে আসছে সরাইখানার ভেতর থেকে। দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালের ওপরে হতে অবিশ্রান্ত বাজনার শব্দ আসছে। ম্যারিয়া সেখানে বসল; এক কাপ চা খেল। তার পাশের টেবিলে বসে চাষাগুলো ভড্‌কা ও বিয়ার পান করছে। পানীয়ের গুণে সর্বাঙ্গ তাদের ঘেমে উঠছে। সরাইখানার রুদ্ধ, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে।

"ওহে কুজমা," একসঙ্গে সবাই কথা বলে চলেছে। "কি হল?" "হা ভগবান!" "ও লোকটা নিশ্চয় আইভান ডিমেণ্টিচ।" "ওহে বুড়ো, শোন।"

একটি বেঁটে লোক, মুখে বসন্তের দাগ, মুখ জুড়ে কালো দাড়ি। সে বড্ড বেশী মদ খেয়েছে। হঠাৎ কি একটা দেখে ভারী আশ্চর্য হল সে। তারপরই শুরু করল অশ্লীলভাষায় চীৎকার করতে।

"এই, গালাগালি করছিস কেন?" সেমিয়ন রেগে উত্তর করল। সে একটু দূরেই বসে ছিল। "দেখছিস না একটি যুবতী মেয়ে বসে রয়েছে।"

"যুবতী মেয়ে!" আর এক কোন থেকে একজন ভেঙিয়ে উঠল।

"তবে রে শালা—।"

বেঁটে মানুষটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আমি কিছু মনে করে বলি নি। আমাকে ক্ষমা করুন। আমরা আমাদের পয়সা দিয়ে ফুর্তি করছি, ও মেয়েটিও নিজের পয়সাই খরচ করছে। আচ্ছা, নমস্কার।"

স্কুল-মিস্ট্রেস উত্তরে শুধু প্রতি-নমস্কার করল।

"তোমাকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

ম্যারিয়া চা খেয়ে বেশ তৃপ্তি বোধ করল। সমস্ত দেহে উষ্ণতা অনুভব করল। সেও চাষাগুলোর মত লাল হয়ে উঠতে লাগল। আবার তার মনে পড়ল আগুন জ্বালবার কাঠের কথা, দরোয়ানে কথা...............।

"ওহে বুড়ো, থাম, থাম।" সে শুনতে পেল ভিয়াজোভির স্কুল মিস্ট্রেস। আমরা ওকে ভিয়াজোভির স্কুল মিস্ট্রেস। আমরা ওকে চিনি—বড় ভাল মেয়ে।"

"বেশ মেয়ে ও।"

দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দের বিরাম নেই। কেউ ভেতরে আসছে কেউ-বা বাইরে যাচ্ছে। ম্যারিয়া সেইখানে বসে রইল। পুরনো চিন্তাগুলো আবার ভীড় করে এল। বাজনাটা একই রকমভাবে বেজে চলেছে। সূর্যের এক-ফালি রশ্মি মেঝের ওপর পড়েছে। আলোর টুকরো ধীরে ধীরে কাউণ্টারের কাছে গেল, কাউণ্টার ছাড়িয়ে দেয়ালে তারপর গেল মিলিয়ে। সেই ছোট মানুষটি টলতে টলতে ম্যারিয়ার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। তার দেখাদেখি আর সবাইও তার করমর্দন করল বিদায়ের আগে। তারপর একে একে গেল বেরিয়ে। দরজাটা নয়বার সশব্দে বন্ধ হল।

"ভ্যাসিলিয়েভনা তৈরি হয়ে নাও," সেমিয়ন ডেকে বলল।

তারা রওনা হল আবার মন্দ গতিতে।

"এইখানে নির্জনি গোরোভিচে কিছুদিন আগে একটি স্কুল তৈরি হচ্ছিল," সেমিয়ন বলল। "ও কাজ বড় খারাপ।"

"কেন?"

"শোনা যায়, প্রেসিডেণ্ট এক হাজার, স্কুলের কর্তা এক হাজার, আর স্কুলের মাস্টার পাঁচশ' টাকা মেরেছে।"

"একটা স্কুল করতে সবশুদ্ধ লাগে এক হাজার টাকা। এমন করে লোকের নামে অপবাদ দেওয়া উচিত নয়, বুড়ো। ওসব বাজে কথা।"

"তা জানি নে। লোকে বলে তাই বললাম।"

পরিষ্কার বোঝা গেল, সেমিয়ন স্কুল মিস্ট্রেসের কথা বিশ্বাস করে নি। চাষাগুলোও তাকে বিশ্বাস করে না। তাদের ধারণা, সে বড্ড বেশি মাইনে নেয়—একশ' রুবল। পাঁচ রুবলই তার পক্ষে যথেষ্ট। সে জ্বালানি কাঠের জন্য আর দরোয়ানের মাইনে বাবদ ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করে, তার বেশির ভাগই সে আত্মসাৎ করে, এই ওদের বিশ্বাস। স্কুলের কর্তারও ঐ চাষাগুলোর মতই ধারণা। অথচ সে লোকটা এক ত কাঠ বেঁচে লাভ করে, তার ওপর আবার স্কুল-কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে চাষাদের কাছ থেকে পয়সা নেয় স্কুলের কর্তা এই অজুহাতে।

বন পেরিয়ে এসে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ভিয়াজোভি পর্যন্ত এবারে শুধু খোলা সমতল জমি। আর অল্প পথই বাকী আছে। নদী পার হয়ে রেল লাইন ছাড়িয়ে এলেই ভিয়াজোভি দেখা যায়।

"কোন্ দিকে যাচ্ছ?" ম্যারিয়া সেমিয়নকে জিজ্ঞেস করল। "ব্রিজের দিকে ডানহাতি রাস্তা ধর।"

"কেন, আমরা এ পথেও যেতে পারি। এখানে নদী মোটেই গভীর নয়।"

"দেখো বাপু, ঘোড়া যেন ডুবে না মরে।"

"কি বললে?"

"দেখেছ, হ্যানভ ব্রিজের দিকে গাড়ি চালিয়েছে।" ডানদিকে বহুদূরে চার-ঘোড়ার এক গাড়ি দেখতে পেয়ে ম্যারিয়া বলল, "সে-ই হবে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, সে-ই ত। সে তাহলে বাকভিস্টকে বাড়িতে পায়নি। কি বোকা লোকটা! খাঁদা বটে। সে গাড়ি চালিয়ে এতদূরে গেছে। কি জন্যে? এ-রাস্তা দিয়ে গেলে পুরো দু মাইল পথ কম হত।"

তারা নদীর ধারে এসে পৌঁছল। গ্রীষ্ম-কালে নদীতে জল থাকে না, সবাই হেঁটেই পার হয়। আগস্ট মাসে সাধারণত জল যায় শুকিয়ে। কিন্তু এখন! বসন্তের প্লাবনে নদীটি প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা ঘোলাটে জল খরস্রোতে বইছে। তীর থেকে শুরু করে জলের ধার পর্যন্ত গাড়ির চাকার স্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে। এইখান থেকে কেউ নদী পার হয়েছে।

"হেট্, হেট্," সেমিয়ন ঘোড়ার লাগাম কষে টেনে ধরল। তার কনুই দুটো পাখীর ডানার মত ঝাপটাতে লাগল। সে ঘোড়ার উদ্দেশে চীৎকার করে চলল, হেট্, হেট্। তার স্বরে চিন্তা ও ক্রোধ ফেটে পড়ছে।

ঘোড়াটা পেট পর্যন্ত জলে নেমে থেমে গেল। পরমুহূর্তে আবার এগিয়ে চলল সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে। ম্যারিয়া পায়ের তলায় তীক্ষ্ন শীত অনুভব করল।

"চল, চল—হেট," সে-ও উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল।

তারা ওপারে এসে গেছে।

"কি বিষম বিপদ দেখ দেখি!" সেমিয়ন দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলে কথা কয়টি। তারপর লাগাম-টাগামগুলো ঠিক করে নিলে। "জেমসভোর মরণ হয় না!"

ম্যারিয়ার জুতো, জামা সব ভিজে জ্যাব-জ্যাবে হয়ে গেছে। তার পোষাকের নীচটা, তার কোট ও জামার আস্তিনও ভিজেছে। সেগুলো থেকে জল ঝরছে। চিনি ও ময়দা-গুলোও বাদ যায়নি। ওগুলো গেছে বলেই তার বেশি দুঃখ। ম্যারিয়া একটা হাতের মুঠোয় আর একটা হাত শক্ত করে ধরে হতাশ ভাবে বলে উঠল,

"সেমিয়ন, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।"

একটা ট্রেন স্টেশন থেকে আসছিল। রেলওয়ে ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ। গাড়ি চলে না যাওয়া পর্যন্ত ম্যারিয়া ক্রসিংয়ের কাছে অপেক্ষা করতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ শীতে কাঁপছে। ভিয়াজোভি দেখা যাচ্ছে। ঐ স্কুলের সবুজ ছাত, ঐ গির্জা। গির্জার ক্রুশটি বিকেলের

সূর্যে ঝকঝক করছে। স্টেশনের জানলা-গুলোও ঝিকমিক করছে। ইঞ্জিনের থেকে তামাটে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার মনে হল, সব কিছু যেন শীতে কাঁপছে।

ট্রেন এসে পড়ল। জানলাগুলোতে হাল্কা সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে চার্চের ক্রুশের মত সেগুলো ঝকঝক করছে। অসহ্য লাগল তার সেগুলোর দিকে তাকাতে। দুটি প্রথম শ্রেণীর কামরার মাঝখানে ছোট পা-দানিতে একটি মহিলা দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ না সে তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, ম্যারিয়া তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মা! এমন মিলও কি হয়! তার মারও ঠিক এমনি মাথা-ভরা চুল ছিল। ঠিক অমনি কপাল, অমনি মাথাটা একটু হেলে থাকত। তার অতীত জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি অদ্ভুত স্পষ্টরূপে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। তার মা, বাবা, ভাই, মস্কোর সেই ফ্ল্যাট। তাদের ছোট মাছের যাদুঘর। প্রত্যেকটি জিনিস তাদের খুঁটিনাটিগুলো পর্যন্ত তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সে যেন পিয়ানোর বাজনা শুনতে পাচ্ছে; তার বাবার গলাও শোনা যাচ্ছে। যখন সে দেখতে সুন্দর ছিল, মনোরম পোষাক পরত, সেই বালিকা-বয়সে উজ্জ্বল উত্তপ্ত ঘরে প্রিয়জনদের মাঝে বসে তার মনে যে অনুভূতি জাগত, তারই স্পর্শ সে অনুভব করছে। অকস্মাৎ তার সমস্ত হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে উঠল। এই প্রবল সুখানুভূতি তাকে বিবশ করে ফেলল। দু-হাত দিয়ে কপালের রগ দুটো চেপে ধরল সে, আকুল কণ্ঠে ডাকল, "মা!"

তারপরই অজস্র ধারায় কাঁদতে শুরু করল। কেন, তা সে জানে না। সেই মুহূর্তে হ্যানভ তার চার-ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে সেখানে এসে পড়েছে। তাকে দেখে তার মনে হল এত খুশি সে আর কোনদিন হয়নি। আজ সে তার বন্ধুর মত, তার সমকক্ষের মত তার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নমস্কার জানাল। তার আনন্দ, তার জয়ের আভা সারা আকাশকে রাঙিয়ে দিল। প্রতি জানালায়, গাছে গাছে তা ছড়িয়ে পড়ল। তার বাবা মৃত হতে পারে না, তার মা মরেনি, সে কোনকালে স্কুল মিস্ট্রেস ছিল না। এসব কিছুই একটা দীর্ঘ ক্লান্তিকর অদ্ভুত প্রশ্ন। আজ সেই দুস্বপ্ন থেকে সে জেগে উঠেছে।

"ভ্যাসিলিয়েভনা, গাড়িতে উঠে এস।"

মুহূর্তে সব মিলিয়ে গেল। গেট খুলে গেল ধীরে ধীরে। ম্যারিয়া কাঁপতে কাঁপতে গাড়িতে উঠে বসল। সমস্ত শরীর শীতে অবশ হয়ে গেছে। চার-ঘোড়ার গাড়ি রেল লাইন পার হয়ে গেল। সেমিয়ন পিছনে পিছনে চলেছে। সিগন্যালম্যান টুপি তুলে নমস্কার জানাল।

"এতক্ষণে আমরা ভিয়াজোভিতে এসে পড়েছি।"

অনুবাদ : হীরেন দাশগুপ্ত

স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন—অনাথগোপাল সেন স্মৃতি প্রবন্ধ। প্রণেতা—অধ্যাপক ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের পক্ষে প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। মূল্য চারি টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ অর্থনীতি বিষয়ে দুইটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রথম প্রবন্ধ "স্বাধীন ভারত ও তাহার অর্থনৈতিক সংগঠন", লেখক শ্রীধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। শেষোক্ত প্রবন্ধ "স্বাধীন ভারতের আর্থিক সংগঠন", লেখক শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী।

স্বর্গীয় অনাথগোপাল সেন ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় আলোচনায় একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। সরল ও সহজবোধ্য বাঙলা ভাষায় দুরূহ অর্থনীতির বিষয় আলোচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষাপদ্ধতির কোনো একটি বিষয়ে বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া তজ্জন্য পুরস্কার প্রদান করিবেন। এই ব্যবস্থা দশ বৎসর পর্যন্ত পরিচালিত হইবে। আলোচ্য গ্রন্থটির উভয় প্রবন্ধই এই ব্যবস্থাধীন পুরস্কার উপযোগী বিবেচিত হইয়াছে এবং উভয় প্রবন্ধ একত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধ দুইটিতে দেশের বর্তমান অর্থনীতির অতি সুনিপুণ আলোচনা স্থান পাইয়াছে। উদ্যোক্তাগণ দুইটি কারণে প্রশংসার্হ। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে, দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতি বিষয়ে কিছু কিছু উৎকৃষ্ট পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। ১৮০।৪৮

স্ট্রাইক—শ্রীসন্তোষ দে প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দি গ্লোব লাইব্রেরী, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

'স্ট্রাইক', 'গল্প নয়' 'চোর' প্রভৃতি নয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। লেখকের ভাষা ঝরঝরে। গল্পগুলিও নূতন ধরণের। 'গল্প বলার গল্প', 'তৃণে জাগে প্রাণ' প্রভৃতি কয়েকটি গল্প আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ২৭০।৪৮

চার ধাম ভ্রমণ—শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভেদিয়া, বর্ধমান—এই ঠিনাকায় লেখকের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য দেড় টাকা। ২০০ পৃষ্ঠা।

"চার ধাম ভ্রমণে"র প্রথম ভাগে উত্তর খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণ খণ্ড, তৃতীয় ভাগে পশ্চিম খণ্ড ও চতুর্থ ভাগে পূর্ব খণ্ড ভ্রমণের বিবরণ পরিকল্পিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ প্রথম ভাগ; উহাতে কেদারবদরী পশুপতিনাথ ভ্রমণের সুবিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। গ্রন্থটি নিছক ভ্রমণ কাহিনী নয়, লেখক স্বীয় ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তীর্থাদির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই লোভনীয় ভ্রমণ কাহিনীটি পাঠ করিলে সহজেই ভ্রমণের নেশা পাঠকের চিত্তে উদ্দিপ্ত হইবে, এইখানেই গ্রন্থকারের সার্থকতা। যাহারা তীর্থাদি পর্যটনে নানা কারণে অশক্ত তাঁহারা গৃহে বসিয়া এই গ্রন্থ পাঠে ভ্রমণ বাসনা কিঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে পারিবেন। কারণ লেখকের আন্তরিকতাপূর্ণ লেখার গুণে গ্রন্থটি সহজেই পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিবে। ১৮৯।৪৮

যৌথ-সংসার—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী, ২০২নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

গ্রন্থখানি "যৌথ-সংসার", "কর্তা ও গৃহিণী" "সেবা সদন" এই তিনটি রচনার সমষ্টি। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি; তাঁহার বাড়িতে জ্ঞান বৈঠক নামে একটি আলোচনা সভাতে সমাজ ও সংসার বিষয়ে কথোপকথনের মধ্য দিয়া প্রথমোক্ত রচনাটি জমিয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী রচনা দুইটিও ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে কথোপকথন। তিনটি রচনার মধ্যেই একটি পারম্পর্য অব্যাহত আছে। এই সকল আলোচনা দ্বারা সাধারণ লোকের জ্ঞানের প্রসার কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

২২৪।৪৮

মৃত্তিকা-শৃঙ্খল—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র সম্পাদিত গল্পের সংগ্রহ-পুস্তক। প্রকাশ—"লেখনী", ১বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

বারোজন তরুণ লেখকের রচিত বারোটি ছোট গল্প এই পুস্তকটিতে সংকলিত হইয়াছে। লেখকগণের অনেকেই সাহিত্যে প্রায় নবাগত। কিন্তু প্রত্যেকটি রচনাতেই শিল্প বোধ ও রচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। গল্প রসিক পাঠকগণের নিকট আমরা বইটির সমাদর কামনা করি। ২৪৭।৪৮

ফুল্লরা

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

প্র.না.বি.....

উর্মিলার মধুর নামটির জন্য একালের কবিগুরু সেকালের কবিগুরুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরাও অনুরূপ কারণে কবি-কঙ্কণকে ধন্যবাদ জানাইতে পারি। চণ্ডীকাব্যে বীভৎস রসের অভাব নাই। ব্যাধ চোয়াড় প্রভৃতির কাহিনী লিখিতে বসিয়া মুকুন্দরাম কলমকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছেন, কিন্তু রক্ষা এই যে, চণ্ডীকাব্যের পাত্র-পাত্রীর নামগুলি মধুর। লহনা, খুল্লনা, রত্নমালা, ধনপতি, শ্রীমন্ত প্রত্যেকটি নাম মধুবিন্দু ক্ষরণ করে। আবার, যদিচ কালকেতু লোকটা অত্যন্ত চোয়াড় প্রকৃতির ব্যবসায়ে সে ব্যাধ, তবু তাহার কালকেতু নামটাতে কবির আশীর্বাদ আছে! আর শুধু তাহার নামই বা কেন? তাহার বংশের সকলেরই মধুর নাম। সুকেতু, ধর্মকেতু, কালকেতু, পুষ্পকেতু। কালকেতু ও তাহার পত্নী পূর্বজন্মে ছিল নীলাম্বর ও ছায়াবতী! কিন্তু চণ্ডীকাব্যের মধুরতম নাম ফুল্লরা, বসন্তকালের ফুলের মধুবিন্দু সংগ্রহ করিয়া নামটি রচিত। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন দিলে যে প্রহসন হয় না, বাস্তবকে সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা হয়,—মুকুন্দরাম তাহা জানিতেন। তাই ব্যাধ-কন্যা ও ব্যাধ-পত্নীকে তিনি ফুল্লরা বলিয়া ডাকিয়াছেন। ফুল্লরা শব্দটির অর্থ কি? ফুল্লরাব হইতে ফুল্লরা হওয়া অসম্ভব নয়, তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, ফুলের মতো মৃদু ও লঘু যাহার কথা। আবার ফুলের উপরে যে মৌমাছি বসিয়া গুঞ্জন করে, সেই রকম মৃদু গঞ্জনাও আছে ফুল্লরার কণ্ঠে, সেই গুঞ্জনেই মনে পড়িয়া যায় যে জীবটি মধুর ভাণ্ডারী।

ফুল্লরা কালকেতুর পত্নী, সঞ্জয়কেতুর কন্যা। আবার একটি মিষ্ট নাম। কিরাতের কাহিনীতে এত মধুর নামের ছড়াছড়ি দেখিয়া কুমার-সম্ভবের সেই বর্ণনা মনে পড়ে, মন্দাকিনীর নির্ঝর শীকরে সিক্ত দেবদারু তুষারমণ্ডিত অধিত্যকায়, যেখানে কেবল কিরাত ও বন্য পশুদেরমাত্র সমাগম, সেখানে পথে-ঘাটে যত্রতত্র গজমোতিসমূহ পড়িয়া থাকে। একদিন ঘটক আসিয়া ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতুর সহিত ফুল্লরার বিবাহের প্রস্তাব করিল। সঞ্জয়কেতু ফুল্লরার পরিচয় দিতে গিয়া বলিল,—'রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।' ফুল্লরা চণ্ডীকাব্যের দ্রৌপদী। ভালো রাঁধিতে না জানিলে মুকুন্দরামের কাছে মুখ পাইবার উপায় নাই। বেচারা একদিন শাপলার নাল খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল, তাই সুযোগ পাইলেই কল্পনায় সে রাজভোগ আহার করিত। কাব্য যদি জীবনের 'কপি' মাত্র হইত, তবে তো এমন হইবার কথা নয়। কবিরা আর যাই হোক জীবনের নকলনবিশ নয়। সাহিত্য ক্রমেই মাছিমারা কেরাণীর কীর্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

যাক, তারপরে যথাশাস্ত্র ফুল্লরা ও কালকেতুর বিবাহ হইয়া গেল এবং কালকেতু পত্নীর রন্ধন বিদ্যার পরিচয় পাইয়া ভীমের আহারান্তে জিজ্ঞাসা করিল—'রন্ধন করিছ ভাল, আর কিছু আছে।' কালকেতু বন হইতে জন্তু-জানোয়ার মারিয়া আনে, ফুল্লরা সেই মাংস হাটে বাজারে বিক্রয় করে, এ বিদ্যাতেও সে নিতান্ত অপটু নহে। একদিন শিকার মিলিল না, ঘরে খুদ কুঁড়াও নাই, ফুল্লরা সখীর বাড়িতে চাউল ধার করিতে গেল। ওদিকে কালকেতু শিকারে গিয়া একটি জীবন্ত গোধা বাঁধিয়া আনিল। গোধা বা গোসাপটি ভগবতীর ছদ্মবেশ। ফুল্লরার কুটীরে আসিয়া ভগবতী ষোড়শী তরুণীর মূর্তি ধরিলেন। তখন কালকেতু ঘরে ছিল না। তরুণীকে স্বগৃহে দেখিয়া ফুল্লরা চমকিয়া উঠিল—ভাবিল এ এক নূতন বিপদ। এতদিন তবু সুখে দুঃখে চলিতেছিল—এ অগ্নিশিখা আসিল কোথা হইতে। ভগবতী বলিলেন,—তোমার স্বামীই আমাকে নিজগুণে বাঁধিয়া আনিয়াছে, আমার বাড়িঘর নাই, এখানেই কিছুকাল থাকিব ভাবিয়াছি। ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ফুল্লরা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, আমরা বড়ই দরিদ্র, ভাত জোটে না, ভাঙা কুঁড়ে, শীতে কাঁপি, আর যখন খাদ্য জোটে তখন আধার জোটে না, 'আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।' ফুল্লরা বলিল, এখানে সুবিধা হইবে না বাপু, অন্যত্র যাও। কিন্তু ভগবতী বিশেষ উদ্দেশ্যে আসিয়াছে তাহার গেলে চলিবে কেন? সে নড়িল না। তখন ফুল্লরা স্বামীকে গিয়া ধরিল, বলিল, এ কেমন তোমার ব্যভার? এখানে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে ফুল্লরার পুষ্প মৃদু রব, পুষ্পলীন মৌমাছির মতো গুঞ্জন করিয়া উঠিয়াছে।

কাহিনীকে অকারণ বিতানিত করিবার প্রয়োজন নাই। ভগবতীর কৃপায় কালকেতু অগাধ ধনরত্ন পাইল। সেই টাকায় সে বন কাটিয়া গুজরাট রাজ্য স্থাপন করিল। তারপরে ভাঁড়ুর ষড়যন্ত্রে কলিঙ্গরাজের সহিত লড়াই বাঁধিয়া, আবার ভাঁড়ুর ষড়যন্ত্রে সে বন্দী হইল। তারপরে উভয় রাজায় মিত্রতা হইয়া গেলে কালকেতু পুনরায় গুজরাট রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। এরারে কাব্য শেষ হইবার পালা। তাই দেবতার আদেশে কালকেতু পুষ্পকেতুকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহারা, কালকেতু ও ফুল্লরা দেবদেহে স্বর্গে চলিয়া গেল। তাহারা ছিল শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর ও ছায়াবতী, ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূ। ইহাই কালকেতু কাহিনীর সংক্ষেপ।

সাহিত্যে যাহারা সমাজ-চৈতন্য খোঁজে চণ্ডীকাব্য তাহাদের লুটের মাহাল। এত অবিকৃত সমাজ-চৈতন্য আর কোন কাব্যে আছে কিনা জানি না। বাস্তবিক চণ্ডীকাব্য সামাজিক ইতিহাসের দলিল না কাব্য তাহা এখনো ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিজের ধারণা যে প্রচুর উপাদান মুকুন্দরাম পাইয়াছিলেন সেগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া কাব্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইন্ধনের ভারে অগ্নি এখানে দুর্বল, তাই শিখার চেয়ে ধূমই প্রবল, আর ধূমের চেয়েও অনেক প্রবল ইন্ধনের স্তূপ। সমাজ-চৈতন্য অনুসন্ধিৎসুর কাছে এই ইন্ধনেরই সমাদর।

অনায়ত্ত ইন্ধনের আধিক্য সত্ত্বেও মুকুন্দরাম কয়েকটি নরনারীর চিত্র অংকনে সফলকাম হইয়াছেন। একটি ভাঁড়ুদত্ত, অপরটি বেনে মুরারি শীল। আর একটি ফুল্লরা। কিন্তু ফুল্লরার চরিত্র অর্ধ-সমাপ্ত অর্থাৎ ইহার প্রথমার্ধেই কবির কৃতিত্ব। ব্যাধ-গৃহিণী ফুল্লরার চরিত্র কবিকঙ্কণ যথাযথ আঁকিয়াছেন, কিন্তু রাজ-গৃহিণীর ছবি কিছুই হয় নাই; সেখানেও সে ব্যাধ-গৃহিণী হইয়াই আছে। কবিকঙ্কণের দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা ছিল, দরিদ্রের ছবি আঁকিতে পারিতেন, কিন্তু ধনীর চিত্র তাঁহার কল্পনার অতীত। পর্যবেক্ষণ শক্তির উপরেই মুকুন্দরামের প্রতিষ্ঠা, যখনই তিনি অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়াছেন, সফল হইয়াছেন, কিন্তু যখনই কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। একসংগে পর্যবেক্ষণের পা এবং কল্পনার পাখা অল্প লোকেই পাইয়া থাকে। মুকুন্দরামের দুখানা বেশ শক্ত রকমের পা ছিল। পাখার আভাস ছিল না তা নয়, তবে সে পাখা হাঁসের পাখা, তাহাতে ওড়া চলে না, বড়জোর মাচার উপরে উঠিয়া বসা চলে। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র তাঁহার সগোত্র।

ধনের অভিজ্ঞতা মুকুন্দরামের ছিল না, তাই কালকেতু ও ফুল্লরাকে রাজা ও মহিষী করিয়া আঁকিতে পারেন নাই, তাই ধনপতির কাহিনীতে তাঁহার কলম দ্বিধাগ্রস্ত। যদি আমরা ভুলিয়া যাই যে, ফুল্লরা রাজমহিষী হইয়াছিল, তবেই তাহার চরিত্রের পূর্ব ও উত্তর-পর্বে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইব। কলিঙ্গরাজ গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করিলে ফুল্লরার দুর্বলতা কালকেতুকে ভীরু করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার পারমর্শেই কালকেতু ধানের মাচায় লুকাইয়াছে, তাহার নির্বুদ্ধিতাতেই সে কোটালের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—আর কালকেতুকে বাঁচাইবার অনুরোধ করিয়া ফুল্লরা

নিতান্ত প্রাকৃত জনের ন্যায় কোটালের কাছে কান্নাকাটি শুরু করিয়াছে। এসব রাজমহিষীর স্বভাবসংগত নয়। অবস্থার পরিবর্তনে তাহার স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ফুল্লরার চরিত্রের শেষার্ধের এই শোচনীয় চিত্রগুলিকে ভুলিয়া গিয়া তবে তাহার বিচার করিতে হইবে। কিন্তু বেচারাকে দোষ দিয়া কি ফল? ইহা তো কবিরই অক্ষমতা।

কবিকঙ্কণ যেখানে সক্ষম, সেখানে তিনি একান্ত বাস্তবনিষ্ঠ এবং তাহারই অনুষঙ্গরূপে নির্মম। ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীলের ন্যায় বস্তুনিষ্ঠ চরিত্র আধুনিক কালের সমাজ-সচেতন লেখকেরা আঁকিতে পারিয়াছেন কি? আধুনিকদের বস্তুনিষ্ঠা ঠিক বস্তুটিকে ধরিতে পারে নাই, শেয়ালের পা ধরিতে বটের শিকড় মাত্র ধরিয়াছে।

ফুল্লরা ও ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র বস্তুনিষ্ঠ পন্থায় আঁকিতে শুরু করিয়া কবিকঙ্কণ হঠাৎ কেন পথ পরিবর্তন করিলেন? বস্তুনিষ্ঠ পন্থা যুগোচিত সাহিত্য-ধর্ম ছিল না, ওটা তাঁহার একান্ত স্বকীয় ধর্ম। অগোচরে তাঁহার কলমকে স্বধর্ম পরিচালিত করিতেছিল বটে, কিন্তু যখনই তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন, অমনি যুগধর্ম প্রবল হইয়া উঠিল, বস্তুনিষ্ঠা আদর্শ-নিষ্ঠায় বিলীন হইল, নির্মমতার স্থলে তন্ময়তা দেখা দিল। হঠাৎ পথ পরিবর্তনের ইহাই রহস্য।

ফুল্লরা মেয়েটি মন্দ নয়, দরিদ্র ঘরের বধূ হইবার উপযুক্ত। কিন্তু দরিদ্র যদি হঠাৎ মোটা রকমের লটারির টাকা (সেকালে যাহা ছিল চণ্ডীর হঠাৎ দয়া, একালে তাহাই লটারির টাকা) পায়, তবে তাহাকে লইয়া মুশকিল বাঁধিবে। গরীব ঘরের স্বভাব সে ছাড়িতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সংসারে গরীব লোকের সংখ্যাই অধিক, কাজেই ফুল্লরার স্থানের অভাব হইবে না। স্থানের তো অভাব হইবে না—কিন্তু ফুল্লরা কোথায়? ফুল্লরা দুষ্প্রাপ্য *।

হীরা মালিনী

বাঙলা সাহিত্যে ভাঁড়ুদত্তের যদি কেহ জুড়ি থাকে তবে সে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের হীরামালিনী—'কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।' একদিন হাটের মধ্যে এই দুইজনে হঠাৎ সাক্ষাৎকার হইয়া গেলে কি কাণ্ড ঘটিত, তাহাই ভাবিতেছি। ভাঁড়ুদত্ত কিভাবে অকুতোভয়ে হাট লুট করিয়া বেড়াইত, দেখিয়াছি। এ বিষয়ে হীরাও বড় কম যায় না, তবে তাহার পন্থা ভিন্ন। ভাঁড়ু বলের আশ্রয় লইত, কারণ সে জানিত, রাজার বাহুবল তাহার সহায়। হীরার সে রকম কোন ভরসা ছিল না, তাই তাহাকে প্রধানত নিজের বাক্য-বলের উপরে নির্ভর করিতে হইত, অবশ্য সঙ্গে অশ্রুবলও ছিল। সুন্দরের প্রদত্ত টাকা ঘরে রাখিয়া দিয়া দুটি মেকি টাকা (সেকালেও মেকি টাকা ছিল জানিয়া অনেকে আশ্বস্ত হইবেন) লইয়া সে হাটে চলিল—

তারপরে—

চলে দিয়া হাতনাড়া, পাইয়া হীরার সাড়া
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে॥
যদি দেখে আঁটাআঁটি কান্দিয়া ভিজায় মাটি
সাধু হ'য়ে বেনে হয় চোর॥
রাঙা তামা মেকি মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে বানিয়ারে ফেলে ফেরে
কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া॥

হীরা বাড়ি ফিরিয়া গিয়া সুন্দরকে বেসাতির হিসাব দেয়—সে হিসাব বঙ্গ-সাহিত্যের Punning-এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যে-হীরা তামাকে রুপা বলিয়া চালাইতে সক্ষম, সে যে এক শব্দকে দুই ভিন্নার্থে চালাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের কি!

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে ভাঁড়ু যদি হয় humour-এর প্রতিনিধি, হীরা তবে wit-এর। 'হিউমার' ও 'উইটে'র তত্ত্বগত পার্থক্য নিরূপণ সহজ নয়, কিন্তু বস্তুগত পার্থক্য মোটামুটি সহজেই ধরা যায়, আরও সহজ হইবে যদি ভাঁড়ু ও হীরার চরিত্র মনে রাখি। ইতিপূর্বে ভাঁড়ুকে স্থূলকায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি—হিউমারে এক প্রকার স্থূলতা আছে, কারণ হিউমারে উদারতা আছে, স্থূলতা এক প্রকার উদারতা।

'উইট' তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণ বলিয়াই কৃশ, যেমন কৃশ তীক্ষ্ণ অসিলতা। হীরা কৃশা, তাহার বয়স আর একটু কম হইলে তন্বী বলা চলিত। হীরার বিশদ বিবরণ ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—

> কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।
গালভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে।
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান শাদা শাড়ি
ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ি বাড়ি।
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।
ছিটাফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কতগুলি
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়।

এই বর্ণনায় হীরার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সব তথ্যই কবি জানাইয়া দিয়াছেন। হীরার wit সানন্দে সহ্য করি, কিন্তু সে হিউমারের চেষ্টা করিলে অসহ্য হইত। রবীন্দ্রনাথ কোন জায়গায় বলিয়াছেন যে, পুরুষ ফলস্টাফকে উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু নারী ফলস্টাফ হইলে গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিত, তার কারণ আর কিছুই নয়, পুরুষের প্রকৃতিতে এক প্রকার স্থূলতা আছে, যাহা হিউমারের অনুকূল। নারী প্রকৃতির সংকীর্ণ খাপের মধ্যে 'উইট'এর যথার্থ আশ্রয়। নারী রিয়ালিস্ট, উইট রিয়ালিজমের অস্ত্র। উদার হিউমার আদর্শনিষ্ঠ। সরস্বতী উইট, কারণ উইট মূলত জ্ঞান; আর গণেশ হইতেছেন হিউমার; হিউমারের ভিতরে-বাহিরে একটা অসংগতি আছে, সেই অসংগতি দেখিতে পাই গণেশের স্থূলদেহের ও সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বন্দ্বে।

হীরা ও ভাঁড়ু প্রাচীন কবিদ্বয়ের সার্থক, বোধ করি, সার্থকতম চরিত্র সৃষ্টি। তাঁহারা দুজনেই অনেক রাজা, বীর ও বরাঙ্গনা সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু হীরা ও ভাঁড়ুর কাছে তাহারা নিষ্প্রভ। চরিত্র সৃষ্টি তিন উপায়ে হইতে পারে, রচনা, বর্ণনা ও সৃজনা। রচনা হইতেছে বিভিন্ন অংশ, কাহিনী বা গুণ একত্র করিয়া সৃষ্টি। বর্ণনা হইতেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ব্যাখ্যা ও তাহাতে অলংকারের আরোপ, যেমন মালা পরাইলে বুঝিতে হইবে কণ্ঠ, বালা পরাইলে বুঝিতে হইবে হাত। আর সৃজনা হইতেছে উদ্দিষ্ট চরিত্রের উন্মীলন, অর্থাৎ যাহা আছে তাহাকে মেলিয়া ধরা। যাহা আছে বলিতে বুঝি সেই চরিত্র কোন-না কোনরূপে মানব-সংসারে আদি হইতেই আছে, লেখকের আগে হইতেই আছে, এখন এক রকম রহস্যময় যোগাযোগের ফলে লেখক তাহাকে আর সকলের জ্ঞান গোচর করিয়া দিলেন। আমার একথা আদৌ Paradox নয়। বাস্তবে প্রাণসঞ্চার যদি মানুষের সাধ্য না হয়, তবে কাব্যে তো আরও অসম্ভব, যেহেতু, কাব্য বাস্তবতর, আর বাস্তব মানুষের আয়ুর চেয়ে কাব্যের নরনারীর আয়ু দীর্ঘতর। তাই ইহাকে সৃজনা না বলিয়া আবিষ্করণা বলাই উচিত। বলা উচিত যে, কলম্বাস যেমন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, শেক্সপীয়র তেমনি ফলস্টাফকে ও বাল্মীকি তেমনি রামচন্দ্রকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই একইভাবে অবশ্য সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে কবিকঙ্কণ ভাঁড়ুকে আর ভারতচন্দ্র হীরাকে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের মানসিংহ ও ভবানন্দ রচনা মাত্র। কতকগুলি ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তী-মূলক তথ্যকে সংগ্রহ করিয়া দুটি মনুষ্য মূর্তিকে তিনি দাঁড় করাইয়াছেন, তাহারা নড়ে-চড়ে বটে, কিন্তু স্বকীয়তায় নয়, কবি প্রয়োজনবোধে নাড়ান বলিয়া। তাহারা কাহিনীর বাহন। সার্থক চরিত্র সৃষ্টি কাহিনীকেই আপন বাহন করিয়া নেয়, অনেক সময়ে লেখকের অভীষ্ট লক্ষ্যের বিপরীতে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া যায়, অনেক সময়ে তাহার প্রাণের আতিশয্যে পথের মধ্যে কাহিনীর ঘোড়া মরিয়া পড়ে সোয়ার ছুটিতেই

---

*মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—কালকেতুর উপাখ্যান।

থাকে। সার্থক চরিত্র সৃষ্টি সর্বদাই কাহিনীর চেয়ে বড়।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যা ও সুন্দর বর্ণনা মাত্র। বাক্য অলঙ্কারে ও স্বর্ণ অলঙ্কারে তাহারা এমনি ভারগ্রস্ত যে নড়িতেও অক্ষম, ভবানন্দ ও মানসিংহ তবু নড়িত চড়িত। বিদ্যা ও সুন্দরকে বিশ্বাস করিতে হইলে কবির কথায় বিশ্বাস করিতে হয়। কাঙ্গারু শাবকের মতো জন্মের পরেও তাহারা জন্মদাতার কুক্ষিগত।

কেবল হীরাকে বিশ্বাস করিবার জন্য আর কাহারো সাক্ষ্যের আবশ্যক হয় না, সে শুধু স্বতন্ত্র নয়, স্বয়ম্ভূ। ভারতচন্দ্রের আগে হইতেই সে ছিল, কবি তাহাকে উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন। হীরা মালিনী কবির আবিষ্করণা।

ভারতচন্দ্রের প্রতিভাকে লঘু করিবার ইচ্ছা আমার নাই। সচেতন শিল্পী হিসাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। বর্তমান যুগেও মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁহার জুড়ি দেখি না, কেবল বলিতে চাই যে, চরিত্রাঙ্কণ প্রতিভায় তাঁহার বিশিষ্টতা নয়। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! সাহিত্যে ঐটিই একমাত্র গুণ নয়। বর্ণনা, শ্লেষ, ভাষার স্বচ্ছন্দ অসিক্রীড়া—এ সমস্ত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ। এই সব গুণেই ভল্টেয়ার টিঁকিয়া আছেন, ভারতচন্দ্র আছেন, বার্নাড শ টিঁকিয়া থাকিবেন। কেবল হীরা মালিনীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছে। হীরা মালিনী তাহার বিশিষ্ট গুণের ফল নহে, নিতান্তই tour de force, সেকালের কৃষ্ণনগরের রাজপথে পড়িয়া-পাওয়া রত্ন। ঐতিহাসিকদের কাছে শুনিয়াছি, প্রাচীনকালের অনেক শহর তাহার বিপুল ঐশ্বর্য ও জনতা লইয়া নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তারপরে অনুসন্ধিৎসুর হাতে ধ্বংসস্তূপের রহস্য ভেদ করিয়া একটা তামার মুদ্রা বা জীর্ণ তাম্রলিপি ধরা দিয়াছে—প্রাচীন গৌরবের উহাই একমাত্র অর্বাচীন সাক্ষী। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি আজ সম্পূর্ণ প্রাণহীন, কেবল ঐ কোন্দলপরায়ণা মালিনীটা আজও জীবিত, এতই সজীব যে, কাছে যাইতে সাহস হয় না, পাছে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়, কিংবা সর্বনাশ, সুন্দরের মতো নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে লইয়া যায়। সুড়ঙ্গটার প্রতি যে লোভ নাই তাহা নয়, কিন্তু গতজীবনা বিদ্যার কক্ষে যাইবার কষ্ট কে স্বীকার করিত অবশ্য হীরা মালিনীকে দেখিবার লোভ স্বাভাবিক, কিন্তু সেজন্য অতদূরে যাইবার প্রয়োজন কি? তাহার বংশ আজিও লোপ পায় নাই। *

* ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য।

জীবনের আরম্ভ

ডাঃ অভীশ্বর সেন, এম এস-সি; পি এইচ ডি।

জীবনের জন্মরহস্যের নীরব সন্ধানপথ দিয়া যাইতে যাইতে অনুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিককে কোথাও আসিয়া থামিয়া যাইতে হয়, অগ্রসর হইবার পথ আর তিনি খুঁজিয়া পান না। সেখানে আর প্রমাণ নাই। তাহার কারণ আছে। জীবনের জন্ম এত অদ্ভুত, তাহার পরের ফলাফল এত বিভিন্ন যে, তাহা মানব-মনের কল্পনারও বাইরে; অতি অভিজ্ঞ প্রাণী-তত্ত্ববিদকেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ঐন্দ্রজালিক তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষ তিনি, তাঁহার নিজের ও অপরের অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলাফল প্রত্যক্ষ করেন বিস্ময়ে। জীবনের জন্ম অর্দ্ধ অন্ধকার অর্দ্ধ আলোকের মধ্যে ক্ষুদ্র আণবিক অবয়ব হইতে। আজও সকল প্রাণীই একটি ক্ষুদ্রতম জীবকোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই জীবকোষের সৃষ্টি করিবার, পৃথিবীর জলে স্থলে আকাশে ও প্রতিকোণে ছড়াইয়া পড়িবার অসীম ক্ষমতা আছে। বিজ্ঞান এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন, রাসায়নিক পদার্থ ও শক্তি, জল ও সময় ইহাদের লইয়া আকস্মিকভাবে কোন ঘটনায় বিভিন্ন প্রাণীর জন্ম হইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়, একই স্থান হইতে জন্ম লইয়া, বিভিন্ন প্রাণী—বুদ্ধিমান মনুষই হউক কি ক্ষুদ্র মন্থর-গতি শামুকই হউক একই নিয়তির নির্দেশক্রমে জীবনযাত্রা পরিচালিত করে;—তাহাদের বিভিন্নতার সমতা কোনদিন গড়িয়া উঠিবে না।

নানা ধর্মে জীবনের সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহারা পরস্পর কত বিভিন্ন। বৈজ্ঞানিক মতবাদও বহুল। নানাধর্মের অন্ধ বিশ্বাসে প্রণোদিত না হইয়া, এমন কি জীবনের কারণ ও উৎস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোন বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস না রাখিয়া আমরা যদি জীবনের আদিবৃত্তের সন্ধান করিতে যাই কেবল তখনই বুঝিব, জীবন আকস্মিক ঘটনায় রাসায়নিক শক্তি-জল-সময় ঘটিত পদার্থের কেবলমাত্র সমষ্টি কি না।

পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আশ্চর্য আছে, এমন কি এই সীমাহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তাহার অপেক্ষাও আশ্চর্য হইতেছে প্রতি জীবকোষের ভিতরকার প্রায় অদৃশ্য জীবনরস প্রোটোপ্লাসম, ফলের আঠার মত তাহা গতিশীল, স্বচ্ছ ও সূর্যকিরণ হইতে শক্তিগ্রাহী। প্রোটোপ্লাসম সূর্যের আলোয় বাতাসের অঙ্গারক বাষ্প হইতে, অঙ্গার ও অক্সিজেনকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে—জল হইতে হাইড্রোজেনকে মুক্ত করিয়া শর্করা জাতীয় পদার্থগুলি গঠন করিতে পারে। পৃথিবীর একটি দুর্ভেদ্য রাসায়নিক পদার্থকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া আপনার খাদ্য আপনি প্রস্তুত করে।

এই সজীব একাকী জীবকোষ, এই স্বচ্ছ কুজ্ঝটিকার মত বিন্দু আপনার ভিতর জীবন-কণা লুকাইয়া রাখে। পৃথিবীর ছোট বড় সমস্ত জীবন্ত পদার্থের মধ্যে জীবন সঞ্চারিত করিবার শক্তি তাহার আছে। সমুদ্রতলদেশ হইতে আকাশে, যেখানেই জীবনের প্রভাব অনুভূত হউক না কেন, প্রতি প্রাণীকেই তাহার চারি-দিকের অবস্থার সহিত সে সুপরিচিত করে। সময় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রত্যেক প্রাণীকে বিভিন্ন অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিশেষভাবে গঠিত করিয়াছে। নূতন নূতন আকারে ও অর্জিত নূতন নূতন স্বভাবের জন্য পুরাতন অনেক ক্ষমতা প্রাণীরা হারায় বটে কিন্তু অনেক নূতন ক্ষমতাও তাহারা লাভ করিয়াছে,—নূতন বিশেষ অবয়বে আবদ্ধ হইয়াছে। পিছনে ফিরিবার সকল শক্তি তাহারা হারায় বটে কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোন অসুবিধা তাহাদের থাকে না।

প্রোটোপ্লাসমের এই ক্ষুদ্র কণা ও তাহার অন্তর্নিহিত পদার্থনিচয়ের শক্তি, উদ্ভিদ ও গতিশীল জীবন্ত প্রাণীদের অপেক্ষাও অধিক। ইহা হইতে পৃথিবীর জীবন আসিয়াছে, ইহাই পৃথিবীকে সবুজ ও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। প্রোটোপ্লাসম ব্যতীত কোন জীবন পৃথিবীতে নাই।

বিজ্ঞান প্রোটোপ্লাসমের এই শক্তি বিশ্বাস

কুরে কিন্তু প্রোটোপ্লাসম না হইলে যে কেন জীবন পৃথিবীতে থাকিতে পারে না তাহা বিশ্বাস করে না।

আদিম অবস্থায় পৃথিবী ছিল একটি বিরাট মরুভূমি—ক্রমে ক্রমে শীতল হইবার অবস্থায় যে সমস্ত পদার্থ পড়িয়াছিল তাহারাই তখন তাহার উপরিভাগে ছিল। সমুদ্র হইতে তখন স্থলভাগ উঠিয়াছে; অসম্ভব ক্ষয়ের ফলে উচ্চ পর্বতশিখরগুলি ভাঙিয়া গিয়া শক্ত নাতি-উচ্চ দিগন্ত বিস্তৃত পর্বত ও পলিমাটির নরম স্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল। অজৈব পদার্থের মধ্যে ছিল বাসাল্ট, গ্রেনাইট এবং আগ্নেয়গিরি হইতে উদ্গীর্ণ ও পরিবর্তনশীল প্রস্তর খণ্ড। পৃথিবীতে জীবনের আরম্ভ হইবার পূর্বেই পলিমাটির স্তর পড়িয়াছিল। পরের রাসায়নিক পদার্থেরা যথা চুন, প্রবাল, চক বা ফ্লিণ্ট পাথর তখন কোথাও ছিল না। খুব কম জিনিস লইয়াই পৃথিবী তাহার তরুণ জীবন শুরু করিয়াছিল। তখন ছিল প্রায় চতুর্দিকে জল ও প্রায় সমান তাপ।

পৃথিবীতে জীবনের আগমনপ্রণালী হয়ত এই সকল অনুকূল অবস্থার জন্য সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে জীবন আসিয়াছে অন্য কোন গ্রহ হইতে জীবাণুর মত—এই জীবাণু অক্ষত অবস্থায় অনির্দিষ্টকাল শূন্যে থাকিয়া অনন্তকাল পরে ভাসিতে ভাসিতে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই জীবাণুর অনন্ত শূন্যের ভীষণ শৈত্য সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। এই প্রতিকূল অবস্থায় যদিবা তাহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল তাহা হইলেও মহাশূন্যের কত রহস্যময় বিষাক্ত আলোকরশ্মি-সম্পাতে তাহার বাঁচিয়া থাকা ছিল অসম্ভব। যদি অনুমান করা যায়, কোন বিশেষ অনুকূল অবস্থায় এবং আকস্মিক ঘটনায় কোন একটি জীবাণু অলক্ষ্যে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা নিশ্চয় আসিয়া পড়িয়াছিল সমুদ্রে—সেখানে অভিনব অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া তাহার নূতন জীবন শুরু হইয়াছিল। তাহাই হয়ত পৃথিবীতে প্রথম জীবনের জন্ম। কিন্তু মনে কি স্বভাবতই প্রশ্ন আসে না—অন্য গ্রহে কিরূপে জীবনের জন্ম হইয়াছিল, যে গ্রহ হইতে এই জীবাণু পৃথিবীতে প্রথম আসিয়াছে? এখন বৈজ্ঞানিকেরা জানিতে পারিয়াছেন জীবনের পক্ষে তাহা যত অনুকূলই হউক না কেন, শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থাই নয়, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাতেও জীবনের জন্ম হয় নাই। জীবনের জন্ম একটি প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক রহস্য। অনির্দিষ্ট মহাশূন্য হইতে জীবনের আসিবার সম্ভাবনা আজ কেহ বিশ্বাস করেন না। কখনও বলা হয়, পদার্থের একটি ছোট কণা; একটি বিরাট অনু, কিন্তু এত ক্ষুদ্র যে কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই তাহাকে কোনদিন ধরা যাইবে না—কোন পরমাণু সংযোগে তাহাদের অন্তর্নিহিত মিলনসূত্রকে ছিন্ন করিয়াছিল এবং এই প্রণালী বার বার চলিতে থাকায়, জীবনের অনেকগুলি কার্যপ্রণালীর সে পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে জীবন বলা যায় না।

এমিবা একটি ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রাধীন জন্তু সুসংবদ্ধ এবং বহু অণু পরমাণু যোগে নির্মিত। এমিবারা একক জীবকোষ সম্পন্ন জীব—ইহার দৈর্ঘ্য বোধহয় এক ইঞ্চির একশত ভাগের মাত্র একভাগে পরিমাপ করা যায়। পৃথিবীর সর্বত্র নাতিগভীর জলে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। এমিবার ক্ষুধা আছে;—তাহার জন্য সে খাদ্যান্বেষণে বাহির হয়। একটি জীবের কামনা ও দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিবার জন্য কত বড় তাহাকে হইতে হয়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছোট বড়র, কোন মূল্য নাই। একটি ক্ষুদ্র অণু সারা সৌরজগতের মতই সুসংবদ্ধ। এমিবার মতই—অথচ এমিবাকেই পৃথিবীর প্রথম জীবন মনে না করিয়া—কোন প্রোটোপ্লাসমযুক্ত জীব ভিতরে ভিতরে কোন কারণে দুই ভাগে ভাঙিয়া গিয়াছিল এবং দুইটি জীবনের সৃষ্টি করিয়াছিল। পৃথিবীর আদিম জীবন বলিয়া ইহাকে অনুমান করা যাইতে পারে। এই দুইটিই ভাঙিয়া গিয়া পরে হইয়া যায় চার এবং বার বার এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল। বর্তমান জীবদেহে নূতন জীবকোষের সৃষ্টি এমনি করিয়াই হইয়া থাকে। প্রতি জীবকোষের ভিতর নূতন আর একটি জীবকোষ সৃষ্টি করিবার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে। এই জীবকোষগুলি, যদি দুর্ঘটনায় তাহাদের বিনষ্ট না করে, তবে নিজেরা অমর। প্রতি প্রাণীর ও প্রতি উদ্ভিদের জীবকোষ নূতন জীবকোষের অনুরূপ। মানুষ আমরা—আমাদের ভিতর কোটি কোটি সুসংবদ্ধ জীবকোষের দল, প্রত্যেকটি জীবকোষ তাহার
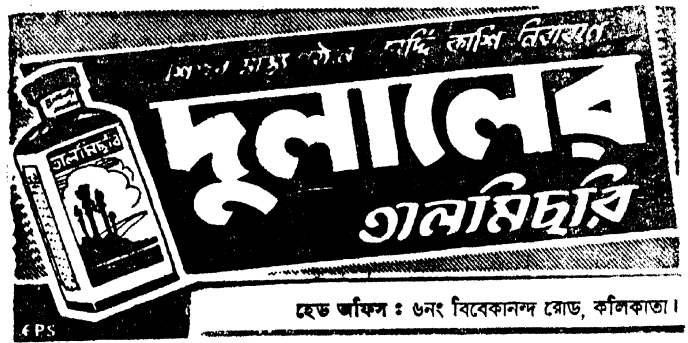
নির্দিষ্ট কাজ বিশ্বস্ত সৈনিকের মত নিঃশব্দে করিয়া যাইতেছে। নির্জীব অণু হইতে তাহারা কত বিভিন্ন।

অতি প্রাচীনকালে, জীবনের আদিম জন্ম-সময়ে, যে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ এই সময় করা যায়। তাহা অনেকের চোখেই পড়িবে। একটি জীবকোষ আসিয়াছিল, সূর্যকিরণে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ ভাঙ্গিয়া নিজের ও প্রতিবেশী জীব-কোষদের খাদ্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা লইয়া। অন্য একটি জীবকোষের বংশধরগণ এই প্রথমোক্ত জীবকোষের খাদ্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল এবং পৃথিবীর প্রথম প্রাণীদের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রথম জীবকোষের বংশধর-গণ উদ্ভিদে পরিণত হয়, যাহারা আজও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর খাদ্য যোগাইতেছে। আমরা কি বিশ্বাস করিব যে, একটি জীবকোষ উদ্ভিদে ও অপর জীবকোষটি জন্তুতে পরিণত হইয়াছিল তাহা কি সম্পাদিত হয় একটি তুচ্ছ ঘটনায়? এইখানেই সংগঠিত হইয়াছিল জীব ও উদ্ভিদ জগতের অদ্ভুত বিনিময় সম্পর্ক। অঙ্গারক বাষ্পের দিকে চাহিলে আমরা দেখি, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের এই বিভাগ জীবনের মতই প্রয়োজনীয় এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবন ইহার উপর একান্ত নির্ভরশীল। পৃথিবীতে যদি শুধু প্রাণীরাই থাকিত তাহা হইলে আজ পর্যন্ত তাহারা বাতাসের সমস্ত অক্সিজেনই খরচ করিয়া ফেলিত। শুধু উদ্ভিদই যদি পৃথিবীতে থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন উদ্ভিদখাদ্য অঙ্গারক বাষ্প আর পড়িয়া থাকিত না। শেষে উদ্ভিদ বা জনপ্রাণীর পৃথিবীতে চিহ্ন থাকিত না।

পৃথিবীর প্রথম দিকে কেহ কেহ মনে করেন বাতাসে কোন অক্সিজেন ছিল না। সমস্ত অক্সিজেনই পৃথিবীর প্রস্তর স্তরে জল ও অঙ্গারক বাষ্পের ভিতর মিশিয়া গিয়াছিল। তাহা যদি সত্যই হয়, তবে বাতাসের অক্সিজেন নিশ্চয় উদ্ভিদ হইতে আসিয়াছে। ইহা সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে কারণ উদ্ভিদ অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়। ইহা সত্য হইলে,—জীবদের যখন অক্সিজেন এত প্রয়োজন—জলে স্থলে উদ্ভিদরাজ্য প্রতিষ্ঠার অনেক পরে নিশ্চয় প্রাণীরা পৃথিবীতে আসিয়াছে। পৃথিবীতে কি দুইবার জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল?

ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

ইহা কি আশ্চর্য নয়, প্রথম প্রোটোপ্লাসম পরিপূর্ণ জীবকণা হইতে পুরুষ ও স্ত্রীর উদ্ভব হইয়াছে—ইহাদের বহু মিলনে বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন উদ্ভিদের জন্ম হইয়াছে;—উদ্ভিদ ও প্রাণী তাহাদের আদি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে?

বলা বাহুল্য এই সকল প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থশক্তির মিলনে।

সংঘবদ্ধভাবে থাকিলে, জীবকোষ সমষ্টির বাঁচিয়া থাকার বিশেষ সুবিধা হয়। আদিযুগের একাকী জীবকোষেরা তাই দুই চার, একশত একসহস্র এমনকি লক্ষ লক্ষ করিয়া একসঙ্গে মিলিতে লাগিল। প্রতি জীবকোষকে ইহার পর নিজের নিজের নির্দিষ্ট কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ক্রমে যখন বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন জীব-কোষ সম্পাদন করিতে লাগিল তখন আরম্ভ হইল জীবকোষসমষ্টির নূতন কার্য। প্রাণীদের মধ্যে কেশের মত দীর্ঘ ও ক্ষীণ শরীরের অংশ-গুলি খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করিতে লাগিল, অন্য জীবকোষদল এই খাদ্য পরিপাক করিতে লাগিল। শরীরের কোন কোন অংশে বহু জীবকোষ একত্রিত হইল। একদল রক্ষক জীব-কোষদল বহিরাবরণে পরিণত হইল—তাহারা বৃক্ষের ত্বক। অপর দল জীবন্ত প্রাণীর একস্থান হইতে অন্যস্থানে খাদ্য বিতরণ করিতে হইল সচেষ্ট। শেষে আমরা তাহাদের দেখি প্রস্তুত করিয়াছে উদ্ভিদের কাষ্ঠময় অবয়ব, জীবজন্তুর কঠিন অস্থি অথবা ক্রম বর্ধমান অবয়বকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সুদৃঢ় আবরণ। শামুক কাঁকড়ার বাহিরে এই ঢাকনা আছে। মানুষের মেরুদণ্ডের প্রয়োজন। জীবন্ত সমস্ত প্রাণীই একটি জীবকোষ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই জীবকোষ তাহার সৃষ্ট অপরাপর জীবকোষকে তাহাদের নির্দিষ্ট কাজ করিতে—তাহা সে স্থলচর মানুষই হউক কি জলচর মৎস্যই হউক—তাহাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে বাধ্য করে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, জীবকোষগুলির কি মানুষের মত বুদ্ধি বা কর্মশক্তি আছে? প্রকৃতি তাহাদের এই সকল বৃত্তি দিয়াছে কিনা জানা যায় না। কিন্তু আমাদের স্বীকার করিতেই হয় যে, জীবকোষগুলি তাহাদের অবয়বের পরিবর্তন করিতে এবং যে জীবদেহের তাহারা অংশ তাহার প্রয়োজনীয় কার্যগুলি সম্পাদন করিতে বাধ্য থাকে। প্রতি প্রাণীদেহের কোন জীবকোষকে তাহার মাংসপেশীর অংশ হইতেই হইবে, কাহাকেও বা ত্বকের অংশ হইয়া অবশেষে বিনষ্ট হইতে হইবে। দাঁতের শাদা অংশটি ইহাদের তৈরী করিতেই হইবে, গঠন করিতে হইবে চক্ষুর স্বচ্ছ জল নাক অথবা কানের অংশ-গুলি। নিজেদের বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবার জন্য তাহাদের নিজ অবয়বের পরিবর্তন করিতেই হইবে। কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য তাহাদের উপর পতিত আলোক-রশ্মিকে ডানদিকে অথবা বামদিকে বক্র করিয়া দেয়। জীবকোষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা যে না আছে তাহা নয়। লক্ষ লক্ষ জীবকোষকে একই সময়ে একই স্থানে একই কাজ করিতে হয় যেন সে কাজ করিতে তাহারা বাধ্য। জীবন অগ্রসর হইয়া চলে নূতনকে তৈরী করিয়া, জীর্ণকে মেরামত করিয়া, নিজেকে বর্ধিত করিয়া এবং নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়া—নির্জীব পদার্থের সে শক্তি নাই। ইহা অনুভব-শক্তি না স্বাভাবিক প্রবৃত্তি? হয়ত ইহা এমনিই ঘটে। কে ইহার উত্তর দিবে?

জীবন কিরূপে আসিয়াছিল পৃথিবীতে, কিরূপে তাহার আরম্ভ তাহা আজও রহস্যা-বৃত। আজও তাহা কেহ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে নাই। কিন্তু কেহ কেহ বিশ্বাস করেন জীবন কোন অজ্ঞাত বিরাট সৃষ্টিশক্তির বিকাশ, তাহা পার্থিব নহে। কোন পদার্থ হইতে তাহা আসে নাই।

অতীন্দ্রিয়

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আমার হৃদয় থেকে অনেক কুসুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে
অনায়াসে পথ চিনে লাখো লাখো হৃদয়ের ভীড়ে
ঠিক সেই হৃদয়েরই ফাঁকা ডালে নিঃসঙ্কোচে
রেখে যদি দিতে পারি কোনক্রমে অতি আলগোছে,
তারপরে ফাঁকা-ফাঁকা এমনের খিল খুলে দিয়ে
বাঁকাচোরা হৃদয়ের নুয়ে-পড়া শাখাকে লুকিয়ে
সমতল অবসরে অবিরাম চুপে চুপে চোখ চেয়ে থাকা ঃ

আমার কুসুম নিয়ে কুসুমিত হলো নাকি তবে সেই শাখা!
তবে কি অনেক ঝড়ে অনেক বাতাস এসে গেছে ফিরে ফিরে?
কুসুমেরা ঝরেনিকো পড়েনিকো মরেনিকো বিশ্বাসী সে-হৃদর তীরে!
অচেনা হৃদয় তারা খসে গেছে বাধা পেয়ে, ধ্বসে গেছে হয়ে আশাহত,
আমার হৃদয়-ছেঁড়া কুসুমেরা আজো বুঝি সে শাখায় তবু উদ্ধত!
তবে এ-হৃদয় থেকে কুসুমের বাকী বোঝা লঘু আরো লঘু হতে থাক,
নোতুন বাতাসে শুধু ও হৃদয়ের মাঝে মাঝে আমার খবর নিয়ে যাক।

হ্যাঙাক জ্বলতেই সবাই চলতে শুরু করলো। সামনে চৌকিদার পথ দেখিয়ে চলেছে। চৌকিদারের গতি মন্থর, হাকিমের পায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে আলো ফেল্‌তে হ'চ্ছে—সদর এস ডি ও প্রিয়ব্রত সেন একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মফঃস্বলের সফর সেরে আজকেই তার ফেরার কথা। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে তিনি দুপুর থেকেই তাগিদ দিচ্ছেন—কিন্তু হাকিমের আগমন উপলক্ষে বেচারা এর মধ্যেই একটা টি-পার্টির আয়োজন করে ফেলেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিছু চাঁদাও আদায় হ'য়েছে।

সামনেই বোর্ডের ইলেকশন—নমিনেশন প্রথা অবিশ্যি এখন আর চালু নেই; তবু হাকিম সহায় থাক্‌লে কতকটা ঈশ্বরকে হাতের কাছে পাওয়ার মত। চাল, চিনি, কেরোসিন, কাপড়, সবই তো হাকিমের অনুগ্রহে—রিলিফের টাকার বরাদ্দও তো তারই হাতে,—এমন কি বন্দুকের লাইসেন্স পর্যন্ত। চারিদিকে নজর আছে বলেই সে বারো বছর একটানা প্রেসিডেণ্ট হতে পেরেছে। তা ছাড়া এবার ইলেকশনে রায়পুরের ছোটবাবুই হয়ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন, কানাঘুষার থেকে কথাটা আঁচ করতে পেরেই তাকে সতর্ক হতে হয়েছে।

হাকিমকে অস্থির হ'তে দেখে প্রেসিডেণ্ট মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বল্‌লে ঃ হুজুর একটু চায়ের আয়োজন করেছিলাম, মানে এখানে সকলেরই ইচ্ছা—আপনার দর্শন পাওয়া'তো ভাগ্যের কথা—মানে—তাই আর কি!

প্রিয়ব্রত সেন হাকিমী মেজাজে একটু খি'চিয়ে উঠলেন: না-না—এসব কি? আমি কোথায় কাজে এসেছি—আপনি আবার এর মধ্যে—যত সব—

সব কথা বোঝা গেল না, তবে মেজাজটা যে কৃত্রিম বারো বৎসরের অভিজ্ঞতায় প্রেসিডেণ্ট তা বুঝে নিয়েছে।

ঃ আজ্ঞে আমি ওদের বার বার বলেছি—হুজুর এসব পছন্দ করেন না, কিন্তু জানেন তো অশিক্ষিত চাষাভুষোর দল—কিছু বোঝে না।

প্রিয়ব্রতকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু সাহস পেয়ে প্রেসিডেণ্ট তাড়াতাড়ি চায়ের পর্ব শেষ করার ঢালা হুকুম দিলে।

টেবিলের ওপর প্লেট, ডিস, মায় ফুল-দানিটি পর্যন্ত সবই প্রস্তুত। প্রেসিডেণ্টের আদেশে উপকরণগুলো শহর থেকেই সংগ্রহ হ'য়েছে—পরিবেশনের জন্য মডেল কেবিনের একজন বাবুর্চি পর্যন্ত।

অনাবশ্যক এতটা সময় হাতছাড়া হয়ে গেল। প্রিয়ব্রত মনে মনে একটু হিসেব করে বললে ঃ রায়পুর এখান থেকে কতদূর?

ঃ আজ্ঞে ডাকবাংলোর থেকে প্রায় এক মাইল—আমরাও তো আর এসে পড়েছি—ওইতো চৌধুরী বাড়ীর মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

সামনে জল, এসে পড়লেও আর এগুনো যাচ্ছে না।

ডোবার জল ভরে মাঠ ভেসে গেছে, ধানের ডগাও আর দেখা যায় না। জলের দিকে তাকিয়ে প্রিয়ব্রত বিরক্তিপূর্ণ স্বরে উচ্চারণ করলেঃ ননসেন্স। প্রেসিডেণ্টও একটু মুষড়ে গেল—সত্যি কথা বলতে কি হাকিমের এরকম অতর্কিত আকস্মিক আগমন সে আন্দাজ করতে পারেনি। নয়তো তালের ডিঙিগও একটা রাখা যেত।

চুপি চুপি খাসকামরায় গোপন সংবাদটা সেই সরবরাহ করেছিল, কিন্তু হাকিমের হুকুম হতে সাধারণত দীর্ঘ সময় নেয়—তারপর স্বয়ং এস ডি ও বাহাদুর যে সরজমীন তদন্তে আসবেন এরকম আশাতীত সৌভাগ্যের কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

অকারণে নিজেকে অপরাধী মনে করে সে সংকুচিত হয়ে পড়লো, মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হলো না।

প্রেসিডেণ্টের অবস্থা দেখে চৌকিদারও বিচলিত হলো—এসব ক্ষেত্রে বড়র ত্রুটির ফল ভোগ ছোটকেই করতে হয়।

চৌকিদারি ঢঙে সেও খানিকটা হাঁকডাক দিলে, তারপর ডিঙ্গি আনবার জন্যে হাকিমের অনুমতি চাইলে।

দূর থেকে ঘণ্টার একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শব্দটা এ অঞ্চলে পরিচিত।

ঃ চৌধুরী বাবুদের হাতী আসছে। চৌকিদার বললে।

ঃ রায়পুরের চৌধুরী?—প্রিয়ব্রত প্রশ্ন করলে।

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

শব্দটা কাছে এবং আরও কাছে এসে থেমে গেল।

জমিদার অনঙ্গ চৌধুরী এগিয়ে এসে নমস্কার জানালেন ঃ জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো পথ দেখতে পাবেন না—তার চেয়ে এগিয়ে আসুন।

ঃ ধন্যবাদ। অন্য সময় হলে এই গায়ে-পড়া সৌজন্যে এস ডি ও হয়ত বিরক্ত হতেন, কিন্তু এখন একটা কিনারা দেখতে পেয়ে বরং খুশিই হলেন।

ঃ আপনারা তো রায়পুরেই যাচ্ছেন?

সবাই চুপ করে রইলো। প্রশ্নটা অবান্তর। কারণ সামনে রায়পুর ছাড়া অন্য কোন গ্রাম নেই, তারপরই চষা ক্ষেত আর বিল।

ঃ খবরটা আগে জানা থাকলে আর আপনাকে এতক্ষণ কষ্ট করতে হ'তো না। কি বলেন প্রেসিডেণ্ট সাহেব?

এই সম্মানিত সম্বোধনে যেটুকু খোঁচা ছিল, প্রেসিডেণ্ট তা বুঝতে পেরে যেন আরও সংকুচিত হয়ে পড়লো।

চৌধুরীরা যে কর্তাদিনের বনেদি জমিদার তা ঠাকুর দালানের ইটের গাঁথুনি আর মন্দিরের খিলানের শিল্পকাজ দেখেই অনুমান করা যায়।

পাইক, বরকন্দাজ, লোক, লস্করে কাছারী বাড়ি সরগরম। কাছারী পার হয়েই সিংহ-দরজা। দরজার দু'পাশে দুটি জীবন্ত বাঘ দেখে প্রিয়ব্রত চমকে দু'পা পিছিয়ে এলো। বাঘের পেটে একটা ঠেলা দিয়ে অনঙ্গ চৌধুরী হেসে বললে ঃ ছোট ভায়ের কীর্তি। লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল প্রিয়ব্রত।

রুচির আভিজাত্যে পরিচ্ছন্ন একটি ঘরে বসে হাকিম একটু অন্যমনা হলেন। কোথাও একটু খুঁত নেই, কাশ্মীরী গালিচা থেকে নিকোলাস রোরিকের ছবি পর্যন্ত।

টানাপাখাও আছে, কিন্তু তালপাতার মর্যাদা আলাদা। হাকিমের সামনে বিরাট তালপাখায় তাই হাওয়ার ঝড় বইয়ে দিচ্ছে খানসামা।

প্রিয়ব্রত একটু চঞ্চল হয়ে বললে ঃ হাওয়া খেতে তো আসিনি।

ঃ তা জানি। তবে চলুন গোলাবাড়ির দিকেই যাওয়া যাক্।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালো প্রিয়ব্রত ঃ আপনি জানতেন বুঝি?

ঃ আপনাদের নজরের দিকে লক্ষ্য রেখেই তো আমাদের চলতে হয়। অনঙ্গ চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এক টুকরা হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট সেদিকে তাকাতে সাহস করলো না, মুখ নীচু করে সে চলতে লাগলো।

সারি সারি গোলাঘর আর বস্তা বোঝাই ধান। একবার সবটা ঘুরে আসতেই যথেষ্ট সময় লাগে। পরিমাণ অনেকটা আন্দাজ করে নিতে হয়—পরীক্ষা করে নেওয়া দু'একদিনের কাজ নয়।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর শ্রান্ত হয়ে এস ডি ও বললেন ঃ তাহলে সবশুদ্ধ পাঁচ হাজার মণ ধান পেয়েছেন?

ঃ পাঁচ নয়—ছ' হাজার মণ।

ঃ তবু বলছেন গভর্নমেণ্টকে দেবার মত বাড়তি ধান আপনার নেই?

ঃ আমার লোকজন তো সব দেখলেন—আশেপাশের প্রজাদের অভাবের সময় আমাকেই চাল জোগাতে হয়।

ঃ আপনি সেটাও ঘর-খোরাকীর মধ্যে ধরতে চান! বেশতো। হাকিমের হাসিতে একটু অবজ্ঞা ছিল—সেই সংগে একটু করুণাও ঃ না-না—এসব আপনি আমায় বিশ্বাস করতে বলবেন না—আমি জানি; চাল কোথায় যায়—আর সে তদন্তও আমাকেই করতে হবে।

ঃ আপনার মুখ থেকে এতটা আশা করিনি। আপনি হাকিম যা খুশি তাই বলতে পারেন—কিন্তু আমি জমিদার বলেই যা খুশি তাই করতে পারি না। জমিদারের কঠোর দৃষ্টির চাবুকটা এসে লাগলো প্রেসিডেণ্টের গায়ে। কেউ আর কোন কথা বললে না; —রাত্রির অন্ধকারে অনঙ্গ চৌধুরীর চোখ দুটো শুধু জ্বলতে লাগলো।

ফিরে এসে প্রিয়ব্রত যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ঃ আপনি অতিথি। এরকমভাবে চলে গিয়ে আমায় অপমান করতে চান?

ঃ আপনি ভুল বুঝচেন অনঙ্গবাবু—যে করেই হোক আজকে আমায় ফিরতে হবে—অতিথি হতে আমি আসিনি।

ঃ কিন্তু ফিরবার আপনার পথ কোথায়? আপনি যাবার আগেই তো এদিককার খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

ঃ খেয়া বন্ধ হলে ট্রেন তো আছে।

ঃ না তা-ও নেই। রাত দশটার পরে ট্রেন কোথায়?

প্রিয়ব্রত একটু চুপ করে গেল।

ঃ তাহলে ডাকবাংলোতেই রাত কাটাতে হবে। একটু থেমে আবার বললে।

ঃ সামনের জলা তো দেখলেন। ডাক-বাংলোয় বা যাবেন কি করে?

সে কথা ঠিক। জমিদারের সাহায্য ছাড়া ডাকবাংলোয় পৌঁছানোও অসম্ভব ব্যাপার। সাহায্য যখন নিতেই হবে তখন এখানে থাকা এমন কি দোষের? প্রেসিডেণ্ট এস ডি ও'র ভাবগতিক দেখে উসখুস করছিল। তার

একটা রাতের অনুপস্থিতিতে অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারে। হাকিম যেরকম খেয়ালী লোক, তাছাড়া এখন একা বাড়ি যেতে হলে সাঁতার ছাড়া উপায় নেই।

ঃ তাহলে থেকেই যান—কি বলেন? আমিও ওদিকের ঘরটা ঠিক করে দিতে বলি—আর সেই সংগে আপনার খাবারও।

ঃ না—না—কিছু খেতে আমি পারবো না। ও অনুরোধ আমায় করবেন না।

ঃ আপত্তি থাকলে আর করবো কেন? বেশ তবে শোবার ব্যবস্থাই হোক—আপনিও ক্লান্ত। কি বলেন প্রেসিডেণ্ট সাহেব? আপনাকে বোধ হয় আজ একটু কষ্টই করতে হবে। কষ্ট যে কি, সেটা সে ভালো করেই জানে। হাকিম যে এভাবে হেলে পড়বেন, এটা সে আগে থাকতে বুঝতে পারেনি।

নতুন জায়গায় ঘুম আসতে একটু দেরি হয়। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় প্রিয়ব্রত ঘরের চারপাশটা একবার চোখ মেলে তাকালো।

রাত্রির স্তব্ধতায় একটানা ঝিঁঝিঁর শব্দ। ঠাকুর বাড়ির মন্দিরের ঘণ্টা কখন থেমে গেছে, —তারই শব্দতরংগ এখনও যেন বাতাসে দুলছে।

বিলের জলে জাল ফেলার ছপছপ আওয়াজ দূর থেকে অস্পষ্টভাবে কানে আসছে। শহরে এখন কেউ ঘুমোয় না। গ্রাম বলেই সব নিঝুম, নিস্তব্ধ।

দেয়ালের দিকে চোখ পড়তেই প্রিয়ব্রত চমকে উঠে দাঁড়ালো। শিকারের পোষাকে সুশ্রী একটি তরুণ—পায়ের নীচে একটা মরা বাঘ পড়ে, এক হাতে বন্দুক, আর একটা পা বাঘের পিঠের ওপর।

প্রিয়ব্রত মাথায় হাত রেখে ভাববার চেষ্টা করলো।

প্রায় পনর বছর—পনর বছর আগেই হবে। তখন প্রিয়ব্রত এই শহরে নতুন প্রবেশনার ডেপুটি হয়ে এসেছে, বিয়ের পরে সুজাতা সেই প্রথম সংগে এসেছে।

পথের ক্লান্তি ভুলে দুদিনেই সুজাতা পরিচ্ছন্ন ফিটফাটভাবে ঘর গুছিয়ে ফেললে—ঠিক যে জায়গার যেটি, একটুও এদিক-ওদিক হবার যো নেই। ড্রেসিং টেবিলটা ড্রয়িংরুমে ছিল, সেটা শোবার ঘরে এনে বসানো হল, বুককেসটা শোবার ঘর থেকে গেল ড্রয়িংরুমে। ডাইনিং হলের জানালায় পর্দা ছিল না, পর্দা ঝুললো একটা। লম্বা আলমারীটা অফিস ঘরে চলে গেল—মিড্‌সেফটা জায়গা বদল হয়ে রান্নাঘরের এক কোণে স্থায়ী আসন দখল করলো।

এসব কাজ এমন নিখুঁতভাবে করলে সুজাতা যে, দেখে একবারও মনে হলো না, নতুন জায়গায় এসে তার বিশেষ কিছু অসুবিধে হচ্ছে। ঘরের সমস্ত জিনিসে একটা রুচির ছাপ—কোথাও ত্রুটি নেই একটুও। প্রিয়ব্রত দেখে খুশি হলো, আর খুশি হবার কথাও।

সুজাতা এখানে আসার আগে অমত করেছে, বলেছে পচা পুরোনো জায়গায় আবার যাবো কি? তার চেয়ে অন্য জায়গায় যাতে হয় চেষ্টা করো—চেষ্টা করতে দোষ কি? —একবার বদলী হলে বুঝি বাতিল করা যায় না? —খুব যায়, শেষ পর্যন্ত সন্দ্বীপ কিম্বা রাঙগামাটিও হতে পারে।

সব ভেবে প্রিয়ব্রত আর কিছু করেনি—চলে এসেছে এই শহরে।

সুজাতার ছেলেবেলা থেকে দেখা কলেজ-জীবনের পুরোনো পচা এই জায়গায় এসে বাসা বেঁধেছে।

শহরের বদল হয়নি কিছু—শুধু বড় রাস্তাটায় পিচ ঢালা হয়েছে। নতুনের মধ্যে ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস। ছোট শহর, বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে।

তাদের বাড়ির কাছে ছিল ব্রহ্মপুত্র, পার ভেংগে ভেংগে নদীটা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে—নদীর মাঝখানে দেখা দিয়েছে চর। চরের জমিটা তো ওদেরই? —ওই যে বাড়ির পাশে যারা ছিল—কোন্ গাঁয়ের যেন জমিদার? সব নাম সুজাতার মনেও থাকে না। অনেক লোক-জন ছিল তখন—কে জানে এখন কে আছে সেখানে।

এ পর্যন্ত কারও সংগে আলাপ হলো না, সুজাতা যেচে কারও সংগে আলাপ করতে পারে না। পুরুষেরা কিন্তু বেশ—চটপট কেমন জমে যেতে পারে।

প্রিয়ব্রতও তেমনি জমে গেছে—আড্ডা নিয়ে মেতে উঠেছে।

অফিসাররা কেন—বাইরের লোকও আসছে আজকাল।

এই তো সেদিন এলো একজন, সুজাতা ভেতরে যাবার অবসরও পায়নি। বাইরের ঘরে বসে একেবারে অপ্রস্তুত। উঠে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিল ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেনঃ না—না, উঠবেন না, আপনার সংগেও দরকার আছে।

সে আবার কি! সুজাতার মুখখানা শাদা হয়ে গিয়েছিল।

প্রিয়ব্রত হেসে বললেঃ বসো না—আলাপ করিয়ে দি। উনি মিঃ চৌধুরী—খুব ভাল শিকারী।

সুজাতা বসতে চায়নি—পিছন দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

ঃ কাল রাত্রে কিন্তু খুব ঠকে গিয়েছি—একটাও বিগ্ গেম হলো না—মাত্র দুটো হরিণ—তাও একেবারে বাচ্চা। আপনি হরিণের মাংস খান তো? ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

প্রিয়ব্রত হাঁ-না কিছুই বললে না। চুপ করে থাকাতেই বোধ হয় জবাব মিললো। মিঃ চৌধুরী অনুরোধ জানালেন এবারঃ রাত্রে আসুন না আমাদের ওখানে। খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে—মিসেসকেও সংগে আনবেন। আপনি তো নতুন এসেছেন—আলাপ হবে এখানে সকলের সংগে।

ঃ বেশ তো। প্রিয়ব্রত সম্মতি দিলে। মন্দ কি? নতুন জায়গায় দু'দশজন লোকের সংগে আলাপ থাকা ভাল। সুজাতা অন্যদিকে চেয়েছিল, ভদ্রলোক চলে গেলে ফিরে দাঁড়াল।

ঃ উপস্থিত একজন ডাক্তারের সংগে আলাপ হওয়া একান্ত দরকার নয়কি?

ঃ যাও! আর চালাকি করতে হবে না। সলজ্জ হাসির ঝিলিক দিয়ে সুজাতা বললে।

ঃ তুমি যাবে নাকি ওদের ওখানে। একটু পরে আবার প্রশ্ন করলে।

ঃ তুমি যাবে না?

ঃ আমি! পাগল হয়েছ। —ভদ্রলোকের স্ত্রী নেমন্তন্ন করলে হয়তো যেতাম।

ঃ তাহলে তোমার কোনদিনই যাওয়া হতো না—কারণ ভদ্রলোক বিয়ে করেন নি।

ঃ তাই নাকি? সুজাতার বিস্ময়টা অকৃত্রিম কিনা, বোঝা গেল না।

ঃ তুমি জানলে কি করে?

ঃ জানবো না! ভদ্রলোক প্রায়ই ক্লাবে আসেন যে—আমাদের সকলের সংগে খুব আলাপ। —হাসি, গল্প, তাস—আর শিকারের গল্প উঠলে তো কথাই নেই। সারারাত বোধ হয় একাই ব'কে যেতে পারে।

ঃ তাই বুঝি। বকতে তো আজকাল তুমিও কম পারো না দেখছি। এখন খাবে, চলো—কাছারীর বেলা হয়নি?

সুজাতা বরাবরই দেখেছে প্রিয়ব্রত একটু বড়লোক ঘেঁষা। জমিদারের ছেলে বলে মাথা কিনে রেখেছে নাকি? কোথাও কিছু নয়—হরিণ মেরেছে, অমনি খেতে ডাক পড়লো। না, তার যাওয়া হবে না—দেখি প্রিয়ব্রত কি করে যায়?

সেদিন প্রিয়ব্রতর যাওয়া হলো না—সময় বুঝে সুজাতা এমনি মাথা ধরার ভাণ করলো!

পরের দিন দুপুরে এলেন ভদ্রলোক। সুজাতা বাইরের ঘরে এমনি বসেছিল, থতমত খেয়ে বললেঃ উনি তো বাড়ি নেই।

ঃ হাঁ, খেয়া পার হতে দেখলাম।

তাহলে জেনেই এসেছে—সুজাতার মনটা নাড়া দিয়ে উঠলো—প্রস্তুত হবার জন্যে সময় নিলে খানিকটা।

মিঃ চৌধুরীই আরম্ভ করলেনঃ তুমি নিজে গেলে না—ভদ্রলোককেও যেতে দিলে না কাল। মিছিমিছি সকলের কাছে অপদস্থ হলাম। তোমাদের উপলক্ষ্য করেই এত আয়োজন করা হলো, অথচ—

ঃ কেন যাইনি, জানতে এসেছেন বুঝি? সুজাতার স্বর ধারালো।

ঃ শুধু জানতে নয়, বুঝে নিতেও এসেছি। তুমি কি আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও? পারবে মনে হয়? জানো তো আমাকে—

ঃ দেখা যাক। শিকারীও বাঘের হাতে মারা পড়ে।

ঃ তাই নাকি? শুনে খুশি হলাম। তবে জেনে রেখো, যতক্ষণ আমার হাতে গুলী আছে —শিকার আমার অব্যর্থ।

সুজাতা প্রত্যুত্তর করলে না। সত্যি সে ঠিক এতটা আশা করতে পারেনি, সাপের চোখে ধুলো পড়লে যেমন পথ দেখতে পায় না —চুপ করে থাকে, সুজাতা তেমনি মাথা নীচু করে বসে রইলো।

ঝড়ের বেগে চলে গেলেন মিঃ চৌধুরী— শুধু তার জুতোর ধুলো হাওয়ায় ঘুরতে লাগলো।

সুজাতা বুঝলো ব্যাপারটা ঠিক হয়নি। অন্য রকম ভাবা উচিত ছিল তার।

বাধা দিলে বেড়ে যায়—কথাটা ঠিক বোধ হয়। সেদিন মিঃ চৌধুরী আসতেই প্রিয়ব্রতকে নিষেধ করলো সুজাতা। প্রিয়ব্রত মুখে বললেঃ না। কিন্তু সন্ধান নিয়ে জানলো— গেছে ঠিক। —তাকে লুকিয়েই গেছে।

একদিন সুজাতা একটু রেগেই বললেঃ তুমি শিকারের জানো কি? —যাও যে সঙ্গে বড়—গুলীর বাক্স বয়ে বেড়াও বুঝি?

ঃ তুমি বুঝতে পারবে না, রাত্রে জঙ্গলে থাকার কি আনন্দ।

ঃ বুঝতে চাই-ও না। —সত্যি জঙ্গলকে তার খুব ভয়, আর ভয় শিকারকে।

একা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে সুজাতা। মফঃস্বলে গেলে একবারে দু'-তিন দিন—তার আগে তো নয়ই, কোনবার ফিরতে পাঁচদিন হয়।

সুজাতা বললেঃ এবার আমি সঙ্গে যাবো —না বললে ছাড়চি না। আর সত্যি গেলও। বাধ্য হয়ে প্রিয়ব্রতকে একটা মোটর ঠিক করতে হলো।

সফর শেষ হলো হালুয়াঘাটে, কিন্তু গেল তারা ডালু পর্যন্ত। সুজাতা কিছুতেই ছাড়তে চাইলে না, বললেঃ এখন ফিরবো কি? আর বুঝি আসা হবে আমার?

দু' পাশে শালবন আর রাঙা মাটির রাস্তা। গারো পাহাড়ের গা-ঘেঁষে ওপরে উঠছে তারা। উঁচু কাঠের খুঁটির ওপর মাঝে মাঝে দু-একখানা ঘর—তারপর আবার জঙ্গল। প্রতিবেশী বলে নেই কিছু এখানে। সব ছাড়া-ছাড়া। একজনকে সাপে কাটলে আর একজন তার ডাক শুনতে পাবে না।

সুজাতা যেতে চেয়েছিল তুরা পর্যন্ত। পেট্রলের দোহাই দিয়ে ফিরিয়ে আনলে প্রিয়ব্রত। এখানে পেট্রল ফুরোলে আর উপায় আছে?

বাধা যে কোথায়—পেট্রল ফুরোনোর অজুহাত যে ভুয়ো, তা সুজাতাও বুঝেছিল— তাই আর আপত্তি করেনি।

শরীর তার সত্যি কাহিল হয়ে গেছে; আর সে কাহিল যে কতটা—শহরে ফিরে টের পেল সুজাতা।

বিছনায় একেবারে নেতিয়ে পড়লো— ভেঙ্গে পড়লো যন্ত্রণায়।

সমস্ত দিন একরকম ছিল, বিকেলের দিকে একটু বাড়বাড়ি হ'লো। ডাক্তার একবার দেখে গেছে। হাতের কাছে একটা দাই থাকা দরকার।

পাঠিয়েছে চাপরাশিকে। বুড়ো চাপরাশি এদিককার সব খোঁজ-খবর রাখে।

সুজাতা হাত দু'টো কাছে টেনে বললেঃ তুমি যেন যেওনা কোথাও—আমার ভয় করছে।

ভয় কি? ভয়ের কি আছে? মুখে সাহস দিলেও প্রিয়ব্রত নিজেই স্থির হ'তে পারছেনা।

অস্থিরভাবে পায়চারি করছে—ঘর আর বারান্দা। একবার সুজাতার কাছে এসে অনাবশ্যক প্রশ্ন করছে—আবার বাইরে এসে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছে। হয়ত কিছুই ভাবছে না—চুপ ক'রে শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যের দিকে নেড়ির মা'কে নিয়ে চাপরাশি ফিরে এলো, প্রিয়ব্রত এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত।

দাই ঘরে ঢুকেছে। মেয়েলী পরীক্ষার ব্যাপারে পুরুষের কাছে সংকোচ আসা স্বাভাবিক। প্রিয়ব্রত ইচ্ছে ক'রেই ভেতরে যায় নি—দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে শুধু।

পাকা দাই, অভিজ্ঞতা আছে তার। আলোটা একেবারে মুখের কাছে ধরে বললেঃ ওমা তুমি! তুমিতো আমার চেনা লোক গো।

প্রিয়ব্রতর কানে গেল কথাটা। আর সুজাতা—মুখখানা নীল হ'য়ে গেছে তার, নেড়ির মা'কে দেখে যন্ত্রণা যেন তার আরও বেড়ে গেছে।

গলা শুখিয়ে আসছে, জিভটা যেন ভেতরের দিকে টেনে নিচ্ছে।

আগে ব্যথাটা থেকে থেকে আসছিল, এখন যেন প্রবলভাবে নাড়ীতে টান পড়ছে— ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়।

দাই প্রবোধ দিলে আবারঃ এবার আর তোমার অতো কষ্ট হ'বেনা, এখুনি খালাস হ'বে।

কথাটা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ঝড় ব'য়ে গেল বারান্দায়। প্রিয়ব্রত'র হাতের সিগারেট মাটিতে পড়ে গেল; তারপর সিগারেট জ্বললো একটার পর একটা, কোনটাই খাওয়া হ'লো না শেষ পর্যন্ত। একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো যেন আস্তে আস্তে ফুস্‌ফুসকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। দম বন্ধ হ'য়ে আসছে তার, কি ক'রে সে নিঃশ্বাস নেবে আবার!

চরম মুহূর্তে একটা গোঙানি কানে এসেছিল—তারপর......

ঘরের সব কিছু তেমনিই আছে। আলনায় সুজাতার নতুন ভাঁজভাঙ্গা শাড়ীটা পর্যন্ত। বাচ্চার দু'টো ফ্রক—অসমাপ্ত কাঁথা দু একখানা বাক্সর ওপর ছড়ানো।

প্রিয়ব্রত সিগারেট শেষ করলে একটা।

চুরুট খেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে তার, হাতের কাছে যদি একটা চুরুট থাকতো।

শিকারীকে প্রিয়ব্রত এতক্ষণে চিনতে পেরেছে।

জমিদার অনঙ্গ চৌধুরীর ডাকে তার ঘুম ভাঙ্গলো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সমস্ত রাত না ঘুমিয়ে শরীরটা তার অবসন্ন। কোন কিছু ভালো লাগছে না, এখন শহরে ফিরতে পারলে বাঁচে।

ঃ চা' দেওয়া হয়েছে আপনার। গতকালের মত অনঙ্গ চৌধুরীর অনুরোধে আজ আর না বলতে পারলে না, সত্যি চা'য়ের তার এখন বিশেষ দরকার।

চা'য়ের টেবিলে ব'সে প্রিয়ব্রত বললেঃ আপনার ছোট ভাই বুঝি এখনও শিকার করেন?

ঃও নেশা কি সহজে যায়? আর কোন কথা হ'লো না।

ততক্ষণে হাতী এসে গেছে, প্রিয়ব্রত উঠে পড়লো, যাবার সময় শুধু বললেঃ আপনার ছোটভাইকে একবার কাগজপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। কি যেন নাম?

ঃরঞ্জন চৌধুরী।

ঃঠিক হিসেব পাঠাবেন কিন্তু। ঠাকুর সেবা, ঘর খোরাকী আর মাসিক বৃত্তিতে কত লাগে। প্রিয়ব্রত একটু মুচ্‌কি হাস্‌লো। এ হাসিতে কোন কটাক্ষ ছিল না—অনঙ্গ চৌধুরী তার ব্যবহারে হয়ত বুঝতে পেরেছিল।

ধানের ব্যাপার নিয়ে কালেক্টারকে একটা রিপোর্ট দেওয়া দরকার। রঞ্জনবাবুও আর খোঁজ নিলেন না। প্রিয়ব্রত আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে না, আজই যা হয় একটা কিছু করতে হ'বে। পিওন পাঠিয়ে খবর দিলে গরজ মনে হ'বে। কি দরকার? যা হ'বার হোক্‌। রিপোর্ট'টা পাঠাবার আগে প্রেসিডেন্টকে একবার ডেকে পাঠাতে হ'বে। তার সব কথা তখন ভালো ক'রে শোনা হয়নি।

হঠাৎ কে যেন তার নাম ধরে ডাক্‌ছে মনে হ'লো। মফঃস্বল শহরে সহকর্মী অফিসার ছাড়া হাকিমের বড় কেউ নাম ধরে ডাকে না। চাপরাশি কেউ নেই নাকি?

প্রিয়ব্রত বাইরে এলো।

এসেছে রঞ্জন চৌধুরী—এতদিন পরেও প্রিয়ব্রত'র চিন্‌তে একটুও কষ্ট হ'লো না। এখনও আগের চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য মিল

আছে, একটুও বদলায়নি, বয়সের ছাপ শুধু কপালের দু' একটি রেখায়। দৃঢ় চিবুক ধারালো নাক, চোখে শিকারীর সন্ধানী দৃষ্টি, একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

ঃ অনেক দেরী ক'রে ফেল্‌লেন।

ঃ আপনার কাছে আসার জন্যে প্রস্তুত হ'তেই যা সময় গেল। একটু হেসে বল্‌লে রঞ্জন।

ঃ চিন্‌তে পেরেছেন তাহ'লে? প্রশ্নটা অবান্তর, রঞ্জন নিজেই বুঝ্‌লো।

ঃ না। প্রিয়ব্রত হাস্‌লো এবার।

একটু থেমে আবার বল্‌লেঃ দেখুন আমি ভেবে দেখেছি, আপনাদের কিছু ধান গবর্ন-মেণ্টকে দিতেই হ'বে।

ঃ তাহ'লে আমার এসে লাভ কি হ'লো?

আবার দু'জনেই চুপ। প্রিয়ব্রত একটা ফাইল বের করলে, সরকারী তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক ইউনিয়নে হাসপাতাল খোলার প্রস্তাব আছে এতে।

প্রিয়ব্রত বললেঃ দেখুন আমি একটা কথা ভাব্‌ছি। আপনি রাজী হ'লে আপনাদের সুবিধে করে দিতে পারি।

ঃ না জেনে রাজী হওয়া তো মুশ্‌কিল। একটু হেসে বল্‌লে রঞ্জন।

ঃ মুশ্‌কিল নয়—আপনাদের উপকারই হবে। আপনাদের ইউনিয়নে একটা ম্যাটারনিটি হোম করতে চাই। সরকারও সাহায্য করবেন, কিন্তু আপনাদের মোটা টাকা দিতে হ'বে। অন্ততঃ পাঁচ হাজার ত বটেই।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রঞ্জন চৌধুরী বললেঃ অতো কি করে হ'বে? তিন হাজার পর্যন্ত দিতে পারি, কিন্তু আমার একটা সর্ত আছে। হাসপাতালের নামকরণ করবো আমি।

ঃ বেশ তো। আপনার মায়ের নাম দিতে চান বুঝি।

ঃ না। হাসপাতালের নাম হবে "সুজাতা ম্যাটারনিটি হোম"।

প্রিয়ব্রত ঠিক চম্‌কে উঠ্‌লো কিনা বোঝা গেল না। চুরুটের ধোঁয়ায় সমস্ত মুখটা তার ঢাকা পড়েছে।

ঃ আপনাকে এখনই উত্তর দিতে বলছি না, পরে জানালেই হ'বে। রঞ্জন চৌধুরী আর অপেক্ষা না ক'রে চলে গেল।

প্রিয়ব্রতকে গালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে দেখে সুমিতা বললেঃ কি ভাবছো এত? কাছারী যাবে তো? এবার পারমিটে তোমাদের হেমদাকে দু'খানা ভাল শাড়ী দিতে বলো—বুঝ্‌লে?

প্রিয়ব্রত তবুও চুপ—কোন দিকে খেয়াল নেই তার।

কিছুদিন পরে প্রিয়ব্রত প্রমোশন পেয়ে এ্যাডিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে বদ্‌লী হ'লো বর্ধমানে। যাবার আগে সব ফাইল শেষ ক'রে, এ ফাইলটা পাঠাবার আগে রায়পুরে একটা চিঠি পাঠাল।

......আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী। এ সম্বন্ধে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করবেন। তবে তিন হাজার নয় পাঁচ হাজার। শিকারের পেছনে ত অনেক টাকাই অপব্যয় করেছেন, একটা সত্যিকারের সৎকাজ করুন না!

পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রধান সচিব মিস্টার লিয়াকৎ আলী পূর্ব-পাকিস্থান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রকাশ, তথায় তাঁহার সম্বর্ধনা আশানুরূপ হয় নাই; কারণ পূর্ব-পাকিস্থানের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়কে তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য অর্থ দিতে বাধ্য করিলে তাহা ক্ষতে ক্ষারক্ষেপই হইয়াছে এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগণ দেখিতেছে, চাউলের মূল্য কল্পনাতীতভাবে অধিক হইয়াছে এবং রেলে ও স্টীমারে তাহাদিগকে ভাড়া দিতেও হইতেছে; আর নোয়াখালি-ত্রিপুরায় তাহারা যেভাবে লুণ্ঠনাদি করিতে পাইয়াছিল, এখন আর সেভাবে কাজ করিতে উৎসাহ পাইতেছে না। সে যাহাই হউক, মিস্টার লিয়াকৎ আলী পূর্ব-পাকিস্থানের অধিবাসী-দিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারত-রাষ্ট্রকে যাহা বলিবার জন্য পূর্ব-পাকিস্থানে গিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া গিয়াছেনঃ—

পাকিস্থানের সমস্যা—রাষ্ট্র রক্ষার ও অর্থনৈতিক। এতদুভয়ের মধ্যে রাষ্ট্র রক্ষার সমস্যাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। রাষ্ট্র রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত কোন দেশ তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না—সেইজন্য পাকিস্থান আর্থিক উন্নতি লাভে বিলম্ব করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র রক্ষার কাজে বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না।

অল্পদিন পূর্বে ভারত-রাষ্ট্রের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলিয়াছিলেন, পাকিস্থান যদি পূর্ব-পাকিস্থানে হিন্দুর বাস না চাহে, তবে তাহাকে তথা হইতে বাস্তুত্যাগী হিন্দু-দিগের বসবাসের জন্য আবশ্যক জমি পশ্চিম-বঙ্গকে দিতে বলা হইবে। পাকিস্থানে এই উক্তি সমরাহ্বান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এবং পাকিস্থান বলিয়াছিল—সেজন্য সে রাষ্ট্র প্রস্তুত। তাহার পরে যদিও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—সর্দারজীর উক্তিতে ভয় দেখান হয় নাই, তথাপি পাকিস্থান সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নাই।

অবশ্য যাহারা অর্ধাশনে কালাতিপাত করিতেছে, তাহারা মিস্টার লিয়াকৎ আলীর উক্তি—পাকিস্থানীরা অনাহারে থাকিয়াও সামরিক শক্তি বর্ধিত করিবে—পূর্ব-পাকিস্থানের জনগণ বিশেষ উৎসাহপ্রদ মনে করিয়াছে কিনা, বলা যায় না—তথাপি তাঁহার উক্তির উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

মিস্টার লিয়াকৎ আলী বলিয়াছেন—পূর্ব-পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরা যে ব্যবহার পাইতেছে, তাহা আদর্শ ব্যবহার। সে ব্যবহার তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আদর্শ কিনা, তাহা কে বলিবে? বর্তমানে পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা যে 'আদর্শ' ব্যবহার লাভ করিতেছে, তাহার ফলে ইতিমধ্যেই ১৫ লক্ষের অধিক লোক সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য পূর্ব-পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বিষম সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে। যদি সেই 'আদর্শ' ব্যবহার চলিতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই অল্পকাল মধ্যে পূর্ব-পাকিস্থান হিন্দু-শূন্য হইবে—পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা হয় পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিবেন, নহে ত মুসলমান হইতে বাধ্য হইবেন। পারস্যে যেমন মিশরেও তেমনই এই ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগের আগমনস্রোত বন্ধ করিবার জন্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যত চেষ্টাই কেন করুন না, মিস্টার লিয়াকৎ আলীর উক্তি—পাকিস্থানে হিন্দুরা 'আদর্শ' ব্যবহার পাইতেছেন— যে পূর্ববঙ্গের হিন্দু-দিগের মনে আশার সঞ্চার না করিয়া ভীতি বর্ধিতই করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং ভারত সরকারকে পূর্ববঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর অর্থাৎ আরও এক কোটি হিন্দুর জন্য ভারত-রাষ্ট্রে বসবাসের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তাহা না করিলে ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালকগণ কর্তব্যে অবজ্ঞা করার অপরাধে অপরাধী হইবেন। কারণ, কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতীত ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান দুই রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিত না। কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান—সেইজন্য তাহার ক্ষমতাও যেমন অধিক, তাহার দায়িত্বও তেমনই প্রবল।

পূর্ব-পাকিস্থানে হিন্দুরা কিরূপ 'আদর্শ' ব্যবহার পাইতেছেন, তাহার কয়টি দৃষ্টান্ত

একই দিনের (২৩শে নভেম্বর) 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্র হইতে দিতেছি:—

(১) ঢাকার শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চিকিৎসক ও সমাজসেবক। গত ১৯শে নভেম্বর তিনি যখন ফরিদাবাদ হইতে রোগী দেখিয়া ফিরিতে-ছিলেন, তখন ৮।১০ জন মুসলমান প্রথমে তাঁহার রিক্সা একটি সংকীর্ণ গলির মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করে। তিনি রিক্সা হইতে লাফাইয়া পড়ায় তাহারা তাঁহাকে লোহার ডান্ডা প্রভৃতি দিয়া আঘাত করিতে থাকে—যিনি তাঁহার সাহয্যার্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহাকেও প্রহার করা হয়।

(২) শ্রীজ্ঞানরঞ্জন দত্ত উয়ারী পল্লীতে মুদীর দোকান চালাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার পীড়িত শ্বশুরকে দেখিবার জন্য—কর্মচারী অরুণকুমার দেবকে দোকানের ভার দিয়া কলিকাতায় গমন করেন। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া যাইয়া তিনি দেখেন মহম্মদ রহমন নামক এক ব্যক্তি আর কয়জনের সহযোগিতায় দোকানের প্রায় তিন হাজার দুইশত টাকার মাল সরাইয়া—কর্মচারীকে ভয় দেখাইয়া দোকান-ঘর অধিকার করিয়াছে। তিনি সূত্রাপুর থানায় এজাহার দিলে দারোগা বলেন—তিনি এ বিষয়ে কিছুই করিবেন না। পরদিন তিনি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিলে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে নির্দেশ দেন—কোন সম্ভ্রান্ত সরকারী কর্মচারীর দ্বারা যেন আবেদনের বিষয় অনুসন্ধান করান হয়। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিষয়টি অনুসন্ধান জন্য সূত্রাপুর থানার দারোগার নিকটেই পাঠান; কিন্তু দারোগা নাকি আবেদন গ্রহণও করেন না।

এই সকল 'আদর্শ' ব্যবহার কি হিন্দু-দিগকে পূর্ব-পাকিস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টাই নহে?

গত ১৯শে নভেম্বর মালদহ-রাজসাহী সীমান্তে কতকগুলি মুসলমান পাকিস্থান হইতে ভারত-রাষ্ট্রে আসিয়া ক্ষেত্র হইতে ধান্য লইয়া যাইতে থাকে। ভারত-রাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের প্রহরীরা আপত্তি করিলে তাহারা প্রহরীদিগকে ধরিয়া পাকিস্থানে লইয়া গিয়াছে।

আজ আমরা এই ঘটনা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিব না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি এ বিষয়ে কোন বিবৃতি প্রদান করিবেন? মুর্শিদাবাদ সীমান্তে অনুরূপ ঘটনা পূর্বেও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া লোকের কৌতূহল নিবৃত্তি করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই।

পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গে আগমন অতর্কিত বা অপ্রত্যাশিত নহে। তথাপি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার—ভারত সরকারের সাহায্য লইয়া—আজও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আগন্তুকদিগকে পথে বনগ্রামে ও অন্যত্র ট্রেন হইতে নামাইয়া অস্থায়ী আশ্রয়-শিবিরে রাখিয়া পরে স্থায়ী আশ্রয়শিবিরে প্রেরণ করা হইবে। ইহাতে কলিকাতায় আগন্তুকের সংখ্যা হ্রাস পাইবে বটে, কিন্তু কলিকাতায় সরকারের রাজধানীতে যে সুব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না, মফঃস্বলে তাহা করা সম্ভব হইবে কি?

বিহার সরকার দারিদ্র্য হইতে বন্যা পর্যন্ত নানা যুক্তির আশ্রয় লইয়া বিহারে বাঙালী বাস্তুহারাদিগকে আশ্রয় দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উড়িষ্যা সরকার কি বলিবেন, জানি না। কিন্তু ভারত সরকার কিরূপে কর্তব্য পালন করিবেন, স্থির করিয়াছেন?

কলিকাতায় লোকসংখ্যা যত বর্ধিত হইতেছে, বাটির অধিকারী হইতে বস্তির জমিদার পর্যন্ত ততই বর্ধিত লোভের পরিচয় দিতেছেন। ভাড়াটিয়া উৎখাত করিতে পারিলেই ভাড়া বৃদ্ধি ও (গোপনে) সেলামি প্রাপ্তি হইবে বলিয়া জমিদাররা নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ভাড়াটিয়াদিগকে কোন কোন বাড়ীওয়ালা ছলে ও কৌশলে নহে, বলেই বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সংবাদ আদালতেও পাওয়া যাইতেছে। এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবহারও বিস্ময়কর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করা ত পরের কথা বৃদ্ধিতই করিতেছেন! আর সরকারী কর্মচারীদিগের বাস-ব্যবস্থার জন্য গৃহস্বামীদিগের প্রতি যে ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাও প্রশংসনীয় বলা যায় না। কোন গৃহের অধিকারীরা পৃথক হইয়া একজন তাঁহার অংশে প্রাপ্য গৃহাংশ নিজ বাস জন্য চাহিলেও সরকার কোন অধ্যাপকের জন্য তাহা দখল করিয়াছেন। সে বিষয়ে মামলায় পশ্চিমবঙ্গীয় রাজস্ব সংসদের সদস্য যে রায় দিয়াছেন, তাহা এইরূপ:—

"দরখাস্তকারীর (গৃহস্বামীর) পক্ষে কৌঁসুলীর বক্তব্য শুনলাম। ডক্টর সেনের বক্তব্যও শুনলাম। দরখাস্তকারী নিজ ব্যবহারের জন্য বাড়িটি চাইছেন বটে, কিন্তু ডক্টর সেনকেও পথে দাঁড় করান যায় না। দরখাস্ত না-মঞ্জুর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু আবশ্যক হলে আশা করি, কর্তৃপক্ষ দরখাস্ত-কারীর বিষয় সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন।"

আপাতত গৃহস্বামীকেই পথে দাঁড়াইতে হইল।

পূর্ববঙ্গ হইতে যে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ কলিকাতায় আরও হিন্দুর আগমন অনিবার্য, তাহার অনেক কারণ আছে। যদিও মিস্টার লিয়াকৎ আলী বলিয়াছেন, তথায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরা 'আদর্শ' ব্যবহার পাইতেছে, তথাপি সে ব্যবহারের স্বরূপ আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি। গত ৭ই অগ্রহায়ণের 'আনন্দ-বাজার পত্রিকায়' শ্রীসুখময় চন্দ্র (১০৭।২, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা) ও শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা (২, বসাক লেন, কলিকাতা) লিখিয়াছেন, তাঁহারা গত ২রা অগ্রহায়ণ গাইবান্ধা হইতে সন্ধ্যা ছটার ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করেন। রাত্রি যখন প্রায় ১১টা, তখন—ট্রেন বগুড়া স্টেশন ত্যাগ করিয়া সহসা দাঁড়ায় ও ১০।১২ জন মুসলমান লাঠি, দা, ছোরা প্রভৃতি লইয়া তাঁহাদিগের কামরায় আসিয়া বলে—"মুসলমান ভাই সব একতরফ হো যাইয়ে।" তখন তাহারা হিন্দুদিগকে প্রহার ও হিন্দুদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে থাকে। তাহারা যখন কামরাস্থ মহিলাদিগের উপর অত্যাচারে উদ্যত হয়, তখন হিন্দুরা বাধা দেন—ফলে ৪।৫ জন যাত্রী আহত হন। সুরেশবাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। ঐ ট্রেনে ৪০।৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ ছিল। তাহারা ঐ কামরায় গোলমাল ও আর্তনাদ শুনিয়াও আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে কোনরূপ সাহায্য প্রদান করে নাই। গার্ড আসিয়া অবস্থা দেখিয়া ট্রেন চালাইবার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, ট্রেনে যাত্রীদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। সান্তাহারে স্টেশনের লোককে চিকিৎসার কথা বলিলে তাঁহারা বলেন, পরদিন প্রাতঃকাল ব্যতীত কিছুই করা সম্ভব হইবে না।

এইরূপ 'আদর্শ' ব্যবহারের দ্বারা কি হিন্দুদিগকে পূর্ব-পাকিস্থান ত্যাগে বাধ্য করা হইতেছে বলিতে হইবে না? যদি এইরূপ ব্যবহারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুরা পাকিস্থান ত্যাগ করেন—তবে অবশিষ্ট হিন্দু জনগণকে মুসলমান হইতে বাধ্য করা দুঃসাধ্য হইবে না। কারণ, প্রধানরা ইতোমধ্যেই পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া হিন্দুস্থান হইতে উদারতার 'বাণী' প্রচার করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সচিবসঙ্ঘের অর্থসচিব, স্বরাষ্ট্র-সচিব, পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন; পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিও তাহাই; ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও পূর্ববঙ্গে যাইয়া তথায় কাজ করেন নাই।

গণ-পরিষদের পশ্চিমবঙ্গীয় সদস্যগণ দিল্লীতে স্থির করিয়াছেন, নূতন শাসন-ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ও উচ্চ দ্বিবিধ ব্যবস্থা পরিষদ থাকাই বাঞ্ছনীয়। উচ্চ পরিষদকে অরবিন্দের ভাষায়—"Council of not-ables" বলা যায় কি? দুইটি পরিষদে যে ব্যয় বৃদ্ধি অনিবার্য, কেবল তাহাই নহে—গণতন্ত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কিরূপ?

কংগ্রেসের নব-নির্বাচিত সভাপতি ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়া যে কংগ্রেসের পূর্ববর্তী সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে ভিন্নমত, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি মত প্রকাশ

করিয়াছেন, যত শীঘ্র সম্ভব ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা কর্তব্য। তাহাতে যে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পালন ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। ভারত-রাষ্ট্রে ঐক্য বৃদ্ধি ও তাহার শক্তিবৃদ্ধি যে সকলেরই কাম্য, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় যে সে শক্তি বর্ধিত না হইয়া ক্ষুণ্ণই হইতে পারে এবং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনে অকারণ বিলম্বে যে ভারত-রাষ্ট্রের ঐক্য দৃঢ় না হইয়া দুর্বল হইতে পারে, তাহা মনে না করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না যে,

"Hope deferred maketh that heart sick."

প্রাদেশিক সীমার পরিবর্তনে কখনই রাষ্ট্রের ঐক্য নষ্ট ও শক্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। বিশেষ বিহার সরকার পশ্চিমবঙ্গকে তাহার জন্মগত অধিকারে বঞ্চিত রাখিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সে সকলের ফল কখনই ভাল হইতে পারে না। বিলম্ব যেস্থানে অপ্রয়োজন, সে স্থানে তাহা ত্যাজ্য। যখন সমগ্র ভারত-রাষ্ট্রের সকল প্রদেশের এক-যোগে কাজ করাই বাঞ্ছনীয়, তখন যাহাতে কোন প্রদেশের সঙ্গত অধিকার অস্বীকার করিয়া অসম্প্রীতি সৃষ্টি করা না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই রাজনীতিকোচিত কাজ।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পাকিস্থানে প্রধান সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যশোহরে গিয়াছিলেন—পশ্চিমবঙ্গের গভর্নরও তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনার উদ্দেশ্য—পূর্ব-পাকিস্থানে হিন্দুদিগের প্রতি যাহাতে সদয় ব্যবহার হয়। কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, যতদিন পাকিস্থান ইসলাম রাষ্ট্র বলিয়া পাকিস্থানীরা মনে করিবেন, ততদিন তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আমরা মুসলমানী আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহি। কিন্তু আমরা মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুরের সেই আইন সম্বন্ধীয় পুস্তকে দেখিতে পাই—কোরাণই মুসলমানী আইনের ভিত্তি এবং কোরাণের মতধারায় মুসলমানী আইন পর্যবসিত। আর কোরাণের নির্দেশ—

(১) যেস্থানেই প্রতিমাপূজকদিগকে পাইবে, সেই স্থানেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে;

(২) মুসলমানাতিরিক্ত ধর্মাবলম্বীরা যদি (তাহাদিগের ধর্মমতের জন্য) অনুতাপ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তবে আর তাহাদিগকে হত্যা করিবে না।

এইরূপ আরও উক্তি কোরাণে আছে, যথা—(১) মুসলমানাতিরিক্ত ধর্মাবলম্বীদিগের সহিত যুদ্ধ বাধ্যতামূলক এবং (২) তাহাদিগের নিকট হইতে জেজিয়া কর আদায় করা আইন-সঙ্গত। —ইত্যাদি।

পাকিস্থান যদি ইসলাম রাষ্ট্র হয় এবং ইসলাম আইনে শাসিত হয়, তবে অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। পাকিস্থানের পরিচালকগণ যদি না বলেন, হিন্দুর পক্ষে মুসলমান আইনের বিধান প্রযোজ্য নহে, তবে হিন্দুরা তথায় কিরূপ ব্যবহারের আশা করিতে পারেন?

শ্রীসন্তোষকুমার বসু ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি (ডেপুটি হাই-কমিশনার) হইয়া পূর্ব-পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকায় গিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাহা ভুলিলে চলিবে না। পাকিস্থানে প্রজা হিন্দুদিগের প্রতি সে রাষ্ট্রের ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তাঁহার নাই। তিনি কেবল পাকিস্থানে ভারত-রাষ্ট্রের প্রজাদিগের স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অগ্নিমূল্য কমে নাই; বস্ত্র সুলভ হয় নাই। বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের পক্ষ হইতে অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইতেছে যে, দেশে বস্ত্রের অভাব নাই—লোক যে কাপড় পাইতেছে না, সে কেবল বণ্টনের সুব্যবস্থার অভাবে। বণ্টনের ব্যবস্থা লইয়া কেন্দ্রী সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার হয় খেলা করিতেছেন, নহে ত কি করিলে ভাল হইবে স্থির করিতে না পারিয়া অক্ষমতার পরিচয় মাত্র দিতেছেন। মধ্য হইতে লোক যেমন ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেছে, চোরাবাজারের ব্যবসায়ীরা তেমনই লাভবান হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার আপনি বণ্টনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিন আবার পিছাইয়া দিয়া বলিতেছেন—রঙ্গালয়ের "শেষ রজনীর" মত ৩১শে ডিসেম্বর শেষ দিন —তাহার পরেই তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত করিবেন। কারণ যাহাই হোক না কেন, ক্ষতি কেবল সাধারণ লোকের অথচ গণতন্ত্রে তাহাদিগেরই সরকারের নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকিবার কথা। ভারতবর্ষ এখনও আমলাতান্ত্রিক নিয়মে শাসিত হইতেছে, এখনও তাহার গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি রচিত হয় নাই—সুতরাং "বহু ধৈর্যং"। যদি তাহাই হয়, তবে জিজ্ঞাস্য—আর কতদিন?

দু'টি লোকের ইতিবৃত্ত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

একজন লোককে জানতুম, ছিল ঘোড়া আর কুকুর রাখার বাতিক,
আর সারা দিন কাটতো ওদের নিয়ে।
শরৎকালের সকালে আর বিকেলে রোদ এসে পড়তো
ফসলের মাঠগুলোর ওপর;
আর লোকটাকে দেখতুম ঘোড়ায় চড়ে' চলেছে
যেন হালকা হাওয়ায় ভর ক'রে,
তার পেছনে সামনে দেহরক্ষী পার্শ্বচরের মতো
পিঙ্গল বর্ণের তেজীয়ান কুকুরগুলো।
আর এরই মধ্যেই একদিন লোকটা বিয়ে করলো,
ছেলেপিলেও হয়েছিল গোটা তিনেক,
তারপর বুড়ো হ'য়ে চোখের নীচে কুঞ্চিত রেখা নিয়ে
একদিন লোকটা মহাপ্রস্থান ক'রলো।

আরো একজন লোককে জানতুম, সর্বদা পাইপ টানতো,
আর নিজের পড়ার ঘরে কেরোসিনের আলোয়
পুরনো বইয়ের হলদে পাতাগুলো উল্টাতো,
আর হাটুর ওপর থেকে ধুলো ঝাড়তো অনবরতই।
প্লেটো থেকে রবার্ট ব্রাউনিং পর্যন্ত
কতো দুরূহ বিষয় নিয়েই না মাথা ঘামাতে হ'তো;
আর এরই মধ্যে একদিন বিয়ে করবার সময় হ'লো,
ছেলেপিলেও হ'য়েছিল গোটা তিনেক,
তারপর বুড়ো হ'য়ে চোখের নীচে কুঞ্চিত রেখা নিয়ে
একদিন পা বাড়াতে হ'লো মহাপ্রস্থানের পথে।

আজ রাতে দু'টি ঝরা পাতা এসে উড়ে পড়লো
একজোড়া সমাধি স্তূপের ওপর;
চারিদিক থমথমে, আকাশে কুঞ্চিত চাঁদ।
আর একমাত্র এই চাঁদ-ই শুনতে পেলো
বাতাসের ফিসফিসানি,
বলাবলি করছে যেন কুকুর আর ঘোড়াগুলোর কথা,
প্লেটো আর রবার্ট ব্রাউনিংয়ের কাহিনী॥

---

*উইলিয়ম এ নরিস-এর কবিতা থেকে।

"ক্ষুরস্য ধারা"—সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

(ছয়)

"অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর গ্রে যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অফিসে থাকত, আমি বাড়িতে উদ্বেগে কাল কাটাতাম, ভয় হ'ত হয়ত মাথাটাই ও উড়িয়ে দেবে কোনদিন। এতই ওর অপরিসীম লজ্জা। আপনি ত' জানেন গ্রে বা তার বাবা ওদের ব্যবসা সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন, নিজেদের বিচারবুদ্ধি সম্পর্কেও ছিল ওদের ততোধিক গর্ব। আমরা যে অর্থহীন হলাম সেটা বড় কথা নয়, যারা আমাদের বিশ্বাস করত তাদের যে সব গেল সেইটাই বড় কথা। গ্রে মনে করত ওর আরো গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা উচিত ছিল। কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না যে ওর কোন ত্রুটি নেই।

ইসাবেল ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বার করে তার ঠোঁট রঞ্জিত করে নিল।

"কিন্তু শুধু এইটুকুই যে আপনাকে বল্‌তে চাই তা নয়। আমাদের যা রইল তা শুধু সেই আবাদ। আর আমার মনে হল গ্রের পক্ষে এখান থেকে চলে যাওয়াই প্রয়োজন, তাই আমরা মেয়েদের মার কাছে রেখে দিয়ে ওখানে চলে গেলাম। বরাবরই ওর জায়গাটা ভালো লাগত, কিন্তু কোনো দিনই আমরা সেখানে একা যাইনি, সঙ্গে একদল লোক থাক্‌ত আর খুব মজায় কাট্‌ত। গ্রে ভালো শিকারী, কিন্তু তখন আর শিকার করার মত অবস্থা ছিল না। একটা নৌকো নিয়ে একাই জলায় চলে যেত, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাখি দেখে কাটিয়ে দিত। খালের আগাগোড়া পাড়ি দিত, তার দু'পাশে ঝোপ আর ওপরে ভূমধ্যসাগরের মত নীল আকাশ। ফিরে এসে বিশেষ কিছুই বল্‌ত না। শুধু হয়ত বল্‌ত, চমৎকার—আমি কিন্তু বুঝতাম কি ওর মনোভাব। আমি জানতাম ওর অন্তর সৌন্দর্য আর স্তব্ধতা ও বিরাটত্বে বিস্ময়াহত হয়ে আছে। সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে জলার ওপরকার আলো অতি অপরূপ। ও দাঁড়িয়ে সেই সৌন্দর্য দেখত আর আনন্দে অভিভূত হ'ত। সেই নির্জন রহস্যময় অরণ্যে ও দীর্ঘপথ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত; মাতারলিঙ্কের নাটকের মতই এই সব অরণ্য রহস্যময়, তেমনই ধূসর, নিস্তব্ধ ও অলৌকিক, আর বসন্তকালের এক সময় (এক পক্ষের বেশি সেই কাল থাকে না) এই গাছপালা ফুলে ফেটে পড়ে, গ'দের গাছে পাতা গজায়, স্প্যানীয় শ্যাওলার ধূসর রঙের ওপর সেই সবুজ যেন আনন্দ-সংগীত। জমি বড় বড় শাদা লিলি ফুল আর বন্য এজালিয়া ফুলে যেন কার্পেটের মত বিছিয়ে থাকে। ওর কাছে যে এ কি তা গ্রে বল্‌তে পারত না, কিন্তু তার কাছে এই ছিল জগৎ সংসার। এর মনোহারিত্বে ও মাতাল হয়ে উঠেছিল। আমি ঠিকমত বল্‌তে পারছি না জানি, কিন্তু আপনাকে এটুকু বল্‌তে পারি ঐ বিরাট পুরুষ প্রতিদিন প্রভাতে যে পবিত্র ও সুন্দর আবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠত তাতে আমার কান্না আস্‌ত। স্বর্গে যদি বিধাতা থাকেন, তাহ'লে বল্‌ব গ্রে তাঁর অতি কাছাকাছি পেঁাছেছিল।"

এই কথা বলার সময় ইসাবেল কিঞ্চিৎ ভাবালু হয়ে উঠেছিল, একটি ছোট্ট রুমাল নিয়ে চোখের কোণে যে জল এসেছিল তা সন্তর্পণে মুছে নিল।

আমি হেসে বল্‌লাম:

"তুমি একটু রোমান্টিকপানা করছ না? আমার মনে হচ্ছে তুমি গ্রের সম্পর্কে এমন সব কথা ও ভাবাবেগ আরোপ কর্‌ছ যা হয়ত তুমি ওর হয়ে প্রত্যাশা করেছ।"

"ওসব না থাকলে আর আমি কি করে দেখ্‌ব? আপনি আমাকে জানেন। যতক্ষণ না বুঝি আমার পায়ের তলায় সিমেণ্ট বাঁধানো ফুটপাথ আর পথের দু'পাশে কাঁচের শো-কেসের ভিতর নজর দেওয়ার মত ভালো হ্যাট আর ফারকোট বা ডায়মণ্ড ব্রেসলেট আছে, ততক্ষণ আমি আন্তরিক স্বস্তি পাই না।"

আমি হাসলাম, তারপর কয়েক মুহূর্ত আমরা উভয়েই নীরব রইলাম। তারপর ইসাবেল পুনরায় যে কথা বল্‌ছিল তাই শুরু করে,......

"আমি কখনও গ্রে'কে ডিভোর্স কর্‌ব না, আমরা অতিরিক্ত ভাবে একত্রে কাটিয়েছি, আর আমার ওপর একান্ত নির্ভরশীল। অবশ্য এতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় আর একটা দায়িত্ববোধ জাগে, আর তা ছাড়া......"

"তা ছাড়া কি?"

ও আমার পানে অপাঙ্গে তাকাল আর তার চোখে দুষ্টোমিভরা হাসি। আমার মনে হয় ওর মনের কথাটা আমি কিভাবে নেব সেটা ও ঠিক বুঝতে পারছে না।

ইসাবেল বলে:—

"বিছানায় গ্রে অপূর্ব। আমাদের দশ বছর বিবাহ হয়েছে, প্রথম দিনের মতই সে কামনাকুল প্রেমিক হয়ে আছে। আপনি একটি নাটকে বলেন নি যে একই রমণীকে পুরুষ পাঁচ বছরের বেশি আর চায় না। গ্রে কিন্তু প্রথম যখন বিবাহ হয়েছিল তখনকার মতই এখনও আমাকে চায়। সেদিক দিয়েও আমাকে অতি খুশি রেখেছে। আমাকে দেখে হয়ত আপনি বুঝবেন না, আমি কিন্তু অতি কামাতুর মেয়ে।"

"এ তোমার খুবই ভুল, আমার এই ধারণা।"

"যাই হোক্, এটা একটা অনাকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলা যায় না, কেমন তাই নয়?"

তার দিকে একটা সন্ধানী দৃষ্টি হেনে বল্‌লাম—"বরং, দশ বছর আগে লারিকে বিয়ে করো নি বলে তোমার কি অনুশোচনা হয়?"

"না, তাহ'লে সেটা পাগলামি হ'ত। তবে এখন যা জানি তখন যদি জানতাম তাহলে আমি লারির সঙ্গে গিয়ে তিন মাস থাকতাম, তারপর আমার জগৎ থেকে চিরদিনের মত ওকে মুছে ফেলতাম।"

"আমার বোধ হয় এ নিয়ে যে আর পরীক্ষা করোনি, তা ভাগ্যের কথা; হয়ত দেখতে এমন এক বাঁধনে জড়িয়ে পড়তে, যা কোনদিন ছিন্ন করতে পারতে না।"

"আমার তা মনে হয় না। সেটা ছিল একটা শারীরিক আকর্ষণ মাত্র, আপনি ত' জানেন, কামনাকে জয় করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল তা তৃপ্ত করা।"

"তোমার কি কোনদিন মনে হয়নি যে, তুমি অত্যন্ত অধিকারপ্রবণা স্ত্রীলোক? তুমি বলেছ, গ্রের গভীর কবিসুলভ অনুভূতি আছে, সে অদম্য প্রেমিক; আর আমার ত খুব বিশ্বাস, তোমার কাছে দুজনই অনেক কিছু, কিন্তু দুটি জিনিস একত্র করলেও যা এর চাইতে বেশি, এমন কি জিনিস তোমার কাম্য, তা আমাকে বলোনি—তোমার ধারণা যে, তোমার সুন্দর (অথচ তেমন ছোট নয়) হাতের ফাঁকে তাকে ধরে রেখেছ। লারি কিন্তু নিয়তই তোমার কাছ থেকে পালাত। তোমার কীটসের Ode মনে আছে?

"Bold Lover, never, never canst thou kiss, though winning near the goal."

কিঞ্চিৎ তিক্ত সুরে ইসাবেল বলল, "আপনার ধারণা যে, আপনি যা প্রকৃত জানেন, তার চাইতেও অনেক বেশি জানেন। একটিমাত্র উপায়ে স্ত্রীলোক পুরুষকে বেঁধে রাখে, আর সেটি আপনার জানা আছে। এখন আপনাকে

একটা কথা বলি শুনুন: প্রথমবার স্ত্রীলোক যে পুরুষের সঙ্গে শয্যায় যায়, তার তেমন মূল্য নেই, দ্বিতীয়েরই মূল্য বেশি। তখন যদি তাকে বাঁধতে পারে ত চিরদিনের জন্যই পারে।"

"তুমি ত দেখছি সব আশ্চর্য রকমের খবর সংগ্রহ করতে পারো?"

"আমি চারদিকে ঘুরি, আর আমার চোখ ও কান খোলা থাকে।"

"এ খবরটি কোথায় পেলে জানতে পারি।"

এইবার ইসাবেল অত্যন্ত বিরক্তিজনক ভঙ্গীতে আমার পানে তাকিয়ে হাসল—"পোষাক প্রদর্শনীতে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার কাছে জেনেছি। একজন বলেছিল, এই স্ত্রীলোকটি হচ্ছে প্যারীর অত্যন্ত চটকদার রক্ষিতা রমণী। তাই ঠিক করেছিলাম, ওর সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। তার নাম আদ্রিয়েন দ্য এয়ে ওর নাম কখনো শুনেছেন?"

"কখনো শুনিনি।"

"আপনার শিক্ষা কত অপ্রচুর। তার বয়স পঁয়তাল্লিশ, তেমন সুশ্রীও নয়, কিন্তু এলিয়ট মামার যে কোন ডাচেসের চাইতেও তাকে মর্যাদামণ্ডিত দেখায়। আমি তার পাশে বসে ছোট মার্কিনী মেয়ের মত ভাবাবেগপূর্ণ চণ্ড শুরু করলাম। আমি তাঁকে বললাম, জীবনে এতখানি উদ্‌ভ্রান্তিকর রূপ আর কারো দেখিনি বলেই আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। আমি তাঁকে বললাম, তাঁর আকৃতিতে কারু-কার্যখচিত গ্রীক মণির সম্পূর্ণতা রয়েছে।"

"আচ্ছা তোমার নার্ভ!"

"গোড়ার দিকে মহিলাটি অত্যন্ত গম্ভীর ও দাম্ভিক ছিলেন, কিন্তু আমার সহজ ও ন্যাকা ভঙ্গীর কাছে অবশেষে হার মানলেন। তারপর আমাদের বেশ অনেক কথা হল। প্রদর্শনী ভাঙার পর তাঁকে 'রিজে' লাঞ্চে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম—বললাম, চিরদিনই তার এই অপূর্ব ভঙ্গীর আমি প্রশংসা করব।"

"ওকে কি আর আগে কখনো দেখেছিলে?"

"না, আমার সঙ্গে লাঞ্চে রাজী হলেন না, বললেন, প্যারীতে সব ঈর্ষাকাতর ও বিদ্বেষ-পরায়ণ লোকের ভীড়, এতে আমার বদনাম হবে, তবে আমি নিমন্ত্রণ করাতে তিনি আনন্দিত হয়েছেন, যখন লক্ষ্য করল, হতাশায় আমার ঠোঁট কাঁপছে, তখন আমাকে তাঁর বাড়িতে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর সৌজন্যে আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত হতে দেখে তিনি আমার হাতে মৃদু চাপড় দিলেন।"

"তুমি গিয়েছিলে নাকি?"

নিশ্চয়ই, আমি গেলাম, এ্যাভিন্যু ফসে তাঁর চমৎকার বাড়ি, আর যে বাটলার আমাদের পরিবেশন করল, সে ঠিক জর্জ ওয়াশিংটনের প্রতিমূর্তি। চারটে পর্যন্ত ছিলাম। সব কাজ-কর্ম ছেড়ে অমরা পুরোপুরি মেয়েলি গল্পে মেতে গেলাম। সেইদিন এতো কথা জেনেছিলাম যে, একখানা বই লেখা হয়ে যেত।"

"লিখলে না কেন? এই রকম জিনিসই ত "Ladies Home Journal" পত্রিকার উপযুক্ত।"

সে হেসে বলল—"আপনি একটি আস্ত বোকা।"

"আমি কয়েক মিনিট চুপ করে রইলাম—নিজের চিন্তাসূত্র অনুসরণ করতে লাগলাম। তারপর একটু পরে বললাম, "আমি ভাবি, লারি কি কোনদিন প্রকৃতই তোমাকে ভালবাসত।"

ইসাবেল উঠে দাঁড়াল, তাঁর ভঙ্গিমা তার মনোহারিত্ব হারিয়েছে, চোখে রাগের চিহ্ন—

"আপনি কি বলছেন? নিশ্চয়ই ও আমাকে ভালোবাসে, আপনি কি বলেন, কোন পুরুষ ভালোবাসে কি না বাসে মেয়েরা বোঝে না?"

"আমি বলতে পারি না, ফ্যাশান মাফিক সে তোমাকে ভালোবাসে কিনা—তোমার মত ঘনিষ্ঠভাবে ও আর কোন মেয়েকে জানে না, বাল্যকাল থেকে তোমরা উভয়ে খেলে বেড়িয়েছ, ও তোমাকে ভালোবাসারই আশা রেখেছিল, ওরও স্বাভাবিক যৌন-অনুভূতি ছিল, ব্যাপারটি এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের বিবাহ হওয়া উচিত ছিল। তোমরা একই ছাদের নীচে এক বিছানায় শুলে এমন কিছু এসে যেত না।"

ইসাবেল, কিঞ্চিৎ নরম হয়ে আমার কথা শুনে যেতে লাগল, আর মেয়েরা চিরদিনই প্রেমের কথা শুনতে চায় জেনে আমি বলে চললাম।

"নীতিবাগীশরা বোঝাতে চান যে, যৌন-অনুভূতির সঙ্গে প্রেমের তেমন সম্পর্ক নেই। যেন বিষয়টি মোটেই অপ্রমেয় নয়।"

"ঈশ্বরের দোহাই, ব্যাপারটি কি?"

"মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করেন সচেতনত্ব মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত কিন্তু কোন প্রভাব বিস্তার করে না, যেমন জলের ওপর গাছের ছায়া পড়ে, কিন্তু তাতে গাছের কি এসে যায়। আমার মনে হয় কামনাহীন প্রেমের কথা নিছক ভুয়ো ও বাজে কথা; লোকে যখন বলে কামনার অবসানেও প্রেম থাকে, তখন তারা অন্য কিছুর কথা বলে, যথা অনুরাগ, স্নেহ, করুণা, রুচি, আগ্রহ ও স্বভাব। বিশেষ করে স্বভাব। দুটি প্রাণী শুধু স্বভাববশেই যৌন সঙ্গম করে যেতে পারে—যেমন, যে সময়ে তারা আহার করতে অভ্যস্ত, স্বভাববশে ঠিক সেই সময়েই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রেমহীন কামনা হতে পারে, বাসনা আর কামনা এক নয়। বাসনা যৌন-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি আর মনুষ্য চরিত্রের অন্য কোন ক্রিয়া অপেক্ষা এর কোন গুরুত্ব নেই। এই কারণেই সময় ও সুবিধা বুঝে স্বামীরা যখন মাঝে মাঝে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন মেয়েরা বোকার মত তাই নিয়ে হৈচৈ শুরু করে দেয়।"

"শুধু কি পুরুষের সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য?"

আমি হাসলাম।

"তুমি যদি পীড়াপীড়ি করো, তাহলে স্বীকার করি হাঁস আর হাঁসির খাদ্য একই। এর বিরুদ্ধে একটি কথা শুধু বলা চলে পুরুষের কাছে এই জাতীয় একটা সাময়িক সম্পর্কের কোন ভাবাবেগজড়িত বিশেষত্ব নেই, কিন্তু স্ত্রীলোকের কাছে তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।"

"স্ত্রীলোক হিসাবে একথা প্রযোজ্য।"

বাধা পেয়ে থামার বাসনা আমার ছিল না।

"প্রেমে যদি কামনা না থাকে, তাহলে সে প্রেম প্রেমই নয়, অন্য কিছু; আর কামনানুরাগ পরিতৃপ্তিতে বাড়ে না, বাড়ে প্রতিবন্ধকে। কীটস যখন তাঁর 'গ্রীসিয়ান আরনে' প্রেমিককে বলছেন—দুঃখ কোরো না, তখন তিনি কি বলতে চেয়েছেন মনে কর? For ever wilt thou love and she be Fair! কেন? কারণ নায়িকা সেখানে অনধিগম্যা, অধরা, যতই উন্মত্তের মত তার পিছনে ঘোর ততই সে এড়িয়ে চলে। আমার মনে হয়, উদাসীন শিল্পকার্যের মর্মর প্রাচীরের অন্তরালে তারা উভয়েই আবদ্ধ হয়ে আছে। লারির প্রতি তোমার বা তার তোমার প্রতি প্রেম পাওলো ও ফ্রান্সেসকা বা রোমিও এবং জুলিয়েটের মতই সরল ও স্বাভাবিক। তোমার সৌভাগ্যক্রমে তার একটা অশুভ পরিণতি ঘটে নি। তুমি একজন ধনীকে বিবাহ করলে আর লারি পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে স্বর্গীয় সঙ্গীত-সুধার সন্ধানে। কামনা-বিরহিত এই অবস্থা, এর ভিতর কামনার সম্পর্ক নেই।"

"আপনি কি করে জানলেন?"

কামনানুরাগ কোন মূল্যের হিসাব রাখে না। প্যাসকাল বলেছেন যে, হৃদয়ের যে যুক্তি আছে, সেটা যুক্তি গ্রাহ্যই করে না। আমি যা ভেবেছি, তিনি যদি তাই মনে করে থাকেন, তাহলে এর অর্থ এই যে, কামনা যখন অন্তরকে আচ্ছন্ন করে, তখন সে যে শুধু আপাত-যুক্তিযুক্ত যুক্তি আবিষ্কার করে তা নয়, সে অখণ্ডনীয় যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে প্রেমের জন্য জগৎ-সংসার সব বৃথা হয়ে গেল। প্রেম তোমাকে বিশ্বাস করাবে যে সম্মান যথার্থ কারণেই বলি দেওয়া হয়েছে, আর লজ্জার অতি অল্পই মূল্য। কামনা ধ্বংসকর শক্তি। এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা, ট্রিস্টান ও আইসলড্, পারনেল ও কিটি ও'সৈয়া সবাইকেই এই যুক্তি ধ্বংস করেছে। আর যদি ধ্বংস করতে না পারে, তাহলে তার চরম অবসান ঘটে। এমন হতে পারে তখন মানুষের মনে হতাশা জাগে যে, জীবনের এতগুলি দিন তার বৃথাই নষ্ট

হয়ে গেল, মনে হতে পারে নিজের ওপর একটা অপমানভার চাপানো হয়েছে, ঈর্ষার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সহ্য করে, সকল তিক্ত অবসাদ মেনে নেয়, সকল কোমলতা উজাড় করে দিয়েছে, অন্তরের যা কিছু ঐশ্বর্য সব কিছুই একটা নির্বোধ, অকিঞ্চিৎকর প্রাণীর ওপর ঢেলে দেওয়া হয়েছে, এমন এক বস্তুর ওপর স্বপ্নের বোঝা চাপানো হয়েছে, যার মূল্য একটা চিউইংগামের বড়ির চেয়ে বেশী নয়।"

এই কথা শেষ করার আগেই আমি জানতাম ইসাবেল আমার কথায় কান দিচ্ছে না, নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। কিন্তু তার পরবর্তী মন্তব্য আমাকে বিস্মিত করল:

"আপনার কি মনে হয় লারি আজো কৌমার্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে?"

"বাছা, তার বয়স বত্রিশ।"

"কিন্তু লারির অক্ষত কৌমার্য সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।"

"কি করে নিশ্চিত হলে?"

"এসব কথা মেয়েরা সহজাত বুদ্ধি প্রভাবে জানতে পারে।"

"আমি একজন তরুণকে জানতাম সে একটির পর একটি মেয়েকে এই বলে কাটিয়েছে যে, জীবনে সে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসেনি। সে বলেছিল কথাটি ইন্দ্রজালের মত কার্যকরী।"

"আপনি যাই বলুন, আমার কিছু এসে যায় না, আমার বুদ্ধিতে আমার বিশ্বাস আছে।"

দেরী হয়ে যাচ্ছিল, গ্রে আর ইসাবেল সেদিন বন্ধুদের সঙ্গে নৈশভোজন করবে, ইসাবেলকে আবার সাজসজ্জা করতে হবে। আমার কোন কাজ ছিল না, তাই সেই মধুর বসন্ত সন্ধ্যায় বুলভার্দ রাসপেলের পথ ধরে বেড়াতে লাগলাম। স্ত্রীলোকের সহজাত বুদ্ধিতে আমার কোন কোন কথার সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য তারা যেখানে যেমন খাটে, তেমন কথাই সুন্দরভাবে বলে; যখন ইসাবেলের সঙ্গে এই সুদীর্ঘ আলাপের শেষাংশটি মনে এল তখন না হেসে থাকতে পারলাম না। এতদ্দ্বারা আমার মনে সুজান রুভায়ার কথা জাগল। সে যে কি করছে ভাবতে লাগলাম। যদি কোন কাজ না থাকে, সে আমার সঙ্গে একদিন ডিনার খেতে ও ছবি দেখতে যেতে রাজী হতে পারে। একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে তার বাসার ঠিকানা বলে দিলাম।

(সাত)

এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে আমি সুজান রুভায়ার কথা উল্লেখ করেছি। আমি তাকে দশ বারো বছর ধরে জানি আর এখন আমি যে বয়সে পেঁছেছি সে হিসাবে মনে হয়, ওর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মেয়েটি সুন্দরী নয়, বরং তাকে কুশ্রী বলা চলে। ফরাসী স্ত্রীলোকের অনুপাতে সে মাথায় বেশ লম্বা, দেহটি খাটো, লম্বা পা ও লম্বা হাত; আর তার ভঙ্গীও ছিল বেয়াড়া, যেন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ কি করে সামলাবে ভেবে পায় না। তার চুলের রঙ তার খেয়াল মত বদলে যেত—কিন্তু অধিকাংশ সময়েই লালচে-বাদামী রঙের হয়ে থাকত। ওর মুখখানি ছিল ছোট ও চৌকস, গালে প্রচুর রুজ মাখানো, আর মুখবিবর বেশ বড়ো এবং ঠোঁট দুটি রঙে অতি-রঞ্জিত। এসব কিছুই তেমন আকর্ষণীয় মনে হয় না, তবু তার আকর্ষণ ছিল; তার চমৎকার গাত্রচর্ম, দৃঢ় শাদা দাঁত, আর বড়ো বড়ো স্পষ্ট নীল চোখ ভালো লাগত। তার ভিতর একটা ধূর্ত, আকর্ষণীয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গী ছিল, আর সে তার মনোহর স্বভাবের সঙ্গে যথোচিত কঠোরতা সংমিশ্রিত করে রেখেছিল। তার যে জীবন সেই হিসাবে কঠোর হওয়াই প্রয়োজন। সামান্য সরকারী চাকুরের বিধবা সুজানের মা স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর পেনসনের ওপর নির্ভর করে আনজুতে বাস করতে এলেন, সুজান তখন পঞ্চদশী। পাশের শহরে তাকে এক পোষাককারের কাছে কাজ করতে দেওয়া হল, শহরটি এত কাছে যে, রবিবারে সে বাড়ি আসতে পারত। একবার সতের বছর বয়সে যখন পনের দিনের ছুটি নিয়ে গ্রামে এল তখন এক শিল্পী ওকে প্রলোভিত করল, গ্রীষ্মকালটার দৃশ্যপট আঁকার জন্য তিনি গ্রামে এসেছিলেন। ইতিমধ্যেই সে বুঝেছিল যে, বিনা অর্থে বিবাহের সৌভাগ্য জীবনে পাওয়া বড় সহজ হবে না, তাই সেই শিল্পী যখন গ্রীষ্মাবসানে তাকে প্যারী নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখাল তখন সে সোৎসাহে রাজী হল। শিল্পীটি মন্তমাত্রারের এক ঘিঞ্জি, নোংরা স্টুডিয়োতে নিয়ে গিয়ে ওকে রাখল আর তার সাহচর্যে সুজানের এক বছর বেশ আনন্দে কাটল।

এর পর সেই শিল্পী ওকে বলল, একখানিও ছবি তার বিক্রী হয়নি, তাই তার পক্ষে রক্ষিতা রাখার বিলাসিতা আর চলবে না। এই সংবাদটাই কিছুকাল ধরে প্রত্যাশিত ছিল সুজানের কাছে, সুতরাং সে এর দরুণ হতাশ হল না। শিল্পী জানতে চাইল, সুজান দেশে ফিরে যাবে কিনা, ও যখন জানালো দেশে ফিরবে না, তখন সে জানালো, সেই বাড়িরই অপর অংশে আর একজন শিল্পী আছেন তিনি তাকে সানন্দে রাখবেন। এই লোকটি পূর্বে দুএকবার ওর কাছে ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গী করেছিল, সুজান তার পাল্টা জবাবও দিয়েছিল কিন্তু সে কাজটি এমন ভালোভাবে করেছিল যে, তিনি একটুও ক্ষুণ্ণ হননি। তাঁকে সুজানের অপছন্দও ছিল না, তাই সে এ প্রস্তাব গ্রহণ করল। তার ট্রাঙ্কটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে একটা ট্যাক্সি ডেকেও খরচ করতে হল না এইটুকু সুবিধা পেয়েই সে খুসী হল। দ্বিতীয় প্রেমিক প্রথমের চেয়ে বয়সে অনেক বেশী ছিলেন, তবু সুপুরুষ, তিনি সকল সম্ভাব্য অবস্থায় ওর ছবি আঁকলেন, সবস্ত্র এবং বিবস্ত্র; তাঁর সঙ্গেও দু বছর সুখে কাটাল সুজান। ওকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করেই যে সেই শিল্পীটির সর্ব-প্রথম সাফল্য হয়েছে একথা বলে সুজান গর্ববোধ করত, একটি সচিত্র পত্রিকায় মুদ্রিত সেই ছবিটির একখানি প্রতিলিপি কেটে নিয়ে আমাকে দেখিয়েছিল। ছবিটির ক্রেতা একটি আমেরিকান চিত্রশালা। জীবন্ত আকারের পূর্ণাঙ্গ একখানি নগ্নচিত্র, 'মানে'র 'Olympe' ছবিটির মতো তার সমান ভঙ্গী ও অবস্থান। সুজানের আকৃতির মধ্যে যে একটু আধুনিক এবং মজার ভঙ্গী আছে শিল্পী তা অল্পকালের ভিতরই বুঝে নিলেন, তার শীর্ণ শরীর শীর্ণতর করে তার দীর্ঘ হাত ও পা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন শিল্পী, তাঁর উঁচু চোয়াল আরো স্পষ্ট করেছেন, আর তার নীল চোখকে খুবই বড় করা হয়েছে। সেই মুদ্রিত প্রতিলিপি থেকে আমি স্বভাবতই রঙটা কেমন ফলানো হয়েছে ঠিক বলতে পারছি না, তবে সেই ছবির মনোহারিত্ব বুঝলাম। এই ছবিটি শিল্পীর যথেষ্ট দুর্নাম সৃষ্টি করে আর তারই ফলে এক গুনানুরক্ত বিত্তশালী বিধবার সঙ্গে তার বিবাহ ঘটে যায়। সকল মানুষের যে ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত এ বিষয়ে সুজান যথেষ্ট সচেতন ছিল—তাই সে বিনা আক্রোশেই এই বিচ্ছেদ গ্রহণ করল।

এতদিনে সুজান নিজের মূল্য জেনে নিয়েছে। শিল্পীর জীবন তার ভালো লাগে, ছবির জন্য ভঙ্গী করে দাঁড়াতে বা বসতে তার ভালো লাগে, তারপর দিনের কাজ শেষ হলে শিল্পীরা যখন স্ত্রী বা তাঁদের রক্ষিতাদের সঙ্গে কাফেতে গিয়ে আর্ট সংক্রান্ত আলোচনা করে, ছবি বিক্রেতা দালালদের গালাগাল দেয় বা নানাবিধ অশ্লীল গল্প বলে তখন তা উপভোগ করে আনন্দ পাওয়া যায়। এই সময়টিতে বিচ্ছেদ আসন্ন জেনে সুজান একটা মতলব ঠিক করে নিয়েছিল। নিঃসঙ্গ একটি তরুণকে মনে মনে সে বেছে নিয়েছিল, আর তার ধারণা ছিল ছেলেটির প্রতিভা আছে। কাফেতে তাকে একা পেয়ে সেই সুযোগে সুজান তাকে সমস্ত অবস্থাটা জানালো তারপর বিশেষ গৌরচন্দ্রিকা না ভেঁজে প্রস্তাব করল উভয়ে একত্রে থাকবে। বলল:—

"আমার বয়স কুড়ি। আমি ভালো গৃহিণী। এর জন্য তোমার টাকা বাঁচবে আবার মডেলের খরচও বাঁচবে। তোমার সার্টের দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখলে লজ্জা করে, তোমার স্টুডিয়ো ত' ভাতের হাঁড়ি হয়ে আছে, দেখা শোনা করার জন্য তোমার এখন একটি স্ত্রীলোকেরই প্রয়োজন।"

ছেলেটি জানত স্জান ভালো মেয়ে, তার প্রস্তাবে সে আমোদ অনুভব করল, আর স্জানও দেখল প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে সে অনিচ্ছুক নয়।

স্জান বলে, "যাই হোক, এখন পরখ করে দেখতে ক্ষতি কি—যদি এ প্রস্তাব কার্যকরী না হয় তাহলে এখন যা অবস্থা তার চেয়ে ত' আর আমাদের খারাপ অবস্থা হবে না।"

ছেলেটি ছিল নি-দলীয় শিল্পী, স্জানের পোর্টরেট সে চৌকস ও আয়ত ভঙ্গিতে আঁকল। কোনোটি শুধু একটি চোখ ও মুখ-হীনা করে আঁকল, জ্যামিতিক ব্যবস্থায় কালো, বাদামী ও ধূসর রঙে চিত্রিত করল। হিজিবিজি লাইন আঁকল স্জানের মডেলে। তার ভিতর সহজে মানবীয় মুখ দেখাই যায় না, এমনই কত বিচিত্র ছবি। তার সঙ্গে দেড়বছর থাকার পর স্বেচ্ছায় তাকে একদিন ছেড়ে এল স্জান।

আমি জানতে চাইলাম, "কেন? তোমার কি ওকে পছন্দ হয়নি?"

"পছন্দ হয়েছিল—ও চমৎকার ছেলে—কিন্তু ওর বিশেষ উন্নতি হচ্ছে মনে হল না, কেবলই সে নিজের কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।"

পরবর্তীকে খুঁজে নিতে স্জানের অসুবিধা হল না, সে শিল্পীদের প্রতি নিষ্ঠাবতী হয়ে রইল।

স্জান বলে, "আমি বরাবরই ছবির ব্যাপারে রয়েছি। ছ'মাস একজন ভাস্করের সঙ্গে ছিলাম—কিন্তু কেন জানি না আমার তা ভালো লাগল না।" কোনও প্রেমিকের কাছ থেকেই অপ্রীতিকর কারণে সে বিচ্ছিন্ন হয়নি। শুধু ভালো মডেল নয়, সে ছিল সুগৃহিণী। সাময়িকভাবে যখন যে স্টুডিয়োর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার জন্য কাজ করতে সে ভালোবাসত আর সেটি নিখুঁত করে রাখতে গর্বানুভব করত। স্জান ছিল অতি ভালো রাঁধুনি, অতি কম খরচে খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু করে তোলার তার ক্ষমতা ছিল। তার প্রেমিকদের মোজাও সে সেলাই করে দিত, সার্টের বোতাম বসিয়ে দিত। বলতো "আর্টিস্ট বলেই মানুষ কেন যে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হবে না, এ আমি ভেবেই পাই না।"

শুধু একবার স্জানের একজনের কাছে পরাজয় ঘটেছিল। লোকটি তরুণ ইংরাজ, এত অর্থশালী লোক আগে কখনও সে দেখেনি, তার আবার একটি মোটর গাড়ি ছিল।

স্জান বল্লেঃ "কিন্তু বেশী দিন তা টি'কলো না, লোকটি বড়ই মাতাল হয়ে পড়ত, আর তখন তাকে সামলানো দায়, যদি সে সুদক্ষ শিল্পী হ'ত তাহলে আমি এসব তেমন গায়ে মাখতাম না। কিন্তু মশাই, সে এক বেয়াড়া ব্যাপার। আমি তাকে ছেড়ে দেব বল্লাম, সে ত' কান্না সুরু করে দিল। বলতে লাগল, আমাকে সে ভালোবাসে। আমি বল্লাম—বন্ধু হে ভালোবাসো কি না বাসো সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা তোমার প্রতিভা নেই। দেশে ফিরে গিয়ে মুদির দোকান খোলো গে, সেই কাজই তোমার হবে।"

আমি বল্লাম—"এসব কথায় সে কি বল্লে?"

"ক্ষেপে উঠে বল্লে দূর হয়ে যাও, আমি কিন্তু ওকে সৎপরামর্শই দিয়েছিলাম, আমার বিশ্বাস সেই পরামর্শ ও নিয়েছে। লোকটা খারাপ ছিল না, শুধু শিল্পী ছিল তৃতীয় শ্রেণীর।"

হালকা ধরণের স্ত্রীলোকের পক্ষে জীবনের তীর্থযাত্রায় সাধারণ বুদ্ধি ও নম্র প্রকৃতি অনেক সহায়তা করে, তবে স্জান যে জীবনধারা গ্রহণ করেছিল আর সব ব্যবসায়ের মত তারও জোয়ার ভাঁটা আছে। যেমন স্ক্যানডানেভিয়ান লোকটির কথাই ধরা যাক্—নির্বোধের মত স্জান তার প্রেমে পড়ে গেল।

সে আমাকে বলেছিল—"জানলেন, ও ছিল দেবতা, ভীষণ লম্বা চেহারা, যেন ইফেল টাওয়ার, চওড়া কাঁধ, সুন্দর বুকের ছাতি, কোমরটি এমন যেন হাত দিয়ে জড়ানো যায়, পেটটি আমার হাতের তালুর মত সমতল, আর দেহের পেশীগুলি যেন ব্যায়াম বীরের মত দৃঢ়। কোঁকড়ানো সোনালি চুল, আর ছিল মধুর মত গায়ের চামড়ার রঙ। ছবি তেমন খারাপ আঁকত না, তার ব্রাসের কাজ আমার ভালো লাগত, বেশ বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক ভঙ্গী।

তার দ্বারা একটি সন্তান লাভের স্জানের বাসনা হ'ল। সেই লোকটির তাতে আপত্তি ছিল, কিন্তু স্জান জানালো যে এই বিষয়ের সর্ব দায়িত্ব তার।

"জন্ম হওয়ার পর মেয়েটি তাঁর খুবই পছন্দ হ'ল। ভারী সুন্দর হয়েছিল, গোলাপী রঙ, মাথায় এক মাথা সোনালি চুল, আর বাপের মত নীল চোখ—।"

তাঁর সঙ্গে স্জান তিন বছর কাটালো।

"লোকটি কিঞ্চিৎ বোকা ছিল, আমার বিরক্তি হত, কিন্তু এত মধুর তাঁর স্বভাব ও এতই সুন্দর ছিলেন তিনি, যে আমি কিছু মনে করতাম না।"

এই সময় সুইডেন থেকে তার বাবা মৃত্যুমুখে এই সংবাদ এল, তৎক্ষণাৎ যাওয়ার জন্য টেলিগ্রামে জরুরী তাগিদ এল। তিনি ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেও স্জানের তবু সংশয় ছিল ও বোধ হয় আর ফিরবে না।

তার যা কিছু অর্থ ছিল সবই স্জানকে দিয়ে গেল। এক মাস আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তারপর খবর এল বিষয় সম্পত্তির অবস্থা জটিল রেখে তার বাবা মারা গিয়াছেন, এই সময় মায়ের পাশে থাকা দরকার ও তাদের কাঠের ব্যবসা তাকেই চালাতে হবে। চিঠির সঙ্গে সে দশ হাজার ফাঁর একটা ড্রাফট্ পাঠিয়ে দিয়েছিল,—স্জান হতাশায় আকুল হবার মত মেয়ে নয়। সে অল্প সময়ের ভিতরেই বুঝলো যে সন্তানসহ তার কার্যকলাপের গতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা তাই সে দেশের বাড়িতে মায়ের কাছে তার মেয়েটিকে সেই দশ হাজার ফ্রাঁ সমেত রেখে এল।

"ব্যাপারটি অবশ্য হৃদয়-বিদারক, আমি মেয়েটিকে ভারী ভালোবাসতাম, কিন্তু জীবনে মানুষকে ত ব্যবহারিক হ'তে হবে।"

আমি জানতে চাইলাম: "তারপর কি হ'ল?

"আমার ঠিকই চলে যেতে লাগল, আর একজন বন্ধু জুটে গেল।"

কিন্তু এর পরই ওর টাইফয়েড হল। কোটিপতিরা যেমন ভঙ্গীতে বলে থাকেন "আমার পার্মাবিচের প্রাসাদে," স্জানও তেমনই এই কথাটি 'আমার টাইফয়েড' বলে উল্লেখ করত। এই রোগে সে মৃতকল্প হয়েছিল এবং প্রায় তিন মাস হাসপাতালে পড়েছিল। হাসপাতাল থেকে যখন বেরিয়ে এল তখন শুধু হাড় আর চামড়া, ইঁদুরের মত দুর্বল, আর এতই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে কান্না ছাড়া আর কিছুই পারত না। সেই সময় আর কারো প্রয়োজন লাগার মত তার শরীর নয়, 'পোজ' দেওয়ার সামর্থ্য নেই, আর হাতে অতি সামান্য অর্থ ছিল।

(ক্রমশ)

অনেক দিন . . .

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

কর্তব্যপরায়ণতার তাগিদে অস্থির হয়ে পুলিশ অফিসারটি বললেন, তা হলে আরম্ভ করা যাক্।

যোগানন্দবাবুর যেন ঘুম ভাঙলঃ আসুন, আসুন—চলুন, উঠে পড়লেন কাঁপতে কাঁপতে।

পুলিশ অফিসারটি উঠে পড়ে টেবিলের ওপর থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে ঘাড় কাৎ করে কি ইঙ্গিত করলেন। দাবা বোড়ের গুটিগুলো নড়ে-চড়ে উঠলো।

যে কারণেই আজ পুলিশ আসুক, সমর মনে মনে পুলিশ অফিসারটির ওপর চটে রইল। ওঁর বোঝা উচিত ছিল সমর কি বলতে চেয়েছিল—যারা যুদ্ধে যায় তাদের বাড়িতে পুলিশের হাঙ্গামা ধৃষ্টতা! একবার যেন মনে হলো প্রবীর ঠিক করছে।

পুলিশ অফিসারকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে সমর আশ্চর্য হয়ে গেল—মা ইতিমধ্যে একেবারে বদলে গেছেন, সেই ভেঙেপড়া আলু-থালু মূর্তি আর নেই। বেশ শক্ত আর কঠিন হয়ে উঠেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মূক প্রতিবাদের ব্যঞ্জনা মায়ের মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। মা দালানে দাঁড়িয়েই ছিলেন, পুলিশ অফিসারটি সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সামনে আসতেই একটু যেন মৃদু হাসলেন। সমর স্পষ্ট দেখতে পেল, পুলিশ অফিসারটি মুখ কালো করে ফেলেছে।

দালান পেরিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়িতে পুলিশ অফিসারটি পা দিতে পিছন থেকে মা বললেন, নীচে ভাঁড়ার ঘরটি দেখে গেলেন না?

মায়ের কথায় বোধ হয় খোঁচা ছিল, পুলিশ অফিসারটি তিন লাফে পাঁচিশটা ধাপ আরোহণ করলেন। বাবার কথা মনে পড়লো সমরের—উঠে আসবার সময় দেখে এসেছেঃ চেয়ারের মধ্যে কেমন হাত-পা গুটিয়ে বসেছেন, বড় অসহায়—যেন এই মাত্র সর্বস্বান্ত হয়েছেন!

প্রবীরের ওপর রাগ করলেও সমরের এইটা ভাল লাগেনি। হঠাৎ বাবাতে মাতে তফাৎটা মনে লাগে। অশ্রুমুখী উদ্বেগটা ভেতরে ভেতরে আত্মমর্যাদায় কৃত না দীপ্ত। আর বাবা?

ঘণ্টা দুয়েক ধরে 'সার্চ' পর্ব চললো। পুলিশ অফিসারটি খুব বেশী তচনচ করেননি জিনিসপত্তর। সার্চের ঘটা দেখে বুঝতে পারা যায় না কিসের সন্ধানে তাঁরা এসেছেন। যা কিছুর ওপর হাত পড়ছে সব কিছুই যেন দরকার এমনি ভাব দেখিয়ে সন্ধানী চোখ জোড়া আটকে যাচ্ছে কিছুক্ষণ তারপর হতাশ হয়ে ভ্রূকুঁচকে উঠছে—নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে এই পুলিশের মেঘ-রুদ্দুরের খেলাটা ভারি কৌতুকাবহ। কি চান ওঁরা? Incriminating অর্থের ব্যাখ্যা কি?

A police party raided a house at Bhowanipur nothing incriminating was found——খবরের কাগজে এই সংবাদ—কাল লোকে কি বুঝবে?

সমরের জিনিসপত্তরের ওপর নজরটাই যেন বেশী। রেখে ঢেকে ফেলে ছড়িয়ে একেবারে তচনচ করে দিয়েছে। সব থেকে লজ্জার অলকার চিঠিগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে—মুখফুটে সমর বারনও করতে পারে না। একবার অস্ফুটে প্রতিবাদ করতে পুলিশ অফিসারটি সদ্য আবিষ্কৃত একখানা চিঠিতে দৃষ্টি রেখে মুখ না-তুলে জবাব দিলেন,

Everything in the house is to be searched—no matter what or whose property it is! I may lay my hand on—

গালে চড় কষাবার মত রাগ হয়েছিল সমরেরঃ একটা পাঁতি পুলিশ মিলিটারীকে গ্রাহ্যই করে না!

অবশ্য খুব বেশীক্ষণ পুলিশ অফিসারটি চিঠি বাছাবাছি করলেন না—যে বস্তুর সন্ধানে এসেছেন তার সন্ধান ওর মধ্যে নেই। ছড়ান চিঠিগুলো থেকে চোখ তুলে সমরের মুখের দিকে চেয়ে কি দেখলেন—তারপর স্থানকাল এবং সুযোগের সম্পূর্ণ বেখাপ্পা সুরে প্রশ্ন করলেন, আপনি 'কমব্যাটান্ট' হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন?

উপেক্ষা করবার পালা যেন এবার সমরের। জবাব দেওয়া আবশ্যক বোধ করলে না। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুলিশ অফিসারটি বোধ হয় গুণতে জানেন। সমরের বাক্স ছেড়ে বাণীর বাক্সে হাত দিলেন। বাণী এমন ভাব দেখাল যেন সুটকেশটা খুললে এখনি সার্চের উদ্দেশ্য সফল হবে। বাণী একরকম বাক্সটা আঁকড়ে বুকের মধ্যে চেপে রইল। সন্দেহ বস্তুর সন্ধান মিলেছে ভেবে পুলিশ অফিসারটি উৎফুল্ল হয়ে হৃদ্যকণ্ঠে বললেন, কেন 'রেসিস্ট করছেন!'

বাণী বললে, না। এ হতে দেব না।

অফিসারটি কৌতুক বোধ করেন, না মানে—আমাদের ডিউটি করতে দেবেন না? ছেড়ে দিন আমরা দেখে নিই।

বাণীর গলার স্বরটা বিকৃত হয়ে গেলঃ প্রাইভেট।

পুলিশ অফিসারটি হেসে বললেন, সেই জন্যেই তো দেখাতে বলছি! ছেড়ে দিন—

বাণী তবুও বাক্সটা ছেড়ে দেবার কোন চেষ্টাই করলে না। পুলিশ অফিসারটি উপস্থিত ক্ষেত্রে কি করা উচিত হবে ইতস্তত করতে লাগলেন—এদিকে তার বদ্ধ ধারণা হয়ে গেছে তিনি যে জিনিস খুঁজতে এসেছিলেন তা ওরই মধ্যে আছে। একটা উপায় করে দেবার জন্যেই যেন সমরের মুখের দিকে চাইলেন।

সমর বললে, বাণী ছেড়েদে—কি দেখবার উনি দেখে নিন।

কে জানে অন্যটা বোনের 'প্রাইভেট' জিনিসটা কি দেখবার জন্যে সমরও পুলিশ অফিসারটির মত মনে মনে কৌতুহলী হয়ে উঠেছে কিনা। পুলিশ অফিসারের জেদটা যে অন্যায়, অশোভন এবং অপমানকর সমর ভাবতে পারলে না।

বাক্সটা খুলতে খুলতে পুলিশ অফিসারটি কৈফিয়ৎ দেবার মত বললেন, Search: a look into the privacy! আমরা হেল্পলেস্, বুঝতেই পারছেন—

অফিসারটি টেনে টেনে অনেকগুলো চিঠি বার করলেন—কোনটা পড়লেন, কোনটা পড়লেন না। চোখেমুখে কৌতুক ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। একসময় হেসে বললেন, আপনারা খুব চিঠি লেখেন তো? বেশ!

বাণীর বলতে গিয়ে আটকে গেল: তাতে আপনার কি? হয়তো সেকথা বলবার সাহস এখন বাণীর নেই—লোকটি আবার কিছু না বলে বসে! বাণী কি ভয় পেয়েছে?

অফিসারটি বললেন, মাপ করবেন—এই অরবিন্দবাবুটি কে, যাঁর কাছ থেকে এত চিঠি পেয়েছেন?

কি স্পর্ধা! কি লজ্জা! বাণী ফেটে পড়ল, সেটা অরবিন্দবাবুকে জিগ্যেস করলেই পারেন!

অফিসারটি হেসে বললেন, তাতো পারি, কিন্তু তার আগে আপনি যদি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেন! মানে—

বড় বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় সমরের। আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। সমর বিরক্তি প্রকাশ করলে, এও কি আপনার জানা দরকার? তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

বেশ সহজভাবে পুলিশ অফিসারটি বললেন, নিশ্চয়ই। না, খুব বেশী দরকার নেই।

বাণী হঠাৎ ফস করে বলে ফেললে, অরবিন্দবাবুকে আপনার দরকার কি?

হেসে অফিসারটি বললেন, আছে কিছু। আপনার সঙ্গে আলাপ কতদিনের—

রাগে লজ্জায় বাণী কাঁপতে লাগল—মুখ দিয়ে কোন কথা সরলো না। ওদিকে সমর একটা ভয়ংকর কিছু ষড়যন্ত্রের আন্দাজ করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে ঃ এরা করেছে কি? এ কোথায় এসে প্রবাসবাসের দুঃখ ভুলতে চায় সে? কি সাংঘাতিক সব হয়ে উঠেছে? কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুবে না তো? বাণীটাও রাজনীতি করে? অরবিন্দবাবুটা কে? কি সম্পর্ক তার সঙ্গে বাণীর?

কি বলবেন না? যাক। ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। সমরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, Anything beyond love cause suspicion ছোটলোকের চাকরি মশাই! আপনাদের শুধু শুধু ব্যতিব্যস্ত করলুম।

বাণীর দিকে মুখ ফিরিয়েও ক্ষমা চাইলেন বোধ হয় ঃ আপনি না বললেও আমরা জানতে পারবো। আপনাকে বলা, আলাপ যখন আছে তাঁকে সাবধান করে দিতে পারেন। জানেন তো পুলিশের নজর ভাল নয়।

লোকটা আচ্ছা বেহায়া—কিচ খুঁকি পেয়েছে নাকি? বাণী আর থাকতে পারলে না—বললে, সে কাজ তো আপনারাই ভাল করতে পরেন।

তবুও নির্লজ্জের মত পুলিশ অফিসারটি হেসে বললেন, তা পারি। Sorry for the trouble!

পুলিশ হাঙ্গামা, সার্চ পর্ব শেষ হতে কেমন যেন বিশ্রী লাগে সমরের। ঘণ্টাঘণ্ট ঘরটি অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। অলকার চিঠিগুলো ঘরময় ছড়ান, অপব্যয়ের মত। এখন চিঠিগুলো জড় করে জানালার বাইরে ফেলে দিলে ঘরটি পরিস্কার হবে না কি? ওগুলোর জন্যেই তো তাকে আজ এত অপ্রস্তুত হতে হলো! আর ওগুলো রেখেই-বা কি হবে?

হাতের মুঠোয় যতগুলো চিঠি ধরলো একসঙ্গে তুলে নিয়ে জানালার কাছে এগিয়ে এল। চিঠিগুলো ফেলতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিলে—ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কি না কে জানে—এখনো আশা আছে কি? বাণীর অরবিন্দবাবুর কথা মনে হয় সমরের—কই, বাণীতো চিঠিগুলো ফেলে দিলে না? ভাল-বাসার এখনো দরকার আছে বাণীর? তার কেন থাকবে না— জানালার নীচে অমন ফলফলে ডুমুর গাছটার উপর লাঠি চার্জ করে ওরা থেৎলে দিয়ে গেছে—হাতের লাঠিগুলো সুড় সুড় করছিল।

প্রবীরের ওপর সমরের এখন আর একটুও রাগ নেই। সমর যুদ্ধে গিয়ে যা না করতে পেরেছে প্রবীর বাড়ি বসে যেন তার সহস্রগুণ করেছে। তাদের সংসারের অনেক মান বাড়িয়েছে সে।

সকালের নিষ্ক্রিয়তা কখন কেটে যায়। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের তাপে ফুলে-ওঠা হৃদয়বৃত্তির ফানুসটা হঠাৎ কঠিন বাস্তবের ছোঁয়ায় ফেটে গেছে—সমাজবোধের ক্ষুদ্রতর গণ্ডি থেকে রাজনীতিকবোধের বৃহত্তর গণ্ডিতে পা দেওয়ার মত ভয় বিস্ময় উত্তেজনা! প্রবীর কত দূরে চলে গেছে? এখন মনে ছোট ভায়ের জন্যে কি জাগছে—ক্রোধ না সম্ভ্রম, না শান্তি নাশের আশংকা? একটা অননুভূত অত্যাশ্চর্য মানসিকতার টের পাওয়া যায়—কি সে, ঠিক বুঝিতে পারে না সমর।

এদিক-ওদিক করা ওল্টানো-পাল্টানো জিনিসপত্তরগুলোর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে সমরের মনে হয়, তার যুদ্ধে যাওয়ার আর আজ কোন মানে হয় না, কোন সার্থকতাই নেই। আজকের ঘটনা সমস্ত অহংকার চূর্ণ করে' দিয়েছে—ব্যক্তিগত কীর্তির জন্যে মনে মনে খুশী হওয়াও না কত ছেলেমানুষী! কি কীর্তি রেখেছে সে? কি উন্নতিই বা করেছে? অর্থ-পদ-মান কোনটার সে অধিকারী? বড় তুচ্ছ জিনিসের পুঁজি সম্বল করে' দেশে ফিরে সে সবার চিত্ত জয় ক'রতে চেয়েছিল—তার যেন ফল এই! ঠিক হ'য়েছে।

কিন্তু অরবিন্দ কে? প্রবীরের মত তাকেও পুলিশ সন্দেহ করে? বাণীর ভাল-বাসার পাত্রটি কি রকম? সমর ছোটবোনের মানসিক পরিবর্তনের কারণ যেন খুঁজে পায়। ছোট বোন আর সে ছোট বোন নেই! একা প্রবীর নয় বোনটিকে তৈরি করবার জন্যে আরো একজন হৃদয় নিয়ে বুদ্ধি নিয়ে প্রস্তুত আছে। কত বয়েস বাণীর? বাণীর ভালবাসার কথা বাবা-মা জানেন না?—খবরও রাখেন না? শেষে—

এদের কাউকে যেন আর বোঝা যায় না—অদ্ভুতভাবে সব তৈরী হ'য়ে গেছে—এই ক'বছরে। বাবাকে কি বোঝা যায়? সেই সুখে-দুঃখে সন্তান এবং সংসারবৎসল ভালমানুষটি? মাকে? সেই নিরীহ আত্ম-সত্তা বিস্মৃত মা? সেই ফ্রক-পরা কারণে অকারণে ধমক-খাওয়া বোনটি? সেই খেলার সাথী, অনুক্ষণ সংগী দুর্দান্ত প্রবীর? এরা কেউ আর সেই নেই, অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে! কই তার তো কোন পরিবর্তন হয়নি। তবে এরা বদলালো কেন, এদের কেন ধরতে পারছে না, বুঝতে পারছে না সমর?

বেশী করে প্রবীরের কথাই মনে হয়। দুর্দান্ত ব'লে ছোট ভাইটাকে সমর বড় একটা পছন্দ করতো না। কারণে-অকারণে বাবার কাছে নালিশ করে' নির্যাতন করাতো। সংসারে মা-ই বোধ হয় কেবল ওকে একটু প্রশ্রয় দিতেন। দিনে অন্ততঃ পাঁচবার বাবার হাতে ও প্রহার খেতো। তবুও কি ভ্রূক্ষেপ ছিল। না, সমর ওকে ভালবাসতো না—আর কি করেই বা ভালবাসবে, প্রবীর কি কোনদিন তাকে বড় ভায়ের সম্মান দিয়েছে?—যেটা বারণ করতো সমর, প্রবীর সেটাই করতো।

একদিন, বেশ মনে পড়ছে সমরের, বদমাইসী করার জন্যে বাবার হুকুমে সকাল থেকে প্রবীরের খাওয়া বন্ধ হ'লো—বাবা অফিস যাবার সময় একটি ঘরে প্রবীরকে বন্ধ করে' চলে গেলেন। তখন-তখন ছোট ভায়ের শাস্তিটা সমরের ভালই লেগেছিল, বড় মজা বোধ করেছিল যেন—গোপন প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্যে একটা খুশী-খুশী ভাব—বেশ হয়েছে যেমন পাজী ছেলে! বাবা অফিস যাবার সময় মাকে কি বলে গেলেন সমর শোনেনি। কিন্তু যত বেলা বাড়তে লাগল সমরের মনটা কেমন করতে লাগল—কিছু ভাল লাগছিল না, ঘুরে ফিরে বার বার বন্ধ দরজার কাছে এসে ঘুরে যাচ্ছিল। এক একবার দরজায় কান দিয়ে কি যেন শুনতে চেয়েছিল। মাকে দরজা খুলে প্রবীরকে মুক্ত করে' দিতে বলতেও কেমন লজ্জা করছিল—তার নালিশেই আজ ভায়ের ঐ সাজা হয়েছে! খেতে বসে সমর ভাল করে' খেতে পারলে না, কেমন বিস্বাদ লাগল। রোজকার মত ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে না খেলে পেট যেন ভরে না। বাবা অফিসে চলে গেলেন, রান্না ঘরের পাট উঠে গেল। হঠাৎ ঘুম-ভেঙে যাওয়া রাতের মত বাড়ীটি নিস্তব্ধ খাঁ খাঁ করছে—কলতলায় একটি কাক কা-কা করছে। সমরের চোখে ঘুম নেই। চোরের মত সন্ধানী চোখে সারা বাড়ীটি খুঁজে বেড়াতে লাগল—প্রবীরের ঘরের চাবিটা বাবা কোথায় রেখে গেছেন? মাকে জাগিয়ে জিগ্যেস করবে না কি? মা আজ ঘুমচ্ছেন কেন? উনি কি জানেন না, প্রবীরের এখনো খাওয়া হয়নি? চাবির সন্ধান মিলল; কিন্তু এখন দরজার মাথার শিকলে আঁটা তালাটায় চাবি লাগায় কি করে? শব্দ না করে' বাইরের ঘর থেকে চেয়ার বয়ে আনা তার সাধ্য নয়—মা যদি উঠে পড়েন। তবু সমর চেষ্টা করলে—একটুও শব্দ না-তুলে পিঠে করে' চেয়ার বয়ে আনতে আনতে দরজার কোণে দেওয়ালের ছালছাড়ান গায়ে ঘসড়ানি লেগে শরীরের অনেক জায়গা ছড়ে গেল—চেয়ার-বহন পর্বটি সমর সম্পূর্ণ দম বন্ধ করে' সমাধা করলে। কিন্তু দরজা খুলতে নিজেকে আর সামলাতে পারলে না—সমর হু হু করে' কেঁদে ফেললেঃ ঘরের একধারে খালি মেজেয় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে প্রবীর ঘুমিয়ে আছে। অতটুকু বয়েসে সমরের তখনি মনে হয়েছিল, প্রবীর তার ওপরই অভিমান করে' ঘরে বন্ধ হ'য়েও কোন প্রতিবাদ করেনি—দরজা খোলার সময়ও প্রবীর জেগেছিল—পাছে সমরের সঙ্গে কথা কইতে হয়, এই লজ্জায় চোখ বুজে আছে। অমন দুর্দান্ত ভাই তার কি শান্ত হ'য়ে গিয়েছিল সেদিন! প্রবীরকে সমর কি ভালবাসতো না? সে-দিন আর আজ—অনেকদিন, অনেককাল, তবু আজই সে-কথা মনে পড়ছে কেন? প্রবীরের দুর্দান্তপনা বরদাস্ত না করলেও

তাকে কি সমর ভালবাসে না? বুকে হাত দিয়ে সমর বলতে পারে ছোটভায়ের বিপর্যয়ে সে নিশ্চিত নিরুদ্বিগ্ন থাকবে? আজ যদি প্রবীরকে জেলে ধরে' নিয়ে যায় সে কি তখনো যুদ্ধে যাওয়ার গর্বে কাঁধের ওপর সুতোয় বোনা তারার মালা দেখিয়ে বেড়াবে? প্রবীরের কাজের সমর্থন না করলেও প্রবীরের জন্যে কি তার কোন উৎকণ্ঠাই প্রকাশ পাবে না? ভাই আপনার না, ভায়ের মতবাদ আপনার? মত এবং পথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভায়ে-ভায়ে, বন্ধুতে-বন্ধুতে মানুষে-মানুষে ভালবাসার বিচ্ছেদ ঘটে? মত বড় না ভালবাসা বড়? কিসে মানুষ সুখ পাবে শান্তি পাবে?

না, ভালবাসার কোন দাম নেই। এক-তরফা ভালবাসা যায় না। প্রবীর কি তোমার ভালবাসা চায়? অলকা কি তোমার ভালবাসা স্বীকার করে? ব্যক্তিগত মত ও পথই বড়। প্রবীর অনেক দূরে চলে গেছে—অলকাও নিজের ইচ্ছেয় অনেক সরে গেছে। তোমার হৃদয়ের প্রসারতা বাড়িয়ে কি তুমি তাদের নাগাল পাবে? মান-অপমানে, বিচ্ছেদে-মিলনে যে ভালবাসা জেগে থাকে না সে-ভালবাসার লৌকিক মূল্য যাই থাক্ হৃদয়ের গভীরে তার কোন স্থান নেই। আর হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে যদি স্পর্শ ক'রতে না পারলে ভাল-বাসাকে বুঝবে কি করে? সহসা নিজের ভালবাসার অকুণ্ঠতা সম্বন্ধে সমর সন্দিগ্ধ হ'য়ে ওঠে—কাউকে সে স্পর্শ করতে পারেনি? কি অধিকার আছে তার?

অলকার পর প্রবীর যেন বড় দাগা দিল। এরা এত বদলে গেল কি করে? প্রবীর যে পথে পা-দিয়েছে সে তো ভয়ংকর পথ! রাজরোষ বাঘে ছোঁয়ার মত! কিন্তু কেন? এত লোক থাকতে ও-ই বা দেশের জন্যে মাথা ঘামায় কেন? সব বাড়াবাড়ি!

বাবা এমনভাবে ঘরে ঢুকলেন যেন এই মাত্র অতি নিকট আত্মীয়ের মুখাগ্নি করে' এলেন। মুখচোখের ভাব এত অসহায় এবং চিন্তাগ্রস্ত সমর চোখ তুলেই মুখ নামিয়ে নিলে।

যোগানন্দবাবু কাকে সম্বোধন ক'রছেন বোঝা যায় না এমনি শোনালঃ এখন উপায়? সমরও ঠিক বুঝতে পারলে না কি উত্তর দেবে—যোগানন্দবাবুর মত সেও যে আজকের ব্যাপারে বিচলিত হয়নি তার ঠিক কি? আর সান্ত্বনা দেবার মত তার মনের স্থৈর্য্য এখন আছে কি?

যোগানন্দবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, এখন উপায়? সবার হাতে দড়ি দেবে—

প্রবীরের পক্ষ সমর্থন করবার ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও সমর মুখে বললে, কিসের উপায়? আমি কি বলবো!

হঠাৎ যোগানন্দবাবু উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন, তা হ'লে কে জানবে? তুমি জানবে না, প্রবীর জানবে না, বাণী জানবে না, তা হ'লে কি আমি জানতে যাব? সংসারে বাস করতে দেবে না তোমরা?

সমরও গলার স্বরটা উঁচু করে তোলেঃ তা আমি কি জানি! আগে থেকে দেখোনি এখন ফল ভুগতে হ'বে। এখন আমার চাকরি না গেলে বাঁচি—দেশে এসে দেখচি জ্বালাতন!

যোগানন্দবাবু চুপ করে' যান। হয়তো ভাবেন—সমরকে এভাবে পরামর্শের জন্যে আহ্বান করা তাঁর ঠিক হয়নি। রাজানুগ্রহ-পুষ্ট ছেলের কাছে রাজরোষদুষ্ট ছেলের জন্যে পরামর্শ চাওয়া বৃথা। প্রবীরের জন্যে সমরকে কি করতে বলেন তিনি?

সমর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, এ আমি জানতুম—কিছু করেন না, লম্বা লম্বা কথা বলেন শুধু—ওছাড়া আর কি করবে? আমি হ'লে আগে থেকেই বলতাম নিজের পথ দেখ। Idle brain!

বড় ছেলের সঙ্গে যে-বিষয় নিয়ে পরামর্শ ক'রতে এসেছিলেন যোগানন্দবাবুর সব গুলিয়ে যায়। প্রবীরের কাজের জন্যে সমরের অভিযোগে তাঁর মনে হ'চ্ছে তিনিই দায়ী। বেকার ছোটছেলের কার্যকলাপে পূর্বাহ্নেই তাঁর কড়া নজর রাখা উচিত ছিল। সত্যিই তো সমর কি করতে পারে? ওর চাকরি যাবার ভয়টা অমূলক নয় হয়তো।

সমর অভিভাবকের কণ্ঠে বলে, এখনো সময় আছে, প্রবীরকে সাবধান করে দাও—ছেলেমানষী ছেড়ে দিক, যে সময়টা দেশোদ্ধার করে' বেড়ায় সে সময়টা একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখলে অনেক উপকার হবে। চিরকাল তো আর অতো বড় ছেলেকে কেউ বসিয়ে খাওয়াবে না!

যোগানন্দবাবু একবার চোখ তুলে সমরের মুখের দিকে চাইলেন শুধু। ভাইকে বসিয়ে খাওয়ানোর খোঁচাটি যেন যোগানন্দবাবুর লেগেছে।—নিজের কথার অপ্রিয়তা সমর বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি বলে, একটা চাকরি-বাকরি করলে আর ওসব খেয়াল থাকবে না। ওকে এখন বোঝান দরকার এতে করে এখন কিছু হবে না। এত বড় যুদ্ধটা যারা জিতলে তাদের কখনো দু চারটে সমিতি করে' কখানা 'প্রোসক্রাইবড্' বই রেখে হটান যায়! পাগলামো—ছেলেমানষী! —

বাপকে আশ্বাস দিতে ভাই-এর ছেলে-মানষীটাকে প্রমাণ করতে সমর অকারণে কয়েকবার হাসলে। যোগানন্দবাবুর চোখে কিন্তু ভয় বিহ্বলতা কাটেনি, তাঁর দৃষ্টি পূর্বের মতই উদ্‌ভ্রান্ত—এর পর কি হ'বে কে জানে! প্রবীর ছেলেমানুষ এটা তিনি অবশ্য বিশ্বাস করেন, কিন্তু তার কার্য-কলাপটাও যে ছেলেমানষীর সামিল তিনি আদৌ বিশ্বাস করতে পারেন না। তাঁর সন্দেহ, তাঁর ভয়, তাঁর উদ্বেগ প্রবীর সাংঘাতিক একটা কিছু করে' বেড়াচ্ছে, যার ফল সে একলা ভোগ করবে না, আর সবাইকে ভোগাবে—এত করে বাঁচান সংসারটায় ঘোর বিপদ আসবে, চোখে-কানে দেখতে না-পাওয়ার মত দুর্দিন আসবে। কিন্তু কি সে বিপদ যোগানন্দবাবু জানেন না। এখন মনে হচ্ছে সংসারটা তার নয়। কাউকে তিনি নিজের মত করে আর চালাতে পারবেন না। তাই আশ্বাস তিনি বড় একটা পেলেন না সমরের কথায়। যে ছেলেমানুষ নয় তাকে তার ছেলেমানুষী বোঝাবার সাধ্য কি তাঁদের!

সমর বললে, পলিটিক্স করার তো একটা সময় আছে—পেটে যাদের ভাত জোটেনা তারা আবার পলিটিক্স করতে যায় কি বলে'? তা ছাড়া—

যোগানন্দবাবু মাঝখানেই বলে' বসলেন, তা হলে তুমি ওকে বারণ করে দিও—আমাদের কথা তো আর শোনে না—এখানে ওসব চলবে না।

হঠাৎ এই ধরণের প্রস্তাব হবে সমর আশা করেনি। তাই শুধু মুশকিলেই পড়ে না—বাবা নিরুপায় হয়ে তাকে এ ভার দিচ্ছেন, না নিজেও পারবেন না বলে' এমন একটা অপ্রিয় কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছেন? সমরের হঠাৎ মনে হয়, বাবা প্রবীরের প্রতি তার বৈরিতার প্রতিযোগিতায় সন্দেহ করছেন। তাই—

সমর বলে, আমার বারণ করার কি আছে—আমি আর ক'দিন আছি। আপনিই বলে দেবেন। কাজটা ভাল নয় তাই বলা, আমার কি?

যোগানন্দবাবু নিরুপায়ের মত বলেন, তা হলে? আমার কথা কি শুনবে!

সমর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আলবৎ শুনবে, একশ'বার শুনবে—কেন শুনবে না! না শোনে বলে দেবেন, বাড়িতে জায়গা হবে না—নিজের পথ দেখে নিক। ভয় আপনার কি? আশ্চর্য! কিছু না বলে বলেই তো অতো বাড়িয়েছেন—দিব্যি কোলের কাছে বাড়া ভাতটি পাচ্ছেন, আহ্লাদ পেয়ে গেছেন! না না ওসব চলবে না!

যোগানন্দবাবু কিছু না বলে সমরের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তিনি হয়তো বেশ বুঝেছেন, কারো ওপর আর তাঁর জোর নেই, আপন কর্তৃত্ব খাটাবার আর সময় নেই—ভাল-মন্দর জন্যে একালের ছেলেমেয়েদের উপদেশ দেওয়া বৃথা। সমরের উত্তেজনার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না—কেন যে তিনি সমরের কাছে এলেন? ছেলের বুদ্ধিটাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন না, ছেলের রোজগারকে সমীহ ক'রেছেন? প্রবীর কি এমন অন্যায় করছে? সমর যদি মোটা টাকা রোজগার না করতো তা হলেও কি এতখানি উদ্বিগ্ন হবার তাঁর দরকার

করতো? এক্ষেত্রে বড় ছেলের উপদেশটা গ্রহণ-যোগ্য মনে করতেন? নিজেকে কেমন যেন হারিয়ে ফেলেন যোগানন্দবাবু—কোন কিছুর বোধগম্যতা তাঁর থাকে না। একটা অদ্ভুত ভয় কেবল তিনি বোধ করতে পারেন। ছ'বছর আগে একদিন সন্ধ্যেবেলায় তাঁর সংসারে এমনি ভয় এসেছিল, এমনিভাবে চিন্তার পারম্পর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল- কিছু ভাববার, কিছু বোঝবার বোধ ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। কি সে ভয়? প্রতিদিনের খাওয়া-পরা-শোওয়া-বসা স্বাচ্ছন্দনাশের আশঙ্কা কেবল, না আরো কিছু? ব্যক্তিগত সুখদুঃখের পারে সমাজবোধের ধারাবাহিকতা বহন করার ঐতিহ্যনাশের ভয়? সেদিনকার সেই মুহূর্তের ভাবনায় যে ভবিষ্যৎ ছিল, আজকের ভাবনায় উদ্বেগেও কি সেই ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে? তার রূপ কেমন? সমরের চাকরি যাওয়া, যোগানন্দবাবুর বাড়ি বিক্রী হয়ে যাওয়া—মুখাপেক্ষীদের হাত ধরে পথে দাঁড়ান? এ ছাড়া আর কিছু? যোগানন্দ-বাবুর মনে এখন ভবিষ্যৎ বিভীষিকার ছবিটা কেমন?

হঠাৎ যোগানন্দবাবু প্রতিধ্বনি করেন, ঠিক বলেছো, ওসব এখানে চলবে না। একজনের জন্যে তো আর সবাই পথে দাঁড়াতে পারে না বলে নিজের বাপ-মা খেতে পায় না, আবার দেশমাতা! বুড়ো বয়সে জেলে যাব নাকি?

(ক্রমশঃ)

সুশীল রায়
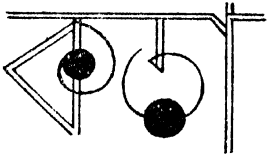
এক এক সময় ইচ্ছে হয়, দরজার কড়া দুটো খুলে পকেটে রেখে দিই। দরজার বুকের ওপর দুটো গোল গোল চোখ বার করে সারাদিন ওরা রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। এক ভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ওদের আর যে কোনো কাজ নেই, এমন নয়। কিন্তু, আমার মনে হয়, চুপচাপ তাকিয়ে থাকাতেই যদি তাদের কাজ শেষ হয়ে যেতো, তা হলে সেইটেই ভাল ছিল।

আমাকে বিরক্ত না করলে ওদের কাজ যেন শেষ হয় না। সামান্য একটু অছিলা পেলেই ওরা কটকট শব্দে হেসে ওঠে। ওদের ওই কাটখোট্টা হাসি শুনে আমার মাথা গরম হয়ে যায়। অনেক কষ্টে ও অনেক চেষ্টায় নিজের চারদিকে রোমাঞ্চকর স্তব্ধতা সৃষ্টি করে সেই স্তব্ধতার জালের মাঝখানে মাকড়ষার মতো হয়ত ওৎ পেতে বসে আছে। ভালো রকম একটা চিন্তা নাগালের মধ্যে এলেই সেই শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো, মনে মনে এমনি আঁচ করছি হয়ত, অমনি কড়া দুটো কট্‌কট শব্দ করে আমার সদ্য রচিত জাল তো ছিঁড়ে দিলোই, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার শিকারকেও দিলো তাড়িয়ে।

একটা জাল ছেঁড়া মাত্র আর একটা জাল তৈরী করে নেব, এমন বৈজ্ঞানিক যাদু জানিনে। তাই নিজের অক্ষমতার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে ওই কড়ার ওপর। ওরা যদি আমার দরজায় পাহারাওলার মতো না থাকে, তাহ'লে আমার ক্ষতি কতটা—সেই হিসেব করতে থাকি। ওদের আবিষ্কার করলো কে, এটাও ভাববার কথা। যে ওদের খুঁজে বার করেছে, সে নিশ্চয় একজন কাজের লোক। তার গবেষণার দরুণ পৃথিবী হয়ত সত্যিকারের কাজের জিনিস পেয়েছে অনেক, কিন্তু তার এই প্রাণান্তকর চরম আবিষ্কারটির জ্বালায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমি তাই অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

ঘরে ঘরে দরজায় দরজায় এমনি অজস্র কড়া ছড়ানো আছে, আমি জানি। এদেরকে দিয়ে বাস্তবিক কতটা কাজ হয়, তা খতিয়ে ক'জন দেখেছে—তা অবশ্য জানিনে। খতিয়ে দেখার জন্যে উদ্যোগী যদি কেউ হয়, তাহ'লে নির্ঘাৎ দেখা যাবে যে, উপকারের চেয়ে অপকার আর লাভের চেয়ে ক্ষতিই, এদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি বেশি। এদের এই কুকীর্তিকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যে ধরেনি বলেই আজও এদের টিকি দেখা যাচ্ছে। সবার যদি হুঁস হয়, আর সকলে যদি কাজের হিসেব দাখিল করার জন্যে এদের নির্দেশ দিতে পারে, তাহলেই একদিনে এদের মুখোস খুলে যাবে। দরজায় দরজায় সেজে দাঁড়িয়ে থেকে কত ক্ষতি যে এরা করেছে, তার অন্ত নেই। আসলে পাহারা দেবার কাজ কতটুকু জানে ওরা। দুপাশে দুটি কড়া যখন আলাদা আলাদাভাবে ঝুলে থাকে তখন ওদের থাকা না-থাকা সমান। ঘর আগলাবার জন্যে যখন ওদের ডাক পড়ে, তখন ওদের দুজনকে একসঙ্গে বাঁধতে হয়। কেউ কখনো দেখেছে যে ঘর আগলে দাঁড়াবার জন্যে দুটো কড়া উদ্যোগী হয়ে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বাঁধা পড়েছে। কড়া দিয়ে পাহারার কাজ হয় না, এর চেয়ে বড় প্রমাণ তাহলে আর কী আছে? সুতরাং, আমার ইচ্ছে—অবিলম্বে সমস্ত ঘর-দুয়ার থেকে কড়াদের অপসারিত করা হোক—কুকুর অনুযায়ী মুগুর ব্যবহারের রেওয়াজ আছে শুনেছি। অতএব এদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা হবে, তা উপযুক্ত হতে হলে সে ব্যবস্থা কড়া হওয়াই দরকার।

দেখতে এরা নীরব ও নির্জীব, নিরীহ ও নম্র। কিন্তু আসলে এরা কী, এদের একটু নাড়াচাড়া করে দেখলেই চট্‌ করে বোঝা যাবে। একটু আস্কারা পেলেই এরা এদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে কসুর করে না। কট্‌কট্‌ করে হেসে ওঠে। হাসির শব্দ যদি এমন কঠিন আর কপট হয়, তাহলে সে শব্দে প্রাণ পুলকিত না হওয়াই স্বাভাবিক। এই বিকৃত আওয়াজে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে এই জন্যেই। কিন্তু পৃথিবীর সবই বিচিত্র। এরা আমাদের চির-সঙ্গী আর আমাদের দরজার অঙ্গের-ভূষণ হয়ে থাকবেই। 'রাধিকার বেড়ি ভাঙো—এ মম মিনতি' বলে কাৎরাতে চাইনে, কিন্তু এই বেড়ির হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই।

ওরা আছে আমার দরজায়। কিন্তু ওদের কথা মনে হলেই আমি সচকিত হয়ে উঠি। আমার মনে হয়, ওরা শুধু আমার হাতে নয়, আমার সর্বাঙ্গে বেড়ি হয়ে ঝুলে আছে। জানালা কবাট বন্ধ করে ছোট একটা আলো জেলে রোমাঞ্চকর ও লোভনীয় করে তুলেছি হয়ত আমার চারধার। নিজের নিশ্বাস-পাতের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই হয়ত নেই কাছে-ভিতে। আমাকে এমনি একা পেয়ে আশপাশ থেকে চিন্তারা দল বেঁধে গুটি গুটি পায়ে হয়ত আমাকে ঘিরে দাঁড়াবার জন্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আমিও বসে আছি ওৎ পেতে। নাগালের মধ্যে এলেই ওদের ধরে ফেলবো বলে তৈরি হচ্ছি। আরো কাছে এসেছে ওরা। শিকারীর মত ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুবর্ণ মুহূর্তটি বাছাই করছি হয়ত, এমন সময়—

কেউ হয়ত এসেছে। চারদিকের জাল ছিন্নভিন্ন করে সশরীরে বেরিয়ে এলাম। চিন্তারা হুটপাট করে পালিয়ে গেল। দরজা খুলে দেখলাম, বাইরেটা অন্ধকার ও নির্জন। বাতাসের ছোট একটা সঙ্কেতে ওরা দুজন রসিকতার হাসি তবে হেসেছে আপন মনেই। ঠিক এই সময় এমন কাংস্য হাসি তাদের না হাসলেই বুঝি চলত না। আপন মনে হাসবার উৎসাহ যাদের আছে, আপন ইচ্ছায় দরজা আগলাবার ক্ষমতাও তাদের তাহলে থাকা উচিত। বাতাসের একটু নাড়া

পেলে যারা খুশিতে বন্য হয়ে উঠতে পারে, তারা পাহারা দেবার সময় তবে তালার শরণাপন্ন হয় কেন। ক্ষমতার দৌড় যাদের এতদূর, তাদের মুখ থেকে তাহলে ওই উৎকট হাসি উপড়ে ফেলাই দরকার। এই জন্যেই ওদের সকলকে অপসারিত করার সুপারিশ করছিলাম। আমার এই তদ্বিরে বিশেষ কিছু কাজ হবে কি না জানিনে। কিন্তু কাজ যদি হতো, তাহলে সেটা কাজের মত কাজ বলে গণ্য যে হতোই—এ বিষয় আমি নিঃসন্দেহ।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলাম। ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটা শেষ করে খুব ক্লান্তি বোধ হতে লাগলো। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিতে লাগলো। আবার দরজা খুললাম। ঘামের ওপর বাতাসের প্রথম প্রলেপটা বড় মোলায়েম লাগলো। তখন আমার মনে হলো, ওই কড়ারা আমাকে কট্‌কট করে হয়ত বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে ইঙ্গিত করে। জাতে ওরা কড়া, ভাষাও তাই হয়ত ওদের কড়া। ইশারাও তাই কট্‌কট করে বাজে। ঘরে জ্বলছে ছোট একটা বাতি, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে হাজারো বাতির উৎসব দেখতে পাচ্ছি। বহুদিন বাদে রাত্রের আকাশের দিকে চেয়ে মনে হলো, দেয়ালীর উৎসব শুরু হয়েছে যেন এখানে। দুপুর রাতের এই স্তব্ধতা আমাকে ঘিরে এসে দাঁড়ালো। ওই, ছুটে গেল একটা তারা—একটা হাউই উড়ে গেল যেন। এই নীরব ও নিস্তব্ধ উৎসবটি তো মন্দ নয়। ছোট ঘরের মধ্যে অনেক কষ্টে ও অনেক চেষ্টায় নিস্তব্ধতা জোর করে আমাকে তৈরি করতে হয়, ঠুনকো আঘাতে কাঁচের বাসনের মতো তা খানখান হয়ে ভেঙে যায় এক নিমেষে। কিন্তু এই বিশাল বাইরে তলহীন স্তব্ধতার যে মহাসমুদ্র রচিত হয়েছে, তার নিশ্চয় মার নেই। হাজার হাজার কড়া দল বেঁধে এসে সহস্র গলায় উৎকট উল্লাস করলেও এর এই নিটোল নিস্তব্ধতার গায়ে একটা টোলও ফেলতে পারবে না। নিজেকে অসহায় ভাবার আগে দরজার কড়া দুটোর দিকে চেয়ে তাদের ওপর বড় করুণা হলো।

কিন্তু আসলে করুণার পাত্র যে আমি নিজেই, সে হুঁশ তখন হয়নি। কড়ারা লোক চেনে। ফুলের ঘায়েই যে মূর্চ্ছা যায়, পদে পদে হোঁচট খেতে হয় তাকেই। যে প্রবল প্রতাপ-শালী, হোঁচটরা তাকে সমীহ করে পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। আমার দরজার কড়ারা আমাকে নিশ্চয় চিনেছে। তাই অমন চিম্‌টি কাটে। জমাট হয়ে বসা মাত্র তাই বিদ্রূপের হাসি হেসে আমার মেজাজ গরম করে দেয়। সহজেই যে কাবু হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে লাগতে পিছ-পা ওরা হবে কেন। তাই বাইরের ওই বিশাল শূন্যতা দেখে ওরা কেবল চোখ গোল গোল করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু ভিতরের এই ক্ষুদ্রাকার শূন্যতা দেখে ওরা কট্‌কট শব্দে না হেসে থাকতে পারে না।

ওরা যে খুব চালাক ও চতুর, সে কথা অস্বীকার করতে চাইনে। ওদের চোখের গোলগোল চাউনি দেখেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। দরজার অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে ওরা দরজার গায়ে লেগে আছে। ওদের পরিহার ক'রে দেখুন, তাতে কারো বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওদের দরজাচ্যুত করতে কেউ পারবেন না। এটাও ওদের চালাকিরই লক্ষণ। আমার কথা হ'চ্ছে এই—আমার সঙ্গে ওদের চালাকির এত বহর কেন? কটকট ক'রে শব্দ করে আমার কাজ পণ্ড ক'রে দিয়ে ওরা চুপচাপ নিরীহের মতো ঝুলতে থাকে। তখন ওদের গায়ে হাত দিলে ওরা ফের কটকট শব্দে আবার প্রতিবাদও জানায়। নিষ্কর্মাদের গলার স্বর এমনিই হয় বটে।

পৃথিবীতে মাটির তুলনায় নোনা জলের আয়তন অনেক বেশী। এই নোনাজল পাম্প করে যদি একদম বাদ দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে শস্য শ্যামলা পৃথিবী নাকি রাতারাতি শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে উঠবে। সুতরাং এর প্রয়োজন অবহেলা করা চলে না। কাজের পৃথিবীতে তেমনি কড়ারাও অপরিহার্য। নিষ্কর্মারা যে কাজ করে না, সেইটেই নাকি তাদের কাজ। কাজের পিঠে চিমটি কেটে কাজ ভণ্ডুল করার জন্যেই নাকি তাদের আবির্ভাব। এ রকম অনেক যুক্তি শুনে শুনে হয়রাণ হয়ে গেছি।

ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ ব'সে থাকাকে নিশ্চয় কেউ কাজ আখ্যা দেবেন না। কড়ারাও একে কাজ ব'লে স্বীকার অবশ্যই করে না। তা হ'লে আমার দরজায় এসে হানা দেবার তাদের দরকার কী। যারা কাজ নিয়ে আত্মহারা হ'য়ে আছে তাদের কিন্তু এরা আদপে বিরক্ত করতে ভরসা করে না, বিব্রত করার সাহসও পায় না। যারা কাজ ক'রে, তারা বাইরের পৃথিবীর জীব। একটু আগেই আমরা দেখেছি, বাইরের পৃথিবীর ওপর এরা বিন্দুমাত্র উপদ্রব করে না। এদের যত উৎপাত সব ঘরের ওপর। যে ঘরের দরজায় এদের আশ্রয় দেওয়া হয়, এদের আক্রমণের ধাক্কা পড়ে সেই ঘরেরই ওপর। নিষ্কর্মাদের নাকি স্বভাবই এমনি।

তা যদি হয়ই, তবে এ সব নিষ্কর্মা দিয়ে আমাদের কাজ কী। এদের স্বভাব, এদের মতিগতি, এদের আচার আচরণ সব কিছু সম্বন্ধেই আমরা যদি ওয়াকিবহাল হ'য়ে থাকি, তবে এদের এভাবে আস্কারা দিয়ে চ'লেছি কেন। কড়াদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার করার জন্যে আমাদের সকলের অবিলম্বে কড়া হ'তে হবে। তা ছাড়া গত্যন্তর যে নেই, এ কথা আমি ভেবে দেখেছি।

ওই কটকট শব্দ করছে কড়া। ভাবনা-চিন্তা ছিঁড়ে-ছুটে ছত্রখান হয়ে গেছে অনেক আগেই, তাই আর নড়ছিনে। এক মনে খসখস শব্দে কলম চালাচ্ছি। ওকে দেখাবার ইচ্ছে যে, ওর ওই উৎকট হাসি আমি গ্রাহ্যই করিনে। যতই শব্দ করছে কড়ারা, তত দ্রুত চলছে কলম। কিন্তু ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারব কেন। তাকিয়ে দেখি, শাদা-শাদা লেখা পড়ছে কাগজে। দম ফুরিয়ে গেছে কলমের। কালী ভরতে হবে। উঠে পড়লাম।

কড়াদের উপড়ে পকেটস্থ না করা পর্যন্ত আর কিছু লিখব না, ঠিক করে ফেললাম আজ।

পশ্চিম বঙ্গের অর্থকথা

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ

প্রদেশের প্রাণিসম্পদ

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে নানাপ্রকার জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রদেশের অর্থনীতিতে এই সকল জীবজন্তুর গুরুত্ব সামান্য নহে। এই সকল জীবজন্তুকে অরণ্যচারী এবং গৃহপালিত—এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক উপযোগিতার দিক হইতে গৃহপালিত পশু পক্ষীর গুরুত্ব যে অনেক বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রদেশের অর্থনীতিতে অরণ্যচারী জীবজন্তুর কোন গুরুত্বই নাই, ইহা কোনমতেই বলা চলে না। প্রদেশের অরণ্যচারী পশুপক্ষীর ভিতরে জলপাইগুড়ির অরণ্য অঞ্চলে ব্যাঘ্র এবং হস্তী, সুন্দরবন অঞ্চলে বৃহৎ ব্যাঘ্র, হরিণ, চিতাবাঘ এবং কুমীর প্রধান। ইহা ছাড়া, প্রদেশের বিল এবং জলাভূমি অঞ্চলে, বৃহৎ নদীসমূহের নিকটবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য বন্য হাঁস, মোরগ এবং নানাপ্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

সুন্দরবনের যে অঞ্চল ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বহুসংখ্যক ব্যাঘ্র, অসংখ্য হরিণ এবং চিতাবাঘ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা ছাড়া খাল এবং ছোট ছোট নদীতে বহু সংখ্যক কুমীর বিচরণ করে। সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে, বিশেষতঃ সাগর দ্বীপে, নানাপ্রকার হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। ২৪ পরগণা জিলার বিল এবং নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে পাতিহাঁসের অভাব নাই। নদীয়া জিলায় বিশেষত রাণাঘাট এবং শান্তিপুর থানায়, বহু সংখ্যক চিতাবাঘ এবং বন্য ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। জিলার কোন কোন স্থানে নানাপ্রকার হাঁস দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু জলাভূমিসমূহ কচুরীপানা এবং আগাছায় পরিপূর্ণ বলিয়া হাঁস শিকার অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। মুর্শিদাবাদ জিলায় অরণ্যচারী জীবজন্তুর অভাব নাই। জিলার যে কোন জংগলে চিতাবাঘ এবং ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যাইবে। কান্দি মহকুমার হিজল বিলে এবং জিলার প্রাচীন নদীসমূহে বহু কুমীর দেখিতে পাওয়া যায়। হিজল বিল এবং এই সকল নদী ও জলাভূমিতে অসংখ্য পাতিহাঁসও দেখিতে পাওয়া যায়। বেলডাঙ্গা এবং ভাবতা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে 'বাগরী' নামক এক প্রকার ছোট পাখী প্রতি বৎসর বহু সংখ্যায় শিকার করা হইয়া থাকে। বর্ধমান জিলার দুর্গাপুর জংগলে এবং পূর্বস্থলী থানায় ভল্লুক কিংবা চিতাবাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, জিলার বহু স্থানে প্রতি বৎসর নানা প্রকার হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলী জিলার আরামবাগ মহকুমায় চিতাবাঘ এবং বন্যভল্লুক দৃষ্টিগোচর হয়। শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বিলসমূহে, বিশেষত ডানকুনি বিলে, নানাপ্রকার পাখী এবং হাঁস প্রতি বৎসর শিকার করা হইয়া থাকে। হাওড়া জিলায় কখনও কখনও বন্য ভল্লুক এবং চিতাবাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া উলুবেড়িয়া মহকুমায়, বিশেষত শ্যামপুর থানায়, নানাপ্রকার হাঁস এবং পাখী প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। বাঁকুড়া জিলার রাণী বাঁধ জংগলে এখনও ব্যাঘ্র এবং হস্তী বিচরণ করিতেছে বলিয়া বহুলোকের ধারণা রহিয়াছে। এই অঞ্চলের অরণ্যে বৃহৎ ব্যাঘ্র এবং হস্তী বর্তমানে অধিক সংখ্যায় না থাকিলেও হরিণ, চিতাবাঘ, বন্য ভল্লুক এবং নেকড়ে বাঘ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, অরণ্য অঞ্চলে বন্য মোরগ এবং নানাপ্রকার পাখীর অভাব নাই। সোণামুখী থানায় এবং বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বহু সংখ্যক হাঁসও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বীরভূম জিলায় দুবরাজপুর থানায় বন্য ভল্লুক, চিতাবাঘ এবং কখনও কখনও হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আলন্দা বিলের নিকটবর্তী অঞ্চলে হাঁস এবং জিলার জংগলসমূহে বন্য মোরগ দেখিতে পাওয়া মোটেই আশ্চর্যের নহে। মেদিনীপুর জিলায় অরণ্যচারী পশুপক্ষীর অভাব নাই বলিলেই চলে। সাঁওতাল পরগণার নিকটবর্তী অঞ্চলে, বিশেষত ঝাড়গ্রাম মহকুমার জংগলে চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল জংগলে হরিণ এমন কি কখনও কখনও ব্যাঘ্রও দেখিতে পাওয়া যায়। বনাঞ্চলে বন্য মোরগ, খরগোস হাঁস প্রভৃতির অভাব নাই। মালদহ জিলাতেও হাঁস, চিতাবাঘ প্রভৃতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জিলার উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে যে সকল বিল ও জলাভূমি রহিয়াছে, তাহাতে হাঁস ও অন্যান্য পাখী শিকার অত্যন্ত সহজসাধ্য। পশ্চিম দিনাজপুর জিলার ঠাকুরগাঁও মহকুমায় প্রায়ই চিতাবাঘ এবং ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, বিল অঞ্চলে হাঁস এবং তিতির জাতীয় পক্ষীরও অভাব নাই। অরণ্যচারী জীবজন্তু জলপাইগুড়ি জিলায় সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। জিলার অরণ্য অঞ্চলে বন্য হস্তী, গণ্ডার, বৃহৎ ব্যাঘ্র, বন্য ছাগল, ভল্লুক প্রভৃতি সকল প্রকার জন্তুই দেখিতে পাওয়া যাইবে। জলপাইগুড়ি জিলার এই অঞ্চল হিমালয়ের পাদদেশে "তরাই" অঞ্চলের বিস্তৃতি বলিয়াই অরণ্যচারী জীবজন্তুর এইরূপ সমাবেশ সম্ভবপর হইয়াছে। এই সকল বৃহৎ জীবজন্তু ছাড়া, বন্য মোরগ, বিভিন্ন প্রকার পক্ষী এবং হাঁস বনাঞ্চলে এবং ক্ষুদ্র নদীসমূহের নিকটবর্তী অঞ্চলে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। জিলার দক্ষিণ-পশ্চিমে দিনাজপুর জিলার সীমারেখায়ও এই সকল পাখী ও হাঁস দেখিতে পাওয়া কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নহে। প্রদেশের অরণ্যচারী পশুপক্ষীর ইহাই মোটামুটি পরিচয়।[১]

গৃহপালিত জন্তু

প্রদেশের অর্থনীতিতে গৃহপালিত জন্তুর গুরুত্ব যে অরণ্যচারী জীবজন্তুর গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সকল জন্তুর ভিতরে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, শূকর এবং গাধাই প্রধান; খচ্চর এবং উঠের সংখ্যা নগণ্য। ১৯৩০ সালে সমগ্র প্রদেশে মাত্র ৮৬টি উট ছিল, ১৯৪০ সালে ইহার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৭টিতে দাঁড়াইয়াছে। এই দশ বৎসরে খচ্চরের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে, ১৯৩০ সালে সমগ্র প্রদেশে যেখানে খচ্চরের সংখ্যা ছিল ৪১৩, ১৯৪০ সালে সেখানে খচ্চরের সংখ্যা মাত্র ৫৬-টিতে দাঁড়াইয়াছে। প্রদেশের জিলাসমূহের ভিতরে ২৪ পরগণাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক খচ্চর (২৫২টি) দেখা যায়। ১৯৩০ সালে প্রদেশে গাধার সংখ্যা ছিল ৬০১; দশ বৎসরে ইহা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই; বরং সামান্য হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২০ সালে প্রদেশের গাধার সংখ্যা ৫৯৮ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪০ সালের ভিতরে প্রদেশের ঘোড়ার সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০ সালের দশ বৎসর পূর্বে প্রদেশের ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার ৫ শত; দশ বৎসরে ইহা ২২ হাজার ৪ শতে হ্রাস পাইয়াছে। ঘোড়ার সংখ্যাও ২৪ পরগণা জিলাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী; ১৯৪০ সালে ৫ হাজারের অধিক সংখ্যক ঘোড়া কেবলমাত্র ২৪ পরগণা জিলাতেই ছিল। আয়তনের তুলনায় দার্জিলিং জিলায় ঘোড়ার সংখ্যা যথেষ্ট। দার্জিলিং এবং মুর্শিদাবাদ উভয় জিলাতেই ঘোড়ার সংখ্যা ৩ হাজারের বেশী হইবে। বাঁকুড়া জিলায় ঘোড়ার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম; দুই শতের সামান্য বেশী হইবে। প্রদেশের বিভিন্ন জিলায় বহু সংখ্যক শূকর দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪০ সালে প্রদেশে প্রায় ৯১ হাজার শূকর ছিল। বাঁকুড়া জিলায় শূকরের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী; প্রায় ২০ হাজার হইবে। ১৯৪০ সালে বর্ধমান জিলায় ১৩ হাজারের বেশী এবং বীরভূম জিলায় ১১ হাজারের বেশী শূকর ছিল। হাওড়া জিলায় শূকরের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম; ৫½ শতের বেশী হইবে না। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪০ সালের ভিতরে প্রদেশের

1 Agricultural Statistics, Govt. of Bengal.

ভেড়ার সংখ্যাও প্রায় ৩০ হাজার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩০ সালে ভেড়ার সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৮৭ হাজারের বেশী; ১৯৪০ সালে ইহার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৩ লক্ষ ৫৭ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ভেড়ার সংখ্যা বীরভূম জিলায় সর্বাপেক্ষা বেশী; ১৯৪০ সালে বীরভূমে ভেড়ার সংখ্যা ৮০ হাজারের বেশী ছিল। বর্ধমানেও ৭১ হাজারের বেশী ভেড়া ছিল। জলপাইগুড়িতে ভেড়ার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম; ১৯৪০ সালে জলপাইগুড়িতে ১ হাজার ৪ শতের কিছু বেশী ভেড়া ছিল। ১৯৩০ সালের পর হইতে দশ বৎসরের প্রদেশে ছাগলের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩০ সালে প্রদেশে ছাগলের সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার; ১৯৪০ সালে ছাগলের সংখ্যা ২৭ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। মেদিনীপুরে ছাগলের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী; ১৯৪০ সালে মেদিনীপুর জিলায় ৩ লক্ষ ৮৬ হাজারের বেশী ছাগল ছিল। বাঁকুড়া জিলাতে সেই সময়ে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজারের বেশী ছাগল ছিল। দার্জিলিং জিলায় ছাগলের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম,—৫৪ হাজারেরও কম হইবে।১

গো-মহিষাদি জন্তু

প্রদেশের গৃহপালিত জন্তুসমূহের ভিতরে গোরু এবং মহিষই প্রধান। ১৯৩০ সালে সমগ্র প্রদেশে দুগ্ধবতী গাভী, বলদ এবং গো-বৎসের মোট সংখ্যা ছিল ৮৯ লক্ষ ৯০ হাজার। দশ বৎসরে এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৮১ লক্ষ ৩৩ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। ইহার ভিতরে বাছুরের সংখ্যা ২১ লক্ষের বেশী হইবে। দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশী এবং ষাঁড় ও বলদের সংখ্যা ২৮ লক্ষের বেশী হইবে। ১৯৩০ সালের পর হইতে ১০ বৎসরের ভিতরে প্রদেশে বলদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী; দশ বৎসরের ভিতরে ৫ লক্ষেরও বেশী বলদ হ্রাস পাইয়াছে। দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা কিন্তু প্রায় ৪০ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। গো-বৎস কিংবা বাছুরের সংখ্যা এই দশ বৎসরে প্রায় ৪ লক্ষ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪০ সালের হিসাব অনুসারে, মেদিনীপুর জিলায় গোরুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী, প্রায় ১৭½ লক্ষ হইবে। ২৪ পরগণা জিলায় গোরুর সংখ্যা ১১ লক্ষের বেশী হইবে। মালদহ জিলায় গোরুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম, ৩ লক্ষ ২২ হাজার মাত্র। ১৯৪০ সালের পর হইতে ১৯৪৮ সালের ভিতরে প্রদেশে গোরুর সংখ্যায় কি তারতম্য ঘটিয়াছে বলা সহজ নহে। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত গোরুর সংখ্যা যেভাবে হ্রাস পাইয়াছে, তাহাতে ১৯৪৮ সালে প্রদেশে গোরুর সংখ্যা যে বৃদ্ধি পায় নাই, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। তাহা ছাড়া, যুদ্ধের কয় বৎসর গো-বধ যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে ১৯৪৮ সালে গোরুর সংখ্যা কিছু হ্রাস পাইয়াছে, এইরূপ মনে করাই যুক্তিযুক্ত। পঞ্চাশের মন্বন্তর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা-প্লাবন প্রভৃতির ফলেও প্রদেশের গোরুর সংখ্যা নিশ্চয়ই কিছু হ্রাস পাইয়াছে।

১৯৩০ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে মহিষের মোট সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার। ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার দাঁড়াইয়াছে। ইহার ভিতরে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার পুরুষ-মহিষ, ১ লক্ষ ৩২ হাজার স্ত্রী-মহিষ এবং ৭২ হাজার শিশু মহিষ ছিল। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪০ সালের ভিতরে পুরুষ মহিষ ১৪ হাজার, স্ত্রী মহিষ ১৫ হাজার এবং শিশু-মহিষ ১৩ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। জিলাসমূহের ভিতরে বাঁকুড়া জিলায় মহিষের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী—১ লক্ষের বেশী হইবে। হাওড়া জিলায় মহিষের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম; ৫ হাজারের সামান্য বেশী হইবে। ১৯৪০ সালের পর হইতে ১৯৪৮ সালের ভিতরে মহিষের সংখ্যাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।১

প্রদেশে গোরু-মহিষের সংখ্যা নির্ধারণ করিবার পরে এইবারে প্রদেশের প্রয়োজনের একটি হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। প্রদেশে মোট স্ত্রী-গোরুর সংখ্যা (গো-বৎস ভিন্ন) ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ডাঃ বার্নস'র মতে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে প্রতিটি গোরু গড়ে বাৎসরিক ৩৭০·৬ পাউন্ড দুধ দেয়। প্রদেশের সকল স্ত্রী-গোরুকে যদি দুগ্ধবতী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এই হিসাব অনুসারে প্রতি বৎসর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১,০২১,৫৫৪,০০০ পাউন্ড কিংবা ১১,১৭৩,৬২২ মণ গো-দুগ্ধ পাওয়া যায়। গো-দুগ্ধ ভিন্ন অন্যান্য দুগ্ধের ভিতরে মহিষের দুগ্ধই প্রধান। প্রদেশে স্ত্রী-মহিষের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ডাঃ বার্নস'র মতে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের প্রতিটি মহিষ গড়ে ৭৩২·৬ পাউন্ড দুধ দিতে পারে। এই হিসাব অনুসারে, ৯৬,৭০৩,২০০ পাউন্ড কিংবা ১,০৫৭,৬৯১ মণ মহিষ-দুগ্ধ প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যাইতে পারে। কাজেই সমগ্র প্রদেশে গো-দুগ্ধ মহিষ-দুগ্ধের পরিমাণ একত্রে ১২,২৩১,৩১৩ মণ হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।২

ডাঃ আক্রয়েড'র মতে প্রত্যেকটি শিশু, প্রসূতি এবং গর্ভবতী নারীর জন্য দৈনিক ১ পাউন্ড দুধ এবং সাধারণ লোকের জন্য দৈনিক ½ পাউন্ড দুধ প্রয়োজন। এই হিসাব অনুসারে প্রদেশের মোট প্রয়োজন ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ মণের কম হইবে না। বর্তমান সরবরাহের পরিমাণ ১ কোটি ২২ লক্ষ মণ ধরিয়া লইলে ঘাটতির পরিমাণ ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ মণের কম হইবে না। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমানে যে পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যাইতেছে, তাহার একটি বৃহদংশ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; কাজেই পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত দুধের পরিমাণ আরও কম হইতে বাধ্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে কেবলমাত্র কলিকাতাতেই প্রতিদিন ১১৩০ মণ কিংবা প্রতি বৎসর ৪১৪৪৫৩ মণ দুধ মিঠাই প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।৩ তাহা ছাড়া ১৯৪০ সালের পরে প্রদেশের গো-মহিষের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, এইরূপ মনে করিবার যে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

প্রদেশে ষাঁড় ও বলদের মোট সংখ্যা ২,৮৪৫,২৬৪ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে, ইহার ভিতর ষাঁড়ের সংখ্যা (অল্পবয়স্ক সহ) ৪২,২৭৭ হইবে। এই সকল ষাঁড়ের প্রত্যেকটি সবল ও সমর্থ বলিয়া ধরিয়া লইলেও দেখা যাইবে যে; ৭০টির বেশী গোরুর জন্য মাত্র ১টি ষাঁড় পাওয়া যাইতেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ৫০ হইতে ৬০টির বেশী গোরুর পক্ষে ১টি করিয়া ষাঁড় দরকার। কাজেই দেখা যাইতেছে প্রদেশে অন্ততঃপক্ষে আরও ২০ হাজার ষাঁড়ের দরকার। প্রদেশে গোরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যে আরও বেশী ষাঁড়ের দরকার হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা ছাড়া, প্রদেশে যে সকল ষাঁড় রহিয়াছে তাহাদিগকে কখনও কখনও একাধিক কার্যে ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনের তুলনায় প্রদেশে ষাঁড়ের সংখ্যা অল্প হইলেও বলদের সংখ্যা মোটামুটিভাবে পর্যাপ্তই বলিতে হইবে। ডাঃ বার্নসএর মতে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে এক জোড়া বলদ ৭·৬ একর জমি চাষ করিতে পারে। এই হিসাব অনুসারে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের আবাদী জমির জন্য অন্ততঃপক্ষে ১,৩৬৫,২৬৩ জোড়া বলদ প্রয়োজন। প্রদেশে ষাঁড় ও বলদের সংখ্যা (অল্পবয়স্ক ষাঁড় ও বলদ ভিন্ন) ২,৮৪৫,২৬৪ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে ষাঁড়ের সংখ্যা বাদ দিলে প্রদেশে পূর্ণবয়স্ক বলদের সংখ্যা ২৮০২৯৮৭ কিংবা কিছু বেশী হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রদেশের প্রয়োজন অপেক্ষা ৭২,৪৬১ কিংবা কিছু বেশী বলদ বাড়তি হইয়াছে। এই হিসাব অবশ্য ১৯৪০ সালের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছে; ১৯৪০ সালের পর এদেশে বলদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, এইরূপ মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

1 Statistical Abstract, West Bengal. p. 49. Compiled from Season and Crop Report of Bengal.

1 Statistical Abstract West Bengal: Compiled from Season and Crop Report of Bengal.

2 Dr. Burns: Report on the Technological Possibilities of Agricultural Development in India.

3 Report on the Survey of Milk Supply Position of Calcutta, 1945, P. 4.

বিষ্কমুখের কথা

বাঙালীর নিজস্ব উৎসব শারদীয়া পুজোর আধুনিক রূপান্তর প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

স্মৃতি-চিত্র জাতীয় রচনায় সেকালের সামাজিক প্রথা, আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। সে সব প্রথা বা সংস্কার আজকের দিনে অচল আর বাতিল, এ কথা মেনেও তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল থাকলে ক্ষতি নেই। বরঞ্চ লাভ আছে। আর কিছু না হোক্, আমাদের দেশীয় সমাজের মধ্যে যে সব অগ্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া এ যাবৎ কাজ করে এসেছে, তাদের একটা মোটামুটি বিশ্লেষণ করবার সুযোগ মেলে। তীর্থ-মাহাত্ম্য, ব্রত-পার্বণ, অর্থহীন লোকাচার আমরা মানব না, এটা ঠিক্। কিন্তু কি সামাজিক আর ঐতিহাসিক কারণে শ্রুতি-স্মৃতির জন্ম আর প্রসার হল, অবনতির যুগে সেই সব আচার-অনুষ্ঠানগুলোই নিষ্প্রাণ হয়েও মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি গেড়ে মনকে অনুশাসনের দাসত্বে বেঁধে ফেললে, সেগুলো খবর হিসেবে প্রয়োজনীয়। আর প্রাচীন প্রথা বা সংস্কারের মধ্যে যদি কোনও কল্যাণ বা সৌন্দর্যের স্পর্শ থাকে, তা হলে সেগুলিকে বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিশ্চয়ই নেওয়া যেতে পারে। যেমন নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে এমন সব উৎসবের প্রবর্তন তিনি করেছিলেন, যেগুলির মধ্যে সমাজ-মঙ্গলের পরিচয় আছে। রসরাজ অমৃতলাল বসুর লেখা 'কৌতুক-যৌতুকে', বিশেষ করে 'কৌলিক দুর্গোৎসব' নামে রসচিত্রটিতে সেকালের পুজোউৎসবের ভালোমন্দ দুটো দিক্ই দেখানো হয়েছে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসরচনাতেও এই রকম বাঙালী পুজো-পার্বণের বৈশিষ্ট্য সরসভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

* * * *

বাঙলা দেশে 'সার্বজনীন' উৎসবগুলির প্রচলনই আজকাল বেশি। বাঙালী মিলে মিশে কাজ করে। তবে পার্টি বা দলের প্রাধান্য এদেশে বরাবরই আছে। আমার মনে হয়, বাঙলা দেশের পলিটিক্স যে নষ্ট হয়ে গেল তার প্রধান কারণ হল বাঙালীর বারোয়ারী মনোভাব। চাঁদা তুলতে আমরা যেমন ওস্তাদ, কাজ ভাগ করে দিয়ে নিজে মুরুব্বি সেজে বসে থাক্তে আমরা যেমন নিপুণ, পরের দোষ দেখিয়ে দলাদলি করে আবার কোনও এক অনুষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে দিতেও আমরা পিছুপাও হই না। বেশি দিন ধরে কোনও একটা কাজে লেগে থাক্তে সত্যি আমাদের কষ্ট হয়। কয়েকটি বিশিষ্ট বাঙালী প্রতিষ্ঠান অবশ্য আজও সগৌরবে টিঁকে আছে, যেগুলি সারা ভারতের প্রশংসা দাবী করতে পারে। কিন্তু এগুলো হল নিপাতনে সিদ্ধ। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। বাঙলা দেশের সমাজনীতি আর রাজনীতির ব্যাকরণ বড় কড়া জিনিষ। এখানে কোনও কিছু গড়ে ওঠবার আগেই, তার ব্যুৎপত্তি নিয়ে প্রথমে গোলমাল শুরু হয়। গোলমাল যদি বা থাম্‌লে, শুরু হল বিভিন্ন শব্দরূপ। সেটা বা যদি আয়ত্ত হল, সন্ধির অধ্যায়ে গিয়ে আট্‌কে যেতে হবে। সেখানে সব বিচ্ছেদ। সমাসের চেয়ে ব্যাস-বাক্যেই আমরা পটু। কৃৎপ্রত্যয়ে আমাদের আস্থা নেই। তদ্ধিত প্রকরণের বিলোপ-সূত্র-গুলিই আমাদের কণ্ঠস্থ। ণত্ব আর ষত্ব বিধানের নেতিমূলক আর স্বত্ব-বাচক নিয়ম-গুলি শিখ্‌তে আমাদের আগ্রহ আছে। আত্মনেপদী ব্যাপারের চেয়ে পরস্মৈপদী ক্রিয়া-কলাপেই অভিরুচিটা যেন বেশি। আর সব চেয়ে বড় কথা, আমরা সনন্ত ধাতুর পক্ষপাতী। কিন্তু ক্রিয়াপদ শেষ করতে ভয় পাই। আমাদের জিজ্ঞাসা অসীম, পিপাসা অনন্ত। মধ্যে মধ্যে উদার মুহূর্তে চিকীর্ষাও অনুভব করি। দুর্ভিক্ষে বুভুক্ষা যেটুকু ওঠে, সাহিত্যে তার চেয়ে বিবক্ষা হয় বেশি। ছিদ্র-ব্যাপারে অনু-সন্ধিৎসা বেশ সূক্ষ্ম, অপরের ব্যাধি-চিকিৎসায় আমরা যত্নবান্। কিন্তু শুশ্রূষা নেই—জিঘাংসা ও জুগুপ্সার শক্তি অসামান্য। জিজীবিষা পরাস্ত হয় মুমূর্ষার কাছে। তবে সব বিষয়েই ইচ্ছা আমাদের আছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

* * * *

কিন্তু গঠনমূলক যে কোনও প্রচেষ্টায় আমরা নেতিয়ে পড়ি সহজে। আজকাল ব্যবসায়ে দেখি উৎসাহ প্রচুর, বিশেষ করে যুবকদের। কিন্তু বেশি দিন টেঁকে না। সৎ উদ্দেশ্য, সাধু ইচ্ছা সত্ত্বেও এক বছরে একই ঘরে তিন চারবার গণেশ বসেন আবার ওল্টান। বাড়িওয়ালার দল বোধ হয় এই সব বুঝেই অগ্রিম টাকা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। এর কারণ অনেক আছে অবিশ্যি। তবে যেটা স্পষ্ট দেখতে পাই, সেটা হল আমাদের স্বাভাবিক অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা। মুখে ইংরেজ, জর্মন, জাপানীর মুণ্ডপাত করি, তাদের ব্যবসায়িক কৃতিত্বে ঈর্ষাবোধ করি। স্বদেশী দ্রব্যের বা জাতীয় পরিচয়ের গুণগান করি হাস্যকর বিজ্ঞাপন দিয়ে। মাংসের দোকান শুধু বাঙালী নয়, খাঁটী পশ্চিমবঙ্গীয় বলে অভিহিত করি। কিন্তু দু'চার মাসের মধ্যে আশাতীত সৌভাগ্য-উদয় না হলে দোকান বেচে দিই। একটা ব্যবসা বড় করতে হলে তাকে যেভাবে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়, মার খেয়েও লেগে থাক্‌তে হয়, যে সততা আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সুনাম রক্ষা করতে হয়, সেগুলো কাগজে-কলমে আমাদের আয়ত্ত আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিক্রয়-নীতি শিক্ষায় হয়তো কারুর কারুর বিলাতী তক্‌মাও আছে। কিন্তু যখন দেখব, রাতারাতি বড় লোক হতে পারছি না, মুনাফা মিলছে না মনের মতন, তখন মুসড়ে পড়ে অন্য কিছুর চেষ্টা দেখি।

এইখানেই গণ্ডগোল। বইয়ের দোকান না জম্‌ল তো লাগাও মনোহারী দোকান কিংবা সাব-কণ্ট্র্যাক্ট। দিন কতক বেশ জম্‌জমাট। বেশ স্ফূর্তি করা গেল। মাল কিনে আট্‌কে রেখে থাঁক্‌তির দিনে চড়া দামে বাজারে ছেড়ে বেশ দু পয়সা জমিয়ে নেওয়া গেল। কিন্তু স্ল্যাম্প্ বা ডীপ্রেশ্যানের জন্য আমরা তৈরী হতে পারি না। "রেডি রীটার্ন" দাবি করি। এতে ব্যবসা স্থায়ী হবে কি করে? তারপর বন্ধুর দল আছেন। এ্যাকাউন্ট শোধ না করে হাওয়া হয়ে যাবার অস্বাভাবিক নৈপুণ্য তাঁদের আছে। পয়সার মুখ দেখতে আরম্ভ করলে স্যুট আছে, সিনেমা আছে। শাড়ী-চকোলেটের খরচা আছে। বিদেশী ইন্‌ভয়েস্ কিনে নিয়ে মাল আট্‌কে থাকার জন্য ক্ষতি সম্ভাবনা আছে। তা থাকুক, ক্যোটা প্যর্মিট জোগাড় করবার মতন তদ্বির-তাগদ্ আছে। সেইটেই তো ক্যাপিটেল! দায়িত্বহীন লোকদের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসায়ে নেমে শেষ পর্যন্ত যদি নৌকা ডোবে, ডুবুক্। সাঁতার জানা আছে কিছুটা। পাঁকে জড়িয়ে মরুক্ বোকারা। নিজে ওপারে পৌঁছুবার মতন বুদ্ধি আছে। দেনদারী দায়িত্ব তো নেই। কাগজে-কলমে যখন কিছু লেখা নেই, ভয়টা কিসের! মুনাফার অংশ মিললেই হল, যখন পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। বেগতিক দেখলে কেটে পড়, না হয় বেনামীতে কারবার চালাও। আর কাউকে লাভের আশায় নামিয়ে তার টাকাটা 'রোল্' করিয়ে দাও। বাঙালীর সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তু হল এই মুফতে লাভের আশা। সাধারণ অর্থনীতি শাস্ত্রে যাই বলুক্, বর্তমান যুগে যুবকদের ইকনমিক্সই আলাদা। তারা আগেকার দিনের মূল্যবোধকে 'লোয়ার ভ্যালুজ' মনে করে। করুক্, তাতে ক্ষতি নেই। যদি নিজেরা লাভবান্ হয়ে একটা নতুন সমাজ-বিজ্ঞান গড়ে তুলতে পারে যেখানে পুরানো দিনের দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক চরিত্র আর অর্থের অর্থ বদলে যায়, তা হলে কৃতিত্ব তাদেরই। কিন্তু দেখা যায়, তারা অতি-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও উচ্চতর 'ভ্যালুজ্'-বোধে বিশ্বাসী হয়েও ছেলে-মানুষের মত ঠকে যায়।

দু একটা বিষয়ে কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্রে কোনও পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে বহুবিজ্ঞাপিত যুগ-সন্ধিক্ষণেও নয়। একটা হলঃ স্বল্পতম পরিশ্রমে চরমতম লাভ। আর একটা হলঃ সাইড-বিজ্‌নেস্। মাস্টারির সঙ্গে দরজির দোকান, হোমিওপ্যাথির সঙ্গে জীবন-বীমা, প্রাইভেট টুইশনের সঙ্গে শর্ট-হ্যান্ড, কেরাণীগিরির সঙ্গে বি-কম্, পুরুত-গিরির সঙ্গে ঘটকালি আর পেনস্যনের সঙ্গে শেয়ার মার্কেট—এগুলো ঠিকই আছে। এ যুগের ছেলেরা নতুন কোনও কম্‌বিনেশ্যান বাৎলাতে পারেন?

জাপ যুদ্ধাপরাধের বিচার

যুদ্ধবিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শেষে জাপানের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যে যে আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল তার বিচার পর্ব শেষ হয়েছে। ১১ জন বিভিন্ন দেশীয় বিচারক নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার স্যার উইলিয়াম ওয়েব ছিলেন এই বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল এই আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। যুদ্ধাপরাধে জাপানের যে ২৫ জন যুদ্ধকালীন মন্ত্রী, পরামর্শদাতা ও সমরনায়কদের বিচার করা হচ্ছিল তাঁদের সম্বন্ধে গত ১২ই নবেম্বর টোকিও থেকে বিচারকমণ্ডলীর রায় প্রকাশিত হয়েছে। রায় সর্ববাদিসম্মত হয়নি। ১১ জন বিচারকের মধ্যে তিনজন, হল্যাণ্ডের ডাঃ বি ভি রোলিং, ফ্রান্সের বিচারপতি বার্নার্ড ও ভারতের বিচারপতি শ্রীযুক্ত পাল মূল রায়ের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। প্রথমোক্ত দুজনের মতভেদ হল আংশিক আর ভারতীয় বিচারপতির মত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ৩ লক্ষ শব্দের একটি স্বতন্ত্র রায় প্রকাশিত করেছেন। এর থেকে দেখা যায় যে, তিনি এই বিচারের প্রহসনকে আদৌ সমর্থন করেন নি।

যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জেনারেল তোজো। বিচারকমণ্ডলী তাঁর ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। তাঁর যুদ্ধকালীন সহকর্মীরূপে আরও ছয়জন জাপ সেনাপতি ও পরামর্শদাতাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। ১৬ জনের প্রতি আজীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বাকী দুজনের একজনকে ২০ বৎসরের ও অপরজনকে ৭ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। জেনারেল তোজো ছিলেন জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী। প্রাচ্যে জাপানের যুদ্ধারম্ভ হয় ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। তার দুমাস পূর্বে প্রিন্স কনয়ের জাপ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল তোজোর নেতৃত্বে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। জেনারেল তোজোর বর্তমান বয়েস ৬৪ বৎসর। এই দণ্ডাদেশ ঘোষিত হবার পর জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে—মার্কিন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ম্যাক আর্থার এই দণ্ডাদেশ মকুব করবেন কিনা। জেনারেল তোজো অবিচলিত চিত্তে এই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তিনি এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিজয়ী মার্কিনদের কাছে আবেদন করতে রাজী নন। তবু তাঁর এবং অন্যান্য দণ্ডিত জাপ নেতাদের

পক্ষীয় কৌঁসুলীরা জেনারেল ম্যাক আর্থারের কাছে আপীল করেছিলেন। ২৪শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি সমস্ত দণ্ডই বহাল রেখেছেন এবং এই নবেম্বর মাসেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের ফাঁসি হয়ে যাবে। একজন জাপানীও ফাঁসীর সময় উপস্থিত থাকবে না—উপস্থিত থাকবেন শুধু কয়েকজন মার্কিন সেনানায়ক। জেনারেল তোজোর প্রতি এই দণ্ডাদেশে জাপ জনসমাজে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তার পুরোপুরি খবর আমরা পাইনি। তবে জাপ জনগণ যে খুব হৃষ্ট চিত্তে এ দণ্ডাদেশ মেনে নেবে না—তা বুঝতে কষ্ট হয়

জেনারেল তোজো

না। একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ফাঁসির পর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত সাতজন যুদ্ধবন্দীর দেহাবশেষ দেশবাসীদের হাতে তুলে দিতে হবে এই দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় টোকিওতে হাজার হাজার জাপানী ২৬শে নবেম্বর তারিখে সম্মিলিত হয়েছিল।

তোজো প্রমুখ জাপ নেতাদের যে ধরণের বিচার হলো এ ধরণের বিচার এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে যুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর যুদ্ধাপরাধীদেরও বিচার হয়ে গেছে নুরেমবুর্গে। বিজিতদের প্রতি বিজয়ীদের এই ধরণের বিচারকে প্রহসন ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া চলে না। জেনারেল তোজো এবং তাঁর দুচারজন সহকর্মী বেঁচে থাকলেন কি মারা গেলেন সেটা বড় কথা নয়। সেটা জাপানের পক্ষে কিংবা পৃথিবীর পক্ষে এমন যুগান্তকারী কোন ব্যাপার নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে, এই ধরণের বিচার আন্তর্জাতিক আইন বহির্ভূত তো বটেই—মানবিক নীতিবহির্ভূত। যুদ্ধে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন তাঁরা ইচ্ছা করলে বিজিত দেশের সব নরনারীকেই হত্যা করতে পারেন। সেটা আইনের কথা নয়—পশুবলের কথা। জেনারেল তোজো প্রমুখ যুদ্ধাপরাধীদের যদি যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হত আমরা কিছুই বলতাম না। কিন্তু যে জিনিস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকেই করা ছিল, তাকে ঘটা করে আইনের মর্যাদা দেবার জন্যে এ ধরণের বিচারের কি প্রয়োজন ছিল? আন্তর্জাতিক আইনে এক রাষ্ট্রের নেতাদের বিচার করার অধিকার অন্য কোন রাষ্ট্রের নেই। অথচ এক্ষেত্রে সেই অবৈধ কাজকেই আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের সকল দায়িত্ব আজ তোজো এবং তাঁর সহকর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কি? এঁরা শুধু যুদ্ধকালীন পরিচালক ছিলেন মাত্র। যে ঘটনাপুঞ্জের যোগাযোগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছিল তা একদিনের আকস্মিক ব্যাপার নয়। কোন ব্যক্তিবিশেষকে এর জন্যে দায়ী করে লাভ কি? যুদ্ধের পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধ শক্তিরূপে জার্মানীতে নাৎসীবাদ ও জাপানে ফ্যাসীবাদের উদ্ভবকে প্রথম প্রথম স্নেহ চক্ষে দেখে যে ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতি তাদের শক্তিসঞ্চয়ে সহায়তা করেছিল তারা কি এ যুদ্ধের জন্যে আদৌ দায়ী নয়? জাপানের মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের বিরুদ্ধে, চীনে জাপানের অভিযানের বিরুদ্ধে, অবিসিনিয়ায় ইটালীর বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে, স্পেনে রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বরাবরই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছিল। কই তখন তো ফ্যাসিজমের অগ্রগতির বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তারা অঙ্গুলি উত্তোলন পর্যন্ত করেন নি। যখন সরাসরি তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগল তখনই শুধু বাধল যুদ্ধ। প্রকৃত যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে হলে অনেক পুরাতন ইতিহাস ঘাঁটতে হয় এবং বিগতপ্রাণ অনেক নেতাকে কবর থেকে টেনে তুলে তাঁদের বিচার করতে হয়। তা যখন সম্ভব নয় তখন যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব তোজো কিংবা গোয়েরিং-এর ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁদের হত্যা করে লাভ কি? তাঁরা দোষী নন—এমন কথা বলছি না। কিন্তু তাঁরাই একমাত্র দোষী নন। পণ্ডিত নেহরু সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের প্যারী অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, যাঁরা এখানে বসে আছেন তাঁরা বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের সময় যদি ভাবেন যে, নিজেরা প্রত্যেকেই কম বেশী অপরাধী তবে সমাধান সহজতর হয়। দুঃখের বিষয়, যাঁরা আজ শক্তির আসনে অধিষ্ঠিত তাঁরা

ক্ষমতাকেই নিজেদের ন্যায়নিষ্ঠ প্রতিরূপ বলে মনে করেন আর তারই জোরে পৃথিবীতে অনেক অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং বিশ্বশান্তি হয়ে উঠেছে সুদূরপরাহত। হিংসা মানুষের মনে শুধু প্রতিহিংসারই উদ্রেক করে—তার দ্বারা হিংসার মূলোচ্ছেদ হয় না—এই হল ভারতের শিক্ষা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধির দরুণ অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল—জার্মান সম্রাট কাইজারকে হতে হয়েছিল পদচ্যুত। তবু সেই জার্মানীতে যুদ্ধকামী হিটলারের অভ্যুদয় হতে মাত্র কয়েক বৎসর সময় লেগেছিল। হত্যার বদলে হত্যা করলেই যদি সব সমস্যার সমাধান হত—তবে পৃথিবীতে আদৌ কোন হত্যাকান্ড সংঘটিত হত না। সুতরাং মুষ্টিমেয় যুদ্ধাপরাধীকে হত্যা করে আগামী যুদ্ধের গতিরোধ করা যাবে না। তার জন্যে অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। সেই অন্য ব্যবস্থার প্রতি আজ বিশ্বের কোন বড় রাষ্ট্রকেই মনোযোগ দিতে দেখা যাচ্ছে না।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাতিসঙ্ঘের ম্যাণ্ডেট অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক শাসিত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান বারবার যে ধরণের দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছে, তা আদৌ আশাপ্রদ নয় এবং এই ধরণের দুর্বলতার পরিচয় দেওয়াই যদি এই প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য হয়, তবে বিশ্বশান্তির নামে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব অর্থ-হীন হয়ে দাঁড়াবে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিক অছি-পরিষদের শাসনাধীনে ছেড়ে দেবার প্রশ্ন আজ নতুন নয়। সর্বপ্রথম ১৯৪৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসন-ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক অছির হাতে তুলে দেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার উচিত। কিন্তু স্মাটস্ গভর্নমেণ্ট এ প্রস্তাবে সায়ও দেন না—এ প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করারও কোন চেষ্টা করেন না। এক বৎসর পরে ১৯৪৭ সালের ১লা নভেম্বর রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অধিবেশনে পুনরায় পূর্ব প্রস্তাব অনুমোদিত হ'ল। কিন্তু এবারও স্মাটস্ গভর্নমেণ্ট গা করলেন না। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রিমন্ডল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্মাটস্-এর ইউনাইটেড পার্টির পরিবর্তে ডাঃ মালানের ন্যাশনালিস্ট পার্টি আজ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত। মালান গভর্নমেণ্ট রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ তো মানেনেই নি বরং রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে গ্রাস করার উদ্যোগ করেছেন। এই অবস্থার মধ্যেও ২৬শে নভেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের প্যারী অধিবেশনে সদিচ্ছাপ্রণোদিত সেই একই প্রস্তাব পুনরনুমোদিত হয়েছে—অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে যে, সে যেন দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার ম্যাণ্ডেট শাসিত অঞ্চলের শাসনভার আন্তর্জাতিক অছি-পরিষদের হাতে তুলে দেয়। অথচ একাধিকবার রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করে দক্ষিণ আফ্রিকা যে অপরাধ করেছে তার বিরুদ্ধে প্রস্তাবে একটি কথাও নেই। এই প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য যখন অছি-পরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছিল, তখন ভারতের পক্ষ থেকে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত একাধিক সংশোধনী প্রস্তাব তুলে প্রস্তাবটিকে আরও জোরালো করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ম্যাণ্ডেট শাসন সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা এক বছরের যে রিপোর্ট অছি-পরিষদের কাছে পেশ করেছে, তা আদৌ সন্তোষজনক নয়। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত চেয়েছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘনিষ্ঠ সহযোগ স্থাপনের নামে দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকাকে যাতে গ্রাস করতে না পারে, তার নির্দেশ যেন থাকে এই প্রস্তাবে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসী আফ্রিকানরা যাতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আবেদন করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকুক এবং প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের একটি কমিশন প্রেরিত হোক। তাঁর এই যুক্তিসংগত প্রস্তাব মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে অছি-পরিষদে পরাজিত হয়। হবারই কথা। কারণ, ঔপ-নিবেশিক শাসনের ধারক ও বাহক স্বার্থবাদী দেশগুলি ইংগ-মার্কিন রাষ্ট্রদ্বয়ের নেতৃত্বে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। আফগানিস্তান, মিশর, ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, সৌদি আরব, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ কার অনির্দেশ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে কোন পক্ষেই ভোট দেয় নি—তা বোঝা দুষ্কর নয়। এ অবস্থায় ভারতের পরাজয় ছিল স্বাভাবিক। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ-আফ্রিকার ঘরোয়া ব্যাপার বলে সমস্যাটিকে ধামাচাপা দেওয়াই স্বার্থবাদী দেশগুলির উদ্দেশ্য। তা নইলে একটি ম্যাণ্ডেট শাসিত অঞ্চলে একবার আন্তর্জাতিক অছির কর্তৃত্ব স্থাপিত হলে তাদের অনেকের শাসিত ও শোষিত অঞ্চলকেই এইভাবে আন্তর্জাতিক অছির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। ভারত যা করতে চেয়েছিল তা যদি গৃহীত হ'ত, তবে সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের সনদের মর্যাদা কিছু পরিমাণে রক্ষিত হ'ত এবং বিশ্বাসীদের চোখে প্রতিষ্ঠানটির গৌরব অনেক বেড়ে যেত। কিন্তু স্বার্থবাদী রাষ্ট্রপুঞ্জের চক্রান্তে এই রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানটি যদি চালিত হয়—প্রতি পদে তার ক্ষমতাহীনতা যদি এইভাবে প্রমাণিত হয়—তবে শেষ পর্যন্ত এই রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব জেনেভার জাতিসঙ্ঘের মতই নিছক অর্থহীন প্রদর্শনীতে পরিণত হবে।

২৮-১১-৪৮

সগোষ্ঠীপালোয়ান!

এপর্যন্ত অনেকেই কসরৎ মেহনৎ ব্যায়াম করে নিজে পালোয়ান হয়েছেন এটা দেখা যায়। কিন্তু এমন একটি পালোয়ানের খবর সম্প্রতি সংগ্রহ করেছি, যিনি নিজে তো পালোয়ান আর ব্যায়ামবীর বটেই, এমন কি, তাঁর স্ত্রী এবং কাচ্ছা-বাচ্ছারা সবাই রীতিমত

সাড়ে ন' মাসের খুকু এ্যান—দোল খাচ্ছে

পালোয়ানী কসরৎ দেখাতেও ওস্তাদ। ইনি হলেন আমেরিকার ওয়াশিংটনের কিথ্ ক্যাল্লিও (Keith Kallio) ইনি নিজে একজন পেশী-সঞ্চালন-ব্যায়ামের ওস্তাদ এবং এঁর ছোট্ট পরিবারের সবাইকার পেশীর কেরামতী ও পালোয়ানী কসরৎ দেখাবার ক্ষমতা আছে। এঁর স্ত্রী বারবেল তোলার কসরৎ দেখিয়ে আসছেন। এছাড়া এঁর ছোট ছোট দুটি মেয়েও বেশ পালোয়ান হয়ে উঠছেন যে তা বোঝা যাচ্ছে। এঁর ৩ বছরের মেয়ে ডিয়ানে মেরী মাটিতে চীৎ হয়ে শুয়ে পেট বুক বেঁকিয়ে চমৎকার ধনুক হতে শিখেছে—ধনুক হয়ে সে পেটের ওপর প্রায় আধ মণ ওজন নিতে পারে। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এঁর সাড়ে নয় মাস বয়েসের মেয়ে প্যাট্রিসিয়া অ্যানের পালোয়ানী কসরৎ। ৯ সের ওজনের এই ছোট্ট খুকীটিকে তার বাবা ক্যাল্লিও এক হাত ধরে যখন দোলান তখন সে তার পেশীর সাহায্যে ঐ হাতটিকে শক্ত করে রেখে সোজা দোল খায়। সঙ্গের ছবিটি দেখলেই তার বাহাদুরী কত বুঝতে পারবেন। জানা গেছে এই খুকুটির বয়স পনের দিন পার হবার পর থেকেই সে কারুর সাহায্য না নিয়েই হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেশেও পালোয়ান [illegible], আর পালোয়ান বাবাদের ছেলেমেয়েরা যে পালোয়ান হচ্ছে; তাতো হরবখতই দেখতে পাচ্ছি। অতএব অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সাইকেল রিক্সা নয়— এবার মোটর রিক্সা

আজকাল মানুষে-টানা রিক্সার বদলে সাইকেল রিক্সা হওয়ায় ছোট ছোট শহর ও পল্লীগ্রামে যানবাহন সমস্যা অনেকখানি হাল্কা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি লণ্ডনের ঈর্ল্‌স্ কোর্ট ভবনে যে সাইকেল ও মোটর প্রদর্শনী হয়ে গেছে—সেখানে দেখানো হয়েছে তিনচাকা ওয়ালা একরকম মোটর গাড়ী—যার পেছনের আসনে দুজন বেশ আরামে বসতে পারবেন। এটাই হলো মোটর-রিক্সা। ট্যাক্সীর যা দাম এখন—তার তুলনায় এ গাড়ীর দাম অনেক কম হবে—এবং এগুলি সাইকেল-রিক্সার মত ছোট ছোট শহরে অনায়াসে গ্রামের পথেও চালাতে পারবে যে কেউ। এই মোটর-রিক্সা তৈরী করেছেন বিলেতের একটি মোটর কোম্পানী। সত্যিই আমাদের দেশের শ্রমিক অঞ্চলে, ও মধ্যবিত্ত সমাজের যানবাহন সমস্যার সমাধানে এই মোটর-রিক্সাকে চালু করতে পারলে হয়তো মোটর যাঁরা কিনতে পারেন না, তাঁদের মোটর-চড়ার সখ এবং সুবিধাটা খুব সহজেই হতে পারবে। এদেশে এখন যাঁরা মোটর গাড়ী তৈরী করার চেষ্টা করছেন—তাঁরা যদি গোড়াতেই এই মোটর-রিক্সাটা তৈরী করার চেষ্টা করেন—তাহলে আমাদের মত লোকেরও বাস ট্রামের হয়রানিটা হয়তো কমে।

মোটর রিক্সা—এদেশে এলে বাঁচি।

কাশ্মীরের তুষারাবৃত জজিলা গিরিশৃঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ প্রস্তুতি। এই সকল গিরিশৃঙ্গ অধিকার করিয়া হানাদারগণ গুর্মোর ও মাচই অতিক্রম করিয়া দ্রাসে অভিযান চালাইতেছিল। গত ১লা নবেম্বর ভারতীয় বাহিনী তাহাদের উপর আক্রমণ পরিচালন করে। ছবিতে মাদ্রাজী স্যাপার্স ও মাইনার্সগণকে বরফ কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতে দেখা যাইতেছে

পণ্ডিত নেহরুর সাম্প্রতিক কাশ্মীর পরিদর্শনকালে শ্রীনগরের শালিমার বাগে এক প্রীতিভোজে পণ্ডিতজীকে আপ্যায়ন। বাম হইতে দক্ষিণেঃ লেঃ জেঃ কারিয়াপ্পা, রাজকুমারী ফাতিমা পাহ্লবী ও আশরফ পাহ্লবী, পণ্ডিত নেহরু, শেখ মোহম্মদ আবদুল্লা এবং শ্রীমতী অম্মু স্বামীনাথন

বিদেশী ছবি দেখে আমোদ পাবার জন্যে আমরা বছরে কয়েক কোটি ক'রে টাকা বিদেশে চালান ক'রে দিচ্ছি অনেককাল ধ'রেই। স্বাধীন হবার পর দেশের সম্পদ ও শিল্প প্রসারে দেশের টাকা যতটা সম্ভব বিদেশীর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার যুক্তিতে বিদেশী ছবির আমদানী কম ক'রে দেওয়া হবে ব'লে স্বভাবতই আশা জেগেছিলো। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে যে, আগে এখানে যতো বিদেশী ছবি দেখানো হ'তো স্বাধীন হবার পর প্রকৃতপক্ষে তা উল্টে সংখ্যা বেড়েই গিয়েছে, সুতরাং টাকাও আগের চেয়ে বেশী ক'রেই পাচার হ'য়ে যাচ্ছে বিনা বাধাতেই। তার ওপর বিদেশী ব্যবসাদারদের নতুন ফন্দীতে বিদেশী ছবিকে এদেশেরই ভাষায় পরিবেশন করার যে ঢেউ এসে লেগেছে তাতে কিছুকালের মধ্যেই এদেশের প্রমোদবিহারী লোকের পকেটে দিশী ছবির জন্যে নিমিত্ত-মাত্র পয়সাই বরাদ্দ হ'য়ে পড়ার আশংকা অমূলক নয়। বিদেশী ছবি উৎকর্ষে এদেশের ছবির তুলনায় অনেক বেশী আকর্ষণীয়, তাছাড়া বিদেশী ব্যবসাদারদের বিকট প্রচার-যন্ত্রের কারসাজিতে এদেশের বেশীর ভাগ দর্শকদের টেনে নিয়ে রাখা মোটেই শক্ত কাজ হবে না। এই প্রতিযোগিতার সামনে দিশী ছবিকে টিঁকিয়ে রাখা যায় কি ক'রে? এতে 'কোটা'র কথাই স্বতঃই মনে হয়। বিদেশী ছবির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ক'রে দিশী ছবির দ্বারা সেই ফাঁকা স্থান পূরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর দ্বারা প্রতিযোগিতাকে খানিকটা রুখে দেওয়া যেতে পারে, অবশ্য যদি না বিদেশী ব্যবসাদাররা আর এক ফন্দী খাটিয়ে এদেশের ব্যবসাদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আধাআধি বখরায় এদেশে হোক আর তাদের দেশে হোক, ছবি তোলায় মেতে ওঠে। তা না হ'লেও, অবস্থাকে 'কোটা'র সাহায্যে পুরো-পুরি শুধরে নেওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না। তার কারণ এখন দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থা বা ক্ষমতা এমন নেই যার দ্বারা বিদেশী ছবির প্রদর্শন এমন একটা নিম্নতম সংখ্যায় বেঁধে দেওয়া যেতে পারে যেক্ষেত্রে বিদেশে চালানী টাকার অঙ্ক মাথা-ব্যথার কারণ ব'লে পরিত্যজ্য হ'তে পারবে। বিদেশী ছবি একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়াও সমীচীন নয়; কারণ পাশ্চাত্যের সাহিত্য, নীতি, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন প্রগতিশীল মত-বাদের সেগুলি আকর, যার সঙ্গে আমাদেরও পরিচয় রাখা একান্তই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বিদেশী ছবি সম্পর্কে যতই কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক আমাদের প্রয়োজনেই বেশ কিছু টাকা বিদেশী ছবির খাতে এদেশ থেকে চালান দেওয়া বরাদ্দ রেখে দেওয়া অপরিহার্য হবেই। এ টাকাটাকেও সটান চলে যেতে না দিয়ে ওটা থেকে খানিকটা দেশের উপকার আদায় ক'রে নেবার একটা উপায় আছে, সেটা হ'চ্ছে বিলিতী ও আমেরিকান ছবি দেখাতে দেওয়ার বদলে এদেশের লোককে বিলেত ও আমেরিকার স্টুডিওতে গিয়ে কাজ শিখে আসার সুযোগ দিতে বাধ্য করা। শোনা গেল, সদ্য বিলাত প্রত্যাগত আমাদের একজন প্রথিতযশা পরিচালক এই বিষয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছেন এবং অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছেন। এটা সত্যি হ'লে, আমাদের দেশের ছবি কিছুকাল পরে উৎকর্ষে ওদেশের ছবির সঙ্গে পাল্লায় দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন ক'রতে পারবে ব'লে মনে করা যেতে পারে। আমাদের সরকার পক্ষের উচিত এ ব্যাপারটা হাতে তুলে নেওয়া।

নূতন ছবির পরিচয়

মায়ের ডাক (সিনে প্রডিউসার্স)—কাহিনী : চাঁদমোহন চক্রবর্তী; কাহিনী অবলম্বনে (?) : মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান : বিজয় গুপ্ত; পরিচালনা : সুকুমার মুখোপাধ্যায়; আলোকচিত্র : রামানন্দ সেন; শব্দযোজনা : ঋষিপতি বন্দ্যোপাধ্যায়; সুরযোজনা : সত্যদেব চৌধুরী; ভূমিকায় : অভি ভট্টাচার্য, মঙ্গল চক্রবর্তী, প্রশান্ত দে, ডাঃ হরেন, মনোরঞ্জন, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী রায়, কুমার মিত্র, ফণী বিদ্যাবিনোদ, জীবন মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, উমা প্রভৃতি।

ছবিখানি প্রাইমার পরিবেশনে ১১ই নভেম্বর রূপবাণী ও ইন্দিরায় মুক্তিলাভ করে।

কলমের কালিও শুকিয়ে যায় লজ্জায়, এমন সব ছবির পরিচয় করিয়ে দেবার দুর্ভাগ্যটাই আজকাল আমাদের পেয়ে বসেছে যেন। আর উপায়ও নেই, যেহেতু ছবির ব্যবসাদাররাও অর্থাৎ প্রযোজক, পরিবেশক ও

হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা রোনাল্ড কোলম্যান ও তাঁর স্ত্রী বেনিটা হিউম। সম্প্রতি লণ্ডনে এই ফটো গৃহীত হয়।

প্রদর্শক তিন তরফই বর্তমানে ঐসব ছবির কারবার নিয়েই মেতে রয়েছেন। ছবির ওপর লোকের শ্রদ্ধা তাহ'লে থাকে কি ক'রে, আর ছবির ব্যবসাও বা প'ড়ে যাবে না কেন? অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ছবির ওপর লোকের অশ্রদ্ধা পাকিয়ে তোলার যে সিরিজ ইদানীং চালু রয়েছে 'মায়ের ডাক' তা থেকে নিজেকে বিচ্যুত করার কোন প্রয়াসেরই পরিচয় দেয়নি। প্রযোজকও খুবই পুরনো আমলের লোক, সেই কারণেই বোধ হয় সমস্ত বিষয়েই নতুনত্বের মোহ থেকে দূরে সরে থাকার মত বিচক্ষণতা প্রকাশ তিনি করেছেন।

কাহিনীটি সৃষ্টি হ'য়েছে তে-মাথার সংযোগে আর তাই বোধ হয় ছবিতে দেখা দিয়েছে তিন দফা কাহিনী যা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে তিনটি রাস্তা ধ'রে চলে গিয়েছে। ছবির কাহিনী একজন লেখে বা কোন লেখা কাহিনী অবলম্বনে আর একজন চিত্রনাট্য রচনা ক'রে থাকেন, এই নিয়মই এতকাল দেখে এসেছি কিন্তু এই দুয়ের মাঝে আবার 'কাহিনী অবলম্বনে' যাতে আর একজনের সমাবেশ আমাদের কাছে কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য স্পষ্ট ক'রে দিতে পারেনি। তবে যেহেতু ব্যবসায়ে সফল 'স্বয়ং সিদ্ধা'-র কাহিনী লেখা মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেইহেতু ছবিতে তার নামটা ব্যবহার করা দরকার ব'লে তাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে হবে এটাই যদি প্রযোজক ভেবে নিয়ে থাকেন তো আলাদা কথা। কিন্তু সেদিক থেকেও তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কারণ কাহিনী, কাহিনী অবলম্বনে ও চিত্রনাট্য তিন দিকের তিনজনই চলচ্চিত্রজ্ঞান সম্পর্কে অতি কাঁচা মগজওয়ালা লোক ব'লে নিজেদের প্রতিপন্ন ক'রেছেন। মনে হয় এদের তিনজনের মধ্যে যোগাযোগ একেবারেই ছিল না যার ফলে আলাদাভাবে তিন হাত ফিরে ফিরে কাহিনীটি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় গিয়ে পেণছেছে।

ডালপালা ছেণ্টে বাদ দেবার পর যে কাহিনীটি মূলে ব'লে বেছে নেওয়া যায় তার প্রথম পর্ব হ'চ্ছে অজিত নামক একটি যুবককে নিয়ে যাকে বম্বের ব্যারিস্টার মিঃ নাগ তার মেয়ে রমলার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে প্রতি-পালন করেন এবং তাকে বড় ক'রে তুলবার জন্যে আই-সি-এস পড়তে বিলেত পাঠিয়ে দেন। জাহাজে অজিতের আলাপ হয় সম-উদ্দেশ্যে অভিগামী রামনাথের সঙ্গে। বিলেতে যুদ্ধ বাঁধতে অজিত বিমানের পাইলট হয় এবং একদিনের জার্মান বোমা বর্ষণে নিহত হয়। মরবার আগে অজিত রমলাকে বিয়ে করবার জন্যে রামনাথকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে। এর পর কাহিনী রামনাথকে নিয়ে। রামনাথ ফিরে এসে বাড়ীতে কোন খবরাখবর না দিয়েই রমলাকে বিয়ে করে, কিন্তু কাজটা কেন যে গোপন ক'রলে বুঝতে পারা গেলো না। আই-সি-এস হ'লেও সরকারি কাজে রামনাথ যোগ দিতে চাইলে না আর তাই নিয়ে মিঃ নাগের সঙ্গে তার মতানৈক্য ফলে রমলাকে ছেড়ে অন্য গ্রামে আগমন এবং বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতিতে মেতে যাওয়া। কয়েক বছর পার হ'য়ে যায়। ইতিমধ্যে রমলার একটি সন্তান হয় এবং কোর্ট অফ ওয়ার্ডস থেকে জমিদারী ফিরে পেয়ে মিঃ নাগ তাকে নিয়ে স্বগ্রামে চলে আসেন, রামনাথের গ্রামেরই অপর পারে। ঘটনাচক্রে রমলার ছেলে গাছ থেকে পড়ে আহত হয় এবং তাকে নিয়ে আসা হয় রামনাথেরই হাসপাতালে। বলা বাহুল্য যে রমলা ও রামনাথের এইখানেই পুনর্মিলন ঘটলো। এর মাঝে মাঝে সময়ের ফাঁক পূরিয়ে যাবার জন্যে উপস্থাপিত করা হ'য়েছে গ্রামের চিরাচরিত সংস্কারন্যুব্জ অশিক্ষিত গোঁড়াদের যাদের দিয়ে হাসির সৃষ্টি করার চেষ্টা হ'য়েছে, অবশ্য অত্যন্ত স্থূল রসিকতার মধ্যে দিয়ে। এছাড়া আর একটি কাহিনী হ'চ্ছে, জমিদার কর্তৃক নিজ সন্তানরূপে পালিতা প্রৌঢ়া ব'লে বিভ্রম হয়, নমঃশূদ্রের এমন একটি ধিঙ্গী মেয়ে মাধুরী, আর তারই সঙ্গে ক্ষীণাঙ্গ এক ছোকরা ডাক্তারের প্রেম নিয়ে, এটাও বোধ হয় হাসির খোরাক জোগাবার জন্যেই। নেতাজী, জয়-হিন্দ, পুস্করিণী সংস্কার, গোঁড়ামী সংস্কার ও কুশিক্ষা নিয়ে বক্তৃতা, হরিজন উন্নয়ন, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা, ইংরেজের গোলামীর বিরুদ্ধে চোখাচোখা কথা ইত্যাদি যে এমন একটি কাহিনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকবেই তা আন্দাজ করা বোধ হয় শক্ত নয়। সর্বশেষে, 'মায়ের ডাক'-এ মা-টি কে আর তার ডাকটাই বা কি তা বোঝবার মত বোধ শক্তির অভাব বোধ করেছি, স্বীকার ক'রবো।

কাহিনীর কোথাও নাট্যরসের বালাইটুকুও নেই। আর যেসব যৌক্তিকতা!—এয়াররেডের অব্যবহিত পরই হাসপাতালের ডাক্তার কর্তৃক টেলিফোনে সরাসরি আহতের খবর প্রদান, গ্রামের এক গোঁড়ার আবদারে কলাচুরির অপরাধ দেখিয়ে দারোগা কর্তৃক হেড মাস্টারকে প্রকাশ্যভাবে হাতকড়ি লাগিয়ে নিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি আরও বহু রকমের। জাহাজের পোর্টহোল দিয়ে প্রবিষ্ট আলোকে তালে তালে অপসরণ ক'রলে কি জাহাজের গতি বোঝানো হয়, না, আকৃতি ও প্রকৃতির বিনা পরিবর্তন এবং কোনরূপ সংজ্ঞাপক প্রতীকের বিনা সাহায্যেই বম্বে ও দূরবর্তী লণ্ডনকে সংলাপে ব'লে দিলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে? ইংরিজী ছবি থেকে গ্রহণ করা হ'য়েছে ব'লে, এখানেও, লণ্ডনে বোমা পড়ার দৃশ্যে বোমা ও মেসিনগানের বিকট শব্দের মধ্যে থেকেও হঠাৎ 'in the meantime' ইত্যাদি কয়েকটি টুকরো কথা থেকে গিয়েছে কেন? পরিচালক নবরত্নী; বাঙলা ছবির এই দুঃসময়ে তাকে স্বাগতম জানাতে পারলে খুসীই হতুম, কিন্তু তার কোন সুযোগই তিনি আমাদের দিতে পরেন নি।

প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠার মতো কোন বস্তু বা ব্যক্তিত্ব চরিত্রগুলির মধ্যে না থাকার জন্যেই বোধ হয় অভিনয়ে ডাঃ হরেন, মনোরঞ্জন, কানু বন্দ্যোঃ, কুমার মিত্র, ফণি রায়, ফণি বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি অতিশয় জনপ্রিয় এবং পাকা শিল্পীরাও শিক্ষানবিশী আমলে ঠেস দিয়ে রয়েছেন ব'লে মনে হ'লো। রমলার ভূমিকায় অনুভাকে মোটামুটি সহ্য ক'রে যাওয়া যায়; রামনাথের মধ্যে কোন প্রাণ না থাকায় অভীও প্রাণ দিতে পারেনি, মঙ্গল চক্রবর্তীর অজিত ওদের মধ্যেই একটু সজীব; কিন্তু প্রধান উপনায়িকা ও নায়ক মাধুরী আর অমরনাথের ভূমিকায় যথাক্রমে উমা ও প্রশান্ত ছবিখানিকে বিরক্তিকর ক'রে তোলারই অন্যতম কারণ হ'য়েছেন—ছবির অনেকখানি অংশ এরা দখল ক'রে আছেন অথচ মূল কাহিনীর সঙ্গে এদের কোন যোগই নেই।

আবহ সঙ্গীতকে একরকম এড়িয়েই যাওয়া হ'য়েছে। গান চারখানি মন্দ নয়, কিন্তু তার মধ্যে দুখানি মাধুরীকে দিয়ে গাইয়ে মাধুর্যই নষ্ট করে দেওয়া হ'য়েছে। স্বতন্ত্র-ভাবে কোন মূল্য না থাকলেও ছবির আলোক-চিত্র প্রশংসা পাবার মতো; শব্দগ্রহণও অপ্রশংসনীয় নয়। দৃশ্য ও সাজসজ্জাদি নিয়ে নালিশের তেমন কিছু নেই।

খুচরা খবর

ওরিয়েণ্টল ইণ্টার ন্যাশনাল ফিল্ম কর্পোরেশন নামে বিলিতী ও দিশী টাকার যোগে বম্বেতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কেবলমাত্র বিলিতী ছবি তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে।

*　*　*　*

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া স্বাস্থ্যোদ্ধার ক'রে বিলেত থেকে ফিরে এসে এস-এস প্রডাকসন্সের হ'য়ে একখানি বাঙলা ছবি তোলায় হস্তক্ষেপ করেছেন। সেই ১৯৪৪ সালে চাঁদের কলঙ্কের পর এইটাই তার হবে প্রথম বাঙলা ছবি।

*　*　*　*

গত ২৬শে নবেম্বর ইষ্টার্ন টকীজ স্টুডিওতে নতুন চিত্র-প্রতিষ্ঠান মহাভারতী লিঃ-এর প্রথম ছবি 'কুয়াশা'র মহরৎ অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। গল্পটি খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রর লেখা এবং তিনিই পরিচালনা করছেন। এই ছবিতে অনেক নতুন অভিনেতা ও অভিনেত্রী অবতীর্ণ হবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

ক্রিকেট

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতীয় দলের সহিত দিল্লীতে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়া পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের খেলায় যোগদান করে। প্রথম করাচীতে সিন্ধু একাদশের সহিত খেলিয়া অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে। ইহার পর রাওয়ালপিণ্ডি পাকিস্থানের সৈন্যাধক্ষ্যের একাদশের সহিত এক তিনদিনব্যাপী খেলা হয়। এই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অনায়াসে ৯ উইকেটে জয়লাভ করে। এই খেলার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে পাকিস্থান একাদশের সহিত লাহোরে চারিদিনব্যাপী এক বেসরকারী টেস্ট খেলায় যোগদান করিতে হয়। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। পাকিস্থান একাদশের ইমতিয়াজ আমেদ ও দলের অধিনায়ক সৈয়দ আমেদ উভয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকেই ধারণা করিয়াছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের খেলায় অতি সহজেই বিজয়ী হইবেন কিন্তু ফলতঃ তাহা হইল না। নজর মহম্মদ, ইমতিয়াজ আমেদ, বদরুদ্দিন, সৈয়দ আমেদ প্রভৃতি খ্যাতনামা খেলোয়াড়গণ দেশের সুনাম রক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ তাঁহারা বিভিন্ন খেলায় দিয়াছেন। ইহাদের উদ্যম ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

লাহোরের বে-সরকারী টেস্ট ম্যাচ

পাকিস্থান একাদশ প্রথম টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিং গ্রহণ করে ও দিনের শেষে ২ উইকেটে ১৯৭ রান করে। ইমতিয়াজ ৭৬ রান করিয়া আউট হন কিন্তু নজর মহম্মদ ৭৩ রান করিয়া নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্ন-ভোজের পূর্বে পাকিস্থানের প্রথম ইনিংস ২৪১ রানে শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৭ উইকেটে মাত্র ১৪৮ রান করে। তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্ন-ভোজের পূর্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৩০৮ রানে শেষ হয়। পরে পাকিস্থান দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। তৃতীয় দিনের শেষে দেখা যায় পাকিস্থান দল ১ উইকেটে ১৬৪ রান করিয়াছে। ইমতিয়াজ ৭৯ রান ও সৈয়দ ৬৬ রান করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় ইমতিয়াজ ১০৩ রান ও মহম্মদ সৈয়দ ১০১ রান পূর্ণ করেন। কিন্তু মধ্যাহ্ন-ভোজের পরেই পাকিস্থান দলের দ্রুত উইকেট পতন আরম্ভ হয়। চা-পানের কিছু পূর্বে ৬ উইকেটে ২৮৫ রান হইলে পাকিস্থান ডিক্লেয়ার্ড করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অবশিষ্ট সময় ১ উইকেটে ৯৮ রান করে। ফলে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

খেলার ফলাফল :—

পাকিস্থান একাদশ প্রথম ইনিংস :—২৪১ রান (নজর মহম্মদ ৮৭, ইমতিয়াজ আমেদ ৭৬, মহম্মদ সৈয়দ ২১ গোমেজ ৫১ রানে ৪টি, কেরু ৬ রানে ২টি, হেডলী ২১ রানে ২টি ও ট্রিম ৫৩ রানে ২টি উইকেট পান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস :—৩০৮ রান (উইকস ৫৫, ওয়ালকট ৪১, রিচার্ডস ৭২, ক্রিস্টিয়ানী ৩৪, হেডলী নট আউট ৫৭ রান, মুনাওয়ার আলী ১০৩ রানে ৪টি সুজাউদ্দিন

৬৯ রানে ২টি ও আমিন ৪৭ রানে ৩টি উইকেট পান।)

পাকিস্থান একাদশ দ্বিতীয় ইনিংস :—৬ উইঃ ২৮৫ রান (ডিক্লেয়ার্ড) (ইমতিয়াজ আমেদ ১৩১, সৈয়দ আমেদ ১০১, গডার্ড ৮১ রানে ২টি গোমেজ ৭০ রানে ৪টি উইকেট পান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস :—১ উইঃ ৯৮ রান (কেরু ৫৬, স্টোলমেয়ার নট আউট ৩৩ রান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের দল

পাকিস্থান ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড রাওয়ালপিণ্ডিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের সহিত পাকিস্থান সৈন্যাধক্ষের দলের তিনদিনব্যাপী এক খেলার আয়োজন করেন। এই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অতি সহজে ৯ উইকেটে জয়লাভ করিয়াছে।

খেলার ফলাফল :—

সৈন্যাধক্ষের একাদশ প্রথম ইনিংস :—৯৬ রান (রেজা ৩৪, স্টোলমেয়ার ৮ রানে ৩টি, এ্যাটকিনসন ২৪ রানে ৩টি ও গডার্ড ৩২ রানে ২টি উইকেট পান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস :—১৮৪ রান (কেরু ৪০, এ্যাটকিনসন ৩৫, স্টোলমেয়ার ২৮, মীরণ বক্স ৬১ রানে ৫টি উইকেট পান।)

সৈন্যাধক্ষের একাদশ দ্বিতীয় ইনিংস :—৫৮৭ রান (রেহমণ ৩৯ রানে ৬টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস :—১ উইঃ ১০০ রান (স্টোলমেয়ার নট আউট ৩৯, ওয়াকট নট আউট ৫১ রান।)

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ আগামী ৯ই ডিসেম্বর হইতে বোম্বাইর ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে আরম্ভ হইবে। এই খেলায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করা হইয়াছে :—অমরনাথ (অধিনায়ক), পি সেন, বিজয় হাজারে, বিনু মানকর, আর এস মোদী, ডি জি ফাদকার, সি আর রঙ্গচারী, এইচ আর অধিকারী, এস জে সিন্ধে, কে সি ইব্রাহিম, উমরিগর ও সি টি সারভাতে।

অতিরিক্ত :—গোলাম আমেদ ও রেগে। প্রথম টেস্ট খেলায় যে সকল খেলোয়াড়গণ খেলিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র তারাপোর ব্যতীত সকলকেই দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের জন্য মনোনীত করা হইয়াছে। তারাপোরের স্থানে সিন্ধেকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বোম্বাইতে সম্প্রতি এক আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই খেলায় মাত্র তিনটি দল যোগদান করে। প্রথম খেলায় পূর্বাঞ্চল দলকে উত্তর দক্ষিণাঞ্চলের সম্মিলিত দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। প্রবীণ অভিজ্ঞ খেলোয়াড় পি ই পালিয়ার অধিনায়কত্বে পূর্বাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে উত্তর দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করে। ফলে ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দলকে পশ্চিমাঞ্চল দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। এই খেলাটি পাঁচদিনব্যাপী হইবে বলিয়াই স্থির ছিল কিন্তু চতুর্থ দিনেই খেলার মীমাংসা হইয়া যায়। পশ্চিমাঞ্চল দল ৮ উইকেটে পূর্বাঞ্চল দলকে পরাজিত করে। পূর্বাঞ্চল দলের পক্ষে বাঙ্গলার কয়েকজন খেলোয়াড় যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে নির্মল চ্যাটার্জি ব্যাটিংয়ে ও এস ব্যানার্জি (ছোট) বোলিংয়ে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। কলিকাতায় ভারতীয় দলের সহিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলা হইবে। ঐ খেলায় বাঙ্গলার উক্ত দুইজন খেলোয়াড়কে ভারতীয় দলে স্থান পাইতে দেখিব বলিয়া আশা হয়। খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী এই সুযোগ দিবেন কি না জানি না। তবে দিলে বাঙ্গলার উদীয়মান খেলোয়াড়ের মনে উৎসাহ সঞ্চার হইত ও ভবিষ্যতে বাঙ্গলার অনেক খেলোয়াড়কেই ভারতীয় দলে খেলিতে দেখা যাইত।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পূর্বাঞ্চলের খেলা

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পূর্বাঞ্চলের খেলা এলাহাবাদে অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ায় বাঙ্গলার ক্রিকেট উৎসাহীগণ বিশেষভাবে হতাশ হইয়াছেন। পূর্বাঞ্চল দল গঠন করিতে হইলে অধিকাংশ বাঙ্গলার খেলোয়াড় লইয়াই করিতে হইবে অথচ সেই খেলা বাঙ্গলার ক্রীড়ামোদিগণ দেখিতে পাইবেন না ইহা সত্যই দুঃখের বিষয়। একবার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া শেষ সময়ে তাহা পরিবর্তন করা আমরা কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারিলাম না।

টেনিস

দিল্লী টেনিস প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার তরুণ খেলোয়াড় নরেশকুমার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় পরম আনন্দলাভ করা গেল। সুমন্ত মিশ্র, দিলীপ বসু প্রভৃতি বাঙ্গলার খেলোয়াড়গণ ভারতীয় টেনিস জগতে বাঙলার সুনাম যাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা সহজে যে ক্ষুণ্ন হইবে না নরেশকুমার প্রমাণিত করিলেন। আমরা শ্রীমানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

এই প্রতিযোগিতায় ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে সাফল্যলাভ করিয়াছেন অপর এক উদীয়মান খেলোয়াড় নরেন্দ্রনাথ। ভবিষ্যতে ইনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হইবেন বলিয়া আশা হয়। নিম্নে দিল্লী টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল

নরেশকুমার (বাঙ্গলা) ৬—৩, ৩—২, ৬—২ গেমে বলবন্ত সিংকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল

নরেন্দ্রনাথ ও রমা রাও ৬—৩ ৬—২, ৬—২ গেমে বলবন্ত সিং ও প্রেম পান্ধীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল

নরেন্দ্রনাথ ও মিসেস ডিসুব্রে ০—৬, ৬—২, ৬—৩ গেমে বলবন্ত সিং ও মিসেস সিংকে পরাজিত করেন।

দেশী সংবাদ

২২শে নবেম্বর—দিল্লীর লাল কেল্লার প্রধান ফটকের বিপরীত দিকে একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি স্থাপনের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ এডভাইসরী কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনে রাষ্ট্রের অনুসরণীয় কতকগুলি আদর্শ নীতি আলোচিত হয়। পরিষদ শ্রীযুত শান্তনমের সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সমগ্র দেশে স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটরূপে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠনের জন্য খসড়া শাসনতন্ত্রে একটি নূতন ধারা সন্নিবিষ্ট করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৩শে নবেম্বর—ভারতের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

অদ্য বোম্বাইয়ে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ফলে বোম্বাইয়ের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিকল হইয়া যায়, টেলিগ্রামের কাজ অচল হইয়া পড়ে এবং কলিকাতা বোম্বাইয়ের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, ৪৮ ঘণ্টা ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ৬০ জন জলমগ্ন এবং বৃক্ষপতন ও ইমারত ধ্বসিয়া পড়িয়া ২৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা ছাড়া ৬টি স্টীমার ও ৪টি লঞ্চ ডুবিয়া যায়। ক্ষতির পরিমাণ মোট ৫ কোটি টাকা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

২৪শে নবেম্বর—ভারতীয় গণপরিষদে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত মৌলিক নীতিতে এই মর্মে একটি ধারা যুক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র ঔষধ হিসাবে ব্যবহার ছাড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর সুরাপান ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার রাষ্ট্রের তরফ হইতে নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। সংশোধন প্রস্তাবসহ ৩৮নং অনুচ্ছেদ গৃহীত হওয়ায় নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের ভাবী গভর্নমেণ্টকে মাদক দ্রব্য ব্যবহার ও গোহত্যা নিষিদ্ধ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অদ্য গণপরিষদে ভারত শাসন আইনের সংশোধন করিয়া একটি বিল পেশ করেন।

২৫শে নবেম্বর—অদ্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ডক্টর অব্ ল' ডিগ্রী দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে দলাদলি পরিহার করিয়া যুক্তভাবে দেশকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলার আহ্বান জানান।

২৬শে নবেম্বর—কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারী দপ্তরখানায় নিখিল ভারত খাদ্য সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত আর এল গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

জোজিলার (কাশ্মীর) এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত ১লা নবেম্বর বরফাচ্ছাদিত জোজিলা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া প্রথম ট্যাঙ্ক লইয়া যাইবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অস্থায়ী ল্যান্স-দফাদার বচন সিংহের। পাহাড়ের চূড়ার ন্যায় বরফখণ্ডের উপর দিয়া বরফের আচ্ছাদনের ও গলিত বরফের মধ্য দিয়া ট্যাঙ্ক চালাইয়া বচন সিং শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। পরে ভারতীয় সৈন্যগণ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া গুমড়ী অধিকার করে।

২৭শে নবেম্বর—গতকল্য ভারত-পাকিস্থান সীমান্তে এক গুরুতর সংঘর্ষ হইয়াছে। পাকিস্থান সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর প্রায় ২৫০ জন লোক লাহোরের প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দল নামক গ্রামের একটি ভারতীয় পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে। প্রায় দুই ঘণ্টারও বেশী সময় পূর্ব পাঞ্জাব সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী ও পাকিস্থান সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে গুলী বিনিময় হয়।

কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতীয় দেশরক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পুঞ্চ ও জম্মু রক্ষী বাহিনীর সহিত পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে এবং কারগিল ও লের সৈন্যদলের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পুঞ্চ অববাহিকা ও লাডক উপত্যকার উপর শত্রুর চাপ হ্রাস পাইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেণ্ট পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে বর্গাদার ও জমির মালিকের মধ্যে জমির ফসল বণ্টনের হার সম্বন্ধে নূতন একটি সাধারণ নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন। এই নীতি অনুসারে প্রথমে জমির মোট উৎপন্ন ফসল হইতে বীজের জন্য বরাদ্দ ফসল পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপর অবশিষ্ট ফসল এইরূপ তিন ভাগে ভাগ করিয়া লইতে হইবে—জমির মালিক পাইবেন এক-তৃতীয়াংশ, চাষী পাইবেন এক-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে দুই ভাগ চাষের বলদ ও লাঙ্গল সরবরাহকারী এবং বাকী এক ভাগ জমির সার ও যানবাহন প্রভৃতির ব্যয় বহনকারীর ভাগে যাইবে।

বর্ধমানে পশ্চিম বঙ্গ ধান্য চাষী সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির হারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া এই বৎসর পশ্চিম বঙ্গে ধান্যের মূল্য নির্ধারিত হওয়া কর্তব্য।

২৮শে নবেম্বর—ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং হোসিয়ারপুর জেলার মাহিলপুরে এক সংগ্রহ সমাবেশে বক্তৃতা করেন। "৫০ হাজার পাঠান কাশ্মীর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত" পাকিস্থানের জনৈক মুখপাত্রের এই হুমকির উত্তরে দেশরক্ষা সচিব বলেন যে, একমাত্র পূর্ব পাঞ্জাবই সমগ্র পাকিস্থানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম।

বিদেশী সংবাদ

২২শে নবেম্বর—রাষ্ট্রসংঘের সোভিয়েট প্রতিনিধি অদ্য প্যালেস্টাইন সম্পর্কে বার্ণাদোত পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৩শে নবেম্বর—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, চীন সমস্যা সম্পর্কে বৃটিশ ও মার্কিন মনোভাবের মধ্যে মৌলিক অনৈক্য দেখা দিয়াছে।

২৪শে নবেম্বর—প্যারিসে নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্থানের পররাষ্ট্রসচিব স্যার জাফরুল্লা খান কাশ্মীর সম্পর্কে যে পত্র পেশ করিয়াছেন, অদ্য নিরাপত্তা পরিষদ তাহা প্রকাশ করেন। পত্রে তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে, পশ্চিম কাশ্মীর দখলের জন্য ভারতীয় সৈন্যদল অভিযান আরম্ভ করিয়াছে এবং অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদ এই অভিযান বন্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে পাকিস্থান কর্তৃক যথাশক্তি প্রতি-আক্রমণ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না।

২৫শে নবেম্বর—নানকিংএর সংবাদে প্রকাশ, সরকারী চীনা পদাতিক সৈন্যরা সপ্তম চীনা বাহিনীর চতুর্দিকস্থ কম্যুনিস্ট বেষ্টনী চূর্ণ করিয়া সুচাও-এর পূর্বে ও দক্ষিণ দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গতকল্য সরকারী সৈন্যদল সুচাও-এর ২০ মাইল পূর্বে তাসচিয়া পুনরধিকার করে।

প্যারিসে নিরাপত্তা পরিষদে হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সমস্ত সদস্যই এই সময় উপস্থিত ছিলেন। এই সময় জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কাশ্মীর কমিশনের সদস্য কলম্বিয়ার প্রতিনিধি সেনর আলফ্রেডো লোজানোর কাশ্মীর কমিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী এক রিপোর্ট দাখিল করেন।

২৬শে নবেম্বর—দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা কেবলমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাধীনে থাকিবে না উহা রাষ্ট্র সংঘের তত্ত্বাবধানে থাকিবে—এই মর্মে অছি কমিটির সুপারিশ অদ্য প্যারিসে রাষ্ট্র সংঘের সাধারণ পরিষদে ৪৪—২ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে অছি কমিটির অধীনে রাখা সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার অসম্মতিসূচক যে প্রস্তাব পরিষদের সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা গ্রহণ করা চলে না।

অদ্য নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরে সংগ্রাম বন্ধ করিতে এবং বর্তমান আপোষ মীমাংসার আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি ঘটিতে পারে এমন কিছু করিতে ভারত ও পাকিস্থানের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছেন।

২৭শে নবেম্বর—বৃটিশ বেতার বার্তায় প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, কম্যুনিস্ট বাহিনী, নানকিং হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।

চীনের আইন পরিষদ অদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নিকট 'আমেরিকার স্বার্থ রক্ষায়' গৃহযুদ্ধে সরকারী বাহিনীর বিপর্যয় নিবারণের জন্য অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণের আবেদন জানাইয়া এক জরুরী বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

২৮শে নবেম্বর—সাংহাই-এর সংবাদে প্রকাশ, নানকিং-এর প্রবেশপথে অবস্থিত চীনা সরকারী বাহিনীর শেষ ঘাঁটি পেংপুতে অদ্য কামান গর্জন শ্রুত হয়। প্রতিপক্ষ পেংপু দখলের সংগ্রামে তিন লক্ষ সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে। পেংপু সুচাও-এর ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং নানকিং হইতে ১৭০ মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ] শনিবার, ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ সাল। Saturday 11th December 1948 [৬ষ্ঠ সংখ্যা

উভয় বঙ্গের সমস্যা

ভারতের রাজধানীতে ভারত-পাকিস্থান সম্মেলনের অধিবেশন পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। কোন পক্ষ হইতেই এই অনুষ্ঠানের আঙ্গিকতার দিক হইতে কোন ত্রুটি রাখা হয় নাই। বাঙলার দিক হইতে বিচার করিলে এই বৈঠকের আলোচনার সার্থকতার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগের সমস্যা বৈঠকের অন্যতম প্রধান বিচার্য বিষয়-স্বরূপে ধার্য হইয়াছে। পাকিস্থানের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলী পূর্ববঙ্গ সফর শেষ করিয়া এ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিরাশ করিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর উক্তি সকলকে বিস্মিত করিয়াছে। মিঃ লিয়াকত আলী এ সমস্যাকে একেবারে লঘুভাবে উড়াইয়া দিয়াছেন। পূর্ব-বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নূরুল আমীন ততদূরে যান নাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগ তিনি আংশিকভাবে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এই বাস্তুত্যাগ যে পরিমাণে বা যে সংখ্যাতেই হোক, ইহার সন্তোষজনক কোন কারণ তিনি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। গভর্নমেণ্টের কোন ত্রুটি নাই, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হৃদ্যতারও কোন অভাব নাই, ইহাই তাঁহার অভিমত। অথচ বাস্তুত্যাগ ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে। জন-কয়েক দুষ্টপ্রকৃতির লোকের উপদ্রব এবং অর্থনীতিক কারণ বাস্তুত্যাগের এইগুলিই এতদিন একমাত্র হেতু বলিয়া নির্দেশিত হইয়া আসিতেছিল। পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী শেষোক্ত কারণের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি অনুসারে হিন্দু মহাজনগণ টাকা খাটাইতে কার্পণ্য করিতেছেন এবং অধিকাংশ ব্যবসায়ীই কলিকাতায় চলিয়া

আসিয়া সেখানে তাঁহাদের ব্যবসা খুলিয়াছেন। পাকিস্থান রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর এই সব যুক্তিও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্র যদি উপযুক্ত থাকে এবং তাহাতে অন্তরায় সৃষ্টি না হয়, তবে ব্যবসায়ীরা অনিশ্চিতের অভিযানে বাহির হইবেন ইহা স্বতঃই ধারণার অতীত। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ভাবাবেগের মূল্যবত্তা খুবই কম, ইহা সকলেই জানেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্টের নীতি এবং সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বৈষম্যমূলক আচরণ ব্যবসায়ী সমাজকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে এবং বাস্তব অবস্থার বিচার করিয়া চলিতে তাঁহারা বাধ্য হইতেছেন। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদের দৃষ্টিকে ভ্রান্ত ধারণা বলিয়া লঘু করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, বস্তুতঃ ইহা ভ্রান্ত ধারণা নয়, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বিবেচনা। পূর্ব-বঙ্গ গভর্নমেণ্টের নীতি এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বৈষম্যমূলক দৃষ্টির ফলে সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, পাকিস্থানের কল্যাণব্রতী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় নিজেও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মতবাদের মধ্যে এই বৈষম্যমূলক মনস্তাত্ত্বিকতা যে বিজড়িত রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। ইসলামের নীতির উদারতার শত যুক্তি আবৃত্তি করিলেও একদিকে সেখানকার সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়ের মন হইতে বৈষম্যমূলক সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্ববোধকে যেমন দূর করা যাইবে না, তেমনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনকেও অসহায়ত্বের ভাব হইতে যুক্তির জোরে মুক্ত করা সম্ভব নয়। পূর্ববঙ্গের সব বিপর্যয়ের গোড়ার কারণ এইখানেই রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ইহা ছাড়া সীমানা সম্পর্কিত বিরোধও রহিয়াছে। বিপন্ন ইসলামের ধুয়া পাকিস্থানী নীতির নিয়ামকদের মুখে আমরা বহুক্ষেত্রেই শুনিতে পাইয়াছি। এখন সুরটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বিপন্ন পাকিস্থানের জিগীরে পরিণত করা হইয়াছে। না খাইয়াও অস্ত্র ধরিবার জন্য কোমর বাঁধিতে অবিরত উত্তেজনা ছড়ান হইতেছে। এই উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া কোন্ দিকে পড়ে, বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না এবং সাম্প্রদায়িকতার পথেই যে তাহা সম্প্রসারিত হয়, ইহাও সুস্পষ্ট। মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্থানকে যাহারা বিপন্ন করিতেছে, তাহারা কে বা কাহারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সহজেই তাহা বুঝিয়া লয় এবং সেই বোধ তাহাদের দৃষ্টিকে অপর সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত এবং বিদ্বিষ্ট করিয়া তোলে। এ খুবই অদ্ভুত অবস্থা; বলা বাহুল্য, এই অবস্থার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তার ভাব কিছুতেই দৃঢ় হয় না এবং রাষ্ট্রগত মর্যাদায় তাহাদের বুদ্ধি বলিষ্ঠ হইয়া উঠে না। ফলে অসুবিধার বিচার এবং আশঙ্কার ভাব তীব্রতর হয়। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, এমন অবস্থার প্রতিকার সাধনে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কার্যতঃ অবস্থার প্রতিকার না করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আনুগত্যের উপর বারংবার চাপ দেওয়ার মূল্য কিছুই হয় না। কারণ পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জলে বা হটেনটট নয়, তাহাদের সুদীর্ঘ সংস্কৃতি রহিয়াছে। আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রের আদর্শের অনুপ্রেরণা তাঁহাদের সমাজ-জীবনে আত্যন্তিক

ভাবেই সক্রিয়; ভারতের স্বাধীনতার সুদীর্ঘ সংগ্রাম এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। বস্তুতঃ ইঁহাদের উদার সংস্কৃতিকে মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতার বলে পিষ্ট করিয়া ইঁহাদের স্বচ্ছন্দ সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। পরন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় শাসকদের সদয় এবং অনুগ্রহপূর্ণ আশ্বাস্তি বা আপ্যায়নের আড়ম্বরকর প্রতিবেশের মধ্যে দাস-জীবনের গ্লানিও বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত সত্য এবং এ সত্যকে অস্বীকার করিলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনস্বিতাকেই অস্বীকার করা হয়; অধিকন্তু তাহাদের গৌরবময় ঐতিহ্যেরও অবমাননা ঘটে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের সমস্যাকে শুধু রাষ্ট্রীয় দিক হইতে না দেখিয়া সাংস্কৃতিক দিক হইতেই বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে; নতুবা এ অন্য পথে গোঁজা মিলের দ্বারা তাহার কিছুতেই সমাধান ঘটিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ভারতীয় আদর্শের সংকট

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য-বাদীদের শক্তিকে খর্ব করিয়া আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। ভারতের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে শস্ত্র-বলের জয় নয়, ইহা ভারতীয় সংস্কৃতিরই জয়। জিঘাংসা-পরবশ সেনানীদের কৃতিত্ব বলে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই, মানব-সংস্কৃতির মর্যাদাপূর্ণ মনস্বিতা ভারতের স্বাধীনতাকে মহীয়ান করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মানবপ্রেমিক এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনস্বীদের সাধনা এই সংগ্রামে বীর্যবল সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিলেও সংকট আমাদের কাটে নাই। কারণ প্রতিকূল অবস্থার চাপ ভারতের উপর নানা দিক হইতে আসিয়া পড়িতেছে। বস্তুতঃ মানব সংস্কৃতির মর্যাদা বিশ্বজীবনে পরিব্যাপ্তি লাভ করিবার মত অবস্থা জগতের এখনও আসে নাই; এ জন্যই সংস্কৃতিমূলক ভারতীয় সাধনার সংকটও অনেক রহিয়াছে। এই অবস্থায় আমরা যদি নিজেদের সংস্কৃতিতে দৃঢ় থাকিতে না পারি এবং ভারতের স্বাধীনতার মূলে যাঁহাদের মানবতামূলক মনস্বিতা কাজ করিয়াছে তাঁহাদের আদর্শ হইতে যদি বিচ্যুত হই, তবে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা অল্প দিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইবে এবং দুর্গতির চরম সীমার ভিতর গিয়া যে আমরা পড়িব এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। উৎকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে অভিভাষণ দিতে গিয়া ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ডক্টর সর্বপল্লী চীন, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি আমাদের প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রের বিপর্যয়ের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। কমিউনিস্ট মতবাদের ফলে বিপ্লব এই সব দেশ বিধ্বস্ত করিতে বসিয়াছে। এই সব দেশের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া আমরা কমিউনিস্ট মতবাদের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িতেছি এবং তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু শুধু এভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। ডক্টর সর্বপল্লী কথাটা খুলিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সামাজিক দুর্নীতি হইতেই কমিউনিস্ট মতবাদ সম্প্রসারিত হয়। বস্তুতঃ দারিদ্র্য এবং বুভুক্ষার ফলেই অন্ধ উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং নৈতিক আদর্শ হইতে বিচ্যুতির মধ্যেই আমাদের আশঙ্কার বীজ নিহিত রহিয়াছে। সমাজ যদি নীতিহীন হয় এবং রাষ্ট্র-জীবনে অবিচার ও অন্যায় যদি প্রবল হইয়া উঠে সমাজের উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি বলিয়াই যদি আমরা কেহ কেহ স্বার্থের মোহে দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করিতে প্রবৃত্ত হই এবং গণতন্ত্রের আদর্শ উজ্জ্বল রাখিতে না পারি তবে জন-সাধারণের মধ্যে হতাশার ভাব একান্ত হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে যদি জনসাধারণ বিপ্লবের পথ অবলম্বন করে তবে তাহাদের দোষ দেওয়া চলে না। বলা বাহুল্য, ডক্টর সর্বপল্লীর কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। বাস্তবিকই দেশের চারিদিকে চাহিয়া আমরা বৃহৎ আদর্শের কোন প্রেরণাই আজ পাইতেছি না। ডক্টর সর্বপল্লীর উক্তির সত্যতা সম্যক ভাবে উপলব্ধি করিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আমরা আদর্শনিষ্ঠার দিক হইতে অনেকখানি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি এবং সাফল্যের মধ্যে আমাদের দুর্বলতাই আজ ধরা পড়িয়া যাইতেছে। আমাদের মনের কোণে যেসব পাপ লুক্কায়িত ছিল সেগুলি চারিদিক হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে এবং নেহাৎ সুবিধাবাদ ছাড়া যে আমাদের অন্তরের বল বিশেষ কিছু নাই, এই সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আত্মানুসন্ধানের দ্বারা আমাদিগকে সময় থাকিতে সতর্ক হইতে হইবে এবং এই মানসিক দুর্গতি হইতে নিজেদের উদ্ধার করিতে হইবে। আমাদিগকে আজ এই সত্য সুনিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সেবা, ত্যাগ এবং দুঃখকষ্ট বরণের ভিতর দিয়াই আমরা স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি; সেই মূলধন যদি আজ হেলায় হারাইয়া ফেলি, তবে মনুষ্যত্বের মর্যাদা লইয়া বাঁচিয়া থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে; জগতের আজ গতি একান্তই দ্রুত। আমাদিগকেও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে হইবে। জনচেতনা বর্তমানে প্রখর এবং সতর্ক। তাহারা সামাজিক ও আর্থিক দুর্গতির প্রতীকার এখনই চায় এবং এ সম্বন্ধে অপেক্ষার কথা শুনিতে প্রস্তুত নয়। বাস্তবিক পক্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্যোগময় রাত্রিতে ত্যাগ ও তপস্যার যে দীপ এখানে জ্বলিয়াছিল, যদি তাহা নিভিয়া না যায়, তবে ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও তাহা আমাদিগের পথ উজ্জ্বল করিবে এবং বিশ্ব-জগতে ভারতের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না, বাঙলার বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী যেন আমরা বিস্মৃত না হই। সত্যই বিশাল এই ভারত-ভূমির শত্রু বাহিরে নয়, শত্রু আমাদের ভিতরে। লোভ স্বার্থপরতা এবং হিংসার প্রবৃত্তি এই-গুলিই আমাদের প্রকৃত শত্রু। এই সব শত্রুর বিরুদ্ধে নৈতিক অভ্যুত্থানের জন্য আহ্বান আসিয়াছে।

কলিকাতায় জাহাজ নির্মাণ

সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর প্রথম সমুদ্রগামী জাহাজ সম্প্রতি কলিকাতা বন্দরে আগমন করে। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, কোম্পানী প্রথমে কলিকাতাতেই জাহাজ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কলিকাতার পোর্ট কমিশনার কর্তৃপক্ষ এবং তৎকালীন ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই; পরে কোম্পানীকে ভিজাগা-পট্টমে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। বলা বাহুল্য কলিকাতার ন্যায় বাণিজ্যপ্রধান কেন্দ্রে কারখানাটি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে যে সুবিধা হইত সিন্ধিয়া কোম্পানী ভিজাগা-পট্টমে সে সুবিধা পান নাই। কিন্তু বিদেশী গভর্নমেণ্টের প্রতিকূলতায় বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে শেষোক্ত স্থান নির্বাচন করিতে হয়। ভারতীয় নৌ-বাণিজ্য সম্প্রসারণ প্রয়াসের আধুনিক ইতিহাসে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা সকলেই জানেন, বৃটিশ শক্তি আগাগোড়া এই চেষ্টায় প্রতি-কূলতা করিয়াছে এবং বহির্বাণিজ্যে ভারতের প্রভাব ক্ষুন্ন করিয়া নিজেদের শোষণ-স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহাদের নীতির লক্ষ্য ছিল। কিন্তু দেশের সে অবস্থা এখন আর নাই। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধান-চন্দ্র রায় সেদিন এই পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি সিন্ধিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং কলিকাতা বা তন্নিকটবর্তী কোন স্থানে জাহাজ নির্মাণের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি কোম্পানীকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই বাঙলা দেশ হইতে জাহাজযোগে যে ব্যবসা-বাণিজ্য পরি-চালিত হইত, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস হইতেও সে পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশীর প্রতিকূলতায় বাঙলার এই বহির্বাণিজ্য বিনষ্ট হইলেও বাঙালীর

নৌ-সাধন দক্ষতা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙলার সমুদ্রগামী লোকসংখ্যা এখনও অনেক এবং নৌ-বাণিজ্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় কর্ম ও কর্মচারীও বাঙলা দেশ হইতে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া সম্ভব হইতে পারে। আমরা আশা করি, সিন্ধিয়া কোম্পানী ডাক্তার রায়ের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন এবং ভারত গভর্নমেণ্টও এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ভারত গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব এই দিকে বিশেষভাবে আছে বলিয়া আমরা মনে করি; কারণ, কলিকাতা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই রাজধানী নয়, সমগ্র ভারতের ইহা সর্বপ্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র এবং কলিকাতা শহরের সমৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের সঙ্গে সমগ্র ভারতের বিশেষভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাষ্ট্রীয় সামরিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের বাঙলা

মনীষীদের সাধনার প্রভাবে ভাষা ও সাহিত্য বিকাশ লাভ করে; কিন্তু পাকিস্থানী নীতির পরিণতিতে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের এই স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইতে বসিয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক কূট প্রয়োজনে পূর্ববঙ্গে নূতন বাঙলা ভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। পূর্ববঙ্গের শিক্ষাসচিব জনাব আব্দুল হামিদ সম্প্রতি শ্রীহট্টের ছাত্রদের একটি সভায় বাঙলা ভাষার এই নবজন্মের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য এই যে, পূর্ববঙ্গের বাঙলা ভাষা কিরূপ হইবে পাকিস্থানী সরকারের হুকুমের উপর তাহা নির্ভর করিতেছে। পূর্ববঙ্গ সরকার এজন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটির সদস্যেরা শরিয়তী বিধানের চালুনী দিয়া ছাঁকিয়া পূর্ববঙ্গের জন্য বাঙলা ভাষার বিশেষ সংস্করণ বাহির করিবার কাজে ব্যাপৃত আছেন। তথ্যটি আমাদের জানা ছিল এবং যাঁহারা এই গূঢ় রহস্য অবগত নহেন তাঁহারাও এ সম্বন্ধে একেবারে অনবহিত থাকিতে পারেন না। পাকিস্থানী রেডিওর মারফতে তাঁহাদিগকে এই নূতন বাঙলা ভাষার মাধুর্যে আপ্যায়িত করিবার ব্যবস্থা কিছুদিন হইতেই হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্থানী কর্তারা শুধু রাষ্ট্রকেই ইসলামী করিয়া নিরস্ত হইবেন না, বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যকেও ইসলামী ছাঁচে ফেলিয়া সাম্প্রদায়িক রূপ দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যম-সহকারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রয়োজনের পীড়নে বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্য সাংস্কৃতিক হিসাবে জাতিভ্রষ্ট হয়, তাঁহাদের সেজন্য কোন চিন্তা নাই; প্রকৃতপক্ষে জাতি-তত্ত্বের পরিপূর্তির পক্ষে এই পথই তাঁহারা প্রকৃষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছেন। ভাষা এবং সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়াই রাষ্ট্রের সংহতি সর্বাঙ্গীণতা লাভ করিয়া থাকে, রাষ্ট্রের সব সম্প্রদায়ের চেতনার সেই ভিত্তি হইতে বাঙলা ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার খাতে লইয়া ফেলিয়া কার্যত পূর্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রনিয়ামকগণ তাঁহাদের রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণতাকেই শিথিল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তরুণ সমাজে এজন্য স্বভাবতঃই একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি হইতেছে; কিছুদিন পূর্বে ঢাকা রেডিওর উর্দুমিশ্রিত উৎকট বাঙলার বিরুদ্ধে তাহারা প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপন করে, ফলে ওস্তাদী ব্যক্তিকে কিছুটা চাপা পড়িয়াছিল; কিন্তু রাষ্ট্রনীতির মূলীভূত অভিসন্ধি অব্যর্থ লক্ষ্যেই অগ্রসর হইতেছে। কমিটির মারফতে কাজটা হাসিল করারই এখন অপেক্ষা রহিয়াছে। পূর্ববঙ্গের জনচেতনার উপর বৈদেশিক প্রভাবের এই বিড়ম্বনা কি দুর্গতি বহন করিয়া আনিবে ভাবিয়া আমরা উদ্বিগ্ন হইতেছি। জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ এবং সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তির পথই যদি রুদ্ধ হয়, তবে তাহার ভবিষ্যৎ কোথায় এবং জাতির স্বাধীনতারই বা মূল্য কি থাকে? যাঁহাদের মনীষামূলক সাধনা, ত্যাগময় তপস্যা এবং প্রাণপূর্ণ অবদানের সঙ্গে জাতির স্বাভাবিক সম্পর্ক গ্রথিত হইয়াছে, তাঁহাদের মানসিক প্রভাব হইতে রাষ্ট্রীয় সংকীর্ণ স্বার্থ প্রয়োজনে জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহাকে মরণের মুখেই ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। আপন পর করিলেই পর আপন হয় না; পক্ষান্তরে ঘর ভাঙিবারই সে পথ। আমরা পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবনের পক্ষে এই মহাভয় আসন্ন দেখিতেছি

জাফরুল্লার জিগীর

পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জাফরুল্লা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বিশ্ব রাষ্ট্র পরিষদে এক চিঠি পাঠাইয়া পুনরায় ভারতকে এই হুমকি দেখাইয়াছেন যে, ভারত যদি কাশ্মীরে যুদ্ধ বন্ধ না করে তবে পাকিস্থান পুরা তোড়জোড়ে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে। বলা বাহুল্য যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ভারত গভর্নমেণ্টের কোন দিনই নাই। তাঁহারা কাশ্মীরে বর্তমানে যে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন, তাহা আক্রমণাত্মক নয়। নরঘাতক দস্যুদল এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষকদিগকে সেখান হইতে উৎখাত করিয়া কাশ্মীরে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাই ভারত গভর্নমেণ্টের কাশ্মীর সম্পর্কিত নীতির প্রধান লক্ষ্য। হানাদার দল কাশ্মীরে সমানভাবে অত্যাচার উপদ্রব চালাইয়া যাইবে এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষকেরা সশস্ত্র বলবাহনে দস্যুদের সাহায্য করিতে থাকিবে, অথচ ভারত গভর্নমেণ্ট মানবতার মূল নীতি বিসর্জন দিয়া কাশ্মীরের নিরীহ জনসাধারণকে সেই অত্যাচার এবং উপদ্রবের মুখে ঠেলিয়া দিবেন, ভারতের আদর্শ এবং মনোবল সম্বন্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ মূর্খেরাই এমন আশা করিতে পারে। ভারত গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে কাশ্মীরের ক্ষেত্রে পাকিস্থানের সমরোদ্যমের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, গত জুলাই মাস হইতে পাকিস্থান কাশ্মীরে ক্রমাগত সেনাদল পাঠাইয়া আক্রমণ চালাইতেছে এবং তাহাদের এই আক্রমণাত্মক নীতি ক্রমশ সম্প্রসারিত হইতেছে। যাহারা অকারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাইতেছে এবং নিরীহ নরনারীর রক্তে মাটি ভিজাইতেছে, তাহাদের মুখে শান্তির বুলি আবৃত্তির অন্তর্নিহিত ভণ্ডামি সভ্য সমাজকে সত্যই বিস্মিত করিবে। কিন্তু পাকিস্থানের কর্ণধারদের বিচারে লজ্জা বলিয়া কোন বস্তু আছে বলিয়া মনে হয় না। কাশ্মীর সম্বন্ধে তাহাদের সাধুতার ভাণের ভিতরের কথা ইহার পূর্বেই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীর কমিশনের সদস্যগণ সরেজমিনে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। কমিশনের সদস্যগণ কর্তৃক পাকিস্থানের পররাজ্য আক্রমণমূলক আন্তর্জাতিক নীতি ভঙ্গের সে অপরাধ প্রমাণিত হইবার পরও মিঃ জাফরুল্লার আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য এরূপ মিথ্যা প্রচারের মূল্য যে কিছুই রহিবে না; ইহা সকলেই বোঝেন। মোটের উপর ভারত এক্ষেত্রে যাহা কর্তব্য তাহা প্রাণপূর্ণ প্রতিপালন করিবে এবং কাহারো হুমকিতে ডরাইবে না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেদিনও গোয়ালিয়রে ভারত গভর্নমেণ্টের তৎসম্পর্কিত সংকল্প সুস্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি জানাইয়া দিয়াছেন যে, কাহাকেও আক্রমণের ইচ্ছা ভারতের নাই; কিন্তু ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থান আক্রমণ করিবার স্পর্ধা যদি কেহ করে, ভারত তাহাকে রেহাই দিবে না এবং সে প্রচেষ্টা বিচূর্ণ করিবে। সর্দারজী একথাও বলিয়াছেন যে আত্মরক্ষায় ভারতের এই শক্তির সম্বন্ধে যদি কাহারো মনে এখনও কোন সন্দেহ থাকে তবে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সুতরাং কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারতের নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। পাকিস্থানের পররাষ্ট্র সচিব যাহা খুশি করিতে পারেন, ভারত সর্বদা প্রস্তুত আছে। কিন্তু শান্তি যদি সত্যই তাঁহাদের কাম্য হয় তবে মধ্যযুগীয় বর্বরতার নীতি বর্জন করিয়া আধুনিক সভ্য-জনোচিত পথে তাঁহারা আন্তর্জাতিক বিধি এখনও মান্য করিয়া চলুন এবং হানাদার দস্যু-দিগকে প্ররোচনা প্রদানের দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত কাপুরুষোচিত পন্থা পরিত্যাগ করুন।

চিনের বিপদ

উত্তর চীনের রণাঙ্গনে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের রাজধানী নানকিং দখলের জন্যে কম্যুনিস্ট বাহিনী পূর্ণোদ্যমে সংগ্রাম আরম্ভ করেছে। সম্প্রতি এই রণাঙ্গনের ঘটনা এত দ্রুত আবর্তিত হয়ে চলেছে যে এ সম্বন্ধে যাই লিখি না কেন সেটা নেহাৎ সাময়িক ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। রণাঙ্গন থেকে যেসব সংবাদাদি পাওয়া যাচ্ছে সে সবের মধ্যে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা আবিষ্কার করা কঠিন। কম্যুনিস্ট চীন ও জাতীয়তাবাদী চীন উভয় পক্ষ থেকেই মাঝে মাঝে সাফল্য সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী দাবী শুনতে পাওয়া যায়। বর্তমানে নানকিং থেকে ১১০ মাইল উত্তরে স্থিত সুদৃঢ় সরকারী সামরিক ঘাঁটি পেংপু নিয়ে ভয়াবহ সংগ্রাম চলেছে। এই সংগ্রামের প্রাথমিক ফলাফল সম্বন্ধে উভয় পক্ষ থেকেই পরস্পরবিরোধী সাফল্যের দাবী করা হয়েছে। এই পেংপুর যুদ্ধের উপর রাজধানী নানকিং-এর ভাগ্য যে বহুলাংশে নির্ভর করছে সে বিষয়ে সংশয় নেই। জাতীয়তাবাদী চীনও এ যুদ্ধের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করছে না। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার সাম্প্রতিক বিজয়ে উল্লসিত কম্যুনিস্ট বাহিনীকে তারা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না। ইতিপূর্বে নানকিং এর ২০০ মাইল দূরবর্তী অপর একটি সুদৃঢ় সরকারী ঘাঁটি সুচৌ পরিত্যাগ করে সরকারী সেনাবাহিনী চলে এসেছে এবং কম্যুনিস্টদের দাবী যদি সত্য হয় তবে তারা এই ঘাঁটিটি দখল করে নিয়েছে।

চীনের জটিল সামরিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যেটুকু তথ্য উদ্ধার করা যায় তাতে একথা স্পষ্টই মনে হয় যে প্রতিপক্ষদের দাবী প্রতিদাবী যাই হোক, জাতীয়তাবাদী চীনের আজ মহাদুর্দিন এসেছে। জাপানের আক্রমণে চীনকে একদিন যেরূপ বিপদে পড়তে হয়েছিল তার আজকের বিপদ তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। নানকিং ও সাংহাই-এর অবস্থা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে সেটা আদৌ আশাজনক নয়। গুজব রটেছে যে চিয়াং গভর্নমেণ্ট নানকিং ত্যাগ করে ক্যাণ্টন কিংবা ফরমোসায় চলে যাবেন। এ গুজবের মধ্যে কতটা সত্য আছে জানা যায় না। সরকারী মহল থেকে এ সংবাদকে ভুয়ো বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, নানকিং ত্যাগের ইচ্ছা গভর্নমেণ্টের নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার খবর পাওয়া যাচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দলিলাদি যাতে শত্রুর হাতে না পড়তে পারে সেজন্য সেগুলি পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে কিংবা ট্রেণে ও জাহাজে করে অন্যত্র চালান দেওয়া হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীদের পুত্র পরিবারদের স্থানান্তরিত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে নানকিং-এর সাধারণ নাগরিকদের মনেও আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে এবং তারা দলে দলে রাজধানী ত্যাগ করে চলেছে। ধনীরা অবিশ্বাস্য রকমের কম দামে ঘর বাড়ী জিনিস পত্র বিক্রী করে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন নানকিং থেকে যে আটখানি এক্সপ্রেস ট্রেণ ছাড়ে তার প্রত্যেকটিতে অন্তত এক হাজার করে নরনারী রাজধানী

মাদাম চিয়াং কাইশেক

ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। আর অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা না বললেও চলে। গভর্নমেণ্টের কিছুকাল পূর্বের মুদ্রানীতি ও কড়া মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তার হাত এড়াতে গিয়ে গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি একেবারে বিনিয়ন্ত্রণের বিপরীত নীতি গ্রহণ করেছেন। এতে অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি তো হয়ই নি—বরং অবনতি হয়েছে। একদিকে সামরিক বিপর্যয়, অপর দিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়—এই দুই পরিস্থিতির সম্মুখে পড়ে যেকোন গভর্নমেণ্টের হিমসিম খেয়ে যাবার কথা। চিয়াং গভর্ন-মেণ্টেরও আজ সেই অবস্থাই হয়েছে।

চিয়াং কাইশেকের গভর্নমেণ্ট যে আজ কত বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হল মাদাম চিয়াং কাইশেকের বিমানযোগে আমেরিকা গমন। তিনি স্পষ্টতই মার্কিন সাহায্য পাবার আশা নিয়ে গেছেন এবং তাঁর সে আশা সফল না হলে চীনের ভাগ্যে কি ঘটবে তা ঠিক করে বলা শক্ত। ইয়াংসি নদীর ওপারে সমগ্র উত্তর চীন যদি কম্যুনিস্টদের হাতে চলে যায় এবং চিয়াং গভর্নমেণ্ট দক্ষিণ চীনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন তবে সেটা কম্যুনিস্টদের পক্ষে একটা বিরাট বিজয় হবে এবং ভবিষ্যতে চীন থেকে কম্যুনিস্টদের উচ্ছেদ সাধন করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে বললেও অত্যুক্তি হয় না। চীনকে এত বড় একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থির অচঞ্চল আছে। রাষ্ট্রদপ্তর কিংবা প্রেসিডেণ্ট ট্রুমানের পক্ষ থেকে চীনকে অবিলম্বে সাহায্য করা সম্বন্ধে কোন উচ্চ-বাচ্য শোনা যাচ্ছে না বরং আভাসে ইঙ্গিতে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে স্পষ্ট মনে হয় যে এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা যেন বিরূপ। ১লা ডিসেম্বর তিনি ওয়াশিংটনে গিয়ে পৌঁছেছেন কিন্তু এ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে তাঁর কোন সাক্ষাৎকার ঘটেনি। অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেছেন যে তিনি মাদাম চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ জর্জ মার্শাল বর্তমানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে একটি সামরিক হাসপাতালে অবস্থান করছেন। মাদাম চিয়াং ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্ব শেষ করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি কোন নতুন আশার আলোক পেয়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে চীন গভর্নমেণ্টের বর্তমানে এক মুহূর্ত বিলম্ব করার উপায় নেই বললেও চলে। সর্বশেষ সংবাদে দেখা যায় যে, চীনা বাহিনী ইয়াংসি নদীর ২০ মাইলের মধ্যে রক্ষাব্যূহ গঠন করেছে। এই রক্ষাব্যূহ যদি কম্যুনিস্টরা বিচ্ছিন্ন করতে পারে তবে ইয়াংসি নদীর উত্তর তীরবর্তী সমগ্র চীন তাদের করায়ত্ত হবে। মার্কিন সাহায্য পাওয়া না পাওয়ার উপর চিয়াং গভর্নমেণ্টের কম্যুনিস্ট বিরোধী অভিযান পরিচালনা বহুলাংশে নির্ভর করছে। মাদাম চিয়াং যদি ব্যর্থ হন, তবে চীনের নবনিযুক্ত উদারনৈতিক প্রধানমন্ত্রী ডাঃ সুন ফো কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপোষ-প্রয়াস করবেন বলে প্রকাশ। কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে আপোষ করতে হলে মন্ত্রিমণ্ডলও সেইভাবে গড়তে হবে বলে তিনি এ পর্যন্ত তাঁর মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ব্যাপারে ততটা মনোযোগ দেন নি। একদিকে সামরিক অনিশ্চয়তা, অপর দিকে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অনিশ্চয়তা—এর চাপে একটা জাতির সংগ্রামী শক্তি কতদিন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে?

চিয়াং গভর্নমেণ্টের দুর্বলতার মূল কারণ যে অর্থাভাব সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের জাতীয়তাবাদী গভর্নমেণ্টকে বহুদিন থেকে সাহায্য করে আসছে—সন্দেহ নেই। কিন্তু ঢাক ঢোল পিটিয়ে সে সাহায্যকে যতটা বড় করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে আসলে সেটা তত বড় কি না সে বিষয়ে গভীর সংশয় আছে। যুদ্ধ-কালে সামরিক প্রয়োজনে চীনের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যতটা নজর ছিল বর্তমানে ততটা নজরও নেই বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। মাসখানেক পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হয়ে গেল সেই নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও তাঁর ডেমো-ক্র্যাটিক দলের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান ডিউই-র দলের বড় একটি স্লোগান ছিল যে তাঁরা (অর্থাৎ ডিউইর দল) ক্ষমতা পেলে চীনকে অধিকতর সাহায্য করবেন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে চীনকে প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য করা হচ্ছে না। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মহল নাকি বলছেন যে তাঁরা চীনকে সাহায্য করে করে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের এ সাহায্যের পরিমাণ 'আমেরিকান ফরেন সার্ভিস জার্ণাল' নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার থেকে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু থেকে এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে ৩৫০ কোটি ডলার নগদে ও জিনিসপত্রে দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সাহায্যের পরিমাণ যতটা বড় মনে হয় আসলে সেটা তত বড় নয়। ৮ বৎসরে ৩৫০ কোটি ডলার ভাগ করলে প্রতি বৎসরে দাঁড়ায় মাত্র ৪৪ কোটি ডলার। অর্থাৎ বৎসরে চীনের প্রতি নরনারীর মাথাপিছু এক ডলার মাত্র। চীনের মত দারিদ্র্যপীড়িত—যুদ্ধদীর্ণ একটি দেশের পক্ষে এ সাহায্য কিভাবে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে? মাদাম চিয়াং বর্তমানে ১০০ কোটি ডলার সাহায্য পাবার দাবী নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন বলে প্রকাশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ নাকি ২০ কোটি ডলারের বেশী সাহায্য দিতে চান না। এ কোন জাতীয় দর কষাকষি সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল মার্কিন সাহায্যনীতির দ্বারা চীনের প্রকৃত সাহায্যও কিছু হচ্ছে না [illegible] যুক্তি হাতে নিয়ে তাকে প্রতি-নিয়তই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারে। এ অবস্থার অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চীনের বিজয় যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য হয় তবে তাকে সেই অনুপাতে সাহায্য দিতে হবে। তা নইলে চীনে চূড়ান্ত কম্যুনিস্ট বিজয় ও বিশ্বরাজনীতিতে তজ্জনিত প্রতিক্রিয়ার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ফ্রান্সে ধর্মঘটের অবসান

ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে কম্যুনিস্ট দল বেশ শক্তিশালী। জাতীয় পরিষদে তাদের সংখ্যাশক্তি নগণ্য না হলেও তারা কোন জাতীয় গভর্নমেণ্টে ইদানীং স্থান পাচ্ছে না। নিয়ম-তান্ত্রিক পথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার সুযোগ না পেয়ে তারা চেয়েছিল ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে যাতে ফরাসী গভর্নমেণ্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই গত ৪ঠা অক্টোবর কম্যুনিস্টরা ফ্রান্সের কয়লা খনির শ্রমিকদের ধর্মঘটে প্ররোচিত করেছিল। কয়লাখনিগুলিকে অচল করে পরে জাতীয় জীবনের অন্যান্য শিল্পে অচল অবস্থার সৃষ্টি করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই ধর্মঘটের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ কিছুটা না ছিল এমন নয়- কিন্তু মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। সুখের বিষয় মঃ কোয়েলির গভর্নমেণ্ট তাদের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে পেরেছেন। প্রায় দুই মাস কাল ধর্মঘট চলা সত্ত্বেও কম্যুনিস্টরা ফ্রান্সের অন্যান্য জাতীয় শিল্পের শ্রমিকদের ধর্মঘটে প্ররোচিত করতে পারেনি। বন্দর কর্মীদের ধর্মঘটে প্ররোচিত করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়েছে। একমাত্র ডক কর্মীরাই কিছু সংখ্যায় কম্যুনিস্ট পরিচালিত কয়লা খনির শ্রমিকদের ধর্মঘটে সমর্থন জানিয়েছিল। ডক কর্মীদের ধর্মঘটও শুধু ডানকার্ক বন্দরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলা চলে। অন্যান্য ডকের কাজ প্রায় রুটিন মাফিক চলেছিল। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে নভেম্বর মাসের শেষে ধর্মঘটের উদ্যোক্তা কম্যুনিস্ট পরিচালিত সি জি টি মাইনার্স ইউনিয়ন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। ধর্মঘটী ডক কর্মীদের সঙ্গেও গভর্নমেণ্টের আপোষ হয়ে গেছে।

এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে একাধিক সুফল ও কুফল ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেখা দেবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। ধর্মঘটের প্রত্যক্ষ ফল হয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টন কয়লার ক্ষতি। এই জাতীয় ক্ষতি পূরণের জন্যে ফ্রান্সকে কম করে হলেও বিদেশ থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টন কয়লা আমদানী করতে হবে এবং তার দরুণ তার আমদানীর তালিকায় কিছুটা রদবদল করতে হবে। ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। ধর্মঘট উপলক্ষে কয়লা খনিগুলির ক্ষতিও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। ক্ষতির পরিমাণ কি সেটা এখনই ঠিক করে বলা কষ্টসাধ্য, কেন না এ ক্ষতির পরিমাণ কিছুদিন না গেলে বোঝার উপায় নেই। তবে এ ক্ষতির পরিমাণ যে আদৌ নগণ্য নয়—ওয়াকিবহাল মহলের প্রায় সবাই এ বিষয়ে একমত। এ ধর্মঘটের ফলে ফ্রান্সের জাতীয় শক্তি লাভবান হবে বলে আশা করা যায়। ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় কম্যুনিস্টরা আর বেশ কিছুদিন মাথা তোলার সাহস করবে না বলে আশা করা যায়। ফরাসী রাষ্ট্রমন্ত্রী এম মক বলেছেন যে এ ধর্মঘটের পিছনে ছিল কমিনফর্মের ষড়যন্ত্র। কমিনফর্মের প্রধান উদ্যোক্তা জেনারেল ঝানভ মৃত্যুর কিছু পূর্বে এই ধর্মঘটের নির্দেশ দিয়ে গেছিলেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। তাঁর এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যা এরূপ মনে করার হেতু নেই। তার কারণ এ ধর্মঘট ছিল মূলত রাজনৈতিক অর্থ-নৈতিক নয়। এই ধর্মঘটের ফলে জনসমাজের চোখে কোয়েলি গভর্নমেণ্টের মর্যাদা অনেকটা বেড়ে গেছে। দ্য গলের দল কম্যুনিস্ট ধর্মঘট নিয়ে গভর্নমেণ্টকে নাস্তানাবুদ করার কম চেষ্টা করেনি। কোয়েলি গভর্নমেণ্টের এই বিপন্মুক্তি থেকে মনে হয় যে এ গভর্নমেণ্ট কিছুকাল স্থায়ী হবে। আর একটি বিষয়েও কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই চরম ব্যর্থতার ফলে আগামী নির্বাচনে কম্যুনিস্ট দলের প্রভাব বহুলাংশে কমে যাবে।

৫·১২·৪৮
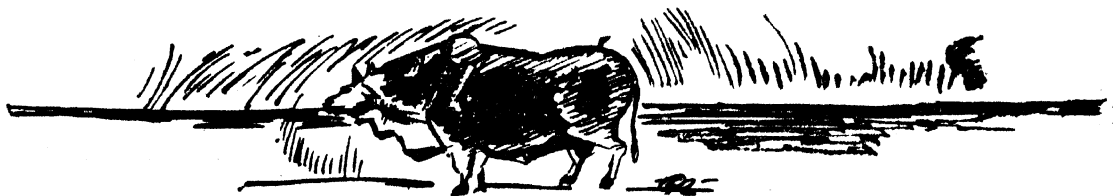
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মতিক্রমে প্রথম শ্রেণীর **ট্রামের** ভাড়া বৃদ্ধি করা **হইল।** **প্রথম** শ্রেণীর **ট্রাম গাড়ি** বৃদ্ধির সম্মতি **এখনও** পাওয়া যায় **নাই।**

• • • •

এক সংবাদে **প্রকাশ,** মাসীর (Masheer) জাহাজে করিয়া বিলাত হইতে ডবল-ডেকার বাস আসিতেছে। মাসীর খবর হইলেও মায়ের কাছে ইহা একটি খবরের মত খবর।

• • • • •

অনেক লরী চালক উত্তরাধিকার সূত্রে পশ্চিম আফ্রিকার কোন এক রাজ্যের রাজপদ লাভ করিয়াছেন। "রাজপদ লাভ না
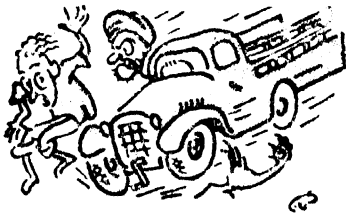
করেও যে অনেক লরী চালক রাজা বনে গেছেন তা একবার রাজপথের দিকে তাকালেই বোঝা যায়"—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

• • •

"এসো তুমি—রক্তের মত দ্রুত সবচেয়ে সাদা ট্রামে চড়ে"—একটি উদ্ধৃতি। কিন্তু কবি ভুল করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি ট্রামে চড়া বড় সহজ কথা নয়। চেষ্টা করিয়া দেখিবেন ইহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন ফলই হয় না। বাঞ্ছিতকে অবিলম্বে সান্নিধ্যে পাইতে হইলে অন্য কোন যানবাহনের কথা বলিলেই কবি ভাল করিতেন।

• • • •

A 30-page brochure has been prepared by Sir Zafrulla Khan wherein most malignant things are said about India.—

একটি খবর। খুড়ো বলিলেন—"নোবেল পুরস্কার কমিটি এ বছর শান্তির জন্য কোন পুরস্কার দেবেন না বলেই ঘোষণা **করেছিলেন,** কিন্তু খাঁ সাহেবের এই মহামূল্য কেতাব পড়ার পর না তাঁদের মত বদলাতে হয়।"

• • •

আমাদের রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন,—

A birthday is a concern of either the wife or the world. Mine belongs to the former category.—

তাঁর এই মতবাদে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইবেন। তবে আমরা আশা করি, ঘটা করিয়া জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি আপত্তি করিবেন না, কেননা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—I am a good son-in-law.

• • • •

রাষ্ট্রপাল রাজাজী তাঁর জন্মদিনে কোনরূপ অনুষ্ঠান করিতে মানা করিয়াছেন। ইহাও আর একটি মর্মান্তিক মতবাদ। এ ক্ষেত্রেও আমরা আশা করি অন্তত "সহস্র নাম" জপে রাজাজী কোন আপত্তি উত্থাপন করিবেন না।

• • • •

জন্মদিনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে **পণ্ডিত জওহরলালের অভিমত**—"Sickening sentimental tamasha" খুড়ো বলিলেন—"এটাকে most unkindest cut of all বলা যায়। তামাসা সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর এই

উক্তিতে যে কোন পাণ্ডিত্য নেই—তা একবার রাষ্ট্র পরিষদে ভোট নিলেই বোঝা যাবে!"

• • • •

মদ্যপান বর্জনের নির্দেশাত্মক বিধি সম্বন্ধে ডাঃ আম্বেদকর আশ্বাস দিয়া **বলিয়াছেন,—**

"Nothing to be worried about directive principles as they are not intended to be applied immediately."

—"অর্থাৎ ইহা চুরি করা বড় দোষ সদা সত্য কথা কহিবে গোছের সেই সনাতন নির্দেশাত্মক বিধির মতোই একটা বিধি মাত্র। রাষ্ট্র পরিষদে এ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে হয়ত শুধু ফোঁস করার জন্য।"

• • • •

পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন,—

"Delhi is a city with some kind of a soul. Many large cities are merely accumulations of human beings but without a soul."

—হয়ত তাই। কিন্তু পণ্ডিতজী নিশ্চয়ই জানেন নানা কারণে আমাদের **আত্মারাম** বহু আগেই খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছে"—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

• • • •

খেলা-ধুলার সংবাদ খবরের কাগজে থাকিবে কি থাকিবে না এই নিয়া ভোট সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ পাঠকই খেলা-ধুলার পাতা—sports page—উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী। "পৃথিবী যে খেলা ছেড়ে শুধু কাজ নিয়ে dull হতে যাচ্ছে এ বোধ হয় তারই প্রমাণ"—বলিলেন ক্রীড়ারসিক বিশুখুড়ো।

• • • •

"U. S. arming itself to the teeth" —এই সংবাদটি পাঠ **করিয়া** শুনাইলে আমাদের শ্যামলাল বলিল,—"যুদ্ধটা যদি শুধু দাঁতে কাটার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে আর আপত্তি কি আছে—Blackout, Bomb, Evacuation থাকবে না অথচ রগড়ও হবে বেশ!!

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

নিজের কথা বলা নাকি রুচি-বিগর্হিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, আমার কথা আমি যদি না বলি, তবে এমন কোন বান্ধব আছে যে, আমাদের মত রামা-শ্যামাদের কথা বলিবার জন্য আগাইয়া আসিবে? বেশ, তর্কের খাতিরে ধরিয়া নিলাম যে, আমাদের ঢাক পিটিবার মত লোকের অভাব হইবে না। তবে আবার জিজ্ঞাসা করি যে, আমার কথা আমি যেমন মমতা ও আন্তরিকতা লইয়া বলিব, অর্থাৎ আমার জন্য আমার যে-মায়া ও পক্ষপাতিত্ব আছে, তাহা অপরের কাছে প্রত্যাশা করা যায় কি? যায় না। অতএব, নিজের কথা নিজেরই বলিতে হয়।

ব্যাকরণেও এই ব্যবহারের সমর্থন আছে। পুরুষ-বিচারে ব্যাকরণে আমাকে মানে নিজেকে দেওয়া হইয়াছে 'উত্তম পুরুষ'-এর আসন, সম্মুখে উপস্থিত আছেন বলিয়া তোমাদের মানে আপনাদের দেওয়া হইয়াছে 'মধ্যম-পুরুষ'-এর আসন, আর বাদবাকী যাবতীয়কে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে একেবারে থার্ড ক্লাশে অর্থাৎ "তৃতীয় পুরুষ"-এর পংক্তিতে। এখন, সুপুরুষ বা পাত্র সম্বন্ধে বলিতে গিয়া যদি নিজেকেই বাদ দিতে হয়, তবে যে পুরুষের মধ্যে সেরা পুরুষ সেই "উত্তম পুরুষ"টিই বাদ পড়িয়া যায়। ইহারই অন্য নাম শিবহীন যজ্ঞ।

শুধু ব্যাকরণ কেন? ধর্মশাস্ত্রতো আদর্শ আচরণের অভিধান ও বিধান একাধারে। গীতা ধর্মশাস্ত্র, ইহা নিশ্চয় আপনারা মানিয়া থাকেন। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন? তিনি খোলাখুলিই বলিয়াছেন, "শোন অর্জুন! পৃথিবীতে প্রত্যেকেই নিজেকে 'আমি' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আসলে কিন্তু প্রত্যেক ব্যাটাই এক একটি নকল আমি। সৃষ্টিতে আসল 'আমি' হইলাম একমাত্র আমি। আমি তোমাদের ব্যাকরণের উত্তম পুরুষ নই, আমি একেবারে পুরুষোত্তম।"

গীতা ছাড়িয়া উপনিষদে আসুন, দেখিতে পাইবেন যে, ঋষিরা গীতায় বক্তাকেও প্রায় ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কোন চক্ষুলজ্জারই ধার না ধারিয়া ঘোষণা করিয়া বসিয়াছেন—শৃন্বন্তু, অহং ব্রহ্মাস্মি। অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বর' বলিয়া 'আমিকে' একেবারে তুঙ্গে বা তুরীয়ে তুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

এখন ঈশ্বরের ব্যবহারের খবর লওয়া যাক। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন,—'এই সৃষ্টি আমার, আমিই ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি এবং আমিই ইহাকে বিনাশ করি।' অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়া তাঁর অহঙ্কার তৃপ্ত হইয়াছে, তাই তিনি সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করিয়া আমাদের চোখে আঙ্গুলে দিয়া দেখাইতেছেন—"আমি ঈশ্বর, আমার ঐশ্বর্য দেখ।"

দেখা গেল, এই আমির আত্মশ্লাঘা হইতে কেহই রেহাই পান নাই। খোঁজ লইলেই জানিতে পারিবেন যে, আমাদের মধ্যে যিনি যত বড়, তিনি তত বড় আমি। জগৎটাই তো এই আমির আত্ম-প্রচারের একটি প্রকান্ড কীর্তনশালা বা আসর। এই আসরে মহাজন যেন গত সঃ পন্থা বলিয়া আমরাও যদি গলা খুলিয়া আমাদের কথা খানিকটা বলিয়া যাই, তাহাতে মহাভারত নিশ্চয় অশুদ্ধ হইতে পারে না।

আমার নিজের কথা একটি স্থানে বলার আবশ্যক হইবে বলিয়াই এত বড় একটা ভূমিকা ফাঁদিয়া লইয়াছি।—

কমান্ডাণ্ট ফিনি সাহেবকে কিছুদিনের মধ্যেই স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা একরূপ চলনসই করিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু নিজেদের চলনসই করিয়া লইতে বেশ খানিকটা সময় আমাদের লাগিয়াছিল।

অবস্থা স্বাভাবিক হইবার অন্তরায় ছিল সেই চিরন্তন কারণ, অর্থাৎ দলাদলি। বক্সার বিপ্লবীদের মোটামুটি তিনটি দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যুগান্তর, অনুশীলন, আর বাদবাকী। এই বাদবাকী বা তৃতীয় দলের অধিকাংশেই মূলতঃ পূর্বোক্ত দুইটি দলেরই লোক ছিলেন, কিন্তু ধরা পড়িবার বছরখানেক পূর্বে মতবিরোধ হেতু যুগান্তর ও অনুশীলন ঘাঁটি হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া আসেন। বক্সা ক্যাম্পে এই দলটিকে বলা হইত থার্ড পার্টি। ক্যাম্পের পরিচালনার জন্য বন্দীদের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কি হইবে, ইহাই ছিল সমস্যা। ক্যাম্পের কর্তৃত্ব কোন পক্ষের হাতে থাকিবে, এই ভাবেও ব্যাপারটাকে দেখা চলে। যুগান্তর ও অনুশীলনের কলহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় বনেদী বলিলেই চলে। দুইয়ের গোপন দড়ি টানাটানিতে ক্যাম্পের ম্যানেজারের দায়িত্ব তৃতীয় পক্ষের জন চারেকের উপর গিয়া সাময়িকভাবে ন্যস্ত হয়। তখন পর্যন্ত একত্রই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের ভাষায়—তখন পর্যন্ত একটি 'চৌকা' বা 'কিচেন' ছিল। বড় দুই পক্ষের এই ব্যবস্থা মনঃপুত ছিল না, আর তৃতীয় পক্ষ মাঝে থাকিয়া মজা দেখিতেছিল। এই সময়ে সেই ব্যাকরণের উত্তম পুরুষ আমি বক্সাতে আবির্ভূত হই।

নেতাদের প্রায় সকলকেই আমি চিনিতাম। বন্ধুদের নিকট ব্যাপারটা শুনিয়া লইলাম। তিনপক্ষের কর্তাদের মধ্যে জোর শলা পরামর্শ চলিতে লাগিল। আমি বন্ধুদের পরামর্শ দিলাম, হাঁড়ি ভাগ করিয়া ফেল। পরামর্শটি অবশেষে তাঁহারাও সমীচীন বোধ করিলেন। ফলে ক্যাম্পে সঙ্কট দেখা দিল এবং গোপন দলাদলির ঠেলায় রান্নাঘরে একদিন উনুন জ্বলিল না। বন্দীরা উপবাসেই রহিলেন। টিফিনের যে রুটি, মাখন, ডিম ইত্যাদি ছিল, তাহা লুঠ হইয়া গেল। এই অবস্থায় ক্যাম্পের প্রথম সাধারণ সভা আহূত হইল।

যাহা জুটিল খাইয়া লইয়া দিবানিদ্রা দিলাম। যখন জাগিলাম, তখন ঘরশূন্য। বুঝিলাম, সকলে সভায় গিয়াছেন। এমন উত্তেজনাপূর্ণ সভাটির প্রথম হইতেই যোগ দিতে পারিলাম না ভাবিয়া একটা লোকসান বা ক্ষতির ব্যথাই মনে মনে বোধ করিলাম।

সভা বসিয়াছিল তিন নম্বরের 'এ' ব্যারাকে। বারান্দা ধরিয়া আগাইতে আগাইতে দেখিলাম যে, ঘরটি একেবারে লোকে ঠাসা হইয়া আছে। কিন্তু সভার কাজ আরম্ভ হইয়াছে কি না তখনও বুঝিতে পারিলাম না। যেখানে সভাপতির আসন থাকিবার কথা সেই দরজা পর্যন্ত আগাইয়া গেলাম এবং খোলা দরজা দিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া থামিয়া দাঁড়াইলাম, কোথায় গিয়া এখন স্থান লই বা দাঁড়াই। কিভাবে ঢুকিয়াছিলাম, ঠিক বলিতে পারিব না, তবে প্রায় সকলের দৃষ্টিই আমার উপর যুগপৎ নিপতিত হইয়াছে, ইহা টের পাইলাম।

ডাহিনে তাকাইয়া দেখিলাম কয়েকখানা লোহার খাটিয়া একত্রিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। তদুপরি নেতারা স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। মধুদা (সুরেন ঘোষ), প্রতুলবাবু (গাঙ্গুলী), মহারাজ (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী), জ্ঞানবাবু (মজুমদার), ভূপেনবাবু (দত্ত), অরুণবাবু (গুহ), যতীনবাবু (ভট্টাচার্য), জীবনবাবু (চ্যাটার্জী) প্রমুখ নেতৃবর্গ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদের পাশেই একটি ডেক চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম আমার

বন্ধুবর পঞ্চাননবাবুকে (চক্রবর্তী) এবং তাঁহারই পাশে একটি চেয়ারে আসন লইয়া অবস্থিত ভূপতিদা (মজুমদার)। চক্ষু ঘুরাইয়া একটু বাঁয়ে আসিতেই নজরে পড়িল যে, বিরাট দেহ লইয়া রবিবাবু (সেন) চেয়ারে উপবিষ্ট, তাঁর পাশের চেয়ারে দীর্ঘকায় ও দীর্ঘনাসা রেজাক সাহেব এবং তাঁর পাশের চেয়ারে কালী সেন মহাশয়। ঘরে ঢুকিয়া এটুকু দেখিয়া লইতে আমার দু-তিন সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগে নাই। দরজার ঠিক বাঁ পাশেই দেয়াল ঘেঁষিয়া সভাপতির চেয়ার কিন্তু শূন্য।

এমন সময় অর্থাৎ আমি সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া থামিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভূপতিদার গলা শুনিতে পাইলাম, তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং বলিতেছেন "আমি প্রস্তাব করি যে, আজকের সভায় অমলেন্দু দাশগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।" মজুমদার পাশেই প্রতুলবাবু উপবিষ্ট ছিলেন উপবিষ্ট অবস্থাতেই তিনি [illegible] "আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।"

অমলেন্দু নামটা আমার কাজেই আমাকেই যে সভাপতি হইবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে, এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কেন? ব্যাপার কি? ইত্যাদি একদল প্রশ্ন মগজের মধ্যে কিলবিল করিয়া উঠিল। বাঙলার বিপ্লবীদের যাঁহারা নেতা, চালক ও নায়ক, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই সভায় উপস্থিত রহিয়াছেন। তবে আমার সভাপতি হইতে হইবে কেন? আজ হয়তো মতবিরোধ ঘটিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ ষোল সতের বছর যাঁহাদের দ্বারা চালিত হইয়াছি, তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে আমি সভাপতি? ইত্যাদি প্রশ্ন মনে জাগিতে ও আমার সিদ্ধান্ত করিতে আমি বড় জোর পাঁচ ছয় সেকেণ্ড সময় লইয়াছিলাম।

তারপর গিয়া সভাপতির চেয়ারে স্থান লইলাম অর্থাৎ তাহা অলঙ্কৃত করিলাম। আমি যেভাবে ঢুকিয়াছি এবং সভাপতির আসনে গিয়া বসিয়াছি, তাহাতে মনে হইতে পারিত যে, সভাপতির আসন আমারই জন্য ঠিক করা ছিল, আমি সভায় প্রবেশ করিয়া তাই সেই নির্দিষ্ট চেয়ারে সোজা গিয়া আসন লইয়াছি।

আমি আসিয়াছিলাম মজা দেখিতে, শেষে আমাকেই হইতে হইল সেই সভার সভাপতি। বরাতে যদি পাওনা থাকে, তাহা আটকায় কার সাধ্য! হিন্দীতে আছে তিনি যখন দেতা হ্যায়, তখন নাকি ছপ্পর ফুঁড়কেই দেতা হ্যায়। ব্যাপারটা এই, মধ্যে, প্রতুলবাবু, মহারাজ প্রমুখ নেতাদের নাম একে একে প্রস্তাব করা হয় এবং একে একে সকলেই সভাপতির পদ প্রত্যাখান করেন। এই রকম মারাত্মক সভার মারাত্মক পরিণতির দায়িত্ব লইতে কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। এই সময়ে মূর্তিমান সেই উত্তম পুরুষের প্রবেশ এবং সভার সিংহাসন লাভ। ভূপতিদাই শ্বেত-হস্তীর কাজটি করিলেন, প্রস্তাবের শুঁড়ে তুলিয়া উত্তম পুরুষটিকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। চেয়ারে বসিয়া স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে নিজেকে মনে মনে কবিতা শুনাইলাম—কি কুক্ষণে শূর্পনখা আইলি এ ঘোর দণ্ডক অরণ্যে?

আমার চেহারাটার একটু বর্ণনা দেই। এতক্ষণই যখন ধৈর্য ধরিয়াছেন, তখন বাকীটুকু বোঝার উপর শাকের আঁটি বই তো নয়। পরিধানে আমার লুঙ্গি শুনিয়া হাসা করিবেন না। কারণ লুঙ্গির পরিচয় দিলে ঈর্ষার উদ্রেক হইতে পারে। টেনীবাবু সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আগমন করিয়াছেন, সঙ্গে আনিয়াছেন অতি দামী একজোড়া সিল্কের লুঙ্গী। তার একখানা হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং তাহাই ছিল আমার পরিধানে। গায়ে? বলিতেছি। গায়ে ছিল একটি হাফসার্ট। কিসের? লুঙ্গির সঙ্গে আভিজাত্যে পাল্লা দিয়া সেটি ছিল বহরমপুরী মটকার। পরিচ্ছদের পরে আমার চেহারার অর্থাৎ রূপের বর্ণনা চাহিবেন? ওটী আমাকে মাপ করিতে হইবে। নিজের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া লজ্জায় হয়তো আমি কমাইয়া বলিতে পারি। সে-বিপদে আমি নিমজ্জিত হইতে রাজী নহি। তবে আপনাদের অনুমানের জন্য একটু সাহায্য করিতেছি। একমাথা চুল, ব্যাকব্রাশ করা। আর গাল ভাঙ্গা বদন চন্দ্রিমা। সবশেষে, মোটা নাসিকার দুই পাশের চোখ দুইটি একেবারে জবা ফুলের মত লাল। অপরিচিত লোকের প্রথমেই আমার সম্বন্ধে ধারণা হইত যে, আমি মদ্যপ নয় তো আমি বেশ প্রচুর পরিমাণে গঞ্জিকা সেবন করিয়া থাকি। আসলে আমার চোখের উহাই ছিল স্বাভাবিক বর্ণ, নেশায় বা ক্রোধে উহা রক্তরঞ্জিত হয় নাই। চোখের এই অস্বাভাবিক রক্তিমার জন্য ছোটকাল হইতেই নানাজনের নানা কথা শুনিয়া বেশ খানিকটা মনমরা হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু যেদিন মহাভারতে পাঠ করিলাম যে, কৃষ্ণার্জুন উভয়েরই চোখের রং লাল ছিল, সেদিন জীবনে যে কী আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা আর কহতব্য নহে।—এহেন রূপ লইয়াই উত্তম পুরুষ সভাপতির আসন দখল করিয়া প্রায় ঘণ্টা তিনেক সভার পতিত্ব পালন করিয়াছিল।

সভার ফলাফল যাহা হইবার তাহাই হইল। হট্টগোলের মধ্যে সভাটি শেষ হইতে পারিত; কিন্তু সভাপতি মহাশয় সেদিন এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, হট্টগোল বাদ দিয়া হট্টগোলের সব ফলটুকুই পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোক তো চটিয়া গিয়াই বলিলেন—"ওরকম ভাবে আপনি চোক পাকাবেন না।" সভাপতি উত্তর দিলেন—"Sit down, বসে পড়ুন, আমার চোখের দৃষ্টিই ওরকম।" আর এক ব্যক্তি হুঙ্কার দিলেন—"সভাপতির বিরুদ্ধে সেন্সর মোশন আনতে চাই।" সভাপতি উত্তর দিলেন—"আপনাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে, এখন বসে পড়ুন।" এই সময়ে অনুশীলন পার্টির অন্যতম নেতা রবিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আমি বলি কি—" তিনি শেষ করিবার সুযোগ পাইলেন না, সভাপতি বলিলেন—"Please sit down, আপনি কি বলেন পরে শোনা যাইবে।" রবিবাবুকে বসিতে বলিবার কারণ এই যে, তাঁর পূর্বে কালী সেন ও আব্দুর রেজাক খান বহুক্ষণ যাবত দণ্ডায়মান ছিলেন কিছু বলিবার জন্য। রবিবাবুকে বসাইয়া দিতেই এক কোনা হইতে মন্তব্য আসিল—"ব্যাটা মুসলিনী।" শুনিয়া উত্তম পুরুষটি বড়ই পরিতৃপ্ত প্রাপ্ত হইল, কারণ তুলনাটার মধ্যে সভাপতি আত্মমর্যাদায় যেন আরামের সুড়সুড়িই বোধ করিলেন। আধ ঘণ্টা এইভাবে দক্ষযজ্ঞ চলিল, একদিকে সভাপতি অন্যদিকে সভা মানে সদস্যগণ।

সভায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অতঃপর সভাপতি যাহা বলিলেন, তার সার মর্ম এই: নিরর্থক আলোচনার প্রয়োজন নাই। নেতৃবর্গ যদি নিজেদের মধ্যে আপোষ করিয়া মীমাংসায় উপনীত হন, তবে ভালো। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এই সভা ডাকার প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। অতএব, নেতৃবর্গের নিকট হইতে এই বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য শোনা যাইতে পারে অবশ্য বক্তব্য যদি থাকে।

নেতৃবর্গ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। সুরেনবাবু, প্রতুলবাবু, পঞ্চানন-বাবু প্রভৃতিকে একে একে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহারা বুদ্ধিমান, তাই নীরবেই রহিয়া গেলেন। সভা শান্ত, অর্থাৎ দম বন্ধ করিয়া সদস্যগণ অধুনা কুম্ভকের সীমানায় আসিয়া গিয়াছিলেন। এমন সময়ে সভার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রবিবাবু আবার দণ্ডায়মান হইলেন, বলিলেন—

"সভাপতি মহাশয়?"

—"বলুন।"

"যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহারা বাদে অপর কেহ যদি ভার লইতে প্রস্তুত হয়?"

—"তেমন কেহ আছেন কি?"

—"আমি আছি," বলিয়া রবিবাবুর পিছনে বেঁটে খাটো একটি লোক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম, দক্ষিণ কলিকাতার বিভূতি গাঙ্গুলী, মাস্টার বা ম্যাস্টার বলিয়া তিনি ক্যাম্পে পরিচিত। এতটুকু যন্ত্র হইতে

এত শব্দ হয়, ইহার মত মানুষকে দেখিয়াই কবি লিখিতে পারিয়াছিলেন।

"আপনি আছেন, তা ঠিক। কিন্তু কি অর্থে আছেন?" সভাপতির প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল।

ম্যাণ্টর একটু তোতলা, তাই উত্তরের আরম্ভতেই আটকাইয়া গেলেন, বাধা হইতে জিভটাকে মুক্ত করিয়া শেষে কহিলেন, "আপনার প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

—"প্রশ্নটি একটু কঠিন বটে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, বর্ত্তমান সমস্যায় বা অবস্থায় আপনি কি করতে চাইছেন?"

"আমি ক্যাম্পের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির ভার নিতে রাজী আছি।"

—"একা আপনি?"

প্রশ্নটির মধ্যে কি ছিল জানি না, সভায় মৃদু হাসি খেলিয়া গেল, যেন ধানের ক্ষেতে ঢেউ লাগিয়াছে।

ম্যাণ্টার বলিলেন, আমি আর আমার কয়েক বন্ধু।"

—"বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেছেন, তাঁদের মত নিয়েছেন?"

—"না, এখন পর্যন্ত নেইনি। তাঁরা আমি বল্লেই রাজী হবেন।"

সভাপতি বলিলেন, "আপনি বসুন।"

ইহাতে একদল ঘোর কলরব করিয়া উঠিলেন। সভা শান্ত করিতে সভাপতি পূর্বের পদ্ধতি প্রয়োগ করিলেন, পূর্ববৎ 'মোটা মুসোলিনী' মন্তব্য পূর্বাপেক্ষা একটু উচ্চ গলায় নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু সভা শান্ত হইতে বাধা হইল।

সভাপতি বলিলেন—"মধুদা, আপনি ক্যাম্পের ভার নিতে রাজী আছেন?"

তিনি বলিলেন—"না, সকলের ভার নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"প্রতুলবাবু, আপনি?"

তিনি শুধু একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন —"না।"

—"পঞ্চানন বাবু, আপনি?"

তিনি আরও সংক্ষিপ্ত হইলেন, অর্থাৎ বাক্যের সাহায্য না লইয়া ডেক চেয়ারে বসিয়াই মাথা নাড়িয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি ঘোষণা করিলেন,—"সভার কাজ শেষ হইয়াছে। সভা ভঙ্গ হইল।" বলিয়া চেয়ার ত্যাগ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা তুমুল হৈ-চৈ উঠিল। তার বারো আনা বক্তৃতা ও মন্তব্য সভাপতি ও তাঁর আচরণ সম্বন্ধে। একমাথা চুল, ভাঙ্গা গাল, রক্তচক্ষু, বর্মী লুঙ্গি ও মটকার হাফ সার্ট লইয়া স্যাণ্ডাল পায়ে উত্তম পুরুষ মানে আমি বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলাম। গুরুজনদের দৃষ্টি আড়াল করিয়া সিগারেট ধরাইয়া ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে বারান্দা ধরিয়া আগাইয়া গেলাম এবং পাশের তিন নম্বর 'বি' ব্যারাকের প্রথম দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া নিজের সীটে গিয়া আসন লইলাম। জানি, এখনই মধুলোভী মৌমাছির দল আমার সন্ধানে আসিল বলিয়া।

ভিড় ভালো করিয়া ভাঙ্গে নাই, ভূপতিদা আমার সীটে আসিয়া এমনভাবে আমাকে অভিনন্দন জানাইলেন যে, আমি যেন একটা ঐতিহাসিক যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি। সেনাপতি নির্বাচনের সমস্ত প্রশংসাটুকু আত্মসাৎ করিয়া লইয়া ভূপতিদা এক সময়ে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা দিলেন মধুদা। তিনি আসিয়া জড়াইয়া ধরিলেন এবং কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া গেলেন। সর্বশেষে আসিলেন স্বয়ং রবিবাবু। তিনি ঘোর প্যাঁচের ধার ধারেন না, যাহা বলেন তাহা স্পষ্ট, শ্রোতা বা বক্তা কারো ভুল বুঝিবার বা বুঝাইবার অবকাশ থাকে না। বলিলেন—"আমাকে বসিয়ে দিয়েছ, কিন্তু তবু তোমার সভাপতিত্বের প্রশংসা না করে পারলাম না।" বলিয়া প্রশংসাটি পিঠে চাপড় দিয়া হাতে হাতে তখনই বুঝাইয়া দিলেন, বিরাট পুরুষের বিরাট থাবায় আমার ক্ষীণকায় দেহের মেরুদণ্ডটি মড় মড় করিয়া উঠিল। দমবন্ধ করিয়া ফাঁড়াটা কোন মতে সে-যাত্রা কাটাইয়া দিলাম। মোট কথা, আমার কাছে এতটা বা ইহা প্রত্যাশা করে নাই বলিয়াই সেদিন নেতৃবর্গ আমাকে একটু প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি আমার স্বভাব ও শক্তি সম্বন্ধে বেশ একটু সজাগ ছিলাম, আমার সীমা আমি জানিতাম, তাই ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশিয়া যাইতে আমার একটুও সময় লাগিল না। নেতা বা চালক আমি নই, ইহা আমি জানিতাম, তাই প্রশংসা বা লোভে আমাকে অব্যাপারে কোনদিন আকৃষ্ট হইতে হয় নাই সেবারকার দীর্ঘ আট বৎসর জেল জীবনের মধ্যে।

পরের দিন সূর্য যথানিয়মে উদিত হইল। ফিণী সাহেব অফিসে আসিতেই ভূপতিদা জন ষাটের একটি তালিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং এই ষাট জনের প্রতিনিধি হিসাবে একটা আলাদা চোকা বা রান্নাঘর আদায় করিলেন। ইহাই হইল দুই নম্বর চোকা বা যুগান্তর কিচেন। ভূপতিদা হইলেন তাহার প্রথম ম্যানেজার।

অতঃপর পঞ্চাননবাবু ঐ একই পদ্ধতিতে ফিণী সাহেবের নিকট জন পঞ্চাশেকের জন্য একটি রান্নাঘর আদায় করিলেন, ইহাই হইল তিন নম্বর চোকা বা থার্ড পার্টি কিচেন।

বাদ বাকী জন প'য়তাল্লিশের ভার লইয়া এক নম্বর রান্নাঘর, ইহাই হইল অনুশীলন-কিচেন, ক্ষিতীশ ব্যানাজী হইলেন ইহার প্রথম ম্যানেজার। হাঁড়ি ভাগ সুসম্পন্ন হইল।

দেশ বিভাগ অর্থাৎ হাঁড়ি ভাগের পরবর্তী প্রতিক্রিয়াটিও সুসম্পন্ন হইতে বিলম্ব হইল না, অর্থাৎ লোক বিনিময়। প্রত্যেক কিচেনের বা দলের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাক বণ্টন হইল। লোহার খাটিয়া, বিছানাপত্তর, টেবিল-চেয়ার লইয়া যে যাঁহার নির্দিষ্ট ব্যারাকে আসিয়া স্থান লইলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ক্যাম্পে আভ্যন্তরিক বিলিব্যবস্থা এত পাকা-পোক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল যে, কে বলিবে যে হাঁড়ি ভাগ হইয়াছে। গানবাজনা, খেলা-ধূলা, আলাপ-আলোচনা, থিয়েটার যাত্রা ইত্যাদিতে ক্যাম্পটি জমজমাট হইয়া উঠিল। বিভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে এমন বন্ধুত্বও বহু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইল, দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে ইহারা বিভিন্ন পার্টির মেম্বর। সে-বন্ধুত্ব কয়েকটি ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বেই পরিণত হইয়াছে। হাঁড়ি ভাগ করিয়া খারাপ হয় নাই, ইহা প্রমাণিত হইয়া গেল এবং হাঁড়িভাগে উত্তম পুরুষের যে-অংশটুকু ছিল, তার জন্য আর আমার লজ্জিত হইবার কোন কারণই রহিল না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, সাধু আগে কোঠি পাকড়াও, তারপর সহরের আড়ং দেখিতে বাহির হও। অর্থাৎ বাসা ঠিক করিয়া তারপর অন্য কাজে হাত দিতে তিনি বলিয়াছিলেন। সেই উপদেশটাই এ-ক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করিয়াছিলাম। যার যেথা স্থান সেটুকু আগে ঠিক করিতে ও দিতে হয়। তারপর স্বস্থানে বা স্বাভাবিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের মনও হাত পা মেলিবার অবকাশ পায়। নতুবা কেবল সংঘর্ষ, কেবল কলহ ইত্যাদিতে জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। হাঁড়িভাগ করিয়া বক্সার বন্দিরা স্বাভাবিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ক্যাম্পের বন্দিদের নিজেদের মধ্যেকার প্রাত্যহিক জীবনে শান্তি ও আনন্দও অব্যাহত হইল।

(ক্রমশ)
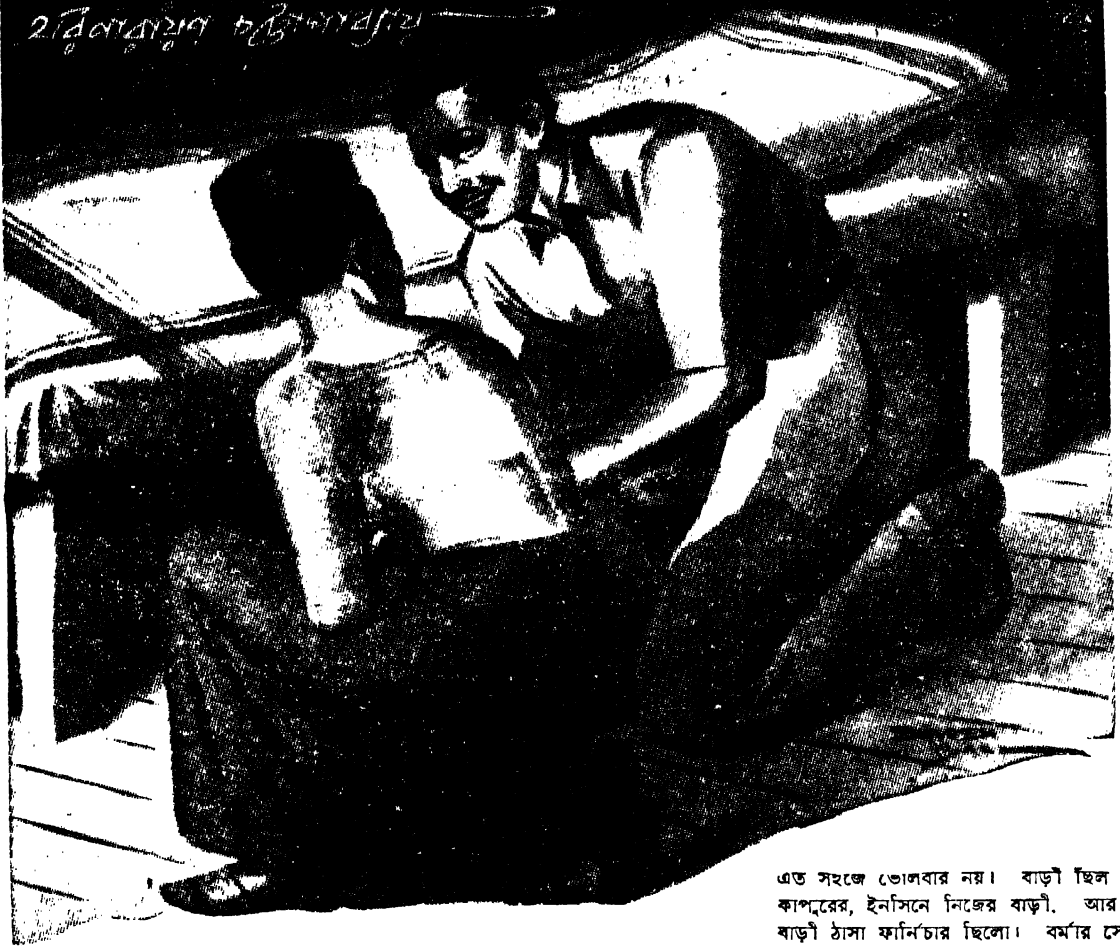
জেটিতে পা দিয়ে অমরেশ চেয়ে চেয়ে এদিক ওদিক দেখলো। সেরকম কিছু তো চোখে পড়ছে না। আশা করেছিলো নদীর দুধারের বাড়ীগুলো গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ হয়েছে, আগুনের হল্কায় পুড়ে পাঁশুটে হ'য়ে গেছে গাছ-গাছড়া.. বোমার গর্তের জন্য রাস্তা চলাই দুষ্কর হ'য়ে উঠবে। কিন্তু সেরকম তো কিছু নয়। এক নজরে দেখলে মনেই হয় না এত বড় একটা যুদ্ধের হিড়িক গেছে গোটা দেশটার ওপর দিয়ে।

কথাটা বলতেই ইন্দর কাপুর হেসে উঠলো, 'আরে চলো তো ভেতরের দিকে। শহরের মধ্যে না ঢুকলে আর শহরের অবস্থা জানবে কি ক'রে? তা ছাড়া এতদিন পরে ফিরছো, কিছু কিছু মেরামত তো নিশ্চয় হ'য়ে গেছে এর মধ্যে।'

পুল পার হ'য়ে রাস্তায় এসে পড়লো দুজনে। মোটঘাটের বালাই বিশেষ নেই। বিছানার বাণ্ডিল আর একটা সুটকেশ। ব্যস! বারবার মানুষ ঠকতে চায় না। সেদিনের কথা এত সহজে ভোলবার নয়। বাড়ী ছিল ইন্দর কাপুরের, ইনসিনে নিজের বাড়ী. আর সেই বাড়ী ঠাসা ফার্নিচার ছিলো। বর্মার সেগুণ-কাঠের তৈরী ঝকঝকে তকতকে দামী আসবাব। কিন্তু এদেশ ছাড়বার সময় স্রেফ পরনের কাপড় আর গেঁজেতে বাঁধা টাকার থলেটা নিতে পেরেছিলো সঙ্গে। পিছনে গরুর গাড়ীতে অবশ্য স্ত্রী আর দুই মেয়ে ছিলো।

অমরেশের অবস্থা এতটা সচ্ছল ছিলো না। রেল অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী। শহর-তলীর এক মেসে থেকে দিন কাটাতো। বোমার হিড়িকে এক কাপড়েই পালাতে হয়েছিলো। কাজেই ঘরপোড়া গরুর মতন দুজনেই বাড়তি জিনিস সম্বন্ধে এবার যথেষ্ট সাবধান হ'য়ে-

ছিলো। বেগতিক দেখলেই যাতে বগলে সুটকেশ আর কাঁধে বিছানার বাণ্ডিল ফেলে কাস্টমস অফিসের সামনে লাইন দিতে পারে তার বন্দোবস্ত করেই পা দিয়েছিলো এদেশের মাটিতে।

পুরানো মেসে অমরেশের সুবিধা হ'লো না। বর্মীরা মিলে সেখানে হাতির দাঁতের কারখানা খুলেছে। অফিসের কয়েকজন জুটে শহরের মধ্যে যে মেস করেছে ঠেলাঠেলি ক'রে সেখানেই এসে অমরেশ উঠলো। শহরে থাকার সুখ তো নেই, বরং অসুবিধাই আছে প্রচুর। রোজ সকালে রাস্তার কল থেকে বালতি বালতি জল টেনে তুলতে হয় ওপরে। নিজের জন্য তো হয়ই, তাছাড়া বুড়ো রামকমলবাবুর জন্যও বইতে হয় মাঝে মাঝে। পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো তার ওপর হাঁপানি রুগী, কাজেই পালা ক'রে জোয়ান ছোকরারাই জল বয়ে নিয়ে আসে। এ অসুবিধাটা অনেকটা গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো অমরেশের, কিন্তু অস্বস্তি হ'তো রাত্রে। বাতির বালাই নেই, কাঁহাতক আর মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজকর্ম করা যায়! অমরেশের আবার বই পড়ার বাতিক আছে একটু। সারাদিনের খাটুনির পরে হাল্কা ধরনের নভেল কিংবা খবরের কাগজের সম্পাদকীয়। সকাল-বেলা জল তোলার হাংগামা আর অফিস যাওয়ার বাস্ততার মধ্যে খবরের কাগজটার ওপর কোন রকমে চোখ বোলানো হয় একটু, পড়া আর হয় না। কাজেই মোমবাতির আলোয় চোখ কুঁচকে পড়তে পড়তে অমরেশ রীতিমত ক্ষেপে ওঠে। লড়াইয়ের ওপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে। সব কিছু যেন তচনচ করে দেয় এই লড়াই। গোছানো জিনিস উলটে পালটে একাকার। জীবনযাত্রার ধরনই দেয় বদলে। আরো একটা মস্ত বড়ো অসুবিধা অমরেশের। সেকথাটা অবশ্য অফিসের দু'একজন লোক জানতোও। শুধু দু'একজন লোক, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ যারা, একেবারে পাশে বসে অফিসে কাজ করতো হয়ত ঢুকেও ছিলো একই সংগে আর চাকরীর দৌড়ে একসংগেই efficiency barএর বেড়ার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বছরখানেক। বয়সে অনেক বড়ো হ'লেও ইন্দর কাপুরও এই দলের লোক। সেই সেদিন তুললো কথাটা, 'হ্যাঁ হে অমরেশ, ফেলে যাওয়া চাকরী তো পেলে কিন্তু ফেলে যাওয়া মেয়েটির খবর কি।'

ফেলে যাওয়া মেয়েটি? লিখতে লিখতে কলম থামিয়ে অমরেশ বিস্ময়ের ভংগী করলো একটা, 'তার মানে?'

'তোমার আদরের মা টিন গো? রোজ অফিসের দোরগড়ায় এসে যে অপেক্ষা করতো তোমার জন্য মনে নেই?' ইন্দর কাপুর—চেয়ারের হাতলের ওপর একটা পা ঝুলিয়ে দিয়ে টিপে টিপে বললো কথাগুলো।

মনে আবার নেই। অমরেশ একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো। একটুখানির জন্য। টেবিলের সামনে খোলা অফিসের খাতার পাতাগুলো আলতো হাতে ওল্টালো দু'একবার তারপর ম্লান হেসে বললো, 'ওসব মেয়ে কি আর আছে? জাপানীরা দেশটাকেই চষে ফেলেছিলো, মেয়েদের কি বাকি রেখেছে?'

'সে কি? খোঁজখবর করোনি একবার এখানে এসে?' আলমারী থেকে পুরানো টিকেটের গোছা নামাতে নামাতে নুরুদ্দিন বললো।

'না' অমরেশ অম্লানবদনে ঘাড় নাড়লো, 'এসে অবধি আর ফুরসৎ পাচ্ছি কই। জল টানতে টানতেই হাতে কড়া পড়ে গেলো, এসব করবার কি আর সময় আছে।'

কথাটা অবশ্য সত্যি নয়। সত্যি যে নয় সেটা অন্ততঃ নুরুদ্দিন জানে, কারণ ওদের পাড়ায় অমরেশকে অনেকদিন সে ঘুরতে দেখেছে। ঘোরার কারণ তার অজানা নয়। পাড়ার মোড়ের বাড়ীতেই একসময়ে থাকতো মা টিন অমরেশের পুরানো মেসের ঠিক পাশে। কিন্তু তার কোন পাত্তা পায়নি অমরেশ। পাড়ার লোকেরা ঠিক খবর দিতে পারে নি। সবাই নতুন এসে ঢুকেছে, পুরোনো বাসিন্দাদের খোঁজখবর কেউ রাখে না। সেই হাংগামার সময় কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটকে পড়েছে কে রাখে তার হিসাব। নতুন লোকে নতুন ঘর-সংসার পাততে শুরু করেছে। আগের পড়শীদের খবর রাখবার তাদের বিশেষ মাথা-ব্যথা নেই।

পর পর অনেকদিন গিয়েছিলো অমরেশ। বর্মীদের কাছে খোঁজ করতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলো। খোঁজ তো দেইইনি, উপরন্তু চোখ দুটো কুঁচকে বিশ্রীভাবে চেয়েছিলো ওর দিকে। ছেলেবুড়ো থেকে কচিকাঁচা সবাই। ভাবটা যেন, কি দরকার এতো এদেশের মেয়ের খবরে? সুখের পায়রার মতন সুসময়ে গলা ফুলিয়ে বকবকম করবে আর বিপদের সামান্য সূচনাতেই ডানা মেলে পালাবে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। পিছনের দিকে একবার ফিরেও চাইবে না।

শুধু ওপাড়ার বর্মীরাই নয় অমরেশ বেশ লক্ষ্য করেছে অফিসের সহকর্মী বর্মীরা পর্যন্ত কেমন এড়িয়ে এড়িয়ে চলে আজকাল। নেহাৎ একেবারে চোখাচোখি হ'লে শুকনো হাসির টুকরো কিংবা দায়সারা গোছের ঘাড় নেড়ে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা,—বাস, এই পর্যন্ত।

ওরা যেন বেশ বুঝতে পেরে গিয়েছে এরা শুধু রুটির খোঁজে এদেশে এসে জোটে। মুখে যতই বড়ো বড়ো কথা বলুক, অন্তরঙ্গতা দেখাতে চেষ্টা করুক এদেশের লোকের সঙ্গে নাড়ীর কোন যোগ নেই, রুটির সঙ্গে এদেশের নুন এরা খায়নি—এ একেবারে খাঁটি কথা। এরা বিদেশী। ঝড় উঠলেই অন্য দ্বীপে গিয়ে উঠবে আবার সমুদ্র শান্ত হ'লে দেঁতো হাসি হেসে এদেশের কূলে এসে ভিড়বে।

ওরা তর্ক করলে হয়ত বোঝাবার চেষ্টা করতো অমরেশ, কিন্তু ওরা একটি কথাও বলে না। সাবধানে শুধু এদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে।

কিন্তু মা টিনের কথা সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রথম আলাপের কথা আজো অমরেশের পরিষ্কার মনে আছে। মেসবাড়ীর পাশেই বুড়ো বাপকে নিয়ে মা টিন একলাই থাকতো। বাড়ীতে বসে লুংগীর ওপরে পুঁতির কাজ আর গালার টুকটাক জিনিসপত্র তৈরী ক'রে দুটো পেট চালাবার মতন উপার্জন মা টিন করতো। খুব সচ্ছল না হ'লেও অভাব অনটন ছিলো না বিশেষ। তার ওপরে মা টিন এক পাল মুর্গী পুষেছিলো। কম ক'রে রোজ এক ডজন ডিম সে বাজারে পাঠাতো।

প্রথম আলাপ অবশ্য এই মুর্গীকে সূত্র ক'রেই।

মেসবাড়ীর সামনে এক ফালি জমির ওপর কোদাল চালিয়ে অমরেশ পালং আর নটে গাছের বীজ ছড়িয়েছিলো। মেহনৎ কম নয়। ঘাসের চাবড়া ভেঙে ভেঙে ঝুরঝুরে নরম করেছিলো মাটি একটি একটি ক'রে আগাছা উপড়ে ফেলেছিলো, তারপর মাইল দশেক দূর থেকে এক বন্ধুর বাগান থেকে শাকের বীজ ক'টা যোগাড় করেছিলো বন্ধুকে অনেক খাতির খোসামোদ ক'রে। শুকনো কঞ্চি দিয়ে চার-পাশে নীচু করে একটা বেড়াও বেঁধে দিয়েছিলো ছাগল আর গরুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। তখন অবশ্য মুর্গীর কথাটা অমরেশের একেবারেই মনে পড়ে নি।

কাজেই তার পরের দিন ঘুম থেকে উঠে বাগানের দিকে চেয়েই অমরেশের রক্ত মাথায় চড়ে গিয়েছিলো। দুহাতে চোখ দুটো কচলে অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়েছিলো তারপর তীরবেগে সিঁড়ি বেয়ে নীচে ছুটে এসেছিলো।

একটা নয় দুটো নয় মোরগ আর মুরগী মিলে অন্ততঃ গোটা পনেরো। ধাড়ীগুলো কঞ্চির বেড়া ডিংগিয়ে এসেছে আর বাচ্চাগুলো এসেছে তলা দিয়ে। নির্ভয়ে খুঁটে খুঁটে শাকের প্রায় প্রত্যেকটি দানাই শেষ করেছে এইবার অমরেশকে ছুটে আসতে দেখে গলা উঁচু করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ 'কক্' 'কক' শব্দ করে এদিক সেদিক ছুটে পালাবার চেষ্টা করলো। অমরেশ পেঁছবার আগে প্রায় প্রত্যেকটি মুরগী সরে পড়েছিলো কেবল একটি সাদা রঙয়ের ছোট মোরগ কিভাবে কঞ্চির বেড়ার মধ্যে ঠ্যাংটা আটকিয়ে ঝটপট করছিলো। অমরেশ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তার ওপর আর

পরক্ষণেই একেবারে বগলদাবা ক'রে সেটাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছিলো।

মেসের দু'একজন বারণও করেছিলো, 'ছেড়ে দাও অমরেশ, সামান্য একটা মুরগী নিয়ে আবার হৈ চৈ হবে একটা। বর্মীরা সব পারে। এক আনা পয়সার জন্য মানুষকে ছ টুকরো ক'রে কেটে রেখে যেতে পারে। দাও ছেড়ে দাও তার চেয়ে।'

'পাগল, ছেড়ে দেবো বই কি,' অমরেশ প্রায় গর্জন করে উঠেছিলো—'আমার পাঁচ টাকার বীজ বেটারা খেয়ে শেষ করেছে। এটাকে আজ বলি দিয়ে তবে অন্য কাজ।'

বলি দেওয়া অবশ্য শেষ পর্যন্ত হয়নি। রাগটা একটু কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমরেশ বুঝতে পেরেছিলো সেটা লঘুপাপে গুরুদণ্ড হ'য়ে যাবে। তার চেয়ে থাক ধামা-চাপা। অনাহারে শুকিয়ে বেটাকে মারা হবে।

তাই ঠিক হয়েছিলো। পায়ে দড়ি বেঁধে খাটের পায়ার সঙ্গে অমরেশ আটকে রেখে-ছিলো। অফিস যাবার সময় কি মনে ক'রে এক মুঠো চালও ছড়িয়ে দিয়েছিলো সামনে।

বাড়ী থেকে বেরোবার মুখেই এক বিপত্তি। ঠিক গেটের গোড়াতেই মা টিনের বাপ বুড়ো বা মঙের সঙ্গে দেখা।

'বাবুজি, আমার মেয়ের একটা মোরগ এসেছে তোমাদের বাগানে? সকাল থেকে একটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

অমরেশের ইচ্ছা হ'য়েছিলো সত্যি কথাটাই বলে। মোরগ তার ঘরেই বাঁধা আছে, খেসারৎ বাবদ পাঁচ টাকা দিয়ে যেন মোরগ ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে অমরেশের যেন সাহসে কুলিয়ে উঠলো না। বা মঙের মুখের মাংসগুলো কুঁচকে গুটিয়ে গুটিয়ে গেছে। সামনের একটা দাঁতও নেই। ভুরুর পাকা পাকা চুলগুলো চোখের পাতার ওপর এসে পড়েছে। কিন্তু অদ্ভুত উজ্জ্বল দুটি চোখ। তোবড়ানো মাংসের তলের মধ্য থেকে যেন ঝকঝক ক'রে জ্বলে উঠছে চোখের মণি দুটো। দায়ের ফলার মতন চকচকে! কাজ কি বিদেশ বিভুয়ে এই সব লোককে ঘাঁটিয়ে! অমরেশ বেমালুম ঘাড় নেড়ে দিয়েছিলো। একটু আশ্চর্য হ'য়েই বলেছিলো, 'মোরগ! তোমাদের? কই দেখছি বলে তো মনে হ'চ্ছে না।'

বুড়োকে পাশ কাটিয়ে অমরেশ এগিয়ে গিয়েছিলো।

সারাটা দিন অফিসে কিন্তু অস্বস্তিতে কেটেছিলো। কি জানি বেটাদের অসাধ্য কাজ নেই। বছর ছয়েক এদেশে থেকে একথাটা অমরেশ ভালো ক'রেই জেনেছে। কোন রকমে যদি টের পেয়ে যায় যে হারানো মোরগ বাবুর তো ফেরৎ নিয়ে যাবেই, বাবুর জিনিসপত্তরও হয়ত জড়ো ক'রে দেশলাই জ্বালিয়ে দেবে। ঝোঁকের মাথায় সকালে ও কাজটা না ক'রলেই যেন ভালো ছিলো।

মাথাধরার অজুহাতে সেদিন অমরেশ একটু সকাল সকালই বাড়ী ফিরে এসেছিলো।

ঘরে ঢুকেই খাটিয়ার তলায় উঁকি মেরে দেখেছিলো, মোরগটি বহাল তবিয়তেই রয়েছে। চালের একটি দানাও অবশিষ্ট নেই, পরিবর্তে খাটের তলাটা বিশ্রীভাবে নোংরা করে রেখেছে। এই এক ঝঞ্ঝাট! মেসের চাকর রাজী না হ'লে তাকেই পরিস্কার করতে হ'বে সমস্তটা। জামা-কাপড় খুলে অমরেশ লুংগিটা জড়িয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় খুট খুট ক'রে শব্দ হ'য়েছিলো।

'কে?' অমরেশ জোর ক'রে গলাটা ভারিক্কি করার চেষ্টা করেছিলো। 'আমি, মা টিন।' খুব কোমল গলার আওয়াজ।

অমরেশ দরজা খুলেই থতমত খেয়ে গেলো। উঁকি মেরে দেখলো মেয়েটির পিছনে আর কেউ ধারালো কিছু নিয়ে অপেক্ষা করছে কিনা? কিন্তু না, কেউ নেই। এমন কি মেয়েটির বুড়ো বাপ পর্যন্ত নয়।

'আমার একটা মোরগ আপনাদের ঘরে আছে?' ভিজে ভিজে গলার আওয়াজ মেয়েটির।

অমরেশ বেশ একটু দমে গেলো। উদ্ধত জিজ্ঞাসা নয়, করুণ প্রত্যাশা। মোরগটি যে আছে এ যেন মেয়েটির জানা, শুধু সে ফেরৎ চায় সেটি।

এবার আর অমরেশ মিথ্যে বলতে পারে নি। মেয়েটির মাথার ওপর জড়ো করা ঘন চুলের রাশ, সরল মুখভঙ্গী আর দুটি চোখের চাউনিতে কি যেন ছিলো, সেটা অবশ্য অমরেশ আজো ঠিক বুঝতে পারে নি কিন্তু অমরেশ ভিজে গিয়েছিলো। শাকের বীজ আর খেসারতের কথা মনেই ছিলো না। মেয়েটির দিকে চেয়ে শুধু আস্তে আস্তে বলেছিলো, 'আমিই অন্যায় ক'রে তোমার মোরগটিকে আটকে রেখেছি, আমায় ক্ষমা করো।'

মেয়েটির গাল লালচে হ'য়ে উঠেছিলো, দুটি হাত বুকের ওপর জড়ো করে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলেছিলো, 'না, না, কিছু অন্যায় করেন নি। আমি জানি আমার মুরগী-গুলো এসে আজ সকালে আপনাদের গাছ-গাছড়া সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে। আমার অসাবধানতার জন্যই এটা ঘটেছে। আমি ভারি লজ্জিত।'

অমরেশ মেয়েটিকে ঘরের কাছ বরাবর আনতেই, মা-টিন ঝাঁপিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে মোরগটিকে বুকে চেপে ধরে তার পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে ছিলো। মোরগের ডানার ওপর নিজের গালটা রেখে আস্তে আস্তে বলেছিলে, জোটেনি তো? বেশ হ'য়েছে। পরের বাগানে ঢোকার ঠিক শাস্তি হ'য়েছে। আহা নরম পায়ে বড্ড লেগেছে না রে।' সত্যি সত্যিই মেয়েটির দুটি চোখে জল ভ'রে আসতেই অমরেশ রীতিমত অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলো

একটু আমতা আমতা করে বলেছিলো, 'না, না, অত নিষ্ঠুর আমায় ভেবো না। রাগের মাথায় তোমার মোরগটাকে বেঁধে রেখেছিলাম বটে, কিন্তু অফিস্ যাবার সময় তাকে এক মুঠো চাল দিয়ে গেছি। দেখোনা সবকটা চাল তো খেয়েইছে, খাটের নিচেটা কি রকম নোংরা করে রেখেছে।' অমরেশ আঙ্গুল দিয়ে খাটের নিচেটা দেখিয়ে দিয়েছিলো।

মেয়েটি নিচু হ'য়ে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিলো, ঈস্ তাইত, দিন একটা কাপড়ের টুকরো আমি সব পরিস্কার ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। কথার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি দরজার কোণে রাখা ছেঁড়া ন্যাকড়ার একটা টুকরো টেনে বের করে মোছবার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে বসতেই অমরেশ মরিয়া হ'য়ে মেয়েটির একটি হাত চেপে ধরেছিলো, 'ছি, ছি, ওসব তোমার করতে হবে না। মেসের চাকর আছে সেই করবে অখন।'

'না, তা কি হয়, আমার দোষের একটু সাজা হওয়া দরকার বৈকি। আপনি ভালো লোক ব'লে শুধু বেঁধে রেখেছেন মোরগটা, অন্য কোন লোকের বাগানে এরকম অত্যাচার করলে, আধলা ইঁট দিয়ে থেৎলে দিতো না একে। সরুন আপনি। আমি এখুনি মুছে দিচ্ছি।'

মেয়েটিও নাছোড়বান্দা, অমরেশও ছাড়বার পাত্র নয়। দুটো হাত দিয়ে সে মেয়েটির একটি হাত চেপে ধরে ছিলো আর মেয়েটিও আর একটা হাত দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিলো, ঠিক এমনি হাত কাড়াকাড়ির মুখে দরজার গোড়ায় হরবিলাসবাবু এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক না ক'রে জলগ্রহণ করেন না। অফিসে কুশাসন নিয়ে যান, চেয়ারের ওপর পেতে তবে তার ওপর বসেন। জাত যাবার ভয়ে এই ম্লেচ্ছ দেশে স্ত্রীপুত্র আনেন নি। সেই জন্যই মেসে এসে উঠেছেন। তিনি কিছুক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন তারপর একহাত দিয়ে পৈতেটা অনুসন্ধান করেছিলেন কিন্তু যজ্ঞসূত্রটি কোট, সার্ট, সোয়েটার আর গেঞ্জির তলায় থাকায় চট ক'রে সেটি খুঁজে না পেয়ে মুখে সরবে গায়ত্রী আওড়াতে শুরু করেছিলেন।

অমরেশের যখন চমক ভেঙে ছিলো তখন হরবিলাসবাবুর দুচোখে অগুনের আভা বেরুচ্ছে সমস্ত শরীর কাঁপছে ঠক ঠক করে।

হরবিলাসবাবু তার পরের দিনই মেস

নি। মাঝে মাঝে ডিম আর গালার ঝুড়ি সাজ নিয়ে দেখাশোনা বজায় রেখেছিলো। মেসের অন্য লোকদের বাঁকা চাউনি আর হাসি টিটকারি সে গায়েই মাখে নি। ব্যাপারটা গম্ভীর হ'য়ে জমেছিলো মা-টিনের বুড়ো বাপ মারা যাবার পর থেকে।

ভোর রাতের দিকে কান্নার শব্দ পেয়ে অমরেশ ছুটে গিয়েছিলো। বাপের মাথাটা কোলে নিয়ে মা-টিন চীৎকার ক'রে কাঁদছিলো। সান্ত্বনা দিয়েছিলো অমরেশ। মিষ্ট সহানুভূতির কথা বলেছিলো। মা-টিনের জগতে আর কেউ রইলো না. এই খেদোক্তির উত্তরে অমরেশ এগিয়ে গিয়ে মা-টিনের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে জানিয়েছিলো নিজের কথা। মা-টিনের সমস্ত ভার সে নিতে রাজী, স্পষ্ট করে বলেছিলো সে কথা।

মা-টিনের জমানো টাকার অংকটা জানবার পর থেকেই অমরেশ সম্পর্কটা আরো নিবিড় ক'রে তুলেছিলো। সময়ে অসময়ে, কারণ অকারণে মা-টিনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতো। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতো পরিবর্তে সুগন্ধি চা কিংবা চালের পায়েস জুটে জেতো। ক্রমে আরো নিবিড় হ'লো সম্বন্ধ। জিনিস দেওয়া-নেওয়া থেকে মন দেওয়া-নেওয়ার পর্যায় গিয়ে পৌঁছলো। এই সময়ে অবশ্য মেসের দু একজন ভদ্রলোক বারণ করেছিলো অমরেশকে, 'সাবধান মিত্তির সাপ নিয়ে খেলা করছো। বিপদে পড়বে একদিন।' মা-টিনের পাঠানো ডিমের অমলেট মুখে দিতে দিতে অমরেশ নিরুদ্বেগচিত্তে উত্তর দিয়েছিলো 'ভয় পেয়ো না, খেলি যদি তবে সাপ নিয়েই খেলব, ছুঁচো নাচিয়ে বাহাদুরী নেব না।"

ব্যাপারটা মোড় ঘুরেছিলো কিছুদিন পরেই। সাঝের ঝোঁকে মা-টিন অমরেশের গা ঘেষে ব'সে মিষ্টি গলায় বলেছিলো 'তুমি আরো কাছে নাও না আমাকে, একেবারে নিজের করে?' অমরেশ আচমকা একটা ধাক্কা খেয়েছিলো। এমন একটা জিনিস যে হবে তা সে জেনেছিলো কিন্তু এতটা তাড়াতাড়ি এটা ভাবতে পারেনি। তাই আলগোছে উত্তর দিয়েছিল, 'কাছেই তো আছো তুমি। কত কাছে নেবো তোমাকে?'

'বিয়ে হয় না আমাদের? সত্যিকারের বিয়ে? বর্মী মেয়ে বিয়ে করতে আপত্তি আছে নাকি তোমার?' মা-টিন এগিয়ে এসে অমরেশের বুকের ওপর মাথাটা রেখেছিলো।

আপত্তি? মোটেই নয়। কি আপত্তি থাকতে পারে অমরেশের? মাত্র ক'দিন আগে মার অসুখের নাম ক'রে মা-টিনের কাছ থেকে শ দুয়েক টাকা আদায় করেছিলো অমরেশ ইচ্ছে ছিলো আরো কিছু চাইবে এই বাবদ কাজেই এই সময়ে আপত্তি করলে চলবে কেন।

অমরেশ খুব গাঢ় গলায় বলেছিলো, 'আমার কোন আপত্তি নেই মা-টিন। মায়ের অসুখের জন্য মনটা বড় খারাপ হ'য়ে রয়েছে। আজ কোন চিঠিও পেলুম না। মার ভালো থাকার খবর আসলেই তোমাকে আমি একেবারে নিজের করে নেবো।' কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ নিঃশ্বাস ফেলেছিলো একটা আর সেই নিঃশ্বাসের ঝাপটায় আরো কিছু টাকা যে মা-টিনের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছিলো সে কথাটা মনে করে অমরেশ আজো উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো।

অমরেশের বরাত ভালো বলতে হবে। ওর মায়ের কল্পিত অসুখ সারবার আগেই সাইরেন বাজার পালা শুরু হ'য়ে ছিলো। প্রথমটায় কেউ তেমন গা করেনি। সিংগাপুরের সিংহ-দরজা পেরিয়ে কেউ যে এ দেশে ঢুকে হামলা করতে পারবে এটা লোকের ধারণার বাইরে ছিলো। কিন্তু একদিন প্রখর দিনের আলোয় মানুষের সে ধারণা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গিয়েছিলো। জলের দরে বাড়ীঘর জমিজমা সব বিক্রী করে যে যেদিকে পেরেছিলো পালাতে শুরু করেছিলো। অমরেশের অফিস সরে গিয়েছিলো মাণ্ডেলেতে। মা-টিন সঙ্গ ছাড়েনি। এখানকার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে অমরেশের সঙ্গে কাঠের ছাউনিতে গিয়ে উঠেছিলো। শত্রুদেরও উৎসাহ অদম্য। ব্লাড হাউন্ড কুকুরের মতন রক্ত শুঁকে শুঁকে ঠিক গিয়ে হাজির হ'য়েছিলো ভারের দিকে। তাও কি খালি হাতে ধাওয়া করা। বোমা বারুদ এরোপ্লেনের বহর নিয়ে উদ্ব্যস্ত ক'রে তোলা মানুষকে।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে অমরেশের দেরী হয়নি। এদেশ ওরা নিয়ে তবে ছাড়বে। তার চেয়ে মানে মানে দেশের ছেলে দেশে পালানোই শ্রেয়। পৈত্রিক প্রাণটা জিইয়ে রাখতে পারলে, আখেরে অনেক কাজ দেবে। কাজেই একদিন ভোরের দিকে জামাকাপড়ের বাণ্ডিল কাঁধে ঝুলিয়ে আর মাটিনের ধানজমি বিক্রির কয়েক হাজার টাকা কোমরের গেঁজেয় বেঁধে দেশের দিকে হাঁটাপথে পাড়ি দিয়েছিলো। অবশ্য চেষ্টা করেও এড়াতে পারেনি মা-টিনকে। ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, পথের দুর্গমতার কথাও বুঝিয়েছিলো অনেক, কিন্তু আপদ সঙ্গ ছাড়েনি। বাঙলা দেশে গিয়ে বাঙালীর বৌ হয়ে থাকবে—এ নাকি তার বহুদিনের কামনা।

তারপরের কথাগুলো মনে পড়লে অমরেশ একটু বিচলিত হ'য়ে পড়ে। একটু বেশি সেবী কাজ হয়ে গিয়েছিলো। এতটা না এগোলেই ভালো ছিল। গরুর গাড়ীতে মা-টিনকে বসিয়ে জল খাবার ছুতো করে পাহাড়ের ঢালু পাড় বেয়ে ঝরণার খোঁজে অমরেশ নেমে গিয়েছিলো তারপর বুনো বাঁশঝাড় আর পাইনের জংগলের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা ধরে সোজাসুজি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলো। অসুবিধা হয়নি বিশেষ। হাজার হাজার গরুর গাড়ী চলেছে পথ দিয়ে। দঙ্গলে দঙ্গলে লোক চলেছে। কোন একটা দলে গিয়ে জুটলেই হ'লো। মাঝে মাঝে শুধু কোমরে বাঁধা মা-টিনের টাকা কটার ওপরে আলতো হাত বুলিয়ে নিয়েছিলো।

অনুতাপ অনুশোচনার বালাই ছিলো না কারণ অমরেশ সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আবার একদিন ফিরে আসবে এদেশের মাটিতে, কোনদিন দাঁড়াতে হবে মা-টিনের মুখোমুখি।

কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেল অমরেশ। একটি পয়সা নেই হাতে, লড়াইয়ের আগুন নিভে গেছে বটে, কিন্তু শুধু ছাইয়ের রাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে চারদিকে। মানুষের পেট ভরাতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মাইনের টাকাকটা মেসের খরচেই চলে যায়, দেশের বৌ-ছেলেপুলেদের পাঠাবার মতন সামান্যই থাকে। খরচের যেন আর শেষ নেই। বাঁধাধরা নিয়ম নেই জিনিসের দরের। ফাঁকেও বুঝে দাম লাগবে। ঠিক এমনি সময়ে মা-টিনকে প্রয়োজন ছিলো। সেদিনের সরে পড়ার একটা কিছু কৈফিয়ৎ অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারতো বিশ্বাসযোগ্য কোন একটা অজুহাত। হাতদুটো চেপে ধরে বুকের ওপর রেখে ইনিয়ে বিনিয়ে রঙীন কথাবার্তায় ঠিক ভোলানো যেতো মা-টিনকে।

মা-টিন যে ফিরে এসেছে শহরে এ বিষয়ে অমরেশ স্থিরনিশ্চয়। ফিরে তো নিশ্চয় এসেছে আর মিলিটারীর আমলে বৃথা যায়নি ওর অটুট যৌবন। ভাগাভাগি করে নিয়েছিলো ইংরেজ আর জাপানী প্রভুদেরেরা, ফলে মা-টিনের অবস্থা যে বেশ ভালো এ কথাটা কল্পনা ক'রে নিতে অমরেশের কোন অসুবিধা হ'লো না। কিন্তু হয়রান হয়ে গেলো খুঁজে খুঁজে। প্যাগোডার চাতালে হাটে বাজারে ছুটির দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পায়চারী করলো কিন্তু পাত্তা মিললো না। আশ্চর্য, কোথায় গেলো মেয়েটা।

প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়েছিলো অমরেশ, সেই সময় হঠাৎ একদিন অফিসের দোরগোড়ায় বেরোবার মুখে বা ছিটের সংগে দেখা হ'য়ে গেলো। অবশ্য বা ছিটকে চেনবার উপায় ছিলো না। ঝকঝকে তকতকে পোষাক, হাতে দামী সিগারেটের টিন, চোখে সানগ্লাশ, হঠাৎ দেখলে বোঝবার উপায়ই নেই যে মাত্র কয়েক বছর আগে মা-টিনের বাড়ীতে চাকরের কাজ করতো এই লোকটা। লড়াইয়ে হয়ত ফিরিয়ে নিয়েছে নিজের বরাত।

বেশ সমীহ করেই অমরেশ ডাকলো, 'কে বা ছিট নাকি? আছো কেমন?'

বা ছিট থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ভাবলো দু-এক মিনিট। তারপর চিনতে পেরে একগাল

হেসে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আরে বাবুজী যে? ফিরেছেন কবে?'

একটু দ্বিধা করে অমরেশ সিগারেট তুলে নিলো। একথা সেকথার পর এক সময়ে জিজ্ঞাসাই করে ফেললো আসল কথাটা।

বা ছিট ঠোঁট মুচকে হাসলো একটু, 'মা টিন? মা টিন এখন কেমেনডাইনে আছে। নদীর ওপারে কাঠের মিলের পাশে। মাঝে মাঝে আমি যাই। তা সেখানে গিয়ে বিশেষ লাভ হবে না।'

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বা ছিট চলে গেলো।

অমরেশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সুবিধা হবে না বিশেষ। তার মানে মা টিন আমলই দেবে না ওকে। তাহলে মিলিটারীর দৌলতে বেশ কিছু নিশ্চয় কামিয়েছে, ফিরিয়ে ফেলেছে অবস্থা। দেখা করতে হয় তো এই সময়ে, নয়ত মানুষের অবস্থার কথা বলা যায় না কিছু। আজ ভালো কাল খারাপ। বিশেষত এই সব ব্যাপারে খাজনার চেয়ে বাজনাটাই বেশী হয়। অমরেশ আর দেরী করল না। সন্ধ্যের দিকে খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হ'য়ে পড়লো। পথঘাট অচেনা নয়। স্টেশনে নেমে সোজা নদীর পার বরাবর গিয়ে হাজির হ'লো। একটু ঘোরাঘোরির পরে কাঠের মিল খুঁজে নিতে দেরী হ'ল না। পাশে একটা ছোট চায়ের দোকানে জিজ্ঞাসা করলো। ঠিক ক'রে কেউ বলতে পারলো না, তবে আন্দাজে সাদা গেট-ওয়ালা একটা বাড়ী দেখিয়ে দিলো।

ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমরেশ দেখলো কিছুক্ষণ। বেশ পাকা দুতলা বাড়ী। সামনে একটু ফুলবাগানের মতনও রয়েছে। অযত্নে আর অবহেলায় আগাছা জন্মেছে অনেক। তাহ'লে অবস্থা সত্যিই ফিরিয়ে নিয়েছে মা টিন। জমিজেরাত করেছে, বাড়ীঘর করেছে নগদ টাকাও করেছে নিশ্চয় বেশ কিছু।

বেশ অন্ধকার। সাবধানে পা ফেলে ফেলে অমরেশ এগিয়ে গেলো। থমথমে নিস্তব্ধতা। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। বাড়ী আছে তো মা টিন, না বায়না নিয়ে বাইরে গেছে কোথাও। সিঁড়ির কাছ বরাবর একটি ছোকরার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। কাঁধে তোয়ালে দেখে চাকর বাকর ব'লেই মনে হ'লো।

'ওহে মা টিন ব'লে কেউ থাকে এখানে?'

ছোকরা থমকে দাঁড়ালো। কয়েক পা এগিয়ে এসে অমরেশের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বললো 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওপরেই আছেন। সোজা উঠে যান।'

সিঁড়ি দিয়ে অমরেশ ওপরে উঠে গেলো। বারান্দার কাছ বরাবর গিয়ে ডাকলো, 'মা টিন, মা টিন আছো এখনে?'

'কে?' ভিতর থেকে উত্তর এলো। ভুল হবার উপায় নেই। মা টিনেরই গলার আওয়াজ।

চৌকাঠ পার হ'য়ে অমরেশ ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। আশ্চর্য, ভিতরেও অন্ধকার। একটা মোমবাতিও কি জ্বালাতে পারে না এরা। অচেনা লোক হোঁচট খাবে যে এখানে।

'আমি অমরেশ। তুমি কোথায় মা টিন।' অমরেশের গলার আওয়াজ যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও কেঁপে কেঁপে উঠলো। একটা ছায়া এগিয়ে এলো। অমরেশের সামনে এসে দাঁড়ালো, শান্ত গলায় বললো, 'কে অমরেশ, ভিতরে এসো।'

অদ্ভুত ঠেকলো অমরেশের: কেমন নিস্তেজ আর নিস্পৃহ গলার আওয়াজ মা টিনের। এতদিন পরে দেখা—এই কি আহ্বানের রীতি। আশা করেছিলো নামটা শোনা মাত্র মা
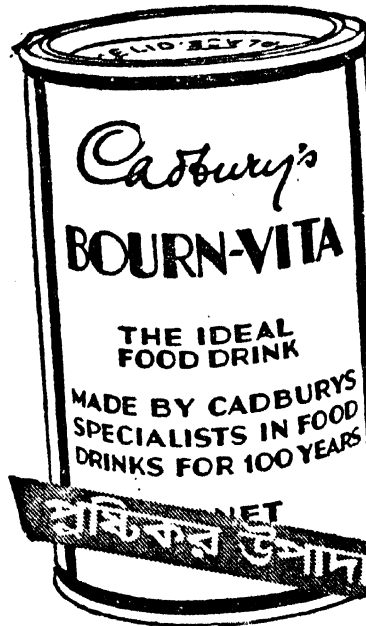
টিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, ছুটে এসে মুখ লুকোবে অমরেশের বুকে, চোখের জলে একাকার করে দেবে। কিন্তু মা টিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

'তুমি চিনতে পারছো না আমায়?' অমরেশ জিজ্ঞাসা করলো। এবার মা টিন অমরেশের একটা হাত টেনে নিলো নিজের হাতে। আস্তে বললো, 'তোমাকে চিনবো না, সে কি হতে পারে। তোমাকে ঠিক চিনেছি।'

এবারেও ঘাবড়ে গেল অমরেশ। সত্যিই কি তাকে চিনতে পেরেছে নাকি মা টিন। পরিচয় পেয়েছে খোলসছাড়া আসল রূপের?

'আমায় ক্ষমা করো মা টিন' অমরেশ কণ্ঠে ব্যাকুলতার সুর আনলো 'তোমায় হারিয়ে এ কবছর আমার যা অবস্থা হয়েছিলো বলবার নয়। এখানে এসেই তন্ন তন্ন ক'রে তোমায় খুঁজেছি। বা ছিটের কাছে খবর পেয়ে ছুটে এসেছি এখানে।'

মা টিন নিরুত্তর।

অমরেশ আবার শুরু করলো, 'সে রাত্রে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম মা টিন। দু'দিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে যখন পথের খোঁজ পেলাম তখন তুমি হারিয়ে গেছ। পাগলের মতন যাকে সামনে পেয়েছি, তাকে জিজ্ঞাসা করেছি তোমার কথা।' পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চোখে চাপা দিতে গিয়েই অমরেশের মনে হলো তার প্রয়োজন হবে না, এই অন্ধকারে মা টিনের কিছু দেখতে পাবার কথা নয়।

'আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেই গরুর গাড়ীতেই ফিরে এসেছিলাম।' শান্ত মা টিনের গলার আওয়াজ। আবেগের সামান্য আভাসও নেই।

শেষ চেষ্টা করলো অমরেশ, 'আমি তোমাকে এবারে আপনার করে নিতে চাই মা টিন। আর তো কোন বাধা নেই।' ঝুঁকে পড়ে মা টিনের একটা হাত আন্দাজে নিজের হাতে তুলে নিলো।

'তা হয় না অমরেশ' আশ্চর্য কঠিন মা টিনের গলার আওয়াজ।

'বিয়ে আমাদের হ'তে পারে না।'

এই ধরণের কিছু অমরেশ আগে থেকেই আঁচ করেছিলো, তার জন্য তৈরীও সে হ'য়ে এসেছিলো।

'কেন মা টিন, আজ তোমার বাড়ী হ'য়েছে, অনেক টাকা হয়েছে, তার জোরেই কি পুরোনো প্রেমকে এমনি করে মুছে ফেলবে তুমি?'

আস্তে হেসে উঠলো মা টিন, 'এ বাড়ী আমার নয় অমরেশ। এক গুজরাটি ভদ্রলোক গোলমালের সময় ফেলে পালিয়ে ছিলেন, আমিই তাঁর কথামত বাড়ীটা আগলাচ্ছি শুধু। আর টাকা—' মা টিন আবার হাসলো।

অমরেশ বুঝতে পারলো এবার। ঠিক আগের মত অত সহজ হবে না এবারের খেলা।

জীবনকে চিনেছে মা টিন। গোটা লড়াই ওরও জীবনের ওপর দিয়ে গিয়েছে। অমরেশের চেয়েও অনেক জাঁদরেল লোক যাওয়া আসা করেছে ওর জীবনে। অমরেশের মতন পুঁটি-মাছের সংগে নিজেকে জড়াবার মতন সময় ওর নেই।

অমরেশ একটা নিঃশ্বাস ফেললো। ইচ্ছাকৃত নয়, সত্যিকারের নিঃশ্বাস। বুকটা মুচড়ে যেন বেরিয়ে এলো। এতদূর এগিয়ে ফিরেই যেতে হবে তাকে। অন্ততঃ পুরোনো ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে শ-পাঁচেক টাকাও যদি আদায় করা যেত। দেশের রান্নাঘরের যা অবস্থা সে দেখে এসেছে, এবারের বর্ষায় টিকবে, এ আশা খুবই কম।

অমরেশ সামলে নিলো নিজেকে, 'আমাদের আগের সম্পর্ক কি ফিরে আসতে পারে না মা টিন। শুধু তুমি আর আমি টিনের চালাঘরেই না হয় থাকবো পাশাপাশি?' আবেগে তরল হয়ে উঠলো অমরেশের গলা।

'তা হয় না অমরেশ। আমার স্বরূপের পরিচয় পেলে তুমি নিজেই যাবে পিছিয়ে' মা টিন হাতটা আলতোভাবে ছাড়িয়ে নিলো। অন্ধকারে অমরেশের কানে যেন নিঃশ্বাসেরও শব্দ গেলো।

আশ্বস্ত হ'ল অমরেশ। এই কথা। এতেই মুষড়ে পড়েছে মা টিন। লজ্জাবতী লতার মতন গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। ওর দেহের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে, তাতেই বুঝি পিছপা হবে অমরেশ। ভাববে একটা অসতীকে নিয়ে কেমন করে নীড় বাঁধা চলবে? অমরেশ চেয়ারে জুত-সই হ'য়ে বসলো। না বিশেষ বদলাইনি মা টিন। আগের মতনই সরল আর সহজ রয়েছে। খুব বেশী খেলিয়ে তোলবার প্রয়োজন হবে না। এক টানেই ডাঙায় তোলা চলবে।

অমরেশ একেবারে অন্য কথা পাড়লো, 'কিন্তু এই অন্ধকার ঘরে বসে আছো যে চুপচাপ। না হয় মোমবাতিই জ্বালো একটা। অন্ধকারে কি জমে কথাবার্তা।'

মা টিন হাসলো, 'মোমবাতির পয়সা নেই একথা বোধ হয় বিশ্বাস করবে না, কাজেই কবিত্ব করেই বলছি, একটু পরেই জ্যোৎস্না উঠবে। সারা ঘর ভেসে যাবে চাঁদের আলোয়।' অমরেশ একটু নড়ে চড়ে বসলো। কেমন যেন বাঁকা বাঁকা কথা, মানে বুঝতে হাঁফিয়ে উঠতে হয়। অমরেশকে তাড়াবার মতলব নাকি? আরো ঘন হ'য়ে অমরেশ বসলো। একটা হাত দিয়ে মা টিনকে টেনে নিলো নিজের কাছে। একটু শক্ত হ'য়েই মা টিন ছেড়ে দিলো নিজেকে। চুলের গোছা ভেঙে অমরেশের কাঁধে বুকে ছড়িয়ে পড়লো। মা টিনের একটা হাত অমরেশ নিজের হাতে আঁকড়ে রইলো।

চাঁদ উঠতে শুরু হ'য়েছে। কাঠের মিলের পাশে ঝাঁকড়া বটগাছটার পেছন থেকে আলোর আভাষ পাওয়া গেলো। খোলা জানলা দিয়ে এখনি ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে চাঁদের আলো। অমরেশ মনে মনে হিসাব শুরু করলো এ কবছরে কম ক'রেও কত টাকা মা টিন জমিয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় বিয়ের একটা ভড়ং করতেই বা বাধাটা কি। এদেশে চাকরীর খাতিরে অন্ততঃ আরো বছর পনেরো কুড়ি হয়ত থাকতেই হবে তাকে। বর্মী বিয়ে করলে কাজ কর্মেরও সুবিধা হবে, ইজ্জৎ বাড়বে এ দেশের চোখে। এদেশের মেয়ে নিয়ে এদেশের মাটিতেই ঘর তুললে চাকরীর উন্নতি অবধারিত। আর মাঝে মাঝে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনী গেয়ে মা টিনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের কায়দাটা তো ওর ভালোই জানা আছে।

চাঁদের আলোয় ঘর ভরে গেলো। এবার আর কিছু আবছা নয়—দিনের আলোর মতন স্পষ্ট। হাত দিয়ে মা টিনের চুলের রাশ অমরেশ সরিয়ে দিলো। সাগ্রহে দুটো হাত দিয়ে মা টিনের মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়েই চমকে উঠলো। মাথাটা ভীষণভাবে দুলে উঠলো, চেয়ারের শক্ত হাতলটা আঁকড়ে ধরে টাল সামলালো কোন রকমে।

বীভৎস মুখ। স্প্লিনটারের আঁচড়ে সারা মুখটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। বাঁ দিকের চোখটা সম্পূর্ণ বুজে গেছে, মুখের চামড়াগুলো পুড়ে যেন ঝলসে গিয়েছে। নিচের ঠোঁটের অনেকখানি নেই। অমরেশ চেয়ে চেয়ে দেখলো শুধু দেশের ওপর দিয়েই নয়—মানুষের ওপর দিয়েও, গোটা লড়াইটা গিয়েছে।

মা টিন আস্তে কথা বললো, 'তুমি চলে যাবার পর গরুর গাড়ীতে ফেরবার সময়ই বোমায় এই অবস্থা হয়। লোকেরা ভয় পাবে ব'লে দিনের আলোতে আমি রাস্তাতেই বেরোই না। অন্ধকার রাতে টিনের থালা নিয়ে আশে পাশের বাড়ী থেকে চেয়ে চিন্তে দুমুঠো ভাত জোগাড় করি। তাও সবদিন পাই না অমরেশ। মাঝে মাঝে উপোসও দিতে হয়।' মা টিন বীভৎসভাবে হাসলো।

সব কথা ভালো করে অমরেশের কানে গেলো না। চোখের সামনে তরল অন্ধকারের স্রোত। মনে হ'লো সব কিছু দুলে দুলে উঠলো। আস্তে মা টিনের মুখটা সরিয়ে দিলো। হঠাৎ গলার ভিতরটা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠলো। একটু জল পেলে হ'তো ভিজিয়ে নিতো গলাটা। কিংবা সেদিনের মতন জলতেষ্টার ভাণ করে পাহাড়ী ঝর্ণার খোঁজে ঢালু জমি বেয়ে নেমে যাওয়া যায় না? সন্তর্পণে নেমে গিয়ে পাইন আর বুনো বাঁশঝাড়ের পিছনে অনন্তকালের জন্য যায় না আত্মগোপন করা?

টাট্‌কা জল একবার মাত্র ফুটিয়ে ব্যবহার করবেন।
১
চা ভেজাবার আগে পট্‌টা গরম করে নেবেন্।
২
মাথা-পিছু এক চামচ আর ঐ সঙ্গে আর এক চামচ বেশি চা নেবেন।
৩
চা-টা তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ভিজ্‌তে দেবেন।
৪
কাপে চা ঢালার পর দুধ চিনি মেশাবেন।
৫
ভালো চা তৈরির ৫টি সহজ নিয়ম
চা
ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও তামিল ভাষায় "চা তৈরির খুঁটিনাটি" নামে একখানা পুস্তিকা, ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট একস্‌প্যান্‌শন্ বোর্ড, ৩১ নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা, এই ঠিকানায় ভাষার উল্লেখ করে চিঠি লিখলেই বিনামূল্যে পাঠানো হবে।
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্‌প্যান্‌শন্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
ITX 313

"ক্ষুরস্য ধারা"—

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

সুজান বলে চলল, "আঃ সে যে কি কষ্টের ভিতর পড়লাম, ভারী দুঃসময় ভাগ্যক্রমে আমার অনেক ভালো বন্ধু ছিল। কিন্তু জানেন ত আর্টিস্টরা কি, তাদের পক্ষে কোনোক্রমে সব দিক বজায় রাখা কঠিন। আমি ত' কোনদিনই তেমন সুন্দরী ছিলাম না, সামান্য কিছু বস্তু অবশ্য ছিল, তবে আর ত' আমার কুড়ি বছর বয়স ছিল না। তখন একজন 'কিউবিস্ট' শিল্পীর কাছে গেলাম, আগেও তার কাছে ছিলাম। ইতিমধ্যে তার বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, কিউবিজম ছেড়ে দিয়ে সে অতি-প্রাকৃত ভঙ্গীর সুর-রিয়ালিস্ট' হয়েছে। সে ভাবলে আমাকে হয়ত তার প্রয়োজনে লাগবে, ত ছাড়া সে নিঃসঙ্গ। আমার আহার ও আবাসের সে ভার নিতে রাজী হল, আর আমিও সানন্দে তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।"

ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সুজান এই লোকটির সঙ্গেই রয়ে গেল। ব্যবসায়ীটিকে এক বন্ধু স্টুডিয়োতে এনেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে তিনি হয়ত ভূতপূর্ব কিউবিস্টের দু'একটি ছবি কিনতে পারেন—এই আশায়। আর সুজান তাঁকে ছবি কিনতে প্রলুব্ধ করার জন্য যতদূর সম্ভব নিজেকে মনোহর করে তুলল এ কাজে সে পটু ছিল। তিনি অবশ্য তখনই স্থির করতে পারলেন না ছবি নেবেন কিনা—তবে পরে আবার আসবেন ছবি দেখতে এই কথা বলে গেলেন। পক্ষকাল পরে আবার এলেন, এইবারে সুজানের ধারণা হল শিল্পকলার চাইতে তাকে দেখতেই তিনি এসেছেন। এবারও যখন ছবি না কিনেই তিনি চলে গেলেন তখন অনাবশ্যক উষ্ণতার সঙ্গে করমর্দন করলেন। পরদিন যখন সুজান দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিষপত্র কিনতে বাজারে বেরিয়েছিল তখন যে বন্ধুটি ব্যবসায়ীকে এনেছিলেন তিনি ও'কে এক পাশে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, ব্যবসায়ীটির সুজানকে ভালো লেগেছে, উনি পরে আবার যখন প্যারীতে আসবেন তখন একদিন কি তাঁর সঙ্গে ডিনারে খেতে যাওয়ায় সুজানের সুবিধা হবে কেন না তাঁর একটা প্রস্তাবও আছে।

সুজান জানতে চাইল: "আমার মধ্যে কি এমন দেখলেন আপনার মনে হয়?"

"উনি একজন সৌখীন শিল্পরসিক ব্যক্তি, তোমার অনেক পোর্টরেট দেখেছেন তোমাকে তাই মনে ধরেছে, উনি হলেন মফঃস্বলের ব্যবসাদার তুমি ও'র কাছে প্যারী শিল্প, রোমান্স সব কিছুরই প্রতিনিধি, ও'র দেশে লিলিতে বসে ত' আর তা পাওয়া যাবে না।"

বুদ্ধিমতীর মতো সুজান জানতে চাইল—"ও'র অর্থ সম্বল আছে?"

"প্র-চু-র।"

"বেশ একত্রে ডিনার খাওয়া যাবে, কি বলার আছে শুনতে আর দোষ কি।"

ভদ্রলোক ওকে 'ম্যাকসিমে' ডিনার খাওয়ার জন্য নিয়ে গেলেন সুজানের বেশ মনে লাগল; সে বেশ শান্ত ধরণের পোষাক পরে ছিল তাই আশে পাশের মেয়েদের পানে তাকিয়ে ওর মনে হ'ল—তাকে বেশ বিবাহিতা সম্ভ্রান্ত মহিলার মত দেখাচ্ছে। ভদ্রলোক এক বোতল স্যামপেনের অর্ডার দিলেন আর তাতে সুজানের মনে হল লোকটি ভদ্র। কফির সময় ভদ্রলোক তাঁর প্রস্তাবটি পাড়লেন। সুজান বুঝলো প্রস্তাবটি মনোরম। তিনি বল্লেন পক্ষান্তে একবার বোর্ডের মিটিং-এ যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে প্যারী আসতে হয়। একা ডিনার খেতে ভালো লাগে না। তার মত অবস্থার লোক বিবাহিত এবং দুটি সন্তানের জনকের পক্ষে নাইট ক্লাবে যাওয়াও অশোভন। ও'দের উভয়ের সেই বন্ধুটি সুজান সম্পর্কে সকল কথা বলেছেন। আর তিনিও জানেন যে ও রুচি ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন স্ত্রীলোক। উনি ত' আর এখন তরুণ ন'ন, তাই একটা উদ্দাম প্রকৃতি যুবতীকে নিয়ে মাতামাতি করতেও উনি ইচ্ছুক ন'ন। তিনি আধুনিক ঢঙের ছবির একজন সংগ্রাহক, সুজানের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাঁর কাজের সহায়তা হবে। তারপর টাকাকড়ির কথা, তিনি ওর জন্য একটা বাসাবাড়ি সাজিয়ে দিতে প্রস্তুত, তা ছাড়া দুহাজার ফ্রাঁ মাসিক আয়ের বরাদ্দ করে দিতে পারেন। এর বিনিময়ে তিনি পক্ষান্তে একটি রাত্রি সুজানের সঙ্গে কাটাতে চান। সুজান তার জীবনে এত টাকা খরচ করার সৌভাগ্য পায়নি, এত টাকা নিয়ে সে হিসাব করে দেখল, আজকালকার সমাজের ও ফ্যাসনের ধরণে পোষাক আসাক করে থাকলেও তার মেয়ের জন্য কিছু কিছু জমাতে পারবে আর দুর্দিনের জন্যও কিছু সরিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু একটি মুহূর্ত সে ইতঃস্তত করে। তার নিজের ভাষায় সে চিরদিনই 'আঁকার ব্যাপারে'ই রয়েছে, আর এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে তার অর্থ হবে ও একজন সাধারণ ব্যবসায়ীর রক্ষিতা।

তিনি বল্লেন:

এ প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করতেও পার প্রত্যাখ্যান করতেও পার।"

লোকটি ওর চোখে তেমন বেয়াড়া লাগল না, তা ছাড়া তাঁর জামার বোতামের ঘরে 'লিজন দ অনারের' চিহ্ন ই বোঝা গেল উনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সুজান হাসল।

সে জবাব দিল—আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

—আট—

সুজান যদিচ বরাবরই মনতমার্তরে থাকত তবু সে স্থির করল অতীতের সংযোগ ছিন্ন করা উচিত, তাই সে বুলভার্দের ঠিক পাশেই মনতপারনাসেতে একটা বাসা নিল। দুটি ঘর, একটি ছোট রান্নাঘর আর একটি বাথরুম; ছতলার ওপর বাসা—তবে বাড়িতে একটা লিফট ছিল। তার কাছে একটা বাথরুম আর লিফট (যদিও তার গতি শামুকের মত এবং পায়ে হেঁটে তার চেয়ে দ্রুত ওঠা যায়) শুধু বিলাসিতার পরিচায়ক নয়—রীতিমত একটা স্টাইল।

সুজানের সঙ্গে মিলনের প্রথম কয়েক মাস মসিয়ে একিল গভেন (ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির নাম) তাঁর পক্ষান্তিক প্যারী আগমনকালে একটা হোটেলে এসে উঠতেন এবং তাঁর শৃঙ্গারাত্মক বাসনার প্রয়োজনানুসারে যতটুকু সময় দরকার সেই কালটুকুই সুজানের বাসায় কাটিয়ে রাতের বাকী অংশ নিজের হোটেলের শয়নকক্ষে এসে অতিবাহন করে প্রাতে তার ব্যবসা কার্যের উদ্দেশে এবং শান্ত পারিবারিক জীবন যাপনের জন্য ফিরতি ট্রেণ ধরতেন, এই সময় সুজান বুঝিয়ে দিল তিনি বৃথাই অর্থ নষ্ট করছেন, উনি যদি সকাল পর্যন্ত তার

বাসাতেই থাকেন তাহলে আরাম ও অর্থ উভয় দিক থেকেই তিনি লাভবান হ'বেন। এই যুক্তির সারবত্তা তিনি বুঝলেন। তাঁর সুখ-সুবিধা সম্পর্কে সুজানের এই চিন্তাশীলতায় তিনি বিমোহিত হলেন—সত্যই ত হিমশীতল শীতের রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে আসার কোনো অর্থ নেই—আর বৃথা অর্থব্যয় সম্পর্কে সুজানের অনিচ্ছাও তিনি অনুমোদন করলেন। সুচরিতা স্ত্রীলোকই শুধু নিজের অর্থ নয় তার প্রেমিকের অর্থেরও হিসাব রাখে।

মঁসিয়ে একিলের সন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। সাধারণতঃ ওরা মনতপারনেশের উচ্চাংগের রেস্তোরায় ডিনার খেত, কিন্তু মাঝে মাঝে সুজান তাঁর জন্য বাসাতেই ডিনারের ব্যবস্থা রাখত। সে এমন সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করত যা মঁসিয়ের অত্যন্ত পছন্দ হত। উষ্ণ সন্ধ্যায় হাতকাটা সার্ট পরে উনি ডিনার খেতেন আর অতিশয় উদ্দাম ও খেয়ালী হয়ে উঠতেন। ছবি কেনার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল, কিন্তু সুজান তাঁকে কিছুতেই নিজের মনোমত না হলে ছবি কিনতে দিত না, উনিও ক্রমশঃ সুজানের বিচার শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। সুজান কখনও দালালের সংগে সংস্পর্শ রাখত না, সোজা ওঁকে ষ্টুডিয়োতে শিল্পীদের কাছে নিয়ে যেত, তার ফলে উনি যা দিতে হত তার অর্ধমূল্যে ছবি কিনতে পেতেন। উনি জানতেন সুজান কিছু টাকা সরিয়ে রাখছে, আর সে যখন জানালো বছর বছর সে স্বগ্রামে কিছু কিছু জমি কিনছে, তখন মঁসিয়ে অন্তরে গর্ববোধ করলেন। তিনি জানতেন যার শিরায় ফরাসী রক্ত প্রবাহিত হয় তারই প্রাণে জমির মালিক হওয়ার বাসনা থাকে, সুজানেরও চরিত্রে যে সেই বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাতে তিনি প্রীত হলেন।

এদিকে সুজানের দিক থেকে, সেও সন্তুষ্ট ছিল। সে ওঁর প্রতি একনিষ্ঠ না হলেও অবিশ্বাসিনী ছিল না; অর্থাৎ এক কথায় সে আর কারো সংগে পাকাপাকিভাবে সংস্পর্শ না রাখলেও যদি কেউ তার শয্যায় অংশগ্রহণের বাসনা জানাতো সে তাকে বিফল মনোরথ করত না। কিন্তু কিছুতেই সে তাকে নিশা-যাপন করতে দিত না। সে মনে করত যে, বিত্তশালী মানুষটি তাকে এই সম্ভ্রান্ত ও নিশ্চিন্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই সৌভাগ্যে শুধু তারই অধিকার।

সুজান যখন আমার পরিচিত এক চিত্র-শিল্পীর রক্ষিতা ছিল তখন ওর সংগে আমার পরিচয় হয়, আমি মাঝে মাঝে ও যখন 'পোজ' দিয়ে থাকত, তখন ষ্টুডিয়োতে গিয়ে বসে থাকতাম; আমার অনিয়মিত ভ্রমণের পথে সুবিধামত ওর সংগে দেখা করতাম, কিন্তু ও যতদিন না মনতপারনসের বাসায় উঠে এসেছিল ততদিন আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠিনি।

এই সময় জানা গেল মঁসিয়ে একিল (এই ভাবেই তাঁর নাম সুজান উল্লেখ করত ও এই নামেই তাঁকে ডাকত) আমার দু'একখানি গ্রন্থের অনুবাদ পড়েছেন এক সন্ধ্যায় তিনি আমাকে এক রেস্তোরায় ডিনার খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। লোকটি বেঁটে খাটো, সুজানের চেয়ে মাথায় কিছু খাটো মাথায় লোহধূসর চুল আর সুন্দর গোঁফ। লোকটি একটু মোটা ধরণের, ভুঁড়ি আছে, তবে তাতে শুধু তাঁর শাঁসালো অবস্থারই আভাষ পাওয়া যায়। বেঁটে মোটা লোকের ভঙ্গীতে তিনি হাঁটেন, স্পষ্টই বোঝা যায় লোকটির নিজের
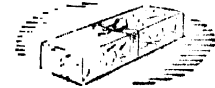
বিষয়ে অতৃপ্তি নেই। আমাকে তিনি চমৎকার ডিনারে আপ্যায়িত করলেন, ভারী নম্র ও ভদ্র লোক। আমি যে সুজানের বন্ধু, এতে তিনি খুসী কেননা তিনি একদৃষ্টিতেই বুঝেছেন আমি একজন 'Comme il fant'—অর্থাৎ ভদ্রলোক, তাই আমি যদি সুজানকে একটু-আধটু দেখি তাহলে তিনি সুখী হন। তাঁর ব্যবসার ব্যাপারে অবশ্য লিলিতেই দুঃখের বিষয় তাঁকে আটক থাকতে হয় আর বেচারী সুজানকে বেশীর ভাগ একা থাকতে হয়, সে যে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আছে এইকথা ভেবে তিনি স্বস্তি পাবেন। তিনি ব্যবসায়ী বটে তবে চিরদিনই কলাবিদ্‌দের শ্রদ্ধা করে আসছেন।

"জানেন মশাই, শিল্প ও সাহিত্য চিরদিনই ফরাসী দেশের যমজ গৌরব, অবশ্য তার সংগে সামরিক শক্তিও যুক্ত। আর পশম উৎপাদক ব্যবসায়ী হিসাবে আমি বিনা দ্বিধায় বলছি—শিল্পী ও সাহিত্যিক একজন জেনারেল বা রাষ্ট্র নেতার সমপদস্থ।"

এর চাইতে ভালো কথা কেউ বলতে পারে না।

সুজান গৃহস্থালী কাজের জন্য একজন দাসী রাখতে নারাজ, অংশতঃ অর্থনৈতিক কারণে আর যে কোনো কারণেই (হেতুও তারই ভালো জানা আছে) হোক অপরে যে তার ব্যাপারে এসে মাথা ঢোকাবে এ সে চায় না। সেই ছোট্ট বাসাটি সে তৎকালীন রীতি অনুসারে অতি-আধুনিক ভংগীতে সাজিয়ে রাখত, সবই পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, আর নিজের গাত্রাবাস নিজেই করে নিত। কিন্তু তবুও এখন আর ত 'পোজ' দিতে হয় না, তাই তার সময় যেন কাটে না, কারণ সুজান অতি কর্মকুশলা, তারপর তার মাথায় ঢুকলো এতগুলি শিল্পীর সংগে এতদিন কাটিয়ে ও নিজেই বা কেন ছবি আঁকতে পারবে না। সে কাম্বিস, ব্রাস ও পেণ্ট কিনে তখনই ছবি আঁকতে বসল, মাঝে মাঝে তাকে ডিনারের নিমন্ত্রণে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটু সকাল করে গিয়ে দেখি ও সেমিজ-সদৃশ জামা পরে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। গর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন সংক্ষেপে শ্রেণীগত বিবর্তনের ভিতর কাটায়, সুজানও তেমনই তার সকল প্রেমিকের অঙ্কণ-রীতির পুনরাবৃত্তি করে। নিসর্গ শিল্পীর মত সে দৃশ্যপট আঁকে কিউবিস্টের ধরণে বিচিত্র চিত্র অবার ছবিওলা পোস্টকার্ডের সাহায্যে স্কাণ্ডানেভীয়ের মত নদীর ঘাটে নোঙর করা নৌকাও আঁকে। ছবি সে আঁকতে পারে না, কিন্তু রঙের জ্ঞান তার অপূর্ব, আর তার ছবি তেমন ভালো না হলেও ছবি এঁকে সে প্রচুর আনন্দ পেত।

মঁসিয়ে একিন তাকে উৎসাহিত করতেন। তাঁর রক্ষিতা যে একজন শিল্পী হয়ে উঠছে এতে তিনি বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করলেন। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে সুজান শরৎকালীন প্রদর্শনীতে একখানি ছবি পাঠালো—আর সেটি টাঙানো হতে উভয়েই বিশেষ গর্বানুভব করল। তিনি ওকে একটি সদুপদেশ দিলেন।

বল্লেন, "প্রিয়ে, পুরুষের মত আঁকতে চেষ্টা কোরো না—স্ত্রীলোকের মতই আঁকো, খুব বলিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করব না, শুধু সৌন্দর্য্যেই তৃপ্ত থাক, আর সাধুতার প্রয়োজন, ব্যবসায়ে অনেক সময় অন্য পন্থায় সাফল্য আসে—কিন্তু শিল্পের ব্যাপারে সততাই একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথ।"

যে সময়ের কথা লিখছি তখন উভয়েরই পারস্পরিক প্রীতির সংযোগের প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে।

সুজান বললে: "আমার মনে উনি তেমন শিহরণ আনেন না সত্যি, তবে উনি বুদ্ধিমান ও পদস্থ ব্যক্তি। আমিও এমন এক বয়সে পেঁছেচি যে আমার অবস্থাও চিন্তা করতে হয়।

সুজান সংবেদনশীল ও সমজদার, মঁসিয়ে একিনের তার বিচারশক্তির ওপর উচ্চ ধারণা ছিল। উনি যখন তাঁর ব্যবসা বা পারিবারিক বৃত্তান্ত ওর কাছে বলতেন তখন সে তা সাগ্রহে শুনত। ওঁর মেয়ে যখন পরীক্ষায় ফেল করল তখন সুজানও তাঁর সংগে শোক-প্রকাশ করে। আবার যখন একজন বিত্তবতী মেয়ের সংগে তাঁর ছেলের বিবাহের কথা স্থির হল তখন আনন্দ জ্ঞাপন করল। মঁসিয়ে স্বয়ং ব্যবসাক্ষেত্রে ওঁদেরই সমপর্যায়ের একজনের একমাত্র মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন এবং তদ্দ্বারা উভয়পক্ষেরই সকল দিক থেকে প্রচুর সুবিধা হয়েছিল। তাই তাঁর ছেলেও এখন সফল বিবাহ হিসাবে অর্থ ও সম্পদশালী মেয়েকেই নির্বাচিত করে বুদ্ধির পরিচয় দিল তখন তা আনন্দের ব্যাপার হ'ল। তিনি সুজানকে বলেছিলেন, তাঁর মেয়ের বিবাহও অভিজাত ঘরেই তিনি দিতে চান।

সুজান বলেছিল: "কেন হবে না? ওর সম্পদ ত' কম নয়"। মঁসিয়ে একিন সুজানের মেয়েকে সুশিক্ষার জন্য কনভেণ্টে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন যথাসময়ে টাইপিস্ট বা স্টেনোগ্রাফী শিক্ষার ব্যয় তিনিই বহন করবেন।

সুজান আমাকে বললে: "বড় হলে ও সুন্দরী হবে—কিন্তু শিক্ষা পেলে বা টাইপ ঠুকলে ত' সে সৌন্দর্য ব্যাহত হবে না—ও এতই ছোট, এখন অবশ্য ঠিক বলা যায় না, তবে মনে হয় বড় হলে ওর কোনো প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট থাকবে না।"

সুজান কথাগুলি বলতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা-বোধ করছিল। আমার বুদ্ধির ওপর কথাটির নিগূঢ়ার্থ বোঝার ভার ও ছেড়ে দিয়েছিল। আমিও ঠিকমতই বুঝে নিলাম।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিম বঙ্গের অর্থকথা

শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ

কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষী

এইবারে হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীর কথা আলোচনা করিয়াই প্রদেশের জীবজন্তুর আলোচনা শেষ করা যাইতে পারে। ১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে ৫০ লক্ষ ৩৭ হাজারের বেশী মুরগী ছিল। ইহার ভিতরে মুরগীর (স্ত্রী) সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ ৮৭ হাজার, মোরগের সংখ্যা ৮ লক্ষ ১৭ হাজার এবং মুরগী শাবকের সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার। প্রদেশের জেলাসমূহের ভিতরে ২৪ পরগনায় মুরগীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক—প্রায় ৮ লক্ষ ৬০ হাজার হইবে। মুর্শিদাবাদ জিলায় মুরগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৩ হাজারের বেশী এবং মেদিনীপুর জিলায় ৫ লক্ষ ১৯ হাজারের বেশী হইবে। হাওড়া জিলায় মুরগীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অল্প,—১ লক্ষ ১৬ হাজারেরও কম হইবে। ১৯৪০ সালে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে হাঁসের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার। ইহার ভিতরে স্ত্রী হাঁসের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার, পুরুষ হাঁসের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ ৩১ হাজার এবং হাঁসের বাচ্চার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার হইবে। মুরগীর ন্যায় হাঁসের সংখ্যাও ২৪ পরগণা জিলায় সর্বাপেক্ষা বেশী—৪ লক্ষ ৬৪ হাজারের বেশী হইবে; হাঁসের সংখ্যা দার্জিলিং জিলায় সর্বাপেক্ষা কম—৬ হাজার ৭ শতের সামান্য বেশী হইবে।[1]

পশ্চিম বঙ্গ মৎস্য

বাঙলাদেশের নদী নালা খাল বিল পুষ্করিণীতে বিভিন্ন প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। অবিভক্ত বাঙলায় মৎস্য শিল্প গড়িয়া তুলিবার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী চেষ্টার অভাবে এবং সাধারণের অজ্ঞতার ফলে এই শিল্প আধুনিক শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙলা বিভক্ত হইবার ফলে পশ্চিম বঙ্গের মৎস্য সম্পদ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। পশ্চিম বাঙলায় প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার মণ টাটকা মাছ পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মণ, কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে ৫০ হাজার মণ, নৌকাযোগে আনীত 'জিয়ল' মাছ ৫০ হাজার মণ, মেদিনীপুর হাওড়া হইতে কলিকাতায় আনীত ২৫ হাজার মণ এবং পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে ৬ লক্ষ ৩০½ হাজার মণ মাছ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চল হইতে ২ লক্ষ ৬০ হাজার মণ শুটকী মাছ এবং হাওড়া মেদিনীপুর হইতে ৪ হাজার মণ শুটকী মাছ পাওয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে, সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে মোট ১২ লক্ষ ১৫½ হাজার মণ মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু শুটকী মাছ পশ্চিম বাঙলার অধিবাসীরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে না বলিলেই চলে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে খাদ্য-হিসাবে মৎস্যের পরিমাণ ১০ লক্ষ ৫৫½ হাজার মণ ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসংগত।

প্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানে কি পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যাইতেছে তাহারও একটি হিসাব দেওয়া সম্ভবপর। পূর্ণবয়স্ক সমর্থ ব্যক্তির মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজন যদি ½ পাউন্ড ধরা হয়, তাহা হইলে প্রদেশের প্রয়োজন মোটামুটিভাবে ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার মণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই প্রদেশে বর্তমানে যে মৎস্য পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ঘাটতির পরিমাণ প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ ৬২½ হাজার মণ হইবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে অবশ্য বর্তমানে বিহার হইতে ২০ হাজার মণ এবং উড়িষ্যা হইতে ৭০ হাজার মণ মৎস্য আমদানী করা হয়। তাহা ছাড়া, গোয়ালন্দ সিরাজগঞ্জ রাজসাহী হইতেও প্রতি বৎসর ২ লক্ষ ২০ হাজার মণ মৎস্য পশ্চিমবঙ্গে আমদানী করা হয়। এই সকল আমদানী ধরিলে প্রদেশে ঘাটতির পরিমাণ ৯ লক্ষ ৫২½ হাজার মণের বেশী হইবে না। কিন্তু গোয়ালন্দ সিরাজগঞ্জ রাজসাহী অর্থাৎ পূর্ব-বাঙলা হইতে যে মৎস্য আমদানী করা হইত তাহা বাঙলা বিভক্ত হইবার পরে পশ্চিম বঙ্গে আর পাওয়া যাইবে না, এইরূপ ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসংগত। কাজেই আমদানী মৎস্য হিসাব ধরিলেও প্রয়োজন অপেক্ষা প্রদেশে মৎস্য সরবরাহ অন্ততঃপক্ষে ৭ লক্ষ ৩২½ হাজার মণ কম হইবে, ইহা নিঃসন্দেহই বলা চলে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বিল জলাভূমি পুষ্করিণীতে মৎস্য চাষের বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ রহিয়াছে। তাহা বিভিন্ন জিলার জলসম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময়ে বলা হইয়াছে। প্রধানতঃ অবহেলা এবং অজ্ঞতার জন্যই বিভিন্ন জিলায় এই সকল বিল জলাভূমিকে মৎস্য চাষের কার্যে ব্যবহার করা হইতেছে না। পশ্চিম-বাঙলা সরকার সম্প্রতি প্রদেশে মৎস্য চাষ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন বটে; কিন্তু এই প্রচেষ্টাকে আরও ব্যাপক, কার্যকরী এবং ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

প্রদেশের অরণ্যসম্পদ

পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের ১৬ লক্ষ ৯৭ হাজার একরের বেশী জমি জুড়িয়া বনাঞ্চল রহিয়াছে। যে সকল বনভূমি ইজারা দেওয়া হইয়াছে এবং যে সকল অঞ্চলে ইতিমধ্যে আবাদ শুরু হইয়াছে, এইরূপ বনভূমি ধরিলে পশ্চিম বঙ্গের বনাঞ্চলের আয়তন প্রায় ২৪ লক্ষ ৭০ হাজার একর হইবে। ১৯৪৪ সালে পশ্চিম বঙ্গের এই সকল বনভূমিকে নিম্নরূপে ভাগ করা হইয়াছে: ১৬ লক্ষ ৮২ হাজার একর "রিজার্ভড্", ১২ হাজার ৩ শত একর অন্যান্য; ১৭৩ একর সংরক্ষিত বা "প্রোটেকটেড", ৩৭০ একর অন্যান্যভাবে সংরক্ষিত, ২ হাজার ৩ শত একর খাস; ৭ লক্ষ ৭২ হাজার একর ইজারাধীন। এই সকল বনাঞ্চলের ভিতরে যে সকল স্থানে ইতিমধ্যে বসবাস শুরু হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর হইবে। প্রদেশের এই ২৪ লক্ষ ৭০ হাজার একর (কিংবা ৩ হাজার ৮ শত বর্গমাইল) পরিমিত বনাঞ্চলকে তত্ত্বাবধান এবং ব্যবহারের দিক হইতেও শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রদেশে অরণ্য তত্ত্বাবধানের যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ৫৭৮ বর্গমাইল পরিমিত বনাঞ্চলকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে: ৫৭৪ বর্গমাইল পরিমিত বনাঞ্চলকে অগ্নি হইতে কার্যত রক্ষা করা হইতেছে; ২৯০২ বর্গমাইল পরিমিত বনাঞ্চল পশুচারণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ১৮৭ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলে পশুচারণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য অঞ্চলে যে সকল কাষ্ঠ পাওয়া যায়, তাহাদিগকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: জ্বালানী কাষ্ঠ এবং গৃহসামগ্রী হিসাবে ব্যবহার্য কাষ্ঠ। ১৯৪৩-৪৪ সালে সরকারী বিবরণীতে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চল হইতে প্রায় ২১ হাজার ঘন ফুট জ্বালানী কাষ্ঠ এবং প্রায় ৬ হাজার ঘন ফুট ব্যবহার্য কাষ্ঠ পাওয়া গিয়াছে। বনাঞ্চলে আয়-ব্যয়ের যে সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৯৪৩-৪৪ সালে সমগ্র বনাঞ্চল হইতে মোট

1 Statistical Abstract, West Bengal. Compiled from Season and Crop Report of Bengal.

৩০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা আয় হইয়াছে এবং ২০ লক্ষ ১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ সেই বৎসর খরচা বাদে ১০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা আয় হইয়াছে।

প্রদেশের জিলাসমূহের ভিতরে ২৪ পরগণায় অরণ্যসম্পদ সর্বাপেক্ষা বেশী; ২৪-পরগণার পরে যথাক্রমে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জিলার স্থান। ১৯৪৪ সালের সরকারী বিবরণী অনুসারে ২৪ পরগণা জিলার প্রায় ২৮৩৭ বর্গমাইল (কিংবা প্রায় ১৮ লক্ষ ১৫ হাজার একর) পরিমিত স্থান জুড়িয়া বনাঞ্চল রহিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে ২৪-পরগণা জিলা হইতে ৩৪১৩ ঘন ফুট ব্যবহার্য কাষ্ঠ এবং ১৫৯২ ঘন ফুট জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া গিয়াছে। সেই বৎসরে ২৪-পরগণার অরণ্য অঞ্চলে প্রায় ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা আয় হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জিলার প্রায় ৫৭১ বর্গমাইল (৩ লক্ষ ৬৫½ হাজার একর) পরিমিত স্থান জুড়িয়া বনাঞ্চল রহিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে জলপাইগুড়ি জিলা হইতে ১,৩৩২ ঘন ফুট ব্যবহার্য কাষ্ঠ এবং ১২,৯৪৩ ঘন ফুট জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া গিয়াছে। সেই বৎসর জলপাইগুড়ির অরণ্য অঞ্চলে আয়ের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার বেশী; ব্যয়ের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার কিছু বেশী। ১৯৪৪ সালে দার্জিলিং জিলায় মোট ৪৫১ বর্গমাইল (২৮৯২৩১ একর) পরিমিত স্থানে বনাঞ্চল ছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালের সরকারী হিসাব অনুসারে, দার্জিলিং জিলা হইতে ১,২৩৫ ঘন ফুট ব্যবহার্য কাষ্ঠ এবং ৬৪৫২ ঘন ফুট জ্বালানী কাষ্ঠ পাওয়া গিয়াছে। সেই বৎসর দার্জিলিং জিলায় বনাঞ্চলের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা আয় হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। (১)

প্রদেশের বিভিন্ন জিলায় যে সকল জঙ্গল রহিয়াছে, তাহা ধরিলে পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলের আয়তন আরও বেশী হইবে। ২৪ পরগণা জিলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার দক্ষিণে, সদর মহকুমায় এবং বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর এবং সন্দেশখালি থানায় বহু জঙ্গল রহিয়াছে। বর্ধমান জিলার সদর-আসানসোল-কাটোয়া-কালনা মহকুমায় ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রায় ২২ হাজার একর জমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। হুগলী জিলার সদর-শ্রীরামপুর আরামবাগ মহকুমার প্রায় ১২ হাজার একর জমিতে জঙ্গল দেখা যাইবে। হাওড়া জিলার ১ হাজার ৩ শত একরের বেশী জমিতে জঙ্গল রহিয়াছে। বাঁকুড়া জিলার জঙ্গল ৪১ হাজার ৫ শত একরের বেশী হইবে। ইহা ছাড়া, বাঁকুড়া জিলায় শালবন রহিয়াছে, তাহার আয়তনও প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার একর হইবে। এই অঞ্চলকে অবশ্য অনেক সময়ে আবাদী জমির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে। সেটলমেণ্ট রিপোর্টে বাঁকুড়া জিলায় বন-জঙ্গল ২ লক্ষ ৬১ হাজার একর পরিমিত স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমানে ইহা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। বীরভূম জিলার সদর এবং সিউড়ী মহকুমাতে ১৪ হাজার একরের বেশী জমিতে বন-জঙ্গল রহিয়াছে। মেদিনীপুরে শালবনের আয়তন ২ লক্ষ ৬৬ হাজার একর হইবে। পশ্চিম দিনাজপুর জিলার সদর বালুরঘাট ঠাকুরগাঁও মহকুমায় ৬১ হাজার একরের বেশী জমিতে বন ও জঙ্গল রহিয়াছে। জলপাইগুড়ি জিলার অরণ্য ছাড়াও ৮১ হাজার একরের বেশী জমিতে জঙ্গল রহিয়াছে। দার্জিলিং জিলায় এইরূপ জঙ্গলের আয়তনও প্রায় ১৬ হাজার একর হইবে। (২)

1 Statistical Abstract West Bengal. Report of the Forest Administration of Bengal.

প্রদেশের খনি ও খনিজ সম্পদ

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ খনিজ সম্পদে বিশেষ সম্পদশালী নহে। প্রদেশের খনিজ সম্পদের ভিতরে কেবলমাত্র কয়লা এবং লৌহের নাম করা যাইতে পারে। প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে যে সামান্য লৌহ পাওয়া যাইতে পারে তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মতো নহে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ বলিতে কয়লাকেই বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গের এই সকল কয়লা খনি প্রধানত বর্ধমান জিলাতেই পরিলক্ষিত হয়। রাণীগঞ্জ আসানসোল কয়লার জন্য বিখ্যাত। সরকারী হিসাব অনুসারে ১৯৪৩ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ৬৬৮৮৮৫৬ টন কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালে ৮৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টন কয়লা পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালেও ৭½ লক্ষ টনের বেশী কয়লা এই সকল খনি হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে। (১) সাধারণত প্রদেশে প্রতি বৎসর ৭ লক্ষ টন কয়লা কয়লাখনিসমূহ হইতে উত্তোলন করা হয়, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল কয়লা-খনি রহিয়াছে, তাহাতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার অভাব নাই বলিলেই চলে। কিন্তু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা সম্পর্কে তাহা বলা চলে না। রামনগর, লাইকডি, দিসেরগর প্রভৃতি যে সকল কয়লাখনিতে উৎকৃষ্ট পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়, বিশেষজ্ঞদের মতে সেই সকল কয়লাখনিতে ১ হাজার ফুট নীচে প্রায় ৮ কোটি ২০ লক্ষ টন এবং ২ হাজার ফুট নীচে প্রায় ২৫ কোটি টন কয়লা এখনও মজুত আছে। যে সকল খনিতে পাথুরিয়া কয়লা ভিন্ন অন্যান্য উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায় সেই সকল খনিতে ১ হাজার ফুট নীচে এখনও প্রায় ৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টন এবং ২ হাজার ফুট নীচে প্রায় ১৫৮ কোটি টন কয়লা মজুত রহিয়াছে। (২) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কয়লা সম্পদে বিশেষ সম্পদশালী হইলেও খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিবার প্রণালী ও পদ্ধতি মোটেই বৈজ্ঞানিক নহে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, খনি হইতে উত্তোলনকালে অগ্নিসংযোগ, চুরি ধ্বসন প্রভৃতির ফলে প্রায় ৭% ভাগ কখনও কখনও ৩৩% ভাগ কয়লার অপচয় ঘটে। ডাঃ ফক্স এর মতে এইরূপ অপচয়ের পরিমাণ ৫০% ভাগের কম হইবে না। যাহাই হউক, পশ্চিমবঙ্গের কয়লা সম্পদকে যদি যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিয়া প্রদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রণালী কয়লা খনিসমূহে প্রবর্তিত করা প্রয়োজন।

2 Agricultural Statistics, Bengal.

1 Compiled From Coal Statistics Department of Commercial Intelligence and Statistics, India.

2 Gee E. R.: "Memoirs" (Geological Survey of India) Vol. LXI. Bengal Industrial Survey Committee Report. Pp. 67-68.
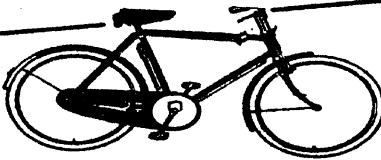
বিশ্ব-সমস্যার সমাধানে নেহেরু-ব্রেলসফোর্ড আলোচনা

গত অক্টোবর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন ইংলণ্ডে যান সেই সময়ে তিনি ভারতের অন্যতম বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ রাজনৈতিক-নেতা ও সুপণ্ডিত দার্শনিক মিঃ এইচ এন ব্রেলসফোর্ডের আমন্ত্রণে মিঃ ব্রেলসফোর্ড ও মিসেস ব্রেলসফোর্ডের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছিলেন। সেই সন্ধ্যায় অনাড়ম্বর ঘরোয়া শান্ত-পরিবেশে সেদিন তাঁদের তিনজনের মধ্যে যে হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল—সে সম্বন্ধে মিঃ ব্রেলসফোর্ড লণ্ডনের 'পিকচার পোস্ট' পত্রিকায় নিজেই একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন—সেটিতে পণ্ডিত নেহরু সম্বন্ধে তাঁর পূর্বের ধারণাটা কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল এবং পণ্ডিত নেহরু কিভাবে আবার তাঁর ভ্রান্তি ঘুচিয়ে তাঁর আস্থা অর্জন করলেন—সেই কথাই অকপটে বলেছেন। মিঃ ব্রেলসফোর্ড পৃথিবীর অন্যতম স্বাধীন-চেতা মনীষী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সমগ্র ইংরাজ জাতিকে যুক্তির সঙ্গে বোঝাবার জন্য মিঃ ব্রেলসফোর্ড যে পরিশ্রম করেছেন, যে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন—তার তুলনা খুব কম বিদেশীদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

মিঃ ব্রেলসফোর্ড ভারতবর্ষকে দেখেছেন, ভারতের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও জনগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে একাধিকবার এসেছেন এবং তিনি তাঁদের নিষ্ঠা ও চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে বহুকাল আগেই ইংরাজ জাতিকে বুঝিয়ে বলেছিলেন—ভারতকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা দুঃস্বপ্ন মাত্র—অতএব তাদের স্বাধীনতা কেউ রোধ করতে পারবে না। তাঁর "Rebel India" পুস্তকটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন মিঃ ব্রেলসফোর্ড—কতখানি নির্ভীক ও বলিষ্ঠ মনের মানুষ। তিনি তাই 'ভারত-বন্ধু' নামে খ্যাত। এই বন্ধু ব্রেলসফোর্ড-দম্পতিকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাতেই ভারতের রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি তাঁদের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। ব্রেলসফোর্ড-দম্পতীও অকপটভাবে পণ্ডিত নেহরুকে তাঁদের মনের কথা জানিয়েছিলেন। কিভাবে তাঁদের মধ্যে বিশ্ব-সমস্যার আলোচনা হয়েছিল—তা তাঁদের মুখের কথাতেই যথাযথ-ভাবে প্রকাশ করেছেন—মিঃ ব্রেলসফোর্ড নিজে। আমি তা অনুবাদ করে দিলাম এই-জন্যই যে, ভারত সরকারের নীতি সম্বন্ধে আমাদের মনে বর্তমানে যে সব প্রশ্ন জাগে—সেই সব প্রশ্নই মিঃ ব্রেলসফোর্ডের মনেও জেগেছিল—এবং তিনিও সেই সমস্ত প্রশ্নই করেছিলেন পণ্ডিত নেহরুকে। পণ্ডিত নেহরুর জবাবগুলি তাঁকে তো খুশি করেইছে—আমাদেরও করেছে—শুধু তাই নয় বিশ্ব-সমস্যার সমাধান কোন পথে আসবে—তারও অকপট ইঙ্গিত দিয়েছেন-পণ্ডিত নেহরু। মিঃ ব্রেলসফোর্ড তাঁর বিবৃতিতে লিখেছেন—

১৮ বছর আগে ১৯৩০ সালের অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মাঝামাঝি সময়টা—সবপ্রথম আমি নেহরুর সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন নৈনির এক জেলখানায় বন্দী ছিলেন। যাই হোক আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল—এবং আমাদের সেই সাক্ষাৎটা অনেকটা গুহার অন্ধকারে সাক্ষাতের মতই বলা চলে। খুব আশ্চর্যের কথা যে, জেলের অধ্যক্ষ আমাদের দুজনকে নিরালায় আলাপ করতে দিয়ে সরে গেছলেন—তবে সেখানে যে একটি কাঠবেড়ালী ছিল—বেশ মনে আছে। সেটিকে আমি কাঁধের ওপর রেখে পিঠ চাপড়ে আদর করেছিলাম—এবং আদর করা থামাতেই সে আমার কান কামড়িয়ে দিয়েছিল। আমার এখনও মনে আছে সেই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল আগ্রার কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামের দুঃখ-দুর্দশার কথা নিয়ে—কারণ তখন আমি সেগুলি দেখে বেড়াচ্ছিলাম। এইসব কথা প্রসঙ্গেই দেখেছিলাম—নেহরুর কাছে স্বাধীনতা অর্থে তখন বোঝাতো—ভারতের অসংখ্য গ্রাম-গুলিকে তাদের দুঃখদুর্দশার স্তর থেকে উন্নত করে তোলা। কিন্তু এ মাসে যখন আবার আমার নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো—তখন একথা না ভেবে পারিনি—যে বর্তমানে তাঁকে যে ক্ষমতাগ্রাসী রাজনীতি মেনে চলতে হচ্ছে—এবং সেই রাজনীতিতে তিনি যে ভূমিকায় অভিনয় করছেন তাতে হয়তো তাঁর সেই মূল সংকল্প—ভারতীয় কৃষক সমাজকে দারিদ্র্য ও দুঃখ থেকে মুক্ত করার সংকল্পের মধ্যে অসঙ্গতি এসেছে। সেইজন্য আমি তাঁকে সেই প্রশ্নই করলাম—এবং তারপর তা নিয়ে আমাদের বাকি যে সমস্ত কথাবার্তা হলো—তা অনেকটা এই রকম—

ব্রেলসফোর্ড গৃহে—ব্রেলসফোর্ড দম্পতির সঙ্গে নেহরু

নেহরু—ঠিকই বলেছেন—সম্পূর্ণ অসংগতি এসে গেছে—আমার আদর্শ ও কর্মের মধ্যে। এমন কি বলা চলে—কখনও কখনও তা বিপরীত ধর্মীও হয়ে উঠছে। কিন্তু শুধু সেই গ্রামের ছবিগুলি মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখা ছাড়া—একটি মানুষ আর কি করতে পারে বলুন? তবে এটুকু বলতে পারেন—এই এখনই সবপ্রথম চাষীরা পেটভরে খেতে পাচ্ছে—এবং দেনার দায় থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। অধিকাংশ চাষীর জীবনেই এই পরিবর্তন ঘটেছে। তবে বলছি না যে সকলেরই হয়েছে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে বাজারের দাম চড়িয়ে দিয়ে তারা যা কিছু উৎপন্ন করছে তার সমস্তটাই বিক্রী করে ফেলার জন্য তাদের বাধ্য করা হয়নি। তারা তাদের ফসল নিজেরা

"একটি মানুষ আর কি করতে পারে বলুন?"

কিছুটা খেয়েছে—এমন কি কিছু কিছু মজুত করেও রেখেছে। তারা অবশ্য খুব যে বেশী পরিমাণে মজুত করেছে—তা বলছি না, তবে লক্ষ লক্ষ চাষী যদি সামান্য পরিমাণেও মজুত করে থাকে—তার মানে অনেক শস্যই আটক হয়ে গেছে। সেটাও হলো খাদ্যাভাবের অন্যতম কারণ।

ব্রেলস্‌ফোর্ড—অর্থাৎ লোকেরা খাচ্ছে বেশী—বেচছে কম।

নেহরু—তবে অবশ্য যাঁরা চাকরী করে সংসার চালান—তাঁরা অত্যন্ত কষ্টে রয়েছেন। কিন্তু আপনার মূল বক্তব্যটি হচ্ছে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার গোটা লক্ষ্যটাই হলো—দেশের সাধারণ শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা এবং তাদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো। দেড় বছর আগে আপনি যখন আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন—তখন যদি আপনি আমাকে ঐ প্রশ্নটি করতেন—তাহলে আমি হয়তো বলতাম—আমাদের অসংখ্য পরিকল্পনা আছে—যার শিক্ষাবিস্তার পরিকল্পনাটিই হলো সবচেয়ে দরকারী, এছাড়া অবিশ্যি আছে চারিটি—'নদী ও উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা', কিন্তু কি জানেন—দেশ বিভক্ত হওয়াতে—এবং তার পরের ঘটনাবলীতেই—ও সমস্তই আগাগোড়া এখন মাঝপথে ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছে। এখন পঞ্চাশ লক্ষ বাস্তুহারা আশ্রয়প্রার্থীদের ঝামেলা মেটানো ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সমস্যাই সব গ্রাস করলো।

ব্রেলস্‌ফোর্ড—তাহলে তো আপনাকে দেশরক্ষার ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করতে হয়েছে। আচ্ছা একই সঙ্গে আপনি কি দেশরক্ষা' এবং দেশ-সংগঠন ব্যবস্থা করতে পারেন? আমাদের মধ্যে কেউ কি ঐ দুটি একসঙ্গে করতে পারে? আপনাদের সৈন্যবাহিনী নৌ-বহর ও বিমানবাহিনী গড়ে দেশরক্ষার প্রয়োজন মিটাতে হলে—আপনাকে পথ বদলে সেই সমস্ত কিছুই কি ব্যয় করতে হবে না যা আপনি মনে করেছিলেন দেশ-সংগঠনের কাজে লাগাবেন?

নেহরু—এটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের কাশ্মীরে যে ঝামেলা ভোগ করতে হলো—তাতেই পথের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস হয়ে উঠেছে বাস্তুহারাদের বিরাট সমস্যাটাই—আর্থিক এবং আনুষঙ্গিক এই দুদিক থেকেই। তখনই সৈন্যবাহিনী হয়ে পড়লো—আমরা যেভাবে হিসেব খতিয়েছিলাম—তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যয়বহুল। আজকাল সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের প্রশ্নটা তত বড় নয়—যতটা প্রয়োজন হচ্ছে আধুনিক যুদ্ধ-সরঞ্জামের।

মিসেস ব্রেলসফোর্ড—হ্যাঁ তা বটে। কিন্তু এই সমস্ত পথ-বিচ্যুতিতে আমাদের কি করা উচিত? গোটা পৃথিবীতে জনসাধারণ আজ চীৎকার করে চাইছে শান্তি আর পেটভরা খাদ্য। মেয়েমানুষ হিসাবে আমি বলি কি আমাদের এমন একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান চাই, যেটি জগতের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাহলেই এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সৈন্যবাহিনীর দরকার হবে না এবং এইভাবে আমরা হয়তো শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারতাম।

নেহরু—আমাকে এ কথাটা আপনার বোঝাতে কষ্ট করতে হবে না। এর জবাব হলো—"হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন,' কিন্তু কেমন করে? পৃথিবীতে এমন মহৎ ও শুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বহু ব্যক্তিই—কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু যখন ঘটনার বেগে অস্বাভাবিক সময় এসে পড়ে, তখন তাঁরাও ভেসে চলে যান। গান্ধীজীর মত একটি মানুষ যিনি নিজে ছিলেন কল্যাণশক্তি। পৃথিবীর দৃষ্টিভংগীকে তিনি কিছুটা পরিবর্তিত করেওছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে আরও অনেকেই তাঁর চেয়ে অনুকূল পটভূমিকা ও পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, শুধু একটা গগনস্পর্শী বাগাড়ম্বরময় পরিকল্পনা খাড়া করবার জন্য—যার কোনও যোগ থাকবে না মাটির পৃথিবীর সংগে।

মিসেস ব্রেলসফোর্ড—কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি গগনস্পর্শ করতে যাচ্ছি না। আমি বাস্তব জিনিসের কথাই বলছি। আমি নেমে যেতে চাইছি সেই স্তরে—যেখানে খাদ্য উৎপাদন-মাটিতে গাছপালা বসানোর মত বাস্তব কাজের যোগ আছে।

নেহরু—আমারও তাতে মত আছে। কিন্তু জনসাধারণ মাটিতে গাছ বসানোর বদলে অন্যের

অসম্ভব মনে হলেও বিশ্ব-সমস্যার সমাধান হবেই

বুকে ছুরি বসাচ্ছে—কখনও কখনও এর চেয়েও ভালো মনে করে—

মিসেস ব্রেলসফোর্ড—না, তারা ঐসব করছে কারণ তারা আজ সর্বহারা—সমস্ত আশা তাদের ঘুচে গেছে তাই।

নেহরু—আমি অবশ্য এই কথাই বলবো সর্বহারারা শান্তিকামী; তারা ছাড়া অন্য যাঁরা আছেন, তাঁরাই এই রকম সব দুষ্কার্য করছেন।

ব্রেলস্‌ফোর্ড—আচ্ছা ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ির পথ থেকে খাদ্য এবং ক্ষুধার্তের সমস্যা সমাধানের পথে কি জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করার কোনও উপায় নেই? বর্তমানে মনে হচ্ছে, ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ির সমস্যাটা সমাধান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

নেহরু—খুব সম্ভবতঃ আমাদের কাছে ব্যাপারটা তাই মনে হচ্ছে—তার কারণ আমরা এখন ঐ সমস্যার মাঝপথেই রয়েছি। এটার

সমাধান করতেই হবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে—যুক্তির পথে এই সমস্যার যদি সমাধান না হয়, তা হলে এই সমস্যার সমাধান হবে অনাহার ও মৃত্যুতেই। ব্যক্তিবিশেষের মতই গোটা পৃথিবীর জীবনযাত্রাটাও একই ব্যাপার জানবেন—একটি ব্যক্তি কখনো যদি তার নিজের সমস্যার সমাধান করতে না পারে—তাহলে হয় সে মরে যায় নয়তো তাকে আত্মহত্যা করে সব সমস্যার সমাধান করতে হয়। গোটা পৃথিবীর বেলাতেও ঠিক তাই ঘটবে। একথা নিশ্চিতভাবে ঠিক যে যদি আমরা প্রত্যেককে যথাযথভাবে খাওয়াবার এবং পরাবার ব্যবস্থা করতে পারতাম—এবং এর পরেও প্রাচুর্য বজায় রাখতে পারতাম তাহলে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও টানা হ্যাঁচড়াটা অনেকখানি কম হতো। আমরা তা কি উপায়ে করবো?

মিসেস ব্রেলসফোর্ড—কিন্তু আপনিতো জানেন—F. A. O. বা স্যার জন বয়েড ওর-এর প্রতিষ্ঠিত Food & Agriculture Organisation রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটিতো বর্তমানে ক্ষুধার জ্বালা প্রশমিত করার জন্য, লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সমাধানে, এবং সর্বত্র চাষ আবাদের উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। ৫২টি জাত একসঙ্গে একবাক্যে এই প্রচেষ্টায় সম্মতি জানিয়েছে। এটির অভাব হচ্ছে পরিচালনা শক্তির।

ব্রেলসফোর্ড—বেশ তো! এর মানেই হচ্ছে এই যে পৃথিবীর গবর্ণমেণ্টগুলিকে হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভোটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

মিসেস ব্রেলসফোর্ড—আপনি কি এটা মানেন যে এই যে নিঃস্ব জনসাধারণ—এরাই একনায়কত্ব বা ডিক্টেটরীর আসল মালমশলা? তাই যদি আমরা মেনে নেই—তা হলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণামটুকু ভেবেও আমাদের সকলকে সারা পৃথিবী থেকে নিঃস্বদের নিঃস্বতা ঘোচানোর কাজে লাগতেই হবে।

নেহরু—হ্যাঁ—হ্যাঁ তাতো বটেই ওটুকু বোঝাবার জন্য আপনার এত যুক্তিতর্ক খাড়া না করলেও হবে।

মিসেস ব্রেলসফোর্ড—সবাই ছেলেমানুষী করলেও, কিন্তু আমাদের শান্তি এবং ক্ষুধা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। চারধারে জনমত প্রবল ভাবাবেগে বেড়ে চলেছে—

নেহরু—দুর্ভাগ্যক্রমে আজ পৃথিবীর ওপর সেটির কোনও কার্যকরী প্রভাব নেই—

মিসেস ব্রেলসফোর্ড—কারণ এই জনমত এখনও রাষ্ট্রসংঘকে (U. N. O.) ভেদ করে তার মধ্যে আসন গাড়তে পারেনি।

নেহরু—হ্যাঁ! তবে আমি বলতে পারি ঐ পথে সে কোনও দিনই সেখানে আসন গাড়তে পারবে না। যদি না পৃথিবী আবার নতুন পথে চলে তাহলে আজ কেবলমাত্র যা গণ্য বলে বিবেচিত হবে—তা হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার বা গবর্ণমেণ্টগুলি। সেগুলিকে জনমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত করা যেতে পারে। কিন্তু আপনারা সরাসরি রাষ্ট্রসংঘকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন না, কারণ আপনারা যদি রাষ্ট্রসংঘে জনমতের প্রভাবটাকে খুব বেশী রকম বিস্তার করতে চেষ্টা করেন—তাহলে তার ফল শেষ পর্যন্ত এই হবে যে U. N. O.-র অস্তিত্ব থাকবে না, কারণ তখন গবর্ণমেণ্টগুলিই সহযোগিতা করবেন না।

ব্রেলসফোর্ড—তা হলে আমাদের গবর্ণমেণ্টগুলির উপরই চাপ দিতে হবে।

মিসেস ব্রেলসফোর্ড—আমি প্রবল জনমতের কথা এই কারণেই বললাম—যে আমি বোঝাতে চাইছি যে এমন একজন কেউ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি থাকুন যিনি এই জনমতকে জোর গলায় শোনাবেন। ঠিক এই দৃষ্টি নিয়েই আপনার কথা ভেবেছি আমি পণ্ডিত নেহরু,

দেশগড়ার পথ থেকে দেশরক্ষার পথে আসতে হয়েছে

এবং এই দৃষ্টি নিয়ে আমি শুধু একা নই—আরও বহুলোক আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে।

নেহরু—একথা তো খুবই সত্যি যখন মানুষ হালে পানি না পায়—তখন নেহরুর মত স্রোতে ভেসে যাওয়া একটুকরো তৃণকেও অবলম্বন বলে মনে করে। অনেক লোক গোটা পৃথিবীটাকেই প্রচারের দ্বারা কাবু করে উচ্চ নীতিজালের বিস্তার করছেন—তবুও দেখা যায় ফল হয় নিতান্ত সামান্য। এখন ভাবুন তো গান্ধীজীর কথা। তাঁর কর্মজীবনের বেশ কয়েকটি বছর ধরে তিনি ভারতীয় সমস্যাগুলির সমাধান ও চিন্তা করতেও অস্বীকার করেছিলেন, কারণ তিনি বলতেন তাঁর পক্ষে ভারতীয় সমস্যা বলতে যা বোঝায় সেটা হচ্ছে ঢের ঢের বিরাট আর বড়। তিনি শুধু ভারতীয় সমস্যার অংশমাত্রেই নিজেকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। অনেক দিন পরে তবে তিনি সমগ্রভাবে ভারতীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময় তখন যদি আপনি তাঁর কাছে পৃথিবীর সমস্যার কথা তুলতেন, তিনি বলতেন পৃথিবীটা তাঁর পক্ষে মস্ত বড়, তিনি ভারতবর্ষকেই ভাল করে বুঝেছেন। গোড়া থেকে আপনাকে বাস্তব সত্যকে দেখতে হবে। তা না হলে আপনি নিজেকে একক করে ফেলবেন—এবং সমস্ত কিছুকেই একটা অদ্ভুত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন।

ব্রেলসফোর্ড—ঠিক এই কারণেই তো আমরা খাদ্যবস্তুর যোগান, জমিতে সেচ দেওয়া, জমির ক্ষয় নিবারণ প্রভৃতি নেহাৎ সাদামাটা সমস্যাতেই নিবিষ্ট হতে চাইছি।

নেহরু—না, না আমাদের সব দিকেই এগিয়ে চলতে হবে। আপনি যা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে এগিয়ে চলার একটা দিক মাত্র—এ সম্বন্ধে তো তর্কের কিছু নেই, কিন্তু মনে রাখবেন অনেক কিছুই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ও দ্রুত ঘটে যায়। আপনি যখন একটা বাড়ীর একদিকের দেওয়াল গাথছিলেন তখনই হয়তো—ঘূর্ণিঝড় এসে গোটা শহরটাকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে গেছে। এমনও তো ঘটতে পারে। কাজেই ঘূর্ণিঝড়ের উপমাটা সব সময়ে মনে রেখেই একজনকে কাজ করতেই হয়। দেখছেন তো, আমি আপনার মতে সায় দিচ্ছি—

মিসেস ব্রেলসফোর্ড—আপনিও যখন সায় দিচ্ছেন—বেশ তো আসুন আমরাই দেখি কি করতে পারি। আমরা তো জানি, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই যুদ্ধ ঘটবে না, এমন কি দু'এক বছরের মধ্যেও নয়। বেশ তাহলে এই একটা দুটো বছরকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি?

নেহরু—দেখুন আমি নিজেকে এই কর্মপন্থা নির্ধারণের সম্পূর্ণ যোগ্য বলে মনে করি না, এটা একটা অত্যন্ত ভীতিজনক জটিল পরিস্থিতি। আপনি যে ধারায় চলেছেন—ঠিক ঐ ভাবে একজন একজনের সর্বসাধ্য প্রযত্ন করে চলেছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর কোনও না কোনও অযৌক্তিক বিশ্বাসের ইঙ্গিতেই এগিয়ে চলেছে।

ব্রেলসফোর্ড—তাহলে আপনি কি এমন কোন পথ বাৎলাতে পারেন যাতে করে প্রাচ্যের শক্তিসমূহের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বটা আমরা কমাতে পারি? তার প্রথম কাজই কি হবে পরস্পরের সঙ্গে মতের অমিল ঘটানোর চুক্তি? পরস্পরের হস্তক্ষেপের অধিকারকে বাদ দিয়ে যে যার নিজের মতে চলা?

নেহরু—আমি যতটা বুঝি, তাতে মনে হয় এইটাই করতে হবে যাতে করে তেমন কোনও সুদূরপ্রসারী চিন্তার পথে আমরা কথা কইব না, যা আমাদের লক্ষ্য থেকে বহু দূরে, বরং দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলার জন্য

আমরা সঙ্কীর্ণ সমতল ক্ষেত্রেই পা বাড়াবো। আমরা যদি অল্প কিছুদিনের জন্যও এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পথকে এড়িয়ে চলতে পারি—তাহলে তখনই ঐ সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ও উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারবে। এটা একটা নেহাৎই ভীতিজনক উদ্ভট বোকামী যে আজও গোটা পৃথিবীকেই যুদ্ধ-পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে হবে। আসলে একজন যুদ্ধ ঘোষণা করে—কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই। আচ্ছা এটাই যদি সে মৃত্যুর মতো নিশ্চিত জানতে পারে, যে যখন তুমি জিতবে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না তখন যুদ্ধটা হয়ে দাঁড়ায় নিছক বোকামী। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের এই পরিণাম মৃত্যুর মতই নিশ্চিত সত্য, তাহলেও এর পরেও জনসাধারণ যুদ্ধের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। তারা আজ একে অপরের সম্বন্ধে এমনই ভয় পেয়েছে। আপনি মধুর ও সারগর্ভ যুক্তি দিয়ে ততক্ষণ কোনও কাজ হাসিল করতে পারবেন না—যতক্ষণ জনসাধারণের মনের এই অবস্থা বজায় থাকবে। আপনার যুক্তি-উপদেশ ভয় সংক্রামিত মনস্তত্ত্বের উপর সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। আমি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারেই এই ব্যাপারটা দেখেছি ভারতের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে। কাজেই আজ আন্তর্জাতিক প্রশ্ন ও সমস্যাগুলিকে মনঃবিশ্লেষণের দৃষ্টি-কোন থেকে দেখে নিয়ে যথারীতি আরোগ্য বিধান করতে হবে। আপনি বিকৃত মন বা উল্টা-বুঝলি রামের সঙ্গে তো যুক্তিতর্ক করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন না।

ব্রেলস্ফোর্ড—নিশ্চয়ই না। তাহলে আমরা কি এমন অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারি যখন বড় বড় শক্তিসমূহ—ভিন্ন ভিন্ন পথে মতের অনৈক্য বজায় রেখে চলতে রাজি হবে?

নেহরু—হয়তো এমনটা আপনা থেকেই হয়ে গিয়ে সে সুযোগ আসবে। হয়তো তেমন অবস্থাতেই সর্বত্র নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

ব্রেলস্ফোর্ড—আমারও মনে হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যেসব বড় বড় কথা আলোচনা করছিলাম—সেই সব বড় বড় কথা আরম্ভ করার আগে—যেটি আপনি বললেন সেটিই হচ্ছে প্রথম ধাপ। একবার যদি এই মিলনের টানাটানিটা একটু আলগা হয়—তাহলে কিছুদিন সমস্ত চুপচাপ থাকার পর শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত গবর্ণমেণ্টই গঠন-মূলক পরিকল্পনার দিকে স্বচ্ছন্দভাবে মন দিতে পারবে।

নেহরু—নিশ্চয়ই—এইটাই হলো আসল কথা।

অনুবাদক—শ্রীবিমল ঘোষ

পাকিস্তানের প্রধান সচিব মিস্টার লিয়াকৎ আলি পূর্ব পাকিস্তান সফর করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু তাঁহাকে গমনপথে কলিকাতায় আসিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান সচিব ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পাকিস্তানে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও তাহাই করিয়াছিলেন। মিস্টার লিয়াকৎ আলীর পূর্ব পাকিস্তানে গমনের নানা কারণের মধ্যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের পাকিস্তান ত্যাগ যে অন্যতম, তাহা অবশ্যই অনুমান করা যায়। ঢাকায় তিনি বলিয়াছেন—পূর্ব পাকিস্তান পরিভ্রমণ ফলে তিনি বুঝিয়াছেন, অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—সংবাদপত্রে (তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব বিধানবাবুর উক্তিতে) যে বলা হইতেছে, ১৫।২০ লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং প্রচারকার্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।" আমরা আশা করি, আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্যও ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় এই মিথ্যার প্রতিবাদ করিবেন। একান্ত পরিতাপের বিষয়, যদিও বোম্বাই প্রদেশে ঝড়ে কতকগুলি গাছ পড়িয়া গিয়াছে, ৩।৪ দিনের মধ্যে তাহার হিসাব পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু কত হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব দেন নাই—বোধ হয় রাখাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। অথচ শিয়ালদহ স্টেশনের হিসাবই মিস্টার লিয়াকৎ আলীর মিথ্যার প্রতিবাদ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

তবে কি মনে করিতে হইবে—মিস্টার লিয়াকৎ আলী মনে করেন এক কোটি ২৫ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ১৫।২০ লক্ষের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ তিনি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং সে সংখ্যা আরও অধিক হওয়াই তাঁহার মতে বাঞ্ছনীয়? অর্থাৎ তিনি কি মনে করেন যখন এত হিন্দু তথায় থাকিতে পূর্ব পাকিস্থান মুসলমান রাষ্ট্র করার সুবিধা হইবে না, তখন হিন্দুর সংখ্যা আরও অল্প করা প্রয়োজন? যদি তাহাই হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

আমরা জানি, কেন হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন এবং কত লোক আসিয়াছেন, তাহার আনুমানিক সংখ্যাও অজ্ঞাত নহে।

মিস্টার লিয়াকৎ আলী চতুর লোক। তিনি যে স্বীকার করিবেন, পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের বাস অসম্ভব হইয়াছে, এমন মনে করা যায় না। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে তিনি বলিয়াছেন—পাকিস্তান সরকার ও পূর্ব পাকিস্তান সরকার চাহেন যে, হিন্দুরা সম্মান ও সম্ভ্রম লইয়া মুসলমানদিগের সহিত তুল্যাধিকার সম্ভোগ করিয়া পাকিস্তানে বাস করুন।

আমরা ডক্টর ঘোষকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি ঘটনা ও অবস্থা লক্ষ্য করিয়াও মনে করিতে পারেন—এই কথা বিশ্বাসযোগ্য?

ডক্টর ঘোষ কি জানেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে লুণ্ঠন ও অগ্নিযোগ সমভাবেই চলিতেছে: গত এক মাসের মধ্যে কলমচোরা, ধানপুর, রাজাপুর, আনন্দপুর, রাধানগর ও রামনগর এইগুলি স্থানে বন বিভাগের কার্যালয় ভস্মীভূত এবং নবদ্বীপ, চম্পকনগর, জগন্নাথদীঘি স্থানগুলিতে বন বিভাগের কার্যালয় লুণ্ঠিত হইয়াছে। তিনি কি জানেন না, সীমান্তে সভা করিয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" ভয় দেখান হইতেছে? মিস্টার লিয়াকৎ আলীর কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি কি মনে করেন, এসব বড় লোকদের মায়া, নহে ত ভারত সরকারের প্রচারবিভাগের মিথ্যা প্রচার?

মিস্টার লিয়াকৎ আলী বলিয়াছেন—"পাকিস্তান তাহার রক্ষা-ব্যবস্থা করিতেছে—পররাজ্যাক্রমণ তাহার উদ্দেশ্য নহে।" অতি উত্তম কথা। কিন্তু তিনি যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন—খাইতে না পাও সেও ভাল, কিন্তু সামরিক ব্যবস্থা দৃঢ় করিতেই হইবে, সে কি কেবল আত্মরক্ষার ব্যবস্থার জন্য? পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? আর পাকিস্তানের ইহাও অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে যে, পাকিস্তানের সমরায়োজন বর্ধিত হইলে ভারত রাষ্ট্রেরও তাহাই করা অনিবার্য। অবশ্য মন্ত্রগুপ্তি সমরায়োজনের অন্যতম আবশ্যক অংশ। কাজেই পাকিস্তানের যদি ভারত রাষ্ট্রের প্রতি হস্ত প্রসারণের ইচ্ছা থাকে, তবে পাকিস্তান কখনই মুখে তাহা বলিবে না। তাহার কাজ দেখিয়াই সে ইচ্ছা অনুমান করিতে হইবে। ভারত সরকার অবশ্যই সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

পূর্ব পাকিস্তান সরকার নির্দেশ দিয়াছেন, ধানচাষীকে প্রতি বিঘায় ৬ মণ ধান সরকারের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। কৃষককে চাষের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া ধান সরকারের গুদামে দিয়া আসিতে হইবে—কতদিনে এবং কি হিসাবে মূল্য পাওয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না। আর সকল জমি হইতে বিঘা প্রতি ৬ মণ ধান দেওয়া সম্ভব কি না, তাহা কে বিবেচনা করিবে? প্রধানত এই কারণেই পূর্ববঙ্গে মিস্টার লিয়াকৎ আলীর সম্বর্ধনা আশানুরূপ হয় নাই। কারণ, কতক লোককে চিরদিন এবং সকল লোককে কিছুদিন ধাপ্পা দেওয়া যায়, কিন্তু সকল লোককে চিরদিন ধাপ্পা দেওয়া যায় না। আবার মিস্টার লিয়াকৎ আলী ছাত্রদিগের দাবীর যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব পাকিস্থানের মুসলমান তরুণরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

মোট কথা—মিস্টার লিয়াকৎ আলীর পরিদর্শনে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের আশ্বাস পাইবার কোন কারণই ঘটে নাই। সুতরাং তথা হইতে হিন্দুদিগের আগমনের জন্য ভারত সরকারকে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিন্তু উড়িষ্যা সরকার যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে স্থান দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা কি "জলে জলবিম্বপ্রায়" হইল? বিহার ত কথনই জবাব দিয়াছেন—প্রকাশ্যভাবে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সচিব শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি আন্দামান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, আন্দামান স্বর্গের তোরণ। তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য কাহারও আন্দামানে যাইবার প্রয়োজন ছিল না। আন্দামান বাঙালীর বাসযোগ্য কি না, তাহাই বিবেচ্য। কিন্তু আমরা ভারত সরকারকে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জিজ্ঞাসা করি, কতদিনে আন্দামানে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদিগের বাসের ও চাষের ব্যবস্থা করা হইবে, কতদিনে তথায় চিকিৎসালয়, জলসরবরাহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে, ততদিন কত বাস্তুহারা অনাহারে, অনাবৃতভাবে, রোগে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে? তাহাদিগের মৃত্যুর দায়িত্ব হইতে কি সরকার সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সচিব বলিয়াছেন, বাস্তুহারাদিগের জন্য ২ কামরাযুক্ত ১০ হাজার গৃহ নির্মিত হইবে। কবে তাহা হইবে এবং কলিকাতায় বহু সিনেমাগৃহ ও আশু নগর আখ্যায় আখ্যাত ব্যক্তিগত গৃহ নির্মাণের পরে সে সব গৃহের জন্য আবশ্যক উপকরণ পাওয়া যাইবে ত?

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ প্রতিষ্ঠার পরেই আমরা সরকারের ব্যয়বাহুল্যের আলোচনা করিয়াছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ অবিভক্ত বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ হইলেও দপ্তরে ব্যয়-সঙ্কোচের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। অথচ প্রত্যেক পদাধিকারীর কার্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব প্রদেশ বিভাগ ফলে কমিয়া গিয়াছে। নূতন প্রদেশের প্রয়োজন হিসাবেও পদের সংখ্যা অধিক দেখা যায়,

(১) রিজার্ভড চাকরী—

(ক) একজন চীফ সেক্রেটারী; বেতন—মাসিক ৩ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা।

(খ) একজন মেম্বার বোর্ড অব রেভিনিউ—বেতন মাসিক ৩ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা।

(গ) ৭ জন সেক্রেটারী; প্রত্যেকের মাসিক বেতন—২ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা।

(ঘ) ২ জন ডেপ্‌টি সেক্রেটারী ও ২ জন আণ্ডার সেক্রেটারী; প্রত্যেকের মাসিক বেতন—সিভিল সার্ভিসের বেতনাপেক্ষা ২ শত টাকা অধিক।

(২) নন্‌-রিজার্ভড চাকরী—

(অ) ৩ জন সেক্রেটারী; প্রত্যেকের মাসিক বেতন—২ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা।

(আ) ২ জন জয়েণ্ট সেক্রেটারী; প্রত্যেকের মাসিক বেতন সিভিল সার্ভিসের বেতনাপেক্ষা ২ শত ৫০ টাকা অধিক।

(ই) ১২ জন ডেপ্‌টি সেক্রেটারী; প্রত্যেকের মাসিক বেতন চাকরীর নির্দিষ্ট বেতনাপেক্ষা ২ শত টাকা অধিক।

(ঈ) ১৩ জন এসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী; প্রত্যেকের মাসিক বেতন চাকরীর নির্দিষ্ট বেতনাপেক্ষা একশত টাকা অধিক।

—ইত্যাদি।

ম্‌সলিম লীগের সময়েও প্রধান সচিবের খাস ম্‌ন্সীর মাসিক বেতন সিভিল সার্ভিসে চাকরীর বেতন ও আর ২ শত টাকা ছিল; এখন প্রধান সচিবের খাস ম্‌ন্সীর মাসিক বেতন ২ হাজার ৭ শত ৫০—খাস ম্‌ন্সীর বেতন সেক্রেটারীর বেতনের সমান না হইলে বোধ হয় রাজ্যের সম্ভ্রম হানি হয়।

প্‌র্বের তুলনায় কর্মচারীর সংখ্যাব্‌দ্ধি হইয়াছে।

কোন পত্রে কয়জন সরকারী কর্মচারীর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্টের বেতন ও তাহার পরের বেতনের এক দীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা কয়টি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

	প্‌র্বে	পরে
শ্রীস্‌কুমার সেন	২২৫০	৩৭৫০
শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০০০	৩৭৫০
শ্রীব্রজকান্ত গ্‌হ	২২০০	২৭৫০
শ্রীশৈবালকুমার গ্‌প্ত	২১৫০	২৭৫০
শ্রীরণজিৎ গ্‌প্ত	২০০০	২৭৫০
শ্রীকর্‌ণাকুমার হাজরা	২০০০	২৭৫০
শ্রীস্‌শীলকুমার দে	১৮০০	২৭৫০
শ্রীআর এস কৃষ্ণস্বামী	১৮০০	২৭৫০
শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়	২০৫০	২৭৫০
শ্রী বি বি দাশগ্‌প্ত	৯০০	২৭৫০
শ্রীধর্মদাস ভট্টাচার্য	১১০০	১৯৫০
ডক্টর স্নেহময় দত্ত	১০০০	১৮০০

আবার অনেক কর্মচারী অতিরিক্ত ভাতা পাইতেছেন। যথা—

শ্রীশম্ভূচরণ চট্টোপাধ্যায়—বেতন ১০০০, আর অতিরিক্ত ভাতা ৬০০+২০০।

শ্রীকুমার অধিক্রম মজ্‌মদার—বেতন ৮৫০, আর অতিরিক্ত ভাতা ৬৫০।

আমরা আশা করিয়াছিলাম, ব্যয়বহ্‌ল ব্‌টিশ সরকারের অবসানে এই দরিদ্র দেশে শাসনব্যয়ে মিতব্যয়িতা অবলম্বিত হইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া যেভাবে অমিতব্যয়িতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে শেষ কি হইবে, বলা যায় না।

তাহার পরে দেখা যাইতেছে, কোন দিকেই যেন "গ্‌ছাইয়া" কাজ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে না। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গে ডক্টর প্রফ্‌ল্লচন্দ্র ঘোষের সচিব সঙ্ঘের পতনে প্রধান সচিব হইয়াই বলিয়াছিলেন—সরকার রেশনে যে পরিমাণ খাদ্যোপকরণ প্রদান করেন, তাহা মান্‌ষের পক্ষে যথেষ্ট নহে; তিনি তাহা দ্বিগ্‌ণ করিবার প্রয়োজন অন্‌ভব করেন। কিন্তু তিনি কি তাহার কিছ্‌ করিতে পারিয়াছেন? তিনি কিছ্‌ করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করার প্‌র্বে আমরা জিজ্ঞাসা করিব, পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিবার কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা এমন কি চেষ্টা তাঁহার সচিবসঙ্ঘ করিয়াছেন কি? আমরা বিশ্বস্তস্‌ত্রে অবগত হইয়াছি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্‌ পশ্চিমবঙ্গে "পতিত" জমীর হিসাব দেখিয়া বলিয়াছেন, অত জমি "পতিত" থাকিতে পশ্চিমবঙ্গ প্‌র্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুত্যাগীদিগের জন্য কেন্দ্রী সরকারের সাহায্য দাবী করিতেছে কেন? আমরা বার বার বলিয়াছি, কলিকাতার উপকণ্ঠ হইতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যে জমি "পতিত" আছে, তাহা চাষের অযোগ্য নহে—তবে তাহাতে চাষের ব্যবস্থা হয় না কেন? সে জমি "উঠিত" হওয়া ত পরের কথা অতি-লোভী ধনীদিগের লোভহেতু "উঠিত" জমিও "পতিত" থাকিতেছে। আইনের ছিদ্রহেতু বহ্‌ ধনী রাজস্ব অনাদায়ে নিলামে জমি ক্রয় করিয়া তাহা ফেলিয়া রাখিতেছেন। তাহার কারণ, তাঁহারা জমিতে প্রজার অধিকার হইবার ভয়ে তাহাতে চাষ দিতেছেন না। আবার কেহ কেহ, লোকের দ্‌রবস্থার স্‌যোগে, "কলোনী" করিবার জন্য চাষের জমি কিনিয়া আটকাইয়া রাখিতেছেন। জমি লইয়া যে চোরা বাজার চলিতেছে, তাহার কথা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনবগত?

শ্রীপ্রফ্‌ল্লচন্দ্র সেন বলিয়াছেন সম্প্রতি যে ব্‌ষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ধানের ফসল শতকরা ৩ ভাগ নষ্ট হইয়াছে। কির্‌প সংখ্যা হিসাবে নির্ভর করিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। তবে আমরা

জানি ভারত সরকারের সচিববৃপে একজন বাঙালী যখন বলিয়াছিলেন, সে বৎসর বাঙলায় যে ধান হইবে তাহাতে বাঙলাকে বলা যাইবে—"তুমি দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন" তাহার কয়মাস পরেই বাঙলায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এবার ধানের ফসলে ফলন কিরূপ হইয়াছে, তাহার নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া গিয়াছে কি? শাকসব্জী উৎপাদনের জন্য আবশ্যক সার দেওয়া ত দূরের কথা, কৃষি বিভাগ এবার কৃষকদিগকে প্রার্থিত সারও দিতে পারেন নাই। তাহা কি যোগ্যতার নিদর্শন? ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সভাপতি স্যার দাতার সিংহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এক পরিকল্পনা জানাইয়াছেন—তাহাতে কলিকাতার নর্দমা বাহিত আবর্জনা হইতে প্রতিদিন অনেক সার পাওয়া যাইতে পারিবে। একথা নূতন নহে। গ্লাসগো মিউনিসিপ্যালিটি ঐরূপে সার প্রস্তুত করিয়া কৃষিকার্যের জন্য বিক্রয় করিয়া থাকেন। এখন কথা—কতদিনে এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হইবে? গত বৎসর সময়ে গোল আলুর বীজ না পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; কৃষি বিভাগের যে কর্মচারী বীজের জন্য দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি নাকি আলু চাহিয়াছিলেন। এবারও যে সুব্যবস্থা হইয়াছে এমন বলা যায় না। আবার সারের অভাব। কেহ কেহ মনে করেন, মুসলিম লীগের সময়ে যে শাকসব্জী ৮ টাকায় বিকাইয়াছিল, গত বৎসর তাহার মূল্য ১০।১১ টাকা হয়—এবার, বোধ হয়, ১৫।১৬, টাকা হইবে। সার কোন চাষীকে কতটুকু দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার ভার বিশ্বাস করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডকে বা কংগ্রেস কমিটিকে দেওয়া হয়—গ্রামে গ্রাম্য সমিতি থাকিলে তাহাকেও সে ভার দেওয়া হয় নাই। সে ভার পাইয়াছেন বেতনভুক্ত "ও এ" চাকরীয়ারা। তাঁহারা স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ এবং স্থানীয় কৃষকদিগের প্রতি তাঁহাদিগের মমত্ববোধও নাই। চেষ্টা করিলে—ইচ্ছা থাকিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "কম্পোস্ট" সার প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেও যে পারিতেন না; তাহা নহে।

এই সময় বর্ধমানে ধান্যচাষীদিগের যে সম্মিলন হইয়াছে, আমরা তাহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। সরকারের অব্যবস্থায় যে চাউলের শ্রেণী বিভাগ নষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য—কারণ সে ব্যবস্থায় "মুড়ি মিছরির একদর" হইয়াছে। সরকার যে উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করিয়াছেন, তাহাও নহে। সেচের সুব্যবস্থাও করা হয় নাই। এমন কি যে "বোরো" ধান জলমগ্ন স্থানে হয়, তাহার চাষ যত বর্গমাইল স্থানে হইতে পারিত তত বর্গ বিঘা মাত্র স্থানে হইয়াছে। এই অবস্থায় কৃষক যদি—জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের বর্ধিত মূল্যের অনুপাতে ধানের বর্ধিত মূল্য না পায়, তবে চাষে তাহার উৎসাহ থাকিতে পারে না। সমস্যা যে জটিল, তাহা আমরা অবগত আছি। কারণ, মুদ্রাস্ফীতি দমিত করিতে হইলে প্রথমেই চাউলের মূল্য কমাইতে হয়। কিন্তু বাঙলায় দুর্ভিক্ষ কালে পাঞ্জাবের খাদ্যসচিব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত যে খাদ্যশস্যের মূল্য দিয়া কৃষককে করোগেটের টিন প্রভৃতি কিনিতে হয়, তাহার মূল্য কমাইলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যও হ্রাস করা প্রয়োজন। নহিলে একদেশদর্শিতার পরিচয়মাত্র প্রদান করা হয়। কিসে ধান চাষে অল্প ব্যয়ে অধিক ফলন করা যায় তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা করিতেছেন কি?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে হরিণঘাটা ক্ষেত্র মুসলিম লীগ সরকারের উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন তথায়, বোধ হয়, এক কোটি টাকা ব্যয়িত হইল। কিন্তু তথায় পরীক্ষাকালে দেশের লোক কি বিন্দুমাত্র উপকার লাভ করিয়াছে? যে বর্ষাধিককাল পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে কি হরিণঘাটায় উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের, গোজাতির উন্নতি সাধনের, ছাগের উন্নতি সাধনের ও মেষ পালনের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে? অথচ পশ্চিমবঙ্গে দুগ্ধের অভাব অত্যন্ত অধিক; দেখা গিয়াছে, ছাগের উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে তাহার যথেষ্ট উৎকর্ষ নষ্ট হইতেছে—দামও কমিতেছে না; সকলেই জানেন কলিকাতা হইতে মেষ লইয়া যাইয়া অস্ট্রেলিয়ায় মেরিনো মেষের উদ্ভব করা হইয়াছে। হংসাদির কথা আর না-ই বলিলাম।

পূর্ব পাকিস্থানে মিস্টার লিয়াকৎ আলীর উক্তির প্রতিধ্বনি নিবৃত্ত হইবার পূর্বেই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—

নদীয়া সীমান্ত হইতে পাকিস্থানের লোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশের একজন সহকারী সাব ইন্সপেক্টারকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

এই সংবাদ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আই সি এস-এর জুড়ী যুতিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যান কিন্তু অগ্রসর হইতেছে না। আলো ত দূরের কথা গ্যাসের যে আলো পাওয়া যাইতেছে, তাহা কবি মিল্টনের বর্ণিত নরকের "darkness visible" মাত্র। জনরব, এডমিনিস্ট্রেটর কয় হাজার নূতন লণ্ঠন দিবেন। তাহাতে অবশ্য আলো অধিক হইবে না। আমরা বলি—লণ্ঠনের ঠিকা মামুলী ঠিকাদারদিগকে দিবার পূর্বে কর্পোরেশনের চাকরীয়া ও বাহিরের লোক সকলকে উৎকৃষ্ট লণ্ঠনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া "ডিজাইন" আহ্বান করিলে হয় না? তাহাতে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

আমরা বলিয়াছি, গত ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩রা অক্টোবরের মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী কর্পোরেশনের হিসাবে দেড় হাজার টাকার পেনিসিলিন কিনিয়াছেন—তাহার কোন হিসাব পাওয়া গিয়াছে কি? আমরা কি আশা করিতে পারি, বিষয়টি সম্বন্ধে আবশ্যক অনুসন্ধান হইবে?

বিজ্ঞমুখের কথা

বাংলার সামাজিক জীবনে যে অনেকগুলো গলদ আছে, সে কথা সবাই জানেন। নতুন করে পুরানো কথা বললে 'কমনপ্লেস' অপবাদ কেনবার সম্ভাবনা আছে, এ কথাও মানি। কিন্তু যেগুলো মারাত্মক ত্রুটি, যেগুলো নিয়ে উলটে আমরা অহংকার করি—অবাধ্য সন্তানের গোঁয়ার্তুমির কাহিনীগুলো নির্বোধ জননী যেমন সালংকারে এবং সাহংকারে শোনাতে ভালবাসেন—যে নিন্দনীয় দোষগুলো জাতীয় বৈশিষ্ট্যের নামে চালাবার চেষ্টা করি, ইংরেজিতে যাকে বলা যায় 'বেন্যালিটিজ'—সেই সব পোজকে এক্সপোজ করলে স্বদেশ-দ্রোহিতা হয় না। ব্রাহ্মণোচিত কটূক্তি বা তীব্র ভাষণ না করে, গুরুমশাইগিরি না করেও সত্য কথা বলা যেতে পারে। দলাদলির যে মজ্জাগত স্পৃহা আর মুফতে মুনাফার যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে অল্প-বিস্তর রয়েছে, তার কিছু কিছু চিত্র সাহিত্যের মারফৎ চোখে আসে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে কল্পনার আমেজ আছে বলে হয় তো সে সব চিত্র অনেকখানি বাস্তব হয়েও আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে ভাবায় না। সাহিত্যিক সংস্কারক নন, এ কথা শরৎচন্দ্রকে বলতে শুনেছি। তবু তাঁর 'পল্লী সমাজ' বইখানা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েও সমানুপাতে কার্যকরী হয়নি। যদি হত, তা হলে একখানা বই পড়েই আমাদের চৈতন্যোদয় হ'ত আর পল্লীসমাজের চেহারাটা সত্যিই বদলে যেত সাধারণ পাঠকের আন্তরিক বোধশক্তির তাগিদে। ডিকেন্স, গলসওয়ার্দির রচনা পড়ে বিলেতে নাকি আইন-সংস্কারের প্রচেষ্টা হয়েছিল। এদেশে সাহিত্যিক বা লেখকদের কেউ 'সীরিয়সলি' নেয় না। অসংখ্য পত্রিকার উদরপূরক হিসেবে তাঁদের সামাজিক আসন। সিনেমার বই লিখলে তবে রেস্তরাঁয় চায়ের কাপে যা একটু-আধটু তুফান ওঠে। নইলে ধার করে বই পড়ার ফল আর কতটুকুই বা স্থায়ী হতে পারে।

তবে লেখকদেরও ত্রুটি আছে বৈ কি! তাঁরা ভাবাতে চান না কিংবা ভয় পান। মধ্যবিত্ত জীবনের আরামপ্রদ সুবিধা, অস্বস্তিকর অসুবিধাগুলোকে একটা মনোরম 'এ্যাটমস্ফিয়র' বা আবেশে জড়িত করেন। আমাদের জীবনের যথোচিত স্থানে যথোচিত সুড়সুড়ি বা চিমটি কেটেই তাঁরা ক্ষান্ত হন। গল্পলেখক হয়তো গল্প বেশ ভালোই লিখে চলেছেন। কিন্তু শেষ করে হুঁচোট খেতে হয়। মনে হয়, এ কি হল? এর পয়েণ্ট কোথায়? যদি বা থাকে, সেটা এমন কিছু নয় যার জন্য পাঠককে এতটা ধৈর্য বা সময় নষ্ট করতে হবে। তা ছাড়া দু চারটে প্যাঁচ ও মোচড় কায়দা-মাফিক লাগিয়ে এমন একটা বাঁধা পথে এনে ফেলেন লেখক তাঁর বিষয়-বস্তুকে যে গড়্গড়িয়ে আপনি চলে যায়। সোজা সড়ক থেকে নেমে আশেপাশে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে হাঁটবার ভরসা নেই। আজকাল 'ইডিওলজি'র দাসত্ব। স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ও গভীরতায় সাহিত্যের বিচার চলবে না। দেখতে হবে তার প্ল্যানটা কি? ছক কেটে বেরিয়ে যদি কেউ নতুন সাহসী পরীক্ষা করেন তো হলে সেটা নিরর্থক, নিরুদ্দেশ। কংগ্রেস সাহিত্যিক হলে ১৯০৬ কিংবা ১৯৩০ কিংবা ১৯৪২ সালের পটভূমি আর বিষয়বস্তু। ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়েও রচনা মন্দ্রমুখর। আর প্রগতিশীল লেখক হলে বেয়নেটের ছন্দের তাল তো আছেই। পাকা ধানের সোনার ফসল চোখে না দেখুন, তে ভাগার নাম তো জানা আছে। ধান কানা না হলেই তালকানা। বড় লেখকরাও চলতি পথের যাত্রী। 'ক্যারেকটার' অথবা চরিত্রগুলি টাইপস মাত্র। তারা পুরো মানুষ এবং স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে উঠতে জানে না। আর প্রেরণার বুদ্বুদ ফেটে গেলে, আঙ্গিকের কৌশলে অবচেতন মনের নিরুদ্ধ কাম-বৃত্তির চমকপ্রদ প্রকাশে সেটা পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে। শক্তি আছে চিন্তা নেই সত্যকল্পতা আছে, অভিজ্ঞতা বা জীবনবাহী উত্তাপ নেই। সুতো আলগা কিন্তু 'টুইস্ট' আছে। তেলের মধ্যে ভেজাল মিশিয়ে ঝাঁঝ ফোটানো যায়। নয়তো বাসি চালের গুঁড়ো আর সস্তার সবেদায় রঙীন দরবেশ পাকানো চলে।

তা চলুক। কিন্তু এ আত্মবঞ্চনা আর কতদিন? এখন একখানা কাগজ হাতে থাকলেই হল। অনেক সাহিত্যিকই হয় সম্পাদক নয় প্রকাশক বনে যাচ্ছেন। দু জনের হাতেই দলপতির চাবি-কাঠি। চটাবার উপায় নেই। স্তুতিবাদেই কাজ সারতে হয়। সম্পাদকের মুষ্টি যতই শিথিল হোক, মুষ্টি-যোগের মাহাত্ম্য কিছু কম নয়। আর সে মুষ্টির ভিতর দিয়ে প্রাপ্তিযোগ আছে। অতএব গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে প্রশস্তি রচনাই যুক্তিসংগত। আর সে সব প্রশস্তি স্বকীয় কাগজে অনায়াসে ছাপানো হয়। কেউ বা যুগান্তকারী কবি। শেকসপীয়র দান্তে ছাড়া আর কোনও কবি তাঁর সমকক্ষ নন। কেউ বা অখাদ্য গদ্য লিখে প্রথম সুসভ্য গদ্য রীতির প্রবর্তক বলে আখ্যা পেয়ে থাকেন। কেউ বা গম্ভীর-মূর্খতায় ধূমায়িত বহ্নি। পাণ্ডিত্যে অথবা ৭০-পন্থী সাহিত্যতত্ত্বে তিনি অদ্বিতীয়। কেউ বা নির্বান্ধব গোষ্ঠীপতি। নিজেই স্তাবকের অভাব পুষিয়ে নেন। আর যাঁর কেউ নেই, তাঁর প্রেয়সীর চুল আছে আর আছে ভাড়াটে ছাপাখানা। শুনেছি সাহিত্যিকরা নাকি ভয়ানক অভিমানী। সামান্যতম বক্রোক্তিতেই তাঁদের মানসিক ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু নাচতে নেমে ঘোমটা দিলে চলবে কেন? সাহিত্যের নামে যদি তাঁদের স্বাক্ষরে কোনও মাল চালান হয়, বাজারে তার পরখ হবেই। এবং লঘু-গুরু, প্রাসঙ্গিক ও অবান্তর মন্তব্যের জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকা উচিত। সমালোচনা সহ্য করার মতন সহিষ্ণুতা ও নিরাসক্তি না থাকলে এপথে পা বাড়ানো চরম নির্বুদ্ধিতা। "ইলুশ্যান" অথবা কোনও একটা রোমাণ্টিক মোহ নিয়ে প্রেমে পড়া যায়, ছেলেমানুষি করা যায় এবং তার ফলভোগও করতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞ সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ গুণ হল মোহনাশ। ঊর্ণনাভের তন্তুশোভা কেবল নিশির শিশির-পাতে। তাই বলে পাঠক-সাধারণের ওপর অবজ্ঞার দৃষ্টি থাকলেই সেটা সৃষ্টির ইঙ্গিত নয় যেমন আত্মম্ভরী হলেই কালোয়াত হওয়া যায় না। বিদেশী সাহিত্যিকের অনেক নজির অবিরাম উদ্ধৃত করা যায়—যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পাঠক-সমালোচকদের বুদ্ধিমান মনুষ্যপদ বাচ্যই করেন নি। কিন্তু আভিজাত্য-বোধ থাকলেই স্রষ্টা হওয়া যায় কি? যারা পড়ে এবং মন্তব্য করে, তাদের কথাও কিছুটা ভাবতে হবে বৈ কি! এই একটা জিনিষ আমি বুঝতে পারি না। মুখে বলি, আমরা প্রগতি-বাদী লেখক, 'পীপল'দের জন্যে লিখি তাদের জাগ্রত করবার জন্যে কলম ধরেছি। অথচ মনের মধ্যে আছে সত্য অথবা মিথ্যা অভিমান,—বুদ্ধিজীবীর ঠুনকো কাঁচের পাল্লায় সুবিধা-বাদী লেখার প্রসাধন সাজিয়ে রাখি থরে-থরে। যখন যেটা চালু, পুঁজি থেকে সেইটে বার করি। দরকার মতন ব্যঙ্গ-কবিতায় কোনও মতবাদকে ধূলিসাৎ করি। আবার বাজারে চাহিদা বাড়লে সেই মতবাদকেই আশ্রয় করে ঝুলি-ভর্তি প্রশস্তি-মালার ফিরি করে বেড়াই। এই সব লেখক ভুলে যান, জনসাধারণের স্মৃতি-শক্তি স্বভাবতঃ দুর্বল হলেও বহু-রূপীর সাজ ও ভোল ধরে ফেলে অনেক ক্ষেত্রেই। কয়েকটা দুর্বোধ্য 'কনসীট' কিংবা অপ্রচলিত প্রতীকের সাহায্যে যেমন সত্যি-কারের 'প্রোগ্রেসিভ' লেখক হওয়া যায় না, তেমনি আবার সস্তা এবং পুরোনো ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুকে ভিন্ন পরিবেশে সাজিয়ে দিলেই জনগণপ্রিয় যুগান্তকারী সাহিত্যিক হওয়া যায় না। 'প্যাবলিক'কে পাঁঠার দল বলে উড়িয়ে দিলে নিজের গায়ের বোটকা গন্ধ ঢাকা যাবে না। 'কম্যুনিজম' করলেই প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়া যায় না, এটা ঠিক। সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, 'কম্যুনিজম' বিরোধী হলেই সে লেখক মস্তবড় সাহিত্যিক নন।

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

কেউ-ই লক্ষ্য করেনি কখন কাত্যায়নী দেবী এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছেন—নিঃশব্দে বাপ-ছেলের কথাবার্তা শুনছিলেন। প্রবীরের জন্যে তিনিও হয়তো উদ্বিগ্ন হয়ে বড় ছেলের কাছে পরামর্শের জন্যে ছুটে এসেছিলেন, যোগানন্দবাবুর মত তিনিও হয়তো আজ দিশেহারা হয়ে গেছেন। একটা নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে হঠাৎ পুলিশের আগমনে সব যেন কেমন ওলোট-পালট হয়ে গেছে—প্রতিদিনের নিশ্চিন্ত মুখের গ্রাসটা এখন কাঁটার মত বিঁধবেঃ হতভাগা ছেলেটা বাইরে কি করে বেড়াচ্ছে কে জানে।

কাত্যায়নী স্তব্ধ হয়ে আছেন। কে জানে মনে মনে তিনি বড় ছেলের অনুশাসন অনুমোদন করলেন কিনা। যোগানন্দবাবু কথা শেষ করতে বলে উঠলেন, গেলে তো ভাল—আজকের ভয়ের হাত থেকে বেঁচে যাবে। ভয়টা তো খাওয়া-পরার?

হঠাৎ যেন একটা সত্য বাক্য বড় অসতর্কতায় এবং আচম্বিতে বেরিয়ে গেছে। 'ভয়টা তো খাওয়া-পরার'—কথাটা নিঃশব্দে রাজরোষ ভীত অভিভাবক জনকের চোখের ওপর আঙুলের মত উদ্যত হ'য়ে রইল। সত্যি ভয়টা কিসের? পুলিশ কেবল এসেছে, আর তো কিছু করেনি! থেকে থেকে নিঃশব্দ ঝঙ্কারে কথাটা বিদ্রূপের মত রণিয়ে উঠে ঘরময় ছুটোছুটি করে।

যোগানন্দবাবু প্রশ্ন করেনঃ মানে? তুমি কি বলতে চাও ওর জন্যে সবাই মজবে? কেন?

কাত্যায়নী দেবী বললেন, তা বলবো কেন—জেলে যাওয়াটা যত সহজ ভাবছো তত সহজ নয়। কোথায় কার কথায় এ বাড়িতে পুলিশ এলো, আর সবাই মিলে অমনি মিছে সন্দেহ করে' ছেলেটাকে পর করতে বসলে! কেন পুলিশ আজ কি পেয়েছে?

যোগানন্দবাবু বললেন, পায়নি কিন্তু পরে পাবে তখন?

কাত্যায়নী দেবী যেন একটু হেসে বললেন, তখন ভেবো—যা মনে যায় করো। পুলিশে যা করতে আজ সাহস করলে না তা তুমি ক'রবে কেন? ছেলে তো তোমার চুরি-ডাকাতি করে' বেড়ায়নি!

যোগানন্দবাবু তাল রাখতে পারলেন না—বললেন, তা হ'লেই তো হয়েছে দুদিনে আর কিছু ও রাখবে নাকি? ও কি করে না করে তুমিই কি কিছু জান যে, ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেচো?

কাত্যায়নী দেবী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেনঃ খারাপ কিছু করে না তা জানি।

হুঁ তোমার কথা শুনলেই হ'য়েছে! আর ঐ জন্যেই তো ছেলেটা অতো বেড়েচে! শুনলে তোমার মায়ের কথা, যোগানন্দবাবু সমরের দিকে চাইলেন।

সমরের মনে হ'চ্ছে, মা তাকে শোনাবার জন্যেই বাবার সঙ্গে তর্ক করছেন—ভয়টা অমূলক প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন। সমরের কথায় কি শুধু প্রবীরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, তাই মা সন্ত্রস্ত হয়ে ছোট ছেলের পক্ষ নিয়ে তাদের মাঝখানে ছুটে এসেছেন? সমরকে কি ভাবছেন? আজকে মায়ের ব্যবহার আর প্রথম দিন প্রবীরের জন্যে বড় ছেলের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ, কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। মা কাকে বিশ্বাস করেন—সমরকে না প্রবীরকে? আজকে চাক্ষুষ এত বড় প্রমাণের পর প্রবীরের নিরীহতা বিশ্বাস করার কি মানে হয়? সেদিন প্রবীরের জন্যে তা হ'লে মা কি আশ্বাস চেয়েছিলেন—কি ভেবে আগে ভাগে প্রবীর সম্বন্ধে সাবধান হ'তে বলেছিলেন? ভায়ে ভায়ে বৈরিতার অনিবার্যতা তিনি সেদিন সন্দেহ করেছিলেন, তাই কি সমরের বুদ্ধি-বিবেচনায় স্বারস্থ হয়েছিলেন? কিন্তু মা অমন সন্দেহ করবেন কেন? সমরের মনে হ'লো, সেদিনের মায়ের ভাবনাটা আজ সত্য প্রমাণিত হ'য়ে গেছে—প্রবীরকে সমর ভাল চোখে দেখবে না। যেন মা বড় ধরে ফেলেছেন।

সমর বললে, খারাপ করতে যাবে কেন, সে তো আমরাও জানি। তা হ'লেও সাবধান হ'তে হবে তো। ওকে বুঝিয়ে বললেই হবে, তুমি বলো না।

যেন এতক্ষণ অবাধ্য ছেলেকে বুঝিয়ে বলবার পরামর্শ চলছিল। প্রতারণার মত মনে হয় সমরের আগাগোড়া ব্যাপারটা। ইচ্ছে সত্ত্বেও নিজের প্রভাব খাটানো যায় না এদের কারো ওপর। ছোট ভাই যা খুশী করুক তার বলবার কোন অধিকার নেই, বাবা যেটুকু মুখাপেক্ষিতার অপেক্ষা করছিলেন, মার কথায় তার উদ্দেশ্য যেন পরিষ্কার হ'য়ে গেছেঃ ভয়টা নিছক খাওয়া-পরার। মিছিমিছি মাথা ঘামান—কাকে ফেরাবে সে, আর কে-ই বা তার কথায় কান দেবে! প্রবীর অনেক বোঝে, অনেক দেখেছে, অনেক ভেবেছে—সে যুদ্ধে গিয়ে আর কি দেখেছে, কি বুঝেছে!

মায়ের ব্যবহারে অভিমান না করে' পা না সমর—বড় ছেলেকে মা বিশ্বাস কর পারেন নি; মনে করেছেন, ছোট ছেলের বিরু ষড়যন্ত্র চলছে। এ সংসারে তার কোন প্রয়োজ নেই—কোন শ্রদ্ধা, কোন বিশ্বাসের সম্পর্ক কেউ রাখতে চায় না তার সঙ্গে। যোগানন্দ বাবুর বিহ্বলতায় সমরের এখন বিরক্তিই বো হয়—একটা স্বার্থপর উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথ মনে পড়ে।

কাত্যায়নী দেবী আর কিছু না বলে চলে গেলেন। যোগানন্দবাবু খাটের ওপর চুপ করে বসে অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন। আ কোন সলাপরামর্শের দরকার আছে কিনা তিনি ভেবে দেখতে লাগলেন হয়তো। সমর জানালা কাছে দাঁড়িয়ে গলির মুখোমুখি বড় রাস্তাটা লোকচলাচল দেখতে লাগল। কে জানে ভবিষ্যতে ছোট ভায়ের সংসর্গ ক্ষতিকর কিনা কাকে বুঝিয়ে বলবে সে? একবার মনে হ'লো বাণীর অরবিন্দবাবুর কথাটাও বলে দেয়—দেখা যাক মা বাবা কি করেন! প্রবীরের মত তাঁরা অরবিন্দবাবুকে লক্ষ্য করেন কিনা? হঠা এই সংসারের অদ্ভুত একটা ক্ষতি করবা কলঙ্ক আনবার ইচ্ছে হয় সমরের—সংসারটা টিকটিকির কাটা ল্যাজের মত লাফায় না কেন! না, না, কোন দরকার নেই, এ সংসারের শান্তি নষ্ট হ'লেই বা, তার কি!

বাপের মুখের দিকে চেয়ে কিন্তু সম কেমন বেদনা অনুভব করে; বুড়ো বয়সে বাবার কি দুর্ভোগ, কি দুশ্চিন্তা! স সংসার করবার উপায় নেই। হঠাৎ এ বিগলিত হ'য়ে পড়ে যে, যোগানন্দবাবুর কি প্রস্তাবে রাজী হওয়ার কথা মনে হয় সমর বলবে নাকি সে বিয়ে করবে? তাঁর মনে পাত্রীকেই বিবাহ করবে?

বাণী ইতিমধ্যে কখন ঘরে ঢুকে জিনি গুছোতে আরম্ভ করেছে। বাণীকে দেখে সামলে নেয়। ছি ছি একি দুর্বলতা প্র করছিল সে! এত বড় একটা বিপদের সে নিজের বিয়ের কথা ভাবতে পারলে কি আশ্চর্য অদ্ভুত ভাবনা—হঠাৎ দিবাস্বপ্নের কি কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে মনের লঘুচিত্ততা!

বাণীকে দেখে মনটা হঠাৎ বড় সংস্কারধর্মী হ'য়ে ওঠে—বাবাকে মাকে দেবে সে, তোমাদের মেয়েটি গোপনে অ কীর্তি করছেনঃ অরবিন্দ নামে কোন ছো কাছ থেকে নিয়মিত রাশি রাশি চিঠি পা সেদিকে তোমাদের লক্ষ্য আছে? মেয়ে শাসন করেছো কোনদিন? সব যে যার মত, খুশী মত, খেয়াল মত ভেসে বেড়াচ্ছে

কেন? আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন ক'রতে পারনি? কেলেঙ্কারী হ'তে কতক্ষণ? সামাজিক, ব্যবহারিক, লৌকিক নীতিবোধ যেন সমরকে পেয়ে বসে। বাণী এবং অরবিন্দবাবুর মধ্যে পত্র বিনিময়টা ঔদ্ধত্যের মত মনে হয়। কতই বা বয়েস হ'য়েছে বাণীর? না না, এ ভাল নয়—বাবা মার জানা উচিত। মেয়েটি এত খারাপ হ'য়ে গেছে! বিচ্ছিরি কান্ড কারখানা যত সব। নীতিজ্ঞানটা বড় খোঁচাতে থাকে।

সমর গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করেঃ হ্যাঁরে এই অরবিন্দবাবুটি কে? এত চিঠিপত্তর—সবটা সমর শেষ করে না, যোগানন্দবাবুর দিকে চেয়ে দেখে প্রশ্নটার কি প্রতিক্রিয়া হয়। যোগানন্দবাবু খুব উৎসুক হ'য়ে উঠেছেন বলে' মনে হয় না। পূর্বের মতই নিশ্চেষ্ট হ'য়ে তিনি বসে থাকেন।

সমর আবার জিজ্ঞেস করলে, কে এই অরবিন্দবাবু, পুলিশে যাঁর খোঁজ করছিল? তোর সঙ্গে এত আলাপই বা কেন?

প্রশ্নটা বড় রুক্ষ, রসকসহীন, অপ্রিয়—বাণী শুধু বিরক্তই হয় না, অপমান বোধ করে। দাদার যদি এতটুকু সম্ভ্রমবোধ আছে! 'আলাপই বা কেন?' বড় কানে বাজে, মনে লাগে—ব্যক্তিত্বকে অপমান করে। আলাপ থাকাটা কি অপরাধের? অরবিন্দ কে? এ বাড়িতে কেন? এ কথার মানে কি?

বাণীর হ'য়ে যোগানন্দবাবুই জবাব দেনঃ প্রবীরের বন্ধু—আগে খুব এখানে আসতো।

বড় বোকা মনে হয় সমরের নিজেকে—অরবিন্দবাবুর পরিচয় জানতে বড় বাড়াবাড়ি রকমের কৌতূহল প্রকাশ করেছিল, আপন সন্দেহের হীনতাটা আপনাকেই অপ্রতিভ করে' তোলে নিজের কাছে নিজেই অপরাধী বলে মনে হয়। প্রবীরের বন্ধু না হয়ে যদি শুধু বাণীরই আলাপী কেউ হ'তো তাতেই বা কি এসে যেত সন্দেহটা সত্যি হ'লেও সে কি করতে পারতো? বাণীকে ভালবাসার ভুল পথে যেতে না বলার তার কি অধিকার আছে? আর বললেও বাণী শুনবে সে-কথা! সে একদিন ভালবাসেনি? অলকা যখন প্রথম ভালবাসে তখন সে বাণীর মত ছিল না?—কত আর বয়েস ছিল? তার আগেও অলকা কাউকে ভালবেসেছিল না কি? সন্দেহটা এখনই মনে স্থান পায় ভালবাসার আবিলতা নিষ্ঠার কোন মানেই হয় না। আর বিশ্বাসই বা কি? তবুও গুরুজন হিসেবে বাণী-অরবিন্দ পত্রবিনিময় চোখে লাগে, বেহায়পনা মনে হয় সমরের। বাপ ভাই মাথার ওপর থাকতে কোন অনূঢ়া মেয়ের এ রকম করাটা উদ্ধত স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া আর কি। বাণী এত স্বাধীন হ'য়ে গেছে? এ স্বাধীনতা ও পেল কার কাছে? সমরের কিছুতে সহ্য হয় না—তারা মানবে না আর বাণী ভালবেসে ফেলবে? বাণী তাদের অভিভাবকত্ব অস্বীকার করেছে, এত বড় স্পর্ধা!

বাপের ওপর সমরের বেশী রাগ হয়। জেনে শুনে উনি চুপ করে আছেন! মেয়েকে শাসন করতে পারেন নি? এ রকম একটা গুরুতর ব্যাপারে উদ্বেগের কোন বালাই নেই। প্রবীর যা করেছে তার চেয়ে বাণীর অপরাধ কি একশ গুণ সাংঘাতিক নয়? ওরা কি চিঠি লেখালেখি করে বাপ মার জানা উচিত নয় কি? হোক প্রবীরের বন্ধু, তবু তাঁরা এত মেলামেশাই বা করতে দিলেন কেন? জানেন না, এর শেষ ফল কি?
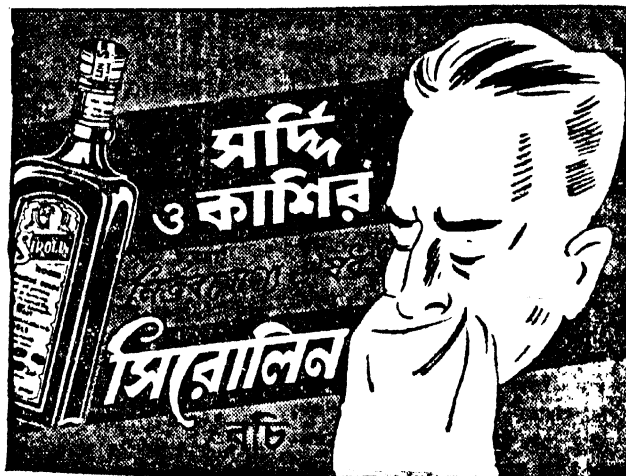
মুখে সমর বললে, ও। সেই জন্যেই পুলিশে সন্দেহ করে। ভদ্রলোক কি করেন?

যোগানন্দবাবু বললেন, কি আর করবে—প্রবীরের মত টো টো ক'রে দেশোদ্ধার করে বোধ হয়।

সমর লক্ষ্য করে বাণী ঘর ছেড়ে চলে গেল। বাণীর কাছ থেকে চিঠিগুলো চেয়ে দেখবে নাকি? বাপ মাকে দেখাবে? কি করলে যে মেয়েটাকে কষ্ট দেওয়া যায়!

Take away all the lette s—shut up her in a room—Insult the gallant gentleman! Stupid scandalous

সমর বাণীকে শুনিয়ে বলে, বেকার! পুলিশে লোক চেনে! যত সব ছেলেমানষী! Idiocy.

সমরের মত যোগানন্দবাবুও এদের ছেলেমানষীতে বিশ্বাস করেন কিনা বোঝা যায় না। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলেন তুমি যা ভাল বোঝ কর—তোমার মার কথাই ঠিক. একটা যুক্তিটুক্তি করে বুঝিয়ে সুজিয়ে যা হয় করা যাবে।

একলা ঘরে সমর চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থাকে। মনে মনে হাসি পায়. কাকে বোঝাবে সে? নিজেকে না, আর কাউকে? ওদের যা খুশী ওরা করুক, কি বয়ে গেছে তার ওদের বোঝাতে? সব উৎসন্নে গেলেও তার কি এসে যাবে! সে এখানে থাকতে আসেনি। সে চলে যাবে। অলকা প্রবীর বাণী অরবিন্দ তখন কোথায় থাকবে! কার জন্যে কে মাথা ঘামায়? এখন মনে হ'চ্ছে, সকালবেলা পুলিশের ব্যাপার নিয়ে এতক্ষণ ধরে হৈ চৈ করাটার কোন মানে হয় না। প্রবীরকে ধরে নিয়ে গেলেই বা কি? অমন দেশোদ্ধার তো অনেকে করে—বাহাদুরীর কি আছে! তার কি, সে চলে যাবে! তবুও একবার যেন পিছন ফিরে তাকাবার দরকার হয়। কিন্তু কতদূর দেখা যায়। শৈশব, কৈশোর লালিত অতিবাহিত হওয়া এই পরিবেশ এই আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব—এই [illegible]রোডের পৃথিবী। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাবনা-কামনার পরিবর্তনের পক্ষে এই ছ'ট. বছর কি খুবই দীর্ঘ? যতদূর মনে ক'রতে পারে সমরের মনে হয়, যুদ্ধ হবার আগে পর্যন্ত তাদের মত যুবকের কোন মতে একটা চাকরি যোগাড় করা ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না—যে কোন প্রকারে অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করবার ক্ষমতা অর্জন করলে তারা কৃতার্থ হ'য়ে যেত। আর কি তারা চাইতো? আর কি তারা ভাবতো? রাজনীতির ধারে কাছে তারা কোনদিন ঘেঁষেনি। সে দিনগুলো কি অবিমিশ্র সুখের, কি অবিমিশ্র দুঃখের ছিল? যুদ্ধাবস্থায় যে দুর্দিন এসেছিল শত্রু নিধনেও তা কাটেনি কেন? এই যুদ্ধে যে

বিপ্লব বাধলো তা কি মানুষের অন্তরকেও বিপ্লবমুখী করে রেখে গেল? প্রবীরের মত ছেলেরাও রাজনীতি করছে? পুলিশ পাহারা পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। অরবিন্দবাবুর প্ররোচনায় দীক্ষায় বাণীও কি রাজনীতির পাঠ নিচ্ছে? এত বড় যুদ্ধের পর এসব করে আর কি হবে—প্রবীররা কাকে হটিয়ে দেবে? কি ক্ষমতা আছে ওদের? এই বিবর্ণ নোঙরা কোলকাতাটা দেখেও কি ওদের মনে হয় না কি নিরর্থক ওদের এই প্রচেষ্টা! ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ করা এখন সোজা নাকি! সমর জানে ওদের শক্তি কোথায়—শক্তির প্রয়োগ কোথায় কিভাবে করতে হয় ইংরেজরা জানে। যুদ্ধে গিয়ে সমরের একদিনও মনে হয়নি, ইংরেজরা কোনদিন হেরে যাবে—ভারতবর্ষে তাদের জমিদারী হাতছাড়া হবে। বরং শত্রুর বিমান আক্রমণে কামান গর্জনে বাঁচবার অদম্য ইচ্ছা বারবার মনে হয়েছে আজ বাঁচতে পারলে কাল ব্রিটিশ সিংহের পক্ষপুটে অনেক সুখ ভোগ করা যাবে— ভবিষ্যতের সুখ অপরিমিত অচিন্তনীয়। অর্থ পদ মান কোন কিছুরই অভাব হবে না।

এক সময় সমরের কেমন ধারণা হয়, তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত সুখের অন্তরায় এই প্রবীররা। যুদ্ধ শেষে যে শান্তি আসতে পারতো এরা কয়েকজন মিলে তাকে আসতে দিচ্ছে না। এতদিন এরা কোথায় ছিল? কি করেছিল? বিকৃতবুদ্ধি অর্বাচীনরা জানে না তাদের এই অবিমৃষ্যকারিতার ফল কি। বিয়াল্লিশ সালের কথা বুঝি এদের মনে নেই—কত সহজে সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। প্রবীররা নেহাৎই ছেলেমানুষ, দেশের অবস্থা বোঝে না—ওদের পেছনে কারা আসবে? না, প্রবীরকে সাবধান করে দেবে, বুঝিয়ে বলবে—পাগলামো ছেড়ে দে। প্রবীরের বন্ধু অরবিন্দ? তাকেও কি সমর ও কথা বলতে পারবে! ছোকরার সঙ্গে বাণীর কি সম্বন্ধ? বাণী তাকে ভালবাসে? অরবিন্দ প্রেম করে? অত্যন্ত অন্যায়, অশোভন ব্যাপার। প্রবীরের বন্ধু বলেই এ বাড়িতে অবারিত দ্বার? বাবা-মা'র যদি কোন বিবেচনা থাকে? এখন যদি ওরা তার কথা না শোনে মুখ থাকবে কি?

অলকার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটি স্মরণ করা যায় না। আজকের দিনের মনোবেদনার সঙ্গে সেদিনের মনোহারিতার তুলনা করা যায় না। অলকা কি ছিল, কি হয়েছে! বৃথা আক্ষেপ! অলকার বাবা-মা কোনদিন সমর সম্বন্ধে বিপরীত কিছু ভেবেছিলেন কি না কে জানে। মনটাকে গুটিয়ে অন্তর্মুখী করে মনের গভীরে ডুব দিলেও কি সে-দিনের কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে আর?

নীচে রজনীবাবুর উচ্চ কণ্ঠের আলাপ শোনা গেল। যোগানন্দবাবুর বাড়ি পুলিশ পড়ায় ভদ্রলোক খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। পাড়ার লোকের ইতরতায় তিনি খুবই ব্যথিত লজ্জিত, ছি ছি এমন কাজও কেউ করতে পারে? ভদ্রলোকের বাড়িতে মিছিমিছি পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে কি সুখটা হলো কার?

রজনীবাবুর গলা পেয়ে সমর ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়িয়ে এল। আত্মকেন্দ্রিক মনটা এখন যে-কোন একজনের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে বড় উন্মুখ হয়ে আছে: সে রজনীবাবুই হোক আর গোপীজনবল্লভ বাগই হোক! এখন মনের কথা যেন সকলকে বলা যায়। এত সহজ হয়ে গেছে সমর.

সমরকে দেখে রজনীবাবু বললেন, দেখ দেখি বাবা, কি অন্যায়—বলা নেই, কওয়া নেই, পুলিশের হাঙ্গামা! অন্যায় অধারা.

অন্যায়টা কার এবং ধারা বহির্ভূত কে, সমর জিগ্যেস করবার আগেই রজনীবাবু বললেন, কখনো মনে করো না, পুলিশ শুধু শুধু এসেচে! নিশ্চয়ই কেউ খবর দিয়ে এসেচে—পাড়ার লোককে চিনি তো!

সমর ভেবে পেলে না পাড়ার এমন হিতৈষী কে আছে। যোগানন্দবাবু চুপ করে রজনীবাবুর কথা শুনতে লাগলেন। তার যেন বলবার, প্রতিবাদ করবার কিছু নেই—পাড়ার লোককে তিনি এত জানেন যে রজনীবাবুর কথা যদি সত্যি হয় তা হলে প্রবীরের কার্যকলাপে যত না মর্মাহত হয়েছেন তার চেয়ে বেশী মর্মাহত এবং বিস্ময়বিমূঢ় হবেন। নিজের ছেলেকে যে পরিমাণ বিশ্বাস না করেন তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস বোধহয় তিনি পাড়ার লোকদের করেন। সেই পাড়ার লোকই তাঁর বাড়িতে পুলিশ ডেকে আনবে আর এনেই বা দেখাবে কি? প্রবীরকে তাদের সন্দেহ কেন? বেকার ছেলে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন নিয়ে উদয়-অস্ত পথে পথে ঘুরে বেড়ায় বলে?

রজনীবাবু বললেন, প্রবীরের মত ছেলের নামে রিপোর্ট করা!—কখনো ভাল হ[illegible] ভেবেচো? রামঃ—যতই পয়সা হোক, এখা[illegible] চন্দ্র সূর্য আছে এর ফল পেতে হবে দেখে নি[illegible]

কিছুক্ষণ আগের ব্যাপারটি যেন রজনী[illegible]বাবুর বাড়িতেই ঘটেছিল। ভদ্রলোক ম[illegible] আবেগে অনুপস্থিত দুষ্কৃতিকারীর বিরু[illegible] অনেকগুলি সার্থক গালিগালাজ করেন।

সমর একেবারে থ হয়ে থাকে। মনে পড়ে[illegible] দেশের মাটিতে পা দিয়ে কারো মুখে যা [illegible] এতখানি স্বজনবৎসলতা প্রত্যক্ষ করে[illegible] রজনীবাবু অন্ততঃ সেই রকমই আছেন। [illegible] ছুটে আসেনি, উনি তো তবু বিপদে ছু[illegible] এসেছেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন। [illegible] বা আজকাল কে করে?

আবেগটা ক্রমশঃ যুক্তিধর্ম আশ্রয় ক[illegible] আরে পুলিশ এলেই হল্লো!—তাও করলো কি শুনি? এটা বুঝলি না যে বাড়িতে লো[illegible] সবে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে সে বাড়ি[illegible]

পুলিশের বাবার সাধ্যি আছে, কিছু সন্দেহ করে। বাবাজী আমাদের তো যে সে হ'য়ে ফেরেনি। রজনীবাবু বিজ্ঞের মত নিঃশব্দে হাসেন।

পুলিশকে যেন ঐ কথাগুলোই সমর সকাল বেলায় বলতে চেয়েছিল—যে যুদ্ধ থেকে ক্যাপ্টেন হয়ে ফিরে আসে তার বাড়িতে 'সিডিশন' সন্দেহ করে পুলিশের আসাটা বেয়াদপি। সমরের রাগ, দুঃখ, পুলিশ সাব্-টি সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। এর প্রতিফল একদিন সমর নেবে।

হঠাৎ রজনীবাবুর গলার স্বরটি বড় ক্ষীণ হয়ে আসে—মুখ নীচু করে বলেন, বেটাদের পয়সার গরম বিঁধেচে—রাতদিন কেত্তন গাওয়াচ্ছেন আর রেডিও বাজাচ্ছেন। কিন্তু এটা কি?—বেশ তো আছিস, আবার থানা পুলিশ কেন। ঐ বেটাদের কাজ, এখন তো আর তেমন চুরির সুবিধে হচ্চে না। দু বেটাই চোর।

যোগানন্দবাবু যেন একটু অবিশ্বাসের সুর তুলতে চোখ দুটোকে কুঞ্চিত করেছিলেন সবে, রজনীবাবু হাত নেড়ে বললেন হয় ঐ বাগ, নয় ঐ বেনী। খবর নিয়ে দেখ সত্যি কি না।

তারপর সমরের মুখের দিকে চেয়ে যেন সহায়সম্পদ যাচ্ঞা করলেন: বাবাজী ঐ দুটোকে এবার টিট করে দিতে পার। যুদ্ধে তো অনেককে টিট করে এসেচো। বড় বাড়িয়েচে—পাড়ার মাতব্বর সেজেচেন।

সমর খুব বেশী শ্লাঘা বোধ করে না। এতে তার যোগ্যতা স্বীকৃত হলেও যেন একটা অতি তুচ্ছ কাজে তাকে ডাকা হচ্ছে। হঠাৎ সমরের মনে হয়, প্রবীরের গতিবিধির খবর পুলিশকে রজনীবাবুই দিয়ে আসেন না তো রোজ? পাড়ার তিনিই গুপ্তচর নন তো?

রজনীবাবু আর বেশীক্ষণ বসতে পারেন না। যোগানন্দবাবুও সান্ত্বনা পাবার জন্যে আর তাঁকে ধরে রাখেন না। সমর নিয়মিত যুদ্ধ-ফেরৎ বন্ধুবান্ধব সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়ে।......

ক্রমশ

অনুবাদ সাহিত্য

'অনুশাসন'

স্টেফান জেরোম্‌স্কি

প্যানী ইভা ডমব্রডস্কা ট্রেন থেকে নেমেই তাড়াতাড়ি পেরিয়ে এলো স্টেশনটা। বাইরে কাদাভর্তি মাঠে একটা নড়বড়ে ঘোড়া-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভাড়া পাবার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েই গাড়োয়ান চাবুকের শব্দ করে ঘোড়া দুটোকে সজাগ করে তুললো—ঘড় ঘড় শব্দ করে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে এলো গাড়ি।

"আমাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পারবে?" প্রশ্ন করলে ইভা।

"কেন পারব না? আমরা সারাদিনই ঐ কাজেই তো আছি এখানে। তা' আপনি কি রোগী নিয়ে যাবেন?"

"না আমি নিজেই যাব রোগী দেখতে"—জবাব দেয় প্যানী ইভা।

"তাহলে উঠে পড়ুন।"

"কিন্তু ভাড়া কত নেবে?" ইভা জিজ্ঞেস করে নেয়।

"কত আর নেবো, আধ রুবল দিলেই চলবে।"

গাড়িতে উঠে বসলো ইভা। এবড়ো খেবড়ো পাথুরে পথ দিয়ে ঝাঁকতে ঝাঁকতে চললো গাড়ি। শহরের সীমানা পেরিয়ে গ্রামের দিকে পৌঁছতেই দূরে থেকে দেখা যায় হাসপাতালের দালান। স্বচ্ছ দিন, রৌদ্রস্নাত বসন্তের হাওয়া, পথে-প্রান্তরে শ্যামলিমার কোমল কান্তি—এরই পটভূমিকায় হাস-পাতালটাকে মনে হোলো বড় বেমানান বড় খাপছাড়া। ইভার কী রকম অবাক লাগছে হাসপাতাল আর তার চারদিকের শোভা দেখে। হ্যাঁ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষেই তো সে এখানে প্রথম আসে—অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে। কই তখন তো এ সব কিছুই চোখে পড়েনি তার। কে জানে হয়ত শোকের প্রথম আঘাতে আচ্ছন্ন ছিল তার মন। তবে কয়েকটা জিনিসের কথা বেশ মনে আছে—আর সেগুলো দেখে চিনতেও পারস ইভা পথের পাশে সেই ডালভাঙা শুকনো গাছটা—এক হাত কাটা লোকের মতই শোচনীয় অবস্থা তার। তারপর সেই আঁকা-বাঁকা মাইল স্টোন আর আচমকা পথের বাঁকটা।

হাসপাতালের বড় দালানের সামনে গাড়িটা এসে থামলো। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে ভারী একটা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো প্যানী ইভা ডমব্রডস্কা। সামনেই পাথরের সিঁড়ি। ওধারে অফিস রুম। একজন ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে অফিস-রুমে দেখা হোলো ইভার। খুব মারাত্মক রোগ নয় যাদের তারাই থাকে এ'র চিকিৎসাধীনে—ইভার স্বামী এদেরই একজন। কথাবার্তায় বেশ সহানুভূতিশীল মনে হোলো ডাক্তারকে। ইভার পাণ্ডুর মুখের দিকে যখন চাইলেন ডাক্তার কি অপূর্ব মমতাই না ফুটে উঠলো তার চোখে। ডাক্তার অনেক আশা দিলেন ইভাকে—বেশ ভাল ভাল কথায়। মনে হোলো এগুলো বোধ হয় তিনি প্রায় সব সময়ই রোগীর দর্শনপ্রার্থী মা, মেয়ে, স্ত্রীর কাছে বলে থাকেন।

চওড়া চত্বর পেরিয়ে একটা একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো ইভা আর ডাক্তার। হতশ্রী উদ্যান আর তার মাঝখানে একটা দালান। দালানের সঙ্গে প্রকাণ্ড লম্বা বারান্ডা চলে গেছে। বারান্ডায় উঠেই ডাক্তার ইভাকে বল্লেন—"আপনাকে কিন্তু বেশীক্ষণ দেখা করতে দিতে পারব না।" সম্মতি জানালো ইভা।

"তাহলে আপনি সিস্টার জুলিয়ার ঘরে একটু অপেক্ষা করুন। আমি নিয়ে আসছি আপনার স্বামীকে। তবে তিনি আপনার কাছে বেশীক্ষণ থাকবেন না। কারণ এখনও মাঝে মাঝে তার সেই পাগলামীটা দেখা দেয়। আর একটা কথা—আমি বাইরে বারান্ডায় অপেক্ষা করব। উনি যদি গোলমাল শুরু করেন তবে চট করে চলে আসব আমি।"

'বেশ তো'—জবাব দেয় ইভা।

কয়েকটা বন্ধ দরজা পেরিয়ে ডানদিকের ছ' নম্বর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো দুজন—ইভা আর ডাক্তার। দরজা খুলতেই সামনে একটা ঘর—বৈঠকখানার ধরনের। প্যানী দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, ডাক্তার চলে যেতেই বসে পড়লো সোফার উপর। এ ক'দিন ধরেই দুঃখ ভয় নিরাশা উৎকণ্ঠা অনবরত তার মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল কিন্তু এখন প্যানীর মনে এক সুদৃঢ় প্রত্যয়ের প্রদীপ্তি, বলিষ্ঠ সাহসের আভাস। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা দিয়ে ঢুকলো একজন—লম্বা ধরণের চেহারা, চুল এলোমেলো, অবিন্যস্ত বেশবাস।

তার স্নিগ্ধ নীল আয়ত চোখ দুটি স্থির কিন্তু কিসের একটা দীপ্তিতে চকচক করছে—দেখলে শঙ্কা হয়। জ্বরতপ্ত ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠছে অসহায়ভাবে। শুকনো জিভ দিয়ে বারবার বৃথাই ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করল পাগল। ডাক্তার কিংবা ইভা কারুর দিকেই তাকিয়ে দেখল না সে। হঠাৎ চিৎকার শুরু করে দিল—"ফোচিক ইয়াচেমস্কি লিখেছে কৃষিতন্ত্রের সম্বন্ধে আর আমি হেনরিক

ডমব্রভাস্কি লিখেছি সমাজতাত্ত্বিক পরহিতাত্মক পেয়াজতত্ত্ব সম্বন্ধে।"

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতেই প্যানী ইভার উপর চোখ পড়ল তার। এগিয়ে এসে এক টুকরো শুকনো চিজ প্যানীর চোখের সামনে নেড়ে নেড়ে বলে চললো পাগল—

"দেখ, দেখ, আমার সহধর্মিণী, আমার ধর্মপত্নী একবার তাকিয়ে দেখ, তোমার স্বামী এত রসিয়ে রসিয়ে কি খাচ্ছে।"

"আপনার স্ত্রীকে অভিনন্দন করতে ভুলে গেছেন প্যান ডমব্রভাস্কি—এটা উচিত হয়নি"—মৃদু তিরস্কার করেন ডাক্তার। "উনি এসেছেন আপনাকে দেখতে, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা কইতে আর আপনি তার সঙ্গে এই ব্যবহার শুরু করেছেন। আপনি এখনই আপনার স্ত্রীর হস্তচুম্বন করুন।"

একটু বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘরময় পায়চারি করে বলতে লাগলো পাগল—

"সমাধি ভালবাসা ও ব্যথা এ দুয়েরই স্মারক সমাধির রক্ষক সে তো ছায়া বই আর কিছুই নয়।"

দরজা দিয়ে অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। ইভা তার ছোট্ট ঝুড়ি থেকে এক বাক্স মিষ্টি বের করল। স্বামীর দিকে এগিয়ে দিতে এক রকম ছোঁ মেরেই নিয়ে গেল সে। বাক্স খুলে এক মুঠো মুখে পুরে চিবোতে লাগল—তারপর আর এক মুঠো—আরো এক মুঠো তারপর। সব শেষে বাক্সটা চাটতে লাগল। খাবারটা শেষ করে শুরু করল আলাপ করতে—কী উৎকট গলার স্বর। মাঝে মাঝে স্ত্রীর নাম ধরে ডেকে উঠল—ইভা—ইভুনিয়া—ইভুনিয়া—ইভা।

স্বামীর হাত ধরে পাশে বসাবার চেষ্টা করতেই এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল হাত। ইভা বিছানার উপর বসে রইলো হাতের উপর মাথাটা ঠেশ দিয়ে। স্বামীর সান্নিধ্য কেমন যেন অদ্ভুত লাগে ইভার। যখনই স্বামীকে স্পর্শ করেছে তখনই বেদনার তীব্রতায় ভেঙে পড়েছে ইভা, যেন অদৃশ্য ছুরিকাঘাত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্মূল করে দিচ্ছে। এক লহমায় মন তার চিন্তায় আকুল হয়ে উঠল—এই দালানটায় কি করে তার স্বামী রাতের পর রাত কাটিয়েছে—অনন্ত অন্ধকারময় রাত্রি। আর একবার অনুভব করতে চেষ্টা করল তার স্বামীর অসহ্য বেদনা, দুর্মর ভীতি। ইভার সমস্ত সত্তায় জেগে ওঠে আকুল আগ্রহ—স্বামীর ভয়ের সেই অদৃশ্য জগতের সঙ্গে লড়াই করবে সে—হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবে—সেই-জন্যই তো সে এসেছে এখানে। অদৃশ্য শত্রুকে চরম আঘাত হানবে সে। কিন্তু কে সে—কি তার স্বরূপ? প্রশ্ন জাগে ইভার মনে। অশুভ আত্মা? তাকে দূরে হটতেই হবে। কোন গভীর ক্ষত? কিন্তু সে তো দুরারোগ্য নয়! তাহলে কি শুধুমাত্র ভয়? কিন্তু ভয়ের মেঘও তো কেটে যায়। অসহ্য যন্ত্রণা? তাকেও নিরাময় করে তুলবে। ইভা—মনের জোরে, হ্যাঁ মনের জোরেই।

পাগল তার পায়চারি থামিয়ে দিয়ে ইভার সামনে দাঁড়াল মিনিটখানেক, তারপর বসে পড়ল বিছানার উপর। প্রচণ্ড হাঁই তোলা আর বিড়বিড় শব্দ চলেছে ক্রমাগত। স্বামীকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে মাথাটা বুকের ভিতর টেনে এনে মৃদু স্বরে বলে ইভা—"হেনরিক, এবার একটু স্থির হয়ে শোন আমার কথা। বসো—একটিবার বলো কি মনে হয় তোমার—এত ভাব-ই বা কি। আমি তোমাকে সবই বলে দিতে পারব। দেখবে কারুর সাহায্য ছাড়া আমি নিজেই ভাল করে তুলব তোমাকে।"

পাগল শোনে চুপ করে আর মেঝের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে।

"এখনও কি তোমার সব সময়ই ভয় করে?" একটু ঘন হয়ে বসে চুপি চুপি প্রশ্ন করে প্যানী ইভা আর নিজের গলার স্বরে নিজেই অবাক হয়ে যায়। সন্দেহ হয় একি নিজেরই গলা না অন্য কারুর।

একটা অস্ফুট আওয়াজ এলো হেনরিকের মুখ থেকে। ইভা নিশ্চুপ! কিসের যেন একটা অনুশীলনে নিমগ্ন তার মন। ইভা ভাবে আচ্ছা এমন কি হয় না যে, ইচ্ছাশক্তির বলে সে তার নিজের স্বাস্থ্য সংক্রমিত করে দেবে তার স্বামীকে। তাই ইভা অদৃশ্য হাতে বার বার খুঁজে ফিরলো তার স্বামীর অন্ত-র্বেদনার গভীর ক্ষতমুখ। অতলান্তের গভীরে ডুব দিয়ে সে পরিমাপ করতে চাইল তার প্রিয়তমের দুঃখ দরিয়া।

"শোনো, যখনই তোমার ভয় করবে—একটু স্থির হয়ে থেকো তখন—এখন যেমন রয়েছ—মিনতি করে ইভা।

"না, না, আমার সব সময়ই ভয় করে—সব সময়।"

"কেন, ভয় কিসের—বলো আমাকে—তোমার ইভাকেই বলো কিসের ভয় তোমার। কোন ভয় নেই তোমার, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

মাথা তুলে ঠিক আগের মত সপ্রেম দৃষ্টিতে ইভার মুখের দিকে চাইল হেনরিক; মুখে অসহ বেদনার নীল ছায়া। স্ত্রীর কাছে ঘন হয়ে বসে চুপি চুপি বললো, "জানো ওরা আমাকে নিয়ে যাবে।"

"কে বলেছে তোমাকে ও কথা? তুমি হাতটা ধরো—বসো এখানে—আমি সব বলব তোমাকে। তুমি তো জানো কত ভালবাসি তোমায়।"

"হ্যাঁ ওরা আমাকে নিয়েই যাবে, আবার নিয়ে যাবে"—স্ত্রীর মুখের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে বিড়বিড় করতে থাকে হেনরিক। তারপর হঠাৎ শুরু হয় তার পায়চারি—ঘরময় পায়চারি করে আর বলে, কোচেক ইয়া চেমস্কী কৃষিতত্ত্ব সম্পর্কে লিখেছে—এ—এ

প্যানীর হাতের পরে স্বামীর মাথাটা ন্যস্ত ছিল এতক্ষণ—এবার হাত দুটো ঝুলে পড়ল তার কোলের উপর। গভীর হতাশা ফুটে উঠলো মুখে চোখে। প্যানী ইভা কাঁদছে—কপোল বেয়ে অঝোরে ঝরছে জল। কাটা শিরা থেকে যেমন অনর্গল রক্ত বেরোয় তেমনি অন্তর নিংড়ে জল বেরিয়ে আসছে তার দুটি চোখে। গভীর বেদনার ক্ষত আজ হৃদয়ের চোরাবালি দিয়েছে উন্মুক্ত করে। অন্তরতম দুঃখের উৎস থেকে উৎসারিত হচ্ছে অনন্ত অশ্রুস্রোত।

বৃথাই চেষ্টা করেছে ইভা। বিশ্বাস? যে বিশ্বাসে পাহাড় টলে—কি মূল্য আজ তার! প্রেম? সেও নিষ্ফল। সমস্ত সংশয়ের অতীত যে ইচ্ছাশক্তি—কি নিরর্থক তা' আজ। মাথা নত করে বসে রইলো ইভা। পাগল স্বামী পাশে বসে পাগলামী চালিয়ে যাচ্ছে। ইভার দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে—ইভা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার স্বামীর উন্মাদ চাহনি, তার শিরসঞ্চালন, তার অস্থির হাতের দ্রুত ভঙ্গি, তার স্থূল দেহ.........

"কোথায় সেই অমর আত্মা?" গভীর দুঃখ বেদনার মধ্যেও এই প্রশ্নটিই বার বার ইভার মনে আসে আর অকারণ পীড়ন করে নিজেকে...

স্বামীর স্পর্শে সচকিত হয়ে উঠল ইভা। ফিরে তাকাতেই ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেল সে। কী অদ্ভুত লালসাতুর দৃষ্টি স্বামীর চোখে—কী কুৎসিত হাসি—কী জঘন্য অঙ্গভঙ্গি। লাফ দিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি পালাবার চেষ্টা করতেই স্বামী ওকে ধরে ফেললো। টের পেয়েই ছুটে এলেন ডাক্তার পাগলকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন কামরার অন্য প্রান্তে। ইভা ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে। অন্ধের মত চলেছে সে—কোথায় যাবে কিছুই জানে না। প্রথমে গেট—গেট পেরিয়ে সরু গলি—তারপর বড় রাস্তা। ইভা হেঁটে চলেছে মাথা নীচু করে। যন্ত্রের মত অসহায় তার গতি যেন বিরাট একটা শক্তি থেকে প্রোৎক্ষিপ্ত হয়েছে ওর গতি।

জল জমেছে রাস্তার এখানে ওখানে—পায়ের ছাপ পড়েছে ভিজে মাটিতে। একটা খঞ্জন নেচে নেচে ফিরছে জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে গা আর এক আধবার শিষ দিয়ে উঠছে। হাসপাতাল ছেড়ে এসে অবধি ইভার চোখে সবই মনে হয়েছে প্রাণহীন—মৃতকল্প। খঞ্জন যেন জীবনের স্পন্দন। আবেগে বলে উঠল ইভা—"কী খুশী রে তুই—ছোট্টপাখী কী খুশী তুই।"

পথের দুধারে ঘাসগুলোর দিকে চোখ ফেরালো ইভা। অযুত তৃণসম্ভার—ঝলমলে কচি শীষগুলো যেন উপেক্ষা জানাচ্ছে পথের কঙ্করময় বন্ধুরতাকে। দূরে প্রসারিত প্রান্তর—বসন্তের বর্ষণে সিক্ত। ঘন নীল জল জমেছে এখানে ওখানে। সুদীর্ঘ ফুলের সারি। স্তবকে স্তবকে ফুটেছে অগ্নিবর্ণ বাটারকাপ—ইবর্ণসিক্ত। তরুগুল্মের ছায়ায় ফুটে উঠেছে

নীলাভ মার্সভায়োলেটের পেলব গন্ধ। আর চারিদিকে তৃনদল ঝলমল করছে কণক কিরণে। ইভার চোখ বারবার ঘুরে ফিরলো তৃণগুল্মের শ্যামল শোভায় আহরণ করলো অদৃশ্য শক্তি—নতুন জীবন ফিরে পেলো যেন সে। তার সারা মনে একটি কথারই গুঞ্জরন—"কী খুসী রে তুই কী খুসী।"

আকাশে বাতাসে বসন্তের স্নিগ্ধ আমেজ। নানা বর্ণের বিচিত্র শোভা চারিদিকে। রসসিক্ত কিশলয়গুচ্ছ বাতাসে আন্দোলিত তৃণদল। ইভার মনে দোলা লাগে, বনজ ওষুধ যেমন বিষের প্রতিক্রিয়া করে তেমনি করেই চারিদিকের শোভায় ধুয়ে মুছে গেল ইভার মনের যত গ্লানি।

বড় সড়কের ডান হাতে চলে গেছে পায়ে-চলার পথ মাঠের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে। সে পথের পানেই উড়ে গেল খঞ্জনটা। ইভা অজান্তেই ওকে অনুসরণ করে চললো। ভুলে গেল ওটা স্টেশনের পথ নয়। ঘুরে বেড়ালো খানিকক্ষণ তারপর মাঠের উপর এক জায়গায় বসে পড়ল শ্রান্ত ইভা। অদ্ভুত একটা অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সারাদেহ, যেন বহুক্ষণ ধরে হেঁটে এসেছে একটানা। মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত দেহ দুলে উঠছে কিন্তু মন চলে গেছে বহু দূরে—ইভার দুঃখের সঙ্গে যেন কোন সংযোগ নেই তার। চারিদিকে রূপে প্রান্তরে পরম প্রশান্তি—দৃষ্টি প্রসারিত সুদূরে। ইভার কাছে আজ সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার জীবন এরকম না হয়ে অন্য রকমও তো হতে পারতো; কেন হোল না। এ সব সমস্যার-ই সমাধান খুঁজে পেল ইভা। কিছুই আজ তার মনের অগোচর নয়।

অস্ফুট স্বগতোক্তি করে চলে ইভা:

সত্যই মানুষকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর অতলে ...রে। কোন সমারোহ নেই তার—কোন গোপনতা নেই মৃত্যুর। কসাইয়ের মতো নির্মম তার ছুরিকাঘাত। নিজের খেয়াল খুশীমত হাসি মুখেই আঘাত করে মৃত্যু। এতটুকু করুণা নেই কারুর পরে। তাহলে আমরাই বা কেন করুণা দেখাবো—কেন—কেন......

নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে ইভা। পড়ে থাকে তার স্পন্দনহীন দেহ। হঠাৎ ট্রেনের বাঁশী সচকিত করে তুলল ইভাকে। তাড়াতাড়ি বেশবাস সংযত করে ছুটলো স্টেশনের দিকে। স্টেশনে পৌঁছে হাঁপাতে আরম্ভ করেছে সে। কখন ট্রেন আসবে খোঁজ করতে গিয়ে দেখে সেই ভদ্রলোক। হলদে বেড়াটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—মাটিতে নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। কিন্তু ইভা জানে সে দৃষ্টির কাছে কিছুই অগোচর নয়। মুখের হাসিটিও কি অদ্ভুত। ইভা পৌঁছতেই ভদ্রলোক একবার চোখ তুলে চাইলেন। সে চোখের ভাষা পড়তে পারে ইভা—সে দৃষ্টি যেন বলছে —"আমাকে যদি চলে যেতে বলো তাহলে চলে যাব এক্ষুনি।"

ভদ্রলোককে ইভা জানে। কোন একটা এনজিনিয়ারিং ফার্মে নকলনবিশের কাজ করেন। স্বামীর অসুখের আগে ইভা তাকে তার বাড়ির পথ দিয়ে যেতে দেখেছে। ফ্যাক্টরীর পর ফিরতি পথে পার্কে বেঞ্চের উপর বসে থাকতেও দেখেছে তাকে। সন্ধ্যাবেলা সে একা একা বসে থাকতো। শুধু তাই নয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেও দেখেছে ভদ্রলোককে। ইভা তার বন্ধুর মারফৎ খবর পেয়েছিল ভদ্রলোক নাকি বড় ভাল আর খুব পরোপকারী। ইভা জানতো যে ভদ্রলোক তার সম্বন্ধে সব জানেন আর সেটা যে তার বন্ধুর মারফৎ নয় এও জানতো ইভা। ইভাকে ভদ্রলোক যে কতটা ভালবাসেন ইভার তা অজানা নয়—তার চোখের চাহনিতেই ধরা

পড়ে সে ভালবাসার গভীরতা। কিন্তু কতটা কতটুকু ইভা। ভদ্রলোক তার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা করেননি কখনো। তাহলে কি রক্ষা ছিল। কত কুৎসাই না ছড়িয়ে পড়ত ওর নামে। ভদ্রলোক ওকে দূরে থেকে দেখেই খুশী—কখনও দিনে একবার অথবা দু-তিন দিন অন্তর একবার।

স্বামীর অসুখের ভীড়ে এসব কথা বেমালুম ভুলে ছিল ইভা। এমনি হতাশা তাকে ঘিরে ধরেছিল যে সুখের সামান্যতম সম্ভাবনাকেও মনে করত অশুভসূচক আর অযথা পীড়ন করত নিজকে। তাই এত চেনা লোকটিকেও আজ সে ঠিক ঠাহর করতে পারে না। সত্যি সত্যিই দেখেছে তাকে না সে স্বপ্নে দেখা মানুষ। তবে ভদ্রলোকটিকে দেখলে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দময় মুহূর্তগুলি ফিরে পায় ইভা—ফিরে পায়জীবনের সেই রবিরশ্মি-দীপ্ত দিনগুলি।

ভদ্রলোককে স্টেশনে দেখতে পেয়েই ইভা তাড়াতাড়ি ওয়েটিং রুমে ঢুকে পড়ল—একটা টিকেট কিনে কাঠের বেঞ্চের উপর বসে রইলো চুপচাপ। জানলা দিয়ে দেখা যায় ভদ্রলোককে—তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একগুচ্ছ মার্শভায়োলেট—দৃষ্টি নিবন্ধ তাতে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ভদ্রলোক প্ল্যাটফরমে পায়চারি করছেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারবার ইভার দৃষ্টি আকর্ষিত হোলো ভদ্রলোকের প্রতি। টুপির উপর রোদের আলো এসে পড়েছে—আর কী চমৎকার মানিয়েছে ওর সুন্দর চুলের সঙ্গে। পাতলা ওভারকোট হাতে মার্শফুলের গুচ্ছ, সুষম গতিচ্ছন্দ—কিছুই এড়ালো না ইভার চোখে। বেদনাবহ্নিতে দগ্ধ ইভার হৃদয়, বীতবহ্নি—আছে শুধু অঙ্গার। তারই ধূমে ভ্রংশ বুদ্ধি, হৃদয়ও অনুভূতিহীন, অসাড়।

ট্রেন এসে গেছে। খালি একটা কামরায় উঠে বসলো ইভা। কিছুক্ষণ পর ইভার অজ্ঞাত-পূজারীও এসে উঠল সেই কামরায়। একটা কোণে জায়গা করে নিল সে—দৃষ্টি তখনও নিবন্ধ রয়েছে মার্শফুলের গুচ্ছে। গাড়ি ছেড়ে দিল তক্ষুনিই। প্যানী ইভা উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়েছে বাইরে প্রকৃতির পানে। গাড়ির দ্রুতগতির তালে তালে ইভার মনও উধাও—দূরে বহুদূরে। কতক্ষণ পরে ইভার মনে হোলো যেন পথের বন্ধুটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। ইভা জানে তার দিকেই তাকিয়ে আছে ভদ্রলোক। কী আকুল আগ্রহ নিয়েই না সে বসে আছে মাত্র একটিবারের জন্যও যদি ইভা চোখ তুলে চায়। ইভা তো জানে এমনি একটি মুহূর্তের জন্য কী গভীর প্রত্যাশা নিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটেছে ভদ্রলোকের।

ইভার হৃদয়েও দোলা লাগে। আকুল হয়ে ওঠে সমস্ত অন্তর ভদ্রলোককে দেখবার আগ্রহে। তার মুখ, তার হাসি, তার আঁখির ভাষা—সব কিছুর জন্যই আজ উন্মুখ হয়ে উঠল ইভা। "আমি কেন দুঃখ পাব—কি করেছি আমি যার জন্যে আমাকে কষ্ট পেতে হবে"—বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ইভার অন্তরাত্মা।

সমস্ত দুঃখ কষ্টের প্রতি এমনি বিরূপ হয়ে উঠল ইভা যে এখন যদি ভদ্রলোক ইভাকে তার বুকে টেনে নেন তাহলে ইভা যেন কেঁদে বাঁচে—যেন নিংড়ে বের করে ফেলে তার দুঃখ কষ্ট। ভদ্রলোককে ভালবাসবে ইভা—ছায়ার মত ফিরবে তার। যেমনি চালাবে সে তেমনি চলবে ইভা। ইভা কেন কষ্ট করবে? এমনি অজস্র চিন্তা করতে করতে মাথা মুখ গরম হয়ে উঠল ইভার। খানিকটা অন্যমনস্ক হবার জন্য আসন ছেড়ে উঠে এলো জানালার কাছে। সবুজ শস্যক্ষেত্র, শ্যামল প্রান্তর দূরে সরে সরে যাচ্ছে। হাসপাতালের লাল চিমনীটা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। ধোঁয়া উঠছে চিমনী থেকে। গাড়ির দ্রুতগতি আর ঘস ঘস আওয়াজ ছাপিয়ে ইভার কানে যেন ভেসে এলো সেই অভিশপ্ত সুর—

> সমাধি ভালবাসা আর ব্যথা
> এ দুয়েরই স্মারক
> সমাধির যে রক্ষক সে তো
> ছায়া বই আর কিছুই নয়।

ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ল মন। এ গানের অর্থ অজানা নয় ইভার। গানের সুরটি অবধি মূর্ত হয়ে উঠল তার মনে। এতো স্বামীর কণ্ঠস্বর নয়—এ শুধু একটা সুর। বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে উঠল ইভা। ঠোঁট দুটি শক্ত করে বন্ধ করে বসে পড়লো বেঞ্চের ওপর। ফুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে ইভা। ভদ্রলোকই ফুলগুলো রেখেছেন ওখানে—ইভা যখন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তখন। ফুলগুলো দুহাতে তুলে নিলো ইভা—চেয়ে রইলো তার বর্ণমাধুরীর দিকে। মনে মনে বলে উঠল—"দেরী, বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে।" অনেকক্ষণ ধরে এমনিভাবে বসে রইলো ইভা—ব্যথা বেদনায় বিধুর তার মন। একবার চোখ তুলে চাইল সে—কী করুণ তার দৃষ্টি। আস্তে আস্তে একটা একটা করে ফুল মেঝের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মিনতির সুরে বললো ভদ্রলোককে—"বড় অসুস্থ আমার স্বামী—বড় বেশী অসুস্থ"—যেন ইভা তার নিজের কাজের কৈফিয়ৎ দিচ্ছে।

ভদ্রলোক বসে রইলেন নিথর হয়ে। শহরের ঠিক আগের মাঝনামাবার স্টেশনটা অবধি অপেক্ষা করলেন ভদ্রলোক। স্টেশনটা আসতেই নেবে গেলেন—তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে দিলেন শহর অভিমুখে—

ইভা তাকিয়ে রইলো তার চলে যাওয়ার দিকে। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখলো তার সুন্দর চুলের গুচ্ছ আর কান পেতে শুনলো তার পদক্ষেপের অস্পষ্ট আওয়াজ।*

অনুবাদ—বেলা দত্ত

---

* এই গল্পটি পোলাণ্ডের কথাশিল্পী স্টেফান জেরোমস্কির 'Taboo' গল্পের অনুবাদ।

ফড়িং ধরে খাওয়ার হিড়ক!

আমেরিকা হলো এমন একটি দেশ যেখানে ছোট-বড় সবাই—সর্বদাই একটা অদ্ভুত নূতন কিছু করে সবাইকে তাক লাগাতে চায়। সম্প্রতি জর্জিয়া প্রদেশে কলেজ ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জীবন্ত গঙ্গা ফড়িং ধরে খাওয়ার হিড়িক পড়ে গেছে। এখানে একটা গঙ্গা-ফড়িং ঐভাবে চিবিয়ে খেলে দেড় ডলার থেকে কুড়ি ডলার পর্যন্ত বাজি জেতা যায়। এই বাজি জেতবার লোভেই ডার্লাপটে নির্ঘিন্নে ছেলে-মেয়েগুলো সম্প্রতি এই নূতন অদ্ভুত খেয়াল খেলা আরম্ভ করেছে। আপনারা হয়তো ভাবছেন 'জীবন্ত গঙ্গাফড়িং কি ক'রে খায় তারা ? কেমন লাগে ইত্যাদি নয় কি ? এমন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তাদের ঐসব প্রশ্নই করা হয়েছিল। প্রশ্নের জবাবে একটি মেয়ে বলেছে, "ফড়িংটা গলা দিয়ে পেটের ভেতরে যাওয়ার সময় গলাটা একটু সুড়সুড় করে আর মনে হয় গলার ভেতরটা আঁচড়ে বা ছড়ে যাচ্ছে।" গঙ্গা-ফড়িং খাইয়ে একটা ছেলে বলেছে "গঙ্গাফড়িং খাবার সময় মনে হয় জ্যান্ত ঘাস চিবোচ্ছি।" অর্থাৎ যা বোঝা যাচ্ছে গঙ্গাফড়িং খুব বিস্বাদ বস্তু নয়, খেয়ে দেখলে মন্দ হয় না!

৩০টি বেড়াল স্বামীর চেয়েও প্রিয়তর!

সম্প্রতি ইংলণ্ডের ঊর্ধ্বতন বিচারালয়ের এক আপীলের মোকদ্দমায় ভারী একটা মজার খবর জানা গেছে, সেটা আপনাদের না জানিয়ে পারছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে মিসেস্ এডিথ্ অ্যামেলিয়া উইনান তাঁর দুটি ঘরওয়ালা বাসা-বাড়ীতে ৩০টি পোষা বেড়াল নিয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। এতগুলি বেড়াল পোষা নিয়ে অ্যামেলিয়ার সঙ্গে তাঁর স্বামীর প্রায়ই মতান্তর ঘটতো কিন্তু অ্যামেলিয়া তাঁর কথায় বড় একটা কান দিতেন না। শেষে ব্যাপারটা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে অ্যামেলিয়ার স্বামী মিঃ স্যামুয়েল জন প্রেস্টন উইনান রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যান। এ ব্যাপারটা ঘটে ১৯৪৪ সালে। অসহায়ভাবে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যাওয়ার অপরাধে অপরাধী করে অ্যামেলিয়া তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। কিন্তু সে মামলা খারিজ হয়ে যায়। মামলা খারিজ হওয়ার পর মিঃ উইনান ঘরে ফিরে বেড়ালগুলিকে বিদায় করার জন্য স্ত্রীকে অনুরোধ জানান। কিন্তু মিসেস অ্যামেলিয়া উইনান বলেন,—তা তিনি পারবেন না, কারণ তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসেন তাঁর পোষা ঐ তিরশটি বেরালকে।

এর ফলে আবার আপীলের মামলা সুরু হয় এবং বিচারালয়েও মিসেস উইনান ঐ ঘোষণা করায় বিচারপতি তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদই ব্যবস্থা করেছেন।

লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড!

সাড়ে ঊনিশ বছর আগে ২১ বছর বয়স্ক সিসিল রাইটকে মাত্র দু'ডলার তেতাল্লিশ সেণ্ট মূল্যের ডাক-টিকিট লুকিয়ে রাখার অপরাধে সানফ্রান্সিস্কোর জেলা আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি তাতে দমে যান নি। আনকোরাঙ্গ জেলে বসে তিনি আইন অধ্যয়ন করে আইনজ্ঞ হন। এবং এর পরে তিনি তাঁর শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল করেন এবং আপীলের মামলায় নিজেই নিজের মামলা পরিচালনা ক'রে সাড়ে ঊনিশ বছর পরে গত ৬ই নভেম্বর মুক্তিলাভ করেছেন। মুক্তিলাভের পরই তিনি ইলিনয়ের চাউসটনে গিয়ে তাঁর যৌবনের...প্রেমাস্পদা বেউলা ব্রাইমেরীর সঙ্গে দেখা করেন। কারণ এই মহিলাটি এতদিন বিয়ে না করে তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। শোনা যাচ্ছে খুব শীগগরী তাঁদের দু'জনের বিয়ে হবে এবং তিনি আইন-ব্যবসায়ে যোগ দেবেন। এখন তাঁর মুক্তির পর সকলেই বলছেন—সত্যিই লঘুপাপে গুরুদণ্ডের চরম উদাহরণ এইটিই। এমন কাণ্ড আমেরিকাতেও হয়!

বক্তৃতায় বিপত্তি

সম্প্রতি ইংলণ্ডের ক্রয়ডন শহরে ভাইস এডমিরাল স্যার জন রুসেল, রয়াল নেভি ওল্ড কমরেডস এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দিতে উঠে ভারী এক মজার কাণ্ড করেছেন। বক্তৃতা আরম্ভ করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করলেন। তারপর যথারীতি সভাকে সম্বোধন এবং ভূমিকা শেষ করার পর—তাঁর হাতের কাগজের দিকে একবার তাকালেন, তারপর আর একবার দেখলেন কাগজগুলো নেড়ে চেড়ে। তারপর একটু হেসে বললেন—"বন্ধুগণ, আমি ভুল করে, বক্তৃতা লেখা কাগজের বদলে—নিয়ে এসেছি আমার স্ত্রীর দেওয়া বাজার করার ফর্দটা......। অতএব লিখে লিখে যাঁরা বক্তৃতা দেন তাঁরা অতঃপর বাজারের ফর্দ সম্বন্ধে সাবধান হবেন?

সাড়ে ঊনিশ বছর প্রতীক্ষায় থাকার পর—বেউলা ব্রাইমেরী পেলো সিসিল রাইটকে!

দেরাজ

সুশীল রায়

টেবিলের ওপর দুটো পা তুলে দিয়ে বসে-ছিলাম। এভাবে বসার ভঙ্গী দেখে কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু কারো আপত্তিকে পরোয়া না ক'রে নির্বিকার ব'সে আছি। আমার ঘরে আমিই তো রাজা। সে-ঘরের টেবিল আমার রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। সেটা বসার জিনিস না হ'তে পারে, কিন্তু রাজসিংহাসন তাকে মনে করায় ক্ষতি কি? সুতরাং আমি রাজকীয় ভঙ্গীতে ব'সে বসে পা দোলাচ্ছিলাম। পা দোলাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম, কারো আপত্তিতে আমার এ-আরাম নষ্ট হ'তে দেওয়া উচিত কি না। টেবিলের ওপর টুকিটাকি জিনিসপত্র আছে কয়েকটা,—থাক না। আমার বাঁ-হাতের কাছে একটা তে-পায়া। সামনের র‍্যাকে বই। ওদের দিকে তাকালাম। ওদের দেখে মনে হলো ওরা যেন বিশেষ খুসি না আমার ওপর। আমার এ-রকম বেকায়দায় বসা দেখে ওরা যেন অসন্তুষ্ট হ'য়েছে। হোক্। কারো চোখ-রাঙানিকে কেয়ার করার ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ চোখ পড়লো দেরাজের দিকে। পা নামিয়ে সোজা হ'য়ে বসলাম। দেরাজ টেনে খুললাম। এক গাদা কাগজ জড়াজড়ি করে প'ড়ে আছে ওর মধ্যে। বন্ধ ক'রে দিলাম।

কাউকে কেয়ার করার ইচ্ছে নেই বল-ছিলাম কিন্তু দেরাজের দিকে চোখ পড়তেই আমার অজানিতে পা দু'টো চট্ করে নেমে এলো কেন, তাই ভাবছি।—আমি ওকে সমীহ তা হ'লে করি নিশ্চয়। সমীহ করি কিনা, তা স্পষ্টভাবে জানা ছিল না। আজ তার দিকে চোখ পড়া মাত্র থতমত খেয়ে যাওয়াতেই হঠাৎ যেন নিজের কাছেই ধরা প'ড়ে গেলাম। সত্যি দেরাজকে আমি শ্রদ্ধা করি।

প্রাণের কথা অকপটে খুলে বলতে পারি এমন কেউ নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু দেরাজ আমার সব কথা জানে। ওটা যদি হাটকে দেখা যায়, তাহ'লে আমি পুরোপুরি বে-আব্রু হ'য়ে যাবো নির্ঘাৎ। তাই মনে হচ্ছে—আমি আমার অজানিতেই আমার সব গোপন ও আপন কথা ওর কাছে ব'লে ফেলেছি। অজানিতে বলে ফেলেছি বলেই অজানিতে ওকে শ্রদ্ধা করতেও শুরু করেছি নিশ্চয়। তে-পায়া আর র‍্যাকেরা তো আমার কোনো খবর রাখে না। দেরাজের মতো ওরাও আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে, কিন্তু তবু যেন ওরা আমার আপনার নয়। কিন্তু দেরাজ ওদের মতো মুখ হাঁ করে বসে নেই। তার পেটের মধ্যে আমার সব খবর পুঁজি ক'রে বসে আছে। আমার লম্বা জীবন-টাকে জড়িয়ে জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ও যেন নিজের মধ্যে তা ধ'রে রেখেছে। আমার এই অর্থহীন জীবনকে যে অমূল্য সম্পদের সম্মান দিচ্ছে, তাকে সমীহ না করাটা অশোভন। তাই হয়ত ওর ওপর আমার টান জ'ন্মে গেছে, তাই নিশ্চয় আমি ওকে শ্রদ্ধা করি।

খণ্ড আর ছিন্ন কতকগুলি মুহূর্তকে এক সঙ্গে বেঁধে দিলে যা দাঁড়ায়, তারই চলতি নাম নাকি জীবন। তা যদি হয়, তা'হলে দেরাজ তো আমার জীবনের জিম্মাদার। আমার মুহূর্ত-গুলিকে আমি একা বসে ব'সে রচনা করি, আমার সেই রচন আর সেই শব্দহীন বচন ও যেন লুফে ধ'রে ফেলেছে। অর্থাৎ আমি ওর কাছে ধরা পড়ে গেছি। আমার এই আত্ম-সমর্পণের কারণ কি, তা জানিনে। কিন্তু আমি নিয়মিত ওর কাছে ধরা দিয়ে যাই। আমাকে ধরতে পারে না ব'লে যারা অনুযোগ করে থাকে, তারা যদি আমার পিছু ধাওয়া না ক'রে আমার দেরাজটি হাত কবতে পারে—তাহ'লে আমি যে সত্যিসত্যি তাদের কাছে ধরা পড়ে যাব—এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আমার প্রত্যেক মুহূর্তের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের মুখে দেরাজ আমার দরকার। তাই হয়ত আমি ওকে এমন নিবিড় আত্মীয়ের মধ্যে আমার হাতের নাগালের মধ্যে রেখেছি। যে-কথা মনে পড়ে না, তা মনে করার জন্যে শরণাপন্ন হই দেরাজের। যে-কথা ভুলে যেতে পারি ব'লে ভয় হয়, তা চট্ করে চালান করে দিই দেরাজের কাছে। এতটুকু ইতস্ততঃ করা দূরের কথা, ও যেন আমার সময়কে লুফে নেবার জন্যে তৈরি হ'য়ে ব'সে থাকে। একটু টান দিলেই আমার সব কথা জেনে নেবার জন্যে প্রকাণ্ড একটা হাঁ বিস্তার করে দেয়।

জীবনে দেরাজের মত দেরাজ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। এমন অবাধ্য দেরাজও অনেকের আছে শুনেছি, কথা বললে তা কথা শোনে না, টানলে নড়তে চায় না, কোনো কথা বা কাজ বা কাগজ জিম্মা দিলে অন্যমনস্কের মত অন্য দিকে চেয়ে থাকে। সেই অন্যমনস্কতার ছিদ্র দিয়ে গড়িয়ে প'ড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় সব কথা ও কাজ।

জীবনকে যদি সহজ ও স্বাভাবিক সতেজ ও সবুজ রাখার ইচ্ছে কারো থাকে, তাহলে তাকে অবিলম্বে মনোমত একটা দেরাজের সন্ধান করবে হবে। বিশ্বাস করুন বা না-করুন—ঘরের আর পাঁচটা আসবাবের মধ্যে দেরাজই কিন্তু সবচেয়ে বেশি দরকারী। অবশ্য আমি তো তাই মনে করি। তাই দেরাজের ওপর আমার এই শ্রদ্ধা। আমার জীবনকে ওর হাতে সঁপে দিয়ে আমি সচ্ছন্দে মনের আনন্দে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারি। পকেট যদি ফুটো হয়, তাতে আমার কিছু যায় আসেনা। কিন্তু দেরাজ যেন সর্বদা মজবুত ও সুস্থ থাকে, এই আমার কামনা। পকেট ফুটো হলে তাতে আমার কতটুকুই-বা ক্ষতি! তাতে আমার পয়সা হয়ত পড়ে যাবে, কিন্তু ভরসা তো তাতে শেষ হবে না। কিন্তু একদিন যদি আমার ঘর নির্দেরাজ হ'য়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ আমার সব ভরসার সমাধি হ'য়ে যাবে। একদিন যদি সেই দেরাজের কোথাও ঘুণ ধরে, তাহ'লে আমার জীবনের নির্যাস নিমেষে উবে যাবে।

আমার লম্বা জীবনকে আগলে বসে আছে ওই দেরাজ। কখনো কোনো কথা মনে করার ইচ্ছে হলেই আমি ওকে ধ'রে টানি। দেখতে পাই স্তরে স্তরে ও আমাকে ওর মধ্যে সাজিয়ে রেখেছে, ওর ভাঁজে ভাঁজে আমার জীবনের সৌন্দর্য ও সৌগন্ধ মাখা। সাবধানতার সঙ্গে আমি আমার জীবনের বিশেষ একটি দিককে ওর মধ্যে থেকে বেছে বার করতে পারি। আমার অতীতের সঙ্গে ও মুখোমুখি আমাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, আমার মৃত-দিনের সঙ্গে ও আমাকে কথা বলিয়ে দিতে পারে, এমন যার ক্ষমতা, তার ওপর শ্রদ্ধা হওয়াই স্বাভাবিক। তাই ঘরের জন্য কোনো কিছুর ওপর আমার শ্রদ্ধার অভাব যদি ঘটেও, দেরাজের প্রতি অবজ্ঞা দেখাতে পারিনে কিছুতে। তাই, তাকে দেখে মাথা নত না হলেও আমার অজানিতে আমার পা নেমে আসে।

চেয়ারের মধ্যে জড়োসড়ো হ'য়ে বসে ভাব-ছিলাম—আমার কিছুই হারায়নি। পিছনে ফেলে এসেছি বলে যাদের নিয়ে আক্ষেপ করার কথা, তারা তো সবাই আছে আমার হাতের কাছে, তারা সবাই আমার দেরাজে ভর্তি। তাই দেরাজ ধ'রে টানলাম। টেনেই আবার বন্ধ করে দিলাম। না, গতকালদের কথা ভেবে এখন লাভ নেই। দেরাজও যেন আমার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিল। হাতের ইশারায় তৎক্ষণাৎ আবার ও বন্ধ হ'য়ে গেল।

ওর কাছে আমাকে বাঁধা রেখেছি, তবুও আমার ওপর ওর এতটুকু জুলুম নেই। আমার পরিপূর্ণ জীবনের ওপর এতবড় অধিকার প্রতিষ্ঠা করেও ও আমার ওপর প্রভুত্ব করতে চায় না। এটা কম কথা না। ও জানে আমি ওকে

শ্রদ্ধা করি। আমি ওকে শ্রদ্ধা করি ব'লে সেই দাবীতে আমাকে ও অশ্রদ্ধা করবে—এমন অভিসন্ধিও আমি দেখতে পাইনে ওর মধ্যে। ও আমার অতি পুরাতন ও অতি পরিচিত নয়। আমার জীবনের প্রথম দিন থেকে ও আমার সঙ্গ নেয় নি। কিন্তু তবুও আমার জীবনের প্রথম প্রভাত থেকে শেষ সন্ধ্যার মালিক হয়েই ওর যেন আবির্ভাব। আমি ধরে রেখেছি—আমার জীবন ওর কাছে বন্ধক প'ড়ে গেছে।

তাই আমিও হাল্কা। সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলায় আমার বিঘ্ন নেই। উদ্দাম গতিতে উল্কার মতো আমি চলে যেতে পারি। পিছনে তাকিয়ে আমাকে দেখে নিতে হয় না, এই ব্যস্ততার ফাঁক দিয়ে আমার কিছু পড়ে গেল কিনা। যদি তাড়াতাড়িতে কিছু ফেলে যাই, দেরাজ তৎক্ষণাৎ তা কুড়িয়ে তুলে রাখে। সহায় বা সম্বল না-হয় না বললাম একে। কিন্তু একে সাহস ও সঞ্চয়ের আধার হয়ত বলতে পারি।

কথা উঠতে পারে একটা কাঠের দেরাজের এত স্তুতি আমি করছি কেন। কাঠকে যারা নিছক কাঠ মনে করে তাদের সে মনে করার কোনো প্রতিবাদ করতে চাইনে। কিন্তু অনেক সময় কাঠও তো কথা কয়। আমি সেই রকম কাঠের দেরাজের কথাই এতক্ষণ বলছিলাম।

কিন্তু এরা কারা? এরা আমাদের সঙ্গী ও সহচর। এরা আমাদের আশ্রয় ও আশ্বাস। জীবনে যদি এরা না থাকতো তাহলে জীবন অসহায় ও অসহনীয় হয়ে যে উঠতোই—এ বিষয় সন্দেহ কারো নেই। মনে করুন, আপনার ঘরে দেরাজ নেই—ঘরময় কেবলই টেবিল। সেই উন্মুক্ত ও অবারিত জীবন নিয়ে আপনি কি তাহলে বিব্রত হতেন না? আপনার জীবনকে গুটিয়ে একটু আড়ালে রাখার ইচ্ছে যদি আপনার হতো তাহ'লে সেই খোলা টেবিলের বুকের ওপর রেখে আপনি কি তাতে একটুও স্বস্তি পেতেন? আমার তো মনে হয় এতে স্বস্তি পাবার কথা নয়। প্রকাণ্ড পৃথিবীটাকে একটা সমতল টেবিল বলে যদি মনে করা যায় তাহলেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। এই পৃথিবীতে ছোট ছোট ঘর বেঁধে বাস করার রেওয়াজ আছে—কেননা পৃথিবীর মাঝখানেও একটু আশ্রয় আমরা খুঁজি। আমাদের এই সন্ধানের পর আশ্রয় হয়ত পেয়ে যাই আমরা। তখন সেই ছোট আশ্রয়ও অনেক সময় অবারিত মনে হয় আমাদের। যখন এমন মনে হয়, তখনই খুঁজি দেরাজ।

দেরাজ আবার টানলাম। অতীতের দিনগুলো এক সঙ্গে কথা বলার জন্যে এক সঙ্গে যেন লাফিয়ে উঠলো। কোনো দিকে না তাকিয়ে ওকে চেপে বন্ধ করে দিলাম।

পুরানো বাঙলার শব্দার্থ বিচার

শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য

প্রকৃতির বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরণ-চাকের অনিবার্য ঘুরনটা চলেছে, চলে-যাওয়া জীবনের বলন-ভঙ্গীটি লিখে রাখার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু এই ঘুরনের তুলনায় লেখনের অংশটা এত কম যে ঝরে-পড়া ফুলের পাপড়ি জোড়ার মতো লিখে রাখা শব্দের অর্থসঙ্গতি করা দায় হয়ে পড়ে। পথের ধারে দরজা বন্ধ করা পাল্কির পাশে ঘাড় উঁচু করা দারোয়ানটিকে দেখে সকলেরই মনে যেমন পাল্কির ভিতরের জীবটির প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব জেগে ওঠে; বাঁকা চোখে পাগড়ির বাহার দেখে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা হয়, পাল্কির ভিতরের জীবটির খবর নেবার সাহস হয় না, সেইরূপ পুরানো বাঙলার চর্যাগুলির পাশে ভরং-করা টীকাটিকে দেখে পাঠকের মনে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার ইচ্ছা জেগে ওঠে, তার ভিতরের ভাবটিকে বুঝে নেবার ক্ষমতা থাকে না। তাই পথে-বসা পথিকের কাছে মনোরম অট্টালিকার মতো পাঠকের মনে চর্যার ধর্মটি মনোরম হয়ে ওঠে না।

চর্যাপদের ধর্মটিকে মনোরম করে তোল-বার ইচ্ছা যে থাকে না তা নয়, কিন্তু উপায় করা যায় না। কারণ চর্যাপদের বাঙলাটা পুরানো আমলের, বহরটা কিছু দরাজ। আজ-কালকার জ্ঞানের মাপকাঠিতে তাকে মাপতে পারা যায় না। তাই জানবার ইচ্ছাটা প্রবল হলেও বিদ্যার বহরে কুলায় না। আলন্ত দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো আমাদের গড়ে-ওঠা জ্ঞানকে হার-মানানো চর্যাগুলিকে টেবিলের পাশে রেখে দেবার ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় থাকে না। একটি চর্যায় আছেঃ

"ফাড্ডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ
আদয়দিটি টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ"

(বৌদ্ধ গান ও দোহা পৃঃ ১১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩) টীকার ব্যাখ্যায় বলে, "মোহতরুং বিষয়ং ব্যাবৃতিবশাৎ তমেব সংবৃতিবোধিচিত্তবৃক্ষং পাটয়িত্বা তস্য বিষয়গ্রহং খণ্ডয়িত্বা সততালোকং পাটকেন সহ একী-করণং ঘটয়তি। পুনরস্য ফলপ্রতিপাদনায় যুগনদ্ধপরশুনা দৃঢ়ং করোতীতি।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় তাঁর "চর্যাপদে"র ভাবানুবাদে এই লাইন দুইটির আধুনিক বাঙলারূপ দিয়েছেন—"মোহতরু ফাড়ি তার পাটগুলি জোড়, অন্বয়-টাঙ্গি দিয়া নির্বাণে কর দৃঢ়" (শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু চর্যাপদ, পৃঃ ১৯, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৩) তিনি এই টাঙ্গী শব্দটির প্রতিশব্দ দিয়েছেন কুঠার। কিন্তু চর্যাটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হলেই মনে হয় এখানে এই টাঙ্গী শব্দের মানে কুঠার হতে পারে না। আমি অবশ্য দার্শনিক নহি, ভাষাতত্ত্বের খুঁটিনাটি আলোচনাতেই এ জীবনের ভারিভুরি। তাই বাক্যের বাইরের বেশ দেখেই বিভোর হয়ে যাই, ভাবার্থের ভাবনা করবার সুযোগ হয় না। তবুও চলতি দৃষ্টি চলার পথে যেটুকু প্রারম্ভিক শক্তির পরিচয় দেয় তাতে মনে হয় সহজিয়ারা নির্বাণ কামনা করে; নির্বাণই যখন সহজিয়াদের কাম্য তখন তার দিকে টাঙ্গী ধরবে কি করে? সাধারণতঃ আমাদের যা কাম্য নয় তার দিকেই আমরা টাঙ্গী খাড়া করি, যা কাম্য তার দিকে নহে। সুতরাং নির্বাণ যখন সহজিয়াদের কাম্য তখন এখানে টাঙ্গী মানে কুঠার হতে পারে না। টীকাকারও তাঁর টীকাতে টাঙ্গীর অর্থে টাঙ্গী নামক অস্ত্রের উল্লেখ করেননি বলেই মনে হয়। তিনি বলেছেনঃ "পুনরস্য ফলপ্রতিপাদনায় যুগ-নদ্ধপরশুনা দৃঢ়ং করোতীতি"। এখানে পরশু অর্থে কুঠার ধরলে "যুগনদ্ধপরশুনা দৃঢ়ং করোতীতি" বলতে পারা যায় না। কারণ যুগনদ্ধ পরশুর দ্বারা যুগকে দৃঢ় করা সম্ভব নয়, শিথিল করাই সম্ভব। কিন্তু টীকাকার বলেন, "দৃঢ়ং করোতীতি"। সুতরাং এখানে 'যুগনদ্ধপরশুনা'র দ্বারা টীকাকার বোধ হয় দুটো কাঠকে জোড়া দেবার জন্য যে পরশী ব্যবহৃত হত তার কথাই বলেছেন। এখনো দুটো কাঠকে জোড়া দেবার জন্য দুধার বাঁকান যে গজাল পাওয়া যায় তাকে পশ্চিম বাঙলার কথ্য ভাষায় পরশী বলে। টীকাকার বোধ হয় এই পরশী অর্থেই পরশু শব্দটা ব্যবহার করেছেন। ইহার সংস্কৃতের রূপ কল্পনা করলে দাঁড়ায় প্রসু* (প্র পূর্বক সু ধাতু to press out, পীড়ন করা) এই প্রসুর প্রাকৃতরূপ পরসু*। এই প্রাকৃত শব্দটা সংস্কৃতের পর্শু ও পরশু শব্দের অনুকরণে পরশু হয়ে আবার সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করেছে বলেই মনে হয়। টীকাকার বোধ হয় সেই জন্যই "যুগনদ্ধপরশুনা" দৃঢ় করতে পেরেছেন।

এখন টীকাকারকে মানতে হলে টাঙ্গী মানে কুঠার হতে পারে না। আমরা আগেই আলোচনা করেছি টীকাকার টাঙ্গী শব্দটির প্রতিশব্দ দিয়েছেন পরশু। এই পরশু শব্দের আধুনিক বাঙলা রূপ পরশী। চর্যার টাঙ্গী শব্দটিও টানা শব্দে পরিণত হয়ে পশ্চিম বাঙলার কথ্য ভাষায় চলেছে। দুটো কাঠের জোড়কে শক্ত করার জন্য ছুতারেরা বাঁশের যে শলা তৈরি করে তাকে তারা টানা বলে। টীকাকারও পরশু শব্দের দ্বারা এই অর্থেরই আভাস দিয়েছেন। সুতরাং চর্যাটি আলোচনা করে টীকাকারের ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা সমীচীন বলে মনে হয়। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে আছেঃ

"ফাড্ডিঅ মোহতরু পটি জোড়িঅ
আদয়দিটি টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ"।

'আদয়দিটি' ও 'কোহিঅ' পদ দুটির পাঠান্তরে 'আদয়দিঢ়' ও কোড়িঅ' এই পদ দুটিকে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পাঠটি গ্রহণ করলে ঐ লাইন দুটির অর্থও পরিস্ফুট হয়ে যায়, টীকাকারের ব্যাখ্যাটিও খেটে যায়। পাঠান্তরের পদ দুটি গ্রহণ করলে দাঁড়ায়ঃ

ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ
আদয়দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোড়িঅ

একে সংস্কৃতে পরিণত করলে দাঁড়ায়ঃ

পাটয়িত্বা মোহতরুং পাটিকাঃ জোটয়িত্বা
অদ্বয়দৃঢ়টঙ্গিকয়া নির্বাণে কটিতঃ

এর আধুনিক বাঙলা রূপ হয়ে যায়—মোহতরু ফেড়ে পাটগুলি জুড়ে নির্বাণের জন্য অদ্বয়রূপ দৃঢ় টানা দিয়া জোড়টি কড়া (শক্ত) করা হয়েছে।

আমরা আবার আসব

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

সাহানা চলো আমরা পালিয়ে যাই।
গভীর রাতে রক্তাক্ত পৃথিবী অবসন্ন : ভোরেই রুখে দাঁড়াবে
ওই দেখো আকাশে কত কত তারা, তারাই পথ দেখাবে
সাহানা, চলো আমরা পালিয়ে যাই।

আধো আলো আধো ছায়ায় হাত ধরাধরি করে
আমরা দুজন পাশাপাশি এগিয়ে যাবো।
দমকা হাওয়ায় হয়ত তোমার চুল উড়বে, চুল ঘুরবে—
সেই আবেশেই পথ চলার আনন্দ পাবো।
পরস্পর বাহুর বাঁধনে স্রোতের শেয়ালার মত ভেসে যাবো।

এখানে ভালোবাসা নাই হৃদয় নাই
এদেশে মানুষ নাই।
সাহানা চলো আমরা পালিয়ে যাই।
কত পথ কত মাঠ, বালুচর পেরিয়ে পেরিয়ে
বনপাখীর মত ভেসে ভেসে চলে যাবো আমরা
বিজন বনের ধারে হয়ত রাতের শকুন ডেকে উঠবে
একদল নিশাচারী শৃগাল হয়ত চীৎকার করে উঠবে
পায়ের পাশ দিয়ে হয়ত একটা অজগর চলে যাবে।
ভয় কি সাহানা! ওরা মানুষ নয়।
সাহানা ওরা বিনা কারণে কারো ক্ষতি করে না।
পথ চলতে চলতে তোমার দু পা অবশ হয়ে আসবে
তোমার মাথা আমার বুকে নুয়ে পড়বে—তেষ্টায় প্রাণ ফেটে যাবে
নাম-না-জানা রূপলেখা নদীর তীরে
বটের পাতা ছিঁড়ে
তোমায় জল পিয়াবো, চোখে মুখে ছিটিয়ে দেবো।
সাহানা আমরা আবার পথ চলবো।

যেখানে পথের শেষে দেখবো রক্তের বিশ্রী গন্ধ নেই
যেখানে ভানুমতীর মাঠের ধারে সোনার ধানেরা ঝিলমিল করছে
যেখানে ময়নামতী বিলের পারে শিউলী শতদল উপচে পড়ছে
সাহানা আমরা সেখানে থামবো।
আমাদের অবসন্ন দেহ বটের ছায়ায় এলিয়ে দেবো।
বুকের উত্তাপে শ্রান্তির মেঘ কেটে যাবে—কেটে যাবে—
তারা ফুলেরা মাটীতে এসে বাসর সাজাবে।
সোনালী রোদে কোয়েলের গান শুনে জেগে উঠবো।
সাহানা আমরা সেখানে চখা-চখীর নীড় বাঁধবো।
তুমি মাটী ছেনে ছেনে হাতে তুলে দেবে
আমি ঘরের বাতা গড়ে তুলবো।
তুমি ধান ভিজিয়ে বীজ তৈরী করে রাখবে
আমি ধান বুনবো।
সাহানা আমরা স্বর্গ গড়ে তুলবো।

সে দেশে ভালোবাসা আছে, হৃদয় আছে
সেদেশে আজো খাঁটী সোনার মানুষ আছে।
সাহানা সেদেশে আমরা একা নই।
সেই আমাদের চল্লিশ কোটি মানুষের সোনার দেশ।
সাহানা, সেই আমাদের আসল দেশ।

সে মানুষদেরে আমরা ভালোবাসবো
সে মানুষদেরে আমরা আদর করে বুকে তুলে নেবো।
সেদেশে আমরা একা নই।

দুপুরের কড়া মাঠে কাস্তে হাতে আপন সুরে গান গাবো আমি—
সুরের আগুনে পুরুষের কাস্তে শাবল ধারালো হয়ে উঠবে।
ঘরের দাওয়ায় অগ্নিবীণায় আগুন ঝরাবে তুমি—
সে আগুনে নারীর মহাশক্তি উদ্‌বোধিত হয়ে ফুটবে।
অশোকের শিলালিপি কালের ঝড়ে মুছে গেছে
হজরত মোহাম্মদের বাণী মানুষে ভুলে গেছে
রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা শয়তানেরা ধ্বংস দিয়েছে।
আমরা আবার নতুন করে শিলালিপি খুড়বো
সাহানা আমরা মানুষ গড়বো।
সেদেশে আমরা একা নই।

মনে পড়ে, গ্রানাডায়, সাত সাগরের ঢেউয়ের দোলায়
তাইগ্রীস ইউফ্রেটিস পারে ... সভ্যতার উদ্‌ভব?
মনে পড়ে শ্যাম-কাম্বোজে ওঙ্কার ধামে
তাম্রলিপ্তির ডাইনে বামে
স্বর্ণ দিনের উদ্‌গম......?

আমরা আবার মিছিল বানাবো
সাহানা আমরা মিছিল চালাবো।

তাঁতী জোলা জেলে মাঝি কামার কুমোর হিন্দু মুসলিম
চল্লিশ কোটি মানুষের সোনার ভারত।
এই আমাদের আসল ভারত।
সাহানা, এদেশ আমাদের।

এদেশের মান আমাদের মান
এদেশের গান আমাদের গান
এদেশের ধান আমাদের ধান
চল্লিশ কোটি ভাই বোন আমার প্রাণ।

আড়ালে আবডালে প্রাণ কেড়ে নিতে ছুরী শানায় যারা
আমাদের অস্থি-ইটে অট্টালিকা বানায় যারা
দুগ্ধপোষ্য শিশুর শোণিতে মেদিনী ভাসায় যারা
সেই লড়াই-ই এবার লড়ছি : লড়বো।
সেই শাবল-ই এবার গড়ছি : গড়বো।
পশুর মতন অনেক মরেছি : মরবো।

আমাদের অস্থি-প্রবালে নতুন উপনিবেশ গড়াবো।
দানবের পৃথিবীতে মানবের সবুজ পতাকা উড়াবো।
সাহানা আমরা স্বর্গ রচনা করে যাবো।
সাহানা, আমরা ইতিহাস হবো॥

যন্ত্রবেণী—কবি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। প্রকাশক জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দু টাকা।

লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন, এই গ্রন্থের ৫৬টি কবিতা 'প্রাচীন আসামী হইতে' নামে পূর্বে প্রকাশিত। সে ১৩৪১ সালের কথা। নূতন ৭৭টি কবিতা যোগ করে 'যন্ত্রবেণী' নামে আজ ১৩৫৫ সালে প্রকাশ হল 'আষাঢ়স্য' হয়তো 'প্রথম দিবসে'ই হবে। এও নতুন এক মেঘদূত, তবে প্রিয়ার নাম ধাম ঠিকানা লুকানো আছে এবং ভৌগোলিক পথের পরিচয়টা পাওয়া যায় না— হৃদয় হৃদয়ের কোন্ প্রদেশ দিয়ে কোথায় চলেছে তার কথা জানতে পারি। কবিতাগুলি প্রাচীন আসামীর ভাষান্তর এই ভাণ ত্যাগ করে কবি যে শেষ পর্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এজন্য তাঁকে প্রশংসা করি। ১৩৩টি প্রেমের কবিতা, প্রত্যেকটি চতুর্দশ ছত্রে সীমিত, সনেট বলব কি না সে তর্কে যেতে চাইনে। প্রাচীন আসামী বা পারসিকের অনুসরণে যে নয় তা তো জানতেই পারছি, হয়তো মেঘদূত ঋতুসংহার-চৌরপঞ্চাশিকার অনুরণনে কি না এ আলোচনা করলেও চলে না করলেও ক্ষতি নেই। কোকিল জাতের সৃষ্টিকাল থেকেই, বসন্তে বসন্তে পুং কোকিল নিশ্চয়ই বন-বনান্তর কুহু কুহু স্বরে আকুল করে আসছে এবং মনুষ্যজাতির মুখে যেদিন ভাষা জুটেছে সে ভাষায় ছন্দের দোলা লেগেছে, অমনি সে যে সঙ্গীতে ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে প্রিয়ার গুণগানে মুখর হয়ে উঠেছে এ বিষয়েই বা সন্দেহের অবকাশ কোথা? প্রেম মানুষের আদিম প্রবৃত্তি; আর, মার্কস্ইজ্‌ম্, ফ্রয়েডইজ্‌ম্, সকলের সব মার খেয়েও প্রেম শেষ পর্যন্তই টিকে থাকবে।। প্রেমিক যে সে এই কবিরই মতো (বিশ্বের সকল কালের সব কবির সঙ্গেই এ বিষয়ে তার মিল আছে) চিরদিন প্রিয়ার মধ্যে নিখিল জীবনের সকল সুখ-দুঃখ মন্থন করা পরম সুধা চরম বিষ, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য প্রতিমায়িত বলে উপলব্ধি করবে।

এই কাব্যের কবিতাগুলিতে রূপ যেমন অনবদ্য রেখায় রেখায় পরিস্ফুট, তেমনি আবার অনুরাগের রঙে রঙে ঐশ্বর্যময়। তার সঙ্গে আছে শ্রুতিতর্পণ পদসংঘাতসমুত্থ অপরূপ ধ্বনি সংগীত।

এই কাব্যে কবির একটি প্রিয়া যে বিরাজ করেছেন তাও নয় তাঁর এক দ্বিতীয়া আছেন, যাঁকে বলি প্রকৃতি। অথবা তাঁকে অনন্যা প্রেয়সীর মর্মসখীও বলা যায়, সমভাবে বিরহের ও মিলনের দিনে সর্বদা কাছে কাছে আছেন পাশে পাশে আছেন, হাসিকে আরও উজ্জ্বল এবং অশ্রুকে আরও করুণ করে আপন আলোছায়ার সম্পাতে; হয়তো কখনো বা এক সত্তা আর এক সত্তায় লীন— এমনও হয়েছে।

রসিক ব্যক্তি এই কাব্যখানি পাঠে যে আনন্দ পাবেন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি আর পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার দ্বারা তাকে খণ্ডিত বা ক্ষুণ্ণ করে লাভ নেই। যদৃচ্ছাক্রমে সম্পূর্ণ একটি কবিতা তুলে দিয়ে, আজকের এই অর্থনৈতিক অভাব ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার মধ্যেও অনবদ্য কাব্য সৃষ্টি যে সম্ভব হয়েছে সেই খবরটুকু কেবল জানানো যাক্।—

> তুমিই শরৎ মোর জানো কি তা সখী?
> কৌতুক-ফলিত নেত্র চমকি চমকি
> ঝরায় শেফালিপুঞ্জ অজস্র আলোল।
> অশাসিত চূর্ণালোক দেয় মোরে দোল
> প্রথম উত্তর বায়ে; তোমার অঞ্চল
> পাষাণ-মিলানো সে কি পরশ বিহ্বল
> আনে কোন্ জন্মান্তের, মনে হয় যেন
> সৃষ্টির প্রত্যন্তশায়ী নীহারিকা-হেন
> এ দেহ মিলায়ে গেল তোমার সত্তায়
> আত্মঅগোচরে; কম্প্র মরীচিকা-প্রায়
> রূপ তব, প্রেম তব দেয় হাতছানি—
> কোন্ রহস্যের পানে। জানি সখী জানি
> কুন্দ বিকশিত তব চরণের তালে
> কাননের প্রতি পুষ্পে জাগে প্রাতঃকালে॥
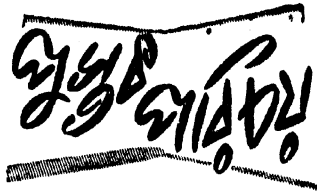
লীলাসঙ্গিনীঃ—আর্যকুমার সেন। প্রকাশক বেঙ্গল পাব্লিশার্স, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।

লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয় এবং সিদ্ধি তদুপযোগী। মহাকবি কালিদাস ঋতুসংহারে ষড়্‌ঋতুর রূপবৈচিত্র্য এবং ঋতুতে ঋতুতে উন্মদমত্ত তরুণ তরুণীর বিলাসবৈচিত্র্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। আর্যকুমার সমগ্র ঋতুসংহার ভাষান্তরিত না করিলেও তাহার প্রত্যেকটি ঋতু-বর্ণনার অনেকগুলি শ্লোকেরই অনুসরণ করিয়াছেন—ফলে মূল গ্রন্থের সার্থক আভাস পাওয়া যায় এবং কাব্যাস্বাদে রসিক চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ঋতুসংহারের এই অনুসৃতি বাঙলায় 'সংহার' বলিলেই যাহা বুঝি তা নয়। অর্থাৎ লেখক প্রত্যেকটি পদ বাক্য বাগ্‌ভঙ্গী রূপক উপমাদি অলংকার খুঁটিয়া খুঁটিয়া সঞ্চয় না করিলেও মূল কাব্যের রসে নিজের চিত্তকে এতখানিই রসায়িত করিয়াছেন যে পাঠকও মূলের ভাবনাবেদনার ভঙ্গী মূলের রস পাইবেন। 'হ্রস্ব' ও 'দীর্ঘ' স্বর মাত্রার হিসাবে সমান মূল্যের হওয়ায় বাঙলায় সংস্কৃত ছন্দের বিশেষ তরঙ্গভঙ্গী আনা যায় না, লেখক সে চেষ্টা করেন নাই তাঁহার বিশেষ গুণপনা এই যে, তিনি বাঙলা ভাষা ও ছন্দকে কোথাও দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া পীড়ন করেন নাই বা কোথাও ভারাতিশয্যে জড়ীভূত করেন নাই—ছন্দের সাবলীল গতি এবং ভাষার কৌলীন্য মুগ্ধ করে।

ঋতুসংহার ব্যতীত কালিদাসের রচনা হউক বা না হউক তাঁর নামে প্রচলিত, পুষ্পবাণবিলাস শৃঙ্গারতিলক শৃঙ্গাররসাষ্টক—এই তিনখানি কাব্যেরও কতকগুলি শ্লোকের ভাষান্তর আছে। সেগুলিরও প্রত্যেকটি বাঙলা কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট এ কথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না— কেবল একটিকে ব্যতিক্রম বলিয়া সন্দেহ হয়। শৃঙ্গাররসাষ্টকের প্রথম কবিতাটির অনুবাদ হয়তো আর একটু সংহত বা সংক্ষিপ্ত বা লঘুগতি হইলে খুলিত ভালো। মূল কবিতাটিতে শুধু কথার খেলা নাই, সেই সঙ্গে বেশ একটু হিউমারও আছে।

আমাদের দেশে সংস্কৃতের চর্চা ইংরেজি ভাষা-শিক্ষার গুরুভারে বা স্টীম রোলারের তলায় চাপা পড়িতে বসিয়াছে। দর্শনাদিতে বহুজনচিত্ত উৎসুক হইবার সম্ভাবনা নাই, এই গ্রন্থপাঠে সংস্কৃত কাব্যের পরিচয় গ্রহণে ও রসাস্বাদে কেহ যদি লুব্ধ হন, সেও সুখের বিষয় হইবে। আমাদের দেশে এরূপ হওয়া উচিত যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভালো না জানিলে অশিক্ষিত, বিশেষতঃ অবিদগ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। (সমালোচক জানেন, তিনি নিজেই সেই শ্রেণীভুক্ত।) 'লীলাসঙ্গিনী' এদেশের প্রাচীন রসবৈভবে চিত্তের লোভ জাগাইবে। চিত্তে দোলা দিবে। দোলা তাহাকেই বলি, যখন একটা কোনো গতি সূচিত হইয়া শীঘ্র তাহা থামে না, ঘটিকাযন্ত্রের দোলকেরই মতো। একটা কবিতা পড়িয়া শেষ হয় না, তাহার রেশ বাজিতে থাকে— হয়তো তাহা হইতে পাঠকের মনে নূতন কবিতা জাগিয়া উঠে। তাহার দৃষ্টান্ত দিব। এই কাব্যপাঠে অকৃতবিদ্য ভাষানভিজ্ঞ লেখকের লেখনীও চঞ্চল হইয়া লিখিল—বর্ষা।

> প্রফুল্ল মধুমালতীগুচ্ছে রচিত কবরীচূড়,
> ধারাবিধৌত বকুলে কুটজে হারাবলী অনুপম—
> বনের বিকচ নীপকুসুমের পরায়ে কর্ণপূর
> ভূষিছে বর্ষা রূপসী নারীরে প্রণয়ীকান্তসম।

শরৎ—

> শুভ্র কাশের স্তবকে খুশির হিল্লোল ওঠে দুলে,
> চন্দ্রমাকরে শুভ্র নিশার ক্ষণ,
> সরসীর কালো বক্ষ সেজেছে শুভ্র কুমুদ ফুলে—
> সপ্তপর্ণী প্রসূনে শুভ্র বন।

ফলতঃ, কালিদাসের প্রেরণে (কালিদাসীর হইলে লেখা চলিত 'কঙ্কনধ্বনিত করতাড়নে'। হায় স্বপক্ষত্যাগিনী পক্ষপাতিনী সরস্বতী!) আর্যকুমার চমৎকার কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন নিশ্চয়ই ইঁহারও প্রভাবে অনেক আজ-পর্যন্ত-অকবি কবি হইয়া উঠিবেন।

লীলাকমলের **দলগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া তাহার রূপ গুণ গৌরব নাই বা ব্যাখ্যা করিলাম।** (তাহাতে ধরা পড়িবারও সম্ভাবনা আছে।) কোথাও যে ফুটিয়াছে কোনো হরিণেক্ষণা ভামিনীর কুবলয় মুণ্ডিতে আন্দোলিত হইয়া সুরভি বীজন করিতেছে কেবল এই সন্দেশটুকুতেই অলিকুল চঞ্চল হওয়া উচিত।

তবু আর একটু বলা প্রয়োজন। আচার্য নন্দলালের বর্ণবিমোহন চিত্র প্রবীণ রাজশেখর বসুর অভয়বচন (কবির সাহস যেমন প্রচুর আছে মনে। অরসিক অশ্লীলতাদুষ্ট বলিবে ইহার চেয়ে বেশি ভয়ঃ আধুনিক পাশ্চাত্য গুরুর আধুনিক প্রাচ্য শিষ্য বলিবে যুগাবিধৃত নয় লেখকের উদ্দেশ্য হইল 'এসকেপিজ্‌ম্'।) ছন্দ ও ভাষাবিদ প্রবোধ সেনের পরিচিতি এবং অনুবাদক আর্য সেনের প্রবেশক কবিতার দ্বারা এই গ্রন্থের মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাপাবাঁধাই সাজসজ্জা সুন্দর। তবে বাঙলা বইয়ে পাঠাশুদ্ধি না থাক রীতিবিরুদ্ধ। মুদ্রাকর উক্ত প্রবেশকে সুন্দরীকে এক 'পায়ে' হাঁটিয়া প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, নির্দেশ-দাতাকে কিছু বলা বৃথা এবং সুন্দরীও নিশ্চয় দুই পায়েরই নূপুর ঝঙ্কারে মধু বর্ষণ করিয়া ভাগ্যবানের অভিসারে আসিবেন কিন্তু কথা হইল, অনিন্দ্যাঙ্গীর অলজ্জ তনুকে 'সলজ্জ' বলাতে লেখক নিজেই যদি 'সলজ্জ' বানান করেন তবে 'ঋতং' (প্রেস 'হিতং' নয়) মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ সখেদ এই কথাই কি বলিতে হইবে? এখানেও মুদ্রাযন্ত্রেরই ষড়যন্ত্র এরূপ জানিলে আশ্বস্ত হইতাম। এই কবিতাটি চমৎকার; ইহার দ্বিতীয়ার্ধে আর্যকুমার অখণ্ড ঋতুসংহারের নির্যাস যেন চতুর্দশটি ছত্রের ক্ষুদ্র সম্পুটে ভরিয়া আনিয়াছেন।

এই কাব্যগ্রন্থ রসিক সজ্জনের ঘরে ঘরে থাক্, হাতে হাতে ফিরুক।

চন্দ্রচূড়

প্রমোদ ব্যবসাতে যাঁরা লিপ্ত তাদের রুচিটা, যাকে বলে আর্টিষ্টিক হওয়াই আশা করা যায় আর দৃষ্টিভঙ্গী নিবদ্ধ থাকা উচিত একমাত্র শ্রীমণ্ডিত ও আদর্শদ্যোতক বস্তুর ওপর। আমাদের প্রমোদ ব্যবসায় সম্পর্কেও একথা খাটানো চলে কি? ছবি যে দিন দিন নোংরা আর বাজে হয়েই চলেছে তার কারণই তো মনে হয় প্রমোদ ব্যবসায়ী ও প্রমোদ উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঐসব গুণের অভাব। প্রমোদ উপাদানের মধ্যেও যেমন, তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কিছুতেও তেমনি, ঐ খামতীটাই সমভাবে মূর্ত দেখা যায়। ধরুন প্রচারের কথা—পত্র-পত্রিকায় দেওয়া বিজ্ঞাপনাদি দেখে লোকের মন খুব আকৃষ্ট হয় বলে কি ধরে নেওয়া যায়? বিজ্ঞাপনের যে ভাষা তা যে-কোন দিনের একখানা কাগজ খুললেই নমুনা পাওয়া যাবে। ব্যাকরণ বহির্ভূত নতুন নতুন উদ্ভট বিশেষণ আমদানী করা তো আছেই তার ওপর লোককে ধোঁকা দেবার জন্যে চূড়ান্ত ভাবে অসত্যের আশ্রয় নেওয়াটাকেও কেউ এতটুকুও লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করে না। দশটা চিত্রগৃহে একই দিনে, একখানা ছবি একযোগে মুক্তি দিয়ে মাত্র সাতটা দিন পার হতেই গৌরবোজ্জ্বল ১১শ সপ্তাহ এবং ঐ ভাবে-তিনটে সপ্তাহ না যেতেই রজত জয়ন্তী পালন করার জোচ্চুরী তো পুরোনো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু-একদিন দেখানো হতে না হতেই দর্শক, সমালোচক ও সংবাদপত্র কর্তৃক উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত বলে বিজ্ঞাপন দেবার পুরোনো ধাপ্পা আজও চলছে কিন্তু লোকের মনে তার দ্বারা কতখানি ছাপ দেওয়া যায়, কেউ মেপে দেখেছে কোনদিন? আচ্ছা, "স্বয়ংসিদ্ধা" বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি বিচার করলে কে? —অথচ ছবিখানি চলার সময় ঐ বলেই বিজ্ঞাপন চালিয়ে যাওয়া হয়েছে দিনের পর দিন, এমন কি ওর হিন্দী সংস্করণটার বিজ্ঞাপনেও বোম্বের পত্র-পত্রিকায় দেখলুম, 'গত বছরের বাংলার শ্রেষ্ঠ ছবি' বলেই প্রচার করা হচ্ছে! বিমল রায় যেহেতু 'উদয়ের পথে' ও 'অঞ্জনগড়' তুলে নাম করেছেন অমনি আর এক বিমল রায় জুটে গেলো এবং একখানি ছবির সঙ্গে কাহিনীকার ও পরিচালকরূপে ঐ নামটা জুড়ে দিয়ে নির্লজ্জের মতো লোককে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে। চিত্র গ্রহণের নামগন্ধ নেই অথচ দ্রুত 'সমাপ্তির পথে' বা 'মুক্তি প্রতীক্ষায়' বলে প্রচার চালিয়ে যাওয়াটা তো রীতির মধ্যেই পড়ে গিয়েছে। এমনি ভাবে কতো মিথ্যাই যে চালানো হয়, নির্বিবাদে তার আর ইয়ত্তা নেই। প্রচার মানেই ওরা ধরে নিয়েছে যেনতেন প্রকারে লোককে ধাপ্পা দেওয়া। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে ছবির উদ্বোধন করিয়ে ছবি সম্পর্কে লোকের মনে একটা বিশেষ ধারণা সৃষ্টি করিয়ে দেওয়া আর এক প্যাঁচ। এর একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো 'পদ্মা প্রমত্তা নদী'—ছবিখানির মধ্যে এমন কি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ আবেদন আছে, যার জন্যে ছ'ছজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীকে দিয়ে একই দিনে শহরের ছ'টি বিভিন্ন চিত্রগৃহে ছবিখানিকে উদ্বোধন করাবার দরকার ছিলো? নাম-কাঙাল এবং নিজেদের মর্যাদাবোধ সম্পর্কে অচেতন এমন শিক্ষাব্রতীও দেখিনি! ঠিক পরের দিনের বিজ্ঞাপনেই যে শহরের ছ'জন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কর্তৃক বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি বলিয়া ঘোষিত' যোগ হয়ে যাবে তাতো ধরেই নেওয়া গিয়েছিলো। শিক্ষাব্রতীরা তাহলে নিয়মিতভাবে সব ছবিগুলিই দেখছেন আজকাল! এমনি যাদের মন সেই প্রমোদ-ব্যবসায়ীদের রুচি ও জ্ঞানবুদ্ধির কথা না তোলাই ভালো—বিজ্ঞাপনে বাপুজীর একেবারে মুখের ওপরেই নটীর নর্তকীবেশের একটা চেহারা সেঁটে দিতেও এরা দ্বিধা করে না, যেহেতু ছবির নাম 'বাপু নে কহা থা'।

আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে পোষ্টার, যা শহরকে আজ একেবারে কুৎসিত করে তুলেছে। লোকের বাড়ির দেওয়াল তো আছেই তার সঙ্গে থানা হোক আর আদালতই হোক স্কুল-কলেজ মন্দির মসজিদ হোক টেলিফোন টেলিগ্রাফ ইলেকট্রিক পোষ্ট হোক যে কোন জায়গার দেওয়াল হোক স্থান অস্থান নির্বিচারে শহরের নিভৃততম দেওয়ালটিতেও একফালি ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকার উপায় নেই—চোখ ফেরালেই পোষ্টারের তাড়া—পোষ্টারে পোষ্টারে কাকার করে সমগ্র শহরটাকেই একটা কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে টেনে এনে ফেলা হয়েছে—লাটসাহেবের বাড়িটাই শুধু অক্ষত কেনো যে আছে জানি না। একটা মোটামুটি হিসেব নিয়ে দেখা যায় যে, শহরকে এই ভাবে হতশ্রী করে রাখার জন্যে স্থায়ী সিনেমা থিয়েটারগুলি মিলে বছরে দশ লক্ষেরও বেশী টাকা খরচ করে যাচ্ছে। আর পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থের ক্ষেত্রে কাগজের উৎকট টানাটানির মুখে শিক্ষা ও জ্ঞানবুদ্ধির প্রসারকে স্থগিত রেখে দিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে বছরে প্রায় দুশো টনেরও বেশী কাগজ লেপ্টে দিয়ে শহরটাকে এক ন্যক্কারজনক আবহাওয়ার মধ্যে রেখে দেওয়া বরদাস্ত করে যাওয়া হচ্ছে! এর সঙ্গে অন্যান্য সাময়িক প্রমোদ-ব্যবস্থার প্রচারে ও সৌখীন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান বিজ্ঞপ্তিরূপে ব্যবহৃত এবং আরও বিভিন্ন বহু সহস্র সামগ্রীর প্রচারে নিয়মিতভাবে পিষ্ট লক্ষ লক্ষ পোষ্টারের হিসেব ধরলে অতি মহার্ঘ কাগজের যে কি শ্রাদ্ধই হচ্ছে ভাবতে গেলে গালে হাত দিয়ে বসে পড়তেই হবে। পৃথিবীর আর কোথাও এর তুলনা থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ কি বে-হিসেবীই না এই খরচা। সিনেমা থিয়েটারের মোট প্রচার বরাদ্দের প্রায় পাঁচ আনা অংশই ব্যয় করা হয় শহরকে নোংরা করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে, কিন্তু তার প্রতিদানে সাধারণের কাছ থেকে পাঁচ পাই পরিমাণও সাড়া এই খাতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু আমাদের প্রমোদ-ব্যবসায়ীরা যদি অতো হিসেব করেই চলবেন তো সিনেমা থিয়েটার আজ দুরবস্থার মধ্যে পড়ে থাকবে কেন? কতকগুলো স্থান নির্দিষ্ট করে বোর্ড বসিয়ে তার ওপরে পোস্টার লাগালে অমনি ধারা একশো বোর্ড কমপক্ষে পাঁচ ছ' হাজার ইতস্ততঃ পিষ্ট পোস্টারের চেয়েও বেশী ফলপ্রসূ যে হতে পারে ইংরিজী ছবিগুলির বিজ্ঞাপন পদ্ধতি দেখেও আমাদের এঁরা অভিজ্ঞ হতে চান না কেন বোঝা দায়। তা তাঁরা বুঝুন আর নাই বুঝুন, পোস্টার ব্যাপারটা মাত্রাছাড়া বাড়াবাড়িতে দাঁড়িয়ে গেছে আজ—এটাকে বন্ধ করতেই হবে। এ বিষয়ে আমরা সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

নূতন ছবির পরিচয়

ধাত্রী দেবতা (**লালচিত্র প্রতিষ্ঠান**)—কাহিনী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: কালীপ্রসাদ ঘোষ, আলোকচিত্র: মুরারি ঘোষ, শব্দগ্রহণ: শিশির চট্টোপাধ্যায়, সুরযোজনা: দুর্গা সেন; ভূমিকায়: অনুপকুমার, শম্ভু মিত্র, মাষ্টার শম্ভু, কালী বন্দ্যো, অরবিন্দ, নেচু, নৃপতি, কেষ্ট দাস, ছায়া দেবী, অঞ্জলি রায়, তন্দ্রা মিনতি, প্রীতি ধারা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। ছবিখানি ইস্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জের পরিবেশনায় ২৬শে নবেম্বর প্রাচী ইন্দিরা-ছায়াতে মুক্তিলাভ করছে।

'ধাত্রীদেবতা' কেবলমাত্র তারাশংকরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাই নয়, এ যুগের একটি জনপ্রিয় সাহিত্যসৃষ্টিরূপেও প্রখ্যাত। যে যে উপাদানের সমাবেশে ছবির কাহিনীকে আদর্শ বলে স্বীকার করা যায়, 'ধাত্রীদেবতা'তে তা অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবেই পরিবেশিত। কিন্তু বিন্যাসের দোষে তাও যে কিভাবে নীরস ও প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে, ছবিখানি সেই পরিচয়ই দেয়। কাহিনীটি নির্বাচনে প্রগতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বিন্যাসের বেলাতে দেখা যায় ঠিক তার উল্টো ব্যাপার: কালীপ্রসাদ ঘোষ গত যুগের সেরা পরিচালকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন এবং আজও দেখা গেলো তিনি সেকেলেই রয়ে গিয়েছেন। একদিকে সমস্ত কিছুর মধ্যেই কেমন যেন এ্যামেচার থিয়েটারসুলভ একটা প্রভাব ব্যাপ্ত দেখা যায়—সাজ-পরিবেশে, অভিনয় শিল্পী নির্বাচনে ইত্যাদি অনেক ব্যাপারেই, তেমনি আবার পদে

পদে একটা অতিসচেতনতা কাহিনীর বিন্যাসকে কেমন যেন আড়ষ্ট করে তুলেছে।

কাহিনীটি চরিত্রপ্রধান এবং লাট শ্যামপুর জমিদারীর নাবালক মালিক শিবনাথ তার মুখ্য চরিত্র। কিন্তু এই শিবনাথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এতো মোড় ঘুরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যার ফলে নাটারস দানা বাঁধবার সুযোগ থেকে বার বার ব্যাহত হয়ে পড়েছে। প্রথমে আমরা পাই শিবনাথের প্রতাপশালিনী পিসিমাকে যিনি শিবনাথকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বাপ-পিতামহের আদর্শে প্রবল-প্রতাপ এক জমিদাররূপে। অল্প বয়সে তিনি ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার-ভাগিনেয়ী গৌরীর সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ দেন। শিবনাথের মা অপর দিকে যা কামনা করতেন শিবনাথ যেন বিবেকানন্দের আদর্শে গড়ে ওঠে। আর শিবনাথের মাস্টার মশাই শিবনাথকে অনুপ্রাণিত করতেন দেশ-নেতাদের কাহিনী শুনিয়ে। ভিন্নমুখী আদর্শের আওতায় শিবনাথ বড় হতে থাকে। পিসিমাই গৃহকর্ত্রী; গৌরীকে উপযুক্ত গৃহিণী করে তোলার জন্যে তাকে দিয়ে ছোট-খাটো কাজ করাতে থাকেন। গৌরীর তা পছন্দ না হওয়ায় সে পালিয়ে যায় মামার বাড়িতে এবং এই নিয়ে দুই পরিবারে এমনি মনো-মালিন্য ঘটলো যে, গৌরীর দিদিমা তাকে নিয়ে কাশী চলে যান। বছর কতক পরে শিবনাথ ম্যাট্রিক পাশ করে গ্রামে এসে শুনলে কলেরা শুরু হয়েছে; ঝাঁপিয়ে পড়লো সে জনগণের সেবায়। প্রতিদানে গ্রামের লোক এক ডোম বৌয়ের নামের সঙ্গে শিবনাথকে জড়িয়ে কুৎসা রটনা করলে। গৌরীর কাছে এই মিথ্যা খবর সত্য হয়ে দেখা দিল, সে জানালে যে, যে কেলেঙ্কারী শিবনাথ করেছে তারপর তার কাছে যাবার প্রবৃত্তি তার নেই। শিবনাথ চলে গেলো কলকাতায় এবং গ্রামে মহামারীর সময় সেবাকার্যের জন্যে সুশীল ও পূর্ণ নামে যে দুজন ডাক্তার গিয়েছিলো তাদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী কাজে যোগ দিলো। এতোদিনে গৌরীর কাছে সত্য প্রকাশ হলো এবং সে শিবনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুল হলো। কিন্তু পার্টির কাজে শিবনাথের পক্ষে গৌরীর ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হলো না। পার্টির এক নেতার সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় পূর্ণ তাকে গুলী করে হত্যা করে। এর পরই শিবনাথ দেশে ফিরে এলো, মা তখন মৃত্যুশয্যায়, গৌরীও সেই খবর পেয়ে এলো; দীর্ঘ বিরহের পর তাদের মিলন হলো। পিসিমাও গৌরীর হাতে সংসার আর শিবনাথের ভার ছেড়ে কাশীবাসী হলেন। গৌরীর সঙ্গে কিন্তু শিবনাথের সংঘর্ষ বাধলো। গৌরী চায় সম্পদ আর শিবনাথ চায় সর্বকিছু তুচ্ছ করে প্রজাদের মঙ্গল করতে, জমিদারীর ক্ষতি-স্বীকার করেও দুঃখ ঘোচাতে চায় অসহায় কৃষকদের। গৌরীর সঙ্গে আবার ছাড়াছাড়ি হলো। শিবনাথের এবারে অবস্থা হলো ছন্ন-ছাড়া, বিষয়সম্পত্তি সে প্রায় ঘোচাতে বসে। খবর পেয়ে আবার গৌরী ছুটে আসে। আবার সেই আদর্শের সংঘর্ষ আর মনোমালিন্য। কিছুদিন পর গৌরী অতিষ্ঠ হয়ে দিদিমার কাছে চলে গেল, কিন্তু তখন তার গর্ভে শিব-নাথের বংশধর। সন্তান লাভ করে গৌরী তাকেই নিজের আদর্শে গড়ে তোলায় মেতে উঠলো। এই সময় খবর এলো শিবনাথ পিকেটিং করায় গ্রেপ্তার হয়েছে। মামা জানালেন যে, মুচলেকা লিখিয়ে তিনি শিব-নাথকে ছাড়িয়ে আনবেন। কিন্তু গৌরী আপত্তি জানালে। সে শ্যামপুরে ফিরে এসে অকস্মাৎ পিসিমার এই সময়ে সহায়তার জন্য আকুল হয়ে উঠলো আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পিসিমাও এসে হাজির হলেন। তারপর সবাই জেলে গিয়ে শিবনাথের সঙ্গে দেখা করলে এবং সেইখানেই শিবনাথ ও গৌরীর মধ্যে নতুন করে মিলন হলো।

কাহিনী শক্তিশালী হলে হবে কি; বিভিন্ন চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলা বা শিবনাথের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলিকে যথাযথভাবে নাটকীয় রস সিঞ্চন করে দেওয়ার অভাব দেখা দিয়েছে। তার ওপর চরিত্রপ্রধান কাহিনী অথচ এমনি সব অভিনয়শিল্পী নির্বাচন করা হয়েছে যাতে প্রধান চরিত্রগুলির কোনটির মধ্যেই ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতে পারেনি মোটেই। এর সঙ্গে বিন্যাসের জড়তা এবং নাটকীয় পরিস্থিতিকে পরিণত করে তোলার অক্ষমতা অমন ভালো একটি কাহিনীর সহায়তা পেয়েও কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। ছবিখানি যে শেষ পর্যন্তও লোককে টেনে রাখে সেটা গল্পটার নিজস্ব ক্ষমতার জোরেই। এর জন্যে পরিচালকের যদি কোন কৃতিত্ব থাকে তা তিনি পেতে পারেন।

মাস্টার শম্ভু অভিনীত ছেলেবেলার শিব-নাথকে ভালোই লাগে, কিন্তু তরুণ বয়সের শিবনাথকে অনুপকুমার শত চেষ্টাতেও ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ আদর্শবাদী চরিত্র করে তুলতে পারেননি। গৌরীর ক্ষেত্রেও তাই; ছোট বয়সটা মানিয়ে গেছে, কিন্তু বড় অবস্থাটা ছন্দার রূপায়ণে একটা পীড়াদায়ক অকালপক্ক চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মভোলা সদাশিব মাস্টার মশায়ের গলার ফিনফিনে আওয়াজটাই চরিত্রটিকে গাম্ভীর্য এনে দিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। দুটো ছোট ভূমিকায় প্রীতিধারা আর মিনতি লোককে খুশী করতে পেরেছেন। পিসিমার ভূমিকায় ছায়া দেবীর অভিনয়ে তেমন তেজ পাওয়া গেল না। পার্টির নেতার ছোট্ট ভূমিকাটি শম্ভু মিত্রের অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়েছে, কিন্তু সহ-অভিনেতাদের অভিনয়ে কোন ওজন না থাকায় ওকে হত্যার দৃশ্যটা ছবির একটি স্মরণীয় অংশ হয়েও হতে পারেনি। ছোটখাটোদের মধ্যে আর ছাপ দিয়েছেন নবাগত কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দরদী কণ্ঠ, সহজ ও সাবলীল অভিব্যক্তি সব দিক থেকেই তিনি দর্শকদের দৃষ্টিকে টেনে নিতে পেরেছেন।

আলোকচিত্র খুবই কাঁচা লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে মনে হলো। বহু দৃশ্যে ক্যামেরা চলার সময় ছবি কেঁপে দৃষ্টিকে পীড়া দিয়েছে। তা ছাড়া দৃশ্য সংগঠন বা আলোক-সম্পাতও নাট্যানুগ হয়নি বেশীর ভাগ দৃশ্যেই। শব্দ অস্পষ্ট না হলেও কেমন একটা খ্যানখেনে স্বর সবায়েরই কণ্ঠের মাধুর্য খানিকটা করে নষ্ট করে দিয়েছে, এটা অবশ্য প্রক্ষেপণ যন্ত্রের জন্যে হয়েছে কি না বলা যায় না। শব্দের পুনঃসংযোগ (re-recording) একেবারে বাদ দিয়ে যাওয়ায় নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটেছে, কোথাও বা উদ্ভটও হয়ে দাঁড়িয়েছে। গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' আর গোবিন্দদাসের 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কেন' ভালো লাগে; শ্রমিক চাষীদের নিয়ে কালী-প্রসাদ ঘোষের 'এগিয়ে চল এগিয়ে চল' গান-খানা প্রয়োগ কৌশলের দোষে জমতে পারেনি।

চন্দ্রলেখা

মুক্তিলাভ করার আগেই মাদ্রাজের জেমিনী স্টুডিওর প্রথম হিন্দী নিবেদন 'চন্দ্রলেখা' মহরার যে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে ইদানীং আর কোন ছবির ক্ষেত্রেই তা ঘটেনি। 'চন্দ্রলেখা' নিছক প্রমোদচিত্র এবং সব বয়সের সব রকম রুচির দর্শকের কাছে উপভোগ্য করে তোলার জন্যে ছবিখানিতে বহুবিধ উপাদানের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পরিচালক ভাসন 'চন্দ্রলেখাকে' চিত্রজগতের একটি অনবদ্য অবদান করে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রাসাদ দুর্গের প্রয়োজনে সত্যিকারের দুর্গ তৈরী করা হয়েছে, অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে সত্যিকারের একটা টানা সেতু; যুদ্ধ, সার্কাস, ঘোড়সওয়ার (প্রায় ৩০০টি) সমস্তই বাস্তব। ভিড়েতে ঘোড়ার খুরের নীচে পড়ার যেখানে দরকার, সেখানে সত্যিই অভিনেতা ঘোড়ার পায়ের নীচে নিজেকে মাড়িয়ে যেতে দিয়ে তারপর বিশ দিন হাসপাতাল বাস করেছে। বারো ফিট উঁচু ৬০০টি আসল ঢাকের ওপরে ৬০০টি মেয়ের নাচ এবং সময়ে সময়ে নাচ চলতে চলতেই এক-একটি ঢাককে আরও চল্লিশ ফিট ওপরে উঁচিয়ে দেওয়া ছবিখানির একটি পরম বিস্ময়। কোন কোন দৃশ্য গ্রহণ করতে আলোকচিত্রগ্রহীতাকে ৮০ ফিট উঁচু বটগাছের ওপরে ক্রেনের সাহায্যে কাজ করতে হয়েছে। 'চন্দ্রলেখা'র তামিল সংস্করণ মাদ্রাজে মুক্তিলাভ করেছে এবং একটি পরম বিস্ময় বলে এক-বাক্যে স্বীকৃত হয়েছে।

দেশী সংবাদ

২৯শে নবেম্বর—ভারতীয় গণপরিষদ অদ্য অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে গ্রহণ করেন। গৃহীত ধারাটি এই:—"অস্পৃশ্যতা দূর করা হইল এবং অস্পৃশ্যতা সমর্থনসূচক সব আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইল। অস্পৃশ্যতা হইতে উদ্ভূত যে কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।"

ভারত গবর্ণমেণ্টের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সমস্ত বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও ফিরিওয়ালাকে আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে মূল্যাঙ্কবিহীন মিলজাত বস্ত্র ও সূতা বিক্রয় না করিবার নির্দেশ দিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন।

আগরতলার সংবাদে প্রকাশ, ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে গৃহদাহ ও বেপরোয়া লুঠতরাজ চলিতেছে। প্রকাশ, গত একমাসে পাঁচটি ফরেস্ট অফিস ভস্মীভূত হয়। রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সভা সমিতি হইতেছে এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের হুমকি দেখান হইয়াছে।

৩০শে নবেম্বর—অদ্য সেনেট হলে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীযুত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীকে ডক্টর অব ল উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

ভারতীয় গণপরিষদে রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত মৌলিক নীতির ১০নং অনুচ্ছেদ গৃহীত হইয়াছে। উহাতে রাষ্ট্রের অধীনে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে সমুদয় নাগরিকের তুল্যাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন (সাময়িক বিধান) অদ্য হইতে কার্যকরী করা হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে বিশেষ আদালতে সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসলী শ্রীযুত সি কে দফতরী অদ্য মহাত্মা গান্ধী হত্যা মামলা সম্পর্কে সওয়াল আরম্ভ করেন।

অদ্য ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ের খেতাব লোপ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটি গৃহীত হয়। শ্রীযুত টি টি কৃষ্ণমাচারী এই অনুচ্ছেদের একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে এই অনুচ্ছেদের বিধানে সামরিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ক্ষুণ্ণ হইবে না। পরিষদে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

২রা ডিসেম্বর—অদ্য ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনে নাগরিকদের বক্তৃতা ও মনোভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, সমিতি অথবা সঙ্ঘ গঠনের স্বাধীনতা সম্বলিত শাসনতন্ত্রের ১৩নং ধারাটি গৃহীত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় করিয়া না তুলিবার জন্য কাশ্মীর কমিশন গত ১০ই জুলাই উভয় ডোমিনিয়নের উদ্দেশ্যে যে আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন, পাকিস্থান তাহার প্রতিকূল কার্য করিয়াছে বলিয়া ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রসংগে অভিযোগ করিয়াছেন।

৩রা ডিসেম্বর—ভারতীয় গণপরিষদে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত অধ্যায়ের পুনরালোচনা আরম্ভ হইলে মানুষ ক্রয়-বিক্রয় ভিক্ষাবৃত্তি ও বেগার প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া তিনটি ধারা গৃহীত হয়। ভারতের অভ্যন্তরে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা দান সম্পর্কিত ধারাটিও পরিষদে গৃহীত হয়।

ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য শ্রীযুত আর আর দিবাকর ভারত সরকারের রাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আগামী ৭ই ডিসেম্বর তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন। গণপরিষদের অন্যতম সদস্য ডাঃ বালকৃষ্ণ ভি কেশকার সহকারী সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর—লেঃ জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া অদ্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। আগামী ১৫ই জানুয়ারী তিনি প্রধান সেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

আমেদাবাদে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ পরিষদের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন অদ্য সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রমিকদের অবস্থা, মানসিক ক্ষমতা ও কর্মক্ষমতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী এক শান্ত সংহত সমাজ যাহাতে গড়িয়া ওঠে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ইউনিয়নসমূহের প্রতি নির্দেশ দিয়া পরিষদে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পাটনায় সদাকত আশ্রমে উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ৬৪তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি গতকল্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সাংবাদিকগণের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত দ্বীপপুঞ্জ উপনিবেশ স্থাপনের একান্ত উপযোগী।

৫ই ডিসেম্বর—গতকল্য গোয়ালিয়রে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিয়া একটি ভিন্ন দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা এদেশে চাপাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনাশ সাধনের সকল চেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করা হইবে।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে নবেম্বর—নিউইয়র্কে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, চীনা সরকারী সৈন্যদলকে নানকিং-এর ২০০ মাইল উত্তর দিকবর্তী সুচাও ত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, কম্যুনিস্ট বাহিনী সুচাও-এর তিন মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

৩০শে নবেম্বর—নানকিং এর সংবাদে প্রকাশ, চীনের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ইতিমধ্যেই নানকিং ও সাংহাই অঞ্চল ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ চীন হইতে কম্যুনিস্ট বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার পরিকল্পনা করিয়াছেন। কম্যুনিস্ট সৈনারা নানকিং-এর ১৬০ মাইল উত্তরে রেলওয়ে শহর কুচেং অধিকার করিয়াছে।

অদ্য জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক সংগ্রাম বিধ্বস্ত সুচাও হইতে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যকে সরাইয়া লইয়া পেংপু রক্ষার্থ দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করেন।

১লা ডিসেম্বর—নানকিং এর সংবাদে প্রকাশ, চীনা জাতীয় মন্ত্রিসভা অদ্য স্থির করিয়াছেন যে, কম্যুনিস্টদের আক্রমণের মুখে নানকিং বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও গভর্নমেণ্ট অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইবে না। প্রকাশ শক্তিশালী চীনা সরকারী বাহিনী পেংপু অভিমুখে অগ্রসর কম্যুনিস্ট বাহিনীর জাও নদী অতিক্রমের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, টোকিওর কেন্দ্র স্থান হিবিয়া পার্কে মহাত্মা গান্ধীর একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

জাতীয়তাবাদী চীনের জন্য অধিকতর সাহায্য লাভের অভিপ্রায়ে মাদাম চিয়াং কাইশেক অদ্য আমেরিকায় পৌঁছিয়াছেন।

২রা ডিসেম্বর—চীনা সরকারী সৈন্যদল অদ্য নানকিং-এর উত্তরে সুসিয়েন ও পেংপুর মধ্যবর্তী এলাকায় কম্যুনিস্ট বাহিনীর উপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছে।

লণ্ডনে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, নানকিং এলাকায় সোভিয়েট সেনাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন অধিনায়ক মার্শাল ভ্যাসিলিভস্কি স্বয়ং কম্যুনিস্ট বাহিনীকে পরিচালনা করিতেছেন।

৩রা ডিসেম্বর—চীনের সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, পেংপু রণাঙ্গনে চীনা সরকারী বাহিনী প্রবল আক্রমণ শুরু করিয়াছে। কম্যুনিস্ট বেতারে নানকিং-এর দুইশত মাইল উত্তর দিকবর্তী সুচাও দখলের দাবী করা হইয়াছে।

৪ঠা ডিসেম্বর—নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, চীনের রাজধানী নানকিং-এ প্রথম রক্ষাব্যূহ অদ্য ইয়াংসী নদীর কুড়ি মাইলের মধ্যে সরাইয়া আনা হইয়াছে।

৫ই ডিসেম্বর—নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদল পেংপুর কুড়ি মাইল উত্তরে অবস্থিত কুচেং পুনরধিকার করিয়াছে।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, সম্মিলিত পক্ষের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকআর্থার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সাতজন জাপ নেতার ফাঁসি অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রাখার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থান সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদকে জানাইয়াছে যে, কাশ্মীরে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করার জন্য গত মাসে কমিশন যে আবেদন করিয়াছিল, ভারত উহা মানিয়া না চলিলে পাকিস্থান উপযুক্ত 'আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা' অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে।

ইসরাইল রাষ্ট্র হইতে অবিলম্বে সৈন্যাপসরণের জন্য আরব লীগভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার যে দাবী রুশিয়া উত্থাপন করিয়াছিল, অদ্য প্যারিসে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠান উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

কংগ্রেস সংখ্যা

১৯৪৮

জয়পুর কংগ্রেস

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে পুণ্যময় স্মরণীয় দিবস। নবভারত সৃষ্টির প্রাণময় সংবেদনের শক্তিবীজ এই তিথিতে বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে উপ্ত হয়। শক্তি-সাধনার পীঠভূমি বাঙলার পুণ্যশ্লোক সন্তান এই যজ্ঞের পুরোধাস্বরূপে বৃত হন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোবর্তী করিয়া বোম্বাইতে যে ব্রতের উদ্বোধন ঘটে, ক্রমে তাহার ত্রয়ী অভিব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় অর্থাৎ পরিব্যাপ্তির পথে ত্রিবৃৎ-তত্ত্বে পরিস্ফূর্ত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে আত্মাহুতির উজ্জ্বল গরিমায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। সৃষ্টির সেই প্রথম স্তরে সুরেন্দ্রনাথের প্রাণময় সাধনা প্রধানভাবে কাজ করে এবং সমগ্র ভারতে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। সৃষ্টির এই পর্যায়ের পূর্ণ পরিণতি সুরাটে নূতন ভঙ্গী ধরে। সে স্রোত উত্তাল আবর্ত তুলিয়া জাতির মনোমূলে স্থিতির ভিত্তি লাভ করিতে অগ্রসর হয়। এ যুগে জাতির চেতনা আত্মসংস্থিতির নব আলম্বনে ও উদ্দীপনায় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র এবং অরবিন্দের সাধনায় ছন্দায়িত হইয়াছিল। তাঁহাদের অগ্নিময় তপস্যার তাপে ভাবের ভিত্তি দৃঢ় হইতে থাকে এবং জাতির লক্ষ্য বিনিশ্চিত হইয়া উঠে। আপনার পূর্ণ অধিকার, দেশবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা, বিদেশীর বন্ধন-বিনির্মুক্ত আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার আকুলতায় জাতির চিত্তবৃত্তি পরিস্ফূর্তির পথে উন্মদ আবেগে প্রধাবিত হইতে উন্মুখ হয়। বৈষ্ণবী শক্তির সেই বিপ্লবোন্মুখ গতি পরে মহাত্মা গান্ধীর অবদান-মহিমায় ব্যাপ্তি লাভ করে। গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই বৈষ্ণব-বীর্যের ধারক, বাহক এবং পরিপোষক। তিনি তাঁহার স্বচ্ছ প্রতিভা বলে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়া এই শক্তিকে স্থির লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করিতে আত্মনিয়োগ করেন। মহাত্মাজীর ত্যাগ এবং তপস্যার বলে এই শক্তি বহিরার্থের বিচিত্র অভিব্যঞ্জনায় ভারতের ইতিহাসকে এক অভিনব ছন্দোময় রূপ দান করে। বঙ্গভূমি হইতে এই সাধনা বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সাধনাকে প্রাণময় করিয়া তোলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সে তরঙ্গ-লীলাকে তাঁহার অনবদ্য ত্যাগের মহিমায় শক্তিশালী করেন। ক্রমে শত সহস্র সাধকের

শোণিতোৎসর্গে সুসংস্থিত সেই শক্তি প্রাচুর্যের পরিব্যাপ্তি-ধর্ম লাভ করে।

ইহার পরবর্তী ত্রয়ীতত্ত্বের শেষ পর্যায়, প্রাণময় তরঙ্গের শেষ উচ্ছ্বাস বা লয়। নিঃশেষে আত্মদানের এই শেষ পর্যায়ে সুভাষচন্দ্রের অগ্নিময় সাধনা জাতির প্রাণমূলে অমোঘ শক্তি প্রদীপ্ত করে। বিদেশী বিজেতৃ-শক্তির সব আশ্রয় সুভাষচন্দ্রের সাধনার অন্তর্নিহিত আগুনের জ্বালায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়। কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' এই সুদৃপ্ত দাবীর শক্তি সুভাষচন্দ্রের সাধনায় সাক্ষাৎ সম্পর্কে উপবৃংহিত হয়।' 'করেঙ্গে আউর মরেঙ্গে' মহাত্মাজীর প্রাণবলের বিচ্ছুরিত বিপুল বীর্যে সম্পুটিত মন্ত্রশক্তিতে সঞ্জীবিত জাতির এই হুঙ্কারে সাম্রাজ্যবাদীদের রাক্ষসী এবং অসুর প্রবৃত্তির সমগ্র দৈন্য উন্মুক্ত হয়। একান্ত সেই দৈন্যের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের তটভূমি পরিত্যাগ করে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষকে পরাধীন করিয়া রাখিয়া তাহারা এখানে হিংসার যে মারাত্মক বিষ ছড়াইয়া-ছিল, তাহার ফলে ভ্রাতৃরক্তপাতে পুণ্যভূমি কলঙ্কিত হইতে থাকে, নির্দোষ এবং অসহায়ের অশ্রুতে এদেশের ধূলিকণা আর্দ্র হইয়া উঠে। ইহার পর পূর্ণাহুতি। আত্মঘাতী সে পৈশাচিক জিঘাংসার গতি রোধ করিবার জন্য মহামানব গান্ধীজীর আত্মদান জগতের ইতিহাসে মানবতার এক উজ্জ্বল অধ্যায়কে উন্মুক্ত করে। গান্ধীজী প্রাণ দিয়া মৃত্যুহীন প্রাণধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন। ফলতঃ কংগ্রেসের সাধনার ত্রয়ী তত্ত্বের অমৃতত্ব গান্ধীজীর এই আত্মোৎসর্গের মর্ম-মূলে নিহিত রহিয়াছে। ভারতের অগ্রগতির পথে ইহার শক্তি চিরন্তন প্রেরণা সঞ্চার করিবে। গান্ধীজীর এই মৃত্যুঞ্জয় মহিমা অনন্তকাল মানব-জাতির ইতিহাসকে পরম প্রতিষ্ঠার অভ্রান্ত আলোকে উদ্ভাসিত রাখিবে; অমোঘ এ শক্তি; এ শক্তি অব্যক্ত; ইহা অনির্দেশ্য; ইহা অনন্ত। দেশ ও কালধর্মে এ শক্তি নিঃশেষিত হইবার নয়। সুতরাং সর্বদা এবং সব ক্ষেত্রে এ শক্তি অপরাজেয়।

স্বাধীনতা আমাদের লাভ হইয়াছে সত্য; কিন্তু সংকট এখনও কাটে নাই। জাতির চারিদিকে ভয়, বিশ্বের চতুর্দিকে মহাভয় এবং সংশয় এখনও আচ্ছন্ন রহিয়াছে। ভেদের ব্যবধান আমরা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভাঙিগয়া ফেলিয়াছি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য কংগ্রেস যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল, সে সংকল্প সে আজ সার্থক করিতে চলিয়াছে। কিন্তু জনসমাজের আর্থিক এবং সামাজিক দুর্গতিকে দূর করিতে হইবে, শোষণ-স্বার্থ সম্পর্কিত বৈষম্যকে বিচূর্ণ করা প্রয়োজন। আমাদের ভয়ের কারণ এখানেই রহিয়াছে। জয়পুর কংগ্রেস এইদিকে ভারতকে নূতন আশার আলোক দেখাইবে, মানব-সেবার বলিষ্ঠ কর্ম সাধনাকে প্রণোদিত করিয়া জাতিকে এবং শুধু জাতিকেই নয়, বিশ্বকে বর্তমান মহাভয় হইতে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিবে। এই দিক হইতে স্বাধীন ভারতে জাতীয় মহাসমিতির এই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনের গুরুত্ব বিশেষভাবে রহিয়াছে। মানব-মৈত্রীর বাণী এই ভারত হইতেই বিশ্ব-জগতে প্রথমে প্রচারিত হয়। পুনরায় ভারত তাহার পূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশ্বকে মৈত্রীর মঙ্গলমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিবে। আমরা এই আশাই অন্তরে পোষণ করিতেছি। মহাত্মাজীর ত্যাগ ও তপস্যা এবং আত্ম-দানের শক্তি আমাদের জীবনে সত্য হোক্, নিত্য হোক্। সর্বপ্রকার দৈন্য এবং দুর্বলতা হইতে তাঁহার পুণ্যময় জীবনের প্রভাব আমাদিগকে মানব-ধর্মের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখুক, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ত্রয়ীতত্ত্ব আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র সাধনায় উদ্দীপিত হইয়া অনাহত ঝঙ্কারে জগতে মানব-সংস্কৃতি উদার মহত্ত্ব বিস্তার করুক। ভারত চিরদিনই বিশ্বকে চাহিয়াছে, বিশ্ব আজ ভারতকে চাহিতেছে। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূলীভূত শক্তিবীজ ত্রয়ীতত্ত্বের পরিস্ফূর্তিতে এই মিলনকে সার্থক করিয়া তুলুক, এই প্রার্থনা।

কংগ্রেসের আদর্শ

মহাত্মা গান্ধী

আমি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অতি সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে এখানে কাজ করিতেছি। ইহাতে হয়ত কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কতকটা বুঝা যাইবে। আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে তাহা সম্পাদনে আপনাদের সহানুভূতি পাইব বলিয়া আমি আশা রাখি। কংগ্রেস ভারতের সবচেয়ে পুরাতন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া আমার বিশ্বাস। দীর্ঘ ৫০ বৎসর পূর্বে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। তদবধি নির্বিবাদেই ইহার বাৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। কংগ্রেস একান্তভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়, কোন বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ কোন স্বার্থের প্রতিনিধি নহে। ইহা ভারতের সমস্ত স্বার্থ ও সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবী করে। ইহা সত্যি আনন্দের কথা যে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা সর্বপ্রথম ইংরেজের মস্তিষ্কেই আসিয়াছিল। এলান অক্টেভিয়ান হিউমকেই কংগ্রেসের জনক বলিয়া আমরা জানি। পার্শী সম্প্রদায়ের মহান দুইজন নেতা—ফিরোজ শা মেটা ও দাদাভাই নৌরজী এই প্রতিষ্ঠানকে সযত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন। নৌরজীকে অতিবৃদ্ধ মানুষ হিসাবে ভারতবাসী স্মরণ করিতে এখনও আনন্দ অনুভব করে। কংগ্রেসের সৃষ্টি হইতে উহা মুসলমান, খৃষ্টান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ মোটামুটি সমস্ত ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। পরলোকগত বদরুদ্দিন তায়েবজী নিজেকে কংগ্রেসী বলিয়াই পরিচয় দিতেন। কংগ্রেসের সভাপতি-গণের মধ্যে যেমন মুসলমান ছিলেন, তেমনি পার্শীও ছিলেন। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম আমি এখনই উল্লেখ করিতে পারি। ইনি হইতেছেন কালীচরণ ব্যানার্জি। ইনি একাধারে যেমন খাঁটি ভারত-বাসী ছিলেন—তেমনি ছিলেন কংগ্রেসপন্থী। মিঃ কে টি পাল আজ এখানে উপস্থিত নাই। ইহাতে আমার মত আপনারাও যে দুঃখিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমার যতদূর বিশ্বাস তিনি সরকারীভাবে কংগ্রেসের সহিত যুক্ত না থাকিলেও পুরাপুরি জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

আজ মৌলানা মহম্মদ আলি বাঁচিয়া নাই, কিন্তু তিনিও কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জনই মুসলমান ছিলেন। তাছাড়া কংগ্রেসে নারীরও স্থান ছিল। কয়েকজন খ্যাতনামা মহিলা কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রথম সভানেত্রী হন ডাঃ আনি বেসান্ত, দ্বিতীয় সভানেত্রী হন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যও হইয়াছিলেন। সুতরাং বলিতে পারি যে, কংগ্রেসের মধ্যে যেমন শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়গত কোন পার্থক্য ছিল না, তেমনি নর ও নারীর মধ্যেও কোন পার্থক্য ছিল না।

কংগ্রেস প্রথম হইতেই তথাকথিত "অস্পৃশ্য"দের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। এক সময়ে কংগ্রেসের প্রত্যেক বার্ষিক সম্মেলনের সঙ্গে একটি করিয়া সামাজিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইত। পরলোকগত রানাডে তাঁহার বহু কাজের মধ্যেও এই কাজের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রানাডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঐ সামাজিক সম্মেলনে গৃহীত কার্যসূচীতে অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতি করিবার কথা প্রধান স্থান লাভ করিত। ১৯২০ সালে কংগ্রেস অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে আরও কার্যকরী প্রস্তাব গ্রহণ করে। অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন কংগ্রেসের রজনৈতিক কার্যসূচীর অঙ্গীভূত হয়। কংগ্রেস বুঝিতে পারে যে স্বরাজ লাভের জন্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তথা সমগ্র জাতির ঐক্য যেমন অপরিহার্য তেমনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য অস্পৃশ্যতারূপ পাপ দূরীকরণও একান্ত প্রয়োজন।

১৯২০ সালে কংগ্রেস যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল আজও তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। যে জাতীয়তাবাদের বাহক বলিয়া সে নিজেকে প্রচার করিত, সর্বব্যাপারেই সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে সে চেষ্টা করিত। তাছাড়া, কংগ্রেস প্রথম হইতেই দেশীয় নৃপতিগণের পক্ষও সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। আমি এই কমিটিকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ভারতের অতি-বৃদ্ধ পুরুষ কাশ্মীর ও মহীশূরের প্রতিভূ হিসাবে উহাদের বহু মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তাই আমি অতি বিনীতভাবে বলিতে পারি যে, ঐ রাজ্যদ্বয় দাদাভাই নৌরজীর কাছে বহু ব্যাপারেই ঋণী।

দেশীয় নৃপতিগণের ঘরোয়া ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া কংগ্রেস পরোক্ষভাবে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছে। আমি যে ক্ষুদ্র ভূমিকার অবতারণা করিলাম, আশা করি, তাহাতে, এই উপসমিতি এবং কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে কংগ্রেস তাঁহার দাবীর মর্যাদা রক্ষা করিতে সর্বদাই চেষ্টা করিয়াছে। তবে সব সময় সে যে ঐ মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু তবু আমি জোর দিয়াই একথা বলিতে পারি, আপনারা যদি কংগ্রেসের ইতিহাস অনুধাবন করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, তাহার ব্যর্থতার চেয়ে সাফল্যের সংখ্যাই বেশী।

বিশাল ভারতের, সে ভারত ব্রিটিশ অথবা ভারতীয় ভারত যাহাই হউক না কেন, ৭ লক্ষ গ্রামে যে অগণিত মূক, অর্ধভুক্ত নরনারী ছড়াইয়া রহিয়াছে কংগ্রেস তাহাদেরই প্রতিনিধি। অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের দাবীর চেয়ে ইহাদের দাবীই কংগ্রেসের নিকট অগ্রগণ্য। ইহাদের স্বার্থের সহিত অন্য যে কোন স্বার্থেরই বিরোধ উপস্থিত হউক না কেন, আমি নিঃসঙ্কোচে একথা বলিতে পারি যে, ঐ মূক নরনারীর স্বার্থ রক্ষার্থ অন্য সমস্ত স্বার্থকে দূরে সরাইয়া রাখিতে কংগ্রেস বিন্দুমাত্র ইতস্তত করিবে না। ইহা মুখ্যত একটি কৃষক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই পরিণত হইতেছে। কংগ্রেস তাহার সংগঠন ও নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের মধ্য দিয়া ২ হাজার গ্রামের ৫০ হাজার স্ত্রীলোকের আয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছে। ইহা জানিয়া আপনারা এমন কি উপ-সমিতির ভারতীয় সদস্যগণও নিশ্চয় বিস্ময়বোধ করিবেন। যাহাদের আয়ের সংস্থান কংগ্রেস করিয়া দিয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজন মুসলমান। তথাকথিত অস্পৃশ্য স্ত্রীলোকের সংখ্যাও কম নহে। এইভাবে গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়া আমরা গ্রামের নরনারীর সহিত যোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ৭ লক্ষ গ্রামেই যাহাতে আমরা সংযোগ স্থাপন করিতে পারি তাহারও চেষ্টা হইতেছে। ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু মানুষের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে কংগ্রেসও অচিরাৎ সমস্ত গ্রামের নরনারীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া তাহাদের নিকট চরকার বার্তা পৌঁছাইয়া দিবে।*

* ইংলণ্ডে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।
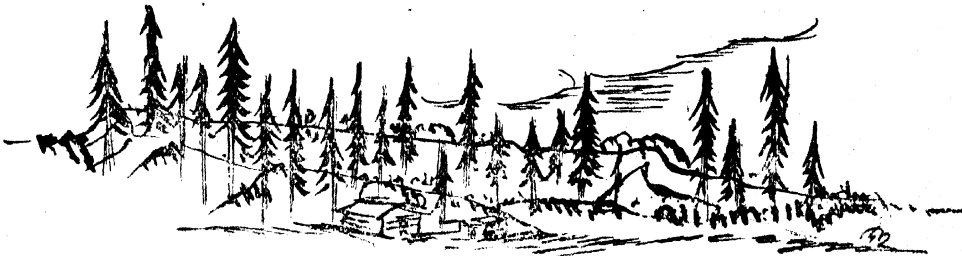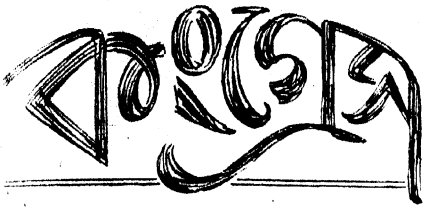
বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশনে যে স্বল্প সংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা নির্বাচিত প্রতিনিধি না হইলেও লোকসেবক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কংগ্রেসের এই প্রথম অনুষ্ঠানের পর ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা অর্জনই কংগ্রেসের লক্ষ্য হয়। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রথম দিকে তত পরিস্ফুট ছিল না, কিন্তু পরবর্তী যুগে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা তাহার আদর্শ হয়। এই বিশাল দেশের সমস্ত সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে লইয়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং উহাকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল করিয়া তোলাই হল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস যখন সৃষ্টি হয় তখন কংগ্রেসসেবিগণের আশা ছিল যে, ইংরেজ রাজনৈতিকগণ ও ব্রিটিশ সরকার তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিবেন এবং ভারতে সত্যকারের প্রতিনিধিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশ শাসন করিবার অধিকার ভারতীয় জনগণের হস্তে অর্পণ করিবেন। কংগ্রেসের প্রথম যুগে প্রস্তাব গ্রহণ করা ও বক্তৃতা করা ছাড়া আর কিছুই হইত না এবং এই সব বক্তৃতা ও প্রস্তাবে ঐ আশা ও বিশ্বাসই বার-বার ব্যক্ত করা হইত। প্রারম্ভে কংগ্রেসের দাবী প্রস্তাব করিয়াই প্রকাশ করা হইত। এই সব প্রস্তাবে শাসন সংস্কার সাধন ও আপত্তিজনক বিধিব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবী উপস্থিত করা হইত। এই আশাতে দাবী উপস্থাপিত করা হইত যে, ইংরেজ জাতি ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে যদি ভারতের অবস্থা ও ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সম্যকভাবে অবগত করান যায়, তবে তাহারা নিশ্চয় ভারতের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিবেন এবং এক-দিন ভারতবাসীকে বহুমূল্য স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিবেন।

ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে ইংরেজ সরকার যে নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাহাদের ঐ আশা ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতে থাকে। জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের শাসননীতিও রূঢ়তর হইতে থাকে। লর্ড কার্জনের আমলে বাঙলা দেশকে বিভক্ত করা হইলে ইংরেজের সদিচ্ছার প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। বঙ্গভঙ্গের ফলে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহাতে জনপ্রিয় জাতীয় চেতনা যে কতটা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাপান কর্তৃক রুশদেশ বিজয় প্রভৃতি জাগতিক ঘটনাও ঐ জাগ্রত চেতনাকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তবু বলা যায়, ভারতবাসীর বিশ্বাসের ভিত্তি তখন পর্যন্ত একেবারে ধ্বসিয়া যায় নাই। কারণ মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদে সাহায্য করিবার জন্য ইংরেজ যখন ভারতবাসীর নিকট আবেদন জানাইল, তাহাতে ভারতবাসী অকুণ্ঠভাবে সাড়া দিয়াছিল। কারণ, বঙ্গভঙ্গ রদ করায় ভারতবাসীর মনে ইংরেজের সদিচ্ছার প্রতি আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল; তাছাড়া তাহারা সমস্ত অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই ইংরেজকে সাহায্য করিতে ইতস্তত করে নাই। ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞগণ এই সাহায্য দানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ ঐ যুদ্ধ করে বলিয়া সকলেই আশা করে যে, যুদ্ধশেষে ভারতেও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারত সচিব এক ঘোষণা করেন। ভারত-বর্ষকে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে বলিয়া ঐ ঘোষণায় বলা হয়। উহাতে ভারতীয়-গণের মধ্যে মতবিভেদ হয়। পরে ভারত সচিব ও বড়লাটের আদেশে যে তদন্তকার্য চলিতে-ছিল, তাহা প্রকাশিত হওয়ায় ঐ মতভেদ আরও তীব্র হয় এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন পাশ হওয়াতে উহা চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া উপনীত হয়। ভারত শাসন আইন বিষয়টি আলোচনার মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। ইংরেজরা যুদ্ধে জয়লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়গণ ইহা উপলব্ধি করিতে থাকেন যে, ব্রিটেন যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে এবং ইউ-রোপের উপর আর যুদ্ধের চাপ না থাকাতে ভারতের প্রতি ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। খিলাফৎ ব্যাপারে ইংরেজের ব্যবহার এবং সমস্ত জনগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাউ-লাট আইন পাশ করায় তাহাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। খিলাফৎ ব্যাপারে ইংরেজ চুক্তিভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া তাহারা বুঝিতে পারে এবং রাউলাট আইন পাশ করিয়া যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় যে ভারতরক্ষা আইন চালু ছিল, তাহার সমস্ত কঠোর বিধানাবলী স্থায়ী আইন করিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া তাহারা উপ-লব্ধি করে। এই আইন দ্বারা জনগণের অর্থাৎ স্বাধীন নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে বলিয়া তাহারা বুঝিতে পারে।

অতঃপর সমগ্র দেশে দারুণ বিক্ষোভ ও আন্দোলন দেখা দেয়। যে সত্যাগ্রহ দক্ষিণ আফ্রিকায় আরম্ভ হইয়াছিল এবং চম্পারণে ও খেইরায় সাধারণভাবে চেষ্টা করা হইয়াছিল, মহাত্মা গান্ধী সেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। সত্যাগ্রহ দ্বারা অভিযোগের প্রতিকার সাধনের চেষ্টা এই সর্বপ্রথম। পাঞ্জাব ও আহমেদাবাদে কিছু বিসদৃশ হাঙ্গামা হয়। ইহাতে কিছু ধন ও জনের ক্ষতি সাধিত হয়। ইহার পরই জালিয়ানওয়ালাবাগের হৃদয়বিদারক হত্যালীলা ও পাঞ্জাবে সামরিক আইনের বীভৎস শাসন আরম্ভ হয়। ইহার ফলে দেশে স্বভাবত যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহা তদন্তকারী কমিশন হাণ্টার কমিটির রিপোর্টে বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় তো নাই-ই, বরঞ্চ এই রিপোর্ট সম্পর্কে পার্লামেণ্টে যখন বিতর্ক আরম্ভ হয়, তখন উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। দেশে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। একদিকে সরকারী খেতাব বর্জন, আইনসভা বর্জন, সরকারী শিক্ষালয় ও কোর্ট ইত্যাদি পরিত্যাগ এবং বিদেশী কাপড় বর্জন এবং অপরদিকে কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠা, কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ, তিলক স্বরাজ ফণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ, জাতীয় শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য-বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য পঞ্চায়েৎ গঠন এবং চরকা ও খদ্দর প্রচলন করা—ইহাই হয় অসহ-যোগ আন্দোলনের কর্মসূচী। আইন অমান্য ও কর বন্ধ আন্দোলনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টির জন্যই ঐ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বরাজ অর্জন করা ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সারা দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। সরকারী দমননীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ হইতে থাকে। ফলে ১৯২১ সালের শেষের দিকে কয়েকজন খ্যাতনামা নেতা সহ বহু সহস্র নরনারী কারা-রুদ্ধ হন। সরকারের সহিত আপোষ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বার্দোলীতে যে করবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়, যুক্তপ্রদেশের চৌরি-চোরায় দারুণ হাঙ্গামা বাধায় তাহা স্থগিত রাখিতে হয়। পরে অসহযোগ আন্দোলন কর্ম-সূচীর অন্যান্য কার্যক্রমও পর পর স্থগিত

রাখিতে অথবা প্রত্যাহার করিতে হয়। কংগ্রেস সদস্যগণ অতঃপর আইনসভায় যোগদান করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য ইংরেজ পার্লামেণ্ট কর্তৃক সাইমন কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনে কোন ভারতীয়কে গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাতে দেশে আবার আন্দোলনের জোয়ার আসে। কংগ্রেস অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় একটি গঠনতন্ত্র রচনা করেন। তাহাতে ডোমিনিয়ন স্টেটাসই ভারতের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। উহা বৃটিশ সরকারকে গ্রহণ করিতে বলা হয়। কিন্তু সরকারের দিক হইতে আশাজনক সাড়া না পাওয়ায় কংগ্রেস ১৯২৯ খৃঃ লাহোর অধিবেশনে তাহার লক্ষ্য পরিবর্তন করিয়া বলেন যে, আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ স্বরাজ (পূর্ণ স্বাধীনতা) অর্জনই কংগ্রেসের লক্ষ্য। অতঃপর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কংগ্রেস আবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে। ইংরেজ সরকারও দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। একদিকে তাহারা ভারত সম্পর্কে একটি গঠনতন্ত্র রচনার জন্য লণ্ডনে একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া তাহাতে সরকারকে উপদেশ দিবার জন্য কতিপয় ভারতীয়কে মনোনীত করেন; অপর দিকে অসহযোগ আন্দোলন দমন করিবার জন্য বহু কঠোর অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া দমননীতি চালাইতে থাকে। ১৯৩১ খৃঃ মার্চ মাসে ইংরেজ সরকারের পক্ষ হইতে লর্ড আরউইন ও কংগ্রেসের পক্ষ হতে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা হয় এবং ১৯৩১ খৃঃ শেষের দিকে মহাত্মাজী লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু সম্মেলনের ফলে কোন লাভ হয় না। কংগ্রেস ১৯৩২ খৃঃ প্রারম্ভে আবার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৪ খৃঃ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলে। পরে উহা আবার স্থগিত রাখা হয়। ১৯৩০ ও ৩২ সালের আন্দোলনে বহু নরনারী এমন কি শিশু পর্যন্ত জেলবরণ করে, হাসিমুখে পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার ও লাঠির আঘাত সহ্য করে। বহু লোকের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। জনতার উপর পুলিশের গুলী-বর্ষণের ফলে বহু জীবনহানি হয়। সত্যাগ্রহীদের সংগঠন ক্ষমতা ও সহ্যশক্তি বিস্ময়কর ছিল। প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও মোটামুটি তাহারা অহিংস ছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সজীবতা ও যোগ্যতা দেখা গিয়াছে, তাহা তুলনাহীন। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের উপর যে কঠিন আঘাত হানিয়াছে, তাহাতেও তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। যদিও দেশ তখন তাহার আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণ-স্বরাজ লাভ করিতে পারে নাই, তবু সে সাফল্যের সহিত সমস্ত অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

করাচী কংগ্রেসে গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে ইহা পরিষ্কার ভাবে বলা হয় যে, জনগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও প্রয়োজন। তাছাড়া গৃহীত প্রস্তাবে বক্তৃতার, মেলামেশার, ব্যক্তির ও সম্পত্তির, ধর্মের ও বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। কাজের সুব্যবস্থা ও সময় নির্দিষ্ট করা, বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করা, বার্ধক্য, পীড়া ও বেকার অবস্থার জন্য আর্থিক বন্দোবস্ত এবং ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা—প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা যাহাতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, প্রস্তাবে তাহাও বলা হয়। কৃষিজমির উপর যে করভার ছিল তাহার যথার্থ ব্যবস্থা করার জন্য কর ও খাজনা হ্রাস, অনুর্বর জমির কর বা খাজনা বাতিল এবং এইভাবে খাজনা বাতিল হইবার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সব জমির মালিকের ক্ষতি হইবে, তাহাদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা কৃষকদের স্বার্থও রক্ষা করা হইবে বলিয়া প্রস্তাবে আশ্বাস দেওয়া হয়। অন্য প্রস্তাবে জমির মোট আয়ের একটা ন্যায়সঙ্গত সর্বনিম্ন আয়ের পর হইতে ক্রমানুসারে কর ধার্য করা, একটা নির্দিষ্ট আয়ের উপর ক্রমহারে মৃত্যুকর আদায় এবং সামরিক ও দেশরক্ষা ব্যয় ও বেসামরিক শাসনব্যবস্থার ব্যয় হ্রাস করার কথা বলা হয়। সরকারী চাকরীয়াদের সর্বোচ্চ বেতন মাসিক পাঁচ শত টাকা ধার্য করার জন্য প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। বিলাতী বস্ত্র বর্জন, দেশীয় শিল্প রক্ষা, মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, রাষ্ট্র কর্তৃক বৃহৎ শিল্প নিয়ন্ত্রণ কৃষিঋণ মকুব, দেশের স্বার্থে কারেন্সী ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং দেশরক্ষা কল্পে নাগরিকগণকে সামরিক শিক্ষা দান প্রভৃতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমও গৃহীত হয়।

১৯৩৪ সনে বোম্বাইতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে আইন সভায় প্রবেশ করিবার নীতি অনুমোদিত হয়। তাহা ছাড়া সুতাকাটা ও হস্ত চালিত তাঁতে বস্ত্র বোনা, প্রয়োজনীয় কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন, অর্থনৈতিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয়, সামাজিক ও স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য গ্রাম্য-জীবনের পুনর্গঠন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য সাধন, মাদকদ্রব্য বর্জন, জাতীয় শিক্ষা, বয়স্ক লোককে সাধারণভাবে শিক্ষাদান, শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক এবং কৃষকদের সমিতি গঠন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা প্রভৃতি গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া প্রতিনিধি সংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং প্রাথমিক সদস্যের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। কংগ্রেসের সমস্ত নির্বাচিত সদস্য ও কর্মকর্তাদের পক্ষে খদ্দর পরা বাধ্যতামূলক করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।

এইভাবে নানা জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া কংগ্রেস অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে কংগ্রেস গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ইহাতে জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নই কেবলমাত্র যে হইবে তাহা নহে, তাহাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিবার পথ প্রশস্ত করিবে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে আরম্ভ হইলেও কংগ্রেস আজ সমস্ত দেশের প্রতিষ্ঠান, সমস্ত স্থানে তাহার শাখা রহিয়াছে। কংগ্রেস আজ জনগণের বিশ্বাসভাজন প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার যুদ্ধে যখনই সে আহ্বান জানাইয়াছে তখনই নানা-শ্রেণীর জনগণ অকাতরে সর্বস্ব দান করিয়াছে। কংগ্রেস আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, ইহার শক্তিবৃদ্ধি করা প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহা যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এখন বিশ্রাম লইবার সময় নহে। কঠিনতম অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে ইহার জন্য প্রয়োজন অফুরন্ত পরিশ্রম, অশেষ ত্যাগ ও ঐকান্তিক দৃঢ়তা। ইহা ভিন্ন পূর্ণ স্বরাজলাভ সম্ভবপর নহে। যে সব অজ্ঞাত ও জ্ঞাত নরনারী ও শিশু দেশের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, দেশের জন্য অশেষ দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়াছেন এবং দেশকে ভালবাসিবার জন্য মূল্য দিয়াছেন, আসুন আমরা তাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

যাঁহারা এই মহান প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের অক্লান্ত শ্রম ও ত্যাগ দ্বারা উহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন আমরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিতেছি। ষাট বৎসর পূর্বে যে ক্ষুদ্র বীজ রোপণ করা হইয়াছিল আজ তাহা বিরাট মহীরূহে পরিণত হইয়াছে, এই বিশাল দেশে ইহার শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বহু নরনারীর ত্যাগে আজ উহা পুষ্পপত্রে সুশোভিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কর্তব্য হইতেছে তাহাদের ত্যাগ ও সেবা দ্বারা এই বৃক্ষকে পরিপুষ্ট করা যাহাতে ইহা সাফল্য লাভ করিতে পারে এবং প্রকৃতির ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ভারতকে সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করিতে পারে।

তেন এবং তখন তাঁকে আবার পা গণে রে আসতে হত। তাঁর মতবাদকে পুরো-রি গ্রহণ করার মত লোক বেশী ছিলেন না কেউ কেউ তাঁর মূল নীতির সঙ্গেও এক-ত ছিলেন না। কিন্তু পরিবর্তিত আকারে গ্রেসের কাছে তাঁর যে মতবাদ আসত তা নেকে এই বলে গ্রহণ করতেন যে তৎকালীন রিবেশের পক্ষে সে মতবাদ উপযোগী। দুটি ক থেকে তাঁর চিন্তাজগতের পটভূমিকা স্পষ্ট হলেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলঃ কোন কাজের মূল্য বিচার করা হত তার য় জনগণের কতটা উপকার হবে তাই দিয়ে ং কাজ করার উপায়টাকেও সব সময় গুরুত্ব ওয়া হত। উদ্দেশ্য সাধু হলেও উপায়কে জ্ঞা করা চলত না—কেন না উপায় উদ্দেশ্যকে য়ন্ত্রিত করে এবং তার পরিবর্তন সাধনও র।

গান্ধীজী মূলত ধর্মবোধসম্পন্ন মানুষ লেন—তাঁর সত্তার গভীরতম বিষয়েও তিনি লেন হিন্দু—তবু তাঁর ধর্মবোধের সঙ্গে কার বা ধর্মীয় রীতি পদ্ধতির কোন সংযোগ ল না। সে ধর্মবোধের মূল ভিত্তি ছিল তিক বিধি সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের উপর একেই তিনি বলেছেন সত্য কিংবা প্রেমের ধি। সত্য এবং অহিংসা তাঁর কাছে একই নিস কিংবা একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন ক মাত্র এবং তিনি প্রায় সমার্থবোধক অর্থেই ই কথাগুলি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর দাবী ল যে হিন্দুধর্মের মূল সূত্র তিনি বোঝেন বং তাঁর আদর্শবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে সেই র্ যা হওয়া উচিত তার সঙ্গে কোন শাস্ত্রোক্ত প্রথার যদি সামঞ্জস্য না হত তবে তিনি কে বলতেন পরবর্তী যুগের অনুলিখন বা য়োজনা। তিনি বলেছেনঃ "যেসব উদাহরণ প্রথা আমি বুঝতে পারি না কিংবা নীতিগত ক থেকে সমর্থন করতে পারি না তাদের সত্ব করতে আমি রাজী নই।" কার্যতও দেখি তনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁর মনোমত পথ বছে নেন, নিজেকে ইচ্ছামত পরিবর্তিত করেন, তাঁর জীবনদর্শন ও কর্মপদ্ধতির বিবর্তন াধন করেন। এসব ব্যাপারে তিনি নৈতিক বিধিকে যেভাবে বুঝেছেন তার বাঁধন ছাড়া অন্য কান বাঁধন মানেন না। তাঁর এ দর্শন সত্য কি ান্ত তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে; কিন্তু তিনি র্ববিষয়ে, বিশেষ করে নিজের ব্যাপারে, এই কই মূল মাপকাঠি প্রয়োগ করার উপর জোর দন। রাজনীতিতে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং প্রায়ই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন অসুবিধাই তাঁকে তাঁর বেছে নেওয়া সরলরেখা সদৃশ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না—যদিও একটা বিশেষ সীমার মধ্যে পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে তিনি প্রতিনিয়তই নিজেকে বদলান। যে সংস্কার তিনি করতে চান, যে উপদেশ তিনি অপরকে দেন সেটা সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের উপর প্রয়োগ করেন। তিনি সর্বদা নিজেকে দিয়েই কাজ শুরু করেন এবং হাতের সঙ্গে যেমন দস্তানার মিল তেমনি তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই যাই ঘটুক না কেন তাঁর চারিত্রিক নিষ্ঠা তিনি কখনও হারান না এবং তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে সর্বদাই একটা প্রাণময় সম্পূর্ণতা দেখতে পাওয়া যায়। আপাতত যেটাকে তাঁর ব্যর্থতা বলে মনে হয় তার মধ্যেও দেখি তিনি অনেক বড় হয়ে উঠেছেন।

তিনি নিজের ইচ্ছা ও আদর্শ অনুসারে যে ভারতকে গড়ে তুলতে চাইছিলেন তার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি ছিল? "আমি এমন ভারত সৃষ্টির জন্যে কাজ করে যাব যেখানে দীনতম জনসাধারণও অনুভব করবে যে এটা তাদের দেশ, একে গড়ে তোলার কাজে তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। সে হবে এমন ভারত যেখানে উচ্চ শ্রেণী ও নীচ শ্রেণীর মানুষ থাকবে না, যেখানে সমস্ত সম্প্রদায় পরিপূর্ণ শান্তিতে বাস করবে।......সে ভারতে অস্পৃশ্যতা রূপ অভিশাপের কোন স্থান থাকবে না কিংবা মত্ততা সৃষ্টিকারক পানীয়াদিরও কোন স্থান থাকবে না।......নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করবে।......এই হল আমার কল্পলোকের ভারতবর্ষ।" নিজের হিন্দু উত্তরাধিকারের জন্যে তাঁর গর্ববোধ ছিল; হিন্দুত্বকে তিনি একটা সার্বজনীনতার আবরণে আবৃত করার চেষ্টা করতেন এবং তাঁর সত্য-বোধের সীমার মধ্যে সকল ধর্মের স্থান ছিল। তিনি তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সংকীর্ণতার মধ্যে ধরে রাখতে সম্মত ছিলেন না। তিনি লিখেছিলেনঃ "ভারতীয় সংস্কৃতি পুরো-পুরি হিন্দু, ঐসলামিক কিংবা অন্য কোন জাতির নয়। এ সংস্কৃতি হল সব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত।" তিনি আরও বলেছেনঃ "আমার গৃহের চতুর্দিকে যতটা সম্ভব মুক্তভাবে সকল দেশের সংস্কৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছে এই আমি দেখতে চাই। কিন্তু কোন বিশেষ সংস্কৃতির চাপে আমি নিজেকে হারাতে রাজী নই। অপরের গৃহে অনধিকার প্রবেশকারী রূপে, তা সে ভিক্ষুকরূপেই হোক আর দাসরূপেই হোক, আমি বাস করতে অসম্মত।" আধুনিক চিন্তাধারাগুলির প্রভাব তাঁর উপরে ছিল; কিন্তু মূলকে তিনি কখনও ছাড়েন নি বরং সজোরে আঁকড়ে ধরেই ছিলেন।

জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য পুনঃ সংস্থাপন করতে, সমাজের শীর্ষদেশবাসী পাশ্চাত্যধর্মী ক্ষুদ্র একদল নরনারী ও অগণিত জনগণের মধ্যবর্তী প্রাচীর ভেঙে দিতে, প্রাচীন মূলের মধ্যে জীবনীশক্তি আবিষ্কার করে তার ভিত্তিতে নতুন কিছু গড়ে তুলতে, জন-গণকে মোহগ্রস্ত অচল অবস্থা থেকে জাগিয়ে তাদের প্রাণময় করে তুলতে—তিনি কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর একমুখী অথচ বহু-বিচিত্র প্রকৃতির যে ভাবটি মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করত সে হল জনগণের সঙ্গে তাঁর একীভূত ভাব, তাদের সঙ্গে ভাবগত বহু সাদৃশ্য, শুধু ভারতের নয় সমগ্র বিশ্বের সর্বহারা ও দারিদ্র্যপীড়িতদের সঙ্গে বিস্ময়কর ঐক্যবোধ। নিষ্পেষিত জনগণের উন্নতিসাধনের যে তীব্র স্পৃহা তাঁর মনে ছিল তার কাছে অন্য সব কিছুর মত ধর্মের স্থানও ছিল গৌণ। "অর্ধাশনক্লিষ্ট জাতির ধর্ম, শিল্প কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না।" "অনশনক্লিষ্ট কোটি কোটি নরনারীর জীবনে যা-কিছু উপকারী আমার মতে তাই হল সুন্দর। আজ যদি প্রথমেই আমরা জীবনের অস্তিত্বের পক্ষে অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জোগাতে পারি তবে জীবনের সকল সৌন্দর্য ও লাবণ্য আপনা থেকেই আসবে।......আমি চাই এমন শিল্প ও সাহিত্য যা কোটি কোটি নরনারীর মনে সাড়া জাগাতে পারে।" এই অসুখী সর্বহারা দল তাঁর চিন্তা-জগৎ জুড়ে ছিল এবং তাঁর জীবনের সব কিছুই ঘুরত তাদের কেন্দ্র করে। "কোটি কোটি নরনারীর জন্যে আছে হয় অনন্ত জাগরণ নয়তো অনন্ত মোহনিদ্রা।" তিনি বলতেন যে তাঁর মনের অভীপ্সা হল "প্রত্যেক চোখের প্রতি ফোঁটা জল মুছে দেওয়া।"

এই যে বিস্ময়কর ধরণের প্রাণবান মানুষটি যিনি পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও অস্বাভাবিক রকমের ক্ষমতার অধীশ্বর, প্রতিটি ব্যক্তির সমানাধিকার ও স্বাধীনতা যাঁর দাবী, কিন্তু এ সবকিছুরই যিনি পরিমাপ করেন দীনতম মানুষকে দিয়ে, তিনি যে ভারতের জনগণকে মুগ্ধ করবেন এবং চুম্বকের মত তাদের আকর্ষণ করবেন—এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি তাদের কাছে ছিলেন অতীত ও ভবিষ্যতের যোগসূত্রের প্রতীক বিশেষ এবং নৈরাশ্যপূর্ণ বর্তমানকে তিনি তাদের চোখে আশা ও প্রাণ-পরিপূর্ণ ভবিষ্যতের সিঁড়িরূপে প্রতিভাত করাতে পেরেছিলেন। আর শুধু জনগণই নয় বুদ্ধিবাদীরাও মুগ্ধ হয়েছিল যদিও তাদের মন সময়ে সময়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলত এবং আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করে তাদের পক্ষে নতুন জীবনে অভ্যস্ত হওয়া অধিকতর কষ্টদায়ক হয়ে উঠত। এইভাবে শুধু নিজের অনুগামীদের মধ্যে নয়, বিরোধীদের মধ্যে এবং অসংখ্য মধ্যপন্থীদের মধ্যে, যারা কোন চিন্তা বা কাজ সম্বন্ধে মনস্থির করে উঠতে পারেনি—তাদের সকলের মধ্যে তিনি একটা বিরাট মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব সাধন করতে পেরেছিলেন।

কংগ্রেস গান্ধীজীর প্রভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল অথচ সে এক অদ্ভুত প্রভাব, কেন না কংগ্রেস

ছিল একটি সক্রিয়, বিদ্রোহী, বহুমুখী প্রতিষ্ঠান, বহু ধরণের মতবাদে পূর্ণ এবং যে কোন মতের দ্বারা তাকে সহজে এদিকে ওদিকে চালাবার উপায় ছিল না। অনেক সময় গান্ধীজী অন্যের ইচ্ছার মূল্য দেবার জন্যে নিজের মতবাদকে নরম করে আনতেন আবার কখনও বা তিনি বিপরীত সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতেন। নিজের সম্বন্ধে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠিন এবং এজন্যে একাধিকবার কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিল। কিন্তু সব সময়েই তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা ও সংগ্রামী জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক, যারা ভারতকে দাসত্বশৃংখলে আবদ্ধ করতে চাইত তাদের অপরাজেয় বিরোধী। তিনি স্বাধীনতার এমন প্রতীক ছিলেন যে অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে মতভেদ হলেও এ ব্যাপারে মানুষ তাঁর কাছেই ছুটে যেত এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিত। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যখন থাকত না তখন তাঁর নেতৃত্ব সবাই সর্বদা মানত না, কিন্তু সংগ্রাম যখন অনিবার্য হয়ে উঠত তখন তাঁর প্রতীকটিই সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াত—আর সব কিছুই হয়ে পড়ত গৌণ।

এইভাবে ১৯২০ সালে কংগ্রেস এবং বহুল পরিমাণে সমগ্র দেশ এই নতুন ও অনাবিষ্কৃত পথে যাত্রা করল এবং বার বার বৃটিশ শাসক শক্তির সঙ্গে তার সংঘর্ষ হতে লাগল। এই সব উপায়ের মধ্যেও যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার মধ্যে এই সংঘর্ষ অন্তর্নিহিত ছিল, তবু এসব কিছুর পিছনে নিছক রাজনৈতিক কৌশল ও ঘুঁটি চালাচালি ছিল না—ছিল ভারতবাসীদের শক্তিশালী করে তোলার আগ্রহ, কেননা একমাত্র এই শক্তির দ্বারাই তাদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করে রক্ষা করা সম্ভব। একটির পর একটি আইন অমান্য আন্দোলন এসেছে—তাতে অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা পেতে হয়েছে কিন্তু সে দুঃখ-যন্ত্রণা ছিল আমাদের আমন্ত্রিত, কাজেই শক্তিদায়ী—যে ধরণের দুঃখ-যন্ত্রণা অনিচ্ছুকদের অভিভূত করে ফেলে, হতাশা ও পরাজিতসুলভ মনোভাবের দিকে নিয়ে যায়—সে ধরণের দুঃখ-যন্ত্রণা এটা নয়। সরকারী নির্যাতনের বহু বিস্তৃত জালে পড়ে অনিচ্ছুকদের ভুগতে হয়েছে, এমন কি স্বেচ্ছায় যারা দুঃখ-যন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছিল তারাও সময় সময় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু অনেকেই সত্যাশ্রয়ী ও দৃঢ় ছিল এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা তাদের আরও দৃঢ়তর করে তুলেছিল। কখনও, এমন কি চরম দুর্দিনেও, কংগ্রেস কোনদিন উচ্চতর শক্তির কাছে কিংবা বৈদেশিক শাসকদের কাছে নতি স্বীকার করে নি। ভারতের স্বাধীনতা লাভের তীব্র স্পৃহা এবং বিদেশী শাসন প্রতিরোধের ইচ্ছার প্রতীক হয়েই সে বরাবর ছিল। এইজন্যেই ভারতের অগণিত নরনারী কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল এবং নেতৃত্বের আশায় তার দিকেই তাকাতো—যদিও তাদের মধ্যে অনেকে এত দুর্বল বা এভাবে পারিপার্শ্বিক ঘটনায় অবরুদ্ধ ছিল যে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কিছু করার উপায় ছিল না। কোন কোন দিক থেকে কংগ্রেস ছিল একটি রাজনৈতিক দল; আবার কয়েকটি দলের মিলিত প্ল্যাটফর্মও ছিল কংগ্রেস, কিন্তু মূলত কংগ্রেস ছিল এরও চেয়ে বেশী কিছু, কেন না কংগ্রেস ছিল অগণিত জনগণের মনোগত অভীপ্সার প্রতিনিধি। কংগ্রেসের সদস্যদের তালিকাভুক্ত নামের সংখ্যা খুব বেশী হলেও তা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক প্রতিনিধিমূলক চরিত্রের পরিমাপ করা কঠিন, কেননা সদস্যভুক্ত হওয়াটা জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল না, সেটা নির্ভরশীল ছিল দূরতম পল্লী পর্যন্ত আমাদের পেঁছানোর শক্তির উপর। বহুবার কংগ্রেসকে অবৈধ প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হয়েছে, আইনের চোখে তার কোন অস্তিত্বই তখন থাকে নি এবং পুলিশ আমাদের খাতাপত্র সব নিয়ে চলে গেছে।

যখন কোন প্রত্যক্ষ আইন অমান্য আন্দোলন থাকত না তখনও ভারতে বৃটিশ শাসনযন্ত্রের সঙ্গে অসহযোগিতার সাধারণ মনোভাব থাকত, যদিও সে মনোভাব হত আক্রমণাত্মক-নীতি-বিবর্জিত। তার অর্থ অবশ্য ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা নয়। অনেক প্রদেশে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট স্থাপিত হবার পরে অফিস ও সরকারী কাজকর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতার সম্পর্কই বিদ্যমান ছিল। তখনও কিন্তু পটভূমিকা বিশেষ বদলায় নি এবং অফিসঘটিত কাজকর্ম ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে কংগ্রেসপন্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সাময়িক আপোষ ও সামঞ্জস্যবিধান সময়ে সময়ে অনিবার্য হলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে চূড়ান্ত শান্তি স্থাপিত হতে পারে না। একমাত্র স্বাধীন ভারতই সমান সর্তে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে।

কংগ্রেস অভ্যুদয়ের ইতিহাস

পট্টভি সীতারামিয়া ...

কংগ্রেসের ইতিহাস—জাতীয় জাগরণ তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। বাণিজ্য করিতে আসিয়া ইংরেজ নানা ছলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করিয়া শাসন ও শোষণ দুই-ই চালাইতে থাকে। ইহাদের কবল হইতে ভারতকে মুক্ত করাই ছিল কংগ্রেসের প্রধানতম উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে তাই তাহাকে অনবরত বিদেশী শক্তির সহিত সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। তাহাদের মধ্য চলিয়াছে অসহযোগ সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই কংগ্রেসের রক্তরঞ্জিত ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

ভাগ্যান্বেষী গুটিকয়েক ইংরেজ ভারতে প্রবেশদ্বার খুলিয়া ধরে জাতির কাছে। ভারতের অফুরন্ত সম্পদের কথা পশ্চিম জগতে রূপকথার মত ছড়াইয়া পড়ে। লুব্ধ ও অদৃষ্টপরীক্ষার্থী শ্বেতাঙ্গের দল দলে দলে ভারতের শ্যামল ভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে। অবাধ বাণিজ্যের তথা সহজে অর্থ আহরণের এমন সুযোগ পাইয়া তাহারা নিজ বাসভূমির কথা পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া ভারতভূমিতেই স্থায়ী আবাস স্থাপন করে। আর অন্যদিকে কতিপয় ইংরেজ বণিক ভারতকে সুশৃংখলভাবে শোষণের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিয়া বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট হইতে সনন্দ আদায় করেন। ধীরে ধীরে ভারতের বিশাল বাজার তাহার করতলগত হয়। ইংরেজ বণিক অফুরন্ত ঐশ্বর্য ও ধনরত্নের অধিকারী হয়। অপরিমিত অর্থসম্পদ তাহাকে ক্ষমতালিপ্সু করিয়া তোলে। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়া সে রাজনীতিক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। ব্যবসাবাণিজ্যের দিকটা পেছনে রাখিয়া তাহারা দেশীয় নৃপতিগণের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের কূটনীতি জয়লাভ করে। প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয়। "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে, পোহালে শর্বরী"।

১৭৭২ সালের পর হইতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ সম্পর্কে তদারক করিতেন। কোম্পানী ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করায় নূতন সনন্দ দেওয়ার পূর্বে পার্লামেণ্ট বিশেষভাবে তদন্ত করিতেন। কিন্তু তবু ইহাতে বহু ফাঁক থাকিয়া যাইত। সেই সুযোগে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ভারতবাসীকে নানাভাবে নির্যাতন করিতেন। তাহাদের দুর্বিচার ও নিপীড়নের সংবাদ কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করিলেও বহু ইংরেজ পুরুষ ছিলেন যাঁহারা তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিতে ইতস্তত করিতেন না। এই প্রসঙ্গে আমরা এডমণ্ড বার্ক, সেরিডন, ফক্স-এর নাম উল্লেখ করিতে পারি। অভিযুক্ত ওয়ারেন হেস্টিংস বিচারে মুক্তিলাভ করিলেও সমস্ত সভ্য জগৎ জানিতে পারে যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইতেছে।

কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ ভারতে রাজ্যবিস্তার করিতে চেষ্টা করিবেন না বলিয়া পার্লামেণ্ট বারবার সর্ত আরোপ করিলেও উহা আদৌ রক্ষিত হইত না। সুযোগ পাইলেই প্রতিনিধিগণ রাজ্য জয় করিয়া লইতেন এবং রাজ্যের ধনরত্ন নানাভাবে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন। এ কার্যসাধনে তাহারা যে বিশ্বাসঘাতকতা, হীনতা ও পশুমনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা তুলনাহীন। তাহারা বারবার সন্ধি করিয়াছে এবং প্রত্যেকবারই তাহা অতি সহজে লংঘন করিয়াছে। বহু ভারতীয়ও তাহাদের ঐ দুষ্কার্যে সহায়তা করিয়াছে। তাহাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্যে ইংরেজ বণিক ভারত হইতে যে প্রভূত অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছে তাহা দ্বারা তাহারা শিল্প বিপ্লবের সুযোগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সারা পৃথিবীতে শিল্পক্ষেত্রে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।

১৭৭৪ খৃঃ সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পরোক্ষভাবে ভারতের বিজিত অংশের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের উপর বোর্ড অব কন্ট্রোল নিযুক্ত হইল। ইহাদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩৩ সালে আইন করিয়া চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বর্ণবিভেদ তুলিয়া দেওয়া হইল এবং কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার অধিকারও লুপ্ত হইল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন সম্পূর্ণরূপে ভারতের শাসন কর্তৃপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল।

ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের ব্যাপারে এই সময় এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। রাজা রামমোহন মনে করিলেন যে, দেশবাসী ইংরাজী না শিখিলে তাহাদের মধ্যে আত্মবোধ জাগিবে না। তাই তাঁহার ও মেকলের আন্দোলনের ফলে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে জনমত গঠিত হইল।

১৮৩৩ হইতে ১৮৫৩ সালের মধ্যে ইংরেজ নানা অজুহাতে বহু দেশীয় রাজ্যসহ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ দখল করিয়া নেয়। বিদেশী শাসকের অত্যাচার, অবিচার ও নিপীড়ন আর অপর দিকে অর্থনৈতিক শোষণ দেশে নিদারুণ অসন্তোষ এবং বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ হয় ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে। অসন্তোষে ইহার সৃষ্টি হইলেও জাতীয়তাবাদে ইহার বৃদ্ধি। পরাধীন ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা ইহাই সর্বপ্রথম। পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) এক শতাব্দী পরে ভারতীয়গণ দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু নানা কারণে এই বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। তাহা হইলেও এই বিদ্রোহ যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে তাহাতে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকার তথা পার্লামেণ্টের হাতে চলিয়া যায়। ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণাবাণী পাঠ করেন তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক আশার বাণী শোনান হয়, কিন্তু কার্যত অনেক কিছুরই ব্যতিক্রম দেখা যায়। রাজপ্রতিনিধি পূর্বনীতি অনুসরণ করিয়াই ভারতে রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন। তাছাড়া মুসলমান নৃপতিগণের বংশধরেরা আবার যাহাতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে না পারেন সেজন্য ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিশ্চিহ্ন করাও কর্তৃপক্ষের নীতি হয়। এমনিভাবে প্রায় ২০ বছর তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

আইন করিয়া ভারতীয়গণের পক্ষে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করা হইলেও কার্যত তাহাদিগকে চাকুরিতে বহাল করা হইত না। তাছাড়া সিভিল সার্ভিসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় ভারতীয়গণের পক্ষে উহাতে যোগদান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কারণ বিলাতে গিয়া সবার পক্ষে প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর নহে। তবু যাঁহারা বিলাতে গিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলেন তাঁহারা সাফল্যমণ্ডিত হইলেন। লর্ড সেলিসবেরী প্রতিযোগীদের বয়ঃসীমা হ্রাস করিয়া আর এক নূতন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিলেন।

কৃষকদের জীবনও দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলায় নীলকরের অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাছাড়া দেওয়ানী আদালতের ব্যয়বাহুল্য ও অকার্যকরী বিচারপদ্ধতি, দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী পুলিশের নিপীড়ন, রাজস্ব আদায়ের কঠোর

ব্যবস্থা এবং অস্ত্র ও বন আইনের নির্মম প্রয়োগ কৃষকদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা তীব্রভাবে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-জ্ঞাপন করিয়া বিফলমনোরথ হইল। অর্থাৎ তৎকালীন সমস্ত ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণের ভাষায় বলা যায় যে, ব্যুরোক্রেসী দেশবাসীকে নূতন কোন সুবিধা সুযোগ তো দেয়ই নাই, বরঞ্চ, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, সভা করিবার অধিকার, পৌর স্বায়ত্তশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি যাহা ছিল তাহাও হরণ করিয়া নিয়াছে।

সংবাদপত্রের সংখ্যা অতীতে আমাদের দেশে খুব কমই ছিল এবং যা ছিল তাহাও ইংরেজ পরিচালিত। এই সংবাদপত্র পরিচালনার জন্য বহু ইংরেজকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও স্যার চার্লস মেটকাফের আমলে সংবাদপত্র কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু লর্ড লীটন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারী করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আবার হরণ করেন। তিনি অস্ত্র আইন পাশ করিয়া ভারতবাসীকে কেবলমাত্র যে নিরস্ত্র করিলেন তাহা নহে, ইংরেজ ও ভারতীয়গণের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে তাহাই প্রমাণিত করিলেন।

তারপর দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের কথা। দেশে খাদ্য আছে, কিন্তু তবু লোকে খাইতে পায় না। অব্যবস্থার ফলে হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দেশে শাসক আফগান যুদ্ধের জন্য বহু কোটি টাকা ব্যয় করিল। শুধু তাহাই নহে, মহারাণীর রাজ্যাভিষেকের জন্য দিল্লীতে দরবার আহবান করা হইল। লোকের সহ্যের সীমা তখন শেষ প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়াছে। মুষ্টিমেয়ের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বহুলোকের উপর এই নির্যাতন সারা দেশে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। নানা স্থানে অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনও দেখা দিল।

স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন বলিয়াছিলেন যে, লর্ড লীটনের আমলে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে রুশের অনুকরণে পুলিশ যে অত্যাচার চালাইতেছিল তাহাতে অদূরভবিষ্যতে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় মিঃ হিউমকে কাজে লাগান হইল। ইহা ভিন্ন মিঃ হিউম জানিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশে গুপ্তভাবে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এই সম্পর্কে কতকগুলি দলিলও তাহার হস্তগত হয়। তবে উহা যে সুপরিকল্পিত একটা কিছু তাহা নহে। দারুণ হতাশায় একটা কিছু করিবার জন্য দেশের লোকে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহারা চাহিতেছিল দেশে ডাকাতি, অবাঞ্ছিত ব্যক্তি-গণকে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে যাহাতে উহা ক্রমে জাতীয় বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়। বোম্বাইয়ের কৃষক বিদ্রোহের রূপও ছিল তাহাই। হিউম উহা প্রতিরোধ করিবার জন্য "সেফ্‌টি ভাল্‌ব" স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। এই সেফ্‌টি ভাল্‌ব হিসাবে ব্যবহারের জন্যই তিনি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তথা কংগ্রেসের পরিকল্পনা করেন।

বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ যত কায়েম হইতেছিল ভারতে জাতি গঠনের কাজ ততই দ্রুততর হইতেছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নেতৃবৃন্দ ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তার বাণী প্রচার করিতেছিলেন। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনও বেশ সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইতেছিল। কংগ্রেসের জন্মের ৫০ বৎসর পূর্ব হইতেই জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টা চলিতেছিল। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী। তাই তাঁহাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঋষি ও নব ভারতের জনক বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজ জাতি গঠন তথা সামাজিক সংস্কার কার্যে ব্রতী ছিল। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমরা বাঙলার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বোম্বাই এসোসিয়েশন, মাদ্রাজ মহাজন সভা, পূর্ব ভারতীয় সভা, পুণার সার্বজনীন সভার নাম করিতে পারি। এইসব প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান জাতির জাগরণে বিশেষ সহায়তা করে। ঐসব সমাজসংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত নেতৃবৃন্দ,—যথা, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, স্যার মঙ্গলদাস নাথুভাই, নৌরজী ফার্ডানজী, দাদাভাই নৌরজী, জগন্নাথ-শঙ্কর শেঠ, জি সুব্রহ্মনিয়া আয়ার, বীর রাঘব-চারিয়ার, রঙ্গিয়া নাইডু, এন পান্তলু, মহারাষ্ট্রের রাও বাহাদুর কে এল নুলকর, এস এইচ চিপলুনকর দেশ গঠনে আপনাদের সর্বশক্তি নিযুক্ত করেন। রাজনীতি তাঁহাদের আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বিষয় না হইলেও জাতীয়তাবাদ মন্ত্রে তাঁহারা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা এবং আনন্দমোহন বসু ইহার প্রথম সম্পাদক। দেশে তখন নূতন জাগরণের ঢেউ তাই সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য যখন উদাত্ত স্বরে আহবান জানান, তখন দেশবাসীর নিকট হইতে প্রভূত সাড়া পান। তিনি জাগরণের বাণী লইয়া প্রায় সারা ভারত পর্যটন করিয়া বেড়ান। ইহা ভিন্ন সমাজসংস্কার তথা জাতীয় জাগরণের মূলে কতিপয় ধর্ম-সংস্কারকের দানও অবিস্মরণীয়। কেশব সেন, আর্য সমাজের দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁহার যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দেশের এই নব জাতীয়তাবাদের বন্যাকে রুদ্ধ করিবা জন্য রাজপ্রতিনিধিগণ নানাভাবে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হন। তাঁহাদের নিপীড়ন রুদ্ধ স্রোত আরও বেগবতী হয়। এই সময় মিঃ ইলবার্ট একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিচারপতিগণকে শ্বেতাঙ্গ আসামীদের বিচার করিবার অধিকার দান, এই বিলের ফলে শ্বেতাঙ্গ সমাজে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। তদানীন্তন বড়লাটকে জোর করিয়া এদেশ হইতে চালান দিবার জন্য এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। বিরোধিতার ফলে বিলটি মূলত প্রত্যাহৃত হইলেও বিধান করা হইল যে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজদের মধ্য কোন পার্থক্য থাকিবে না। যাহা হউক, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের এই জয়লাভে ভারতীয়গণ নিজেদের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল। সঙ্ঘশক্তি প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে তাহারা অনুভব করিল। ভারতের নেতৃবৃন্দ কলিকাতার এলবার্ট হলে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন আহবান করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও অম্বিকাপ্রসাদ বসু এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনদিনব্যাপী স্থায়ী এই অধিবেশনে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। ১৮৮৪ সালে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয় তাহাতে জাতীয়তা-মূলক বহু বিষয়ে আলোচনা হইল। এইখানেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বীজ উপ্ত হইয়া-ছিল বলিয়া রেভাঃ জন মারডক মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, নিখিল ভারত কংগ্রেসের পরিকল্পনা সর্বপ্রথম কে করিয়াছিলেন, তাহা আজও রহস্যাবৃত। দেশে তখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে দেশবাসী যে একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কোন ভুল নাই। মিঃ হিউম তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞদের পরামর্শক্রমে এই ব্যাপারে অগ্রণী হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, প্রাদেশিক সমিতিগুলি, যথা,—কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বোম্বাইয়ের প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন, মাদ্রাজের মহাজন সভা রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য করিবে এবং নিখিল ভারত জাতীয় সভা মোটামুটি সামাজিক আন্দোলনে তাহাদের কর্মশক্তি নিয়োজিত করিবে। তিনি এ বিষয়ে লর্ড ডাফরিনের সহিত পরামর্শ করেন। এ সম্পর্কে মিঃ ডব্লিউ সি ব্যানার্জি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, কংগ্রেস যে লর্ড ডাফরিনেরই উদ্যোগে ও পরামর্শে সৃষ্ট তাহা হয়ত অনেকের জানা নাই। কারণ হিউম সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে

জার্মানের সহিত আলাপ করিতে গেলে তিনি হিউমকে যুক্তি দ্বারা ইহাই বুঝাইয়া দেন যে, পরোক্ষগত সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ না করিলে ঐ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কোন অর্থ হইবে না। হিউম তাঁহার যুক্তি গ্রহণ করিয়া ভারতীয় জাতীয় সভার কর্মক্ষেত্র রাজনীতিতেও প্রসারিত করিতে মনস্থ করেন।

১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে পুণাতে বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে পুণাতে ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়নের এক সম্মেলন হইবে। সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইবে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্য-পারস্পরিক ভাব আদান প্রদান ও পরবর্তী বৎসরের জন্য যে রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা।

সম্মেলনের বন্দোবস্ত করিয়া মিঃ হিউম বিলাত চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি লর্ড রিপণ, লর্ড ডালহৌসী, স্যার জেমস কাইরাড, জন ব্রাইট, মিঃ রীড, মিঃ শ্লাগ এবং অন্যান্য বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদদের সহিত কংগ্রেসের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁহাদের পরামর্শে তিনি সেখানে ভবিষ্যৎ ভারতীয় পার্লামেণ্টারী কমিটির বীজ বপন করেন। পার্লামেণ্টে নির্বাচনপ্রার্থীরা যাহাতে ভারতীয় ব্যাপারে একটু ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন তাহার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে এদেশ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত টেলিগ্রাম বিলাতে পেঁছাইয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা যেন গোপনে না রাখা হয়, তজ্জন্য বোম্বাইতে একটি 'টেলিগ্রাম ইউনিয়ন' স্থাপন করেন।

দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পুণার পরিবর্তে বোম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় ইউনিয়নের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্থানের বহু নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনে যোগদান করেন। মিঃ ডব্লিউ সি ব্যানার্জী সভাপতির পদে বৃত হন। সভায় ৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহাতে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুসন্ধানের জন্য রয়াল কমিশন নিয়োগ, ভারত সচিবের বর্তমান গঠিত পরামর্শ পরিষদের উচ্ছেদ, শাসন সংস্কার প্রভৃতির জন্য আবেদন জানান হয়।

১৮৮৫ সালে কলিকাতায় মধ্যবিত্ত মুসলমানদের একটি সমিতি গঠিত হয়।

কংগ্রেসের জন্মের মোটামুটি ইতিহাস ইহাই। আরম্ভে সমস্ত প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র থাকে। এমন কি যে খরস্রোতা নদী একদিন কূল প্লাবিত করিয়া মানুষের মনে শঙ্কার সৃষ্টি করে, তাহারও আরম্ভ হয় অতি-সঙ্কীর্ণ জলধারা দ্বারা। ধীরে ধীরে ঐ নদী যত সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহাদের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। তারপর যত তাহাদের পরিধি বর্ধিত হয়, ততই তাহারা ধীর ও স্থির মূর্তি ধারণ করে। অগ্রগতির পথে শাখা-উপশাখার জলধারা তাহাকে আরও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলে। ইহাই নদীর চলার নিয়ম। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিবর্তনের ইতিহাসে ঐ নিয়মেরই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখিতে পাই। বহু বিঘ্নবিপদ তাহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে, তাই আরম্ভে তাহার আদর্শ ছিল অতি সাধারণ। কিন্তু দিনের পর দিন জাতির মনের মধ্যে যত সে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে ততই ইহার বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে এবং সামাজিক, নৈতিক, অর্থ-নৈতিক প্রভৃতি বহু সমস্যার মাঝে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছে। আরম্ভে ইহার কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে একটা সন্দেহ ও সংশয় ছিল, কিন্তু যতই সে সাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা পাইতে লাগিল, ততই সে স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হইল এবং তাহার দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রসার লাভ ঘটিল। আবেদন-নিবেদনের স্তর হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া নিজের দাবী উপস্থিত করিবার শক্তি অর্জন করিল। তারপর লোকশিক্ষা ও প্রচারের ফলে দেশের সর্বত্র কংগ্রেসের কেন্দ্র স্থাপিত হইল। অতি বিনীতভাবে আবেদন জানাইয়া অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে একদিন যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হইয়াছিল, আজ সেই প্রতিষ্ঠান জাতির মুখপাত্ররূপে দাবী জানাইবার গৌরব অর্জন করিয়াছে।

অতি সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে কংগ্রেসের জন্ম কিন্তু আজ সে ভারতের জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র। কংগ্রেসের দ্বার আজ সমস্ত বর্ণ ও শ্রেণীর জন্য মুক্ত। সামাজিক ব্যাপার দিয়াই প্রারম্ভে কংগ্রেস আন্দোলন আরম্ভ করে, কিন্তু কালক্রমে কোন খণ্ডিত ব্যাপারে আপনার শক্তি ব্যয়িত না করিয়া মানুষের সর্বাঙ্গীণ জীবনের উন্নতির জন্য কংগ্রেস আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কংগ্রেস আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক--উভয় ক্ষেত্রেই আপনার শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। এখন আর তাহার কাছে বৃটিশ ভারত বা ভারতীয় ভারত বলিয়া কোন সীমারেখা নাই; প্রদেশে প্রদেশে, শহরে গ্রামে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, শিল্পীর বা চাষীর স্বার্থে, ধনীতে দরিদ্রে, কিম্বা ধর্মে ধর্মে কোন পার্থক্য তাহার কাছে নাই বা কংগ্রেস উহা স্বীকারও করে না। কংগ্রেসের সত্যিকারের রূপ কি, তাহার পরিচ্ছন্ন বিবরণ আমরা পাই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির নিকট যে সাক্ষ্য দেন তাহাতে। তাহাতে তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের ধর্ম হইতেছে নিরন্ন, পীড়িত মূক জনগণের সত্যিকারের দাবী আদায় করা এবং তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা।

কংগ্রেস জাতির বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও কর্ম-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহার ভাগ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। ভারতের লক্ষ কোটি নরনারীর মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগাইয়া দিয়াছে এবং একতা, আশা ও আত্মবিশ্বাসে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কংগ্রেস ভারত-বাসীর চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয়তার রসে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ভারতের এক ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলা, সর্বোপরি তাহাদের আশা ও আদর্শকে পুনরুদ্ধারে সাহায্য করিয়াছে। ইহার গতিপথকে অনুধাবন করিলে আমরা জাতির আশা নিরাশা তথা জয়-পরাজয় সম্পর্কে সম্যক অবস্থা অবগত হইতে পারি।

স্বদেশী আন্দোলনের আদিপর্ব

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা

লর্ড কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ হইতে যে আন্দোলনের উৎপত্তি, তাহা আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে "স্বদেশী আন্দোলন" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করা; এবং লক্ষ্যস্থলে পেঁৗছিবার জন্য দুইটি পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, একটি হইল বিলাতী পণ্য বর্জন, আর অপরটি স্বদেশ-জাত দ্রব্য গ্রহণ। বাঙলার নেতারা ভাবিলেন,—ইংরাজ রাজার জাতি হইলেও ব্যবসায়ী জাতি, তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশ ও স্বজাতির ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, বণিক-রাজের শাসনের সঙ্গে শোষণও এই কারণে সমতালে চলে। সুতরাং বিলাতী পণ্য বর্জনের দ্বারা বিদেশী শাসকগণের উপর চাপ দেওয়া সম্ভবপর হইবে।

এক কালে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট-নাগপুর লইয়া একটি প্রদেশ ছিল এবং এই প্রদেশের শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল একজন ছোট লাটের (Lieutenant Governor)এর উপর। আসাম ছিল একটি পৃথক প্রদেশ এবং অনুন্নত বলিয়া একজন চীফ্ কমিশনার ইহার শাসন-কার্য পরিচালনা করিতেন। শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের হেতুতে ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাজসাহী বিভাগ (দার্জিলিং জিলা ব্যতীত) ও আসাম লইয়া একটি প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা হইল। প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও বর্ধমান বিভাগ এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া আর একটি প্রদেশ গঠন একই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই পরিকল্পনার সমর্থনে বিদেশী শাসন-কর্তারা যত যুক্তিই দেখান না কেন, দূরদর্শী বাঙালী নেতারা ইহার মধ্যে দেখিতে পাইলেন, বাঙালী জাতির অখন্ডতা বিনাশের সুপরি-কল্পিত ষড়যন্ত্র এবং ভারতের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে বাঙালীর প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট করার অপকৌশল। কূটনীতিজ্ঞ ও সুচতুর রাজনীতিবিদ্ (Politician) লর্ড কার্জন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাঙলার ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজ, বিশেষ করিয়া ইংরাজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণের তুলনায় বাঙালীর মধ্যে রাষ্ট্রিক অধিকারবোধের বিকাশ অপেক্ষাকৃত বেশী। বাঙালীর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইতেছে প্রগতিমূলক রাজ-নৈতিক চিন্তাধারা এবং বাঙালীর কণ্ঠ ও লেখনীর সাহায্যে তাহা প্রচারিত হইতেছে ভারতবর্ষের নানা স্থানে। তিনি ইহাও দেখিতে পাইলেন যে, কংগ্রেস যে রাজনৈতিক জন-প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিতেছে তাহারও মূলে রহিয়াছে বাঙালী। এই বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি কংসের ন্যায় যেন দৈব-বাণী শুনিতে পাইলেন —'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' অতঃপর বাঙলাকেই তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় গোকুল-ধাম বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেন। ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন ভাবিলেন, বাঙালীর রাজনৈতিক অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলে কংগ্রেসকে সমাধিস্থ করা সহজসাধ্য হইবে। তিনি স্থির করিলেন, বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাঙালীর নবজাগ্রত সংহতি শক্তি নষ্ট করিয়া দিবেন।

পরিকল্পনার বিরোধিতা

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সরকারী প্রস্তাব প্রথম প্রচার করেন ভারত সরকারের সেক্রেটারী মিঃ রিজলী (Risley) ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর মাসে। প্রস্তাবটি প্রকাশিত হইবার দুই মাসের ভিতর বাঙলার নানা স্থানে পাঁচ শত প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয়। প্রতিবাদ ব্যাপক হইতেছে দেখিয়া লর্ড কার্জন ১৯০৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বয়ং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম গমন করিলেন এবং এই সকল স্থানে অভিনন্দন-সভায় বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবের অনুকূলে বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু জন-প্রতিনিধিগণকে স্বপক্ষে আনিতে পারিলেন না।

১৯০৪ সনের ১৮ই মার্চ কলিকাতায় টাউনহলে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয় এবং তাহাতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ যোগদান করেন। কলিকাতা টাউন-হলে অনুরূপ আর একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল ১৯০৫ সনের জানুয়ারী মাসে। অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ভারত-হিতৈষী স্বনামখ্যাত স্যার হেনরী কটন তখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি এই শেষোক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সমস্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত সরকারের মত পরিবর্তিত হইল না। জুলাই মাসে প্রকাশ পাইল যে, বঙ্গ-বিভাগের ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর মাসে উত্থাপিত প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে কার্যকরী করিবার জন্য সরকারী ঘোষণা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতার "বেঙ্গলী", "অমৃতবজার পত্রিকা" প্রভৃতি ইংরাজী দৈনিক ও "সঞ্জীবনী", "হিতবাদী", "বসুমতী" প্রভৃতি সাপ্তাহিক এবং মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলি পুনরায় তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দেশীয় সংবাদপত্র ব্যতীত য়্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের মুখপত্র কলিকাতার "স্টেটসম্যান" ও "ইংলিশম্যান" পত্রিকাও বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। জুলাই মাসের প্রথম ভাগে "স্টেট্স্ম্যান" পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিলঃ—

"The unexampled nature of the protest aroused by Mr. Risley's famous Memorandum and by the Viceroy's speeches at Dacca and Mymensingh—two of his last felicitous efforts—led the more optimistic leaders of opinion in Bengal to infer that Lord Curzon could not add to the unpopularity of this second term of office by pressing the partition scheme the most controversial of all his measures so far as Bengal is concerned. This view of the question was considerably strengthened by the renewed public protest which was brought to a head during Sir Henry Cotton's visit to Calcutta last cold weather.......Presumably it will fall to Lord Curzon's successor to carry the plan of the new province actually into effect. The present Viceroy's part in it is to all intents and purposes over, and so far as His Excellency is concerned it will have but one result—namely, to complete the estrangement between himself and the people of Bengal....... The Government of India is already aware of the depth and intensity of the feeling which partition proposals excite throughout Bengal......"

"ইংলিশম্যান" পত্রিকাও একই সময় বঙ্গ-বিভাগের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেনঃ—

"The Viceroy in the course of a speech during his short trip to Eastern Bengal allowed it to be inferred that the Government of India had come to be of the opinion the Bengal agitation against the partition of the lower provinces was 'artificial' in character, and, therefore, the less likely to be taken seriously. In a sense, of course, all agitation is artificial. No means exist of giving expression to popular feeling except through public meetings and the columns of the press, and public meetings need organisation. In the case of partition of Bengal public meetings have been held throughout

he Province and it is idle to denounce these gatherings simply because usual methods were followed in arranging them. The point is that Bengal sentiment was sufficiently stirred by the prospect of dismemberment to induce an outcry of a kind that presupposes a determined effort to be heard. The partition scheme was denounced not by a few journalists, but by educated Bengal at large and the question arises whether the protests that were raised, were due only to a desire to object to everything the Government did or because there has grown up in Bengal a feeling of solidarity and nationality which was shocked and offended by the official proposals. We think, that all the whole those who have been in a position to survey the agitation and who know something of the Bengali character will come to the conclusion that the partition scheme has really caused distress of mind among the protestants ...."

'সঞ্জীবনীর প্রস্তাবিত কার্যক্রম'

স্বনামধন্য জননায়ক নির্বাসিত দেশসেবক স্বর্গগত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বাঙলা সাপ্তাহিক "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় ১৩১২ সালের ২৯শে আষাঢ় (১৯০৫ সনের ১৩ই জুলাই) তারিখের সংখ্যায় "কর্তব্য নির্ধারণ" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রকাশ করিয়া বাঙলার জনসাধারণকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা সমগ্র প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ—

কর্তব্য নির্ধারণ

"ভারত সচিব বঙ্গের অঙ্গ দ্বিখণ্ডিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। বাঙালী এই সাংঘাতিক সংবাদ শুনিয়াও নির্জীব হয় নাই। বাঙালী আরও ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। অদ্য ভারত সচিবের নিকট বহু সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক অকাট্য যুক্তিপূর্ণ পত্র প্রেরিত হইয়াছে।

"ভারত গভর্নমেণ্টের মন্তব্য বর্তমান সপ্তাহেই বোধ হয় প্রকাশিত হইবে। মন্তব্য প্রকাশিত হওয়া মাত্র সমস্ত বঙ্গদেশে তুমুল ঝড় উপস্থিত হইবে। এবার কেবল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের নয়, এবার ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী ও বগুড়া একপ্রাণ একমন হইয়া প্রতিবাদের এমন ঝটিকা উত্থিত করিবে যে, তাহার বেগে সমস্ত দেশ কম্পিত হইবে। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদের প্রবল তরঙ্গ উঠিবে। অশিক্ষিত প্রজার ভৈরব গর্জনে চারিদিকে সন্ত্রাস উপস্থিত হইবে। কোটি লোক এক কণ্ঠে গভর্নমেণ্টকে এই অশুভ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিবে।

"এবার অন্যূন ৫০ জন প্রতিনিধি ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইবে। বাঙালীর প্রাণে যে বেদনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। বাঙালীর মর্মপীড়ার কথা ইংলণ্ডের সহৃদয় লোকের নিকট প্রচার করা হইবে। বাঙালীর দৃঢ় বিশ্বাস এই, ইংলণ্ডের গভর্নমেণ্ট যদি বাঙালীর এই নিদারুণ যাতনার কথা অবগত হন, তবে নিশ্চয়ই বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করার প্রস্তাব রহিত করিবেন। যদি বর্তমান গভর্নমেণ্ট বাঙালীর কথায় কর্ণপাত না করেন, তবে উন্নতিশীল দল নিশ্চয়ই লর্ড কার্জনের কৃত কার্য পণ্ড করিয়া দিবেন।

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালীর চিরাশৌচ হইবে। যতদিন বংগদেশের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় একত্র না হয় ততদিন বাঙালী শোকচিহ্ন ধারণ করিবে। বাঙালী আমোদ প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়া সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হইবে ততদিন তপশ্চর্যা করিবে। জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে, তবু বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে, তবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙালী আর মিউনিসিপাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে পারিবে না।

"জাতীয় অশৌচের সময় বড়লাট, ছোট লাট, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্য আর অর্থদান করা হইবে না।

যতদিন জাতীয় শোকের অবসান না হয় ততদিন রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের আমোদে কেহ যোগ দিতে পারিবে না।

"লর্ড কার্জন বাঙালীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তিনি উদ্যত খড়্গ সম্বরণ না করেন, বাঙালী আর রাজপুরুষদের সংস্রবে যাইতে পারিবেন না।"

"সঞ্জীবনীর" এই কার্যক্রম দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছিল। খুলনা জিলার বাগেরহাটের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে "সঞ্জীবনী"র প্রস্তাবিত কার্যক্রমের প্রথম প্রকাশ্য সমর্থন পাওয়া যায়। তথায় "জনসাধারণ সভা" নামে একটি জন-প্রতিষ্ঠান ছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের ১৬ই জুলাই তারিখের বিশেষ অধিবেশনে "সঞ্জীবনী"র উত্থাপিত প্রস্তাবের মধ্যে দুইটি প্রস্তাবের সমর্থন করা হয়। ২০শে জুলাই (৪ঠা শ্রাবণ) তারিখের "সঞ্জীবনী"তে সেই সভার বিবরণ ও গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে শোক জ্ঞাপনার্থে এই সংখ্যা "সঞ্জীবনী" কালো বর্ডারে মুদ্রিত করিয়া বাহির করা হয়। তাহাতে "বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ" নামে একখানি ব্লকের ছবিও ছিল। ছবির পরিকল্পনা এইরূপঃ—দুইজন ইংরাজ করাত দিয়া বঙ্গমাতার অঙ্গ ছেদন করিতেছেন, তন্মধ্যে একজন লর্ড কার্জন ও অপরজন সম্ভবতঃ ভারত সচিব; আর পার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া আছেন সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কয়েকজন নেতা। বাগেরহাটের সভার তৃতীয় প্রস্তাবটি "সঞ্জীবনী" হইতে উদ্ধৃত করা হইলঃ—

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া সঞ্জীবনী যে সুসঙ্গত কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার মধ্যে বিলাতীর পরিবর্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও রাজপুরুষদিগের অভ্যর্থনা ও বিদায়াদিতে অর্থদান ও আমোদ প্রমোদে যোগদান না করা এই দুইটি প্রস্তাব এই সভা আপাততঃ সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং উপস্থিত সভ্যগণ এজন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন; অধিকন্তু অন্য লোক যাহাতে ইঁহাদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।" এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বাগেরহাটের প্রবীণ উকিল দেবীবর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রতিবাদ সভা

"সঞ্জীবনী"র পূর্বোক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার দুই সপ্তাহ মধ্যে অর্থাৎ ৩০শে জুলাইর পূর্বেই বাঙলাদেশের নানাস্থান হইতে প্রস্তাবগুলি ব্যাপকভাবে সমর্থন লাভ করে। তৎপর ৭ই আগস্ট (১৩১২ সালের ২২শে শ্রাবণ) ভারত সভা (Indian Association) এবং কলিকাতার দুইটি প্রভাবশালী জমিদার সভার উদ্যোগে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভার অধিবেশন হয়। বিপুল জন-সমাগমের দরুণ টাউন হলের দ্বিতলে, নিম্নতলে এবং ময়দানে তিনটি সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্বিতলে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে মূল সভার অধিবেশন হয়। সভায় যে চারিটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাবটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ—

"ইংরেজের কলকারখানাজাত জিনিসের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য মফঃস্বলে যে সব সভা হইয়াছে, টাউন হলে সম্মিলিত হাজার হাজার লোক একবাক্যে সেই সকল সভার সহিত সহানুভূতি ও সহযোগিতা জ্ঞাপন করেন। ভারত গভর্নমেণ্টের কার্যাদির সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি উদাসীন। ইংরেজের এই উদাসীনতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রাজা ও প্রজা, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারজীবী, বালক, বৃদ্ধ ও যুবা সকলে সংকল্প করিয়াছেন,—"যতদিন গভর্নমেণ্টের আদেশ প্রত্যাহৃত না হয়, ততদিন আমরা বিলাতী জিনিস ব্যবহার করিব না।"

এই তিনটি সভায় যাঁহারা প্রস্তাবগুলি উত্থাপন ও সমর্থন করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও ছিলেনঃ—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকাচরণ মজুমদার, পূর্ণচন্দ্র মৈত্র, বিহারীলাল রায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, আবুল কাসেম, নরেন্দ্রনাথ সেন, কুমার সত্যধন ঘোষাল।

সহস্র সহস্র ছাত্র ও যুবক দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এবং "বন্দে মাতরম্", "জয় জন্মভূমির জয়" প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে সভাস্থলে গমন করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রীদিগের অনেকের হস্তেই "বন্দে মাতরম্", "মিলিত বঙ্গ" প্রভৃতি বাক্যাঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণ পতাকা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের "বন্দে মাতরম্" সর্বপ্রথম বাঙালীর সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়; জন্মভূমির সেই অবিস্মরণীয় বন্দনা গীতি "বন্দে মাতরম্" বাঙলা দেশে সঙ্গীতরূপে গীত হয়।

সেদিন ভারতবর্ষের প্রাণ-কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও

ভাবোন্মাদনার যে বন্যা-প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছিল, উত্তরকালে তাহারই প্লাবন-ধারা সমগ্র বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। সে প্রবহমান ধারা বাঙলার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সুদূর পঞ্চনদ, মহারাষ্ট্র ও মদ্রদেশ পর্যন্তও পেঁছিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনকে বাঙলার জাতীয় জীবনে 'রিন্যাসেন্স' বা নবজাগৃতির যুগ বলা যাইতে পারে। বাঙালীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইল। ভারতীয় স্বাদেশিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা দেশবিশ্রুত বাগ্মী ও সাংবাদিক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নবজাগ্রত বাঙালী জাতি নেতৃত্বে বরণ করিল। তৎকালে তিনি এত লোকপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁহাকে বাঙলার মুকুটহীন রাজা ("Uncrowned King of Bengal") বলিয়া অভিহিত করা হইত। "সঞ্জীবনী" সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

বঙ্গ-বিভাগের সরকারী ঘোষণা

১৯০৫ সনের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের সরকারী ঘোষণা দ্বারা প্রচার করা হয় যে, আগামী ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-বিভগের প্রস্তাব কার্যকরী হইবে এবং আসামের চীফ্ কমিশনার মিঃ জোসেফ ব্যাস্‌ফাইল্‌ড্ ফুলারকে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোট লাট নিযুক্ত করা হইল। ভারত সরকারের ঘোষণার শেষ দুইটি প্যারা (২ ও ৩) নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

2. The Governor-General in Council is pleased to specify the sixteenth day of October, one thousand nine hundred and five, as the period at which the said provisions shall take effect, and fifteen as the number of Councillors whom the Lieutenant-Governor may nominate for his assistance in making laws and regulations.

3. The Governor-General in Council is further pleased to declare and appoint that upon the constitution of the said province of Eastern Bengal and Assam the districts of Dacca, Mymensingh, Faridpur, Backergunge, Tippera, Noakhali, Chittagong, the Chittagong Hill Tracts, Rajshahi, Dinajpur, Jalpaiguri, Rangpur, Bogra, Pabna, and Malda, which now form part of the Bengal Division of the Presidency of Fort William, shall cease to be subject to or included within the limits of that Division, and shall thenceforth be subject to and included within the limits of the Lieutenant-Governorship of the Province of Eastern Bengal and Assam."

প্রতিবাদের তীব্রতা

এই ঘোষণার ফলে আন্দোলনের অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়া ত দূরের কথা, বরং বৃদ্ধি পাইল। ছাত্র ও যুবকগণ দলে দলে সহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিলাতী কাপড়ের দোকানে 'পিকেটিং' চালাইতে লাগিল। বাঙলার নেতৃমণ্ডলী ও কর্মিগণের উৎসাহ উদ্যম কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না। বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের অমোঘ অস্ত্র চালনা করিয়া তাঁহারা বঙ্গ-বিভাগের অন্যায় আদেশ প্রত্যাহারে করাইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

২২শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার (৬ই আশ্বিন) কলিকাতা টাউনহলে আর একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হইল। সেদিন বারিবর্ষণ সত্ত্বেও সভাক্ষেত্রে অন্যূন বিশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। কোনো কোনো সংবাদপত্রের প্রদত্ত বিবরণ মতে প্রায় অর্ধ লক্ষ লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল। টাউনহলে স্থানাভাবের দরুণ চারিটি সভার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতলের সভায় সভাপতিত্ব করেন সুবিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষ, নিম্নতলের সভায় এবং সিঁড়ির উপরের সভায় সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক স্বনামখ্যাত শিশিরকুমার ঘোষ ও বঙ্গ-বিশ্রুত মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। মাঠে লর্ড বেণ্টিংকের প্রতিমূর্তির সম্মুখস্থ সভায় বক্তৃতা করেন বড়লাটের আইনসভার সদস্য ও বিখ্যাত এর্টর্নি মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ২৮শে সেপ্টেম্বর (১২ই আশ্বিন) তারিখের "সঞ্জীবনী" এই দিনের সভা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ—

"৭ই আগস্ট টাউন হলে যে বিরাট সভা হইয়াছিল, তাহাতে বাঙালীর প্রাণে যে অপূর্ব উদ্দীপনা ও সুদৃঢ় সঙ্কল্প জাগাইয়া দিয়াছিল গত শুক্রবারের টাউন হল-মহাসভায় তাহা প্রবলতর, ভীষণতর মহাভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই সভা আহ্বানের জন্য যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই, সেদিন বৃষ্টি কাদায় বাহিরে চলাচলের অসুবিধা হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি টাউন হল সভায় সেদিন কলিকাতার অন্যূন ২০ হাজার লোক একত্র হইয়াছিল। পূর্ববারের ন্যায় এবারেও প্রায় দুই সহস্র ছাত্র বিচিত্র বেশে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া টাউন হলে গমন করেন।"

রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান

বাঙলার নেতৃবর্গ স্থির করিলেন যে, ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) জাতীয় শোক-দিবস রূপে পালন করা হইবে। বিভক্ত বঙ্গের মধ্যে ঐক্যের যোগ-সূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য এবং রাজনৈতিক কৃত্রিম বিভাগ অস্বীকার করিয়া বাঙালী জাতির সৌভ্রাত্রের বন্ধন অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইল রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান। সমস্ত দিন অরন্ধন এবং জনসভায় বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ১৬ই অক্টোবরের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলিকাতা মহানগরীর জন্য এই সমুদয় ব্যতীত আরো দুইটি কার্য নির্ধারিত হইল; একটি অখণ্ড বঙ্গ-ভবনের (Federation Hall) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, আর অপরটি জাতীয় ধন-ভাণ্ডার স্থাপন ও তজ্জন্য অর্থসংগ্রহ। নেতৃমণ্ডলীর আহ্বানে সমগ্র বাঙলা দেশ সাড়া দিল। বাঙলার নগরে নগরে ও গ্রামে-গ্রামে অরন্ধন এবং রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান পালিত হইল। বাঙালীরা দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় সংগীত গাহিয়া এবং সম্মিলিত কণ্ঠে "বন্দে মাতরম" ধ্বনি করিয়া স্নানান্তে পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল। এই স্মরণীয় দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য জাতীয় মিলন-যজ্ঞের হোতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করিলেন প্রাণস্পর্শী সংগীতঃ—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু,
বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
হে ভগবান॥"......

খণ্ডিত বাঙলার মিলনের আদর্শ এবং সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে অন্তরের ঐক্য সাধনের মহান উদ্দেশ্য লইয়া রাখী বন্ধন ও "ফেডারেশন হল" নির্মাণের পরিকল্পনা রচিত হয়। ইহাতে ভাবপ্রবণ কল্পনা-কুশল বাঙালীর কবিচিত্তের পরিচয় মিলে। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী" শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩৫৫—কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি') লিখিয়াছেন ঃ—

"১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন ১৩১২) বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য সমাধা হইবে—এই সরকারী ঘোষণা যখন প্রচারিত হইল, তখন ভাঙা বাংলাকে জোড়া দিবার জন্য দেশে বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় আন্দোলনে রামেন্দ্রসুন্দর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। বঙ্গ বিভাগের দিনটিকে দেশবাসীর মনে চিরজাগরূক রাখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মাথায় যেমন উভয় বঙ্গের মিলনসূচক রাখীবন্ধনের, তেমনি রামেন্দ্রসুন্দরের মাথায় ক্ষোভসূচক অরন্ধনের পরিকল্পনা জাগিয়াছিল। "তিনি অরন্ধনের পরিকল্পনা করিয়া তাহা সামাজিক ব্রত অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। সমাজের অর্ধাঙ্গভাগিণী স্ত্রীজাতিকে সেই আন্দোলনের পশ্চাতে দণ্ডায়মান রাখিয়া পুরুষজাতির শক্তি ও উৎসাহ বর্ধন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতির জন্য অপূর্ব ভাষায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন।" পুস্তিকার ভূমিকায় প্রকাশঃ—"বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে জেমো-কান্দি গ্রামের অর্ধ সহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহবানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণু-মন্দিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন; গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।"

১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) রাখী বন্ধনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে যে অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে নেতৃবর্গ ও কর্মিমণ্ডলী দেখিতে পাইলেন বাঙালীর জাতীয় জীবনে নবোদিত সূর্যের রক্তিম আলোকচ্ছটা। জাতির ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন নহে ভাবিয়া ইঁহারা সকলেই আশান্বিত হইলেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই স্মরণীয় দিনে মুহুর্মুহুঃ অগণিত জনগণের সম্মিলিত কণ্ঠের বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে মহানগরী মুখরিত হইয়া উঠিল। কলিকাতা ও উপকণ্ঠ হইতে সহস্র সহস্র দল শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে

হিতে পশ্যাতোয়া ভাগীরথী তীরে আসিয়া মবেত হইল। স্নানান্তে পরস্পর পরস্পরের তে রাখী বাঁধিয়া দৃঢ় করিল জাতীয় ঐক্য ন্ধন, সার্থক করিয়া তুলিল জাতীয় অনুষ্ঠান। রাজের দোকান ব্যতীত সমুদয় দোকানপাট, জ-কারবার, হাট-বাজার যানবাহন চলাচল ত্যাদি সমস্তই বন্ধ ছিল। সহর ও সহর-লীর কল-কারখানাগুলিতে শ্রমিকগণ কাজ রে নাই। শত শত কারখানার বংশীধ্বনি সদিন ছিল স্তব্ধ হইয়া। গঙ্গা নদীতে জটির কুলী-মজুর কাজে যোগ না দেওয়ার াল জেটিতে পড়িয়া রহিয়াছিল। ছুটি দেয় াই বলিয়া কাশীপুরে বন্দুকের কারখানার লিরা কারখানা ছাড়িয়া চলিয়া আসে। বার্ন কাম্পানীর ১২০০ কুলী ছুটি চাহিয়াছিল, না দওয়ায় কাজ করিতে অস্বীকার করিয়া প্রস্থান রে। কলিকাতা ও সহরতলীর হাট-বাজারে ুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতার অভাবে বাজার একেবারে বন্ধ াকায় পুলিশ বাহিনী কর্মতৎপরতা দেখাইবার ুযোগ পায় নাই। সেদিনকার অনুষ্ঠানের বশদ বিবরণ তৎকালের বিখ্যাত ইংরাজি দনিক 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বং প্রসিদ্ধ বাঙলা সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' 'হিতবাদী' প্রভৃতি সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলি ন আলোকিত করিয়া দিয়াছিল। স্বদেশী ান্দোলন আরম্ভ হইবার ১৪।১৫ বৎসর পরে ান্ধী-যুগে আমরা 'হরতাল'এর কথা প্রথম ুনিতে পাই এবং তৎসম্পর্কে অভিজ্ঞতাও াভ করি। কিন্তু ১৯০৫ সনের ১৫ই ক্টোবর রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে াঙালী বস্তুতঃ পক্ষে 'হরতাল' পালন করিয়া-ল। সেকালে আমাদের রাজনৈতিক অভিধানে রতাল' শব্দটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলেও াঙালী কার্যতঃ ইহার সহিত পরিচিত ছিল।

অখণ্ড বঙ্গ-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় অখণ্ড বঙ্গ-ভবনের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান। সার্কুলার রাডে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও মূক-বধির বদ্যালয়ের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে প্রায় অর্ধ লক্ষ লাকের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত ভবনের ভিত্তি াতিষ্ঠা হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য রিয়াছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ুবিখ্যাত ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু। এক ৎসর যাবত তিনি রোগ-শয্যায় শায়িত। সেই বস্থায় চলৎশক্তিহীন রুগ্ন জননায়ককে াঠাসনে বসাইয়া সভাস্থলে বহন করিয়া ানা হইল। ডাক্তার নীলরতন সরকার ও াক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সঙ্গে আসিলেন। ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, বীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অম্বিকাচরণ মজুমদার, াগেশ চৌধুরী প্রভৃতি বসু মহাশয়ের অনু-সরণ করিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে সভাস্থলে বিপুল উন্মাদনার সঞ্চার হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণের পরে এই তাঁহার প্রথম রাজনৈতিক সভায় যোগদান।

"স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর কোনরূপ রাজনীতিক ব্যাপারে যোগ দিতে পারেন নাই। সমস্ত জাতির মহাবিপদের সময় আর তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বহু লোক আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল। অদ্ভুত কণ্ঠে বন্দেমাতরং রবে চতুর্দিক নিনাদিত করিয়া তুলিল" (১৯শে অক্টোবর—২রা কার্তিকের 'সঞ্জীবনী' হইতে উদ্ধৃত)

সভাপতির লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিভাষণের আরম্ভ এইরূপঃ—

"এক অখণ্ড বঙ্গরাজ্যের অধিবাসিগণ, হিন্দু ও মুসলমান প্রিয় সুহৃদগণ, পুরাকালে একজন ঋষি দেবতাদিগকে এই বলিয়া ধন্যবাদ অর্পণ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের কৃপায় কপিলাবস্তুর বুদ্ধদেবের ধরাগমন দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আমি ঋষি নহি; কোন ঋষির পদধূলি গ্রহণেরও উপযুক্ত নহি; কিন্তু তবু আজ আমি এই বলিয়া বিশ্বপতিকে ধন্যবাদ দিই—যিনি ইংরেজ ও ভারতবাসী সকলের সম বিচারকর্তা—আজ আমি তাঁহাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমি এইদিন পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া এক জাতির অভ্যুদয় দেখিয়া যাইতে পারিলাম। আমি যেন আজ শ্মশান হইতে উত্থিত হইয়া এই জাতীয় জাগরণ সন্দর্শন করিতে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি।......" ('সঞ্জীবনী' ২রা কার্তিক)

এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণের অন্য এক স্থলে বসু মহাশয় বলিয়াছেনঃ—

"বিশুদ্ধ পবিত্র প্রীতির সহিত আত্মোৎসর্গ যদি আমাদের সাধনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে এবং ভ্রাত বন্ধুগণ, আপনাদিগকে ভগবান রক্ষা করিবেন এবং অক্ষয় আনন্দ ও সুখের অধিকারী করিবেন। সে সুখ যে কিরূপ যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। সকলেই সতর্ক হইবেন আমাদের কার্যে যেন বে-আইনী নামগন্ধও প্রকাশ না পায়। যদি প্রয়োজন হয়, আমরা অনভিজ্ঞ রাজপুরুষ ও নীতিজ্ঞানহীন পুলিসের হস্তে অত্যাচার সহ্য করিব; কিন্তু আমরা অত্যাচার করিব না। আমাদিগকে এক্ষণে ধৈর্য সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে হইবে। বলিদান ব্যতীত কোন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না এই ধর্মগ্রন্থসমূহ ইহাই শিক্ষা দেয়। যদি কোন রাজপুরুষের দুর্বুদ্ধিবশতঃ আমাদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, সকলে প্রস্তুত হউন, মাতৃভূমির জন্য আমরা তাহাই সহ্য করিব। আজ যে কণ্টকে আমাদের চরণ বিক্ষত হইবে কালে সেই কণ্টকেই আমাদের জন্মভূমির গৌরবমুকুট নির্মিত হইবে।" —('সঞ্জীবনী')

অভিভাষণের পরিসমাপ্তি হইয়াছে এই-ভাবেঃ—

"আজ আমরা প্রাণের ভিতরে সন্দর্শন করি যে, স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে—দেবদূতেরা অবতীর্ণ হইতেছেন। প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে যে দেবতারা যুদ্ধক্ষেত্রে পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। বন্ধুগণ, আজ কি আমরা দেখিতে পাইতেছি না যে, সেই সকল দিব্যহস্ত হইতে আজ আমাদিগের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, স্বদেশের কল্যাণের জন্য বীরোচিত সাধনা ও কঠোর সংকল্প গ্রহণে শোণিতহীন নবতর মহাসংগ্রাম ক্ষেত্রে আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে?" ('সঞ্জীবনী')

সভাপতির অভিভাষণ পাঠ সমাপ্ত হইলে পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠ করিলেনঃ—

ঘোষণা

"যেহেতু বাঙালী জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন; অতএব আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমগ্র বাঙালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান শেষ হইলে পর বিপুল জনতা বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়ীর দিকে যায়। সার্কুলার রোড হইতে বাগবাজার পর্যন্ত জন-সমুদ্র। সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডের অধিনায়কত্বে বড় একটি পুলিশ বাহিনী। এই সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যুষ হইতে প্রদোষ পর্যন্ত কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে কোথায়ও কোনো প্রকার

শান্তিভঙ্গের কার্য কিংবা বে-আইনী কার্য অনুষ্ঠিত হয় নাই।

জাতীয় ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা

জাতীয় ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা এই দিনের অনুষ্ঠানের শেষ কার্য। এই উপলক্ষে পশুপতি বাবুর বাড়ীর সম্মুখস্থ বিরাট ময়দানে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত জন-স্রোতের বিরামহীন প্রবেশ চলিয়াছিল। নেতৃবর্গ দুই দলে বিভক্ত হইয়া ভিতর বাড়ীতে ও বহির্বাটিতে অর্থ সংগ্রহ করেন। মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, কুমার মন্মথ মিত্র বাড়ীর ভিতরে এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ীর বাহিরে অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই প্রকার জন-সমাগম হইবে বলিয়া নেতারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তন্দরুণ বিশাল জনতাকে আয়ত্তে রাখা সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। বিশৃঙ্খলার জন্য অনেকে অর্থ দানের সুযোগ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া যান। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ললিতমোহন ঘোষাল প্রভৃতি বক্তৃতা দিয়া জনগণকে অর্থদানে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

"সুব্যবস্থা থাকিলে সোমবার দিনই ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইত। সকলে শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, সোমবারের ২৫ হাজার টাকার প্রায় সমস্ত, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক আনা হইতে এক টাকা দানের ফল।" ('সঞ্জীবনী')

ভগিনী নিবেদিতার পত্র

তৎকালে 'প্রবাসী' সম্পাদক স্বনামখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদে থাকিয়া 'প্রবাসী'র সম্পাদনা করিতেন। এলাহাবাদের বাঙালী সমাজে রাখী বন্ধন ও অরন্ধন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথাকার অনুষ্ঠানের বিবরণ হইতে জানা যায়, "প্রবাসী সম্পাদক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারে ২৯শে আশ্বিন রাত্রে এবং ৩০শে আশ্বিন প্রাতে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। যাহাতে ধর্মের উপর স্বদেশপ্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য এই পরিবারে প্রার্থনা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুস্থানী ও প্রবাসী বাঙালীগণকে দিবার জন্য নিম্নলিখিত পত্র সহ কতকগুলি রাখী বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন:—

"With the compliments of Sister Nivedita.

"Today, being the 30th Aswin, 16th October, 1905, Partition of the Bengali people is to be made by law.

"This day, then, designed to be the date of our division, is henceforth yearly to be set aside by us, for the deeper realisation of our national unity. Having been made, by this threat of division, overwhelmingly conscious of the essential oneness of the whole Indian Nation, the heart of Bengal goes out to all parts of our common Motherland.

"Thus to you, from us of Bengal, is sent today this thread of Rakhi-Bandhan, in token, not merely of the union of provinces and parts of provinces but of bond that knits us all, as children of one Motherland, together.

Bande Mataram.

"To Principal Ramananda Chatterjee, Editor, *Prabashi*, Allahabad.

"For distribution among suitable persons."

এবারের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থল জয়পুর। ক্ষাত্র শৌর্যের বীরত্ব গাথা চারণগণের মুখে মুখে যে রাজপুতানায় একদিন ঝংকৃত হয়েছিল, সেই রাজপুতানার একটি বিশিষ্ট রাজ্য জয়পুর। অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের জয়পুর আর একটি গৌরব অর্জন করল,—জাতীয় ভারতের কোটি কোটি নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক, সংগ্রামী ভারতের জীবন্ত বিগ্রহ কংগ্রেসের ৫৫তম অনুষ্ঠান-ক্ষেত্ররূপে। এই গৌরব আরও অনন্যসাধারণ এই জন্য যে, স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন জয়পুরে এবং দেশীয় রাজ্য-সমূহের মধ্যে জয়পুরেই এই প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এ পর্যন্ত কোন দেশীয় রাজ্যেই কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। তার কারণ এই যে, বৃটিশ ভারতে কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করেছিল। সেইজন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন শাখা এ পর্যন্ত কোন দেশীয় রাজ্যে স্থাপিত হয়নি। দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রজা-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব-বর্জন-নীতির জন্যই সেথাকার প্রজাগণকে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজামণ্ডল বা All India States' Peoples' Conference গঠন করে সামন্ত-রাজাসমূহের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই সর্বভারতীয় প্রজা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রজামণ্ডল, প্রজাপরিষদ, সার্বজনিক সভা, স্টেট-কংগ্রেস ইত্যাদি নামে প্রজাবৃন্দের নানা সংঘ বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে গড়ে উঠেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্রব না থাকলেও নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা-মণ্ডলকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব ও তাঁদের প্রেরণার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি পট্টভী সীতারামিয়া এই সর্বভারতীয় প্রজামণ্ডলের সভাপতিপদে বৃত হয়েছেন।

জয়পুরের কথা মনে হলেই মনে পড়ে একই পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত লালচে রঙের প্রাসাদ ও অট্টালিকাশ্রেণী,—হর্ম্য শীর্ষে শীর্ষে, অঙ্গনে অঙ্গনে বিচিত্রবর্ণ ময়ূরের নৃত্য, প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ, জনাকীর্ণ সুশোভন বাজার ও বিপণীশ্রেণী।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'হাওয়া-মহল'
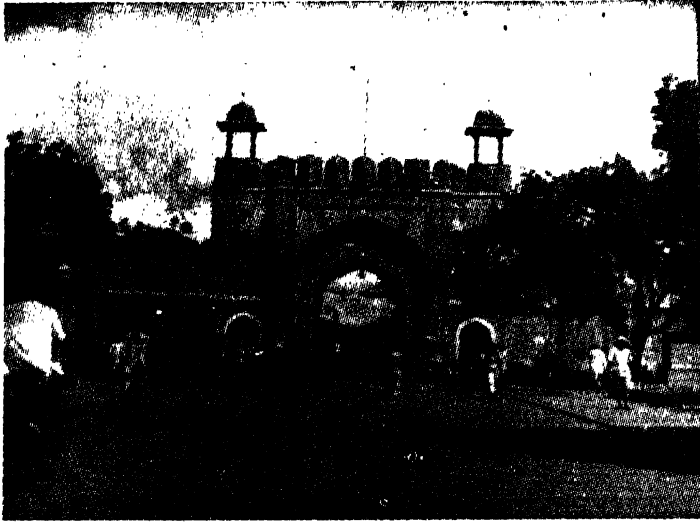
চাঁদপোল বাজারের সুদৃশ্য ফটক

ঐতিহাসিক পটভূমি

জয়পুর রাজ্যের বর্তমান রাজধানী জয়পুর শহর ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ কর্তৃক স্থাপিত হয়। প্রবাসী বাঙালী বিদ্যাধরজী নামে পরিচিত বিদ্যাধর ভট্টাচার্য কর্তৃক এই নগরের সুসমঞ্জস পরিকল্পনা রচিত হয়। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বর।

প্রসিদ্ধি আছে যে, সূর্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশ জয়পুর রাজবংশের আদিপুরুষ।

জয়পুরের বর্তমান মহারাজা সওয়াই দ্বিতীয় মানসিংহ ১৪০তম অধস্তন পুরুষ। এ'র বয়স বর্তমানে ৩৭ বৎসর, ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গদী লাভ করেন মাত্র ১১ বৎসর বয়সে ১৯২২ সালে। ইংরেজ শাসনকালে জয়পুরের মহারাজগণ ১৭টি তোপধ্বনির সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

'গান্ধী-নগর'

জয়পুরের মহারাজার রামবাগ প্রাসাদের সম্মুখভাগ ও মোতিডুংরি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পরিষ্কৃত ও সমতল করে অল্প কালের মধ্যে এক সুদৃশ্য অস্থায়ী নগর গড়ে তোলা হয়েছে। অস্থায়ী হ'লেও অদূর ভবিষ্যতে জয়পুর শহরের এদিকে সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্য করে হয়ত তারি সূচনা হল। দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে জয়পুর রাজ সরকার এখানে কয়েকটি রাজপথ তৈরি করিয়েছেন। মোতিডুংরি পাহাড় ও বি, বি, এন্ড সি আই রেলপথের ঝালনা স্টেশনের সংলগ্ন এই বিস্তীর্ণ অসমতল অপরিষ্কৃত স্থান কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য নগর-রূপ ধারণ করে সারি সারি শিবির, তোরণ ও মণ্ডপে মনোরম হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীর নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে 'গান্ধীনগর'।

ভৌগোলিক পরিচিতি

আয়তন ও লোকসংখ্যাঃ জয়পুর রাজ্যের আয়তন ১৫,৬১০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩০,৪০,৮৭৬ জন। এর মধ্যে এক রাজধানী জয়পুর শহরেই বাস করে ১,৭৫,৮১০ জন। এখানকার শতকরা ৫০ জনেরও অধিকসংখ্যক লোক কৃষির উপর নির্ভর করে।

রাজস্বঃ বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা।

খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদঃ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট 'গার্নেট' নামক বহুমূল্য রক্তবর্ণ মণি ও 'বেরিল' নামক হরিৎ বা নীল বর্ণের ফিরোজ মণি পাওয়া যায়।

তামা, 'কোবাল্ট' (Cobalt), Mica-Schist নামক এক প্রকার স্ফটিক বা বালুকা-প্রস্তর, Steatite নামক একপ্রকার নরম প্রস্তর, 'কঙ্কর' নামক একপ্রকার 'কার্বনেট অব্ লাইম্' বা চূণাপাথর জাতীয় পাথর, রামখড়ি বা ফ্রেঞ্চ-চক্, গেরি মাটি ও চীনা মাটি এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ভৈসলানা নামক গ্রামের কৃষ্ণ মর্মর, মক্রানা ও রাইয়াওসার নামক স্থানের শ্বেত মর্মর বিখ্যাত। তাজমহল, মোতি মসজিদ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি নানা ইতিহাসবিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সৌধ এইসমস্ত স্থানের মর্মর বা মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছে।

শিল্পদ্রব্যঃ জয়পুরের অলংকৃত ধাতুময় পাত্র প্রসিদ্ধ। এখানকার কারুকার্যমণ্ডিত কাঠ ও পাথরের দ্রব্যেরও সমাদর আছে। চন্দন কাঠ ও হাতীর দাঁতের নানাবিধ সুদৃশ্য শিল্পদ্রব্যও এখানে নির্মিত হয়।

এখানে সুন্দর গালার চুড়ি প্রস্তুত হয়। সাঙ্গানীর নামক স্থানের কাগজ উৎকৃষ্ট।

দর্শনীয় স্থানসমূহ

অম্বরঃ জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বর আধুনিক জয়পুর শহর থেকে ৬।৭ মাইল দূরে অবস্থিত। মহারাজা মানসিংহ কর্তৃক এই রাজধানী ১৬০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল।

এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, মান্ধাতার পুত্র অম্বরীশের নাম অনুযায়ী এই রাজধানীর নাম
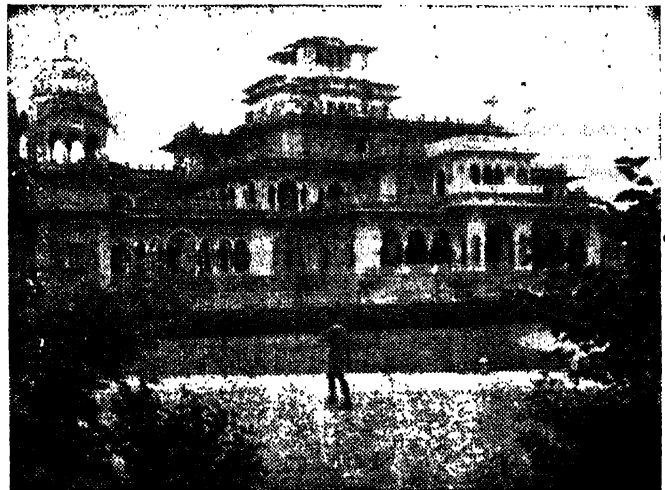
জয়পুর রাজসরকার-পরিচালিত যাদুঘর

জন্য হয়েছিল। অম্বর বর্তমানে একরূপ ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। দুর্গপ্রাকার মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়েছে। কতকগুলি মন্দির ও অট্টালিকা এখনও অক্ষত আছে। এই সমস্ত মন্দিরের মধ্যে জগৎশিরোমণি মন্দির প্রসিদ্ধ।

এখানকার প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, শীষমহল নামে ও স্থাপত্যরীতিতে মোগল যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে। অম্বরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের মহারাজা ও মহারাণীর ভোজন-কক্ষের প্রাচীরে অঙ্কিত নানা তীর্থস্থান ও পৌরাণিক কাহিনীর চিত্র মনোরম। জয়পুর-ফ্রেস্কোর প্রসিদ্ধি আছে। কাজেই ভ্রমণকারিগণের পক্ষে এই প্রাচীন প্রাচীরচিত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

এখানকার কালীবাড়ীও দর্শনীয়। এই মন্দিরে 'যশোহরেশ্বরী' কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মহারাজা মানসিংহ বাদশাহ আকবরের সেনাপতিরূপে বাঙলা দেশ জয় করে যশোহর থেকে যশোহরেশ্বরী কালী ও উক্ত বিগ্রহের পূজারীকে সঙ্গে করে জয়পুরে নিয়ে যান। এখনও এই বাঙালী পুরোহিতগণের বংশধরেরা এই কালীমূর্তির পূজক। বর্তমানে এঁরা ভাষায় ও আচার ব্যবহারে অবাঙ্গালী হয়ে গিয়েছেন। এঁদের বিবাহও বাঙ্গলা দেশে হয় না।

জয়পুরের শহরের পরিকল্পনা-রচনাকারী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।

গলতাঃ জয়পুর শহরের পূর্বদিকে রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত গিরিপথের নাম গলতা। গলতা নামে একটি প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রাচীন শহরও এখানে বিদ্যমান। নানাদিকে অবস্থিত পাহাড়ের উপর নির্মিত দুর্গগুলি প্রাচীনকালে এই শহরকে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। এই সমস্ত দুর্গের মধ্যে নহরগড় দুর্গ উল্লেখযোগ্য।

নর্তকীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের জয়পুর-চিত্রকলার নিদর্শন

এখানকার প্রাচীন সূর্যমন্দির বিখ্যাত। প্রতি বৎসর এই মন্দির থেকে সূর্যদেবের বিগ্রহকে নামিয়ে একটি সুসজ্জিত যানের উপর স্থাপন করে শহরের রাজপথ দিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। মহারাজা, তাঁর সামন্তগণ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। সূর্যদেবের মন্দির ছাড়া এখানে রামচন্দ্রজীর দুটি মন্দিরও আছে। এই মন্দির দুটিও দর্শনীয়।

গালব মুনি এখানকার গিরিপথে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে এর নাম গলতা হয়েছে বলে প্রসিদ্ধি আছে।

মানমন্দিরঃ জয়পুর শহরের 'যন্তর' বা দক্ষিণে মাঝে মাঝে ভগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত সাঙ্গানীর নামে একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র শহর আছে। এখানে বহু বিরাট প্রাসাদ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্তমান। কতকগুলি অট্টালিকা এখনও টিকে আছে। কথিত আছে, এখানকার রাজপ্রাসাদে যুবরাজগণ বাস করতেন।

মানমন্দিরঃ জয়পুর শহরের যন্তর বা মানমন্দির প্রসিদ্ধ। জয়পুরের মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি ভারতের মথুরা, দিল্লী

জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরের সাধারণ দৃশ্য
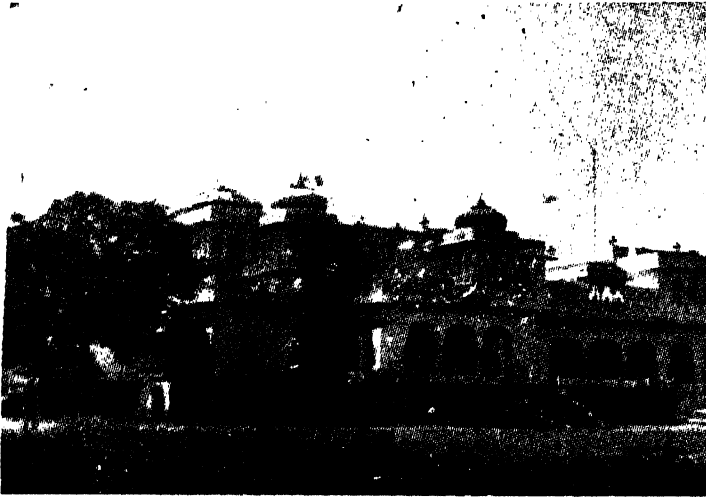
জয়পুরের মহারাজার প্রাসাদ

(যন্তর-মন্তর), বারাণসী, উজ্জয়িনী ও জয়পুর —এই পাঁচটি স্থানে পাঁচটি মানমন্দির নির্মাণ করান, তার মধ্যে জয়পুরের মানমন্দির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। সৌর-জগৎ পর্যবেক্ষণের জন্য সওয়াই জয়সিংহ ইট, পাথর ও ধাতু দিয়ে যে সমস্ত 'যন্ত্র' তৈরী করেছিলেন, তা নিখুঁত ও সুন্দর।

ছত্রী: জয়পুরের মহারাজগণের সমাধি-মন্দিরের নাম ছত্রী। গেতোর গ্রামে এই সমস্ত ছত্রী অবস্থিত। মহারাজা জয়সিংহের ও মহারাজা রাম সিংহের ছত্রী বিশেষভাবে দর্শনীয়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মন্দিরই সর্বাপেক্ষা মনোরম। শ্বেত পাথরের উপর উৎকীর্ণ কারুকার্য এবং পৌরাণিক কাহিনীসমূহের মনোরম চিত্রাবলী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান ছাড়াও জয়পুর শহরের পোথিখানা, শিলেখানা, যাদুঘর, সাধারণ পাঠাগার ইত্যাদি দর্শনীয়। শিলেখানায় বা অস্ত্রাগারে জয়পুরে নির্মিত ছোরা, তরবারি, বন্দুক, বর্ম প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত আছে। পোথিখানা বা পুঁথিখানায় বহু প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থ আছে। এখানে বাদশাহ আকবরের সময় রচিত 'রাজামুনামাহ্' রক্ষিত আছে। 'রাজামুনামাহ্' গ্রন্থের কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি যাদুঘরে রক্ষিত আছে। পোথিখানায় জয়পুরের মহারাজগণের চিত্রাবলী, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত চিত্রাবলী রক্ষিত আছে। সাধারণ পাঠাগারে বহু সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী ফারসী গ্রন্থ ও কিছুসংখ্যক হস্তলিখিত পুঁথিও আছে। যাদুঘরে জয়পুরের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, পরিচ্ছদ, গালিচা, ধাতুদ্রব্য আছে। এখানে চীন, জাপান, আসিরিয়া, কাল্ডিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন চিত্র ও মহারাজগণের চিত্রও আছে।

সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী

জয়পুর রাজ্যের সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রশংসনীয়। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে সারা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার যে তাণ্ডব চলেছিল, জয়পুর রাজ্য যেন বিচ্ছিন্নভাবেই তা থেকে দূরে অবস্থান করছিল,—এখানকার জন-জীবনে তার আঘাত এসে লাগেনি। সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উদার আচরণ জয়পুর রাজ সরকারের চিরাচরিত রীতি। জয়পুর রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের সীমানার মধ্যে রাজসরকারের মুসলমান কর্মচারী ও পরিচারকদের উপাসনার জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠিত আছে। মহরমের সময় রাজসরকারের পক্ষ থেকেও একটি তাজিয়া বের করা হয়। এই তাজিয়াটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর হয়ে থাকে।

জয়পুরের মহারাজার মন্ত্রিপদে পূর্বে মুসলমানও নিযুক্ত হয়েছেন। মন্ত্রীর বাস-ভবন সংলগ্ন মন্দিরে দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বাসভবনেই মুসলমান মন্ত্রীরাও বাস করেছেন।

জয়পুরে এক সময়ে বাঙালীর অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। জয়পুর নগরের পরিকল্পনাকারী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য বাঙালী। এঁর কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। হরিমোহন সেন, সংসারচন্দ্র সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুরের মহারাজার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধ্যযুগীয় রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মীরাট থেকে 'অখণ্ড জ্যোতির' যে আলোকযাত্রা জয়পুরে পৌঁছেছে, এবং তার যে শিখা সম্মেলন মণ্ডপে স্থাপিত হয়েছে, তার আলোকে জয়পুর তথা সমগ্র রাজপুতানা, এমনকি সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত হয়ে নবজীবনের স্পন্দন জাগ্রত করবে। 'অখণ্ড জ্যোতির' এই অপরিম্লান আলোক-শিখা দিকে দিকে সঞ্চারিত হয়ে সমগ্র জগৎকে আবার উদ্দীপিত করে তুলবে,—শাশ্বত ভারতের অন্তরাত্মার অমৃত বাণীর, জাতীয় ভারতের সাধনার এই আলোকযাত্রা তারই ইঙ্গিত।
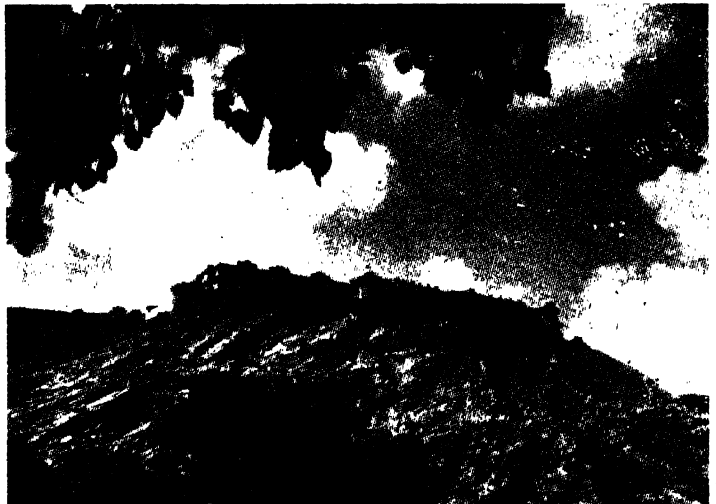
গল্‌তা'র প্রাচীন নহরগড় দুর্গ: শৈলশীর্ষে প্রহরীর মত অবস্থিত

বক্সা ক্যাম্প

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রকাণ্ড গেটটা খুলিয়া ক্যাম্পে ঢুকিলে প্রথমেই তিন নম্বর ব্যারাক। ব্যারাকের সামনেই দক্ষিণে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, পাহাড় চাঁছিয়া সমতলক্ষেত্র তৈরী করা হইয়াছে। এখানেই ভোরে সন্ধ্যায় বন্দীদের হাঁটাচলা, ডাণ্ডা, ব্যাডমিণ্টন, ভলি, প্যারেড, পতাকা অভিবাদন ইত্যাদি চলিত। এই ছোট্ট ও প্রশস্ত স্থানটির পূর্ব সীমান্তে একটি প্রকাণ্ড ঘর, কাঠের প্লাটফর্মের উপর অবস্থিত। ইহাই ছিল আমাদের কমনরুম। পশ্চিমের একদিক হইতে পাথর কাটিয়া বানানো সিঁড়ী বা রাস্তা নামিয়া গিয়াছে। হাত পনর নীচে নামিলে ডাহিনে চার নম্বরের দুইটি ব্যারাক। মাঠটির দক্ষিণ প্রান্ত হইতেও অনুরূপ আর একটি রাস্তা নামিয়া গিয়ে হাসপাতাল ও ডাহিনে ছয় নম্বরের ব্যারাক দুইটির সম্মুখে গিয়া পেঁৗছিয়াছে। পেঁৗছিয়াই শেষ হয় নাই, অতঃপর ডাহিনে মোড় লইয়া পশ্চিম প্রান্ত হইতে আগত রাস্তাটির সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের পশ্চিম ভাগে পাঁচ নম্বর ব্যারাকের দুইটি ঘর এবং পূর্বভাগের বিস্তৃত স্থানে তিন চৌকার রান্নাঘর, খাবার ঘর, টিফিন ঘর, গুদাম ঘর ইত্যাদি।

ক্যাম্পের চৌহদ্দীর এখানেই শেষ নহে। হাসপাতাল ও ছয়নম্বর ব্যারাকের মধ্য দিয়া রাস্তাটা দক্ষিণে আরও নামিয়া গিয়া একটি বাগানে শেষ হইয়াছে, ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল আমবাগান। তারপর গভীর খাদ, দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত, ছাড়িয়া দিলেও মানুষের পক্ষে এ-পথে পলায়ন সম্ভব নহে। এইস্থানে দাঁড়াইয়া দক্ষিণে বাঙলার প্রান্তর, পশ্চিমে হিমালয়ের গিরি শিখরের অভ্যন্তরে সূর্যের অস্তগমন ইত্যাদি দৃশ্যগুলি দেখিবার সবচেয়ে বেশী সুবিধা পাওয়া যাইত।

উপরে তিন নম্বর ব্যারাকের সম্মুখভাগের ঐ ছোট্ট মাঠের দক্ষিণ সীমানায় দুইটি প্রকাণ্ড পোস্ট, তাহার মাথায় তেমনি দুইটা প্রকাণ্ড পেট্রোম্যাক্স সন্ধ্যার সময় জ্বালাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইত এবং সারারাত্র সমস্ত স্থানটুকু আলোতে আলোকিত থাকিত। অন্যান্য স্থানেও আলোর অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। ভোর হইলে বাতিওয়ালা ছেলে- তিনটি আসিয়া এগুলি নামাইয়া লইয়া যাইত।

এই ক্ষেত্রটুকুর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেতে একটি রবার বৃক্ষ। বৃক্ষটিকে বটগাছ বলিয়াই জানিয়াছিলাম, কিন্তু জ্ঞানী লোকের অভাব ছিল না, তাঁহারা জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রয়োগ করিলে চক্ষু খুলিয়া গেল এবং জানিতে পারিলাম যে, এ বটবৃক্ষ নহে, রবার গাছ। কি ঠকানই এতদিন ঠকাইয়াছে, আত্মপরিচয় গোপন করিয়া বটবংশের মর্যাদা আদায় করিয়া লইয়াছে।

এই গাছটার সঙ্গে আমাদের অনেকগুলি দিনরাত্রির বহু স্মৃতি আলো অন্ধকারের মত জড়াইয়া আছে। এই গাছেই টেনাবাবুর প্রকাণ্ড মোরগ দুইটি ভোরে খাঁচা খোলা পাইয়াই উড়িয়া আসিয়া চড়িয়া বসিত। একটি উঁচু ডালে রঙ্গীন ও দীর্ঘ লেজ ঝুলাইয়া সারাদিনমান কাটাইয়া দিত, সন্ধ্যায় অনেক সাধ্যসাধনা ও কৌশলের আশ্রয় লইয়া তবে তাহাদিগকে নামাইয়া আনিতে হইত। রঙ্গীন মোরগ দুইটিকে গাছের ডালে ময়ূর বলিয়া ভ্রম হইত। এ গাছ হইতে একদিন জ্যোছনারাত্রে সতীশবাবুর প্রায় ঘাড়ের উপর ভূত লাফাইয়া পড়িয়াছিল—ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—

নীচে পাঁচ নম্বর ব্যারাকে সন্ধ্যার পরে জলসাগোছের একটা অনুষ্ঠান চলিতেছিল. সকলেই সেখানে গিয়া জমায়েৎ হইয়াছেন। রাত্রিটা ছিল পূর্ণিমা। সারা আকাশ জ্যোছনায় ভাসিয়া গিয়াছে, অথচ আমাদের আকাশে চাঁদ ছিল না, কারণ পূবের পাহাড়টা তাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পূবের পাহাড়টার মাথা আলোকিত হইয়া উঠিল, বুঝা গেল চাঁদ অনেকটা আগাইয়াছে। বন্ধুবর কালীপদ (গুহরায়) এতটা ধৈর্য ধরিবার জন্য রাজী ছিলেন না। পাহাড়ের ওধারে যে-চাঁদ আসিয়া গিয়াছে, তাহাকে আগাইয়া গিয়া অভ্যর্থনা করিবার কবি প্রেরণা তাঁকে পাইয়া বসিল। কেডস্ পায়েই তিনি রবার গাছে চড়িয়া বসিলেন। হাত চৌদ্দ-পনর উঁচু এক ডালকে ঘোড়া বানাইয়া তিনি উপবিষ্ট হইলেন এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অপেক্ষায় ফল ফলিল, পাহাড়ের ঠিক চূড়ায় আসিয়া শশিকলা নয় একেবারে পূর্ণচন্দ্র স্থান লইল। কবিবর উপবিষ্ট আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হয়তো উদ্দেশ্য ছিল চাঁদকে দুইহাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিবার। কিন্তু অভ্যর্থনা আর জানানো হইল না। একে কবির শরীরে ছিল ওজন, দুইয়ে ছিল মাধ্যাকর্ষণ, তৃতীয়ে ছিল না পূর্বপুরুষদের মানে শাখামৃগদের দক্ষতা, তাই গাছের শাখাকে পায়ের তলার মাটির পৃথিবীর মত ব্যবহার করা গেল না। ফলে, ডাল ভাঙ্গিল এবং সেই ভাঙ্গা ডালের ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি সশব্দে ও সবেগে নীচে নামিয়া আসিলেন।

ঘটনার এমনি চক্রান্ত, সতীশবাবু ঠিক তখনই নীচের ব্যারাক হইতে পাহাড় ভাঙ্গিয়া উপরে গাছের তলায় আসিয়া পেঁৗছিয়াছিলেন। পড়বি তো পড় একেবারে তাঁর সম্মুখে। স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন ছিল, তার মধ্যেই যতটুকু দেখিবার সতীশবাবু দেখিয়া লইলেন। এই আচমকা দর্শন ও ঘটনার ধাক্কায় ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করিলেন, মুখ হইতে গোঁ গোঁ একটা আওয়াজও নির্গত হইতে লাগিল এবং তাঁর সমস্ত শরীরটায় বংশপত্রের কম্পন সঞ্চারিত হইল।

এদিকে কালীপদবাবু ডাল ভাঙ্গিয়া ডালশুদ্ধ নীচে নামিয়া দুই হাত থাবার মত মাটিতে পাতিয়া ধাক্কাটা সামলাইতেছিলেন। ভাগ্যবশতঃ তিনি অক্ষতই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু সতীশ বাবুর অবস্থা দেখিয়া তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

ওদিকে নীচে পথে লোকজনের গলা শোনা যাইতেছে, জলসা ভাঙ্গিয়াছে, তাই একে একে সকলে ফিরিতেছেন। সঙ্গীন কিছু ঘটিবার আগেই অসহায় সতীশবাবুকে রবার গাছ তলায় একা ফেলিয়া কালীপদবাবু রুদ্ধশ্বাসে ছুট দিলেন এবং ব্যারাকে গিয়া আত্মগোপন করিলেন।

পিছনে যাঁরা আসিতেছিলেন, তাঁরা উপরে উঠিয়া আসিয়া সতীশবাবুকে তদবস্থায় দর্শন করিলেন।

ডাক্তার গুরুগোবিন্দ কহিলেন, "কাজ্যাডা কিরে মশায়।" এটি ছিল ডাক্তার গুরুগোবিন্দের পেটেণ্ট বুলি, ঘটনাস্থল বা কোনস্থলে প্রবেশের মুখে এই মন্ত্রটি তিনি উচ্চারণ করিতেন। মন্ত্রের অর্থ—"ব্যাপারটা কি শুনি?"

আরও একটু আগাইয়া আসিয়া ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন,—"একি, এখানে এরকম করে দাঁড়িয়ে আছেন যে?"

সতীশবাবু বহুকণ্ঠের আশ্বাসে শ্বাস ফিরিয়া পাইলেন, বলিলেন—"ভূত।"

—"ভূত? কি বলছেন?"

—"ঠিকই বলছি।"

ডাক্তার গুরুগোবিন্দই আবার প্রশ্ন করিলেন—"আরে মশাই খুলে বলুন না আপনি ভূত দেখেছেন?"

—"হাঁ।"

—"কোথায়?"

সতীশবাবু সম্মুখে পতিত ডালটা দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার গুরুগোবিন্দ হাসিয়া আশ্বাসের সুরে বলিলেন, "ওটাতো গাছের ডাল।"

সতীশবাবু কহিলেন, "জানি। ওটা চেপেই তো ঝপাৎ করে উপর থেকে নামল।"

শ্রোতারা এতক্ষণে সত্যই একটু ভাবিত হইলেন, ব্যাপার একেবারে মিথ্যা নাও হইতে পারে। কিছু একটা নিশ্চয় ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই কিছুটা কি?

এইসবে ডাক্তার গুরুগোবিন্দের মাথাটা খেলে ভালো। গোয়েন্দা কর্মচারীর মত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূতটা গেল কোনদিকে?"

—"তার আমি কি জানি। আমি ডালে চড়ে তাকে নাবতে দেখেছি, তারপরেই চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, দেখব কেমন করে?"

—"আচ্ছা," বলিয়া ডাক্তার তিন নম্বর 'বি' ব্যারাকের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন যে, কে একজন চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। সীটটা কার, ডাক্তারের জানা ছিল। চাদর উঠাইয়া ধাক্কা দিতে গিয়া হাতে কেডস্ ঠেকিয়া গেল। কালীপদবাবু দৌড়াইয়া আসিয়াই শয্যা লইয়াছিলেন, তাড়াতাড়িতে খেয়াল ছিল না, তাই জুতাটা আর খোলা হয় নাই।

ডাক্তার গোবিন্দ কহিলেন,—"আরে কাজ্যড়া কিরে মশায়, জুতা পায়েই শুয়ে পড়েছেন। সতীশবাবু কি আর সাধে ভূত দেখেছেন।" বলিয়া কবিকে টানিয়া তুলিলেন। তখন দুই বন্ধুর হাসিতে ঘরটা ভরিয়া গেল।

সমস্ত শুনিয়া সতীশবাবু যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন। জীবনে যদিও বা একবার ভূত দেখিবার সুযোগ আসিল, তাও এইভাবে মাটি হইয়া গেল। গোঁ গোঁ আওয়াজ, চক্ষুবন্ধ, বংশপত্রের কম্পন, মাঝখান হইতে ইহাই শুধু সার হইল। তাই চটিয়া গিয়া মন্তব্য করিলেন,—"চাঁদ দেখবার জন্য আবার গাছে ওঠা কেন, বাপের জন্মে শুনিনি। দুমিনিট দেরী করলেই তো হতো। যত সব ইয়ে—কবি না ভূত।"

তিন নম্বর ব্যারাকের এই মাঠেই ভদ্রলোককে দেখি। পৃথিবীতে এক জাতীয় লোক থাকে, যাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিমাত্রের দৃষ্টিতেই তারা ধরা পড়ে। প্রথম দিনেই দেখিতে পাই যে, পরিধানে খদ্দরের হ্যাফ্‌প্যাণ্ট গায়ে সবুজ রংয়ের গলাবন্ধ খদ্দরের কোট, পায়ে স্যাণ্ডাল, চোখে চশমা এক ভদ্রলোক ঘুড়িয়া বেড়াইতেছেন। পোষাকেই পরিচয় কিছু পাইয়া গেলাম। বয়স্ক ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেছেন না। কে কি ভাবিবে এ যেন তাঁর ভাবনার মধ্যেই আসে না। লোকে কি বলিবে অর্থাৎ জনমতকে যিনি এত সহজে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই। রামকৃষ্ণদেবের প্রশ্নের উত্তরে যুবক নরেন্দ্র নাকি একদিন মন্তব্য করিয়াছিলেন, "লোক না পোক।" নরেন্দ্রনাথ যে উত্তরকালে সিংহপুরুষ হইবেন, তার ইঙ্গিত এই উক্তির মধ্যেই পাওয়া গিয়াছিল। নিজের ব্যক্তিত্বে কতখানি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে লোককে পোকার সামিল মনে হইতে পারে, আপনারাও একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমিও প্রথম দেখাতেই বুঝিয়া লইলাম যে, এই ভদ্রলোক শুধু লোক নহেন, তিনি বিশেষ লোক। দেহের সবল স্বাস্থ্য ও দৃঢ়গঠন দেখিয়া দ্বিতীয় আর একটি অনুমানে উপনীত হইলাম যে, প্রচুর প্রাণশক্তি লোকটির ভিতরে মজুত রহিয়াছে।

অনুমান ছাড়িয়া ভদ্রলোকের জাগতিক পরিচয় একটু দেওয়া যাইতেছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে এম এস-সি পরীক্ষা না দিয়া গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন, বরিশালের তরুণ সম্প্রদায়ের একজন নেতা বলিয়া গৃহীত হন, ডাক নাম রুণুবাবু, পোষাকী নাম শৈলেন দাশগুপ্ত। ১৯২৪ সালে সরকার তাঁহাকে বরিশাল হইতে বহিস্কার করিয়া দেন এবং বিদায়কালে জানাইয়া দেন যে, তাঁহার মত অবাঞ্ছিত ও সন্দেহজনক চরিত্রের লোক যেন বরিশালের ত্রিসীমানার মধ্যে পা না দেন, দিলে ভালো হইবে না। এক কথায়—Take care. ভদ্রলোক সেই হইতে কৃষ্ণনগরের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন।

বিকালের দিকে পঞ্চাননবাবু বলিলেন, "চল, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করবি। এক সঙ্গে কৃষ্ণনগর জেলে ছিলাম।"

পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে পাঁচ নম্বর 'বি' ব্যারাকে গিয়া ঢুকিলাম। কোণার দিকে সীটে আগাইতে আগাইতে পঞ্চাননবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "প্রভু, এই আমার বন্ধু অমলেন্দু।"

"আজ্ঞে আজ্ঞা হোক," বলিয়া রুণুবাবু হাতের তক্‌লী রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিপ্লবী নেতা মাথা না কাটিয়া সুতা কাটেন, দেখিয়া বুঝিলাম যে, গান্ধীজীর নিকট মাথাটি ইনি আপাততঃ গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

সব চেয়ে আশ্চর্য হইলাম এ-বেলায়
োষাক দেখিয়া। রুণুবাবু তাঁর রাজপরিচ্ছদে
লেন। একটা দামী এণ্ডির চাদরকে কাপড়
লয়াই পরিধান করিয়াছেন, গায়ে হাতকাটা
ঞ্জি। নমস্কার বিনিময় করিয়া আসন
ইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "তামাক খান?"

সিগারেটেই অভ্যস্ত ছিলাম, তবু বলিলাম, "খাই।"

—"বেশ, বেশ। শুনে সুখী হলাম, গিয়েই আছেন দেখছি। কোন ক্লাশ থেকে?

হাসিয়া কহিলাম, "বি-এ ক্লাশ থেকে।"

—"বড় লেটে আরম্ভ করেছেন। আমি ইনর ক্লাশ থেকে।"

স্বহস্তে তামাক সাজিয়া হুকা আগাইয়া লেন, আমিও আমার স্ব-হস্ত বাড়াইয়া গ্রহণ রলাম।

আলাপ জমিয়া উঠিল এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ত্তি সেই আসরেই পত্তন হইয়া গেল। এমন একখানি গান, আসলে একটি ছত্র পর্যন্ত নি গাহিয়া শুনাইলেন। ছত্রটি এই—"প্রভু! ম কত বড়, আমি কত ছোট, ভাবিতে কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাই-ই।" ইহা তাঁহার টেণ্ট ও একচেটিয়া গান, অন্য কেহ গাহিলে ন্তুষ্ট হইতেন। গানখানি হইতেই অনুমান য়া লইতে পারেন যে, রুণুবাবুরা ব্রাহ্ম। মও তাঁর "প্রভুর" দলে পড়িলাম, অর্থাৎ রা পরস্পরকে 'প্রভু' বলিয়াই সম্বোধন তাম, বয়সের ব্যবধান লোপ করিয়া আমরা য়সী সখা হইয়া উঠিলাম।

রুণুবাবুর টাইপের লোক চার হাজার রি মধ্যে আর একটি আমি দেখি নাই। । স্বাস্থ্য, ওস্তাদ খেলোয়াড় (বিশেষ য়া হকি), ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রতিভা য়া যে-ব্যক্তিত্ব প্রস্তুত হইয়াছিল, দেশের ব-আন্দোলনের নায়কত্ব করিবার সমস্ত বনাই তাতে মজুত ছিল। কিন্তু কোথায় কি একটি জিনিসের অভাব ছিল, তাই শক্তি তার যথোপযুক্ত কাজে লাগিল না। র অনেক সময়েই মনে হইয়াছে যে, বিধাতা মহৎ আয়োজন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির চাছি আসিয়া কি ভাবিয়া অবশেষে যেন ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে-শক্তি ও সম্ভাবনা রুণুবাবু আসিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে নিজেও যে কেন সজাগ হইলেন না, ইহা কাছে আজও প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে। ার সৃষ্টিও যে অর্ধপথে অসমাপ্ত হয়, বু তার একটি দৃষ্টান্ত।

হার বিপরীত দৃষ্টান্তও যে না দেখিয়াছি, নহে। যাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নাই, ক্ষুদ্র-শক্তি ব্যক্তিকেও সংসারে বৃহৎ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। পঙ্গুকে দিয়া লঙ্ঘন, বোবাকে মুখর করিয়া তোলা ইত্যাদির কথা আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য যে, যার কাছে সকলেই আশা করে, সে ব্যর্থ হইয়া যায়। অথচ, যাকে দেখিয়া কোন আশাই জাগ্রত হয় নাই, সে-ই একদিন বহুর আশা তৃপ্ত করিতে আগাইয়া আসে। এর উত্তর খুঁজিতে গিয়া ইহাই আমার অবশেষে মনে হইয়াছে, শক্তি পাইলেই হয় না, তার ব্যবহার ও প্রয়োগ জানা চাই। ঠিক বুঝাইতে হয়ত পারিতেছি না। আমি বলিতে চাই, মানুষের সার্থকতা বা জীবনক্ষেত্রে সিদ্ধির জন্য বিধিদত্ত শক্তিই যথেষ্ট নহে, সাধনা ব্যতীত সর্বশক্তিই বন্ধ্যা হইয়া যায়। আবার সাধনার সাহায্যে ক্ষুদ্রশক্তিও বৃহৎ সিদ্ধিতে ফলবান হইয়া উঠে—ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যেমন বাতাসের আনুকূল্যে খাণ্ডবগ্রাসী দাবাগ্নিতে পরিণত হয়।

মোট কথা, আমরা প্রত্যেকেই বড় হইতে পারি, নিজ নিজ জীবনে সার্থক হইতে পারি, যদি আমরা একটু ঐকান্তিক নিষ্ঠা লইয়া চেষ্টা করি। আমরা চেষ্টা করি না, তাই সবই অসাধ্য ও অসম্ভব থাকিয়া যায়, যার শক্তি আছে, তারও সে-শক্তিতে মরিচা পড়িয়া যায়।

একটা বিষয়ে প্রভুর মানে রুণুবাবুর দান আমাদের বক্সা জীবনে এতখানি ছিল, যার জন্য আজও আমরা অনেকে তাঁর নিকট মনে মনে কৃতজ্ঞতা বোধ করিয়া থাকি। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টা ও ত্যাগেই আমরা খেলার মাঠটি ভোগদখলে পাইয়াছিলাম। এ যে কী প্রাপ্তি বন্দী ব্যতীত অপরের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে।

খেলার মাঠ পাইয়াছিলাম, তাই আমরা বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। আমার ধারণা খেলার মাঠে প্রচুর ঘর্ম ও শক্তি ব্যয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম বলিয়া আমাদের রক্তের স্বাভাবিক ছন্দ রক্ষিত হইতে পারিয়াছিল এবং শরীরে ও মনে আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকিতে পারিয়াছিলাম। নতুবা আমাদের মধ্যে অর্ধেকেরই বেশী ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থ অস্বাভাবিক মন লইয়া ফিরিতে বাধ্য হইতাম। আত্মহত্যা করিয়া বন্দিদের মধ্যে যাঁরা যন্ত্রণা এড়াইয়াছেন, তাঁদের সংখ্যা নিশ্চয় আরও বৃদ্ধি পাইত, যদি খেলার মাঠের মুক্তির আবহাওয়াটি আমাদের কাছে অপ্রাপ্য ও অনধিগম্য থাকিত।

বাহিরে নানা কাজে নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাতে শক্তি, উদ্যম ও উৎসাহ ব্যয় করিবার সুযোগ ছিল, দুর্গের এই বদ্ধ আবেষ্টনীতে খেলার মাঠেই সে সবের অভাব পূরণের চেষ্টা আমরা করিয়াছি। উগ্র কর্মশক্তি ও তেমনি উগ্র কামনাগুলি যদি বাইরে পথ না পাইয়া শরীর ও মনের ভিতর সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া পথ করিতে বাধ্য হইত, তবে বহুর ক্ষেত্রেই ফলে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দিত, যেমন কতিপয়ের ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। গান-বাজনা, পড়াশুনা ইত্যাদি অবশ্য ছিল এবং তাহাতে মগ্ন থাকিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মচর্চা করিয়া অনেকেই দীর্ঘ কারাবাস তপস্বীর মত যাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, আমরা বেশীর ভাগ সংখ্যাই ছিলাম সৈন্যজাতীয়; তপস্বী, সাধক ও জ্ঞানীর সংখ্যা সে তুলনায় ছিল অতি কম।

(ক্রমশ)

বিপ্রমুখের কথা

আসল কথা, বাঙলার লেখকদের মন এখনও খানিকটা তরল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দানা বাঁধছে অথবা বেঁধেছে। ভালো গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ যে লেখা হয় না—যেখানে বিশ্বাসের সততা ও আঙ্গিকের দৃঢ়তা আছে, এমন কথা বললে নেহাৎই নিন্দুকপনা করা হয়। কিন্তু কেমন যেন ভেস্তে যাচ্ছে। সবটা জমাট হচ্ছে না। যে কঠিনতায় সুষমাশুভ্র, বিচিত্র, পেলব তুষারকণা অনেক গুরু-পদ-ভার সহ্য করতে পারে, পারানির সংকট থেকে বহু আশান্বিত, পীড়িত ও প্রতীক্ষমান মানুষকে উদ্ধার করতে পারে, সে কঠিনতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। এ যেন 'আইসিং' লাগানো মিথ্যা-কঠিন কেক্। মুখে দেবার সময় একটু দাঁতের চাপ লাগে, এই যা। কিন্তু তারপরেই মিলিয়ে যায়। নানা রঙে ও কাজে বেশ সুন্দর করে তৈরি ও সাজানো। কিন্তু চকোলেট-ক্রীমে মুখ ভরে গেলেও কোথায় যেন বাসি নারকোলের গন্ধ।

এক কথায় সাজ-বাহার আছে। সাময়িক চরিত্র আর ব্যবহারিক মূল্যও আছে কিছুটা। কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতার ফলে যে ক্ষয়িষ্ণু বিবর্ণতা, সেটা স্পষ্টই চোখে পড়ে। মধ্যবিত্ত ঘরের অতি-প্রসবিনী রমণীর নীরক্ত সন্তান-গুলি যেমন জীবনীশক্তির অভাবে স্বাভাবিক বুদ্ধি ও দীপ্তি নিয়েও ঝিমিয়ে থাকে আর তাদের জননী যেমন আপনার ক্ষীয়মান দেহ-সৌষ্ঠবের ম্লানতাটুকু সযত্নে ঢেকে রাখে, বর্তমান সাহিত্যিক নির্জীবতা দেখে সেই উপমাটাই বারবার মনে পড়ে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা এর জন্য অনেকখানি দায়ী, একথা খুবই সত্য। কিন্তু যে সাহসিক নিপুণতায় আর আন্তরিক কর্মচেষ্টায় অতি বড় দুর্দিনেও শিল্পী-সাহিত্যিকরা দেশে-বিদেশে সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখেন, প্রতিকূল অবস্থাকে অন্তত লেখনী দিয়ে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেন, তার অভাবও লক্ষিত হচ্ছে। বিদেশী শাসন-শৃংখল অপসারিত হলেও, প্রাক্তন অবচেতন আর অবদমনের গোপন কারসাজি এখনও চলেছে। সেই কারসাজির ফলেই আমাদের অনিচ্ছুকতা, পরাঙমুখিতা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

* * * *

ভাব-জগতে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে যখন যে আন্দোলনের ঢেউ জাগে সেটা ধীর ও স্থিরভাবে গ্রহণ না করে আমরা হয় স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই, নয়তো সব নষ্ট হয়ে গেল এই ভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। যদি নূতনকে বরণ করি, তা হলে সেইটেই শেষ কথা। তাকে পরখ না করে, যাচাই না করে অকারণে খানিকটা উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ হয় কিসে, প্রথমে সেই চেষ্টা করি। মজার ব্যাপার এইঃ যে কারণে সেটা গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ নূতনত্বের যেটা মুখ্য দাবী ও আকর্ষণ সেটা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। আর যেটা নিতান্তই বাহ্য আর গৌণ, অর্থাৎ উপলক্ষণ, তাই নিয়ে মাতামাতি করি। যে অনিবার্য সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কারণে নূতনত্বের জন্ম, তাগিদ ও প্রেরণা, সেই মূল সূত্রগুলি না তলিয়ে বুঝে শুধু বিচলিত হই মাত্র। এতে সৃষ্টি হয় না, হয় বিসৃষ্টি। কাল গুণে এক একটা আন্দোলন ওঠে। তা নিয়ে তর্ক-আলোচনা চলে। সেটা প্রাণশক্তিরই লক্ষণ, রস-বিচারের অপরিহার্য অংগ। কিন্তু হুজুগ হল অন্য জিনিস। তাতে কাজ এগোয় না। ভাব-প্রবণ, উত্তেজনাশীল অসংযত লেখক-শিল্পীরাই প্রগতির প্রধান শত্রু।

আর যাঁরা অতি মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী, কৈশোরসুলভ আত্মপ্রীতি এবং সৌন্দর্যমোহে আপনাদের সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর মনটিকে মুড়ে রাখেন, তাঁরাও কিছু কম ধোঁয়ার সৃষ্টি করেন না। তাঁদের রচনার বর্ণ-মণ্ডলটি তাঁদের স্বকীয় মানস-দৃষ্টির অনুরঞ্জন মাত্র। ভাব-ভংগী অপেক্ষাকৃত কম বিষয়গত বলেই তাঁদের ব্যক্তিগত সাড়া পিছন দিকে প্রেরণা খোঁজে। বিবেকচালিত হয়ে, বর্তমানের সম্মুখীন হয়ে, তাকে বোঝবার চেষ্টায় যে কর্তব্য এবং দায়িত্ব আছে, সেইটাকে তাঁরা এড়িয়ে যেতে চান। ফলে স্মৃতি--বিন্যাস আর অতীত প্রয়াণই তাঁদের কাছে বেশী কাম্য এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সাহিত্যের তিলাঞ্জলি। সেটাও কম মারাত্মক নয়। গলা টিপে শ্বাসরোধ করাও খুন, আবার বহু দিন ধরে মর্ফিয়া-আর্সেনিক সেবন করানোটাও খুন।

আমাদের সাহিত্য এখন এই দোটানায় পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। দুই মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থেকে হয় নব জন্ম। আইরিশ নাট্যকার সিন্জ্ বলেছিলেন—'Is not style born out of the shock of new material?' কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সত্যিকারের 'শক্' এখনও আসেনি। শুধু কয়েকটা অনুভূতির স্পন্দন; সিজমোগ্রাফে ধরা পড়েছে বহু দূরের সূক্ষ্ম ভূ-কম্পন রেখা। যে প্রচণ্ড বেদনায়, অক্লান্ত সহন-সাধনার নিষ্ঠায় জীব জন্মের সম্ভব হয়, সে বেদনায় আকস্মিক সত্যের চকিত দর্শন পাই মধ্যে মধ্যে। কিন্তু সে বেদনা-বোধ এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাতসার। মানসের বাধ্যতামূলক সৃষ্টি নয়। দ্বন্দ্বের সংস্থান কোথায় আর সমাধানের সূচনা কোথায়, এই কথা যদি আন্তরিকভাবে চিন্তা করা হত, সংযম-সাধনায় পরীক্ষায় এবং বলিষ্ঠ প্রকাশে যদি সেই প্রতি-পাদ্যকে রূপায়িত করবার চেষ্টা চলত, তা হলে আমাদের সাহিত্যে এত দলাদলি, ব্যক্তিগত তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হত না। প্রত্যাশী পাঠকরাও শুধু দ্বন্দ্বের আকর্ষণ-বিকর্ষণে দোলা খেত না। একটা কিছু চিন্তা বা বিষয়ের সুচিন্তিত এবং সচিত্রিত বিকাশে তৃপ্ত হত। নৈরাশ্য-জনিত আক্ষেপের জন্ম হয় নৈরাশ্য থেকেই। আমরা এখন দেখছি বুদ্ধি ও ভাব-জগতের মাৎস্যন্যায়, যেটা সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বর্তমান পরিস্থিতিকে অনুসরণ করে চলেছে।

* * * *

সমুদ্রের লবণাক্ত জল ছেড়ে ইলিশের দল মিঠে জলের সন্ধানে বহু দূর চলে আসে তাদের বার্ষিক দুঃসাহসিক অভিযানে। তারা নিয়ে আসে সমুদ্রের স্বাদ, নিয়ে যায় স্রোতস্বিনীর স্মৃতি। কাজটা স্থায়ী হয় না; দলভ্রষ্ট হয়ে অনেকেই মারা পড়ে। তবু সে অভিযান সাময়িক হলেও সার্থকতার আংশিক তৃপ্তি বহন করে অপরের মুখে।

আর ঝর্ণা ধারার খানিক দূরে উপল-ঘেরা একটুখানি জলাশয়ে বাস করে অজস্র ব্যাঙাচি। তারা ছোট ছোট লেজ নাড়ে কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না। প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে পাথরের গায়ে পুরানো-সবুজ শ্যাওলাকে। অদূরেই তাজা জলের ফেণা, কল্লোল আর প্রবাহ। আশ্রয় ছাড়ার সাহস নেই। জীবন-লীলায় জীবনকেই ছলনা করে চোখ বুজে মরা পাথরের রঙ দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নির্মূল জলজ শৈবালে প্রায় সামুদ্রিক বনের অতল ছায়া, ক্ষুদ্র পল্বলে দেখে বৃহৎ আকাশের খণ্ডিত স্বপ্ন। ভাবে—এই সত্য, এই পরম বিশ্রাম, শান্তির আবেশময় আবেষ্টনীতে এই সম্পূর্ণ জীবন।

ভাঙগন-নদীর নিমন্ত্রণ-কূলে বিস্তৃত পলি-মাটি, তারও পিছনে দিগন্ত-প্রসারিত কুমারী মৃত্তিকা। রিক্ত প্রান্তর দেখি, বেদনায় বিহ্বল হই। কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিই না অথবা নির্ভুল সংকেতকে ভুল ভাবি। ফসলের ইঙ্গিত ফলাই; শূন্য কুটীরে নিঃস্ব বৈরাগীর উদাসী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করি।

নয় তো মাত্র তিন বিঘা জমির জমিদারী নিয়ে আত্মগরিমায় বিভোর থাকি। আগাছা ছেঁটে, সরু আল দিয়ে বেঁধে, খোঁচা-খোঁচা কাঁটা-তারের বেড়ায় ঘিরে জমিটুকুতে কেবল সবুজ ঘাসের স্বপ্ন দেখি। নিজের চোখের

আর পীড়িত, নিরন্ধ্র মনের ক্ষুধা মিটিয়ে জগৎ-জোড়া ক্ষুধার নিরসন করি। ভাবি, সবাই চাষ করা ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকুক।

* * * *

এই যে চোখ বন্ধ করে থাকা, প্রকৃতিকে আপনারাই আবেগ-বাহন কল্পনায় রঞ্জিত করে নিয়ে মানুষকে খাটো করে রাখা—এটাই হল কূপমণ্ডূকতা।

মণ্ডূকের কাছে কূপের মাহাত্ম্য অবশ্য অসীম। কেন না কূপোদকে স্নান-পান-তর্পণ সবই চলে। মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায়,—আকাশের অত বড় পরিধিটা কেমন সহজে আয়ত্ত হয়ে এসেছে! বার-দরিয়ার ঝড় তুফানের বালাই নেই অথচ অন্তঃসলিলা ভোগবতীর উৎসারিত শান্ত প্রেরণায় হৃদয় কেমন ভরপুর।

যতটুকু বাস্তবের উৎকটতা সহ্য করা যায়, ততটুকু মেলে। বাঁধানো বৃত্তপ্রাচীরের মধ্যে শৈত্যের উৎপাত নেই। কোমল উত্তাপ আছে। অগ্নিময় গ্রীষ্ম আসুক; পাঁকের মধ্যেও আত্মগোপন করে বেঁচে থাকা এমন কিছু কষ্টকর নয়। খরস্রোত আর খরবায়ু—দুটোই বড় প্রাণসংহারক।

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

হঠাৎ দাদা বড় বদলে যায়—যেন একটানা রোগভোগের পর লোকটা সুস্থ সবল হয়ে উঠেছে। বাণী খুশীও হয় আবার মনে মনে কোথায় যেন বেদনা বোধ করে। মিলিয়ে দেখলে দেখা যায়, সমর স্বভাবকে উত্তীর্ণ করেছে—মানিয়ে নেবার মেনে চলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অকারণে খুশী হবার নেশা যেন আজকাল দাদাকে পেয়ে বসেছে। দাদা কি এই ছিল? কেন এমন হলো?

বিশেষ করে বাণীর প্রতি সমরের স্নেহ-দৃষ্টিটা আজকাল বড় জাগ্রত। বাণীর চলা-ফেরা শোয়া-বসা-পড়া সব বিষয়ে সমর আগ্রহ প্রকাশ করে। সকাল বিকাল নিয়মিত বোনের পড়া-শোনা দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু সমরের সস্নেহ অভিভাবকত্বটা বাণী সহজভাবে নিতে পারে না। কেমন যেন লজ্জা, সঙ্কোচ বোধ করে। অথচ লজ্জাটা কিসের, সঙ্কোচটাই বা কেন বাণী ঠিক বুঝতে পারে না। দাদার আদর ছোটবোনের প্রাপ্য নয় কি? ভালবাসাটা সহজ নয়? অনেক সময় বাণীর দাদাকে বড় ভয় করে—কেমনভাবে দাদা চেয়ে থাকে সময় সময়! দাদার এ ভালবাসার স্নেহ দেখাবার কোন মানে আছে কি? মাঝে মাঝে বাণী সমরকে যে সন্দেহ করে তা কোন বোনের পক্ষে বড় ভাইকে করা হয়তো উচিত নয়। খুব বেশী সময় সমরের সঙ্গে একলা থাকতে পারে না। কেন? সমর বাণীর মনের এ সঙ্কোচ, এ দ্বিধাগ্রস্ত ভাবের খবর রাখে না হয়তো। বাণী কোন ফাঁকে উঠে যাবার চেষ্টা করলে সমর বলে বস্ না—এর মধ্যে উঠ্‌চিস কোথায়?

ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় বাণী আরো খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হ'য়ে বসে থাকে। সমর গল্প বলে যায়, শত্রুর পথ আগলে কোন এক নির্জন দ্বীপে সমরদের তাবু ফেলে অপেক্ষা করার ছবিটা বাণীর চোখের ওপর ভাসে: চারিদিকে নীল জল, নীল আকাশ সোনালী রোদের মায়াজাল—মাঝখানে গুটি কয়েক মানব-সন্তান শান্তির নামে, কল্যাণের নামে উদ্যত রাইফেল আর কামান নিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে। দূরে যেখানে আকাশের নীলে আর অনন্ত জলরাশিতে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে, হঠাৎ কোন সামুদ্রিক পাখীর ক্লান্ত ডানায় প্রভাত সূর্য ঝলসে উঠলো—নীলিমায় রূপালী ছোঁয়া চমকে উঠে কোথায় যেন হারিয়ে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে অনেক কামান গর্জে উঠলো: গুড়ুম, গুড়ুম, ড়্-ড়্-ড়্—গুম্-ম্! নাম-নাজানা দ্বীপটা প্রতিধ্বনিত শব্দে আছাড় খেয়ে সমুদ্রের জলে উৎক্ষিপ্ত হয় বুঝি! ও কি শত্রুর বিমান? দিকচক্রবালে হারিয়ে যাওয়া সমুদ্রের জলে শত্রু সমাধিস্থ হ'লো নাকি? সকাল বেলায় বারুদের গন্ধে ধোঁয়ায় ছোট দ্বীপটা চমকিত আকাশের তলায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে থাকে—কে জানে সে মূর্চ্ছা তার আজও ভেঙেচে কি না। প্রভাতের উত্তেজনা কাটলে দ্বিপ্রহরে দেখা যায় নিষ্কম্প নীলিমায় মিত্রপক্ষের বিমানবহর ঘাঁটিতে ফিরছে—একটানা শব্দ হয়: গোঁ-ও'-ও'-ও'!

আশ্চর্য দ্বীপ! চারিদিকে মাথা উঁচু করা কেবল নারিকেল গাছ, চোখে নীলের ঘোর লাগে—মাটিতে চাইলে মনে হয় ছায়া কাঁপছে। বড় বড় ঘাসের বনে রাইফেল কামান লুকোন থাকে অষ্টপ্রহর—শান্ত সমুদ্রের জলে জিঘাংসা ভেসে বেড়ায়। মাটির স্পর্শ এখনো কিন্তু বড় কোমল!

বাণী যেন দাদার সঙ্গীহীন সত্তার একক রূপটা প্রত্যক্ষ করতে পারে। যুদ্ধে গিয়ে দাদার কোন পরিবর্তনই হয়নি। কত নাম-নাজানা দ্বীপে শত্রুর পথ আগলে অপেক্ষা করে' করে' দাদার মনটা তো কঠিন হয়ে ওঠেনি! সেই নির্জন দ্বীপের স্মৃতিতে দাদা আজো কি দেখতে চায়? নির্মম নিষ্ঠুর হানাহানির মাঝখানে বাস করে' দাদা কি কলকাতায় এই বকুলবাগানের কথা মনে করতো? অলকাদির জন্যে—

সমর কত বড় যোদ্ধা বাণী আন্দাজ করতে পারে না। দাদার পোষাক পরিচ্ছদের ঘটায় মানুষটার নতুন পরিচয়ও খুঁজে পায় না। মিলিটারীকে ভয় কেন? প্রেম ভালবাসা দয়া মায়া তারা চিরতরে বিসর্জন দেয় কি? যুদ্ধে গেলে মানুষগুলো আর মানুষ থাকে না? যুদ্ধের বিরুদ্ধে একজন বড়লোকের কথা ছোড়দার মুখে বাণী শুনেছিল—এখন মনে পড়ছে:

"That a man can take pleasure in marching in formation to the strains of a band is enough to make me despise him....He has only been given his big brain by mistake—a backbone was all he needed....Heroism by order, senseless violence, and all the pestilent nonsense that goes by the name of patriotism—how I hate them"

তার দাদার সম্বন্ধে ও-কথা খাটে কি? দেশভক্তির ফাঁকিটা দাদা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। বীরত্বের অসারতা? দাদাকে দেখে এখন বরং করুণাই হয়। কি অসহায় লোকটা! যুদ্ধে গিয়ে মোটা মোটা টাকা পাঠিয়ে তাদের সংসারটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে—মাসে মাসে 'এলটমেণ্টের' টাকা হাতে পেয়ে বাবার মুখটা কেমন হ'য়ে উঠেছে, হাসি-কান্নায় ভরা! দাদার টাকা যেদিন আসতো মা কিছু খেতেন না। কেন? সারাদিন এমন গুম্ হয়ে থাকতেন মা! তার দাদার শরীরে দয়া মায়া নেই? দাদা তাদের ভালবাসে না?

কি মনে করে বাণী বললে, তুমি আর যুদ্ধে যেও না দাদা।

সমর হাসলে। বললে, যুদ্ধ যখন শেষ হ'য়ে গেছে, তখন আর যুদ্ধে যাব কেন?

সেই ভাল, তুমি আর যেও না, বাণী খুশী হয়।

সমর বলে, ওরা না-ছাড়লে তো আর যাব না বলতে পারি না!

কেন, এই তো বললে যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে আর তোমাদের দরকার নেই? বাণী ভাবে দাদা অভিমান করেছে।

সমর বলে, আবার যুদ্ধ হবে এই ভেবে এখন না-ও ছাড়তে পারে। যুদ্ধ শেষ হলেও আমরা তো এখনো শেষ হইনি।

সমরের কথায় বেদনার সুরটা যেন বাণী ...তে পারে। কি বলবে ভেবে পায় না। এই ...কটু আগে দাদাকে অহেতুক সন্দেহ করে বাণী নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকে। সমর আর বসতে না বললেও অনেকক্ষণ বসে থাকে। সামরিক জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা শুনতে ভালই লাগে বোধ হয়। মানুষের সংখ্যায়, কামান-বন্দুকের ভারে, বোমা-বারুদ আর উড়োজাহাজের বহরে সৈন্যবাহিনীর কারা, 'কোর', কারা 'ব্যাটেলিয়ন' আর কারাই বা 'রেজিমেণ্ট' যথাযথ সংজ্ঞা দাদার মুখে পেলেও বাণীর হিসেবটা গুলিয়ে যায়। স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে যুযুধানদের অর্থ-পদ-মান সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে লোকটা এগিয়ে যাবে সে আর যে লোকটা পেছন থেকে তাকে ঠেলে এগিয়ে দেবে সে দুজনের অনেক তফাৎ—একজনের হবে নম্বর আর একজনের হবে নাম! মারতে এসে 'র‍্যাঙ্কের' জন্যে অনেকের মরাটা বৃথা হয়ে যায়। গাদার মড়ায় উড়ো-খৈ-এর মত ফুলের মালা ছুঁড়ে দেওয়া হয়। বাণী দাদার মুখের দিকে চেয়ে দেখে, 'র‍্যাঙ্কের' গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে দাদা কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, সামরিক বৃত্তির 'র‍্যাঙ্কের' জন্যে দাদার এখনো মনে মনে আকাঙ্ক্ষা আছে। দাদার সঙ্গে যারা যুদ্ধে গিয়েছিল, তারা কে কে, কতজন কি-ভাবে বড় বড় অফিসার হয়ে গেছে দাদার ঠিক ঠিক মনে আছে। দাদা চোখ বুজে তাদের চেহারার বর্ণনা করতে পারে।

বাণী জিগ্যেস করে, আচ্ছা দাদা সব চেয়ে বড় যোদ্ধা কে?

বাণীর প্রশ্নটা বড় অনভিজ্ঞের মত হয়েছে। সমর বলে, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ।

বাণী জিগ্যেস করে, তার চেয়ে বড় কেউ নেই? যার চেয়ে বড় আর হয় না!

যতটা ছেলেমানুষ ভাবা যায়, বাণীর প্রশ্নটা কি সে রকম মনে হয় না? কি উত্তর দেবে সমর এবার? 'সুপ্রিম কম্যাণ্ডার'? ...য়ারম্যান অব দি চিফস? যার চেয়ে আর বড় কেউ হয় না!—কে সে?

উত্তর দিতে গিয়ে সমর থমকে যায়—কি ...বে বোনকে। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরোয়, ...নে?

বোঝা যায় বাণী খুব গম্ভীর হয়েই ...ত্যাশা করছে। বলে, মানে যাকে হুকুম ...বার আর কেউ নেই—যার হুকুমে সবাই ...দ্ধ করে প্রাণ দেয়।

সমর হেসে জবাব দেয়ঃ সে তো হিট্‌লার!

শুধু হিট্‌লার? আর, তোমরা যাদের ...র যুদ্ধ করলে তাদের কেউ? বাণী যেন ...তিবাদ করছে। চার্চিল? রুজভেল্ট? ...রো!

সমর বলে, এঁদের সঙ্গে হিট্‌লারের অনেক তফাৎ—একজন চেয়েছিল যুদ্ধ আর জনরা তার প্রতিবাদ করেছিল। যুদ্ধের দায়িত্ব দুপক্ষের সমান নয়! হিট্‌লার বলেছিল আমিই দেশ, আমিই সব। আমি যা করবো, যা বলবো তাই, আর অন্যজনরা বলেছিল, আমাদের দেশ, আমাদের যা বলবে তাই—যা করাবে তাই। কাজে কাজেই—

বাণী চুপ করে কি ভাবে। খানিক্ষণ পরে বলে, তা হলে যুদ্ধে না-গিয়ে ওদের মত হলেই তো হয়—অনেক সম্মান পাওয়া যায়!

সমর ঠিক বুঝতে পারে না, বাণী বিদ্রুপ করছে কি না। সমর বলে, তা হলে যুদ্ধ করবে কে?

বাণী হেসে বলে, ভালই তো—তা হলে যুদ্ধও বেশ হবে না।

বাণীর ছেলেমানুষী যুক্তিতে সমরও হাসে। হঠাৎ যুদ্ধের ভয়ঙ্করতার কথা মনে পড়ে যায় সমরের—ধ্বংসের প্রতি মানুষের কি আকর্ষণ, কি অনুরাগ! রক্তের উল্লাস যেন অনুভব করে এখনো। রেগে মানুষ নিজের সখের জিনিস নিজে ভাঙে কেন? শুধু কি বুদ্ধিহীন পাগলামী? এত অর্থ এত কৌশল, এত পরিশ্রম খরচ করে মানুষ কার নগর, কার কীর্তি, কার আত্মীয় ধ্বংস করে? হিরোসিমোর ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য মানুষকে খুশী করেছে না দুঃখ দিয়েছে? মানুষ সে-ধ্বংসের বিরাট ব্যাপকতায় বিস্মিত হয়েছে, না, যে-অস্ত্রে সে-ধ্বংসলীলা সাধিত তার কার্য-কারিতায় স্তব্ধ হয়েছে? বিস্ময়টা কিসের, ভয়ের না, ভাবনার না, অভাবনীয় ভয়ঙ্কর কীর্তির? ছেলেবেলায় পটকাবাজী তৈরী করার কথা মনে পড়ে যায়। মোমছাল পটাস্ কি সাংঘাতিক সংমিশ্রণ! তবুও অতটুকু বয়েসে ওরই প্রতি কি দুর্বার আকর্ষণ! যে বাজীটা জোরে শব্দ করতো না তার জন্যে কি আক্ষেপটাই না হতো, আর যেটা ভীষণ শব্দ করে কানে তালা লাগিয়ে দিতো তার জন্যে কি উল্লাসই না প্রকাশ পেতো! কেন? আজ যেন সমর বুঝতে পারে।

যেন যুদ্ধ হবে না বললেই অমনি হবে না আর কি! যুদ্ধ ছাড়া অন্যায়কে দমন করার আর কি উপায় আছে? আর যুদ্ধ না হলে বাণীরই বা কি লাভ হবে? বাণী নিশ্চয়ই জানে না, যুদ্ধ হয়েছিল বলে তাদের দাদাদের একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার সার্থকতা যুদ্ধের অনিবার্যতায়! আর যার যাই হোক না কেন, যুদ্ধ না বাধলে সমরদের কি হতো এখন ভাবা যায় কি? একজনের অকুতোভয়তায় এতগুলো লোক খেয়ে পরে বেঁচে গেল তো! দুর্দিনের কোন স্পর্শ তাদের সংসারে লেগেছে কি?

বাণী বললে কি হবে, যুদ্ধও বেশ আর হয় না! ছেলেমানুষ! ভেবে দেখলে যোদ্ধার জীবনই সমরের এখন ভাল লাগে। হুকুমে হিংসা ঝলসায়! হুকুমে প্রভাব প্রতিপত্তি উপচে ওঠে! ক্যাপ্টেন থেকে মেজর, মেজর থেকে মেজর জেনারেল। যত বড় হওয়া যায়, যত কর্তৃত্ব করা যায়!

সমর অন্য কথা পাড়েঃ চল্ তোকে আজ এক জায়গায় নিয়ে যাব। আলাপ করবি দেখবি সুন্দর লোক তারা!

বাণী জিগ্যেস করেঃ কে? কাদের বাড়ি।

আমার এক বন্ধুর বাড়ি। যুদ্ধে গিয়েছিল মেজর হয়েছে, বন্ধুর জন্যে একটু যেন গর্বও বোধ করে সমর।

বাণীর ভ্রূযুগল কেমন কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। দাদার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে তার কি হবে। মেজর তা তার কি? দাদার অন্য উদ্দেশ্য আছে নাকি?

বোনের মুখের পরিবর্তনে সমর খুব আশ্বস্ত হতে পারে না। তার বন্ধু বলেই কি এই বিরাগ। বাণী কি যুদ্ধপ্রত্যাগতদের উপেক্ষা করে?

সমর বলে, কিরে যাবি না? চৌধুরীর বাপ-মা-বোন খুব কালচার্ড!

বাণী জিগ্যেস করে, তুমি ওঁদের বাড়ি যাও? ওঁদের সঙ্গে আলাপ আছে?

না, শুনেচি। চলনা আজ যাই, আলাপ করে আসি! সমর বোনের উত্তরের অপেক্ষা করে। বাণী কি না বলবে? যাবে কি?

বাণীকে ইতস্ততঃ করতে দেখে সমর উঠে এসে বোনের হাত ধরে ঝাঁকানি দেয়ঃ কিরে যাবি না? চুপ করে আছিস যে!

বাণী হঠাৎ ভারি ভয় পেয়ে যায়—দাদা আজ এতো পেড়াপিড়ি করছে কেন? হাতের স্পর্শটাও বড় তীব্র মনে হয়। দাদা কি কাঁপছে? এত অসহায়? হাতের স্পর্শে যেন মনের ঝড় টের পাওয়া যায়। দাদা কি তাহলে নিজেকে প্রতারণা করছে! এত দুর্বল! দাদা যোদ্ধা নয়?

বাণী সম্মতি জানায়ঃ আচ্ছা যাব!

অরবিন্দকে নিয়ে দাদার কাছে বাণী ভয় পায় কিনা কে জানে!

[ক্রমশঃ]

২২৷৷৹ টাকা মূল্যের ঘড়ি ফ্রী
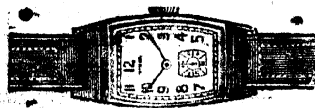
নূতন চালান আসিয়াছে। মনোরম আকার নূতন ডিজাইনের প্রত্যেকটি ৩ বৎসরের গ্যারান্টি রাউন্ড ক্রোম কেস ১৮৷৷৹ সেণ্টারে সেকেণ্ডের ২২৷৷৹ ফ্ল্যাট ৪ জুয়েল ক্রোম—২৩্, স্মল—২৫ ৭ জুয়েল ক্রোম—২৭্, রোল্ড গোল্ড—৩৮্, ১৫ জুয়েল—৩২্, রোল্ড গোল্ড—৫৮্।

রেক্টাঙ্গুলার কার্ভ টোনো (চিত্রানুরূপ)

৫ জুয়েল ক্রোম ৩০, রোল্ড গোল্ড ৩৫্, ৫ জুয়েল ক্রোম ৩৭্, রোল্ড গোল্ড ৪৮্, ১৫ জুয়েল ক্রোম ৫২্, রোল্ড গোল্ড ৬০্।

এলার্ম টাইম পিস ১৮্, সুপিঃ ২২্, বড় ২৫ ডাকব্যয় অতিরিক্ত—তিনটি রিস্টওয়াচ একত্রে লইলে ২২৷৷৹ টাকা মূল্যের একটি রিস্ট ওয়াচ ফ্রী।

পাইওনীয়ার ওয়াচ কোং

পোষ্ট বক্স নং ১১৪২৮ কলিকাতা। শো-রুম-৩১৮-এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ।

নকল হইতে সাবধান

৫০০্ পুরস্কার

(গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)

পাকা চুল ??

কলপ ব্যবহার করিবেন না।

আমাদের সুগন্ধিত সেন্ট্রাল কেশকল্যাণ তৈল ব্যবহারে সাদা চুল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং উহা ৬০ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে ও মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিবে, চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হইবে। অল্প পাকায় মূল্য ২্, ৩ ফাইল একত্র ৫্; বেশী পাকায় ৩্, ৩ ফাইল একত্র লইলে ৭্, সমস্ত পাকায় ৪্, ৩ বোতল একত্র ৯্। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে ৫০০ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিশ্বাস না হয় ৵১০ ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়া গ্যারাণ্টি লউন।

ঠিকানা—শ্রীচন্দ্রকান্তা কার্মেসী
নং ১৪০, পোঃনওয়াদা (গয়া)

AMERICAN CAMERA
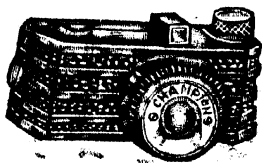
এমন কি সাধারণ অজ্ঞ লোকও এই ক্যামেরার সাহায্যে বিনা ঝঞ্ঝাটে, সুন্দর সুন্দর ফটো তুলিতে পারিবেন। প্রতি ক্যামেরার সহিত ১৬খানা ছবি তুলিবার ফিল্ম, একটী লেদার কেস্ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। মূল্য ১৫ টাকা। ডাকব্যয় ১৷৹ আনা

পার্কার ওয়াচ কোং

১৬৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭।

নকল হইতে সাবধান

৫০০্ পুরস্কার

(গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)

পাকা চুল ??

কলপ ব্যবহার করিবেন না।

আমাদের সুগন্ধিত সেন্ট্রাল কেশকল্যাণ তৈল ব্যবহারে সাদা চুল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং উহা ৬০ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে ও মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিবে, চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হইবে। অল্প পাকায় মূল্য ২্, ৩ ফাইল একত্র ৫্; বেশী পাকায় ৩্, ৩ ফাইল একত্র লইলে ৭্, সমস্ত পাকায় ৪্, ৩ বোতল একত্র ৯্। মিথ্যা প্রমাণিত হইলে ৫০০ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিশ্বাস না হয় ৵১০ ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়া গ্যারাণ্টি লউন।

ঠিকানা—পণ্ডিত শ্রীরামস্বরূপ লাল গুপ্ত
নং ২২৪, পোঃ রাজধানোয়ার (হাজারিবাগ)

হাঁ, 'কুষ্ঠ ও ধবল'

রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ রোগ বিবরণ ও জন্মবার জানাইলে ইহার অমোঘ মহৌষধ ও একটি কবচ আমি দিয়া থাকি। পুণ্যতীর্থ শ্রীশ্রীকাশীধামে কোনও যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ইহা আমরা পাইয়াছিলাম।

শ্রীঅমিয়বালা দেবী (পাহাড়পুর),
৩০।৩বি, ডাক্তার লেন, কলিকাতা।

সতীশ কবিরাজের

শ্বাসারি

হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটীসে

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ
নিরাময়কারী মহৌষধ

১ দাগে হাঁপ কমে
১ শিশিতে আরোগ্য

প্রথম দাগ সেবনেই ইহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইবেন। হুপিং কাশি, ব্রংকাইটিস প্রভৃতিতে প্রথম হইতে শ্বাসারি সেবন করিলে রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে না।

মূল্য—প্রতি শিশি ১৷৷৹
ডাক মাশুল ৷৹

সর্বত্র বড় বড় দোকানে
পাওয়া যায়।

কবিরাজ
এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড সন্স
সাহাপুর · বেহালা · দক্ষিণ কলিকাতা

এমন সুযোগ

হারাইবেন না।

অপরিণামদর্শীর ন্যায় রোগ দুরূহ ও জটিল হলে চেপে রেখে নিজের অমূল্য জীবন ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবেন না। বিশেষ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় স্থায়ী আরোগ্যের জন্য আমাদের যৌনব্যাধি বিশেষজ্ঞের সুপরামর্শ লউন।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক
১৪৮, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং চিরকাল আপনার পাকা চুল কালো রাখুন। আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথাধরা সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ৩৷৷৹ টাকা ও বেশী পাকিয়া থাকিলে ৫্ টাকা মূল্যের এক শিশি তৈল ক্রয় করুন।

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েকদিন এই ঔষধ প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায়। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির হাত হইতে মুক্তিলাভ করুন। ২১ দিনের ঔষধের মূল্য ৫্ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ আয়ুর্বেদ ভবন
(D. C.) বড়বাজার, হাজারিবাগ।

ধবল ও কুষ্ঠ

গাত্রে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পর্শশক্তিহীনতা, অঙ্গাদি স্ফীত, অঙ্গুলাদির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিমা, সোরায়েসিস্ ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নির্দোষ আরোগ্যের জন্য ৫০ বর্ষোর্ধ্বকালের চিকিৎসালয়।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপনার রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—
পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া।
ফোন নং ৩৫৯ হাওড়া।
শাখাঃ ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
(পূরবী সিনেমার নিকটে)

"ক্ষুরস্য ধারা"——

সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

নয়

এক বা দুই সপ্তাহ পরে অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন লারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ...জান ও আমি উভয়ে এক রাত্রে একত্রে ডিনার ...রে, সিনেমা দেখে বুলভার্দ মনত্পারনাসের ...নেমা দেখে বুলভার্দ মনত্পারনাসের ...লেকটে বসে এক গ্লাস করে বীয়র পান ...রছিলাম, এমন সময় লারী এসে দাঁড়াল। ...বিলের ধারে এসে দাঁড়িয়ে ওকে চুমো খেল ...র আমার সঙ্গে করমর্দন করল। দেখলাম ...যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে ...।

সে বল্‌ল : 'বসতে পারি ? আমার এখনও ...নার খাওয়া হয়নি, কিছু খেতে হবে।"

সুজান বল্‌ল, "ওঃ তাই নাকি, কিন্তু ...মাকে দেখে ভারী আনন্দ লাগছে।" ...জানের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল। "কোথা ...কে তুমি এলে ? তুমি যে বেঁচে আছ এ খবর ...কেও এক বছরের ভিতর দাওনি।"

"হা ভগবান! কি রোগাই না হয়েছে। ...মি ত' জানতাম তুমি হয়ত মরেই ...য়েছ।"

"যাক মরিনি।' লারী জবাব দেয়, তার ...খ দুটি মিট্‌মিট করছে। সে আবার বলে, ...দেৎ কেমন আছে?"

সুজানের মেয়ের নাম ওদেৎ।

"ও, সে এখন ডাগর হয়ে উঠেছে। সুন্দরীও ...য়েছে, এখনও তোমাকে তার মনে আছে।"

আমি ওকে বলি "তুমি যে লারীকে জানো, ...তো কোনো দিন বলনি।

" কেন বল্‌ব ? আমি কি জানি আপনি ...কে চেনেন—আমরা যে পুরানো বন্ধু।"

লারী নিজের জন্য ডিম আর বেকনের ...র্ডার দেয়। সুজান তাকে তার মেয়ের এবং ...জের সম্বন্ধে সব কথা বলে। লারী তার ...জস্ব মধুর হাস্যময় ভঙ্গীতে ওর বকবকানি ...নে যায়।

সুজান বলে সে এতদিনে থিতু হয়েছে ...বং ছবি আঁকছে। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ...লে :

"আমার ছবির অনেক উন্নতি হয়েছে না ? আপনার কি মনে হয় ? আমার প্রতিভা আছে একথা বলতে চাইনা, তবে এটুকু বল্‌তে পারি আমার সমস্ত পরিচিত আর্টিস্টদের চাইতে আমার শক্তি কিছু কম নয়।"

লারী জান্‌তে চায়—"ছবি একখানাও বিক্রী করেছ ?"

বেশ ভঙ্গী নিয়ে সুজান বলে, "বিক্রীর দরকার হয় না, আমার নিজস্ব অর্থসামর্থ্য আছে।"

"ভাগ্যবতী মেয়ে তুমি।'

"ঠিক ভাগ্যবতী নই, তবে চালাক বল্‌তে পারো। একদিন এসে আমার ছবি দেখ্‌তে হবে।"

এক টুক্‌রো কাগজে নিজের ঠিকানা লিখে দিয়ে ওকে দিয়ে একদিন আসার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল। উত্তেজিত সুজান অনর্গল কথা বলে যায় তারপর লারী বিল আনতে বল্‌ল।

সে চেঁচিয়ে ওঠে—"সে কি! চলে যাবে নাকি ?"

সে হেসে বলে "হ্যাঁ যাচ্ছি।'

দাম দিয়ে হাত নেড়ে ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আমি হাস্‌লাম। ওর ভঙ্গীটুকুতে বরাবরই আমার মজা লাগে। এই তোমার সঙ্গে রয়েছে ব্যস্ তার পরমমুহূর্তেই বিনাবাক্যব্যয়ে উধাও। এমনই আকস্মিক ওর অন্তর্ধান যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

সুজান একটু বিরক্ত হয়ে বলে "এত তাড়াতাড়ি কেন গেল কে জানে?"

আমি রহস্য করে বলি—"হয়ত কোনো মেয়ে ওর প্রতীক্ষায় বসে আছে।'

ব্যাগ থেকে প্রসাধন সামগ্রী বার করে মুখে পাউডার মেখে সুজান বলে :—"একটা কথার মত কথা বটে, ওর সঙ্গে যে মেয়ে প্রেমে পড়বে সে আমার করুণার পাত্রী—আ-হা-হা।"

"একথা বল্‌ছ কেন ?"

আমার মুখের পানে এক মিনিট গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে থাকে সুজান, ওকে সচরাচর এতখানি গম্ভীর দেখি না।

"একবার আমি নিজেই প্রায় ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আর কি—বরং জলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বা একঝলক সূর্য কিরণ কিংবা আকাশের একটুকুরো মেঘের সঙ্গে প্রেমে পড়া সহজ—আমি একটুকুর জন্য খুব বেঁচে গেছি; কি বিপদেই না পড়তে হত। এখনও সেই কথা ভেবে আমি শিউরে উঠি।"

বিবেচনা চুলায় যাক্। ব্যাপারটি যে কি তা না জানতে চাওয়া অমানুষিক হবে। নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম এই ভেবে যে মৌনতা কাকে বলে তা সুজান জানে না।

আমি জান্‌তে চাইলাম—"তুমি যে কি করে ওকে জানলে তাই ভেবে অবাক হচ্ছি ?"

"ওঃ সে অনেক বছর আগের কথা, ছ' বছর কি সাত বছর হবে, মনে নাই। ওদেৎ তখন সবে পাঁচ বছরের। আমি যখন মার্সেলের সঙ্গে থাক্‌তাম ও' তাকে জান্‌ত। স্টুডিয়োতে এসে আমি যখন 'পোজ' দিতাম তখন ও বসে থাকত। মাঝে মাঝে আমাদের ডিনারে নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আস্‌তইনা—আবার দুতিন দিন উপর্যুপরি আসত। মার্সেল ওর আসা যাওয়া ভারী পছন্দ করত, সে বলত ওর উপস্থিতিতে নাকি সে ভালো আঁকতে পারে। তার-পরই আমার টাইফয়েড হ'ল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে ভীষণ দুঃসময়ের ভিতর পড়লাম।" সুজান কাঁধ নাড়লো : "তবে সে সব কথা ত আপনাকে বলেছি। একদিন স্টুডিয়ো মহলে ঘুরে বেড়াচ্ছি কাজের সন্ধানে, কেউই আমাকে চায় না, এক গ্লাস দুধ ছাড়া কিছুই খাইনি—কি করে যে ঘরের ভাড়া দেব তাই ভবছি এমন সময় হঠাৎ বুলভার্দ ক্লিবিতে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও আমাকে দাঁড় করিয়ে আমার কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌ল—আমি তাকে আমার টাইফয়েডের বিবরণ জানালাম, তারপর ও আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল "তোমায় দেখে মনে হয় এখন ভরপেট খাওয়ার দরকার।" আর তার কণ্ঠস্বরে ও চোখের দৃষ্টিতে কি যেন ছিল আমি ভেঙে পড়লাম। চোখ দিয়ে আমার জল পড়তে লাগল।

"আমরা লা মেরি—মারিয়েতের পাশেই ছিলাম, ও আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটি টেবলে বসাল। এতই আমার ক্ষিধে পেয়েছিল যে একটা ছেঁড়া জুতাও খেয়ে ফেলতে পার-তাম—কিন্তু যখন অমলেট এল তখন যেন মনে হ'ল আমি কিছুই খেতে পার্‌বো না। একটু খাওয়ার জন্য জোর করে ও আমাকে এক গ্লাস বার্গেণ্ডি দিল। তখন অনেকটা ভালো লাগ্‌ল, কিছু এ্যাস্‌পারাগাস (শতমূলে) খেলাম। আমি ওকে আমার দুঃখের কাহিনী বল্‌তে লাগ্‌লাম, "পোজে" বসার পক্ষে আমি অত্যন্ত দুর্বল—গায়ে শুধু হাড় আর চামড়া, আর দেখাচ্ছে অতি বিশ্রী। এখন কোনো মানুষকেই পাওয়ার আশা করতে পারি না। দেশে ফিরে যাওয়ার মত অর্থ ও আমাকে ধার দিতে পারে কিনা জান্‌তে চাইলাম। সেখানে অন্ততঃ আমার মেয়েটি আছে। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমি কি সেখানেই যেতে

মনীষী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রতিরোধের কারণ ও পন্থার আলোচনায় বলিয়াছিলেন—

এদেশে যে ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রদত্ত হয়, আমরা তাহাতে অসন্তুষ্ট। ইহার দৈন্য, অসম্পূর্ণতা, জাতীয়তাবিরোধী প্রকৃতি, সরকারের অধীনতা ও সেই অধীনতার সুযোগে জাতির দেশপ্রেম ক্ষুণ্ণ করা—আমরা এ সকলের বিরোধী।

আর তিনি যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত ছিল, আজও তাহাই রহিয়াছে। আজও তাহার পরিবর্তন হইল না—আমাদিগের বালকবালিকারা আজও শিক্ষার নামে কুশিক্ষা লাভ করিতেছে। শিক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্তনের কোন উল্লেখযোগ্য আয়োজনও নাই বলিলেই হয়। বাঙলা বিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা বাড়িয়াছে; কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কি হইল?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম সচিব শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি সদলে আন্দামান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। লোক মনে করিয়াছিল, পূর্ববঙ্গত্যাগী হিন্দুদিগকে তথায় বাস করাইবার জনাই তিনি অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাবৃত হইবার পরেই যে বিধানবাবু তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়াছিলেন, তাহাতে লোকের সেই কথাই মনে হইয়াছিল। এখন শুনা যাইতেছে যে, বাঙালীদিগকে তথায় বসতি করান হইবে কি না স্থির নাই। নিকুঞ্জবাবুর রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে কি না, আমরা বলতে পারি না। তবে এপর্যন্ত তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নূতন কোন সংবাদ নাই। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার হেনরী ক্রো যখন বলিয়াছিলেন, আন্দামান স্বর্গতুল্য, তখন তাহার বিশেষ প্রতিবাদ হইয়াছিল এবং প্রতিবাদকারীরা প্রধানত ভারত সরকারের জেল কমিটির রিপোর্ট নির্ভর করিয়াই সমালোচনা করিয়াছিলেন। তখন আন্দামান পরিদর্শনের প্রস্তাব হয় এবং ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দল চাহেন যে, তাঁহাদিগের মনোনীত কেহ পরিদর্শনে যাইবেন। সরকার তাহাতে সম্মত না হইয়া রায়জাদা হংসরাজ ও স্যার মহম্মদ ইয়ামিন খাঁ—ব্যবস্থা পরিষদের এই ২ জন সদস্যকে পরিদর্শনে প্রেরণ করেন। আন্দামানে নির্বাসিত বন্দীদিগের—বিশেষ রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের অবস্থা পরিদর্শনই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তখন পোর্ট ব্লেয়ারে আন্দামানজাতিদিগের সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়, তাহাতে দেখা যায়, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম আন্দামান বন্দিনিবাসরূপে ব্যবহৃত হয়। তখন সিপাহী বিপ্লবের পরে ভারতের কারাগারে আর স্থান না থাকায় তাঁহাদিগকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। রায়জাদা হংসরাজ তাঁহাদিগকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তখন আন্দামানজাতগণ বলেন, আন্দামানে লোক গতায়াত বন্ধ করা অসম্ভব। কারণ—

(১) আন্দামানজাতগণ ঐ দ্বীপকেই তাহাদিগের মাতৃভূমি মনে করেন;

(২) আন্দামানে অনেক জমিতে ধান্যের, নারিকেলের ও রবারের চাষ হয় এবং তাহাতে ভারত সরকারের আয়ও হয়;

(৩) সামরিক ঘাঁটি হিসাবে আন্দামানের গুরুত্ব অল্প নহে; তথায় ব্যবহারযোগ্য বন্দর আছে এবং তথায় আবহাওয়ার ও বেতারের কেন্দ্র থাকায় বিমানের ও জাহাজের বিশেষ সুবিধা হয়।

তথায় তখন ২ হাজার বর্গমাইল স্থানে বন ছিল, এবং সেই বনের কাষ্ঠের আদর অল্প নহে। বহু বন্দী মুক্তি পাইবার পরে আন্দামানেই বাস করিয়াছে এবং ব্যবসা করিয়া অর্থার্জন করিয়াছে।

এসব কথা যেমনই কেন হউক না, পূর্ববঙ্গাগত হিন্দুদিগকে তথায় বাস করাইতে হইলে সেই স্বতন্ত্র ও উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্নদিগের জন্য শিক্ষার, শিল্পের, কৃষিকার্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি ডক্টর পট্টভী সীতারামিয়া ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতির সম্ভ্রম রক্ষা করাই কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর পশ্চিমবঙ্গের দাবী যদি ন্যায়সংগত হয়, তবে তাহাতে বিহারের আপত্তি অসংগত এবং সেই জন্যই উপেক্ষিত হইবার উপযুক্ত। খার্সোয়ান ও সেরাইকেল্লা লইয়া উড়িষ্যার একদল লোক যেমন ভারত রাষ্ট্র ত্যাগের ব্যর্থ আন্দোলন করিয়াছিল, মানভূম ও সিংভূমাদি পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইলে তেমনই বিহারের একদল লোক তর্জন গর্জন করিতে পারে—কিন্তু সে তর্জন গর্জন ব্যর্থ হইবেই। বিশেষ যখন সমগ্র রাষ্ট্রে শৃংখলার ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে আনুগত্যের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, তখন পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার কাহারও পক্ষে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুত নীতি পালিত হইলে তাহাতে বিরোধিতা করা সংগত হইবে না। কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি কখন ভঙ্গ করা হইবে না—এই বিশ্বাস অবিচলিত রাখিয়া বাঙলা এতদিন যে রাজনীতিক অবস্থার প্রতীক্ষা করিয়া আসিয়াছে—যে অবস্থার প্রবর্তন জন্য বাঙালীরা জাতীয়তার জনক হিসাবে কোনরূপ ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠানুভব করে নাই, সেই অবস্থার প্রবর্তনের পরে যদি তাহার দাবী সংগত বলিয়া স্বীকৃত হইলেও উপেক্ষিত হয়, তবে তাহা তাহার পক্ষে যেমন বেদনাদায়ক হইবে, কংগ্রেসের পক্ষে তেমনই অসংগত হইবে।

যে সময় দিল্লীতে ভারত রাষ্ট্রের ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রীতির পরীক্ষা দিতেছেন, সেই সময় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের' দিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন ঃ—

পূর্ববঙ্গে বরিশাল শহরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সে সম্পর্কে দিল্লীতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, তথায় হিন্দু সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের মধ্যে বাস করিতেছেন। এমন কি যে সকল দায়িত্বশীল (হিন্দু) ব্যক্তিরা এত দিন তথায় থাকিয়া নিজ নিজ অঞ্চলে কংগ্রেসের কাজ করিতেছিলেন, তাঁহারাও (বাধ্য হইয়া) শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

প্রকাশ, কংগ্রেসকর্মীদিগকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা ও তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করা হইতেছে। তাঁহাদিগকে হাতে হাতকড়া দিয়া এবং কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদিগকে আরও নানাভাবে অপমানিত ও নির্যাতিত করা হইতেছে। পূর্ব-পাকিস্থান ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীবিনোদ চক্রবর্তী, ৬০ বৎসর বয়স্ক কংগ্রেসকর্মী ডক্টর অবলা কর ও অন্য ব্যক্তিদিগের গ্রেপ্তারে সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। এই সকল লোকের গ্রেপ্তার ব্যতীত গৃহে অগ্নিযোগ, নারীধর্ষণ, ভীতি-প্রদর্শন, চুরি প্রভৃতির সংবাদও পাওয়া যাইতেছে।

সংবাদে আরও প্রকাশ—

(১) শ্রীঅনন্ত সাহা নামক একজন হিন্দুর দোকান ঘরে রাত্রিতে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া অগ্নিযোগ করা হয়। ঐ সময় ঐ ঘরে কয়জন নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহাদিগের আর্তনাদে স্থানীয় হিন্দুরা সমবেত হইয়া কোনপ্রকারে তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধন করেন।

(২) গত ২রা নভেম্বর কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২টি স্ত্রীলোককে কয়েকজন মুসলমান আক্রমণ করে—কিন্তু তাঁহারা কোন উপায়ে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন কতকগুলি মুসলমান রাস্তার উপর সমবেত হইয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশে গালি দিতে থাকে ও ভয় দেখায়। দুইদিন পরে রাত্রিকালে তাঁহাদিগের গৃহে অগ্নিযোগ করা হয়।

(৩) জনৈক মোক্তারের অবিবাহিতা ভগিনী রিক্সায় যাইবার সময় কয়জন মুসলমান কর্তৃক আক্রান্তা হন। আর কয়জন মুসলমানের চেষ্টায় তাঁহার উদ্ধার সাধিত হয়।

হিন্দুদিগের গৃহ হইতে গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু চুরি হইতেছে।

পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি শহরের আমানতগঞ্জ পল্লীতে নভেম্বর মাসের মধ্যেই ঘটিয়াছে।

রাষ্ট্রপাল রাজাজী কলিকাতা বণিক সভায় বলিয়াছেন—"We are in a moving river."—"বন্যা বা সমুদ্রে তলিয়ে যাবার ইঙ্গিত আশা করি, এ উক্তিতে নেই"—বলেন খুড়ো।

* * * * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজাজীকে Dr. Law উপাধিতে সম্মানিত করিলে রাজাজী বলিয়াছেন ইহা হওয়া উচিত Dr. D. অর্থাৎ Doctorate of Dharma. কিন্তু

ট্রামে-বাসের কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, D. D-র চেয়ে D. D. T-র প্রয়োজন আমাদের বর্তমানে বেশি।

* * * * *

পশ্চিমবঙ্গের সরবরাহ সচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদের মন থেকে লাভ করার মতলব সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। —এই উক্তি শুনিয়া কোন কোন ব্যবসায়ী নাকি জানিতে চাহিয়াছেন যে, অতঃপর ব্যবসা ছাড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটায় যদি তাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তবে গভর্নমেণ্ট তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন কিনা?

* * * * *

শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণাণ বলিয়াছেন যে, ক্ষুধা হইতেই কমিউনিজমের জন্ম হয়।—"কিন্তু চোখের খিদে থেকেও যে অনেক সময় কমিউনিজম্ জন্মে, তা হয়ত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণাণ জানেন না"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * * *

রাশ্যার নারীদের মধ্যে যাঁরা বিদেশী স্বামীকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁরা স্বামীদের সঙ্গে ঘর করিবার অনুমতি পাইতেছেন না। সোভিয়েট সরকার একেবারে খাঁটি নির্ভেজাল বলিয়া যাঁদের ধারণা, তাঁরাও এই ব্যাপারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন।

* * * * *

সংযুক্ত প্রদেশের কোন এক সমিতি ভারতবর্ষ হইতে এলোপ্যাথি চিকিৎসা উঠাইয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। —"পাগলামো দূর করার পরামর্শ এখনো কেহ দেননি"—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

* * * * *

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পাটনার এক সভায় মহিলাদের উপদেশ দিয়াছেন—"Share the sorrows of others." —ট্রামে-বাসে চড়িয়া এই উপদেশ পালন করা বড়ই শক্ত!

* * * * *

পূর্ব পাকিস্থানে কি ধরণের বাঙলা ব্যবহার করা হইবে, তা নির্ধারণ

করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। "যাঁরা বাঙলা জানেন না বা বাঙলায় কথা বলেন না, আশা করি, নিরপেক্ষ বিচারের জন্য এই গুরুভার তাঁদের ওপরই অর্পণ করা হয়েছে"—বলিলেন খুড়ো।

নিউইয়র্কের স্টেট এথলেটিক কমিশনের চেয়ারম্যান মন্তব্য করিয়াছেন যে—খেলাধূলার মধ্য দিয়াই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবে। তিনি রাশ্যা এবং আমেরিকার

মধ্যে এথলেটিক প্রতিযোগিতার পরামর্শ দিয়াছেন। বিশুখুড়োর পরামর্শ—"তাই যদি হয়, তাহলে এই দুদেশের মধ্যে catch-as-catch-can-be কুস্তির ব্যবস্থা করেই—এই পন্থাটিকে ভালো করে যাচাই করে নেওয়া উচিত।

* * * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে নিযুক্ত কেরানীদের মধ্যে যারা সরকারের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারিবেন তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া শুনিলাম। পরামর্শ মত গভর্নমেণ্ট কাজ করিবেন কি না সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন সরকারী বিবৃতি এখনও প্রকাশিত হয় নাই!

* * * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ জাপানী যুদ্ধ-অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড সম্বন্ধে রাশ্যার "ইজভেস্তিয়া" মন্তব্য করিয়াছেন—"দণ্ডদান লঘু হইয়াছে। বিশুখুড়ো মন্তব্য শুনিয়া বলিলেন—"মরার-বাড়া গালও তাহলে আছে?"

* * * * *

নিউ ইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ যে, জনৈক নিগ্রো বাসে এক শ্বেতাঙ্গের পাশে বসিয়াছিল, এই অপরাধে গুলীবিদ্ধ হইয়াছে। নিগ্রোটি নির্বাচনে Truman-এর জয়কে নিশ্চয়ই True man-এর জয় বলিয়া ভুল করিয়াছিল।

আপনি উহার বস্ত্র হরণ করিতেছেন

ঐ শাড়ীখানা দেখিতে চমৎকার! কিন্তু কিনিবার আগে একবার ভাবুন। আপনার কি সত্যই এখন কাপড়ের দরকার আছে? আপনার কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় খরিদ করা নাই? আপনার যাহা আছে তাহাতে আরও কিছুদিন কি চলে না? মনে রাখিবেন—দেশে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় নাই। আপনি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় কেনেন, তাহা হইলে অপর একজন তাহার ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে। সম্ভবতঃ বঞ্চিতের প্রয়োজন আপনার অপেক্ষা ঢের বেশী।

অপরের কথা ভাবুন

নেহাৎ ঠেকিলেই কাপড় কিনুন এবং যেটুকু একান্ত প্রয়োজন সেটুকুই শুধু কিনুন।

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

ASP

দেশী সংবাদ

৬ই **ডিসেম্বর**—নয়াদিল্লীতে ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আরম্ভ হয়। পাকিস্থান ও ভারত গভর্নমেণ্টের বিবেচনাধীন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি সাব কমিটি গঠিত হইবার পর বৈঠক মুলতুবী থাকে।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মুরাপাড়ার ৯ জন হিন্দু জমিদারের বাসগৃহ ও বাস্তুভূমি দখল করিবার আদেশ জারী করা হইয়াছে। ৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৫টার সময় গৃহের মালিকদের গৃহত্যাগ করিবার নোটিশ দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, ঐ দিনই তাহাদের গৃহত্যাগ করিতে হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের অসামরিক সরবরাহ সচিব শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার কলিকাতা সহরে তাঁতের কাপড় সমেত সকল রকমের কাপড় মিলাইয়া মাথা পিছু বার্ষিক মোট ১৮ গজ কাপড়ের রেশন বরাদ্দ করিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রাধীনে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের জন্য পশ্চিম বঙ্গে যে প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রণীত হইতেছে তাহাতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় এযাবৎ ১১ লক্ষাধিক ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৭ই **ডিসেম্বর**—ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনে ধর্ম-স্বাধীনতা সম্পর্কে কতকগুলি অধিকার স্বীকার করিয়া খসড়া শাসনতন্ত্রের ৩টি অনুচ্ছেদ গৃহীত হইয়াছে। একটি অনুচ্ছেদে ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনায় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অথবা সৎকার্যের জন্য ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির মালিকানা দখল ও পরিচালনার স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে নাগরিকদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম অথবা ধর্মের নাম অব্যাহত রাখার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণরূপে সরকারী অর্থে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্ম শিক্ষাদান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে উভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধি সম্মেলনে উভয় ডোমিনিয়নের মুখপাত্রগণ এক ডোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিয়নে গমনের কারণ বিশ্লেষণ করেন। এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা চুক্তির রাজনীতিক ধারাসমূহ কার্যে পরিণত করার বিষয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগের বিষয় একটি রাজনৈতিক কমিটিতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে।

৮ই ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৯ সালে ভারতে ২০ লক্ষ টন চাউল এবং আনুমানিক ১০ লক্ষ টন অন্যান্য খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়িবে বলিয়া সরকারীভাবে হিসাব ধরা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ খাদ্যদ্রব্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন ত্বরান্বিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ৭ কোটিরও অধিক সহরাঞ্চলের বাসিন্দা রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী আগামী বৎসর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর দরুণ ভারতকে একশত কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

৯ই ডিসেম্বর—অদ্য ভারতীয় গণপরিষদে যে অনুচ্ছেদটি গৃহীত হইয়াছে, ডাঃ আম্বেদকর তাহাকে সমগ্র খসড়া প্রস্তাবের মূল বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জনসাধারণকে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য শাসনতন্ত্রে যে ব্যবস্থা

করা হইয়াছে, ঐ ধারায় তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। পরিষদে গৃহীত ধারায় মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিধান অনুযায়ী অধিকার বলবৎ করার জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত যে কোন অধিকার বলবৎ করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

১০ই **ডিসেম্বর**—ভারতীয় গণপরিষদে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতীয় ইউনিয়নে একজন রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেণ্ট) থাকিবেন এবং তিনি শাসনতন্ত্র ও আইন অনুযায়ী ইউনিয়নের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। আরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ভারতের সেনা বাহিনীসমূহের সর্বময় কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে অর্পিত হইবে।

আগামী সপ্তাহে জয়পুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন আরম্ভ হইবে, সেই অধিবেশনের কর্মসূচী ও প্রস্তাব রচনার জন্য অদ্য নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন, আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্মী এবং নেতাদিগকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। পুণা সহরে ২৮৯ জন, বোম্বাই সহরে ২৫৬ জন, কাশীতে ১০০, নাসিকে ১০৪, কলিকাতায় ১০৬ এবং আমেদাবাদে ৬১ জনকে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে প্রায় সাড়ে তের লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে প্রথম শ্রেণীর ট্রাম টিকিটের উপর এক পয়সা এবং মাসিক টিকিটের উপর তদনুপাতিক ভাড়া বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রাম গাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে না।

১১ই **ডিসেম্বর**—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি, বিশেষতঃ বৃটেন ও কমনওয়েলথের সহিত ভারতের সম্পর্ক, ভারতে বিদেশী অধিকৃত স্থান প্রভৃতি বিষয়ে সাময়িকভাবে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্যকার আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।

কলিকাতা পুলিশ অদ্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ১৫৭ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবে ভারতের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐক্য ও শুভেচ্ছা বিধান, শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপসাধন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সামাজিক সংস্থা গঠনকল্পে আত্ম-নিয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি অদ্য ছয়টি খসড়া প্রস্তাবের চূড়ান্ত রূপদান করিয়াছে। এই প্রস্তাবগুলি জয়পুর কংগ্রেসের অধিবেশনে উত্থাপন করা হইবে। গৃহীত প্রস্তাবসমূহে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে, যথা ঃ—কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি, দেশ বিভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ, শ্রমিক সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা।

বিদেশী সংবাদ

৬ই **ডিসেম্বর**—আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালের প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দুইজন জাপ সমর নেতা মার্কিণ সুপ্রীম কোর্টে যে আপীল করিয়াছেন, উহার শুনানী হইবে বলিয়া অদ্য স্থির হইয়াছে। জেনারেল দইহারা ও ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী হিরোতার পক্ষ হইতে আপীল করা হইয়াছে।

৯ই **ডিসেম্বর**—বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্ণেস্ট বেভিন কমন্স সভায় বলেন যে, বৃটেন চীনা গভর্নমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আর্থিক অবস্থার জন্য জাতীয় বাহিনীকে সাহায্য করার ক্ষমতা তাহার নাই।

১০ই **ডিবেম্বর**— জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক সমগ্র চীনে সামরিক আইন জারী করিয়াছেন। নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, নূতন আমদানী শত সহস্র কম্যুনিষ্ট সৈন্য অদ্য নানকিং-এর মাত্র ৭৫ মাইল দূরে দ্বিতীয় সরকারী রক্ষাব্যূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

১১ই **ডিসেম্বর**—সাংহাই-এর সংবাদে প্রকাশ, চীনের ওয়াকিবহাল রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সাম্যবাদী চীনের সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইসেকের উপর চাপ দিতেছে। আই হুই, হোনান ও কিয়াংসী প্রদেশে পরিবেষ্টিত সরকারী চীনা বাহিনী তিনটির খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে।

হেগে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, হল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্রের মধ্যে তিন বৎসর ব্যাপী বিরোধের মীমাংসাকল্পে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

প্যারিসে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদ প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে কাউণ্ট বার্ণাদোতের পরিকল্পনা বাদ দিয়া একটি নূতন

প্রস্তাব গ্রহণ করে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, তিনজন লইয়া গঠিত একটি আপোষ কমিশন প্যালেস্টাইনে যাইবে। বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চীন এবং রুশিয়া যাহাদের মনোনয়ন করিবে, তাঁহাদের মধ্য হইতে তিন ব্যক্তি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

১২ই ডিসেম্বর—নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, রাজধানী নানকিং হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত রেলপথের উপর এক স্থানে চীনের কম্যুনিষ্ট বাহিনী সরকারী সেনাদলের শেষ রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়াছে। অদ্য ঐ স্থানে দ্রুত দুই ডিভিসন সরকারী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। কম্যুনিষ্টদের আরও সেনাদল আমদানী করা হইয়াছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ষোড়শ বর্ষ]   শনিবার, ১০ই পৌষ, ১৩৫৫ সাল।   Saturday, 25th December, 1948.   [৮ম সংখ্যা

জয়পুর কংগ্রেস

জয়পুরে কংগ্রেসের পঞ্চপঞ্চাশৎ অধিবেশন ভারতের—শুধু ভারতের কেন, জগতের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হইবার পর কংগ্রেসের এই প্রথম ও প্রকাশ্য অধিবেশন। এই অধিবেশনের আরও একটি দিক হইতে বিশেষত্ব রহিয়াছে। ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলি এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে মধ্যযুগীয় প্রগতি-বিরোধী শক্তির ঘাঁটি বলিয়াই বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে এবং ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের আলো এমন প্রতিবেশের অন্ধকারে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশ পাইবার সুযোগ লাভ করে নাই। সামন্ত রাজ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন এই সর্বপ্রথম। জয়পুর গান্ধীনগরে ভারতের সহস্র-শীর্ষ পুরুষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং সমগ্র ভারতের আত্মা এখানে সব স্বেচ্ছাচারিতা উৎখাত করিয়া মানবতার অকুণ্ঠ অধিকারকে মর্যাদা দিয়াছে। জয়পুর কংগ্রেসে নানাদিক হইতে স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির পন্থা সুনিশ্চিত হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংগে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কিরূপ হইবে, জগতের বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত ভারত কোন পথে চলিবে, জয়পুর তাহা নির্দেশ করিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনীতিক আদর্শ কংগ্রেসের এই অধিবেশনে পরিস্ফুট হইয়াছে। জয়পুর কংগ্রেস ভারতের সাধ্য এবং সাধনাকে বিচ্ছিন্ন-ভাবে দেখে নাই, বিশ্বের মানবতার পরিপ্রেক্ষায় কংগ্রেস ভারতের রাষ্ট্রনীতিকে সুব্যবস্থিত করিবার সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছে। জয়পুর কংগ্রেস জাতিকে গভীরভাবে আত্মস্থ হইবার পথে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং কংগ্রেসকর্মীদিগকে বিশেষভাবে তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। গান্ধীজীর জীবন-সাধনাকে জাতির সম্মুখে কংগ্রেস জীবন্ত করিয়া অভ্রান্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়াছে। ত্যাগ স্বীকার এবং জনসেবার পথেই যে ভারতের রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান একমাত্র সম্ভব কংগ্রেসের অধিবেশনে এ সত্য বিঘোষিত হইয়াছে। কংগ্রেসকর্মীরা যদি এই আদর্শকে তাঁহাদের কর্মসাধনায় উদ্দীপ্ত রাখিতে না পারেন, তবে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকিবে না জয়পুরের এই নির্দেশ। কংগ্রেসকর্মীদিগকে চরিত্র বলে এবং নৈতিক মহিমায় সমগ্র জাতির চিত্তবৃত্তিকে সব সঙ্কীর্ণতার উপরে লইয়া যাইতে হইবে জয়পুর কংগ্রেসের ইহাই অনুশাসন। বস্তুত ভারতের দায়িত্ব আজ অসীম। সমগ্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক জাগরণের ক্ষেত্রে আজ ভারতের আহ্বান আসিয়াছে। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব হইতে মানুষকে মুক্ত করিতে হইবে, জাতি এবং সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বর্বরতার গ্লানিকে বিশ্বের বুক হইতে অপসারিত করিতে হইবে। ত্রিশ কোটি নরনারী অধ্যুষিত ভারত এ দায়িত্বকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহামানবের সাধনার শক্তিতে যাহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে, জগৎ তাহাদের নিকট অনেক কিছু আশা করিতেছে। জয়পুর কংগ্রেসে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে সে আশাকে সার্থক করিবার সংকল্প ঘোষিত হইয়াছে। জগতের ইতিহাসে সত্যই ইহা এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

রাষ্ট্রপতির নির্দেশ

রাষ্ট্রপতি ডক্টর সীতারামিয়া গান্ধীজীর একান্তনিষ্ঠ অনুবর্তী পুরুষ। তাঁহার সুচিন্তিত সুদীর্ঘ অভিভাষণের সর্বত্র গান্ধীজীর আদর্শের সুরই ঝংকৃত হইয়াছে। তিনি গান্ধীজীর সম্বন্ধে দ্বিধাহীন কণ্ঠে ও নির্ভীকচিত্তে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন অবতার। তিনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীকে মানবতার মহান আদর্শের স্তরে উন্নীত করাই এই মহান অবতারের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল। রাষ্ট্রপতি আমাদের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য গান্ধীজীর প্রচারিত এবং অনুসৃত নীতিই সবক্ষেত্রে অবলম্বন করিয়াছেন। গান্ধী-শিষ্য ডক্টর সীতারামিয়ার দৃষ্টি ভারতের গ্রামগুলির দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয়তাকে গ্রামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ঐ একটি ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া জাতির অর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের পথ তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি জন-সেবার এই দৃষ্টিতেই শ্রমিক, শিল্প, পুনর্গঠন-পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, সামাজিক ন্যায় বিচার, গোধন পরিচর্যা এবং হরিজন সম্পর্কিত বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন। কংগ্রেস ও গভর্নমেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অভিভাষণে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, একদিকে দেশের জনসাধারণের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অপর দিকে দেশ শাসন, এতদুভয়ের মধ্যে কংগ্রেস সেতুর মতো কাজ করিবে। কংগ্রেস রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইয়া সাক্ষাৎ সম্পর্কে জনসেবার সামাজিক দিকটা লইয়াই থাকিবে তিনি সর্বাংশে এই নীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতির এই পরামর্শ কতটা সার্থকতা লাভ করিবে কংগ্রেসকর্মীদের আদর্শনিষ্ঠা এবং গভর্নমেণ্টের কর্ণধারগণের সেবা ও ত্যাগের উপর তাহা অনেকখানি নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে সেবা এবং ত্যাগে রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয়দিকে আমাদের অভ্যুন্নতিকে সুনিশ্চিত করিতে পারে। রাষ্ট্রনীতির বহিরঙ্গতা এই ত্যাগ ও সেবার মহিমাতে সমাজ-চেতনার সংগে ঘনিষ্ঠতা সূত্রে অন্তরঙ্গতা

লাভ করে। আশা করা যায়, রাষ্ট্রপতি সীতারামিয়ার নেতৃত্বে গভর্নমেণ্ট এবং জনচেতনা উভয় দিকেই কংগ্রেসের আদর্শনিষ্ঠ সেবা এবং ত্যাগের মহিমা সম্প্রসারিত হইবে। এইভাবে কংগ্রেস এবং গভর্নমেণ্ট হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইবেন এবং দেশ ও জাতিকে উন্নতি হইতে মহত্তর সমৃদ্ধির দিকে আগাইয়া লইতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে ভারতের জনসাধারণের অন্তরে নূতন আশার সুর বাজিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার নবভারতের স্বপ্ন সার্থক হোক, আমরা ইহাই কামনা করি।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধতা

বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ভাষার ভিত্তিতে চারটি নূতন প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ভারতীয় পরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশনের মতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হইলে প্রত্যেকটি নূতন প্রদেশ অধিকতর সুখী ও শক্তিশালী হইবে এবং তাহারা নিজেদের সংস্কৃতি সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী পথে নিজেদের উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। এইভাবে গঠিত শক্তিশালী প্রদেশের পক্ষে ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে অধিকতর সুষ্ঠু সেবা করা সম্ভব হইবে এবং ভারতের জাতীয়তাবাদ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, এমন ধারণা ভ্রান্ত। একটু বিবেচনা করিলেই বোঝা যাইবে, গত ২৫ বৎসরকাল কংগ্রেস যে আদর্শ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে, এবং জাতির চিন্তানায়ক যে নীতিকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন, কমিশনের কয়েকজন বিচারক কলমের খোঁচায় তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। কমিশনের মতে আগে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, স্বাধীন ভারতে আর তাহা চলিবে না এবং ভাষাগত প্রদেশে উপজাতীয়তাবোধই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দেখা দিবে, ভারত রাষ্ট্রের সংহত শক্তি আর থাকিবে না। কমিশনের সদস্যদের বুদ্ধিমত্তায় আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না; কিন্তু তাঁহারা আজ যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, ভারতের মনস্বী রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টিতে তাহা আগে পড়ে নাই, এমন কথা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। ভারতের সংহত রাষ্ট্র-চেতনার বেদনাময় বিগ্রহ গান্ধীজী স্বয়ং ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্তও দৃঢ়ভাবে তাহার সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হইলে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রবোধ ক্ষুণ্ণ হইবে, কমিশনের এমন যুক্তির মধ্যে আমরা সংগতি খুঁজিয়া পাই না। ভারতের সব প্রদেশের সংস্কৃতির বীজ সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভাষাগত সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটিলে সে বোধ হ্রাস পাইবে, এমন যুক্তির আমরা কোন মূল্য দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ সুসংস্থিত না হইলেই সেই বোধ শিথিল হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কমিশন তাঁহাদের বক্তব্য এই বলিয়া ইতি করিয়াছেন যে, "ভারতের জাতীয়তা অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বর্তমানের কয়েকটি প্রদেশ পুনর্গঠিত হওয়া উচিত; কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে না হইয়া শাসনগত সুবিধার ভিত্তিতেই তাহা হওয়া বাঞ্ছনীয়।" শাসনগত সুবিধা বলিতে কমিশনের সুযোগ্য সদস্যগণ কি বুঝিয়াছেন, আমরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমরা তো ইহাই বুঝি যে, শাসনগত সুবিধার জন্যই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ফলত সাহিত্য বা কাব্য আলোচনার সুবিধার জন্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই এবং জাতির কর্ণধারগণ তাহা সমর্থনও করেন নাই। বর্তমানে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের পক্ষে কমিশন কতকগুলি বাস্তব অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি অবশ্য বিবেচনার বিষয় এবং সেইসব অসুবিধা আগে দূর করাও প্রয়োজন হইতে পারে এবং সেজন্য প্রদেশ গঠনের কাজে এখনই প্রবৃত্ত হওয়া অসমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেকথা স্বতন্ত্র এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই তাহা বিচার্য বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি। সুতরাং সে তত্ত্ব লইয়া মস্তিষ্ক সঞ্চালনে প্রবৃত্ত না হওয়াই কমিশনের উচিত ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে কমিশনের সদস্যগণ তাঁহাদের বিচার্য বিষয়ের গণ্ডি অতিক্রম করিয়াছেন এবং একটা বিশেষ মতবাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনের একটা বদ্ধ সংস্কারই তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করিয়াছে। সমগ্র ভারতের স্বার্থ-প্রণোদিত সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির আলোকে এ সম্বন্ধে ভবিষ্য-পন্থা নির্ণয় করিতে হইবে। এই দিক হইতে কমিশনের সিদ্ধান্তকে আমরা চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

পূর্ব পাকিস্থানের দায়িত্ব

পূর্ব পাকিস্থানের দেড় কোটী হিন্দুর তথাকার রাষ্ট্রের পূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করিবার দাবীর সংগতি নিশ্চয়ই আছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশনে এই বিষয়টির উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে সর্দার প্যাটেলের প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়াছে। সর্দারজী এসম্বন্ধে পাকিস্থান গভর্নমেণ্টকে তাঁহাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কিত সমস্যার যদি সমাধান না হয়, এবং ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পরও অবস্থার যদি অবনতি ঘটে, তবে তাঁহারা সে অবস্থা স্বীকার করিয়া লইবেন না। পশ্চিম পাকিস্থান হইতে যে সব বাস্তুত্যাগী আসিয়াছে, ভারত গভর্নমেণ্ট তাহাদের পুনর্বসতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানের বাস্তুত্যাগীদের দায়িত্ব পশ্চিম বাঙলার গভর্নমেণ্টকে লইতে হইবে এমন কোন কারণই নাই। সর্দারজীর এ যুক্তি আমরাও স্বীকার করি। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমের সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ স্বেচ্ছায় নিজেদের জন্মভূমি তাহারা ছাড়িতে চাহেন না নিশ্চয়ই। সর্দারজী পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্বন্ধে বলেন,—"পূর্ববঙ্গের লোকেরা বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিনা কারণে কেহই তাহার নিজের বাস্তুভিটা ছাড়িতে চায় না। বিশেষভাবে ভারতে আসিলে তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাহাদিগকে ভারতে আসিতে হইতেছে। আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনে এই বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছে। আমরা আশা করি, সন্তোষজনক ভাবেই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। অবস্থা যে গুরুত্বপূর্ণ তাহা পাকিস্থানী গভর্নমেণ্টকে বিশেষভাবেই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেস ভারত বিভাগে সম্মত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি পট্টভি সীতারামিয়া পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনোভাবকে যথাযথ মর্যাদা দিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। রাষ্ট্রপতির মতে "এখানে তাঁহারা আশ্রয়ের সন্ধানে অথবা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার ভিক্ষা জানাইবার জন্য আসেন নাই। জাতি দেশ বিভাগে সম্মতি দান করিয়াছে, তাহার ফলেই আজ তাঁহারা এইভাবে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।" বস্তুতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দাস-জীবনের প্রতিবেশের মধ্যে কংগ্রেস কোনক্রমেই ঠেলিয়া দিতে পারে না। সুতরাং ভারত গভর্নমেণ্টও এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পণ্ডিত জওহরলালের উক্তিতেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্ট যদি তথাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে পরাঙ্মুখ হন তবে ভারতের স্বার্থের জন্য ভারত গভর্নমেণ্টকেই আগাইয়া যাইতে হইবে এবং পূর্ববঙ্গের গভর্নমেণ্টকে সে দায়িত্ব প্রতিপালনে বাধ্য করিতে হইবে। ভারত গভর্নমেণ্টের মুখপাত্র-

স্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল এবং সর্দারজী উভয়েই এই দিক হইতে তাঁহাদের কর্তব্য প্রতিপালনে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির ভবিষ্যৎ

নয়াদিল্লীতে অনেক ঘটা করিয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আলোচনা সম্পন্ন হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ আলোচনার ফল খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে এবং ইহার ফলে পুরাপুরি ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী চুক্তি ও সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব হইয়াছে। কলিকাতা চুক্তির অবসানেও আমরা এই ধরণের অনেক আশার কথা শুনিয়াছিলাম, শুধু তাহাই নয়, তাহার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগের গতি কিছু সময়ের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়াও যায়; কিন্তু সে আলোচনা বাস্তব ভিত্তি লাভ করে নাই, কার্যতঃ সব সিদ্ধান্ত অকেজো হইয়াই থাকে। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে পুনরায় নৈরাশ্যের ভাব গভীর হইয়া উঠে এবং বাস্তুত্যাগের গতি বৃদ্ধি পায়। নয়াদিল্লীর সিদ্ধান্তে সেই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি না ঘটিলেই মঙ্গল। বস্তুতঃ আমরা দিল্লীর সিদ্ধান্তের সার্থকতা সম্বন্ধে এখনও সন্দিহান রহিয়াছি। আমাদের এমন সন্দেহের কারণ কি? সে কথা আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই। পাকিস্থানের অর্থসচিব জনাব গোলাম মহম্মদ নিজেই ভিতরের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, উধর্বস্তরে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হইলেও সেগুলি সর্বাংশে সার্থক হয় নাই। নিম্নস্তরের রাজকর্মচারীরা নিজেরা শাসন-দণ্ড চালাইয়াছেন এবং চুক্তির সর্ত সব ভঙ্গ করিয়াছেন। রাজকর্মচারীদের এই ধরণের অনাচার আর বরদাস্ত করা হইবে না। যাহারা চুক্তির বিধান ভঙ্গ করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে বলিয়া পাকিস্থানের অর্থসচিব আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, কর্মচারীরা এমন সাহস পায় কেন? এবং উধর্বতন কর্তৃপক্ষ এমন অনাচার কতটা দমন করিতে সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে জনমত যদি জাগ্রত না হয়, তবে হাতে যাহারা ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহারা সে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিবেই। জনমত বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের কথাই আমরা এক্ষেত্রে বলিতেছি। কারণ, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সেই মতই রাষ্ট্রক্ষেত্রে কার্যতঃ মর্যাদালাভ করিয়া থাকে। পাকিস্থান রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তা সম্বন্ধে এইখানেই গলদ দাঁড়াইতেছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ অবিরত শাসন ও সাম্প্রদায়িকতার কথা বলিতেছেন। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক বোধই জনমতকে প্রভাবিত করিতেছে। পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন সেদিনও পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্বোধন করিতে গিয়া মন্ত্রটি আবৃত্তি করিয়া লইয়াছেন। তিনি বিপন্ন ইসলামের স্থলে বিপন্ন মুসলিম জগতের সুরে সাম্প্রদায়িকতাকে জড়াইয়া লইয়াছেন। এমন অবস্থায় পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার বোধ উদ্বুদ্ধ হইবে এবং সেই দৃষ্টিতেই তাহারা রাষ্ট্রের স্বার্থের বিচার করিবে, ইহা স্বাভাবিক। ফলতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি এইরূপে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়, তবে রাজ-কর্মচারীরাও সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের স্বেচ্ছাচারিতাকে পরিতৃপ্ত করিবার পথ খোলা পাইবে। রাজ-কর্মচারীরা এক একজন ওমরের মত উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হইবে, এমন আশা করা অন্যায়। ফলতঃ স্বার্থ সাধনা এবং নিজের প্রভুত্বকে তৃপ্ত করিবার কামনা এই শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকিবেই। প্রকৃতপক্ষে জনমতের চাপেই ইহাদের স্বেচ্ছাচার প্রবৃত্তি সংযত থাকিতে পারে। সত্য কথা বলিতে গেলে পাকিস্থানের কর্ণধারগণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রের বাস্তব প্রতিবেশ সৃষ্টির জন্য যতদিন একান্ত না হইবেন, ততদিন পর্যন্ত পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিরাপদ এবং তাহাদের মান-মর্যাদা রাষ্ট্রের দরদে দৃঢ় হইয়া উঠিবে না।

পাকিস্থানের সমস্যা

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগের ফলে ইহার মধ্যেই পূর্ব পাকিস্থানে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার কথাটার ভিতরে ভারতের উপর অসঙ্গত একটা খোঁচা আছে। প্রকৃতপক্ষে অ-মুসলমান ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসেন নাই, সেখানে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই অ-মুসলমান ব্যবসায়ীদিগকে পূর্ববঙ্গ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছে। খাজা সাহেব তাঁহার স্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, অনর্থক পারস্পরিক দ্বন্দ্বে নিজেদের শক্তি ক্ষয় না করিয়া জনগণের দুঃখ-কষ্ট নিরসনের জন্য নিজেদের সকল শক্তি প্রয়োগ করাই ভারত ও পাকিস্থানের উভয়ের পক্ষে এখন কর্তব্য। বলা বাহুল্য, ভারত কোন দিনই বিরোধ চাহে না, ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই। সাম্প্রদায়িক বৈষম্যবোধ এখানে যাহারা জাগাইতে চেষ্টা করিবে, ভারত তাহাদিগকে বিচূর্ণ করিবে, এ সঙ্কল্প সে সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে এবং কার্যতঃ তাহারা নীতি আদর্শনিষ্ঠ কঠোরতার সঙ্গে সে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইতেছে। সে নীতি এতই সুস্পষ্ট যে, সে সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন হয় না। বলা বাহুল্য, ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের উদার ভাবনা এ ক্ষেত্রে জনচেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। কংগ্রেসের রাষ্ট্র-সাধনার মূলে উদার মানবতার আদর্শের অনুপ্রেরণা সব সময়ই কাজ করিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নিন্দিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য এবং ভেদবুদ্ধিই পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠার মূলে প্রেরণা যোগাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, আজও সেই সঙ্কীর্ণ পথ ছাড়িয়া বলিষ্ঠ উদার আদর্শের ভিত্তির উপর রাষ্ট্রীয় সাধনা দাঁড় করাইবার সাহস পাকিস্থানের নেতারা পাইতেছেন না। এ পথ পাকিস্থানের অকল্যাণেরই পথ। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্থানকে আজ সংহতিবদ্ধ এবং সজাগ হইতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর দল এখনও সজাগ রহিয়াছে। এসিয়ার সঙ্কট কাটে নাই, ইহা বোঝা দরকার। পারস্পরিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তের মূলে এই সত্যটি পাকিস্থানী রাষ্ট্র-নীতির কর্ণধারগণ যত সত্বর উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল।

কংগ্রেস সেবার আদর্শ

ক্ষমতা হাতে পাইলে তাহার অপব্যবহার করিবার একটা ঝোঁক দেখা যায়, মানব প্রকৃতির পক্ষে ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগ ও তপস্যায় যাহাদের চরিত্রবল সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, সেই সব কংগ্রেসকর্মী এমন দুর্বলতার উধের্ব নিজেদের আদর্শের মহিমা উন্নত রাখিবেন, সকলেই এমন আশা করেন। অথচ এ সম্বন্ধেও অভিযোগের কারণ ঘটিয়াছে। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীশঙ্কররাও দেও কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস কর্মীদের এক সম্মিলনে তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। জয়পুরে কংগ্রেসে সম্যক সুস্পষ্ট ভাষায় এই সম্পর্কে সাবধান-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা কংগ্রেসের আদর্শই জনগণের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরা হইয়াছে। অতঃপর যাঁহাদের কাজে কংগ্রেসের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে, তাঁহারাই নিজেদের মর্যাদা হারাইবেন। ফলতঃ কংগ্রেসকে তাহাদের আচরণজনিত মালিন্য স্পর্শ করিবে না। কিন্তু প্রস্তাব পাশ করিলেই সত্যকার কোন কাজ হয় না, আচরণের দ্বারাই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ত্যাগে ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত কংগ্রেসকর্মীরা তাঁহাদের আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণের দ্বারা কংগ্রেসের মর্যাদা জাতির অন্তরে জীবন্ত করিয়া তুলিবেন, আমরা ইহাই আশা করি। অবশ্য, শত্রুও আমাদের আছে। ইহারা সত্যকেও মিথ্যা করিতে চাহিবে; কিন্তু অভিযোগের সত্যই যদি কারণ না থাকে তবে মিথ্যার তেমন গ্লানি আদর্শের কোন হানি করিতে পারে না।

প্যারী অধিবেশনের সমাপ্তি

পূর্বনির্দিষ্ট সময়ের একদিন পরে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের প্যারী অধিবেশনের সমাপ্তি হয়েছে। একে সমাপ্তি বললে ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে কিছুটা ভ্রান্তি দেখা দেবার সম্ভাবনা। এ অধিবেশনটিকে কয়েক মাসের জন্যে মুলতুবী রাখা হয়েছে বলা চলে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল লেক সাকসেসে এই অধিবেশনেরই পুনরারম্ভ হবে। প্যারী অধিবেশনে সমাপ্য কাজের তুলনায় যে কাজ নিষ্পন্ন হয়েছে, তার পরিমাণ দেখে অনেক প্রতিনিধিই হতাশ হয়েছেন বলে প্রকাশ। বেশ কিছুটা নৈরাশ্যজনক পরিবেশের মধ্যেই এ অধিবেশনের সমাপ্তি হয়েছে। এই সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ এভাট্ লৌকিকতার খাতিরে অবশ্য বলেছেন যে, প্যারী অধিবেশনে ভাল ফলই হয়েছে, কিন্তু কার্যতঃ ভাল ফল যে পাওয়া যায়নি তা তার নিজের বিবৃতির নৈরাশ্যজনক ভঙ্গী থেকেই প্রকাশ। আজ পৃথিবীর স্থায়ী শান্তির পক্ষে সবচেয়ে বেশী বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃহৎ শক্তিপুঞ্জ বলে প্রকীর্তিত রাষ্ট্র কয়টির অন্তর্বর্তী মতবিরোধ। যে যে বিষয় নিয়ে এই মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে, তার কোনটির সম্বন্ধেই কোন স্থায়ী সমাধানের ইঙ্গিত প্যারী অধিবেশন দিতে পারে নি। বরং এক পক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় ও অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধান যে আরও বেড়ে গেছে প্যারী অধিবেশনের ফলে বিশ্ববাসীদের চোখে সেটা ভালভাবে ধরা পড়েছে। বিশ্বের স্থায়ী শান্তির পক্ষে এটা কি আদৌ আশার কথা? অথচ প্যারী অধিবেশন উপলক্ষে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সদস্য ৫৮টি দেশের প্রতিনিধিমন্ডলীকে বহু অর্থব্যয়ে সমবেত হতে হয়েছিল এবং প্রায় তিনমাসকাল বাকবিতন্ডা ও আলাপ আলোচনায় ব্যয়ও করতে হয়েছে। সে তুলনায় আমরা ফল পেয়েছি কি? প্রত্যক্ষ ফলের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য:— (১) আণবিক শক্তি কমিশনকে নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এক বছরের জন্যে তার আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—অবশ্য এই কার্যক্রমের দ্বারা আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের সমস্যা মিটবে কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়। (২) সামাজিক গোষ্ঠীর ধ্বংসসাধনকে 'জাতিহত্যা' আখ্যা দিয়ে অবৈধ ঘোষিত করা হয়েছে এবং সেই মর্মে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিও রচিত হয়েছে। (৩) মানুষের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে উচ্চাদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয়েছে। এই ঘোষণার ফলে মানবীয় অধিকারের কোন উন্নতি হবে কিনা তা এখনও নিশ্চিত করে বলা শক্ত। (৪) প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে বার্নাদোতের পরিকল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনটি দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সালিশী কমিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই কমিশনের অধিকার ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া হয় নি বলে এ কমিশনের ব্যর্থতার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। (৫) রাশিয়া ও তার সমর্থক রাষ্ট্রপুঞ্জের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও বলকান ও কোরিয়া কমিশনের আয়ু আরও এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। (৬) রাশিয়া ও তার অনুগামী রাষ্ট্র কয়টির বিরোধিতা সত্ত্বেও পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ কর্তৃক উত্থাপিত নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে। (৭) এই অধিবেশনে একটা ভাল ফল এই দেখা গেছে যে, পৃথিবীর ছোট দেশগুলি আর বড় দেশগুলির তাঁবেদারী করে সন্তুষ্ট নয়। তারা চাইছে বেশী পরিমাণে আত্মস্থ হয়ে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটিই যা-কিছু আশার কথা। তা ছাড়া অন্যান্য যে সব প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়েছে, তাদের প্রস্তাবগত মূল্য হয়তো অনেকখানি, কিন্তু তার ফলে মূল বিশ্ব-সমস্যার কোন সমাধান হবে বলে মনে হয় না।

উপরে যে কাজের হিসাব দেওয়া হল তার প্রত্যেকটির মধ্যেই যে কৃতিত্বের পরিচয় আছে এমন নয়। কোন কোনটির মধ্যে অকৃতিত্বের পরিচয়ও আছে যথেষ্ট। যেমন ধরুন প্যালেস্টাইনের সালিশী কমিশনের কথা। এর মধ্যে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার রূপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানকল্পে রচিত কাউন্ট বার্নাদোতের পরিকল্পনার মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকলেও তার মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট পথের ইঙ্গিত ছিল। বর্তমানে সে পরিকল্পনার অকালমৃত্যু ঘটিয়ে যে সালিশী কমিশনের সৃষ্টি করা হল তার আসল রূপ ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পরলোকগত কাউন্ট বার্নাদোতে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত মধ্যস্থই ছিলেন। নিজেদের নিয়োজিত মধ্যস্থ ও সালিশীর সুপারিশ গ্রহণ করে তদনুযায়ী কাজ করার মত ক্ষমতাও যদি সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের না থাকে, তবে সে প্রতিষ্ঠানের নির্দেশের উপর বিশ্ববাসীদের শ্রদ্ধা থাকবে কেন? প্যালেস্টাইন নিয়ে একই দলের অন্তর্ভুক্ত ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে তারই যূপকাষ্ঠে বার্নাদোতে পরিকল্পনাকে বলি দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে আরব ও ইহুদীদের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে যে সালিশী কমিশন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে আদৌ কোন কাজ হবে বলে আশা করা যায় না। একদিকে রুশ স্বার্থবাদ ও অপর দিকে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থবাদ আজ পরস্পর বিবদমান এবং তারই ফলে আজ বিশ্বের কোন সমস্যার স্থায়ী কোন সমাধান হচ্ছে না। বার্লিন নিয়ে এই দুই পক্ষের দীর্ঘস্থায়ী কলহের কথা সুবিদিত। সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান বার্লিন সমস্যা সমাধানের কোন হদিস দিতে পারে নি। নিজেদের স্বার্থের লড়াই-এর মীমাংসা যারা নিজেরা করতে পারে না, তারা অপরের পথ নির্দেশ করবে কোথা থেকে? রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা আছে বলেই দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি-গর্বী শ্বেতাঙ্গরা বারবার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ লঙ্ঘন করার সাহস পায়। ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী ডাচরাও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা কমিটির নির্দেশ অমান্য করে ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিককে গ্রাস করার দুঃসাহস পায়। তাই প্যারী অধিবেশনে কাজ যতটা হয়েছে, তার তুলনায় অনেক বেশী কথার তুবড়ী ছুটতে আমরা দেখেছি। কেবল পরস্পর-বিরোধী দোষারূপ। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা বলছে রাশিয়াই বিশ্ব-শান্তির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে আর সোভিয়েট রাশিয়া বলছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই বিশ্ব-শান্তির বড় প্রতিবন্ধক। এর শেষ কোথায়? এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রাশিয়া বিদেশীদের সঙ্গে বিবাহিত রুশ রমণীদের বিদেশে যেতে দিতে চাইছে না বলে তার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেত অধিবাসীদের প্রতি ম্যালান গবর্নমেণ্টের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মত সময় হয় নি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষে আছে ভোটের জোর আর রাশিয়ার হাতে আছে ভেটোর অস্ত্র। ভেটোর জোরে রাশিয়া পুনরায় সিংহলের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ লাভের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সোভিয়েট রাশিয়া সিংহলের সদস্যপদ লাভের বিরোধী। এর একমাত্র অর্থ হল বৃহৎ শক্তি কয়টির পারস্পরিক ক্ষমতালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেহেতু রুশ সমর্থিত বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশকে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে গ্রহণ করতে নারাজ, সে হেতু রাশিয়াও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ কর্তৃক সমর্থিত ইটালী, সিংহল, আয়ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশকে সদস্যরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত। রাশিয়া চায় সামগ্রিকভাবে আবেদনকারী সব কয়টি দেশের প্রশ্নই এক সঙ্গে বিবেচিত হোক—কোন একটি বিশেষ দেশের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি দেখানোর কোন কারণ আছে বলে সে মনে করে না। রাশিয়ার এ যুক্তির পিছনে জোর আছে বলেই ভারতবর্ষ সিংহলের প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে এই জটিল বিষয়ে ভোট দানে বিরত ছিল।

প্রতিটি সমস্যা আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, ভোট ও ভেটোর এই পারস্পরিক লড়াই-এর ফলেই আজ যত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই জটিলতার অবসান ঘটাতে পারে একটিমাত্র উপায়ে, সে হল বৃহৎ শক্তিকয়টির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা। তা ছাড়া দ্বিতীয় একটি পন্থাও আছে, সে হল ভেটোর অবসান ঘটানো এবং ভোটাধিক্যে সকল প্রস্তাব গ্রহণের রীতি প্রবর্তন করা। কিন্তু তা করতে গেলে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের মূলেই কুঠারাঘাত করতে হবে। যে সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তার আমূল পরিবর্তন ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। বৃহৎ শক্তি কয়টি একমত হয়ে বিশ্ব সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হবে এই উদ্দেশ্যেই একদিন ভেটোর প্রবর্তন হয়েছিল। রাশিয়া জানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে ভোটের জোর তার নেই—তাই ভেটো সে হাতছাড়া করতে রাজী হবে না। ভেটোর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার জন্য পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ যে প্রস্তাব এনেছে সে সম্বন্ধে তীব্র বিরোধিতা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সুতরাং ভেটোকে দূর করতে হলে রাশিয়াকে সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান থেকে দূর করতে হবে। তাতে স্থায়ী বিশ্বশান্তি স্থাপনের পথে বাধা বাড়বে বই কমবে না। সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে ক্রমশ যেরূপ অচল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে চলেছে তাতে একদিন হয়তো পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জ এই উপায়ই গ্রহণ করবে। কিন্তু আজও তারা এই চরমপন্থার জন্যে প্রস্তুত নয়। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় হল পারস্পরিক বোঝাপড়ার চেষ্টা করা। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে সর্ব-সম্মতভাবে মেক্সিকোর যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এভাট ও সেক্রেটারী জেনারেল মঃ ট্রিগভি লি সম্মিলিত-ভাবে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতেও এই পথেরই নির্দেশ ছিল। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। তা নইলে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান নিছক একটি আন্তর্জাতিক বিতর্ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে—তার থাকা না থাকা হয়ে দাঁড়াবে সমান অর্থহীন।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার আকাশে আবার সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। আগামী ২।১ সপ্তাহের মধ্যে যদি আবার ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে ডাচদের "পুলিশী" অভিযান আরম্ভ হয়—তবু বিস্ময়ের কোন কারণ থাকবে না বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। এই শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাতে রিপাব্লিক গভর্নমেণ্ট ইতিমধ্যেই বিশ্বস্বস্তি পরিষদের কাছে আবেদন করেছেন। কিন্তু তাঁদের আবেদন ফলপ্রসূ হবে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা শক্ত। ডাচদের সঙ্গে ইন্দোনেশীয়দের যে আপোষ-আলোচনা চলছিল তা চূড়ান্তভাবে ভেঙে যাওয়াতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ডাচরা তাদের পূর্ব নির্দিষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১লা জানুয়ারীর মধ্যে রিপাব্লিককে বাদ দিয়েই তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে অন্তর্বর্তী ফেডারেল গভর্নমেণ্ট গঠনের চেষ্টা করছে এবং সেই সুযোগে কোন ছল ছুতো ধরে রিপাব্লিককে তারা আক্রমণ করে বসবে এরূপ আশঙ্কা করার কারণ আছে। ইদানীং ডাচরা যেভাবে প্রতি-নিয়ত রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে শান্তিচুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনছে তার আলোকে বিচার করলে এ আশঙ্কাকে আদৌ অমূলক বলে মনে হয় না। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের যে সদিচ্ছা কমিটি দীর্ঘ বৎসরাধিককাল ইন্দোনেশিয়ায় আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টায় রত আছেন তাঁরাও অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সাম্রাজ্যবাদী ডাচরা পুলিশী ব্যবস্থার নামে রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান আরম্ভ করায় ভারত ও অস্ট্রেলিয়া স্বস্তি পরিষদে বিষয়টি উপস্থাপিত করে এবং ১লা আগস্ট স্বস্তি পরিষদ যুদ্ধ বিরতি ও আপোষে বিরোধ নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। তদবধি সদিচ্ছা কমিটির মধ্যস্থতায় আপোষ প্রয়াস চলে আসছে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে রেণভিল চুক্তি নামে একটি শান্তিচুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী কোন রাজ-নৈতিক চুক্তি সম্পাদিত না হওয়ায় এ শান্তি-চুক্তির প্রত্যক্ষ ফল বিশেষ কিছু হয় নি। আপোষ মীমাংসার নামে একাধিক ডাচ প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ায় যাতায়াত করেছেন। কিন্তু ডাচদের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের নীতি পরিবর্তিত না হওয়ায় কোন আপোষ-মীমাংসাই সম্ভব হয় নি। ডাচ পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ স্টিটারের নেতৃত্বে সম্প্রতি যে প্রতিনিধিদল ঘুরে গেলেন তাঁরাও অবস্থার কোন উন্নতি ঘটাতে পারেন নি। ইতিপূর্বে সদিচ্ছা কমিটির তরফ থেকে একাধিক আপোষ-মীমাংসার সূত্র উভয়পক্ষের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছিল; কিন্তু প্রধানত ডাচদের বিরোধিতার ফলেই যে সেসব কার্যকরী হতে পারে নি সে কথা সদিচ্ছা কমিটির সদস্যরাই ঘোষণা করেছেন। ইন্দোনেশীয়রা যে এখনও সম্মানজনক সর্তে আপোষ-প্রয়াসী সেকথা রিপাব্লিকের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ হাত্তা পুনরায় ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ডাচ গভর্নমেণ্ট বলছেন যে ইন্দোনেশীয়রা বিনাসর্তে অন্তর্বর্তী ফেডারেল গভর্নমেণ্টে যোগ দিতে রাজী না হলে তাঁরা নতুন কোন আপোষ আলোচনা করতে নারাজ। কিন্তু স্বাধীনতা-কামী ইন্দোনেশীয়রা নিজেদের রক্তমূল্যে কেনা স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত তাঁবেদার ফেডারেল গভর্নমেণ্টে যোগ দিতে রাজী নয়। অন্তর্বর্তী ফেডারেল গভর্নমেণ্টকে ডাচরা যদি প্রয়োজনানুরূপ স্বাধীনতা না দেয় তবে সে গভর্নমেণ্টে যোগ দিয়ে লাভ কোথায়? ডাচদের আক্রমণাত্মক দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে স্বস্তি পরিষদ যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা না করেন, তবে শীঘ্রই ইন্দোনেশিয়ায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এ বিষয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মনোভাব কি সেটা স্পষ্ট বোঝা গেছে পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিককে সুদৃঢ় প্রাচ্যের অর্থনৈতিক পরিষদের সহযোগী সদস্যরূপে গ্রহণ থেকে। প্রতিবাদে ডাচ প্রতিনিধি অর্থনৈতিক পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেছিলেন। তবু এশিয়ার জাতিপুঞ্জ তাদের অভিমত পরিবর্তন করে নি। ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার যোগসূত্র তো অত্যন্ত গভীর। ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকার্ণো ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভারত ভ্রমণ করতে আসছেন—এ সংবাদ ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে। এ অবস্থায় ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের অপরিসীম পররাজ্যলোলুপতা ও ঔদ্ধত্য যদি পুনরায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বুকে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে তোলার দুঃসাহস দেখায় তবে বিশ্বশান্তির পক্ষে ও সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের মর্যাদার পক্ষে সেটা হবে মারাত্মক। বিশ্বস্বস্তি পরিষদ সে দুর্ঘটনা ঘটতে দেবেন না—এই প্রত্যাশাই করি। ১৯-১২-৪৮

রাষ্ট্রপতিকে জয়পুরে কংগ্রেস সভামণ্ডপে একটি রৌপ্য-নির্মিত রথে বহন করিয়া নিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবস্থাটি নূতন। যাহারা নূতনে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না তাহারা শুনিয়া সুখী হইবেন—রথের-বাহন সেই চিরপুরাতন বলদই থাকিবে।

* * * * *

কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ দর্শনার্থীদের কম্বল নিয়া যাইতে বলিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"ভয়ের কোন কারণ নেই, এই সঙ্গে লোটা নিতে বলা হয় নি"।

* * * *

সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন—"India needs more Doctors"—"তাঁর এই বাণীর সারবত্তা উপলব্ধি করেছেন বিশ্ব-বিদ্যালয়—তাই বুঝি ডক্টরেটের এত ছড়াছড়ি" —মন্তব্য বলা বাহুল্য খুড়োর।

* * * * *

সর্দারজী আরও বলিয়াছেন আমরা নাকি আগ্নেয় গিরির উপর বসিয়া আছি। খুড়ো সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন—

"যাদের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা বা বিবৃতি দেওয়ার অভ্যাস তারা অবহিত হউন।"

* * * * *

শুধু নিলাম জয়পুরগামী স্পেশাল গাড়ী গুলির নামকরণ হইয়াছে নেতাদের নামে—সুতরাং স্থানাভাব হইলেও আনন্দের অভাব হইবে না।

* * * * *

প্রসংগত রেলওয়ের শ্রেণী বিভাগের কথা মনে পড়িল। কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণ যাত্রীরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পাশও হইবে না—তারা সেই "ফেল"।

* * * *

রাজাজী তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে গীতার বাণী স্মরণ করাইয়াছেন—মা-ফলেষু কদাচন। "আমরা মনে রাখব নিশ্চয়ই এবং বলব

এ সব টকো ফল"—খুড়ো ঈসপের গল্প স্মরণ করাইলেন।

* * * *

পাটনা কলেজের ছেলেরা নাকি দাবী জানাইয়াছেন যে টেস্ট পরীক্ষা না দিয়াই তাহাদিগকে ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হউক। কর্তৃপক্ষ এ দাবী না মানায় তারা ধর্মঘট পর্যন্ত করিয়াছেন। আমরা বলি ফাইন্যাল পরীক্ষা না দিয়াও পাশ করাইয়া দিবার দাবী জানাইলে তারা সর্বভারতীয় ছাত্র-দের সহযোগিতা লাভ করিতে পারিতেন।

* * * *

তেজপুর উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় হইতে বাঙলা উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে—"সত্যিকারের আসামী হওয়ায় আর বাধা নেই"—বলিলেন খুড়ো।

* * * *

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা কাবুলকে গোপনে জিন্দাবাদ জানাইতেছি। গোপনে এই কারণে যে যাহারা উর্দু ভাষা নিয়া ভাসিয়াছেন তারা না মনে করেন এটা ইণ্ডিয়া ইউনিয়নের news paper Stunt মাত্র!

শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম বলিয়াছেন—আমরা জগতের দুয়ারে ভিক্ষার্থী যেন না হই। খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু তিনি কি জানেন না যে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।"

* * * *

শ্রীমতী সরোজিনী মেয়েদের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"Achieve beauty of heart"—"কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত রুজ, ক্রীম প্রভৃতি পাওয়া যায় কিনা সে কথা বলে দিলে উপকার হতো"—মন্তব্য করিল শ্যামলাল।

* * * *

শুধু নিলাম বৃটেন এবং উত্তর আয়র্লণ্ডে নাকি চল্লিশ লক্ষাধিক টেলিফোন আছে!—"কিন্তু wrong number-এর সংখ্যাটা আমাদের দেশে নিশ্চয়ই ওদের চেয়ে ঢের বেশী"—বলিলেন খুড়ো!

* * * *

বোম্বাইতে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রসঙ্গে আমাদের জনৈক ক্রিকেট রসিক সহযাত্রী বলিলেন—"ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামকে Batsmens Paradise বলা হয়, কিন্তু ফল হলো "Paradise Lost"—আমরা Garden of Eden-এর ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

* * * *

বড়দিনের সপ্তাহে পরস্পর বিবদমান আরব ও ইহুদীরা বেথলেহেমের পথে কোন গোলমাল করিবেন না বলিয়া কথা দিয়া-

ছেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। "যিশুর ভাগ্য বলতে হবে"—বলিলেন বিশু-খুড়ো।

তমসা

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বেলাবেলি তিন তিনটে বাঁশবাগান একদম পরিষ্কার হইয়া গেল। সর্বসাকুল্যে প্রায় দু হাজার বাঁশের কম হবে না। কঞ্চিগুলো জ্বালানির কাজে লাগবে। খানিকক্ষণ ভেবে নিলেন নীলরতনবাবুঃ পশ্চিম বাঙলায় ইদানীং যেমন কয়লা আর জ্বালানি কষ্ট, তাতে করে বাঁশের ভেলার উপর কঞ্চিগুলো একবার আঁটি বেঁধে কোনভাবে কলকাতার শ্যামবাজারের খাল অবধি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারলে অন্তত আগামী ছয় মাসের জন্য উনুনের ব্যবস্থা যে স্থির রইল, তাতে ভুল নেই। বাঁশগুলো আপাতত কোথাও নিয়ে তোলা যাবে; কলকাতার বাজারে মাটির সেরই চার পয়সা, এক-একখানি বাঁশ সেখানে এক টাকা, দেড় টাকার কম হবে কি? অঙ্কে ভালো মাথা নেই নীলরতনবাবুর, তবু একবার মনে মনে হিসেব করে নিলেন—দু' হাজার বাঁশ পুরোপুরি বিক্রী হলে দু হাজার থেকে তিন হাজার টাকা তো হাতে আসবেই বটে। প্রাণে খানিকটা জল পেলেন নীলরতনবাবু। কলকাতার শহরতলীতে দেখে শুনে ঐ টাকা দিয়ে জমি কিনে ধীরে-সুস্থে বাড়ি করায় নিশ্চয়ই বেগ পেতে হবে না। আপাতত ভাড়া-বাড়িই যথেষ্ট। প্রতিবেশী পঞ্চুকে ইতিপূর্বেই তিনি বলে রেখেছেন বাড়ি ভাড়া করতে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছে পঞ্চু। মনে মনে একবার সাতপুরুষের বিধাতাকে স্মরণ করলেন নীলরতনবাবু।

বৃন্দাবন এসে কখন কাছে দাঁড়িয়েছে, চোখে পড়েনি। বললো, 'আইডিন আছে বাবু, আঙুলটা একবার ব্যাণ্ডেজ করে নিতাম।'

চোখে পড়তেই হঠাৎ আঁৎকে উঠলেন নীলরতনবাবু। বৃন্দাবনের বাঁ-হাতের তর্জনীটা ধারালো দা'তে কেটে গিয়ে প্রায় ঝুলে পড়েছে, রক্ত পড়ছে দরদর করে।

সারা গায়ে একবার কাঁটা দিয়ে উঠলো নীলরতনবাবুরঃ 'এ তুই করেছিস কি পাগলা? আইডিন দিয়ে কি হবে রে, এ যে রীতিমত জখম! যা, যা, শীগ্গির ভবতারণবাবুর ডিস্পেন্সারীতে ছুটে যা। ইস্, এত রক্তও তোর গায়ে ছিল!'

ডান হাতের মুঠোয় একবার বাঁ-হাতের কব্জীটা শক্ত করে ধরে নিল বৃন্দাবন, বললো, 'এ আর কি, এটুকু আমাদের সহ্য করবার অভ্যাস আছে বাবু। রক্ত তো দেখেননি নি, রক্ত ছিল আমার পিতাঠাকুরের গায়ে; শিকারে গিয়ে বাঘে আঁচড়ে দিয়েছিল, দেখেছিলাম রক্ত কাকে বলে!'

কথার শেষে দুই ঠোঁটের মধ্যে একটুকরো হাসি চেপে নিল বৃন্দাবন।

কিন্তু এত কথা শুনবার মতো তখন ধৈর্য নেই নীলরতনবাবুর। চিরদিন অল্পেতেই তিনি বড় বেশি শংকিত হয়ে পড়েন। পূর্ব-বাঙলার এই রাজারহাট থেকে পিতৃপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে যাবার আগে অন্তত তিনি চোখের সামনে বিন্দুমাত্রও রক্তপাত দেখতে চাননি। ওটা অমঙ্গলের সূচনা। চিরকাল ধর্মভীরু মানুষ নীলরতনবাবু। বললেন, 'তা দেখেছিলি দেখেছিলি বেশ করেছিলি, এখন একবার দৌড়ে ঘুরে আয় দিকি ভবতারণ ডাক্তারের কাছ থেকে। হতচ্ছাড়া, বলছিস—সহ্য করতে পারি, এদিকে যে আঙুলের মাথাটি খেয়ে বসে আছিস। নে ধর, এই আধুলিটা সংগে নিয়ে যা।'

বড় একটা আর পুনরুক্তি করলো না বৃন্দাবন, আধুলিটা শুধু ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়লো।

বৃন্দাবন নীলরতনবাবুর পরিবারভুক্ত নয়, ঠিকে ঘরামি। বাগান পরিষ্কার করবার জন্য দশজন ঘরামিকে বেলা হিসেবে ঠিকে নিযুক্ত করেছেন নীলরতনবাবু। দলের সর্দার বৃন্দাবন। স্বয়ং মোড়লের আঙুলহারা—এটা দুশ্চিন্তার কারণ বৈকি নীলরতনবাবুর। নিজের মনেই একবার হাঁক দিলেন তিনিঃ অনাদি।

অনাদি এসে গড়গড়ায় তামাক সেজে দিয়ে নীরবে একবার বাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে গেল। প্রায় সময়ই সে বাবুর সঙ্গে কথা বলতে চায়, কিন্তু সুযোগ খুঁজে পায় না। যখনই কিছু বলবে মনে করে, সামনে এসেই বাবুর মুখের দিকে লক্ষ্য করে নিঃশব্দে আবার পশ্চাদপদ হয়। দিব্যি হাসিখুশি মানুষ ছিলেন বাবু, কাছে ডেকে গল্প করতেন যখন-তখন। আজ সেই হাসিমুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। দু মাসের মধ্যে যেন দশ বছরের বেশি বুড়ো হয়ে পড়েছেন তিনি। তাকাতে গেলে মায়া হয়; অনাদির নিজের কথা তখন কোথায় চাপা পড়ে যায়, নিজেই বুঝে পায় না সে।

সত্যিই বড় বেশী বুড়িয়ে গেছেন বৈ কি ইদানীং নীলরতনবাবু!—পরগণা শহর এই রাজার হাট। পিতৃপুরুষের ভিটে কামড়ে এতদিন দিব্যি নিশ্চিন্তে ছিলেন তিনি। চুলে কেবল পাক ধরেছে, মান্যগণ্যও করেছে তেমনি এতদিন হাটবাজারের লোকেরা। পানওয়ালা থেকে সব্জীওয়ালা পর্যন্ত হেসে 'আসুন বাবু' বলে পণ্য হাতের কাছে এগিয়ে ধরেছে। বিপদে-আপদে-প্রয়োজনে পাড়ার মানুষ এসে নীলরতন বাবুর বাগান থেকে ইচ্ছে মতো বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে। কে ক'টা নিল, তাকিয়েও দেখেননি তিনি কোনোদিন। নির্ঝঞ্ঝাট সংসারে নির্বিরোধে দিব্যি গড়গড়া টেনে কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি এতদিন। কিন্তু রাষ্ট্রবিধাতার হিসেবের খাতায় এসব মানুষদের দিকে তাকিয়ে গোণাগুণতির যোগফল নামে না। দিনকালের আজ পরিবর্তন হয়েছে। দশ আনা ছ-আনা হয়ে গেছে আজ বাঙলা দেশ। রাজারহাটের বুকে আজ পাকিস্থানী অনুশাসন। কম লোক ছিল না এই পরগণাতেই। অনেক সংগতিসম্পন্ন হিন্দু এরই মধ্যে সরে পড়েছে, সরে পড়েছে তারা—যাদের পূর্বতন পুরুষেরা একদিন পাঠানকে ঠেঙিয়েছে, মোঘলকে হটিয়েছে, বৃটিশের বেয়নেটের গুলীর সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে এগিয়ে দিয়েছে। পেয়েছে বৈ কি সেই স্বাধীনতা আজ ভারতবর্ষ! কিন্তু সে ভারতবর্ষ আজকের ভারতবর্ষ নয়। শত শত শহীদের বুকের রক্ত একদিন যে ভারতবর্ষের মাটিকে রাঙা করেছে, সেই মাটি থেকে আজ জন্ম নিয়েছে পাকিস্থান। রাষ্ট্রবিধাতার ন্যায়ের দণ্ড উদ্ধত হয়ে আছে সীমানা-সংস্থাকে লক্ষ্য করে। সেই সীমানার চক্রে পড়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে আজ রাজা-হাটের নরম মাটি। সেই মাটির একটি ক্ষীণতম অঙ্কুর নীলরতনবাবু। তাকিয়ে দেখলেন—একে একে সরে পড়েছে প্রতিবেশীরা। কায়েৎ, বামুন, বদ্যি, বণিকে ঠাসাঠাসি ছিল পাড়াটা, দেখতে দেখতে প্রায় খালি হয়ে উঠেছে। যে যার মতো জমি জায়গা ঘর বাড়ী বিক্রী করে ভারত রাষ্ট্রের প্রজাস্বত্বের সুযোগে বেরিয়ে পড়েছে এখানে সেখানে। বাড়ীগুলোয় ইদানিং মুর্গি চরতে দেখা যায়, দেখা যায় কলহাস্যে মুখর হয়ে উঠতে নতুন বাসিন্দাদের। বুক দুরুদুরু করে ওঠে নীলরতন বাবুর। মনে পড়ে সত্য-প্রসন্ন বাবুর কথাঃ 'যদি বুদ্ধিমান হন, তবে এই বেলা সরে পড়ুন; এরপর, যেমন শুনেছি, মালপত্র নিয়ে নৌকো বা রেল ধরতে পারবেন না। ডোমিনিয়ন-ল, বুঝেছেন মশাই? রাষ্ট্রানুগত্যের কলে পড়ে পাঁজাতুলো হয়ে যাবেন।'

কথাটা কিছুদিন আগেকার মাত্র। তখনও নীলরতন বাবু মনে মনে 'কি করি, কি করি' করছেন। ততক্ষণে আরও দু'চার পাঁচ ঘর নিজেদের পথ দেখেছে। সত্যপ্রসন্ন বাবুরা তো কবেই গিয়ে সেরেছেন। থাকবার মধ্যে থাকলো শুধু পণ্টুরা অর্থাৎ প্রশান্ত মিত্রেরা। সুখে দুঃখে দু'চার কথা তাঁর সংগে হয়। ছেলে পণ্টু এখান থেকে ওখান থেকে এটা ওটা আতঙ্ককর খবর নিয়ে এসে পরিবেশন করে বাবাকে, প্রশান্ত মিত্র তাই দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে আরও অনেকখানি আতংক সৃষ্টি করেন নীলরতন বাবুর। নিজেও যে বড় বেশী ভরসা পান, এমন নয়; এক সময় তাই বাড়ী ঠিক করবার জন্য পণ্টুকে পাঠাবার উদ্যোগ করেন কলকাতায়। উদ্যোগী হয়ে নীলরতন বাবু এসে গাড়ী ভাড়াটা হাতে গুঁজে দেন পণ্টুরঃ 'জানো তো বাবা আমার লোকের অভাব। এতকাল একসংগে পাশাপাশি জীবন কাটালাম, কলকাতায় গিয়েও যাতে একসঙ্গেই বাকী জীবনটা কাটাতে পারি, সেটুকু কোরো।'

একরকম প্রতিশ্রুতিই দিয়ে গেছে পণ্টু, তবে যাবার সময় গাড়ী ভাড়াটা জিভ কেটে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। তা দিক্, ছেলে ভালো পণ্টু।......

দিন কতক কেটে যেতে প্রশান্তবাবুর মুখেই শোনা গেল—বাসা একটা প্রায় ঠিক করে ফেলেছে পণ্টু। এখনও পুরোনো ভাড়াটে আছে। বাড়ীওয়ালা আগাম রসিদ দিয়ে বলেছে—বলেছে—সামনের পয়লা তারিখে বাড়ী খালি করে দেবে। কেলেণ্ডারের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন নীলরতন বাবু—মাঝখানে শুধু একটা সপ্তাহ। বেঁচে থাক পণ্টু, উন্নতি হোক্ পণ্টুর। নতুন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পুরোনো প্রতিবেশীর সংগে চিরকালের আত্মীয়ের মতই গল্প তামাসা করে দিন কাটানো যাবে।

সুবিধে মতো দরে বাড়িটা বিক্রীর জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠলেন নীলরতন বাবু। পিতৃ-পুরুষের ভিটে, মন সায় দিচ্ছিল না, কিন্তু উপায় নেই। এখানকার নতুন সরকার নাকি যখন-তখন যে কোনো বাড়ি রিকুইজিসন করে নিচ্ছেন। শব্দটা নতুন নীলরতন বাবুর কাছে। গোপনে এসে একবার ডিকসেনারীর পাতা উল্টিয়ে নিলেন। বিপদ কম নয়, আজই যদি বাড়ীটা সরকারী দখলে চলে যায়, তবে যে দাঁড়াবার জায়গাটুকুও থাকবে না! বিধাতা হয়ত কৃপা করলেন! কে একজন জহিরুল মুন্সী বাড়িটার দর দিল তিন হাজার। শুনে কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে নিলেন নীলরতন বাবু। এসব অঞ্চলে বালাম চালের দর যখন ছিল তিন টাকা করে মণ, তখনকার দিনেই বাড়িটা করতে নাকি বারো হাজার টাকা খরচ পড়েছিল। বংশের পুরোনো হিসেবাবলীতে দেখেছেন তিনি। আজ চড়তি বাজারে সে বাড়ি এমন তিন হাজারে বিকিয়ে দিতে হবে? দিন দুয়েক সময় নিয়ে চিন্তা করে দেখলেন নীলরতন বাবু। এই দু-দিনের মধ্যে আর বড় একটা কেউ নতুন দর নিয়ে এলো না। বাধ্য হয়ে বিক্রীনামা লিখে দিলেন তিনি জহিরুল মুন্সীকেই; সংক্রান্তির দিনই তিনি বাড়ি খালি করে দিয়ে যাবেন।—এ ছাড়া অন্য পথ ছিল না নীলরতন বাবুর। নানা রকমের সন্ত্রাস চারপাশে। বয়স্কা মেয়ে নিয়ে কেউ আর বড় একটা নিশ্চিন্তে নেই এসব দিকে; উড়ো চিঠি এসে পড়ে বাড়িতে,

অশ্লীল উক্তি এসে কানে বাজে। তা ছাড়া এ ফাণ্ড, ও ফাণ্ড, চাঁদা দাও প্রত্যেক পরিবার থেকে। জোর তলবদারী। ধর্মভীরু পাঁচটি মহের প্রাণ নীলরতন বাবুর, এক একটা ঘটনার কথা শোনেন আর নিজের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ওঠেন।—পিতৃপুরুষের ভিটে, বাড়িটায় প্রায় নোনা ধরবারই উপক্রম হয়েছিল; নিজের সঙ্গতিতে কোনোদিন এতটুকুও সংস্কার করে উঠতে পারেননি তিনি বাড়িটার। এই নিয়ে কতদিন ঝগড়া হয়ে গেছে স্ত্রীর সঙ্গে। বলে বলে নিজেই শেষ পর্যন্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন নয়নতারা। নিজের মধ্যে একটা বড়-রকমের নিশ্বাস চেপে নিয়ে আর একবার হাঁক দেন নীলরতন বাবুঃ 'অনাদি আছিস?'

উৎসর্গীকৃত ছাগশিশুর মতো পুনরায় অনাদি এসে সামনে দাঁড়াল।

চোখ তুলে তাকালেন একবার নীলরতন বাবুঃ 'নিজের কথা কিছু ভেবে দেখলি অনাদি?'

অনাদিও এই কথাই ভাবছিল এতদিন ধরে। নিজের কথাটা কিছুতেই জিজ্ঞেস করে উঠতে পারছিল না বাবুকে। ভেবেছিল—তার আবার চিন্তা কি? বাবু যেখানে যাবেন, তারও সেইখানেই গতি হবে। বললো, 'আজ্ঞে না, ভাবিনি তো কিছু!'

—'এরপর তো আর বাড়ি ঘর দোর বলতে কিছু রইল না, তাই ভাবচি—'

অর্থাৎ এরপর নীলরতন বাবুর জীবনে একেবারেই অনাবশ্যক অনাদি।

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা দেখতে চেষ্টা করলো অনাদি, তারপর কিছুটা ইতস্তত কণ্ঠে বললো, 'আমি সঙ্গে না গেলে নতুন জায়গায় গিয়ে যে কষ্টে পড়বেন বাবু। এইসব লটবহর নিয়ে একা একা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? কুলী ভাড়া দিতে দিতে যে বাড়ি বিক্রীর টাকাটাই নেমে যাবে!'

গড়গড়ার নলটা আর একবার দুপাটি দাঁতের মধ্যে কামড়ে ধরলেন নীলরতন বাবু। মিথ্যে বলেনি অনাদি। নতুন জায়গায় গিয়ে নিজের বিপদটাকে অনাদির মতো এত বেশী করে ভাবতে পারেননি তিনি। অনাদিকে যে প্রতিমুহূর্তের জন্য অপরিহার্য! গড়গড় করে বার কয়েক শব্দ হলো গড়গড়াটায়, গলগল করে কয়েকবার ধোঁয়া ছেড়ে নিলেন নীলরতন বাবু। —যা, হাত চালিয়ে বাঁধাছাঁদাগুলো চটপট সেরে ফেল গিয়ে; এদিকে দিনক্ষণ তো আর বসে নেই।

নিঃশব্দে এক সময় আবার নেপথ্যে গা ঢাকা দিল অনাদি।

দিনক্ষণ যে বসে নেই, সে কথা কর্তার চাইতেও ভালো জানেন নয়নতারা। কদিন ধরেই তাই তিনি বেশ মুখর হয়ে উঠেছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকবার এসে তিনি ঘুরে গেছেন কর্তার সামনে দিয়েঃ 'বলি গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে থাকলেই কাজ হবে নাকি? কিছু না করো ঘরে গিয়ে তো একবার বসে এলেও পারো! প্যাকিং-এ পুঁটলিতে যে পাহাড় গড়ে উঠলো, না কমালে এত জিনিস নেবে, কি করে?'

কাতর চোখ দুটো একবার মিটমিট্ করলো নীলরতনবাবুর। কি বলবেন ঠিক বুঝে উঠলেন না।

গলার স্বর অপেক্ষাকৃত কিছুটা চেপে নিলেন নয়নতারা। 'ছোট হাতবাক্সটা গরম কাপড়ের ট্রাঙ্কে ভরেছি, তাতেও সঙ্গে যাবার মতো ট্রাঙ্ক সাতটা। পুরোনো তালাভাঙ্গা সুটকেশ দুটো কেরোসিনের টিনগুলোর সঙ্গে সকালেই বিক্রী ক'রে দিয়েছি। অদৃষ্ট, নইলে ঐ বিক্রী করে নাকি আবার চারটে টাকা মাত্র হয়। তা যাকগে, এদিকে কাঠের বাক্সও যে ছোটবড়োয় মিলে আটদশটায় দাঁড়ালো! নাই বা হবে কেন, কাচের বয়ম, গ্লাস, খাবার থালা বাসন, পিতলের বাল্তি কলসীগুলো তো আর কোলে কাঁখে ব'য়ে নেওয়া যাবে না! কি করি বলো?'

বড় বড় চোখ দুটো একবার স্বামীর মুখের দিকে তুলে ধরলেন নয়নতারা।

মুখ থেকে একবার নলটা নামিয়ে নিলেন নীলরতনবাবুঃ 'যা ক'রছো তাই করো।'

—'তবে আর চিন্তা ছিল কি!' স্বর তুললেন নয়নতারাঃ 'যাতায়াতের যেমন সব অসুবিধে শুনছি, কিছু যে বলছো না তুমি? এ ছাড়া ক্যাম্প খাট আছে দুখানা, তক্তপোষ আছে এ-ঘর ও-ঘর মিলিয়ে তিনখানা। তপা ব'লছে—আর কিছু যাক্ না যাক্, তার পড়বার চেয়ার-টেব্‌ল্ যেন অবিশ্যিই সঙ্গে যায়, নইলে আর বই খাতা ছুঁয়েও দেখবে না। পারো তো বোঝো গে তোমার মেয়ের সঙ্গে। কেমন ক'রে যে এত সব সঙ্গে যাবে, আমি তো বুঝি না বাপু!'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একবার মাথাটা পরিষ্কার ক'রে নিতে চেষ্টা করলেন নীলরতন-বাবু ঃ 'ক্যাম্প খাট দুটোর চট খুলে নিয়ে পারো তো ট্রাঙ্কেই কোথাও গুঁজে নাও। চেয়ার, টেব্‌ল্ আর খাটগুলোকে শক্ত দড়ি গিঁঠিয়ে বাঁশের ভেলার উপরেই এঁটে দেওয়া যাবে। বেডিং আর ট্রাঙ্কগুলো শুধু সঙ্গে রাখবো।'

শুনে চোখ কপালে তুল্লেন নয়নতারাঃ 'সঙ্গে রাখবো কি ব'লছো? এরই মধ্যে ভুলে ব'সে আছ সব কিছু?'—স্বামীর কানের কাছে একবার মুখখানি এগিয়ে ধরলেন নয়নতারাঃ যাবার পথে শহর হ'য়ে যেতে হবে না? গয়নাগাটিগুলো রয়েছে দিদির কাছে; এরপর তারাও যদি কোথাও চ'লে যায়, তবে যে বিপদে প'ড়তে হবে!'

বিপদেই পড়তে হবে বৈ কি!' নীলরতন-বাবু একবার দৃঢ় দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন স্ত্রীর মুখের দিকে।—শহরে চুরি ডাকাতির ভয় কম; ট্রেজারী আছে, ব্যাঙ্ক আছে, থানা পুলিশ আছে, এই ভরসাতেই নয়নতারা আর তপতীর গয়নাগুলো ইতিপূর্বেই শহরে গিয়ে ভায়রাভাইয়ের জিম্মা ক'রে দিয়ে এসে-ছিলেন নীলরতনবাবু। বড় ভায়রা ঃ ভরসাটাও সেই কারণেই বড় ছিল। নয়নতারা মনে করিয়ে না দিলে গয়নাগুলোর কথা আসলে মনেই প'ড়তো না নীলরতনবাবুর। কতদিকে এক সাথে মন দেওয়া যায়! মাথার আর কিছু রইল না এ ক'দিনে।

সংসারের অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছিল ভাগ্নে বাবাজিঃ শম্ভুপদ। ছেলেটি গোবরামুখো নয়, দিব্যি চট্‌পটে। স্থির ক'রলেন— পানসীতে যাবতীয় মাল নিয়ে রওনা হবে সে; বাঁশের ভেলা নিয়ে যাবে অনাদি। এখানে ওখানে যাতায়াতে অনাদিও কম চট্‌পটে নয়। অতএব তাকে ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে না-থাক্‌বার কিছু নেই। দু'দিন আগে বরং বেরিয়ে প'ড়বেন তিনি স্ত্রী আর মেয়ে তপতীকে নিয়ে। শহরে বড় ভায়রার বাড়ি হ'য়ে ট্রেনেই কলকাতা রওনা হওয়া যাবে। মেয়েমানুষও একেবারে কম বোঝা নয়; মালপত্র সঙ্গে না নিয়েও যাতায়াতের চূড়ান্ত হাঙ্গামা আজকাল। নাভিশ্বাস উপস্থিত হয় ভাবতে গেলে। ভায়রাভাইয়ের ওখানে হ'য়ে ক'লকাতা পৌঁছাতে পৌঁছাতে শম্ভুপদ আর অনাদি গিয়ে শ্যাম-বাজারের পাড়ে নিয়ে মাল তুল্‌তে পারবে।

শুনে উপস্থিত মতো কিছুটা আশ্বস্ত হলেন বটে নয়নতারা, কিন্তু খুব যে একটা মন সরলো, এমন নয়। তিলে তিলে বুক দিয়ে তিনি সমস্ত সংসারটাকে সাজিয়েছেন এতকাল ধরে। আজ অনেক কিছুই তার তচনচ হয়ে গেছে। বাকী সম্বলটুকুকেই শুধু গোছগাছ করে বেঁধেছেঁদে নিয়েছেন তিনি। এ-ও যদি কোনভাবে খোয়া যায়, তবে তার আগে যেন তিনি চক্ষু বোজেন। দেহে প্রাণ থাকতে এত বড় ক্ষতি তিনি সহ্য করে উঠতে পারবেন না। বললেন, 'যে-ই যা কিছু নিয়ে যাও, মঙ্গলমতো পৌঁছালেই হলো। আমার লক্ষ্মীনারায়ণের ফটোখানি যেন শুধু আমার হাতে থাকে।'

শুনে মৃদু হাস্যে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন নীলরতনবাবু।

ইতিমধ্যে ভবতারণবাবুর ডাক্তারখানা থেকে ঘুরে এসেছে বৃন্দাবন। টিংচার বেঞ্জিন আর তুলো দিয়ে শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছেন ডাক্তার ক্ষতস্থানটা। অনেকখানি আরাম বোধ করছে তাতে বৃন্দাবন। বললো, 'ডাক্তারবাবু বড় ভালো লোক, সিকি-আধুলি কিছুই নিলেন না বাবু। তা—ডাক্তারবাবুরা সম্ভবত এখানেই থেকে গেলেন!'

—থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক।' নীলরতনবাবু বললেন, 'ডাক্তাররা চলে গেলে পাকিস্তানে যে মরক লেগে যাবে। ওঁদের গায়ে অন্তত আঁচড় লাগবে না।'

শুনে মুচকে একবার হাসলো বৃন্দাবন : 'আর আমাদের গায়ে?'

উত্তর দেওয়া শক্ত হলো এবারে নীলরতনবাবুর পক্ষে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'অসুবিধে বোধ করলে শেষ পর্যন্ত তোদেরও যেতে হবে।'

কিন্তু কোথায় যেতে হবে, কবে যেতে হবে—বৃন্দাবনের মতো মানুষেরা তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝে ওঠে না। তারা জানে—তারা ঘরামি, গতর খাটিয়ে হাতে কাজ করে—এছাড়া আর তাদের ভিন্ন জগত নেই। নীরবে তাই কিছুক্ষণ বাবুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এবং দলের দশজনের খাটুনির মাথাপিছু হিসেবে টাকা গুণে নিয়ে ধীরে ধীরে এক সময় বাড়ির পথে সরে পড়লো।......

যথাসময়েই তপতী আর নয়নতারাকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়বার উদ্যোগ করলেন নীলরতনবাবু। ইতিমধ্যে দুদিন রাত্রে বাড়িতে ঢিল পড়েছে। এমন ভয়াবহ উপদ্রব মাথায় নিয়ে এইভাবে আর পড়ে থাকা চলে না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে জানালে কোন, কথা কানে তোলে না; এখানকার নতুন হাফেজ সাহেবও তথৈবচ। অতএব—'

রওনা হয়ে পড়বারই উদ্যোগ করলেন নীলরতনবাবু। আর একবার সবকিছু ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন তিনি শম্ভুপদ আর অনাদিকে, গুণে গুণে মালের হিসেব টুকে দিলেন ফর্দতে। প্রশান্ত মিত্রের বাড়িটাও আর একবার ঘুরে এলেন সেই সঙ্গে। শুনলেন—মিত্তির নিজেও দু একদিনের মধ্যেই রওনা হয়ে যাচ্ছেন, মেয়েছেলেদের ইতিমধ্যেই সরিয়ে দিয়েছেন বাড়ি থেকে। পণ্টুর নতুন আর কোন চিঠি পাওয়া যায়নি। আপাতত সে কোনো হোটেলে আছে একটা সীট নিয়ে। অসুবিধে নেই খুঁজে বের করতে; আমহার্স্ট স্ট্রীট আর মির্জাপুর স্ট্রীটের জংশন। অতএব সেদিক থেকে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই বেরোলেন নীলরতনবাবু : পণ্টুর কাছে গিয়ে উঠলেই বাড়ির সমস্যা মিটবে। বড় ভালো ছেলে পণ্টু।

কিন্তু কেন যেন রওনা হবার মুহূর্তে অলক্ষ্যে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো নীলরতনবাবু আর নয়নতারার চোখ বেয়ে। সব বুঝেও নির্বোধের মতো একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে বুকের মধ্যে একটা তপ্ত নিঃশ্বাস চেপে নিলেন নীলরতনবাবু। তাঁর সারা জীবনের সাধনা আর পিতৃপুরুষের সমস্ত কিছু মান, বৈভব, ঐতিহ্য এমন করে আজ পরের হাতে বিকিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে অপরাধীর মতো তাকে পালিয়ে যেতে হচ্ছে এখান থেকে। কাপড়ের খুঁটে একবার চোখ দুটো মুছে নিলেন তিনি। বড় বেশী দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলছেন না তো? কিন্তু জীবনে কতবার কত পরাজয় চেপে রাখা যায় সারা বুকখানিতে? কতখানি সহ্য করতে পারে মানুষ?—ঐ পুকুরঘাট, ঐ শিবের মঠ, ঐ আম-নারকেল আর লিচুবাগান, পাতিনেবুর গাছ দুটোয় এখনও লেবু ধরে আছে দু'চার শো, কলাগাছগুলোয় মোচা দেখা দিয়েছে, সারা বাড়িটা জুড়ে পিতৃ-পুরুষের বুক নিংড়ানো স্নেহ চন্দ্র-কিরণের মতো, এখনও স্নিগ্ধ আবেশে তরঙ্গিত হচ্ছে। এ সব কিছুকে এমন একান্ত করে ছেড়ে আজ কোথায় চলেছেন তিনি? ক'টা দিন কাটবে সেখানে তাঁর এই বাড়ি বিক্রীর তিন হাজার টাকায়?

শহরে এসে উঠলেন তিনি বড় ভায়রা নকুলেশ্বরের বাড়িতে। সাদর অভ্যর্থনা যত্ন করে বসালেন নিয়ে নয়নতারার দিদি চারুপ্রভা। বললেন, 'একেবারে ভিটেয় তবে কপাল ঠুকেই তোরা বেরিয়েছিস?'

—'না বেরিয়ে যে উপায় ছিল না দিদি।' নয়নতারা বললেন, 'ঘরে তো তোমার সোমত্ত মেয়ে নেই, কি করে বুঝবে? তপাকে নিয়ে এতদিন যে কি করে ওখানে ভয়ে ভয়ে শ্বাসবন্ধ হয়ে ছিলাম, বলতেও বুক কেঁপে ওঠে দিদি।'

সে কথার বড় একটা জবাব দিলেন না চারুপ্রভা, বললেন, 'সবই অদৃষ্ট বোন, নইলে দেশই বা ভাগ হবে কেন, আর লোকই বা পালাবে কেন পরিত্রাহি করে?'

নীলরতন বাবু বললেন, 'তা—আপনাদের দেখে যেন একরকম নির্বিকার বলেই বোধ হচ্ছে দিদি, এক পা-ও এখান থেকে নড়বেন না বলেই স্থির করেছেন নাকি?'

কথাটার জবাব দিলেন নকুলেশ্বর।—'স্থির করা ভিন্ন উপায় কি? তুমি পেরেছ, চললে, কিন্তু আমার পক্ষে অসম্ভব। কেবল তো লোক পালানো সুরু; কিছু একটা শেষ না দেখে এক পা-ও নড়ছিনে এখান থেকে। কোথায় যাবো বলো? মার যদি খাই তবে এখানে থাকলেও খাবো, ওদিকে গেলেও খাবো। এদিকে সাপের ভয়, ওদিকে বাঘের ভয়; বাঙালী হয়ে ওদিকে হিন্দু জাতভাইদের কাছে মার না খেয়ে এখানে মুসলমান ভাইদের দু'ঘা লাঠি খাওয়াও ভালো। তবু যে দু'টো দিন বাঁচি, ঘরের খেয়ে আলোবাতাস পেয়েই বাঁচবো।'

বিরাট একটা বক্তৃতার মতো বক্তব্য শেষ করে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালেন নকুলেশ্বর; বললেন, 'যাও, মঙ্গলমতো পৌঁছাওগে, দেখো যদি কোনোরকম সুবিধে হয়! তেমন বুঝলে যেতে শেষ পর্যন্ত আমাদেরও হবে বৈ কি!' —কথাটা একটু টেনে টেনেই বললেন নকুলেশ্বর।

কিন্তু তার মধ্যে একটা বিরাট অর্থ খুঁজে পেলেন নীলরতন বাবু। কথাটা একেবারে মিথ্যে বলেননি নকুলেশ্বর। কোথাও জীবনের কোনো স্থিরতা নেই। ওদিকে ভাষাবিদ্বেষ, এদিকে বর্ণবিদ্বেষ। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে এই বিদ্বেষের বহ্নি-স্রোত। কেউ কোথাও স্থির নয়, কেউ কোথাও নিশ্চিন্ত নয়; চারপাশ থেকে আজ অনবরত গুপ্ত ঘাতকের মতো মৃত্যু উঁকি মারছে, শুষে নিচ্ছে মানুষের প্রাণরস। জীবন সংশয়িত, বিভ্রান্ত, বিস্রস্ত : কতকাল বাঁচবে মানুষ এইভাবে?

গয়নাগুলো সযত্নে এবং সতর্কে শক্ত ফিতের থলেয় কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে একসময় ট্রেনে উঠলেন নীলরতনবাবু।

তপতীর কিন্তু অতশত চিন্তা নেই। জীবনে কোনদিন সে কলকাতা দেখেনি, কলকাতার স্বপ্নে তাই বেশ একটা পরিচ্ছন্ন সুখ বোধ করছিল সে মনে মনে। জিজ্ঞেস করলো, 'কতক্ষণে গিয়ে আমরা পৌঁছাবো বাবা?'

—'কেমন করে বলি?' মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন একবার নীলরতন বাবু : 'যেমন লেট্ করে ছাড়লো গাড়ী, তাতে পৌঁছাবার সময়টাও অনিশ্চিত।'

স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে একবার ফিস্‌ফিস্ করলেন নয়নতারা : 'ভিন্ন জাতের কেউ ওঠেনি তো এ-গাড়ীতে, তবে কিন্তু ছোঁয়া-ছানা লেগে আমার লক্ষ্মীনারায়ণের ছবিখানি একেবারেই অপবিত্র হয়ে যাবে।'

শুনে স্ত্রীকে একবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করলো নীলরতন বাবুর। এত যে মেহনত্ গেল, পারলেন কিছু তার সমাধান করতে লক্ষ্মীনারায়ণ? কিন্তু এত বড় কথাটা মুখে উচ্চারণ করতে পারলেন না তিনি; ধর্মভীরু মানুষ, নিজের মনেই একবার জিভ্ কেটে পরে বললেন, 'চিন্তা কি, তেমন বুঝলে ওখানে গিয়ে গঙ্গাজলেও শুদ্ধ করে নিতে পারবে।'

ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্—

অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছিল ট্রেন। তার সঙ্গে অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছিল নীলরতন বাবুর মন। ছুটে চলেছিল এই পার্থিব সীমারেখাকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় কোনো এক স্বপ্নরাজ্যে। সেটা স্বপ্ন কি দুঃস্বপ্ন বলা কঠিন।

হঠাৎ মাঝপথে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। সামনেই কি একটা জংশন স্টেশন। প্লাটফর্মের ওদিক থেকে কেমন একটা শব্দ আসছে : বহুকণ্ঠের কলধ্বনি। সেদিকে একবার কান খাড়া করলেন নীলরতন বাবু। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। ধুক্‌ধুক্ করে উঠলো একবার বুকখানি। পূর্ববাঙলা আর পশ্চিমবাঙলার সীমারেখা টেনেছে রাণাঘাট। কিন্তু রাণাঘাট আসতে এখনও অনেক দেরী। বিপদ কিছু

ঘটবে না তা এইখানেই ঃ একটা বড় রকমের ডাকাতি, একটা বড় রকমের আর কিছু?

দরজার সামনে এসে একবার দাঁড়ালেন নীলরতন বাবু। শুনলেন—কাল ভোর বেলার আগে গাড়ী এখান থেকে নড়বে না। দেখলেন ইঞ্জিনটা ইতিমধ্যেই গাড়ী থেকে খসে 'ব্যাক' করে আসচে পাশ দিয়ে। গাড়ীতে উঠবার আগে যা আশঙ্কা করেছিলেন তিনি, ঠিক তাই হলো।

উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে তাকালেন একবার নয়নতারা ঃ 'ওগো, কিছু বিপদ নেই তো?'

এবারে যথার্থই ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো নীলরতন বাবুর; চোখ দুটোকে একবার বড় করতে চেষ্টা করলেন তিনি ঃ 'অতো জেনে তোমার কী দরকার? বরং ঘুমুতে চেষ্টা করো দুজনে।'

—'কেন, তুমি বুঝি পাহারা দেবে? খবে বীর পুরুষ যা হোক্।' আশঙ্কিত বিপদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন একটু কুরো ঠাট্টার সুর তুলে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন একবার নয়নতারা। কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না। ধূ ধূ অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তর, মাঝে মাঝে শুধু দু'একটা জোনাকি জ্বলছে, শিয়াল ডাকচে দূরে বনের অন্তরাল থেকে।

সারারাত লক্ষ্মীনারায়ণকে বুকে চেপে পড়ে রইলেন নয়নতারা।

গাড়িটা সম্ভবত সেই কারণেই পরদিন সকাল আটটায় বেশ নির্বিঘ্নেই ছাড়লো। স্বামীর কানের কাছে আর একবার মুখ নিয়ে বারকয়েক ফিসফিস করলেন নয়নতারা। —'রাত্রে অত যে চটেছিলে, বলি আমার লক্ষ্মীনারায়ণ করুণা না করলে কি এই বিপদ থেকে এতটুকুও রেহাই পেতে? সব ব্যাপারেই চোখ গরম করলে কাজ হয় না।'

না হলেই ভালো। নির্বিবাদে চুপ করে গিয়ে পকেট থেকে শুধু একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে নিয়ে একটু মোড় ঘুরে বসলেন নীলরতনবাবু।

শিয়ালদায় এসে গাড়ি পৌঁছাতে বেলা পড়ে গেল। সঙ্গে মালপত্রের লটঘটি নেই। অতএব পঞ্চুর ওখানে গিয়ে সোজা না উঠে আগে শ্যামবাজার পৌঁছা আবশ্যক। আড়াই বেলার বেশি লাগবার কথা নয় শম্ভুপদ আর অনাদির এসে পৌঁছাতে। নীলরতনবাবুদেরই বরং এসে পৌঁছাতে দেরি হয়ে পড়েছে। পথ-ঘাট জানা নেই কিছু শম্ভুপদ আর অনাদির, অতএব তীর্থের কাকের মতো নিশ্চয়ই তারা এতক্ষণ মালপত্র আগলে অধীর অপেক্ষায় বসে আছে খালের ধারে। মাঝি ব্যাটা হয়ত ক্রমশঃই ঘণ্টাপিছু দর চড়াচ্ছে আর দাঁত খিঁচোচ্ছে শম্ভুপদকে লক্ষ্য করে।

সামনেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে উঠে পড়লেন নীলরতনবাবু। —'সোজা চলো শ্যামবাজার, টালা ব্রিজ।'

মিটার উঠছে একে একেঃ এক টাকা থেকে আড়াই টাকা, আড়াই টাকা থেকে চার টাকা চোদ্দ আনা।

সত্যিই তীর্থের কাকের মতো বসে আছে শম্ভুপদ আর অনাদি। মুখ দেখলে কে বলবে গুরুদশাগ্রস্ত নয়! কাছে আসতেই প্রায় এক-সঙ্গে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠলো দুজনে। শম্ভুপদ বললো, 'সব লুট হ'য়ে গেছে, সব পথে ক্ষুইয়ে এসেছি মামাবাবু।'

অনাদি ততক্ষণে রীতিমত কেঁদে ফেলেছে।

ব্যাপারটা ঠিক হঠাৎই কিছু অনুমান ক'রে উঠতে পারলেন না নীলরতন বাবু। ব'ল্লেন, 'কি ক্ষুইয়ে এসেছিস? নৌকো কোথায়, বাঁশ কোথায়?'

অনাদি এবারে রীতিমত বাবুর পা জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে উঠলোঃ 'সেই কথাই তো ব'লছি বাবু, বিশ্বাস করুন আমাদের। খেজুরতলীর বিল ছাড়িয়ে আসতেই গুণ্ডা-ডাকাতের নৌকো এসে পিছনে লাগলো। পাশাপাশি আসছিলাম। শম্ভুবাবু তার পানসীতেই ছিলেন, আমি মাঝির সঙ্গে লগি চালাচ্ছিলাম ভেলায় ব'সে। ডাকাতেরা দু'দলে ভাগ হ'য়ে এসে আক্রমণ করলো আমাদের। জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবে এই নৌকো আর বাঁশ?' ব'ল্লাম, 'হিন্দুস্থানে।' তারা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'এখান থেকে কোনো মাল যে কোথাও চালান দিতে দেওয়া হয় না, জানিস?' বললাম, 'এমন কথা তো শুনিনি।' অমনি একটা জবরদস্ত আওয়াজ উঠলো—'শুনিস নি কি রে শালা শয়তান?' সেই আওয়াজ শুনেই তখন আমাদের হ'য়ে গেছে। জবাব দিতে পারলুম না। চেয়ে দেখলাম—ততক্ষণে শম্ভুবাবুর পানসী থেকে সমস্ত মাল তাঁদের নিজেদের নৌকায় তুলছে গুণ্ডারা। মাঝি মুসলমান ছিল ব'লেই সম্ভবতঃ রক্ষা। সমস্ত মাল তুলে নিয়ে আমাকে আদেশ ক'রলো পানসীতে উঠতে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে তাই উঠলাম। বোধ করি গুণ্ডাদের সর্দারই হবে, মাঝিকে হাঁক দিয়ে ব'ললো, 'সামনেই ডাঙ্গা পেয়ে শোয়ারী নামিয়ে নৌকো নিয়ে ফিরবে, নইলে বিপদ আছে মিয়া।' বাঁশ আর মালপত্র নিয়ে ভেগে প'ড়লো গুণ্ডারা। মাঝিরও সম্ভবতঃ বিপদের আশঙ্কাই ছিল; সামনেই এক যায়গায় আমাদের নামিয়ে দিল, ব'ললো, 'প্রাণে বেঁচেছেন, এই যথেষ্ট; থানা-পুলিশ ক'রতে যাবেন না, তাতে শুধু হাসাহাসিই হবে। পারেন তো কোনো কৈবর্ত-কেরায়া নিয়ে গন্তব্যস্থানে চ'লে যান।' নতুন এক মাল্লাই ক'রে তাই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। আর কি ক'রবো বাবু, বলুন?'

শম্ভুপদ শুধু বলির পাঁঠার মতো কাতর-দৃষ্টিতে এক একবার মামাবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর নিঃশ্বাস চেপে নিচ্ছে।

কিন্তু তার আগেই মূর্চ্ছা গেছেন নয়ন-তারা।

বিন্দুমাত্রও বাকস্ফূর্তি হ'লো না নীল-রতন বাবুর। ইচ্ছে হ'লো—তিনিও একবার মাটিতে শুয়ে প'ড়ে প্রাণ ভ'রে কেঁদে নেন, কিন্তু পারলেন না। কতক্ষণ যে একই অবস্থায় অভিভূতের মতো তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, বলা শক্ত। পরে ব'ল্লেন, 'তোরা তো প্রাণে বাঁচ্লি! তোর মামিমাকে তুলতে চেষ্টা কর্, শম্ভু।'

তপতী কোনো কথাতেই বড় একটা কান দেয়নি এতক্ষণ। বেশ লাগছিল তার ক'লকাতার রাজপথের এই একাংশ। মোড় ঘুরে ট্রাম আসছে যাচ্ছেঃ গ্যালিফ স্ট্রীট্ আর হাওড়া স্টেশন। হুন্ হুন্ ক'রে বাস আসচে, লরী আসচে, মিছিলের পর মিছিল চ'লেছে মোটর ট্যাক্সির, আর জনারণ্যপথে কলগুঞ্জরিত জীবনস্রোত। একেবারেই নতুন পরিবেশ। কোথাও এতটুকু মিল নেই তাদের রাজারহাটের সাথে। বিমোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তপতী।—মায়ের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি প'ড়তেই কেমন যেন একবার ছাঁৎ ক'রে উঠলো বুকখানি।

কিন্তু ততক্ষণে আবার চোখ মেলেছেন নয়নতারা।। মুখে চোখে অনবরত কয়েকবার জলের ছিটে দিয়ে দিয়েছে শম্ভুপদঃ 'ওঠো মামিমা, উঠে বসো।'—কেঁপে কেঁপে শব্দ-গুলো ধ্বনিত হ'লো শম্ভুপদ'র কণ্ঠে।......

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছিল পিচের রাস্তায়। আজ আর সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা বুঝবার জো নেই এখানে। ক'লকাতা আজ জনসমুদ্রে প্লাবিত, মুখরিত, মূর্চ্ছিত। গ্যাস্ আর ইলেকট্রিকের বাতি জ্বলছে পথে পথে; চ'লেছে মোটর, রিক্স, ট্রাম, বাস। দূরে কলের চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছেঃ কালো ধোঁয়া। ঐ কালি যেন রাত্রিকে অন্ধকারে ঢেলে দিয়েছে রাজপথের এই কালো পিচের বুকে। অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, তমসার তম-প্লাবন ব'য়ে চ'লেছে চারপাশে। সেই অন্ধকারের বিষাক্ত দাঁতে দংশিত হ'য়েছেন নীলরতন বাবু অনেক আগেই।—বহুক্ষণ পর আর-একবার স্বর তুললেন তিনিঃ 'আমাকে একটু ধর্ তো অনাদি। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দুটো যেন কেমন অবশ ক'রে নিচ্ছে।'

দু' পা এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল অনাদি। বাবুর জন্য প্রাণ কাঁদে তার, কঁকিয়ে ওঠে প্রাণ-পুরুষ। কিন্তু প্রকাশ ক'রতে পারে না সেটুকু অনাদি, মনে মনে করাঘাত করে নিজের ললাটে।......

আমহার্স্ট স্ট্রীট্ আর মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়টা জানা ছিল নীলরতন বাবুর। ইতি-পূর্বে কয়েকবার এসে ক'লকাতায় ঘুরে গেছেন তিনি।—জীবনের সব কিছুই তো

একরকম ধুয়ে মুছে গেল, শেষ সম্বল এখন শুধু পঞ্চু। ক্ষুধায় পেট দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে, আগুনের হল্‌কার মতো জ্বলছে ব্রহ্মতালুটা। কাল সমস্ত রাতটা কেটেছে আতঙ্কে আর অনিদ্রায়, কেটেছে আজ সমস্ত দিনটাও; স্নান নেই, খাওয়া নেই। জীবনে এমন কষ্টে কোনোদিন প'ড়তে হয়নি তাঁদের। ক্রমশঃ রাত্রি গাঢ় হ'য়ে উঠ্‌চে।—নিশ্চয়ই বাসা ঠিক ক'রে রেখেছে পঞ্চু। নতুন যায়গায় একসঙ্গে আবার তাঁরা পুরোনো আত্মীয়তায় মিলে মিশে থাক্‌বেন, এইটুকুই তো সর্বশেষ সুখ তাঁর জীবনে। পঞ্চুর উন্নতি হোক্, মঙ্গল করুন তার ভগবান।—নিজের মধ্যে কিছুটা আলোড়িত হ'য়ে উঠলেন নীলরতন বাবু।

• •

সম্ভবত সাপ্তাহিক ফিস্টের ব্যবস্থাতেই তখন সরগরম হয়ে উঠেছিল হোটেলটা। সিটগুলো আজকাল পুরোমাত্রায় ভ'রে উঠে উপচে পড়েছে। মেম্বরদের চাইতে গেস্ট হয়েছে বেশি; ঘরের মেঝে আর ছাদে পর্যন্ত ঠাঁই নেই কোথাও। ম্যানেজার বিপ্রদাস দত্তের তাই নিয়ে ইদানীং মাথা কিছুটা গরম থাকে।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নীলরতনবাবুর। কিন্তু বিপ্রদাস দত্তের দৃষ্টি আরও শ্যেন, আরও প্রখর। মুহূর্তের মধ্যে চোখ দুটো তার চলন্ত সাইকেলের চাকার মতো ঘুরে এলো নয়ন-তারা, শম্ভুপদ, তপতী আর অনাদির মুখের উপর দিয়ে। করজোড়ে হাত দুখানি কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'মাপ করতে হবে, নিজের হোটেলে নিজেরই আজ আমার একটা সীট নেই'। দয়া করে অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।'

এজাতীয় অনুমানের উপরেই আজকাল প্রথম দৃষ্টির প্রথম পাঠ সেরে নেয় বিপ্রদাস দত্ত। কিছু অন্যায় নয় তার পক্ষে ভাবা। অনবরত লোকের পর লোক এসে সীট আর ফ্যামিলি রুমের জন্য বিরত করে তাকে।

হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীলরতনবাবু বললেন, 'সীটের জন্য আসিনি, দয়া করে একবার পঞ্চানন মিত্রের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন, তাহলেই হবে।'

ঠোঁটের উপর বারকয়েক দক্ষিণ হাতের তর্জনীটা মৃদুভাবে ঠুকে নিয়ে স্বগতোক্তি করলো একবার বিপ্রদাস দত্তঃ 'পঞ্চানন—দোতলার ১১ নম্বর রুমের পঞ্চানন মিত্র!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজারহাট ইউনিয়নের পঞ্চানন মিত্র।'

—'শুভ গড্। সে তো আজ সকালেই সীট ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জ না ওদিকে কোথায় তার নতুন বাসায় চলে গেল।'

বোঁ করে একবার বিঘূর্ণিত হলো নীলরতনবাবুর ব্রহ্মতালুটা। —'বালিগঞ্জ, নতুন বাসা, পঞ্চু তবে আগে থেকেই চলে গেল?'

স্বগতভাবে কথাগুলো একবার উচ্চারণ করলেন নীলরতনবাবু। থেমে বললেন, 'কোন্ রাস্তার কত নম্বর বাড়ি কিছু জানেন না আপনি?'

—'তবেই হয়েছে।' বিপ্রদাস দত্ত বললো, 'দুদিনের পঞ্চানন, তার কোষ্ঠি-ঠিকুজি নিয়ে বসি আর কি! দশ বছর, পনেরো বছর ধরে যারা এখানে আছে, তাদেরই মশাই ভালো করে নাম জানি না, কেউ খ্যাদাবাবু, কেউ নাকুবাবু, বাকী আছে এখন পঞ্চানন মিত্র।' —কথাগুলো কতকটা অনুনাসিক সুরেই বললো বিপ্রদাস দত্ত।

পিছনে দাঁড়িয়ে অনবরত চোখের জল গোপন করে নিচ্ছেন তখন নয়নতারা।

নীলরতনবাবু নিজেকে অনেকখানি চেপে যেতে চেষ্টা করলেন নিজের মধ্যে, কিন্তু পারলেন না। আচমকা একটা শব্দ উচ্চারিত হলো তাঁর কণ্ঠেঃ তাহলে আমাদের উপায়!'

—'উপায় একমাত্র পাইস হোটেল। একটু সামনেই কলেজ স্কোয়ারের দিকে পাবেন।'

বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা করলো না বিপ্রদাস দত্ত। ফিস্টের ব্যাপার নিয়ে দোতলা আর তিনতলায় বিরাটভাবে জমে উঠেছে বোর্ডাররা। ফ্যামিলী রুমগুলো সম্বন্ধে মাঝে মাঝে অসম্বৃতভাবে ইঙ্গিত-আলোচনা চলেছে তাদের মধ্যে। সপ্তাহের এই দিনটা হোটেলের 'ডিসিপ্লিন' আর 'মেনু' নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকতে হয় ম্যানেজার বিপ্রদাস দত্তকে। বাজে সময় ব্যয় করবার অবকাশ কোথায় তার? আবার দুখানি যুক্ত কর কপালের দিকে উঠে গেলঃ 'আচ্ছা নমস্কার।' গটগট করে সিঁড়ি ভেঙে নিমেষের মধ্যে উপর তলার দিকে উঠে গেল বিপ্রদাস দত্ত।

বজ্রাহত বনস্পতির মতো এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নীলরতনবাবু। আগাগোড়া সর্বকিছু সহ্য করে এসেছেন তিনি, সমস্ত দুঃখ অবসাদকে চেপে রেখেছেন বুকের মধ্যে। কিন্তু আর বড় বেশিক্ষণ সামলাতে পারলেন না নিজেকে। বনবন করে ঘুরছিল অনবরত ব্রহ্মতালুটা, শিথিল হয়ে আসছিল হাঁটু দুটো। টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি সিঁড়ির উপর।

চেঁচিয়ে উঠতে গেল একবার অনাদিঃ 'বাবু, বাবু!'

—'নারে, না, কিছু হয়নি।' অস্ফুটে কাতরোক্তি করলেন মাত্র একবার নীলরতনবাবু। —'সিঁড়ির লাইটটা সম্ভবত উপর থেকে ম্যানেজার নিভিয়ে দিয়ে থাকবে; কেমন যেন অন্ধকারে হঠাৎ চোখ দুটো বুজে আসছিল। নে ধর, মাথাটা একটু তুলে ধর, উঠি।'

লাইট যেমন ছিল, তেমনিই জ্বলছিল।

দুহাতে বাবুর মাথাটা একবার তুলে ধরবার চেষ্টা করলো অনাদি। দেখলো—সিঁড়ির কোণায় লেগে মাথার একটা পাশ কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরে পড়ছে বাবুর।

কারু মুখে এতটুকুও কথা নেই। অনেক কথা বলেছে তারা সারা জীবনে, আজ কণ্ঠে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে......স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই। আলোগুলো আজ বীভৎস ছায়ামূর্তির মতো গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে সবাইকে। তার মুখের কালো গহ্বরের সামনে লক্ষ্য খাদ্যের মতো অপেক্ষা করে আছে বিরাট জীবনের একটা ভগ্ন অংশঃ নয়নতারা, তপতী, শম্ভুপদ, অনাদি আর নীলরতনবাবু।

বাংলা সাহিত্যের নরনারী
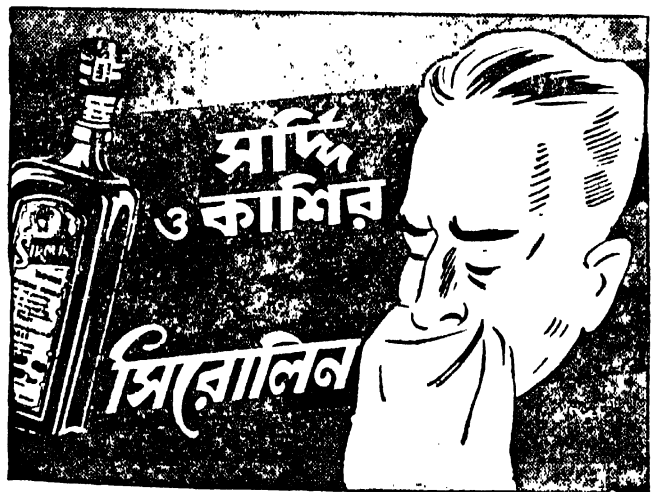
প্র.না.বি.....

ভবতারণ পিশাচখণ্ডী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেনের মেয়ে উপন্যাস একাধারে কাহিনী এবং হাজার বছরের পুরানো বাঙলা দেশের সামাজিক ইতিহাস। প্রাচীনকালের বাঙালীর কথাই এই কাহিনীটির উপজীব্য। কিন্তু কেবল বাঙলা দেশের চিত্রই ইহাতে আছে মনে করা ঠিক হইবে না। কাহিনীর স্রোত তৎকালীন বাঙালীর জীবনকে উপছাইয়া ভারতবর্ষের বৃহত্তর ক্ষেত্রে গিয়া পড়িয়াছে। পাঠক কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে শুরু করিলে বঙ্গাধিপতির দূত ভবতারণ পিশাচখণ্ডীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কনৌজ নগর পর্যন্ত গিয়া পেঁৗছিবেন। কাহিনীর এই অংশ আবার একাধারে ভূগোল ও ইতিহাস। কালিদাস একবার বর্ষার মেঘের সংক্রমণ পথ কোন উপলক্ষে সমকালীন ভারতভূখণ্ডকে জরীপ করিবার সুযোগ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাহিনীর সূত্রটাকে বাঙলা দেশের জীবনযাত্রার বাহিরে টানিয়া লইয়া তৎকালীন বৃহত্তর জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়াছেন। কাহিনীর দাবী যেমনি হোক না যদি ভারতবর্ষকে ভাল না বাসিতেন তাঁহারা এমন করিতেন না। দেশ-প্রীতি গভীরতর মর্মে মজ্জাগত না হইলে দেশের কথা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

বঙ্গাধিপতির রাজদূতটির নাম ভবতারণ পিশাচখণ্ডী। পিশাচখণ্ড গ্রামে তাঁহার বাড়ী, তাই পিশাচখণ্ডী। কাহিনীর পূর্বার্ধে তিনি মস্করী নামে পরিচিত। মস্করী কিনা তিনি বাড়ীতে বাড়ীতে আমোদ প্রমোদ, নাচ গান ও ছবি দেখাইয়া ফিরিতেন ইহা তাঁহার জাতব্যবসায় নহে, নিতান্তই ব্যক্তিগত গুণ।

বিহারী দত্ত সাতগাঁয়ের বেনে সমাজের শ্রেষ্ঠ। মায়া তাহার একমাত্র সন্তান। সে শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের পত্নী। সম্প্রতি সে বিধবা হইয়াছে। সে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল, দুইকুলেরই বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী। তাহাকে বৌদ্ধ মঠে লইয়া ভিক্ষুণী করিতে পারিলে তাহার বিপুল সম্পত্তির মালিক বৌদ্ধ মঠ হইতে পারিবে। এই আশাতে বৌদ্ধরা মেয়েটিকে হরণ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দেশের রাজা বৌদ্ধ, কাজেই বেনেরা প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারে না। এক সময়ে মায়াকে হরণের ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল—তখন মস্করী কৌশল করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। তার পরে হিন্দু ও বৌদ্ধে লড়াই বাধিয়া গেল। বৌদ্ধরা পরাজিত হইল, সাতগাঁর বৌদ্ধরাজা রূপা রাজা নিহত হইল, বাঙলা দেশে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন মস্করী মায়াকে পিতৃহস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার উপরে সকলেই খুশী, রাজা এবং বেনে সম্প্রদায়। যুদ্ধে যাহারা হিন্দুদের সাহায্য করিয়াছিল তাহারা যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি দাবী পিশাচখণ্ডীর, কারণ তিনি বেনের মেয়েকে রক্ষা না করিলে এত যুদ্ধ বিবাদ সবই ব্যর্থ হইত। সব কাজ শেষ হইয়া গেলে মহারাজাধিরাজ মস্করীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি চাও?

মস্করী বলিলেন, মহারাজ নিজের জন্য আমি কিছুই চাই না। তিনি বলিলেন মহারাজ আমার আবেদন এই যে, প্রাচীনকালে বিক্রমাদিত্য, হর্ষ প্রভৃতি চক্রবর্তী রাজগণ যেমন সভা করিয়া ভারতখণ্ডের সকল গুণী জ্ঞানীকে আহ্বান করিতেন, তাঁহাদের গুণপনা বিচার করিয়া যথোচিত পুরস্কার করিতেন, আপনি তেমনি করুন। পিশাচখণ্ডী বলিলেন—ইহাই আমার আবেদন। রাজা বলিলেন, সে তো একদিনের কাজ নয়। আয়োজনের জন্য অন্তত এক বৎসর সময় লাগিবে। রাজাদেশে স্থির হইল যে, আগামী বৎসরের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে সাতগাঁয়ে সেই সভা বসিবে। রাজাদেশে, আরও স্থির হইল যে, পিশাচখণ্ডী স্বয়ং রাজদূতরূপে ভারতবর্ষের গুণী সমাজকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইলেন। নিমন্ত্রণে হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আচারী অনাচারী কোন প্রভেদই থাকিবে না। পিশাচখণ্ডী যাইবেন, তাঁহার সহিত যথাপ্রয়োজন লোক লস্কর থাকিবে। পিশাচখণ্ডী এখন রাজদূত, তাঁহার চিন্তা কি?

২

সাতগাঁয়ের কাজকর্ম শেষ করিয়া পিশাচখণ্ডী নিমন্ত্রণে বাহির হইলেন। পুস্তকের ষোড়শ ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ভারত ভ্রমণের বিবরণ। প্রথমে বিহার, পরে বর্তমান যুক্তপ্রদেশ, কাশী, কনৌজ, মায় বৃন্দাবন মথুরা। তৎকালীন বিহার বৌদ্ধ গৌরবের ধ্বংসাবশেষ; কাশী, কনৌজ হিন্দু যুগের গৌরবে উজ্জ্বল। বেনের মেয়ে উপন্যাস বাঙলার বৌদ্ধ যুগের অবসান এবং হিন্দু যুগের পুনরুত্থানের কাহিনী। পিশাচখণ্ডীর নিমন্ত্রণের পর্যক্রমাসূচীতেও কৌশলে যেন তাহারই আভাস। কাহিনী যেমন বৌদ্ধ যুগ অতিক্রম করিয়া হিন্দু যুগে প্রবেশ করিয়াছে, পিশাচখণ্ডী মহাশয়ও তেমনি বৌদ্ধ বিহার লঙ্ঘন করিয়া কনৌজের হিন্দু রাজ্যে পেঁৗছিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদ দুটিতে প্রাচীন ভারতের যে রসোজ্জ্বল চিত্র আছে, ভারত সন্ধানী ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা পাঠ্য। সামান্য প্রবন্ধে তাহার কতটুকু পরিচয় আর দিতে পারিব।

পিশাচখণ্ডী প্রথমে মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে পেঁৗছিলেন। সেখানকার কাজ সারিয়া তাঁহার নৌকা গঙ্গা বাহিয়া আবার পশ্চিম মুখে চলিল। এখন যেখানে বক্তিয়ারপুর, সেখানে তিনি নামিলেন। নৌকার মাঝিদিগকে পাটনায় গিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। লেখক বর্ণনা করিতেছেন—"এখানটাই মগধের প্রধান জায়গা, বড় বড় মাঠ, বড় বড় গ্রাম, বড় বড় গো-চর, প্রচুর ফসল হয়, প্রচুর দই দুধ পাওয়া যায়, প্রচুর চিঁড়া, প্রচুর মুড়কি, প্রচুর মিষ্টান্ন, প্রচুর খোয়া ক্ষীর, প্রচুর খাজা।" মস্করী সন্ধ্যার পরে কোন গোয়ালে আশ্রয় লইয়া রাঁধিয়া খান, সঙ্গীরা বাজারের মিষ্টান্ন খাইয়া ফলাহার করিয়া রাত কাটায়। মগধের যে-দৃশ্য মস্করী দেখিয়াছিলেন, আজও সেই দৃশ্য পথিকের চোখে পড়িবে। শ্রমণ গৌতম যখন মগধে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনিও এই দৃশ্য দেখিয়াছেন। আবার তারও অনেক আগে ভীমার্জুনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ যখন জরাসন্ধের রাজধানীতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিশ্চয়ই এই একই দৃশ্য দেখিয়া থাকিবেন। মানুষ বদলায়, প্রকৃতি বড় একঘেঁয়ে।

একদিন তাঁহারা দূর হইতে মগধের রাজধানী ওদন্তপুরীর অত্যুচ্চ ফটক দেখিতে পাইলেন। ওদন্তপুরীর রাজসভা বঙ্গাধিপতির দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইল, বঙ্গাধিপতির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। মগধেশ্বর সখেদে জানাইলেন যে, এক সময়ে মগধে গুণিজনের অন্ত ছিল না, কিন্তু তাহার সে গৌরবের দিন আর নাই। তিনি বলিলেন—"শ্রীশ্রীশ্রীনগর পাটলিপুত্র এখন প্রায় গঙ্গার গর্ভে। আমরা একরূপে মগধের শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছি বলিলেই হয়।"

তারপরে মস্করী ওদন্তপুরীর বিহারে গিয়া দেখিলেন যে, দুই তলায় দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুক থাকিবার স্থান। আর দেখিলেন বিহারের অমেয় ঐশ্বর্য। এই সময়ের প্রায় দুইশত বৎসর পরে মহম্মদীয়া বক্তিয়ার এই বিহার লুঠ করিয়া সত্তরটি অশ্বতরযোগে সোনা রূপা হীরার স্তূপ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ওদন্তপুরী হইতে পিশাচখণ্ডী নালন্দায় আসিয়া পেঁৗছিলেন। "নালন্দায় একটি বড় রাস্তা আছে। রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত। উহার একধারে বড় বড় বিহার, একটার পরে একটা, তারপরে একটা, দুই-তিন

মাইল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আর একধারে কেবল স্তূপ, বড়টা ২০০।২৫০ ফুট উঁচা, আর মাঝারি ছোট যে কত আছে, তার ঠিকানা নাই। ......রাস্তার ধারে যে সকল বিহার ছিল, তাহার ঠিক মাঝখানে বালাদিত্য বিহার, চারতলা উঁচা। এখনকার লাটসাহেবের বাড়িতে যেমন বাহির দিয়া প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি দুতলা পর্যন্ত উঠিয়াছে, তাহারও ঐরূপ এক সিঁড়ি একেবারে রাস্তা হইতে দুতলা পর্যন্ত গিয়াছে। ......সিঁড়ির সামনে দুতলায় যেখানে খোলা চাতাল আছে, তাহার উপরে তেতলা ও চৌতলায় অধ্যক্ষের থাকিবার স্থান।"

নালন্দা হইতে পিশাচখণ্ডী রাজগৃহে পৌঁছিলেন। চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে সমতল জমি—ইহাই ছিল জরাসন্ধের রাজধানী। নালন্দা হইতে যে 'সেথো' সঙ্গে আসিয়াছিল, সে তাঁহাকে বুদ্ধদেবের প্রিয় ভূমি গৃধ্রকূট দেখাইল, নূতন রাজগৃহ শহর দেখাইল, 'গিরি-এক' নামে হাজার ফুট উঁচা এক পাহাড় দেখাইল। গৃধ্রকূটে তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং 'গিরি-একে' জৈন সন্ন্যাসী দেখিলেন, সকলেই ধ্যানমগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

এখান হইতে গয়া, গয়া হইতে বোধ-গয়া। বোধ-গয়ার মন্দির, শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক ছেদিত অশ্বত্থ গাছ, গাছটা চারশো বছরে আবার প্রকাণ্ড হইয়া উঠিয়া মন্দিরটাকে শিকড়ের প্রয়াসে কাটাইয়া দিয়াছে মস্করী সবই দেখিলেন। তিনি নারদের নিমন্ত্রণে বাহির হইয়াছেন। যেখানে গুণী লোক দেখেন, তাঁহাকেই বঙ্গাধিপতির নিমন্ত্রণ জানান। বোধগয়ায় মস্করী 'দুই-তিনজন নেপালী, দুই-তিনজন ভুটিয়া ও দুই-তিনজন সিংহলীকে সভায় যাইবার জন্য জেদ করিয়া গেলেন........ সেখানে আরও দেশ-বিদেশের পণ্ডিত পাওয়া গেল। দুইজন পারসী বৌদ্ধেরও নিমন্ত্রণ হইল। নীলা নদীর উত্তরে দুইজন রোম দেশের লোকেরও নিমন্ত্রণ হইল।"

তারপরে পাটনা। পাটলিপুত্র এখন প্রায় জনশূন্য। জল, আগুন আর ঝগড়ায় পাটলিপুত্র কতবার ধ্বংস হইয়াছে, আবার উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার আর এক প্রবল শত্রু ছিল ভূমিকম্প। সাড়ে তিনশত বৎসর আগে এক মহা-ভূমিকম্পে সমস্ত নগর বসিয়া যায়। এখনো সেই শ্রীহীন অবস্থা। মগধের লোকেরা পাটলিপুত্রকে বলিত 'নগর'। ইদানীং ভাঙা নগরকে শ্রীনগর বলিত। পিশাচখণ্ডী ঘুরিয়া পাটলিপুত্রের বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিলেন।

ক্রমে মস্করী কাশীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। "কাশী এ সময়ে ছোট ছোট দুটি নগর। একটি মৃগদাব আর একটি অবিমুক্ত ক্ষেত্র। দুজায়গায়ই লোকজন অনেক, এক জায়গায় হিন্দু আর এক জায়গায় বৌদ্ধ।" হিন্দুকাশী জ্ঞানবাপী জলাশয়ের চারদিকে, মাঝখানে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দির। বৌদ্ধ কাশী বা মৃগদাব একদিকে দুইটি স্তূপ। দুটিই প্রকাণ্ড। একটির এখন চিহ্নমাত্র নাই। সে সময়ে ইহা ১৬০ ফুট উচ্চ ছিল। মৃগদাব ও অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাঝখানে রাজবাড়ি। রাজা কান্যকুব্জ-রাজের সামন্ত। মস্করী উভয় স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে বঙ্গেশ্বরের নিমন্ত্রণ জানাইলেন। বেদান্তী চিৎসুখাচার্য এবং উদয়নাচার্য বাঙলা দেশে যাইতে স্বীকার করিলেন।

কাশীর কাজ শেষ হইলে মস্করীর নৌকা কনোজ যাত্রা করিল। মাঝপথে ত্রিবেণীতে তিনি তীর্থস্থান সারিয়া লইলেন। অবশেষে তাঁহার নৌকা কনোজের ঘাটে লাগিল। এত বড় শহর মস্করী ইতিপূর্বে দেখেন নাই। শহরটি তিন ক্রোশ দীর্ঘ, গঙ্গার ধারে, প্রস্থেও প্রায় তিন ক্রোশ। কনোজ একাধারে রাজধানী, বন্দর, ব্যবসায়ের স্থান, বিদ্যার স্থান এবং সেনা নিবাস।

কনোজে উপস্থিত হইয়া মস্করী সকলের মুখেই এক কথা শুনিতে পাইলেন যে, মুসলমান আসিতেছে। তিনি দেখিলেন সকলেই যুদ্ধ সজ্জায় ব্যস্ত। তিনি শুনিলেন যে, রাণী একজোড়া বালা মাত্র রাখিয়া সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছেন, রাজা এক বছরের রাজস্ব দিয়াছেন, ব্যবসায়ীরা ছয় মাসের মুনাফা দিয়াছে—যুদ্ধের খরচ বাবদ। রাশি রাশি উপকরণ ছালা-বন্দী হইতে তিনি দেখিলেন। মাঝখানে পাঞ্জাব, পাঞ্জাব ধ্বংস হইলেই মুসলমান কনোজে আসিয়া পড়িবে, এমন সোনার কনোজ ধ্বংস হইয়া যাইবে। সহজেই বুঝিতে পারা যায়—এমন অবস্থায় মস্করীর রাজসভার আমন্ত্রণে কেহ উৎসাহ প্রকাশ করিল না। তিনি মথুরা বৃন্দাবন দেখিয়া দেশে ফিরিলেন। ভাবিলেন, রাজসভার অধিবেশন শেষ হইলেই বাঙলা দেশকেও মাতাইতে হইবে, নিজেও যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া তিনি স্থির করিলেন। ইহাই ভবতারণ পিশাচখণ্ডীর ভারত ভ্রমণ।

৩

কালিদাসের যক্ষ বার্তা প্রেরণের ভার মেঘের উপরে না দিয়া পিশাচখণ্ডীর হাতে অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারিত। পিশাচখণ্ডী অলকায় গিয়া যক্ষপত্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া স্বামীর বার্তা পৌঁছাইয়া দিত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বেনের মেয়ে উপন্যাসে অনেকগুলি নরনারী আছে—পাঠক যাহাদের ভালবাসিতে বাধ্য হইবে—তাহাদের মধ্যে পিশাচখণ্ডী গ্রামনিবাসী ভবতারণ শর্মা সকলের শ্রেষ্ঠ। এমন নির্লোভ, পরার্থপর, স্বদেশবৎসল ব্যক্তি বাঙলা সাহিত্যে বিরল, কেবল মৃণালিনী উপন্যাসের হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্যের সহিত ইঁহার তুলনা হয়। কিন্তু এক হিসাবে মাধবাচার্যের উপরে মস্করীর জিৎ। মাধবাচার্য বড় বেশি গুরু, একেবারে গুরুতর; মস্করী সামাজিক লোক, দশজনের একজন। প্রয়োজন হইলে নাচ-গানের দ্বারা লোকের চিত্ত-বিনোদন করিয়া তিনি স্বকার্য উদ্ধার করিতে পারেন—অথচ অন্তরটি আশ্বিনের আকাশের মত নির্মল এবং সুদূরপরাহত। বিহারী দত্তর মেয়ের রক্ষাকর্তা হিসাবে ইচ্ছা করিলেই তিনি প্রচুর পারিতোষিক পাইতে পারিতেন। সেদিকে তাঁহার মন গেল না। বঙ্গেশ্বরের প্রভাব বিস্তার হইবে, আশায় তিনি রাজসভার অধিবেশনের দাবী করিয়া বসিলেন এবং নিমন্ত্রণের ভার মাথায় তুলিয়া লইলেন। ঘরের খাইয়া যাঁহারা বনের মহিষ তাড়ায়, পিশাচখণ্ডী সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোক। *

---

*হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত 'বেনের মেয়ে' উপন্যাস।

অনুবাদ সাহিত্য

মুখরক্ষা
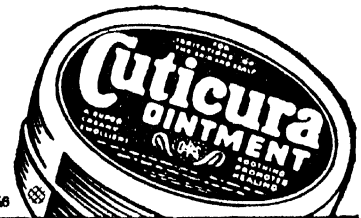
'রবার্ট স্ট্যানেডিস্'

উলিংয়ে কিয়াংসু-চৌকিয়াং-ইয়াংৎসে ব্যাঙ্কের অফিসে আল্‌টিমাম্ ফায়ার-প্রুফ-আর্মারপ্লেটেড-ভল্টের নবতম মডেলের যে সিন্দুকটি বসানো হয় তাতে পাশ্চাত্য কেরামতী ও কারিগরীর জানাশুনো সব রকম উপায়ই খাটানো ছিলো। সম্পত্তি রক্ষার একেবারে চরম ব্যবস্থা। সিন্দুকটি বসাবার ঠিক তিনদিন পরই একটা আন্তঃপ্রাদেশিক লড়াই বেধে যায়—প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে যে ধরণের লড়াই ইয়াংৎসী উপত্যকার নীচের। দিকটাকে প্রায়ই বিধ্বস্ত করে যাচ্ছিল এও সেই রকমই। সিন্দুকটি কমপক্ষে যাতে একেবারে তিরিশ দিন আর খোলা না যায় সময়-যন্ত্রটা সেইমত বেঁধে দেবার পনেরো মিনিট পরই একদল ডাকাত, প্রান্তীয় বাহিনীরই নামান্তর, ব্যাঙ্কের বাড়িটা দখল করে আস্তানা গেড়ে বসে যায়।

ওদের তাড়াতে প্রায় দিন এগারো পার হয়ে যায়। সঙ্গে প্রচুর বিস্ফোরক গেলিগনাইট থাকায় এই কদিনের মধ্যে ওরা ব্যাঙ্কের বাড়িটা, পাশের বাড়িগুলো, ওপারের তিনটি বাড়ি এবং প্রায় দুশো বর্গগজ কংক্রীট মেজে নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গ এবং উলিংয়ের অধিবাসীরা পরম উল্লাস ও বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলে যে সিন্দুকটা সব আক্রমণই প্রতিরোধ করে গিয়েছে এবং ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা অফিস পুনর্দখল করার সময়ে ওটাকে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থাতেই পায়।

এই ব্যাপারে 'আল্‌টিমাম্ প্রডাক্টসের সাংহাইস্থ এজেণ্ট মেসার্স কিন্‌কারডিন এ্যাণ্ড গ্যালাগারের খুব খাতির বেড়ে গেলো। শুধু তাই নয়, ডাকাতদের তাড়াবার দিন থেকে সময়-যন্ত্রের নির্দেশে সিন্দুক উন্মুক্ত হওয়া পর্যন্ত, মাঝেকার এই উনিশ দিনে ওরা শহরের বিভিন্ন ফার্ম থেকে প্রচুর অর্ডারও পেয়ে গেলো।

সময়-যন্ত্র বেঁধে দেবার ত্রিংশতম দিবসে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টররা খুব ধুমধামের সঙ্গে সিন্দুক খুলতে দেখা গেলো যে, তার মধ্যে একমাত্র ক্ষতি হচ্ছে ডিরেক্টরদের ব্যক্তিগত সুরা ভাণ্ডারটির চুরমার হয়ে যাওয়া।

তারপর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেলো। ঠিক যে কি হয়েছিলো, আর কেই বা করেছিলো আজও কেউ জানে না; হঠাৎ যন্ত্রের ঝমঝমানি, একটা পাতলা ইস্পাতের গ্রীলের ঘটাং শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের দরজাটা তার পাল্লায় সরে গিয়ে একটা যেন শ্বাস ফেললে। মারাত্মক তেমন কিছু হয়তো ওটা হতো না, যদি না ব্যাপারটা ঘটার সময় ব্যাঙ্কের দুজন ডিরেক্টর আর পয়লা নম্বর একাউণ্টেণ্ট ভদ্দরলোক সিন্দুকের ভেতরে থেকে না যেতো। তার ওপর আবার, ঐ তিনজনেরই প্রত্যেকের পকেটে ছিল এক একটা চাবি, যার কোনটিকে বাদ দিয়ে বাইরেকার তালা খোলার কারুরই আর কোন উপায় ছিলো না। সিন্দুকের মধ্যে একেবারে তিরিশ-তিরিশটা দিন বন্ধ হয়ে থাকা বড় দীর্ঘ সময়.........

সাংহাইয়ে কিন্‌কারডিন এ্যাণ্ড গ্যালাগারের কাছে ত্বরান্বিত টেলিগ্রামটি এই অস্বস্তিকর উত্তর নিয়ে এলো: "আমাদের এখানে কোন মিস্ত্রী নেই—সিন্দুক খোলায় সক্ষম নির্মাতাদের নিকটতম প্রতিনিধি কলিকাতায় হেড অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ইংলণ্ড থেকে সাইবেরিয়া ঘুরিয়ে লোক আনা-ই বোধ হয় তাড়াতাড়ি হবে —নির্মাতারা সাহায্য করতে পারবে কি না জানবার জন্যে ইংলণ্ডে এখুনই তার পাঠাচ্ছি —কোন বিস্ফোরক ব্যবহার না করে নির্মাতাদের নির্দেশ-পুস্তিকার ৮২ পাতার উপদেশ মতো বায়ু নিষ্কাষণ পদ্ধতি অনুসরণ করুন এবং সর্বোপরি 'জল-নিকাশ ব্যাপারটায় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করবেন।" এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিমান-ডাক তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে।

শিকাগো ল-স্কুলের গ্রাজুয়েট, এটর্ণী মিঃ জেমস্ মালরুণী সাংহাইয়ে ক্লাবে বসে সান্ধ্য পত্রিকা মারফৎ এই ঘটনার বিবরণটি পাঠ করলে। একেবারে যেন ভাগ্যেরই নিয়ন্ত্রণে তখন ঠিক তাঁর উল্টো দিকেই বসেছিলো মিঃ রবার্ট ম্যাক্‌কেক্‌নী, কিয়াংসু-চৌকিয়াং-ইয়াংৎসী ব্যাঙ্কের সিনিয়র ডিরেক্টর। "দেখ, ম্যাক্‌কেক্‌নী", ধীরভাবে বললে মালরুনী, "উলিংয়ের এই ব্যাপারটায় আমি বোধ হয় সাহায্য করতে পারি।"

"তার মানে?" বিরক্তিসূচক উত্তর এলো, "সিন্দুকের বিষয় তুমি কি জানো?"

"না, আমি অবশ্য কিছুই জানি না," বললে মালরুণী, "তবে আমার এক মক্কেল আছে, সে জানে। আচ্ছা দাঁড়াও একটুখানি বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।"

পনেরো মিনিট পরেই, আসামী পক্ষের কৌসুলীর সুযোগ নিয়ে, সিন্ধুক ভাঙ্গার অভিযুক্ত টম ফ্যাট নামক এক আসামী, যার নিজেরই কৌসুলীর মতে সাতটা বছর জেল নির্ঘাৎ তারই সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আদায় করে মালরুনী তার টি-মডেল ফোর্ড-খানায় ঝড়ঝড় করতে করতে সাংহাইয়ের ম্যানিসিপ্যাল জেলে হাজির হলো। খুব সংক্ষেপে মালরুনী টমকে উলিং নাটকের মূল বৃত্তান্তটা জানিয়ে দিলে। তারপর প্রশ্ন করলে "এখন বল দিকিনি, কি করতে পারো?"

"সে ঠিক করে দেবো আমি," টম জানালে বেশ দর্পভরেই, "হাঁ, নিশ্চয়ই ঠিক হবে।"

"আচ্ছা, বেশ তাহ'লে! আমি একটা সর্ত ঠিক করে কাল দুপুরের মধ্যে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবো। ঘুণাক্ষরে কেউ যেন না জানে।"

বিজয়গর্বে মালরুনী ক্লাবে মিঃ ম্যাক্‌কেক্‌নীর কাছে ফিরে এলো। তারপর মহাজন-প্রবরের পাশটিতে বসে চুপি চুপি কথাটা পাড়লে।

"দেখ ম্যাক্‌কেক্‌নী, আমি তোমার লোককে সিন্দুক থেকে বের করে দিতে পারি, অবশ্য তুমি যদি সাহায্য করো। মানে, আমার এক মক্কেল বিচারাধীন অবস্থায় জেলে আছে, মিছিমিছি তাকে হেনরীক্ এ্যাণ্ড উইণ্টার-বটম্‌সের গুদামে সিন্দুক ভেঙ্গেছে বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। হেনরীক এ্যাণ্ড উইণ্টারবটম্‌স্ তোমারই ব্যাঙ্কের খদ্দের, বোধহয় ধারেও তোমার কাছে অনেক টাকা। ওদের একটা মোচড় দিয়ে রাজী করিয়ে নাও যাতে কাল সকালে মামলা উঠলে ওদের সাক্ষীদের—স্মৃতি বিভ্রম হয়। আমার মক্কেল যদি ছাড়া পায় তো আমি তোমায় গ্যারাণ্টি দিচ্ছি যে ও এখেনে আসার পর বারো ঘণ্টার মধ্যে তোমার উলিংয়ের লোকেরা সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসবেই। ওর ফি পাঁচ হাজার, অবশ্য তার অর্ধেক নেবো আমি ওকে ঝামেলা থেকে বাঁচাবার জন্যে। কি বলো?"

"বলবো!" ম্যাক্‌কেক্‌নী চটে গিয়ে বললে, "এমন জঘন্য প্রস্তাব কখনো আমি শুনিনি, ন্যায্য বিচারকে ফাঁকি দেবার একটা ষড়যন্ত্র, বৈতো নয়! আমার চেয়ে সেকথা তোমারই জানা উচিত। ওরকম সব উপায়ের সঙ্গে আমি কোন যোগ রাখতে চাই না।"

"বেশ," মালরনী নিরুপায় ভঙ্গীতে বললে, "ওরা তোমারই বন্ধু, আমার তো নয়! আজ থেকে তিনচারদিনেই ক্ষিদে তেষ্টায় ওরা শুকোতে থাকবে।"

"ড্যাম ইট্" ম্যাক্‌কেক্‌নী বললে, "তিনজন লোকের প্রাণ নিয়ে তোমার অমনধারা দরাদরি করা উচিত নয়!"

"দরাদরি আমি করিনি। দরাদরি করছো তো তুমি। আমি তো তোমায় সিধে বলছি, একেবারে সরল ভাষায় যে, আমার নির্দোষ মক্কেল কি সর্তে সাহাজ্য করতে রাজী। সাহায্য না চাও তো আলাদা কথা, তবে সর্ত ঐ।"

নির্দোষিতা সাব্যস্ত করে এবং মর্যাদা কায়েম রেখে টম ফ্যাট্ পরদিন সকালে আদালত থেকে বেরিয়ে আসতেই মালরনী ওকে সঙ্গে নিয়ে সোজা স্টেশনে গিয়ে উলিংয়ের ট্রেনে চেপে বসলো। মালরনীর বুক পকেটে কিয়াংসু-চিকিয়াং-ইয়াংৎসে ব্যাঙ্কের সই করা চুক্তি যাতে, সিন্দুক খুলতে পারলে খরচ খরচা বাদে টম ফ্যাটের পাঁচ হাজার পাবার সর্তটা লেখা ছিল। ট্রেনে ঠিক ওদের পরের কামরাতেই আশা-নিরাশা আর অস্বস্তির মাঝে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছে মিঃ কিনকারডিন, কিনকারডিন এ্যান্ড গ্যালাগারের বড়কর্তা, উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছিলো শেষ পর্যন্ত কি হবে!

মধ্যাহ্নভোজের সময় ডাইনিংকারে মালরনীকে বললে সে, কি নিয়ে পড়েছো আমার মনে হয়, তুমি বুঝতে পারছ না। ওটা পুরণো আমলের পেটা লোহার সিন্দুক নয় যে জানালা থেকে পাথরের মেঝেতে আছড়ে ফেলে ভাঙ্গা যাবে। বিজ্ঞান আর শিল্পের চরম সৃষ্টি ওটা। জেনো যে ওর ইস্পাতের দেওয়াল ৬ ইঞ্চি গোলাকেও আটকাতে পারে। আর সময় যন্ত্রটা...

"তাতে তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই, কিন্‌কারডিন। ভেবে দেখো, তোমার কম্পানির ইজ্জৎ কতখানি বেড়ে যাবে যদি, বুঝলে, যদি আমার মক্কেল সিন্দুক খোলায় ব্যর্থ হয়। আরে, তখন তো উত্তর চীনের বড় বড় সব শেঠ্‌রাই একটা করে তোমার সিন্দুক নেবে।"

"আমি ভাবছি সিন্দুকে আবদ্ধ সেই বেচারাদের কথা, "কিন্‌কারডিন বললে করুণা প্রকাশ করে ।

"তারপর," মালরনী প্রক্ষেপটা অগ্রাহ্য করে স্বরটা নামিয়ে বললে, "আবার আমার মক্কেল সাফল্যলাভ করলে, তোমার কোম্পানীর ইজ্জৎটা কতখানি চলে যাবে বলতো! সেদিকটা ভেবেছো একবারও?"

কিন্‌কারডিন তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা এছাড়া আর কিছুই ভাবেনি, কিন্তু মনটা খুব নরম বলে চিন্তাটা জোর করে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিলো।

মালরনী বলে চললো, "এটা তোমাকে মানতেই হবে যে, আমার মক্কেল সাফল্যলাভ করলে এবং সাফল্য জাহির করে বেড়ালে সেটা তোমার পক্ষে খুবই বিশ্রী ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। টম ফ্যাটের মতো সরল লোকেরা তো তাদের কীর্তির ঢাক বাজাতেই ভালোবাসে। মানুষের স্বভাবই হলো তাই, নয় কী? সত্যি বলতে কী, তোমাদের মতো উঠতী একটা ব্যবসার ক্ষতি হবে ভাবতেও মন খারাপ হয়ে যায়, তবে তুমি ব্যবসাদার লোক, সহজেই বুঝবে যে, আমার কর্তব্য আমার মক্কেলের দিকে। নীতির অনুজ্ঞা হচ্ছে, এছাড়া আর কোনদিক আমার ভাবা উচিত নয়।"

"নীতি না ছাই!" কিন্‌কারডিন খেঁকিয়ে উঠলো, "শুধু চোট দেওয়ারই মতলব," সোজা কথায় বলো দিকিনি কতো চাই তোমার?"

"তা-ই যখন ধরে নিয়েছো, তাহলে বলি—আমার মক্কেল যখন সিন্ধুক খুলবে—ও তা খুলবেই জেনো, তখন শুধু তুমি আর আমি থাকবো। তারপর, দরজাটা খোলা হলে এবং আবদ্ধ লোকেরা বেরিয়ে এলেই আমি ততক্ষণে বোধহয় আমার মক্কেলকে সরিয়ে দিতে পারবো। জানই তো, ভারী লাজুক লোক! তখন, ইংলন্ড থেকে, তারে গোপন উপদেশ পেয়ে লোক-গুলিকে উদ্ধার করতে পারার একটা গল্প বানিয়ে নেওয়া তোমার পক্ষে শক্ত হওয়া উচিত নয়। এই মধুরেণ সমাপয়েৎ ব্যবস্থাটি করার জন্যে আমার ফি মাত্র প'চিশ হাজার—অন্যায় বলিনি আমি।"

"কিন্তু আমি যে, শেষ অবধি কথা রাখবো কি করে বুঝলে, "কিন্‌কারডিন ধীরভাবে বললে, "বুঝতেই পারছো, কোনরকম লেখা-পড়ার মধ্যে আমি যাবো না।"

"আরে ভাই," মালরনী কপট হাসলে, "ভদ্দরলোকের কথাই হচ্ছে চুক্তি—এটাও তো তাই, কি বলো?—তা সে যদি খেলাপ করোই তাহলে আমারও ব্যক্তিগত তুষ্টি হবে শুধু এই চেষ্টা করা যাতে চীনের আর কোথাও তুমি একটিও সিন্দুক না বেচতে পারো। আমার মক্কেলকে তোমার বর্তমান খদ্দেরদের সবায়ের কাছে ঘুরিয়ে আনবো, তাদের আমি হাতেনাতে দেখিয়ে দেবো সিন্দুকগুলো কতো সহজেই খোলা যায় আর তারা কেমন বেশ ভালোভাবেই প্রতারিত হয়েছে।"

উলিং স্টেশনে ট্রেন প্রবেশ করতে কিন্‌-কারডিন শেষে অসহায়ের মতো সায় দিলে।

উৎকণ্ঠিত ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের কাছে প্রতি-পন্ন হলো যে, কিন্‌কারডিন তার বন্ধু মালরনী এবং দরকারি যন্ত্রপাতি সমেত এক চীনে চাকরকে নিয়ে আবদ্ধ ব্যবসাদারদের উদ্ধার করতে এসেছে।

"নীচের তলা ফাঁকা করে দাও।" কিন্‌-কারডিন হুকুম করলে মালরনীর ইঙ্গিতে।

"ওপরেও, দয়া ক'রে, গোলমাল যেন না হয়। কিছু দরকার হলে আমরা ডাকবো'খন। কিছুই এখন বলতে পারছি না, তবে চেষ্টার ত্রুটি করবো না, হয়তো অনেকটা সময়ও লাগবে।"

মালরনী আর টম ফ্যাটের সঙ্গে একা পড়ে কিন্‌কারডিন একবার ফাঁকা দৃষ্টিতে সিন্দুকের ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের দিকে চাইলে, নির্মাতাদের কাছ থেকে পাওয়া সচিত্র ক্যাটা-লগের বাইরে ওর কলকব্জা সম্বন্ধে আর কিছুই জানে না সে। আশাহত হয়ে তখন টমকে বললে, "নাও যন্ত্র বের ক'রে এবারে কাজে লেগে যাও।"

"যন্তর আমার ঠিক আছে।" বলেই টম পকেট থেকে এক গোছা বাঁকা বাঁকা তার বের করলে।

"সে কি।" কিন্‌কারডিনের মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে এলো, "ওকী এটাকে চীনের ক্যানেস্তারা ভেবেছে নাকি?"

"একটা ধোঁয়া দিন দিকি।" জামাটা খুলে সিন্দুকের দরজার কাছে একটা টুল নিয়ে গিয়ে টম ফ্যাট বসলে। স্থিরভাবে বসে ও কাজে লেগে গেলো।

ধীরভাবে ধোঁয়া টানতে টানতে টম ফ্যাট মাঝের তিনটে চাবির গর্তে তারগুলো নিয়ে খুটখাট করতে লাগলো। মিনিট পাঁচেক পরে মাথা নেড়ে দন্তবিকাশ করলে, তারপর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বাঁহাতের চাবিরগর্ত নিয়ে পড়লো। আরও একটা সিগারেটের পর আবার বিজয়ী দন্তবিকাশ। তৃতীয় এবং ডান-হাতের চাবির গর্তটা একটু কড়া এবং পনেরো মিনিট পার হতে ইস্পাতের একটা হাতল ঘুরিয়ে সিন্দুকের বাইরের দরজাটা খুলতেই প্রকাশিত হলো তালার জোড় আর প্রিসিসন যন্ত্রের মত তিনটে সাদাসিদে গোছের ডায়াল।

"এইবারেই গন্ডগোলের শুরু।" কিন্‌কার-ডিন সন্দিগ্ধভাবে বলে উঠলো।

"গোলমাল করবেন না!" সিন্দুক থেকে যতদূর সম্ভব দূরে এক কোণে টম ফ্যাট ওদের দুজনকে হাঁকিয়ে দিলে।

"কোন কথা নয়, দেশলায়ের খস্ শব্দটিও নয়, নড়াচড়া পর্যন্ত নয়, তাহলে আর আমার দ্বারা হবে না," যাবতীয় শব্দ দাবিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় টুলের নীচে ওর গাউনটাকে চেপে ডায়ালের ধারে বসে টম ফ্যাট জানিয়ে দিলে ওদের। তিন কি চার মিনিট খুটখাট্ করার পর টম ফ্যাট মেঝে পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো কিন্‌-কারডিন আর মালরনী নিঃশব্দে যেখানে খোয়াড় ভোগ করছিলো। "বড় জোরে নিঃশ্বেস নিচ্ছো তোমরা, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না; নাও, এইভাবে থাকো দিকিনি।" বলেই টম ফ্যাট তার সার্টটা দিয়ে মুখটা ঢেকে দেখিয়ে দিলে। ওরাও জ্যাকেট দিয়ে ঐভাবে নিজেদের মাথা মুখ ঢেকে নেবার পর টম ফ্যাট আবার

গিয়ে কাজে বসলো। বাঁকানটা ইস্পাতের দরজায় চেপে ডায়ালগুলো নিয়ে এমনি আলতোভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগলো যে, ভেবে দেখলে যদিও ওর পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার প্রতি-পন্ন হয়, তবুও মনে হলো যেন সব রকম সংযোগেরই ও চেষ্টা করছে।

ওখানে যাওয়া থেকে সাত ঘণ্টা যাবৎ সেই সিন্দুক-বিশারদ চৌনের ন্যুব্জ দেহটা সিন্দুকের দরজায় যেনো সেঁটে রইলো। ওর তখনকার সেই চেহারাটা একটা প্রতীকের কথা মনে করিয়ে দিতে লাগলোঃ দুঃস্থ প্রাচ্যের ধৈর্য সমগ্র পাশ্চাত্যের নির্দয় কারিগরীর ওপর আছাড় খেয়ে পড়েছে।

দেখা গেলো টম ফ্যাট যত বড়ো না তস্কর তার চেয়ে বড়ো আক্কেলবাজ। তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সমস্যার সামনে আজ সে পড়েছে আর তার সমাধানে ও তার যাবতীয় চাতুরী প্রয়োগ করে যাচ্ছে। নেচীগুলো ঘাটে ঘাটে পড়ার মৃদু আওয়াজগুলো ও উৎকর্ণ হয়ে শুনে যাচ্ছে। চাবি-প্রবণ মনটা সে দৌলত বাঁচাবার জন্যে এই দানবীয় যন্ত্রটার যারা উদ্ভব, দশহাজার মাইল দূরের সেইসব অজ্ঞাত কারীগরদের মনের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। তাকে ওদের মতই করে যেতে হবে, যে চাতুরীর ওস্তাদ তারই হবার কথা তার জন্যে নির্মাতা-দের উদ্দেশে মনে মনে তারিফ জানিয়ে টম ফ্যাট তার মনোমুকুরাধারে জটিল কলকব্জা-গুলো ছকে নিলে, তারপর যখন সন্তুষ্ট হলো যে তার কল্পিত চাবির নকলটি মানুষের প্রতিভার একেবারে চরম হতে পেরেছে তখন সে খাটাতে আরম্ভ করলে তার নিজের প্রতিপাদ্য।

সপ্তম ঘণ্টার পর টম ফ্যাটের চোখ বিজয়-গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, কিন্তু প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় কয়েক পা এগিয়ে আসতেই তার চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে গেলো, তার সে-ভাব কাটতে কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে গেলো।

"একটা সিগারেট!" এবার দন্তবিকাশ করে বললে সে, "খুলে গেছে।" টম ফ্যাট ওর পোষাক পরে নিলে।

"তাহলে খুলে দাও।" কিনকারডিন প্রায় ধমকে উঠলো।

"তোমরাই খোলো, সেইটেই ভালো হয়," হেসে বললে টম ফ্যাট।

অবিশ্বাসে ভরা মুখ নিয়ে কিনকারডিন সিন্দুকের কাছে গিয়ে যেটা দিয়ে দরজা খোলে সেই প্রকাণ্ড হাতলটা ধরে ঘোরালে। বিস্ময় আর স্বস্তির সঙ্গে দেখলে হাতলটা খুব সহজেই ঘুরে গেলো। কয়েক সেকেণ্ড পর দানবের মত প্রকাণ্ড ঝকমকে ইস্পাতের দরজাটা খুলতে খুলতে ঠিক যেন মানুষের মত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে আর সিন্দুকের অন্ধকার কোণ থেকে হুমড়ী খেয়ে বেরিয়ে এলো তিনটি প্রাণী, আকাশের নীচে আবার দাঁড়াবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলো যারা।

কিনকারডিন সবায়ের ধন্যবাদ আর প্রশংসা খুব বিনয় সহকারে স্বীকার করে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারলে সরে পড়লো।

বিশ বছরেরও বেশী টম ফ্যাট সাধু-জীবন যাপন করছে, বিত্তশালীরা যেমন করে জীবন কাটায়। এই সময়ের মধ্যে ও তিনবার মাস-কতক করে সাংহাই থেকে অনুপস্থিত হয়েছে। ভব্যতা বিবর্জিত উৎসুক লোকেদের বলতো, "বাবার অসুখ, তাকে দেখতে যাই," যে কৈফিয়ৎটা মোটেই সন্তোষজনক লাগতো না যেহেতু টম ফ্যাটের পরিচিত কারুরই জানতে বাকী ছিল না যে ওর বাবা বহু বছর আগেই দুনিয়ার হিসেব চুকিয়ে গিয়েছে।

মিডল্যাণ্ড সিটির বাইরে খুব উঁচু পাঁচীল দিয়ে ঘেরা ফ্যাক্টরী, আলটিমাম-ফায়ারপ্রুফ-আর্মারপ্লেটেড-স্টীলভল্ট কোম্পানী লিমিটেডের কর্মচারীদের বদ্ধ গবেষণাগারে ওদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এই বিশ বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে কয়েকবার বহু নৈশ প্রহর একটা বেঁটেখাটো চীনেকে নিয়ে কিজন্যে কাটিয়েছে দেখতে দেওয়া হয়নি। তার ওপর, সিন্দুক তৈরী হতে যাবার আগে মডেলের ছকের ওপরকার রহস্য-জনক অক্ষরগুলোর অর্থ বের করতে পারলে ওরা আরও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতো।

সাঙ্কেতিক অক্ষরের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য ট ফ ১৭ মিঃ।" সেই মডেলেরই একটু পরিবর্তিত ছকের উপর লেখা "ট ফ ২ঘঃ ১১মিঃ"। হতভম্ব ইঞ্জিনীয়ার আর নক্সাবীদরা "ট ফ ১৪ঘঃ ২৬মিঃ"-র মানে বের করতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলো এবং শেষ-পর্যন্ত পরিবর্তিত ছকের ওপর "ট ফ ৯দি ১৬ঘঃ" না পড়া পর্যন্ত সিন্দুক তৈরী হবার পাকাপাকি হুকুম পাওয়া যায় নি। ডিরেক্টররা বোঝালে—তাদের ওপর কথা বলবে কে?—খাওয়া শোওয়ার সময় বাদ দিয়ে যদি কোন সিন্দুক টম ফ্যাটকে ন'দিন চোদ্দ ঘণ্টা রুখে দিতে পারে তো সেটা কেরামতীর চূড়ান্ত বলেই ধরতে হবে।

আর টম ফ্যাট, চুরি চামারীর হুজ্জুতের চেয়ে মান বাঁচিয়ে চলাই শ্রেয়ঃ বলতে বলতে বিনয়সহকারে জানিয়ে দেয়ঃ আমি যদি দুদিনে তালা না খুলতে পারি, অন্য লোক দু' হপ্তায়ও পারবে না। তাহলে সেগুলোর আর ভয় নেই। দাও সিগারেট দাও!"

অনুবাদকঃ পঙ্কজ দত্ত

প্রায় দশ লক্ষ কর্মী চা-শিল্প থেকে জীবিকা অর্জন করেন এবং তাঁদেরই শ্রমে এদেশে বছরে চুয়ান্ন কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতীয় চায়ের সুনাম তো আছেই, তা ছাড়া গুরুত্বের দিক থেকেও ভারতের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে চায়ের স্থান দ্বিতীয়। সাত লক্ষ একর জমিতে চায়ের চাষ হয় এবং বিদেশ থেকে বছরে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার সমান মূল্যের খাদ্য আমদানিতে এই শিল্পটি সাহায্য করে থাকে। লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরে ঘরে আয়েশ-আরামের জোগান দিতেও এই সুপ্রাচীন পানীয়টির জুড়ি নেই।

চা-শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি মোটামুটি তথ্য

* ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ এই তিন বছরের রপ্তানি চা থেকে ১২০ কোটি টাকা মূল্যের সমান বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে।
* চা-শিল্প থেকে দেশের প্রায় দশ লক্ষ নরনারী জীবিকা অর্জন করে।
* দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদা মেটানোতে যে পরিমাণ চায়ের প্রয়োজন তার উপর গভর্নমেণ্ট প্রতি পাউণ্ডে তিন আনা করে শুল্ক আদায় করেন এবং রপ্তানির উপর আদায় করেন প্রতি পাউণ্ডে চার আনা। এই দুটি শুল্ক থেকে বছরে প্রায় তেরো কোটি টাকা রাজকোষে জমা হয়ে থাকে।
* এ ছাড়া গভর্নমেণ্ট চা-কোম্পানিদের থেকে আয়কর হিসেবেও বেশ একটা মোটা অঙ্ক পেয়ে থাকেন।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একসপ্যান্‌শন্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

বিষ্কমুখের কথা

কূপমণ্ডুকের কথা লিখেছি এই কারণে যে, বর্তমানে আমার এই প্রবাস-গৃহে কয়েকটি কুয়োর ব্যাঙ নিয়ে বড়ই বিব্রত আছি। আজ সারা সকালটা ওদের পিছনেই গেল।

নিজে ঠিক কূপমণ্ডূক নই। তবু বলতে পারি যে, দুপাশে দুটি ছোট কিন্তু ফলবান পেঁপে গাছের মাঝখানে শান-বাঁধানো এবং চত্বর-ঘেরা ই'দারাটি আমার বিশেষ প্রিয়। বাথরুমে গেলে যেমন গানের বেগ আসে, ঐ কুয়োতলায় গেলেই আমার ভাবাবেগ উপস্থিত হয়। শীতের প্রারম্ভে যতটুকু সূর্যের আলোর প্রয়োজন, সেইটুকুর সঙ্গে অল্প একটু ছায়া মেখে জায়গাটি সত্যি মনোরম। গা শিরশির করে অথচ চড়চড় করে না। প্রথম শীতের মিঠে আমেজ লাগে দেহে, আর ভাবনার বন্ধ কবাট যায় খুলে। ভাবছিলুম অনেক আজে-বাজে কথা.........

এমন সময়ে পুত্র শশব্যস্তে এসে খবর দিলেঃ "তুমি এখান থেকে একটু সরো। হরি, দেবেন, সুখিয়া, কণ্ঠি মালী, সবাই এসে গেছে......"

জিজ্ঞাসা করলুমঃ 'কেন এখানে কি হবে এখন?'

"বা রে! কুয়ো থেকে সেই ব্যাঙদের তুলতে হবে না? তুমি যে বলেছিলে পরশু, এরি মধ্যে ভুলে গেলে?"

অদূরেই সাঙ্গোপাঙ্গরা দাঁড়িয়ে আছে। কুয়োর কাঁটা, দড়ি, ঝুড়ি, বালতি নিয়ে সবাই এমনভাবে তৈরি যে, সমুদ্র-গর্ভ থেকে মুক্তা তোলার জন্য ডুবুরির দল সিগন্যালের প্রতীক্ষা করছে......

মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে ব্যাঙগুলোর সম্পর্কে একটা অন্যমনস্ক মন্তব্য করেছিলুম। তারই ফলে এই অভিযান। ক'দিন ধরে শুনছিঃ "কুয়োর মধ্যে যা ডাগর ডাগর ব্যাঙ ভাসছে—আবার ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে থাকে, কি বিশ্রী! ঐ জল হাতে-মুখে নিচ্ছি, ভাবলেও গা কেমন করে!" কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতন নয়, কিন্তু কি-বা করা যায়। ব্যাঙের গায়ে বিষ আছে কি না আছে তা জানি না। তবে জলচর প্রাণী জলেই থাকে। ই'দারায় ঝুঁকে পড়ে দেখলুম একদিন—একজোড়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট ব্যাঙ। স্তব্ধ নিতল কুয়োটির মধ্যে পরম উদাসীনতায় দুজনে ভাসছে, দুদিকে মুখ ফিরিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন হয়তো শুরু হয়ে থাকবে। কিন্তু কোন অভিযোগ নেই। বিনা আওয়াজে, চুপ করে সিমেণ্ট করা প্রাচীরের গায়ে অসীম সহিষ্ণুতায় লগ্ন হয়ে আছে। পুত্র একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করার ফলে জলে একটু আলোড়ন হল। ওরা দুজনেই সরে গেল—এবার পাশাপাশি। উঁকি দিয়ে দেখছি, এমন সময়ে শীতের একটুকরো ময়লা মেঘ নড়ে উঠল। হঠাৎ ওদের ওপরেই ঝক্‌মকিয়ে উঠল অনেক উচু নীলের পরিষ্কার ছায়া আর তারি কোলে উড়ন্ত পাখীর দু'একটা অস্পষ্ট ফোঁটা। মনটা খারাপ হয়ে গেল......ই'দারার জলের গভীর কালোয় ওদের পিঠের শ্যাওলা-সবুজ রঙ আর ওপরের সাদাটে নীল—সব মিশিয়ে একটা কাব্য-দর্শনের ভ্রূণ সৃষ্টি করলে। বললুম ঃ "আহা বেচারী! চিরজীবন এই কূপের মধ্যে ওরা বন্দী আছে এবং থাকবে। যতদিন পরমায়ু, ততদিন সাঁওতাল পরগণার এই অখ্যাত জায়গাটিতে নিভৃত ও সংক্ষিপ্ত পরিসরেই ওদের বেঁচে থাকতে হবে। ওদের মুক্তি দিলে কেমন হয়?"

কথাটি বড় ধরল পুত্রের কল্পণাপ্রসারী মনে। বালকোচিত উৎসাহে প্রশ্ন করলেঃ "কবে তুলবে ওদের? চিনা-বাদাম আর পালং শাকের ছোট ক্ষেত দুটোর মাঝখানে যে সরু নালীটা রয়েছে, ঐখানে বেশ ঝির-ঝিরে বালির ওপর দিয়ে জল আসে, মালীর বাগানের চৌবাচ্চা থেকে। পেছনেই পেয়ারা গাছের ছায়া......কোনও কষ্ট হবে না......"

শিশু কন্যা মাথা দুলিয়ে দাদার কথায় সায় দিলেঃ "নাঃ, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। এইখানে উঠে এসে ওরা বেশ খেলা করবে, আমরা দেখবো। তখন কেমন মজা হবে!"

মজা হ'ল। একটা ছেলেমানুষী প্ররোচনায় মেতে উঠলুম। কাজ আরম্ভ করে কিন্তু দেখা গেল, সত্যিই কঠিন। বাল্‌তি ফেললে জলে প্রথমতঃ শব্দ হয়। সন্তর্পণে নামালেও ব্যাঙকে তার মধ্যে ধরা যায় না। বেতের ঝুড়ি অচল। ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, কেবল ভাসতে থাকে। অবশেষে একটি কেরোসিনের খালি টিন যখন অর্ধেক ভর্তি হয়েছে, একটি ব্যাঙকে তার মধ্যে কোনও প্রকারে বন্দী করা গেল। শূন্যপথে যখন কপি কলের সাহায্যে টিন উঠছে, তখন নির্ভুল একটি তাগ্ করে লাফ দিতেই, আমার বন্দী আবার ই'দারার জলে আত্মগোপন করলে। নানাবিধ চেষ্টা করা গেল, কিন্তু কোনটাই সফল হল না। অনেক বেলা হয়ে গেছে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সবাই তখন উত্তেজনায় অধীর এবং অন্যমনস্ক। শেষকালে মগজে এক প্রেরণা এল। একটা ছেঁড়া মশারির দুই প্রান্তে দুটি রশি বেঁধে ই'দারার দুই দিক থেকে দুজনে আস্তে আস্তে সেটা ঝুলিয়ে দেওয়া গেল। অশেষ কসরতের ফলে ভেক-দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা গেল। তাদের তুলে এনে বাগানের ছোট্ট চৌবাচ্চার নালীটার পাশে যখন রাখা হল, তখন উভয়েই হাঁপাচ্ছে। রোদে আমাদের পিঠ ও মাথা গরম, উত্তেজনায় শ্বাস বেশ দ্রুত হয়ে উঠেছে। পুত্রের মুখে জেনারেল 'মণ্টি'র বিজয়ী উল্লাস।

* * *

আমাদের সাধু ইচ্ছা এবং পরোপকার-সাধনা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল। বিকেল বেলায় দেখা গেল, একটি মৃত। চিৎ হয়ে অগভীর জলে ভাসছে। অপরটি খাবি খাওয়ার জোগাড়।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জীবন্মৃত, সাথীহীন মণ্ডূককে পুনরায় তার আবাসস্থলে নামিয়ে দেওয়া হল। আশ্চর্যের বিষয় সেটি বেঁচে আছে আজও। অপরটিকে যথাবিহিত সৎকার করে মনে-মনে আমাদের সদিচ্ছা-প্রণোদিত অপকর্মের মারাত্মক পরিণতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলুম। প্রতিজ্ঞা করলুম, অপরের কাজে অথবা জীবন-যাত্রায় অযথা হস্তক্ষেপ কখনো করবো না। যেটা মনে হচ্ছে ভালো কিংবা প্রয়োজনীয়, সেটা অপরের পক্ষে একান্ত মন্দ অথবা নিষ্প্রয়োজন হতে পারে, এ সত্যটি তো হাতে-নাতেই প্রমাণ হয়ে গেল। আমার এ প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা যদি আর কিছুকাল স্থায়ী হয়, তাহলে আদর্শ গৃহস্বামীর সার্টিফিকেট নিশ্চয়ই মিল্‌বে; এমন আশা পোষণ করি।

* * * *

কিন্তু ঠাট্টার কথা নয়। আমাদের সাহিত্যে, জীবনে ও সমাজে যে কূপমণ্ডূকতা লক্ষ্য করি, সেটা আমাদের নিত্য শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই অপরিহার্য হয়ে গেছে। হঠাৎ আগল ভেঙ্গে যদি বেরিয়ে আসি, পুরানো জীবনের ঘুণ-ধরা ভিত্তি যদি নড়ে ওঠে কোনো কারণে, বহু দিনের অভ্যাস আর সংস্কার যদি টলমল করে ওঠে কোনো অত্যাবশ্যক অবস্থান্তরে, তা হলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ যাবে কেটে। হয়তো মারাই পড়বো। শুধু তাই নয়,—কোনও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটে গেলেও অনেক দিন পর্যন্ত আমরা সেটাকে অস্বীকার করতে থাক্‌বো। আমাদের কুনো অপবাদটা একেবারে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত বাঙালী কয়েকজন একত্র বাস করলেই প্রবাসে একটি দল গড়ে ওঠে। উদরান্নের খাতিরে মুখে কিছু না বললেও রবিবাসরীয় মজলিশে অন্নদাতা প্রদেশের অধিবাসীদের মুণ্ডপাত করে থাকি। বাঙালীর উদারতার সুবিধে নিয়ে অপরাপর প্রদেশের

লোকরা কেমন গুছিয়ে নিচ্ছে, সে খবরটা আংশিক সত্য হলেও, সমস্ত ক্ষণ অবিচারের প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে অসন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করি। বাঙালীর প্রতি অবাঙালীর মনোভাব আজ সুস্পষ্ট। সমাজে এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবহারে সেটা ক্রমশঃ রূঢ় মূর্তি নিচ্ছে। কিন্তু কেন?

এতো দিন ধরে বিদেশী ও ভিন্ন-প্রদেশীদের খাইয়ে, লেখা-পড়া শিখিয়ে আমাদের অদৃষ্টে এমন পুরস্কার জোটে কেন? এ প্রশ্নের একটি মাত্র জবাবঃ আমরা মনে-প্রাণে কর্মক্ষেত্রকে গ্রহণ করি নি। অর্থ উপার্জন করেছি, স্বদেশে জমি কেনার জন্য, টাকা জমিয়েছি, ঘরে মনিঅর্ডার করেছি নিয়মিত। সে অঞ্চলের লোকদের কৃপাচক্ষে দেখেছি। পরচর্চা করেছি, থিয়েটার করেছি। কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেছি, কমিটিও গঠন করেছি আর শনিবার রাত্রে ব্রিজ খেলে পাঁঠার মাংস খেয়েছি। সে মাংস হজম হয়ে গেছে। কিন্তু এ্যাসিডের আধিক্যবশে মনের গাঁটে গাঁটে বাত ধরিয়ে দিয়েছে।

সর্পপূজা

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি

বিষহীন গোখরো সাপের কথা কেউ শুনেছেন কি? বোধ হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ-সত্য—এবং এই সাপের পূজা পশ্চিম বঙ্গের কোথাও কোথাও হয়ে থাকে অতি ভক্তিভরে এবং সাড়ম্বরে—দেবতা জ্ঞানে। আমি মনসা পূজার কথা বলছি না কিন্তু। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে সমস্ত গ্রামে এই সাপের পূজা হয় সেখানে অন্য কোনও রকম বিষাক্ত সাপ বা সর্প-দংশন জনিত মৃত্যু দেখা যায় না।

'ঝাংলাই' ও পুরোহিত

এই সর্প-দেবতার নাম "ঝঙ্কেশ্বরী" বা চলতি কথায় "ঝাংলাই"।

বর্ধমান জিলার কাটোয়া মহকুমায় মঙ্গলকোট থানার অধীন চারখানি গ্রামে ঐ সর্প-দেবতার পূজা হয়। ঐ চারখানি গ্রামের নাম মুসারু, পলসনা, ছোট ও বড় পোষলা। অধুনালুপ্ত "ঝঙ্কেশ্বরী মাহাত্ম্য" পুঁথিতে পাওয়া যায়—

'সতী (বেহুলা) শাপে পলাইয়া আসি এই দেশে
নিকটে সাতখানি গ্রামে প্রবেশেন এসে
মুস্তারু, পলসনা, দুই পোষলা গ্রামেতে
সিকওর, মইদান আর নিগনেতে।'

আজকাল সিকওর, মইদান আর নিগণ গ্রামে এই 'ঝঙ্কেশ্বরীর' দেখা মেলে না বা কোনও মন্দিরাদি নাই।

"ক্রমে মাতা অন্তর্হিতা তিন গ্রাম হ'তে
মুসারু, পলসনা দুই পোষলা গ্রামেতে
অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে এই চার স্থানে
পিটোপরি বিরাজিতা আছ কৃপা দানে।"

আগেই বলেছি যে আর কোনওরূপ বিষাক্ত সাপ ঐ গ্রাম চারিখানিতে দেখা যায় না। তাহাও ঐ পুঁথিতে পাওয়া যায়।

"নিরখিয়া হয় মাতঃ আনন্দ অন্তর
তোমার মহত্ত্ব এক অতি চমৎকার
অন্য ফণাধারী কভু নাহি দেখি আর।"

আরও একটি মজার ব্যাপার—
"গাভীবৎস যদি যায় পদেতে দলিয়া
নতশিরা হয়ে তুমি যাও পলাইয়া
কিন্তু যদি নিকটেতে অজ অজা পাও
ঊর্ধ্বফণা করি তারে তখনি দংশাও।"

মানুষকে 'ঝঙ্কেশ্বরী' দংশন করে বটে কিন্তু বিশেষ কিছুই হয় না।

"দৈবযোগে যদি কেহ অঙ্গে পদ দেয়
তোমার দংশনে সেই বহু কষ্ট পায়
অপ্রকাশ্য ভাবে যদি তব স্থানে যায়
(অর্থাৎ মন্দিরে)
তখনি সে মুক্ত হয় বিষের জ্বালায়
প্রাণভয়ে যদি কেহ করে গোলমাল
বেদনা হয় কষ্ট পায় সামাল সামাল।"

ঐ গ্রামকয়টিতে আজ অবধি সর্প-দংশনে মৃত্যুর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। অথচ এই "ঝাংলাই" আছে শত শত সংখ্যায়। প্রতি বাড়ীতে অন্ততঃ দুদশটা খুঁজলে পাওয়া যাবে। ছোট ছেলেরাও নির্ভয়ে খেলা করে এদের নিয়ে। সাধারণ গোখরোর মতই এর আকৃতি এবং ফণাও সেইরূপ। ঊর্ধ্বফণার ইঙ্গিতও পাবেন উপরের ছড়ায়।

মুসারু গ্রামের মন্দিরটি অদ্ভুত এবং এইরূপ মন্দিরই অন্য গ্রামগুলিতে দেখা যায়। মন্দিরের একজন পুরোহিতও আছেন।

* * * *

"তদবধি আষাঢ়ের কৃষ্ণা প্রতিপদে
সাধ্যমত ফুলজল দেয় তব পদে
তারপরে বলিদান হোম ক্রীড়া সারি
পূজা দিনে গ্রামে বহে আনন্দ লহরী।"

আষাঢ়ের কৃষ্ণাপ্রতিপদে ঐ গ্রাম চারখানিতে বিরাট পূজা ও উৎসবের ধুম লেগে যায়।

ফণাওয়ালা 'ঝাংলাই'

এ ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। cobra জাতীয় সর্পের নির্বিষ হওয়ার কারণ কি?

Metamorphosis না স্থানীয় কোনও দ্রব্যগুণ এই বিষ হরণ করেছে?

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। ঐ গ্রামগুলির প্রতি এই জাতীয় সর্পের দুর্নিবার আকর্ষণ। গ্রামের বাহিরে বা গ্রামান্তরে নিয়ে গেলেও দেখা যাবে—তারা আবার ফিরে আসছে 'ঘরের টানে।'

অনেক দিন

প্রভাত দেব সরকার

(পূর্বানুবৃত্তি)

হঠাৎ ছোট ভায়ের মুখের দিকে চেয়ে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। একি বেদনা, উদ্বেগ, শংকা না অন্য কিছু? ভয় শ্রদ্ধা ভালবাসা বিজড়িত কেমন একটা ভাব। যে ছেলেমানুষ সরল মুখ দেখে গিয়েছিল এতো সে নয়—শুধু বিমর্ষই নয়, কেমন চিন্তাগ্রস্ত মনে হয় সমরের। সামনে আরশি না ধরলেও ছোট ভায়ের মুখের সংগে নিজ মুখাবয়বের তফাৎটা সমর বুঝতে পারে। নিজেকে সমরের বড় অপরাধী মনে হয়, কেন জানি না। বেশ কিছুক্ষণ সমর কথা বলতে পারে না। একটা অস্পষ্ট বেদনাদায়ক মানসিকতায় প্রবীরের মত এমন অনেক মুখ ভেসে ওঠে—প্রাণৈশ্বর্য অপহৃত এমন অনেক যুবক বৃন্ধ! কেন? প্রবীরের কি অভাব? কিসের চিন্তায় ও অমন স্বাস্থ্যহীন চিন্তাক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছে? নাই বা চাকরি করলে, কে ওকে পেড়াপিড়ি করছে! সময় মত নাওয়া-খাওয়াটা ক'রতে পারে ত! ভাই-এর সংগে ভাব ক'রতে ভালবাসতে আজ বড় ইচ্ছে করে সমরের।

সমর বললে, রজনীবাবুর কান্ডটা দেখলি, শেষটা ইনফরমারের কাজ করলেন। লোকটা যে এমন ভাবাও যায়নি—আশ্চর্য!

এ যেন ধরা-বাঁধা জানা কথা, আশ্চর্য বা ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই প্রবীর বলে, ও ছাড়া ও'রা আর কি করতে পারেন! আর ওর চেয়ে বেশী কি আশা করা যায় ও'দের কাছ থেকে!

তবুও—সমরের আশ্চর্য হবার আকস্মিকতা এখনো কাটেনি। পাড়ার রজনীবাবু তাঁর বাবার বয়সের সম্মানীয় ব্যক্তি। তাঁর পক্ষে হঠাৎ এ-ধরণের নীচতা অভাবনীয়। তাঁকে যে এক সময় সম্মান করা হ'তো আজকের ঘটনা সংঘাতে সেকথা ভুলে যাওয়া কি সম্ভব?—সম্মান থেকে ঘৃণা করতে মানুষকে আর কত দেরী লাগে? সম্মানের কারণ একদিন কি ঘৃণার কারণ হ'য়ে উঠতে পারে?

প্রবীর শুধু হাসলে। দাদার হয়তো এখানে অনেক কিছু বোঝবার, দেখবার, শোনবার প্রয়োজন আছে। সমরের রাগটা নীতি হিসেবে যত না তার চেয়ে বেশী প্রবীরের ওপর শত্রুতা করা হ'য়েছে বলেই যেন প্রকাশ পায়। আবার চালাকি করে' বেণীবাবুর নাম করছিলেন—ভিজে বেড়ালটি!

সমর লক্ষ্য করে প্রবীর খুব বেশী উৎসাহী হয় না। পাড়ার এতকালের চেনা-শোনা রজনীবাবু কি করলেন না করলেন তাতে তার বিশেষ যায় আসে না। কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হয় প্রবীরকে। অথচ বিষয়টির গুরুত্ব আজ তাদের সংসারে বড় কম নয়। প্রবীর যা করে দেশের বিজ্ঞজনদের চোখের ইশারায় পুলিশের গোচরীভূত হবার মত। সিডিশন, ষড়যন্ত্র, রাজদ্রোহ। সত্যিই কি প্রবীর এসব করে' বেড়ায়?

সমর বলে, এখন বুঝতে পারছি, বাবা তখন কোন কথা বলেননি কেন—কে জানে লোকটা এমন হয়ে গেছে।

প্রবীর বলে, উনি কেন এ পাড়ায় অমন অনেকই হ'য়ে গেছেন। রাতারাতি কবছরে সব স্বভাব বদলে ফেলেছে।

কেন? বলেই সমর নিজেকে কেমন অ-প্রস্তুত বোধ করে। কারণটা প্রবীরের মত তারও যেন জানা উচিত ছিল।

কেন আর, লোভ! শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার অদম্য স্বার্থপরতা। প্রবীরকে একটু যেন বিচলিত দেখায়। উত্তরটা সমর ঠিক অনুধাবন করতে পারে না। দেশে ফিরে লোভ আর স্বার্থপরতার প্রকাশ দেখতে পেলেও দেশের প্রতিটি লোক যে ইতিমধ্যে সেই দোষে দুষ্ট হয়ে গেছে, সমর ভাবতে পারে না।

প্রবীরের কন্ঠস্বর তেমনি বিচলিত। আর কয়েক বছর যুদ্ধ চললে, দেখতে পেতে মানুষের ডান হাত বাঁ হাতকে খাতির করতো না। আপনি আর কোপনি ছাড়া কারো সংগে বোধ হয় সংসারে নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ থাকতো না। এ'রা আর কি সে তুলনায়।

এ আক্ষেপ, কি অভিযোগ সমর বুঝতে পারে না। পূর্বের কিছু আজ প্রত্যক্ষ না করলেও এতটা নীচাশয়তা, লোভ, স্বার্থপরতা মানুষের কাছে প্রত্যাশা করা বেদনার নয় কি? মহৎ মানুষ, উদার মানুষ, ত্যাগী মানুষ, স্বজনবৎসল মানুষ ঘটনা সংঘাতে কি এত বদলে যাবে? যে ভালবাসতো সে কি, তা বলে ঘৃণা করবে? সমর হয়তো সোজা কথাটা বুঝতে পারছে না, একটা অবধারিত সত্যকে নিয়ে মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছে। যতটা আশ্চর্য হওয়া উচিত, তার চেয়ে যেন বেশী আশ্চর্য বোধ করছে।

আশ্চর্য! চাবকে এদের সিধে করতে পারিস না, সামরিক শিক্ষায় দীক্ষিতের মতই সমর বলে।

কজনকে চাবকাবে? আর কখানা চাবুকই বা কাজে লাগাবো? পৃথিবীজোড়া চাবুক যদি থাকতো তা হ'লে না হয় কথা ছিল! প্রবীর হাসে।

না, না, হাসির কথা নয়, লোকটাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শুধু শুধু মিছিমিছি এরকম ত্যাঁদড়ামি করবে কেন? তোরা বলে' তাই সহ্য করিস, আমি হ'লে মজা পাওয়াতুম! উত্তেজনায় সমর এখনি একটা কিছু করে' ফেলতে চায়।

স্বভাব বদলালে অমন ত্যাঁদড়ামি অনেকেই করে। কাকেই বা শিক্ষা দেবে। সে দিনকাল কি আর আছে, একের অপরাধ আর একজনের বোঝার মত মনে হ'বে? কে কার কড়ি ধারে! প্রবীর বলে।

তোরা ছেড়ে দিস্ বলেই তো ওরা পেয়ে বসে যেন! প্রতিবাদ করলে দেখতিস এতটা বাড়তে সাহস করতো না। চালাকি নাকি!

প্রতিবাদ! প্রবীর এমন করে' ওঠে যেন একটা অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে ফেলেছে। সমর ভায়ের বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারে না। এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কি আছে?

প্রতিবাদ যে করবো সে বোধ কোথায়, সে সমর্থনই বা কার কাছে পাবো। তা হ'লে তো লাঠালাঠি করতে হয়! মানুষের অন্যায় এখন মানুষকে প্রতিবাদ করতে বলে না। সহ্য করবার ক্ষমতা থাকে সহ্য কর, আর তা যদি না থাকে, মরে ঝরে যাও। প্রবীর দাদার দিকে চায়।

সমর কি বলবে হঠাৎ ভেবে পায় না। প্রবীরের কথার অর্থটা যেন বড় গভীর, হেঁয়ালির মত।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করে' মানুষ যেদিন লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে মরেচে আর সেই প্রতিবাদের সুযোগ নিয়ে অনেকে সেদিন মজা লুঠেচে। মানবতা থাকলে তো মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে? প্রবীরের কন্ঠস্বর বড় গুরুগম্ভীর বেদনার্ত মনে হয়। সমর ভেবে পায় না, হঠাৎ এত তুচ্ছ ব্যাপারে এত চিন্তাশীলতার কি মানে হয়। একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? প্রবীর এমন কথা বলে যেন, আশা করবার, নিরাশ হবার কোন কারণ নেই—কারণে অকারণে যে প্রকারেই হোক হৃদয়বৃত্তির বিকৃতিতে বিচলিত হবারও কিছু নেই। কাল মানুষ যা করতো, আজ মানুষ তা করছে না, পরশু হয়তো অন্য

একটা কিছু করবে—সামঞ্জস্যতা খুঁজতে যাওয়া বৃথা! তার অসাক্ষাতে ইতিমধ্যে দেশের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার জন্যে মনে মনে সমরের অভিমান থাকলেও সে অভিমানটা যে প্রবীরের মত হতাশার প্রতিধ্বনি নয় তা সে বিশ্বাস করে।

সমর প্রতিবাদ করে। ওকথার কোন মানে হয় না। দু-একজনকে দেখে ঐ সিদ্ধান্ত করার কোন justification নেই! অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াও তো অন্যায়!

বড় অবিশ্বাসীর মত প্রবীর হাসে। বলে, মানি। কিন্তু যেখানে অন্যায় রাজদণ্ডের আশ্রিত, সেখানে তুমি কি করবে—ব্যক্তিগত স্বার্থে মানবধর্ম যেখানে পদদলিত, সেখানে তুমি কি বলবে? চোখের ওপর যে-দেশে রাজ-পথে দিনদুপুরে না খেতে পেয়ে মানুষ খাবি খেয়ে মানুষের দয়া ভিক্ষা করে' সুস্থ মানুষের মনে কোন প্রশ্ন জাগাতে পারেনি, সে-দেশে ন্যায় অন্যায়ের সজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামান পাগলামী নয় কি!

একি শুধু তর্কের কথা, না ভাবনার কথা! প্রবীরের মত করে ভাবা কি সমরের পক্ষে সম্ভব? সমর তর্ক তোলে। অল্প বিস্তর স্বার্থের প্রকাশকে মানবধর্ম বিরোধী বলে গালাগাল দিলে কি হ'বে—দুর্ভিক্ষে একদিন মানুষ মরেচে বলে যারা বে'চে আছে, তারা যে একেবারে অধঃপতিত হ'য়ে গেচে ধরে' নেওয়া কি ঠিক বিচার? তাহলে তো এরকম অনেক বিপর্যয়ে মানব সমাজের পক্ষে চলা অসম্ভব হ'য়ে পড়তো। মানব ধর্ম কি এতই পরিমিত?

প্রবীর জবাব দেয়। একদিন কিন্তু অচল হ'য়ে পড়বে—স্বার্থের অবিরাম সংঘাতে মানুষের যাকিছু ভাল নিঙড়ে বেরিয়ে যাবে! নিজেকে নিজেই হয়তো মানুষ তখন হত্যা করবে।

সমর দেখলে তর্কের মীমাংসা সহজ নয়। প্রবীরের মত সে দূরদৃষ্টি দিয়ে কোন কিছু ভাবে না। নিজে কি করবে না করবে তার ঠিক নেই, মানুষের কার্য কারণ নিয়ে বৃথা মাথা ঘামান। বয়েসের তুলনায় প্রবীরের এ পাকামি ছাড়া কি? কি জন্যে অতো কথা ভেবে মরে! সমর চুপ করে যায়।

প্রবীর বলে, আমাদের ঘনশ্যামবাবুকে জানতে তো—কি ভাল মানুষ না ছিল, ideal man! সেই লোক কি হ'য়েচে শুনবে? যুদ্ধের বাজারে বড় সাহেব হয়ে নিজের ছেলেদের চাকরী করে দিয়ে ঘুষ নিয়েচে। জিগ্যেস কর অস্বীকার করবেন না—বলবেন, প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ছেলে বলে খাতির করি না!

সমর হেসে বলে, তাই না কি! ভারি মজার তো।

ঘুষ নিক, আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেটাকে বাহাদুরী বলে চালাবে কেন? All the viles of men are rampant nowadays—তা না হ'লে স্বার্থের নীচ প্রকাশকে principle বলে বাহবা নেয়া যায়! সমর যেন আর কিছু বলতে পারবে না প্রবীর এমনিভাবে দাদার মুখের দিকে চায়! সমরের হঠাৎ মনে হয়, বাগের পয়সা হওয়ার কারণ, বেণীবাবুর হরি সংকীর্তন মহিমার প্রতিধ্বনি যেন প্রবীরের কথায় শোনা যায়।

তবে কি সব বৃথা! অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ কিছু করবে না! অন্যায়কে অন্যায় জেনে শুধু নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকবে? এত বড় যুদ্ধটা তা হলে কিসের জন্যে—ভাড়া-করা প্রাণ আহুতিতে কোন সমাধান হ'লো না? কিছুক্ষণ দুভায়ের কারো মুখ দিয়ে কথা সরে না, একটা বোবা অস্বস্তি নিঃশব্দ ঝঙ্কারে মুহূর্ত-গুলোকে ভারি করে' রাখে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের কোন বোধ থাকে না—একটা মসি-লিপ্ত অন্ধ ভয়াবহতা চোখের ওপর ঝোলে যেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দে হেসে খেলে বে'চে থাকার কোন আশা কি নেই! কি নিয়ে প্রবীরের সংগে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল, সমর ভুলে যায়। এটা ঠিক সে ভয়ের সংগে আজ তর্ক করতে যায়নি।

প্রবীরই কথার সূত্র ধরে বলে, আমরা কি করি, যার জন্যে সেদিন পুলিশ সমারোহ হ'লো! অথচ এই বেণীবাবু, বাগমশায় মানুষ মেরে বড়লোক হলো তার জন্যে একটি পুলিশও এ-পর্যন্ত নড়ে বসলো না। পরাধীন জাতের জন্যে বিদেশী শাসকের এই তো নির-পেক্ষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা!

সমর আগ্রহ সহকারে জিগ্যেস করে, তোরা করিস কি! পুলিশ নজর দেয়?

মহামারী এমন কিছু নয়, যার জন্যে হিতা-কাঙ্ক্ষী এবং পুলিশের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে। কুড়োন ছেলে-মেয়ে নিয়ে 'ডেস্টিটিউট হোম' করেচি। বলতে বলতে প্রবীর কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

এর জন্যেই পুলিশ এসেছিল? সমর বলে।

আবার কি কর্তারা হয়তো ভেবেচে কুড়োন জিনিষে আমরা যদি কোনদিন সোনা পেয়ে যাই। যারা অবহেলায় অনাদরে রাস্তায় পড়ে মরে তাদের যারা বাঁচাতে যায়, তারা নিশ্চয়ই সন্দেহ-ভাজন। দেশের এত লোক থাকতে আমাদেরই বা এত মাথা ব্যথা কেন? সুতরাং—

সমরের বিশ্বাস হয় না। পুলিশের নজর রাখার কারণ হয়তো অন্য। প্রবীর কিছু গোপন করছে না তো? বেওয়ারিশ ছেলে মেয়েদের নিয়ে আশ্রম করলে পুলিশের সন্দেহ হ'বে কেন? কর্তা-ব্যক্তিরা কি এতই নির্বোধ, শুধু শুধু বুনো হাঁসের পেছনে ঘুরে বেড়াবে? আর তাহলে বাড়ী সার্চ করলে কেন? ঘুণাক্ষরে পুলিশ অফিসারটি একবারও প্রবীরের নাম করেন নি—যা খুঁজছিলেন তা পাননি, কিন্তু ভবিষ্যতে সে বস্তু খোঁজার ইচ্ছে ত্যাগ করবেন, এমন কথাও কিছু বলেন নি, মনেও হ'লো কিছু! প্রবীর কি করে? শুধু কি ঐ কাজ, ছড়ান প্রাণ কুড়িয়ে বেড়ান? কেন প্রবীর তাকে সত্যি কথা বলবে না? দাদাকে সে বিশ্বাস করে না?

সমর বলে, ওতো অনেক খরচার ব্যাপার, দেয় কে?

দেবে আর কে! ভিক্ষে করে, চাঁদা তুলে সংগ্রহ করতে হয়। একটু থেমে প্রবীর বলে, হয়তো আর চলবে না—পুলিশেরও ভাবনার শেষ হবে।

কাজটা বড় শক্ত—মাসে মাসে মোটা 'এড' না পেলে কি চলে! গর্মেণ্টকে এ্যাপ্রোচ করে দেখতে পারিস! যেন একটা মনোমত উপায়ের সন্ধান দিয়েচে, এমনিভাবে সমর ভায়ের দিকে তাকায়।

এ্যাদ্দিন যাও বা চলছিল এখন গর্মেণ্টের দ্বারস্থ হয়ে উঠে যাবার দাখিল হয়েচে। কেন, কি বিত্তান্ত, কি হবে, লাভ কি ইত্যাদি প্রশ্নের ঠেলায় অস্থির। যারা সাহায্য করতো তারাও গর্মেণ্টের নামে হাত গুটচ্চেন। প্রবীরের কথায় আক্ষেপের নিরাশার সুর।

ওসব জিনিস গর্মেণ্ট আণ্ডারটেক না করলেও চলে না। চেষ্টাও সেই মত করতে হবে। কাউকে দিয়ে 'ইনফ্লুয়েন্স' করিয়ে দেখ না? সমর উপদেশচ্ছলে বলে।

দাদার কথা প্রবীর খুব গ্রাহ্য করছে বলে মনে হয় না। অমন অনেক উপদেশ এর আগে অনেকে দিয়েছেন; কোন লাভ হয়নি, উল্টে কাজে বাধা পেয়েছে। একটু যেন বিরক্তিই প্রকাশ পায়ঃ যার কাছে যাব, তিনি আগেই বলবেন, ও করে কি হবে—কতকগুলো ছোট-লোকের ছেলে মানুষ করে' লাভটা কি? এর পরেও যেতে বল!

আর কি বলবার আছে সমর ভেবে পায় না। ভায়ের প্রচেষ্টাকে সে খুব কাজের বলে মনে করে না। তার মনেও প্রশ্ন আছেঃ এসব করে কি হয়? সমিতি ক্লাব করার মত এও একটা খেয়ালের ব্যাপার নয় কি!

এক সময় 'ওয়ার ফণ্ডে' মোটা মোটা চাঁদা দিয়ে যাঁরা মানুষ মারতে সাহায্য করেচেন, আজ সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করে তাঁরা মরা মানুষগুলোকে বাঁচাতে রাজী নন! বলেন, মিছিমিছি। প্রবীর বলে।

সমর চুপ করে থাকে—প্রবীরের কথাবার্তার ধরণ ভাল লাগে না। যেন সব বুঝে বসে আছে প্রবীর বিজ্ঞের মত। অকালপক্কতা! এ প্রবলেম চাইল্ড!

মানুষ মেরে যে লাভ, মানুষ বাঁচিয়ে হয়তো সে-লাভ নেই, প্রবীর নিজের মনে বলে

যায়, যতই চেষ্টা করি না কেন বড়লোকদের দৃষ্টি কিছুতেই এদিকে ফেরাতে পারবো না।

বড় বাঁকা বাঁকা কথা বলে প্রবীর। ভায়ের ওপর ভালবাসার যে অবুঝ আতিশয্যটা গোড়াতে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল এখন যেন অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। ভাইকে যতটা অসহায় এবং মুখাপেক্ষী ভাবা গিয়েছিল তা তো সে নয়—বরং কথাবার্তায় ভাবনা-চিন্তায় বিশিষ্ট একজন, এমন একটা মাতব্বরি বুঝদার ভাব দেখায় যে, ভেতরে ভেতরে ভালবাসা দেখাবার ইচ্ছেটা উপহাসের মত মনে হয়। সমর কাকে ভালবাসা দেখাবে? কার জন্যে ভাববে? প্রবীর কি ছোট, ছেলেমানুষটি আছে এখনো!

সমর এবার অভিভাবকের সুরে কথা বলে, ওসব করে' কি হবে? তার চেয়ে একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখ।—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান!

দাদার কথাটা অপ্রত্যাশিত নয়, তবুও প্রবীর মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়। হয়তো ভেবেছিল তার যুদ্ধফেরৎ দাদাকে নিজের কাজের গুরুত্বটা বোঝাতে পারবে—দেশ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়ে দিতে পারবে। মনে মনে হয়তো এর জন্যে কিছুটা বিস্ময়, সম্মান প্রত্যাশা করেছিল দাদার কাছে। দাদার কথায় যেন খেয়াল হ'লো, সবাই যেখানে চাকরি করে সেখানে বেকার থাকাটা অন্যায়, অপরাধ! দাদা খোঁচা দিয়ে সেই কথাই বলতে চায়।

প্রবীর জবাব দিল : বেশী দিন আর তাড়াব না!

একটা বিরোধের সুর যেন ঘনিয়ে ওঠে। সমর হয়তো ভাল ভেবেই কথাটা বলেছে, কিন্তু প্রবীর যে-সুরে জবাব দিলে স্পষ্টতঃ তাতে তার ভাল ভাবাটা গ্রাহ্য হয়নি। সমর আরো একটু গুরুগিরি করতে যায় : অমন কত ছেলেমেয়েদের তুই মানুষ করবি?—সোজা কথা নাকি? এক গর্মেণ্ট যদি দায়িত্ব নেয় তা হ'লে না হয় কিছু হয়!

দাদার এই সব কথায় গর্মেণ্টের দারস্থ হওয়ার বশম্বদ প্রথাসুলভ মনোভাবটা প্রবীর কিছুতে সহ্য করতে পারে না। মনে হয় এক কেনা গোলামের বাড়া হয়ে গেছে। প্রবীর অনিচ্ছে সত্ত্বেও বলে, যে গর্মেণ্ট মরার দায়িত্ব নেয় না, সে-গর্মেণ্ট আবার বাঁচাবার দায়িত্ব নেবে? তা হ'লেই হয়েচে! সব দুঃখুই তো ঘুচে যেত তা হলে!

কেবল গর্মেণ্টের দোষ ধরলেই তো আর দুঃখু ঘুচবে না! নিজেদেরও সেই সঙ্গে তৈরী করতে হ'বে! সরকার তরফের লোকের মতই সমর কথা বলে।

প্রবীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে : তৈরী আমরা অনেকদিনই হয়ে আছি। যে সরকারের লক্ষ্য কেবল আমাদের ধন-দৌলত, আমাদের সর্বস্ব লুট করা, তারা আর আমাদের তৈরী হওয়া আর না-হওয়া নিয়ে কি করবে—লাভই বা কি তার! তৈরী আমাদের অন্যভাবে হ'তে হবে।

ভায়ের কথায় সমর চমকে ওঠে। জিগ্যেস করে, কি ভাবে?

ভাই কি রাজদ্রোহের কথা বলছে? কোন ষড়যন্ত্র কিছু করছে নাকি? গর্মেণ্টের ওপর যা রাগ ছেলের!

নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের নিতে হবে——কবে কোনদিন সরকার ভাল করবে তার জন্যে দিন গোণা ছাড়তে হবে। বেশ বিশ্বাসে সঙ্গে প্রবীর বলে।

সমরের নিশ্চয়ই ধারণা হয়—প্রবীর রাজনীতি করচে। পলিটিক্সের শিক্ষায় লম্বা লম্বা কথা বলছে। ওটা যে একটা বাজে কাজ সে-বিষয়ে সমরের আর কোন সন্দেহ নেই। অনেকেই তো করলে, কি হলো এ পর্যন্ত? মুখে দেশোদ্ধার যত সব!

সমর খোঁচা দিলে : আজকাল 'পলিটিক্স' করচিস বুঝি? একেবারে মার-মুখো হ'য়ে আছিস?

প্রবীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলে, পারলে নিশ্চয়ই করতুম। মারমুখো হবো কেন, মেরেই তো রেখেচে! দরকার হলে আরো মারবে? ভাবনা কি!

দোষারোপের মত প্রবীরের কথা শোনায়। খোঁচা দিতে গিয়ে খোঁচাটা যেন নিজের গায়ে লাগে। সমর চুপ করে যায়। ভায়ে ভায়ে বড় ছোটোর প্রশ্নটা যেন আবার বড় করে দেখা দেয়—কে বড় সে না প্রবীর? কে মেরে রেখেছে? কে মারবে? সে যুদ্ধে গিয়েছিল বলে কি প্রবীর এখনো কিছু মনে করে?

দেশকে ভালবাসা কি সহজ? পলিটিক্সই করি আর যাই করি! কাকে ভালবাসবো মতকে না, দেশের লোককে? কাকে উদ্ধার করবো একটা মতবাদকে না, একটা পরাধীন জাতকে? কাকে আবিষ্কার করবো? তোমাকে, আমাকে না, সমগ্র দেশের রূপকে? যে পলিটিশিয়নদের কথা ভেবে তুমি ঠাট্টা করচো আমি তাদের দলে নই। বিশ্বাস না হয় একদিন দেখে আসতে পারো আমরা কি করচি। এই সব ছেলেমেয়ে শুধু একদিন দুর্ভিক্ষে ঝরে পড়েনি, প্রতিদিন দরিদ্র বাপমার অনাদরে হারিয়ে যাচ্ছে! কে খোঁজ রাখে? প্রবীরকে বড় বিচলিত দেখায়।

ছোট ভায়ের গলার স্বরে সমর চমকিত হয়। প্রবীর এত ভাবে? এত কাজ করে? নীচাশয়দের উপেক্ষা করার অধিকার তা হ'লে ওর আছে! 'হিউম্যান ভ্যালুস' কথাটায় যথার্থ উপলব্ধি যেন হয়। হঠাৎ যুদ্ধে যাবার কিছুদিন আগে প্রবীরের রাস্তা থেকে একটা ছেলে কুড়িয়ে আনার কথা মনে পড়ে। সে-রাত্রে বাড়ীতে কি হৈ-হৈ—ছেলেটাকে বাড়ীতে স্থান দেওয়ার জন্যে কি অনুনয় বিনয় শেষ পর্যন্ত রাগ অভিমান! যেন অনাথ ছেলেটার বাপমা ঐ। সমরও সেদিন বিরক্ত হয়েছিল, কোথা থেকে একটা জঞ্জাল কুড়িয়ে এনেছে প্রবীর!

রাত তখন এগারটা-বারটা। সেদিন কড়ানাড়ার শব্দটা খুব মৃদু হয়েছিল। দরজা খুলে দিতে প্রবীরের পিছু পিছু ছেলেটা ঢুকলো, এতটুকু শব্দ করেনি কেউ। সমর জিগ্যেস করলে, এ আবার কে?

প্রবীর কিছু বলার আগেই ছেলেটি বললে, আমি চণ্ডী!

সমর প্রবীরের মুখের দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে লাগল। সাড়া পেয়ে বাড়িশুদ্ধ সবাই উঠে পড়ল : মা এলেন, বাবা এলেন, বাণীও এল। এক পাশে জড়সড় হয়ে চণ্ডী তখন নিরীক্ষণ করছিলেন। খপ্ করে চণ্ডীর হাত প্যাণ্টের ছেঁড়া পকেটে মনোযোগ দিয়ে হাত ঘষতে আরম্ভ করেছে—বেওয়ারিশ ছেলেটার তখন হাতের ময়লা পরিষ্কার করার বড় দরকার হ'য়ে পড়েছে। বাইরের ঘরে ইতিমধ্যে অনেকগুলি বিস্মিত চোখের নিঃশব্দ প্রশ্ন উদ্যত হয়ে আছে। প্রবীরও যেন কেমন হয়ে পড়েছে। চণ্ডীকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে এসে তার যত রাজ্যের লজ্জা, ভয় সংকোচ পেয়ে বসেছে! রাত দুপুরে পথ থেকে ছেলে কুড়িয়ে আনা ন্যায় কি অন্যায় ঠিক বুঝতে পারছে না, কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে চণ্ডীর সম্বন্ধে যা ভেবেছিল কর্তব্য ঠিক করেছিল এখন তার কিছুই ঠিক মনে পড়ছে না। শুধু কি দয়া? আর কিছু নয়!

কিন্তু-কিন্তু ভাবটা কিন্তু প্রবীরের যায়নি : মানে, রাস্তায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল—তা-ছাড়া ওর কেউ নেই। তাই আনলুম! কথা বলে প্রবীর এমন হেসেছিল সেদিন, সমরের মনে আছে কান্নার মত অসহায় সে হাসি।

বাবা বললেন, আচ্ছা, গ্রহ একটা জুটলো। এমনিই বাড়ীতে টেকা যায় না, তার ওপর—বিদেয় কর।

মা তখনো কিছু বলেননি, চণ্ডীকে নীরিক্ষণ করছিলেন। খপ্ করে চণ্ডীর হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন : আচ্ছা থাক—কাল যা হয় হবে 'খন!

প্রবীরের যেন গা দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যাক্ এক রাত্রের জন্যে হলেও সে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় করে দিয়েছে। কিছুদিন ধরে সে ছেলেটাকে নিয়ে প্রবীরের কি উৎসাহ, কি উদ্বেগ, আনন্দ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত চণ্ডী থাকেনি। আপদ বিদায় হয়েছিল আপনা হ'তে।

এরকম একদিন নয়। প্রবীর প্রায়ই এরকম করতো। বাড়ীতে একটা কাণ্ড বাধাতো।

সেদিনকার খেয়াল আজ প্রবীরের কর্তব্যে দাঁড়িয়ে গেছে। একি শুধু অনাথকে আশ্রয় দান? না, আর কিছু? কে জানে এ করে প্রবীর দেশের কতখানি উপকার করতে চায়! না,

ভাইকে যতটা সাংঘাতিক ভাবা গিয়েছিল সে রকম কিছুই না। 'ডেস্টিট্যুট হোম' করে। দেশোদ্ধার করবে! ছেলেমানষী আর কাকে বলে? এই নিয়ে এত কাণ্ড?

তবুও সন্দেহের নিরসন হয় না। পুলিশে যখন সন্দেহ করে, না-জানি ওরা আরও কি করে! যে বিষয় নিয়ে ভায়ের সঙ্গে আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল তা এখুনি অবতারণা করবার তাগিদ যেন সমর আর বোধ করে না। তা ছাড়া সে সব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলবার দরকারই বা কি! ভালমন্দ বোঝবার প্রবীরের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে এত যখন ও বোঝে! সব বিষয়ে তার মাথা পেতে নেওয়ার দরকারই বা কি—সে মিলিটারী, আজ আছে কাল নেই! সে না-থাকলেও সংসারের কিছু এসে যাবে না। সুতরাং কার জন্যে মাথা ঘামাবে?

কিন্তু বড় ছোটর প্রশ্নটা বড় ক'রে জাগে। প্রবীর দেশে থেকে যা করেছে তাতে সে বড় না, সমর যুদ্ধে গিয়ে যা করে এসেছে তাতে সে বড়? মানুষের গোপন কুটিল লোভের চক্রান্তের দুষ্টক্ষতে ভালমানুষের মত বসে বসে মলম লাগান ভাল না, অন্যায়কে আগ্নেয় অস্ত্রে প্রতিরোধ করা কাজের, কৃতিত্বের? সমাজ সেবকের সম্মান বেশী না, রাজসেবার সম্মান বেশী? মানবধর্মে যে নীতি আর রাজধর্মে যে নীতি দুয়ের মধ্যে কোনটা মানুষের কল্যাণ করতে পারে? কে বাহবা বেশী পাবে?

সমর জিগ্যেস করে ঃ এতেই ভাবিস তুই দেশের কাজ করবি? আর এতে তোকে পুলিশে সন্দেহ করে? এমনভাবে প্রবীর জবাব দেয় যেন নিজের প্রশ্নে নিজেই লজ্জা বোধ করে সমরঃ আমি দেশের কাজ করিনি কে বললে? একটা 'ডেস্টিট্যুট হোম' করেনি বলে নিজেকে দেশসেবক বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই। তা হ'লে দুর্ভিক্ষের সময় চাঁদা তুলে খিচুড়ী ভোগ খাইয়ে উদ্বাস্তু বুভুক্ষু প্রাণকে যারা শান্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিল তারাও দেশ সেবক! বহু লক্ষ প্রাণের অকুণ্ঠ আশীর্বাদে তারা তো তাহ'লে এতদিনে দেশের নেতা হয়ে যেত! দেশের কাজ কি এত সোজা?

সমর জিগ্যেস করেঃ তা হ'লে তুই কি করিচিস্?

কিছু না। সামান্য কটা নাম-গোত্রহীন ছেলেমেয়ের সন্ধান রাখচি—যাদের অতীত বর্তমান ভয়াবহ বিভীষিকাময় তাদের ভবিষ্যৎ যদি পাঁচজনের চেষ্টায় উজ্জ্বল করে তুলতে পারি। প্রবীর হঠাৎ থেমে গিয়ে কি ভাবে, একটু পরে বলে, আমি কি করচি সেটা বড় কথা নয়, আমরা কি করতে পারি সেটাই হবে বড় কথা।

সমর ফস করে বলে ফেলে ঃ ঘরের খেয়ে মিথ্যে বনের মোষ তাড়ান! ওর চেয়ে একটা চাকরি বাকরি দেখ!

অনেক কষ্টে প্রবীর নিজেকে সামলে নেয়। তার দাদা এত স্বার্থপর! যুদ্ধে গিয়ে আর কিছু রেখে আসেনি—ছি, ছি। এরাও তো দেশের ছেলে, পরাধীন জাতের সহায়-সম্বল? কি বলবে প্রবীর? কটু বলবে? আঘাত করবে? প্রাণভরে গালাগাল দেবে—চীৎকার করে বলবে, দেশদ্রোহী নীচ গোলাম!

প্রবীরের কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকেঃ হ্যাঁ, মোষই! এই বুনো মোষরা একদিন যখন জনপদের দিকে ছুটে আসবে তখন বুঝবে। মোষ বললে কাকে? দেশ কে, তুমি? দেশ কে, বিদেশী সরকার? দেশ কে, তোমার আমার মত গুটি কয়েক শিক্ষাভিমানী? দেশের সত্যিকারের চেহারা কোথায়? আজ যাদের বুনো-মোষ বলে তোমরা আমরা অবজ্ঞা করি, সমস্ত দেশের সমগ্র রূপকে জুড়ে আছে তারাই। তুমি যুদ্ধ করচো, আমি বক্তৃতা দিয়েচি, সভ্যতার এত সব কীর্তি খাড়া করেচি, তবু দেশের রূপ এত ম্লান কেন? তোমার রূপে আমার রূপে দেশ প্রতিভাত হয়নি। হ্যাঁ মোষই ওরা!

ছোট ভায়ের কথাগুলো সমরের খুব মনে লাগে বলে মনে হয় না। বেকার ভায়ের লম্বা-চওড়া কথা! হেসে বলে তবু চাকরি-বাকরি একটা দেখতে হবে তো!

দাদার মনোগত ভাব প্রবীর এতক্ষণে যেন বুঝতে পারে। দাদার রোজগারে সংসার চলে, দাদা সকলকে খাওয়ায় পরায়, সুতরাং সকলকে তিরস্কার পুরস্কারের অধিকারও ও'র আছে। এ ভায়ের ভালর জন্যে উৎকণ্ঠা নয়, ভাইকে বসিয়ে খাওয়ানর জন্যে বিরক্তি। প্রবীর যদি নির্বিবাদে সমরের আজ্ঞাবহ হতো, দাদা বলতে অজ্ঞান হ'য়ে যেত, তা হ'লেও কি সমর প্রবীরকে চাকরির জন্যে এত পেড়াপীড়ি করতো এত কথার পরও? এখন প্রবীরের যেন হঠাৎ খেয়াল হয়, সংসারে একটা সামান্য পোষ্যের মত থাকলে দাদার কোনই আপত্তি থাকতো না হয়তো, মানুষ কষ্ট স্বীকার করে পুষতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি বাস করতে পারে না। প্রতিমতাবলম্বী বন্ধুও মানুষের অসহ্য। কর্তৃত্ব অভিমান মানুষের মজ্জাগত। মুখের ওপর সামান্য প্রতিবাদে ভজুয়ার ওপর বিরক্ত হওয়ার কারণ যেন হঠাৎ প্রবীর বুঝতে পারে। অনেক সময় আবার ভজুয়ার 'হুকুমে হাজির' হওয়ায় দু'চার আনা বকশিষ করার মনোগত ভাবটা এমন মর্মান্তিক রকমে প্রকট হয়ঃ বকশিষটা কাজের জন্যে নয়, ভজুয়ার হীনতা প্রকাশের জন্যে। তা হ'লে দাদাও কি তার কাছে তাই প্রত্যাশা করে? মনযোগান খোসামোদ!

প্রবীরকে চুপ করে থাকতে দেখে সমর যেন অপ্রস্তুত বোধ করে। আমতা আমতা করে বলে, আমি ঠিক ঐ কথাই বলচি না—মানে চাকরি তো একটা দরকার—দেশের কাজও কর—মানে—এখুনিই যে করতে হ'বে তা নয়—সেটা তো করতে হবে—যতই দেশের কাজ কর আর—

কয়েকবার পদচারণা করে সমর কথাগুলো খণ্ড খণ্ড করে ফেলে।

প্রবীর গম্ভীর হ'য়ে জিগ্যেস করেঃ এর জন্যেই কি আমাকে ডেকেছিলে?

সমর থতমত খেয়ে যায়। বলে, হ্যাঁ, মানে, অনেক কথা ছিল—বাবা বলছিলেন, বুড়ো বয়েসে এই পুলিশ হাঙ্গামা—মিছিমিছি 'কেরিয়ার'টি নষ্ট করচিস। কি দরকার?

প্রবীর বলে, আমার মনে থাকবে!

অভিমানের মত প্রবীরের কথাটা শোনায়। রাগের কথা নয়, তবু রাগ মনে হয়। সমর জিগ্যেস করে, কি মনে থাকবে? (অর্থাৎ আমাকে ভুল বুঝ না যেন!)

যা বললে। চাকরি দেখবো। বসিয়ে বসিয়ে আর কদ্দিন তোমরা খাওয়াবে! প্রবীর উঠে পড়ে।

(ক্রমশঃ)

"ক্ষুরস্য ধারা"—
সমরসেট ম'ম

অনুবাদক—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

"ওদেৎকে ও ভারী ভালোবাসত আর ওদেৎ ওকে আদর করত। ও রকম দুষ্টুমি করার জন্য আমি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতাম, কিন্তু যতই বিরক্ত করুক না কেন লারি কিছুই মনে করত না। সে সব দেখে আমি হাসতাম, উভয়ে যেন দুটি শিশু।"

আমি জানতে চাইলাম—"কি করে সময় কাটত।"

"করবার কিছু না কিছু থাকতই। একটা নৌকা নিয়ে আমরা মাছ ধরতে যেতাম, মাঝে মাঝে সরাইওলার সিত্রোঁ গাড়িটা নিয়ে শহরের দিকে বেড়াতেও যেতাম। লারীর খুব ভালো লাগত। পুরাতন বাড়িগুলো আর জায়গা সবই ওর পছন্দ। এতই শান্ত জায়গাটি যে পাথরের ওপর পদধ্বনির শব্দ আওয়াজ পাওয়া যায়। একটা লুই কোয়ার্টোরজ গ্রাম্য হোটেল একটা গির্জা, আর শহরের প্রান্তে একটা স্যাটো ছিল, আর লে নতরের একটা বাগান। সেইখানে সেই কাফেতে বসে মনে হত আমরা যেন তিনশত বছর পিছিয়ে চলে এসেছি, আর ঐ সিত্রোঁ গাড়িখানা এ জগতের বলে মনেই হ'ত না।"

এই রকম একদিন বেড়াতে বেরিয়ে লারী সুজানের কাছে তরুণ বৈমানিকের কাহিনী বলেছিল। এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে সে বিবরণ দিতেছি।

আমি বললাম ঃ "তোমাকে যে কেন বলে-ছিল তাই ভাবি।"

"কি জানি, আমিই ত' বুঝি না। যুদ্ধের সময় শহরে একটা হাসপাতাল হয়েছিল, আর গোরস্থানে ছোট ছোট ক্রুশের অসংখ্য শ্রেণী পর পর সাজান। আমরা সেটি দেখতে গিয়ে-ছিলাম। বেশীক্ষণ থাকিনি, আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল—আহা বেচারা সব পড়ে আছে। লারী বাড়ি ফেরার পথে একদম চুপ করে রইল। কোনোদিনই ও বেশী খায় না। সেদিন ডিনারে একেবারে কিছুই স্পর্শ করল না। আমার সব স্পষ্ট মনে আছে, চমৎকার তারকা শোভিত রাত, অন্ধকারের বুকে ছায়ামূর্তির মতো কাপলার গাছের শ্রেণী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আর লারী পাইপ টানছে। আর সহসা, সময়োচিত ভঙ্গীতে লারী আমাকে তার বন্ধুর কথা বল্ল—কি করে লারীকে বাঁচাতে গিয়ে ওর মৃত্যু হোল তার বিস্তৃত বিবরণ।" সুজান এক চুমুক বীয়র পান করে নিল। "ও এক অদ্ভুত প্রাণী কোনোদিনই ওকে বুঝতে পারবো না। আমার কাছে কিছু পড়ে শোনাতে ও ভালোবাসত—কখনো দিনের বেলা খুকীর জন্য যখন সেলাই করতাম সেই অবসরে—বা রাতে খুকীকে শুইয়ে দেওয়ার পর।"

"কি সব পড়ত ?"

"ও—সব রকম, মাদাম দ্য সেভিনের পত্রাবলী আর সেন্ট সাইমনের অংশবিশেষ—ভেবে দেখুন একবার ব্যাপারটা। যে আমি কখনো খবরের কাগজ ছাড়া পড়িনি এবং কদাচিৎ ষ্টুডিয়োতে কারো মুখে নেহাৎ বোকা বনে যাওয়ার ভয়ে দু-একটি নভেল পড়েছি, তার কাছে এই সব! পাঠ যে এত ভালো লাগতে পারে, জানতাম না। প্রাচীন লেখকরা লোকে যা মনে করে, সত্যই তেমন মাথামোটা ছিলেন না।"

আমি মুখ টিপে হেসে বলিঃ "কারা মনে করে ?"

"তারপর ওর সঙ্গে আমাকে দিয়েও পড়াতে শুরু করল, আমরা Phedre ও Berenice পড়লাম। পুরুষের ভূমিকায় লারী, মেয়েদের ভূমিকা আমার।"

বেশ সরলভাবে সুজান বলে "সে যে কত মজার, আপনি ভাবতেই পারেন না। করুণ অংশে যখন আমি কেঁদে ফেলতাম, তখন ও আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকতো। হয়ত আমার শরীরে তেমন শক্তি ছিল না বলেই —আর জানেন, ওসব বইগুলি আমার আজো আছে। ওর সেই মধুর কণ্ঠস্বর, এদিকে শান্তভাবে নদী বয়ে চলেছে, ওদিকে ওপারে পপলার শ্রেণী— এই সব ছাড়া তখন আমি মাদাম দ্য সেভিনের অনেক চিঠি পড়তে পারি না, আর মাঝে মাঝে মোটেই পড়তে পারি না—বুকে একটা বেদনা জাগে। এখন বুঝি আমার জীবনের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দময় দিন। ঐ লোকটি আনন্দমূর্তি, যাকিছু মধুর তারই প্রতিমূর্তি।"

সুজান ভাবছিল ও একটু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছে, আর ভয় পাচ্ছিল (অকারণেই অবশ্য) যে, আমি হয়ত ওর কথায় হাসব। সুজান কাঁধ নাড়লো এবং হাসলো।

"জানেন, আমি বরাবরই মনে মনে ভেবে আছি, যখন বয়স হবে, যখন কোন পুরুষই আর আমার সঙ্গে বিছানায় আসবে না, তখন গির্জায় গিয়ে শান্তির চেষ্টা করব, আর পাপের জন্য অনুতাপ করব। কিন্তু লারীর সঙ্গে যে পাপ করেছি, পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েই তার জন্য অনুতাপ করব না। কখনো না—কখ্খনো নয়।"

কিন্তু তুমি যেসব কথা বলে গেলে, তার ভিতর অনুতাপের ত কিছুই দেখলাম না।"

"আমি এখনো আপনাকে অর্ধেক কথা বলিই নি—দেখছেন ত আমার শরীরের গড়নটা ভালো, তারপর সারাদিন বাইরে সংসারের কোন কিছুর জন্য চিন্তা না থাকায় —তিন-চার সপ্তাহের ভিতর আমি আগের চাইতেও শক্ত হয়ে উঠলাম। আমাকে দেখাচ্ছিলও ভালো, গালে রক্ত লেগেছিল—আর চুলেরও জ্যোতি ফিরেছে। যেন আমার কুড়ি বছর বয়স হয়ে গেছে মনে হত। লারী প্রতিদিন নদীতে সাঁতার কাটত, আমি তাকে দেখতাম, ওর চমৎকার শরীর—আমার সেই স্ক্যান্ডিনেভীয়ের মত শরীরবিদের দেহ নয় বটে, তবে সুদৃঢ় ও অনন্ত মাধুর্যমণ্ডিত।"

"আমি যখন দুর্বল ছিলাম, তখন অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিল লারী, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে ওকে আর অপেক্ষায় রাখার হেতু নেই আমি ওকে দু-একবার ইশারায় জানালাম যে, আমি এখন সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত—কিন্তু ও বোধ হয় বুঝতেই পারল না। অবশ্য আপনারা এ্যাংলো-স্যাক্সনরা অদ্ভুত, আপনারা কখনো পশুর মতো সেই সঙ্গে আবার ভাবপ্রবণ; একথা অস্বীকার করা যায় না, আপনারা ভালো প্রেমিক নন। আমি মনে মনে বলতাম, হয়ত ওর কুণ্ঠা হচ্ছে, আমার জন্য ও অনেক করেছে, আমার মেয়েটিকে এখানে রাখতে দিয়েছে, হয়ত প্রতিদানে যা ওর দাবী, তার চাইতে লজ্জাবোধ করছে। সুতরাং এক রাতে, শুতে যাওয়ার সময়, আমি ওকে বললাম—তোমার ঘরে কি রাতে আসব ?"

আমি হাসলাম।

"একটু ঠোঁট কাটার মতই বল্লে, নয় ?"

"আমি ত আর আমার ঘরে শুতে আসতে বলতে পারি না; সেখানে যে ওদেৎ ঘুমোচ্ছে।" সে বেশ কৌশলে কথার জবাব দিল। "ও আমার দিকে একমুহূর্ত করুণা ভরা চোখে তাকিয়ে রইল, তারপর হেসে বল্লে 'তুমি আসতে চাও ?"

"তোমার কি মনে হয়—অমন সুন্দর ঐ শরীরে আসতে চাইব না,"

"বেশ, তাহ'লে এস।"

"আমি ওপরে গিয়ে কাপড় ছাড়লাম, তারপর বারান্দা দিয়ে ওর ঘরে এসে পেঁাছলাম। বিছানায় শুয়ে ও পাইপ টানছিল আর বই পড়ছিল। পাইপটা নামিয়ে বইটা রেখে আমার জন্য সরে গিয়ে ও জায়গা করে দিল।"

সুজান কয়েক মুহূর্তে নীরব রইল, আর ওকে কোনো প্রশ্ন করতে আমার বুদ্ধিতে বাধলো। কিন্তু একটু পরেই ও আবার বলতে লাগল...

"প্রেমিক হিসাবে ও অপূর্ব! ভারী মধুর, প্রেমময় ও কোমল, কামোন্মত্ত নয় অথচ তেজোময়, আপনি বোধ হয় আমার কথা বুঝবেন—আর এতটুকু পাপের ছাপ ওর মনে নেই। স্কুলের ছেলের মতো উত্তপ্ত ওর প্রেমাবেগ। ব্যাপারটি মজার বটে, কিন্তু হৃদয়-স্পর্শী। যখন আমি ওকে ছেড়ে চলে এলাম, তখন আমার মনে হল ওর চাইতে আমারই বরং ওর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমি দরজাটা ভেজিয়ে দেওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম লারী বইখানি তুলে নিয়ে যেখানে ছেড়েছিল আবার সেইখানে শুরু করছে।"

আমি হাসতে লাগলাম।

কিঞ্চিৎ গম্ভীরভাবে সুজান বলেঃ "আপনি যে কথাগুলিতে মজা পেলেন তাতে আমি খুশি হয়েছি।" সুজানের রসজ্ঞানের অভাব ছিল না, তাই সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। "আমি অল্পদিনেই বুঝলাম যদি নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকতে হয় তাহলে অনন্তকাল অপেক্ষায় থাকতে হবে—তাই অন্তরে বাসনা হলেই আমি ওর ঘরে গিয়ে বিছানা নিতাম। সর্বদাই লারী ছিল মনোরম। ওর স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তি ছিল কিন্তু ও এতই ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক থাকে যে খেতে ভুলে যায়, কিন্তু সামনে ভালো খাদ্যদ্রব্য ধরলে তা গোগ্রাসে খায়। মানুষ যখন আমার প্রেমে পড়েছে আমি বুঝেছি। কিন্তু লারী আমার প্রেমে পড়েছে একথা মনে করলে বলতে হবে আমি নির্বোধ, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল ওর হয়ত আমাকে সয়ে গেছে। জীবনে মানুষের ব্যবহারিক হ'তে হয়—তাই মনে মনে ভাবতাম প্যারীতে ফিরে আমাকে যদি লারী ওর সংগে থাকার জন্য নিয়ে যায় তাহলে ভালো হয়। আমার সহজাত বুদ্ধি সতর্ক করেছিল ওর প্রেমে পড়া নির্বোধের কাজ হবে। আপনি ত' জানেন মেয়েরা কত দুর্ভাগা, তাই তারা যখন প্রেমে পড়ে তখন আর তারা ভালোবাসার পাত্রী থাকে না, আমি তাই সতর্ক থাকার জন্য মনস্থির করে ফেললাম।"

সুজান সিগারেটটি টেনে নিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। রাত হয়েছিল, অনেক টেবল শূন্য হয়ে গেছে, তবু কয়েকজন প্রাণী 'বারে' ঘোরাফেরা করছে।

"একদিন প্রাতে ব্রেকফাস্টের পর; আমি নদীর ধারে বসে সেলাই করছিলাম, আর ওদেৎ লারীর এনে দেওয়া কতকগুলি ইট নিয়ে খেলা করছিল, এমন সময় লারী এসে পেঁাছল।

সে বলল "আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

আমি বল্লাম—"চিরদিনের জন্য নয়—নিশ্চয়ই!"

"তুমি ত' এখন বেশ সুস্থ আছ, আর বাকী গ্রীষ্মটুকুর জন্য এবং প্যারীতে গিয়ে গুছিয়ে বসার উপযুক্ত যথেষ্ট টাকা এই রহিল।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি এতই মুহ্যমান হয়ে গেলাম যে মুখ দিয়ে কোনো কথা প্রকাশ হ'ল না। লারী আমার সামনে দাঁড়িয়ে ওর সেই অপরূপ ভঙ্গীতে হাসতে থাকে।

আমি জানতে চাইলাম—"আমি কি কিছু অসন্তোষকর কাজ করেছি?"

"না, না, কিছুই না—ওকথা কখনও মনে ভেবো না। আমাকে কাজ করতে হবে, এখানে চমৎকার সময় কাটলো। ওদেৎ এসো তোমার কাকাকে বিদায় জানিয়ে যাও।"

"ওদেৎ এসব কথা বোঝার পক্ষে খুবই শিশু।—লারী তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো খেল, তারপর আমাকে চুমো খেয়ে হোটেলে ফিরে গেল, এক মিনিটের ভেতরই গাড়ি ছেড়ে দিল। আমার হাতের ভিতর ব্যাঙ্ক নোটগুলির দিকে তাকিয়ে দেখি বারো হাজার ফ্রাঁ। এত তাড়াতাড়ি সব ঘটে গেল যে আমার ভাববার অবসর রইল না। আমি ভাবলাম—যাকগে, একটা বিষয়ের জন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে ওর প্রেমে পড়িনি। কিন্তু আমি এর মাথামুণ্ডু ভেবে পাইনি।"

আবার আমাকে বাধ্য হয়ে হাসতে হ'ল।

"জানোত, শুধু সত্য কথা বলার সরল পদ্ধতিতে একদা রসিক বলে আমার খ্যাতি ছিল,—অনেকের কাছে তা এতই বিস্ময়কর মনে হ'ত যে তারা ভাবত আমি রহস্য করছি।"

"আমি এর সংগে কি সম্পর্ক আছে বুঝতে পারছি না।"

"আমার ত' মনে হয়, লারী একমাত্র ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ অনাসক্ত। এর দরুণ কার্যাবলী অদ্ভুত ঠেকে। শুধুমাত্র ভগবানের প্রতি প্রীতি বশত মানুষ এমন কাজ করে যাতে তার বিশ্বাস নেই—এমন মানুষ দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই।

সুজান আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

আমি বলি "বন্ধু হে—একটু পান করে ফেলেছ।" (ক্রমশ)

ভারত রাষ্ট্রের সহিত পাকিস্থান রাষ্ট্রের যে সকল বিষয় লইয়া কয়দিন আলোচনা হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ-দিগের অর্থাৎ ভারতে মুসলমানদিগের ও পাকিস্থানে হিন্দুদিগের সমস্যার গুরুত্ব আমাদিগের পক্ষে অসাধারণ। উভয় রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ-দিগকে যথাসম্ভব রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে এবং সেজন্য যথাসম্ভব চেষ্টা হইবে। গত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় আলোচনা ফলে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে সকল ব্যতীতও কয়টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যা সম্বন্ধে সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য যৌথ সংবাদপত্র পরামর্শ পরিষদ গঠিত হইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, উদ্দেশ্য সাধু হইলেও অনেকক্ষেত্রে কাজে সুফল ফলে না এবং উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতেও পারে। আমাদিগের ভয় হয়, নূতন পরামর্শ পরিষদ গঠনের ফলে কেবল সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচই হইবে। অর্থাৎ অনেক সত্য সংবাদ—সম্প্রীতি রক্ষার অজুহাতে প্রকাশ করা যাইবে না। সংবাদপত্রের প্রাথমিক কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা দুষ্কর হইবে। এ বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; কেননা, সংবাদপত্রসকল ভুক্তভোগী।

কলিকাতায় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সে সকল কি পাকিস্থানের দ্বারা যথাযথরূপে পালিত হইয়াছে?

আমরা নিম্নে একটি ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি—

আসাম নওগাঁয় একটি হিন্দু তরুণী আদালতে তাঁহার বলপূর্বক হরণের ও অত্যাচার ভোগের বিবরণ কাঁদিতে কাঁদিতে বিবৃত করেন। তাঁহার নাম—সরলা; পূর্ব নিবাস ময়মনসিংহে। লাহারীঘাটে কয়জন মুসলমানের নিকট হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। তিনি যখন পীড়িত স্বামীর শুশ্রূষা করিতেছিলেন, সেই সময় কয়জন মুসলমান বলপূর্বক তাঁহাকে লইয়া যাইয়া আর একজন মুসলমানের নিকট সমর্পণ করে। তাঁহাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া ও ঘৃণিত জীবন-যাপনে বাধ্য করা হয়। পরে তাঁহাকে কুষ্ঠিয়া চরে আনিলে তথায় আরও দশজন লোক আসিয়া অপহরণকারীদিগের দল বৃদ্ধি করে। তাঁহাকে আজারবাড়ীতে আনিয়া ওয়াহেদ কবিরাজের কাছে রাখা হয়। এই স্থানে মাজু মোড়ল তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া পুলিশে সংবাদ দিলে অত্যাচারকারীরা আবার তাঁহাকে লইয়া যায়; কিন্তু তাহারা অধিকদূর যাইবার পূর্বেই মাজু ও তাহার পুত্রগণ পুলিশের সাহায্যে সরলার উদ্ধার সাধন করে।

এ বিষয়ে পাকিস্থান সরকার কি বলিবেন? পূর্ববঙ্গে নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় যে পৈশাচিক ব্যাপার ঘটে, তাহার পরে অত্যাচারী-দিগকে ধর্মনির্বিশেষে—অতি কঠোর দণ্ড না দিলে যে কোন সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে নিরাপদ করিতে পারেন না, পাকিস্থান সরকার যে তাহা বুঝেন না, এমন মনে করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা কি সেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বা করিতেছেন? আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, নোয়াখালীর গোলাম সারওয়ার পাকিস্থান সরকারের নিকট কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছে?

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব যে বলিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্থান হইতে প্রায় ১৫ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব পাকিস্থানের প্রধান সচিব তাঁহার কথা অতি-রঞ্জিত বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, ১৫ লক্ষেরও অধিক হিন্দু নোয়াখালী-ত্রিপুরার অত্যাচারের পর হইতে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন। ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞান পরিষদ অনুসন্ধানকল্পে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত আগন্তুকদিগের সংখ্যা বোধহয়, সাড়ে ১৩ লক্ষ হইবে। কলিকাতায় আগন্তুক-দিগের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ ৩ হাজার ৩শত ২৯; কলিকাতার উপকণ্ঠেও ২৪ পরগণার সংখ্যা—১ লক্ষ ২৬ হাজার ৮শত ৫৫; বর্ধমানে সংখ্যা—৭৮ হাজার ৮শত ৪৪; নদীয়ায় সংখ্যা—৬৭ হাজার ৯শত ৭৯; পশ্চিম দিনাজপুরে সংখ্যা—৫০ হাজার ৯শত ৫৯; হুগলীতে সংখ্যা—৩৪ হাজার ১ শত ১৮; মুর্শিদাবাদে সংখ্যা—২৮ হাজার ৪শত ২০; জলপাইগুড়িতে—১৭ হাজার ৪; মেদিনীপুরে সংখ্যা—১৫ হাজার ৯শত ৫৭। এই বাস্তু-ত্যাগীদের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ২শত ৫০জন চাকুরী ও ৫৪ হাজার ৯শত ৯৪জন ব্যবসা করিত। ইহাদিগের মধ্যে শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতিও ছিলেন।

কলিকাতায় এবং নদীয়া জেলায় নবদ্বীপে, রাণাঘাটে ও শান্তিপুরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, হিসাবে অতি-রঞ্জন থাকাত দূরের কথা—সংখ্যা অল্পই ধরা হইয়াছে।

এইজন্যই আমরা বলিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগন্তুকদিগের হিসাব না রাখিয়া ভুল করিয়াছেন। অবশ্য বাঙলা বিভাগের পূর্বেও বহু হিন্দু পলাইয়া আসিয়াছেন এবং গান্ধীজীর উপস্থিতি ও উপদেশও তাঁহাদিগকে বাস্তুত্যাগে নিরস্ত করিতে পারে নাই। বাস্তবিক গান্ধীজীর পূর্ববঙ্গে গমনে বিলম্ব ঘটাইবার জন্য তৎকালীন লীগ মন্ত্রি-মণ্ডল যে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে তাঁহাকে বিহারে যাইতে প্ররোচিত করিবার যে আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছে, তাহা পূর্ববঙ্গে মুসলমানদিগের অত্যাচারের স্বরূপ গোপনের জন্য। সে কাজে যে বাঙলার তৎকালীন গবর্ণর বারোজও সহায় হইয়াছিলেন, তাহা বিলাতে পার্লামেণ্টে তাঁহার বিবৃতির আলোচনায় বুঝা গিয়াছিল। তখন যে সকল হিন্দু চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হিসাব পাওয়া দুষ্কর।

অথচ আমরা দেখিতেছি, পূর্ব পাকি-স্থানের প্রধান সচিব নিতান্ত নির্লজ্জভাবে বিধানবাবুর উক্তি মিথ্যা বলিয়াছেন এবং বিধানবাবু যে বলিয়াছিলেন, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে মুসলমানরাও পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, পূর্ব-বঙ্গের বাস্তুত্যাগীরা প্রতিদিন ট্রেন পূর্ণ করিয়া পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইতেছেন!

গত ৬ই অক্টোবর পুলিশ যশোহরের খ্যাতনামা কর্মী মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ও বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদারের গৃহে খানাতল্লাস করে। সুরেন্দ্রবাবু সেই দিন যশোহর ত্যাগ করেন। তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের দুর্গাপূজার জন্য পরদিন গ্রামের গৃহে যাওয়ার কথা ছিল। যশোহরের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন হওয়ায় সুরেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা উকীল বিজয়বাবু পুলিসের অনুমতি লইয়া পরদিন, পূর্ব ব্যবস্থামত ট্রেনে সকলকে লইয়া যাত্রা করেন। যশোহরের গৃহে একজন আত্মীয়, একজন কর্মচারী ও একটি ভৃত্য রাখিয়া তাঁহারা ৪ দিনের জন্য গমন করেন। ঐ পরিবারের লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ হইবে। ১৩ই অক্টোবর তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখেন বাড়ি হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া পুলিস বাড়িটি তালাবন্ধ করিয়াছে। বার বার আবেদন করিয়াও বিছানা, কাপড় এমন কি চশমা পর্যন্ত পাইবার অনুমতি লাভ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার পরে তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে ঐ গৃহে কয়জন সরকারী কর্মচারীর বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অথচ মিস্টার জিন্না হইতে আরম্ভ করিয়া মিস্টার নূরুল আমিন পর্যন্ত বলিতেছেন, পাকিস্থানে হিন্দু যে সদ্ব্যবহার পাইতেছে,

ভারত রাষ্ট্রে মুসলমানেরা তাহা পাইতেছে না। এইরূপ উক্তিতে বিদেশীদিগকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হইতে পারে, এই পর্যন্ত।

যশোহরে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদার ও ডক্টর জীবনরতন ধর যে ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহাতে কি মনে করা যায়—শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিলে, তাহার পরে ভীতিনত হিন্দুরা হয় সর্ববিধ হীনতা স্বীকার করিবে, নহেত মুসলমান হইবে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা করেন নাই। অথচ শিক্ষাবিস্তার যে দেশের উন্নতির প্রথম সোপান তাহা অবশ্য স্বীকার্য। এ বিষয়ে জাপানের দৃষ্টান্ত সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাপানী সরকার ঘোষণা করেন, সরকারের অভিপ্রায় এই যে, কোন গ্রামে একটিও নিরক্ষর পরিবার এবং কোন পরিবারে একজনও নিরক্ষর লোক থাকিবে না। সেই উদ্দেশ্যে যে কাজ হয়, তাহাই জাপানের দ্রুত উন্নতির কারণ। এদেশে ইংরেজ সরকার এ বিষয়ে প্রাথমিক কর্তব্য পালন করেন নাই। পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে যখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, তখন সরকার তাহার বিরোধিতা করেন।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার পূর্বেই চতুষ্পাঠীর সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা অধিক নহে—সংস্কৃত শিক্ষার আর পূর্বের মত আদর নাই। যদিও পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর ডক্টর কাটজু বলিয়াছেন, সংস্কৃতই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা সংগত এবং যদিও দেখা যাইতেছে, স্বদেশীয় ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে আফগানিস্থানের সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পাঠ বাধ্যতামূলক করিয়াছেন, তথাপি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিকল্পিত পরিবর্তনের জন্য ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। সহসা নবদ্বীপে ও মেদিনীপুরে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্কৃত শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন, তাহা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুমোদিত বলা যায় না। সে ব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষা সরকারের দ্বারাই প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হইত। সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের যে ভোটার-তালিকা প্রস্তুত হইতেছে, পণ্ডিত-সভা তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন; কারণ তাঁহাদিগের বিশ্বাস, ঐ তালিকায় যাঁহাদিগের পশ্চিমবঙ্গে টোল নাই, এমন অনেক লোকের নাম থাকিবার সম্ভাবনা। তাহা অভিপ্রেত নহে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রকৃত ইতিহাস রচনার ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজির পঠনপাঠন বর্জন করিতেছেন, তাহা অবশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু বাহিরের কাজ, হাতের কাজ, কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতির পুষ্টি-সাধন প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বে আমরা কলিকাতায় দুইটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছিলাম—

(১) এলবার্ট টেম্পল। যখন রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তখন ময়মনসিংহের জমিদার (পরে রাজা) হরিশ্চন্দ্র রায়ের দানে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি পত্তন হয়। ইহাতে শিল্প

শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখনও এই প্রতিষ্ঠানের তহবিলে টাকা মজুত আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার পরিচালন-ভার লইয়া কলিকাতার উত্তরাংশে একটি উপযুক্ত শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন।

(২) পরলোকগত মাণিকলাল শীল—ভূপেন্দ্রনাথ বসুর প্ররোচনায় পান্নালাল শীলের নামে যে কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ও পরিচালনার জন্য অর্থ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কিভাবে—কি উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতেছে, তাহাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখিতে পারেন। এই দুইটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দাতৃগণের অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হয়, তাহা আমরা সরকারকে দেখিতে বলিয়াছি—আবার বলিতেছি। গড়া জিনিস রক্ষা করা সহজ—কেবল তাহাকে নষ্ট হইতে না দেওয়া প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আমরা আজ আর একটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি, "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষা শিবির" নামক অবৈতনিক শিল্প-শিক্ষায়তন। আমরা ইহার বিবরণ পাঠ করিয়াছি। কয়জন উৎসাহী শিক্ষাব্রতীর ত্যাগের উপর এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে শিক্ষক প্রস্তুত করিবার সুব্যবস্থাও আছে। আমাদিগের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিবের দৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই—হইলে ইহা দৈন্যমুক্ত হইয়া সমাজের সমধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারিত। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গে কিরূপ প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কেহ কেহ ওয়ার্ধা পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষার সমর্থক। আমাদিগের মনে হয়, সেই শিক্ষা-পদ্ধতি যদি পশ্চিমবঙ্গে প্রবর্তন করা হয়, তাহা হইলেও তাহাতে আমাদিগের পুরাতন পদ্ধতি হইতে অনেকাংশ গ্রহণ করিয়া তাহা আমাদিগের সমাজের উপযোগী করা যায় এবং তাহা করা কর্তব্য। পাঠশালায় যেমন "সর্দার পড়ুয়ারা" নিম্ন শ্রেণীতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিত, তাহার পুনঃ প্রবর্তন হইলে শিক্ষাদানের ব্যয় অনেক কমিয়া যায়। আমাদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুভংকরীর পুনঃ প্রবর্তন প্রয়োজন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙলার স্কুল ইন্সপেক্টর মিস্টার স্টার্ক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিদ্যালয়ে 'শুভংকরীর' প্রচলন বন্ধ হওয়ায় অঙ্কে বাঙালী ছাত্রের নৈপুণ্য হ্রাস পাইয়াছে। শুভংকর স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং বিষ্ণুপুর রাজ্যের দেওয়ানী করিতেন। তিনি যেরূপ সরল ও সংক্ষিপ্ত কবিতায় অঙ্কের মূল সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ আর কোন দেশে কেহ করিয়াছেন কিনা, সন্দেহ। সে সকল সূত্র অতি সহজে মুখস্থ হয় এবং বালক-বালিকারাও সেই সকলের সাহায্যে অঙ্ক মুখে মুখে সমাধান করিতে পারিত। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—জাতীয় শিক্ষারই মত, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাহার কাজের উপযুক্ত করা। তাহা উচ্চশিক্ষা হইতে বিভিন্ন—কেবল প্রয়োজনে উচ্চশিক্ষার সোপানরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পূর্বে ইংরেজী শিক্ষার গৌরব ও উপযোগিতা ছিল—এখন আর তাহা নাই। এখন শিক্ষার্থীর মাতৃ-ভাষায়—পশ্চিমবঙ্গে বাঙলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপায় করিতে হইবে। অতীতের ভ্রম হইতে মনকে মুক্তি দিতে হইবে।

শিক্ষার অন্য উপায়ও পূর্বে ছিল। সে সকল উপায়—কথকতা প্রভৃতি যদি আজ পুনঃ প্রবর্তন সম্ভব না হয়, তবে তাহার স্থানে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সঙ্গে বক্তৃতার প্রবর্তন অনায়াসে হইতে পারে। যেকালে একালের মত—য়ুরোপীয় প্রথাসম্মত—প্রাথমিক শিক্ষা ছিল না, সেকালেও লোকশিক্ষার উপায় ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্য সিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্মের কূটতর্ক সকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম চরণকে আর্দ্র করে......সেই কূটতত্ত্বময়, নির্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্বোধ্য ধর্ম শাক্য সিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে, গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিবরী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোক-শিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্‌বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম শিখাইলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না?"

বঙ্কিমচন্দ্র নিদান নির্ণয় করিয়াছিলেন—ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমাজের অবশিষ্ট অংশের সহিত সহানুভূতির অভাবই বর্তমান দুর্দশার কারণ। হয়ত সমাজে ভেদ সৃষ্টিই বিদেশী শাসকদিগের অভিপ্রেত ছিল। আজ বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় সে ভাবের পরি-বর্তন করিতে হইবে; বুঝিতে হইবে, সমাজের যে বিরাট অংশ হইতে সমাজের শক্তি উদ্গত হয় তাহা যদি অজ্ঞতাহেতু পঙ্গু হয়, তবে সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, সেইজন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অশিক্ষিতের উন্নতি সাধনের আন্তরিক চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সাধনে অধিক মনোযোগ দিতে হইবে—সে জন্য আবশ্যক অর্থ দিতে হইবে। যাহাতে বিরাট কৃষক সম্প্রদায়ের বালক বালিকারা কৃষিকার্যের অবসরে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা না করিলে হইবে না। শিক্ষকগণও যাহাতে অনন্যকর্মা হইয়া শিক্ষাদানকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। ইংরেজের শাসনপদ্ধতির যে সকল ব্যবস্থা আমরা ব্যয়-বহুল বলিয়া নিন্দা করিয়া আসিয়াছি, সে সকল বর্জিত বা সংশোধিত হয় নাই।

শিল্প ব্যবসায়ে এদেশে এতদিন ইংরেজরা যে অতিরিক্ত সুযোগ লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা এখনও দূর হয় নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম, যুদ্ধের জন্য বৃটেনের নিকট ভারতের যে অর্থ প্রাপ্য তাহা দিয়া এদেশে বৃটিশ ব্যবসায়ীদিগের পাটকল, কয়লা খনি প্রভৃতি ভারত সরকার ক্রয় করিয়া লইবেন—শিল্পের জাতীয়করণের সূত্রপাত হইবে। কিন্তু

আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা করা হয় নাই। এখন পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ পাটকল, অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কয়লার খনি, অধিকাংশ উৎকৃষ্ট চা-বাগান বিদেশীর হস্তগত। বিদেশী ব্যবসায়ীরা যে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পূর্বে সম্ভোগ করিতেন এখনও তাহা সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বিদেশীর বৃহৎ কয়লার খনির জন্য সরকার রেলে অধিক মালগাড়ী দেওয়ায় পশ্চিম বঙ্গেও বহু ক্ষুদ্র কয়লার খনি বন্ধ হইয়াছে—ইতোমধ্যেই কয়লা চালান দিতে না পারায় যে ৮০টি ভারতীয়ের কয়লার খনিকে কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে সে সকলের ৪০টি বাঙ্গালীর। কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাব দিয়াছেন, ঐ সকল খনিতে ৬ কোটি টাকার কয়লা মালগাড়ীর অভাবে খনির মুখে পড়িয়া বিকৃত হইতেছে। আমরা বলিয়াছি, এখনও এ দেশে বড় বড় কল-কারখানা ইংরেজের। সে সকলের পরিচালকগণ ইংরেজের খনির কয়লা ব্যবহার করিয়া স্বজাতির উন্নতি সাধনেই আগ্রহসম্পন্ন। এতদিন সে সকল খনিতে রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত "পোড়া কয়লা" প্রস্তুত করা হইত না। এখন "গাছেরও পাড়িব, তলারও কুড়াইব" নীতিতে সে সকল খনিতেও "পোড়া কয়লা" প্রস্তুত করা হইতেছে এবং সে সকল খনির জন্য অধিক মালগাড়ী বরাদ্দ হওয়ায় দেশীয় খনিসমূহের আরও ক্ষতি হইতেছে। কেন এরূপ হয়, তাহা কি ভারত সরকার দেশের লোককে বলিবেন?

ভারত সরকার আজকাল উটজ শিল্পের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন। উটজ শিল্পের প্রয়োজন ও উপযোগিতা কৃষি-প্রধান দেশে যত অধিক, তত আর কোথাও নহে। বাঙলার গভর্নররূপে স্যার জন এণ্ডারসন বলিয়াছিলেন—এই কৃষিপ্রধান প্রদেশে ব্যবস্থার ত্রুটিতে লোক ১২ মাসের মধ্যে ৯ মাসকাল কাজের অভাবে অলস হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এদেশের উটজ শিল্পের সর্বনাশই এইরূপ শোচনীয় অবস্থার কারণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে পূর্ববঙ্গ হইতে বহু লোকের আগমনে সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। তাঁহারা অবিলম্বে এবিষয়ে অবহিত হইলে ভাল হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবন্ধ আহ্বান

জামসেদপুর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলনের সাধারণ, বিজ্ঞান, শিশু-সাহিত্য ও সাহিত্য এই চারিটি অধিবেশনে পড়িবার উপযোগী রসরচনা, কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রেরণের জন্য সকল সাহিত্যসেবীর নিকট আমন্ত্রণ জানাইতেছি। প্রবন্ধ সরস, হৃদয়স্পর্শী ও অনতিদীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন এবং লেখকের নিজস্ব মনন-শীলতা ও মৌলিকতার ছাপ থাকা বাঞ্ছনীয়। ফুলস্ক্যাপ সাইজ কাগজে অনধিক দেড়শত পংক্তির মধ্যে লিখিয়া লেখকের নাম ও ঠিকানা-সহ রচনা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

—শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত, সহ-সম্পাদক, জামসেদপুর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। ৩৮, গণ্ডক রোড, পোঃ জামসেদপুর, বি-এন-আর।

জাতীয় অভ্যুত্থানের সংগীত রূপায়ণ গীতিনাট্য অভ্যুদয়

ভারতীয় নাট্যকলা কেন্দ্রের প্রযোজনায় কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের সুখ্যাত গীতিনাট্য অভ্যুদয়ের হিন্দী সংস্করণ শীঘ্রই মঞ্চস্থ হইবে। তরুণ কবি শ্রীপুষ্কর বাঙলার মূল ছন্দ ও ভাব সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখিয়া হিন্দী ভাষান্তরণ কার্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানের নৃত্য পরিকল্পনা করিতেছেন শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন এবং যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীত পরিচালনা করিতেছেন শ্রীজিতেন গলুই (উদয়-শঙ্কর সম্প্রদায়) ও শ্রীহীরক রায়। সংগীতাংশে অংশগ্রহণ করিতেছেন যথাক্রমে শ্রীমতী প্রতিভা কাপুর, শ্রীহিতব্রত রায়, শ্রীগোপাল বসু, শ্রীশিবব্রত রায় প্রভৃতি। শিল্প নির্দেশ করিতেছেন শ্রীবঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীধীরেন ঘোষ ও শ্রীকল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়। সকল দিক হইতে এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শিল্পিগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

বক্‌সা ক্যাম্প

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

ক্যাম্পের বাহিরে কিন্তু দুর্গের সীমানার মধ্যেই উত্তর দিকে হাত ত্রিশেক নীচু জমিতে পাথর কাটিয়া খেলার মাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সে-মাঠে একপাশে মাটিও ছিল। মাঠটিতে সিপাহীরা ফুটবল ও হকি খেলিয়া থাকে, কারণ ব্যায়াম করিলে মনে সুখ ও শরীরে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং সিপাহীদের এদুটি জিনিসের নাকি বেশী আবশ্যক, সামরিক কর্তৃপক্ষ বহু আগেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। খেলার মাঠে রিহার্সেল না দিয়া কোন সেনাপতিই লড়াইয়ের মাঠে সৈন্য-চালনা করিতে রাজী হয় না। আর আমরাও তো একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সৈন্যই, ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে 'প্রিজনার অব ওয়ার' হইয়া আপাততঃ দুর্গে আটক আছি, খেলার মাঠে আমাদের দাবী না মানিলে চলিবে কেন, ইহাই হইল রণুবাবুর বক্তব্য।

কমাণ্ডাণ্ট ফিনী সাহেবের পরিচয় কিছু দেওয়া হইয়াছে, তিনি কিছুতেই মাঠ ছাড়িতে রাজী হন না। অনেক ধস্তাধস্তির পর মাঠে আমাদের সরীকত্ব মানে পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠিত হইল। মাঠে স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রণুবাবু আদা-জল খাইয়া লাগিয়াছিলেন, সামনে ছিলেন ভূপতিদা ও ক্ষিতীশবাবু। অবশেষে একটা রফায় আমরা উপনীত হইলাম।

প্রথম বন্দোবস্ত হইল যে, মাঠটি আমাদের জন্য চার দফায় খোলা হইবে আধ ঘণ্টা করিয়া। প্রত্যেক দফায় চব্বিশ জন লোক মাঠে যাইবার ছাড়পত্র পাইবে, বাইশজন খেলোয়াড়, একজন রেফারী এবং একজন দর্শক, মোট সংখ্যা চব্বিশই হয়। আমরা সম্মত হইয়া গেলাম।

সম্মত হইবার কারণ এই যে, ছুঁচ হইয়া ঢুকিলে ফাল হইয়া বাহির হইবার কথাটায় আমাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। তা ছাড়া, ফিনী ব্যাটা রাজবন্দী কি চীজ না বুঝিয়া আমাদের মাঠে ছাড়িতে সাহস পাইতেছে না। এক দুর্গের দিকটা বাদ দিয়া মাঠের অপর তিন দিকে শুধু তারকাঁটার বেড়া, কে জানে যদি দলবদ্ধভাবে আমরা পলাইবার চেষ্টা করি। অবশ্য এই কাঁটার বেড়া এমনই মজবুত ও ঘন করিয়া তৈরী যে, পলায়ন সম্ভব ছিল না। তবু সাবধানের মার নাই, এই বুদ্ধিকে বুড়ীর মত ফিনী সাহেব ছুঁইয়া রহিলেন। যদি প্রমাণ হয় যে, খেলার মাঠে আমরা খেলিতেই যাই, তাহা হইলে সকালে ও বিকালে দুই বেলা আমাদের জন্য সপ্তাহে চারদিন সাহেব মাঠ খোলা রাখিবেন, বাকী তিন দিন মাঠ থাকিবে সিপাহীদের দখলে ও ব্যবহারে। পরে সপ্তাহে একদিন বাদ দিয়া ছয়দিনই মাঠ আমাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিতে ফিনী সাহেব বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই মাঠে কি খেলাই আমরা খেলিয়াছি, মনে পড়িতে রোমহর্ষণ হয়। নিজের কথা মনে আছে, চারদফায় চারবারই মাঠে গিয়া হকি খেলিয়াছি, দুপুরের আগে দুবার, দুপুরে একবার, আর বিকালে একবার। সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় 'প্রভু' হেড কোয়ার্টারে থাকিতেন না, প্রত্যেকবারই পুরোভাগে থাকিয়া প্রত্যেক ব্যারাক হইতে রিক্রুট সংগ্রহ করিয়া বাহিনী প্রস্তুত করিয়া লইয়া বাহির হইতেন। খেদাইয়া জড় করিবার কাজ যদি রণুবাবু নিজে হাতে না নিতেন, তবে চার দফার তিন দফাতেই মাঠ খেলোয়াড়শূন্য থাকিত, এক বিকালের দিক ছাড়া। কালটা ছিল শীত, ইহা স্মরণ রাখিবেন, তাও আবার পাহাড়ী শীত।

হকি খেলাতে প্রভু সত্যই ওস্তাদ ছিলেন; আমাদের কাছে তিনিই ছিলেন ধ্যানচাঁদ। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমরা যত না বল পিটাইয়াছি, তার হাজারগুণ অধিক পিটাইয়াছি একে অপরের ঠ্যাং। বল মার খাইয়াও মড়ার মত চুপ করিয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু হকি স্টীকের বাড়ি খাইয়া ঠ্যাং হইতে রক্ত ঝরিতে থাকিলে চুপ করিয়া থাকা আমাদের পক্ষে সত্যই কষ্টকর হইত, তখন খেলাটা যা জমিত, ভাবিতে আবার রোমহর্ষণ হয়।

কয়েকজন খেলোয়াড়ের টাইমিং এমন নিখুঁত ছিল যে, প্রত্যেকবারই বল তাক করিয়া কার্যকালে স্বপক্ষ বা বিপক্ষের ঠ্যাংয়ে মারিয়া বসিত। প্রভু তাঁর শিক্ষার এমন চমৎকার ফল দেখিয়া সানন্দে উৎসাহ দিতেন, "সাবাস কেষ্টবাবু, এমন হাত যশ বড় দেখা যায় না, লক্ষ্যভেদে অর্জুনকেও কাঁদিয়ে ছাড়লেন।"

কেষ্টবাবু জবাব দিতেন, "প্রত্যেকবারই দেখছি কেউ না কেউ ঠ্যাং বাড়িয়ে দেবে, বল আর মারা হয় না।"

একদিন ফিনী সাহেবকে গিয়া রণুবাবু বলিলেন—"সাহেব, তোমার সিপাই টীমের সঙ্গে আমরা হকি ম্যাচ খেলতে চাই।" প্রস্তাবে সাহেব প্রথমটা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, "আচ্ছা। এ খুব ভালো প্রস্তাব।" সাহেব নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন।

দুদিন সাহেব আমাদের খেলা দেখিলেন, তারপর রণুবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "ম্যাচ খেলার প্রস্তাবটা বাতিল করতে হোল?"

—"কেন?"

—"ফল ভালো হবে না। তা ছাড়া, উপর থেকে অনুমতি পাওয়া যাবে না।"

কথাটা যুক্তিযুক্ত। প্রভু ভাবিত হইলেন, কি উপায়ে ব্যাটাকে সম্মত করা যায়।

ফিনী সাহেব বলিয়া বসিলেন, "You are dangerous players" বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। প্রভুও হাসিয়া ফেলিলেন এবং এতক্ষণে আসল কারণটা অনুমান করিতে সক্ষম হইলেন। ফিনী সাহেব আমাদের খেলা দেখিয়াই মনে মনে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। নিজেদের ঠ্যাং হইতে রক্ত ঝরাইতে যাদের এত উৎসাহ সিপাহীদের ও সাহেবের ঠ্যাংগুলির প্রতি তাদের আসক্তি ও আগ্রহ যে কি প্রকারের হইবে, সাহেব তাহা মানসচক্ষে দেখিয়া লইতে পারিয়াছিলেন এবং পরিণামে কোথাকার জল কোথায় গিয়া গড়াইতে পারে, তাহাও তিনি দেখিয়া লইয়াছিলেন।

তাই সংক্ষেপে বলিলেন, "you are dangerous players."

চোখ বুঝিলে আজও সেই পাহাড়ের মাঠ চোখে পরিষ্কার দেখিতে পাই এবং যে বিপজ্জনক ও রোমহর্ষক খেলা তথায় আমরা খেলিয়া আসিয়াছি, তাহার পুনরভিনয় মানস মাঠে দেখিতে পাই। আজ প্রৌঢ় জীবনের শান্ত নির্জনতা হইতে সেদিকে তাকাইয়া দেখি, আর ভাবি যে, যৌবন আমাদের জীবনেও একদিন আসিয়াছিল। এত প্রাচুর্য, এত অমিত বেহিসাবী ব্যয় একদিন সত্যই দেখা দিয়াছিল—শৃঙ্খল-মুক্ত ঝড়ের মত, বাঁধমুক্ত বন্যার মত মেঘমুক্ত আলোর মত এই আমাদের জীবন।

যাঁরা সৃষ্টির গোড়ার চক্রান্তটা ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁরা 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে' বলিয়া একটা মোক্ষম কথা ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। ঐ চাকাটায় যে মাঝে মাঝে তেল দিতে হয়, কথাটাই কিন্তু তাঁরা একদম চাপিয়া গিয়াছেন। আমাদের চাকাটাও আটকাইয়া গেল, খেলার মাঠে পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে হাঙ্গামা দেখা দিল। চাকায় কি তৈল নিষেক করিলে তার গতি মসৃণ, সহজ ও চালু হইতে পারে, আমরা সেই সমস্যায় নিপতিত হইলাম।

আমরা আবিষ্কার করিলাম, কমাণ্ডাণ্ট ফিনী সাহেব শুধু ঘুঘু ব্যক্তিই নহেন, ব্যাটা রীতিমত একটি উ'চুদরের চোর। চৌর্যকে বড় বিদ্যা বলা হইয়াছে, যতক্ষণ না ধরা পড়ে।

ফিনী সাহেব ধরা পড়িয়া গেলেন। আমাদের অনুমান শক্তি জীববিশেষের ঘ্রাণ শক্তির মতই প্রবল ছিল, তাই ব্যাপারটা আন্দাজেই আমরা আয়ত্ত ও বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানকেও প্রমাণ বলিয়া সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা আপনারা মনে রাখিবেন।

গভর্নমেণ্টের টাকা গৌরী সেন নামক ব্যক্তির টাকা, তা মারা গেলে শোক আমরা নাও করিতে পারি। কণ্ট্রাক্টর যিনি মাল সাপ্লাই করেন, তাঁর মস্তকে পনস নামক বৃহদাকার ফলটি স্থাপন পূর্বক ভাঙিয়া ফিনী সাহেব যদি ভক্ষণ করেন, তাতেও আপত্তি করিতে আমরা বিরত থাকিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমাদের ট্যাঁকে হাত দিতে আসিলে আমরা ন্যায়তঃ আপত্তি করিতে ও অসন্তুষ্ট হইতে নিশ্চয় পারি।

দুর্গের ও বন্দিদের পাহারার জন্য বেশ মোটা একটা সংখ্যা গুর্খা ও গাড়োয়ালী সিপাহী বাহিনী রাখিতে হইয়াছিল। খেলার বাবদ সিপাহীদের প্রাপ্য টাকাটা মারিয়া দিয়া আমাদের হকিস্টীক, বল ইত্যাদি দিয়াই ফিনী সাহেব কাজ চালাইয়া যাইতেছিলেন। গুর্খাই ও গাড়োয়ালী হাতের ধাক্কা সামলাইতে আমাদের স্টীকগুলির দফা প্রায় রফা হইয়া আসিত, আমরা শুধু মরা মারিয়া খুনের দায়ে পড়িতাম।

খেলাটা যে আমাদের কতখানি ছিল, তাহা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছি। খেলাটা যে যুদ্ধের মত রোমহর্ষক ব্যাপার ছিল, সে রিপোর্টও আপনাদের সমীপে পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের রসদ ও সমরোপকরণে এইভাবে টান পড়িলে আমাদের বরাদ্দ টাকায় সে লোকসান পোষাণো সম্ভব নহে। এত দামী স্টীকগুলি যে এত অল্পায়ু, ইহা আমরা কেহই সন্দেহ করি নাই। আমাদের সমর সচিব অর্থাৎ খেলার সেক্রেটারী অনুমান-আন্দাজে হাতড়াইয়া কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইতে দেখিলেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা আমাদের মালুম হইয়া গেল।

সেক্রেটারী কমিটির মিটিং-এ রিপোর্ট দাখিল করিলেন। আমরা মেম্বরগণ সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম—আমাদের খেলার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম মালপত্তর আমাদের সম্পত্তি, সুতরাং সেগুলি আমাদের জিম্মাতে আলবৎ থাকা দরকার।

অতঃপর কমিটি সেক্রেটারীকে নির্দেশ দান করিলেন—মালশুদ্ধ বাক্সটা ভিতরে আনার ব্যবস্থা করা হউক। মস্ত বড় একটা কাঠের বাক্সে খেলার সাজসরঞ্জামগুলি অফিসে রক্ষিত হইত, মাঠের গেট খুলিলে অফিস হইতে সেগুলি লইবার অনুমতি আমরা পাইতাম। ঐ বাক্সটা দখল করিবার হুকুমই আমরা দিলাম।

সন্ধ্যার সময় কমিটির আবার অধিবেশন বসিল। সেক্রেটারী বিরসবদনে নিবেদন করিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের আদেশ পালনে সক্ষম হইনি।"

আমরা শুধাইলাম, "কেন? আপনি কি চেষ্টা করেননি? কিংবা আমাদের পঞ্চায়েতের নির্দেশ সমীচীন মনে করেন নি?"

তিনি উত্তর দিলেন, "না, সেদিকে কোন ত্রুটি হয়নি। সাহেব বাক্সটা ভিতরে পাঠাতে প্রস্তুত নহেন।"

সমস্বরে প্রশ্ন উত্থিত হইল, "কেন? কেন তিনি বাক্স ভিতরে পাঠাবেন না শুনি?" অর্থাৎ উহা কি সাহেবের পৈত্রিক সম্পত্তি, ইহাই ছিল আমাদের আসল জিজ্ঞাস্য বা মনের ভাব।

সেক্রেটারী বলিলেন, "সমস্ত শুনে ফিনী সাহেব বল্লেন, "তোমাদের জিনিষ তোমাদের কাছে থাকবে, এতে আপত্তি করবার কি থাকতে পারে।"

আমরা বলিলাম, "আমরাও তো তাই বলি।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "কিন্তু তিনি বল্লেন যে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত—"

শেষ করিতে না দিয়াই আমরা প্রশ্ন করিলাম, "তিনি আবার খামোকা দুঃখিত হতে যান কেন?"

"কারণ, তাঁর সাধ্য নেই এগুলি ভিতরে পাঠাবার।"

আমরা বলিলাম, "বেশ, লোকের অভাব থাকে, আমরাই হাতে হাতে এগুলি নিয়ে আসব।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "লোকের অভাবের কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, সাহেব বল্লেন যে, গভর্নমেণ্টের অর্ডার নেই।"

মেম্বরগণ তাঁহাদের সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি সে অর্ডার দেখেছেন?"

সেক্রেটারীও ঝানু লোক, কহিলেন, "বল্লাম, কই দেখি তোমার অর্ডার। সাহেব একটা সার্কুলার আমার চোখের সামনে খুলে ধরে বল্লেন, দেখলে তো ক্ষুর পর্যন্ত not allowed. আর হকিস্টীকের মত ডজন তিনেক মারাত্মক অস্ত্র ইচ্ছে থাকলেও তোমাদের হাতে আমি তুলে দিতে পারিনে।"

শুনিয়া আমরা উচ্চারণ করিলাম—"হুঁ।" অর্থাৎ ব্যাটা আচ্ছা প্যাঁচ কষিয়াছে, ভোগাবে দেখিতেছি।

বুঝিলাম, ফিনী সাহেব এখন হইতে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করিয়াছেন এবং যুক্তিতর্কের আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুক্তির লড়াই মানে বুদ্ধির লড়াই। মাথার সংখ্যা বেশী হইলেই বুদ্ধির পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। এই পৃথিবীতে কতবার দেখা গিয়াছে যে, লক্ষ লক্ষ বোকা লোক একটা বুদ্ধিমানের নিকট হারিয়া গিয়াছে, যেমন হাজার ভেড়া একটা সিংহের গর্জনে আধমরা হইয়া যায়। ফিনী সাহেব আমাদিগকে বেকাদায় ফেলিলেন, আমরা কমিটির সভাগণ ভাবনা ও দুশ্চিন্তার ভারে মুণ্ড হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলাম।

এমন সময় দৈববাণী হইল, "আমি মালশুদ্ধ বাক্স ভিতরে এনে দিতে পারি।"

রণুবাবুর গলা। শুনিয়া আর সন্দেহ রহিল না যে, ব্রহ্ম কৃপা করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করিলাম যে, এক 'প্রভু'ই এই বিষাদসাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। তিনি যে কি পারেন, আর কি পারেন না, বুঝিতে গিয়া আমরা হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। প্রভুর মহিমাই শুধু নহে প্রতিভাও অপার এবং বিচিত্র ছিল।

আমরা বলিলাম, "আপনি এগুলি আনিয়ে দিতে পারেন?"

রণুবাবু সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, "পারি।" প্রভু শূন্য কুম্ভ ছিলেন না, তাই বেশী বাক্য নির্গত হইতে দেন নাই।

আমরা অনুরোধ করিলাম, "তবে আপনি এগুলি আনিয়ে দিন প্রভু।"

প্রভু বলিলেন, "আচ্ছা। কিন্তু—"

আমরা শঙ্কিত হইয়া কহিলাম—"এর মধ্যে দোহাই প্রভু, আর কিন্তু ঢোকাবেন না।"

অনুরোধে কান না দিয়া তিনি বলিলেন, একটি সর্তে এ ভার নিতে আমি পারি।"

বাধ্য হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিতে হইল, "কি আপনার সর্ত প্রভু?"

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন,—"আমাকে তিন দিনের জন্য সেক্রেটারী করতে হবে।"

আমাদের ঘর্ম দিয়া ঝড় ত্যাগ হইল, এত অল্পে রেহাই পাইব, এমন আশঙ্কা আমরা করি নাই। সানন্দে কমিটি প্রভুর সর্তে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া গেলেন। সাব্যস্ত হইল যে, অফিসে সেক্রেটারীর চিঠি যাইবে যে, তিনি অসুস্থ বিধায় তাঁহার স্থলে মিঃ শৈলেন দাশগুপ্ত, ওরফে আমাদের 'প্রভু' সেক্রেটারীর কার্য নির্বাহ করিবেন।

সভা ভঙ্গের পূর্বে সুরে ঘনিষ্ঠতা আনিয়া আমরা প্রশ্ন করিলাম, "বলুন না প্রভু, কি ভাবে বাক্স আনবেন?"

প্রভু এতাবৎ তাঁর গাম্ভীর্যকে একটুও শিথিল না করিয়া পূর্ববৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও মন্ত্র ব্যক্ত করেন না, কারণ দেয়ালেরও কর্ণ রহিয়াছে।"

আমরা মুখে বলিলাম, "তা তো বটেই।" আর মনে মনে বলিলাম, ব্যাটা ঘুঘুদাশ।

পরের দিন প্রভু যথাসময়ে অফিসে গেলেন এবং একাই ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে বাক্স নাই।

আমরা কহিলাম, "কই, বাক্স কই?"

"বাক্স অফিসে আছে, ব্যস্ত হবেন না। এখনও দুদিন পুরো হাতে আছে।"

পরের দিন প্রভু আমাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পোষাক দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। পরিধানে হাফপ্যাণ্ট, পায়ে মোটা মোজা, দুই পায়ে দুই বুট, উত্তমাঙ্গে মিলিটারী কোট এবং মাথায় একটা টুপি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও হে?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইল, "সমরে চলিনু হাম, হামে না ফিরাও হে।"

কহিলাম, "সত্যি ব্যাপার কি?"

উত্তর হইল, "অফিসে যাচ্ছি। আজ আমি জেনারেল ফন রুণডাস্ (রুণুদাশ), যাচ্ছি দুর্গের কমাণ্ডাণ্টের সঙ্গে মিলিটারী কন্‌ফারেন্সে আলোচনা করতে।" বলিয়াই আমার মশারী টানাইবার একটা লোহার ডাণ্ডা টান মারিয়া খাটিয়া হইতে খুলিয়া লইলেন।

বলিলাম, "আরে, করেন কি?"

"ভয় নেই, ফেরৎ পাবেন। দরকার আছে, নিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া তিনি ঘর হইতে ব্যারাকের বারান্দায় আসিলেন।

বারান্দায় একটা লোহার খাটিয়াতে বসিয়া অফিস-আর্দালী নীলাদ্রি বাবুদের প্রদত্ত সিগারেট সেবন করিতেছিল। প্রভু বলিলেন, "চল।"

নীলাদ্রি বলিল, "চলিয়ে।"

বাবুদের সঙ্গে করিয়া অফিসে পেঁৗছাইয়া দেওয়া ও ফিরাইয়া আনার ডিউটি নীলাদ্রি ও আর একজন সিপাহীর উপর ন্যস্ত ছিল। তাহারা ক্যাম্পের গেটে বা ভিতরেই থাকিত।

আমরা গেট পর্যন্ত প্রভুর অনুগমন করিলাম। গেটে একটা ঝাঁকা সম্মুখে রাখিয়া

প্রভুর পেয়ারের ভুটিয়া চাকর বাচ্চু অপেক্ষা করিতেছিল। প্রভু বলিলেন, "নে চল।"

বাচ্চু ঝাঁকাটা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আর আমরা বিস্ময়ে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঝাঁকাটার মধ্যে রক্ষিত চীজগুলিই আমাদের বিস্ময়ের হেতু।

দেখিলাম, তাহাতে ছোট বড় মাঝারি নানা সাইজের বঁটি রহিয়াছে, নানা সাইজের বৈঠা মানে পিতলের খুন্তি-হাতা রহিয়াছে, রহিয়াছে দা ও মুরগী-কাটা ছুরি, রহিয়াছে সোডার বোতল এবং নানা সাইজের পাথরের টুকরা। সেই ঝাঁকা মাথায় বাচ্চু চলিয়াছে পিছনে, আর মশারী টানাইবার হাত আড়াই লম্বা একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন আমাদের প্রভু ফন রুণডাস্।

গেটের সিপাহী বন্দুক হাতে আগাইয়া আসিয়া লোহার প্রকাণ্ড গেটটা খুলিয়া দিয়া আমাদের মতই হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভু গেট পার হইয়া নীলাদ্রি ও বাচ্চুসহ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আর, আমাদের চিন্তাটা দুশ্চিন্তার তুঙ্গে উঠিয়া স্থির হইয়া রহিল।

ঘণ্টা দুয়েক সারা ক্যাম্পটা কুম্ভক মারিয়া অপেক্ষা করার পর আমরা শ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম, বাচ্চু ও নীলাদ্রিসহ প্রভু ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর সঙ্গে আসিয়াছে দুইজন ভুটিয়া কুলির মাথায় চড়িয়া অতিকায় কাঠের একটা সিন্দুক। সারা ক্যাম্প গেটের সম্মুখে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। প্রভু ক্যাম্পে ঢুকিয়া বাণী ছাড়িলেন, "কেল্লা ফতে হো গিয়া।"

আমরা উল্লাসে চেঁচাইয়া উঠিলাম, "জয়, প্রভুর জয়।"

জন চারেক তরুণ বয়স্ক ডেটিনিউ ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া আসিয়া প্রভুকে ছোঁ মারিয়া চ্যাং দোলায় তুলিয়া লইল। প্রভু নিজের পায়ে হাঁটিবেন, ইহা যে আমাদেরই লজ্জা ও অপমানের কথা। চ্যাং দোলায় চাপিয়া হাতের ডাণ্ডাটাকে ঊর্ধ্বে পতাকার মত তুলিয়া ধরিয়া প্রভু অগ্রসর হইয়া চলিলেন, আমরা চলিলাম পিছনে ও অগ্রে রীতিমত একটা শোভাযাত্রা করিয়া।

(ক্রমশঃ)

—'ভবঘুরে'—

পাথর ফাটা কপাল

রাতারাতি যদি কারুর আকস্মিকভাবে অবস্থা ফিরে যায়—তখন আমরা বলি লোকটার "পাথরফাটা কপাল"—কারণ 'পাথর চাপা কপালই তো আমাদের অধিকাংশের। যাই হোক শুনলে অবাক হবেন যে, নিউইয়র্কের বিঙ-হামটন্ অঞ্চলের অধিবাসিনী তিনটি সন্তানের

মিস্টার ও মিসেস প্ল্যাট

জননী মিসেস উইলিয়াম প্ল্যাটের আয় ছিল মাসে ১৪ ডলার অর্থাৎ ৪০।৪২ টাকা আর কি! তার থেকে হঠাৎ একেবারে আয়টা বেড়ে হতে চলেছে মাসে দেড় হাজার ডলার। কেমন করে হলো জানেন? সম্প্রতি এক ব্যবসাদার তাঁদের জানিয়েছেন যে, ঐ মহিলার ঠাকুরদাদার ইলিনয়েশের এক প্রান্তে যে পড়ো জমিটা ছিল তার নীচ থেকে পেট্রল পাওয়া গেছে এবং ঐ খনিজের সত্ত্বাধিকারী হচ্ছেন তিনি এবং তাঁর স্বামী। কাজেই তাঁরা ঐ খনিজের রয়ালটি বাবদ এখন থেকে বছরে ১৮ হাজার ডলার পাবেন। পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে যাদের কিছুটা জমিও আছে তাঁরা আশা বাড়াতে পারেন।

ট্রুম্যান পায়ে হেঁটে অফিস করছেন!

আপনারা হয়তো জানেন সম্প্রতি যুক্ত রাষ্ট্রের-প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর সরকারী বাস-ভবন ত্যাগ করে 'ব্লেয়ার হাউস' ভবনে বাস করছেন কারণ তাঁর সরকারী বাস-ভবনটি মেরামত হচ্ছে। সেখান থেকেই তিনি হোয়াইট হাউস ভবনে তাঁর দপ্তরে যাওয়া আসা করছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁর গাড়ীটিকে পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ ধরণের 'ট্রাফিক সিগন্যালে' সমস্ত রাস্তার গাড়ী চলাচল বন্ধ রাখা হচ্ছে। এ খবরটি তাঁর কানে যেতেই তিনি ঐ প্রথা বন্ধ করবার নির্দেশ তো দিয়েছেনই, এমন কি এক সপ্তাহ পায়ে হেঁটে তিনি তাঁর দপ্তরে গিয়েছেন। এই-জন্য কলম্বিয়া জেলার "নিরাপদ পথচলা সমিতি" তাঁকে Pedestrian of the week অথবা "সপ্তাহের পদব্রজী" এই খেতাব দিয়েছেন। আমাদের প্রদেশপাল ও রাষ্ট্রপালদের কানেও এ খবরটা পৌঁছে দেবার ভার রইল আপনাদেরই উপর কেমন?

সাম্রাজ্যবাদী নয়তো বৃটেন!

সম্প্রতি লণ্ডনের ঔপনিবেশিক দপ্তর থেকে "Know the Empire" বা "সাম্রাজ্যকে জানুন" এই পর্যায় একটি প্রচার-কার্য সুরু করা হয়েছে। এই খবরটি আমেরিকানদের কানে যেতেই তাঁরা ঔপনিবেশিক দপ্তরে গিয়ে এই ব্যবস্থার কারণ জানতে চান—তার জবাবে ঐ দপ্তরের কর্তৃপক্ষ মার্কিন জিজ্ঞাসুদের জানিয়েছেন যে, "ওটা এই জন্যই করা হচ্ছে যে, এখনও শতকরা তিনজন বৃটেন-বাসী বিশ্বাস করে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রটি এখনও বৃটিশ উপনিবেশের একটি। তাহলে মনে মনে হিসেব করে বলুন তো আপনারা শতকরা কয়জন বৃটেনবাসী এখনও ভারতবর্ষকে তাদের সাম্রাজ্যের অধীন বলে মনে করতে পারেন?

• •

চুরুটখোর খোকাবাবু!

কয়েক সপ্তাহ আগে "কাহিনী নয় খবর" এই বিভাগে খবর দিয়েছিলাম আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত স্প্রিংফিল্ডের বাসিন্দা ২২ মাস বয়সের এক খোকাবাবু লরেন্স ফিলিপস জুনিয়ার রোজ দুটি করে চুরুট যায়। সে খবরে অনেকেই নাকি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বলে শুনছি। তাই এবার ফিলিপস-এর চুরুট খাওয়ার ছবিটাও এই সংগে ছেপে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। ছবিটি নিউ ইয়র্ক থেকে রেডিও যোগে এসেছে।

ফিলিপস্—চুরুটখোর খোকা

এই
সাইকেল
দেখতে তো সুন্দর
বটেই
টেকেও
বহুদিন !

খারাপ রাস্তায়ও ফিলিপ্‌স সাইকেল তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে—এ বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এত চমৎকার সাইকেল খুব কমই আপনার চোখে পড়বে। প্রত্যেকটি ফিলিপ্‌স আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত একটি কারখানায় অভিজ্ঞ কারিগরের হাতে সম্পূর্ণ বিলিতী মালমশলা দিয়ে নিখুঁতভাবে তৈরি। এ জন্যই পৃথিবীর সর্বত্র আরামে ও নির্ঝঞ্ঝাটে সাইকেল-সফরের জন্য সবাই ফিলিপ্‌সই কিনে থাকেন। আপনিও কেনবার আগে দেখে নেবেন সাইকেলটা ফিলিপ্‌স কিনা — নকলে ভুলবেন না।

মডেল এ. জি. (ওপরে)
টেম্পার করা ইস্পাতের ফ্রেম, ঝক্‌ঝকে এনামেল ফিনিশ, উজ্জ্বল ক্রোমিয়ম-প্লেটিং, চওড়া 'ড্রপ্ সাইড মাডগার্ড'।

মডেল এ. জি. ডি.
বিশেষ মজবুত টেম্পার করা ইস্পাতের ফ্রেম এবং জোড়া টপ টিউব।
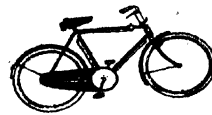
মডেল এ. আর.
'সুপার-টুরিস্ট' মডেল—নিচু ফ্রেম — অয়েল-বাথ গিয়ার-কেস ও ৩ স্পীড গিয়ার লাগানো।

KPL 12

**J. A. PHILLIPS & CO. LTD.
BIRMINGHAM · ENGLAND**

সেরা বিলিতী ইস্পাত দিয়ে
নিখুঁত করে তৈরি

ইন্দ্রজিতের চিঠি—

ব্যাঙ্ক ফেল

বাঙলা দেশে যখন যেটার হিড়িক পড়ে। কলেরা বসন্ত প্লেগ বন্যা সার্বজনীন দুর্গাপুজো যখন যেটা আরম্ভ হয় সেটাই মহামারীর আকার ধারণ করে। এবার পুজোর ঠিক আগটাতে হঠাৎ ব্যাঙ্ক ফেলের হিড়িক পড়ে গেল। তাসের ঘরের মতো একটার পর একটা ব্যাঙ্ক ওলটাচ্ছে, দেখে আমার বড় কৌতুক বোধ হয়েছিল। জানি পরের সর্বনাশে কৌতুক বোধ করাটা সৌজন্য সম্মত নয়, কিন্তু কি করব মনে মনে কিছুতেই হাসি চাপতে পারি নি। বাঙলা দেশের এতগুলো ব্যাঙ্ক ফেল পড়েও আমার এক পয়সা লোকসান ঘটাতে পারে নি, একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন এটা বড় কম কৌতুকের কথা নয়। ওদিক থেকে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। দুনিয়ার সব ব্যাঙ্ক ফেল পড়লেও আমার টাকা মারা যাবার ভয় নেই, কেননা ব্যাঙ্কে আমার টাকা নেই।

আমার একটি বন্ধু প্রায়ই বলে থাকেন ব্যাঙ্ক ফেল, তহবিল তসরুপ এ সব নাকি বাঙালীর ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি। কথাটা স্বজাতি নিন্দার মতো শোনায় বলে কথাটাকে কোন কালে আমি আমল দিই নি। এবারেও আমল দিয়েছি এমন মনে করবেন না। ব্যাঙ্কের ব্যবসাটা আসলে হচ্ছে পরের ধনে পোদ্দারি। বাঙালীরা পরের ধনে পোদ্দারি করতে জানে না বলেই বাঙালীর ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। অন্য কোন জাতের ব্যাঙ্ক ফেল পড়তে তো কই বড় একটা শুনি না। বাঙালী ব্যাঙ্ক যে হামেশা ফেল পড়ছে সেটা নিন্দের কথা নয়। বরং এটাকে তার কৃতিত্ব বলেই ধরে নেওয়া উচিত। কিন্তু বাঙালী যে ক্রমে চরিত্রভ্রষ্ট হচ্ছে তার প্রমাণ এই ব্যাঙ্ক ফেল নিয়ে বাঙলা দেশে রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে গেছে। ব্যাঙ্কের মালিকদের সবাই মিলে বিষম গাল দিচ্ছে। এই ক'দিনের ধাক্কায় অনেক সব শ্রুত-কীর্তির কীর্তিনাশ হলো। অথচ আমি বলব এঁরা বাঙালীর মুখ রক্ষা করেছেন। কেননা, বাঙালী যেদিন খাঁটি ব্যবসাদার হবে সেদিন আর সে খাঁটি বাঙালী থাকবে না।

অবশ্য আপনারা বলতে পারেন অপরের গচ্ছিত ধন নষ্ট করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজ; কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজমাত্রই নীতি-বিরুদ্ধ কাজ নয়। অর্থনীতির মার্ক্সীয় ভাষ্যমতে মানুষের সঞ্চিত ধন অপরকে বঞ্চিত করা ধন। সঞ্চয় প্রবৃত্তি মানুষের দুষ্ট রিপু। বর্তমান সমাজের সমস্ত পাপের মূলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সঞ্চিত ধন। সে ধন যদি কোন কারণে নষ্ট হয়, তাতে পরোক্ষভাবে সমাজের কল্যাণ হতে পারে। সুতরাং যাঁরা ব্যাঙ্ক ফেল করাচ্ছেন, তাঁরা পরোক্ষভাবে সমাজসেবার কাজ করছেন। অবশ্য এখানে কথা উঠবে যে টাকা কখনও নষ্ট হয় না। টাকা জিনিসটা একটা energy এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র মতে energy'র লয় ক্ষয় নেই—একের টাকা অপরের ট্যাঁকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাহলেও এর একটা মূল্য আছে। এই ব্যাঙ্ক ফেলের মধ্যে একটি অতি কঠোর নীতির ক্রিয়া চলছে। অপরকে যে বঞ্চিত করবে সে নিজেও বঞ্চিত হবে। চোরাবাজারের টাকা বাটপাড়ের বাজারে যাবেই। চোরের চাইতে বাটপাড় মানুষ হিসাবে ভালো, কেননা চোর ভালো মানুষকে ঠকায়, বাটপাড় চোরকে ঠকায়। চুরির চাইতে জোচ্চুরিটা যে উঁচু দরের আর্ট, একথা আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

এখানে অনেকে হয়তো বলবেন যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা সবই তো আর অসৎ পথে অর্জিত টাকা নয়। অনেক নিরীহ ব্যক্তির সৎ পথে কষ্টার্জিত টাকাও নষ্ট হয়েছে। আমি বলব এসব নিরীহ ব্যক্তিরা অপরকে বঞ্চিত না করলেও নিজেদেরকেই বঞ্চিত করেছেন। অর্থাৎ যে টাকাটা ভালো খেয়ে ভালো পরে ভালোভাবে থেকে ব্যয় করতে পারতেন সেটা নিতান্ত লোভ বশত ব্যাঙ্কে জমিয়েছেন। যে ব্যক্তি নিজেকে ঠকায় সে সব চেয়ে বড় ঠক। যারা অপরের ধনে লোভ করে তাদেরকে বরং ক্ষমা করা যায়, কিন্তু নিজের টাকার 'পরেই যার লোভ তার অপরাধের মার্জনা নেই। আমি সেই টাকাকেই বলি সদ্ভাবে অর্জিত যে টাকা সদ্ভাবে ব্যয়িত হয়। কাজেই উপরোক্ত নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতি আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই।

কিন্তু আসল কৌতুকের কথাটা এখনও আপনাদের বলি নি। এই ব্যাঙ্ক ফেলের ব্যাপার নিয়ে একটা জিনিস গোড়া থেকেই লক্ষ্য করে আসছিলাম। পথে ঘাটে, ট্রামে, বাসে, হাটেবাজারে ক'দিন এ ছাড়া আর কথা ছিল না। যারই সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, আজ্ঞে মশাই শুনেছেন কেন, ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে একেবারে বসিয়ে দিয়েছে। এত কষ্টের টাকা—যত সব ইত্যাদি ইত্যাদি। যতই মুখ শুকিয়ে বলুন না, এঁদের কথাবার্তায় কোথায় যেন একটু প্রচ্ছন্ন গর্বের ভাব আছে। তা আপনারও নিশ্চয় কিছু গেছে, কি বলেন? না মশায়, ব্যাঙ্কে জমাবার মতো টাকা থাকলে তবে তো যাবে। কথাটা বলতে গিয়ে নিজেই কেমন যেন লজ্জা পেয়েছি।

আমি যে অঞ্চলে বাস করি সেখানটায় সাধারণ মধ্যবিত্তের বাস। ইস্কুল মাস্টার কিম্বা আপিসের কেরাণী। ব্যাঙ্ক ফেল ইত্যাদি ব্যাপারে এসব অঞ্চলে কোন রকম চাঞ্চল্য ঘটবার কথা নয়। প্লেন্ লিভিং আর হাই থিংকিং এর মন্ত্র জপ করে করে সবাইকার মনের ভেতরটাতে অবধি গেরুয়ার ছোপ লেগে গিয়েছে। আমার শীর্ণ মূর্তি এবং বেশভূষার শ্রী দেখলে আমার হাই থিংকিং সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু এবারকার ব্যাঙ্ক ফেল—এ আমার মতো মানুষকেও নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। বেশ নামজাদা একটি ব্যাঙ্ক ফেলের পর ক্রমে কাণাঘুষায় খবর আসতে লাগল আমার তাহলে [illegible] পেছনে যেসব প্রতিবেশীরা বাস করেন, এঁদের সকলেরই কিছু কিছু টাকা ব্যাঙ্কে মারা গিয়েছে। টাকার অঙ্কটাও কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে ফ্যালনা নয়। পাঁচ সাত শো, হাজার দু হাজার তো আছেই। উপরে একজনের চৌদ্দ হাজার পর্যন্ত গিয়েছে। এ্যাঃ তবে কি আমার প্রতিবেশীরা হাই থিংকিংএ বিশ্বাস করেন না? ভেতরে ভেতরে এতকালের চিত্তস্থৈর্য বিচলিত হয়ে উঠল, অবশ্যি বাইরে সেটা প্রকাশ পেতে দিই নি। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, খবরটা অন্তঃপুরেও এসে পৌঁছেছে। গৃহিণীর মুখ বিষম ভার। মধুরভাষিণী একদিনেই রুক্ষভাষিণী হয়ে উঠেছেন। কেমন, খুব তো আমাকে বুঝিয়েছিলে, এখন দেখলে তো? আমাদের মতন অমন ভেতর-ফোঁপড়া কেউ নয়, সবারই কিছু না কিছু আছে। হেসে বললুম, আছে আর কই, সবই তো গেছে। গেলই বা, থাকলেই মানুষের যায়! আমাদের সে ওসাদটুকুও নেই।

আসলে হয়েছে কি শুনুন। পাড়ার গৃহিণীদের মধ্যাহ্ন মজলিশটা সেদিন আমাদের বাড়িতে বসেছিল। গৃহিণীরা একে একে এঁদের ব্যাঙ্ক দুর্দৈবের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সবাই কিছু বলেছেন, শুধু আমার স্ত্রী কিছু বলতে পারেন নি। কেরাণীবাবুর অস্থি রুগ্ন স্ত্রীটি ঈষৎ হেসে বলছিলেন, আমার ভাসুরপো সরকারী ব্যাঙ্কে কাজ করে কিনা। আগেই টের পেয়েছিল, তাই রক্ষে। বেশি না, এই শ আষ্টেক টাকা ছিল। ভাগ্যিস হপ্তাখানেক আগে তুলে নিয়েছিলুম। ঠাকুর খুব রক্ষে করেছেন।

যাক্ বোঝা গেল আমার প্রতিবেশীরা অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কিম্বা হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন। আমরা যে এত বড় সুযোগ পেয়েও সর্বস্বান্ত হতে পারি নি, সেজন্যই সকলের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হচ্ছে। গৃহিণী প্রসঙ্গক্রমে সেদিন যে সব মন্তব্য করেছিলেন, তার একটিরও জবাব দিতে পারি নি। আমি আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে এতদিন ধরে যে 'ছোট ঘরে বড় মন' ইত্যাদি ইস্কুলে শেখা বুলি আউড়েছি সেগুলো আমারই কাছে এখন ছোট মুখে বড় কথার মতো শোনাচ্ছে।

যাক্ যা হবার তো হয়েছে। এখন বাঙলা দেশের যে ক'টি ব্যাঙ্ক এখনও টিকে রয়েছে, তাদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। অদূর ভবিষ্যতে যদি কোন ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার সম্ভাবনা থাকে, তবে দয়া করে আমাকে যেন পূর্বাহ্নে একটু সংবাদ দেন। আমি ধারকর্জ করে হোক্ যেমন করে হোক অন্তত শ'খানেক টাকা জমা দিয়ে দেব, যাতে সকলের কাছে বলে বেড়াতে পারি যে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি। সত্যি সত্যি দেখলুম কিনা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা মারা না গেলে ঘরে-পরে কোথাও [illegible] মান রক্ষা করা যায় না।

জাতীয় মহাসভার জয়পুর অধিবেশন
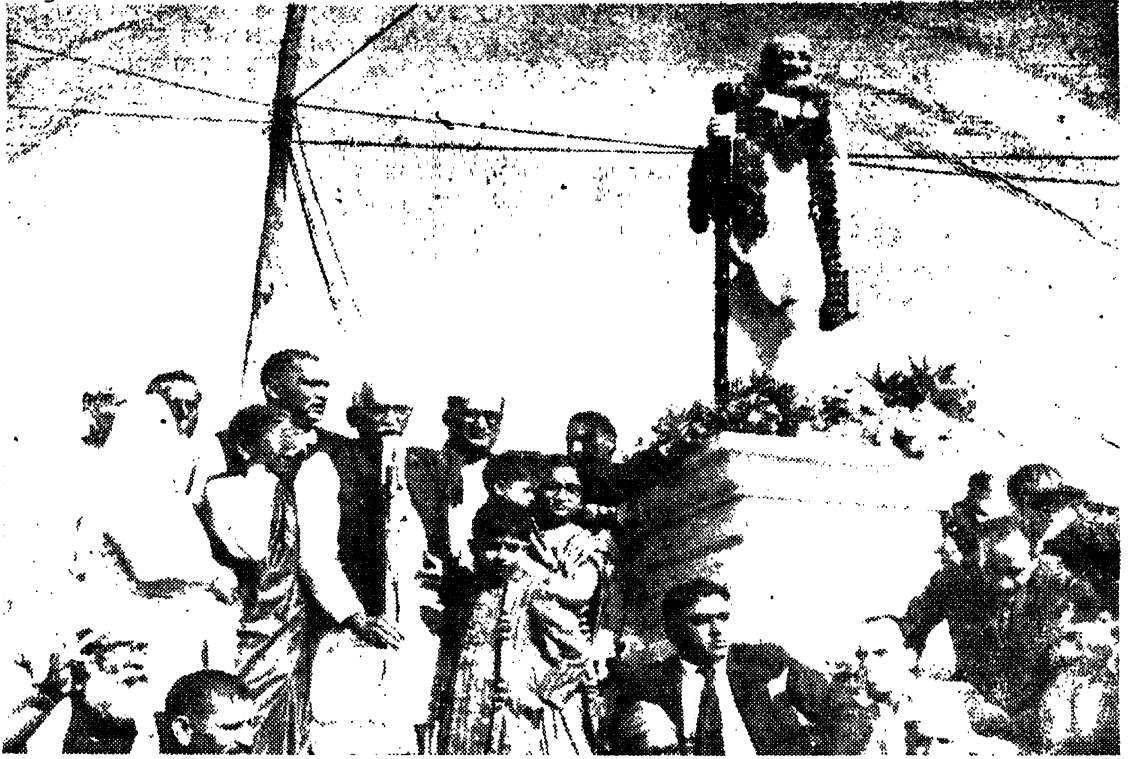
রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া গান্ধীনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন এবং ভাষণ দেন
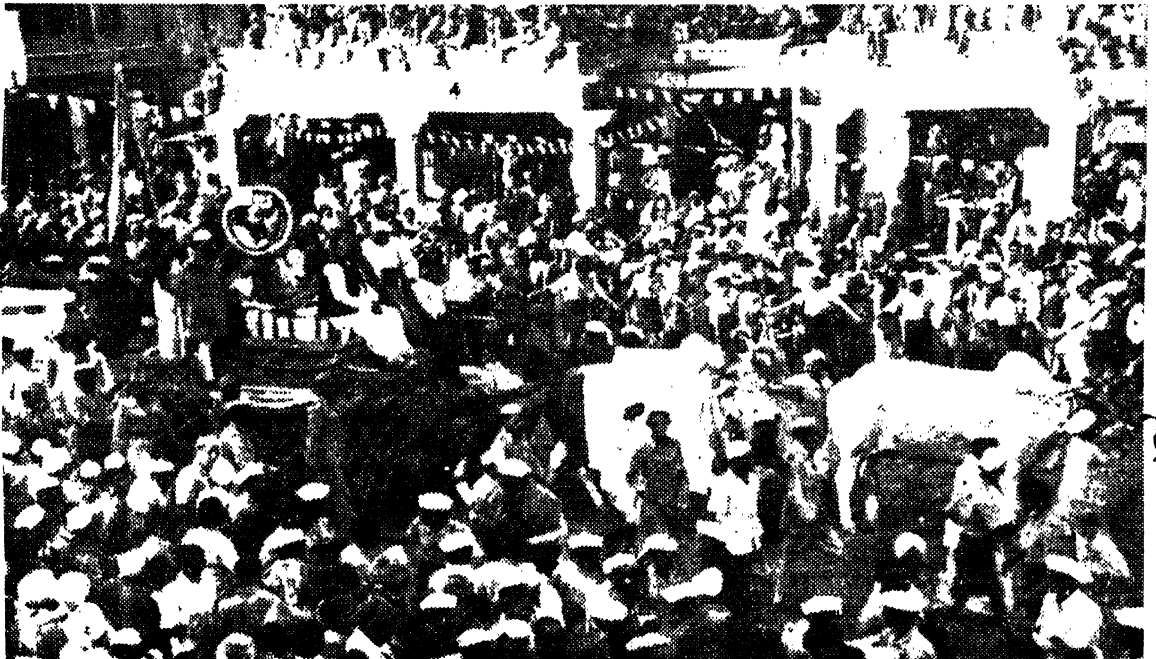
রাষ্ট্রপতির শোভাযাত্রা: বলীবর্দবাহিত রজতরথে উপবিষ্ট রাষ্ট্রপতি যুক্তকরে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন
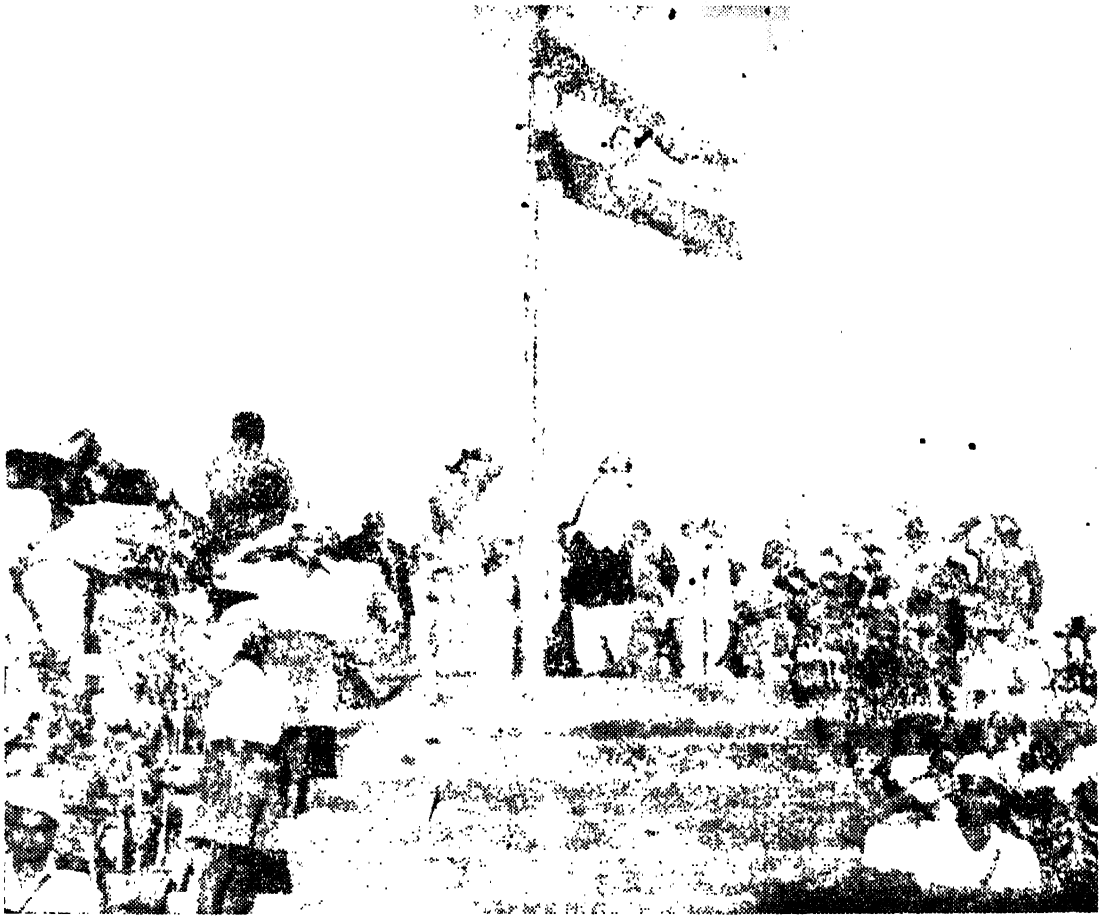
ঝাণ্ডাচকে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডাঃ সীতারামিয়া কর্তৃক কংগ্রেস পতাকা উত্তোলনের দৃশ্য

গান্ধী নগরে প্রতিনিধি ও দর্শকদের শিবিরশ্রেণী

শুভ উদ্বোধন
২৪শে, ডিসেম্বর
ওরিয়েণ্ট ০ বসুশ্রী ০ বাণী কলিকাতা
চন্দ্রলেখা
জেমিনীর ছবি
৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তোলা হয়েছে
যে ছবি—
বিহ্বলতায় রোমাঞ্চিত — ষড়যন্ত্রে লোমহর্ষক
সঙ্ঘর্ষে ভয়াবহ — দৃশ্যসজ্জায় বৈচিত্রময়
ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা
সুবিশাল ছায়াচিত্র
III B
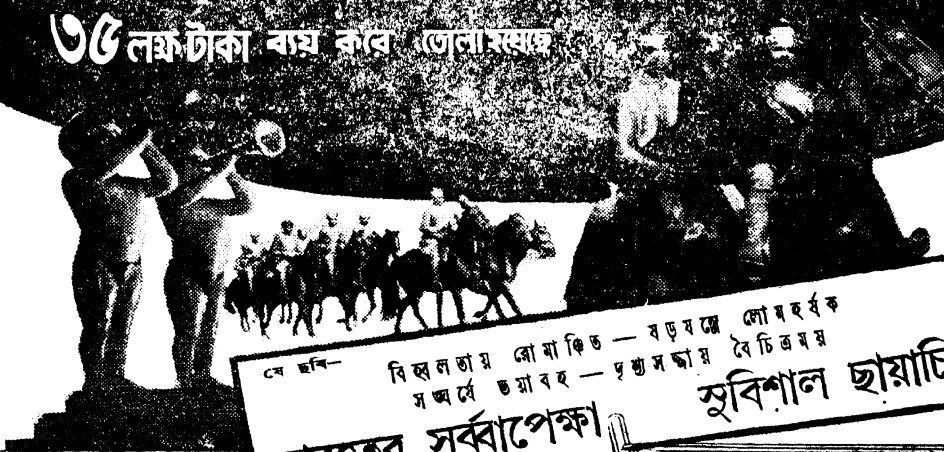
গ্রেসের কাছে চলচ্চিত্র কোনদিন আদর পায়নি এবং চলচ্চিত্রও কংগ্রেসের কোনদিন আসেনি, এইটেই হ'লো ...চরিত ধারণা। এদেশে যখন প্রথম ছবি তোলা আরম্ভ হয় তখন প্রথম অবদানই হয় দিল্লী দরবারের, ছবি এবং তারপরও উপর্যুপরি রাজপুরুষদের আনাগোনা তার উৎসবাদির ছবি তোলার মধ্যেই তার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে। তাছাড়া, আরও একটা দেখা যায় যে, ছবির ওপরে গোড়া থেকেই ইংরেজ সরকারের এমনি কড়া নজর পর্যবসিত হয় যে, কংগ্রেসের পক্ষে গণ-উত্থান বা গণ-আন্দোলনের কাজে তাকে নিয়োজিত ক'রে নেওয়া অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। ...লে গোড়া থেকেই চলচ্চিত্র কংগ্রেসী মহলের ...জ্য বস্তু হ'য়ে ওঠা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে যায়। এই নির্লিপ্ততার ফল এমনি ঘৃণায় পরিণত হয় যে, চলচ্চিত্রের কথা উল্লেখ করাও দেশ-নায়কদের কাছে একটা জঘন্য অন্যায়াচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া ব'লে প্রতিভাত হ'তে থাকে। ওপরপক্ষে চলচ্চিত্রের একদিক থেকে শাসকদের বাধানিষেধের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ে ...ং অন্যদিকে দেশনায়কদের কাছ থেকে অনাদর ...ণা লাভ ক'রে নিজের অস্তিত্বকে বজায় ...খে যেতে অবান্তর অসামাজিক ও বহুবিধ ...ও দুর্বল নীতি সংপৃক্ত পথ বেছে নেওয়া ...ড়া আর উপায় রইলো না। একটা কথা ...তু এই প্রসঙ্গে মানতে হবে যে, কংগ্রেসের ...দ্বারা অবজ্ঞাত হ'লেও চলচ্চিত্র বরং রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থেকে গিয়েছে ...াবরই; কিন্তু কোনদিনই এমন কিছু করার প্রবৃত্তি হয়নি যা কোনক্রমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ হ'য়ে উঠতে পারতো। দেশের সকল শ্রেণীর ও সকল পর্যায়ের জীবন যখন কংগ্রেসের প্রভাবে সম্পূর্ণ অভিভূত সে সময় কংগ্রেসের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন চলচ্চিত্রের ওপর লোকের মোহ যে থাকতে পারে না এইটাই ছিল স্বাভাবিক, তাই দেশের বিপুল জনগণের কাছে চলচ্চিত্র অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এই অশ্রদ্ধা এতই তীব্র ছিলো যে, ছবি দেখাটা কোন কংগ্রেসসেবী বা কর্মীর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ ব'লে পরিগণিত হ'তো এবং বহু লক্ষ কংগ্রেসী আছেন যাঁরা জীবনে ছবি দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রেছেন দেশ স্বাধীন হবার পর অর্থাৎ মাত্র বছর দুই আগে এবং হয়তো আরও বহু সহস্র আছেন যাঁদের কাছে আজও চলচ্চিত্রের কোন আকর্ষণ নেই।

একদিকে শাসকদের এবং অপরদিকে জাতীয় নেতৃবৃন্দের অবজ্ঞা হেতু চলচ্চিত্র নিজেই যে পথ বেছে নিতে বাধ্য হ'য়েছে তার দ্বারা সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনকে অনেক বিষয়েই কুৎসিত হ'য়ে ওঠায় যে প্রশ্রয় দিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, এই

অপকীর্তিই চলচ্চিত্রের সব নয়। চলচ্চিত্রের প'য়ত্রিশ বছর অস্তিত্বে সমগ্র দেশের সমাজ-জীবনের মধ্যে অনেক রকম সুপরিবর্তন সাধনও তার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ছুৎমার্গকে অস্বীকার ক'রে সকল জাতের লোককে পাশা-পাশি এনে বসাবার কৃতিত্ব চলচ্চিত্রাগারগুলি থেকেই ব্যাপক হ'য়ে ওঠা সম্ভব হয়। সঙ্গীত নৃত্যাদি যা শুধু দেশের বিশেষ শ্রেণীরই

জেমিনীর "চন্দ্রলেখা" চিত্রে টি আর রাজকুমারী। ছবিখানি এসপ্তাহে কলকাতায় মুক্তিলাভ ক'রেছে

উপভোগ্য ছিল সে রস প্রতিজনের পক্ষে সহজে আহরণ করার সুযোগও চলচ্চিত্রই এনে দিয়েছে। বহুবিধ সামাজিক কুসংস্কারকে কাটিয়ে তুলতে যেমন, জীবনকে উপভোগ করার প্রেরণা দিতেও তেমনি চলচ্চিত্র সমানভাবেই প্রভাব বিস্তার করে গিয়েছে। খুঁটিয়ে বিচার করলে দোষের বোঝা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রের দ্বারা ভাল কাজও যথেষ্টই হ'য়েছে। হিন্দী আজ রাষ্ট্রভাষা, কিন্তু তাকে ভারতের গহনতম প্রদেশেও প্রবিষ্ট হবার সুযোগ চলচ্চিত্রই এনে দিয়েছে।

কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে আগেকার দিনে চলচ্চিত্রকে শ্রদ্ধেয় ক'রে তোলার জন্যে যারা চেষ্টা ক'রেছিলেন তাঁদের মধ্যে শেঠ গোবিন্দ-দাস, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। শেঠ গোবিন্দ দাস চলচ্চিত্রের শুধু পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, চলচ্চিত্রের শক্তিকে দেশের কাজে লাগাবার চেষ্টাও ক'রেছেন। তিনি আদর্শ চিত্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন এবং বিধবা সমস্যা অবলম্বনে 'কুমারী বিধবা' নামে একটি সমাজ-সংস্কারমূলক ছবিও তোলেন; তাছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে এদেশের পরিচয় ও যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনিই প্রথম চেষ্টা করেন 'ইণ্ডিয়া ইন আফ্রিকা' নামক একখানি ছবির প্রযোজনা ক'রে—সে প্রায় '৩২-৩৩ সালের কথা। মৌলানা আজাদের যোগ আমরা পাই ১৯৩৫ সালে 'ওয়ান ফেটাল নাইট' নামক ছবিখানির সংলাপ রচয়িতা হিসেবে। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেস সদস্যা থাকা অবস্থাতেই কয়েকখানি চিত্রে অবতরণ ক'রে ভারতীয় ছবিতে অনেক-খানি ইজ্জৎ যোগ ক'রে দেন। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলিও একখানি ছবিতে অভিনয় করেন কিন্তু সে হ'চ্ছে তাঁর রাজনীতিক জীবন আরম্ভ হওয়ার আগে। খোঁজ ক'রলে এমনি ধারা বহু দেশনায়কদের কথা জানা যাবে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের চলচ্চিত্রকে সম্মানিত ক'রেছেন। কিন্তু রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির তাগিদে কেউই দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেন নি।

আজকের অবশ্য দিন বদলে গিয়েছে। কংগ্রেসের নেতারা আজ রাষ্ট্রের নায়কপদে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন। রাষ্ট্র ও সমাজ সেবায় চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তাও আজ তারা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। চলচ্চিত্রকে নতুনভাবে গ'ড়ে তোলবার জন্যে, তাকে দেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত করার জন্যে সর্দার প্যাটেলের অধীনে ফিল্ম ডিভিসন স্থাপিত হ'য়েছে। তাছাড়া, বম্বে কলকাতা ও মাদ্রাজে ছবি তৈরীর ওপর সরকারী অনেক নেতিবাচক নির্দেশও চাপানো হ'য়েছে; মোটামুটিভাবে দেশের ছবিকে পরিচ্ছন্নতর করার দিকে রাষ্ট্রনায়কদের চেতনা আজ জেগেছে ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, চলচ্চিত্র সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব আজও বদলায়নি, অন্ততঃ পরিবর্তনটা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। রাজ-নীতির পর দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দায়িত্ব কংগ্রেসেরই। চলচ্চিত্র দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি উভয়েরই প্রসারের সর্বচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। চলচ্চিত্রকে এ কাজে উৎসাহিত ক'রে তুলতে কংগ্রেস অনেকখানি সহায়তা ক'রতে পারে, অনেক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতাও

দিতে পারে। দেশ গড়ার কাজে চলচ্চিত্রকে নিয়োজিত করার সেইটেই হবে সবচেয়ে কার্যকরী প্রচেষ্টা।

নূতন ছবির পরিচয়

বাঁকা লেখা (এস ডি প্রডাকসন্স)—কাহিনী: মণিবর্মন, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: চিত্ত বসু, গান: শৈলেন রায়, আলোকচিত্র: দেওজীভাই, শব্দ-যোজনা: শচীন চক্রবর্তী, সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকায়: কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, বিপিন গুপ্ত, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, ভূপেন চক্রবর্তী, কানন দেবী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, সুহাসিনী প্রভৃতি।

ছবিখানি ৩রা ডিসেম্বর থেকে উত্তরা, পূরবী উজ্জ্বলায় দেখানো হচ্ছে।

জমাটি ছবি তৈরী ক'রতে সত্যিই কি সবাই-ই ভুলে গেলো? এই রকমই একটা অবস্থা যেন বর্তমানে বাঙলা ছবির ক্ষেত্রকে আঁকড়ে বসেছে, না হ'লে যে যা ছবি তুলছে তার প্রত্যেকখানিই বাজে হ'য়ে উঠছে কেন? বর্তমান ছবিখানিকে বাজার চলতি ছবিগুলি থেকে ধরনে যতটা সম্ভব আলাদা রকমের ক'রে তোলারই চেষ্টা হ'য়েছে। কিন্তু এমনি এক কাহিনী তার জন্যে গ্রহণ করা হ'য়েছে যে ছবিখানিতে উপভোগ করার মত বস্তুর এবং কোন কোন দিকে বেশ তারিফ করার মত গুণের অভাব না থাকলেও মোটমাট কোনই ছাপ দিতে পারে না। কিংবা এও হয়তো সম্ভব যে কাহিনীটির বিন্যাসেই এমন ত্রুটি হ'য়ে পড়েছে যার জন্যে লোকের মনে আবেগ সৃষ্টি ক'রতে নাটকীয় রস দানা বাঁধতে পারেনি কোথাও।

ছবির আরম্ভ ভগবানের গাড়োয়ানী নিয়ে। মানে, ভগবান নামক এক গাড়োয়ানের মুখে সংসার তত্ত্ব সম্পর্কে একখানি গান দিয়ে। ভাবটা হ'লো, যার গাড়ী সে চালিয়েই যায়, তুমি আমি কে?—গল্পের বিষয়বস্তুও হ'লো তাই। সুখশান্তি নাগালের মধ্যে থাকতেও ভবিতব্যের লিখন বাঁকা হ'লে জীবন যে কিভাবে বিপর্যস্ত হয় এইটেই কাহিনীর প্রতিপাদ্য। প্রথমেই দেখি ধনী আত্মাভিমানী জমিদার দেবকান্ত রায়কে। দেনার অপমান সহ্য ক'রতে না পেরে তিনি পরম আদরের অতি বয়স্কা কন্যা রমা ও তরুণ হ'লেও শিশোচিত আদুরে পুত্র কুণালকে একেবারে পথে বসিয়ে আত্মহত্যা ক'রে বসলেন। ভাইটিকে নিয়ে রমা চলে এলো ক'লকাতায়। যে বাড়ীতে এসে ওরা উঠলো তার ওপর-তলায় থাকেন কিম্ভূতপ্রকৃতির দর্শনের অধ্যাপক অবিনাশ। রমার ঝি সুহাস আর অবিনাশের চাকর বেহারীর মধ্যে ঠিক 'পথের দাবী'র মতো উনুনে ধোঁয়া দেওয়া নিয়ে বাঁধলো ঝগড়া আর তাই উপলক্ষ্য ক'রে দুই মালিকের মধ্যে পরিচয়ও হ'য়ে গেলো। কুণালের সখ বেহালা বাজানো। তার পরম আরাধ্য বিনায়ক শর্মা ক'লকাতায় আসতে সে রমাকে ধরে বসলো তার বাজনা শোনবার জন্যে। ওরা গেলো কিন্তু টিকিট পেলো না এবং তার চেষ্টা ক'রতে ওরা এক অভদ্র জনতার কবলে পড়লো; ওদের বাঁচালো থিয়েটারের মালিক অশোক। এর পর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে কুণাল অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। ডাক্তার জানাল যে এমন রোগ যে তাতে কুণাল চোখ হারাতে পারে। কুণালের চিকিৎসার জন্যে রমা চাকরীর সন্ধানে বের হ'লো কিন্তু পেলে না, তার বদলে রেডিওতে গাইবার কণ্ট্রাক্ট ক'রে এখানকারই ট্রেনারের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে এলো। পথে কুণালের জন্যে ফল কিনতে গিয়ে টাকাটা আঁচল-কাটা হ'য়ে গেলো, আর অমনি সেখানে দেখা হ'য়ে গেলো অশোকের সঙ্গে। অশোক ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলো। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে অবিনাশের সঙ্গে রমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে উঠেছে। কুণালকে নিয়ে রমা একদিন বনে বেড়াতে এলো, সেখানেও অশোকের সঙ্গে দেখা। এবারে জানা গেলো যে অশোকই রমাদের জমিদারীর নতুন মালিক; সুতরাং অশোক ওদের কাছে পিতৃহন্তারই সমান হ'য়ে দাঁড়ালো। রমা রেডিওতে গান গেয়ে রোজগার করে, সঙ্গীত-বিরাগী অবিনাশের তা পছন্দ নয়, তাই সে রমাকে নিয়ে এলো তার বন্ধুগৃহে, বন্ধুর মা-হারা কন্যা ছবির দেখাশুনো করার জন্যে। বন্ধু তখন জমিদারীর কাজে অনুপস্থিত। গৃহকর্ত্রী মাসিমা রমাকে চাকরী দিতে রাজী হ'লেন না। কিন্তু সেই সময়ে ছবি এসে রমাকে দেখেই যেন যাদুবলে সম্মোহিত হ'য়ে শান্ত হ'তেই মাসীমা রমাকে চাকরী দিয়ে দিলেন। একদিন জানা গেলো যে সে-বাড়ীর মালিক সেই অশোকই। রমা চলে যেতে চাইলে। ছবি ছাড়তে চায় না; রমার ওপরে ছবির টান দেখে অশোকও রমাকে থেকে যেতে অনুরোধ ক'রলে। কিন্তু রমা রইলো না। বাড়ীতে ঘুমের ঘোরেও রমা ছবিরই কথা বলে। কুণাল তা লক্ষ্য ক'রে ক্ষিপ্ত হ'য়ে, যে-ছবি তার কাছ থেকে তার দিদিকে টেনে নিয়েছে তাকে দেখতে ছোটে, এবং রাগে ও ক্ষোভে ছবিকে বেহালার ছড়ি দিয়ে প্রহার ক'রে আসে। ফিরে এসে সেই আগেকার রোগে কুণাল অন্ধ হ'য়ে যায়। এদিকে রমা বিহনে ছবি পড়ে অসুখে; অশোক নিজেই তার সেবা ক'রতে থাকে। রমাদের সংসার আর চলে না। অনটনের সব কথা শুনে একদিন অবিনাশ এসে রমার হাতে তার সংসার তুলে দিতে চাইলে, চাইলে তাকে বিয়ে ক'রতে। রমা রাজী হ'লোনা। অবিনাশ বুঝলে যে রমা তাহ'লে অশোককেই ভালবাসে। অশোককে অবিনাশ সে কথা জানিয়ে এলো। অশোক তার মাসীমাকে জানালে যে রমাকে সে বিয়ে ক'রে ছবির মার আসনে বসাতে চায়। মাসীমা জানালেন যে তাতে তিনি অমত ক'রবেন না, কিন্তু বরণ ক'রে নিতেও পারবেন না। ছবির অসুখ বেড়েই চলে। রমা ছবির জন্য চঞ্চল হ'য়ে তাকে দেখবার জন্যে ছুটে গেলো, কিন্তু ছবি তখন শেষ হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যে কুণাল রমাকে মুক্তি দেবার জন্যে অবিনাশের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলো। ফিরে এসে কুণালকে না পেয়ে রমা তার সন্ধানে পথে বের হ'লো। এইখানেই কাহিনীর সমাপ্তি।

গল্পটিকে অসাধারণ ক'রে তোলার একটা চেষ্টা হ'য়েছে। কিন্তু বিন্যাসে তা হ উঠতে পারেনি। অনেকগুলো বেখাপ্পা জিনি মিলে বহু স্থানে মনে বিরক্তিরও সঞ্চার ক দিয়েছে। কুণাল চরিত্রটি দরদী, মনে রে করিয়ে দেবার মতো। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিলো একটি বালকের— তরুণকে দিয়ে অতিশয় ছেলেমানুষী ব অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও হাস্যাস্পদ হ'য়ে চা টাকেই নষ্ট ক'রে দিয়েছে। তেমনি ছবির পাকামীটাও হ'য়ে গিয়েছে মাত্রাত শেষের দিকের নাট্যরস এই চরিত্রটিকে করে জমে ওঠার কথা, তা না হ'য়ে ছবির আবির্ভাব থেকে ছবিও ঝুলে গিয়ে মাসীমা চরিত্রটি যেন বিজাতীয় ঢং দাম্ভিক, গম্ভীর প্রকৃতির ও গোঁড়া কলের পুতুলের মত প্রাণহীন উগ্র হবে তার কি মানে? চরিত্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে তোলার জন্যে জোর করে যেন ঘটনা পাকিয়ে তোলা হ'য়েছে। কলকাতায় এসেই ধোঁয়ার ব্যাপারে রমার সঙ্গে অবিনাশের পরিচয়, ফল কিনতে গিয়ে টাকা চুরি হ'তেই অশোকের সঙ্গে দেখা, অশোকের বাড়ীতেই রমার চাকরী ইত্যাদি বহু ঘটনাই ঘটনাপ্রবাহে সহজ স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতির চেয়ে সাজানো ব্যাপার মনে হয়। হুকুম ক'রে আনা প্রকৃতির তাণ্ডব গোড়াতে ও শেষে, দু জায়গাতেই গল্পের সুর কেটে দিয়েছে। তার ওপর চোখে দেখা যাচ্ছে ভীষণ বজ্রপাত ও মেঘেমেঘে দুরন্ত মাতামাতি, অথচ তার যথাযথ আওয়াজ নেই, এমন কি সংলাপ মেঘ ডাকার কথা উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও [illegible]বার আর এক বেতালা ব্যাপার!

ছবির সবচেয়ে উপভোগ্য বিষয় সংলাপের মাধুর্য। নাটককে নিবিড় ক'রে জমিয়ে তোলার মতো ক্ষমতা তার মধ্যে ছিলো কিন্তু ঘটনা বিন্যাসের দুর্বলতায় সেদিক থেকে তা সর্বত্র সার্থকতা লাভ ক'রতে পারেনি। অভিনয়ে ছবিখানিতে সবচেয়ে রসসঞ্চার ক'রেছেন পাগলাটে অধ্যাপক অবিনাশের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, যদিও অধ্যাপকের যে ধরণে

ভোলামি দেখানো হ'য়েছে তা বাস্তব-বর্জিত; তাহ'লেও জহর গাঙ্গুলী চরিত্রটিকে নিয়ে তোলবার যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অভিনয় কৃতিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শ্রীমতী কানন রমার ভূমিকাটিকে নিয়ে নিয়ে গিয়েছেন এই পর্যন্তই; নায়িকা হবার মতো আকর্ষণ যে তার কমে গিয়েছে নিজেরও বোঝা উচিত। তবে তার কণ্ঠ-মাধুর্য্য প্রায় আগের মতই আকর্ষণীয় আছে এবং গান ক'খানি গেয়েছেন ভালই।

আলোকচিত্র ইদানীংকার সাধারণ বাঙলা ছবির চেয়ে ওপরের স্তরের; এমন কি কোন কোন দৃশ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দগ্রহণের ত্রুটি দূরত্ব-সংস্থাপনে অর্থাৎ perspective বিচারে কয়েক জায়গায় বিসদৃশতা এনেছে; নয়তো ... তে স্পষ্টতা ও সমতা রক্ষিত হয়েছে। ... তুলনায় উল্লেখ করবার মতো কোন কৃতিত্ব ... গেলো না।

বসুশ্রীর প্রথম বার্ষিক উৎসব ও "গান্ধীজী" চিত্র

... ত ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার শহরের ... শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহ বসুশ্রী তাদের প্রথম ... প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে পালন করে। ... র বিশিষ্ট নাগরিক, চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ... ও সাংবাদিকরা উৎসবে যোগদান করেন। ... উপলক্ষে 'গান্ধীজী' নামে মহাত্মার জীবনী ... র্কিত একখানি ছবি প্রদর্শিত হয়। ... নি দেখে মনে হয় না যে, এর প্রযোজক ... লাল প্যাটেল তার দায়িত্ব সম্পর্কে এতটুকুও সচেতন ছিলেন। একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে যে, ছবিতে যে সব সংবাদ-চিত্রের টুকরো সন্নিবেশিত হয়েছে, তার ... সবই হ'চ্ছে বম্বে অঞ্চলের ঘটনা, বিলেতের ... টেবিল আর দিল্লীর শবযাত্রা। এ ছাড়া ... তের বহুস্থানে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে ... মহাত্মার জীবনী থেকে বাদ দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক বা নেতাজী ও গান্ধীজী তার কোন ছবিও নেই, এমন কি আবহ-ভাষণের কোথাও উল্লেখও নেই—অথচ এ সম্পর্কিত সংবাদ-চিত্রের অভাব ছিল না। মহাত্মার জীবনের অনেক অংশই ছবিখানিতে বাদ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে এই জীবনী-চিত্রটি এতই বিকৃত মনে হয় যে, কি ক'রে প্রদর্শন অনুমতি পেয়েছে, সেইটেই হচ্ছে বিস্ময়ের বিষয়। তার ওপর আবার দাঙ্গার সময় কলিকাতায় বা নোয়াখালী পরিক্রমার ... াবলীও দেখানো হয় নি, এমন কি তার উল্লেখও নেই; তার কারণ শোনা গেল, সময় না থাকায় বসুশ্রী থেকে ও-অংশটা বাদ দেওয়া হয়েছে—যদি সত্যি হয় তো বসুশ্রীর এই ভদ্রতার আর আমরা তুলনা কোনকালে পাই নি; সেদিনকার বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতদের প্রত্যেকেই এর জন্য ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন দেখা গেল। যাই হোক, 'গান্ধীজী' ছবিখানি আরও একবার সম্পাদনা ক'রে ভুল-ত্রুটি শুধরে না নিলে প্রদর্শনের সম্পূর্ণ অনুপযোগীই থেকে যাবে।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

গত সপ্তাহে মিনার-বিজলী-ছবিঘরে বসুমিত্র প্রডাকসন্সের প্রথম ছবি 'কালোছায়া' মুক্তিলাভ ক'রেছে। ক্রাইম-ড্রামা ইতিপূর্বে চিত্রিত হ'লেও এখানিকে বাঙলা দেশের প্রথম রোমাঞ্চ-চিত্র ব'লে ঘোষণা করা হ'য়েছে। কাহিনী রচনা ও পরিচালনা ক'রেছেন সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন শিশির মিত্র, ধীরাজ, গুরুদাস, নবদ্বীপ, শ্যাম লাহা, শিপ্রা প্রভৃতি। 'কালোছায়া' নতুন ধরণের প্রমোদ-চিত্র হবে বলে আশা করা যায়।

* * *

কলকাতার রঙ্গজগতের ইতিহাসে সর্বাধিক বিজ্ঞাপিত মাদ্রাজের জেমিনী পিকচার্সের পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকায় নির্মিত বলে কথিত 'চন্দ্রলেখা' এই সপ্তাহে বসুশ্রী, বীণা ও ওরিয়েন্টে মুক্তিলাভ ক'রেছে। ছবিখানি তৈরী ক'রতে অর্থ, উপাদান ও কৌশল যা অবলম্বন করা হ'য়েছে তা ইতিপূর্বে ভারতের কোন ছবির ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। অভাবনীয় পরিমাণ অর্থে তিন বছর ধ'রে তৈরী 'চন্দ্রলেখা' উৎকর্ষের দিক থেকেও ইতিহাস রচনায় কতটা সাফল্যলাভ করে এখানকার চিত্ররসিকরা তা দেখবার জন্য উৎসুক।

'অভ্যুদয়' হিন্দী অভিনয়

রবিবার ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের যুগান্তকারী নৃত্যনাট্য 'অভ্যুদয়'-এর হিন্দী রূপান্তর রক্সীতে মঞ্চস্থ হবে। গীতিনাট্যটি প্রযোজনা করেছে ভারতীয় নাট্য-কলা কেন্দ্র; নৃত্য নির্দেশক বালকৃষ্ণ মেনন, সঙ্গীত জিতেন গলুই ও হীরক রায় এবং ব্যবস্থাপক হ'চ্ছেন ধীরেন ঘোষ। মূল 'অভ্যুদয়' গীতিনাট্যের ভাবটি যথাযথ রেখে মাত্র ভাষান্তর ক'রে এই অবদানটি সৃষ্ট হ'য়েছে সুতরাং 'অভ্যুদয়'-এর উৎসুক রসগ্রাহী এটিতেও সমান আনন্দই উপভোগ ক'রবেন।

ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ক্রিকেট টেস্ট খেলাও অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। প্রথম টেস্ট খেলার ন্যায় ভারতীয় দলকে দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতেও "ফলো অন" করিতে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনজন খেলোয়াড়দের অপূর্ব দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল জয়লাভে সমর্থ হয় নাই। বিপর্যয়ের মুখে ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানগণ দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া দলের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন ইহা দুইটি টেস্ট খেলাতেই প্রমাণিত হইল। তবে ভারতীয় দলকে

আর এস মোদী

বিজয়ী হইতে না দেখিলে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছে না। তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল যাহাতে জয়লাভে সামর্থ হয় তাহার জন্য কয়েকজন নূতন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হইয়াছে—দেখা যাক ফলাফল কি হয়?

প্রথম টেস্ট ম্যাচের ন্যায় দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জয়ী হয় ও প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। প্রথম দিনে সারাদিন খেলিয়া ২ উইকেটে ২৫৫ রান করিতে সমর্থ হয়। দলের প্রথম খেলোয়াড় রেই শতাধিক রান করেন। দ্বিতীয় দিনেও প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয় না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ৫৫৭ রান করে। উইকস ১৮৩ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত খেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৬ উইকেটে ৬২৯ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। উইকস ১৯৪ রান করিয়া আউট হন। পরে ভারতীয় দল খেলিয়া দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১৫০ রান করে। ফাদকার ২৭ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ চতুর্থ দিনে রান তুলিবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু বেলা ৩টার সময় ২৭৩ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতীয় দলকে "ফলো অন" করিতে বাধ্য করে। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৯৫ রান হয়। আর এস মোদী ৫৬ রান ও হাজারে

২১ রান করিয়া নট আউট থাকেন। পঞ্চম দিনের সূচনায় সকলেই কল্পনা করিতে থাকেন ভারতীয় দল পরাজিত হইবে। কিন্তু মোদী ও হাজারে দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া ক্রমশই রান তুলিতে থাকেন। ১৮৯ রানের সময় মোদী ১১২ রান করিয়া আউট হন। এই সময় অমরনাথ খেলায় যোগদান করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বোলারগণ এই দুইজন খেলোয়াড়কে আউট করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের তিন উইকেটে ৩৩৩ রান হয়। হাজারে ১৩৪ রান ও অমরনাথ ৫৮ রান করিয়া নট আউট থাকেন। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

খেলার ফলাফল :—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস—৬ উইঃ ৬২৯ রান (ডিক্লেয়ার্ড) (রেই ১০৪, উইকস ১৯৪, ক্রিশ্চিয়ানী ৭৪, ষ্টলমায়ার ৬৬, ওয়ালকট ৬৮, ক্যামেরন নট আউট ৭৫, মানকড় ২০২ রানে ৩টি ফাদকার ৩৫ রানে ১টি, হাজারে ৭৪ রানে ১টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস—২৭৩ রান (ফাদকার ৭৪, উমরিগার ৩০, অধিকারী ৩৪, হাজারে ২৬, মানকড় ২১, ফার্গুসেন ১২৬ রানে ৪টি, গোমেজ ৩২ রানে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস—৩ উইঃ ৩৩৩ রান (আর এস মোদী ১১২, হাজারে নট আউট ১৩৪, অমরনাথ নট আউট ৫৮, গোমেজ ৩৭ রানে ১টি, জোন্স ৫২ রানে ১টি উইকেট পান)।

তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতীয় দলের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলা

অমরনাথ

আরম্ভ হইবে। ভারতীয় দলে খেলিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ মনোনীত হইয়াছেন :—

অমরনাথ (অধিনায়ক), বিনু মানকড়, এইচ আর অধিকারী, ডি ফাদকার, মুস্তাক আলী, পি সেন (উইকেট রক্ষক), কে সি ইব্রাহিম, গোলাম আমেদ, আর এস মোদী ও এস ব্যানার্জি (মণ্টু)।

দ্বাদশ ব্যক্তি—সি টি সারভাতে।

অতিরিক্ত—এম আর রেগে ও এম কে মন্ত্রী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া

ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের সহিত ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া দলের তিন দিনব্যাপী খেলা হয়। এই খেলা

বিজয় হাজারে

অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া দল প্রথমে খেলিয়া ৬ উইকেটে ৪৬৩ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। কে সি ইব্রাহিম ও ইউ এম মার্চেণ্ট উভয়ে শতাধিক রান করেন। বাঙলার অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কার্তিক বসু ৮৫ রান ও এম এন রায়জী ৫৭ রান করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পরে খেলিয়া তৃতীয় দিনের শেষে ৯ উইকেটে ৫৮৯ রান করে। রে শতাধিক রান করেন। খেলার ফলাফল :—

ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া :—৬ উইঃ ৪৬৩ রান (কে সি ইব্রাহিম ১২৮, ইউ এম মার্চেণ্ট ১০৪, কার্তিক বসু ৮৫, এম এন রায়জী ৫৭, গোমেজ ৭৪ রানে ৪টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল :—৯ উইঃ ৫৮৯ (রে ১৬০, রিচার্ডস ৯৮, এ্যাটকিনসন ..., ম্যাকওয়াট ৫১, ক্যামেরন ৫০, ওয়ালকট ৫..., রঙ্গনেকার ১১২ রানে ৫টি উইকেট পান)।

পশ্চিমাঞ্চল বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল

পুণায় পশ্চিমাঞ্চল দলের সহিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চারি দিনব্যাপী খেলা হয়। খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। তবে এই খেলায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানগণ অধিকাংশই ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে সুবিধা করিতে না পারিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে সুনাম অনুযায়ী ব্যাট

এই খেলায় বিজয় হাজারী পশ্চিমাঞ্চল ...ক শতাধিক রাণ করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ...লকট শতাধিক রান করিয়া পুনরায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। রিকার্ডস ...্যবশত ৯৯ রান করিয়া রান আউট হন।

...র ফলাফলঃ—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসঃ—২৭৪ রান (...মায়ার ৯২, গোমেজ ৫৮, কেরু ৪৯, ফার্গুসন ...াউট ২৫, এম এন রায়জী ১০৩ রানে ৫টি, ...র ৩৫ রানে ৩টি ও সোহনী ৬১ রানে ২টি ...টি পান)।

পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ইনিংসঃ—৪৭৪ রান (এম ... ৪৯, হাজারে ১৩৭, কিষেণচাঁদ ৫৩, বি ...লকার ৫২, ইউ মার্চেণ্ট ৮২, আর নিম্বলকার ... এ্যাটকিনসন ১০৬ রানে ৩টি, গডার্ড ৫২ রানে ২টি ও গোমেজ ৫০ রানে ২টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৮ উইঃ ৪৭৮ রান (কেরু ৬২, রে ৬৯, রিকার্ডস ৯৯, ওয়ালকট ...২০, এম এন রায়জী ১৮৪ রানে ২টি উইকেট ...)।

ডন ব্রাডম্যানের সম্মানে খেলা

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যান প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করায় তাঁহার অবসর গ্রহণের পূর্বে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে এক বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় হ্যাসেটের একাদশের সহিত ব্রাডম্যানের একাদশের চারি দিন-ব্যাপী খেলা হয়। উভয় দল নির্দিষ্ট সময় সমান সংখ্যক রান করায় নাটকীয়ভাবে খেলাটির পরি-সমাপ্তি ঘটে। খেলায় ৬জন খেলোয়াড় শতাধিক ...করেন। এমন কি ব্রাডম্যানও শেষ খেলায় ...ক রান করেন।

প্রতিভা থাকিতেই অবসর গ্রহণ করা অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের রীতি। ডন ব্রাডম্যান তাহাই অনুসরণ করিলেন। ব্রাডম্যান প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ৩৭ বার দ্বিশতাধিক ও ১১৭ বার শতাধিক রান করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা হিসাব দাঁড়ায় প্রতি ইনিংসে ৯৫·৫ রান। খেলার ফলাফলঃ

হ্যাসেটের একাদশ প্রথম ইনিংসঃ—৪০৬ রান (লিণ্ডওয়াল ১০৪, ল্যাংডন ৬০, স্যাগার্স ৫২, হ্যাসেট ৩৫, ম্যাককুল ৩৫, লক্সটন ৪৯ রানে ৪টি উইকেট পান)।

ব্রাডম্যানের একাদশ প্রথম ইনিংসঃ—৪৩৪ রান (ব্রাডম্যান ১২৩, মিউলম্যান ১০০, রেমার ৪০, ম্যাককুল ১০১ রানে ৫টি উইকেট পান)।

হ্যাসেটের একাদশ দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৪৩০ রান (ব্রাউন ৬৩, কর্ণেস ৮৯, হ্যাসেট ১০২, ল্যাংডন ৪২, স্যাগার্স ৪১, লেন জনসন ৫৩ রান নট আউট, রিং ১৫০ রানে ৪টি, রেমার ৬৬ রানে ২টি ও ব্রাডম্যান ১২ রানে ২টি উইকেট পান)।

ব্রাডম্যানের একাদশ দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৪০২ রান (মোরিস ১০৪, টালন নট আউট ১৪৬, হেমেন্স ৪৫, লিণ্ডওয়াল ৩২ রানে ৩টি ও ডুল্যাণ্ড ১০৫ রানে ২টি উইকেট পান)।

মহারাষ্ট্র ও পশ্চিম ভারত রাজ্যদল

মহারাষ্ট্র ও পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় কয়েকটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। এই খেলায় সর্বপ্রথম দেখা গেল হঠাৎ খেলার মধ্যে একটি দল খেলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। ইতিপূর্বে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই। দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইতেছিল সত্য তাহা বলিয়া যে সময় একটি খেলোয়াড় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যানের ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড ভঙ্গ করিতে উদ্যত তখন খেলা বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়া খুবই অন্যায় হইয়াছে। জানি না ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ঐ দলের আচরণের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, তবে খুব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অবসরকারী দল চরম অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক কৃতী মহারাষ্ট্র খেলোয়াড় একা ৪৪৩ রান করিয়া ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে ব্যক্তিগত রানের এক নূতন রেকর্ড করিলেন। ইতিপূর্বে ১৯৪৩ সালে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাইর পক্ষে ও মহারাষ্ট্র দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া বিজয় মার্চেণ্ট ৩৫৯ রান করিয়া ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড করেন। বি বি নিম্বলকার সেই রেকর্ড ভঙ্গ করিলেন। তবে দুঃখের বিষয় যে তিনি ডন ব্রাডম্যানের প্রতিষ্ঠিত ৪৫২ রানের রেকর্ড প্রতিপক্ষ দলের জন্যই অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তাহা ছাড়া এই খেলায় ১৯৪৫ সালে মহীশূর দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া হোলকার দল ৬ উইকেটে ৯১২ রান করিয়া মোট রান সংখ্যার যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও ভঙ্গ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কারণ খেলা যখন বন্ধ হয় তখন মহারাষ্ট্র দলের ৪ উইকেটে ৮২৬ রান হইয়াছিল। তবে এই খেলায় নিম্বলকার দ্বিতীয় উইকেটে ভাণ্ডারকারের সহিত ৪৪৫ রান সংগ্রহ করিয়া নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বি বি নিম্বলকার ও ভাণ্ডারকার ভবিষ্যতে আরও নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

পুস্তক পরিচয়

একান্ত পথ—শ্রীভূতনাথ সরকার, ও বি ই ...ত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস ...নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই ...।

...গীতার কতকগুলি নির্বাচিত শ্লোক চয়ন ... মুদ্রিত হইয়াছে এবং স্বতন্ত্রভাবে ঐ সকল ...র অন্বয়, অনুবাদ ও বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যা প্রদানকালে লেখক উপনিষদ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এবং প্রসঙ্গত অন্যান্য মনীষীদের মত ও ধারণা উল্লেখ করিয়া ... বক্তব্যকে জোরালো করিয়াছেন। গীতা-... পথই যে একান্ত পথ, লেখকের ব্যাখ্যায় ... সুস্পষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। সদ্‌গ্রন্থ ... আমরা বইটির প্রচার কামনা করি।

২১৬।৪৮

...রদীয় শিবির ১৩৫৫—সম্পাদক—শ্রীরাখাল-... চক্রবর্তী, কার্যালয়—১৩/২বি, বেনিয়াটোলা ..., কলিকাতা। মূল্য—বারো আনা।

...শিবির ছাত্র ও কিশোরদের উপযোগী ...াহিক পত্র। উহার বিশেষ শারদীয়া সংখ্যাটি ... করিয়া খুশী হইয়াছি। নানা বিষয়ের প্রবন্ধ, ...প, নাটিকা ও কবিতায় সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ।

২৫৩/৪৮

মেঘ ও মাটি—শ্রীইন্দু গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০বি, হাজরা বাগান, কলিকাতা—১৫। মূল্য আট আনা।

দৃষ্টিকোণ, অন্তরালে, অবতামসী রাত্রির কূলে, এই কয়টি গল্প একত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। গল্পগুলি ভালই লাগিল। কিন্তু এমন চটি বই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী নয়।

যুগ-সংঘ—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী প্রণীত। খাগড়া বিমলারঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

যুগ-সংঘ কতকগুলি দেশাত্মবোধের কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি সমস্তই বর্তমান যুগের বিষয়বস্তু লইয়া রচিত এবং এই যুগেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা এগুলির মধ্যে রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে কয়েকটি কবিতা নিতান্ত প্রচারধর্মী হওয়ার দরুণ কাব্যরসবর্জিত হইয়াছে একথা অপ্রিয় হইলেও অস্বীকারের উপায় নাই। তবে অধিকাংশ কবিতাই বেশ জোরালো।

২৭২/৪৮

বিশ্ববাণী—(স্বামী অভেদানন্দ স্মৃতি-পথ—দ্বিতীয় অবদান) প্রকাশক—ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও কলা সম্পর্কিত বহু সংখ্যক উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ এবং কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। একখানা রঙীন ও অনেক একরঙা ছবিতে সুসজ্জিত। পাঠকগণ এই সংখ্যাখানিতে বহু চিন্তার খোরাক পাইবেন। বিশেষতঃ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত রাগ ও রূপ শীর্ষক সংগীত সম্পর্কিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি সংগীতবিজ্ঞানী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

২৬৮/৪৮
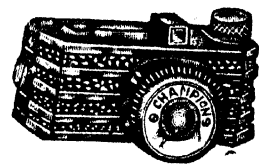
সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৩ই ডিসেম্বর—অর্থনৈতিক কার্যসূচী সম্পর্কে একটি এবং গান্ধী জাতীয় স্মৃতি ভান্ডার সম্পর্কে আর একটি—এই দুইটি প্রস্তাব গ্রহণের পর নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কে যে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কমিশনের সদস্যগণ সকলে একমত হইয়া তাঁহাদের বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। বিবরণীতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভারতে এখন একটা জরুরী অবস্থা বর্তমান রহিয়াছে—এই অবস্থায় ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করা সমীচীন হইবে না।

ভারতীয় গণপরিষদে স্থির হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে ভারতের প্রেসিডেন্ট নিম্নলিখিত নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন—(১) উভয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ। (২) বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের আইন সভায় নির্বাচিত সদস্যগণ। প্রেসিডেন্টের কার্যকাল ৫ বৎসর হইবে।

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের উপ-নির্বাচনে পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী বহু ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইয়াছেন।

অদ্য ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ভারত সরকারের রেলওয়ে ও যানবাহন সচিব শ্রী কে শান্তনমকে কলিকাতায় এক মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করেন।

১৪ই ডিসেম্বর—অদ্য গান্ধীনগরে (জয়পুরে) আচার্য বিনোবা ভাবে সর্বোদয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে স্বাধীন ভারতে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রদর্শনী উদ্বোধন প্রসঙ্গে আচার্য বিনোবা ভাবে তাহা বর্ণনা করেন।

১৫ই ডিসেম্বর—গতরাত্রে নয়াদিল্লীতে ভারত-পাকিস্থান সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে। প্রকাশ, বাস্তুত্যাগ বন্ধ করার ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বিষয়গুলিতে উভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধি দলের মধ্যে অনেকখানি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে। সংবাদপত্র, প্রচার কার্য, বেতার এবং ছায়াচিত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে দৃষ্টি দিবার জন্য উভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধি লইয়া একটি পরামর্শ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামানুসারে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রস্তাবটি ভারত সরকার সমর্থন করিয়াছেন।

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলিকাতায় ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী সমিতির নবম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চপঞ্চাশতম অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া অদ্য স্পেশ্যাল ট্রেনযোগে জয়পুরে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। অপরাহ্নে চারিটী বলীবর্দ বাহিত একটি রজত রথে রাষ্ট্রপতিকে লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়।

১৬ই ডিসেম্বর—জয়পুরে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে অদ্য গান্ধীনগরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। অতঃপর নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির বৈঠক বিষয় নির্বাচনী সভায় পরিবর্তিত হয়। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া উহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বৈঠক আরম্ভ হওয়ার পর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কংগ্রেসের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর অধিবেশনে কংগ্রেসের বাণী ও আদর্শ এবং ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপাল এখন হইতে মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাইবেন। উহা আয়কর মুক্ত থাকিবে।

১৭ই ডিসেম্বর—গান্ধীনগরে (জয়পুরে) ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার সভাপতিত্বে বিষয় নির্বাচনী সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। অধিবেশনে ৮টি সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব "ভারতস্থ বৈদেশিক উপনিবেশ" সম্পর্কে। উহাতে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতে বৈদেশিক উপনিবেশের অস্তিত্ব ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। অন্যান্য প্রস্তাবগুলি "দেশীয় রাজ্য", "দেশ বিভাগের ফলে দুর্গতগণ", "শ্রম", "গান্ধী জাতীয় স্মৃতিরক্ষা তহবিল", "দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ", "ইন্দোনেশিয়া" এবং "সাম্প্রদায়িকতা" সম্পর্কে।

বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে "দেশ বিভাগের ফলে দুর্গতগণ" সংক্রান্ত সরকারী প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা দানকালে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পাকিস্থানকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দুদের বাসের উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করিতেই হইবে। যদি অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে তবে ভারতবর্ষ তাহা বরদাস্ত করিবে না।

১৮ই ডিসেম্বর—গান্ধীনগরে (জয়পুরে) রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চপঞ্চাশৎ অধিবেশন আরম্ভ হয়। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গাহিবার পর অধিবেশনের কাজ আরম্ভ হয়। সভাক্ষেত্রে দুই লক্ষাধিক নরনারী উপস্থিত ছিলেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকান্ডে সুগভীর বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া অধিবেশনে কংগ্রেসের বাণী ও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত সরকারী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এই আশা ব্যক্ত করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে যৌথ দেশরক্ষা ব্যবস্থা, যানবাহন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত আগষ্ট মাসের পূর্বে প্রস্তুত এবং ১লা ডিসেম্বর তারিখে আটক ভারতীয় মিলজাত বস্ত্র সরকার কর্তৃক ন্যায় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণের নিকট বি[illegible] ১৯৪৯ সালের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে [illegible] ছাড়িয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৯শে ডিসেম্বর—গান্ধীনগরে (জ[illegible] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন [illegible] হইয়াছে। অদ্যকার অধিবেশনে কংগ্রেস ভার[illegible] বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে ১৬টি সর[illegible] প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। অধিকন্তু কংগ্রেস গঠনতন্ত্র[illegible] কয়েকটি ছোটখাট সংশোধনও করা হইয়া[illegible] "আচরণের মানদন্ড" সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গতক[illegible] ও অদ্য বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকে বি[illegible] চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু অদ্য [illegible] বিনা বিতর্কেই প্রকাশ্য অধিবেশনে গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

১৪ই ডিসেম্বর—হংকং-এর সংবাদে প্র[illegible] চীনা অর্থনৈতিক মহলে অদ্য এই মর্মে এক সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে যে, চী[illegible] প্রেসিডেন্ট জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক পদ[illegible] করিয়াছেন। জেনারেলিসিমোর স্থলে ভাই[illegible] প্রেসিডেন্ট লি সুং জেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচি[illegible] হইয়াছেন।

নানকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য কম্যু[illegible] বাহিনী চীনের প্রাচীন রাজধানী পিপিং-এর দ[illegible] প্রান্তে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত [illegible] বিম[illegible] ঘাঁটি দখল করিয়াছে।

১৬ই ডিসেম্বর—হংকং-এ একটি ব্য[illegible] বামপন্থীরা খবর পাইয়াছে যে, পিপিং-এর প[illegible] হইয়াছে।

১৭ই ডিসেম্বর—নানকিং-এর সংবাদে প্র[illegible] জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক অদ্য তাহার [illegible] কোয়ার্টার নানকিং হইতে উত্তর দিকে ৪০ মাই[illegible] মধ্যে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রকাশ, গভর্নমেন্ট[illegible] নূতন হেড কোয়ার্টার চুসিয়েনে স্থানান্ত[illegible] হইয়াছে।

১৯শে ডিসেম্বর—বাটাভিয়ায় প্রকাশিত [illegible] ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে, বিমানবাহি[illegible] ওলন্দাজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে যোগ্যকর্তা অধি[illegible] করিয়াছে। বাটাভিয়া রেডিওর এক সংবাদে প্র[illegible] গণতান্ত্রিক দলের প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ [illegible] মন্ত্রী সহ যোগ্যকর্তা ত্যাগ করিয়া বিদেশ [illegible] করিয়াছেন।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।